

CUK-17485A-22-P30101

প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

১৬.৩
০/৪

ষোড়শ ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড

১৩২৩ সাল, কার্তিক-চৈত্র

প্রবাসী কার্যালয়

১৩১ কণওয়ালিস, ষ্ট্রিট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

প্রবাসী ১৩২৩ কার্তিক—চৈত্র

১৬শ ভাগ ২য় খণ্ড,

বিষয়-সূচী

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।
কর্মার ক্ষমতা (কবিতা)—শ্রীকীর্তীলাল	...	চন্দ্রের উৎপত্তি (সচিত্র)—
চট্টোপাধ্যায়	৩৪২	কুমার মিত্র, এম-এসসি
অস্থির ইচ্ছা (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	১০৩	চরৈবেতি, চরৈবেতি—শ্রীকি
অপরোধীর মন পরীক্ষা (সচিত্র)—	৫৩	চারপেয়ের বাসা (সচিত্র)
অবোধ (কবিতা)—শ্রীনন্দদুলাল দত্ত	৪৫ ৫৬৪	পাধ্যায়, বি-এ
“আগে চল আগে চল তাই”—শ্রীহরেশচন্দ্র বন্দ্যো-	...	চারের হার (কবিতা)—শ্রীকা
পাধ্যায়	১৭	চিত্তসংঘম—শ্রীহরেশচন্দ্র বন্দ্যো
আলোচনা—	৭৬, ১৭৭, ৪০২, ৪৮০, ৫২৮	চিত্রকর (গল্প)—শ্রীপরিমলকুম
ইতিহাস—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল	...	চিত্র-পরিচয়
উপলব্ধি—শ্রীকৃষ্ণলাল আচার্য্য চৌধুরী	...	চিত্রশিল্প সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি খেদে
এদেশে রাজর্ষি রামমোহনের আদর—শ্রীধোয়েন্দ্রনাথ	...	চিনির গৃহ (সচিত্র)—শ্রীনির্মল
চৌধুরী, এম-এ	...	চান্দাদের জীবনযাত্রা (সচিত্র)
বি ও কবি—অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত,	...	সরকার, এম-এ
এম-এ	২২৮	চীনের তৃতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব—শ্রীবি
ভক্ত (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	১০২	এম-এ
খর—	২৮৭, ৩৭২, ৫০৫, ৫৬৫	চীনের শিকাগো (সচিত্র)—শ্রীবি
সিঙ্কের কাজ (সচিত্র)—শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যো-	...	এম-এ
পাধ্যায়, বি-এ	৪২৩	ছাতার বাটের চাব
গল্প (গল্প)—শ্রীসরযুবালা সেন	...	ছাঁচ ও তলোয়ার (কবিতা)—শ্রী
(কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২০	ছেলেদের ঘড়ি ঘড়ি ক্ষুধা পায়
বিভা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	১০৩	বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা)—শ্রীআবু ছালে সৈয়দ মোহাম্মাদ	...	ছোটলোক (কবিতা)—শ্রীজলধর
খার হোসেন চৌধুরী	১৩৭	জগৎপ্রসিদ্ধ মহাপ্রাচীর (সচিত্র)
র-লক্ষ্মী (কবিতা)—শ্রী	৫৫	সরকার, এম-এ
ঐক্যরূপে মাটির ব্যবহার—	...	জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ
মাঝে ছবির সাধনা (সচিত্র)—শ্রীচাক্রচন্দ্র	৪২৫	—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৫	জাতের ভিতর ভাঙ্গা-গড়া ও ওঠা-ন
অক্ষরের উচ্চারণ—অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
য়, এম-এ, বিদ্যানিধি বিজ্ঞানভূষণ রায়-	...	জাপানী টিকি (সচিত্র)
হাহু	...	জাপানী বীরের সাহস পরী

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।”

১৬শ ভাগ

২য় খণ্ড

কার্তিক, ১৩২৩

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাধারণ লোক।

“এক যে ছিল রাজা। তার ছিল এক বাগী।” রাজা ও রাণীদের সম্বন্ধে এই বক্তৃতির অন্তিম উপকথা নানা দেশে আছে। বড়-বড় কাব্য মহাকাব্য নাটকের নায়ক-নায়িকারা রাজা রাণী রাজকুমারী। অল্প লোকদের সম্বন্ধে কোন কাব্য যে লেখা হয় নাই তাহা নয়। হইয়াছে; যেমন মুচ্ছকটিক, যেমন মুকুন্দরামের চণ্ডী। কিন্তু উপবধা ও কাব্যের নাবকনায়িকা প্রধানতঃ রাজা বাণী রাজকুমারীরাই হন। পুরাকালে যেমন এখনও তেমন, সাধারণ লোকদেরও জীবনে আলো ও ছায়া, সুখদুঃখ, নানা বিচিত্র রস আছে; কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি প্রথম হইতে ভাল করিয়া পড়ে নাই।

প্রাচীনকালে ভাবতবর্ষে, গ্রীসে, রোমে সাধারণতন্ত্র ছিল, রাজতন্ত্রও ছিল। উভয়প্রকার শাসনপ্রণালীই এখনও পৃথিবীতে আছে। কিন্তু তথাপি, মোটের উপর, এখনও অসংখ্য লোকের ধারণা এই যে, দেশে একজন রাজা না থাকিলে দেশের কাজ চলিতে পারে না, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতে পারে না; অরাজক কথাটিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ড, জাপান, প্রভৃতি দেশে রাজার নিয়মিত-কর্তৃত্বে যেমন দেশগুলি প্রবল,

ও সভ্য হইয়াছে, আমেরিকা, ফ্রান্স, প্রভৃতি সাধারণতন্ত্রেও লোকেরা তেমন শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও সভ্য হইয়াছে। বর্তমান মহাযুদ্ধে রাজতন্ত্র ইংলণ্ড অপেক্ষা সাধারণতন্ত্র ফ্রান্সের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য কম দেখা বাইতেছে না।

রাজা, রাজবংশ, রাজপরিবার, ইহারাই সব, জনসাধারণ কিছু নয়, এইরূপ ধারণাবশতঃ কয়েক বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত ইতিহাস মানে ছিল, রাজাদের জন্মমৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ, সিংহাসন-আরোহণ, সিংহাসনচ্যুতি, এক রাজবংশের উচ্ছেদ এবং তাহার জায়গায় অন্য বংশের অভ্যুদয়, ইত্যাদি বিষয়ের সমষ্টি। দেশের লোকেরা কেমন কবিষা জ্ঞানে ধর্ম্মে, পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থায়, শিল্প-বাগিছো, সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনে, দৈহিক ও মানসিক বলে, রাষ্ট্রীয় শক্তিতে ও অধিকারে, এবং সভ্যতায়, উন্নত বা অধঃপতিত হইতেছে, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত না।

রাজাকে ও রাজবংশকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখায় মাছুষ ধর্ম্মজগতেও প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে নাই। তাহার একটা দৃষ্টান্ত যীশুখ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্তে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সূত্রধরের সন্তান; কিন্তু তাঁহার মহত্ব বাড়াইবার জন্য তাঁহাকে রাজা দাউদেব বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এক বংশতালিকা সৃষ্ট হইল। অথচ ইহা সকলেরই বুঝা উচিত, যে, মাছুষের মহত্ব বংশের জন্য হয় না, নিজের চরিত্র ও চরিত্র হইতেই হয়।

সে-কালের যুদ্ধের বর্ণনা পড়িলেই মনে হয়, যেন সেনাপতি মহারথীরাই সব, সাধারণ সৈনিকেরা বেশী কিছু নয়। একজন মহারথী আহত হইলেন; বা মারা পড়িলেন, আর অমনি অমুচরেরা সকলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। একজন দিগ্বিজয়ী দস্যু যদি কোন দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজাকে বন্দী বা হত্যা করিতে পারিল, তাহা হইলে দেশও অধিকৃত হইয়া গেল। আজকালকার দিনেও যুদ্ধে জয়লাভ সেনাপতির বুদ্ধি, কৌশল, কষিষ্ঠতা ও সাহসের উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু, পুরাকালের কাব্যের বর্ণনার মত, সেনাপতির মৃত্যুতেই কোন পক্ষের সর্বনাশ হয় না।

মানবজীবনের সকল বিভাগেই সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষের বড় বেশী প্রভেদ বুলনা করা হইয়াছে, এবং তাহাতে এই কুফল ফলিয়াছে যে সাধারণ মানুষেরা, দৈহিক স্বাস্থ্য স্বপ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের অধিকার, মানসিক শক্তি, রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং আধ্যাত্মিকতা, সকল বিষয়েই আপনাদিগকে অত্যন্ত হীন বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও নিজ নিজ হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু একরূপ বিশ্বাসও অমূলক, এবং এই প্রকার সন্তোষও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের অন্তরায়। তজ্জগৎ যথেষ্ট পরিমাণে অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য স্বপ্নস্বাচ্ছন্দ্য এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায় নাই।

রাজবংশের অশোক, রাজবংশের আকবর, রাজবংশের ভিক্টোরিয়া, রাজবংশের মুংসুহিতো, ইহাদের মত লোকদের যশ ম্লান করিবাব কোন ইচ্ছা নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষদের মাঝখান থেকে এতাহাম লিঙ্কনের মত লোক যে জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তাহাতে ইহাই বুঝায় যে রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভেদ শক্তির মাত্রা বা বিকাশের প্রভেদ মাত্র। মেঘ ও মানুষের মধ্যে যেমন প্রভেদ আছে, সাধারণ ও অসাধারণ মানুষের তজ্জপ কোন প্রভেদ নাই। আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রমণ্ডলে (U. S. A.), ফ্রান্স, এবং অগ্রাগ্র সাধারণতঃ দুই পাঁচ বৎসর অন্তর-অন্তর নতুন দেশপতি (president) নির্বাচিত হইতেছেন; কিন্তু কার্যক্ষম লোকের অভাব হইতেছে না। সাধারণ লোকদের দল হইতেই যোগ্য মানুষ পাওয়া যাইতেছে। রাজবংশের

লোকেরাও ত প্রথম হইতেই রাজা ছিলেন না। যে-সকল রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস আছে, তাহাদের আদিপুরুষ জনসাধারণের দল হইতে উদ্ভূত দেখা যায়।

বড় বড় যোদ্ধারাও অধিকাংশ স্থলে সাধারণ লোকদের বংশ হইতে উদ্ভূত। অনেক বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ, মন্ত্রী, বৈজ্ঞানিক, কবি, ধর্মপ্রবর্তক, সাধারণ পরিবারের সন্তান।

আমাদের মধ্যে বীজরূপে যাহা নাই তাহা আমাদের কেহ দিতে পারে না। অন্ত্রে কেবল বীজকে অঙ্কুরিত হইয়া পরে পত্রপুষ্পফলবান বৃক্ষে পরিণত হইতে সাহায্য করিতে পারেন। কবি আমাদের তাঁহার কবিতা শুনাইয়া আনন্দ দিতে পারেন এই জন্ত যে তাঁহার আত্মা ও আমার আত্মা একই বকমের। তাঁহার চিন্তা, ভাব, স্বপ্ন, আনন্দ এই কারণে আমারও হইতে পারে; তিনি যে বস আশ্বাদন করিয়াছেন, তাহা আমিও করিতে পারি। তিনি কিন্তু গোকুলে নিজের আনন্দ দিতে পারেন না, নিজের স্বপ্ন দেখাইতে পারেন না; কারণ গোকুল একটা স্বতন্ত্র রকমের জীব। কবিকে খুব ভালবাসি, খুব সম্মান করি, কিন্তু অতিমানুষ কোন গুণ তাঁহাতে আরোপ করিতে পারি না। তিনি মানবসমাজ হইতে রসসংগ্রহ করেন, মানবসমাজে বাস তাঁহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অগ্রতম প্রধান কারণ।

দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সকলের সম্বন্ধেই এই সব কথা প্রযুক্ত। তাঁহার খুব সম্মানার্থ, কিন্তু অতিমানুষ কিছু নহেন।

কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতির শক্তির প্রকৃতি কিরূপ, মূল কোথায়, বিকাশ কেমন করিয়া হয়, তাহা সভ্যতাব উৎকর্ষ সহকারে মানুষ যত জানিতে পারিবে, এবং শৈশব হইতে শিক্ষার আয়োজন যে পরিমাণে এই জ্ঞানের অনুযায়ী হইবে, সেই পরিমাণে আরও অধিকসংখ্যক এবং অধিকতর শক্তিশালী কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতি, সাধারণ মানুষদের মধ্য হইতেই পাওয়া যাইবে। হইতে পারে যে, এক এক জন মানুষ কেমন করিয়া অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হয়, তাহার সমস্ত কারণ আমরা কোন কালেই জানিতে পারিব না; যাহাকে জ্ঞানের অভাবে “দৈব” বলা হয়, একরূপ কিছু কারণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই “দৈবের”ও লীলাক্ষেত্র সাধারণ মানুষদেরই আত্মা, সাধারণ মানুষদেরই হৃদয়মন।

আব সকল বকম অসাধারণ মানুষকে সাধারণ লোকদের আত্মীয় ও জ্ঞাতী বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইলেও, ধর্মজগতে তাঁহারা মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন, মানবমন এখনও তাঁহাদিগকে সাধারণ লোকদের ছা'ত ভাই বলিয়া মানিতে রাজী হয় নাই। এইজন্য বুদ্ধ যীশু প্রভৃতি কোন কোন ধর্মপ্রবর্তকের জন্ম পর্য্যন্ত অলৌকিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মপ্রবর্তকদিগকে আমবা ভক্তি করি; তা'হা একটুও কমাইতে চাই না। কিন্তু আমরা যে তাঁহাদের জা'তভাই তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের মধ্যে বাহা বীজরূপে নাই, তা'হা আমাদের কাছে দিতে পারে না। ধর্মজগতের অসাধারণ মানুষেরা অল্প মানুষকে আধ্যাত্মিকতা দিতে পারেন, ধার্মিক করিতে পারেন, এইজন্য, যে, এই-সব অল্প-মানুষের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মপ্রবণতা স্তূপ ভাবে রহিয়াছে। বাবকে তাঁহারা আধ্যাত্মিকতা ও সম্বল দিতে পারেন না, কারণ বাব আর-এক রকমের জানোয়াব, গাছপাথরকে ত পারেনই না।

একটা ঘরের মধ্যে বাতাস আছে বলিয়াই, উহার একদিকে বেহালা বাজাইলে অন্য দিকের লোকেরা শুনিতে পায। কিন্তু একটা বাজের মধ্যে বেহালা রাখিয়া তা'হা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ুশূন্য করিয়া যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার তন্ত্রীগুলি বর্ষণ কবা যায়, তা'হা হইলে কোন শব্দই আমরা শুনিতে পাইব না, কারণ শব্দতরঙ্গের আশ্রয়ভূত বায়ু বাজের নাই। তেমনি, সাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষ আমবা সবাই যেন আত্মাসাগরে বিচরণ করিতেছি, একের আশ্রিত তরঙ্গ অপরে সঞ্চালিত ও সংক্রামিত হইতেছে।

ধর্মজগতের অসাধারণ মানুষদের মধ্যে যে সাধুতা, প্রেম, পবিত্রতা, আত্মোৎসর্গ, সাহস, নিষ্ঠা, অন্তর্দৃষ্টি, প্রভৃতি দেখা গিয়াছে, সেই রকমের জিনিষ যে অনেক অপ্রসিদ্ধ অজ্ঞাতকুলশীল নবনারীব মধ্যেও ছিল, আছে, ও দেখা গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক রাজবংশের আদিপুরুষ যেমন সাধারণ পিতামাতার সন্তান, তেমনি অনেক ধর্মপ্রবর্তকও সাধারণ পিতামাতার সন্তান। অন্যদিকে, আবার, তাঁহাদের ও আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে পব-ব্রহ্মের সহিত। খৃষ্টিয়ানেরা ঈশ্ববকে “our Father” (আমাদের পিতা) বলেন, আমরা বলি “পিতা নোহসি,”

অদ্বৈতবাদী বলেন “সোহম্।” কোন দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া বলিতে পারা যায় যে এই-সমুদয় উক্তির মধ্যেই সত্য আছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একাত্ম; স্তবরাং সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষ সবাই এক পবিত্রতার লোক। একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ রাত্রিকালে আকাশের জ্যোতিষ্কদের গতি দেখিতে দেখিতে বলিয়াছিলেন, “হে প্রভু, আমি তোমার চিন্তার অনুসরণ করিতেছি” (I am thinking thy thoughts)। ঋষিব সত্য দেখা পরব্রহ্মেরই দেখাব মত, কবির আনন্দ তাঁহারই আনন্দের মত, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান তাঁহারই জ্ঞান, দার্শনিকের মনন তাঁহারই মনন।

অসাধারণ ধার্মিকেরা বাস্তবিকই মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু আমরাও তুচ্ছ নহি; আমরাও “অমৃতন্ত পুত্রাঃ”, “অমৃতের পুত্র।” আমরা যেন অল্প জ্ঞানে, অল্প পবিত্রতায়, অল্প প্রেমে, অল্প শক্তিতে, অল্প বিশ্বাসে, অল্প সাহসে, অল্প কৃতিত্বে সন্তুষ্ট না হই; এমন যেন মনে না করি, যে, আমরা তুচ্ছ সাধারণ মানুষ, অতএব আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। না, আমাদেরও অধিকাব, আমাদেরও সম্ভাব্যতা অসীম।

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে একজন ভাল রাজা বা ভাল মন্ত্রী যেমন দেশের কাজ চালাইবার ও দেশের স্বশস্যবৃদ্ধি করিবার সুপন্থা নির্দেশ করিতে পারেন, তেমনি জনসাধারণও পরামর্শ করিয়া সহুপায় ও সুপ্রণালী নির্ণয় করিতে পারেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কখন কখন ভুল হয় বটে, কিন্তু বড় বড় রাজাদের এবং মন্ত্রীদেরও ভুল হয়।

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দেশের প্রতিষ্ঠা যেমন হইয়াছে, ধর্মক্ষেত্রে এখনও ততটা হয় নাই; কিন্তু তাহার স্বত্রপাত হইয়াছে। দশজন সঙ্গসংকল্প লইয়া পরামর্শ করিলে যেমন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সুপন্থা ও স্থনীতি আবিষ্কৃত হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি সাধুশ্রুতিপ্রায়ে দশজন মিলিত হইলে তাঁহারা তত্ত্বদর্শী এবং ধর্মপথের আবিষ্কর্তা হইতে পারেন। কারণ, সকলেরই আত্মা এক রকমের, সকলেরই সত্য দেখিবার চিনিবার মানিবার ক্ষমতা আছে। প্রজাতন্ত্র প্রণালী অনুসারে শাসিত দেশে অতীত কালের ব্যবস্থাপক-দেব নীতি, জ্ঞান ও ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া হয়;

তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হব না। ও শৌর্য প্রদর্শন করেন নাই। ধর্মপ্রবর্তক একা সব তেমনি, ধর্মজগতেও, স্বতন্ত্র পথে পথিকেরা কোন শাস্ত্র, কোন সাধুবচনকে অবজ্ঞা করিবেন না, সমস্তই প্রজ্ঞার সহিত অলুপন করিবেন; কিন্তু সাধাবণ অসাধারণ সব মানুষের আত্মাতেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত, ইহাও কখনই বিশ্বত হইবেন না। দশজনের, ভোট লইয়া ধর্মবিষয়ক সত্য নির্ণয় উপহাসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহাও ঠিক যে যতক্ষণ কোন শাস্ত্রীয় উক্তি বা সাধুবচনে আশাদের অন্তবাস্তা সাব দিতেছে না, ততক্ষণ উহা আমাদের পক্ষে সত্য নহে। আমবা যন্ত্রের মত উহা অব্যবহৃত হইতে পাবি; কিন্তু তখনই উহাকে মানুষের মত মানা হয়, যখন আমাদের অন্তবাস্তা, বুঝিয়া সজ্জিয়া, উহাতে আনন্দেব সহিত সায দেয়।

অসাধারণ মানুষদিগকে প্রণাম কবি। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় হইবার উপযুক্ত হইতে চাই। সেই অধিকার দাবী কবিতেনি। কলের মত অলুচর হইতে ও থাকিতে চাই না, সহধর্মী, সহমর্মী, সহযোগী, ও সহকর্মী হইতে চাই। ইহা আশ্পর্শ নয়: ইহাকেই আমরা প্রকৃত প্রীতি, প্রকৃত ভক্তি মনে করি।

সাধারণ মানুষের প্রয়োজন।

জগতের দ্বিধিজয়ী বীরেরা এবং বড় বড় সেনাপতিরা খুব শক্তিশালী লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাধারণ সৈন্য তাঁহাদের জয়লাভেব জন্ত প্রাণ দেয়, তাহারা অখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা হইলেও তুচ্ছ লোক নয়। সেনানায়ক ব্যতিরেকে যুদ্ধ চলে না বটে, কিন্তু সাধাবণ নিপাহী ভিন্নও ত যুদ্ধ চলে না। সেনাপতি ২৪ জন মরিলে সাধাবণ সৈন্যদের মধ্য হইতে ববং লোক বাছিয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করা চলে, কিন্তু হাজার হাজার মৃত সৈনিকের স্থান পূরণ সেনানায়কেরা করিতে পারেন না।

ধর্মপ্রবর্তকেরা মহৎ ও ক্ষমতাবান লোক সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ও অলুশিষ্যেরাও ধর্মের জন্ত সর্বপ্রকার উপহাস, ক্লেণ, উৎপীড়ন, ও লাঞ্ছনা সহ্য কবিতেন। এবং বহু স্থলে প্রাণ দিয়া কম আত্মোৎসর্গ, বিশ্বাস, নিষ্ঠা

ও শৌর্য প্রদর্শন করেন নাই। ধর্মপ্রবর্তক একা সব কাজ করিতে পাবেন না। দলের লোকদের উপর সাফল্য বেশী নির্ভর কবে। তাঁহার কথা ও কার্য যেমন তাঁহার দলের লোকদিগকে অলুপ্রাণিত করে, তেমনি তাঁহার মণ্ডলী লোকদের কথা ও কার্যও তাঁহাকে নূতন আলোক দেয় ও উৎসাহিত কবে।

বড়-বড় আড়তদার, বড়-বড় কারখানার মালিক মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অগ্রান্ত জিনিষ জোগান বটে, কিন্তু অগণ্য কৃষক, কুলী, মজুর, মিস্ত্রীকে বাদ দিলে তাঁহাদের কোন সামর্থ্য, কোন কৃতিত্বই থাকে না। “চাষা” কথাটা প্রয়োগ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করা সোজা, কিন্তু “বাবু”র চেয়ে চাষার দবকার সংসাবে খুব বেশী।

নানাপ্রকারেব গৃহ, প্রাঙ্গণ, দুর্গ, মন্দির, গির্জা, মসজিদ, কবর, রাস্তা, ঘাট, সেতু সভ্যতাব বহিরঙ্গ। এগুলির উপর নামের ছাপ পড়ে বড়-বড় ধনী, বড়-বড় এঞ্জিনিয়ারের, কিন্তু সাধারণ মিস্ত্রী মজুর ভিন্ন তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না।

অনেক কবিতায় একপ লেখা আছে যে কবির আপন মনে নিভূতে বসিয়া আপনাব আনন্দে বিভোর হইয়া গান করেন। এই কল্পনাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব না হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক একটি মহাকবিকে বালা বা যৌবনকাল হইতে একটি নির্জন দ্বীপে রবিন্সন ক্রুসোর মত রাখিয়া দিলে তিনি কেমন আনন্দে বিভোর হইয়া আপন মনে গান কবিতেন দেখা যাইত। মানবমাজ, গৃহপরিবার, আত্মীয় প্রতিবেশী আছে বলিয়াই মহাকবিরও কাব্য সম্ভব হয়। মানুষেব জীবনেব ঘাতপ্রতিঘাত, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, হর্ষশোক, পদস্থলন ও উত্থান, চারিত্রিক সংগ্রাম জয় পবাজয়, প্রভৃতি কবির কাব্যের উপাদান। কবি নিজেব আনন্দ অপর মানুষেব সহিত উপভোগ করিতে চান ও কবিতা পারেন বলিয়াই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কবি একা বিশেষ একটা কিছু নহেন, অপর দশজনকে লইয়া কবি।

ধনীলোকেরা এক শ ছ শ, দু-দশ হাজার, বিশ-পঁচিশ লক্ষ, দু-এক কোটি টাকা দান করেন; তাহাতে মানুষ অবাক হইয়া যায়, তাঁহাদের গুণে মোহিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রশংসা করিবার সময় ইহাও মনে রাখা দরকার

যে ঐ-সব টাকা গরীবের হাড়ভাঙা পরিশ্রম হইতে উৎপন্ন ;) অনেক স্থলে গরীবকে উপযুক্ত মজুরী না দেওয়াতেই ধনীর ধনবান্ হওয়া সম্ভব হইয়াছে, কখন-বা গরীবকে ঠকাইয়া ধনী ধন লাভ করিয়াছে। ধনীর টাকা ব্যতীত বড় কাজ যে হয় না, তাহা নয়। তীর্থস্থানের কোন কোন জলাশয়, ধর্মশালা আদি মুষ্টিভিক্ষা ও এক আধ পয়সা ভিক্ষা দ্বারা কোন কোন সম্মানীয়কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতাব বড়-বড় বেসরকারী কলেজ প্রধানতঃ গরীব ছাত্রদের বেতন হইতে চলিতেছে। মহারাষ্ট্রেব তালগাঁও কাচের কারখানা “পয়সা-ফণ্ড” হইতে স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্রের উপর রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালী ব সাহায্য গরীবের, আত্মদানকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাহারও শুভকামনা, কাহারও উপকার, “কায়মনো-বাক্যে” করা বহু গ্রন্থে আছে। “কায়মনোবাক্যে” ভগবানের ইচ্ছা অনুগত হওয়া, তাঁহার সেবা করা যাইতে পারে। কায়, মন ও বাক্য এই সংস্কৃত কথা তিনটির যেমন একত্র একত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তেমনি হিন্দীতে “তন মন ধন” অর্থাৎ তনু (দেহ), মন ও ধনেরও সম্মিলিত প্রয়োগ প্রচলিত আছে। যিনি পরম ভক্ত, তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয়, যে, তাঁহার “তনমনধন” ভগবৎচরণে উৎসর্গ হইয়াছে। জগতে কেহ বা বাক্যমনের দ্বারা, কেহ বা ধনের দ্বারা, কেহ বা মন ও ধনের দ্বারা, কেহ বা শুধু বাক্যের দ্বারা হিতসাধনের চেষ্টা করেন। ইহারা কেহ কবি, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বাগ্মী, কেহ বা দানবীর বলিয়া বশী হইবেন। কিন্তু যে-সকল লক্ষ-লক্ষ কোটিকোটী মানুষ কাষ দ্বারা, “তনু” দ্বারা, দেহ দ্বারা, হাত পায়ের দ্বারা, সমাজের সেবা কবে, যাহারা না থাকিলে লোকস্থিতি অসম্ভব হইত, তাহাদের এই দৈহিক দেবপূজা, এই দৈহিক মানবসেবা, অখ্যাত এবং কবির কাব্যে অকীর্তিত হইলেও, কখনই তুচ্ছ নহে। তাহারা জানে না, জানিয়া অহঙ্কৃত হয় না, যে, তাহাবা কত বড় কাজ করিতেছে এবং সেই কাজ ব্যতিরেকে সংসার কিরূপ অচল হয়। এই অজ্ঞানকৃত সেবা ভগবান্ কি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না? প্রাসাদের যে অংশ মাটির উপর দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাব সৌন্দর্য্য ও

তাহার সুশ্রাব্ধন্দ্য-বিধানের উপযোগিতায় আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু নঘনগোচর সমস্তটাই যে মুস্তিকাগর্ভে প্রোথিত অসুন্দর ভিত্তির উপর খাড়া হইয়া আছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নয়। গাছের ডালপালা ফলফুল সুশোভন এবং নানা প্রকারে হিতকর ও আনন্দদায়ক; তাহার শিকড়-গুলি তেমন সুন্দর নয়। কিন্তু শিকড়গুলি ব্যতিরেকে কোন শোভা, কোন হিত সম্ভব হইত না। মানুষের সমাজ প্রাসাদের মত, পত্রপুষ্পফলে সম্বিজিত বৃক্ষের মত। ইহার ভিত্তি, ইহার মূল, চাষা মুটো মজুর কুলি কারিগর।

এই সত্যটি উপলব্ধি কবা সকল দেশের সকল জাতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইহা আমাদের দেশে যত দরকার, এত, বোধ করি, আর কোথাও নয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদের জীবনকে, আমাদের কায়মন ও বাক্যের ক্রিয়াকে, তাহার অনুরূপ করিতে না পারিলে আমাদের উদ্ধার নাই।

এব্রাহাম লিঙ্কন ঠিক বলিয়াছিলেন, “ভগবান্ নিশ্চয়ই সাধারণ লোকদিগকে ভালবাসেন, তাহা না হইলে তিনি এত বেশী করিয়া সাধারণ লোকেব সৃষ্টি করিতেন না।”

সাধারণ লোকের দায়িত্ব।

সাধারণ লোকদের অধিকার, সাধারণ লোকদের শক্তি, সাধারণ লোকদের দাবী, এবং সাধারণ লোকদের গৌরবের কথা বলিলাম। কিন্তু ইহা বৃথা আফালন বরিবার জ্ঞান নয়। যেখানে অধিকার সেইখানেই তাহার অনুরূপ দায়িত্ব; শক্তি এক পিঠ, শক্তির অনুরূপী কাজ উন্টা পিঠ। একটাকে বাদ দিবা অস্ত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা বৃথা। আমরা সাধারণ লোকেরা এইজ্ঞান উদ্ধৃত হইতে চাই যে আমরা আমাদের দায়িত্ব বুঝিয়া শক্তি বুঝিয়া তাহার মত মানুষ হইব, তাহাব মত কাজ করিব, এবং তাহার মত অধিকার জিনিষ লইব। আমরা প্রকৃত নেতাকে পদচ্যুত করিতে চাই না, অসাধারণ মানুষের মহত্ত্ব খর্ব করিতে চাই না। কিন্তু, কে কবে নেতা হইবেন, কখন কোন্ মহাপুরুষ আসিবেন, কখন কোন্ অবতারেব আবির্ভাব হইবে, আমরা তাহাব অপেক্ষা আলস্তে কাল কাটাইতে পারি না। ভগবান্

নানা শক্তিরূপে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রহিয়াছেন। আমাদের কাজ আমবা করিব। যাহার চোখ আছে, তাহাকে বিশ্বের চমৎকারিত্ব বুঝিবার জ্ঞান হিমালয়ে ঘাইতে হয় না, পথের ধূলাতেও তাহা তাহার নিকট জাজ্ঞ্যমান। অসাধারণে ভগবানের মহিমা, ভগবানের শক্তি আছে বটে, কিন্তু সাধারণেও আছে। সাধারণের আত্মবিশ্বাস হইয়া থাকে। সাধারণ জাগুন, এবং তাঁহার যাহা হইবার সম্ভাবনা তাহা হউন, তাঁহার যাহা করিবার তিনি করুন। সূর্য্য চন্দ্র আলোক দেয় বলিষা নক্ষত্রেরা ত আলো দিতে বিরত হয়ই না, জোনাকিও বিরত হয় না। জমীকে উর্ব্বর করিবার জ্ঞান বড় বড় বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু অরণ্যভীত কাল হইতে কেঁচোও আঁধারে লোকচন্দ্র অগোচরে জমীকে চাষের উপযোগী করিয়া আসিতেছে।

অহংকারেব ঔষধরূপ দীনতা অকিঞ্চনতা ভাল; কিন্তু উহা যখন মাহুষের হাত পা ও আত্মাকে অবশ ও জড়তাপন্ন করে, তখন উহা বিষ, উহা বর্জ্জনীয়। ভগবানের কাছে আমরা অতি ক্ষুদ্র ইহা সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে আমরা “অমৃতস্ত পুত্রাঃ,” আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা মরিব না; আমবা মহৎ ও শক্তিশালী।

নমঃশূদ্রের উচ্চশিক্ষা।

ভাঙ্গমাদের “নমঃশূদ্র-হিতৈষী”তে দেখিয়া স্থখী হইলাম, ৪ জন নমঃশূদ্র ছাত্র বি-এ, ২ জন আই-এ, ১ জন আই-এসসী, এবং ২ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শিক্ষিত নমঃশূদ্রদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা অল্প জাতির শিক্ষিত হিন্দুদিগকে “রাজপ্রোহী” ইত্যাদি যেন না বলেন। তাঁহারা এ যাবৎ অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা পাইয়া আসিতেছেন বটে; কিন্তু তাহার পরিবর্তে বিদ্বেষ ভাল নয়; ক্ষমা ও প্রীতিই ভাল।

একালে স্বয়ম্বর।

আম্বিনের “কায়স্থ-পত্রিকা” নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন।

জেলা সাল্লাহানপুরের অন্তর্গত চাঁদপুরের ভূমালিকারী ঐযুক্ত মুনশী প্যারীলাল ঐযুক্ত মহাশয়ের পৌত্রী আগামী বর্ষে স্বয়ম্বর হইবেন। ঐযুক্ত মহাশয়ের তিন পুত্র (১) ঐযুক্ত অরব বিহারী, বদাউন

জিলাফুলের শিক্ষক; (২) ঐযুক্ত আনন্দ বিহারী, মেধুর রয়েল, গার্ডেন (লণ্ডন) এবং লক্ষ্মী সীড্‌ষ্টোরের স্বত্বাধিকারী; (৩) ঐযুক্ত রাম-বিহারী বেরতীর্থ, বি-এ, এল-এল-বি, উকিল, লক্ষ্মী জুডিশিয়াল কমিশনার কোর্ট। অরববিহারী বাবুর কন্ঠার বয়স ১৪ বৎসর, সুন্দরী পুংকার্যনিপুণ এবং কলিকাতা সংস্কৃত-পরীক্ষা বোর্ডের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইনিই স্বয়ম্বর হইবেন।

যে দিন স্বয়ম্বর হইবে, সেই দিন বিবাহাৰ্ণী ঘণ্টাকালে (অনুমান ৫ জন) বিবাহসভায় উপস্থিত হইবেন। কল্যাণী-তাহাদের মধ্যে যাহাকে মনে হয়, তাহার গলে বরমালা অর্পণ করিবেন। অতঃপর যথাস্থানে বৈদিক বিধানে বিবাহকাণ্ড সম্পন্ন হইবে। স্বয়ম্বরের পূর্বে তিলক দান (পাকাদেশ) হইবে। বিবাহাৰ্ণী যুবক বৈদিক আচারনিষ্ঠ যে কোন শ্রেণীর কায়স্থ হইলেই হইবে। ২০—২৫ বৎসর বয়সের এবং অনান প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। বিবাহাৰ্ণীগণ যৌবন বংশপত্নীসহ উপরের ঠিকানায় প্যারীলালকে পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত ভক্তমহোদয়গণ পাণ্ডাঘাতি খরচ পাইবেন। (Awaza-i-Kalk, 23 August).

বাণ্ডব্য কার্যস্থগণ অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বহুকাল উপবিষ্ট থাকিয়া রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বাণ্ডব্য ক্ষত্রিয়গণই বিষ্ণুকুমাগ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাবার বৈদিক রীতানুসারে স্বয়ম্বর বিবাহের পুনঃ প্রবর্তনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এমনকি আমরা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছি। ইহাতে যদি বিবাহের দাবী দাওয়া ক্রমে উঠিয়া যায়।

মৃতন ব্যাপার বটে; কিন্তু ইহা ঠিক সেকালের স্বয়ম্বরের মত নহে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হইতে ইহা জানা যায়, যে, যদিও প্রথমে দ্রুপদ রাজা “রাজগণে সর্বত্র করিল নিমন্ত্রণ,” তথাপি শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীর মনোনয়ন ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। প্রথম প্রথম,

“পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর-স্থলে।

লক্ষ্য বিজ্ঞিবারে বলে ক্ষত্রিয়-সকলে।”

কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেহ লক্ষ্য বিধিতে না পারায়,

“পুন ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল-নন্দন।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য গুণ্ড নানা জাতি।

যে বিজ্ঞিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী।”

দ্রোণ, দ্রোণি ও কর্ণ লক্ষ্যবেধ করিতে না পারায়,

“ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর।

পুনঃ পুনঃ ডাকি কহে দ্রুপদকুমার।

দ্বিজ হোক ক্ষত্র হোক বৈশ্য শূদ্র আদি।

চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিজ্ঞিলেক যদি।

লজ্জিবে দ্রৌপদী সেই দুঃখ সোঁর পণ।

এত বলি যন ডাকে পাঞ্চাল-নন্দন।”

জীনকীর স্বয়ম্বরেও দৃষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণ পরশুরাম, ব্রাহ্মস রাবণ, এবং বহু ক্ষত্রিয় রাজা হস্তধর্ম ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জাতির জ্ঞান কাহাবও সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠে নাই।

বঙ্কের হোম-ক্লব লীগ।

বাংলা দেশে একটি হোম-ক্লব লীগ বা স্বরাষ্ট্রলাভ চেম্বার জন্ম সমিতি গঠিত হওয়া স্থলের বিষয় বটে, কিন্তু বেভাবে উহা স্থাপিত হইয়াছে তাহার অমুমোদন করিতে পারি না। প্রকাশ সভা করিয়া উহা স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা বোধ করি হয় নাই। আমরা সংবাদপত্রে কোন বিজ্ঞাপন দেখি নাই, কোন চিঠিও পাই নাই। যে জন-ত্রিশ লোক এই সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মত বা তাঁহাদের অনেকের মত্রে বেশী স্বরাষ্ট্রলাভ-প্রয়াসী লোক কলিকাতা সহরে ও বাংলা দেশে আছে।

জাপানে সংস্কৃতের চর্চা।

জাপান হইতে জাপানীদের দ্বারা পরিচালিত হেরাল্ড অব এশিয়া নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের বাহিরে জাপানের মত এত দীর্ঘ কাল ধরিয়া এবং এত বিস্তৃতভাবে আর কোনও দেশে সংস্কৃতের চর্চা হয় নাই। জাপানে ঠিক কখন সংস্কৃত অধীত হইতে আরম্ভ হয় বলা যায় না। সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে ইহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ধর্মের সহিত জাপানে আগমন করে। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি চীনে “বৌদ্ধ-অনুবাদ-প্রতিষ্ঠানে” বিখ্যাত পর্যটক য়ুয়ান চ্যাং ও তাঁহার শিষ্যদের অধীনে কয়েকজন জাপানী পুরোহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিত। ৭৩৫ অব্দে বোধিসেন এবং ফাত্রিয়েং (Fattriet)* নামক দুজন ভারতীয় বৌদ্ধ যখন জাপানে পৌঁছেন, তখন হইতেই সংস্কৃতের চর্চা বিশেষভাবে আরম্ভ হয়।

রেইসেন (Raisen) নামক সংস্কৃতজ্ঞ একজন জাপানী পণ্ডিত ৮০৪ অব্দে চীন যাত্রা করেন এবং কালক্রমে তথাকার বৌদ্ধ-অনুবাদ-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রাজ্ঞ নামক একজন ভারতীয় পুরোহিতের সহিত একযোগে তিনি একটি বৌদ্ধ স্তূপের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। তাহার জাপানী নাম শিকি কোসাক্যো; ইহা এখনও তদ্রূপে

* ভারতীয় নাম এরূপ হয় না; বোধ হয় কোন ছাপার ভুল হইয়া থাকিবে। কিম্বা ভারতীয় নামটি জাপানী ভাষায় এই প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে। প্রবাসী-সম্পাদক।

বৌদ্ধদের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। আরও অনেক সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিত চীনদেশে গিয়া কাজ করেন ও তথায় দেহ-ত্যাগ করেন। কঙ্কো নামক একজন ৮১৪ অব্দে চীন হইতে রওনা হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং এখানে কিছু দিন থাকিয়া, নিঃসন্দেহ নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া, চীনে ফিরিয়া যান। সেই পুরাকালে জাপানী সম্রাট সাগার পুত্র কুমার তাকাকো জাপান হইতে ভারতবর্ষ রওনা হন, কিন্তু কোচিন-চীনের অন্তর্গত লাওস নামক স্থানে পীড়িত হইয়া মারা যান।

জাপানে সংস্কৃতশিক্ষার প্রারম্ভ হইতে তোকুগাওয়া আমল পর্যন্ত মোটামুটি ১২০০ বৎসরে নাম করিবার যোগ্য তিনশত জন সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। তাঁহার নিশ্চয়ই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অগ্রান্ত বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি যুদ্ধ ও অগ্র নানাকারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন প্রায় ১৫০ খানি পুঁথি অবশিষ্ট আছে। তা ছাড়া, সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষ হইতে কিম্বা চীনের মধ্য দিয়া আনীত বিস্তর সংস্কৃত পুঁথি, লিপি ও তন্ত্র জাপানে রক্ষিত আছে। প্রাচীন লিপির নমুনাস্বরূপ সে-সবগুলিই মূল্যবান; তা ছাড়া অনেকগুলির বৈজ্ঞানিক গুরুত্বও আছে।

শেখোক্ত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে হোয়ুজি মন্দিরে রক্ষিত তাল-পাতার পুঁথির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভট্ট মোক্ষমূলর ইহা সম্পাদন করিয়া অক্সফোর্ডে প্রকাশ করেন। এই জাতীয় গ্রন্থের ইহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন নমুনা। অল্পদিন হইল ইহারই মত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আর-একটি তাল-পাতার পুঁথি কোয়োর চিওন-ইনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় ইহাদেরই মত মূল্যবান পুরাতন উপাদান যামাতোর হোয়ুজি, কোকিজি ও কৈমু-ওজি মন্দির-সকলে ও মির মিইদেরা ও সৈক্যোজি মন্দিরে, এবং কোয়াসানে রক্ষিত আছে। জাপানীদের সংস্কৃত পুঁথি ও অগ্রবিধ লিপির ভাণ্ডার আচার্য জুজিরো তাকাকুহু এবং বৌদ্ধ ভ্রমণ একাই কাগাকুচির আনীত সংগ্রহ দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। এই সকল উপাদান এখন জাপানের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অগ্রণী আচার্য তাকাকুহুর তত্ত্বাবধানে পরীক্ষিত ও অধীত হইতেছে। তাঁহার পরিশ্রমের ফল শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১৮৬৮ অব্দে সম্রাটের প্রভুর পুনঃস্থাপিত হইবার পর সংস্কৃতের প্রতি নতন করিয়া লোকের দৃষ্টি পড়ে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বিচার করিয়া ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য শিল্প পদ্ধতি শিক্ষা করিবার জন্য গত ৪০ বৎসরে ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক জাপানী যুবককে পাঠান হইয়াছে। ফলে এখন জাপানে অনেকগুলি ইউরোপে-শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েক জনের নাম, বুলু নাগো, জুজিরো তাকাহুশু, আচার্য ওগিহারা, অধ্যাপক আনেসাকি, আচার্য সাকাকি, এবং আচার্য ওতানাবে। তোক্যো ও ক্যোতো রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে, এবং নানা বৌদ্ধসম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত সাতটি কলেজে সংস্কৃত শিখান হয়। উক্ত দুটি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬০ জন ছাত্র সংস্কৃত পড়ে; বৌদ্ধ কলেজগুলিতে অনেক শত ছাত্র সংস্কৃত শিখে। সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার সহকারে জাপানীরা ভারতবর্ষের নিকট নিজেদের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিতে পারিতেছে, এবং জাপানী ও ভারতবর্ষীয়দের প্রকৃতি ও সভ্যতার মাদৃশ্য বৃদ্ধিতে পারিতেছে।

আমাদের দেশেও জাপানের সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে পরিচয় হওয়া কর্তব্য। জাপানে প্রাচীন সংস্কৃত পূর্ণ, লিপি, তন্ত্রি যাহা আছে, সমুদয়ের প্রতিলিপি আমাদের দেশের বড় বড় লাইব্রেরীর জন্য আনীত ও তথ্য রক্ষিত হওয়া উচিত।

বাকুড়ায় দুর্ভিক্ষ।

বেসরকারী অনেক সমিতি এবং গবর্ণমেন্ট এখনও বিস্তর দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোককে সাহায্য করিতেছেন। মধ্যে চাউল সাঁমাশ সস্তা হইয়াছিল, এখন আবার কিছু দর বাড়িয়াছে। গবর্ণমেন্ট আরও একমাস সাহায্য করিবেন। বেসরকারী অনেক সমিতিও তাহাই করিবেন। কত দিন পর্যন্ত সাহায্য করা দরকার? এপ্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, বস্তুতঃ বাকুড়া জেলায় এবং অল্প অনেক জেলায় স্ববৎসরেও বিস্তর লোক একবেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সুতরাং ঠিক কথা বলিতে গেলে এসব লোকের বরাবরই সাহায্যের প্রয়োজন।

যাহা হউক, আপাততঃ পাঠকেরা জানিয়া রাখুন যে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষক্লিষ্টলোকদিগকে সাহায্য করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যশিক্ষা।

আমাদের দেশে যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুযায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশ্চাত্য প্রাচীন আদর্শ এই যে তথ্য কেবল একপ শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, এবং হৃদয়ের সদবৃত্তি-সকলের উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাক্ষাৎভাবে জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া এই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নহে, যদিও যাহারা এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পায়, তাহারা অনেকে তাহাদের শিক্ষাকে অর্থ-উপার্জনের উপায়ে পরিণত করিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য আধুনিক অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক এই আদর্শ অনুহত হইতেছে না; তাহারা কল কারখানায় যে-সব শিল্পব্যব প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তুত করিতে, এবং জাহাজাদি নির্মাণ করিতে শিখাইতেছে। বাণিজ্যও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও কোথাও কোথাও সাক্ষাৎভাবে অর্থকরী বিদ্যা শিখান হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও চিকিৎসা-বিদ্যা, ওকালতী-বিদ্যা, শিক্ষাদান-বিদ্যা এবং এঙ্কিনীয়াবিং-বিদ্যা শিখান হয়। এগুলি বৃত্তি-শিক্ষা। সুতরাং অর্থকরী-বিদ্যা বলিয়া বাণিজ্য শিখাইতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু বি-এ পর্যন্ত শিখিবাব মত বাণিজ্যে কিছু আছে কিনা, এ-প্রশ্ন উঠিতে পারে। যাহারা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যের বি-এ পরীক্ষার বিষয় ও পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দেখিয়াছেন, তাহারা জানেন যে শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে, এবং তাহা সাধারণ বি-এ পরীক্ষার অল্প অনেক বিষয়ের মত কঠিন। বই পড়িয়া বাণিজ্য শিখা যায় কিনা, সে প্রশ্নও উঠিতে পারে। কতক দূর নিশ্চয় শিখা যায়; বাকী অর্থাৎ পাকা ব্যবসাদার হওয়া অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অত্যাশ্চর্য বৃত্তি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আইনের পরীক্ষা পাশ করিলেই উকীল হয় না; আদালতে কাজ করিতে-করিতে পাকা উকীল হয়।

ডাক্তারী পাশ করিলেই চিকিৎসায় পারদর্শিতা জন্মে না। রোগী দেখিতে দেখিতে বিচক্ষণতা জন্মে। অতএব, শুধু বই পড়িয়া বণিক হওয়া যায় না বলিয়া বাণিজ্য শিক্ষা দিয়া তাহার উপাদি দিবার প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলা চলে না। বোম্বাই বাণিজ্যপ্রধান জায়গা; সেখানে অনেক দেশী সওদাগরের আফিসে কার্য্যতঃ বাণিজ্য শিখিবার কতকটা সুবিধা আছে। তথাপি সেখানে বাণিজ্যের কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা লইয়া ব্যাচিলার অব্ কমান্স্ উপাদি দেন। বাণিজ্যে বাঙালীরা অগ্রসর নহেন। এখানে বোম্বাইয়ের মত দেশী বড় বড় সওদাগর নাই। ইংরেজদের আফিসে সামান্ত কেবানীগিরি ছাড়া বাঙালীরা আর কোন কাজ বড় পায় না। এখানে বাণিজ্য শিক্ষা দিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিক্ষা দিবার পর পরীক্ষা লইয়া উপাদি দেওয়াও দরকার। কারণ উপাদি দিলে বাণিজ্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে অন্ত বি-এদের সমকক্ষ বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে, এবং তাহাদের তদন্তরূপ আদর হইতে পারে।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন।

ভারতসাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় এবং ভিন্ন-ভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানেরা আপনাদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা অল্পসারে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি তাঁহারা পাইতে পারেন, তদপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি তাঁহারা নির্বাচন করেন। তাঁহারা বলেন, মিউনিসিপালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেও তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পাওয়া উচিত। আমরা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথার বিরোধী। উহা কোন শক্তিশালী উন্নত সভ্যদেশে প্রচলিত নাই; এবং শক্তিশালী হইবার পথও উহা নহে। একমাত্র অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বাসিয়া-হের্জেগোবিনা প্রদেশে উহা প্রচলিত আছে। সেখানে কিন্তু শুধু মুসলমান নয়, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই, আপন-আপন সংখ্যা-অল্পসারে, নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। তথাপি ফল যাহা হইয়াছে তাহা ইংরেজী বিশ্বকোষ এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার ৪র্থ খণ্ডের ২৮২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

“Considerable bitterness prevails between the rival confessions, each aiming at political ascendancy, but the government favours none.”

“প্রত্যেক সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করায়, প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বিশেষ আত্মে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট কাহারও প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না।”

রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আমাদের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরই এক। সাধারণ আইন সকলেরই জন্ত এবং ট্যাক্সও সকলকেই সমভাবে দিতে হয়। সুতরাং ধর্ম-অল্পসারে প্রতিনিধি চাওয়া উচিত নয়। বাংলা দেশে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে বেশী। তাঁহারা চেষ্টা করিলে শীঘ্রই শিক্ষাতে হিন্দুদের সমান হইতে পারিবেন। তখন দেশ-হিতৈষী শিক্ষিত মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা ব্যবস্থাপক সভায় যথেষ্ট হইবে। মিউনিসিপালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেও তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রের অভাব হইবে না। বঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন প্রণালী প্রবর্তন করিবার প্রয়োজন নাই। কয়েক বৎসর ধৈর্য্যসহকারে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা করিলে যে ফল লাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার জন্ত জাতীয় ঐক্যনাশক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজনক একটি কুপ্রথা প্রচলিত করিতে চাওয়া স্বদেশাভি-রাগের পরিচায়ক নহে।

যিনি যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন, তাঁহার ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে অল্পগ্রহলব্ধ অধিকার থাকিলেই বা পাইলেই শক্তি-শ্রীবৃদ্ধি হয় না। হিন্দুরাজত্বের অবসান হয় হিন্দুর অযোগ্যতায়, মুসলমানরাজত্বের অবসান হয় মুসলমানের অযোগ্যতায়। একটি সম্প্রদায় কতকগুলি প্রতিনিধিত্ব পাইলেই দেশের বা তাহাদের স্বর্দিন ফিরিবে না। সমুদয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় যোগ্য না হইলে দেশ শক্তিশালী হইবে না। আবার, সমুদয় জাতি শক্তিশালী না হইলে কোনও সম্প্রদায়েরই সম্পূর্ণ উন্নতি হইবে না।

ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের আর-একটি ভাবিবার কথা এই আছে, যে, কোন একটি সম্প্রদায়ের দ্বারাই দেশের সর্ব্বক্ষি অভাব দূর হইতে পারে না, এবং সর্ব্ববিধ গৌরব প্রতিষ্ঠিত ও শক্তি পুনলব্ধ হইতে পারে না। এমন কোন সম্প্রদায় ভারতে আছে যাহা হইতে সমুদয় শ্রেষ্ঠ ঋষি, সাধু, ধর্মপ্রবর্তক, সমাজসংস্কারক, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, শিল্পী, দেশরক্ষক বীরযোদ্ধা, বাৎসনা-

পরিচালক, সওদাগর, নাবিক, কৃষক, শ্রমজীবী, জন্মিয়াছে বা জন্মিতে পারে? সকলের ঐক্য ও সহযোগিতা ভিন্ন একজনেরও পূর্ণ উন্নতি এবং পূর্ণ শক্তিশালিত ঘটিতে পারে না। এই জ্ঞান সকলের একযোগে কাজ করা উচিত। সকলেই কার্যক্ষেত্রে আছেন; কিন্তু যোগ্যতা দ্বারা আছেন, সাম্প্রদায়িক টিকিট দেখাইয়া নহে। আমরা অযোগ্য হিন্দুও চাই না, অযোগ্য মুসলমানও চাই না, অযোগ্য খৃষ্টিয়ানও চাই না; যোগ্য লোক চাই,—তা তিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন।

প্রবাসীর পাঠিকাদিগের প্রতি।

নিম্নলিখিত আবেদন-পত্রটি পাঠ করিয়া যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করিতে আমরা প্রবাসীর পাঠিকাদিগকে সর্বিনয় অনুরোধ করিতেছি।

ও

মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে শ্রুতি-মন্দির।

সমগ্র নারীজাতির প্রতি আবেদন।

দবিনয় নিবেদন,

যিনি একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক, মানবমনের বিচিত্র ভাববিশিষ্ট হলে সত্যের যে অখণ্ডস্বরূপ বিষয়মান, ভগবৎরূপালঙ্কার হৃৎকণ্ঠে বসন্তদৃষ্টি দ্বারা সেই স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি ধন্য হইয়াছিলেন, যক্ষেত্রে নিত্যকাল আপনা আপনি সর্বধর্মসমন্বেষ হইয়া রহিয়াছেন, ধর্মসমন্বেষের জন্ত যেখানে মানবচেতীর অপেক্ষা নাই, মানবজীবনের সম লক্ষ্য আশ্রয় সেই বিশুদ্ধ স্বরূপই যার জীবনের একমাত্র প্রতিষ্ঠাভূমি, এবং সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই যিনি সমগ্র জগতের রনারীকে এক অভেদ মিলনক্ষেত্রে আহ্বান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ভারতের চিরন্তন ইষ্টদেবতা আশ্রয় মহামহিমাবিশিষ্ট ভাবে ক্রিস্টিয়ান আকারে লোকসমক্ষে প্রচারিত করিয়া বর্তমান যুগে আরতক যিনি স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যার রাজ্যের অমোঘ শক্তির প্রভাবে ভারতের তৎকালীন বিক্ষিপ্ত ও হাচ্ছর দৃষ্টি নিঃসর লক্ষ্যস্থানকে দেখিতে বা চিনিতে পারিয়াছে, তীত, বর্তমান ও ভাবী মানব-শিক্ষার ফল একাধারে যাহাতে লবান বলিলেই হয়, সেই সামগ্রিকতার অবতার, আশ্রয় স্বাধীনতা স্বাধিকারী, পরম জ্ঞানী, সাধকশ্রেষ্ঠ, বর্তমান যুগে সর্বধর্মসমন্বেষের ঐক্যবর্তী, নিরভিমান, নিভীক, উন্নতশীল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্ত দেশবাসীরা যাহার জন্মস্থান হুগলীজেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে তাহার শ্রুতির ক্ষেত্রে একটি মন্দির নির্মাণ ও তদানুদক্ষিক অসংখ্য ব্যবহাবিধানে যোগা করি হইয়াছেন।

বিরাট পুরুষের শ্রুতিচিহ্নস্থাপনের বিরাট আরোহণে উদ্যোক্তা হাঙ্গামণ নারীজাতিতে বাহিরে রাখা দূরে থাকুক, একাধারে নারীর শিক্ষারই তাহার সর্বপ্রাণে স্বীকার করিতেছেন। তাহাদের বিবাস, ই মহাপুরুষের কার্য নারীর যোগ্য ব্যতীত একান্ত অসম্ভব।

রাজা রামমোহন রায়ের কার্যে নরনারীর অধিকার তুল্যরূপে কৃত হইলে রাজার শ্রুতি সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এই বিবেচনায় যাহারা যাহাতে নারীজাতিকে উচ্চস্থান দান করিয়া, শুধু বাক্যে নয়,

ভাবে নয়, পরম কার্যে রাজ্যব পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। এই ব্যাপারে দেশ-মধ্যে যে একটি নব শক্তির উদ্বোধন অনুভূত হইতেছে তাহাতে আর ভুল নাই। রাজার অশরীরী আশ্রয় শক্তি যেন আজ এই কার্যের কাণ্ডার হইয়া এই কর্তৃত্বকে কূলে উত্তীর্ণ করিবার জন্ত দণ্ডায়মান হইয়াছে। কে জানে পরিণামে ইহা কি ফল প্রসব করিবে?

যিনি দেহ ধারণ করিয়া একমন্ডল সমগ্র ভারতকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন আজ দেহমুক্ত হইয়া তাহার অদৃশ্য শক্তি যে আবার কি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কে তাহা জানে? দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায়ের আশ্রিতে পরমাত্মার যে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছিল সেই ইচ্ছা আজ রাজার শ্রুতি উপলক্ষ্য করিয়া আবার কোন অতীতপূর্ব মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কে তাহা জানে? পরমাত্মার সীলা বৃত্তিতে মানবের সাধা কোথায়? রাধানগর যে শীতল ভারতের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে তাহাতে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই। বর্তমান যুগে নরদেবতার পূজা বোধ হয় এই রাধানগরেই প্রথম আরম্ভ হইবে। যাহাকে আমরা যুগপ্রবর্তক বলিয়া সম্মান করিতেছি তাহার পূজার উপযুক্ত শ্রুতিমন্দির-নির্মাণকার্যে যে অর্থের অভাব হইবে তাহা মনে হয় না।

এক্ষেণে রাজার কার্যে সমগ্র নারীজাতিকে আহ্বান করিবার জন্ত এই আবেদন-পত্র লিখিত হইতেছে; হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পার্শী, জৈন, ব্রিহদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নারীগণ রাজার কার্যে অগ্রসর হউন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। অর্থ, সাবর্ণা, বুদ্ধি, বিদ্যা, যিনি বাহা বিধা পারেন, রাজার কার্যের সহায়তা করুন। রাজার শ্রুতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির গৌরব রক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

অখণ্ড আশ্রয় পূজার অসমর্থ জ্ঞানে চিরদিন পঞ্চাদশদশ নারী আজ যাহার প্রদান, যাহার কল্যাণে আশ্রয় স্বাধীনতার অধিকারিণী হইয়াছেন, মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অনধিকারিণী নারী আজ যাহার প্রদান, যাহার কল্যাণে উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন, সেই মহাত্মা প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই মহা হৃদয় উপস্থিত। এই শুভ মুহূর্ত্ত সকলের জীবনে আসে না। রাজার কার্যে সহায়তা করিয়া নারীজাতি এক্ষণে আপনাদিগকে সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ কার্যের অধিকারিণী-রূপে সমগ্র জগতের সমুখে স্বীকার করুন। যিনি বাহা দিতে পাবেন তিনি তাহাই দিন, যিনি যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন তিনি ততটুকুই প্রয়োগ করুন, এই আমাদের নিবেদন। এই কার্যের সহায়তার একটি পয়সা হইতে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, যিনি বাহা প্রদান করিবেন, সমান আদরে গৃহীত হইবে।

বিনা অর্থে এতবড় মহৎ অমুষ্ঠান কখনই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না; অতএব আমাদের ভরসা আছে যে ভারতরমণীর্ণ আমাদের এই আবেদন-পত্র একেবারে অগ্রাহ্য করিবেন না। যে কোন মহৎ-অন্তঃকরণী মহিলা যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাদের উৎসাহিত ও বাঞ্ছিত করিবেন।

বিনীত।

ঐহেমলতা দেবী,

হেড আপিস :— পোঃ অঃ...শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

৭১, আমহাট্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৬। ২০নং, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ঐকৃষ্ণাবিনী দাস,

৪নং উইলিয়ম লেন, কলিকাতা।

বাঙালী সৈন্যের সমাদর।

যে-সকল বাঙালীর ছেলে সিপাহী হইতেছে, তাহা-
দিগকে সমাদর করিয়া হাবড়া ষ্টেশন হইতে বিদায় দেওয়া
হইতেছে এবং পথেও নানা স্থানে তাহাদের অভ্যর্থনা
হইতেছে। কলিকাতার একটি নারীসভা সিপাহীদের
প্রত্যেককে নানা-প্রকার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যে পূর্ণ একটি
করিয়া ব্যাগ উপহার দিতেছেন। সৈন্যদের প্রতি এই-
প্রকার শ্রীতি প্রদর্শন করিয়া নারীরা মাতৃজাতির কর্তব্য
পালন করিতেছেন। কিন্তু উপহারের ব্যাগগুলিতে
সিগারেট থাকায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের দেশী
শিষ্টাচার পালন করিতে হইলে মাতৃস্থানীয়া নারীদিগের পক্ষ
হইতে সম্মানস্থানীয় বালক ও যুবকগণকে সিগারেট উপহার
দিবার প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া, সিগারেট বালক ও
যুবকদের পক্ষে হানিকর; সকল বালক ও যুবক যে ধূমপান
করে, তাহাও নয়; করিলেও জননী ও ভগিনীরা এই
অনিষ্টকর জিনিষ তাহাদিগকে উপহার দিবেন কেন?
তাহারা অল্পবয়স্ক; বেঙ্গলী বলেন :—All of these boys
were under-graduates and still students.....
except Kumar Adhikram Mazumdar...and
another...

বেঙ্গলীতে পড়িয়া আরও দুঃখিত হইলাম যে সৈনিক
বিভাগের কর্তৃপক্ষ ছেলেদিগকে মাথাপিছু যে হাত-খরচা
আড়াই টাকা করিয়া দিয়াছেন, তাহার উপর “the
Committee added. Rs. 2-8 per head as cigarette
money।” কি আশ্চর্য! অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ধূমপান
নিবারণের জন্য বিলাতে ও অন্ত কোন কোন দেশে আইন
আছে, পঙ্কাবে এই-প্রকার আইনে বসড়া প্রস্তুত হইয়াছে,
এবং ঐ প্রদেশে বিদ্যালয়ে ও ছাত্রাবাসে ধূমপান শিক্ষা-
বিভাগ নিষেধ করিয়াছেন; আর আমাদের কয়েকটি ছেলে,
যাহাদের অধিকাংশ কাল ছাত্র ছিল, আজ সিপাহী
হইবামাত্র তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট হইতে সিগারেট
উপহার প্রাপ্ত হইল! যে দেশে প্রাচীনপন্থী ভক্তসমাজে প্রৌঢ়
পুত্র বৃদ্ধ পিতার নিকট ধূমপান করে না, সেদেশে, কমিটিতে
অনেক বিবেচক লোক থাকিতে কেন এমন হইল জানি

না। সেকালে রীতি অনুসারে ছেলেদিগকে মিঠাই খাইতে
টাকা দেওয়া হইত। সভ্যতার উন্নতি সহকারে মিঠাইয়ের
জায়গা কি সিগারেট দখল করিবে? ধূমপান না করিলে বা
মদ না খাইলে যে যোদ্ধা হওয়া যায় না, তাহাও নয়।
শিখেরা তামাক খায় না; অনেক ইংরেজ সৈন্য মদ খায় না।
তাহারা কম বীর নয়।

বিদেশী সুপ্রথা গ্রহণ এবং দেশী কুপ্রথা বর্জন করায়
দোষ নাই; বরং তাহা করাই উচিত। কিন্তু বিদেশী
কুপ্রথার অনুকরণ অপকারী ও অতীব লজ্জাকর।

আমাদের বিষয় দেশীয় প্রথা অনুসারেও জননী পুত্রকে
আশীর্বাদ করিয়া জাতীয়তার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।
বেঙ্গলীতে দেখিলাম :—

“Mrs. J. N. Mazumdar, mother of Kumar
Adhikram Mazumdar, a distinguished graduate of
the Calcutta University and a Vakil of the High
Court, who was among the recruits, then garlanded
the boys and blessed them with *chandan* and *durba*.
The mother of another recruit, Atal Behary Mukherjee,
also did the same. These ladies of the orthodox
community came with their relations all the way
for the express purpose of pouring forth mother's
blessings on the lads.”

তাৎপর্য। “শ্রীমান কুমার অধিক্রম মজুমদার ও শ্রীমান অটল
বিহারী মুখোপাধ্যায় নামক দুজন সৈনিকের জননীরা চন্দন ঘুঁটা দিয়া
সৈন্যগণকে আশীর্বাদ করেন। এই মিঠাবতী হিন্দু মহিলাদ্বয়
আশীর্বাদ করিবার জন্যই দূর হইতে আত্মীয়দের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।”

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদল।

সম্পাদক-সমিতির নাম :—

কতিপয় সম্পাদক বড় লাটের সহিত দেখা করিয়া ছাপাখানা-
সংক্রান্ত আইনের কঠোরতা ভাঙ্গা করিয়াছেন। গবর্ণ-
মেন্ট বলিয়াছেন, কে কে দেখা করিতে বাইবে তাহাদের নাম দিতে
হইবে। গবর্ণমেন্ট অনুমতি করিয়া বাহাদুরকে বাইতে অনুমতি
দিবেন, তাহাঁরাই কেবল বাইতে পারিবে। সম্পাদক-সভা এই সর্ব
শিরোধার্য করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে রাজি হইয়াছেন। সম্পাদক-
সভার সহিত আমাদের সংগ্রহ নাই।

আমরা প্রথম হইতে বরাবর সম্পাদক-সভার সভ্য
আছি। কয়েকমাস পূর্বে যখন বড়লাটের কাছে কয়েকজন
সম্পাদককে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইবার কথা প্রথম উঠে, তখন
তাহাদের মধ্যে আমাদের নামও ছিল। তাহার পর যখন
(সম্পাদক-সমিতিতে উল্লিখিত) প্রতিনিধিদের সর্ব সম্মুখে
সভা হইতে আমাদের মত জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন আমরা
লিখিয়াছিলাম যে ঐ সর্ব আমাদের মনঃপূত নহে, এবং
প্রতিনিধির তালিকায় যেন আমাদের নাম দেওয়া না হয়।

প্রেস-আইনেব কড়াকড়িতে মুসলমানদের মুখপত্র কয়েকখানি উঠিয়া গিয়াছে। এইজন্ত প্রতিনিধি সম্পাদকদের মধ্যে মুসলমান সম্পাদক ছ একজন থাকিলে ভাল হইত। প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া কয়েক মাস পূর্বে যে-সব সম্পাদকের নাম বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে লাহোরের মুসলমানদের ইংরেজী কাগজ অবজার্তাবের সম্পাদকের নাম ছিল। এখন কি কারণে তাহার নাম দেখা যাইতেছে না বলিতে পারি না।

আমাদের আয় ও কয়েদীদের ব্যয়।

জেলের কয়েদীদিগকে কোন দেশেই রাজার হালে রাখা হয় না; ভাবতবর্ষে ত নহেই। যেক্রপ খাদ্য, যেক্রপ কাপড় ও বিছানা এবং রোগের সময় যেক্রপ চিকিৎসা না হইলে তাহারা বাঁচিতে পারে না, তাহাদেব জন্ত তাহার বেশী কিছু ব্যবস্থা করা হয় না। সুতরাং জেলে এক একজন কয়েদীর জন্ত গড়ে যত খরচ হয়, তাহার কম আয়ে জেলের বাহিরে একজন মানুষ সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এখন দেখা যাক ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে ১২.৫ সালে কয়েদীদের জন্ত মাথাপিছু খাদ্য, কাপড় ও বিছানা, এবং চিকিৎসায় কত ব্যয় হইয়াছিল। অন্তান্ত ব্যয়ও আছে, যেমন পানীয় জলের বন্দোবস্ত, পায়খানার বন্দোবস্ত, প্রভৃতির জন্ত; কিন্তু তাহা ধরিব না। কারণ আমাদের দেশে পল্লীগ্রামের লোকদের এসকল বাবতে কোন খরচ হয় না।

১২.৫ সালে প্রত্যেক কয়েদীর গড় বার্ষিক খরচ।

প্রদেশ	খাদ্য	বিছানা ও কাপড়	চিকিৎসা	মোট
মধ্যপ্রদেশ	৩১/২	৪০/১১	২/৪	৩৭/১/০
আন্দ্রা-অযোধ্যা	৪১/০	৪৮/০	২৮/৮	৪৮/১/১১
বিহার-ওড়িশা	৪০/২	৪৮/১০	৬৮/১	৫৫/৮
বাংলা	৪৭/০	৬০/০	৭৮/১০	৬১/১০

পূর্বেই বলিয়াছি কয়েদীদের জন্ত সরকারের যত রকম খরচ হয়, সমস্ত ধবা হয় নাই। যে-সব নির্দোষ মানুষ জেলে যায় নাই, জেলের বাহিরে বাস করে, খাওয়া পরা শোয়া চিকিৎসা ছাড়া তাহাদের আরও অনেক রকম ব্যয় আছে। তাহাদিগকে গৃহ নির্মাণ ও মেরামত করিতে হয়, সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হয় বা দেওয়া উচিত, জন্ম,

বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি পারিবারিক ঘটনা উপলক্ষে নানা ক্রিয়াকলাপ করিতে হয়, এবং প্রতিবেশীদিগকে ভোজ দিতে হয়, ধর্মবিধান অনুসারে নানা পূজাপার্বণ ও উৎসব উপলক্ষে ব্যয় করিতে হয়, তীর্থ দর্শন বা অগ্রপ্রকার ভ্রমণের জন্ত খরচ কবিত্তে হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এ-সব না ধরিয়া কেবল কয়েদীদের যে তিনরকমেব ব্যয়ব্যয় ফর্দ উপরে দেওয়া হইয়াছে, সেই-খরচ করিবার মত আয় ভারতবাসীদের আছে কিনা দেখা যাক।

ভূতপূর্ব বড়লাট কার্জন একটা আন্দাজ করিয়াছিলেন যে ভারতবাসীদের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৩০ টাকা। ভারতীয় অর্থনীতিজ্ঞ দাদাভাই নরোজী প্রভৃতি, এবং ডিগবীপ্রমুখ ইংরেজ অর্থনীতিজ্ঞেরা মনে করেন যে কার্জন ভারতবাসীদের আয় বেশী ধরিয়াছেন। সার রবার্ট গিফেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ সম্পাদক, অর্থনীতিজ্ঞ ও রাজস্ব-তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভা ব্রিটিশ এসোসিয়েশানের সম্মুখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশের বার্ষিক আয় এবং মোট পুঞ্জির একটি তালিকা উপস্থিত করেন। তাহাতে তিনি সমুদয় ভারতবাসীর এক বৎসরের মোট আয় ষাট কোটি পাউণ্ড ধরিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা মোটামুটি ৩০ কোটি ধরিলে, এক একজন ভারতবাসীর গড় বার্ষিক আয় ২ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ টাকা হয়। এই অঙ্কমানটা আমরা প্রকৃত আয় অপেক্ষা বেশী মনে করি। যাহা হউক, ইহাই প্রকৃত আয় বলিয়া ধরিলেও ইহার মানে কি দাঁড়ায়, বুঝা চাই। মনে রাখিতে হইবে যে ইহা গড়পড়তা মাত্র। সুতরাং অনেকের আয় ইহা অপেক্ষা যেমন বেশী আছে, তেমনি অনেকের আয় ইহা অপেক্ষা কমও আছে। বার্ষিক আয় একশ দুশ, এক হাজার দু হাজার, বিশ পঞ্চাশ হাজার, অনেক লক্ষ, কতকগুলি লোকের আছে। সুতরাং বার্ষিক ত্রিশ টাকা অপেক্ষা কম আয়ও বিস্তর লোকের আছে; একেবারে আয়শূন্য ভিক্ষুকও ভারতবর্ষে হাজার হাজার আছে। এই সমস্ত তথ্য বিচারের মধ্যে না আনিয়া যদি ধবা যায় যে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় অন্যান্য ত্রিশ টাকা, তাহা হইলেও দৃষ্ট হইবে, যে, অন্তান্ত সমুদয় ব্যয় বাদ দিয়াও কেবল খাই-

খরচও ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের নাই। কয়েকদৈদের অল্প সর্বাপেক্ষা কম খরচ হয় মধ্যপ্রদেশ ও বেঙ্গলে। কিন্তু সেখানেও কেবলমাত্র খাইখরচই হয় বার্ষিক ৩১২। আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশদ্বয়ে খাইখরচ ৪১৮/০, বিহার-ওড়িশা-ছোটনাগপুরে ৪৩৮/২ এবং বেঙ্গে ৪৭৮/০। বার্ষিক খ্রিশ টাকা আয় হইতে এই ব্যয়ের সঙ্কলন হইতে পারে না। সঙ্কলন হয় অনাহার, পবান্ধোজিতা, ভিক্ষা বা চুরি দ্বারা। খাইখরচের উপর অল্প খরচও আছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে ভারতবর্ষের কোটিকোটিলোক আধপেটা খাইয়া জীর্ণ কুঁড়েঘরে বাস করিয়া প্রায় নয় থাকিয়া অশিক্ষিত অবস্থায় সমস্ত জীবনটা নিরানন্দে কাটায়। রোগ হইলে অধিকাংশ লোকেরই যে চিকিৎসা হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই যে ঘোর জাতীয় দুর্দশা, ইহার অল্প কাহার প্রাণ কঁদিতছে? দারিদ্র্যের প্রতিকারের অল্প সচ্ছল অবস্থার শিক্ষিত দেশবাসীরা কি করিতেছেন, গবর্ণমেন্টই বা কি করিতেছেন? যে দেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া বিদেশী কৃত জাতির ধনদৌলতের কারণ হইয়া আসিতেছে, তাহার সম্ভানেরা অশিক্ষিত, অতুল, নগ্ন, রুগ্ন, নিরাশ্রয় অবস্থায় কালযাপন করে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু ইহার অল্প দোষী প্রদানতঃ আমরাই।

গতাত্মশোচনা না করিয়া এখন কিরূপে দেশে ধন বাড়িতে পারে এবং তাহা কয়েকটি লোকের বাঞ্ছা বা ব্যাকের হিসাবে জমা না থাকিয়া পরিশ্রমী সমুদয় দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞানসম্মতভাবে বিভক্ত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্ধারণ করা দেশের মনুষীদের কর্তব্য। পরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মূর্থতা, অন্তঃকরণের উপর নির্ভর করিলেও চলিবে না। উদ্যোগিণ্য পুঙ্খমসিংহম্ উঠৈতি লক্ষ্মীঃ, দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষা বদন্তি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আয়।

ভারতবাসীদের আত্মমানিক আয়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি। স্যার রবার্ট গিফেন ভারতবাসীদের প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় ৩০ টাকা ধরিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের লোকদের আয় কিরূপ ধরিয়া-

ছিলেন দেখা যাক। বিলাতের লোকদের মোট আয় ধরিয়াছিলেন ১৭৫ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ২৬২৫ কোটি টাকা। বিলাতের লোকসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে চারিকোটি। সুতরাং প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় দাঁড়াইতেছে ৫৮৩/৪। তার পর কানাডাবাসীদের মোট আয় ১২০৩ সালে ধরিয়া-ছিলেন ২৭,০০,০০,০০০ সাতাইশ কোটি পাউণ্ড। ১২০১ সালে কানাডার লোকসংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৩১৫। সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় দাঁড়াইতেছে ৫০ পাউণ্ডের অর্থাৎ ৭৫০ টাকার উপর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের লোকদের আয়ও এইরূপ বেশী বেশী। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উল্লেখ অনাবশ্যক। এই তুলনা হইতে আমাদের দারিদ্র্য যে কিরূপ তাহা বুঝা যাইবে।

দারিদ্র্যের ফল।

দারিদ্র্যের ফল অনাহার ও অল্পাহার, দুর্বলতা, দেহের নগ্নতা, গৃহহীনতা বা জীর্ণগৃহে বাস, অসুস্থতা ও রোগ, ভীকতা, অজ্ঞতা, অকালমৃত্যু। দারিদ্র্যের অল্প ফল, আজীবন গণে জড়িত থাকা ও তাহার অল্প মহুষ্যলোপ; আজীবন পরের গলগ্রহ থাকা বা ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন এবং তাহার অল্প মহুষ্যলোপ; চুরি, ডাকাতি, প্রভৃতি দ্বন্দ্বিয়া দ্বারা জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা; এবং এই প্রকারে জীবনকে ব্যর্থ ও কলঙ্কিত করা। ইহার উপায় কে করিবেন? কেবল কতকগুলি কথা বলিলে, কেবল ভাবের উচ্ছ্বাস দেখাইলে প্রতিকার হইবে না। দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, রাষ্ট্রীয় শক্তি ও অধিকার লাভের, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির যে-সব যুক্তিসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া অন্যান্য অনেক দেশের লোকেরা আপনাদের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করিয়াছে, আমাদেরকেও ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত আকারে, তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অল্প সব দেশ সম্বন্ধে বহি পড়িতে হইবে, অল্প সব দেশে গিয়া অল্পসম্ভান করিয়া নানা তথ্য নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু মাছি-মারা কেরাগীর মত নকল করিলে চলিবে না। বুদ্ধি খাটাইয়া ভারতবর্ষের উপযোগী উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

বাঁকুড়ার গরুর গাড়ী ।

স্থানীয় অভাব অভিযোগের কথা সাধারণতঃ মাসিক পত্রে আলোচ্য নহে ; কিন্তু যে কারণে আমবা বাঁকুড়ার ছুর্ভিক্ষের কথা বৎসরাধিক কাল লিখিয়া আসিতেছি, সেই কারণে ঐ জেলার আর একটি কথা লিখিতেছি । বঙ্গদেশ-প্রবাসী ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ রক্ষার্থ কমার্স নামক একটি বাণিজ্যিক সাম্প্রতিক কাগজ আছে । তাহাতে লিখিত হইয়াছে, যে, বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সম্প্রতি ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে গোবর গাড়ীর চাকা সম্বন্ধে যে হুকুম জারী করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে । বোর্ড বলিয়াছেন, যে-গাড়ীর চাকার লোহার হাল ২ ইঞ্চির কম চোড়া, সে গাড়ী জেলার রাস্তায় চলা ফিরা করিতে পারিবে না । ফল এই হইবে যে উৎপন্ন শুল্ক প্রয়োজন-মত নানাস্থানে নীত হইবে না ; তাহাতে প্রজাদের ক্ষতি, বাণিজ্যের ক্ষতি, এবং ছুর্ভিক্ষ নিবারণে বাধা । এখন লোহার দাম তিন চার গুণ বাড়িয়াছে । এখন এক জোড়া হালের দাম ১২ টাকা বা ততোধিক । জেলায় প্রায় পাঁচ লক্ষ গাড়ী আছে । ষাট লক্ষ টাকা খরচ করিয়া প্রজারা নূতন হাল দিবে কেমন করিয়া ? তাহাদিগকে ষাওয়াইবার জন্তই দেশময় চাদা উঠাইতে হইতেছে । এইরূপ অনেক কথা কমার্স লিখিয়াছেন । আমাদের বোধ হয় এরূপ হুকুম এখন চালান ভাল নহে । যুদ্ধ থামিবার পর লোহার দাম পূর্ববৎ হইলে তখন শহরের পাকা রাস্তা সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ করা না কবা সম্বন্ধে বিবেচনা হইতে পারে । গ্রাম্য জংলী রাস্তা সম্বন্ধে এরূপ হুকুমের কোন প্রয়োজন নাই । কমার্স বলেন :—

The Calcutta Corporation issued a similar order some time ago ; but they were compelled to withdraw it, as it was found quite unworkable. If Calcutta, the first city of India, found it unworkable, how much more must this be the case in a small moffusil district ?

বাস্তবিক যদি এরূপ হুকুম করিয়া তদনুসারে কাজ করান সোজা নহে বলিয়া কলিকাতা মিউনিসিপালিটি তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে একটি ছোট দরিদ্র মফঃস্বলের জেলায় ইহা চালান যে দুঃসাধ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?

সারু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ।

বঙ্গের মন্ত্রিসভার বর্তমান দেশী সভ্য নবাব সারু সৈয়দ শামসুল হুদা ঐ কার্য হইতে অবসর লইবার পব তাঁহার স্থানে সারু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে কার্য করিবার জন্ত গবর্নমেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন । এমন একটি ব্যাপাব কি প্রকারে ঘটিল, বুঝিতে পারিলাম না । সিংহ মহাশয় ইহাব পূর্বে কিছুদিন বড় লাটের মন্ত্রিসভার কাজ করিয়াছিলেন ; তাহাও যেচ্ছায, কার্যকাল সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই, ত্যাগ করেন । তাঁহার তখনকার মাসিক বেতন ৬৬৬৬/৮ তাঁহার ব্যারিষ্টারীর আয় অপেক্ষা অনেক কম ছিল । এখন বঙ্গের মন্ত্রিসভার সভ্যরূপে যে মাসিক ৫৬৩৩/৪ বেতন পাইবেন, তাহা আরও কম । সুতরাং তিনি আয়ের জন্ত এই কাজ লন নাই । বড় লাটের মন্ত্রিসভার সভ্যের পদগৌরব বঙ্গের মন্ত্রিসভার পদগৌরব অপেক্ষা অনেক কম । সুতরাং পদগৌরবের জন্ত তিনি এই কাজ গ্রহণ করেন নাই । নবাব সাহেব মন্ত্রী হইবার আগে একজন সাধারণ রকমের হাইকোর্টের উকীল ছিলেন ; সিংহমহাশয় হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বা অন্যতম প্রধান ব্যারিষ্টার এবং এডভোকেট-জেনারেল । সুতরাং নবাব সাহেবের পদে নিযুক্ত হওয়াও তাঁহার কোন সম্মানবৃদ্ধির বা লোভের কারণ হইতে পারে না । বেশ বুঝা যাইতেছে যে তিনি নিজে এই পদের প্রার্থী হন নাই । কোন অজ্ঞাত কারণে, গবর্নমেন্টের অমুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি এই কাজ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন । গবর্নমেন্টের পক্ষে এরূপ অমুরোধ করা উচিত হয় নাই । অবশ্য যদি গবর্নমেন্ট তাঁহাকে পরে কোন প্রদেশের গবর্নর নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে বর্তমানে যে তাঁহার পদগৌরবের লাঘব হইল, তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে । আর্থিক ক্ষতি পূরণ হইবে না ।

তিনি মন্ত্রিসভায় গিয়া, ইচ্ছা থাকিলেও, দেশের বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিবেন, এমন বোধ হয় না । রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহের প্রণালী না বদলান পর্য্যন্ত, দেশবাসী যিনি যত বড় কাজেই নিযুক্ত হউন না, আমরা অসামান্য কোন হিতের প্রত্যাশা করিতে পারি না । অবশ্য যতদিন স্বরাজ্য-প্রাপ্ত না হইতেছে, ততদিনও বড় বড় রাজকার্যে দেশবাসী

নিযুক্ত হওয়া ভাল। কিন্তু যে-কাজ একজন ৬০০০ টাকা বেতনের ইংরেজ করে, তাহার ক্ষুদ্র একজন ১৫২০ হাজার টাকা রোজগারী ভারতবাসী চাই, ইহা বড় অসম্ভব আবদার। ইংরেজকে মজিনভার সভ্য হইবার ক্ষমতা কোন স্বার্থত্যাগ করিতে হয় না; ষাহারা ঐ কাজ গ্রহণ করেন, তাহার অর্থের ক্ষতি করেন; ঐ পদের বেতনে তাহাদের বেশ পোষায়। ভারতবাসীদের মধ্যেও এমন লোক লওয়া উচিত, তাহাদের ঐ টাকায় পোষায়। ১৫২০ হাজার টাকা উপার্জক ভারতবাসী ৬ হাজার টাকা উপার্জক ইংরেজের সমান, কাৰ্য্যত এই দৃশ্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করা আমরা অস্বীকার মনে কবি। অবশ্য যদি মজিনভার সভ্য হইয়া দেশের বিশেষ মঙ্গল করিবার ক্ষমতা কোন দেশবাসীর জন্মিত, তাহা হইলে আমরা মনস্বীলোকদিগকে ত্যাগস্বীকার করিতে অস্বীকার করিতাম। তাহা যখন হয় না, তখন বৃথা অর্গোরব ও অর্থনাশ সহ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

হিন্দু বিধবা ও সধবার সংখ্যা।

হিন্দু সকল-জাতির মধ্যেই বিধবা অপেক্ষা সধবার সংখ্যা বেশী। ইংরেজী বর্ণমালার ক্রম অনুসারে বাংলা দেশের কয়েকটি জাতির সধবা ও বিধবার সংখ্যা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

জাতি	সধবা	বিধবা
বাগদি	২০০৪৭৬	১১১০৭৪
বৈদ্য	১৫৮১০	৭৫৩১
বাক্কাই	৩১৩২৬	১৫৭২৫
বাউরী	৬৬৬২৩	২৩২২৪
ভূঁইয়ালী	১৫৭২২	৮২২২
ব্রাহ্মণ	২৫২৭৮৭	১৪০৭৭৪
চামার	১২৭২১	৫২২১
ডোম	৩২৭৭২	১২২৭২
গন্ধবণিক	৪২৮৭	২৬৩২
কাষ্ম	২২৫৪৮৫	১৪৫৪৮২
নমঃশূদ্র	৩৮৭৭৬২	২২৮৬৪২

সর্বভূক ইংরেজী সাহিত্য।

কোথাও বাণিজ্য কোথাও বা প্রভুত্ব ও বাণিজ্য করিতে ইংরেজের আগমন হয়। এই প্রকারে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে ধন আহরণ করিয়া ইংরেজ ধনী হয়। কিন্তু অল্প প্রকারের ধনও ইংরেজ আহরণ করে। পৃথিবীতে উন্নত, অল্পন্নত, বিশাল বা স্বল্পায়তন এমন কোন সাহিত্য নাই, তাহার কোন না কোন বহি ইংরেজী ভাষায় অন্তর্ভুক্ত না হইয়াছে। এই প্রকারে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পৃথিবীর অপর সমুদয় সাহিত্যের কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় অপর সমুদয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশের অনুবাদ ইংরেজী সাহিত্যে আছে।

যে-সকল অসভ্য-জাতির কোন লিখিত সাহিত্য নাই, ইংরেজ তাহাদের গান, উপকথা, কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিবারে।

এই-সব কারণে ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির চিন্তা ভাব ও কল্পনায় পুষ্ট হইয়াছে, এবং ইংরেজ জাতির বুদ্ধি প্রতিভা ও কল্পনার বিকাশের সাহায্য করিতেছে। ইংরেজের তুলনায় পৃথিবীর নানা দেশে বাঙালীর গতিবিধি অতি সামান্য। কিন্তু আমরা যে-পরিমাণে বিদেশে যাই, সে-পরিমাণেও তথাকার সাহিত্যের রত্নরাজি মাতৃভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতে চেষ্টা করি না। ইংরেজী ও ফরাসী হইতে কিছু অনুবাদ হইয়াছে, বাকী অল্প কোন আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা হইতে কিছু অনুবাদ হয় নাই। প্রাচীন পাক্ষাত্য ভাষার মধ্যে মূল গ্রীক হইতে বোধ হয় দুখানির বেশী গ্রন্থের অনুবাদ হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ভাষার মধ্যে হিন্দী গুরুমুখী ও ওড়িয়া হইতে কিছু অনুবাদ হইয়াছে। মরাঠী, গুজরাতি, তামিল, কানাড়ী, প্রভৃতি হইতে হয় নাই। মডার্ন রিভিউয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতির ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া ইউরোপের ডচ, এবং ভারতের মরাঠী, গুজরাতি, কানাড়ী, প্রভৃতি ভাষায় উহা অনুবাদ করিবার ক্ষমতা অল্পমতি চাহিয়া আমাদের নিকট অনেক পত্র আসিয়াছে, এবং তৎসমুদয় যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে। অল্প ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদ করিবার চেষ্টা আমাদের মধ্যেও থাকিলে ভাল হয়।

সাহিত্যপরিষদের গ্রন্থাবলীর সম্ভা দাম।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতি মহাশয় সম্প্রতি উহার সভ্যগণকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

পরিষদের ঐক্যের জন্ত আমি যে-সকল সঙ্কল্প করিয়াছি, সেইগুলি কার্যে পরিণত করার জন্ত আপাততঃ পরিষদের আর বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। কেবল শিক্ষার দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে যে সর্বত্র সিদ্ধিলাভ ঘটবে, এই প্রকার আশা করা যায় না; পক্ষান্তরে উহার দ্বারা আপনাদের প্রত্যেকের শৌর্য ভ্রান হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। পরিষদের সদস্যেরা যদি সমবেত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরের মুখোপেক্ষী হইতে হয় না। আপনাদের অল্প আয়াদেই পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পরিষদের আর বাড়িতে পারে। আমাব অনুরোধ যে, আপনারা প্রত্যেকে অল্পতঃ ৫ পাঁচ জন সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া পরিষদের সঙ্কল্প বিধান করিবেন। আশা করি, আপনাদের বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে বাকী সাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী পাঁচ জন মাত্র ব্যক্তি নিশ্চয় থাকিবেন।

এত দিন বহু ব্যয়ে ও অশেষ যত্ন সহকায়ে পরিষৎ অনেক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে সাধারণ্যে এই-সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয়, অন্ততঃপক্ষে তাহাতে পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের পুস্তকাগারে এই গ্রন্থগুলি স্থানলাভ করিতে পারে ইহার জন্ত সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্তব্য। সেই অভিপ্রায়ে ইহার সহিত প্রেরিত তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলি (সাধারণের পক্ষে যাহার মূল্য ৩২।০ টাকা তাহা) তিন মাস কাল পর্যন্ত ৫ পাঁচ টাকা মূল্যে আপনাদিগের নিকট প্রেরণ করিতে পরিষৎ প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আপনাদের কোন আত্মীয়কে এক সেট লইবার জন্ত অনুরোধ করিতে পারেন। এইরূপে আপনাদের সাহায্যে সাহিত্য প্রচার এবং পরিষদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

ঐশ্রীপদকল্পতক, চণ্ডীদাসের পদ্যদলী এবং হাজার বছরের প্রাচীন বাক্যলার বিরচিত বৌদ্ধ গান দোহা নামক তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আপনাদের জন্ত উহাদের মূল্য যথাক্রমে ১৮, ২৮ ও ২৮ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করা সকল সভ্যেরই কর্তব্য।

অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাট্টা

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাট্টা মহাশয় খ্রিষ্ট বৎসর শিক্ষাদানকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে স্নদক্ষ শিক্ষক ছিলেন, এবং গবেষণাকার্যেও তাঁহার নৈপুণ্য আছে, তাহা তাঁহার ছাত্রেরা জানেন। তন্মিত্ত তিনি যে ফলিত রসায়নে অর্থাৎ রসায়নী বিদ্যার সাহায্যে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন কার্যে, বঙ্গদেশে একজন কৃতী অগ্রণী, তাহাও অনেকের জানা আছে। কিন্তু তিনি আত্মগোপনপরায়ণ বলিয়া লোকে এ বিষয়ে তাঁহার কীর্ষি ততটা অবগত নহে।

তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার একটি চিত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে রক্ষা করিবার জন্ত এবং ফলিত রসায়নের যাহারা অনুরাগী হইবেন তাঁহাদিগকে উৎসাহদানার্থ একটি ফণ্ড স্থাপন করিবার জন্ত তাঁহার কয়েক জন কৃতী ছাত্র উদ্যোগী হইয়াছেন; যথা, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, রসিকলাল দত্ত ডি-এসসী, রাজশেখর বসু এম্-এ, সত্যীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ, যতীন্দ্রনাথ সেন এম্-এ পি-আর-এস, প্রিয়ব্রত সরকার এম্-এ বি-এসসী। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যের আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সমর্থন করি। তাঁহাদের আবেদন-পত্র হইতে জানা যায় যে বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওর্কসের বিস্তৃত কারখানার গন্ধকদ্রাবক প্রভৃতি উৎপাদনের বিস্তৃত আয়োজনের মূলে তিনি। ঐ কারখানার অন্যান্য নানা উন্নতিও তিনি করিয়াছিলেন।

বেঙ্গল মিসেলেনী নামক আর-একটি রাসায়নিক কারখানারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পবিচালক। নানা প্রকার ঔষধ ও অন্তবিধ নানা প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে সুরাসার আবশ্যক হয়। কিন্তু ভাল সুরাসার বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ভাট্টা মহাশয় এক্ষণে একটি সুরাসার উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এরূপ লোককে সম্মান প্রদর্শন অবশ্যকর্তব্য। তাঁহার ছাত্রেরা উদ্যোগী হউন।

বর্তমান কার্তিক-সংখ্যা কেন ১০ই আশ্বিন বাহির হইল না।

আমরা আশ্বিনের কাগজে বলিয়াছিলাম যে কার্তিকের প্রবাসী ১০ই আশ্বিন গ্রাহকদিগকে ডাকে পাঠাইব। তাহা করিতে না পারাব কারণ গত ৫ই আশ্বিনের ঝড়। প্রবাসীর রঙীন মলাট ও রঙীন ছবি ছাপিবার প্রেস বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয়। ঝড়ের দরুন বৈদ্যুতিক কারখানার সহিত ঐ প্রেসের সংযোগ নানাস্থানে নষ্ট হওয়ায় তার মেরামত করিতে সময় লাগিয়াছে। এইজন্ত ২।১ দিন বিলম্ব ঘটিল। অবশ্য, আমাদের সাধারণ নিয়ম অনুসারে কাগজ বাহির হইবার তারিখ যে ১লা কার্তিক, তাহার বহু পূর্বেই এই সংখ্যা বাহির হইল বটে; কিন্তু বিজ্ঞাপন অনুরাগী ঠিক ১০ই আশ্বিন বাহির না হওয়ায় গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে কারণ জানাইলাম।

তিব্বতরাজ্যে তিনবৎসর

(জাপানী গ্রন্থ একাই কাগুচির ভ্রমণবৃত্তান্ত)

প্রথম অধ্যায়।

বিদায়-উপহার।

১৮২৭ সালে মে মাসে আমি বিদেশ-যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। এই বিপদসঙ্কুল যাত্রার পূর্বে আমি তোকিওর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিদায়ের পূর্বে কত যে আমার প্রতি আশীর্বাদ বর্ধিত হইল, কত যে প্রিয়জনের আন্তরিক শুভ-কামনা প্রাপ্ত হইলাম, কত চক্ষে যে আমার জন্ত অশ্রু দেখা দিল, তাহা আর বলিবার নয়। আমাকে সকলেই বিদায়কালীন কিছু-কিছু উপহার দিবার জন্ত ব্যাকুল হইলেন। আমি বলিলাম “পার্বিষ কোন উপহার লইতে পারি না। আমার জন্ত যদি কেহ কোন মানস কর, আমার জন্ত যদি কেহ কিছু ত্যাগ কর, তবে সেই বহুমূল্য উপহার আমি লইতে প্রস্তুত।” যাহা হউক এই-প্রকার বহুমূল্য উপহার আমি পাইলাম। যাহাকে অতিরিক্ত সুরাসক্ত বলিয়া জানিতাম তাহাকে বলিলাম “আমার বিদায়কালীন যদি কিছু উপহার দিতে চাও তবে আমাকে ঐ সুরাপাত্র উৎসর্গ কর; আর সুরা স্পর্শ করিও না।” ধূম-সেবনে ঘাহার বড়-আসক্তি তাহাকে বলিলাম “বন্ধু, আমার খাতিরে আর ঐটি মুখে তুলিও না।” এই-প্রকারে যাহার যে কু-অভ্যাস এবং পাপাসক্তি আছে জানিতাম তাহার নিকট তাহাই আমার বিদায়কালীন উপহার বলিয়া চাহিলাম। তোকিও হইতে ওসাকায় গিয়া এই-প্রকার আরও অনেক উপহার সংগ্রহ করিলাম; অনেকেই তাহা দিয়া আবার ফিরাইয়া লইয়াছেন,—অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু আজ বড় গৌরবের সঙ্গে স্বরণ করিতেছি, যে, এতদিন পরে আজও অনেকে প্রাণগত যত্নে সেই বিদায়দিনের প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন। তাঁহারা আমায় যে অমূল্য-উপহার দিয়াছেন তাহা আমি অন্তরে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। আমি যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়িয়া আজও অক্ষত রেহে বাঁচিয়া আছি, সে কেবল

তাঁহাদের শুভ-কামনার অদৃশ্য শক্তির গুণে। আর এই-সকল উপহার আমার প্রাণে কত যে বল আনিয়া দিয়াছে, ছদ্মদিনে কত শক্তির সকার করিয়াছে তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়। আমাকে বিদায়কালীন উপহার দিতে গিয়া, কত লোক দারিদ্র্য-বরণ করিয়াছে;—কারণ প্রাণী-হত্যা যাহার ব্যবসা ছিল,—মৎস্য বিক্রয় করিয়া যে পরিবারের সংস্থান করিত,—তাহাদিগকেও আমি জীবহিংসা দ্বারা অর্থোপার্জন হইতে বিরত করিয়াছি। আজ আমার কি শান্তি! কি আনন্দ! আমার হৃদয় একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির চেষ্টায় আজ জলে কত ক্ষুদ্র জীব স্থখে বিহার করিতেছে, কত অবোধ পশু দাক্ষণ ক্লেষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। এই সাধু চেষ্টার গুণে আমি হিমালয়-শিখরে মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, তিব্বতে-ভীষণ-সঙ্কট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি, আমার পরম দয়াল ভগবান বুদ্ধ শত-শত বিপদ হইতে আমায় রক্ষা করিয়াছেন।

এই-প্রকারে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। যাত্রার সকল আয়োজন প্রস্তুত; কিন্তু দেখি যে একশত ইয়েন ছাড়া আমার আর অর্বদম্বল নাই। কিন্তু মুক্ত-হস্ত বন্ধুগণের রূপায় স্বরাষ ৫৩০ ইয়েন পাইলাম। প্রয়োজনীয় সমুদায় ভ্রব্য ক্রয় করিয়া ৫৭৫টি মুদ্রা হাতে লইয়া—সাগর-বক্ষে পাড়ি দিলাম।

বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে তিব্বত-ভ্রমণরূপ দুঃসাহ্য-কার্য্য হইতে বার বার প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ত অত্যাচার করিতে লাগিলেন। আমি যে কেন এই নিশ্চিত মৃত্যুর কূপে ঝাঁপ দিতেছি ইহা ভাবিয়া অনেকে ব্যথিত হইলেন। ওসাকা-নিবাসী বন্ধু মাকি বলিলেন “তোমার মত সাধু নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ পুরোহিতের প্রাণ বিসর্জন দিয়া লাভ কি, তুমি দেশে থাকিলে জাপানের অনেক কল্যাণ হইবে।” কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা অবিচলিত দেখিয়া সকলেই হতাশ হইয়া অত্যাচার উপরোধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা বিষাদপূর্ণ অন্তরে সমুদ্র-তীরে আমায় বিদায় দিতে আসিলেন। বন্ধুদের বিদায়কালীন অভিবাচনের মধ্যে আমাকে বক্ষে লইয়া অর্ববতরনী-সুন্দরী ইজুমি পশ্চিমমুখে যাত্রা করিল। ক্রমে আমার দেশের চিরপরিচিত পর্বত-

শিখর কনগো শিগি ও ইকোমা সমুদ্রপারে অদর্শন হইল। যথাসময়ে মোজি পৌঁছলাম; তৎপরে গেনকাই প্রাণালী পার হইয়া আমাদের পোতখানি সোজা হংকং যাত্রা করিল। হংকংএ গিটার টমসন নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের জাহাজে আরোহণ করিলেন। তাঁহার আগমন আমার এক্ষেপে সমুদ্রযাত্রার নিরানন্দ ভাব দূর করিয়া একটু নতনত্ব আনিয়া দিল। তিনি বলিলেন যে তিনি ১৮ বৎসব জাপানবাসী,—দেখিলাম যে ভদ্রলোকটি অতি চমৎকার জাপানী ভাষায় কথা বলিতে পারেন। ঋষ্টধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা, সুতরাং আমার সহিত তাঁহার ধর্মবিষয়ে খুব আলোচনা চলিত। জাহাজের সকলেই উৎসুক হইয়া আমাদের তর্কযুদ্ধ শুনিতেন; কিন্তু আমরা ইহাতে কখনও স্তব্ধ বই অস্তব্ধ হই নাই। আমি ত বৌদ্ধ শ্রমণ, আমার ধর্মের মহিমা ঘোষণা করিতে আমিও ক্ষান্ত ছিলাম না। কতবার জাহাজের সমুদয় লোক সমুদয় কর্মচারীর নিকট আমার ধর্মের কথা বলিয়াছি।

ক্রমে ১২ই জুলাই আমাদের জাহাজ সিঙাপুর বন্দরে প্রবেশ করিল। আমি ফুজোকগান হোটেলে আশ্রয় লইলাম।

আমি সিঙাপুরের জাপানী কনসালের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাদের জাহাজের কাপ্তেনের নিকট আমার সমুদায় কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আমায় দেখিয়াই বলিলেন “শুনিলাম তুমি নাকি তিব্বতে যাইতেছ। আমি জানিতে চাই তুমি কি করিয়া এই দূরত্ব ক্রমটি সম্পন্ন করিবে। কর্ণেল ফুকুসিমা তিব্বতযাত্রার সংবল্ল করিয়া দারজিলিং-পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সেই কাজ তোমা দ্বারা কেমন করিয়া সম্পন্ন হইবে তা জানি না। তুমি কি জান না তিব্বত প্রবেশ করা অসাধ্য ব্যাপার। দুরকম উপায়ে প্রবেশ করা যাইতে পারে,—হয় এক প্রকাণ্ড বাহিনীর আগে আগে; না হয় ভিক্ষকের বেশে। এই দুই পন্থার মধ্যে কোনটি তুমি গ্রহণ করিবে শুনি—” আমি উত্তর করিলাম “আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু, প্রথম উপায়টি আমার সাজে না, দ্বিতীয় উপায়টি আমায় গ্রহণ করিতে হইবে। তবে আমি কোন পন্থা ঠিক করি নাই—ঘটনাক্রমে যেন ঘটবে তেমনি করিব।” কনসাল সাহেব গম্ভীরভাবে ধারণ করিলেন।

আমি এখানে এক সপ্তাহ বাস করিলাম। এস্থান ত্যাগের পূর্বদিনে এক ভয়ানক ঘটনা ঘটে, এবং অতি আশ্চর্যরূপে আমি মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাই। আমি বৌদ্ধ প্রচারক, ধর্মপ্রচারই আমার কাজ। আমি যেখানে যাই সুবিধা এবং সুযোগ পাইলে ধর্মপ্রচারকার্য হইতে বিরত থাকি না। এখানেও সেই নিয়ম-অনুসারে কাজ করিতাম। আশ্চর্যের বিষয় এই, আমার এইরূপ প্রচারের দ্বারা আমি স্বভাব সেই হোটেলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের স্নানক্ষেত্রে পড়িলাম। তিনি আমার প্রতি প্রশংসা হইয়া প্রতিদিন স্নানাগারে গরমজলে সর্বোচ্চ অবগাহন করিবার জন্ত আমায় অনুরোধ করিতেন। উষ্ণজলে অবগাহন জাপানী-মাত্রেই কি প্রিয়!—আমিও আগ্রহের সহিত তাঁহার এই অমূল্য ভোগ করিতাম। যাত্রার পূর্ব দিন আমি ধর্ম-পুস্তক পাঠে মগ্ন ছিলাম—অধ্যক্ষ মহাশয় ক্রমাগতই দুইবার আসিয়া আমায় স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন—আমি পুস্তক ছাড়িয়া সেদিন আর উঠিতে পারিলাম না। আমার ঘরে বসিয়া পড়িতেছি, সহসা ভীষণ পতনের শব্দ হইল, সমুদয় বাড়ীখানি কাঁপিয়া উঠিল। শুনিলাম আমাদের স্নানাগারটি অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়াছে। সেই সময়ে একজন জাপানী রমণী গৃহে স্নান করিতে ছিলেন, তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সমুদয় আবর্জনার নীচে পড়িয়াছেন। মহিলাটির বাঁচিবার আশা ছিল না। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল বটে, কিন্তু আমার এই কষ্ট হইল যে আমি স্নান করিতে যাই নাই বলিয়া ইনি মারা গেলেন। কেন আমি এই নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলাম?

আমার মনে আশা হইল যে তিব্বতগমনরূপ সৌভাগ্য হইতে আমি কখন বঞ্চিত হইব না। ১৯এ জুলাই ঠিক এই দুর্ঘটনার দিবস—আমি ইংরেজ জাহাজ লাইটনিং চড়িয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। পথে পিনাং হইয়া আমি ঐ মাসের ২৫এ তারিখে কলিকাতায় পৌঁছলাম। কলিকাতার মহাবোধি সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মহাবোধির সম্পাদক বনু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমায় দারজিলিং বাইতে পরামর্শ দিলেন। সেই সময় তিব্বত-প্রত্যাগত রায় শরৎচন্দ্র দাস

দারজিলিংএ বাস করিয়া তিব্বতী-ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন করিতেছিলেন। আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন। শরৎবাবুর নিকট তাঁহার পরিচয়পত্র লইয়া আমি ২রা আগষ্ট যাত্রা করিলাম। এবং পরদিন দারজিলিংএ পৌছিয়া শরৎবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দারজিলিংএ একবৎসর।

১৮৯৭ সালের পূর্বভারতের ভীষণ ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই আমি দারজিলিংএ যাই। দারজিলিংএর সর্বত্র ঘরবাড়ী দেখিয়াই বুঝিলাম যে ভূমিকম্পের প্রকোপ এখানেও বড় কম হয় নাই। শরৎবাবুর বাড়ীখানির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম তাঁহার বাড়ী মেরামত হইতেছে। কিন্তু অবস্থা নানারকমে প্রতি-
কূল হইলেও শরৎবাবু আমায় আদরসহে আপ্যায়িত করিলেন। সেইদিন বিকালে কথাবার্তার পর তিনি আমার দারজিলিং আগমনের কারণ জ্ঞাপ্ত উপলব্ধি করিলেন। এবং পরদিনই ঘুমপালের বৌদ্ধ মন্দিরে লইয়া গেলেন। সেই মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিত সেরাব গ্যাম্‌সোর (অর্থাৎ বিদ্যার সাগর) সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার নামের “একুই” কথাটির অর্থও বিদ্যার সাগর। উভয়ের নামের মিল দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় বড় আনন্দিত হইলেন। ইনিই আমায় তিব্বতী ভাষা শিক্ষা দিবেন স্থির হইল। শরৎবাবু আমাদের উভয়ের মধ্যস্থতা করিতেছিলেন, আমার ইংরেজী ভাষার জ্ঞান অতি সামান্য ছিল, সুতরাং অতি কষ্টে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আলাপাদি করিলাম। সেই দিনই পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে তিব্বতের বর্ণমালা শিখিলাম। সেইদিন হইতে প্রতিদিন তিন মাইল পাহাড় ভাঙিয়া আমি পুরোহিত মহাশয়ের নিকট গিয়া তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিতাম। এইপ্রকারে মাসাবধি চলিল। একদিন শরৎবাবু আমাকে বলিলেন “মিষ্টার কাণ্ডাণ্ডি, আমি আপনাকে তিব্বত যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করার পরামর্শ দি। যে কাজ সাধ্যাতীত তাঁহার জন্ত চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নয়। তিব্বতযাত্রা নিতান্ত অসাধ্য ব্যাপার। তিব্বতী ভাষা ভাল করিয়া শিখিয়া দেশে ফিরিয়া

যান, সেখানে আপনার যথেষ্ট খ্যাতি হইবে।” আমি বলিলাম “খ্যাতি আমি চাই না, তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্মের বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য।” শরৎবাবু আমার উদ্দেশ্যের গুরুত্ব স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন “যাওয়া অসম্ভব এবং গেলেও প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা একপ্রকার অসম্ভব।” আমি ত ছাড়িবার পাত্র নই, বলিলাম “মহাশয়ও গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন আমিই বা পারিব না কেন?” শরৎবাবু উত্তর করিলেন “এইখানেই আপনার ভ্রম, সেদিন আর নাই। তিব্বতের দ্বার বিদেশীদের নিমিত্ত আরও শক্ত করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, এখন সাধ্য কি আমি আবার যাই। আমি সৌভাগ্যক্রমে উত্তম রাহাদানি (Pass) পাইয়াছিলাম, আপনার সে স্বযোগ ঘটবে না। আপনি এ দুঃসাধ্য কাজে হাত দিবেন না। তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া যান।” শরৎবাবুর উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু তিনি আমাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। শরৎবাবুকে বলিলাম “বৌদ্ধ পুরোহিতের নিকট আমার ভাষা শিক্ষা সম্ভোষণক হইতেছে না। তিনি আমায় ভাষাশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্ত অধিক মনোযোগী।” শরৎবাবুকে অমরোধ করিলাম আমায় চলিত তিব্বতী ভাষা শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিতে। শরৎবাবু স্বভাবসিদ্ধ সৌজ্ঞেয় গুণে আমায় পুষ্টিগত এবং চলিত তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিবেন বলিলেন। শরৎবাবুর বাড়ীর নীচেই সবদুঃ নামে এক তিব্বতী লামা বাস করিতেন, তাঁহার বাড়ীতে আমার বাসের বন্দোবস্ত হইল। সেই তিব্বতীয় লামার উপর এই জাপানী লামার শিক্ষার ভার স্থাপ্ত হইল। সবদুঃ লামা আনন্দের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। এই সঙ্গে-সঙ্গে দারজিলিং হাই স্কুলে ভাষা শিক্ষার জন্ত ভর্তি হইলাম। সেখানে তিব্বতী ভাষার প্রধান শিক্ষকের নিকট পড়িতে লাগিলাম। এইপ্রকারে গৃহে চলিত এবং বিদ্যালয়ে লিখিত ভাষা শিখিতে লাগিলাম। আমি যখন দারজিলিংএ পদার্থপর করি তখন আমার হস্তে ৩০০ ইয়েন ছিল। আমি মাষ্টারের বেতন, স্কুলের মাহিনা, আমার নিজের টাকা হইতে ব্যয় করিতে লাগিলাম, কিন্তু শরৎবাবুর গৃহে আহার করিতাম। তিনি আমার আহারের জন্ত খরচ করিতে

দিতেন না, বলিতেন “তোমার মত সাধু লোকের জন্ম এতটুকু করিতে পারিলে আমার বড়ই সুখ হইবে।” শরৎবাবুর সৌজ্ঞেই ১৭ মান আগি দারজিলিংএ বাস করি, নতুবা অতি সন্নদিনের মধ্যেই আমাকে চলিয়া আসিতে হইত।

দারজিলিংএ এই কর মান যেন আমি আবার দ্বিতীয় বাল্যদশা প্রাপ্ত হইলাম। বিদ্যালয়ে গমন এবং গৃহে পাঠাভ্যাস এই হইল আমার কাজ। সন্ধ্যার সময় ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া পড়া মুখস্থ করিতাম। এতদিন জানিতাম বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে সেই ভাষায় যাহারা কথাবার্তা কয় তাহাদের সহিত বাস করিলে শীঘ্র শেখা যায়, এখন দেখিলাম যে শিশুদের দ্বারা নূতন ভাষার শিক্ষক আর নাই। সবহুং লামার ছেলেরা আমায় যেমন শিক্ষা দিত, এমনতর কেহ দিতে পারিত না—এই শিশু শিক্ষকগণ, শিক্ষা দিবার জন্ত ভারি উৎসুক, কিছু শিখাইতে পারিলে তাহাদের গর্ব কত, আমি ভুল করিলে আর রক্ষা নাই, তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিত। বাড়ীর মেয়েরাও কম শিক্ষাবিদ্রী ছিলেন না। আমার এই শিক্ষা হইল যে শিশু এবং রমণী নূতন ভাষার উৎকৃষ্ট শিক্ষক। আশ্চর্যের বিষয় এই ৬৭ মাসের মধ্যে আমি তিব্বতী ভাষায় সুন্দর কথাবার্তা বলিতে শিখিলাম। শিক্ষাবিষয়ে আমারও আগ্রহ এবং মনোযোগের ক্রটি ছিল না। যতই তিব্বতী ভাষায় অধিকার লাভ করিতে লাগিলাম, তিব্বতের সমুদায় বস্তু ততই আমার আগ্রহের বিষয় হইল। সবহুং লামাও বড় সদালাপী ছিলেন, সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট বসিয়া কত যে তিব্বতের গল্প শুনিতাম। বলিতে তাঁহার অপার আনন্দ এবং শ্রোতাও মুগ্ধ হইয়া গল্প শুনিত।

ঈহেমলতা দেবী।

কানু ও হনু

(বৃন্দ. কবি)

ওছা যদি কিছু উচিয়ে বা করে কনু,—
তবু সে ওঁছাই, উচা সে হয় না তবু।
গন্ধমাদন হনু তো ধরেছে শিরে,—
গিবিধারী তবু তারে কেউ বলে কি রে?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

এ দেশে রাজর্ষি রামমোহনের আদর

একজন দীর্ঘকায় আজ্ঞামূল্যবাহ প্রশস্তবক্ষ উন্নত-ললাট “তিল ফুল জিনি নাসা” জগতের কল্যাণে উৎসৃষ্ট-দেহমনপ্রাণ মহাপুরুষ কলিকাতাব পথ দিয়া চলিয়াছেন, একদল বালক ‘সে সুই মেলের কুল, বাড়ী খানাকুল, ওঁ তংসং বলে এক বানিয়েছে স্কুল; ও সে ক্ষেতের দফা করলে রফা মজ্জালে তিন কুল’ বলিয়া তাঁহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিতে-করিতে অগ্রসর হইতেছে। রাজা রামমোহন রায় যখন সশরীরে বর্তমান ছিলেন, তিনি স্বদেশ-বাসীর নিকট এইরূপ অভ্যর্থনাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন শুনিতেছি, এ দেশে তাঁহার আদর নাকি বাড়িয়াছে। যদিও আমাদিগকে এই প্রাচীন বাক্য স্মরণ রাখিতে হইবে, ‘All that glitters is not gold,’ তথাপি উহা স্বীকার করিয়া লইতে আমাদিগের কোন আপত্তি হইত না, যদি এরূপ সন্দেহের অবসর না থাকিত, যে, ইহাকে একটি সত্য-রূপে উপস্থিত করা হইতেছে এই জন্ত যে উহাকে আর একটি (premise) উপনয়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া একটি অভীষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার স্বযোগ মিলিবে। দ্রাবয়বী-ব্যাপ্তি বাক্যটি (Syllogism) এই:—দেশে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কমিতেছে; সুতরাং প্রমাণ হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের পথ হইতে দূরে সবিদ্যা গড়িয়াছেন। ঐ দুই উপনয় হইতে এই সিদ্ধান্ত আসে কি না নৈয়ামিকগণ অবরোহপ্রণালী (Deductive method) অনুসারে তাহার বিচার করিবেন। আমরা আরোহপ্রণালী (Inductive) দ্বারা উপনয় দুটির সত্যতার আলোচনা করিব। ব্রাহ্মসমাজ এ দেশে কতকগুলি সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। রামমোহনের বা তৎপরবর্তী কালের ঐহারা এই-সকল প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন তাঁহাদের বংশধর বা স্বলবর্তীগণের অনেককে সেই-সকল সংস্কারের জন্ত চেষ্টা করিতে দেখিতেছি। ইহাতে দেশের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কহিতেছে, আর রামমোহনের আদর বাড়িতেছে প্রমাণ হয় কি? বিসের দ্বারা বুঝিলাম, দেশে রাজা রামমোহন

রায়ের প্রভাব-বাড়িতেছে? রাজার নামে যে-সকল উৎসব হয় তাহাতে খুব লোকের ভিড় হয় এবং ব্রাহ্ম-সমাজের বাহিরের লোকও তাহাতে যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উৎসবেও তো খুব লোকের ভিড় হয়। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যে সময়ে যত লোকের ভিড় সেইরূপ সময়ে রামমোহনের উৎসবে তাহার দশমাংশ লোক হইবে কি না সন্দেহ। স্তত্রাং যে যুক্তিতে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে, সেই যুক্তিতে ব্রাহ্মসমাজের আদরও বাড়িতেছে বলিতে হয়। যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিবাহকে হিন্দু ব্যবস্থাপক দেশের জনসাধারণের আইনসম্মত বিবাহ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন দেশে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব কমিতেছে এই কথাটাকে পল্লবগ্রাহী শত্রু-পক্ষীয় সমালোচকের অর্থহীন বাক্য (cant) ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

রামমোহনের আদর বাড়িতেছে! কথাটা সত্য হইলে দেশের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মঙ্গল-সমাচার আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু মৃতের প্রতি ছুটি মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ কি আদর? মাহুয মরিলে তাহার প্রতি বিকল্প ভাব চলিয়া যায়। কোনও রকমে তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতে পারিলে, তিনি যতই অতীতের কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যান ততই তাঁহার মূর্তি গড়িয়া পূজা করিবার অবসর হয়। এইরূপে অনেক দেবতার স্মৃতি হইয়াছে যাহাদের জীবন-কথা জানি না বলিয়া তাঁহাদের পূজা করি, জানিলে দেবতার আসন হইতে নামিয়া যান। একজন লেখক বলিয়াছেন, যাহারা "For Thy Son's Sake" বলিয়া যীশুর নামে দিনে সাতবার ভগবানের নিকট উপস্থিত হ'ন, সেই "Son" যদি তাঁহার সেই পূর্বস্কার পোষাক পরিয়া নাম ধাম গোপন করতঃ তাহাদেরই নিকটে আসিয়া সেই পূর্বস্কার ভাবে সেই-সকল পূর্বস্কার উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে যীশু তাঁহার উপাসকগণের দ্বারাই দ্বিতীয় বার জুশবিন্দু হইবেন। বাস্তবিক, মৃতের জন্য বার্ষিক সভা করা আমাদের জাতীয় জীবনের একটা মস্ত কয়-রোপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। বক্তা বা শ্রোতা কেহই যে-সকল সংস্কারকের জীবনের মূলতত্ত্ব পসন্দই করেন

না অথবা অহুসরণ করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাদেরই স্মৃতিসভায় ঘন ঘন করতালি উত্তীত হইবে, আর আমরা মনে করিব যে আমরা একটা বেজায় আদর করিয়া ফেলিলাম। এই স্মৃতিসভাগুলির মত এমন অসত্য-প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠান দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় নাই। যাহারা জীবদ্দশাতে বিদ্যাসাগরের জীবনকে পণ্ড করিবার জন্য ত্রায় অস্ত্রায় শত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা ই যখন স্মৃতিসভার দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া টিকি নাড়েন তখন এই সভাকে কাপট্যের জীবন্ত মূর্তি ছাড়া আর কি বলা যায়! কিছুতেই বিধবা-বিবাহের প্রশ্ন উত্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া যিনি আজ গোপনে স্বর্গমর্ত্যপাতাল এক করিতেছেন তিনিই কাল বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় সভাপতিরূপে অশ্রু বর্ষণ করিলেন আর আমরা হাততালি দিলাম। মহাপুরুষের আদর আমরা এইরূপেই করিতেছি। বিদ্যাসাগর ছিলেন মনুষ্যত্বের জীবন্ত মূর্তি। আমরা আমাদের কুসংস্কার ও দুর্বলতার জন্য তাঁহাকে অহুসরণ করিতে না পারিয়া যদি তাঁহার জীজনহৃত দু'একটি গুণের উল্লেখ করতঃ অশ্রুবর্ষণ করিয়া মনে করি যে বিদ্যাসাগরকে খুব আদর করিয়া ছাড়িয়া দিলাম, তাহা হইলে, আমরা যে আবহমানকাল গুনিয়া আসিতেছি, মাহুযের বুদ্ধি নামক একটা বৃত্তি আছে, তাহার অনন্তিত্বই প্রমাণিত হইবে। সেদিনও ভক্ত নগেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় দেবীলাম জীবদ্দশায় তাঁহার কার্যের সঙ্গে যাহারা যুগাঙ্করেও সহানুভূতি করিতে পারেন নাই,—কেন না, তাঁহাদের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় মতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—তাঁহারাও স্মৃতিসভায় অশ্রুবর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। ইহাই আমাদের মনুষ্যত্বের আদরের মাপকাঠি। এই স্মৃতিসভাগুলি একটি গ্রাম্য প্রবাদের সাক্ষী—“ধাক্তে মা দেষ না ভাত, মরলে করে দানসাগর।” ২৫/২৭/

১। এখন দেখা যাক, দেশে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে এই উপনয়ের মধ্যে কি সত্য বর্তমান। উহা কি মৃতের প্রতি সম্মান না জীবনের আদর? সত্য-দাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন রাজার জীবনের একটা কাজ। আমরা কি এই কাজটির আদর করিয়াছি। তাঁহার জীবিত কালে তো লোকে মনে করিয়াছে, তিনি দেশকে এক মহা-

স্বার্থ ও সুনাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের মনের ভাব এ বিষয়ে কি ছিল? সতীদাহ নিবারণের জন্ত লর্ড বেষ্টিককে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহাতে এই বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে যে তিনি হিন্দু নারীদের জীবনরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন এবং জাতীয় চরিত্রকে নারী-হত্যাকারী ও নারীর আত্মহত্যার সাহায্যকারী এই গভীর কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়াছেন।* তিনি মনুষ্যত্বের উচ্চ আসনে আসীন ছিলেন, জাতীয় অহমিকার কর্দম-প্রাচীর তাঁহার পথ রোধ করিতে পারে নাই। আমরা কি এবিষয়ে রাজার ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিতে সম্যক পারগ হইয়াছি যে বলিব তাঁহাকে আদর করিতেছি? সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে রাজার আইনে, আমাদের হৃদয়ের আবেগে নয়। রাজা আইন উঠাইয়া লইলে আমরা যে কি করিব তাহা ভগবানই জানেন। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় আমাদের মনের ভাব রাজার ভাবের বিপরীতমার্গগামী। সেদিনও নিমতলার ঘাটে আত্মহত্যা সদর্পে মানুষের মাথায় পা তুলিয়া দিল। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার একখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক নারীর এইরূপ আত্মবিনাশের চেষ্টাকে আত্মহত্যা ("Suicide") নাম দেওয়াতে আর-একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক যিনি আপনাকে অর্ধদক্ষ সমাজের মুখপত্র বলিয়া মনে করেন, উহার প্রতি বয়কটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন দেখি পূর্বোক্ত দৈনিকটি আর "Suicide" বলিতে সাহস করেন না, "Suttee"ই বলেন। আমরা আদর করিতে শিখিতেছি বেশ।

২। দেশের লোক সামাজিক ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ একেবারেই অস্বাভাবিক করেন না। অনেকে আছেন, যাহারা সামাজিক দুর্গতি-সকল দূরীকৃত হয় ইহা ইচ্ছা করেন, কিন্তু এ-সকল ব্যাপারে রাজপুরুষগণের সাহায্য

লওয়া একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান, সরকার আইনের বাধুনিতে আমাদের সচল সমাজকে যেমন স্থানে-স্থানে আটকাইয়া ফেলিতেছেন, তাহার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ আইনই আবার অচল অংশকে সচল করিয়া দিবে। এ-কাজ আর কাহারও দ্বারা সংসাধিত হইবে না। যাহা হউক, এ বিষয়ে রাজার মনোভাব কি? আগরা ইতিপূর্বেই টের পাইয়াছি। আইনের দ্বারা সতীদাহনিবারণের জন্ত লর্ড বেষ্টিককে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহাতে যোগ দেওয়ার বিবন্ধে রাজার পক্ষে প্রবল ব্যক্তিগত কারণ বর্তমান ছিল। দিল্লীর সম্রাট-প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি নামঞ্জুর করিয়া সরকার বাহাদুর রামমোহনকে যে-পত্র লেখেন তাহা সেই দিনই তাঁহার হস্তগত হয়। তবুও অতি আগ্রহের সঙ্গে তিনি সরকারের স্তুতিবাদে যোগ দিলেন। এবিষয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তই বর্তমান আছে। রাজা বহুবিবাহের (Horrible polygamy) ঘোর বিরোধী ছিলেন। জীবর্তমানে কেহ বিবাহ করিতে চাহিলে যে জীব অসুস্থ হইতে হইবে এবং আরও যে-সব নিয়ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে তাহা প্রতিপালিত হইতেছে কি না, ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যাহার অসুস্থ হইতে হইবে কেহ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে না এরূপ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্ত রাজা সরকারকে উপদেশ দিয়াছেন।* ইহাতেই বুঝা যায়, আইনের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারে রাজার অমত ছিল না।

৩। দেশের লোককে সজ্ঞাসা কর, সকলেই বলিবে—আহা আমাদের দেশের নারীজীবন যেমন সুখের যেমন উন্নত, এমন আর কোথায়ও নয়। কথায় কথায় তাহারা সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত দিবে। তাহারা ভুলিয়া

* "To offer personally our humble but warmest acknowledgments for the invaluable protection which your Lordship's government has recently afforded to the lives of the Hindu female part of your subjects, and for your humane and successful exertions in rescuing us for ever, from the gross stigma hitherto attached to our character as wilful murderers of females and zealous promoters of the practice of suicide."

* "Had a Magistrate or other public officer been authorised by the rulers of the empire to receive applications for his sanction to a second marriage during the life of a first wife, and to grant his consent only on such accusations as the foregoing (such as barrenness, drunkenness, etc.) being substantiated, the above Law might have been rendered effectual, and the distress of the female sex in Bengal, and the number of suicides (which when compared with those of any other provinces, is almost ten to one) would have been necessarily very much reduced,

বায়, যে অবস্থায় সীতা সাবিত্রী উৎপন্ন হইয়াছিল, সে অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বর্তমান অবস্থায় সাবিত্রী দময়ন্তী যে অসম্ভব, ইহা তাহাদের বুদ্ধির অনধিগম্য। রাজা রামমোহন রায় প্রাচীনকালের নারীদিগের উন্নতাবস্থার কথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভুলিয়া যান নাই যে বর্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। তিনি দেখাইয়াছেন যে বর্তমান নারী-সমাজ আপনাদের পূর্ব গৌরব এবং স্বধর্মবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দৈন্তদশায় পতিত হইয়াছেন।* স্তবরাং তাঁহাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্ত তিনি নানারূপ সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রাজা নারীজাতিকে সামাজিক স্বধর্মবিধাবিধানের বা বংশ অপ্রতিহত রাখিবার যত্নরূপে দর্শন করেন নাই। নারীও যে পুরুষের জায় স্বাধীন জীব, সেও যে ঈশ্বর-প্রদত্ত বৃত্তি-সকলের বিকাশের দ্বারা স্বাধীনভাবে আপনার জীবনের পূর্বতাসাধনের অধিকারী—এই ভাব হৃদয়ে লইয়াই তিনি নারীর সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, দেশের কয়জন লোক রাজার এই মহৎ ভাব ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, নারীকে পুরুষের মূঠার ভিতর হইতে বাহির করিয়া স্বাধীন ভূমির উপর দাঁড় করাওয়া দিতে না পারিলে তাহার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। পরমুখাপেক্ষীর কোন উন্নতি নাই। স্বাবলম্বন সকল উন্নতির মূল। নারীকে দায়াদিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া

পুরুষ নারীর স্বাবলম্বনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সেই পথ ধুলিবার জন্ত তিনি বিপুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নারীজাতির সংস্কারসম্বন্ধীয় সকল প্রস্তাবই পণ্ড হইয়া যাইবে যদি তাহাকে আর্থিক স্বাধীনতা দিবার কোন ব্যবস্থা না হয়। নারীকে যে বিবাহ করিতেই হয়, নহিলে যে অবস্থা প্রয়োজনীয় খোরাকপোষাকও তাহার মিলিবে না। বিবাহে নারী পুরুষের সঙ্গিনী হয় না, দাসী হয়। পুরুষ নারীকে সহায়রূপে গ্রহণ করে না, নারী পুরুষকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয়। রাজা দেখাইয়াছেন, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি পাপ, নারীর এই অসহায় অবস্থার সুযোগে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পুরুষ যদি জানিত যে তাহার স্ত্রী মাত্রই তাহার সম্পত্তিতে ভাগ বসাইবে তবে তাহার বহুবিবাহের বাসনা সমুচিত হইত। স্বামীর অবর্তমানে তাহার যখন পুনরায় বিবাহের সম্ভাবনা নাই—হয় তাহাকে অন্তের গলগ্রহ হইতে হইবে না, হয় জীবিকাধ্বনের জন্ত পাপ পথ অবলম্বন করিতে হইবে * সেইজন্য সে প্রথম শোকের আবেগে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইত। তাই তিনি নারীর দায়াদিকার সমর্থন করিয়াছেন। আজ যদি তিনি সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বলেন, “মাতা চ পিতরি প্রেতে পুত্রতুল্যাংশহারিণী”, বা “তুরীয়াংশান্ত কন্তকাঃ” অথবা “অনুচাচ দ্বিহিতরঃ পুত্রভাগামুসারঃ” তাহা হইলে ঈহারা রামমোহনকে আদর করিতেছি বলিয়া অভিমান করিতেছেন তাঁহারা কি “যঃ পলায়তি সং জীবতি” এই স্ত্রায়ের অম্মসরণ করিবেন না? আর স্বতিসভায়

* With a view to enable the public to form an idea of the state of civilization throughout the greater part of the empire of Hindustan in ancient days, and of the subsequent gradual degradation introduced into its social and political constitution by arbitrary authorities, I am induced to give as an instance, the interest and care which our ancient legislators took in the promotion of the comfort of the female part of the community; and to compare the laws of female inheritance which they enacted, and which afforded that sex the opportunity of enjoyment of life, with that which moderns and our contemporaries have gradually introduced and established, to their complete privation, directly or indirectly, of most of those objects that render life agreeable.”

• “It is not from religious prejudices and early impressions only, that Hindu widows burn themselves on the piles of their deceased husbands, but also from their witnessing the distress in which widows of the same rank in life are involved, and the insults and slights to which they are daily subjected, that they become in a great measure regardless of their existence after the death of their husbands.”

“To these women there are left only three modes of conduct to pursue after the death of their husbands. 1st. To live a miserable life as entire slaves to others. 2ndly. To walk in the paths of unrighteousness. 3rdly. To die on the funeral pile of their husbands, loaded with the applause and honour of their neighbours.”

তাঁহাদের টিকি দেখিতে পাওয়া যাইবে না—তাঁহারা বিরোধী সভার প্রতিষ্ঠা করিবেন। তখন রামমোহনের পশ্চাতে দাঁড়াইবার জ্ঞাত থাকিবে কয়েকজন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মভাবাপন্ন ব্যক্তি। ব্রাহ্মেরাও যে সকলে রাজার কথায় মায় দিবে তাহাও নহে। দেশের আব-হাওয়ার কুপ্রভাব কোন কোন বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের উপরেও সমানভাবেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

৪। এ দেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রচলনে রামমোহনের কি হাত, তাহা সকলেই অবগত-আছেন। আমাদের ধারণা ছিল, রাজার এই কাজটি সকলেরই প্রকার জিনিস। এখন দেখিতেছি আমাদের সে ধারণা ভুল। রাজা পাশ্চাত্য শিক্ষা সমর্থন করিতে যাইয়া ‘টুলো’ শিক্ষাকে যে-ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে নাকি আমাদের জাতীয় অহমিকা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এমনও অনেক গল্পবগ্রাহী আছেন যাহারা ইহাতে রামমোহনের অসঙ্গতিও দেখিয়া থাকেন, তিনি যে-সময়ে ‘টুলো’ বেদান্তের নিন্দা কবিতা-ছেন, ঠিক সেই সময়েই নিজে বেদান্ত প্রচারে অক্লান্ত শ্রম করিতেছিলেন, ইহাতে সহজলভ্য অসঙ্গতি দোষটা না দেখিয়া অভিনিবেশ সহকারে ইহার অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বটার অল্পসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই ভাল হইত। ‘টুলো’ বেদান্ত আমাদেরকে যে-রূপ আধ্যাত্মিক করিয়া গড়িতে-ছিল তাহাতে যে আমাদের জাতীয় জীবন প্রায় নির্বাণের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল তাহার তো সন্দেহই নাই। ইহার জীবনরক্ষার জন্ত কিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগের প্রয়োজন ছিল, তাহারই ব্যবস্থা রামমোহন করেন। আধ্যাত্মিকতা নানী একটি গাভী যে আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি তাহাতে মতবৈধ নাই। কিন্তু যতক্ষণ গরু বাঁচিয়া থাকে ততক্ষণই তাহা ধন। কিন্তু আমাদের সকল ব্যবস্থাই উহাকে মারিয়া ফেলিবার দিকে ছিল। তাই রামমোহন উহাকে বাঁচাইবার আয়োজন করিলেন। বাঁচাইতে যাইয়া দেখিলেন, যে গোত্রে সে ছিল, সে গোত্রে রাখিলে তাহার প্রাণ বাঁচান দায়। সুতরাং গাভীটিকে অল্প গোশালায় স্থাপন করিলেন। সেই গোত্রেই পাশ্চাত্য শিক্ষার গণিত বিজ্ঞান। আমরা আমাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ঘরে ঢুকিবার জন্ত দ্বারে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শম-দম-তিতিক্ষার

যে সম্পদলাভ করিতেছিলাম বা ঘর ছাড়িয়া জগলে যাইয়া যে উপরতি সমাধান অভ্যাস করিতেছিলাম তাহাতে আমরা আধ্যাত্মিক হইতেছিলাম বটে কিন্তু আধ্যাত্মিক বল লাভ করি নাই। বস্তু ছাড়িয়া তাহার ছায়া ধরিয়া মাহুষ গড়ে না। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় দেখিলাম তাহার সাহায্যে মাহুষের আত্মা সবল হয়। রসায়ন, জড়-বিজ্ঞান, শরীর-সংস্থান-বিদ্যার একএকটি সত্য নির্ণয়ে যে ধ্যানধারণার প্রয়োজন হয়, যে সত্যনিষ্ঠা গড়িয়া উঠে, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া নিজে সত্যটাকে প্রত্যক্ষ না করিয়া না-ছাড়িবার যে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে কোন ব্রহ্ম-যোগীর বুলিতে ততবড় শিক্ষা ছিল না। এরূপ কথিত আছে রামমোহন নিজ হস্তে Chemistryর Experiment করিতেন। ইহা কেবল কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত নহে। ইহাব মধ্যে কুস্তক প্রাণায়াম অপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর যোগাভ্যাস রহিয়াছে। “একটি অতি ক্ষুদ্র প্রজাপতির পাখার অতি ক্ষুদ্র অংশ, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধন মুক্ত করিয়া, পরীক্ষার জন্ত সংগ্রহ করিতে হইলে যে ধীরতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, কোন কৈবল্যালাভের যোগচর্চায় তাহা হয় না।” * অনেকে ভাবেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে, সুতরাং অন্নবস্ত্রের জন্তই কেবল এ শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন। সুবিধা পাইলেই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতাব হুর্গে ফিরিয়া যাইব। এই পার্থিব শিক্ষার পরিণতি তো পরম্পরের রক্তপানে! ইহা যদি বাজে লোকের কথা হইত তবে না হয় উপেক্ষা করা যাইত। জ্ঞানে-গুণে যাহারা বড় তাঁহাদের মুখেও আজকাল এ কথা শুনা যায়। অথচ তাঁহারা বলেন দেশে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে। আচ্ছা আমরা যে আধ্যাত্মিক জাতি, আমরা কি চিরদিনই আধ্যাত্মিক রক্তের ব্যবসা করিয়াছি, নবরক্তে কি ধরণী সিক্ত করি নাই? ভূষণী কাকের সাক্ষি অগ্রাহ্য করা যায় না। সত্যযুগের দেবীযুদ্ধে তিনি সন্তবণ করিতে করিতেই রক্ত পান করেন। লঙ্কায়ুধে অতটা নয়, তবে ঠোঁট মাটিতে ঠেকাইতে হয় নাই।

* ১৩২৩ বৈশাখের “প্রবাসী”তে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সম্ভ্রমদায়ের “নূতন শিক্ষা ও প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা” জটব্য।

কুরুক্ষেত্রে রক্ত পান করিতে যাইয়া তাহার ঠোঁটের কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া যায়। পৃথিবী কঠিন হইয়াছে বলিয়া নয়, রক্তের অল্পতায়। কলির কথা জানি না, বোধ হয় রক্তের অল্পতা। হেতু তাহার সমস্ত শরীরই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে, সত্যযুগ হইতে কলির দিকে যতই অগ্রগতির হওয়া যায়, ততই কম রক্তপাতে দর্শ্য অর্ধের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু চিরদিন রক্তপাতের দ্বারাই দর্শ্যকে অর্ধের উপর জয় লাভ করিতে হইয়াছে। তবে আমরা কেবলই আধ্যাত্মিক হইলাম কিরূপে? আর উহাদেরই শিক্ষা জাহান্নমে গেল কেন? আমরা যতই আধ্যাত্মিকতার বড়াই করি না কেন, রামচন্দ্র যদি কেবলই আধ্যাত্মিক হইতেন, পশুবলেও যদি রাবণ হইতে জেঁট না হইতেন, তবে যে আমরা ও তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত মৰ্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিতাম, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। সে বাহাই হোক কেবল পার্থিব উন্নতির জন্তই রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিয়া লন নাই, ইহার সাহায্যে আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতাটাও পূর্ণতা লাভ করিবে, তাহারই জন্তই রাজার এই বিপুল প্রয়াস। রাজার চেষ্টার পশ্চাতের এই মূল তত্ত্বটা যতই ধরিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বিকলভাবে স্বয়ং পোষণ করিতেছি আমরা ততই জোর গলায় রাজার গুণাবলী কীৰ্ত্তন করিতেছি। দেশ যতই তাঁহার পথ হইতে দূরে ধাইতেছে, ততই দেশে তাঁহার আদর বৃদ্ধি পাইতেছে। স্মৃত্যঃ ব্রাহ্মসমাজ যে রাজার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে, ‘লজ্জিকের’ এই অকাটা মীমাংসাটা যে স্বীকার করিবে না তার মত অহিন্দু আর ভুভারতে নাই।

৫। রাজা রামমোহন রায় একপ্রকার হিন্দুবিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বাহা কেবল ব্রাহ্ম-সমাজই গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিবাহে “বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই”। অর্থাৎ যদি নৈকম্যকুলীন ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিবাহ করেন তবে তাহাও হিন্দু বিবাহই হইবে। অরক্ষ ইহা সত্যযুগের কথা নয়, এই কলিকালেরই কথা। এই বিবাহের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় যে পাত্রী ‘কেবল সপিণ্ডা সত্ত্বর্জকা না হয়।’* যে যুক্তির বলে তিনি এই বিবাহ

সমর্থন করিয়াছেন তাহা এই :—এই বিবাহের দ্বারা বিবাহিত যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ত্রায় অবশ্যগ্রহণীয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবামাত্রই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমত নহে, বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সঙ্গে কল্যা কোন সম্বন্ধ ছিলনা সেই স্ত্রী যদি ব্রাহ্মণ কথিত মন্ত্রবলে আজ শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে কেন পত্নীরূপে গ্রাহ্য হইবে না? * জানিতে চাই, আজ যদি রাজা শরীরের বিদ্যমান থাকিয়া এইরূপ এক হিন্দুবিবাহবিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন তবে বাহারা তাঁহার স্মৃতিসভায় প্রশংসান্বিত গগন মেদিনী বিকম্পিত করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ রাজার পথ হইতে দূরে পড়িয়াছেন বলিয়া অহুযোগ দেন, তাঁহাদের কয়জনকে রাজার সমর্থকরূপে প্রাপ্ত হইব। সমর্থন তো দূরের কথা, তাঁহারই সর্বাগ্রে সভা আহ্বান করিয়া রামমোহনকে সমাজচ্যুত, এমন কি পূর্বেরই ত্রায় তাঁহার দেহকে প্রাণচ্যুত করিবার পরামর্শ করিবেন এবং জগতের কাছে সাক্ষ্য দিবেন যে দেশে রামমোহনের “আদর” বেজায় বৃদ্ধি পাইতেছে। বাহা পূর্বে বলিয়াছি, রামমোহন এই মুহূর্তে দেহ ধারণ করিলে তাঁহার ক্রুশবিন্দু হওয়া অনিবার্য। কেননা, বাহারা তাঁহাকে শিক্ষা-কমিটি হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশ নির্মূল হয় নাই। সেই অবস্থা এখনও পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। রাজার প্রস্তাবিত বিবাহের এক সামান্য অংশমাত্র প্রচলিত করিতে যাইয়া ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন্দ্রনাথের যে লাঞ্ছনা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কোন সত্যবাদী ব্যক্তি মনে করিবে যে দেশ রামমোহনকে আদর করিতে শিখিয়াছে।

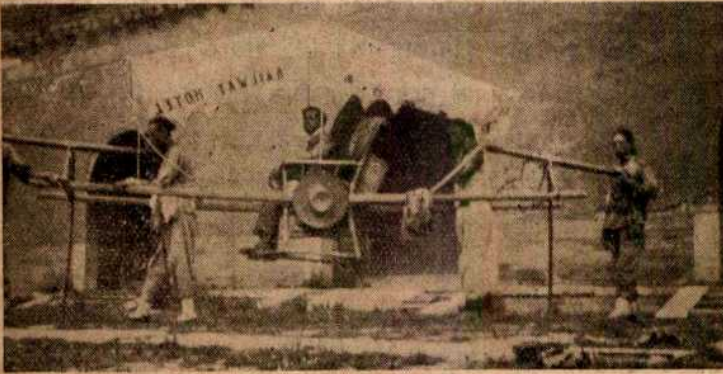
৬। দেশে যদি ব্রাহ্মসমাজ না থাকিত তবে যে রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের পূজা কেবল প্রচার নহে কিন্তু কার্যগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত প্রাণ-পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশের লোক এতদিন ভুলিয়া যাইত। কেননা, তাঁহার স্মৃতিসভায় ইহার উল্লেখ প্রতিবিন্দু। একবার একজন বক্তা উহা উল্লেখ করিতে যাইয়া বিশেষ লালিত হইয়াছিলেন। অথচ উহা যে

তাহার জীবনের কেবলমাত্র একটি প্রধান কার্য তাহা নহে, তাহার বিরাট-জীবনের সকল কার্যের উহাই মূল উৎস। অথচ এইটিই বাদ দিয়া আমরা তাহার স্ততিবাদ সমাপন করি এবং ভাবি দেশে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে। আসল কথাটা এই, যদি একথা সত্যই হয় যে ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের নিশান সোজা করিয়া এখনও তুলিতে পারে নাই, তথাপিও সে নিশান যে কেবল একমাত্র ব্রাহ্মসমাজেই আছে তাহা আরও সত্য। যিনি ব্যক্তিগতভাবে সে নিশান স্পর্শ করিবার স্পর্ধা রাখেন, তাহাকে কোন রকমের ব্রাহ্মই হইতে হইবে। যদি সমবেতভাবে কেহ সে নিশান লইয়া অগ্রসর হইতে চান তবে তাহাও কোন আকারের ব্রাহ্ম-সমাজই হইবে, গতাস্বর নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মিঙ্গ্ সন্স্যাট্দিগের গোরস্থান

পারশু, চীন, ল্যাটিন, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্র নিতান্ত অল্পমত। এই সকল দেশের গবর্নেন্ট স্থানীয়



চীনের চেয়ার-বান।

ভূগোলতত্ত্ব নির্ধারণ করিতে অসমর্থ। এই জ্ঞান যুক্ত-রাষ্ট্রের কার্ণেগি ইন্সটিটিউশন তাহাদের ভূগোল-শাখার সাহায্যে এই সমৃদ্ধ অল্পমত জনপদের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। চীনপর্ষটক পাদ্রী মহাশয় বিগত বার বৎসর চীনের প্রত্যেক প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া

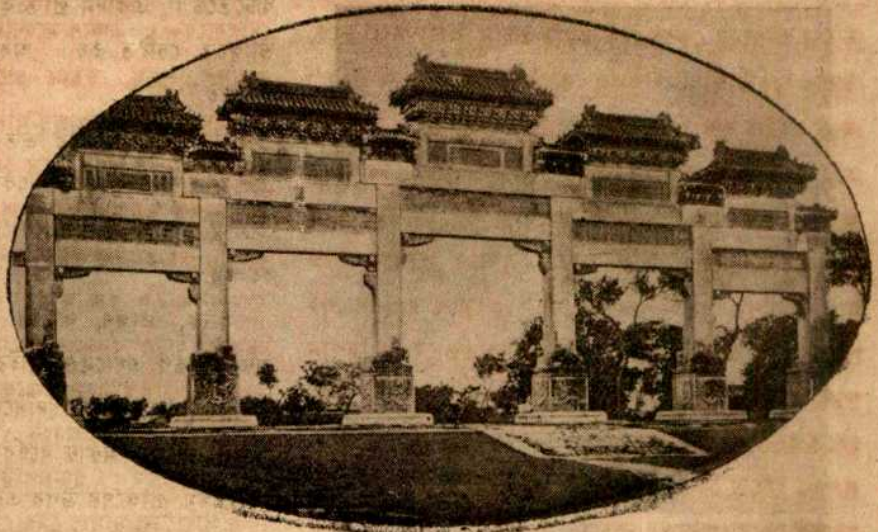
দেখিয়াছেন। এক্ষণে মন্ডোলিয়া, তুর্কীস্থান, তিব্বত-সীমান্ত ব্রহ্মদেশ, শ্রাম, য়ুন্নান প্রদেশ ইত্যাদি দর্শনে বাহির হইয়াছেন। অন্ততঃ ছয় মাস লাগিবে। এই যাত্রায় ইনি একাকী নন। ইয়ান্দিস্থান হইতে কয়েকজন পুরুষ ও রমণী ইহার সঙ্গে ভ্রমণ করিবার জন্ত চীনে আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই ধরণের অল্পসন্ধান ও পর্যটন ভারতবাসীর মধ্যে এখনও আরম্ভ হয় নাই। অবশ্য কথায়-কথায় আমরা তিব্বতপর্ষটক শরচ্চন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি।

ভৌগোলিক মহাশয় মন্ডোলিয়া-যাত্রার উদ্যোগ করিতে থাকিলেন। আমি অদূরে ১১ মাইল মাত্র সফরের জন্ত বাহির হইলাম। গর্দভপৃষ্ঠে যাইবার আয়োজন ছিল। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় মেঘ দেখিয়া পাদ্রী-সদৃশ চেয়ার-বান ভাড়া করা গেল। দোভাবী গর্দভই পছন্দ করিলেন। মিঙ্গ্ সন্স্যাট্দিগের কবর দেখিতে চলিয়াছি। মোগলদের পর এবং মাঞ্চুদিগের পূর্বে মিঙ্গ্ বংশীয় সম্রাটগণ চীনে রাজত্ব করেন। ১৩৬৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৪৪ খৃঃ অঃ পর্যন্ত ইহাদের রাজত্ব কাল। মোগল ও মাঞ্চু-আমলে চীনারা পরাধীনভাবে জীবন যাপন করিত - মিঙ্গ্ চীনের স্বদেশী রাজা। এই জ্ঞান চীনা-সমাজে ইহাদের আদর অত্যধিক। ১৯১১ সালে সান-ইয়ং-সেন প্রবর্তিত বিপ্লবের ফলে মাঞ্চুদের

সিংহাসন-চ্যুতি হয়। তাহার দ্বারা চীনে পরাধীনতা বিলুপ্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্র-শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশীয় রাজগণের শাসন নষ্ট করিয়া বিপ্লবের ধুরন্ধরগণ মিঙ্গ্ সন্স্যাট্দিগের কবরে স্বাধীনতা-লাভের উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। নব্য রিপাব্লিক যেন মিঙ্গ্ বংশের ধারাই বহন করিতে চলিল।

প্রান্তরের ভিতর দিয়া চলিতেছি। সুপরিচিত চাষা জমি; শাক, আলু, তিল, জাওয়ার ও ভুট্টা ছাড়া মাইলের পর মাইল অল্প কোন উদ্ভিদ দেখা যায় না। বামদিকে ও সম্মুখে অনতিদূরে নীল পর্বতমালা। সম্মুখস্থ পর্বত-মালার পাদদেশেই কবরসমূহ অবস্থিত।

দু-একটা পল্লী পথে
পড়িল। ইটের ঘরবাড়ী
ও প্রাচীর। ইটগুলি
রৌদ্রে শুকান আগুনে
পোড়ান নয়। দুই-একটা
বালুকাময় এবং শিলা-
খণ্ডবহুল ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতী
পার হইতে হইল।
গর্দভের পৃষ্ঠে মাল চালান
হইতেছে। শুনলাম অল্প
সময়ে উষ্ট্র-যানের সাক্ষাৎ
পাওয়া যায়।



চীনের মিঙ সন্মাদিগের গোরস্থানে বিজয়-তোরণ।

জাপানের যে-কোন
স্থানেই যাই না কেন
সর্বত্রই দেখিবার বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায়। পর্যটক
গণকে আকৃষ্ট করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট এবং ব্যবসাদারেরা
নানা প্রকার আয়োজন করিয়াছেন। ছবি, ছাপা, হোটেল,
সরাসি ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গায়ই প্রচুর। এই হিসাবে
জাপানীরা ইয়ান্দিদের সমান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চীনের
কোথাও পর্যটকগণের জন্ত কোন প্রকার সুবিধা নাই।
ছবি ছাপা ইত্যাদি ত দূরের কথা—অতি রমণীয় দৃশ্যসমূহও
যত্নাভাবে সংস্কারাভাবে মলিন রহিয়াছে। স্বদূর Great
Wall, মিঙ-কবর ইত্যাদির ত কথাই নাই পিকিঙ্
সহরের মধ্যেই প্রসিদ্ধ দর্শনযোগ্য বস্তুসমূহ লোকজনকে
দেখাইবার জন্ত কোন আয়োজন নাই। চীনাপ্রদর্শক
এবং দোভাষী মহাশয়গণও নিতান্ত অপটু ও
কাঁচা লোক।

পাঁচ ছয় মাইল আসিয়া একটা স্থলী তোরণ দ্বার
দেখিতে পাইলাম। আগাগোড়া শ্বেতমর্ম্মে এইটি গঠিত।
ছয়টি স্তম্ভের মধ্যে পাঁচটা প্রবেশ পথ আছে। ফটকগাত্রে
স্বন্দর-স্বন্দর নক্সা দেখা গেল। ড্রেগন-চিত্রের প্রভাব
নাই কোথায়? অধিকন্তু এখানে দুই সিংহের লড়াই
কতকগুলি প্রস্তরগাত্রে দেখিতে পাইলাম। ফটক প্রায়
১০ ফুট উচ্চ এবং ৮০ ফুট প্রশস্ত। দ্বিতীয় মিঙ্ সন্মাদি
ইহা প্রস্তুত করেন—একজন আধুনিক মাঞ্চু রাজ ইহার

সংস্কার সাধন করিয়াছেন। সমগ্র চীনদেশের বাস্তবশিল্পে
এই মর্ম্মরতোরণ বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করে।

মর্ম্মর ফটক হইতে আরও পাঁচ ছয় মাইল দূরে কবর-
পল্লী পর্তমালার পাদদেশে। ইহার পর একটা লালবর্ণ
ফটক অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলাম। এখান হইতে
সমতল ক্ষেত্রের প্রায় সকলদিকেই পর্তম শৃঙ্গ দেখিতেছি।
কিয়ংকাল পরে একটা দ্বিতল ফটকসদৃশ গৃহের ভিতর
কুম্ভের উপর শ্রুতিকলক দেখিলাম। ইহাতে প্রথম মিঙ্
সন্মাদির গুণ কীর্তিত আছে। এই গৃহের চারিদিকে
চারিটা গোলাকার মর্ম্মরস্তম্ভ দণ্ডায়মান। স্তম্ভগুলির
গাত্রে বিচিত্র সর্পসদৃশ জন্তুর মূর্তি খোদিত। শিরোদেশে
কুঙ্করজাতীয় জীব পথের প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে। শ্রুতি-
কলকের উপর মাঞ্চুসন্মাদি মিঙ্ বংশীয় নরপতিগণের
সাক্যবংশীয় নরপতিগণের চরম প্রশংসা উৎকর্ণ
করাইয়াছেন।

এইবার এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। মিশরে
মন্দিরাদির প্রবেশ-পথে ফ্রিগের সারি দেখিয়াছিলাম।
চীনা মিঙ্ কবরের প্রবেশ পথে প্রায় সেই ধরণের প্রস্তরমূর্তি-
সমূহের শ্রেণী দণ্ডায়মান। প্রথমে দুইটা স্তম্ভ। ইহাদের
গাত্রে মেঘ খোদিত হইয়াছে। তাহার পর চারিটা করিয়া
সিংহ, মেঘ, উষ্ট্র, হস্তী, ইউনিকর্ণ এবং অশ্ব। জন্তগুলির



চীনের মিং-সম্রাটদিগের গোরস্থানে স্মৃতিফলক।

দুইটা করিয়া উপবিষ্ট দুইটা করিয়া দণ্ডায়মান। তাহার পর চারিজন করিয়া মন্ত্রী (বা ম্যাগারিন) এবং সশস্ত্র স্ব-সজ্জিত সেনাপতি। মানবমূর্তি-গুলি সবই দণ্ডায়মান।

মূর্তিসমূহ স্ববৃহৎ প্রস্তরে গঠিত—কিন্তু স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ এইগুলিতে লক্ষ্য করিলাম না। সকলগুলিই যেন নিষ্কর্ষ, নিরেট, স্পন্দন-হীন—

কোথাও ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। উষ্ট্র মূর্তিগুলি চলনসই বলা যাইতে পারে।

সিংহমূর্তিগুলি সম্বন্ধে দোভাবী এক কাহিনী বলিলেন। এই জনপদের এক কৃষক কয়েক দিন রাত্রিকালে সিংহের স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হয়। তাহার ধারণা জন্মে যে, সিংহের মূখ তাহার ঘরের দিকে বলিয়া তাহার পরিবারে অমঙ্গল

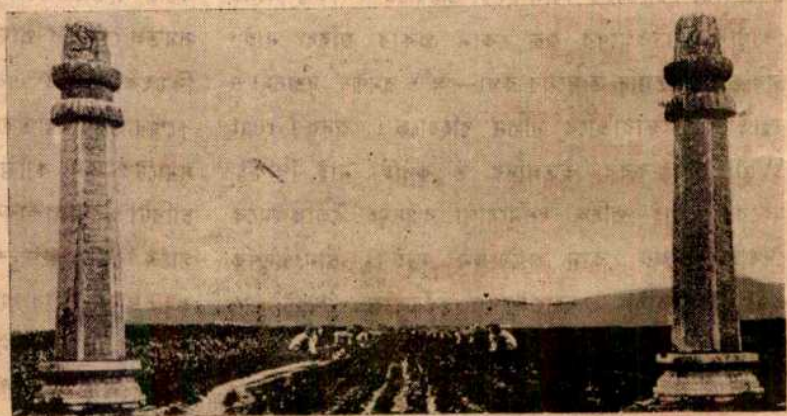
ঘটিতেছে। একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া সে সিংহগুলিকে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিত। অবশ্য পুরাপুরি ধ্বংস সাধিত হয় নাই।

আবার কৃষিক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চলিতেছি। খিলান-বিশিষ্ট প্রস্তর সেতুতে দু-একটা শ্রোতবৃত্তী পার হওয়া গেল। অবশেষে প্রাচীর-বেষ্টিত কবরমন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

ফটক, প্রাঙ্গণ, কাঠের কাজ, ইত্যাদি সবই চীনের অগ্ন্যত্রয়রূপ এখানেও সেইরূপ। ভিত্তি প্রস্তরনির্মিত—মন্দিরের ব্যবহার প্রচুর দেখিতেছি। চীনের স্বদেশী গৌরব পীত টালি এবং অগ্ন্যত্রয় বর্ণের এনামেলও আছে।

প্রথম প্রাঙ্গণের উপর একটা স্ববৃহৎ অট্টালিকার ভিতর সম্রাটের গুণ কীর্তিত রহিয়াছে। ছাদ দ্বিতল। স্বদৃঢ় কাষ্ঠস্তম্ভ এই ভবনের বিশেষত্ব।

ইহার পর আর-একটা প্রাঙ্গণ। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর-নির্মিত ফুলদান, বাতিদান ইত্যাদি রক্ষিত। ইহার পর শেষ অট্টালিকা। নিম্নতলস্থ পথ দিয়া উর্দ্ধে উঠিলাম। দ্বিতলে একটা স্মৃতিফলক। এই অট্টালিকার



চীনের মিং-সম্রাটদিগের গোরস্থানে মেঘ-লাঞ্ছন স্তম্ভ।

পশ্চাতে পর্বতসদৃশ উচ্চ মূর্তিকাস্তূপ। ইহাই কবর। সিউলে ও মুকুডেনে এই ধরণের কবরই দেখিয়াছি।

তৃতীয় মিঙ-সম্রাট এই কবরে শায়িত। এই কবরের চীনা নামের অর্থ “বিরাত কবর।” সম্রাটের নাম ইয়ুঙলু। এই ধরণের আরও বারটা কবর এই স্থানে আছে। সকল-গুলির প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকা একই ধরণে বিহীন।

এই বিরাট কবর সকলগুলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ১৯১১ সালে সান্-ইয়াং-সেন এই কবরেই স্বরাজপ্রতিষ্ঠার উৎসব সম্পন্ন করেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ব্রহ্ম পল্লী-চিত্র

(পদ)

"We are trying to teach the Burmans our ideals, to show them how far superior is our civilization. When we shall have succeeded we shall have spoilt the pleasantest country and the most delightful people in the world."—Sir Herbert Thirkell White, K.C.I.E., Lieutenant Governor of Burma.

হান—মুখিট। ব্রহ্মদেশের একখানি গওগ্রাম।

পাঞ্জ-পাজীঃ—

কো-মং-গে—গ্রামের প্রধান—মা-নী তাহার কস্তা।

মং-লেট—মধ্যবিত্ত কৃষক—
 { মং-সে তাহার স্ত্রী।
 { কো-লোন ঐ পুত্র।

মং-বু — ঐ —
 { মা-হেন — স্ত্রী।
 { মা-পান — প্রথমা কস্তা।
 { মা-নু — দ্বিতীয়া কস্তা।

মং-মো — সূত্রধর। মং-পো-খিন — দারোগা।

মং-শোরেটু — দরিদ্র কৃষক। বা-তা — দহা-সদ্ধার।

উ-বু-না — বুদ্ধ জ্যোতিষী ও চিকিৎসক। মা-পিয়ান — বেসিনের ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী।

[বন্দী নাম — বাংলা অর্থ
 কো-মং-গে — জীল কুর।
 মং-লেট — জীমুক্ত বাহ।
 মং-কো-লোন — জীমান রেশমী গোলা।
 মা-নী — জীবন্তী অধীনী।
 মা-হেন — জীবন্তী বিলাসিনী। ইত্যাদি।]

ব্রহ্মদেশের ধানজমী। পার্শ্বভূমি হইলেও অত্যন্ত উর্বর। মাহুঘভোর উঁচু সোনার ঢেউএর মত স্ববৃহৎ ধানক্ষেতের তিনদিকে ঈষৎ হরিৎ বর্ণের সুপুষ্ট জঙ্গল। উত্তরে, শাখানদীর ক্রোড়ে ক্ষুদ্র কৃষক-পল্লী মুখিট। সেই ধানক্ষেতের মধ্যে গোলপাতায় ছাওয়া একটি সুউচ্চ মাচা বা টোঙ। অনেকটা নহবৎখানার মত।

তখন রাত হইয়াছে। গুরুপক্ষের রাত্রি। ফুরফুরে বাতাস। প্রকৃতি নীরব। দূরের গ্রাম্য কুকুরের খেউ-খেউ চীৎকার পর্য্যন্ত শোনা যায় না। টোঙের দাওয়ায় বসিয়া মং-কো-লোন অগ্ন্যমনে চুপুট টানিতেছে। তাহার দৃষ্টি—জ্যোৎস্নারশির মধ্য দিয়া ওই অশ্লষ্ট জঙ্গলটার দিকে;

কিন্তু মনটি—কৃষক-পল্লীর সুউচ্চ বাঁশের বেড়া ভেদ করিয়া, জ্যোৎস্নামাত্র কুটীর-কক্ষের মধ্যে একটি চকল-লোচনার মধুর অপাঙ্কের কোণে! সমস্ত দিনমানটা বিরহের গান গাহিয়া, পাখী ভাড়াইয়া, সে মাঠের মধ্যে কাটাইয়াছে—রাত্রেও এই কারাগারের মধ্যে থাকিতে হইবে—আর এই চাদিনী নিশীথে এতকণ, ফুলের-মালা লইয়া, তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মং-মো হয়ত তাহার প্রিয়তমা মা-পানের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে।

ধান কাটার দিনকটাও যে কাটে না! তাই কি ছাই রাত্রে একবার গ্রামে যাবার যো আছে—আলের উপরে সাপের ভয়, জঙ্গলের মধ্যে ভূতের বাস!

কত কথা, কত ঈর্ষাঘৃণা, কত ভবিষ্যৎ সুখ-কল্পনার তরঙ্গই না কৃষক-যুবকের চিন্তা-সমুদ্র আলোড়িত করিতে লাগিল! তাহার হাতের চুপুট হাতেই রহিয়া গেল—ছেঁচা বাঁশের ছিটে-বেড়া ঠেদান দিয়া সে আকাশ-পানে তাকাইয়া রহিল।

মাচা নড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘর-থেকে একজন জড়িত-কণ্ঠে কহিল—“কিহে এখনও শোওনি?”

চুপুট নামাইয়া কো-লোন উত্তর করিল—“ঘুম পায়নি।”

প্রথম লোকটি কহিল “এখন কি ঘুম পায়? এই হচ্ছে প্রণয়-ভিকার সময়। হ্যা হে ভূমি বসে-বসে কি ভাবো?”

কো-লোন—“মং-মো হয়ত মা-পানের সঙ্গে বসে ফুটি করছে।”

কো-লোন “আমারও তাই বিশ্বাস।”—হাই তুলিয়া প্রথম ব্যক্তি কহিল—“ভয় কি হে ধান কাটা হোকনা, আমিই তোমাকে নিয়ে রোজ-রোজ মা-পানের ওখানে যাবো।—এখন শোবে এসো।”

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। সকলেই নিদ্রিত। দূর জঙ্গলে অশ্রান্ত করুণ ঝিল্লিরব। কয়টি হরিণ ও শূকর ক্ষেত্রমধ্যে আসিয়া ধান থাইতেছে। অধিকাংশ ধান কাটা হইয়াছে, তথাপি ক্ষেত্রে ঘেঁষে শস্ত ছিল। দুইটি শূকরশাবক তুমুল কলহ করিতে লাগিল। ফলে, মাচার নীচে প্রহরী কুকুরটা আগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিলে বনবাসীরা পলাইয়া গেল। বিরক্ত-কণ্ঠে কো-লোন কুকুরকে স্থির হইতে আজ্ঞা করিয়া পুনরায় ঘুমে অচেতন হইল।



বন্দার নৌকা।

প্রত্যয়ে উঠিয়া ফো-লোন্ দেখিল কান্তর কুয়াসায় ঢাকা। চাল হইতে বৃষ্টিধারার মত শিশির পড়িতেছে। কদল মুড়ি দিয়া শয়ন করাই সমীচীন—কিন্তু শীতে স্থির থাকা অসম্ভব। নিম্নে একস্থানে ভিজা ছাইএর মধ্যে কাঠের আগুন মন্দ-মন্দ জলিতেছিল। ফো-লোন্ গায়ে কদল মুড়ি দিয়া সেই অন্তর্গূঢ় অগ্নিস্তূপের সম্মুখে গিয়া উবু হইয়া বসিল। এইবার এক-আঁটি খড়ের শহাঘো ভাল করিয়া আগুন জালিবার পালা। অর্থাৎ চক্ষু বুজিয়া ফুৎকারের সাহায্যে ভিজা-কাঠের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ।

ফো-লোন্ নির্বিকার-সিঙে আগুন পোহাইতেছে। কদল গায়ে দিয়া শোয়েটুন্ আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল।

“বেশ ঘা-হোক! আমি মরি রোজ আগুন ধরিয়ে আর তোমরা এসে মজা করে আগুন পোহাও!”

“আর দাদা—ওহে আগুন হয়েছে নেমে এসো।”

দ্বিতীয় প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া ফো-লোন্কে প্রশংসা করিয়া বলিল, “এত সকালে আগুন জালা বাস্তবিক একটা যে-সে কর্ণ-নয়!” বক্তার মুখে এক-গাল পান। স্থতরাং তাহার কথন জাগিয়াছিল ফো-লোন্‌র বুঝিতে বাকী ছিল না। ফো-লোন্-নির্বাক।

ক্রমে ধূসর প্রান্তরে সোনালি রং ধরিলে, স্তব্ধকান্তি ধাত্তশীর্ষগুলি হীরার মুকুট খুলিয়া ভূতলাসনে রাখিয়া দিল। এক-বাক টিয়াপাখী তীরবেগে ক্ষেত্র-মধ্যে আসিয়া বসিল।

“এয়েছে রে—। ফো-লোন্ একবার কেনেস্তারাগুলো বাজিয়ে দে ভাই।”

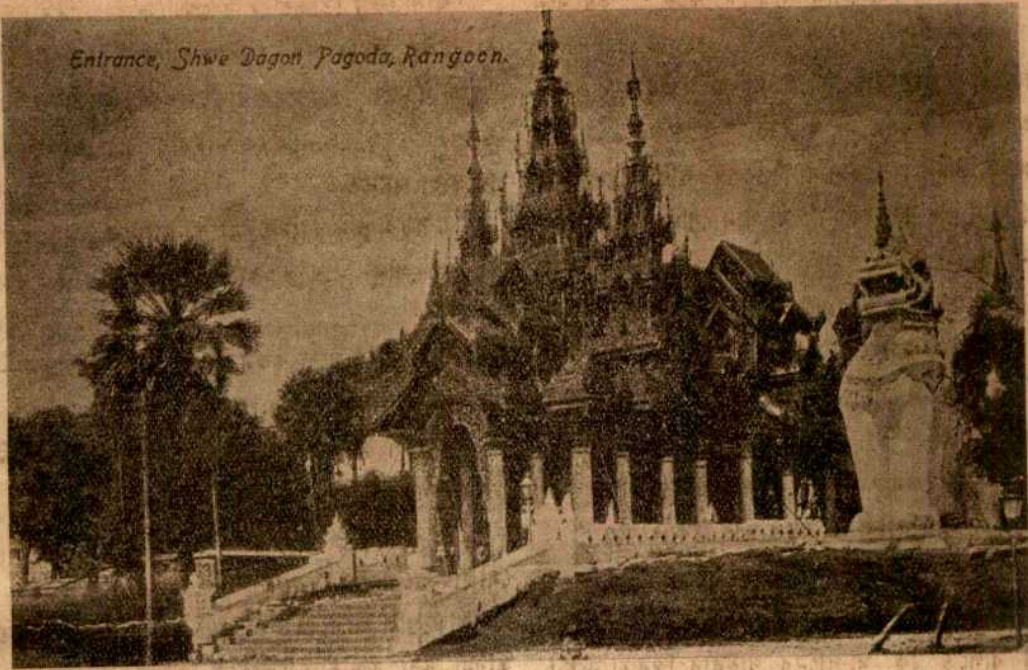
“তা যাচ্ছি, কিন্তু আজ আমি বাঁধতে পারবো না।”

আহারান্তে পানচুরুট খাইতে খাইতে কতকগুলি গরুর-গাড়ীর-চাকার শব্দ শুনিয়া ফো-লোন্ কহিল, “আজ বোধ হয় অনেকেই আসছে, অনেকগুলো চাকার আগুয়াজ না?”

মুহূ-হাস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল “হ্যা, মং-মৌ ছাড়া সকলেই আসছে।”

গ্রামের পাঁচজনের নৌকা মেরামত করিতে মং-মৌ ইদানী বড়ই ব্যস্ত। কয়খানি নৌকা সারিয়া ইতিমধ্যে নদীতে ভাসানো হইয়াছে। বাকী কয়খানি মেরামত হইলে, ধান বোঝাই করিয়া মহাজনেরা ধান বেচিতে বেসিনে যাইবে। মং-বু মহাশয়ের নৌকাখানা সর্কীপেক্ষা বড়। সেইটি মেরামত করিতেই মং-মৌ-এর অনেক দিন লাগিবে। মা-পান, মং-বু মহাশয়েরই জোচ্চা কথা।

খুলিপটলে জঙ্গল অন্ধকার করিয়া একসারি গরু-মহিষের



Entrance, Shwe Dagon Pagoda, Rangoon.

বর্ণনার মনির।

গাড়ী ক্ষেত্র-মধ্যে উপস্থিত হইল। ছেলে-মেয়েদের হাত-কোলাহলের সঙ্গে-সঙ্গে চালকেরা গাড়ী খুলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। ঠুং-ঠুং ঘণ্টা দোলাইয়া পশুগুলি ঝুঁটি-বাঁধা ছেলেদের নেতৃত্বে খালধারে চরিতে গেলে, স্ত্রীলোকেরা তামেইন জামা, ও লুঙ্গী গোছাইয়া চালা ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

চালার একপারে ফো-লোন্ বসিয়া গল্প করিতেছিল। সহচরী সহ মা-পান্ তাহাদের নিকটে গিয়া বসিল। ফো-লোন্ তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যায় নাই। সেও দেখাইতে চায়, যেন সেও ফো-লোন্কে দেখে নাই।

মা-পান্—“মা-মী, একবার দেশলাইটা দে, চুকট ধরাই।”

ফো-লোন্ তাড়াতাড়ি দেশলাই দিয়া কহিল, “আজ বোধ করি গাঁয়ের সকলে এসেছে।”

মুচ্কি হাসিয়া মা-পান্ তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিল। ফো-লোন্ তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল।

আজ মা-পানের চেহারা বড় সুন্দর। নিটোল গড়নের উপর কাঁচা সোনার মত রং—গোলাপী তামেইন্—বেগুনে

লুঙ্গী—ফুলের তোড়ার মত কেশগুচ্ছের উপর তিনটি আধফোটা গোলাপ ফুল—ছুই কানে ধুব বড় ছিজের মধ্যে কাঁচের চোঙা বা নাড়োয়ং। তাহার প্রিয় সহচরী মা-মী গ্রামের প্রধান ব্যক্তি কো-মং-গ্নে মহাশয়ের একমাত্র কন্যা বটে, কিন্তু সে তত সৌখীন নয়। তাহার চেহারাও মা-পানের মত নয়। দোষের মধ্যে তার নাকটা মেয়েদের মত সুচল।

“রোজ রোজ তুমি এখানে থাকো কেন?”—মা-পান্ প্রশ্ন করিল।

ফো-লোনের দৃষ্টি তখন তাহার চুকট খাওয়ার দিকে। শশব্যস্ত হইয়া বলিল “তুমি তো জানোই বাবার জজ। আমি না এলে তাঁকে এনে রাতে পাহারা দিতে হবে। ঠাণ্ডা লাগলে তাঁর অসুখ করে। আমি কি মাখ করে—”

“আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। তুমি কুড়ের বেহদ্দ, তুমি আর আমাকে দেখতে পারো না।”

ফো-লোন্ যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মা-পান্ পশ্চাতে ফিরিয়া ধূম পান

করিতে লাগিল। ফো-লোন্ আর কি করে? ক্ষুধ মনে অন্যত্র গিয়া বসিল।

মাত্রাজী কুলিরা আসিলে কো-মং-গ্রে মহাশয় বলিলেন “ওঠ হে, আর গল্প করে না, কালারা * এসেছে।”

সকলেই উঠিল। ফো-লোন্ বিলম্ব করিয়া দেখিতে-ছিল মা-পান্ যদি কথা কয়। মা-পান্ সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিল না।

মধ্যাহ্নে ফো-লোন্ চালাঘরে আসিয়া মা-পানের নিকটে বসিল। মা-পান্ তাঁহাকে শুনাইয়া মা-মীকে বলিল— “বাবা স্থির করেছেন বেসিনে ঘাবার সময় তিনি মং-মোকে নিয়ে যাবেন।”

মা-মী—“সে কেন? তোমাদের পাড় টানতে যাবে?”

হাসিয়া মা-পান্ কহিল “এ বছর তাই ঠিক হয়েছে।”

“তুমিও বোধ হয় যাবে?”

“দেখি কি হয়।”

সত্য বলিতে কি মা-পানের ঘাইবার স্থিরতা নাই। তাহার পিতা মহাশয় তিন চার বার যাতায়াত করিবেন। জুয়া খেলিয়া সব টাকাগুলি না নষ্ট করিয়া বসেন তাই দেখিতে তাহার মাতা মা-হেন্ সঙ্গে থাকিবেন।

“তোমার মা খুব সেয়ানা। আচ্ছা, অত টাকা জমিয়ে তিনি কি করবেন?”

“তাঁর ইচ্ছা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।”

“হ্যা—নাভোঁএর চওং টাগার (মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার) সঙ্গে যে তার বোয়ের ঝগড়া চলছিলো তার কি হলো জনেহ?”

“টাগা নিজের ছেলেটা ও টাকাকড়ি জমিজমা বুঝেপড়ে নিয়ে পরিবার ত্যাগ করেছে। সেও নিজের বিষয়-আশয় ও মেয়েদের নিয়ে আলাদা হয়েছে। বোধ করি মং-গিওকেই বিয়ে করবে।”

বেলা পাঁচটা। জীলোকেরা শস্তগুলি স্তূপাকারে জড়ো করিতেছে। নিঃশব্দে ফো-লোনের পশ্চাতে আসিয়া মা-পান্ বলিল—“তুমি আজ খুব খেটেছে।”

আর একটু হইলেই সে কান্তে ফেলিয়া দিত। কান্তে সামলাইয়া দাঁড়াইল। হাসিতে-হাসিতে মা-পান্ বলিল “আজ সকালে তোমাদের বাড়ী সকলে খেয়েছি।” সেটা ওরূপভাবে ফো-লোনকে জানাইবার প্রয়োজন ছিল না সে তাহা জানিত।

“এ বছর তুমি কাদের নৌকো চালাবে?”

ফো-লোন্ নিঃশব্দে কান্তের ধার পরীক্ষা করিতে লাগিল।

“বাবা এরই মধ্যে কজন দাড়ী ঠিক করেছেন—তিনি যদি তোমাকে চান্, যাবে?”

আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব। ফো-লোন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল সে তখন “দেখা যাবে।”

“আমি তোমার জন্ত তাঁকে বলবো। আমিও সেই নৌকায় যাবো।”

গাড়ীগুলি আল, উঁচু নীচু মাঠ, নালা ও জল অতিক্রম করিয়া ধূলা উড়াইতে-উড়াইতে চলিল। খড়ের গাদার উপরে বসিয়া বালক-বালিকারা উচ্চস্বরে গান জুড়িয়া দিল। পথ হইতে তাহাদের পিতা ও ভ্রাতারা সেই সঙ্গে যোগদান করিল।

গা তুি বেষং মাঃ ক্ৰৎ সো স্থিঃ সৎ ।

অঃ মতঃ, হু পা তঃ, তঃ পা রে । ইত্যাদি ।

[পঠনকালে ‘তুি’ ‘দো’ বলিয়া উচ্চারিত হয়

‘পা’ ‘বা’ — —
‘রে’ ‘রে’ — —]

আমাদের জন্মভূমি অতীব সুন্দর।

শ্রামল ধানের ক্ষেত অতি মনোহর ॥

এমন বিচিত্র দেশ আর নাকি আছে।

যেথায় প্রকৃতি হাসে মনোহর সাজে ॥

কোথাও নাহিকো স্থখী মোদের সমান।

আমাদের ধর্মপিতা বুদ্ধ ভগবান।

গ্রাম-গ্রামে খামার-বাড়ীর উঠানে আসিয়া চালকেরা পশুগুলি মুক্ত করিয়া দিল। বালকেরা তাহাদের লইয়া নদীজলে স্নান করাইতে সন্ধ্যার ঝাঁপারে মিলাইয়া গেল। সেদিনকার শস্তগুলি ফোলোনের পিতা মং-লেট মহাশয়ের। বলা বাহুল্য, তাহার অংশটি পাঁচ জনের অংশ হইতে স্তূপাকারে পৃথক রক্ষিত হইল।

* সম্রাটের পরপার হইতে বাহারা আসিয়াছে, যুরোপীয় অথবা ভারতীয় সকলেই উচ্চ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।—লেখক।

মুখিট একখানি গুণ্ডগ্রাম। এক পোয়া আন্দাজ রাস্তার দুই ধারে বিশ পঁচিশখানা মাচার মত বাড়ী। মাঝে মাঝে বাঁশঝাড়। রাস্তার উভয় প্রান্তে জঙ্গল, বাঁমদিকে শাখানদী—দক্ষিণে খানিকটা পতিত জমীর পরে ধান ক্ষেত।

নদীতে তখন ভরা জোয়ার। নৌকাগুলি রাস্তার সঙ্গে প্রায় সমতল। বর্ষাকালে কুল ছাপাইয়া গ্রামের মধ্যে দুই হাত আন্দাজ জল দাঁড়ায়। গৃহস্থেরা নৌকাঘোণে এবাড়ী সেবাড়ী যাতায়াত করে।

সে দিন গ্রামে খুব কাজ পড়িয়াছে। মুণ্ডর পিটিয়া কেহ রাস্তার ধারে বাঁশ পুঁতিতেছে—কেহ খড় মাথায় করিয়া আনিতেছে—কেহ বা বাথারি কাটিতেছে। মুরাইয়া তৈয়ারী হইবে।

ফোলোন্ মা-পান্দের বাড়ীতে চলিল। সে তখন তাঁতে বসিয়া খট-খট করিয়া কাপড় বুনিতেন। তাঁদের বাড়ীটা খুব বড়। সম্মুখে নিম্নতলে একটা বারাণ্ডা। বারাণ্ডা হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। নীচে মা-পান্ ছাড়া অন্য কেহই ছিল না। বারাণ্ডার ঘে কোণে বসিয়া সে বধন করিতেছিল তাহার উপরেই তার শরন ঘর। তাহারা দুই ভগিনীতে বারাণ্ডার অন্ত কোণে চুপুট কুমাল প্রভৃতি গৃহজাত দ্রব্য লইয়া অবকাশমত বিক্রয় করিতে বসে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ উভয়ে হিসাব করিয়া ভাগ করিয়া লয়।

ফোলোন্ মা-পানের সম্মুখে উঠানে গিয়া বসিল। দ্বিতলে তাহার-মাতা চলাফেরা করিতেছিলেন। নচেৎ বারাণ্ডায় বসিলে ক্ষতি ছিল না। মাথার উপরে জ্বীলোক থাকা অমদলের চিহ্ন। ফোলোনের দিকে একবার চক্ষু ফিরাইয়াই মা-পান্ নিজকর্মে মন দিল। সে একজন খুব বড় শিল্পী। মা-হেন্ বলেন তাহার মেয়ের মত পরিচ্ছন্ন প্রস্তুত করিতে বুদ্ধা মা-টু ছাড়া অপর কেহ পারে না। চুপুট ও হাঁড়িকুড়ি গড়িতে সে অদ্বিতীয়। একে হুল্লরী, উপরন্ত এমন শিল্পী; স্তত্রায় সমবয়সীরা তাহার প্রতি বিশেষ সদয় নয়।

শুন শুন সুরে গান গাহিতে-গাহিতে মা-পান্ মাকু টানিতেছিল। চুপুট-হাতে ফোলোন্ তন্ময় হইয়া দেখিতে-ছিল। সহসা মা-পান্ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ফোলোন্ কহিল, “আজ থেকে ধান মাড়াই হবে?”

মা-পান্ পানের রসে বাঙা ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি মাখাইয়া বলিয়া উঠিল “তাই নাকি?”

ফোলোন্ হতভম্ব। দূরে বাঁশ পোঁতা হইতেছে। সেও যেন সেই শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ধরণীগর্ভে বসিয়া যাইতেছে। মা-পানের বেসিনে যাইবার খবর লইতেই তাহার আসা। অথচ তাহার উদ্দেশ্য সে যেন না বুঝিতে পারে। নখে করিয়া সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

“তুমি আজ মাঠে যাওনি মা-পান্?”

“মাথা ধরেছে।”

ফোলোন্ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিল। কাজে বিঘ্ন হইবার ভয়ে অধিক কথা কহিতেও সাহস করিল না। দেয়াল হইতে চুপুট দিয়া, অক্লান্ত করিয়া মা-পান্ তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

“তুমি কো-সং-গ্রে মশায়ের নৌকোতে যাবে নাকি?”

“যাবো কি না তার ঠিক হয়নি।”

“আমি চল্লুম।”

ফোলোন্ চলিয়া গেল। অচিরে মা-পানের গানের সহিত তাঁতের শব্দ উঠিল। পথিমধ্যে মা-মীর সহিত ফোলোনের সাক্ষাৎ। কলসীকক্ষে জল লইয়া সে ঘরে ফিরিতেছিল। কলসী নামাইয়া কহিল,—“কি হলো ফোলোন্? আজ তার মন পেলে?”

আদ্যোপান্ত শুনিয়া মা-মী বলিল “মেয়েটা বড় ঠেকারে।”

“তার বেজায় দেমাক হয়েছে। মনে করে বুঝি আমি তার ভেতো। কোনো একটা মতলবের ঠিক নেই, আজ এক কথা, কাল এক কথা।”

“রগড় দেখছে, বেশী সেয়ানা কি না।”

আবেগভরে ফোলোন্ বলিল “তুমি যত পার তার অন্ত করে মর কিন্তু একদিনের জন্তও তার মন পাবে না। ঢের ঢের লোক দেখেছি কিন্তু এমন ভেতর-গোঁজা মানুষ কখন দেখিনি। এ জন্মে আমার যেমন কষ্ট দিচ্ছেন, আর জন্মে তেমনি বেড় হয়ে সাপের মুখে পড়বেন।”

; ক্রমে মা-মী বলিল, তাহার পিতার সহিত মা-পানের যাইবার কথা আদৌ উঠে নাই। তাহাদের নৌকার লোক ঠিক হইয়াছে। স্তত্রায় তাহার স্থান সঙ্কলান অসম্ভব।

শেষে গলা চড়াইয়া বলিল “তোমার একটা বড় দোষ এই যে লোকে যে যা বলে তুমি তাই গ্রহণ বিশ্বাস কবো।”

নিকপায় ফো-লোন তজ্জ্বরীর নথ কামড়াইতে লাগিল। ক্ষণপরে বলিল “মং-মৌএর উপর তার খুব টান দেখতে পাই।”

“কেন হবে না? সে ত তোমার মত আহাম্মক নয়। কাল আমরা বসেছিলুম, মা-পানু আর আমি। মং-মৌ আসতেই মা-পানু বসে, আজ তুমি যাও। সেও তখন চলে গেল। একটু পরেই মা-পানু চোঁচিয়ে বসে, শুনে যাও, আমার মাথা খাও।—সে ফিরেও তাকাল না। তুমি কি মনে কর সে আর আসবে? যদিই বা আসে মা-পানু আর কক্ষণও বলবে না চলে যাও।”

“মং-মৌ নিশ্চয়, তাকে তুচ্ছ-গুণ করেছে। একখানা চিঠি দিলুম তার উত্তর পর্যন্ত দিলে না।” *

“তা জানিনে। তুচ্ছ-গুণ করলেও পচবার ভয়ে সে কাউকে জানাবে না। তবে এটা জানি যে মা-পানুকে চাব টাকা দামের একটা আঙুটি সে দিয়েছে।”

“আমিও ত তাকে ৩২ টাকা দিয়ে হার কিনে দিয়েছিলুম। কিন্তু এক-দিনও পরতে দেখিনি।”

“তোমাকে সে তার ভেড়ো ভাবে। তুমি মরদ নও, মিন্মিনে খোকা। মেয়েমাছুষে তোমার মতন লোককে ভালবাসতে পারে না।” মা-মী বিরক্তভাবে কলসী তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

এক বৃহদাকার প্রাপ্তবয়স্ক আটটি মহিষ ধীরে-ধীরে প্রদক্ষিণ করিয়া ধান মাড়াই করিতেছে। জীলোকেরা নূতন

* পত্রখানি এই:—

“দাস ফোলোন সর্বাঙ্গতঃকরণে মা-পানের সর্ববিধ মঙ্গল কামনা করি। সম্রাটের এই আদি যে দিন মা-পানুকে দেখেছি সেদিন থেকেই আমি মরে গেছি। বেশী আহার পেটে যায় না। মা-পানুকেই খালি খালি ভাবছি। পূর্বজন্মের কর্মফল সত্য সত্যই আছে নচেৎ মা-পানুকে দাস এত ভাল বাসিতে বাইবে কেন। বলি মা-পানুদাসের প্রতি এত বিশ্বাস কেন। কি করিলে দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে বল। মং-মৌই দাসের এই দুঃখের কারণ দেখিতেছি। দাস ফোলোন মা-পানু মহাশয়ের পত্রের আশায় রহিয়ায়। শীঘ্র শীঘ্র উত্তর লিখিয়া স্বীকৃতি করিও।

১২৭৭ খৃ। তারু ভায়ে লাহান ১৩ ম্যক।

সন ১২৭৭ নবী। কাঙ্ক্ষনের স্তম্ভপঙ্কের জ্যোতিষী।”

আট আনিয়া মহিষদের পদতলে ভূগির উপর রাখিতেছে। পুরুষেরা গান গাহিতে-গাহিতে খড়গুলি তুলিয়া লইতেছে। ফো-লোন গম্ভীরভাবে আসিয়া কাজে যোগদান করিল।

বাটা ফিরিবার কালে প্রধান (কো-মং-মৌ) মহাশয় বলিলেন—“অকারণ তোমরা আজ দেবী করলে। আমার সবগুলো আজ না করলেই হত—বাকীটা কাল ধরা যেত। খেতে কত দেবী হবে।”

মং-মৌ ফোলোনকে বলিল “কাল তোমাদেরটা ধরা যাবে।”

ফো-লোন—“যদি প্রধান মশায় অমুখ্যমতি করেন।”

“তা ত নিশ্চয়ই। এখন মা-পানের ওখানে যাবার নিমন্ত্রণ আছে। আজ রাত্রিরে তুমি আমার ওখানে এসো, ছবাজী খেলা যাবে। শোয়ে-টুনরাও যাবে।”

ঈর্ষায় ফুলিয়া উঠিয়াও ফো-লোন তাহাকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। মং-মৌ অসীম বলশালী। মৌনভাবে ভাবিতে-ভাবিতে সে গৃহমুখে চলিল। “নাঃ আর সহ্য হয় না। কাল সকালেই ঝাংখেইঙ এ গিয়ে উ-বৃ-নার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে আসবো। দেখি সে আমার বশ হয় কি না।”

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে একদিন জাতক সম্বন্ধীয় কথকতা শুনিতে বাইবার কালে ফোলোনের জননী পড়িয়া যান। ফলে তাঁহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়। ফোলোন তখন এক বছরের। তদবধি রক্তনাদি কোনও-প্রকার অমসাধ্য কার্য করিতে তিনি অক্ষম। বাটা ফিরিয়া ফোলোন উঠানের এক ধারে উঠান ধরাইয়া দিল। ঘরের মধ্যে রক্তন করা নিষিদ্ধ। প্রথমতঃ গৃহদাহের ভয়, দ্বিতীয়তঃ মাছভাজার গন্ধ অসহ্য। তবে বর্ষাকালের কথা স্বতন্ত্র।

পিতা পুত্রের ভোজন হইয়া গেলে, মাতার জন্ম ভাত বাড়িয়া রাখিয়া, দ্বিতলে গিয়া আলো জ্বালাইয়া, ফোলোন বেশভূষায় মনোনিবেশ করিল। উপরে দুইটি ঘর। একটি তাহার। ঈষৎ অন্ধকারময় ঘরটির ক্ষুদ্র জানালার পাশেই ঘন বাঁশঝাড়। আসবাবের মধ্যে হাত-খানেক উচ্চ একটি তক্তাপোষ, একটি সেগুন কাঠের বাস, দর্পণ হিসাবে বিস্কু-টের টিনের ডালা, মাছুর, বিলাতী কবল, কাঠের বালিশ ও মশারি। তক্তাপোষের নীচে বোটাওয়ালার পাতী কুমড়ার

• মত একটি বারিঙ্গ-করা কাঠের ডাবের বা বাস্ক। বাস্কের মধ্যে—উপরের থাকে, অর্থাৎ কানাওয়ালা ধালের মত গেবেতে, পানের সরঞ্জাম; নিম্নতলে গোটা পাঁচেক চুফট ও কয়েকটি টাকা পয়সা।

পান চিবাইতে চিবাইতে কাঠের সিঁড়ি ধরিয়া ফোলোন্ নীচে নামিয়া আসিল। মাতা তখন বারাণ্ডায় বসিয়া ধূম-পান করিতেছিলেন।

“আমি, মা-পানের ওখানে যাচ্ছি মা।”

“যাও বাবা, বেশী রাত কোরো না।”

ফো-লোনের মত স্বন্দর ঘুবা গ্রামের মধ্যে নাই। মা-পানুও তাহার তুলনায় কালো। মোটের উপর স্বস্ত্রী হইলেও মং-মো ঘেন গুণ্ডার মত। ফো-লোনের পরিধানে লাল রেশমী লুঙ্গি, বকের পালকের মত সাদা জামা, সোনালি রংএর রুমাল মাথায় বাঁধা। বাহারি চাদরের খোঁটে এক তাড়া চাবি—যেন তাহার কতগুণা বাস্ক দেয়াছে কত ধনরত্নই সঞ্চিত।

ফোলোন্ একাই চলিল। কিন্তু সেটা নিয়ম নয়। একজন বন্ধু গিয়া বাহিবে থাকা উচিত।

নিজের ঘরে বসিয়া মা-পানু কনিষ্ঠা সহোদরা মা-নুকে বারাক্ষর উপকথা শুনাইতেছিল। গল্পটি সবে মাত্র শেগ হইয়াছে, ফোলোন্ উপস্থিত হইল।

মা-নু উঠিয়া গেল।

“দাঁড়াও আলোটা জালি।” মুহূর্ত মধ্যে একটা ওয়াস-ল্যাম্প জলিয়া উঠিল। মা-পানের বেশ-ভূষাও চমৎকার। কবরীর গোলাপ দুইটির স্বাসে ঘর ভরপুর। মাতুরে বসিয়া ফো-লোন্ কাঠের রেকাবি হইতে এক খিলি পান তুলিয়া লইল। হাঁড়ির মত অস্ত্র একটো পায়ে গোটা দশেক চুফট ছিল—“শাদে” চুফটগুলি কলার বাসনায় মোড়া,

◆ দেখিতে ঠিক ছুআনা দামের কুল্লী বরফের খোলের মত।

ফো-লোন্ কহিল “এবার খুব ধান হয়েছে। অনেক বছর এমন হয়নি।”

“বাবাও সন্ধ্যার সময় তাই বলেছিলেন। আজ সকালে লাভো গাঁয়ের ফজল নৌকোষ যেতে তাঁকে বলেছে তাদের ওখানেও খুব ধান হয়েছে। তবে অনেক মোঘ গরু মবে যাওয়াতে অনেকের বড় কষ্ট হয়েছে।”

“হ্যাঁ, গেল বরষায় তাদের অনেক গরুটকু মরে গেছে বটে।”

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। কথাও খুঁজিয়া পাওয়া দায়। তৎপরে, মা-পানের পিতা একমাস পবে বেসিন থেকে কি কি দ্রব্য তাহার জ্ঞাত ক্রয় কবিয়া আনিবেন ইত্যাদি কথোপকথনে আরও পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

মা-পানু একটা চুফট তুলিয়া লইতেছে, ফো-লোন্ সহসা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। হাত ছিনাইয়া লইয়া মা-পানু ধাক্কা দিয়া ফো-লোন্কে ফেলিয়া দিল। “দূর হও—এখনি দূর হও বলছি।”

রাস্তা হইতে উপরেব বারাণ্ডার দিকে ফোলোন্ দেখিল, মা-পানু সরোষ ইঙ্গিতে তাহাকে প্রস্থান করিতে বলিতেছে। সভয়ে অফুট স্বরে, করজোড়ে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মা-পানু পক্ষী ফেলিয়া দিল।

অন্তদিন মাতাঠাকুরাণী অন্তরালে থাকিয়া পাণিপ্রার্থী যুবকের সহিত স্বীয় কন্ঠার কথোপকথন শ্রবণ করেন। আজ তিনি নিমিত্ত।

পুত্রের অপেক্ষায় জননী বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলেন। চোরের মত পুত্র তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

“কি হ’ল বাবা। আজ ভাল করে কথা কইলে?”

নিকটে বসিয়া ফোলোন্ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

ফোলোন্—“কো-মং-মের কাছে ওর বাবা বোধ হয় আমার নামে নালিশ করবে।”

“তা পাববে না। পাঁচজনে শুন্লে ওর মেয়েকেই দুষবে। অনেকেই মেয়েটার ওপর চটা।”

“কি করবো এখন কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

“ভেবে কি হবে যুগে যা। আরও অনেক মেয়ে আছে, তাদের কাউকে বিয়ে করিস।”

রাতে সে স্থির করিল পরদিন প্রত্যুষেই উ-বু-নার কাছে যাইবে। সাতটার সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। গ্রামের সকলে তখন মা-পানের পিতা মং-বু মহাশয়েব বাটীতে। আজ তাহার ধানমাড়াই হইবার দিন। এত বেলায় পলায়ন বড় শক্ত। বাড়ীতে আহার কবিয়া কাজে যাওয়াই স্থির হইল।

শোয়েটুন্ আসিয়া নিমজ্ঞ-বাড়ীতে তাহার অস্থপস্থিতির

কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফোলোন বলিল, অধিক রাতে শয়ন নিমিত্ত শরীর ভাল নহে। তাছাড়া অপব বাড়ীতে নিমন্ত্রণ থাওয়াও কি রকম ধাতে নয় না।

শোয়েটুন্ বলিল “মং-ব্য মশাই তোমাকে খুঁজছিলেন। তোমার বাবা আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।”

আত্মহা বা হইয়া ফোলোন বলিয়া উঠিল “দাদা, তুই ততক্ষণ চালকটা ধুয়ে ফেল ভাই, আমি ওপর থেকে ঘুরে আসছি!”

৩

কাক কোকিলও টের পাইল না, ফোলোন বশীকরণের ঔষধ লইয়া আসিল এবং পবনন্দনের মৃত্যুবাণ অপহরণের মত কৌশল করিয়া মা-পানের পানীয় জলে কিয়দংশ মিশাইয়া দিল। অল্পপস্থিতির কারণ অল্পসন্ধান করিয়া পাঁচজনে শুনিল, মাতার ঔষধ আনিতে সে উ-বু-নার কাছে গিয়াছিল। চণ্ড নামানো ও কবিরাজি চিকিৎসায় অনেক অর্থব্যয় হইল অথচ কি ছাই পাশ হইল তার ঠিক নাই। অগত্যা এই শেষবার তাঁহার শরণ লওয়া। মা ব্যতীত তাহার প্রাণের কথা দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না। শুনিলে সব পরিশ্রম পণ্ড হইবে।

দারুণ উত্তরে ফোলোন দিনমানটা কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যাকালে শোয়েটুন্ আসিয়া বলিল “চল হে, ছু বাজি খেলে আসা যাক!”

একথা মন্দ নয়। দু পয়সা আসিতে পাবে। প্রায় সব জমটাই ঔষধ কিনিতে খরচ হইয়াছে। ফোলোন স্বীকৃত হইল।

বড় ভুল কবিতা ফোলোন পকেটে ঔষধ লইয়া জুয়া খেলিতে গিয়াছিল, শয়ন-ঘরের চালে গুজিয়া রাখে নাই।

“হরিণ আমার” “মুরগী” “এবারও কুকুর ধলুম মোদাং ঠিক করে চেলে” ইত্যাদি কলরবে জুয়ার আড্ডা পূর্ণ জোয়ারে প্রবাহিত হইতেছিল, এমন সময় বন্ধুত্ব সেখানে অবতীর্ণ হইলেন।

“বস’ ওখানে—”

“হেঁ ত, কুকুর পড়েছে—বঁচে থাক মোর কুকুর!”

পয়সা বাহির কবিবাব সময় ফোলোন শিহরিয়া পকেটে

হাত গুজিয়া উপরে দৃষ্টিপাত করিল। মং-মৌএর চোখে তাহা এড়াইল না।

পান চুরট ও একটি মাটির পিকদানি ব্যতীত দুই ভাড়া তাড়ি, এক বোতল মদ ও ভ্রমণশীল একটি কাঠের ঘাস আসরে রক্ষিত। মংমৌ যতবার পরাজিত, তাহার নেশার মাত্রা ততই বদ্ধিত। পরবর্তী খেলায় ফোলোন জয়লাভ করিল। সকলের নিকট হইতে সাত আনা সংগৃহীত হইল।

“কেন বাবা মদ খেতে দোষ কি? কাল তোমার বাবা মং-লেট এসে হরদম টেনেছিলো, আর আজ তুমি সাধু বনছ মোনার চাঁদ!”

“আমি ওসব খাই না বলছি—মিছিমিছি বিরক্ত করো না, যাও।”

ফোলোন পুনরায় পকেট পরীক্ষা করিল।

“এ বাজি মঞ্জুব নয়, ও আগে কুকুর ধরেছিল।”

“কুকুর—ধ-বে-ছিলো! রাঙ্কেল, তখন যে ঘুটি গড়ায় নি, সঙ্গে সঙ্গেই ত তখনি বলেছিলুম পায়রা আমার।”

“মুখ সামলে কথা ক’—” বক্তা ঘুসি পাকাইল।

দুই হাতে দুই জনকে ধরিয়া মং-মৌ বিবাদ মিটাইয়া দিল।

ঝমালে টাকা পয়সা বাঁধিয়া ফোলোন বলিল “শোয়েটুন্, আগি ভাই উঠি, রাত হয়েছে, একটু দরকারও আছে।”

“জিতে যাওয়া হচ্ছে না চাঁদ, খেলো—”

“দাদার আজ পোয়া বাব। কেমন পয়া জায়গায় বসেছে!”—আধ ঘাস মদ নিঃশেষ করিয়া, আস্তে ফোলোনের কাঁধ চাপড়াইয়া মং-মৌ পুনরায় বলিল—“কোন বেটা আজ তোরে হারায় দেখি, তুই কত বড় চালাক!”

আরও কম বাজি হইল! সত্যি ফোলোনের পোয়া বার। অনুন আট টাকা জিতিয়াছে। মং-মৌ মদ খাইতেছিল, ফোলোন বিদায় প্রার্থনা কবিল।

“দাঁড়াও ভাই”—লাফাইয়া মংমৌ বলিল—“তোমাকে একটা মজা দেখাই”—আলোটা উল্কাইয়া—“ওই দেখ।”

চড়াই পাখীর বাসা বুজাইবার ক্ষণ ফোলোনের মাথার উপরে চালের বাতায় গোঁজা খানিকটা নেকড়া ছিল।

“ওটা কি জানো—আঁতুড়ঘরের কাপড়! হাঁ: হাঁ: হাঁ: হাঁ: যাহু, ভায়ার আজ সব তুকুগুণ মাটি। এইবার আর কি, পকেট থেকে ওষুধ-পত্ৰ ফেলে দাও।”

ফোলোনের মাথা ঘুরিতে লাগিল। পরসে বাঁধা রুমালের খেঁচি ধরিয়া, সঙ্গে সঙ্গে মং-মোর নাকের উপর মারিয়া, বারান্ডা হইতে সম্প্রদানে, প্রাণপণে সে দৌড়াইতে লাগিল।

“আজ তোর রক্ত দর্শন করবো দাঁড়া শুয়োঁর”—হোঁচট খাইয়া মং-মো সশব্দে পড়িয়া গেল। উঠানে একস্থানে রাস্তার পাথরকুচি ছিল। ফোলোন্ তখন বহুদূরে। মুহূর্তমধ্যে উঠিয়া, দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, অট্টহাস্যে নীরব রজনী কম্পাশিত করিয়া বলিল “বশ করবে শুয়োঁর—কেয়া মজা! হাঁ: হাঁ: হাঁ: হাঁ: হাঁ:—খালি খালি ওপর দেখা হচ্ছে! ওরে তুই ভারি ওস্তাদ, মনে করিস কেউ ধরতে পারছেননা।”

অবশিষ্ট তাড়িটুকুর সংকার হইল। তখন সেখানে জনপ্রাণী নাই।

সকালে আগুন পোহাইবাব সময় মাতাপুত্র কথ্য হইতেছে:—“কাল পালাবার সময় পকেট থেকে পড়ে গেছে, না হলে আজ মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তার গুণ ফিরিয়ে আনতুম। বেটার জন্ত সব মাটি হল।”

“তুই একটা আস্ত গাধা। ভয়কি, আগেকার ওষুধেই কাজ হবে। মা-পানু জল খেয়েছেত?”

“ই্যা তা খেয়েছে।”

“তবে আর কি? ওঝা মহাশয়ের কথামত আজ খামারবাড়ীতে কাজ করবার সময় বরাবর তার কাছে-কাছে থাকিস।”

“আমাব বড় ভয় করছে, বেটা নিশ্চয় আমাকে মেরে ফেলবে।”

“ধরতে এলে পালাস। তুই ত বলিস তুই তার চেয়ে দৌড়তে পারিস।”

“তার মতন চারটেই চেয়ে জোরে দৌড়তে পাবি।

কিন্তু আমায় ধরতে পাবলে-মেবে ফেলবে।

“আচ্ছা কাউকে বলিস তাকে আমার কাছে ডেকে দিতে।”

একটা কুকুর আসিয়া আগুনের কাছে বসিল।

“আর মা পানের কাছে থেকে কোনো ফল হবে না। মং-মো নিশ্চয় তাকে বলে দেবে।”

“দূর পাগল! আঁতুড়-ঘরের নেকড়ার নীচে বসে সকলেরই অপমান হয়েছে।”

“ঠিক বলেছো মা, আমি সে কথা একদম ভাবিনি।”

“ঐ মং-মো,—বোধ হয় শোয়েটুনের বাড়ীতে যাচ্ছে। লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে হাঁটছে—বেশ হয়েছে, তোকে আর মারতে পারবে না।”

“আমি একদম ভয় খাইনি”—তাহার উদ্দেশ্যে ঘুসি ছুড়িয়া—“ঐ দেখ কুত্তা যাচ্ছে—কুত্তা—কুত্তা।”

“ভয় খেয়েছে দেখচিস না, ফিরে দেখারও সাহস হ’ল না।”

“দেখো’না ওকে মজা দেখাচ্ছি, আগে রাত হোক। ইট ছুড়ে ওব মাথা ভাঙবো।”

দূর হইতে মং-মো তাহার আফালন শুনিতে পায় নাই বটে, কিন্তু পাশের বাড়ীর পাঁচজনের কর্ণকুহরে সে কথা আঘাত করিয়াছিল। একজন, কোমংগ্রে মহাশয় স্বয়ং। “কুত্তা বলে কে চোঁচাচ্ছিল—তুই? মং-মো কুত্তা?”

ফোলোনের মুখ সাদা হইয়া গেল। “খুব আস্তে বলেছি, সে শুনেতে পায়নি।”

“তুই ঘুসি দেখাচ্ছিল কেন?”

ফোলোনের ইচ্ছা হইল বলিয়া দেয় গতরাতে সে তাহার কি সর্বনাশ করিয়াছে। মুখে আসিয়াও কথা সরিল না। থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল “ভুল হয়েছে—আর করবো না।”

“পরশু বুড়ী তোকে গাল দিয়েছিলো বলে তুই আমার কাছে তাকে ডাইনী বলে নালিশ করেছিলি। তার দশ রেক জরিমানা হয়েছে। আজ যদি মং-মো নালিশ করে তোর ত্রিশ রেক জরিমানা করব।”

ফোলোন্ তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে সাবধান করিয়া প্রধান মহাশয় বাটী ফিরিলেন।

প্রধান মহাশয়ের বাটীতে সকলে আহাৰ কবিতোছে, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ফোলোন্ গিমি ঠাকরুণকে পরিবেষণে সাহায্য কবিতোছে। মং-মোকে একজন বহিল, “ফোলোন্

তোকে কুস্তা বলে গালি দিলে, ঘুসি দেখালে, আর তুই মুখ বুজে চলে গেলি !”

“কখন—কোথায় ?”

সব শুনিয়া মং-মৌ মিনিট খানেক ভাতের গ্রাস হাতে লইয়া ফোলোনের দিকে তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া রহিল।

“যদি শুনতে পেতুম ওর পিণ্ডি চট্‌কাতুম। আমার কান্নর সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না—ফের যদি বলে ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবো।”

মা-মীর হাত থেকে ‘ভাপির’ পাজ্জটা লইয়া ফোলোনের পরিবেষণ করিবার কিকিং ইচ্ছা হইয়াছিল। উপস্থিত সে সাধ মিটিয়া গেল। মা-পান মং-মৌএর কাছে গিয়া আদর জানাইয়া বলিল—“তুমি কাল আমার কাছে যাওনি—কেন যাওনি ?”

সর্ব-সমক্ষে মা-পানের একরূপ স্পর্ধাসূচক প্রশ্নের উত্তর দিতে মং-মৌ ইচ্ছুক নয়। পায়সানে পিঠা ডুবাইয়া বলিল “ইচ্ছা হয় নি ?”

বৃভীরা হাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে মা-পানের কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্ষণপরে ফোলোনকে ডাকিয়া, অমুরাগের অভিনয় করিয়া মা-পান কহিল “তুমি সকাল থেকে চুপ করে আছো, কান্নর সঙ্গে কথা বইছ না কেন।”

মং-মৌর দিকে নেত্রপাত করিয়া ফো-লোন কহিল “না, এই কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলাম।”

“আমার সঙ্গে আগেকার মত তুমি আর সেধে সেধে কথা কয়োনা।”

আহাৱাদির পর সকলের সঙ্গে মং-মৌ কর্মস্থলে চলিয়া গেল। শুবধের ফল ফলিল। গতরাত্রির জুয়া খেলার কথা সাবধানে অবতারণা করিয়া মা-পানকে ফোলোন জানাইল, তাহাৱ অমুমতি হইলেই টাকা আটটির সাহায্যে সাতনর আদিতে পারে। তবে বেশি ভিন্ন ভাল গহনার স্থবিধা হইবে না।

নিবাস ফেলিয়া মা-পান বলিল “এখনও একমাস।”

পুনশ্চ প্রধান মহাশয়ের বাড়ীতে সরগরম পড়িয়া গেল। কি সমাচার ? না দারোগা মং-পো-খিনু মহাশয় আসিয়াছেন। বাবাণ্ডায় গাছরের উপর তিনি উপবিষ্ট। পথে যাতায়াতের

কালে পথিক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে তাঁহাকে বন্দনা করিতেছে—কিন্তু সেদিকে তিনি বীতশ্রদ্ধ। পাখা হস্তে একজন তাঁহার পশ্চাতে বায়ু সঞ্চালনে রত।

ক্ষতপদে কর্ত্তামহাশয় আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। গ্রামের কথা উত্থাপিত হইলে, প্রধান মহাশয় বলিলেন, গ্রামের অবস্থা উপস্থিত ভাল। পুলিশের কঠোর শাসনে কোনওরূপ গোলমাল বা ডাকাতির নাম গন্ধ নাই। ‘রিপোর্টবুক’ ও দোয়াত কলম আসিল। কলম সরিল না। কলম ছুঁড়িয়া দারোগা মহাশয় বলিলেন “আমি লিখবো—সরকারি জিনিসপত্রে যত্ন করা হয় না।”

লেখনীটা প্রধান মহাশয়ের নিজস্ব। তাহা দারোগা মহাশয়েরও অবদিত ছিল না।

প্রধান মহাশয়—“এবার আসবার সময় গোটাছুই টাকা দিয়ে—দয়া করে একটা ভাল কলম যদি আনতে পারেন—অমুমতি হয় ত টাকা ছুটো—”

পকেটে টাকা রাখিয়া দারোগা বলিলেন “রাজকাৰ্য্যের বেজায় ঝঞ্ঝাট, তবে যদি মনে থাকে ত’ কলম আসবে। আর দামটাও ঠিক জানি না—বোধ করি এতেই হবে, কিছু বেশী যদি লাগে পরে দিলেও চলবে।”

প্রধান মহাশয়ের গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন “তু পয়সায় একজোড়া কলম পাওয়া—”

কর্ত্তার ধমকে গৃহিণী চুপ করিলেন।

প্রধান মহাশয় দারোগাকে বলিলেন “অমুমতি হয় ত আপনার কথামত আমি একবার লিপতে চেষ্টা করে দেখতে পারি।”

সেই কলমে হুটপুট ভুট্টার দানার মত স্পষ্টাক্ষরে লেখা হইল :—

“বারটার সময় মুখিটে আসিলাম। প্রধান মহাশয় বলিলেন গ্রামে ডাকাতি হয় নাই। দুইটার সময় গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম।

মং-পো-খিনু।”

চুরুট ধরাইয়া তিনি বলিলেন “শুনলুম জুয়া খেলে গ্রামটা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। যারা জুয়া খেলায় জিতেছে—এমন দুএকজনের নাম বলুন।”

শুভভাবে হাসিয়া প্রধান মহাশয় বলিলেন “অতি সামান্য

• মাত্র জুয়া খেলা হয়। জুজুরের দয়ায় সকলেই গরীব, হার
জিত বিশেষ হয় না।”

কর্মচ্যুতির ভয় প্রদর্শন হইল। অন্ততঃ একজনেরও
নাম বলা চাই।

“তা হলে ফো-লোন, মং-লেটের ছেলে। বেচারী
কিন্তু বড়ই গরীব।”

অচিরে মং-লেটের আবাসে ফো-লোনের অস্বীকারের
ক্রন্দনধ্বনির সহিত তাহার মাতার গালিবর্ণন হইতে লাগিল।
আধঘণ্টা পরে ফো-লোনের সিঁড়ের লুপী বগলে করিয়া
শান্তিরক্ষক মহাশয় বাহিরে আসিলেন। তাঁহার পকেটে
ফো-লোনের টাকার খলি। প্রধান মহাশয়ের সঙ্গে তিনি
তাঁহার গৃহে আহ্বার করিতে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে প্রধান মহাশয় বারাণ্ডার উপরে বসিয়া
আছেন। উঠানে চাটাইএর উপরে গ্রামের সকলে
উপবিষ্ট। ঘণ্টাখানেক পূর্বে শান্তিরক্ষক মহাশয় ঘুম
হইতে উঠিয়া গ্রামান্তরে গিয়াছেন। কর্তা মহাশয়
বলিলেন, তাঁহার সাধ্যমত তিনি করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে
ফো-লোনের নাম করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। তবে
ভগবান বুদ্ধের কৃপায় ও তাঁহার বিশেষ অহরোধে
ফো-লোন, সে যাত্রা-রক্ষা পাইয়াছে, নতুবা জেলে যাইতে
হইত। তাঁহার বার বার নিবেদন সত্ত্বেও সকলেই প্রায় জুয়া
খেলে। অতীব অস্বাভাবিক।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল।

ফো-লোনের খলিতে ২/১৫ ছিল। রাজকোষে সে
অর্থ জমা হইবে। আসিবার সময় ফো-লোন নিজের
লুপীটি স্বেচ্ছায় দারোগাকে পুরস্কার দিয়াছে তাই তিনি
তাহা লইয়াছেন।

পরদিন প্রাতে প্রধান মহাশয়ের বাটীতে সকলের
নিমন্ত্রণ হইবার পর সভা ভঙ্গ হইল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

ত্রিংশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দূরের পাল্লা

ছিপ্পান্ তিন-দাঁড়,
তিন্ জন্ মালা
চৌপদ্ দিন-ভোর
দ্যায় দূর পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপ ঝাড়
জঙ্গল, — জঙ্গল,
জলময় শৈবাল
পাল্লার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর আগছে,
বনহাঁস ভিম তার
শ্রাওলায় ঢাকছে।

চুপ্ চুপ্—ওই ডুব,
দ্যায় পান্ কোটি;
দ্যায় ডুব টুপ্ টুপ্
ঘোমটার বউটি।

বক্ বক্ কলসীর
বক্ বক্ শোন গো,
ঘোমটার কঁক বয়
মন উগ্ন গো।

তিন-দাঁড় ছিপ্পান্
মধুর বাচ্ছে,
তিন জন মালায়
কোন গান্ গাচ্ছে?

রূপশালি ধান বৃষ্টি
এই দেশে সৃষ্টি;
ধূপ্ ছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।

মুখ্-বাণি-মিষ্টিরে,
চোখ্-জুটি ভোমরা,
ভাব-কদমের—ভরা-
রূপ দ্যাখো তোমরা।

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হল গোখরী !

ডাকপাখী ওর লাগি
ডাক ডেকে হৃদ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম ।

ওর তরে মন্বরে
নদ হেথা চলছে,
জলপিপি ওর মুহু
বোল বুঝি বনুছে ।

আটকেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পর্শ,
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ ।

পান বিনে টোট রাঙা
চোখ্ কালো ভোমরা
রূপশালি-ধান-ভানো
রূপ দ্যাখো তোমবা ।

* * *

পান স্থপারি ! পান স্থপারি !
এই খানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শীর্ণি মেনে
চলুরে টেনে বইঠা হেনে ;
বাক সমুখে, মামনে কুঁকে,
বাঁঘ বাঁচিয়ে; ডাইনে ঝুখে,
বুক দে টানো বইঠা হানো
সাত সতেরো কোপু কোপানো ।

হাড়-বেকুনো খেজুবগুলো
ডাইনি ঘেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থমকে গেল ।
জম্জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল রাত্রি এল ।
ঝাপ্টা আলোয় চরের ভিত্তে
কিরছে কাঁরা মাছের পাছে,
পীব বদরের কুদ্বতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল গাছে ।

* * *

আর জোর দেড় জোশ,
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্ ভাই টান্ সব
নেই উৎকর্ষ ।

চাপ্ চাপ্ শ্রাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বইঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিল্ভিলে হাঁস তায়
-জল-গায় চড়ছে ।

ওই মেঘ জমছে
চল্ ভাই সমুদ্রে,
গাও গান দাও শিশ্
বক্শিস্ ! বক্শিস্ !

খুব্ জোর ডুব্ জল
বয় শ্রাত্ বিন্নবিন্ন
নেই ঢেউ কল্লোল
নয় দূর নয় তীর ।

নেই নেই শঙ্কা
চল্ সব ফুঁড়ি
বক্শিস্ টঙ্ক
বক্শিস্ কুঁড়ি

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়
ঝাউগাছ ছলছে
তোল-কলমীর ফুল
তজ্রায় ঢুলছে।

লকলক শর-বন -
বকু তায় মগ্ন,
চুপ্চাপু চারদিক
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক নিঃশব্দ
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্খান তিন-দাঁড়
চার জন যাত্রী।

* * *

জড়ায বাঁঝি দাঁড়ের মুখে
ঝাউঘের বীথি হাওয়ায় বুঁকে
বিমায বুঝি ঝিঝির গানে
স্বপন পানে পরাণ টানে।

তারায় ভরা আকাশ ওকি
ভুলোয় পেয়ে ধুলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মগ্ন ভরে।

* * *

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মাগিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথাই চাহি।

কোথায় এল নৌকোখানা
তারায় ঝড়ে হইরে কাণা
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে!

জলছে তারা নিব্ছে তারা
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,—
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
জোনাক যেন পদ্ম-হাবা।

তারায় আজি ঝামর হাওয়া
ঝামর আজি আঁধার রাত্রি,
অগুণ্টি অফুরানু তারা
জালায় যেন জোনাক-বাতি।

কালো নদীর দুই কিনারে
কল্পতরুর কুশ কিরে ?—
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
ফুল ফুটেছে মাগিক হীবে!

বিনা হাওয়ায় ঝিলমিলিয়ে
পাপ ডি মেলে মাগিক-মালা,
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক-জালা।

চোখে কেমন লাগছে বাঁধা
লাগছে যেন কেমন পাঁবা—
তারাপুলোই জোনাক হল
কিনা জোনাক হল তারা।

নিখব জলে নিজের ছায়া
দেখছে আকাশ-ভরা তারায়
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায়।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
শ্রোতের টানে কোন্ দেশেবে ?—
মরা গাঙ, আর হ্রদ-সরিত,
এক হয়ে যেথায় মেশেবে!

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় হ্রদ যে
নেই কিছুই ঠিক ঠিকানা
চোখ যে আলা রতন উছে।

* * *

আলোয়াগুলো দপ্দপিয়ে
জলছে নিবে নিব্ছে জলে
উজ্জ্বলস্বী জ্বিল মেলিয়ে
চাটছে বাতাস আকাশ-বোলে!

আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদ।
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা,
একলা ছোটে বনবাদাড়ে
ল্যাম্পো হাতে লকড়ি ঘাড়ে।

মাপ মানেনা বাঘ জানেনা
তুতগুলো তার সবাই চেনা
ছুটছে চিঠি পত্র নিয়ে
বুনবনিয়ে হনহনিয়ৈ।

বাঁশের ঝোপে জাগছে সাড়া
কোল-কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগছে হাওয়া জলের ধাবে
চাঁদ-ওঠেনি আজ আঁধারে।

গুস্তারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্কিরিতে
রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
ছিপ্ চলছে নিঝুম স্রোতে।

ফিরছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া
মাল্লা মাঝি পড়ছে থকে,
রাঙা আলোব লোভ দেখিয়ে
ধরছে কারা মাছগুলোকে।

চলছে তরী চলছে তরী
আর কত পথ? আর ক'খড়ি?
এই যে ভিড়াই ওই যে বাড়ী
ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাঁধা বট ওর পিছনে
দেখ্ছ আলো? ঐতো কুঠি,
ঐখানেতে পৌছে দিলেই
রাতের মতন আজকে ছুটি।

ঝাপ্ ঝাপ্ তিনখান
দাঁড় জোর চলছে
তিনজন মাল্লার
হাত সব জলছে;

গুরুগুরু মেঘ-সব
গায় মেঘ-মল্লার,
দূর পাল্লার শেষ
হাল্লাক মাল্লার।

ঐসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বর-পণ

টিপ্পনী।

আবশ্যের প্রবাসীতে সম্পাদক-মহাশয় বর-পণ লাঘবের একটা প্রতিকার কল্পনা করিয়াছেন। এখন বিবাহের হাতে ইংরেজী-শিক্ষিত বরের দর চড়া। কিন্তু কালে যখন পাশ-করা যুবা অনেক হইবে, তখন যেমন অল্প প্রবোধ বহু উৎপাদন-হেতু দরে সাচিব্য হয়, বরের দামও হটিয়া যাইতে পারে।

বর-পণ বলিলে বরের দাম বুঝায় না বটে, কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা টাকার পবিত্রাণ-অনুসারে রক্ষা করা হয়, তাহা প্রায় কেনা-বেচার তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়া। সে বাহা হউক, গত কয়েক বৎসরে অনেক বি-এ, এম-এ পাশ হইয়াছে। বরের বাজার গন্দা পড়িয়াছে কি? বোধ হয়, পড়ে নাই। কারণ পূর্বে যে কন্ঠার পিতা পাশ-করা জামাই খুজিতেন না, এখন তিনি খুজিতেছেন। উৎকল ও বিহারে বর-পণ ছিল না, বঙ্গের মতন ছিল না, এখন সে সে প্রদেশেও আরম্ভ হইয়াছে।

বর-পণ যোগাইতে গিয়া অনেক কন্ঠার পিতাকে কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, ধনাঢ্য ব্যতীত অল্পের পক্ষে ত্রাসেব কারণ হইয়াছে। সে বৎসর স্নেহলতার মৃত্যুর পর কাগজে মজলিশে বক্তৃতা-মঞ্চে একটা টিটিকার পড়িয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন সমাজ-পাপের প্রাণশক্তি হইয়া গেল, এখন পুণ্যের উদয় হইবে। সাত বৎসর পূর্বে আমি “বঙ্গদর্শনে” বর-পণ এড়াইবাব পথ খুজিয়াছিলাম। হিন্দু-সমাজের পূর্বব বিবাহরীতি রাখিয়া এক পথ দেখিয়াছিলাম, সেটা যুবাদের হাতে। ইচ্ছা করিলে ইহার বর-পণ-বিধি ভাঙিতে পারে, আর কেহ পারে না। স্নেহলতার মৃত্যুর পর যুবাдиগকে মাতাইয়া বর-পণ উঠাইয়া দেওয়ার বহু কল্পনা চলিয়াছিল।

যুবারা কিন্তু সে উদ্বেজনা তুলিয়া গিয়াছে, বর-পণ যেমন ছিল, তেমনই আছে।

বর-পণ একটা কুফল ফলিয়াছে। যিনি পণ গ্রহণ না করিয়া শিক্ষিত পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, তিনি স্বয়ং না হউন তাহার আত্মীয় স্বজন কাগজে-কলমে ঢাক-ঢোল

• পিটিয়া গগন ফাটাইতেছেন, অমকের বিবাহে বর-পণ চাওয়া কিংবা লওয়া হয় নাই। “হে মুঢ়, দেখ, বর-পণ না লইয়া কেমন হরষিত মনে নির্বিবাদে বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়াছে!”

* কিন্তু অল্পসম্মান করিলে দেখা যায়, যোগ্য ঘরে পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, যে ঘর হইতে বর বহু টাকা নিজের ঘরে আনিয়াছে। এখানে পণ-প্রার্থনা অনাবশ্যক হইয়াছিল। তথাপি শ্রাব্য জুটিয়া বিপ্লবের ক্ষতে লবণ-প্রক্ষেপ করিতেছে। পাপ যায় নাই; পাপ ঢাকিতে গিষা আর পাপ করা হইতেছে। পূর্বকালে আত্ম শ্রাব্য ও আত্ম-হত্যা সমান বিবেচিত হইত। এমন দানধর্ম পুণ্যকর্ম কদাচিৎ গোপনে অস্বীকৃত হইয়া থাকে। অত কথায় কাজ কি, যেখানে দানপুণ্য কিছুই নাই, গ্রন্থ ছাপাইয়া গ্রন্থকার নিজের প্রতিমূর্তি জুড়িয়া আত্ম ঘোষণা করিতেছেন!

এমন কালে বর-পণ কেহ উঠাইয়া দিতে পারে কি? ইয়ুরোপের “সভ্যতা” যেটা আমাদের চোখে নিত্য প্রতিভাত হইতেছে, সেটা ভোগেব সভ্যতা। এই সভ্যতা আমাদের সমাজ-দেহের মর্মে-মর্মে প্রবেশ করিতেছে। বিভব-প্রদর্শন ইহার বাহ্যবিকাশ। আমরা জনে-জনে মনে করি এক-এক রাজা। রাজার পক্ষে যাহা সাজে কিংবা সহজে জোটে আমরা তাহা চাই। আমরা পুত্রের বিবাহে স্বর্গের অপ সরা চাই, স্ববর্ণে ও রত্নে আপাদ-মস্তক-মণ্ডিত চাই, পুষ্পক-রথও একটা চাই। সঙ্গে সঙ্গে টাকাও চাই, নচেৎ রাজভোগ চলে না। বর-পণে বিবাহের ঘটা হইতেছে; জাঁকে বিবাহের কারণে বর-পণ বাড়িয়াছে। নিত্য আহার-ব্যবহারে জাঁক; বিবাহে জাঁক আর আশ্চর্য্য কি?

বর-পণ-অত্যাচারের ইহাই একটা কারণ নহে। কন্ডার পিতামাতা উত্তম-কুলজাত স্থূল বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ধনাঢ্য জামাই আকাজ্জক করেন। ইহা স্বাভাবিক। একটা সংস্কৃত শ্লোকে আছে, কন্ডা বরের রূপ, মাতা বিদ্বৎ, পিতা বিদ্যা, বহুজন (আজিকালির ভাষায় কুটুম্ব) কুল, এবং অল্পজন মিষ্টান্ন চায়। এরূপ জামাই জোটা বহু ভাগের ফল বই কি? ইহাব নিমিত্ত অর্থ-ব্যয় অপব্যয় নহে। পিতার বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্র হয়, কন্ডা হয় না। সে কন্ডাব স্ব-বিধানেন নিমিত্ত বিষয়-সম্পত্তি কিছু দাম অবশ্য কি?

আমরা পুত্রের শিক্ষা ও শীলতার প্রতি যত মনোযোগী, কন্ডার প্রতি তত নই। ফলে যোগ্য পাত্র যত মেলে, যোগ্য পাত্রী তত মেলে না। ইহার উপর পাত্রী যদি তেমন স্বরূপ না হয়, তাহা হইলে বিবাহ-সম্বন্ধ দুর্ঘট হইয়া উঠে। এখন বরের পিতাকে টাকার তোড়া দেখাইয়া ভুলাইতেছি। বর-পণ না থাকিলে এমন কন্ডার গুণাঙ্কিত বর পাওয়া যায় না। মনে করুন, বিবাহে টাকা-পণ উঠিয়া গেল। আপনি কন্ডার পিতা; তেমন আরও অনেক পিতা আছেন। অন্তকে কন্ডা-দায় হইতে উদ্ধার না করিয়া আপনাকে কেন করা হইবে? ইহার এক উত্তর, টাকা। টাকা অপেক্ষা প্রেয় দেখান, স্থলভ প্রেয় দেখান। টাকাই যে পুরুষার্থ।

দানে পুণ্য, একথা সর্ব ধর্মেই আছে। হিন্দুধর্ম বলে, দানের মধ্যে কন্ডা-দান শ্রেষ্ঠ। ইহা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৃহস্থশ্রমের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ না থাকিলে, যাহাতে সে আশ্রমের স্থিতি, তাহাতে সন্দেহ আসিতে পারে না। পরাক্রম দ্বারা বিবাহযোগ্য কন্যা লাভ হইতে পারে। কিন্তু তাহা অস্ব-সমাজে, আমাদের সমাজে নহে। আমাদের সমাজে কন্ডার পিতা কন্ডা দান না করিলে, বিবাহে সম্মতি না দিলে, বিবাহ হইতে পারে না। রূপবতী গুণবতী স্থূলী সালঙ্কতা কন্ডাদানই দান। যে দ্রব্যের আদর নাই, তাহার দানে পুণ্যও নাই। কারণ তাহা স্থলভ। কন্ডার প্রতি আদর-মমতা পিতামাতার যেমন, অন্তের তেমন নহে। পিতা সে মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেও মাতা পারেন না। কন্ডা যে মাতৃ-স্বরূপ; সে যে মেয়ে। এমন মেয়েকে যথাসাধ্য সালঙ্কতা না করিয়া কোনো মাতা পরের ঘরে যাইতে দিতে পারেন না। কারণ কন্ডা নিরাভরণ গলে মাতার সম্মান-লাভ হয়; স্বশুর বাড়ীতে কন্ডাকে দুর্বাক্য বা অনাদর সহিতে হইবে, এই আশঙ্কা নহে; কন্ডা আদরের, পুত্রার যোগ্য বলিয়াই কন্ডাকে মাতা সাজাইয়া পাঠান। মায়ের বাড়ীতে কী স্বচ্ছন্দে কুবশে থাকিতে পারে; কিন্তু স্বশুর-ঘরে সেখানে লক্ষ্মী-স্বরূপ হইতে হইবে সেখানে অলক্ষ্মীর বেশ কিছুতেই সাজে না। সাজা-না-সাজা লোকের কথা নয়; মাতৃস্বের কথা। দুঃসিং-বেশা নিরাভরণ কন্ডাদান অসম্ভব।

ঠিক এই কারণে কন্যাকে ঘোঁতুক দিতে হয়। অন্তের ঘরে, যাহাকে জ্ঞান না তাহার ঘরে, যে গৃহলক্ষ্মী হইতে যাইতেছে, তাহাকে গৃহস্থের যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য নিশ্চয়ই চাই। এই যে দ্রব্য-সম্ভার যাহা পিত্রালয় হইতে কন্যা লইয়া যায়, তাহাতে তাহারই অধিকার, শ্বশুরালয়ের কাহারও নহে। অতএব ইহা ঘোঁতুক। কন্যার অলঙ্কার যেমন ঘোঁতুক, অপর দান-সামগ্রী যেমন ঘোঁতুক, যাহা বর-পণ নামে দান বা উৎসর্গ করা হয়, তাহাও তেমন ঘোঁতুক মনে করিতে পারিলে বর-পণের অত্যাচার থাকিত না। কন্যার সংসারযাত্রার সম্বলের নাম ঘোঁতুক। কন্যাকে ঘোঁতুকদান হিন্দুধর্মে প্রসিদ্ধ আছে।

বাধা এই, বরের পিতা পণ বলিয়া গ্রহণ করেন, ঘোঁতুক স্বীকার করেন না। পণের টাকা তাহার। মূলে বরের; কিন্তু বর পায় না, পিতা আশ্রয় করেন, আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করেন, হয়ত স্বীয় কন্যার বিবাহের ব্যয় পুত্রের পণ হইতে নির্বাহ করেন। এইটাই কু। বরের পণ, না বরের পিতার পণ? বর ধনুক-ভাঙ্গা পণ করিতে পারে; কিন্তু সে পণে পিতার অধিকার কোথায়? পিতা পুত্রের বিবাহ নির্বাহ করিবেন। না করিলে তাহার ধর্মহানি হইবে, বংশের পিণ্ড লুপ্ত হইবে। পিতা পুত্রের ভরণপোষণ করিবেন, পুত্রকে শিক্ষিত করাইবেন, বিবাহিত করাইবেন। পুত্রের গৃহস্থান্ত্রে প্রবেশের পূর্বে যত কিছু কার্য, পিতার কার্য, পিতার কর্তব্য। ঋণগ্রাসে-পর্যন্তে ঋণ করিতে হয়, পিতা করিবেন; বিবাহে চর্যাচোষালেম্বপের দ্বারা জ্ঞাতিকুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইতে হয়, তিনি করাইবেন; বিষাল্লিণ বাজনা বাজাইতে হয়, তিনি করাইবেন। ইহার নিমিত্ত ঋণ করিতে হয়, ঋণের দায় তাহার, পুত্রের নহে। কারণ বিবাহের ঘট্য তাহার সম্বোধ, তাহার ধ্যান্তি; পুত্রের নহে। এ স্থলে যে পিতা পুত্রের অর্জিত পণ আশ্রয় করেন, তিনি পিতৃধর্মে বঞ্চিত। তাহাকে কুপিতা বলিতে পারা যায়।

তিনি কুপিতা; কারণ তিনি পুত্রকে বিক্রয় দ্রব্য মঠে করেন। তিনি পুত্রের ভক্তি-স্রীতির মর্ঘাদা রক্ষা করেন না। তাহার ইচ্ছা পুত্র-বিবাহ কবে, পুত্রের কর্তব্য

তাই। কিন্তু পিতা নিজের ধর্ম পালন করেন না; তিনি অধার্মিক। পুত্রের অর্জিত ধনে পিতার অধিকার আদৌ নাই, থাকিতে পারে না।

কন্যার পিতা কন্যা-দান করেন; বর সে দান গ্রহণ করে, বরের পিতা করেন না। পিতৃহীন বরের বিবাহ হয়; কন্যার পিতা বর্তমান না থাকিলে কন্যার মাতা কিংবা অন্য অভিভাবক কন্যা দান করিতে পারেন। অতএব দান, দাতা, ও গ্রহীতার মধ্যে বরের পিতার স্থান নাই। অথচ তিনি যে বর-পণ আদায় করেন, সেটা তাহার দালালি, পুত্রসম্বন্ধে দালালি পিতার গহিত।

কন্যার পিতা উপবাসী ও শুচি হইয়া পিতৃ পিতামহাদির শ্রাদ্ধ করিয়া নারায়ণ-সাক্ষী রাখিয়া বরকে কন্যা দান করেন; এমন দান করেন যে কন্যার আলেয়ে গিয়া দান-প্রতিগ্রহের আশঙ্কায় অন্ন পরিস্রব স্পর্শ করেন না। বরও শুচি হইয়া নারায়ণ সাক্ষী করিয়া কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে। দাতা বড়, না গ্রহীতা বড়? নিশ্চয়ই গ্রহীতা বড়। যে-সে ভাল মন্দ দান করিতে পারে। কিন্তু যে-সে গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব, “হে বর, হে শ্রেষ্ঠ, হে বরণ্য, তুমি কন্যাগ্রহণ করিয়া তোমার পিতাকে চরিতার্থ কর, তুমি তাহার ধর্ম-পালনের সহায়; তুমি পূজ্য, উদার-চরিত, তোমাকে নমস্কার।” এহেন বর, যাহাকে কন্যা বরণ করিয়াছে, তাহাকে অদেয় কি আছে? কন্যার সহিত আরও কিছু প্রার্থনা করিলে কন্যার পিতার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যাহার গৃহে অতিথি উপস্থিত হয়, তিনি যেমন জ্ঞাত্য, অতিথিও তেমন পূজ্য। অতিথি পূজ্য গ্রহণ করিয়া গৃহীকে ধন্য করেন; কন্যা গ্রহণ করিয়া বর কন্যার পিতাকে তেমনই ধন্য করেন। অতিথি এক দিনের; কন্যার পতি নববধূকে চিরদিনের তরে গন্ধীষে বরণ করেন।

বড় কে? দাতা না গ্রহীতা? লোকে ব্যাপারটা তলাইয়া বোঝে না। বুঝিলে দেখিত, কন্যা ব্যতীত অর্থ প্রার্থনা করিয়া বর নিজেই কতখানি অপদস্থ করে। অতিথি কি কিছু চাহিতে পারে? যাহার আশ্রয় সন্দেহ আছে, তিনি কি তাহা সহজে খব করিতে পারেন?

আর, ঘাইার সে জ্ঞান নাই তিনি অতিথি নন, বরও নন। দাড়া ও গ্রহীতার মধ্যে কে বড়, তাহা বলা অসাধ্য।

এহেন সম্বন্ধকে বরের আধারিক পিতা বুঝিতে পারিবেন

কি? তিনি পুত্রের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন কি? যে পুত্র বধূকে অর্ধাঙ্গিনী করিতে প্রস্তুত, যাহাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, স্বখে দুঃখে যে চিরসঙ্গিনী, যে কর্মে বধূর মনে কষ্ট হইতে পারে, সে কি সে কর্ম করিতে পারে? স্বীয় পিতামাতার অপমানে যেমন দুঃখ, পিতৃমাতৃতুল্য শ্বশুর-শাশুড়ীর অপমানেও বরের তেমন দুঃখ। যদি দুঃখ বোধ না করে, তাহা হইলে সে পত্নীর পতি হইতে পাবে নাই। পতি-স্বীকার কি যেমন-তেমন কর্ম? আর পত্নী-স্বীকারই কি যেমন-তেমন কর্ম? স্বামী বড়, না জায়া বড়? স্বার্থত্যাগে কে বড়? এ প্রশ্নের উত্তর নাই।

কথাটা যদি এমন, তবে যুবারা, শিক্ষিত যুবারা, পণগ্রহণে আপত্তি করে না কেন?

ইহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটা প্রধান। মানুষে দেবত্বের বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু পশুত্ব একেবারে লুপ্ত হয় নাই। লুপ্ত হইতে পারে না; কারণ লুপ্ত হইলে মানুষ-স্বষ্টিও লুপ্ত হইবে। পশু-সমাজে দ্বিবিধ বিবাহ দেখা যায়; কন্যা স্বয়ম্বরা হয়, অল্প বয়সে বলপূর্বক কন্যা হরণ করে। বলপূর্বক কন্যা-বিবাহ আত্মর-বিবাহ নামে খ্যাত। দানব-সমাজে এই বিবাহ ছিল। ইহা বীরোচিত বিবাহ। দয়া-দাক্ষিণ্যহীন মানুষ-সমাজে অদ্যাপি অল্পপ্তি হইতেছে। যেখানে কন্যা স্বয়ং পতি বরণ করে, যেখানে বরং বরয়তে কন্যা, সেখানে প্রকৃতির গুঢ় অভিপ্রেম সিদ্ধ হয়। কারণ, কন্যা স্বয়ংবরা হইলে কাপুরুষের বিবাহ অসম্ভব হয়; কদাকার গুণহীন যুর্বর, বিকলাঙ্গের, রুগ্নের, বিবাহও অসম্ভব হয়। ইয়ুরোপে কন্যা স্বয়ম্বরা হয়; সে দেশে সৈনিক বীরের বিবাহ না কি সহজে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে কন্যা স্বয়ম্বরা হয় না, বীরেরও সমাচার পাওয়া যায় না। কিন্তু তা বলিয়া বিবাহের আত্মরিক ভাব লুপ্তও হয় নাই। “বঙ্গদর্শনে” তাহা দেখাইয়াছি। ইহারই একটা বিকাশ, কন্যার পিতার নিকট বরের পণ-প্রার্থনা। যে-সে পণ চাহিতে পারে না। শৌর্য, বীর্য, যাহার আছে, সেই পারে। অ-কৃতি অধমকে কন্যা ক্রয়

করিতে হয়; কৃতীকে কন্যা-সহ অর্থদ্বারা ভুট্ট করিতে হয়।

কথাটা আর একটু বিস্তারিত করা যাউক। যৌবন-কাল বিবাহের কাল। কত বয়স পর্যন্ত যৌবন, সে বিচারে কাঙ্গ নাই। যৌবনের বহু দোষ ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু বহু গুণও আছে। যৌবনের বিকাশে মানুষ নিজেই অল্পভব করিতে আরম্ভ করে। আত্মপ্রকাশ ইহার প্রধান লক্ষণ। তখন বাহ্যপ্রকৃতির সহিত বোঝা-পড়া শুরু হয়। মনে কবিত্ব আসে, ধর্মজ্ঞান প্রথর হয়, উৎসাহ ও তেজ চোখে ফুটিতে থাকে। যুবার তুল্য সদাশয়, প্রেমিক, ও বীর অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

এমন যুবা যে পরের তরে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, সে ভাবী শ্বশুর পীড়ন করিয়া পণ আদায় করিতে পারে কি? সে নব-বধূব খেদের কারণ হইতে পারে কি? যদি না পারে, তবে পণের নামে বাঁকিয়া বসে না কেন? বিবাহের পূর্বে মাতাকে বলে না কেন? স্নেহলতার আত্মহত্যা তাহার মনে জাগে না কেন?

ইহার অনেক কাবণ আছে। যুবা গুরুজনকে ভক্তি করে; তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত কিছু বলিতে কিংবা করিতে পারে না। নিজের বিবাহের কথায় লজ্জা বোধ করে; কারণ সে যুবা, অবিবাহিত। কেহ-কেহ বর-পণ লইতে দেখিয়া দেখিয়া উহাব দোষ উপলব্ধি করিতে পারে না। কেহ হয়ত নিজের ভগিনীর বিবাহে অত্যাচার সহিয়াছে, এখন প্রতিশোধের স্বযোগ ছাড়িতে পারে না। হয়ত সংসার সচ্ছল নহে, উপস্থিত অর্থ-লোভ ত্যাগও করিতে পারে না। আর ইহাও সত্য যুবা হইলেই যৌবনোচিত সারল্য সকলের থাকে না।

কিন্তু একটা গুরুতর কারণ আছে। যুবা সংসারের গণনায় উদার-চেতা, করুণ-হৃদয়, পৌরুষ বটে; কিন্তু যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠায় বাধা হয় সেখানে নহে। যৌবনের ধর্মই এই। সে যে এত পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে; হৃৎ একটু আসিবে বই কি। তাহাকেই যে বর করিতে চাহিতেছে, কন্যা লইতে টাকা লইতে সাধিতেছে; সাধিবার কথাই ত বটে। তাহার তুল্য যোগ্য বর আর কে আছে। শ্বশুর-টশুর কে জানে; ইনি তাহার গৌরব না বোঝেন, উমি বুঝিবেন।

যুবা আত্মাভিমানী। মিথ্যা হউক সত্য হউক, অপমানের লেশ সহিতে পারে না। কারণ সে যুবা, সেই পৃথিবীর রাজা। প্রকৃতিদ্বারা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত।

যুবার কৃতকর্মের বিচারের সময় বৃদ্ধ মনে করেন, সে তাহার তুল্য বৃদ্ধ, শিষ্ট, শাস্ত। তাহার তিতিক্ষা আছে, যুবার না থাকে। সে বৃদ্ধ বিজ্ঞ নহেন, নিজের যৌবন দণ্ড ভুলিয়া গিয়াছেন। বালক চঞ্চল, যুবা দুর্দান্ত, প্রৌঢ় সংযত, বৃদ্ধ স্তম্ভ—প্রকৃতির নিয়তিই এই; নতুবা নূতন সৃষ্টি আবশ্যক।

বিজ্ঞ জ্ঞানেন, যুবাকে দুর্দান্ত রাশিলে তাহার অহিত হইবে। মহাবেগ, প্রচণ্ডতা কুত্ৰাপি হিতকর নহে। যৌবনের প্রাবল্য-দমন কর্তব্য। সেকালে যুবাকে কায়েন মনসা বাচা ব্রহ্মচারী করিয়া রাখা হইত। ব্রহ্মচর্যের পর দার-পরিগ্রহ। তখন যৌবনের আত্মাভিমান নাই; আত্মকাম দণ্ড অতীত হইয়া পরকাম দণ্ডের উদয় হইয়াছে। শাস্ত্রে কন্যাদানের ও বধূগ্রহণের তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়াছে।

একালে ঘরে বাহিরে কত অলঙ্কিত সামাজিক রীতি যৌবনকে সংযত করিতেছে। যে যুবা কলেজে ঢুকিয়াছে, সে অদৃশ্য সূত্র-জালে বদ্ধ হইয়া, দুর্দান্ত অশ্ব যেমন শিক্ষিত হয়, তেমন সংযতগতি হইতেছে। কিন্তু এই পর্যন্ত। বর্তমান ইংরেজী শিক্ষার একটা মহৎ দোষ এই যে ইহা মনের কষ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, সংবীজ বপন করে না। বন ভাঙ্গিয়া আবাদ করে, কিন্তু কি-সে সোনা ফলিবে, তাহার উপদেশ করে না। বুদ্ধি মার্জিত হয়, কিন্তু ধর্মান্তরজ্ঞান-দানের চেষ্টা করা হয় না। যুবা সব শেখে; শেখে না গৃহী হইতে। ইহাতেও যে যুবারা এক রকম মাছুষ হইতেছে, ইহা পূর্বজন্মের বহু স্মৃতির ফল।

এমন অবস্থায় যুবাদিগের দ্বারা সামাজিক সমস্যার কি সমাধান হইতে পারে? যুবা হইলেও বালক, যাহার বুদ্ধি স্থির হয় নাই, ধর্মান্তরবিশিষ্ট দৃঢ় হয় নাই। বিবাহ করে, কিন্তু চোখ-কান বুজিয়া করে; কি করিতেছে, কেন করিতেছে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া করে। একটা অস্পষ্ট আবছায়া মনে ভাসিতে থাকে; একটা স্বপ্নরাজ্য বয়সা করে, যেটা দুই দিনের আগরণে অদৃশ্য হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবৃত্তির বিরোধে সমাজ-দেহ ক্ষত-

বিস্তৃত হইতেছে। এক স্থানে নহে, দুই স্থানে নহে। যাহার বহু স্থানে ক্ষত সে ত আত-নাদ করিবেই। কন্যার পিতাকে উৎপীড়িত করিয়া মনে করিতেছি কুলধর্ম রক্ষা করিলাম; ধনেই কুলীন হইতেছি নবধা কুললক্ষণ অস্বীকার করিতেছি; সহস্র-বিষয়ে অ-হিন্দুর ধর্ম অচুচান করিয়া হিন্দু ও আর্থ নামের পতাকা উড়াইতেছি। কাহার সাধ্য এই শ্রোত প্রতিরোধ করে। যাহার মূলে ভোগ লালসা, স্বল্পে অর্থনীতি, শাখায় বিভব-প্রদর্শন, তাহার ফলেও নিঃসার কিন্তু ক্ষীণ পীতবর্ণ বিলাতী কুম্ভাও হইবে।

বর-পণের বিশ্লেষণ করিলাম; উহার পরিবর্তনের কৌশলপ্রদর্শন আমার কর্ম নহে। হিন্দুর বিবাহ পূর্ব পথে চালাইতে কেহ পারিবে না বলিয়া বোধ হয় না। বর-পণের অত্যাচার-নিবারণ সভা-সমিতি করিতে পারে না। এক পারেন প্রবল রাজা; আর কেহ পারেন না। সংসারে দুঃখের অভাব নাই। কন্যা দায়ও একটা দুঃখ থাকিবে।

আশা এই, দুঃখটা অধিক কাল থাকিবে না। কন্যা-দায় অর্থে কন্যা-দান, কন্যাকে যৌতুক দান। যদি ইহা দুঃখ বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ কন্যার বিবাহ দিবে না, দিতে পারিবে না; কেহ বা বিবাহ করিবে না, জনক হইয়া কন্যা-দায়-দুঃখে পড়িবে না। অর্থাৎ সমাজে অনুচা নারী কিছু থাকিবে, অনুচ নরও কিছু থাকিবে। হিন্দু-সমাজ প্রায় যাবতীয় পুত্রকন্যার বিবাহ বিধান করিয়াছিল। ইহাব অভিশ্রাব স্পষ্ট। সে বিধান ভঙ্গ হইলে সমাজ কি রকম দাঁড়াইবে, তাহার বিচারে কাজ নাই।

কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িতেছে। কন্যা-শিক্ষাও কিছু চলিতেছে। কিশোরীর বিবাহে ভাবী বর-সম্বন্ধে কন্যার মতামত জ্ঞানও আবশ্যক হইতেছে। পূর্বে বর-পক্ষ কন্যা দেখিত; কন্যা-পক্ষ বর দেখিত, কিন্তু কন্যা স্বয়ং বর দেখিত না, স্বয়ংবরা হইত না। বোধ হয়, এখন ইহার একটু পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে। যাহাতে কন্যাও বর দেখিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা কর্তব্য হইয়াছে। ইহার অল্প ফল যাহাই হউক, একটা এই হইবে যে-সে যুবা, শিক্ষিত হইলেই, নির্বাচিত হইবে না। তখন যুবাযাত্রাই বর সন্ধিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, বরের পিতার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

হিন্দুসমাজের বিবাহ প্রাজ্ঞাপত্য বিবাহ, স্বয়ম্বর বিবাহ নহে। স্বয়ম্বর বিবাহ ও গান্ধর্ব বিবাহ প্রায় এক। গান্ধর্বাদ্যে রত গান্ধর্ব সমাজে যে প্রকার বিবাহ ছিল, তাহা গান্ধর্ব বিবাহ। ইয়ুরোপের বিবাহ গান্ধর্ব বিবাহ। আমাদের দেশে কোল সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে আছে। নৃত্যগীতের সময় কিশোর কিশোরী, ইয়ুরোপে যুবক যুবতীর, বিবাহ-প্রসঙ্গ হয়। হিন্দু বিবাহের অভিপ্রায় প্রজ্ঞা-বুদ্ধি, বিশেষতঃ পুত্র-লাভ। ইহা সিদ্ধ করিতে যে সকল বিধি নিষেধ প্রচলিত ছিল, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

এখন সে উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হওয়াতেই বর পণ অত্যাচার-বিশেষে গণ্য হইতেছে। নতুবা বর-পণ থাকিত না, থাকিলেও সে জন্ত কাতরোক্তি শোনা যাইত না। তথাপি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার তুল্য হিন্দু-সমাজেই আর এক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। এখন শিক্ষিত সমাজে বাল-বিবাহ নাই, কিশোর-বিবাহও নাই, যুবা-বিবাহ চলিতেছে। কলেজে পঠদশায় যুবার বিবাহ হইতেছে। কিন্তু ইহারও অতিক্রম আরম্ভ হইয়াছে। পাঠ সাঙ্গ করিয়া অর্থোপার্জনে সমর্থ না হইলে যুবা আর বিবাহে সম্মত হইতেছে না। এটা শুভ লক্ষণ। কারণ যে যুবা সংসারের কঠোরতা উপলব্ধি করিয়াছে, ভবের হাটে নিজের দব বাচাই করিয়াছে, সে আর কোন্ মুখে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করিবে, কোন্ বুদ্ধিতে বাবার দালালি মানিতে পারিবে? যে পিতা কন্যার বিবাহে দুই পাঁচ হাজার খরচ করিতে পারেন, তাহার ধন-কড়ি আছে, কন্যাও ধন ও অভিমানে লালিতা হইয়াছে। সে কন্যা বধূরূপে আনিতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে হইবে। বরের নিঃস্ব পিতা এত মূর্থ হইলেও পুত্রের বোধশক্তি ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া দিবে। বুঝাইয়া দিবে, যে বধু স্বামী গৃহে অনাদরে পণ্যসরূপ আসে, সে গৃহের মঙ্গল নাই। সে বধু স্বস্তর-শাশুড়ীকে আপনার মাহুম, পূজ্য দেবতা মনে করিতে পারে না। স্বামীকেও পারে কিনা, সন্দেহ। যে শাশুড়ী হেলায় বউ পাইয়াছে, সে শাশুড়ী সে বউকে হেলা করিবেই। দুই পক্ষে যেখানে এমন ভাব, সেখানে গৃহের স্বস্থশান্তি অচিরে পলায়ন করিবে।

আরও কথা আছে। যে যুবা বিবাহ করিতে টাকা লইয়াছে, তাহার কন্যার বিবাহের সময় আগত। পূর্বে কুলীনের পণ ছিল, এখন ইংরেজী পাশের পণ। এই পণ দুই পুঁজু পা দিতেছে। সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে বিবাহযোগ্য কন্যার পিতা বিপন্ন হইয়াছেন, তাহার দুঃখে দুঃখী পাওয়া যায়। কিন্তু একথা ঠিক, তাহার নৌহিন্দীর বিবাহের সময় পাওয়া যাইবে না। তখন জামাইএব পিতা চিন্তিত হইবেন, না জামাই নিজেই হইবেন? ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া এই খানে হইবে।

আর এত চিন্তার প্রয়োজনই বা কি? বর ক্রমশঃ সাচিয়া হইবেই। কোড়া উঠিবার সময় ব্যথা হয়, পবে শূখাইয়া কিংবা কাটিয়া যায়, ব্যথা থাকে না। পাশ-করা বর খুজিতেই হইবে, এমন কথা কি আছে? পাশ করিলেই যুবা সাধু হয় না, স্বশীল হয় না। কন্যার চিরায়তির নিমিত্ত টাকারও প্রয়োজন হয় না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পরগাছা

(৩২)

নারায়ণদাসীর বাক্যস্বরূপ অস্থির হইয়া যখন রাখাল একটা চাকরীর জন্ত দেশবিদেশের পরিচিতদের খোসামোদ করিয়া চিঠির পর চিঠি লিখিতেছিল, তখন একদিন স্বধোগ তাহার ঘরের দ্বারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন একখানা বজরা আসিয়া গোসাঁইগঞ্জের ঘাটে লাগিল, তাহার চড়নদার একজন ইংরেজ। একে বজরা, তায় ইংরেজ সওয়ারী, দেখিবার জন্ত ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ গঙ্গার ঘাটে মেলা লাগাইয়া তুলিল। কেবল যায় নাই যণিমালা—তাহার বাপের অমন কত বজরায় সে নদীতে নদীতে বেড়াইয়াছে, কত ইংরেজ তাহার বাপের দরবারে আসা-যাওয়া করিয়া থাকে। আর যায় নাই রাখাল—পাহাড়পুরে স্বস্তর-বাড়ীতে সে বজরা ও ইংরেজ দেখিয়াছেও বটে, আব তাহার সামান্য বিষয়ে চঞ্চল হইয়া উঠা স্বভাব নয় বলিয়াও বটে। পাড়ার লোকদের কাছে

ইহা কিন্তু অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। সকলে যখন দেখিল যে তাহারা ছজন ছাড়া সবাই আসিয়াছে তখন কাঙালী-বলিয়া উঠিল—রাজাগিরির গরম!

ইংরেজটি বজরার সামনে দাঁড়াইয়া ডাঙার লোকদের জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের এখানে ফার্সী-জানা লোক আছে?

ফার্সী? নিজের ভাষা বাংলাই পড়িতে জানে না কেহ, তার আবার কোন সাত সমুদ্র তের নদীর পাবের ভাষা ফার্সী পড়িতে পারিবে কে? সকলে ভাবিয়াই খুন। কেনারাম একটু ভাবিয়া বলিল—হুর্গাগতি জানত বটে, কিন্তু সে ত মরে গেছে!

কাঙালী পিছন হইতে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া খুব লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—হাঁ হজুর, আছে একজন। রাখাল ফার্সী জানে।

অমনি সকলে সমস্তরে বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ! রাখাল-জানে বটে!

ইংরেজটি বলিল—আমাকে কেউ অল্পগ্রহ কবে রাখাল-বাবুর কাছে নিষে যেতে পারেন, আমার একটা জরুরি চিঠি পড়াতে হবে।

কাঙালী আবার সেলাম করিয়া বলিল—হজুর কেন কষ্ট করে যাবেন, আমি গিয়ে রাখালকে ডেকে আনছি। খবর পেলেই সে আসবে।

ইংরেজটি গোঁটে একটা চুপুট চাপিয়া দেশলাই জালিয়া দরাইতে লাগিল। কাঙালী রাখালকে ডাকিতে ছুটিল।

বিন্দু মণিমালার কাছে গিয়া যখন গাহিতেছিল—

আজ্ঞাপ্রতি এক সং এসেছে নদের বাজারে,
তুপির ওপর চৈতন তার নাইকো কাছারে।

—তখন কাঙালী শশব্যস্তে আসিয়া রাখালকে বলিল— রাখাল, রাখাল, তোমাকে একজন সাহেব ডাকছেন, বাপ করে এস।

রাখাল বসিয়া পড়িতেছিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—আমার কাছে সাহেবের কি দরকার? সাহেব কোথায়?

কাঙালী রাখালের উদাসীনতায় আশ্চর্য হইয়া বলিল— সাহেব গঙ্গাব ঘাটে, বজরায়! ডাকছেন! চট করে এস!

রাখাল বলিল—তার দরকার থাকে তাঁকেই এখানে আসতে বলগে। আমার দরকার থাকলে আমি যেতাম।

কাঙালী ভয়ে আধমরা ও অবাক হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল—রাখালকে লইয়া যাইতে পারিল না বলিয়া যদি সাহেব রাখালকে হাতের কাছে না পাইয়া তাহাকেই বুটস্থল লাথি কষাইয়া দ্যায়! কাঙালীর মারীচের দশা উপস্থিত। সে ভয়ে-ভয়ে গিয়া গুচ্ছ-মুখে সাহেবের সম্মুখে একটু তফাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—রাখাল-বাবু আসছেন?

ঠোট চাটিয়া আমতা-আমতা করিতে-করিতে ব্যাপাবটা নিজের পক্ষে যথাসম্ভব নিরাপদ করিয়া লইয়া কাঙালী বলিল—আজ্ঞে সে একটা আকাট গৌয়ার! বলে কিনা যে সাহেবের দরকার থাকে সে আসবে, আমার ত দরকার নয় যে আমি তাব কাছে যাব! তাব এই গৌয়ার্জুমি আর দেমাকের জন্তে আগান্বেব কাবো সঙ্গে তার বনে না হজুব!

ইংরেজটি হাসিয়া বলিল—আমাকে তাঁব কাছে আপনি অল্পগ্রহ করে নিষে চলুন।

সাহেব রাখালকে এতলোক হইতে একটু স্বতন্ত্র দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিবার জন্ত উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু কাঙালী মনে করিল সাহেব রাখালকে দেখিতে চাহিতেছে তাহাকে মজা দেখাইয়া দিবার জন্ত! সে ভয়ে জড়সড় হইয়াও মনের মধ্যে আনন্দে ফুলিতেছিল, এইবার রাখালের সকল অহঙ্কার সকল লোকের সাক্ষাতে সাহেবের বুটের আঘাতে ধূলায় চূর্ণ হইয়া পড়িবে!—এ যে তাহাব অসহ্য আনন্দ! সে মনে মনে মানত করিতেছিল—হে ঠাকুর! হে রাধাকান্ত! হে দর্পহারী মধুহৃদন! রাখালের যেন উপযুক্ত শিক্ষা হয়! আমি তোমাঘ ঘৃত-পরমায় ভোগ দিব। হরিরলুট দিব!

কাঙালী পথ দেখাইয়া আগে-আগে চলিল এবং অনেক লোক ভিড় করিয়া সাহেবের পিছু লইল। গ্রামে ঢুকিতেই অপরিচিত পোষাকের লোক দেখিয়া কুকুরগুলি যেউষেউ শব্দ জুড়িয়া দিল। এবং পথের দুধারি লোক খুব নত হইয়া হইয়া তাহাকে সেলাম করিতে লাগিল।

কাঙালী ইংবেজটিকে বন্দাবন গোসাঁইর সদর দরজায়

দাঁড় করাইয়া পুনর্বার আসিয়া রাখালকে ভৎসনা করিয়া বলিল—কি রকম লোক বল দেখি তুমি রাখাল! সাহেব আসছে তা তুমি একটু বাইবে গিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে পারনি। এই অহঙ্কারে তুমি বিপদে পড়বে দেখছি। এস, এস, ঝপ করে এস...

বন্দাবন গোসাঁইর বাড়ীর সম্মুখে সাহেবকে দেখিয়া গায়ের সকল লোক জড়ো হইল; সাহেবের আগমনের কাণ্ড বাহারা জানে না, শুধু রাখালের সন্ধানে সাহেব আসিয়াছে শুনিয়াই তাহারা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল—রাখাল খবরের কাগজে লেখে বলিয়া সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। ইহা কল্পনা করিয়া অনেকে বেশ একটু খুসী হইয়া উঠিয়াছিল।

বাহিরে আসিয়া রাখাল খুব সহজভাবে সাহেবের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। সাহেবও খুব প্রীতির সহিত তাহার হাত ধরিয়া শেকছাও করিল। এতক্ষণ এত লোক দূর হইতে হুইয়া হুইয়া তাহাকে সেলাম করিতেছিল; আব এই একটা লোক তাহাব নিকটে আসিয়া তাহাব সমান হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল; ইহাতে সাহেব রাখালকে ভালো কবিতা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

রাখাল বিনীতভাবে ইংরেজিতে বলিল—আমার কাছে আপনার কাজ আছে শুনলাম; আমি সাধ্যমত আপনার সাহায্য করতে পারলে সুখী হব।

সাহেব বলিল—আমি শুনলাম আপনি ফার্সী জানেন। আমার কাছে একখানা উর্দু চিঠি এসেছে, জবাব দিও; মুন্সি আমার সঙ্গে নেই। আপনি যদি অল্পগ্রহ কবে পড়ে দান একটু।

—নিশ্চয়, খুসী হয়েই পড়ে দেবো। আপনি অল্পগ্রহ করে বাড়ীর ভিতরে এসে বসুন।

রাখাল সাহেবকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া নিজের মেটে-ঘরের দাওয়ায় একটা মোড়া পাতিয়া বসাইল। তারপর তাহাকে চিঠি পড়িয়া শুনাইল। রাখাল সেই চিঠি হইতে বুঝিল সাহেবের নাম রাইলী। ইনি উনাউ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট।

রাখালকে রাইলী অনেক ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি কাজ করেন?

—আমি কোনো কাজই করি না।

—ও! আপনার জমিদারী আছে বুঝি?

রাখাল খুব স্বচ্ছন্দে হাসিয়া বলিল—জমিদারী থাকলে কি এই বকম বাড়ী হয়? আমার কোনো সঙ্গতিই নেই।

রাইলী লজ্জিত হইয়া বলিল—আমাকে মাপ করবেন, আমি কথাটা না ভেবেই বলে ফেলেছিলাম। আমি শুনছিলাম যে গোসাঁইগঞ্জের ব্রাহ্মণেরা গুরুগিরি করে। গুরুরা প্রায়ই বড়লোক হয়, আমি তাই ভেবে বলেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল—এতে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? ক্ষমিতব্য স্বীকার করতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা নেই।

গায়ের মধ্যে কাঙালী একটু ইংরেজি বুদ্ধিত। কাঙালী তাড়াতাড়ি বলিল—হজুব, ওর স্বপ্ন পাড়াপুরের রাজা! রাইলী আশ্চর্য হইয়া রাখালকে বলিল—তবে আপনি সেখানে থাকেন না কেন?

—আমি তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করেছি, তাঁর জমিদারীকে ত করিনি। স্বপ্নের জমিদারীর চেয়ে নিজের দিনমজুরীর সম্মান ঢের বেশী আমার কাছে।

বাখালের প্রতি শ্রদ্ধায় রাইলীর মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—তবে আপনি নিজে কোনো কাজকর্ম করেন না কেন?

—পাইনি বলে। পাবার চেষ্টা করছি।

—আমাকে যদি অল্পমতি করেন ত আমি একটা কথা বলতে চাই।

—কি বলুন।

—আমি উনাউ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট.....

—তা আমি চিঠি থেকেই টের পেয়েছি।

একটা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট! তাহার সহিত রাখাল এমন নির্ভবে সমানী হইয়া কথা কহিতেছে দেখিয়া কাঙালীর হৃৎকম্প হইল। এবং কাঙালী যখন সেই কথাটা প্রভুপাদ-দিগকে বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দিল তখন তাহার মধুসূদন নাম স্বরণ করিতে লাগিলেন।

রাইলী বলিতে লাগিল—আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে ছুটি নিয়ে নদীতে-নদীতে বেড়াচ্ছি।

আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। আমি কলকাতা গিয়েই উনাউ ফিরব। মাসখানেক পরে আপনি যদি অমুগ্রহ করে উনাউ গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন ত আমি বিশেষ খুসী হব। আপনি আজ আমার যে উপকার করেছেন তাব সামান্য একটু প্রতিদান আপনার গুণমুগ্ধ বন্ধু কাছ থেকে নিজে আপনি অস্বীকার করবেন না আশা করি। ... এই আমাব নামের কার্ড।

রাখাল কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত চিন্তে ধন্যবাদ জানাইয়া উনাউ বাইতে স্বীকার করিল। তারপর হাসিতে-হাসিতে বলিল—আমাদের নিয়ম, বন্ধু বাড়িতে এলে তাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদায় দিতে হয়।

রাইলী হাসিয়া বলিল—আমার শরীর খাবাপ, আমি কিছু এখন খাব না। আপনি কিছু ফল দিলে আমি সঙ্গে করে বজরায় নিষে যেতে পারি।

রাখাল রবয় দুলুকে ডাকিয়া এক কাঁদি কলা ও এক কাঁদি ডাব পাড়িয়া সাহেবের বজরায় পৌছাইয়া দিতে বলিল। এবং এবাব সে নিজে সাহেবের সঙ্গে-সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে বজরা পর্য্যন্ত গেল।

গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—রাখাল কি রকম সন্তায় কিস্তি পাইয়া গেয়াছে! আজকালকার এই মহার্ঘ চাকরীর বাজারে এমন সহজে চাকরী বাগানো বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সাহেবের স্নানকরে এখন পড়িয়াছে তখন অন্তত ত্রিংশ চল্লিশ টাকার একটা কেরানীগিরি ত পাইবেই! কিন্তু ইহাতে কেহই আশ্চর্য্য হইল না, কারণ সকলেরই বিশেষ রকম জানা ছিল লোকটার কি রকম পাতাচাপা কপাল! রাজার বাড়ী বিবাহ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কাঙালীর ভারি আপশোষ হইল যে সে-ই বাখালের খবর দিল, পরিচয় দিল, পথ দেখাইয়া লইয়া গেল, অত করিয়া ছজুব ছজুব করিয়া সেলাম করিল, কিন্তু সাহেব তাহাকে একবার পুছিলও না। ইংরেজদের এমনই অবিচার বটে! বাঁচিয়া থাকিত দুর্গাগতি খুড়ো, ত সে দেখিয়া লইত রাখাল কেমন করিয়া এমন কাকি দিতে পাবিত। দুর্গাগতি খুড়োর কাছেই সে সাহেবকে লইয়া বাইত! কাঙালী আপশোষ করিয়া সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—

মোগল পাঠান হৃদ হল কার্দী পড়ে তাঁতি,
ভীম জোণ কর্ণ গেলে শল্য সেনাপতি,
আর স্বর্য্য তারা চন্দ্র গেল জোনাকির পিছে বাতি!—

এষে তাই হল দেখছি। আগে সাহেবকে দেমাক করে খাতিরই করা হল না; আর যাই দেখলে যে ম্যাজিস্ট্রেট, অমনি খাতির দেখে কে! চাকরীটি বাগিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে হেঁইগো হেঁইগো করতে করতে সাহেবের বজরা পর্য্যন্ত যাওয়া হল, কিন্তু আগে বাড়ীর বাইবে এসেও একটু অভ্যর্থনা করতে পারেন নি!

একটা জেলাব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে এমন একটা গোয়ার-গোবিন্দ লোককে বন্ধু বলিয়া সন্তুষ্ট করিয়া গেল ইহাই সব চেয়ে কাঙালীর কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তখন স্বামীর গর্বে উৎফুল্ল মণিমালার কাছে হাসিতে-হাসিতে বিন্দু কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের রামায়ণ হইতে স্মরণ করিয়া বলিতেছিল—

“পরম দয়ালু রাম গুণের নাহি সন্ধি।
যার গুণে বনের বানর হয় বন্দী।
বানরের হাত দিতে নহেন বিমর্ষ।
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সর্ষ।
বিধির নির্বন্ধ কেবা করিবে থণ্ডন।
বানরের মিতালিতে বন্ধ নারায়ণ॥”

নারায়ণদাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া মণিমালার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—হাজার হোক রাজার মেয়ে, সতীলক্ষ্মী ভাগিয়ানী! তোমার পয়েই আমার রাখাল-এমন কল্যেণ হল নাভবো! আহা নাভবো, দেখছ না, ভূপাল যে ধূলা ঘাঁটছে! যাট যাট বাছারে!— বলিয়া ভূপালকে কোলে তুলিয়া নারায়ণদাসী আঁচল দিয়া তাহার গায়ের ধূলা মুছাইতে লাগিল।

মণিমালা উঠিয়া নারায়ণদাসীর পায়ের ধূলা লইয়া হাসিমুখা ছলছল চোখে বলিল—রাঙা-দিদি, আশীর্বাদ কব ঠর যেন ভাবনা ঘোচে।

—তা তুমি বলবে তবে আশীর্বাদ করব নাভবো? নিত্য রাখাকান্তর কাছে মানত করি যে আমার রাখালের বাড়বাড়ন্ত হোক, পনে পুত্রে লক্ষীলাভ হোক। আমার

গৌর আর রাখাল ত ভিন্ন নয়, বরং আগে রাখাল পরে গৌর।.....কিন্তু বলে রাখছি নাভবো, পেরথম মাসের মাইনে থেকে আমার গৌরকে একখানা সোনার কিছু গড়িয়ে দিতে হবে বাছা।

—উনি যে খরচ পাঠাবেন তা গোসাঁইদাদার কাছেই পাঠাবেন; সব তোমাদেরই ত রাঙা-দিদি! তোমরাই আমার ভূপালকে দেখো। ভূপাল আমার বড় গরিব!—মণিমালা স্বর অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

নারায়ণদাসী ভূপালকে বুকে চাপিয়া বলিল—বালাই-বালাই ঘাট! ও রাজার নাতি! আমাদের বন্ধের ধন, চক্ষের মণি! তবে গৌর দাদা, এ ভাই।

বিন্দি সমস্ত আঁচলটা মুখে গুঁজিয়া দিয়া এক ছুটে প্রসাদীর কাছে গিয়া লুটাইয়া পড়িল।

প্রসাদী বলিল—আ মর! কি হল তোর?

বিন্দি একটু দম লইয়া গাহিল—

সোনা-ব্যাং আর সোনা-পোকার যখন নামই দামী
সোনা-ব্যাঙের হার করিব সোনা-পোকার খামি!

কনক-ধুতরা কনক-চাঁপা

হবে আমার হারের ঝাঁপা,

সোনা কপো নইলে সবই তুচ্ছ করি আমি!

(৩৩)

বাখাল পশ্চিমে গিয়াছে।

মণিমালাব কাছে যে কয়েক খানা রূপার বাসন, মোহর, পুবানো টাকা ছিল তাহা বেচিয়া তাহা হইতে এক শত টাকা নারায়ণদাসীর হাতে দিয়া রাখাল বলিয়াছিল—রাঙা-দিদি, আমি যতদিন না সেখানে বেণ গুছিয়ে বসছি, ততদিন এই টাকাতে তোমাদের খরচ চলবে, তারপর আমি মাসে মাসে খরচ পাঠিয়ে দেবো। মণি আর ভূপাল রইল, ওদের তুমি দেখো।

নারায়ণদাসী টাকাগুলি বাস্তব রাখিতে রাখিতে বলিয়াছিল—তুমি বলবে তবে দেখব, নইলে দেখব না? ওরা যে আমার মাধার মাণিক; তুমি নিশ্চিত থেকে, ওদের যেখানে ঘাম পড়বে আমার রক্ত সেখানে পড়বে জেনো।

রাখাল এমনি করিয়া প্রসাদী ও বিন্দিকেও মণিমালা ও ভূপালের খবরদারী করিতে বলিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছে।

একদিন নারায়ণদাসী ও মণিমালা থাইতে বসিয়াছে, বিন্দি আসিয়া দূরে বসিল। বসিয়া-বসিয়া দেখিল মাত্র কাঁচা-কলা সিদ্ধ, সজ্জনের শাক শড়শড়ি, কলায়ের ডাল ও ফুলের অম্বল রান্না হইয়াছে। বিন্দি মণিমালাকে দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—

কচু-সেদ্ধ কলা-পোড়া

খাচ্ছ তুমি আগা-গোড়া,

আছ আনন্দে।

তার সঙ্গে জলপানিতে

ঝাল কথা আর কালসিতে,

নিত্য ত্রিসঙ্কে!

নারায়ণদাসী জ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল—দেখ্ বিন্দি পোড়ারমুখী, তুই যদি কেন আমার বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোবি ত তোকে ঝাঁটা পেটা করব! বেরো আমার বাড়ী থেকে...

বিন্দি হাসিয়া বলিল—রাঙা-দিদি-ঠাকরুণ—

গেরস্ত মারে কোস্তা ঝাঁটা।

বেরাল ভাবে মাছের কাঁটা!

তুমি ঝাঁটা মারবে, আমি মনে করব আমায় আদর করছ। আমায় কি তুমি তাড়াতে পারবে মনে করছ?

‘মারো আর ধরো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো।

বকো আর বকো আমি কানে দিয়েছি তুলো।’

এই অপ্রিয় ঘটনায় মণিমালা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার যে কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে ইহা সে কাহাকেও জানাইতে চায় না।

তাহাকে অব্যাহতি দিয়া প্রসাদী একখানি রেকাবিত্তে করিয়া কতকগুলি তরকারি আনিয়া নারায়ণদাসীর পাত্রে রাখা রাখিয়া বলিল—রাঙা-দিদি, মা তোমাকে এই তরকারি পাঠিয়ে দিলে।

মণিমালা ও বিন্দি বুঝিল যে ইহা প্রসাদী বা বাঙা-দিদিকে পাঠান নাই, পাঠাইয়াছেন মণিমালাকে।

নারায়ণদাসী বলিল—ও আর এঁটো করিসনে পেসাদী, রান্নাঘরের তাকে তুলে রেখে দে, বিকেল বেলা গৌর খাবে।

প্রসাদী বলিল—এত ভবকারী কি গৌর খেতে পারবে, তোমাদেরও একটু-একটু দি—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রসাদী নারায়ণদাসীকে অল্প ও মণিমালাকে বেশী-বেশী করিয়া দিয়া অল্প-কিছু রান্নাঘরের তাকে তুলিয়া রাখিয়া দিল। নারায়ণদাসী মুখ গোঁজ করিয়া খাইতে লাগিল, কাহারো সহিত আর একটি কথাও বলিল না।

মণিমালা আঁচাইয়া ঘরে আসিয়া প্রসাদী ও বিন্দিকে বলিল—তোমরা ভাই আমাকে মদ্র আস্তি কর কেন, ওতে রাঙা-দিদি যে বিরক্ত হন।

বিন্দি স্বর করিয়া শ্রীধর কথকের গান ধরিল—

“যতনে যাতনা দিবে আগে সখী জানি না।

যাতনা হবে জানিলে যতন করিতাম না।”

মণিমালা বিষন্ন হইয়া বলিল—না ভাই, হাসির কথা নয়। আমার জন্মে শুধু-শুধু তোমরা স্বল্প গাল খাও। তোমাদের হাতে ধরে বলছি, তোমরা যখন-তখন আমার কাছে এস না।

বিন্দি গাহিয়া উত্তর দিল—

“কি করে লোকেরি কথায় ?

সে যে আমার প্রাণধন, মন ঘরে চায়।

উপজ্বিলে প্রেমনিধি

নিষেধ না মানে বিধি,

মনপ্রাণ নিরবধি তারি গুণ গায়।”

মণিমালা হাসিয়া বলিল—তোকে পারবার জো নেই।

কপিকের বিষণ্ণতা কাটিয়া গেল। তিন সখীতে আবার হাসি গল্পে গানে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।—এমন সময় বৃন্দাবনের নামে এক মনিজ্ঞার্ডার ও চিঠি এবং মণিমালার নামে এক পত্র আসিল। রাখাল পাঠাইয়াছে। রাখাল বৃন্দাবনকে লিখিয়াছে, সেখানে গিয়া সে মুন্সরিমের পদে নিযুক্ত হইবাছে; এক বৎসর পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে থাকিতে হইবে, পরে একটা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে

একশত টাকা হইবে। বেতন বৃদ্ধি হইয়া চারি শত পর্যন্ত হইতে পারিবে। সাহেবকে সে উদ্দু পড়াষ, তাহার জন্ত সাহেব তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে চাহিয়াছিলেন, সে লইতে অস্বীকার করিয়াছে। ত্রিশ টাকা পাঠাইতেছে; পনের টাকা বৃন্দাবন লইয়া বাকী পনের টাকা যেন মণিমালাকে দান।

নারায়ণদাসী চিঠি শুনিয়া ত চটিয়া আঁগুন!—এমন সায়েবের মুখে আঁগুন। বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গেল, আমরা মনে করলাম পাঁচ সাত শ টাকার একটা চাকরীই দেবে বা! ওমা, এ দেখছি—

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে

তার মাইনে চোদসিকে!

আবার আমাদের রাখাল-বাবু রাজার জামাই কিনা, তাঁর আবার এমনি বড়মাহুদী যে সায়েব টাকা দিতে চায় কিন্তু তাঁর নেওয়া হয় না! মাইনে ত মোটে পঞ্চাশটি টাকা! তার কুড়ি টাকা রাখলেন নিজে, বোকে দেবার তকুম হল পনের, আর এতবড় সংসারটার খরচ দেওয়া হল পনের! এইতেই আবার পাড়ার পোড়াকপালীরা বলতে আসে যে বোকে কচু-সেজ কলা-পোড়া খাওয়াও কেন? ঐ যে পায় সেই ঢের!

বিন্দি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল—হ্যাঁ রাঙা-দিদি, ঠিক বলেছ! তুষ্টু গয়লাও বলছিল, আমরা জল-দেওয়া দুধ বেচি বলে’ লোকে দাম দিতে চায় না, আর কলকাতায় খন্দেরকে শুধু একবার দুধ দেখিবে গয়লা দুধের দাম নিয়ে চলে যায়।

নারায়ণদাসীর বিবিধ ছন্দের গালাগাল বিন্দির পিছনে ধাওয়া করিল, কিন্তু নাগাল ধরিতে পারিল না।

নারায়ণদাসী মণিমালাকে টাকা পনেরটা দিল—উপায় নাই, নিশ্চয় রাখাল চিঠিতে তাহাকে লিখিয়াছে। বৌ ত সোনার বৌ, মুখে রা নাই, পাড়াবুঁদুলিয়া বাড়ী বহিয়া আসিয়া উহাকে উদ্ধাইয়া দিয়াই ত মুঞ্চিল বাধাইতে চায়। আজকাল কোনো চোখখাকী কি পরের ভালো দেখিতে পারে ছাই! নারায়ণদাসী জিজ্ঞাসা করিল—নাতবৌ, পনেরটা টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

—উনি এ টাকা সবাইকে দিতে লিখেছেন রাঙা-দিদি। প্রথম উপার্জনের টাকা—পাঁচ টাকা দিয়ে মাকে প্রণাম করতে বলেছেন, এক টাকা বিন্দিব মাকে, এক টাকা আবদারকে, দুটাকা খোঁড়া নিস্তাবিণীকে, এক টাকা খেঁদী বষ্টমীকে দিতে বলেছেন; পাঁচ টাকা আমায় দিয়েছেন।

নারাণদাসী বিরক্ত হইয়া বলিল—

ভাগাড়ে গরু পড়ে,
শকুনির মাথায টনক নড়ে।

রাখালের চাকরী হতে না হতে অমনি সকলের বুদ্ধি ছুঁখু জ্ঞানানো হয়েছে? সকলকে মনে পড়েছে কিন্তু এ ত মনে পড়ল না যে রাঙা-দিদি রয়েছে, গৌর রয়েছে, তাদের কিছু হাতে তুলে দি! মনিঅচার এল, মনে কবলাম রাখাল না জানি রাঙা-দিদিমাকে কতই দিয়েছে!—

শাঁখা-হাতী শাঁখা নাড়ে,
বেরাল ভাবে আমার ভাত বাড়ে!—

আমার হয়েছে তাই। রাখাল আবার বড়াই করে বলেছিলেন—চাকরী হলে আমায় বাড়ি স্টুট গয়না দেবেন! আরে আমার পোড়া কপাল!

মণিমালা লজ্জিত হইয়া বলিল—পনের টাকা ত তোমাকেই দিয়েছেন রাঙা-দিদি!

নারাণদাসী ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—আমাকে দিয়েছে! তা হলে তোমরা মায়ে পোষে গিলবে কি?

কুণ্ঠিত হইয়া মণিমালা বলিল—সংসারখরচের টাকা ত ক মাসের মতন একেবারে দিয়ে গিছিলেন।

নারাণদাসী আশ্চর্য হইয়া বলিল—ওমা! সে কি নাতবো! সে কটা টাকা! এই মাগ্গি গণ্ডার বাজারে তাতে কদিন যায়? জমাখবচ লেখা আছে, তুমি দেখো বরং।

মণিমালা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—সে কি কথা রাঙা-দিদি, আমি কি তোমার কথা অবিশ্বাস করতে পারি কখনো। এ মাসের সংসারখরচের টাকা আমি দেবো। ও পনের টাকা তোমার প্রণামি, তুমি নিষো।

নারাণদাসী খুসী হইয়া বলিল—তা দেবে বৈ কি,

তোমরা না দেবে ত দেবে কে! রাখাল আমাব রাজা হোক, আমার মাথার চুলের মতন পেবমাই পাক, তুমি পতি পুত্র নিয়ে পাকা মাথায সিঁছর পর, হাতের নো স্বয় যাক!.....

মণিমালার অধরপ্রান্তে আনন্দের একটু ক্ষীণ আভা দেখা গেল এই ভাবিয়া যে, রাখাল তাকে লিখিয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাহার চার পাঁচ শত টাকা বেতন হইবে, বুড়া বয়সে ঘরে বসিয়া দুইশত টাকা পেন্সন পাইবে; তাহার পর ভূপাল লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইয়া বাহা উপার্জন করিবে তাহাব লোভ তাহারা করিবে না, মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা দুজনে স্বাধীনভাবে নিজের খাইয়াই যাইতে পাবিবে। এই ভবিষ্যৎ স্বপ্নের আনন্দ আর মুক্তামালাব সমস্ত মন ছাইয়া সমস্তই তাহার কাছে মধুময় স্বন্দর কবিয়া তুলিয়াছিল, আজ তাব কোথাও কিছু অপ্রচুর ছিল না।

(৩৪)

রাখালের উপার্জন যেন গ্রামের সকল গরীব দুঃখী ও আত্মীয়ের জন্ত; যাহাদিগের নিতান্ত অভাব আছে বলিয়া সে জানে, যাহাদিগের নিকটে সে কখনো এতটুকু উপকার বা সাহায্য পাইয়াছে, যাহারা তাহাকে নিজের অভাব জানায়, তাহারা সকলেই রাখালের উপার্জনের অংশীদার। ইহাতে যে-পরিমাণে নারাণদাসী চটে, সেই পরিমাণে গ্রামের সকল লোক বাঞ্চালকে আপনাব বলিয়া জানিয়া ধন্ত-ধন্ত কবে। স্বামীব প্রশংসায় মণিমালার বুক স্বখে পরিপূর্ণ, সে অক্লেশে হাসি-মুখে নারাণদাসীকে সকল অত্যাচার ও সকল গল্পনা ও বঞ্চনা সহ্য করিতে পারিতেছিল। তাহাকেও গ্রামের সকলে ভালো বাসে—বিন্দি ও প্রসাদী ত তাহার সহোদরারও অধিক।

এমনি স্বখে দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন চিঠি আসিল মণিমালার বাবা রাজা ধনেশ্বর ছয় মাস হইল মারা গিয়াছেন। বাণী জগদ্ধাত্রী সেই বিপুল জমিদারী লইয়া বিপদে পড়িয়াছেন, রাখাল শীঘ্র গিয়া যেন তাহাকে রক্ষা করে।

এই অকস্মাত দুঃসংবাদ পাইয়া মণিমালা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, তাহার পিতৃবিয়োগেব দুঃখ প্রবলতর বোধ

হইতেছিল এই ভাবিষা যে পিতা মরিবার সময়ও তাহাদের ক্ষমা করিয়া যাইতে পারিলেন না, মাতা এই ছয় মাসেও কন্তাকে তাহার পিতৃবিয়োগের সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই, কন্তাকে কাছে ডাকিবার মমতা অনুভব করেন নাই, বিপদে পড়িয়া উদ্ধার করিবার জন্য জামাইকে মাত্র ডাকিয়াছেন। মণিমালার এতদিনের পুঞ্জি-করা সকল দুঃখ এই উপলক্ষ্য পাইয়া কান্নার স্রোতে বাহির হইতে লাগিল।

প্রসাদী ও বিন্দি রাতদিন মণিমালার কাছে-কাছে থাকে। মণিমালার দুঃখে ত তাহারা শ্রিয়মাণ, আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তাহাদের মন আরো ব্যাকুল ভারাক্রান্ত। বিন্দি যে বিন্দি তাহাবও মুখের হাসি আর গান থামিয়া গিয়াছে।

রাজা ধনেশ্বরের মৃত্যুতে নারায়ণসী পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সে আপন মনে গজগজ করিয়া বকিতেছিল—বাবা! মিজের কি দুর্ভাগ্য করোধ গো! মোলো তবু একবার মেয়েটার দিকে ফিরে চাইলে না! রাগ করে ছিলি বেশ ছিলি, সাত তাড়াতাড়ি মরা কেন? একটুখানি সংসারটা শুদ্ধিয়ে তুলছিলাম, পোড়া বিধির আর সইল না। রাখাল ত এইবার জীপুতুর নিয়ে শ্বশুরের ভিটেয় গিয়ে রাজা হয়ে বসবে—তখন কি আর আমরা একটা পয়সা নাড়াচাড়া করতে পাব?...পাড়ার সব শতকখোয়ারীদের নজর লেগেই ত এমন হল!.....

রাখাল মণিমালার চিঠি পাইয়া মহা সমস্ত্রাষ পড়িয়া গেল। সদ্য সে অনায়াসে নিজেব পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছে; এমন অবস্থায় সেই স্বাধীন উপার্জনের পথ ছাড়িয়া আবার পরাধীন হইতে যাওয়া তাহার উচিত কি না। পিতার মৃত্যুতে জমিদারী মণিমালার মাতাতে বর্জিয়াছে; তাঁহার মৃত্যুর পর ভূপালের হইবে; কিন্তু তাহাতে রাখালের কি? কিন্তু ঐ জমিদারী ভূপালের জন্য রক্ষা করাও ত তাহারই কর্তব্য। অদিকন্তু রাণী জগদ্ধাত্রী লিখিয়াছেন, জমিদারী হাতে লইয়া বিপদে পড়িয়াছেন, রাখাল সম্মত গিয়া যেন তাঁহাকে রক্ষা করে।

রাখাল রাইলীকে সমস্ত জানাইয়া পরামর্শ চাহিল। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে আপাতত ছুটি লইয়া যাইতে বলিলেন।

ভব্যতা ভদ্রতা বিদ্যাহারাণ পরোপকার প্রভৃতি গুণে রাখাল প্রবাসেও সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়াছিল। সকলকে দুঃখিত করিয়া দুঃখিত হইয়া সে দেশে ফিরিয়া আসিল।

মণিমালাকে লইয়া রাখাল পাহাড়পুরে যাইবে স্থির হইয়াছে। মণিমালার ইহাতে স্বথের চেয়ে দুঃখই বেশী বোধ হইতেছিল। যে জন্মনীড় হইতে তাহাকে দুঃখ পাইয়া দূর হইয়া আসিতে হইয়াছিল, সেখানে সে ফিরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বিনা আহ্বানে; সেখানে গিয়া সে তাহার অমন স্নেহময় অথচ অতি-তেজস্বী বাবাকে দেখিতে পাইবে না; তাহার মায়ের স্নেহকোল সে ফিরিয়া পাইবে, কিন্তু যে মাকে সে দেখিষা আসিয়াছিল সে মাকে সে পাইবে না—তাঁহার সে রাগীর বসনভূষণ ঘুচিয়া বিধবার দীনবেশ হইয়াছে; এই কয়দিনের বিচ্ছেদ মেয়েকে মায়ের মন হইতে না জানি কতখানি দূরে সরাইয়া দিয়াছে—যে জায়গা হইতে ছাড়াছড়ি হইয়াছিল সে জায়গায় পৌছিতে কখনো পারিবে কি না কে জানে! আর এই যে এখানে অল্পদিনের প্রবাসে নূতন পরিচয়ে কতগুলি নূতন প্রাণের সঙ্গে প্রশ্নমগ্নি বাঁধা হইয়াছে, এইখানে যে প্রীতির লতা শত শত কোমল বাহু মেলিয়া কত লোককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, এ-সমস্ত খুলিয়া ছাড়াইয়া যাওয়া কি অমনি কথার কথা! হয়ত কত বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে, কত হৃদয়ে বেদনা বাজিবে, প্রীতির লতাকে আশ্রয়হীন কবিয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চারাইয়া রোপণ করাতে তাহার হয়ত এমন নখর ঢল-ঢল তাজা ভাব থাকিবে না, হয়ত বা একেবারেই শুকাইয়া যাইবে!

প্রসাদী আজ কদিন থেকে শুধু কাঁদিতেছে আর মণিমালার গলা জড়াইয়া বলিতেছে—আমি আবার বিধবা হলাম! তোকে পেয়ে বেঁটা আমি সংসারে স্বপ্ন পেয়েছিলাম, তুই আমার সব স্বপ্ন সব আনন্দ কেড়ে নিয়ে চলি।

বিন্দি আর এমুখো হয় না। সে আপনাকে বাড়ীতে বন্দী করিয়াছে।

যাইবার দিন মণিমালা বিন্দিকে বারবার ডাকাইয়া পাঠাইল, সে বিছুতেই আসিল না। বিন্দির বাড়ী পাড়া-অস্তুর বলিয়া বোঁমাছুষ মণিমালা তাহার বাড়ী কখনো

• যায় নাই। আজ সে বিন্দির কাছে বিদায় লইতে তাহার বাড়ী গেল। মণিমালাকে তাহার কুঁড়ে-ঘরে পদার্পণ করিতে দেখিয়াই বিন্দি চোখের জল চাপিয়া হাসি-মুখে গাহিয়া উঠিল—

“এস যাহু আমার বাড়ী তোমায় দিব ভালো বাসা।”

মণিমালা ম্লান মুখে বলিল—বিন্দি ঠাকুরঝি, আমার যাচ্ছি ভাই। তুমি ত আমাদের ছায়া মাড়াও না, তাই আমিই এলাম বিদায় নিতে।

বিন্দি আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিমালাব চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল।

বিন্দি দেখিয়া দেখিয়া বলিল—বিন্দি পোড়ারমুখীর জন্তেও লোকে কাঁদে দেখছি !

মণিমালা বিন্দির হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—ঠাকুরঝি, একেবারে ভুলে যাসনে ভাই, মাঝে-মাঝে গনে কবিস। তোদের আমি কখনো ভুলতে পারব না।

বিন্দি হঠাৎ হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া গোপাল-উড়ের যাত্রার নকলে গাহিতে লাগিল—

“ভোলা সে কি কথার কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা।

শুকাইলে তরু কতু ছাড়ে কি জড়িত লতা।”

মণিমালা ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বিন্দির হাত ধরিয়া বলিল—তবে যাই ভাই ঠাকুরঝি। বেঁচে থাকলে আবার কখনো না কখনো দেখা হবে।

বিন্দি আবার হাসিতে-হাসিতে গাহিল—

“তোমারি বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।

তুমি আমাব স্বপ্নে থেকো, এ দেহে সকলি হবে।”

মণিমালা চোখ মুছিতে-মুছিতে ফিরিল। মণিমালা চোখের আড়াল হইতেই বিন্দি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিয়া মাটিতে আছড়াইয়া পড়িয়া আকুল ক্রন্দনে লুপ্তিত হইতে লাগিল।

(ক্রমশ)

চাক বন্দোপাধ্যায়।

কোজাগর-লক্ষ্মী

ওগো

কোজাগরের লক্ষ্মী তুমি,

(তোমাঘ) ক্ষণিক দেখার লাগি

চিরজীবন-বাত্রি তোমার প্রতীক্ষাতে জাগি ;

নিমেষ-বিহীন আঁখির পাতে,

নিমেষ দেখার প্রতীক্ষাতে

অনুক্ষণই করতে আমায় হয় যে কতই ছল,

হতাশ মনে গাঁথি মালা দিয়ে আঁখির জল !

ওগো

দুর্লভ সে একটি নিমেষ বারেক শুধু আসে,

স্বাতীর বিন্দু মুক্ত। হয়ে হৃদয়-পাতে হাসে ;

সকল-অশ্রু-পুলক-দেওয়া

কোন্ মলয়ার দখিন হাওয়া

হৃদয় ভরে চন্দনেরি সুরভি নিশ্বাসে ;

কোন্ বকুলের বনে জাগে বসন্ত উল্লাসে !

ওগো

কোন্ শরতের শিশির তুমি, বসন্তেরি হাওয়া,

ক্ষণে-ক্ষণে করছ হৃদয়-কুঞ্জে আসা যাওয়া ;

তোমার সরস পরশ তরে

ফুটেছে যে ফুল হরষ ভবে,

শরৎ-জ্যোৎস্না-মাখা তুমি বসন্ত-পূর্ণিমা,

স্বপ্নমার যে অন্ত নাই গো, নাই গরিমার সীমা !

ওগো

অশ্রুসাগর মথন করে পূর্ণচাঁদের সাথে

পূর্ণিমাতে উদয় তোমার স্বধার পাত্র হাতে ;

তোমার প্রসাদ-বিন্দু পিয়ে

বিষ-আহত উঠুক জীয়ে,

অমর হয়ে স্বর্গলোকে হোক সে অপলক,

চির-যুবন মনে ছাপুক পারিজাত-পুলক !

তুমি

কোন্ সাগরের অতল গভীর অন্তরেরি বহু,

সুধ্য শশী তারকাবি টুকরা মহা রত্ন,

আলোর মালা সান্ধিয়ে ধবে’

আরতি তাই তোমাঘ করে,

তারি আভা হাশু তোমার, ঝবছে মুখে চক্ষে,

সাত রাজার ধন মাণিক

সে যে গোপন তোমার বক্ষে !

ওগো হৃদয় আমার লোহার মতন কঠিন ও কুংসিত,
মর্চে-পড়া আঘাত-খাওয়া সব ধনে বঞ্চিত,
নয়ন তোমাব স্পর্শমণি
এক নিমেষে করবে ধনী ;
সোনার খনি হবে যে গোর হৃদয় অন্ধকার,
ধূলার মাঝে সোনার কুচি হাসবে যে দেদার !

তুমি প্রবালঘেরা কল্লনারি আনন্দ-মন্দির,
বন্দনা-গান নিত্য সেধা তোমার এ বন্দীর,
শ্রদ্ধা শ্রীতি হৃদয়-থালে
তোমাবি পায় অর্ঘ্য ঢালে,
অপারদুঃখ-শতদলে পূজার আযোজন,
উঠছে বেজে পরাণ ভাঙা বোদন নিবেদন !
হে কোজাগর লক্ষ্মী, এস আমার রিক্ত ঘরে,
রক্ত-রেখায় আল্পনা যে আঁকছি হৃদয়-পরে,
চরণপদ্ম খুয়ে খুয়ে
সকল ব্যথা ছুয়ে ছুয়ে
একটি নিমেষ পূর্ণ করে দাঁড়াও আঁখির আগে ;
চির জীবন-রাত্রি যেথায় এই বিরহী জাগে !

শ্রী—

২০ আশ্বিন ১৩২২
রাত্রি ১২টা

✱ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দোড়

ফেক্রমাবী মাসের মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসী পত্রিকায় আমাব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর আমি ভাবতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পত্র পাইয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সদাশিব বিশ্বনাথ দত্তের বন্ধু শ্রীযুক্ত দীক্ষিতের পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীক্ষিত মহাশয় দত্তের ২৭ মাইল দৌড়ের বিবরণ ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠাইয়াছেন। দত্ত তাহার দ্বিতীয় উদ্যমে ঘটায় ১১ মাইল দৌড়াইতে পারিবেন বলিতেছেন, এবং যদি তিনি ঘটায় ১০ মাইল হিসাবেও দৌড়াইতে সক্ষম হন, তিনি পুরা ২৪০ ঘটায় ২৫ মাইল অনায়াসে দৌড়াইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়ের সম্মান নিজস্ব করিবেন। আমরা

দত্তকে প্রাচ্যেব শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি, আশা করা যায় যে তাঁহার দ্বিতীয় চেষ্টার পর আমরা তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর কবিত্তে পাইব।

দত্ত যে একজন খুব উঁচুদরের খেলোয়াড় তাহা বলা বাহুল্য। তিনি অল্প কাহাবও সাহায্য না পাইয়া নিজ বুদ্ধিতে এতদূর উন্নতি করিয়াছেন, কেতাৰী বিদ্যা না থাকিলেও যে তিনি খুব বুদ্ধিমান তাহা তাঁহার দৌড় অভ্যাসের প্রণালী হইতে জানিতে পাবা যায়। আমাদের অসীম দুর্ভাগ্য যে তাঁহাকে আরও শিক্ষা দিবার মত শিক্ষক এদেশে নাই; তিনি যদি দক্ষিণ-আফ্রিকার স্প্রিংবক ওস্তাদ অথবা বিলাতেব অল্প কোনও ওস্তাদের দ্বারা শিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে প্রথম উদ্যমেই যে তিনি ম্যাক-আর্থারের দৌড়ের কৃতিত্ব থরক করিতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবতবর্ষে আমরা এমন একজন খেলোয়াড় পাইয়াও হাবাইতে বসিয়াছি,—প্রথমতঃ প্রতিযোগিতার অভাব, দ্বিতীয়ত দত্তের দারুণ অর্থাভাব, হয়ত শীঘ্রই তাঁহাকে দৌড়ান হইতে অবসর লইতে বাধ্য করিবে।

পুণা হইতে ১৫০ মাইল দক্ষিণে সাংলি গ্রামে সদাশিব বিশ্বনাথ দত্ত ১৮৮৭ সালে দরিদ্র অথচ ভদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দত্তের পিতা উক্ত গ্রামে সামান্য ভাবে একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই সময় শিক্ষাবিস্তারের অত্যন্ত হীন অবস্থা হওয়ায় বিদ্যালয়ের আয় হইতে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন কাষক্লেষে চলিত। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সদাশিব বাল্য হইতেই অত্যন্ত কষ্ট ও দুঃস্থ হইয়াছিল। মাত্র দশবৎসর বয়সে সদাশিবের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। সেই সময় দত্তের প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিলেও তাঁহাকে সংসারের ভার লইতে হয়। সংসারে এক বিধবা মাতা ব্যতীত তাঁহাকে সাহায্য করিবার আর কেহই নাই। স্বতরাং লেখাপড়া ছাড়িয়া তিনি কাজকর্মে মনোনিবেশ করেন ও একটি ছোট-খাট পিতলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া অদ্যাবধি তাহা চালাইতেছেন।

বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার শারীরিক উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছা হয়, ও সেই ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া প্রথমে কুস্তী লড়িতে

আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে দৌড়ান অবিধাঙ্গনক বিবেচনা করিয়া তাহাই অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৫ বৎসর বয়স হইতে তিনি দৌড়ান আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই ২ মাইল পথ ১৫-২০ মিনিটে দৌড়াইতে সক্ষম হন; বৎসর অতীত হইলে পর তাঁহার আরও বেশী দৌড়াইবার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি সাবলি হইতে ২½ মাইল দূরবর্তী সন্ধামেশ্বর শিবমন্দির পর্যন্ত দৌড়াইতে আরম্ভ করেন, ইহাতে তাঁহার দেবোচ্চনা ও দৌড় উভয়েরই অবিধা হওয়ায় আজ দশ বৎসর প্রত্যহ নিয়মমত সেই পথ দৌড়ান অভ্যাস করিতেছেন। তিন বৎসর পূর্বে তিনি আত্মশক্তি উপলব্ধি করেন; সেই সময় তিনি ১৪ মাইল দূরবর্তী এক তীর্থস্থানে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে দৌড়াইয়া গিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যান, পূনর্বার সেই পথ সেইটুকু সময়ের মধ্যে দৌড়াইয়া নিজ শক্তিতে অত্যন্ত প্রীত হন। ১৯১৫ সালে মার্চ মাসে তাঁহার বন্ধুরা দক্ষিণাত্য স্মিথখানার ক্রীড়া সম্মিলনীতে তাঁহার দৌড়ের বন্দোবস্ত করেন, তিনি ২৭½ মাইল ৩ ঘণ্টা ৮ মিনিটে দৌড়ান, ও সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ২৭ মাইল ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ২½ সেকেন্ডে দৌড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

দস্তরের দৌড়াইবার পোষাক অত্যন্ত সাধাসিধা, তিনি একটি কামিজ, ধুতি ও টুপি ব্যবহার করেন। দৌড়াইবার পূর্বে কামিজ জলে ভিজাইয়া লন। ছুতা তিনি ব্যবহার করেন না। রাজ্যিশেষে দৌড়াইতে হয় বলিয়া তিনি জীব-জন্তুর ভয়ে লাঠি ব্যবহার করেন।

দস্তরের কৃতকার্য্য হইবার মূল কারণ সংযম, অব্যবসায়, ও প্রাত্যহিক অভ্যাস। তাঁহার চালচলন ও বাস্য অত্যন্ত সাদাসিধা। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ হওয়ায় তিনি মদ্য মাংস সংশ্লিষ্ট প্রভৃতির ব্যবহার জানেন না প্রত্যহ তিনবার তিনি বাজরার কুটি, ভাত, তরকারী, শাকশবজী আহার করেন। তিনি ময়দার কুটি, ফলমূল, বাদাম প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত নন। তিনি আশ্বসের বেশী দ্রব্য পান করেন না। নিয়মিত আহার ও ব্যায়াম করায় তিনি গত পনের বৎসর কখনও অস্থির হন নাই। তিনি চা বা কফি পান করেন না। মধ্যে-মধ্যে দুগ্ধপান করিলেও তিনি তাহাতে অভ্যস্ত নন। দস্তর অবিবাহিত।

সাধারণের সমক্ষে দৌড়াইবার পূর্বে দস্তর সাংলি

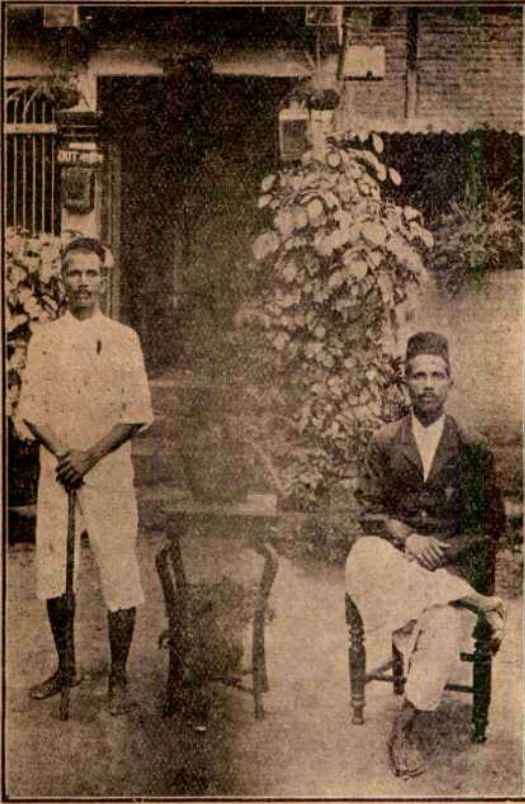
গ্রামে নিজ অদ্ভুত দস্তর-বিদ্যা দেখাইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মত দস্তর করিতে সাংলি গ্রামেই আর কেহই পারিত না। বর্ষাকালে দস্তর ক্ষীতমেহ নদীবেশে দস্তর করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাঁহার দস্তর দেখিবার জিনিষ। গভীর রাত্রে দস্তর একাকী কক্ষানদীতেও দস্তর করিতে অভ্যস্ত। সাতার এবং দৌড়ান উভয়েই দস্তর অত্যন্ত দ্বির; তাঁহার দম এবং শক্তি কখনও তাঁহাকে কার্য্যকালে পরিত্যাগ করে না।

দস্তরের শরীরের মাপ :—

দৈর্ঘ্য	৫' ৩"
ছাতি	৩৩" (সাধারণ)
"	৩৫" (ফুলান)
গর্দান	১৩"
হাতের গুলি	১০½"
কোমর	২৮½"
উরু	১২½"
পায়ের ডিম	১৩"

ইউরোপীয় খেলোয়াড় অপেক্ষা তাঁহার দৈর্ঘ্য কম হওয়াতে দস্তরকে বিস্তর অস্থিবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহা ছাড়া, তিনি কখনও কাহারও দ্বারা শিক্ষিত হন নাই, ও দৌড় অভ্যাস করিবার সঙ্গী পান নাই। খেলোয়াড় মাজেই এইসব অভাবের অস্থিবিধা বুঝিতে পারিবেন।

ইহাই দস্তরের খেলোয়াড়-জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শ্রীযুত দীক্ষিতের অগ্র এক পত্র হইতে জ্ঞাত হইয়াছি যে দৌড়ান অভ্যাস করিতে দস্তরের অত্যন্ত আর্থিক ক্ষতি হয়; কেননা তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইলে নিজ কারখানা বন্ধ রাখিতে হয়। সামান্য ক্ষতিও তাঁহার পক্ষে খুব বেশী এই কারণে তাঁহার দৌড়ান অভ্যাস যতদূর হওয়া উচিত ততদূর হয় না। এই দাক্ষণ জীবনসংগ্রামের দিনে অনেক স্থলে অর্থোপার্জনই চরম লক্ষ্য, বিশেষ দরিদ্র দস্তরের পক্ষে কারখানা বন্ধ করিয়া অর্থের ক্ষতি করা একেবারেই অসম্ভব, সুতরাং অর্থাভাবে দস্তরকে শীঘ্রই দৌড়ান পরিত্যাগ করিতে হইবে। উপস্থিতক্ষেত্রে তাঁহাকে সাহায্য করা আমাদের সর্বতোভাবে উচিত কারণ আমাদের দেশে



শ্রীযুক্ত সদাশিব বিশ্বনাথ দত্তর ।

শিক্ষা ও প্রতিযোগিতার অভাবে এক ত উঁচু দরের খেলোয়াড় একান্ত বিরল। যদিই বা কখনও দুই একজন দৈবাৎ সেই সম্মান প্রাপ্ত হন, আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁহাদের শক্তিটুকু নষ্ট করা নিতান্ত নিন্দনীয়। দক্ষিণাত্য জিমখানা দত্তরকে তাঁহার দৌড়ের জন্ত একখানি স্বর্ণপদক দান করিয়াছিলেন! সে পুরস্কার খুব সম্মানার্থ হইলেও সাহায্য হিসাবে যে নিতান্ত অকিঞ্চিংকর তাহা বলা বাহুল্য। দত্তর আগামী শীতকালে কলিকাতা অথবা এলাহাবাদে দৌড়াইতে সম্মত আছেন; নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে সেজন্ত কোনও বন্দোবস্ত হইতে পারে না, কারণ উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। বাংলাদেশের জনসাধারণ ফুটবল, হকি ইত্যাদি খেলায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের ও সমগ্র ভারতবাসীর নিকট আমার ইহাই সামান্য নিবেদন যে তাঁহারা সামান্য দানের দ্বারাও দত্তরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়ের কৃতিত্ব থর্ক করিতে

সুযোগ দিবেন। যদি দত্তরকে নিতান্ত অর্থাভাবেই দৌড়ান ত্যাগ করিতে হয়, তাহার চেয়েও দুঃখের বিষয় আর নাই। যে কেহ অনুগ্রহ করিয়া অর্থসাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

(১) Treasurer. The Allahabad Sporting Club. 36, Goods Shed Road, Allahabad.

(২) Treasurer. The Students' Sporting Club. 5 A. Stanley Road, Allahabad.

(৩) Mr. K. N. Dikshit M.A. 235 Budhwar, Poona City.

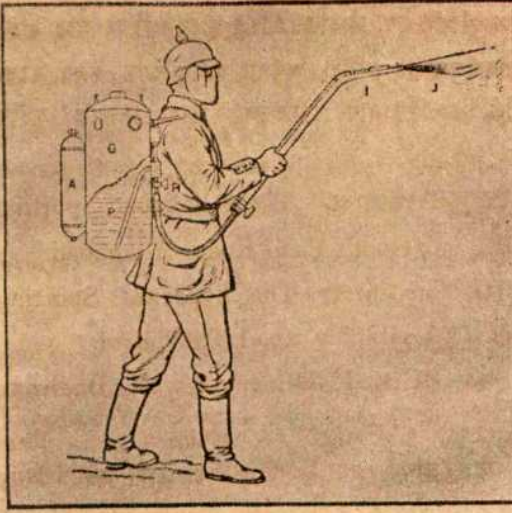
যদি উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা হইলে আমি দত্তরকে কলিকাতা লইয়া যাইয়া প্রবাসী ও মডার্ন-রিভিউ আফিসে সমস্ত স্থির করিব। দত্তর যদি পৃথিবীর দৌড়ের কৃতিত্ব থর্ক করিতে সক্ষম হন ও এলাহাবাদ কিংবা কলিকাতায় দৌড়ান, তাহা হইলে এলাহাবাদ হইতে তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। আশা করি Calcutta Walking Association-এর সম্পাদক মহোদয় এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন। অত্র কোন ব্যক্তি অথবা উক্ত সম্পাদক মহাশয় দৌড়ের বন্দোবস্তের জন্ত আমার সহিত পত্রব্যবহার করিবেন আশা করি।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার ।

পঞ্চশস্য

যুদ্ধে তরল আগুন—

বর্তমান যুদ্ধে প্রাচীনকালের যত রকম যুদ্ধরীতি পুনঃপ্রবর্তিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তরল আগুন ছড়াইয়া শত্রুকে কাবু করার উপায় অত্যন্ত। ইউরোপে বারুদ আবিষ্কারের পূর্বে বৈজ্ঞানিক সাম্রাজ্যের যোদ্ধারা এই উপায়ে যুদ্ধ করিত; বর্তমান যুদ্ধে তাহাই আবার বারুদের সহকারীরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। দি সায়েন্সিফিক আমেরিকান পত্রে তরল আগুন নিক্ষেপের যন্ত্র ও উপায় সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় জল দিবার নলের মতন একটা নলের ভিতর দিয়া সহজে জলনশীল একটা তরল পদার্থ জোরে দূরে নিক্ষেপ করা হয় এবং সেই তরল ধারাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া শত্রুর মধ্যে অগ্নিবৃষ্টি করা হয়। এই কৌশল জারমানদের উদ্ভাবন। ইহা এই যুদ্ধের সময় দায়ে ঠেকিয়া তবে উদ্ভাবিত হইয়াছে এমন নহে, যুদ্ধের বহুপূর্বে হইতেই ইহার উদ্ভাবন, পরীক্ষা ও উন্নতিসাধন হইয়া আসিতেছিল। প্রথমে একটা বাঁধা চৌবাচ্চা হইতে নল লাগাইয়া সহজদ্বারা তরল পদার্থ



তরল আগুন নিষ্কেপের বহনক্ষম কল।

- A কার্বনিক এসিড।
G গ্যাস।
P গ্যাসোলিন।
R ভলভ।
I আগুন জ্বালাইবার চকমকি।
J অগ্নিশিখা।

ছড়ানো হইত এবং সেই নলের মুখে যেখান হইতে তরল পদার্থ বাহির হইত ঠিক সেইখানে এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগানো থাকিত বাহা তরল পদার্থের নির্গমনের তোড়ে সেই তরল পদার্থের ধারায় আগুন লাগাইয়া দিত। এই যন্ত্রে ৩০।৪৫ গজ দূরে অগ্নিধারা বর্ষিত হইতে পারিত, তাহার বেশী দূরে বাইবার পথেই তরল পদার্থটা জ্বলিয়া শেষ হইয়া বাইত। অধিকন্তু তরল পদার্থ নলের মুখেই জ্বলিয়া উঠিত বলিয়া যে লোক সেই নল হইতে অগ্নিবর্ণ করিত অতিতাপে তাহার অহুবিধা ত হইতই, তাহার বিপদেরও সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। তখন চেষ্টা হইতে লাগিল এমন উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে যাহাতে দহনশীল তরল পদার্থ লক্ষ্যস্থানে পড়ার আগে প্রজ্বলিত হইবে না। ইহাতে দাহ তরল-পদার্থের অনাবশ্যক দাহন নিবারণ হইবে। ইহার জন্ম একটা দোনলা তরল-আগুন-দাগার বন্ধুত্ব তৈয়ারী করা হইল। তাহার একটা নল আরেকটার উপরে এবং উপরের নলটা নীচের নলের চেয়ে ছোট। বন্ধুটটা একটা তেপালার উপর এমনভাবে বসানো যাতে তাহা চারিদিকে ঘুরাইতে পারা যায়। এই বন্ধুকের দুই নল হইতেই একসঙ্গে তরল দাহপদার্থ ছোড়া হয়, কিন্তু কেবল উপরের নলের ধারা আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠে। উপরের ছোট নলের এই সরু অল্প ধারা বড় নলের বড় ধারার সহিত ইচ্ছামত-স্থানে যোগ করিবার উপায় থাকিতে ইচ্ছামত-স্থানে বড় ধারাটিতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া সহজ হইয়াছে। বড় ধারায় আগুন ধরিয়া গেলেই সরু ধারাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বড় ধারার অগ্নিশ্রোত সমুখের দিকেই বহিয়া যায়, শ্রোতের উজান চেলিয়া নলের মুখগাথায় জ্বলিয়া উঠে না। এই অগ্নিধারা মাটিতে পড়িয়া আগুনের পর্দার মতন ছড়াইয়া পড়ে এবং বতরুণ পর্যন্ত তরল পদার্থ ধোরাক পায় ততক্ষণ

জ্বলিতে থাকে। নল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আগুনের পর্দা নানানদিকে অবিচ্ছেদ্য ছড়াইয়া দেওয়া চলে। অনেক সময়, কিছুক্ষণ ধরিয়া শত্রুর সীমানায় দাহ-তরলপদার্থ বর্ষণ করা হয়, তারপর নলের মুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত তরলধারা যেখানে মাটি স্পর্শ করিতেছে ঠিক সেইখানে ছোট নল হইতে অগ্নিধারা নিষ্কেপ করিয়া সমস্ত ভিজা জায়গা জ্বালাইয়া তুলিয়া মহামারী-কাণ্ড বাধাইয়া দেওয়া হয়। প্রথমে যখন বাধা-চৌকি হইতে তরল পদার্থ নিক্ষিপ্ত হইত তখন কার্বনিক এসিড গ্যাস বা অপর কোনো গ্যাসের চাপে তরলধারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু গ্যাসের অধিকাংশই দাহ তরল পদার্থে শোষিত হইয়া বাইত বলিয়া চাপ কম হইত এবং তরলে গ্যাসে মিশিয়া যাওয়াতে তরল পদার্থ ফেনিল হইয়া উঠিত এবং তাহাতে সর্বত্র সমানভাবে জ্বলিত না। এই-সমস্ত অহুবিধা দূর করিবার জন্ম এখন পাশ্প ব্যবহার করা হয়। এই তরল আগুন হস্তির জন্ম আলকাতরার তেল ব্যবহার করা হয়। এই তেলে আগুন লাগিলে খুব ঘন পাণ্ডটে রঙের ধোঁয়া হয়; তাহাতে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি বন্ধ হইয়া ত বায়ই, অধিকন্তু তাহার দুর্গন্ধে তাহার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এখন বহিয়া বেড়াইতে পারিবার মতন ছোট ছোট কলও নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।

* *
*

অপরাধীর মন পরীক্ষা—

আজকাল সকল বিষয়ে মনোবিজ্ঞান আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। অপরাধীরা অস্ত্র অপকর্ষণ করে, সমাজ-স্থিতির জন্ম তাহাকে ধরিয়া তাহার প্রতি নানাবিধ শাস্তি বিধান করিয়া সমাজ-রক্ষকেরা এতদিন নিশ্চিন্ত হইতেছিলেন। এখন মনোবিজ্ঞান বলিতেছে অপরাধীরাও ত সমাজের অঙ্গ, তাহার সমাজ-দ্রোহিতা কেন করে তাহাদের সেই মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তদুচিত ব্যবস্থা করা সমাজের কর্তব্য। অনেক সময় অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে চুরি, খুন, ঘরে আগুনলাগান প্রভৃতি অপকর্ষণ করিবার ঠোক সেই-সেই অপরাধীর সেই ব্যাধির চিকিৎসায়, তাহাকে কয়েদ করিয়া শারীরিক কষ্ট দিয়া বা ফাঁসি দিয়া নহে। এইজন্ম বহু মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের অভিমত যে পুলিশ-ধানী ও আদালতের সঙ্গে এক-একটি মনস্তত্ত্ববিচারের শাখা-বিভাগ থাকা আবশ্যক এবং প্রত্যেক অপরাধী আসামীর মন তন্নতন্ন করিয়া বিচার করিয়া তবে তাহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। অপরাধীদের মন পরীক্ষার জন্ম নিউইয়র্কের পুলিশ-বিভাগের সহিত একটি মনস্তত্ত্ববিভাগ যোগ করা হইয়াছে। এই বিভাগে মনস্তত্ত্বজ্ঞেরা অপরাধীর মন পরীক্ষার বিবিধ উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, অপরাধী আসামীকে সেই-সকল উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়—তাহাদের মন স্বস্থ স্বাভাবিক অথবা অস্থস্থ ব্যাধিগ্রস্ত।

(১) বিচারাদীন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিতরূপ কতকগুলি শব্দ দিয়া চটপট তাহার উদ্ভূত শব্দ বলিতে বা লিখিতে বলা হয়—

ভালো	বাহির	শায়
লখা	বড়	জোরে
সাদা	আলো	স্থখী
মিথ্যা	পছন্দ	ধনী
অস্থস্থ	খুসি	পাতলা
খালি	যুদ্ধ	বন্ধু

(২) তাহাদিগকে কতকগুলি বাক্য দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে-মধ্যে এক-একটি শব্দ উচ্চ থাকে; সেই স্থানে বিচারাদীন ব্যক্তিকে চটপট এক-একটি উপযুক্ত শব্দ বসাইতে বলা হয়।

(৩) একটা তক্তার গায়ে কতকগুলি ছবি আঁকা থাকে এবং



মন পরীক্ষার যন্ত্র।

একখানি তক্তার গায়ে কতকগুলি ছবি আঁকা আছে এবং ছবির পাশে পাশে একএকটা চৌকা খাঁজ কাটা আছে। কতকগুলি কাঠের ব্লকে ভিন্ন ভিন্ন ছবি আঁকা আছে। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে তক্তার খাঁজের মধ্যে এমন ব্লক বাছিয়া বসাইতে হইবে যাহাতে তক্তার ও ব্লকের ছবি মিলিয়া একটা মানে হয়। তক্তার মাঝখানে দুজন ছেলে যে-ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে বুঝা যায় যে তাহারা ফুটবল খেলিতেছে। তাহাদের মধ্যকার খাঁজে ফুটবলের ছবি না বসাইয়া অন্য কিছু ছবি বসাইলে মানে হইবে না। এবং তাহাতে সেই ব্যক্তির অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। অবশ্য ব্যক্তির পূর্বে অভিজ্ঞতার উপর সফলতা ও বিফলতা নির্ভর করে।

একএকটা ছবির কাছে একএকটা চৌকা ঘর কাটা থাকে; কতকগুলি চৌকা কাঠের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছবি আঁকা থাকে; বিচার্যধীন ব্যক্তিকে বলা হয় তক্তার গায়ে আঁকা ছবির ভঙ্গির সহিত খাপ খাওয়াইয়া মানে হয় এমনভাবে ছবি-আঁকা চৌকা কাঠগুলি তক্তার গায়ের খাঁজে খাঁজে বসাইয়া দিতে। এই কার্যে যে যত ভুল করে তাহার মন তত অপরিণত বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৪) বিচার্যধীন ব্যক্তিকে একটা কোনো নয়া নকল করিতে দেওয়া হয়; সেই নয়া সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না, তাহার সামনে একখানা আয়না খাড়া থাকে তাহার মধ্যে সেই নয়া প্রতিফলিত দেখে, সেই আয়নার ছায়া দেখিয়া তাহাকে নকল করিতে হয়; সে যে-কাগজে নয়া আঁকে সে-কাগজও সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না, তাহার হাতের উপর একটা ডালা আড়াল থাকে, তাহাতে সে আপনায় আঙুল ও পেনসিলের নড়াচড়া দেখিতে পায় না, কেবল দেখিতে পায় আয়নার ছায়াতে। যে-ব্যক্তি যতশীঘ্র নিতুলভাবে ঐ নয়ার নকল করিতে পারে সে তত বুদ্ধিমান ও তাহার মন তত স্থির বলিয়া নির্ণীত হয়; যে-বার দশকেও নকল করিয়া উঠিতে না পারে তাহার মন অত্যন্ত অস্থির বলিয়া ধরা হয়।

মানুষের বাড়তির-বয়স —

গ্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরা লম্বা। এই পার্থক্য তাহাদের জন্মের সময় হইতেই থাকিতে দেখা যায়। ধোকার সাধারণত বৃদ্ধির চেয়ে ২ ইঞ্চি বড়। পূর্ণ বয়সে এই পার্থক্য প্রায় ৪ ইঞ্চিতে দাঁড়ায়। জার্মানীতে মানুষের বাড়ির নিয়ম সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান নিম্নলিখিত ফল নির্ধারিত হইয়াছে।

শিশুরা প্রথম বৎসরে বেশ গোলগাল মোটামোটা থাকে; তৃতীয় চতুর্থ বৎসরের শেষে সে হঠাৎ মাথা চোড়া দিয়া উঠে এবং সেইজন্ম রোগা দেখায়; তারপর কিছুদিন একটু ধমধমে থাকিয়া আট হইতে এগার বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার হঠাৎ বাড়িতে থাকে। এইরূপে একবার বাড়িয়া কিছুদিন বাড় স্থগিত থাকে, তারপর আবার বাড়। বাড় স্থগিত থাকিবার সময় দেহ মোটা হয়, আবার বাড়িবার সময় রোগা হইয়া যায়। ট্রাউন্স নামক একজন গবেষকের অনুসন্ধানের ফল এইরূপ—

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| (১) প্রথম মোটা হওয়ার বয়স | ২ হইতে ৫ বৎসর |
| (২) প্রথম লম্বা হওয়ার বয়স | ৬ হইতে ৮ বৎসর |
| (৩) দ্বিতীয়বার মোটা হওয়ার বয়স | ৯ হইতে ১১ বৎসর |
| (৪) দ্বিতীয়বার লম্বা হওয়ার বয়স | ১২ হইতে ১৬ বৎসর |
| (৫) পূর্ণতার বয়স | ১৭ হইতে ২৫ বৎসর |

ভাইসেনবার্গ-নামক আর-একজন অনুসন্ধানকারীর মতে মানুষের দেহের পরিণতি ও অবনতির বয়স এইরূপ—

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| (১) প্রথম মোটা হওয়ার বয়স | ২ থেকে ৪ বৎসর |
| (২) প্রথম লম্বা হওয়ার বয়স | ৫ থেকে ৭ বৎসর |
| (৩) বৃদ্ধি স্থগিত— | |

বালক—৮ থেকে ১২ বৎসর

বালিকা—৮ থেকে ১০ বৎসর

- (৪) দ্বিতীয়বার লম্বা হওয়ার বয়স—

বালক—১৩ থেকে ১৮ বৎসর

বালিকা—১১ থেকে ১৫ বৎসর

- (৫) স্থগিত বৃদ্ধি—

যুবক—১৯ থেকে ২৬ বৎসর

যুবতী—১৬ থেকে ১৯ বৎসর

- (৬) স্থগিত বৃদ্ধি ও দ্বিতীয়বার মোটা হইবার বয়স—

২৬ বা ১৯—হইতে ৫১ বৎসর পর্যন্ত।

- (৭) অবনতির বয়স

৫২ হইতে ৭৬ পর্যন্ত।

লম্বার বাড় পূর্ণ হয় গ্রীলোকের ১৮ বৎসরে এবং পুরুষের ২৫ বৎসরে। কোনো কোনো জাতি ইহার পরও একটু বাড়। ২৬ হইতে ৫১ বৎসরের মধ্যে শরীরের দৈর্ঘ্য সমান থাকে, তারপর বার্কোর বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অঙ্গ-অঙ্গ কমে। জন্ম হইতে পূর্ণ পরিণতির বয়স পর্যন্ত শরীরের ওজন ক্রমাগত বাড়িতে থাকে এবং লম্বা হইয়া ওঠার বয়স পার হওয়ার অনেকপরে মানুষ ওজনের চরমে উঠে—সাধারণত পুরুষ ৪০ বৎসরে এবং গ্রীলোক ৫০ বৎসরে সবচেয়ে বেশী ভারী হয়। তারপর আবার ওজনে কমেতে থাকে। অবশ্য বিশেষ কোনো কারণে বা অবস্থায় মানুষ-মোটা হইয়া পড়িলে ইহার ব্যত্যয় ঘটে। ১০ বৎসরের পর মেয়েরা চট করিয়া ছেলেরদের মাধ্যম ছাড়াইয়া উঠে, কিন্তু ১৬ বৎসর বয়সে ছেলেরা মেয়েদের নাগাল ধরিয়া ছাড়াইয়া যায়।

নীতের চেয়ে ক্রীমকালে দৈর্ঘ্য ও ওজন বেশী হয়। শিশুরা সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়ে না বলিলেই হয়; ফেব্রুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত একটু বাড়ে; সবচেয়ে বেশী বাড়ে জুলাই ও আগষ্ট মাসে। মানুষের ওজন সবচেয়ে বেশী হয় আগষ্ট হইতে জানুয়ারীর মধ্যে। অল্প সময় হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

চাপ।

বেদ-মন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচার্য্য

দ্বিতীয় স্তবক—অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

“The particular kind of matter forming as it were the body of the Logos, Heraclitus believes to be Fire.”

অগ্নি পদার্থটা কি—তাহা ভাবিয়া দেখা যাক। অগ্নি যে, ঘর্ষণ-ক্রিয়া'র রূপান্তরিত পরিণাম, তাহা সকলেরই দেখা কথা। ঘর্ষণ-ক্রিয়া হইতে সর্বপ্রথমে তাড়িৎক (electricity) উৎপন্ন হয়; তাহার পরে তাড়িৎক ক্রোড়ে করিয়া তাপ উৎপন্ন হয়; তাহার পরে তাড়িৎক এবং তাপ ক্রোড়ে করিয়া দীপ্তি উৎপন্ন হয়। এই যে, তাড়িৎক-এবং-তাপ-গর্ত দীপ্তি, ইহারই নাম অগ্নি। ঘর্ষণ-ক্রিয়া হইতে অগ্নিকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া দর্শক যদি বলেন যে, উৎপাদ্যমান অগ্নি উৎপাদিকা ঘর্ষণ-ক্রিয়ার পূর্বে ছিল না, তবে তাহার সে কথা শাস্ত্রানুমোদিত নহে;—শাস্ত্রে বলে যে, কাষ্ঠ-ঘর্ষণ হইতে অগ্নি-যাহা যখন উৎপন্ন হয়—ঘর্ষণ-ক্রিয়ার পূর্বে তাহা ঘৃষ্য কাষ্ঠে অব্যক্ত শক্তি-রূপে অন্তর্নিগূঢ় থাকে; আর সেই যে অব্যক্ত-শক্তিরূপী অগ্নি তাহা সমস্ত জগতের গোড়া-মুগ্ধাসা ক্রিয়াশক্তি—তাহা সেই সর্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি যাহার পৃষ্ঠে সর্ববিষয়গত জ্ঞান সংযুক্ত রহিয়াছে। পূর্বস্তুবকে আমরা ধারাবাহিক পদ্ধতি-অনুসারে দেখি-য়াছি যে,

(১) Logos = Word = বাণী

(২) - বিদ্যাবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সবস্বতী

(৩) = জগৎস্বত্ব সমস্ত জীবের বোধাবোধাত্মিকা সমষ্টি-বুদ্ধি

(৪) = সগতিবোধ + অবোধ অধ্যবসায়

(৫) = সর্ববিষয়গত জ্ঞান + সর্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি।

এক্ষণে দেখিতেছি এই যে, সেই যে সর্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি, যাহার মূলে রহিয়াছে সর্ববিষয়গত জ্ঞান, তাহা সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদিকা এবং নিয়ামিকা জ্ঞানগর্ত ক্রিয়াশক্তি যাহার যাবনিক নাম Logos—শাস্ত্রীয় নাম হিবণ্য-গর্ত—আট-পছরিয়া নাম অগ্নি এবং বৈজ্ঞানিক নাম আদিত্য। এ যাহা আমি বলিলাম, ইহার একটি কথাও আমার নিজের বানানো বা সাজানো বা টানিয়া বুনিয়া ঘটাইয়া দাঁড় করানো কথা নহে—সমস্তই পুরাতন বৈদিককালের ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিদিগের হৃদয়গত কথা। যদি বল,—“তাহাব প্রমাণ কি?” তবে নিম্নে প্রণিধান কর।

কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীর ১৫শ শ্লোকে আছে—

“[যমো] লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ [নাচিকেতসে]” (বাংলা) “যমরাজা নচিকেতাকে সেই লোকাদি অগ্নির বিষয় বিবরিয়া বলিলেন।” এই লোকাদি অগ্নির অর্থ শাক্তরভাষ্যে ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ;—“লোকাদিং লোকানাং আদিং প্রথম-শরীরিহাং।” [বাংলা] “লোকাদি কিনা ভুলোক তুলোকাদি সমস্ত লোকের আদি—প্রথম শরীরী।”

আবার কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর ১০ম শ্লোকের শাক্তরভাষ্যে আছে—

“অব্যক্তাং প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্তং তস্মৈ” [বাংলা] “হৈরণ্যগর্ততত্ত্ব, অথবা যাহা একই কথা—হিরণ্যগর্ত, অব্যক্তের প্রথম-জাত সন্তান।”

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১ম সূক্তে ৭ম ঋকে আছে—

“দক্ষস্ত (অর্থাৎ অগ্নে:) জন্ম্ন অদিতেরূপস্তু (অর্থাৎ অদিতে গর্তে)। . . . অগ্নিহি নঃ প্রথমজা।” [বাংলা] “অগ্নির জন্ম অদিতির গর্তে আদিত্যরূপে—অগ্নি আমাদের মধ্যে প্রথম জাত।”

তবেই হইতেছে যে, অগ্নি = সূর্য্য; লোকাদি অগ্নি = আদিত্য। এই-সকল বেদোপনিষদের বাক্য একটাই জড়ো করিয়া আমরা পাইতেছি—

লোকাদি অগ্নি = সর্ব লোকের আদি প্রথম শরীরী = প্রকৃতির প্রথম জাত সন্তান হিবণ্যগর্ত = আদিত্য।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয় দ্রষ্টব্য এই যে, কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বঙ্গীর ১৩শ এবং ১২শ এই দুইটি শ্লোকে উপরিউক্ত লোকাদি অগ্নিকে বলা হইয়াছে “স্বর্গ্য (অর্থাৎ স্বর্গীয়) অগ্নি ।” বেদে আবার একথাও লেখে যে, এই যে লোকাদি স্বর্গীয় অগ্নি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ইনি মধ্যে মধ্যে নর-লোকে আগমন করিয়া হোতাগণের পূজা গ্রহণ করেন ; তার সাক্ষী :—

“আজগম্যান্ অগ্নি ব্রহ্মা নৃষদনে বিধর্তা । আ যং হোতা যজতি বিশ্ববারং ।” ইতি ঋগ্বেদ । ৭ম মণ্ডল । ৭তম সূক্ত । ৫ম ঋক্ । [বাংলা] বিশ্ব-বিধারক অগ্নি ব্রহ্মা নর-সদনে আগমন করিয়াছেন ; ইনি সেই বিশ্ববরণীয় দেবতা ঋষাকে হোতার উপাসনা করেন ।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

“The following are the most important of Heraclitus’ theological fragments :

প্রথম Fragment ।

“There is but one Wisdom [তাহা বেদান্ত]

দ্বিতীয় Fragment ।

“This world-order, the same in all things, no one of Gods or men has made ; but it always was, is, and shall be ever-living fire, kindled in due measure and extinguished in due measure.”

এই দ্বিতীয় Fragment সম্বন্ধে

মন্তব্য ।

দেশীয় শাস্ত্রে বলে—

(১)

World-order = জগৎব্যাপারের অখণ্ডনীয় বিধান
= বিলি = ব্রহ্মা = লোকাদি অগ্নি ।

(২)

সৃষ্টিকালে বিলি, সকলের আগে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হ’ন—লোকাদি অগ্নি kindled হ’ন ; প্রলয়কালে তিনি সকলের শেষে অব্যক্তের জোড়ে নিলীন হ’ন—লোকাদি অগ্নি extinguished হ’ন, সৃষ্টিকালে বিলি অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হন, প্রলয়কালে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হন, এই

শ্রী কোবল, তা বই, তিনি জন্মেনও না—মরেনও না ; বিলি always was, is, and shall be ever-living Fire, kindled in due measure and extinguished in due measure. “বিলি জন্ম-মৃত্যু-বিহীন” এ কথাটির একটু টীকা করা আবশ্যক । [টীকা] অব্যক্ত প্রকৃতির এ পিঠে ব্রহ্মা বা অপর-ব্রহ্ম, ও-পিঠে পরব্রহ্ম ; পরাপর ব্রহ্ম একই ব্রহ্ম, স্বতরাং জন্ম-মৃত্যু-বিহীন ।

তৃতীয় Fragment ।

God is day and night, winter and summer, war and peace, satiety and hunger [বেদান্ত মৃতিমান্]. But he is changed, just as fire, when mingled with different kinds of incense, is named after the flavour of each.

এই তৃতীয় Fragment-এর

শেষের কথাটির সম্বন্ধে

মন্তব্য ।

ঠিক এই কথাটি কঠোপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ২য় বঙ্গীর ১ম শ্লোকে প্রাচীরের আড়াল-বর্জিত প্রমুক্ত ভাবে বলা হইয়াছে এইরূপ :—

“অগ্নি ঈধিকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব । এক স্তথা সর্বভূতান্তরায়া রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিচ্চ ॥” [বাংলা] এক অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করিয়া যেমন রূপে রূপে প্রতিক্রপ হয়, অর্থাৎ যেমন-যেমন রূপের সঙ্গে মেশে তেমনি তেমনি রূপ ধারণ কবে, সেইরূপ এক যিনি সর্বভূতের অন্তরায়া তিনি রূপে রূপে প্রতিক্রপ হ’ন ; আবার, রূপের সংস্রব হইতে বাহিরেও থাকেন, অর্থাৎ রূপে-রূপে প্রতিক্রপিত হওয়া সম্বন্ধে স্বরূপে ভর করিয়া অলগ্ থাকেন—পদ্মপত্র-স্থিত জলবিন্দুর তায় নিলিপ্ত থাকেন । “নিলিপ্ত থাকেন” এ কথাটি আরো স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া বলা হইয়াছে ১১শ শ্লোকে ১ যথা ; সূর্য্যো যথা সর্বলোকান্ত চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষে বাহু দোষৈঃ । এক স্তথা সর্বভূতান্তরায়া ন লিপ্যতে লোকভূতেন বাহুঃ । [বাংলা] সূর্য্য যেমন সর্বলোকের চক্ষু হইয়াও চক্ষুগোচর বিষয়-সকলের কোনো-প্রকাব দোষে লিপ্ত হয় না, তেমনি

একশ্মিনি সৰ্ব্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি লোকহুঃখে
লিপ্ত হ'ন না।

James Adam মহোদয় তাহার পরে বলিতেছেন—

“In the second of the fragments cited above, Heraclitus identifies the cosmos with this element (অর্থাৎ with fire). ‘This cosmos * * * * always was, is and shall be ever-living. Fire, kindled in due measure and extinguished in due measure. Taken strictly, of course, these words involve a contradiction. When Fire is extinguished, it must cease to be; and if it ceases to be, we cannot justly say that it always is. But in saying that Fire is extinguished, Heraclitus means only that it passes into something else; and we must suppose that the other substances into which Fire passes were declared by Heraclitus to be themselves particular forms or manifestations of that element. In other words, Heraclitus maintained that all things are Fire, because Fire is transformed into all things.’”

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপরে দ্যৌ, অন্তরীক্ষে পঙ্কজ, নীচে পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ নর-নারী, সন্তান ই অগ্নি; তা'র সাক্ষী:—পঞ্চম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ডে আছে [প্রবাহন রাজা গৌতমকে সন্বোধন করিয়া বলিতেছেন] “অসৌ বাব লোকো গৌতম অগ্নি:।” [বাংলা] “ঐ লোক (অর্থাৎ ছালোক), গৌতম, অগ্নি:।” ৫ম খণ্ডে আছে—“পঙ্কজো বাব গৌতম অগ্নি:।” [বাংলা] “পঙ্কজ, গৌতম, অগ্নি:।” ৬ষ্ঠ খণ্ডে আছে—“পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নি:।” [বাংলা] “পৃথিবী, গৌতম, অগ্নি:।” ৭ম খণ্ডে আছে—“পুরুষো বাব গৌতম অগ্নি:।” [বাংলা] “পুরুষ, গৌতম, অগ্নি:।” অষ্টম খণ্ডে আছে—“যোষা বাব গৌতম অগ্নি:।” [বাংলা] “স্ত্রী, গৌতম, অগ্নি:।”

এটা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, অগ্নির এই পঞ্চ মূর্তির ভিতরেই তাহার ত্রিমূর্তি সম্বন্ধ রহিয়াছে। ত্রিমূর্তি সে—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র। এ যাহা আমি বলিলাম, এ কথা সত্য কি মিথ্যা—নিম্ন-প্রদর্শিত আগম-প্রমাণ-দৃষ্টে স্ববিদ্বান পাঠক মহোদয়ের তাহা জানিতে বাকি থাকিবে না।

ঋক্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৫১তম সূত্রে ৫ম ঋকে আছে—
“দ্যৌ পিতা, পৃথিবী মাতর অঙ্ক, অগ্নে ভাতর, বসবো,
মুড়তা (অর্থাৎ সূর্যত—স্বর্গী কর) নঃ। বিধে আদিত্যাঃ,

অদিতে, সন্ধ্যাঃ (অর্থাৎ সবাই মিলিয়া) অশ্বভ্যাঃ শর্ধ
বহলং বিয়ন্ত [বিয়ম—নিয়ম—বিধান;—“বিয়ন্ত”—বিধান
কর] [বাংলা] “হে পিতা দ্যৌ, * হে মা অন্নদা পৃথিবী, *
হে ভাই অগ্নি, হে বহু'রা সবে, আমাদিগকে স্বর্গী কর।
হে আদিত্য সবে, হে অদিতি, তোমরা সবাই মিলিয়া
আমাদিগকে বহল কল্যাণ বিধান কর (অর্থাৎ প্রদান
কর)।”

এমতে পাইতেছি—দ্যৌ=পিতা, পৃথিবী=মাতা।

ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের নর-নারীরূপী পিতৃমাতৃগণকে বৃহদ
ব্রহ্মাণ্ডের দ্যৌঃ-পৃথিবীরূপী পিতা-মাতা'র ক্রোড়ীভূত
করিয়া লইয়া পাইতেছি:—

অগ্নির প্রথম মূর্তি।

জগৎস্বক্ৰ সমস্ত নরজাতি ক্রোড়ে-করিয়া-বিরাজমান
দ্যৌষ্পিতা।

দ্বিতীয় মূর্তি।

জগৎস্বক্ৰ সমস্ত নারী-জাতি ক্রোড়ে-করিয়া-বিরাজমানা
পৃথিবী-মাতা।

তৃতীয় মূর্তি।

জনগণের শাসন-কর্তা অন্তরীক্ষ-চর পঙ্কজ রাজা।

প্রথম মূর্তির (অর্থাৎ অগ্নির ব্রহ্মমূর্তির) গুণবাচক নাম
চারিটি:—

ব্রহ্মা=দ্যৌ-অগ্নি=পিতা-অগ্নি=আদি-সূর্য্য=লোকাদি
অগ্নি।

কঠোপনিষদে একস্থানে বাহাকে বলা হইয়াছে “লোকাদি”
অগ্নি, আর-একস্থানে তাহাকেই “নাচিকেতা” নামে নির্দেশ
করিয়া তাহার গুণ-কীর্তন করা হইয়াছে যথেষ্ট; বলা
হইয়াছে যে, এই অগ্নিই মুখ্যরূপে যজ্ঞমানদিগের স্বর্গ-লাভের
সেতু, এবং গৌণরূপে মুমুক্শুদিগের ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সেতু।
তার সাক্ষী:—কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় বঙ্গীর
২য় স্লোকে লেখে—সম-রাজা নাচিকেতা'কে বলিতেছেন
“যঃ সেতু রাজানানাং অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং। অভয়ং
তীতীর্ষতাং পারং নাচিকেতাং শকেমহি।” [বাংলা]
“যিনি যজ্ঞমানদিগের স্বর্গ-লাভের সেতু, সেই (লোকাদি)

* দ্যৌ পিতা=ছালোকরূপী পিতা=দ্য-পিতা=দ্য-পিতৃ=দ্য-
পিতর=দ্য-পিতর=Jupiter।

+ ঋক্ শব্দের অর্থ ভাষ্যে লেখে “দোহনশীলা”। পৃথিবী মাতা
অঙ্ক=অদোহনশীলা=অহুচ্ছা=শতদা=শ্রদা।

নাটিকেত অগ্নিকে আমি চমক করিতে সক্ষম হইয়াছি, আব, স সার সমুদ্র-তরণেজু-গণের অভয় পার যিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তাঁহাকেও জানিতে সমর্থ হইয়াছি।”

দ্বিতীয় মূর্তির (অর্থাৎ অগ্নিব বিষ্ণু-মূর্তির) গুণবাচক নাম তিনটি :—

বিষ্ণু = পৃথিবী-অগ্নি = মাতা-অগ্নি = বৈশ্বানর অগ্নি।

লোকাদি অগ্নি বা আদি সূর্য্য যেমন সৃষ্টির মূল, বৈশ্বানর অগ্নি তেমনি স্থিতির মূল। লোকাদি অগ্নি স্বর্গ্য অগ্নি—বৈশ্বানর অগ্নি পার্থিব অগ্নি। সাধকের ঈষ্ট-সিদ্ধির স্তম্ভ মস্তিষ্কে স্বর্গ্য অগ্নিতে ধ্যানাবেব আহুতি-প্রদান যতই আবশ্যক হউক না কেন—ঋত্বাগ্নিতে পার্থিব অগ্নির আহুতি-প্রদান তাহা অপেক্ষা কম আবশ্যক নহে। বৈশ্বানর অগ্নি শেখোল-জাতীয় অগ্নি। এই অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে থাকিয়া জল বাষ্প মস্তিকাদি’কে জীবন-যাত্রাব পাথেয় সম্বলে—ধাত্বাদি শস্ত্রে—পরিণত করে, এবং নরনারীগণের ঋত্রে থাকিয়া ভূক্ত অন্ন’কে রস-রক্তাদি প্রাণের উপকরণে পরিণত করে; তার সাক্ষী :—ঋত্রেদের ১ম মণ্ডলের ৫ম সূক্তে ১ম ঋকে আছে “নাভি বগ্নিঃ পৃথিব্যাঃ।” [বাংলা] “অগ্নি পৃথিবীর নাভি।” বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণে আছে “অয় মগ্নি বৈশ্বানরো যোহয়ং অস্তঃপুরুষে, যেনেদং অন্নং পচ্যতে যদিদং অদ্যাতে।” [বাংলা] “পুরুষের অন্তরে এই যে অগ্নি—যাহা দ্বারা ভূক্ত-অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়—ইনি বৈশ্বানর।” ইহাবই কল্যাণে গৃহস্থ সাধু-সম্পন্নেরা অন্ন ভোজন করিয়া, প্রিয় দর্শন করিয়া, এবং ব্রহ্মতেজে জলমান হইয়া, স্থখ-স্বচ্ছন্দে বাচিয়া বসিয়া থাকেন। তার সাক্ষী :—

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের একাদশাদি খণ্ড-পবম্পরায় লেখে যে, বাজা অশ্বপতি ছয়জন অভ্যাগত অসম্যক্ জ্ঞানী বৈশ্বানরবাদীকে একে-একে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন “অস্তি অন্নং—পশুতি প্রিয়ং—ভবতি অশ্ব ব্রহ্মবর্চসং কুলে—য এতমেবং আত্মানং বৈশ্বানরং উপাস্তে।” [বাংলা] “একুপ [অসম্যক্জ্ঞান-স্থলভ একাঙ্গ] বৈশ্বানর আত্মাকেও যিনি উপাসনা করেন—ভোজন করেন তিনি অন্ন, দর্শন করেন তিনি প্রিয়, কুলে তাঁহার হয় ব্রহ্ম-তেজ দেদীপ্যমান।”

তৃতীয় মূর্তির (অর্থাৎ অগ্নির রুদ্র মূর্তির) গুণবাচক নাম তিনটি :—

রুদ্র = আন্তরীক্ষ্য বজ্রাগ্নি = বাজা-অগ্নি = পজ্জ্ব অগ্নি।

এ অগ্নি আন্তরীক্ষ্য মহাদেব। ইনি প্রসন্ন হইলেন যদি—তবে তাঁহাব বনাগ্নি তা দেখে কে? অচিরাত্ অমৃতোপম বসবর্ষণ করিয়া পৃথিবী-মাতাকে অন্নপূর্ণা করিয়া তোলেন। ক্ষেপিলেন যদি তবে আব রক্ষা নাই! সেই দণ্ডে ঝঙ্কা-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুহূমুহ লেলায়মান বিদ্যুৎ-রসনায় এবং গগন-বিদ্যাবক বজ্র-হুঙ্কারে পৃথিবী-মাতাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কালী কবালী নৃমুণ্ডমালিনী করিয়া তোলেন। James Adam সাহেব অগ্নিব এই তৃতীয় মূর্তিব—রুদ্র মূর্তিব—ছোটো খাটো একটি ছবি Heraclitusএব পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন এইরূপ :—
“Fire is the thunder-bolt which steers all.”
এই অগ্নিরই, বজ্রাগ্নিরই একটা বিরাট ছবি কঠোপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ৩য় বস্তীর দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে আঁকিয়া দেখানো হইয়াছে এইরূপ :—

২য় শ্লোক ॥ “যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্র উদ্যতং য এতদ্বিহুবমৃতা শ্তে ভবন্তি।” [বাংলা] “নিঃসৃত হইয়াছে এইসব বাহা কিছু—সমস্ত জগৎ—প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মে (Logosএ) স্পন্দিত হইতেছে। এই মহদ্ভয় উদ্যত বজ্র’কে বাহাবা জ্ঞানে উপলব্ধি করেন তাঁহাবা অমর হ’ন।” তৃতীয় শ্লোক ॥ “ভয়াদশ্মাগ্নি স্তপতি, ভয়ান্তপতি সূর্য্যঃ। ভবাদিল্পশ্চ বায়ুশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।” [বাংলা] “এই উদ্যত বজ্রের ভয়ে, অগ্নি তাপিয়া উঠিতেছে—সূর্য্য তাপিয়া উঠিতেছে—মেঘ বায়ু এবং মৃত্যু দৌড়িয়া চলিতেছে।” এই অগ্নি বেদে স্তব হইয়াছে এইরূপ :—

“আ বো রাজানং অক্ষরশ্চ রুদ্রং হোতারং সত্যযজ্ঞং রোদস্তোঃ। অগ্নিঃ পুরা তনয়িত্বোঃ অচিন্ত্যং (অচিন্ত্য = অচেতন-ভাব = মৃত্যু;—পুবা অচিন্ত্যং = মৃত্যোঃ পুবা) হিরণ্যরূপং অবসে কণুধ্বং ॥” ঋগ্বেদ। ৪র্থ মণ্ডল। ৩য় সূক্ত। ১ম ঋক্ ॥ [বাংলা] “বজ্রের গায় সহসা আগমন-শীল মৃত্যুর পূর্বেই তোমরা—স্বর্গ মর্ত্যের ও যজ্ঞের যিনি রাজা, যিনি অমোঘ-ফলদাতা হোতা—সেই হিরণ্যমূর্তি

- রুদ্র অগ্নিকে ভজনা কব।” ঋগ্বেদের আর-এক স্থানে আছে—“ঋং অগ্নে রুদ্রঃ। ঋং বাটৈত্ব অরুণে ঋসি।” ৪র্থ মণ্ডল। ৩য় সূক্ত। ১ম ঋক্। [বাংলা] “তুমি, অগ্নি, রুদ্র। তুমি অরুণ-বর্ণ বায়ুতে করিয়া গমনাগমন কর।” [টীকা। বায়ু ধূলি-ধূসরিত হইলে বেক্রপ বিবর্ণ হয়, তাহাকেই এখানে বলা হইয়াছে অরুণবর্ণ—তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে।]

James Adam মহোদয় তাহার পরে বলিতেছেন—

“Fire, according to Heraclitus, is the everchanging substance to which alone reality belongs.”

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ডের গোড়াতেই আছে “নদেব সৌম্য ইদং অগ্রে আদৌ একমেবাদ্বিতীয়ং। * * * তং ঐক্যত বহুস্তাং প্রজ্ঞায়েত ইতি। তং তেজোহসৃজত।” [বাংলা] “সংই, সৌম্য, অগ্রে ছিলেন একমাত্র অদ্বিতীয়। তিনি দেখিলেন—‘আমার বহু হওয়া চাই—প্রজ্ঞায়মান হওয়া চাই’; তাই তেজ সৃষ্টি করিলেন।”

এইট এখানে বিশেষমতে বুঝিবা দেখা চাই যে, যিনি স্বরূপত একমাত্র অদ্বিতীয় never-changing substance কিনা **সং**, তিনি **বহু** হইবার মানসেই তেজ সৃষ্টি করিলেন; কাজেই তেজ বহুরূপী—ever-changing; আর এই যে ever-changing তেজ—এই ever-changing তেজ never changing **সং** হইতে—Reality-itself হইতে—টাটক-টাটকি বাহির হইয়াছেন বলিয়া ইহার (অর্থাৎ এই ever-changing তেজের) reality ব তুলনায় আর-আর বস্তুর reality realityই নহে। এই বেদোপনিষদের অভিপ্রায়-সঙ্গত সৃষ্টির গোড়াব রহস্যটি Heraclitusএর না-জানা ছিল এমন নহে, তাই তিনি বলিয়াছেন “Fire is the ever-changing substance to which alone reality belongs.” James Adam মহোদয় তাহার পরে কি বলেন দেখা যাক;—একি দেখি! আমাদের শাস্ত্রে যাহা বলে—এষে দেখি সেই **কথাটি** অবিকল! তিনি বলিতেছেন—

“The path of change he (অর্থাৎ Heraclitus) calls the ‘way up and down.’ Fire sinks through water into earth; and earth rises through r into fire.”

এষে দেখি সাংখ্যের অহলোম-প্রতিলোম পদ্ধতি সাক্ষাৎ মূর্তিমতী। Heraclitusএর এই সংক্ষিপ্ত বচনটির গায় হইতে ইংরাজি কোর্ভা পায়জামা ছাড়াইয়া লইয়া উহাকে এ দেশীয় ছুকুল-বস্ত্র পরিধান করাইলে উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহজ মূর্তি ধারণ করে কেমন দেখ চমৎকার! **অহলোম** ক্রমে—অগ্নি জলে—জল পৃথিবীতে পরিণত হয়। **প্রতিলোম** ক্রমে—পৃথিবী জলে—জল অগ্নিতে নিলীন হয়।

জিজ্ঞাসু। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ড হইতে আপনি যাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে কেবল পাইতেছি—সং হইতে তেজ বা অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু Heraclitusএর পুস্তকের খণ্ড-পত্র হইতে (fragment হইতে) Adam সাহেব যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পাইতেছি—অগ্নি জলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে। এ দুই কথার মধ্যে ঐক্য তো কিছুই আমি দেখিতে পাইতেছি না।

প্রবোধিত। ও দুই কথার মধ্যে ঐক্য যৎকিঞ্চিং যাহা আছে তাহা ঐক্যের পূর্বাভাস মাত্র—অরুণোদয় মাত্র; সুতরাং তাহাতে তোমার মনের ক্ষোভ না মিটিবারই কথা। ঐক্য কাহাকে বলে—তাহার যদি একটি দেয়া নমুনা দেখিতে চাও, তবে নিম্নে প্রণিধান কর।

ছান্দোগ্য উপনিষদের যে স্থানটির শিরোভাগ মাত্র একটু পূর্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে, তাহার সমগ্র অবয়বের অপরাপর অংশ বাদে শুধু কেবল প্রদর্শনীয় অংশগুলির মাত্রা গাঁথিয়া পাইতেছি আমরা এইরূপ :—

- (১) “সং ঐক্যত বহু সাং। তং তেজোহসৃজত।
- (২) তেজ ঐক্যত বহু সাং। তদাপোহসৃজত। (৩) আপ ঐক্যত বহু সাং। তা অম্নং অসৃজন্ত (পৃথিবী-লক্ষণং ইতি শাকরভাষ্যে)।” [বাংলা] “**সং** দেখিলেন—আমার বহু হওয়া চাই, তাই তেজ সৃজন করিলেন। **তেজ** দেখিলেন—আমার বহু হওয়া চাই, তাই জল সৃজন করিলেন। **জল** দেখিলেন—আমার বহু হওয়া চাই,” তাই পৃথিবী-লক্ষণাক্রান্ত অম্ন সৃজন করিলেন।

বেদশাস্ত্রে এই যাহা বলা হইয়াছে **বেদোচিত** ভাষায়, দর্শনশাস্ত্রে ঐ কথাটিই বলা হইয়াছে **দর্শ-**

নোচিত ভাষায় ; বলা হইয়াছে—অল্পোম-ক্রমে অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ঐ কথাটিই, আবার, Heraclitus বলিয়াছেন **সর্বনোচিত** ভাষায় ; বলিয়াছেন “Fire sinks through water into earth.” এক্য তো আর পাছে ফলে না—এক্য ইহারই নাম। ইতি প্রস্তোত্তর সমাপ্ত।

স্পষ্ট এই তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বেদোপনিষদের অভিপ্রায়-মতে ভূ-ভুব-স্বঃ, হবিহব ব্রহ্মা, **সর্বই** অগ্নি। কিন্তু হায়—পণ্ডিতবর James Adam. অমন-একটা জলজ্যাস্ত ঐতিহাসিক সত্য ঘূণাক্ষরেও দেখিতে পাইলেন না! আর, তাহা দেখিতে না-পাওয়া গুণে (বা দোষে) নিম্নলিখিত-চক্ষু শা-মোরোগের গ্রাঘ ভয়-শূন্ত হইয়া। Heraclitus-এর অগায়াস্ত মৌলিকতা সমর্থন করিবার চেষ্টায় বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন **এশ্বিনী-উজ্জ্বল-বৈশ্বা** যে, তাহার তোড়ের মুখে অকৃত্রিম সত্য-কথার দাঁড়াইতে পারা অসাধ্য হইত—যদি **সত্য** বালি'র বাধ হইত। কিন্তু **সত্য** বজ্রের বাধ। **সত্য** অটল এবং অজ্ঞেয়। উক্ত ইংরাজ মহোদয়ের প্রবল প্রতাপাশ্রিত বক্তৃতার তোড়ের মুখে, দেখুন তবে, আমি দুইটি অকৃত্রিম সত্য-কথা দাঁড় করাইতেছি **আড়ম্বল-শূন্য বিনোত বেশে** ; দুইটির কোনোটিকে যদি তিনি তিল মাত্রও নড়াইতে পাবেন তবে আমার কথা সর্বৈব মিথ্যা! সত্য কথা-দুটি বিষয়টাই বা কি, আর তাহার সম্মান পাইলামই বা আমি কেমন করিয়া—সমস্তই খোলাসা কবিয়া ভাঙিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন।

ভারতাস্ত্র শ্রেণীর পুরাতত্ত্ব-বেত্তাদিগের দোকান-সাহানিয়া কথায় **আব্বা** মিশি ভোলেন ভুলুন, **আগ্নি** কিন্তু তাহাতে ভুলি না এইজন্ত—যেহেতু উহাদিগকে **আগ্নি** যেমন চিনি, এমন আর কেহই না। তাই উহাদের কথায় আদবেই কর্ণপাত না করিয়া—যে-কথাটির প্রতি মিনিট দশেক ঠাहर করিয়া দেখিয়া আমার মন বলিল “এইটিই সম্ভবে”, সেই কথাটির সমুচিত প্রমাণ সংগ্রহ করিবার মানসে—করিলাম আমি একটি-অতি স্মৃষ্টির কার্য্য :—আমার একজন প্রজ্ঞেয় পরম

বন্ধু*, যিনি শান্তিনিকেতনের ক্রোড়স্থিত ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক এবং যাহার মতো বেদবিদ্যা-বিশারদ স্থপণ্ডিত আর একজন খুঁজিয়া পাওয়া ভার, তাঁহাকে বিহিত সংস্কারের সহিত পথপ্রদর্শক পদে বরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রের দেবতাধিষ্ঠিত নিভৃত গুহায় খালি-পায়ে ভক্তিনয় শরীরে সমস্মমে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কী? দেখিলাম যে অগ্নির প্রভাব-মাহাত্ম্যের সম্বন্ধে এমন একটিও নূতন কথা Heraclitus বলেন নাই যাহা বেদে বলে না। তখন আমি আশ্চর্য্যস্থিত হইয়া বেদবিস্তৃত সাধু মহাত্মাটিকে বলিলাম “দেখিলেন তো ব্যাপারটা! এখন Heraclitus-এর প্রকল্পিত অগ্নিব্রহ্ম-বাদের গোড়ার বৃত্তান্তটির সম্বন্ধে আপনার বিচারে যা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন।” তিনি বলিলেন “Heraclitus আমাদের দেশের বৈদিক অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।” এই গেল প্রথম সংখ্যক অকৃত্রিম সত্য-কথাটির বিবরণ বার্তা। দ্বিতীয় সংখ্যক সত্যকথাটির বিবরণ-বার্তা ইহা অপেক্ষা আরো আশ্চর্য্য,—তাহা বলিতেছি প্রণিধান করুন।

কতিপয় সপ্তাহ পূর্বে আমি একদিন আনমনে ছান্দোগ্য উপনিষদের পাঠা উন্টাইতেছি, আর, সময়ে-সময়ে চক্ষের সামনে যাহা পাইতেছি তাহার কতক কতক ধণ্ডাবয়ব হেলা-ক্রমে আওড়াইতেছি ;—হঠাৎ “প্রত্যক্ অগ্নিঃ আচমেৎ ন নিষ্টীবৎ তদব্রতং” [বাংলা] “ব্রত এই—(সাধক) অগ্নির প্রত্যভিমুখে আসন করিবেন না (জাঁচাইবেন না), নিষ্টীবন করিবেন না (অর্থাৎ থুতু ফেলিবেন না)” এই বচনটি যেই আমার চক্ষে পড়িল, আর অগ্নি Archimedes-এর গ্রাঘ আহ্লাদে গদগদ হইয়া “পাইয়াছি” বলিয়া লাফাইয়া উঠিলাম।†

পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে এটা জানেন সকলেই—যে, “অগ্নির প্রত্যভিমুখে কেহ নিষ্টীবন করিবেন না” এই নিষেধ-বচনটি পিথাগোরীয় বিধান-শাস্ত্রে বেদবাক্যের

* সংস্কৃত ভারতীয় কাণ্ডারী এবং কবীর-ভারতীয় ভাণ্ডারী ঐয়ুক্ত ক্ষিত্তিরোহন সেন।

† ছান্দোগ্য উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ১২শ খণ্ডের সর্বশেষের বচনটি দেখ।

মতো অলঙ্ঘনীয়; এটা কিছু জ্ঞানের না উহাদের এক ব্যক্তিও যে, ঐ নিষেধ-বচনটি “বেদবাক্যের মতো” শুধু না—উহা বেদবাক্যই। কিষে শুভক্ষণে আমি ছান্দোগ্য উপনিষদের একখানি জরাজীর্ণ পুঁতান পুঁথি হাতে লইয়া বিশেষ-কোনো-কারণ ব্যতিরেকে, শুধু-শুধু, তাহার পাতার পর পাতা উন্টাইতে বসিয়া গেলাম—দৈবের এ লীলা বুঝিতে পারে কাহার মাধ্য! যাহাই হোক না কেন—এখন-আর আমি পুরাতত্ত্ববেত্তাদিগের সভার মাঝখানে একথা বলিতে একটুও ভয় করি না যে, পিথাগোরীয় শাস্ত্রে ঐ নকল বেদবাক্যটি আসল বেদবাক্যেরই প্রতিধ্বনি। আমার বেদবিজ্ঞা বিশারদ অঙ্কেয় বন্ধু-মহাশয়টির মুখের প্রতি সহাস্তবদনে চাহিয়া তাঁহাকে আমি বলিলাম “এইবার পিথাগোরাস্ বমাল-স্বচ্ছ ধরা পড়িয়াছেন! আপনার কী মনে হয়?” তিনি বলিলেন “দেখিতেছি—আঁকা কেবল Heraclitus নহে—Heraclitus এবং Pythagoras উভয়েই বৈদিক অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—ইহা একটুও মিথ্যা নহে।” সাধু-মহাশয়টির এই কথা শুনিয়া আমাব উৎসাহানন্দ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। **এই** যে, আমি বলিলাম, “পিথাগোরীয় শাস্ত্রে আর-একটি নিষেধবচন আছে—সেইটি যদি আপনি বেদের মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে পারেন, তবেই আমি বলিব যে, আপনি ষথার্থই কাণীতে দণবারো বৎসর গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন—না যদি পারেন, তবে বলিব যে, আপনার বেদাধ্যয়ন কেবল অধ্যয়নই নাব! নিষেধ বাক্যটি সে—আর কিছু না ‘কেহ মাষ-ভক্ষণ (bean-ভক্ষণ) করিবেন না’ এইমাত্র।” বেদবিজ্ঞাবিশারদ অধ্যাপক-মহাশয় বলিলেন “যে-নিষেধবাক্যটির কথা আপনি বলিতেছেন—তাঁহা যজুর্বেদের অমুক অমুক স্থানে আছে ইহা আমি নিশ্চিত জানি; ছুঁথের বিষয় এই যে, যজুর্বেদের পুস্তকখানি আমার কাছে নাই। খুব সম্ভব যে, কলিকাতার কোন-না-কোনো স্তুবিখ্যাত পুস্তকালয়ে অহুসন্ধান করিলে তাহা পাওয়া যাইতে পারে।” আমি বলিলাম “তবে শুভমু শ্রদ্ধাং।” অধ্যাপক মহাশয় দিন-চারপাঁচ পরেই কলিকাতায় রওনা হইলেন, আর তাহাব দুই দিন পবেই

তাঁহার থলির মধ্য হইতে দুইটি বেদোক্ত নিষেধ-বচন বাহির করিয়া আমার হর্ষোৎফুল্ল বিস্মিত নয়নের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। সে-দুটি বেদ-বচন এই:—

“ন মাষাণাম্ অন্নীয়াদ্ অঘজ্জিয়া বৈ মাষাঃ।”

মৈত্রায়ণী সংহিতা (যজুর্বেদ)

১ম অধ্যায়। ৪র্থ স্থানক। ১০ম বচন।

[বাংলা] “সাধক মাষ ভক্ষণ করিবেন না—মাষ অযজ্জীয় অর্থাৎ দেবতার্থে ব্যবহার-যোগ্য নহে।”

পুনশ্চ:

“ন মাষাণাম্ অন্নীয়াদ্ অমেধ্যা বৈ মাষাঃ।”

কাঠক সংহিতা (যজুর্বেদ)।

যজ্ঞমান ব্রাহ্মণ। ৩২শ স্থানক। ৭ম বচন।

[বাংলা] “সাধক মাষ ভক্ষণ করিবেন না—মাষ অমেধ্য অর্থাৎ অপবিত্র।”

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

John ...

জাতের ভিতর ভাঙ্গা-গড়া ও ওঠা-নামা

(Emile Senart-এর করাণী হইতে)

গোড়া হইতেই আমি পাঠকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, যে,—বর্ণভেদপ্রণালীর গঠনের কাঠামটা অপবিবর্তনীয়, উহা অলঙ্ঘ্য ছোট-ছোট বেড়ার ঘেরে রুদ্ধ, বেশ সুবিবেচিত ও সুসমঞ্জসীভূত অংশে বিভক্ত—যাহার অক্ষুণ্ণ অখণ্ডতা স্তূনির্দিষ্ট মানমর্যাদার দ্বারা চির-রক্ষিত—এই যে একটি ভ্রান্ত ধারণা ইহা যেন কদাপি মনোমধ্যে পোষণ করা না হয়। আমি এই বিষয়ের আলোচনায় পুনরায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইতিপূর্বে স্থিরনির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষণের বর্ণনা কবায় পাঠকেব ধারণা ভ্রান্তপথে নীত হইবার আশঙ্কা আছে, তাই অন্তত এমন কতকগুলি তথ্যের ক্রিয়া-ফল দেখান আবশ্যক, যাহা এই বর্ণভেদতন্ত্রের বিশাল গঠনের মধ্যে,—একটা বৈচিত্র্যের, একটা সচলতার, একটা জীবনের পরিচয় দেয়। একদিকে নবীকরণের একটা আন্দোলন এই জাতের গঠনটিকে অনবরত নাড়া দিতেছে,—পবিবর্তিত করিতেছে; আবার অপরদিকে নির্দিষ্ট মর্যাদা-সোপান-বিজ্ঞানের যে তত্ত্বটি জাতের মধ্যে অহুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে,

তাহা উহার সংবক্ষণ ও স্থায়িত্ববিধানে সহায়তা করিতেছে। এই দুই বৃহৎ প্রবাহ, জাতের উপব দিয়া, পরস্পর উন্টা দিকে চলিয়াছে।

যাহারাই হিন্দুসমাজকে নিকট হইতে নিরীক্ষণ করিয়াছে তাহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবে যে, ভিতরের গঠন-সম্বন্ধে, পন্থামর্যাদাসম্বন্ধে ব্যবসায়সম্বন্ধে একটা “যাওয়া-আসা” নিয়ত চলিয়াছে। একজন সুস্পন্দনশীল এমন কথাও বলিয়াছেন যে, উত্তরাধিকারিত্বই যদি পববর্তী বংশের বিশেষাধিকার লাভের অমূল্য একটা যুক্তিসঙ্গত অমুমানের হেতু হয়, তবে ইহা একটা সামান্য অমুমানমাত্র বলিতে হইবে; অশেষ প্রকার অবস্থা এই অমুমানকে একটু রূপান্তরিত করে, অশেষ প্রকার অবস্থা এই অমুমানের মধ্যে অবরুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল দলিলপত্র আমাদের হস্তাবিগম্য, তাহার মধ্যে যে-কোন দলিল খুলিয়া দেখিলেই, প্রমাণস্বরূপ এমন-সকল তথ্য, নিদর্শন বা উক্তি পাওয়া যায়, যাহাতে করিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, এই পাশা-পাশি ও জড়াজড়ি ভাবে অবস্থিত জাতের অগংটায় একটা যুগল-আন্দোলন অবিরাম চলিয়াছে—একটা ‘ভাঙ্গন’, আর একটা ‘পুনর্গঠন’।

ব্রাহ্মণ, ‘রাজপুত’, জাতি এই জাতি-সাধারণ নামে পরিচিত বড় বড় জাতগুলা, আসলে ধরিতে গেলে, কতকগুলি জাতের সমষ্টি; বাস্তবিক একতা যাহা দেখা যায় তাহা উপবিভাগগুলির মধ্যে, উপ-জাতদিগের মধ্যে, গোষ্ঠীদের মধ্যে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি—এই কথাটা স্মরণে রাখা আবশ্যক :-

রাজপুত নামটা একটা সম্মানসূচক নামমাত্র—উহার অস্তিত্বই একটা অন্তর্গত শাখাজাতি, ও জাত রহিয়াছে,—যাহারা উৎপত্তির সম্বন্ধে, ব্যবসায়সম্বন্ধে, প্রথাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পঞ্জাবেব জাতিরা যে খুব ভিন্ন দেশীয় লোকের সংমিশ্রণ, ইহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কোন জাতিকে জাতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তার উত্তরে সে তার গোত্রের পরিচয় দেয়। একরূপ উত্তর দেওয়া জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে, কেননা গোত্রই তাহার প্রকৃত দেশ।

এই উপবিভাগগুলিও আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া

থাকে। নামগুলা ভিন্ন হইয়া যায়, ভেদবুদ্ধি নিজস্বাধা চালাইতে থাকে। এইরূপেই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যে, “দল”, “সমাজ”, “মেল” এই-সব নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গড়িয়া উঠিয়াছে; কোন স্থান-বিশেষের নিকটে গোড়ায় আসিয়াছিল বলিয়াই হউক অথবা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি উহাদের মধ্যে কোন বিশেষ প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিল বলিয়াই হউক, ঐ-সকল জাত এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়, এই দলের লোকদিগের জাতের দিগন্তসীমারটা শীঘ্রই রুদ্ধ হইয়া যায়। এই ছোট ছোট দলের মধ্যেই সংস্কারকের, নব-প্রবর্তকের একটা উপাদান রহিয়াছে—এই উপাদানের মধ্যবর্তিতা-যোগে, ধীরে ধীরে সাবধানে, নূতন আচার-ব্যবহারগুলা ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ও সেই সঙ্গে পুরাতন সংস্কার ও পুরাতন অভ্যাসগুলা ক্রমশঃ স্বস্থানচ্যুত হয়। ইত্যবসরে ইহার প্রথম পরিণামেই উপবিভাগগুলা জাতগুলা আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ কতকগুলি উপবিভাগ গড়িয়া উঠে, কিন্তু সংখ্যার হিসাবে উহার বড়ই দুর্বল; সকলবকম ছোটখাটো পরিবর্তনের দ্বারা এতটা মুক্ত ও বিস্তৃত যে, একরূপ উপবিভাগস্থাপনের পক্ষে কোন এক ক্ষুদ্র দলের মতামতই যথেষ্ট।

কোন একটা বিশেষ আচার-ব্যবহার হইতে একটা নূতন জাতের উদ্ভব হইতে পারে। উহার মধ্যে অল্প উপাদানও আছে। প্রথমেই, ভৌগোলিক ভাগ-বন্টন। উত্তর ভারতের জৈনগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, উহার ছয় জাতে গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে ব্যবসায়-গত কোনপ্রকার ভেদাভেদ লক্ষিত হয় না। স্থানান্তরযাত্রাকালে, আদিম গুঁড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন কোন এক শাখা প্রায়ই একটা বিশেষ-জাতে পরিণত হয়।

স্বকীয় উৎপত্তিসম্বন্ধে যাহারা কতকগুলি স্মৃষ্টি ও স্মৃতিস্তম্ভ স্থতিকথার রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে এই তথ্যটির যে রূপ স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এমন-আর কোথাও না। সোপানের সকল ধাপেই ইহা সপ্রমাণ হয়।

ধর্মও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। যদিও ইসলাম-প্রবর্তিত বিরুদ্ধ চেষ্টাকে জাত ঠেকাইয়া বাগিয়াছে, তথাপি

ইহা নিশ্চিত,—ভারত-আক্রমণ করিয়া ইসলামধর্ম, যে সব স্থানে পাকা-রকম আড়া গাড়িয়াছে, সেইসব স্থানে, ইসলামধর্ম এই সম্বন্ধে কতকটা চাক্ষুষ উৎপাদন করিয়াছে।

পশ্চিমাঞ্চলে, অনেক ব্যবসায়ী-শ্রেণী, কতকগুলি হিন্দু জাতিতে এবং কতকগুলি মুসলমানজাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল শুচিতা বিষয়ক ধারণার পার্থক্য—ভিন্নধর্মমণ্ডলীর বিশিষ্টতাকে একেবারে রহিত করিতে না পারুক, তাহার বন্ধন কতকটা শিথিল করিয়া দিয়াছে, উহাব ভিতরে সত্যকার কতকগুলি বিচ্ছেদ উৎপাদন করিয়াছে। আর, এটা বেশ মনে হয় যে মুসলমানের ভারত-বিজয়, জাতের বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে বোদ্ধার জাতকে সাদাসিধা শাখা-জাতির অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। শিখের ধর্মপ্রচারও অনেকগুলি জাতেব ক্রমবিকাশে সহায়তা করিয়াছে। শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া, কোন কোন জাত স্বকীয় সামাজিক পদমর্যাদা উন্নত করিবার উপায় লাভ করিয়াছে। তাহাদের এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক, কেননা, শাস্ত্রতঃ শিখ-ধর্মের ভিতর বর্ণভেদের কোন প্রকাব ধারণা নাই। তা ছাড়া স্পষ্ট দেখা যায়, জাতেব উচ্চতম সোপানে এইরূপ আবাহন করিবার সঙ্গে-সঙ্গে, বাহ্য নীচ ও মর্যাদাহানিকর বলিয়া খ্যাত এইরূপ কতকগুলি কাজ একেবাবেই পরিত্যাগ করা হয়। অবশ্য কতকটা গ্রায্য বলিয়া ইহা সমর্থিত হইতে পারে। অনার্য জাতিগণের কতকগুলি উপধর্মেরও প্রভাব এইক্ষেত্রে দেখা যায়। সত্য কি না বলিতে পারি না, কিন্তু কতকগুলি স্বযোগ্য বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেন ওঝা-পুরোহিতের কতকগুলি বিভাগকে ব্রাহ্মণ-উপাধি দিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। যেমন মনে কর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ওঝা-ব্রাহ্মণ, আবে অল্লাহ ব্রাহ্মণ; উহাদের উৎপত্তিস্থানটা উহা অপেক্ষা বেশী গৌরবোজ্জ্বল নহে।

প্রকৃতপক্ষে যাহাকে হিন্দুধর্ম বলা যায়, সেই হিন্দুধর্মের অন্তর্গত অনেকগুলি জাত ও উপজাত, ধর্মসম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক কলা বিচ্ছেদ হইতে স্বকীয় বিশেষত্ব ও নিজস্ব লাভ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ের বা শৈবসম্প্রদায়ের লিঙ্গপূজাব উপব ভিত্তি স্থাপন করিয়া এক বিশেষ শ্রেণী

গড়িয়া তুলিয়াছে। লিঙ্গায়ের বা যে কারণেই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হউক না কেন, প্রধান বিভাগ জঙ্গমেরা ধর্ম সম্বন্ধীয় হেতুবশতই, পৌরোহিত্যের কাষ্য উপলক্ষেই, পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে ও স্বীয় প্রাধান্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বহুকাল হইতেই ভাষতে ধর্মসম্প্রদায়ের প্রচুর বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। এই উদ্ভিজ্জ-মূলত প্রাচুর্য্য রহিত হওয়া দূরে থাক, প্রাচ্য বংশব-বংশেরই নূতন সম্প্রদায় গজাইয়া উঠিতেছে। তবে একথা ঠিক, ঐ-সকল নূতন সম্প্রদায়কে আবার হিন্দুধর্মই উদরসাৎ করিয়া লয়। হিন্দুধর্মটা বহু উপাদানে নির্মিত হইলেও, সনাতন ধর্ম বলিয়া খ্যাত। সাধারণতঃ অতি সর্কারী গণ্ডীবিশিষ্ট এই-সকল ধর্মোন্মোদন হইতে শুধু কতকগুলি সম্মানসূচক উপাধি হয়। কঠোর তপস্বী ও ব্রহ্মচর্য্য তাহাদের জীবনের ব্রত হওয়ায়, জাতের প্রধান নিয়ম যে কুলক্রমিকতা, তাহা বর্জিত হয়। যেচ্ছাত্রতী লোকের দ্বারাই এই-একল সম্প্রদায়ের দলপুষ্টি হয় এবং অগ্রজাতেব লোকদিগকেও গ্রহণ করা হয়। তথাপি এইরূপ কতকগুলি সম্প্রদায়ের ভিতর জ্ঞাপুরুষ উভয়ই থাকায়, খুব সীমাবদ্ধ হইলেও উহার কতকগুলি কৌলিক জাতে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত যথা :—পুনায় “অরাদি” ও “ভারাদি”। “বৈরাগী” দলের লোকও অনেক, উহার প্রকৃত জাতেব মতো কতকগুলি উপ-বিভাগে বিভক্ত; কিন্তু এখনো ঠিক কৌলিক জাতে পরিণত হয় নাই।

গোঁসাইদের ভিতর জাতের ক্রমবিকাশটা আর-একটু বেশী অগ্রবর্তী হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা থাকায় উহার এক্ষণে রীতিমত আনুষ্ঠানিক জাতে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা :—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিকানীয়ারের এক রাজপুত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্জাবের “বিষ্ণবী” সম্প্রদায়ের জায় অল্প কতকগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মসম্প্রদায়ের কোন লক্ষণ বা নিয়ম আদৌ নাই। কোন নূতন মতের আধিপত্য-প্রভাবে, কতকগুলি লোক স্বকীয় পুরাতন দলকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবসায়সম্প্রদায় গড়িয়া তুলে, তাহারই এক দৃষ্টান্ত উক্ত সম্প্রদায়গুলি হইতে পাওয়া যায়।

জাতেব ভিতর, এই যেসব আন্মোদন উৎপন্ন হইয়া জাতেব বর্জন্য অবস্থাকে ক্রমাগত বদলাইয়া তুলে,

ঐ-সব আন্দোলন হয় ব্যক্তিগত নয়, সমাবেতচেষ্ঠা-প্রসূত। শক্তিশালী লোকের আশ্রয়ের জোবে, অথবা ছলে কোণলে, মিথ্যাবাদ বা উৎকোচদানে কতকগুলি লোক বিভিন্ন জাতের মধ্যে কোন-প্রকারে ঢুকিয়া পড়ে; যেখানে জাতের নিষেধের ততটা কড়াঙ্কড়ি নাই, ভারতের সেই সীমান্ত দেশে বিশেষরূপে এইরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটয়া থাকে। কোন সর্দারের খেয়াল অল্পদূরে সকল জাতের মধ্যে হইতেই কতকগুলি লোককে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ কোন জাত—যাহার ভিতর নিষেধের ততটা আঁটাঁটি নাই—অবস্থা-বিশেষে, নব-আগন্তুককে আপনাদের মধ্যে লইবার জন্ত সহজেই দ্বার খুলিয়া দেয়। এইরূপ কতকগুলি যাবাবর বা ছুর্ত শাখাজাতি, কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেই স্বীয় সহচরদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লয়।

নূনাদিক দৃঢ়বদ্ধ লোকসমষ্টির দ্বারাই এই-সকল লাক্ষণিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

এই-সকল পরিবর্তন দুইটি বিরুদ্ধ প্রবাহ অল্পসরণ করিয়া চলিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক মর্যাদা-সোপানের উচ্চতর ধাপে উঠিয়া কোন কোন জাত গড়িয়া উঠিয়াছে; আরও অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক জাত যাহারা ঘটনাচক্রে পড়িয়া কয়েক ধাপ নামিয়া পড়িয়াছে, তাহারা স্বকীয় অবনতি মাথা পাতিয়া অগত্যা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণিক প্রণালী-অনুসারে, যেসকল নিয়মে জাত নিয়মিত হয়, সেই শুদ্ধাকারের নিষম, পারিবারিক নিয়ম ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই জাতরূপ স্বীকারের কেন্দ্রকীলকটি অবস্থিত—সেই কীলককে বেঁটন করিয়াই জাতঘটিত সমস্ত আন্দোলন ও প্রচেষ্টা চলিয়া থাকে।

স্বল্প-সভ্য আদিমনিবাসী লোকেরা ক্রমশ হিন্দু হইয়া পড়িতেছে। উহারা যে প্রকরণ-অনুসারে হিন্দুধর্মের গণ্ডীর ভিতর আস্তে-আস্তে প্রবেশ লাভ করে তাহা লায়াল সাহেব বেশ নিপুণভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। আবার রিজলীও বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের চারি আদর্শ-ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। কতকগুলি দলপতি,—ভূম্পত্তি ও তৎসংলগ্ন প্রতিপত্তি অর্জন করিয়া, ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা উহাদের জন্য একটা বংশাবলী ও একটা পৌরাণিক উৎপত্তি-স্থান রচনা করিয়া দেয়। অথবা

কতকগুলি আদিমবাসী স্বকীয় আদিম নাম পরিত্যাগ করিয়া, কোন হিন্দুধর্মসম্প্রদায়ের ক্রোড়ে আপনাদিগকে নিঃক্ষেপ কবে। অথবা কোন সমগ্র শাখা-বংশ, হিন্দুধর্মের পত্নাকাতলে আদিয়া একটা নূতন জাত গড়িয়া তুলে; অথবা ক্রমবিকাশটা ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, এবং নাম পরিবর্তনের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে। সব ক্ষেত্রেই, হিন্দুউৎসব, হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্ত ও বিবাহের অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ এবং স্বীয় বংশের দীক্ষাগুরু ও পুরোহিতরূপে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অর্থদান করা—এই-সমস্তই উচ্চতর ধাপে উঠবার সুস্পষ্ট নিদর্শন। চারিদিক হইতেই ইহার রাশিরাশি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্য-ভারতের “মিনা”রা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের “বাগ্দি”রা, উড়িষ্যার “খোদ” ও “সান্তিয়া”রা—আরও কত আছে কে জানে। অনেকগুলি রাজপুত-গোত্র কি করিয়া অনার্য-শাখাজাতির নাম গ্রহণ করিল, এইরূপে তাহার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; নিশ্চয়ই এইরূপেই উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূম্পত্তিলাভে সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির সঙ্গে, পঞ্জাবের অনেক রাজপুত, গোত্র ও জাতের ধ্বংসাবশেষে যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

হিন্দুদের মধ্যে থাকিয়া যে সকল জাত বহুকাল যাবৎ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটয়া থাকে। এইরূপ “আহিরে”রা প্রাচীন পূর্বপুরুষদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া, কতকগুলি সমাজসংস্কার সাধন করিয়া, রমণী-দিগকে অন্তঃপূর্বে বন্ধ রাখিয়া ও বিধবাবিবাহ রহিত করিয়া, একটা বিশেষ জাতে পরিণত হইয়াছে। যে-সকল চামার হীন চামড়ার কাজ পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রবয়নের কাজ ধরিয়াছে তাহারা “জোলা-চামার” হইয়াছে। তারা উত্তম জোলায় সমস্ত অধিকার পূর্ণরূপে উপভোগ করে। কতকগুলি শূদ্র মেতরের কাজ ছাড়িয়া “মৌরলি” জাতে পরিণত হইয়াছে। আর অধিক দৃষ্টান্ত নাই।

আবার অধিকাংশস্থলে ইহার গতি উল্টা দিকেই দেখা যায়। উড়িষ্যায় করণ-জাতের জারজ সন্তানেরা একটা বিশেষ গোষ্ঠীরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ উড়িষ্যা প্রদেশেই “চেন্ডব খাই” নামে এক জাত আছে যাহারা দুর্ভিক্ষের সময় সবকাবী সাহায্য-পাকশালায় অন্নগ্রহণ করিয়া নিজের

মানমর্যাদা খোয়াইয়াছিল, সেই বিভিন্ন জাতের লোক এই চক্রর খাই জাতের অন্তর্ভুক্ত। নবাগতদিগের পূর্ব-জাত-অনুসারে উহারা শীঘ্রই আব্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যজ্ঞসূত্রের অধিকার ও ব্যবহার সমস্ত বজায় রাখিয়া যে-সকল ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য শ্রেণীদিগের পৌরোহিত্য কবে তাহারাও নিন্দনীয় হয়। অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে স্পর্শসংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীর ছায়া পৃথক করিয়া বাধে। লালস্বাধ ধরিয়া চাষ কবা ব্রাহ্মণের পক্ষে কম মারাত্মক ব্যাপার নহে। দেখা যায়, “ঠাভি”, “ধুনসার” ও ধুনসারেরা যে-উপাধি বলে বহুদিন সম্মান ভোগ করিয়া আসিয়াছিল, এই-সকল নিয়ম লঙ্ঘন করায় তাহারা সেই উপাধি পর্যন্ত হারাইয়াছে। পঞ্জাবের “টাগা”রা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করে, তাহাদের রমণীদিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখে, উপবীত ধারণ করে—এ-সব সম্বন্ধে তাহারা চোরের জাত ছাড়া আর কিছুই নহে। বাজপুত বণিয়া ও অজ্ঞাত জাতের মধ্যেও এইরূপ অসংপতন যে সহজেই ঘটে তাহা বেণ কল্পনা করা যায়। আর তালিকা বাড়াইয়া কোন ফল নাই।

যে-সকল উপকরণে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইতে বুঝা যায় কি-কি প্রবান নিয়মে ব্রাহ্মণিক শাসনতন্ত্র নিয়মিত হইয়া থাকে। এই শাসনতন্ত্র ছোটখাটো বিষয়েও খুব কড়া কড়। তবে ইহা তেমন অপরি-বর্তনীয় নহে। কোন-কোন প্রদেশে গোড়ায় যে শ্রেণীর উৎপত্তিস্থান অতীত ছিল, কোন বিশেষ অবস্থা, বিশেষত ঐতিহাসিক ঘটনা সেই শ্রেণীর কোন অগ্রণীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া, সেই শ্রেণীকে উচ্চতর ধাপে উঠাইয়া দিয়া, সাধারণ নিয়ম-সামঞ্জস্যের একটু ব্যতিক্রম করিতেও পারে। এমন কি পুণার কুনবীরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

কুনবী জাতের অন্তর্ভুক্ত শিবাজি, যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাকার্য্যে মহা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তিনি ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান রাখিতেন। কিন্তু সমস্ত ধরিতে গেলে,—বিবাহ, বাহুশ্রুতি, ব্যবসায় ও আত্মবক্ষিক আচার-অনুষ্ঠানসম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের যে অনুশাসন, সেই অনুশাসন যে-জাত যে-পরিমাণে পালন

করিয়া চলে, সেই পরিমাণে সেই জাতের শ্রেষ্ঠতা। সর্বোপরি, ব্যবসায় ও আহাৰাদি সম্বন্ধীয় অশ্রুতিতাই কোন নীচ জাতের নীচত্বের মূখ্য হেতু; এই জন্তই উহারা অস্পৃশ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নীচ অস্পৃশ্য জাতের সহিত কোন-প্রকার সম্পর্ক রাখিবে না প্রতিপদে এই নিষেধ নিয়মটি রক্ষা করিয়া চলায়, প্রত্যেক জাতের সঙ্কোচ-বোধটি খুবই সজাগ রহিয়াছে।

একটা বিশেষ লক্ষণ এই দেখা যায়,—বিভিন্ন জাতির ভিতর সাধারণতঃ একটা অসার গর্বের ভাব রহিয়াছে,—সকলেই ব্রাহ্মণিক প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষত্রিয়ের সহিত, বৈশ্বের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনের দাবী করে। অথচ এই বন্ধন-স্থত্রের (অন্তত বর্তমানকালে) কোন-প্রকার বাস্তবতা নাই। ইহার মূলে, প্রাচীন প্রথাগত কোন খাঁটি রকমের প্রামাণিকতা নাই। সমগ্র পুরোহিত ও শাসনতন্ত্রের ছায়া, ইহা পৌরোহিতিক মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও গঠিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই যে সমস্ত-অনুশাসনের চূড়ান্ত কথা, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ব্রাহ্মণেরাই যে সর্বপ্রকার অধিকারের সুবিধা উপভোগ করে, অনেক সময় অধা ও অসঙ্গত সম্মান লাভ করে, তাহা অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-জাতের আধিপত্য ও মানসজগতই যে হিন্দুধর্মের অনিশ্চিত পরিচায়ক লক্ষণ তাহা অতিশয়োক্তি না করিয়া জোবের সহিত বলা যাইতে পারে। এই ভাবটা এত প্রবল যে, যে-সকল জাতের বিকল্পে অনেক রকম কুসংস্কার আছে, যে-সকল জাত বিষেষ ও অবজ্ঞার পাত্র, তাহারাও এই ভাবটি পোষণ করিয়া থাকে; কেননা তাহারাও সব-চেয়ে ব্রাহ্মণের আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সহিত পালন করে। কতকগুলি জাত, যতই নীচ হউক না কেন, তাহারা যদি ব্রাহ্মণের নিকট যাতায়াত করে, যদি তাহাদের ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে,—তাহারা ব্রাহ্মণের সহিত কোন কারবার রাখে না, তাহাদিগের অপেক্ষা উহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ এই নামটাই একটা উচ্চ রকমের উপাধি। যে সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদিগকে, উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণেরা অবজ্ঞা করে, তাহারাও

তু এই ব্রাহ্মণ নামের দরুন, জনসাধারণের নিকট হইতে গভীর সম্মান লাভ করিয়া থাকে।

“ভূদেবতাদের” প্রতি এই যে সম্মান প্রদর্শিত হয় একমাত্র উহারাই ধর্মগুরু—এই বলিয়া নহে। এই ভক্তি এমন সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিও প্রযুক্ত হয়—বাহাদুরের নিত্য-কর্ম বা ব্যবসায় তাহাদিগকে একরূপ কোন-প্রকার উচ্চ অধিকারের উপাধি প্রদান করে না। এই সম্মান,— ঠিক-মতো বলিতে হইলে—এই ভক্তি সকল-রকমের সম্মানসী, ও পণ্ডিত, আচার্য প্রভৃতির প্রতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে অথচ উহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ নহে। ইহার বিপরীতে, যে বিবর্ণী সম্প্রদায় অনায়াসেই ব্রাহ্মণদিগের হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, বাহাদুরের জ্ঞাত সম্বন্ধে কোন প্রকাব অঙ্গসংস্কার নাই,—সেই জৈনেরাও এমন-কি মুসলমানেরাও সেই ব্রাহ্মণকে ভক্তি-ভাবে প্রণাম করে। উহার নিজেদের ধর্মাত্মানে উহাদিগকে পুরোহিত করিতে চাহে। বৈষ্ণব ও শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ, ব্রাহ্মণের উচ্চাধিকার সেই বিরোধের বহু উর্দ্ধে বিচরণ করে। ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাক্রমে এই-সকল বিভাগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।

এই সমস্ত জটিলতার মধ্যে, উচ্চদেশ হইতে এক-নজরে প্রকৃত দিক-নির্ণয় করা সহজ নহে; অভিজ্ঞতার দ্বারা ভুলটুকু ক্রমাগত সংশোধন না করিলে চলে না। আমাদের এই নকশাটা শীঘ্রই পুরাতন হইতে বাধ্য। আমি যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছি তাহারও উপর হয়ত কতকগুলি আঘাত লাগিয়াছে। প্রাচ্যদেশস্থলভ রক্ষণশক্তি ও জড়তা যতই প্রবল হোক না কেন, পাশ্চাত্য সংস্কার, ও পাশ্চাত্য অভ্যাসের প্রভাবের দ্বারা ভারতের প্রাচীন সমাজ আক্রান্ত হইয়াছে। ভাবতেব ইংরেজ সরকার ভারতের স্থাপন-কল্পে যে-সকল সুবিধাজনক উপায় বাজিয়া লইয়াছেন, তাহার মধ্যে জাতকে ও জাতসংক্রান্ত কুসংস্কারকে একেবারেই আমলে আনেন নাই। ইংরেজ-সরকার কেবল ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। নৈমিত্তিক বিভাগ ও শাসনবিভাগ, সকল শ্রেণীর লোককেই ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পরের সংস্পর্শে আনিয়াছেন। একরূপ ঘনিষ্ঠতা ইতিপূর্বে অসহনীয় ছিল। প্রাচীন প্রথার

খানিকটা যে ভাঙ্গিয়াছে, সে কেবল মতামতের জোরে, কাছের গতিকে ও ঘটনাচক্রে।

যে স্নেহদিগকে হিন্দুবা অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে, সেই স্নেহদের প্রতি অতিমাত্র ঘৃণাসংকেত, সেই প্রবল প্রতাপ প্রভুদিগের প্রতি একটা ভীতিমিশ্র ভক্তির ভাব অন্তরে অল্পভব না করা হিন্দুদের পক্ষে খুবই কঠিন। ইহাবই দরুন তথা-কথিত স্নেহদিগের অসাধারণ প্রতাপ প্রতিপত্তি। সভ্যতায় অধিকতর সমুন্নত এই স্নেহদিগের সর্বপ্রকার সংশ্রবে হিন্দুদিগকে প্রায়ই আসিতে হয়; অথচ তাহা নহে, হিন্দুবা ইহা একটা সম্মানের বিষয়, গৌরবেব বিষয় মনে করে। অল্পকরণের অপার গর্ভ, উহাদের চিরাগত সংস্কার ও সঙ্কোচকে ভিতরে ভিতরে ধনাইয়া দিতেছে। অনেক ব্রাহ্মণের আহার্যের মধ্যে মাংস প্রবেশ করিয়াছে। “কালাপানি” পার হইবাব দরুন, ও তজ্জনিত বিবিধ অনাচার ও নিয়মভঙ্গের দরুন, যে অন্তর্জাত উৎপন্ন হয় সে অন্তর্জাত এখন আর তেমন মারাত্মক বলিয়া গৃহীত হয় না। সকল বিষয়েই নিয়মের শিথিলতা হইয়াছে, প্রথা নিরস্ত হইয়াছে, এবং অল্পেঅল্পে একদল হইতে দলান্তরে সংক্রমণ করিয়া ক্রমাভিব্যক্তির কাজ করণই অগ্রগত হইতেছে। ইংরেজের প্রণালীবদ্ধ প্রবল শাসনের সম্মুখে, অগত্যা জাতের চল-শক্তি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তারের হিসাবে, স্থানিদ্ধিষ্ঠতার হিসাবে, প্রামাণিকতার হিসাবে—সকল হিসাবেই জাত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

সর্বত্রই এই অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কার্যকল অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিবাব আবশ্যক নাই। ইহার প্রবণতা ও অব্যবহিত পরিণাম সম্বন্ধে ভুল-বুঝা অসম্ভব। যদি “জঙ্গল্যাস্তো” জাতটাকে পাকড়াও করিয়া উপস্থিত কাজে কর্মে তাকে দেখিতে চাও, তাহার আলোচনা করিতে চাও, তাহা হইলে এই তার সময়। অবশ্য, এই যে যুরোপীয় ভাব, যুরোপীয় অল্পকরণ হিন্দু সমাজের মধ্যে ভিতরে-ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে ইহা নিতান্তই বাহ্যিক; অবশ্য সুবিস্তৃত জনসাধারণের গভীর অন্তর্জাত ইহা প্রবেশ করে নাই। কিন্তু উচ্চ বর্ণগুলি যে নাড় পাইয়াছে, তাহা হইতে অচিরে সমস্ত প্রণালীটাই

• বিচলিত হইয়া উঠিবে। সমস্ত গঠনটার “কৌণিক প্রান্তর” হইতেছে—ব্রাহ্মণশ্রেণীর মানসম্মত ও প্রতিপত্তি। উহারই দক্ষন সমস্ত জটিলতা একটা একতায় আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকর্ম অচুঠানে, ব্রাহ্মণের আধিপত্যে, এই গোলযোগের মধ্যে একটা সঙ্গতি, একটা সামঞ্জস্য আনীত হইয়াছে।

কিন্তু ইহা কি সেই আদিমকালের একতা? ব্রাহ্মণদের এই জ্ঞাতরূপ গঠনটা কি সমস্ত ব্রাহ্মণিক গঠনপ্রণালীর মূলস্বরূপ না, উহার শেষকালীন একটা রূপ মাত্র? এই প্রশ্নটিই সব-চেয়ে প্রধান। এই প্রশ্ন সমাধানের পূর্বে যে-সব খুঁটনাটি বিবরণ প্রদত্ত হইবে, এই আলোচনার অন্য প্রস্তুত হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ও একমাত্র ওজোর।

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রিয়-স্মৃতি

(গল্প)

[নিম্নলিখিত গল্পটী আরমানীর জাতীয় লেখক রাফির গল্প হইতে অনুদিত; তিনি অনেকগুলি উপাঙ্গাস, প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁর অধিকাংশ লেখা এখনও অপ্রকাশিত। তাঁর লেখাতে আরমানী জীবনের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। নবীন আরমানীদিগকে গড়িয়া তুলিতে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছেন। জন্ম ১৮৩৭—মৃত্যু ১৮৮৮।]

তেহারান হইতে একটা নির্জন পথ দক্ষিণে গিয়া এক মরু-প্রান্তরে মিশিয়াছে। সেইখানে সমুদ্র প্রাচীরে ঘেরা এক বিস্তীর্ণ ভূমি। সে যেন একটা-মায়াপুরী—যেখানে চোখ পড়ে সেখানে কেবল প্রাচীর, তাহার ভিতরে কি আছে কিছুই জানিবার উপায় নাই; গৃহের ছাদ, স্তম্ভ বা মিনার কিছুই দ্যাখা যায় না। প্রবেশের পথও নাই।

বৃদ্ধ পারসীকদের মুখে এই স্থান সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়। দিনের বেলা প্রাচীরের ওপারে শব্দের লেশমাত্র নাই, রাজ্যে সেইখানেই নানা ভয়াবহ শব্দ সমুখিত হয়! প্রেতের দল সারা রাত প্রাচীরের ধারে-ধারে ঘুরিয়া ব্যাড়াই, জটলা করে। প্রভাতের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে তারা সব অদৃশ্য হয়, তখন ধু ধু মরু-প্রান্তরে স্তব্ধ প্রাচীরগুলি কেবল গ্রহরীর ছায় দাঁড়াইয়া থাকে।

দিনের আলোতেও কোনো পারসীক প্রাচীরের ধারে যায় না, আশেপাশে কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্রও নাই। দেখা যায় কেবল উচ্চ আকাশে শকুনির দল ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে; তারাই যেন সেই প্রেতের দল রজনীর অন্ধকারে যাদের বীভৎস চীৎকার লোকের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করে!

এই জনহীন পুরী হইতে কিছু দূরে মাটির তলে একটা-ছোট সঁাতা ঘর, কবরের ছায়া নিরানন্দ ও আলোক বর্জিত; এক কোণে একটা উন্নত, তাব মধ্যে কয়েকখানা কাঠ একটুখানি আলো জাগাইয়া রাখিয়াছে।

এই অতি সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে যিনি বাস করেন তাঁর পরিচ্ছদের একান্ত অভাব। সর্বক্ষণই তিনি আগুনের ধারে বসিয়া গভীর মনোযোগেব সহিত পুস্তক পাঠে বত। তাঁহাকে দেখিলে মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও করুণাব উদ্ভেক হয়। মনে হয় যেন অধ্যয়ননিরত ব্যক্তিটি ছুঃখ-হৃদিশার অবতার—জগতে ঘাহার সব আশা ফুঁবাইয়াছে, (যে কেবল শেষ আহ্বান শুনিবার জন্ত উৎসুক হইয়া কান পাতিয়া আছে।)

আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এই জন-বিরল মরুপ্রান্তরে তাঁর অবস্থানের কারণ কি? আর এই প্রাচীরের ধারে যেখানে প্রতিরাতে প্রেতের মেলা বসে, সেখানেই বা তিনি দিন কাটাইতেছেন কেন?

তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া কয়েকটা কথা উচ্চারণ করিলেন, তার মধ্যে কেবল একটা কথা কানে লাগিল—“শরাবানি।”—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “তার মানে?”

তিনি তাড়াতাড়ি সেই সঙ্কীর্ণ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন “আমার সঙ্গে এস।”

সেই প্রাচীরের দিকেই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমিও সঙ্গে চলিলাম। নিকটে একখানা লম্বা মই পড়িয়া ছিল, সেই মইখানা প্রাচীরের গায়ে দাঁড় করাইতে বলিলেন। মই বাহিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। তিনি বলিলেন “দ্যাখ।”

সে-দৃশ্য দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। প্রাচীরের মধ্যে সমস্ত স্থানটি শবের অরণ্য, হাজার হাজার নরকহাল

এবং অর্দ্ধগলিত শব্দ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে-সমস্তই নয়।

মনে হইল এ যেন একটা মস্তমুগ্ধ জগৎ, যা আমার সঙ্গী যাত্রকের নিমেষের মধ্যে চোখের সামনে ফুটাইয়া তুলিলেন। কঙ্কালগুলি দেখিতে পাইলাম স্পষ্ট—ঘাসাঘেসি দাঁড়াইয়া আছে। আমার অনতিদূরেই অসংখ্য নয় শবের মাথার উপর শিকারী পাখীর দল বীভৎস চীৎকার করিয়া উড়িতেছে। মাঝে-মাঝে তারা ছন্দ করিয়া নীচে নামিয়া তীক্ষ্ণধাব চক্ষু ও নখেব আঘাতে খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া লইয়া আবার আকাশে উড়িয়া যাইতেছে।

আমার সঙ্গী অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার গুঠ নড়িতেছিল, বোধ হইল যেন তিনি প্রার্থনা করিতেছেন।

দেখিলাম কঙ্কাল ও শবগুলির মুখ পূর্বদিকে ফেরানো আর প্রত্যেক কঙ্কালের বাহুর তলায় একটি করিয়া খুঁটি মাটির মধ্যে পোতা। খুঁটিগুলির উপর ভব দিয়া কঙ্কাল-গুলি শূন্যে ঝুলিতেছে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন দাঁড়াইয়া আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “এর মানে কি?”

তিনি বলিলেন “শরাবানি।” তারপব বলিলেন “এটি মানুষের বিজ্ঞানস্থান।”

“সমাধিভূমি?”

“হাঁ।”

তিনি বলিতে লাগিলেন “ঐসব মৃতদেহ ঐ খুঁটির উপর ভর দিয়া ঝুলিতে থাকিবে। শিকারী পাখীর দল ক্রমে উহাদের সমস্ত মাংস খাইয়া ফেলিবে। অবশেষে উহাদের অস্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া তলদেশের গর্ভের মধ্যে পড়িবে। প্রত্যেক মৃতদেহ এইরূপে মাটির সঙ্গে মিশিতে যতদিন সময় লাগে তাহা দেখিয়া পরলোকে উহাদের গতি কি হইবে বলা যায়।”

দেখিলাম একটা বস্ত্রশৃগাল পিছনের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইয়া একটি মৃত মানুষের হাত খাইতেছে। আমার সঙ্গী বলিলেন “ঐ মৃতদেহটা সম্প্রতি আসিয়াছে। ঐ হাত, যা এখন শৃগালের খাদ্য হইয়াছে, উহা এক নিদোষ মানুষের রক্তে কলুষিত।” নিকটেই একটা মৃতদেহ, তাব

ডান কাঁধের উপর একটা প্রকাণ্ড দাঁড়কাক বসিয়া চক্ষু দিয়া মৃতদেহ চোখ দুটি ঠোঁটকাইয়া খাইতেছিল। আমার সঙ্গী কহিলেন “ও চোখ কাহারো উপর কখনো সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই।” এইরূপ অনেক মৃতদেহের বৃত্তান্ত তিনি বলিলেন। অবশেষে আমার সঙ্গীর দৃষ্টি একটি কঙ্কালের উপর পড়িল। সূর্যালোকে শ্বেত অস্থিগুলি উদ্ভাসিত। এবার আমার সঙ্গী কথা কহিলেন না, তাঁর জ্ঞান চোখে জল দ্যাখা দিল, তিনি আমাকে ইসারা করিলেন—“সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাও।”

তারপর আগবা তাঁব ঘাবে গিয়া বসিলাম। সূর্য্য তখন অস্তগামী। মকর দাক্ষণ উদ্ভাপ কতকটা সহনীয় হইয়া আসিয়াছে। যে-কঙ্কালটি দেখিয়া তিনি এত বিষাদগ্রস্ত হইলেন তাহার ইতিহাস শুনাইবার জন্য আমি তাঁহাকে বারবার গিনতি করিতে লাগিলাম। অবশেষে তিনি বলিলেন—

“কুড়িবার শীতের তুষার দেখিয়া, কুড়িবার বসন্তের প্রাণহিল্লোল অনুভব করিয়া আমি বিদ্যালভের জন্য আমার গুরুর গৃহে গিয়া পৌঁছিলাম। লোকে বলিত তিনি জ্ঞানের প্রসবণ, তাঁর মুখ দিয়া জ্ঞানের কথা মধু ও দুধের ধারার মত স্রবিত পড়িত। তাঁর কন্ঠার নাম গামার শরাবানি। তিনি পদ্মের চেয়েও কোমল এবং গোলাপের চেয়েও সুন্দর। আমার গুরুর গৃহ যেন স্বর্গ, সেখানে কেবল সুখ আর শান্তি। কিন্তু গোলাপের কাছেই কাঁটার উদ্ভব হয় এবং সূর্য্য-সমুজ্জল দিনের মধ্যেই কখনো কখনো আঁধার-করা মস্ত কণ্ঠা ছুটিয়া আসে। আমার গুরুর গৃহেও সেইরূপই ঘটিল।

“নওরোজের উৎসবের দিন বালিকার দল পাহাড়ের উপর ক্রীড়া কৌতুকে উৎসব যাপন করিতেছিল। সহরের সন্ধ্যার সেদিন শীকারে গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে ক্রীড়া-মস্ত বালিকাদের উপর চোখ পড়িল, এবং গামারের সুন্দর মুখ এবং দেহের লাভণ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিল।

“কয়েক দিন পরে সন্ধ্যার দুর্গ হইতে দূত আসিল। সন্ধ্যার সংবাদ পাঠাইয়াছেন—গামারের রূপে তিনি মুগ্ধ, তাই তাঁর পাণি প্রার্থনা করেন। গুরুর গৃহে যেন বজ্রপাত হইল। প্রথমে গুরুর বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন, পবে সাহস করিয়া বলিলেন, বিধর্ম্মীর হাতে তিনি কণ্ঠাকে দিবেন না।

“এই কথা শুনিয়া সর্দার প্রতিহিংসার বিষে জলিয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসার স্বযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হইল। কে একটা গুজব রটাইল যে সেই শহরের গাঁব বু* সম্প্রদায় মুসলমানের ধর্মমন্দির অপবিত্র করিয়াছে। রাত্রে নাকি তাহারা একটা কুবুবের মৃতদেহ মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়াছে।

“বলা বাহুল্য কথাটা একেবারেই মিথ্যা। কিন্তু তা হলে কি হয়, মুসলমানের দল সত্য মিথ্যার বিচার না করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সর্দার নিজে এবং মোল্লারাও তাদের প্রতি সহায়ুভূতি দেখাইতে লাগিলেন।”

“গাঁবেরো যে পাড়ায় বাস করিত সে পাড়া একদিন অন্ধকার রাত্রে মত্ত তুর্কের দলে ভরিয়া উঠিল। নির্ধম আগুন ও তরবারির সাহায্যে দলে দলে নির্দোষীদের হত্যা চলিতে লাগিল। সেই ভয়ানক মুহূর্ত্তে গামাবের কথা আমার মনে পড়িল। গুরুর গৃহের দিকে উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিলাম। আগুনের শিখায় স্থানটি দিনের মত আলোকিত। গুরুগৃহে পৌছিয়া দেখি গৃহ পুড়িয়া ছাই হইতেছে, আর সেই গৃহের সম্মুখে রক্তাক্তদেহে গুরু পড়িয়া আছেন। চারিদিক হইতে অসহায় নিপীড়িত মেয়েদের কান্নার শব্দ আসিতেছিল, কিন্তু তার মধ্যে গামাবের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না।

“হঠাৎ একস্থানে দেখি আহত অজ্ঞান গামাবকে একটা লোক টানিতে-টানিতে সর্দারের কেল্লার অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। কোমর হইতে চট করিয়া ছোরাখানা টানিয়া লইয়া লোকটার ঘাড়ে বসাইয়া দিলাম; তারপর গামাবকে বুকে টানিয়া লইলাম।

“কেমন করিয়া তাকে বাঁচাইলাম সে কথা নিজেই জানি না। কেবল মনে পড়ে যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে এক উন্মত্ত প্রান্তরের মাঝে প্রভাত হইতেছে। সেই প্রথম বুদ্ধিতে পারিলাম আমিও কয়েক স্থানে আহত হইয়াছি, কিন্তু কোথায় কেমন করিয়া আহত হইলাম তা মনে পড়িল না। পাশে চাহিয়া দেখি গামাব অচৈতন্য, তখন নিজের বেদনা ভুলিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

“সব কথা তোমায় বলা শক্ত, আমার এ কাহিনী

স্থলীর্ঘ; যদিও কোনো কথাই আমার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। একজন দরিদ্র পলাতকের কথা ভাবিয়া দ্যাখ; মাসের পর মাস জনহীন মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া সে চলিয়াছে, লোকালয়ের কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই, আর তার সঙ্গে এক ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতর অবসন্ন তরুণী!

“তুর্কেরা ভাবে গাঁবেরো অশুচি, তাই তারা তাদের ঘৃণা করে, তাদের কাছে ঘেঁসিতে দ্যায় না। আমরা কোনো রাখালের গৃহেও স্থান পাইলাম না, যারা সকলেরই আতিথ্য করে। দিনের বেলা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম, রাত্রে চলিতাম। প্রায়ই মরুজাত ফল খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতাম; হঠাৎ কোনো দিন কোনো সদয় আরমানীর সঙ্গে দ্যাখা হইলে বিছু ভিক্ষাও মিলিয়া যাইত।

“এমনি করিয়া ইস্পাহান, ঘুম ও কাশান শহর অতিক্রম করিয়া গেলাম। প্রথম-প্রথম আমার সঙ্গিনীর মনে সাহস ছিল, তখন সে আমার সঙ্গে হাঁটিত; তারপর যখন সে অচল হইয়া পড়িল তখন সেই অমূল্য নিমিকে আমি পিঠে লইয়া চলিতাম। সে কাঁদিয়া বলিত—‘ববে আমার ভগবান ডাকিয়া লইবেন, তোমার এ কষ্ট আর আমি দেখিতে পারি না।’

“তেহারানের পথে চলিয়াছি, শা’র পদতলে গিয়া পড়িব, এই অত্যাচারের বিচার প্রার্থনা করিব! আমার সঙ্গিনী দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। একদিন তাহার প্রবল জ্বর হইল, আমার সামর্থ্যে যতদূর সম্ভব সব করিলাম, কিন্তু বৃথা!

“আর কয়েক দিনের পথ বাকী। এক গ্রামের ধারে এক শস্তক্ষেত্রে রাত্রে মত বসিয়া পড়িলাম। মাথার উপরে নীল আকাশে চাঁদ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা, আমার কোলে মাথা রাখিয়া তরুণী দারুণ যন্ত্রণায় অধীর।

“হেমন্তের প্রভাতের যখন সবোমাত্র উদয়ে হইতেছে, নবীন ভূণের মাথায় শিশিরবিন্দু চোখের জলের মত টলমল করিতেছে, তখন সে চোখ মেলিয়া আমার পানে চাহিল। ধীবে ধীবে বলিল—‘তবে আসি, পরলোকে আমার সঙ্গতির জন্ত প্রার্থনা করো।’ জগৎ যখন জাগিল তখন চিরদিনের জন্ত তাব জাগাব শেষ হইল!

* স্বর্গ-উপাসক। এই শব্দ হইতে কাকের শব্দের উৎপত্তি।

“এই অন্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমি তার কথামত তারই জন্ত প্রার্থনা করিতেছি, দিনরাত তার ঐ কবরের পাশে থাকিয়া। প্রিয়মিলনের পথে অগ্রসর হইতেছি—ক্রমেই অগ্রসর হইতেছি!”

স্বদেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তালোচনা

ও এ অক্ষরের উচ্চারণ।

সংস্কৃত ও এ বর্ণের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। ক খ গ ঘ বর্ণের সহিত ও, এবং চ ছ জ ঝ বর্ণের সহিত এ, যুক্ত হইত। সংস্কৃতে এমন শব্দ পাওয়া যায় না, যে শব্দে ও এ বর্ণ অল্প ব্যঞ্জননের তুল্য পৃথক স্থান পাইয়াছে। তিষ্ঠ, লুষ্ঠ, লিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটা শব্দ আছে; কিন্তু দে-গুলা সংজ্ঞার নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল, ভাবার ও সাহিত্যের শব্দ নহে। দে-গুলা সাঙ্কেতিক অক্ষর। তত্ত্ব শব্দে ও এ বর্ণ পৃথক পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও সাঙ্কেতিক।

বাঙ্গালায় ও এ অক্ষরের কি উচ্চারণ, তাহাই এখানে বিবেচ্য। প্রাচীন বাঙ্গালায় ও এ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ব্যতীত অসংযুক্ত ব্যঞ্জন রূপেও লিখিত হইত। পরে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। দেখা যাইবে, চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বরবর্ণ প্রকাশের নিমিত্ত ও এ লেখা হইত।

বাঙ্গালায় অব্যাপি ও-অক্ষরের নাম উ-অ। ক-এর উচ্চারণ যেমন ক-খ, ও-এর উচ্চারণ তেমন উ-অ। উচ্চারণ উ- তুল্য না হইলে নাম উ-অ হইত না। যে অঞ্চলে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারিত হয় না, সে অঞ্চলে নাম উ-ম বা উ-মা।

কয়েকটা ক্রিয়াপদ দেখা যাউক। প্রাচীন বাঙ্গালায় করোঙ জাঙ হঙ প্রভৃতি পাওয়া যায়। কি রকম গড়া হইত? কিংবা, কি ধনিপ্রকাশের নিমিত্ত ও লেখা হইত? করোঙ জাঙ হঙ প্রভৃতি ক্রিয়াপদের সময়ে করে। প্রথমের বা প্রথম বানানও প্রচলিত ছিল। অরানন্ড (১৫তম শতাব্দী) লিখিয়াছিলেন, কাক্কে চঢ় নিক্কা জাডো প্লাডীয়ে-তীরে। এখানে জাঙ লিখিলেই চলিত। ডো বানান করিয়া তিনি উচ্চারণ স্পষ্ট করিয়াছিলেন। গত মাসের প্রবাসীতে হঙ=ই ছাপা হইয়াছে; হইবে হও বা হউ। এই করোঙ করে। প্রভৃতি স্থানবিশেষে কেরাম উচ্চারিত হইত। সেসব স্থানে চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ প্রসিদ্ধ ছিল না। কোন অঞ্চলে বন্দঙ, বন্দোঙ, বন্দে।; কোন অঞ্চলে বন্দর হইয়াছিল। এইরূপ, কহিলু (বা কহিলু) স্থানে কহিলাঙ পদ আনিয়াছিল। ইহাই অল্প অঞ্চলে কহিলাম আকার পাইয়াছে। কুন্তিবাসে (সাঃ পঃ সং) হইলারো। পদ আছে। অস্তে হইলাঙ লিখিতেন। কুন্তিবাসের পুন্নি-লেখকও অল্পতর হইলাঙ লিখিয়াছেন। অতএব হৌ ও স্থানে যে ও লেখা হইত, অর্থাৎ ও অক্ষরের উচ্চারণ যে ও উ ছিল তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ, করিবু স্থানে করিবাঙ, এবং স্থান-বিশেষে করিবাম হইয়াছিল। বর্তমান বাঙ্গালাভাষা করিলাম গ্রহণ করিয়াছে, করিবাম করে নাই। করিবু=করিমু, এবং ক্রমে স্থানবিশেষে করিম হইয়াছে।

করোঙ বা করে।, হঙ প্রভৃতি ক্রিয়াপদ প্রচলনের সময়ে কর্তা মো মু মুঞ মুঞি ছিল। মো করে।, মু করু। মো হইতে মো-কে, মো-র, সর্বদায় পদ ছিল।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে ও-যুক্ত শব্দ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-পদ-কল্প-তরু (সাঃ পঃ সং) হইতে কয়েকটা উদাহরণ তুলিতেছি। ভাঙ-ভুজঙ্গম শব্দে ও উচ্চারণে কি ছিল? এখন লিখিলে ভাও কিংবা ভাউ লেখা হইত। বিদ্যাপতির ‘ভাঙু-বিশ্বদ্বি-বিলাস’ শব্দ সন্দেহ মৌচন করিতেছে। ই পরে থাকিলে পূর্বস্থিত অকার ঈষৎ ও-কার উচ্চারিত হয়। যেমন হরি—বাঙালা উচ্চারণে হোরি। বোধ হয়, পূর্ব কালেও এইরূপ ছিল। তখন সোঙরি বা সঙরি—সোওরি সঙরি তুল্য উচ্চারিত হইত। চৌতকি চলয়ে—চৌউকি চলয়ে (চমকি চলয়ে)। এইরূপ কোঙর—কোওর, মাঙন—মাওন, কাঙর—কাওর, শাঙলী—শাওলী, গোঙারি—গোয়ারি, ইত্যাদি। ও=উ অ মনে না করিলে নতুঙা-বদনি (নতুয়-বদনি) বানান আসিত না।

শব্দরামের ধর্মমঙ্গলে একটা বিশেষ প্রমাণ আছে। তিনি দুই শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। নিবাস বর্তমান অঞ্চলে ছিল। লাউসেনের কনিষ্ঠা রাণী কানড়া ক হইতে ক অক্ষরে চণ্ডিকার স্তব করিতেছেন (জাগরণ পালা, বঙ্গবাসীর সং)। ক খ গ ঘ অক্ষরের পর,

উর উগ্রবিনাশিনী উগ্রচণ্ডা মা।

উচ্চারের বীজ উমা সার সেই পা।

ও স্থানে উ। এইরূপ, এ স্থানে ই; যথা,

ঈশ্বরী ঈশ্বরআয়া ঈষদ ইন্দিতে।

ইদানী ইল্লালী রাখ নয়ন-ভদ্রাতে।

লেখক বে প্রচলিত উচ্চারণ ধরিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ জ ব অক্ষরে স্পষ্ট আছে। এক স্থানে আছে,

ধাঙসা ধাঙ ধাঙ পাঙে।

ভাঙ ভাঙ রণশিখা বাজে।

প্রাচীন ও বর্তমান ও অক্ষরের যে উচ্চারণ, তাহা কি নব্য “বাঙলা”র “বাঙালী”র ও-তে আছে?

এ যে ইঙ্গ রূপে উচ্চারিত হইত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। দিঞা, খসঞা, ধাঁঞা, পাইঞাছে প্রভৃতির আধুনিক বানান দিয়ী, খসারী, ধাইয়ী, পাইয়াছে। ভূঞা, মিঞা প্রভৃতি শব্দে রা বা ই-আ স্পষ্ট। সহিতে—সহির্ভে—সহিরে—সঞ্চে, ইহা হইতে মনে, যে অঞ্চলে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ সাধারণ নহে। গোসাঞি নাঞি তেঞি মুঞি প্রভৃতি শব্দে ই বা ঈ পড়িতে হইবে। কারণ, এখনও আমরা গোসাই তেই বলি। ওড়িয়াতে নাহি, মুই বলাও লেখা হয়। অতএব চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বরবর্ণ প্রকাশ করিবার সময় ও এ অক্ষর লেখা হইত।

আর একটু বাইরে কি? ও অক্ষরে উ অক্ষরের মাধ্যম বিন্দু (পাংড়া) আছে কি? এ অক্ষরে এ অক্ষরের গারে বিন্দু? মুক্তি-সাদৃশ্য আকস্মিক? গ ন-এর, ম ন-এর মুক্তি সাধু আছে, বৃত্তিতেও আছে। ও এ মুক্তি সাধু স্পষ্ট নহে; বৃত্তিতেও কিছু সাধু আছে, কিছু নাই।

ভারতচন্দ্র হইতে এক আশুযজ্ঞিক তর্কের উত্তর পাওয়া যায়। হৃন্দর পকাশ অক্ষরে কালিকার স্তব করিয়াছিলেন। তিনি অ হইতে অং অঃ গণিয়া অং স্থানে বলিয়াছিলেন,

অশেৰূপা অংগুময়ী অংশে কংস অরি।

অংহেতে অস্তিত অঙ্গ রাখ অঙ্গে করি।

বোধ হয়, ‘অঙ্গে করি’ স্থানে ‘অঙ্কে করি’ হইবে। সে যাহা হউক, অং হইতে অঙ্গ, অঙ্গ পাইতেছি। অর্থাৎ আমরা যেমন সংখ্যা সংগ্রহ আকাঙ্ক্ষা লিখিতেছি, ইচ্ছা করিলে তেমন অংক, অঙ্গ লিখিতেও পারি।

ঐযোগেশচন্দ্র রায়।

“আগে চল আগে চল ভাই”

মনে উচ্চ অভিলাষ পোষণ করলে মানুষের দ্বারা বড় কাজ করা সম্ভব হয়। কারণ মানুষ সাধারণত যা ভাবে তার চেয়ে বড় কাজ করতে পারে না। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। হাত যে কাজ করে, মন যদি সে কাজে সাড়া না দায়, তবে তা সার্থক হবার নয়। মন যতদূর পৌঁছেছে হাত তার চেয়ে বেশী পৌঁছুবে কেমন করে?।

সকল গভীর মধ্যে মনকে যদি আবদ্ধ করি তবে কর্মক্ষেত্রও সর্বাঙ্গ হয়ে দেখা দিবে। মন যখন সীমা ছাড়িয়ে অনীমের দিকে ধাবিত হয় তখনই কর্মক্ষেত্রের বিপুল বিস্তার চোখে পড়ে। সাধারণ মানুষের মন যে স্তরে কখনো কখনো কষ্টেস্থে ওঠে মহাপুরুষের মন সেখানে সহজেই বিচরণ কবে।

উচ্চাভিলাষ একেবাবে মানুষের রূপান্তর ঘটায়। উচ্চাভিলাষ যখন আসে তখন মানুষ স্বপ্নস্বাচ্ছন্দ্যের কোমল আবরণ ছিন্ন করে' কঠোর শ্রম ও দারুণ কষ্টকে বরণ কবে' নের—ভয় ও কুণ্ঠা তার মন থেকে এক মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। অদম্য অভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্তে সে তখন বড়ের মত পৃথিবী তোলপাড় করে' ফ্যালে।

প্রতিদিন প্রবীনের তুচ্ছ বিজ্ঞতার বাঁধি বুলি আমাদের কানে প্রবেশ করে' উচ্চাভিলাষকে ধ্বংস না করে—উৎসাহের আগুন যেন নির্বাপিত না করে সে সমস্ত সাবধান হতে হবে। যে-সিঁড়ি কেউ চোখে দেখেনি আশা সেই সিঁড়ির ধাপ দিয়ে আমাদের হাতে ধরে' নিয়ে যায়। আশা যা দেখায় তা হয়তো পাই না, কিন্তু আশার অহুধাবন করে' আমরা শক্তিশালী করি, জীবনের প্রশসারিত ক্ষেত্র দেখতে পাই। আশা যেখানে অঙ্কুলি নির্দেশ করে সেদিকে যদি অগ্রসর না হই তো সিঁড়ির ধাপেব ওপর দিয়ে গড়িয়ে তলায় পড়তে বেশী সময় লাগবে না। যে-কাজে লিপ্ত আছি সে-কাজের উচ্চতম শিখরে উঠতে চেষ্টা করবো—মনের সামনে একটা উচ্চ আদর্শ সর্বদা রেখে দেব, এই হবে আমাদের প্রতিজ্ঞা।

ভূমির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ বেখে উঠে উঠতে পারব না। উন্নত হয়ে ওঠ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কব, নিজেকে ছোট

বলে' তুচ্ছ বলে' ভেবনা। অপ্রাপ্ত যা, অজিত যা, তা আমাদের জীবনের সমুচ্চ শিখরদেশ নির্দেশ করছে,—যেখানে মহাপ্রাণ লোকেরা বিরাজিত। আশাই আশা ফলবতী হবার সম্ভাবনা নির্দেশ করে। অতএব আশা হারিয়ে না, আশা কর আশা কর! জীবন যাপন কর একাগ্রচিত্তে। কারণ জীবন তো ছেলেখেলা নয়, একটা মজার অভিনয় নয়; জীবন মিথ্যা মায়ী নয়—জীবন সত্য হৃন্দর, জীবনের মত বাস্তব আর কিছু নেই। জীবনের কর্তব্য দৃঢ়মনে সম্পন্ন কর; সে-কর্তব্য আকাশের তারার জায় অগণ্য!

জীবনে এমন সময় আসে যখন সম্মানলোলুপতা অসার বলে' বোধ হয়, অর্থে আসক্তি থাকে না; পদমর্যাদা বুখা আর শক্তি অপ্রয়োজনীয় বলে' মনে হয়; আর বোঝা যায় মনে শাস্তি না থাকলে কিছুই কিছু নয়, বাহিরের সকল স্ববিধা সকল সম্মান অতি তুচ্ছ অতি অকিঞ্চিৎকর। তাই স্বধী জন নিঃস্বার্থ উচ্চাভিলাষকেই মনে স্থান দান; তাতে মনের শাস্তি অটুট থাকে।

এশিয়ার অনেক দেশের সম্ভ্রাম ও শাস্তিপ্রিয়তা অতি তুচ্ছ এবং হীন। যা পাই তাই ভালো, কোনোবাকমে দিন শুজরান হলেই হ'ল, এই হ'ল এশিয়ার সাধারণ মনভাব। মাস্কাতার আমল হতে যা চলে আসচে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, তার আর উন্নতিব চেষ্টায় মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই! বাঁধি পথে চল, বাঁধি বুলি আওড়াও, আমাদের অত শতে দরকার কি! শাক্সে পরিতৃপ্ত হও! এই ভাব মনে পোষণ করেই আমবা অধঃপতনের চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি—সকল রকম গোলামিতে পাকা হয়ে উঠেছি।

বড় হতে হলে গোড়ার শিক্ষাটা রীতিমত ব্যাপ্ত এবং উদার হও প্রয়োজন। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে বড় হব একপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটু বিপদ আছে। কারণ তা নিয়ে চলতে চলতে কখনো কখনো মানুষ সর্বাঙ্গ ও একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। শোনা যায় বাল্যকালে ডাক্তার কবিতা ও সঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিলেন; কিন্তু পরজীবন কেবলমাত্র বিজ্ঞান-চর্চায় অতিবাহিত করে' তিনি দেখতে পেলেন সেক্সপীয়ার তাঁব কাছে নীবস একঘেয়ে হয়ে

উঠেছে! তখন তিনি ছুঁখ করে' বলতেন, জীবনটা যদি আর একবার ফিরে আসে তো তিনি প্রতিদিন কবিতা ও সঙ্গীত চর্চা করবেন, যাতে এ-সব মধুর জিনিস উপভোগ করবার শক্তি লুপ্ত না হয়।

জুলিয়া ওর্ড হো বলেন—“প্রত্যেক জীবনেই কিছু কিছু ফাঁক আছে। সেগুলি উচ্চ আদর্শ দিয়ে না ভরালে চিরদিন শূন্য নিরর্থক হয়েই থাকে।” আমাদের মনের পটে নিরন্তর কত যে ছবির ছাপ পড়ছে তা আর বলবার নয়। সে-পটে সুন্দর ছবি না আঁকলে—তা যে কদর্যতায় ভরে' যাবে!

সম্পাদিত কর্ণেব বিভেদ অহুসারে জীবনের বিফলতা বা সফলতা নিরূপিত হয়। কেহ হয়তো প্রাণপণ চেষ্টায সর্বোৎকৃষ্ট জুয়াড়ি বা পাকা জুয়াচোর হতে পারে। তা বলে তার জীবন কি সফল? সে তার ব্যবসায়ে বড় বটে, কিন্তু তার সার্থকতা সাধুব্যবসায় লিপ্ত যে-কোনো ব্যক্তির বিফলতারও তুল্য নয়। মনকে চোখ ঠারলে বা সমুজ্জল পোশাকে আবৃত করলে নীচ উন্নত হয় না, অসাধু সাধু হয় না, মলিন নির্মল হয় না। মানুষের আদর্শ যেমন তার জীবনও তেমনি হয়।

কারো উচ্চাভিলাষ প্রতিবেশীর চেয়ে ভালো পরা, ভালো খাওয়া, গাড়ী ঘোড়া চড়া। কারো বা আকাঙ্ক্ষা অজস্র অর্থ ব্যয় করে' বিভাল কুকুরের বিবাহ দেওয়া বা উপাদির মালা পরা। এ-সব ভালো নয়। তবে এও মনে রাখতে হবে ডিসরেলি বলেছেন—“যে উর্দ্ধে দ্যাখে না সে দ্যাখে নীচে; মন যার উদ্বাও হয়ে ওড়ে না সে হয়ত একদিন ধূলোয় ধূসর হবে।”

কেমন হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে সকলের মনেই একটা আদর্শ থাকে। উন্নতিকামীর মনে এই আদর্শটি সে-নিজের যা তার চাইতেও বড়। তাদের মধ্যে এমন লোক খুব অল্প যারা বর্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তার চেয়ে আরো জান্নী গুনী বা উন্নত হতে চায় না।

আমরা যা আছি এবং আসবা যা হতে চাই তার মধ্যে অনেক ব্যবধান! মানুষের মনে কত মহৎ আদর্শ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে! সে-আদর্শ তুলিকায় বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত কবা, মর্মেবের মধ্যে মূর্তিদান করা, স্বরম্য নিকেতনে

ফুটিয়ে তোলা, মনোহরণ সঙ্গীতে ব্যক্ত করা; এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাস-দর্শন-প্রবন্ধে তার পরিচয় প্রদান করা মানুষের প্রকৃতিগত।

ফিলিপ্‌স্‌ ব্রুক্‌স্‌ বলেন—“কোনো যথার্থ মানুষ অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন না। অপর অর্দ্ধ, উচ্চতর অর্দ্ধের জন্ত তাঁর মন নিরন্তর ব্যাকুল হয়ে থাকে।” জর্জ্‌ ইলিয়ট বলেন—“আমরা যতক্ষণ সম্পূর্ণ জ্যাস্ত থাকি ততক্ষণ আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারি না। কতক জিনিস আছে যা আমাদের কাছে বড় সুন্দর বড়ই ভালো, সেগুলির জন্তে আমাদের লোভের অন্ত নেই।”

আমাদের প্রাণের ইচ্ছাই আমাদের অদৃষ্টের ভবিষ্যৎ বাণী। ঘোবনের স্বপ্ন জীবনে সম্পূর্ণ সফল হয় না। বর্তমান যা প্রতিজ্ঞা করে ভবিষ্যৎ কখনো সে সমস্তই দিতে পারে না। কেননা বিধাতা আমাদের বেতনের কতক অংশ হাতে রেখে দ্যান পাছে আমবা কাজ একেবারে পবিত্যাগ করি, একেবারে নিরুদ্যম হয়ে যাই। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অবিনশ্বরতার—অফুরান জীবনের কাহিনী সুস্পষ্ট।

সেই উচ্চাভিলাষই বরণ্য অপবের মঙ্গলসাধনেই যার সার্থকতা এবং বিশ্বনিধিলের কল্যানকর্মে যাব নিয়োগ।

স্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হরফ্‌ রিপারিক

(যে দিন)

টাইপ্‌-মেশিন্‌ আনলে দেশে হরফ্‌-রিপারিক্‌ হাঁফ্‌ ছেড়ে সব বাঁচল হরফ্‌ ফর্শ হ'ল দিক্‌, কারো ঘাড়ে রইবে না কেউ সিদ্ধবাদের গত আঁকড়ে কোমর পাকড়ে গলা—পরগ্‌ ওষ্ঠাগত।

চ্যাঙ-দোলা কেউ কাউকে নিয়ে করবে না এর পর বর্ণমালায় থাকবে না আর অর্দ্ধ-নারীশ্বর।

খবর যেমন গেজেট হ'ল—সেই নজীরের জোরে বেরিয়ে এল 'ঙ' 'ঞ' অজ্ঞাতবাস ক'রে।

* * * *

প্রথম প্রথম ধতমত 'ওয়া' 'ইয়া' করে
 গেঞ্জে ভেবে ছল ধরে সব—হেসে পরস্পরে ;
 গোয়াবেবা ঠাণ্ডা উচায় ছেলেরা ভাঙ্‌চায়,
 ব্যাঙের মালা গঁথে ধাঙড় দিচ্ছে ছেড়ে গায় !
 সকল সয়ে রইল তারা,—বল্লে গো বরং—
 সঙের আধা 'ঙ' বটে, নয়কো 'ঙ' সঙ,
 অমুনাসিক গোত্র মোদেব, আমরা সবাই বীর—
 'ন' 'ন' 'ন'য়ের দালা—যেমন ভীম আর যুধিষ্ঠির ।
 কদব মোদেব বোঝ যদি দেখাব কদবং
 কত কথাষ করছি বিরাজ তিলে তৈলবং ।
 এই না বলে 'ঙ' 'ঞ' শিঙায় দিল ছুঁ
 কাণ্ড দেখে অবাক,—কেউ আর বলে না হাঁ হুঁ ।

* * * *

রঙ্‌গে এল গাঙের ফড়িঙ্‌ কহুঞ্‌ উচু করে,
 রাঙা ফুলের মধ্যে ঝাঁঝি শুঞ্জে ঘোরায় জোবে ;
 ডাঞ্‌নী ডেঞ্‌ পিপ্‌ড়ে এলেন বুকে হেঁটে হেঁটে,
 উচ্চিঙ্‌ড়ে উদয় হলেন গাঙের বাকল কেটে ;
 ভোড়ায় এলেন কোঙা হ'য়ে গোসাঞ্‌ এবং মিঞা,
 চোড়ায় এল ঝিঙা-ভাঙা, ডিঙায় এল টিঞা ;
 গোঙা ছিল কোঙাবেব ঝি টোঙা উল্টে পড়ে,—
 জলটুঙিতে ফেলে এল টাটকা জুঞ্‌য়ের গোড়ে ;
 খুড়ির মাঝে পুঁথি ছিল—পঞ্‌হ মিলিনের,
 ফুড়ি এসে ব্যাণ্ডা করেন নূতন কবে ফের ;
 মাঙ না ঘোঙা মোঙা ছিল সাঙায় কদিন আজ
 শিঙের আওয়াজ পেয়েই সে বাব করেছে ভট্‌চাষ ;
 ভুঞ্‌য়ার মেয়ে এলিয়েছে চুল লুটিয়ে পড়ে ভুঞ্‌,
 অলক বয়ে স্বগন্ধি জল পড়ছে চুঞ্‌ চুঞ্‌,
 টাঙি কাঁধে ভুটিঞা এলো রঙীন টুপি মাখে
 সঙের মতন চেহারা তার বাঁশের চুড়ি হাতে ;
 ভাঙা পুলির জন্তে এল নাবিকেলের ছাঞ্‌—
 বিধিলিঙের ছাড্‌গুলোর পেট করে চুঞ্‌ চাঞ্‌ ;
 চাঞ্‌ব কাছে খবর গেল চাঞ্‌ তো রেগে কাঞ্‌
 কেঞ্‌ চুমিতে কেঞ্‌য়ের বাড়ি বরের খুড়োর ঝাঞ্‌ ।

* * * *

হাঁ হাঁ করে এই সময়ে উঠল সকল গাঞ্জি,
 'আর প্রমাণে কাজ কি ?' বলে মিঞা আর গোসাঞ্জি,
 ঙ্‌ এর দল যে ভারি বুঙ্‌ল সকল লোক
 ফ্যালফেলিয়ে লক্ষ জোড়া রইল ডাঁবা চোপ ।
 অমুনাসিক পাঙুকুলের 'ঙ' যুধিষ্ঠির
 আঙ্‌রাখা-গাঘ পাগড়ী মাথায় বসল সভায় বীর ;
 একটি জোড়া মুণ্ডবে ঠেস দিয়ে ঞ্‌-ভীম
 কুক চিত্তিষে বসল এসে আফিঙ্‌ খেয়ে ঝিম্‌ ।
 দেখছ কি আব শুনছ কি আর ভাবছ কি আব ধন?—
 জ্বয যে তাদেব কায়েম, যাদেব পক্ষে জ্ঞানার্দ্‌ন !
 কাঞ্‌-কাঞ্‌-কাঞ্‌ বাজে কাশী ভব কিছু নাই আর
 লাগ্‌-বঙা-বঙ্‌ বাজায় নেচে বিহুর অমুস্মার ।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ।

পাখীর রকমারি

জগতের সকল প্রাণীর মধ্যে পাখী সর্বাপেক্ষা সুন্দর ।
 তাহার আকার অবয়ব রীতিনীতি এমন বিচিত্র যে আব
 কোনো প্রাণীর বোধ হয় এমন বিচিত্রতা নাই । ইহাদের
 আকার ছোট উটেব মতন হইতে একটা সুপারীর মতন
 পর্যন্ত আছে । ইহাদের কেহবা স্থলচর, কেহবা স্থলচর ও
 জলচর, এবং অনেকই খেঁচর । অনেক পাখীর দেহ
 ভারী বলিয়া বা ডানা ছোট বলিয়া উড়িতে পারে না,
 অনেক পাখীর মোটেই ডানা গজাষ না । ইহাদের পালকেব
 রঙের অস্ব নাই । ইহাদের বাসা গড়িবার ভঙ্গি বিচিত্র ও
 অদ্ভুত । এই সুন্দর, বিচিত্র আকার ও প্রকৃতির প্রাণীর
 কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের কৌতুককর বিবরণ আমরা এই
 প্রবন্ধে সংগ্রহ করিয়া দিতেছি ।

পাখীর জন্ম হয় ডিম হইতে, সুতরাং ইহারা বিজ্ঞ ।
 পাখীর পেটের মধ্যে ডিম হয়, সেই ডিম প্রসবেব পর
 তাহার মধ্যে ছানা পুষ্ট হয়—ইহা প্রকৃতির এক আশ্চর্য্য
 লীলা । ডিম প্রসূত হওয়ার পর ডিমের খোলার ভিতরের
 তরল পদার্থ কিছুদিন (মূবগীব ডিমের বেলা ১৯ দিন)
 একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ পাইলে তাহা পাখীর অবয়ব
 ধরিয়া প্রাণবান হইয়া উঠে । ডিমের মধ্যে ছুটি পদার্থ থাকে,

একটি স্বচ্ছ শ্বেতাভ এবং অপরটি হলুদে। এই হলুদ ডেলার মধ্যে একটি চাকতির মতন থাকে, তাহাই জীব-বীজ। ডিমের মধ্যকার অপরূপ পদার্থ সেই জীব-বীজকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার খাদ্যমাত্র।

ডিমের খোলাব নীচে একটা চামড়ার মতন আবরণ থাকে। তা পাইয়া ডিমের ভিতরকার বীজ যত পুষ্ট হয় ডিমের খোলা হইতে এই চামড়া তত খুলিয়া সরিয়া আসে এবং খোলা ও চামড়ার ভিতরকার জায়গা বাতাসে ভরিয়া যায়, সেই বাতাসে পাখীর ছানাব নিশ্বাস প্রশ্বাসেব কাজ চলে। এই বাতাস ডিমের ভিতবে যায় ডিমের খোলার গায়ে অতি সুস্বাদু ছিদ্র দিয়া।

মুরগীর ডিম ১৬ ঘণ্টা তা পাইলে ডিমের ভিতরকার জীব-বীজের চাকতি ছোলঙেব বা পেয়ারার আকার ধরে এবং মাঝখানে খাল পড়ে; তখন ছানার শিরদাঁড়া এবং স্নায়ুগুণ্ড পত্তন হইতে থাকে। দ্বিতীয় দিনের মাঝামাঝি স্থান এবং প্রধান রক্তস্থলী প্রস্তুত হয়। সেই দিনের শেষে ভ্রূণের গায়ে দুটি স্বচ্ছ থলি জন্মে, একটি থলিতে জল ভরা থাকে তাহা বাহিরের আঘাত হইতে ভ্রূণকে বাঁচায়, এবং অপরটি থলি থাকে, তাহাতে ভ্রূণ-শবীরের মলমূত্র গৃহীত হয়। তৃতীয় দিনে মস্তিষ্ক, চক্ষু, স্নায়ু, ফুসফুস, যকৃত এবং অন্যান্য গ্রন্থি আবির্ভূত হইতে থাকে। এখন ডিমের খেতাংশের অনেকখানি রক্ত তৈয়ারীতে খরচ হইয়া যায়। চতুর্থ দিনে নাক, কান এবং চোয়াল আকার ধরে। বড় আল্পিনের মাথার মতন গুটির আকারে পা ও ডানার আভাস দেখা দেয়। ২৪ ঘণ্টা পরে এই অবয়বগুলি লম্বা হয়, কন্নুই ও হাঁটু চেনা যায়, এবং আঙুলেরও ঈষৎ আভাস আসে।

ষষ্ঠ দিনের আগে ডিমের মধ্যকার ভ্রূণকে পাখী বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। পাখীর ঠোঁট গজায় ১২ দিনে, তার পর দিনে পায়ের নখ গজায়। ৯ দিনে ভ্রূণের সর্বাঙ্গে ছোট-ছোট বোতামের মতন গুটিগুটি পালকের আভাস উঠে, ১৩ দিনে সেগুলি লম্বা কাঠির মতন হয় এবং শীঘ্রই পালকের ঝালরে ছড়াইয়া পড়ে।

মুরগীর বাচ্চা ১৯ দিনেই ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার উপযুক্ত পুষ্ট হয়। তখন ডিমের খেতাংশ কিছুই

থাকে না, এবং হলুদে ভাগও খুব অল্প ও তরল হইয়া নাড়ী-ভুঁড়ির ভিতর জমা থাকে। এইজন্য ডিম ভাঙিয়া বাহির হইবার পর বাচ্চার ২৪ ঘণ্টা কোন খাদ্যের আবশ্যক হয় না। ১৯ দিনের দিন বাচ্চা ডিমের মধ্যে পাশের দিকে মাথা করিয়া সোজা হইয়া বসে। তখন তাহার ঠোঁটের উপর একটা কড়া শিং গজায়; তাহার ঠোকোর মারিয়া ডিমের খোলার গায়েব চামড়ার আবরণে ছিদ্র করে এবং সেই আবরণ ও খোলাব মধ্যকার বাতাসে নিজের ফুসফুস পরিপূর্ণ করিয়া লয়; ততক্ষণাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে আরম্ভ হয় এবং যতদিন জীবন থাকে ততদিন চলে। তারপর সেই শিং দিয়া সে ডিমের খোলার গায়ে ঘা মারিতে থাকে এবং খোলা ফাটাইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

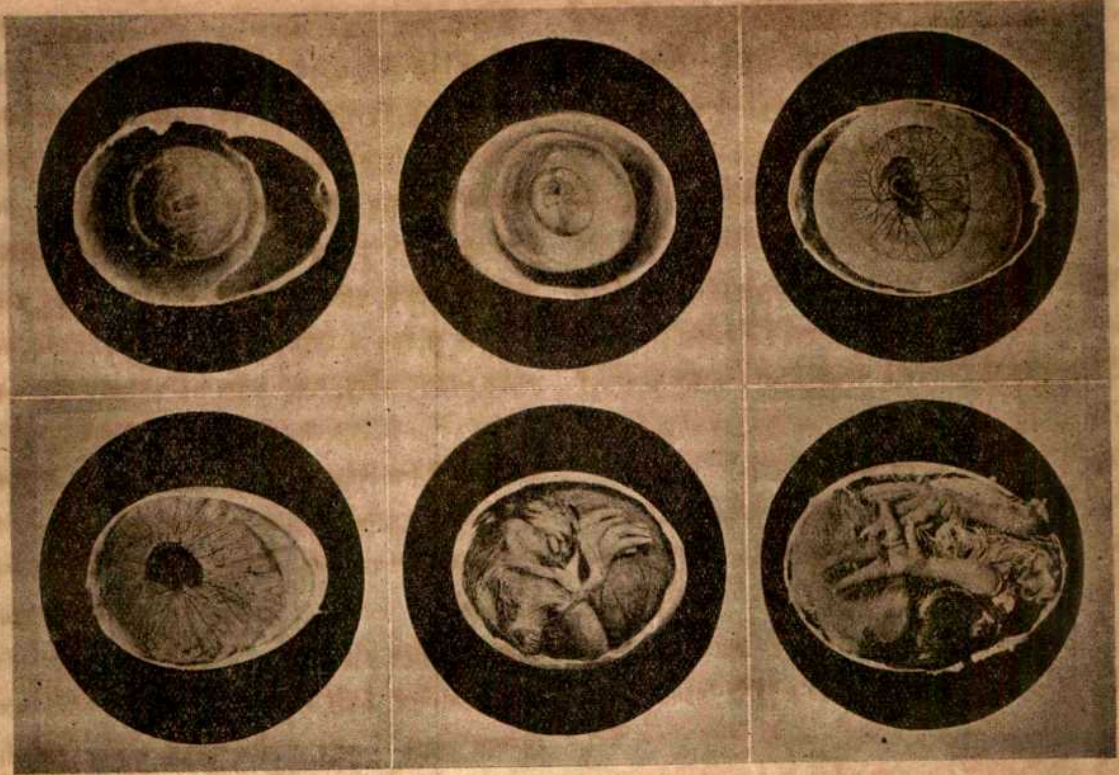
ডিম হইতে যখন বাচ্চা বাহির হয় তখন তাহার গা ভিজা থাকে। যেমন যেমন তাহার গা শুকাইতে থাকে, অমনি ক্রমে-ক্রমে তাহার পালক ছড়াইয়া পড়ে।

কোনো পাখী একটি, কোনো পাখী বা ১২টি পর্যন্ত ডিম এক-সঙ্গে পাড়ে। প্রায় পাখীর ডিমই সাদা; কোনো কোনো পাখীর ডিম রঙিন বা চিত্রবিচিত্র হয়। ইপিয়ারনিস নামক পাখীর ডিম সর্কাপেক্ষা বড়—এক-একটার বেড় দুই ফুটেরও বেশী। তাহার ডিমের খোলে তিন গ্যালন জল ধরে। ইহাই বোধ হয় রক-পাখী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া উপস্থাসে অমর হইয়াছে। অষ্ট্রিচ পাখীর ডিম আকারে খুব বড় বেলের মতন হইলেও ইহার তুলনায় তাহা অতি ক্ষুদ্র।

যে-সব পাখীর ছানা বাসায় পালিত হয় তাদের গায়ে জন্ম মাত্রের পালক গজায় না; যারা ডিম হইতে বাহির হইয়াই হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে তাদের গা পালকে ঢাকা থাকে—যেমন মুরগীর ছানা। ডানা ও পুচ্ছে আগে পালক গজায়, পরে অন্যান্য অঙ্গে।

বড় পাখী বছরে দুবার পালক ছাড়ে—প্রধান সময় নূতন ডিম পাড়িবার আগে। হাঁসের ডানার সমস্ত পালক একসঙ্গে ঝরিয়া যায়; অন্য পাখীর ক্রমে-ক্রমে ঝরে।

পাখীর বিশেষত্ব যে তাহার সর্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পাখীর ডানা মানুষের হাতের স্থানীয় অঙ্গ। ব্রিটিশ গায়ে-নার হোয়াটসিন নামক পাখীর সদ্যজাত ছানার ডানায়



ডিমের মধ্যে পক্ষীজন্মের ক্রমপরিণতি।

পালকের পাশে-পাশে কতকগুলি আঙুল ও নখ থাকিতে দেখা যায়। তাহারা এই ডানার নখ, পায়ের নখ ও ঠোঁট দিয়া বড় বড় উচু খাড়া গাছে চড়িতে পারে। এই ছানা বড় হইলে তাহাদের ডানার আঙুল ও নখ মিলাইয়া যায়। অনেক পাখী বড় হইলেও খাড়া গাছের বা দেয়ালের গা বাহিয়া উঠিতে পারে, তাহাদিগকে ইংরেজিতে Tree-creepers ও Wall-creepers বলে, যেমন কুঠিঠোঁকরা।

পাখীর সর্কান্দের হাড় কাঁপা ও বাতাসে ভরা এবং চামড়ার নীচে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতাসভরা থলি থাকে, এজ্জ তাহারা সহজে বাতাসে ভাসিয়া উড়িয়া বেড়াইতে পারে এবং এই জ্জই পাখীকে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারা একরূপ অসম্ভব। পাখীর অঙ্গের গড়ন উড়িয়া বেড়াইবার উপযুক্ত, নোকার মতন বাদামী। সাধারণত পাখীর পায়ে সম্মুখের দিকে তিনটি ও পিছনের দিকে একটি আঙুল থাকে; একটু উপরে একটি নখ থাকে তাহাই পঞ্চম আঙুলের আভাস। অনেক পাখীর সম্মুখে দুটি ও পশ্চাতে

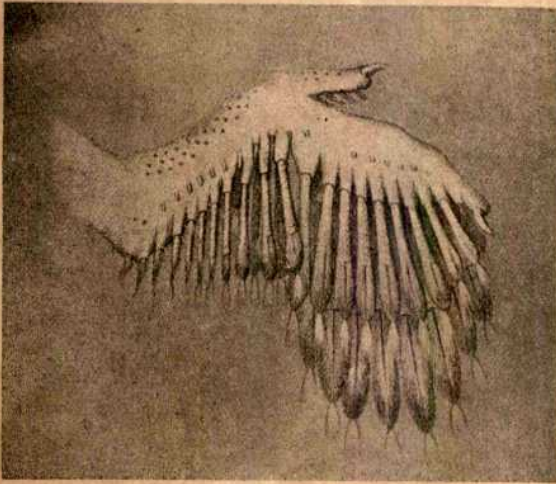
দুটি আঙুল দেখা যায়। জলচর পাখীদের আঙুলগুলি একটা পাতলা সন্ধুচনক্ষম চামড়া দিয়া জোড়া থাকে, তাহাতে তাহাদের জল টানিয়া সাঁতার দিবার সুবিধা হয়। কোনো কোনো পাখীর মাত্র তিনটা আঙুল থাকে;—দুটা সামনে, একটা পালের দিকে প্রায় পিছনে।

পাখীর মধ্যে সব চেয়ে বড় অষ্ট্রাচ বা উট পাখী এবং সব চেয়ে ছোট টুনটুন ও মৌচুকি পাখী। এক জাতের মৌচুকি ভ্রমরের চেয়ে ছোট হয়।

সকল পাখীর চেয়ে জাপানের ইয়োকোহামা-মোরগের লাজ পাখীর শরীরের অল্পপাতে লম্বা, ময়ূরের পুচ্ছের চেয়েও ঢের বড়। ময়ূরের পুচ্ছ সকল—পাখীর পুচ্ছ অপেক্ষা গোছে মোটা, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ও দেখিতে সুন্দর। ময়ূরের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে সে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া পেখম ধরিতে পারে। ময়ূরের ছায় পেরু ও বেহালা-পাখীও পেখম ধরে। বেহালা-পাখী মাত্র অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। ছাঁতার পাখীও পেখম ধরে, তাহাদের পেখম পাখার মতন



মুগাঁর বাচ্ছা উনিশ দিন তা পাইয়া পরিপুষ্ট অবস্থায়
ডিম ভাঙিয়া বাহির হইবার উপযুক্ত হইয়াছে।

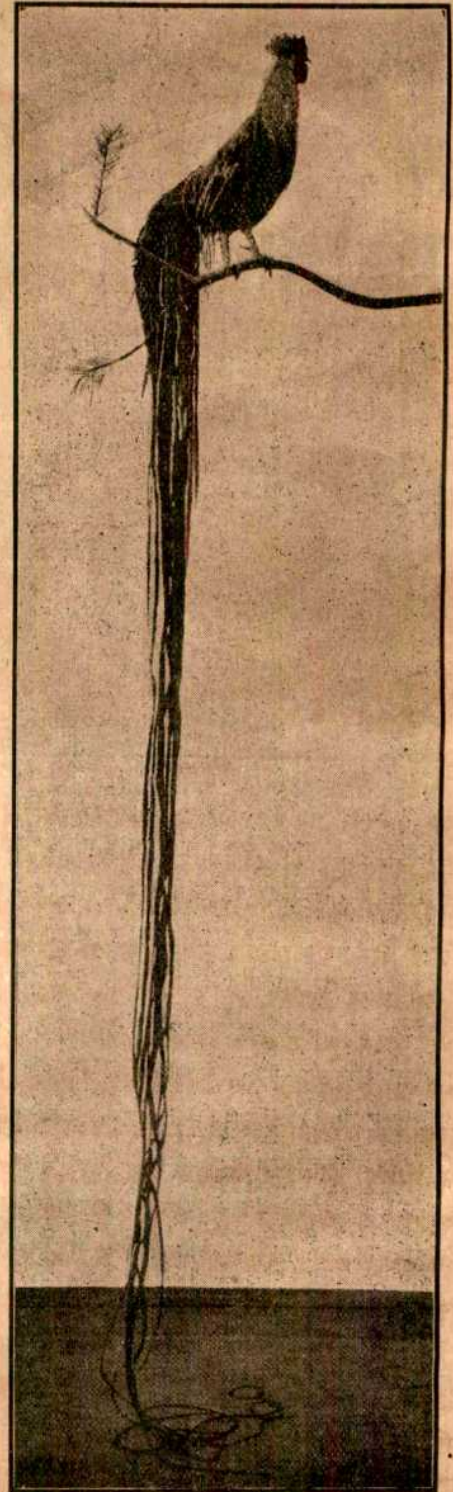


পাখীর হাত

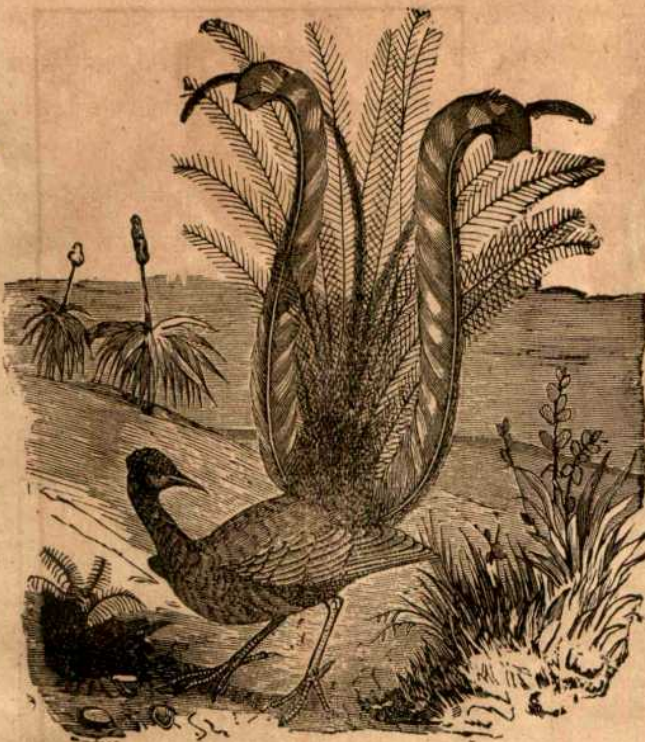
ব্রিটিশ গায়ের হোয়াটজিন্ পাখীর ডানায় আঙুল ও নখ।
এই পাখী ডানা, পায়ের নখ ও ঠোট দিয়া আঁকড়াইয়া
ধরিয়া ধরিয়া খাড়া গাছে উঠিতে পারে।

আকার ধারণ করে বলিয়া ইংরেজিতে এদের Fan-tail
বলে, বাংলায় বলে ছাতা'র পাখী।

অষ্ট্রেলিয়াতে স্বর্গের পাখী নামে একরকম ছোট ছোট
অতি সুন্দর পাখী আছে। এই স্বর্গের পাখীর অনেক
রকম জাত, ইহাদের বিভিন্ন জাতের পালকের রং, সংস্থান
ও ধরণ বিভিন্ন প্রকারের। এক জাতের স্বর্গের পাখীর পুচ্ছে
ও মাথায় খুব সুরু সুরু তারের মতন বিচিত্র রঙের লম্বা লম্বা



ইয়োকোহামা-মোরগ—ইহাদের ছ-রকম জাত হয়—সাদা
ও রঙিন, এটি রঙিন জাতের নমুনা।



বেহালা-পাখী।

পালক ও শিখা থাকে। একএক জাতের স্বর্গের পাখীর পালক এত প্রচুর ও বিচিত্র যে দেখিলে একটি গাছের ঝোপ বলিয়া মনে হয়। এই পাখী এত সুন্দর যে নাম হইয়াছে স্বর্গের পাখী, কিন্তু আসলে ইহারা কাকের জাতি।

আমাদের দেশের বন-মুরগীর পুচ্ছ অনেক স্বর্গের পাখীর মতন লম্বা ও সুদৃশ্য। নরুন-পোছা পাখীর পুচ্ছ একটি পালক খুব সরু ও লম্বা হয় বলিয়া উহার ঐ নাম। গুয়েল্লাকুড়া বা শা-বুলবুল পাখীর পুচ্ছ হইতে একটা লম্বা সাদা পালক ছাকড়ার ফালির ছায়া বুলে। অষ্ট্রেলিয়ার এক জাতের কুঞ্জপাখীর গায়ে মরিবার ঠিক আগে টকটকে লাল পালক গজায়, অল্প সময় তাদের গায়ের পালকের রং অল্প রকম ও অল্পজল থাকে।

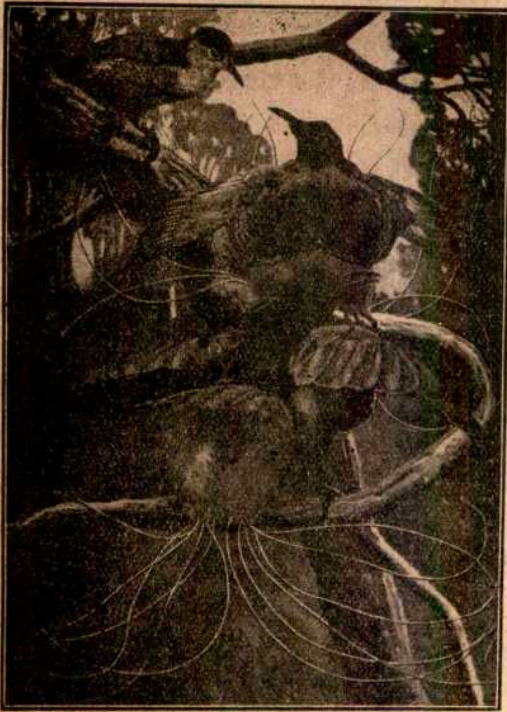
পাখীর অপর একটি নাম খেচর; পাখী উড়িতে পারে-না বলিলে স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই অনেক পাখী মোটেই উড়িতে পারে না, অনেক পাখী অতি অল্পই উড়িতে পারে। মুরগী, পাতিহাঁস, প্রভৃতি গৃহপালিত পাখী অতি অল্পই উড়িতে পারে। অষ্ট্রিচ বা

উটপাখী জাতীয় পাখীর ডানা থাকিলেও তাহাদের শরীর এত ভারি যে তাহারা মোটেই উড়িতে পারে না। আফ্রিকার অষ্ট্রিচ ৮ ফুট উঁচু হয়; উহাদের ডানাও প্রকাণ্ড, কিন্তু তাহাদের প্রকাণ্ড শরীরকে বাতাসে ভাসাইয়া রাখিবার মতন ওকাণ্ড নয়; নৌকার পাল তোলার মতন ডানা মেলিয়া উহারা খুব জোরে দৌড়িতে পারে। এই ক্ষমতা দৌড়িবার শক্তি থাকাতে তাহারা সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইহারা দক্ষিণ আমেরিকার রিয়ো পাখীর ছায় জেভা ও হরিণের দলে চরে। পাখীর পায়ে চারটা করিয়া আঙুল থাকে, কিন্তু অষ্ট্রিচের আঙুল মাত্র দুটি, তাহারও একটি অতি ছোট, হয়ত অল্প দিনে তাহাও লুপ্ত হইয়া যাইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার এমু পাখীর ডানা সর্কাদের পালকের মধ্যে এমন গুপ্ত হইয়া থাকে যে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না যে তাহার ডানা আছে। মোয়া পাখীর ডানা মোটেই নাই। তাহার শরীর ৭ ফুট উঁচু হয়। আপ্টারিক্স পাখীও খুব উঁচু, ডানা-হীন।



স্বর্গের পাখী।



স্বর্গের পাখী

ইহাদের পুচ্ছের সরু সরু পালক তারের মতো।

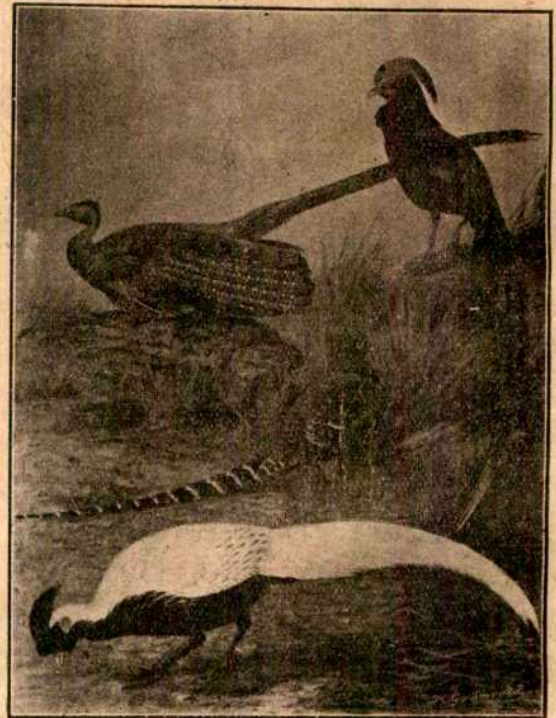
নিউ জিলাও কিণ্ডি, পঁচা-টিয়া, ওকা-রেল প্রভৃতি কয়েক প্রকার পাখী আছে যাহারা মোটেই উড়িতে পারে না। কিণ্ডি পাখী দেখিতে অনেকটা সজারুর মতন, ইহারা রাত্রি খুব জোরে কিণ্ডি-কিণ্ডি করিয়া চোঁচায়। কিণ্ডি-পাখীর আর-একটি বিশেষত্ব এই যে তাহারা যে ডিম পাড়ে তাহা তাহাদের আকারের চেয়ে বড় দেখায়।

মরিশাস ও মাডাগাস্কারের প্রাচীন বাসিন্দা, অধুনা লুপ্ত জোডো সলিটেরার পাখী প্রভৃতিও উড়িতে পারিত না, তাহাদের ডানার আভাস মাত্র ছিল, তাহাতে কোনো কাজ হইত না।

এইসব বড় মেজো ছোট নানা আকারের পাখীর উড়িবার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার কারণ খাদ্যের প্রাচুর্য, এবং প্রতিযোগিতা ও শত্রুর অভাব। এইরূপ নিশ্চিত আয়েসে থাকিয়া উড়িবার আবশ্যক হয় না, এবং অব্যবহারে উড়িবার অঙ্গ ডানা ক্রমে জড় পদ্ব হইয়া ছোট হইতে হইতে অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। তখন বাসস্থানের আব-হাওয়ার

পরিবর্তন হইলে বা নূতন শত্রুর আবির্ভাব হইলে তাহাদের সবংশে উজাড় হইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এইরূপে অনেক পাখী উজাড় পাইয়া এখন নামশেষ হইয়া আছে।

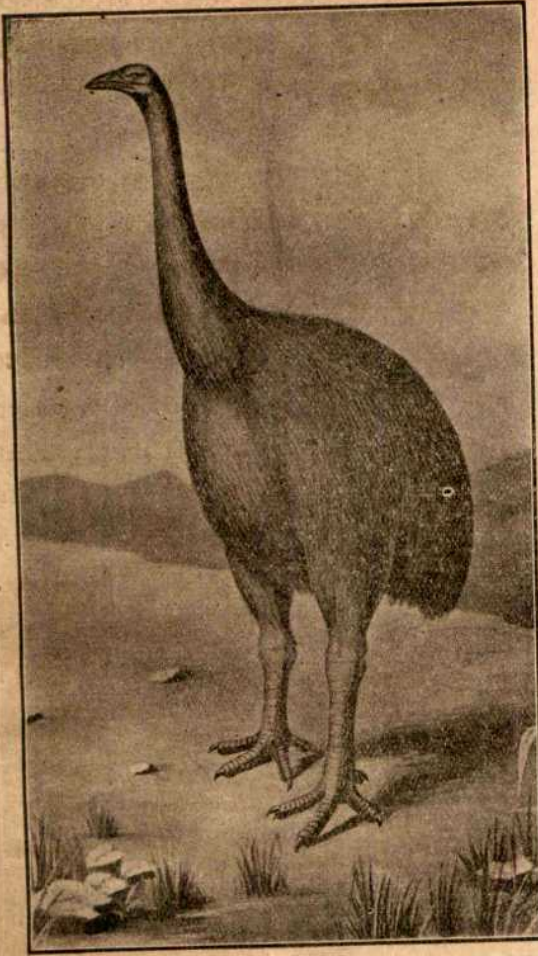
মেক্সিকোহিত বরফে-ঢাকা দেশের বাসিন্দা পেঙ্গুইন পাখী উড়িতে পারে না; জোরে দৌড়িতেও পারে না। কারণ সেখানে তাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী অজাত-শত্রু হইয়া বাস করে। মেক্সিকোয় মাছুষ গিয়া তাহাদের এখন উপদ্রব করিতেছে; লোকের তাড়া খাইলে তাহারা পা ও ডানা দিয়া চারপেয়ে জন্তুর মতন চলে।



বন-মুরগী

ইহাদের পুচ্ছ ও পালক নানান রঙের, কোনো কোনো জাত পেখম ধরিতেও পারে।

পাখীর পুচ্ছের উপরে একটি গ্রন্থি থাকে, তাহা হইতে তৈলক্ষরণ হইয়া পালকগুলিকে মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে; জলচর পাখীদের এই তৈলক্ষরণ বেশী হয় এবং তাহাতেই তাহাদের গায়ে জল লাগে না। অনেক পাখীর পালক আপনা-আপনি গুঁড়াইয়া ধূলা হইয়া শরীরে ছড়াইয়া যায়



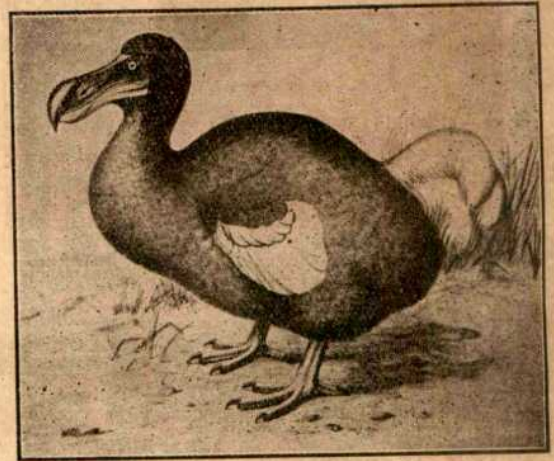
মোর পাখী
মাত ফুট উঁচু; ডানা মোটেই নাই।

তাহাতেও তাহাদের পাউডার মাথার কাজ হয়, গায়ে জল ঠাণ্ডা লাগিতে পায় না; কাকাতুয়ার গলায় মাথার ঝুটির নীচে হাত দিলে এই পালক-গুঁড়া পাউডার হাতে প্রচুর লাগিতে দেখা যায়।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণী খাওয়ার জন্ত বাঁচে, বাঁচিবার জন্ত খায় না। পাখীদের ঠোঁট দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। যে পাখী যেক্রপ আবেষ্টনের মধ্যে থাকে তাহার ঠোঁট তদুপযোগী হয়—সেই আবেষ্টনে সহজপ্রাপ্য খাদ্য গ্রহণের উপযোগী হইয়া ঠোঁট গড়িয়া উঠে। এইজন্ত পাখীর ঠোঁটের আকারের অনন্ত প্রকার দেখা যায়।

কাকের ঠোঁট একাধারে ছোরা, কুড়ুল, হাতুড়ি,

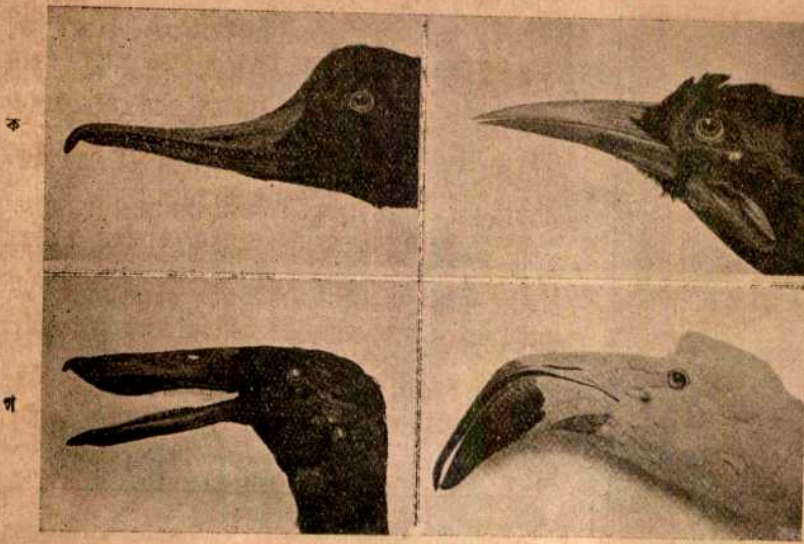
সাঁড়াশী, চিমটে প্রভৃতির কাজ করে। এক্রপ ঠোঁট সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ রকমের কাজের জন্ত বিশেষ আকারের বহু-প্রকার ঠোঁট আছে। কাঁচি-ঠোঁট পাখীর ঠোঁট খাড়াদিকে চেপ্টা, উপর ঠোঁটের চেয়ে নোচেরটা লম্বা, এবং ঠোঁট জুড়িলে সাধারণ ঠোঁটের মতন উপরাউপরি না পড়িয়া কাঁচির মতন পাশাপাশি পড়ে। এই পাখী জলচর, মংস্রাশী। জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইবার সময় নোচের বড় ঠোঁটটা জলে ডুবাওয়া চলে এবং মাছের পোহানের কাঁকের নাগাল পাইলে টপ টপ করিয়া একটার পর একটা উপর ঠোঁটের চাপে কাঁচি-কাটা করিয়া গিলিতে থাকে।



ডোডো পাখী
মাডাগাস্কারের প্রাচীন বাসিন্দা, অধুনা লুপ্ত; ইহার ডানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অকর্মণ্য ছিল।

বকের ও সারসের ঠোঁট বর্শার কাজ করে, মাছকে বিধিয়া মারিয়া খায়। মাছরাজার ঠোঁট ছোরা আর চিমটের কাজ করে। কাদাখোঁচা ও বনমোরগের ঠোঁট যেন ডাক্তারী সন্না, তাহার শুধু ডগা দিয়া জিনিস ধরা যায়; কাদা জায়গায় ঠোঁট বিধাওয়া পোক ধরিবার উপযুক্ত।

হর্বিল পাখীর বা শিং-ঠোঁট পাখীর ঠোঁট কিছুত-কিমাকার,—তাহার ঠোঁটের উপরে একটা মোটা শিং গজায়, তাহা হাতুড়ির কাজে পোক্ত। অল্প পাখীর ঠোঁটের হাড়ের উপরকার চামড়া পাতলা ও নরম হয়; কিন্তু ইহার ঠোঁট যেমন শক্ত, উহার উপরের আবরণও তেমনি পুরু ও



পাখীর নানাবিধ ঠোঁট

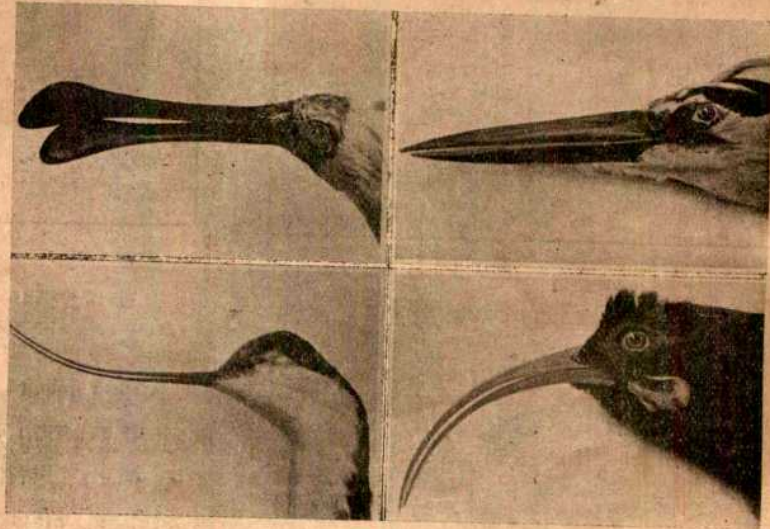
ক—মার্গ্যান্ডার মেছো পাখীর ঠোঁট। খ—মন্ডা হইয়া পাখীর ঠোঁট, ইহার পোকাখোর।

গ—কোদাল-ঠোঁট-হাসের ঠোঁট। ঘ—ফ্রামিঙ্গে বকের ঠোঁট—উভয়েই জলের উপর থিতানো দৃশ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাঁকিয়া খায়।

ফুকোরের মধ্যে গিয়া বসে এবং মন্ডা পাখী ষড়কুটায় কাদা মাখিয়া সেই ফুকোরের মুখ প্রায় বন্ধ করিয়া দায়। একটু যে ছিদ্র থাকে তাহার ভিতর দিয়া মাদী পাখী মাঝে মাঝে ঠোঁট বাহির করিয়া দায় এবং মন্ডা পাখীটা তাহার আহার জোগায়। এই পাখীকে দেখিয়াই প্রাচীন-কালের আরব ও ইটালীয়দের মধ্যে ফিনিক্স পাখীর কাল্পনিক গল্প চলিত হইয়াছিল। এই পাখী ভারতবর্ষে ও সিংহলে প্রচুর।

ইহাদের এক জাতি মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে।

কঠিন। ইহাদের ঠোঁটের উপরকার শিং খুব মোটা হইলেও তাহার ভিতর কাঁপা হওয়াতে বেশী ভারী হয় না। শিং-ঠোঁট পাখীর আকার কাকের মতন হইতে বড় পেকুর মতন পর্যন্ত হয়। এই পাখীর নানা জাতের ঠোঁটের উপরকার শিং নানা আকারের হয়। কাহারো শিং হয় খড়্গের মতন, কাহারো বা হাতুড়ির মতন, কাহারো বা বাঁকা, কাহারো সূচলো, কাহারো ভোঁতা। নেপালের শিং-ঠোঁট পাখীর ঠোঁটে দাঁতের মতন খাঁজ খাঁজ কাটা থাকে, কিন্তু তাহার দ্বারা ইহাদিগকে খাদ্য চিবাইতে দেখা যায় না, তাহারা সমস্ত জিনিষ গিলিয়া খায়। ইহাদের ডাক স্ত্রীলোকের বিলাপধ্বনির মতন। ইহারা গাছের ফুকোরে বাসা করে। ডিম পাড়িবার সময় মাদী পাখী



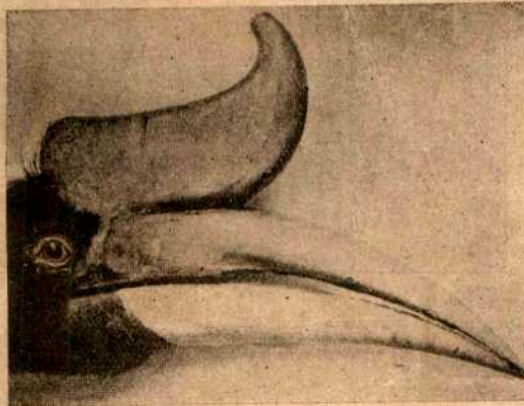
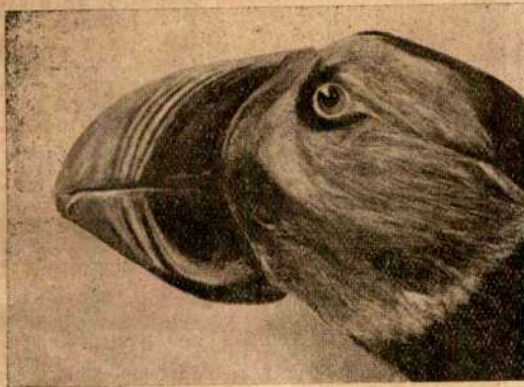
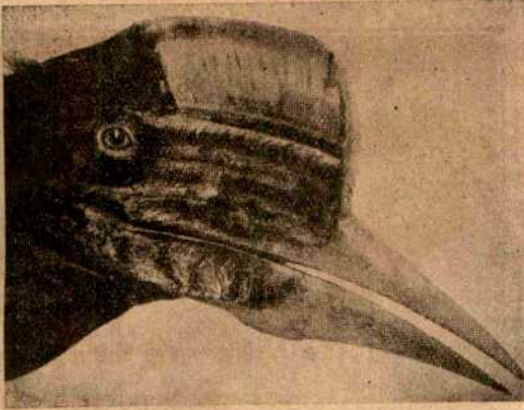
পাখীর নানাবিধ ঠোঁট

ঘ—ধনেশ পাখীর ঠোঁট এক জোড়া চামচের মত। জ—বক জাতীয় হেরন পাখীর ঠোঁট,

ছ—আভোসেট পাখীর ঠোঁট, এই তিনটিই মাছ ধরিয়া খাইবার উপযুক্ত।

জ—মাদী হইয়া পাখীর ঠোঁট, শনার মত পোকা ধরিবার উপযুক্ত।

সেখানে ইহাদের শব্দ হইতে ইহাদের নাম হইয়াছে ঠকঠকান্। ইহাদের শরীরের অল্পপাতে ঠোঁট অতি প্রকাণ্ড, দেখিলেই আগে ঠোঁটই নজরে পড়ে এবং মনে হয় পাখীর শরীরের চেয়ে ঠোঁটটাই বড়। ইহাদের ঠোঁটের কিনার



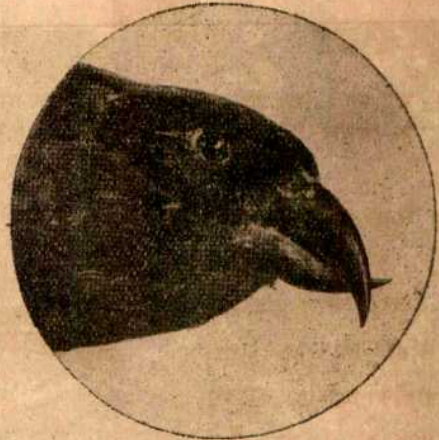
পাখীর নানাবিধ ঠোঁট

উপরে ও নীচে দুই জাতের শিং-ঠোঁট-পাখীর ঠোঁট ও মাঝে মাঝেখোর পাকিন্ পাখীর ঠোঁট।

করাতের দাঁতির মতন কাটাকাটা, তাহা দিয়া ইহারা খাবার চিবাইয়া খায়। ইহাদের ঠোঁটের রং উজ্জ্বল ও সুন্দর এবং তাহাতে বিচিত্র আকৃতির নক্সা কাটা থাকে। ইহাদের ঠোঁট প্রকাণ্ড হইলেও বাতাস-ভরা কোষের সমবায়ে গঠিত বলিয়া খুব হালকা।

কাকের ঠোঁট কুড়ুলের কাজ চালাইতে পারে বটে, কিন্তু কাঠঠোকরার ঠোঁট কাঠ চেলাইতে সকল ঠোঁটের চেয়ে মজবুত। কাঠঠোকরা বেশ বুঝিতে পারে কোন্ গাছের খোল কোঁপরা হইয়া গিয়াছে; সে সেই কোঁপরা গাছের কঠিন পাশ-দেয়াল ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে বাসা করে ও নিরাপদে ডিম পাড়িয়া বাচ্চা পালে।

টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না, লালময়, হীরাময় প্রভৃতির ঠোঁট কাতুরী-কাঁচির কাজ করে; তাহাদের নীচের ঠোঁট খাটো, সামনে আড়া-আড়ি ধার, তাহার উপর উপর-ঠোঁট পড়িয়া চাপ দিলে সহজেই সকল জিনিস কাটিয়া যায়। ইহাতে তাহারা কঠিন খোলার বাদাম আখরোটও কাটিয়া খাইতে পারে।



চার-ঠোঁট পাখীর ঠোঁট।

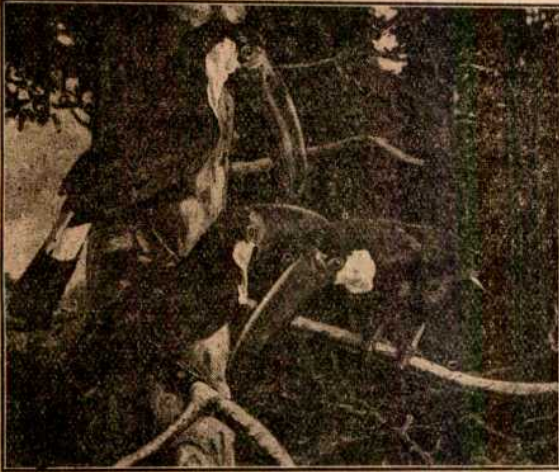
যে-সব পাখী মাংস ছিঁড়িয়া খায় তাহাদের ঠোঁট ডগায় খুব চোখা হয় এবং অনেকের ঠোঁটের কিনারে সারিসারি দাঁত থাকে। শিক্রে বাজপাখীর ঠোঁট বঁড়শীর মতন বাঁকা চোখা, অধিকন্তু কিনারের তীক্ষ্ণধারের উপর একটি করিয়া দাঁত থাকে।

যে-সব ছোট টুনটুনি পাখী ফুলের মধু পান করে তাহাদের ঠোঁট খুব সরু লম্বা ও ঈষৎ বাঁকা হয়; তাহারা ফুলের মধুকোষে ঠোঁট বিধাইয়া মধু চুষিয়া খায়। ইহাদের ঠোঁট কাটা-কাটা করাতের দাঁতির মতন, কীট পতঙ্গ ধরিবামাত্র পিষিয়া যায়। ইহাদের জিভও খুব লম্বা—চট করিয়া বাহির করিয়া চট করিয়া গুটাইয়া লইতে পারে এবং চটচটে থুতুতে ফুলের পোকা আটকাইয়া মুখের মধ্যে লইয়া

আসে। ইহাদের পুচ্ছের ছুপাশের দুই গুচ্ছ পালক খুব লম্বা হয়।

দ্রুত পাখীর ঠোঁট একজোড়া চামচের মতন, তাহার বিশেষ খাদ্য আহরণের উপযুক্ত। হাঁসের ঠোঁটও অনেকটা এইরূপ। ইহারা গুলি শামুক বিছুক ভাঙিয়া খায়, অথবা জলের উপর যেসব ক্ষুদ্র প্রাণী বা সূক্ষ্ম উদ্ভিদ জমিয়া থিক-থিক করে সেইগুলিকে জল হইতে ছাঁকিয়া তুলিয়া খায়।

আফ্রিকার নীল নদের ধারে একরকম বক চরে তাহার ঠোঁট অদ্ভুত রকম চওড়া; তাহাকে সেইজন্ম আরবেরা জুতো-মুখে পাখী বলে; স্বদানের আরবেরা বলে জুতোর জনক; কেহ বা বলে আবু মরকব বা জাহাজের হাইল। ইহারা সাপ, ব্যাং, মাছ, শামুক, বিছুক খায়।



ঠক-ঠকান পাখী

কাঠোঁকরা জাতের সর্বাপেক্ষা বড় পাখী, ঠোঁটের ডগা হইতে লাজের ডগা পর্যন্ত ২ ফুট, কিন্তু ইহার ঠোঁটটাই ৮ ইঞ্চি। ঠোঁট খুব শক্ত কিন্তু হাল্কা।

অনেক পাখীর ঠোঁট থাকিলেও আহার সংগ্রহে তাহার ঠোঁটের ব্যবহার করে না। নাইট-জার বা রেতের বোতল পাখী ঠোঁট মেলিয়া প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে, পোকা মাকড় উড়িয়া গিয়া তাহার গলার বোতলে পড়িলে গিলিয়া খায়। এইরূপ অব্যবহারে তাহাদের ঠোঁট প্রকাণ্ড আকারের ও মাথার তুলনায় অতিশয় ছোট হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক পাখীর ঠোঁটের উপর থোপা হইয়া পালক গজায়—যেমন রক্তরাঙা পাহাড়িয়া ময়না।



জুতো-ঠোঁট পাখী।

অনেক পাখীর মাথায় বিচিত্র আকারের পালকের চূড়া হয়, কাহারও বা শিং হয়। আমেরিকার কুরাসৌ পাখীর মাথায় টকটকে লাল তিন ইঞ্চি শিং গজায়, মাদি পাখীর কিছু ছোট হয়।

বর্তমান কালে যত রকম শিকারী পাখী আছে তাহার মধ্যে আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলের বাসিন্দা ঈগল পাখী সব চেয়ে বড়। শকুনি গৃধ্রীনা ডানা মেলিলে এক ডানার ডগা হইতে আর-এক ডানার ডগা পর্যন্ত মাপে ঈগলের চেয়ে বড় হইতে পারে, কিন্তু শরীরের মাপে আমেরিকার



শিংওয়ালা কুরানো পাখী
বা
পাহাড়ে মোরগ।

ঈগল তাহাদের অপেক্ষা বড়। ফিলিপাইন দ্বীপে এক রকম ঈগল পাখী আছে, তাহাদের মুখের ভাব কতকটা বানরের মতন ও কতকটা পেঁচার মতন। তাহারা কেবল মাত্র বানর মারিয়া খায়। এক ছোঁয়ে বানরকে ধরিয়া তীক্ষ্ণ নখে তাহার হৃদপিণ্ড বিদীয়া নিমেষ মধ্যে মারিয়া ফেলে। অনেক বলেন বানরের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে এই হাপি-ঈগল বানরের আকৃতি লাভ করিয়াছে।

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় এক রকম পাখী আছে তাহারা মাথার পালক ছাতার মতন ছড়াইয়া দিতে পারে। এইজন্ত তাহাদিগকে ছাতা-পাখী বলে। ইহাদের গলা হইতে একটা লম্বা নল বুলে, কাহারও বা নলের উপর গলায় একটা চণ্ডা বুলিও থাকে, যেন ব্যাগ-পাইপ বজ্রনা। এই নলের গায়ে পালক থাকে না, চামড়ারই রং খুব উজ্জ্বল লাল ও হলদে হয়। এই নলের সহিত তাহাদের স্বর-নালীর যোগ থাকে, তাহাতে ইহাদের ডাক

শানাইয়ের বা ব্যাগ-পাইপের গানের মত খুব চড়া অথচ স্তম্ভিত হয়।

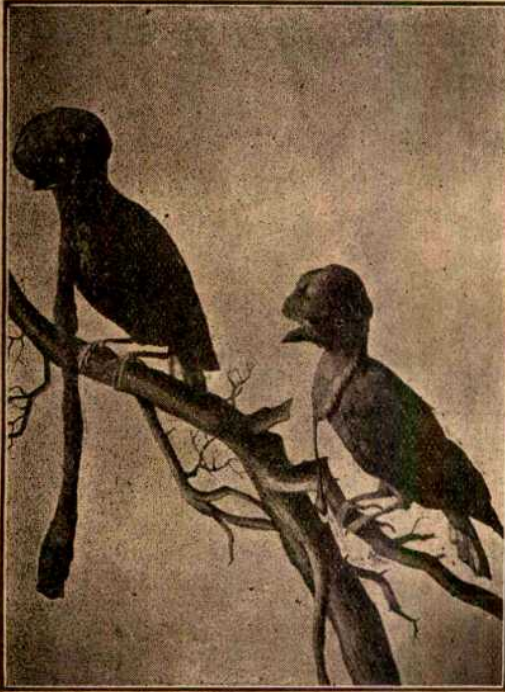
পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে পাখীর প্রকার অসংখ্য। সেখানে পাখীর শত্রু অগাধ জীবও বহু প্রকারের। সেইজন্য সেখানে পাখীরা আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্ত যত প্রকারের বাসা নিৰ্ম্মাণ করে তত আর কোথাও দেখা যায় না। যেখানে গাছ-চড়া পশু ও সাপের ভয় বেশী, সেখানকার পাখীরা গাছের ডাল হইতে ঝুলাইয়া দোতুল্য বাসা নিৰ্ম্মাণ করে।



বানরখোর হাপি ঈগল
ইহাদের মুখে কতকটা পেঁচা ও কতকটা বানরের ভাব।

ভারতবর্ষে বাবুই পাখী খড় দিয়া কুঠরীওলা লম্বা লম্বা বাসা বুনিয়া শাখা-প্রশাখাহীন লম্বা তাল-গাছের ডগায় ঝুলাইয়া দায়। এই বাসার বুনন অতি পরিপাটি। শত্রু যাহাতে শীঘ্র বাসায় ঢুকিতে না পারে এজন্য লম্বা ছাঁড়িপথ থাকে; এবং বাসার পাশে একটা দরজার মতন ফাঁক থাকে, কিন্তু তাহা ভিতরে বন্ধ, সে পথ দিয়া বাসার ভিতর ঘবে-ঘাওয়া যায় না, ইহা শত্রুদের খোকা দিবার জন্ত তৈয়ারি হয় মাত্র। অতি ছোট টুনটুনি পাখী গুটিপোকাক গুটি

হইতে সূতা সংগ্রহ করিয়া অথবা যেখানে যেটুকু সূতা
কুড়াইয়া পায় তাহাই খুঁটিয়া আনিয়া গাছের একটি অথবা
একাদিক পাতাকে ঠোঙার আকারে ঠোঁট দিয়া সেলাই
করে। সেলাই বাহাতে খুলিয়া না যায় সেজন্য সূতার
একপাশে একটা গিট বাঁধিয়া দায়। সেই সেলাই-করা
পাতার ঠোঙার মধ্যে নরম খড় তুলা দিয়া বাসা করে।
তুলা বাহাতে উড়িয়া না যায় তাহার জন্ত পাতার গায়ে
হেঁদা করিয়া একটু একটু তুলা ঠেলিয়া বাহির করিয়া দায়।
যদি কখনো কোনো পাতা শুকাইয়া গাছ হইতে খসিয়া
যায় তবুও তাহা অপর পাতার সঙ্গে সেলাই করা থাকিতে
পড়িয়া যাইতে পারে না।



ছাতা পাখী

ইহাদের গলা হইতে এক একটা নল খুলে এবং মাথার
পালক ছাতার মতন বিস্তারিত করিতে পারে।

আফ্রিকার দক্ষিণে এক রকম ত্রুটি পাখী আছে।
তাহারা উদ্ভিদের তুলা ও ভেড়ার গা হইতে লোম ছিড়িয়া
সূতা পাকায় এবং একটা বোপের মাথায় কয়েকটা
কাঠির গায়ে সূতার টানা পোড়েন বাঁধিয়া কাপড় বুনে এবং
তাহার উপর একটা চাদোয়া খাটায়। এই বাসা দেখিতে

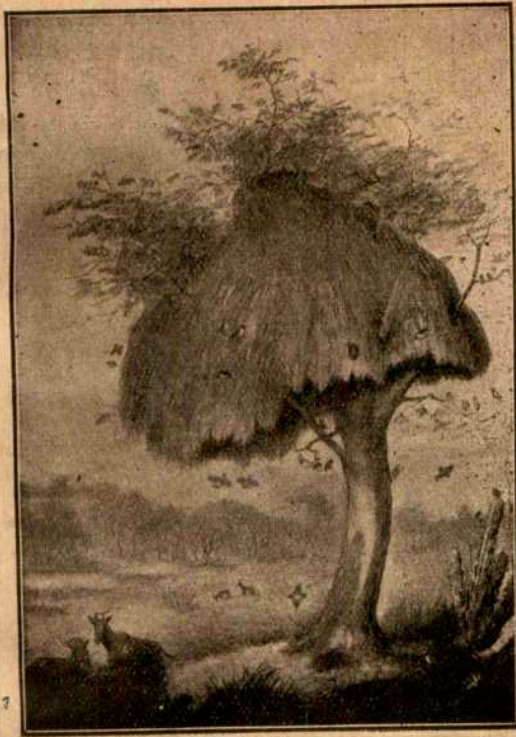


মৌচুম্বিক ও টুনটুনি পাখীর বাসা

- ১—এই বাসাটি খড় কুটা মাকড়সার জাল দিয়া বাঁধিয়া তৈয়ারি
ও গাছের ডাল হইতে ঝুলানো। ২—এই বাসাটি তুলা
ও পশুর লোম দিয়া তৈয়ারি। ৩—ছুটি পাতা
সেলাই করিয়া থলির আকারে প্রস্তুত।
৪—শেলালা জমাইয়া তৈয়ারি।

ঘড়ির পকেটের মতন হয়। তাহার মধ্যে দোতলায়
স্বতন্ত্র একটি ঘর থাকে। সেইটি মন্দা পাখীর শোবার ঘর।
তাতী-পাখীরা যখন চরিতে বাহির হইয়া যায় তখন তাহার
বাসায় ঢুকিবার পথ সেলাই করিয়া রাখিয়া যায়; ফিরিয়া
আসিয়া দরজা খুলিতে না পারিয়া অনেক সময় নিজেরাই
কাঁপরে পড়ে।

ভারতবর্ষের ও ফিলিপাইন দ্বীপের তুপুগা-টুনটুনি পাখী
শুকনো পাতা খড় গাছের আঁশ দিয়া ডিম্বাকৃতি ঠোঙা
করিয়া মাকড়সা শুঁয়োপোকা প্রভৃতির জাল দিয়া বাঁধিয়া
সরু ডালের ডগায় ঝুলাইয়া বাসা বাঁধে। এই বাসায়
ঢুকিবার জন্ত ইহার পাশে একটা গর্ত কাটা থাকে এবং
তাহার উপর একটা বারান্দা বাহির করা থাকে, তাহাতে
শত্রুরা প্রবেশপথ দেখিতে পায় না, ও পাখী বাসায় বসিয়া



সামাজিক চড়ুই পাখীর বাসা

বাবলা গাছের উপরে উলুখড় দিয়া চাল ছাওয়ার মতন বাসা বাঁধিয়াছে।

জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া থাকিলে তাহাকেও কেহ দেখিতে পায় না ও তাহার মাথায় বুড়ির জল পড়ে না।

মধুচূষকি বা মোটুশকি পাখীর বাসা ভারি সুন্দর, যেন ছোট ছোট মনিব্যাগের মতন। কোনো-কোনোটা বুলি বা থলির মতন। তাহার বুনন আগাগোড়া সমান ও সংহত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় চড়ুইপাখীর ছায় এক রকম পাখী আছে, তাহারা বেশ সামাজিক—গাছের ডালে ঘাস দিয়া খুব বড় একটা বাসা বুনে ও তাহার মধ্যে অনেক কুঠরী করে, একএক কুঠরীতে একএক জোড়া পাখী বাস করে। এই বাসা দেখিতে ঠিক মাছঘের ছাণা খোড়ো ঘরের চালের মতন; যখন তাহাদের গ্রামে নতুন পাখী আসে তখন তাহার জন্ম নতুন কুঠরী যোগ করা হয়, অপরের বাস-করা থালি কুঠরীতে কেহ থাকে না। এইরূপে ক্রমশ তাহাদের বাসা বাড়িয়া চলে।

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে এক রকম টুনটুনি পাখী

আছে তাহারা মাটির সঙ্গে সমান্তরাল (horizontal) একটা ডাল খুঁজিয়া তাহার উপর কাদা দিয়া তন্দুরের আকারের বাসা তৈয়ারি করে। ইহাকে হাঁড়ি-বানী পাখী বা কুমোর-পাখী বলা যাইতে পারে। ইহাদের বাসা এমন এঁটেল মাটিতে তৈয়ারি হয় যে উহা রোদে শুকাইয়া পোড়া ইটের মতন শক্ত হইয়া যায়। উহার প্রবেশের পথও এমন প্যাচালো ও দরজার পিছনেই এমন একটা শক্ত দেয়াল খাড়া থাকে যে দরজার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া কেহ যে পাখীর ডিম বা ছানা চুরি করিবে তাহার জো রাখে না। এজন্য ঐ পাখী তাহার বাসা লুকাইবার কোনো চেষ্টাই করে না, বেশ সদর জায়গাতেই গড়বন্দি বাসা বাঁধিয়া বাস করে।



কুমোর পাখীর হাঁড়ির মতো বাসা।

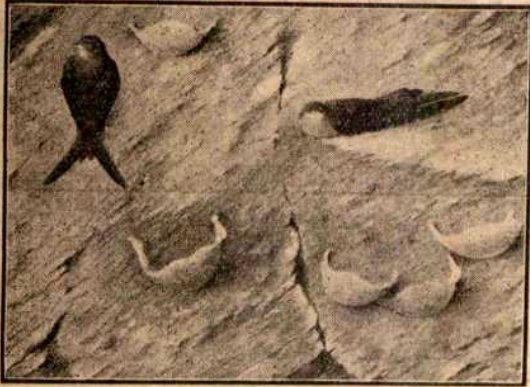
ফ্রান্সিঙ্গে নামে বক জাতীয় সারস-পাখীরা জলার ধারে একএকটা মিছরির কুঁদোর আকারের মাটির ঢিপি গড়িয়া তাহার উপরে ডিম পাড়ে।

অষ্ট্রেলিয়ায় এক-রকম পাখী আছে তাহারা শুকনো ঘাস পাতা জড়ো করিয়া তাহার উপর ডিম পাড়ে এবং ডিমের উপর ঘাস পাতা চাপাইয়া ঢেঁরি লাগাইয়া দ্যায়। এই ঢিপির বেড় ৪৫ ফুট পর্যন্ত হয়। ঢিপির ঘাস পাতার তাতে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।

এক জাতের ফিঙে পাখী থুতু দিয়া তুলোওলা বীজ জুড়িয়া জুড়িয়া বাসা বানায়। অপর জাতের ফিঙে থুতু দিয়া শেয়ালা জমাইয়া ঠোঙার আকারে বাসা করে। অল্প এক জাতের ফিঙের থুতু এত প্রচুর ও আঠালো যে তাহারা কেবল মাত্র থুতু জমাইয়া বাটির মতন বাসা গড়ে ও সেই বাসা বাড়ীর

দেয়ালের গায়ে বা পাহাড়ের খাড়া গায়ে খুঁতু দিয়া ব্রাকেটের মতন আঁটিয়া দায়। এই পাখীর বাসা চীনেরা সংগ্রহ করিয়া বোল রাঁধিয়া খায়; ইহা তাহাদের ভোজের বিলাস-দ্রব্য; এজন্য ইহা বাজারে খুব চড়া দামে বিক্রয় হয় এবং যেসব জায়গায় এই পাখী বাসা বাঁধে সেখানে হইতে বাসা সংগ্রহের ইজারা-পত্ৰনি চড়া খাজনায় বিলি করা হইয়া থাকে।

কুঞ্জ পাখী বাসা বাঁধে অতি সাধারণ রকমে, কিন্তু প্রিয় মিলনের জন্য আলাদা একটি কুঞ্জ রচনা করে। ইহাদের বিভিন্ন জাতের কুঞ্জরচনা বিভিন্ন প্রকারের। কেহ বা কাঁচা পাতা ছিঁড়িয়া একটি পরিষ্কার জায়গায় গোল করিয়া ছড়াইয়া দায়। কেহ বা শুকনো কাঠি দিয়া একটা চাটাই বুনিয়া তাহাতে গোল করিয়া কাঠি খাড়া করিয়া গুঁজিয়া দায় ও শামুকগুলির খোলা, ছুড়ি, পালক, হাড় বা যেখানে পায় কুড়াইয়া আনিয়া কুঞ্জগৃহ সাজায়। ইহারা চকচকে ধাতু দ্রব্য



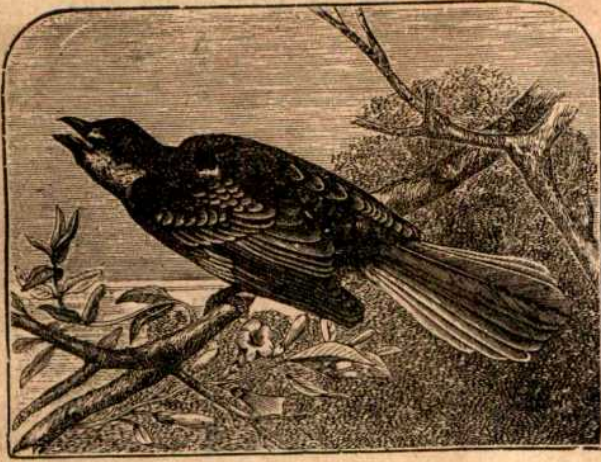
কিও পাখীর খুঁতু-জ্ঞান। বাসা, চীনা-দের প্রিয় খাদ্য।

দিয়া ঘর সাজাইতে ভালোবাসে, এজন্য গৃহস্থের বাড়ী চুরি করিতে যায়। কুঞ্জ রচিত হইলে মন্দা পাখী ঠোঁটে একটি কাঁচা পাতার রুমাল বুলাইয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচিতে-নাচিতে গান গাহিয়া প্রিয়াকে আবাহন করিতে থাকে; ইহাদের গানের শব্দও অদ্ভুত—যেন ছেঁদাবোজা একটা নলের মধ্য দিয়া জল ঢালা হইতেছে। এক জাতের কুঞ্জ-পাখী একটা মোজা চারা গাছের চারিধারে মণ্ডলাকারে কাঠি পুতিয়া পানের বরোজের মতন মাথা-ঢাকা কুঞ্জ তৈয়ারি করে ও দরজার সামনে কোমল শব্দ ও শেয়ালা লাগাইয়া তাহার উপর ফুল পাতা ও রংচড়া



কুঞ্জ পাখীর কুঞ্জ রচনা ও কুঞ্জ সজা।

পোকা ছড়াইয়া বাগান সাজায়; এইসব জিনিস বাসি হইয়া গেলে তুলিয়া কুঞ্জের পিছনে ফেলিয়া দায় ও টাটকা ফুল পাতা তুলিয়া আনে। অপর এক জাতের কুঞ্জ-পাখী কুঞ্জ রচনা করে এইরূপে—এক জায়গায় পাশাপাশি দুইটা গাছ পাইলে দুইটা গাছের কাণ্ড বেড়িয়া কাঠি সাজাইয়া উচু করিতে থাকে; কাঠির বরোজ উচু হইয়া দুইটিতে যতক্ষণ না ঠেকাঠেকি হয় ততক্ষণ উচু করিতে থাকে। তাহার পর ফুল পাতা শামুক বিহীন ধাতুখণ্ড পোকা মাকড় শেয়ালা ফাণ দিয়া বরোজ সাজায়। মন্দা পাখীরাই স্থপতি আর্টিষ্ট। সাজানো হইলে গৃহপতি আত্মীয় কুটুমকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে; অভ্যাগতেরা গৃহসজ্জার খুঁত ধরিয়া যদি একটি পাতা কি ফুল একটু সরাইয়া বসায় অমনি গৃহ-পতির সৌন্দর্য্যবোধ অপমানিত হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। এই কুঞ্জ-পাখী বা বরোজ-পাখী কাকের জাতি। কাকেরও জাতিধর্ম অমৃত্যুর চকচকে জিনিসের প্রতি অতিলাভ আছে এবং সুবিধা পাইলেই চকচকে জিনিস চুরি করিয়া লইয়া গিয়া আপনার বাসায় গুঁজিয়া রাখে।



হরবোলা পাখী।

যে-সব পাখীর বাচ্চা একেবারে ডিম ফুটিয়াই হাঁটিতে পারে তাহারা বাসা বাঁধে না; যাহাদের বাচ্চার জন্মের অনেক পরে পালক গজায় ও হাঁটিবার উড়িবার সামর্থ্য হয় তাহারাই বাসা বাঁধে। কিন্তু কোকিল প্রভৃতি পরতৃত পাখীরা নিজেরা বাসা বাঁধিবার ক্রেশ স্বীকার না করিয়া অপর পাখীর বাসায় তাহার ডিম ফেলিয়া দিয়া আপনার ডিম পাড়িয়া আসে এবং পরকে দিয়া নিজের বাচ্চার লালন পালন করাইয়া লয়।

পাখীদাম্পত্য-প্রেম ও নিষ্ঠা এবং অসহায় সন্তানের প্রতি স্নেহের জ্ঞান বিখ্যাত; এইজন্ত তাহাদিগকে অপর সকল প্রাণী অপেক্ষা অধিক মনুষ্যধর্মী ও শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

পাখীর মতন সুমিষ্ট স্বর আর কোনো জন্তুর নয়; গাইয়ে পাখীদের কণ্ঠনালী এইজন্ত বিশেষ আকারে গঠিত। অনেক পাখী মানুষের কথার নকল করিতে পারে, যেমন—কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না। হরবোলা পাখী সকল রকম শব্দ নকল করে।

পাখীরা এইসব নানা কারণে কবির কাব্যে বহু সমাদৃত।

চাক্র।

দেশের কথা

স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে “রংপুর-দর্পণ” লিখিয়াছেন—

ছেলেমেয়েদিগকে উপযুক্ত করিতে হইলে পিতা-মাতারও উপযুক্ত শিক্ষা আবশ্যক। সুতরাং গৃহ-শিক্ষা কোমলপ্রাণ নারীদিগের হস্তেই অর্পিত হয়। তাই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন। স্ত্রী-শিক্ষার অর্থ ইহা নহে যে, আমাদের নারীদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে ভূষিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে যে, তাহারা যেন সর্ব বিষয়ে পুরুষদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। গৃহকর্ম ছাড়া এই-সমস্ত বিষয়ে নারীদিগের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।—(১) নারীদিগের বাঙ্গলা ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। রামায়ণ, মহাভারত জানা

থাকিবে; দেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসে যথেষ্ট জ্ঞান থাকিবে; দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিষয় তাহারা জানিবেন। (২) ইংরেজী ভাষায়ও নারীদিগের অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। (৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও মোটামুটি জ্ঞান আবশ্যক;—first aid to the injured অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার। (৪) আমাদের দেশের গ্রীলোক-দিগের মোটামুটি ভাবে ভূগোলে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যা কত? বাঙ্গলা দেশ কত জেলায় বিভক্ত? দেশের ও জেলার প্রধান কৰ্ত্তা কে? দেশের নবনদী কিরূপ ভাবে সন্নিবেশিত ইত্যাদি।

আমাদের দেশে আজকাল কিছুকিছু স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হইতেছে। কিন্তু অগ্রাগ্র সভ্য-দেশের তুলনায় তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমাদের দেশের পুরুষেরা সাধারণত স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী, সেইজন্ত যে-সব নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করেন পুরুষেরা ও দেশের অশিক্ষিতা নারীরা তাঁদের ভালো চোখে দেখেন না। এটা দুঃখের কথা হইলেও অস্বাভাবিক নয়, কারণ প্রচলিত রীতি বা প্রচলিত আদর্শ ছাড়িয়া নূতন আদর্শ গড়িতে চাহিলে বা নূতন পথে চলিতে চাহিলে সনাতনপন্থীদের হাতে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। অগ্রণী যিনি তাঁর গোরবই এইখানে; তিনি নূতন আদর্শ স্থাপনা করিতে গিয়া অশেষ দুঃখ ও অপমান মাথা পাতিয়া লইবেন পরবর্ত্তীগণের পথ সুগম করিবার জন্ত। জগতের ইতিহাস সকল সাধু অমু-ষ্ঠানের, সকল অগ্রণীদের নিগ্রহের কাহিনীতে পূর্ণ। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিতা নারীরা যদি কেবল নিজেরা শিক্ষিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, দেশের সাধারণ নারীদের মতই জীবন যাপন করেন তাহা হইলে দেশ বঞ্চিত হইল। যার যেমন শক্তি তাঁর সেই পরিমাণে দেশকে কিছু দেওয়া

উচিত। অস্তুত প্রত্যেক শিক্ষিতা নারী আর দু-চার জন নারীকে অক্ষর পরিচয় করাইয়া কিছু কিছু শিখাইয়া দিতে পারেন। আরো কত রকমে দেশের ভালো করিতে পারেন। তবে দেশকে বুঝিতে হইলে চিনিতে হইলে দেশের পথে বাহির হইতে হইবে, দেশের দশজনের সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে—ঘরের মধ্যে বসিয়া দেশের ভূগোল মুখস্থ করিলে বা কেবল খবরের কাগজ পড়িলে দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বাড়িবে না; দেশ-সেবার পথ কোন্ দিকে তা নির্ণয় হইবে না। অত্যাশ্চর্য সভ্যদেশে শিক্ষিতা নারীরাই অধিকাংশ পুণ্য-অনুষ্ঠানের অগ্রণী, তাঁরা পুরুষের মতই একাগ্রচিত্তে খাটিয়া থাকেন। আমাদের অল্পসংখ্যক মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পাইতেছেন বটে কিন্তু তাঁদের মনের কুঠা ঘোচে নাই, দশজনের সঙ্গে মেলামেশা দূরের কথা, তাঁরা রাস্তার উপর দিয়া পায়ে হাঁটিতে অক্ষম। তাঁদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন পা-ছুখানি দার্জিলিং, মধুপুর প্রভৃতি কয়েকটি বাছা বাছা শহরের রাস্তা হাঁটিবার জুগুই সৃষ্ট হইয়াছিল, যে-সে পথ মাড়াইবার জুগু নয়। এ বিষয়ে শিক্ষিতা মেয়েরা বর্ণজ্ঞানহীন মেয়েদের সমতুল্য। তাঁরাও দেবমন্দিরে বা গঙ্গাস্নানে সাইবার সময় পথ হাঁটিতে পারেন, কিন্তু যেই কোনো আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী বা অন্য কোথাও যাইতে হইল অমনি গাড়ীর দরকার! মন হইতে সকল কুঠা সকল কুসংস্কার দূর করিলে তবে দেশের কাজে লাগিতে পারা সম্ভব হইবে। সমাজের রক্তচক্ষুকে ভয় করিলে দেশবাসীর সামনে নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষার নব আদর্শ স্থাপিত হইবে কেমন করিয়া? তারপর আর-একটি কথা; প্রতিবৎসর মেয়েরা বি-এ, এম-এ পাশ করিতেছেন, কেহ কেহ খুব কৃতিত্বও দেখাইতেছেন, কিন্তু ইদানীং তো দেখা যায় না একটি মেয়েও কিছু নূতন সাহিত্য, সঙ্গীত বা হুকুমার শিল্প সৃষ্টি করিতেছেন। বাংলা দেশে যে জনকতক নারী উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁদের সংখ্যা দেশের কোঠাতেও পড়ে না। এমন অবস্থা কেন হইল সে-কথা ভাবিবার বিষয়। একটি প্রধান কারণ মনে হয় দেশের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ের অভাব। এই জুগু তাঁদের মন সঙ্গীর্ণ থাকিয়া যায়, দেশের জীবনের বহু বিচিত্র লীলা তাঁদের চোখে

পড়ে না, দেশের দৈন্ত্র অভাব ব্যর্থতা তাঁদের বিচলিত করে না। মন নাড়া না পাইলে সাহিত্য সৃষ্টি হইবে কেমন করিয়া? দেশকে কিছু দিতে হইলে, দেশকে নানারকমে সমৃদ্ধ করিতে হইলে, গৃহকোণ ছাড়িয়া দেশ-বাসীর ভিড়ের মধ্যে আসিয়া নারীর দাঁড়ানো আবশ্যক। সনাতনপন্থী হয়তো বলিবে—নির্লজ্জ! কিন্তু যে-লজ্জা নারীকে স্বদেশ হইতে দূরে রাখে, যে-লজ্জা নারীকে প্রকৃত নারীত্ব হইতে বঞ্চিত করে, সে-লজ্জা তো ত্যাগ করাই বিধেয়।

বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট অনেক দিন পূর্বে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী নির্ধারণের জুগু একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। কমিটি হিন্দুপ্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষা প্রদানের জুগু মত দিয়াছেন। তা ছাড়া মেয়েদের প্রধানত বাংলার সাহায্যেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। কমিটির প্রস্তাব কাজে পরিণত হইলে স্বফলের আশা আছে।

আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছে। কেবল সরকার বাহাজুরের কাছে দুঃখ নিবেদন করিয়া, ভগবানের কাছে হাত জোড় করিয়া বা অদৃষ্টকে দিক্কার দিয়া কিছু হইবে না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় চিন্তা করা দরকার। “ত্রিপুরা-হিতৈষী” এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া বলিতেছেন—

“আবহ” বিভাগ হইতে গভর্ণমেন্ট যথাসময়ে বর্ষার ভাবী অবস্থা ঘোষণা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে কৃষকবর্গও অবস্থা বুঝিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে। এই ঘোষণা বাহাতে দেশের সমস্ত লোক সহজে অবগত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব। প্রত্যেক পুলিশ স্টেশন দ্বারা প্রতি গ্রামে ইহার প্রচার করাইলে সকল কৃষকবর্গ ইহা অবগত হইতে পারে। যদি কৃষক বুঝিতে পারে যে বর্ষা শীঘ্রই ঘটিবে তবে শস্ত রোপণ কার্যও শীঘ্রই করিতে পারে এবং বর্ষার জল বিলম্বে আসিবে বুঝিতে পারিলে শস্তও বিলম্বে রোপণ করিতে পারে।

কোনও স্থানে বীধ বীধিয়া দিলে যদি প্রাচীন হইতে শস্ত রক্ষা করা সম্ভবপর হয়, তবে গভর্ণমেন্ট তাহার বিধান করিতে পারেন। স্থানে স্থানে তদ্রূপে জল নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে কতদূর করা সম্ভবপর তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। যদি অনাবৃষ্টির আশঙ্কা থাকে তবে পশ্চিম অঞ্চলের স্থায়ী মাঠের স্থানে স্থানে কৃষকগণ কৃপ খনন করিতে পারে এবং সেই



গৃহস্থালির আনন্দ
 বিশ্বদেশের চিত্র হইতে।
 বঙ্গদেশের চিত্র

Not

- কৃপের জল ক্ষেত্রে সিঁধন করিতে পারে। কিন্তু অন্যত্রটি ঘন ঘন ঘটে না এবং আমাদের দেশ নদী-মাতৃক, এইজন্ত উক্ত কৃপ খনন আবশ্যক না হইতে পারে।

কোন কোন বিশেষ ধাতু একপ থাকিতে পারে বাহা বহু ঘরাও বিনষ্ট হয় না কিবা বাহা যথাসময়ে যে-কোন স্থানে অল্প সময়ে উপস্থিত কবিয়া লওয়া যাইতে পারে। একপ ধাতু বাস্তবিক আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। আমাদের দেশে জলি, বোয়ো প্রভৃতি ধাতু কতক পরিমাণে এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু কৃষক-গণের অজ্ঞতা-বশতঃ এই-সমস্ত ধাতুর সর্বত্র চাষ হয় না।

তাহার পর বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন না করিতে পাবাতেও উপযুক্ত পরিমাণে ফসল পাওয়া যায় না। কখন কখন কোনও অজ্ঞাত কারণে ফসল উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, কখনও বা পোকায় ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। কখনও বা উপযুক্ত সার না দেওয়াতে ভাল ফসল হয় না। এই-সমস্ত ক্ষতি বাহাতে না ঘটিতে পারে তজ্জন্ত কৃষকগণের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা উচিত। আমাদের উক্ত ইংরেজী বিদ্যালয়-সকলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে কৃষিবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলে বোধ হয় দেশের অধিকাংশ লোকেই এই সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পাবে এবং এইরূপ বিধান করিলে ভাল হয় কি না তাহা গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

এখন অনেক কৃষক ধাতুর চাষ কমাইয়া পাটের চাষ অত্যধিক-রূপে বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাতে নগদ টাকা হাতে বেশী আসে বটে কিন্তু ধাতুর চাষ লোকবৃদ্ধি অধুপাতে কমিয়া যাওয়াতে ধাতুর মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় নগদ টাকার বৃদ্ধিতে কোন লাভ হয় না। এক্ষণে এখন রেক্সনের চাউল কমবানী করিতে হয়। পাটের চাষ বত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে তত পরিমাণে আমাদিগকে খাদ্যের জন্য বিদেশের আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং বিদেশ হইতে আমদানী করিতে যে যে অসুবিধা ঘটে তাহাও ভোগ করিতে হইবে। যদি বেঙ্গল প্রভৃতি স্থানে উপযুক্ত-রূপে ফসল না জন্মে এবং আমাদের যদি বিদেশের ফসলের উপরই নির্ভর করিতে হয় তবে তখন কি অবস্থা ঘটবে ?

এই প্রসঙ্গে “স্বরাজে” প্রকাশিত “ধান বনাম পাট”-শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। নীচে উহার সার সংকলন করিয়া দিতেছি—

বাঙ্গলা দেশে পাটের আবাদের প্রসার ক্রমেই বাড়িতেছে। এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক সর্বদাই বলিয়া থাকেন যে, পাটের অমুকম্পায় এ দেশের কৃষিজীবী লোকের আর্থিক অবস্থা দিন-দিনই উন্নততর হইতেছে। এই বিশ্বাস বা অসুমানের মূলে আরো কোন সভ্য আছে কিনা বিশেষভাবে তাহার আলোচনার আবশ্যক।

লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল, একথা বলা যায় কিসে? ভাল মন্দ অবস্থার মাপকাঠি কি?

কৃষিপ্রধান দেশমাজেই ৭৭ বৎসর পূর্বে এক একবার অল্পমাত্রা হইয়া থাকে। দেশে বতরিন বড়লোক থাকিবে, দুখেই হউক আর কষ্টেই হউক মুটেমজুরদের দিন একরকমে চলিয়া যায়। কিন্তু কৃষিকার্য্যই বাহাদেব জীবিকাার্জনের একমাত্র সম্বল, ক্ষেত্রে শস্ত না জন্মিলে তাহাদেরই সর্বপোষক অধিক কষ্ট হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের জন্য হাল-লাঙ্গল, গরু বাছুর, বীজ, নিড়াইবার ও কাটিবার জন্ত অর্থ প্রভৃতি অনেক জিনিষের দরকার হয়। দুর্ভিক্ষের বৎসরে অনেক কৃষকই হাল-লাঙ্গল প্রভৃতি বেচিয়া শীতে বাধ্য হয়, সুতরাং দুর্ভিক্ষাবসানের

পরও অনেক দিন পর্যন্ত তাহা বা আর এই-সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। তবে কৃষকেরা হুজুয়ার বৎসবেও যদি কিছুকিছু খাদ্যশস্ত বা তৎবিক্রয়লব্ধ অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পাবে, তবে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও তাহারা কোনও ক্রমে অনাটনের বৎসর পাড়ি দিতে পাবে। যে কৃষকের এই সঞ্চয়ের পরিমাণ বত বেশী অর্থাৎ যাহার যবে বত বেশী খাদ্যশস্ত মজুত থাকে তাহার অবস্থা তত ভাল। বস্তুতঃ একমাত্র ইহাই ভাল মন্দ অবস্থার একমাত্র মাপকাঠি।

বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রথম বৎসরে পাটের বাজার একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল, তাহার ফলে, যুদ্ধারম্ভের পূর্বে একমাস বাইতে না বাইতেই পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাব কৃষকদের ঘরে ঘরেই হাহাকাব ছানি উঠিয়াছিল। ইহাব কারণ কি? পাটের আবাদে যদি কৃষকের অবস্থা ক্রমেই ভাল হইয়াই থাকে, তবে এক মাস মাত্র পাট বেচিতে না পারায় তাহাদের একপ দুর্দশা হইবে কেন? ইহা কি অবস্থোন্নতিরই প্রকট পৰিচায়ক? একথা কেহ বোধ হয় বলিবেন না যে এই বৎসরে বাঙ্গলা দেশে ধান জন্মে নাই, বরং সে বৎসরে ধানের আবাদ পূর্ণাপরি হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পাটের আবাদে যদি লোকের অবস্থা ভালই হইবে অর্থাৎ পূর্বে পূর্বে বৎসবে পাট বিক্রয় করিয়া লোকে যদি কিছুকিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে দেশে প্রচুর খাদ্যশস্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও জমিদার মহাজনের ধন শোধ তো পরের কথা, নিজেদের উন্নয়নের জন্যই তাহাদিগকে চক্ষে একপ সরিষার মূল দেখিতে হইত না।

পাবনা, মৈমনসিংহ, ঢাকা ও ক্রিদপুৰ—বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সাধারণতঃ এই চারিটি জেলাতেই সর্বপোষক বেশী পাটের আবাদ হইয়া থাকে।

এই-সকল স্থানে গেলে পাটোৎপাদনকারী কৃষকের বাড়ীতে বড় বড় টিনের ঘর ও কাঠের খুঁটা দেখিয়া প্রথমতঃ অনেকের মনেই ইহাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে এই-সমস্ত বড় বড় টিনের ঘর বাড়ী ঘোড়া নৌকা প্রভৃতি সমস্তই মহাজনের নিকট রেহাণাবদ্ধ, অধিকাংশেরই দেনার পরিমাণ এত বেশী যে তাহা কোনও কালে শোধ হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং এই-সমস্ত বাড়ী-ঘরকে কৃষকদের বাড়ী ঘর না বলিয়া মহাজনদের বাড়ী ঘর বলিলেই বোধ হয় সত্যবিচার করা হইবে। পাটের আবাদে একসঙ্গে কতকগুলি টাকা পাইবার সুবিধা থাকাতে মহাজনগণ বেশ অনায়াসে কর্জ দিতেছে এবং কৃষকেরাও পাট হইলেই মহাজনদের দেনা শোধ করিয়া ফেলিব এই আশায় খুব উচ্চ হুদে কর্জ করিতেছে। সুতরাং ইহাতে কৃষকদের কর্জ করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িলেও তাহাদের অবস্থার কিন্তু কোনও উন্নতি হইতেছে না ইহা নিশ্চয়।

সর্বপ্রকার খরচ পত্র বাড়ে পাট বা ধান হইতে কত লাভ থাকে তাহা কি কেহ হিন্দাব করিয়া দেখিয়াছেন? ধান বিনিম্য! একবার কোনও রকমে নিড়াইয়া দিতে পারিলেই কৃষকের সকল কাজ শেষ হয়। পরে পাকিলে ধীরে ধীরে কাটিয়া আনিয়া নিজেরাই মাড়াই প্রভৃতি করিয়া লইতে পারে। সুতরাং ধানের আবাদে নিজেদের পরিচর্য্য ব্যতীত বর হইতে খুব বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। কিন্তু পাটের আবাদে কি তাই হয়? পাটের বুনানি হইতে বিক্রয় পর্যন্ত খরচের অন্ত নাই। অধিকাংশ জমিতেই অন্ততঃ দুইবার নিড়ানি ও বাছট দিতে হয়। তারপর পাট কাটা ধোয়া ও শুকান তো এক মহামারী ব্যাপার। একদিন আগ পাছ হইলেই সব নষ্ট হয়—সুতরাং কোম্পাই হটক উচ্চহারে মজু রাখিয়া এই-সমস্ত কাজ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

প্রতি বৎসর বত কোটা টাকাব পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। পাটের আপিসেব দাবোয়ান হইতে আরম্ভ কবিয়া বড়বাবু পর্যন্ত সকলেই বেশ দু-পয়সা বোজগাব কবে, অথচ যে-কৃষক পাট আবাদ কবে সে অন্নাভাবে গুকাইয়া মরে। কেন একপ তব তাহাও “স্ববাজ্ঞ” বুকাইয়াছেন—

আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকেরই এমন অবস্থা নয় যে বাজার নরম দেখিলে ছুঁচোর দিন পাট না বেচিগাও পুঁজি হইতে সংসাধ চালাইতে পারে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে অধিকাংশ কৃষকই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে অতিরিক্ত হুদে মহাজনের নিকট টাকা করজ বা দানন লইয়া পাটের আবাদ করিয়া থাকে। এই সকল মহাজন তীর্থের কাকের মত হা করিয়া বসিয়া থাকে এবং পাট খোয়া আরম্ভ করিলেই তাহার চারিদিক হইতে একেবারে পঙ্গপালের মত আসিয়া হাজির হয়। আষাঢ় মাসে জমিদারকেও কিছু দেওয়া হয় না। হুতরাং জমিদারের গোমস্তারাও একেবারে দুই কিস্তির তাগাদা লইয়া দেখা দেয়। এনিকে ঘরে প্রচুর পাট মজুত থাকিলেও, অধিকাংশ লোকের ঘরে এক সের চাউলও থাকে না—পাট বেচিবে তবে মুখে হাত উঠিবে। হুতরাং কৃষকদের পক্ষে তখন পাট বিক্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। পাটের ব্যবসায়ীরা কৃষকদের এই দুর্বলতার খবর বেশ ভাল রকমেই জানে। হুতরাং তাহার সকলেই কিছু না কিছু টিল কাটতে থাকে। কাজেই বাজার অনেকটা নামিয়া যায়। হুতরাং কৃষকেরা যে দর পায়, তাহাতেই পাট বেচিয়া ফেলে। দেশীয় মহাজনেরা বা কোম্পানীর বেতনভোগী ক্রেতা বা কমিশন-এজেন্টেরা এই সময়ে খুব অল্প দরে পাট কিনিয়া বাখে। শুধু তাহাই নয়। এই ক্রেতার আবার নানা রকমে দ্বিতীয় ও অভাবজ্ঞি কৃষকদের নিকট মণকরা অন্ততঃ আট দশ সের পাট আদায় করিয়া থাকে। পরে এই পাট তাহার উচ্চ দরে কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়া বেশ দু-পয়সা লাভ করিয়া থাকে।

মাঝে মাঝে বাংলা দেশেব অনেক জেলায় কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়। এই-সকল প্রদর্শনীর দ্বারা বিশেষ লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। বাংলা দেশেব প্রতি জেলায় এক সময়ে নানা প্রকার গৃহশিল্প ছিল। তার উপর নির্ভব কবিয়া বহু নবনাবী জীবিকা নির্বাহ করিত। অধুনা সে-সব গৃহশিল্প লুপ্তপ্রায় বা লুপ্ত। সেগুলিকে আবার উদ্ধার করার জন্ত কোনো চেষ্টা নাই। এমন অবস্থায় কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর সার্থকতা কোথায়?

বংপূরে একটি কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। “রংপুৰ-দর্পণ” লিখিয়াছেন—

আমরা শুনিয়া সুবী হইলাম, প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষ গৃহশিল্প-সমূহের জন্ত একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই বিভাগের কাৰ্য্য প্রদর্শনীর সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হইলে চলিবে না। এই বিভাগের সফলতা সাধনের জন্ত একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত করা হউক। পল্লীগোমে কোথায় কোন্ শিল্প অনাদরে বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কি উপায়ে উহার পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে, ভবিষ্যে কমিটি সমুদয় সংবাদে

আদান প্রদান করিবেন। উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের বিক্রয়ের স্বলোভবন্ত করিবেন। ইহাই প্রদর্শনীর সফলতা।

আমরা দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। রঙ্গপুরে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বাঁশের দ্বারা নানাপ্রকারের শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। জাপানের বংশশিল্প স্থপতি ইউরোপ ও আমেরিকায়, পরন্তু ভারতবর্ষে, কিম্বা উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়, সকলেই তাহা অবগত আছেন। চেষ্টা করিলে এই বংশশিল্পকে অনেকেব জীবিকোপায় নির্বাহের উপযোগী করা যাইতে পারে। এক সময়ে রঙ্গপুরে প্রচুর পরিমাণে কাগজ উৎপন্ন হইত। জেলার সম্পূর্ণ অভাব পূর্ণ করিয়া এই-সমস্ত কাগজ স্থানান্তরে রপ্তানী হইত।

স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় যে জেলায় প্রদর্শনী আচৃত হইবে, সেই জেলায় সেই সেই অবস্থায় যে-সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, ভবিষ্যেই আলোচনা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। মূল কথা জেলার কৃষিশিল্পের জন্ত আমরা একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত দেখিতে চাই। প্রদর্শনীর ব্যয় নির্বাহ করে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন না—সম্ভবতঃ ডিপুটি বোর্ডই অধিকাংশ অর্থ প্রদান করিবেন। জেলার এইরূপ একটি হিতকর অনুষ্ঠানের জন্ত অর্থব্যয়, সকলেই অনুমোদন করিবেন।

হা।

কাজাল

(গল্প)

সে ছিল দরিত্রের সম্বল, অন্ধের যষ্টি।

শৈশবে মাতৃহারা সে তাব মাকে জানিতই না।
কি দুঃখী ছিল সে, একটি খেলার সঙ্গী পর্যন্ত তার ছিল না, না একটি ভাই কি বোন।

তবু সে ঠিক দুঃখী ছিল না, কাবণ সে তার দুঃখ অনুভব কবিতো পাবিত না, সকল অভাব পূরণ কবিতো তাব সেই বুড়ো বাপ।

বাপের মত খাটিয়া খাওয়াইত, মায়ের মত বুকে জড়াইয়া ঘুম পাড়াইত, আর শিশুব মতই হাস্তমুখর হইয়া তাব সাথে গেলিয়া দিন কাটাইত।

সে যখন বুঝিতে শিখিতেছিল এই পৃথিবী খালি হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জায়গা নয়, এখানে মাথার ঘান পায় ফেলিয়া দুমুঠো অন্নের যোগাড় করিতে হয়,—এখানে দুঃখ শোক সহ্য করিয়া, মান-অপমান অগ্রাহ্য কবিয়া, সম্মুখের দীর্ঘতব কালেব প্রত্যনুলে যুক্তিমা বাঁচিয়া থাকিতে হয়,—এমন একদিনে তাহার বাপকে পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার পরোয়ানা আসিল। বড় দুঃখ বাহাদুরের, তাহার

অতঃসঙ্গে গেলে সে দুঃখ ভোগ করিবে কে? নিযতির অঘাচিত কক্কাণায় বিনা চিকিৎসায় বৃদ্ধ সারিষা উঠিল, কিন্তু রোগ তার স্মারক চিহ্ন স্বরূপ লইয়া গেল তার চক্ষুর জ্যোতিটুকু।

বৃদ্ধ আর্ন্তস্বরে ডাকিল—ফকির, বাবা, কি উপায় হবে!

উপায় আর কি, বারো বৎসরের বালক বৃদ্ধের হাত ধরিয়া পথে বাহির হইল।

শীর্ণ বক্ষপঙ্কর রুদ্ধশ্বাসে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিত, অসহ্য বেদনায় বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিত,—তুলাল, আমার মাণিক! এও আমার কপালে ছিল!

উপবাসক্লিষ্ট মুখে হাসি আনিয়া বৃদ্ধের রুদ্ধ মাথায় আদরে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ফকির একটু ধমকের স্বরে বলিত ছি, ছেলেমাছ! তুমি বোঝনা! বাপ কষ্ট করেই ছেলেকে খাওয়ায়।

তাদের ছোট কুটীর দীর্ঘকাল অসংস্কৃত থাকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। ছোট গ্রামবানি, একদণ্ডে সবকয়খানা বাড়ী ঘুরিয়া আসা যায়, এখানে নিত্য পেট ভরে না, নিত্য কেহই দিতে চায় না। আর দিবেই বা কি করিয়া? দবিদ্র পল্লীর সকলেরই যে এক অবস্থা, একটু উনিশ বিশ মাত্র।

নিঃসহায় ছুটিতে তারা পরস্পরের সহায়স্বরূপ হইয়া, বহু কষ্টে বহু আশায় সহরে গিয়াছিল, দীর্ঘ-পথের সুদীর্ঘ যাত্রা বহু অনাহারে বহু অশ্রুজলে সমাপ্ত হইয়াছিল;—কিন্তু তাহাদের সে কষ্ট অবসাদে, সে আশা মরীচিকায়, সে অনাহার—সে অশ্রুজল আরো বৃদ্ধকে আরো হাহাকারে পরিণত হইল।

ছোট পল্লীর কুটীরে কুটীরে যাহা মিলিত, বিশাল-নগরীর প্রাসাদ-মালায় তাহার একান্ত অভাব। হযত বা তেমনি তাহাদের শিক্ষাভাজন পূর্ণ হইত। কোনো দিন বা বেশী পর্ধ্যটনে একমুঠো বেশী। কিন্তু তেমন তৃপ্তিতে তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন হইত কই? এখানে যে মমতার পরিবর্তে অবজ্ঞা, সাস্থনার বদলে রুঢ় দিক্কাব পাইয়া মর্ষ তাহাদের তিক্ত হইয়া গেল।

(২)

এমনি করিয়া কতদিন 'কাটিল; প্রবল শীত, দারুণ গ্রীষ্ম আর প্রলয়ঙ্করী ঝড়-বর্ষাব মাতাল কাল খেলেনা

দিনগুলি লইয়া লোকালোফি করিতে-করিতে চলিয়া গেল, রাখিয়া গেল সারা-পৃথিবীতে-তাহাদের অনাবৃত পদচিহ্নগুলি—কেহবা সে স্পর্শে সরস স্তম্ভর হইয়া উঠে, কেহবা দলিত মথিত হইয়া যায়।

একদিন যখন ধনীরা দুয়ারে দ্বিধ্বিত বালক উপলব্ধি করিতে পারিল সে বালক নয়, পূর্ণাঙ্গ কিশোর;—এত অনাহারে অসহ্যেও সে বলিষ্ঠ কর্মঠ স্বাস্থ্যস্বন্দর কাস্তিময়,—সে কেন শিক্ষা করিয়া খাইবে! আত্মোদর পরিতৃপ্তির জন্ত পরের শ্রমার্জিত ধনে সে কেন নিঃসঙ্কোচে হাত পাতিবে? কেন,—কোন অধিকাবে?

তখন তাহার চিত্ত আবাল্যের অভ্যস্ত কর্মে নিতান্তই বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার আগত বোবনের নূতন গর্ভ, নূতন তেজ, নবতর কর্মলিপ্সা, অনাদর-স্বচ্ছ কিশোর প্রাণের কঁাকে-কঁাকে উকি মারিতেছিল। সে শিক্ষাপাত্র ফেলিয়া ক্ষীর্ণ-বস্ত্রে দৃঢ়রূপে কটি সযত্ন করিল।

বৃদ্ধ কহিল—এ পাগলামি কেন তোরা বাবা? তুই যে আমাব মাঘের ঠাইও কেড়েছিস, আমায় নিঃসহায় একেলা ফেলে কোথা যাবিরে তুই?

না—সে ফিবিবে না,—ফিরিতে পারে না,—তবে শাদ্দুল যেমন তাব অপূর্ণাঙ্গ শাবককে মুখে করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়, সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই এই ভার বহন করিবে;—তবু তাহাকে কাজ করিতেই হইবে, শ্রমের বিনিময়েই সে খাদ্য গ্রহণ করিবে। এতদিন দ্বারে-দ্বারে ফিরিয়া যে ব্যর্থ শ্রম করিতেছিল, তাহা বৃথাই না ফেলিয়া দরদীকে তার শিক্ষা-দানের মূল্যস্বরূপ দিবে। সে কয়লার খনিতে কাজ লইল। সারা দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় যে কয়টি পয়সা পাইত, তাহাতেই স্বচ্ছন্দে তাহাদের দিন চলিয়া যাইত।

প্রতি-প্রভাতেই ফকিরের অঘটন-বিশৃঙ্খল কেশরাশির মধ্যে শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি সঞ্চালন করিতে-করিতে, একটা দীর্ঘ-শ্বাসের সহিত সমস্ত মৌন আশীর্বাদ ঢালিয়া, পুত্রকে বিদায় দিয়া স্থবিধ বৃদ্ধ সারাদিন তার কুটীরের দ্বারখানিতে নীববে বসিয়া থাকে। সন্ধ্যা যখন আকাশে তাব কালো আঁচলের ছায়া ছড়াইয়া, ধরণীব অশ্রান্ত কর্ম-সঙ্গীতে একটি শ্বাসপতনের শেষে বিরামের যতি আনিয়া দেয়, তখন সে

তাহার জ্যোতিহীন চক্ষু-তারকার উপর জ্যোতিমণ্ডলের অভাব বুঝিয়া গৃহ-দীপখানি জলিবার প্রত্যাশায় কম্পিত-বক্ষে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

(৫)

একদিন,—সেদিন বর্ষার ঘনঘটায় আকাশ ধূসর ছিল, দিনের নিদর্শন জ্যোতিঃপিণ্ডের জ্বালাময় শিখা সেদিন অন্ধের চোখে আলোর মায়ী বুলায় নাই। এমন একদিনে রুগ্ন বৃদ্ধ তার শক্তিহীন দেহের ভাব প্রাণান্ত পরিশ্রমে মেরুকেন্দ্রে স্থিতি রাখিয়া তেমনি ভাবে ছুঁয়াবে বসিয়া ছিল। প্রতি মুহূর্তে যেন উদ্বেগ-চঞ্চল পদশব্দ শুনিতে পাইয়া আপনাকে অতন্ত্র রাখিবাব চেষ্টায় সচকিত হইতেছিল।

যখন সে কল্পনায় তার কম্পিত গুণ্ডে স্নেহময় তনয়ের শ্রমোত্তপ্ত ললাটের স্পর্শকর্ষ অহুত্ব করিতেছিল, তখন বাহিরে সহস্রোখিত কোলাহলের মধ্যে ভয়-ব্যাকুল কাহার স্বর তার সকল স্বপ্ন ভাঙিয়া দিয়া একটা নিদারুণ বিভীষিকায় তাহাকে জড় মূঢ় বানাইয়া দিল।

কে বলিল—বিষাক্ত গ্যাসে নূতন নালা ভরিয়া গিয়া অসাবধান কয়টি ছোকরা মজুরের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

বৃদ্ধ একবার আর্তস্বরে ডাকিল—ফকির, বাবা!—

ফকির যখন জনতা ঠেলিয়া ভুলুটিত বৃদ্ধের লোলিত গন্তক সযত্নে বক্ষে তুলিয়া লইল, বৃদ্ধ তখন হাসিকান্নার পরপারে।

দুঃসহ বেদনায় উন্মাদ অস্থির যুবক আপনার হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া উপাড়িয়া ফেলিতে চাহে,—এমন শোচনীয় মৃত্যু! একটা সাক্ষনার কথা বলিবার, একমুহূর্ত সেবা করিবার অবসর মিলিল না! তাহারি আশায় প্রতীক্ষ্যমান পিতা যে তাহারি জন্ত চলিয়া গেল, স্নেহের বেদনায় ব্যাকুল হইয়া সকল স্নেহেব বন্ধন ছিঁড়িয়া দিয়া গেল!

আর তার কি আছে পৃথিবীতে? কার জন্ত,—কার হাসিমুখে দেখিবার জন্ত সে ক্ষুধার অন্ন লইয়া ব্যাকুল দ্রুত পদে নিত্য সন্ধ্যায় কুটীরে ছুটিবে?

কেহ নাই তার, কোনো কিছু নাই, কোনো কিছুই প্রয়োজনও নাই। নিজেব জন্ত নিজের প্রাণের কি এমন দবকার? দশজন দর্শকের মমতা-শূন্য আশা আশ্বাস

আর সাক্ষনার অহুরোধ তাহাকে আরো পাগল করিয়া তুলিল। কি চায় ইহারা? ইহাদের মত তাহার কি আছে যে তাহা দেখিয়া সে আপন চিত্তকে প্রবোধ দিবে?

অশ্রু তার বুকের আগুনে শুকাইয়া গিয়াছে, চোখে শুধু তার রক্তিম, সেই শুষ্ক আরক্তিম চোখে সে পাগলের মত অনির্দিষ্ট পাদক্ষেপে রাস্তায় ফিরিতে লাগিল।

একটা করুণ আর্তনাদে তাহার চিন্তাশ্রোত বা চিন্তা-বিহীন চিত্তের বিপুল বিপ্লব এক নিমেষে থামিয়া গেল। ধূলি-ধূসরিতা ঐ উন্মাদিনী নারীর কাতর চীৎকারে বুঝি পাষণ্ড ফাটিয়া যায়!

ফকিরকে সম্মুখে দেখিয়া রমণী আছাড়িয়া পড়িল,—বাবা, তোর সঙ্গেই ত সে কাজে গিয়েছিল। এনে দে আমার আঁচলের সোনা, আমার কান্ধালের ধন, এনে দে আমায় বাবা! আমার যে আর কেউ নেই, আমি যে বড় কান্ধাল রে, বড় কান্ধাল!

কি ভীষণ দৃশ্য ফকিরের চোখের সামনে পুনরায় জাগিয়া উঠিল। হায়, এই বিধবার নিধি যে তাহারই চোখের সামনে বিষের জ্বালায় ছটফট করিতে-করিতে প্রাণ হারাইয়াছে। আর সে অতি-তৎপরতায় আপনাকে রক্ষা করিয়া পর মুহূর্তেই সেই অহুশোচনায় অহুতপ্ত হইয়াও অসহায় বাপের জন্ত যে সে কথা ভাবিবাবই অবসর পায় নাই। কিন্তু তাহার বাঁচা অনাবশ্যক হইয়াছে। তার অনাবশ্যক প্রাণের বিনিময়ে যদি এই অসহায় নাবীর সর্বস্ব ধন রক্ষা পাইত!

দুঃখিনী বিধবা কাদিতেছিল,—বাবারে, তুই যে না খেয়ে কাজে গিয়েছিলি!

মুহূর্তে ফকিরের মনে পড়িল, এঃ নিঃস্বল, নিরন্ন,—এয়ে নিরুপায়! আহু পাতিয়া অশ্রু-আপ্লুতকণ্ঠে ফকির ডাকিল—মা, সে গিয়েছে, আর ফিরবে না; আয় মা আয়, আমার কান্ধালের ঘরে আয়!

সরযুলা সেন।

উপলখণ্ড

চিত্রে যাহা অস্বাভাবিক তাহা দোষাবহ, কিন্তু যাহা স্বভাবাতিরিক্ত তাহা দোষাবহ নহে। উহা মানুষের সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচায়ক।

ধর্ম এবং স্বাধীনতার নামে জগতে যথেষ্ট অত্যাচার অমুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু সেজ্ঞা ধর্ম বা স্বাধীনতা দায়ী নহে। দায়ী—অন্ধবিশ্বাস।

বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াই ফুল ফুটিয়া থাকে; বাস্তবকে আশ্রয় করিয়াই কল্পনা বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

মেঘে যাহা সলিল, লতায় তাহা পুষ্প; কুস্মে যাহা গন্ধ, নারীর তাহা স্নেহ।

যে অপরের চিন্তা এবং হৃদয়কে বর্জিত হইতে দেয় না সেই জগতের শ্রেষ্ঠ অত্যাচারী।

স্বাধীনতা—সর্ববন্ধহীনতা নহে। সমাজে মুক্তি নাই।

ফুল গন্ধহীন হইলেও তাহার বর্ণ বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মহীন জীবনের গৌরব করিবার মত কিছুই নাই।

মেঘের সার্থকতা শুধু সলিল সিঞ্জে দরগীর দেহে শ্রাম শোভা ফুটাইয়া তোলায় নহে; সে বজ্র দ্বারা ধ্বংসও করিয়া থাকে।

কতকগুলি গাছ গৃহের অন্তরাল ভিন্ন বাঁচিতে পারে না, আবার কতকগুলির পক্ষে উদার আকাশের আবরণই যথেষ্ট।

তুমি নিজে যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ, অপরকেও তাহাব ভিতরেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে এরূপ আশা করিও না।

শিমূল ও গোলাপ উভয়েই করিয়া পড়িবে, কিন্তু গোলাপ তাহার স্মৃতি রাখিয়া যাইবে—গন্ধে, আর শিমূল? গলিত পত্রে।

ধর্মের আবরণে যে পাপ অমুষ্ঠিত হয় তাহাই সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ।

জগৎকে তোমার আপন কাজে খাটাইবার মত শক্তি থাকে—খাটাইও; কিন্তু জগৎটা শুধু তোমার জন্তই সৃষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করিও না।

মানুষ সহজে কাহাকেও আপনা হইতে বড় বলিয়া

যীকার করিতে চাহে না, আবার ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত না করিয়াও থাকিতে পারে না।

জড়স্বেব শাস্তি হইতে দুঃখের চাঞ্চল্য শ্রেয়।

বৃক্ষকে আলোক ও রস উপভোগ করিতে দাও—ফুল আপনিই ফুটিবে। হৃদয়কে জ্ঞান ও আনন্দে পূর্ণ হইতে দাও—তাঁহাকে আপনিই পাইবে।

দেহের পক্ষে যাহা ছায়া, জীবনের পক্ষে তাহাই মরণ? অবস্থার পরিবর্তন?—বিশ্বাস্তি? নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা অনাহত শাস্তি?

সাহিত্য যেদিন ভাবুকতা এবং দার্শনিকতাকে বাদ দিয়া শুধু বাহিরের সৌন্দর্য এবং বাস্তবতাকে লইয়া থাকিবে, সাহিত্যের পক্ষে সেদিন নিতান্তই দুর্দিন।

দুঃখ তোমাকে বেদনা দিতে পারে, কিন্তু ধ্বংস কবিত্তে পারিবে না।

ঝরিয়া পড়াই ফুলের পরিণতি হইতে পাবে, কিন্তু মরণই মানুষের চরম পরিণতি ইহা ভাবিতে ইচ্ছা হয় না।

জগতের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে-সঙ্গেই যেন তোমার প্রাণও স্পন্দিত হয়।

জ্যোৎস্না সাগরের হৃদয়কে উদ্বেল করিয়া তুলে, সৌন্দর্য মানব-হৃদয়ে চাঞ্চল্য আনিয়া দেয়।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্য বা চিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। রস সৃষ্টির জন্তই কাব্য; চিত্রও তাহাই।

গর্ভ মানুষকে অনেক হীনতা হইতে দূরে রাখে।

অপরে তোমাকে যে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিবে তাহা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিও, কিন্তু প্রকৃতি তোমাব জন্ত যে বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিও না।

আমরা যখন উর্দ্ধে চাহিতে ইচ্ছা করি, তখন তাকিয়ায় হেলিয়া গৃহের ছাদের দিকে তাকাইয়া থাকি। কিরণোজ্জল উদার আকাশের দিকে চাহিবার মত শক্তি আমাদের কবে হইবে?

একান্নবর্তী পরিবাস-প্রথা লোককে পরমুখাপেক্ষী হইতে শিক্ষা দেয়।

সর্ববিষয়ে সাম্য অসম্ভব। হাতের পাঁচটি আঙ্গুলকে কাটিয়া সমান করিতে চেষ্টা করিও না।

সর্প যেমন হারান মণিকে খুঁজিয়া বেড়ায় ভারতের
প্রাণকে সেইরূপ করিয়া খুঁজিতে হইবে।

হৃদয় যখন ভাবের আবেগে পূর্ণ হয় তখন নয়, সে
আবেগ বরণ একটু মন্দ হইলেই তাহাকে প্রকাশ করিতে
চেষ্টা করিও।

প্রাচীন ভাবত ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিতে চাহিত না, কারণ
তাহা বৃহত্তরই অংশ, এবং বৃহৎকেও ধারণার অতীতে
রাখিয়া দিত না। আমরা ক্ষুদ্রকেই বৃহৎ বলিয়া মনে
করি, এবং জগতে যে বিচিত্র চিন্তা এবং কর্মধারা নিত্য
নবনবরূপে বিকশিত হইতেছে তাহাকে নিতান্ত তুচ্ছ
বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি।

জীবনটাকে উপভোগ কর; জড়িত সাধিকতা নহে।

মানুষ নিজের জ্ঞান নিত্য নূতন নূতন বন্ধনের সৃষ্টি
করিতেছে।

স্বভাবের কোন দৃষ্ট যদি হৃদয়ে গভীর বেখা অঙ্কিত
করিয়া দেয়, যদি সেই শোভাকে কাব্য বা চিত্রে ফুটাইয়া
তুলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যখনই দেখিবে তখনই
সে চেষ্টা করিও না; কারণ কল্পনাই শুধু হৃদয়কে আরও
সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে।

জগতে বৈষম্য আছে, তাই অনেকে কর্মফল মানিয়া
থাকেন।

মানুষ আপনাকে ভালবাসে - বলিয়াই বেদনা সহ্য
করিতে পারে।

একদিন হয়ত মানবের মনে তাহার যত্নে রচিত
সমস্ত বন্ধনরাশি ছিন্ন করিবাব আকাঙ্ক্ষা হইবে। সেদিন
কি ভয়াবহ কি গৌরবময়!

গৃহকে সুন্দর করিতে হইবে, জীবনকে সুন্দর কবিতে
হইবে, তবেই সুন্দরতমের পরিচয় মিলিবে।

সামান্য বালির বাঁধে কখনও নদীর স্রোত বন্ধ হইবে
না। অশুশাসন কখনও মানবের চিন্তাধারার গতিরোধ
করিতে পারিবে না।

মানুষ বন্ধন স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না।
দ্বিবিজয়ী সম্রাটও হয়ত ছুটি উজ্জল নয়নের অথবা ছুটি
ক্ষুদ্র বাহুপাশের অধীন। সমাজ আপন অশুশাসনের
অধীন; যে ক্ষুদ্র, সে আপন স্বার্থের অধীন; যিনি বৃহৎ,
তিনি বিশ্বমানবের অধীন।

তুমি মানব বলিয়াই সম্মানেব অধিকারী; সেই
মানবতাকে অবমানিত হইতে দিও না।

শ্রুতা অপরকে ধ্বংস কবিবার শক্তি নহে। আপনার
সম্মানকে রক্ষা কবিবার শক্তিই শ্রুতা।

চিন্তাপ্রণালীর পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশের
পদ্ধতিও পরিবর্তিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

নূতনত্বের অন্বেষণ দোষাবহ নহে। যদি তাহাই হয়
তবে 'উন্নতি' শব্দটিকে অভিধান হইতে বাদ দিতে হইবে।

মানব-জীবনে কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাইতেছে; তবে এ
কৃত্রিমতাই এখনকার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে।

পূজার প্রবৃত্তি অধিকাংশ লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক।
জগতে Prometheus দুর্ভাগ্য।

অনেক বিদেশী গাছ এ দেশের আবহাওয়ায় বর্ধিত
হইতে পারিবে না; আবার সকলেই যে পারিবে না
তাহা নয়।

কর্ম কখনও নিষ্ফল হইবে না; চিন্তা কখনও ধ্বংস
হইবে না।

সর্ববন্ধনহীনতা একমাত্র যিনি মুক্ত পুরুষ তাহার
অথবা বর্ধনের পক্ষেই সম্ভবে।

যে নিজকে যত অধিক ভালবাসে পরের প্রতি সে তত
অধিক উদাসীন।

পবের ভাষায় কাব্য লিখিয়া কৃতকার্য হওয়া দুর্লব;
পরেব কলা-পদ্ধতির অনুকরণ করিয়া সফলতা লাভ
আবশ্য দুর্লব।

নূতন নূতন রূপে ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা হইতে ভাষায়
কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

তজ্জাঘোরে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছি—জাগো
জাগো। নিজে ভালরূপে জাগিয়া পরে অপরকে জাগাইবার
চেষ্টা কয়জন করিতেছেন?

কতকগুলি শব্দ মানবের নিকট ক্রমে অর্থহীন হইয়া
পড়িতেছে। 'ভগবান' শব্দও সেইরূপ একটি?

অধিকাংশ লোকই অপরের দ্বারা চালিত হইতে
ভালবাসে। তাহার কারণ, স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং
কর্ম কবিবার প্রবৃত্তি বা শক্তিব অভাব, এবং আলস্য-
পবায়ণতা।

দেশ জড়ত্বের নিদ্রায় অভিভূত। দুই একজন হয়ত প্রভাতকিরণ স্পর্শে ধন্য এবং বিহঙ্গ-কলরোলে মুগ্ধ হইয়াছেন।

সংসারে তত্ত্ব হইতে কর্মের দাবী অধিক।

কালিকাব পক্ষে যাহা স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, অজিকার পক্ষে হয়ত তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

মাগুঘের প্রবৃত্তি স্বতঃই নূতনত্বের দিকে ধাবিত হয়, তথাপি মানব সহজে নূতনকে বরণ করিয়া লইতে স্বীকৃত হয় না।

যাহা অসমঞ্জস তাহাই অসুন্দর।

শাস্ত্র এবং সংযত মন লইয়াই দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। ঘেষ এবং দাস্তিকতাকে বর্জন করিয়াই সাহিত্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। যীশু বলিয়াছেন—কেহ এক গালে চড় দিলে অপর গাল ফিরাইয়া দিও। তাঁহার শিষ্যগণ বলেন—কাহাকেও এক গালে চড় মারিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না, অপর গালেও মারিতে চেষ্টা করিও।

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

হীরাবাগ ধর্মশালা

পূজার ছুটিতে অনেকে দেশভ্রমণে বাহির হন, কিন্তু বিদেশে যাহাদের আত্মীয় স্বজন নাই তাঁহারা গিয়া কোথায় থাকিবেন ভাবিয়া পান না। দেশীভাবে থাকিবার হোটেল সব জায়গায় নাই। আছে ধর্মশালা। কিন্তু ধর্মশালার নাম শুনিলেই মনে হয় যেমন অনাথ ও দরিদ্রদিগের জন্তই উহার একমাত্র সৃষ্টি। সেই ভ্রম দূর করিবার জন্তই আমি বর্তমান প্রবন্ধেব অবতারণা করিয়াছি। কলিকাতা বোম্বাই বেনারস ইত্যাদির গ্রাম জনাকীর্ণ সহরে একা কিয়া পরিবার লইয়া আসিলে থাকিবার স্থানের অভাবে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় ভুক্তভোগীমাত্রেই উহা অবগত আছেন। কঠিন রোগের চিকিৎসা, সহর দর্শন, বিষয়-কর্ম উপলক্ষে অনেক বড় ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোককেই সহরে আসিতে হয় এবং থাকিবার স্থানের অভাবে তাঁহাদের শুধু যে কষ্ট হয় তা নয়, অনেক সময় উপযুক্ত পয়সা ব্যয় করিয়াও

হিন্দুব থাকিবার উপযোগী হোটেল পান না—মধ্যবিত্ত লোকে অবশ্য কলিকাতায় আর্থানিবাস বা বম্বেয় এম্পায়ার হিন্দু হোটেলে রোজ ২০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকিতে পারেন না।

অনেকদিন পূর্বে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীগণ শিবমন্দির ও এইরূপ একটি ধর্মশালা খুলিবার জন্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু কবেন নাই।

বম্বে সহরে অবশ্য হিন্দু মুসলমান ও পারসীগণের জন্ত স্বতন্ত্র ধর্মশালা অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে শেঠ হীরাচাঁদ তেমান রায়ের পুত্র শেঠ তারাচাঁদ কর্তৃক স্থাপিত ধর্মশালা একটি উচ্চশ্রেণীর বাসস্থান এবং মফঃসলবাসী ধনী ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোক যাহারা বম্বেতে ৮।১০ দিনের জন্ত বেড়াইতে বা কোন কার্য উপলক্ষে আসেন তাঁহাদের থাকিবার একটি উচ্চ অঙ্গের বাসস্থান।

হীরাবাগ সহরের মধ্যস্থলে ভুলেশ্বরের নিকট, ট্রাম হইতে ১ মিনিটও লাগে না। হীরাবাগে প্রায় ১৫০টি স্বন্দর ঘর আছে। ঘরগুলিতে বিদ্যুতের আলো আছে—অবশ্য রোজ ১০ পয়সা দিতে হয়, সন্ধ্যা হইতে ১২ টা পর্যন্ত আলো জ্বলাইবার জন্ত; সমস্ত রাত্রি যদি কেহ বিদ্যুতের আলো ঘরে রাখিতে চান তাঁহাকে রোজ ১০ করিয়া দিতে হয়।

পরিবারাদি সঙ্গে থাকিলে ২টি ঘর ও একলা হইলে সময়ে সময়ে ১টা স্বতন্ত্র ঘর ও বেশী লোকের আমদানী হইলে এক ঘরে দুই জনকে থাকিতে হয়। রবিবার ঘর সম্পূর্ণ আলাদা। ঘরগুলিতে ৫।৬টি করিয়া জানালা আছে, আলো ও বাতাস যথেষ্ট থাকে। প্রত্যেক মহলের উপর-তলাতে ৩।৪টি পাইখানা ও কল ও নাইবার স্থান আছে।

ধর্মশালা বলিলেই যেমন অপরিষ্কার, যেমন একটা এঁদো-পড়া পুরান বাড়ী বলিয়া মনে হয় হীরাবাগ তাহা নহে। রোজ ঝাড়ু দিবার জন্ত মাহিনা-করা ঝাড়ুদার আছে, তাহারা দুবেলা ধর্মশালা পরিষ্কার করে। উহাদের কাজ দেখিবার জন্ত ও অত্যাচ্ছ তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্ত একজন পশ্চিমেব হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জমাদার নিযুক্ত আছে ও একজন ৫০ বেতনে পরিদর্শক হীরাবাগে নিযুক্ত আছেন।

ধর্মশালার খাত্তীদিগেব আবশ্যক-মত টেবিল, চেয়ার,

খাট ও অগ্রান্ত আবশ্যকীয় আসবাব. বিছানা বাসন, ইত্যাদি হীরাবাগ ধর্মশালার ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয় ও উহার জন্ত যৎসামান্য ভাড়া আদায় করা হয়, সাপ্তাহিক প্রত্ন-জিনিসের জন্ত এক পয়সা। বর্তমান পরিদর্শক শ্রীযুক্ত ভালচন্দ্র মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ও অতি সজ্জন ও পরোপকারী। প্রথমে হীরাবাগে আসিলে ৫ টাকা জমা লওয়া হয় ঐ ৫ টাকা হীরাবাগ ছাড়িবার সময় ফেরৎ পাওয়া যায়। জিনিসপত্র দিবাব জন্ত ছাপান ফরম আছে, যে যে জিনিস আবশ্যক পরিদর্শককে বা তাঁহার অবর্তমানে হীরাবাগের জমাদারকে বলিলে পাওয়া যায় ও ঐ ছাপান ফরমে লিখিয়া রাখা হয়।

সাধারণতঃ হীরাবাগে ৮ দিন কাল থাকিতে দেওয়া হয়, তবে নেহাত আবশ্যক হইলে অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া ১০।২০ দিন পর্যন্ত থাকা যাইতে পারে। হীরাবাগের উপর-তলায় একটি ডাক্তারখানাও আছে, নামান্ন ব্যয় করিয়া উহাতে চিকিৎসিত হইতে পারা যায়, ডাক্তারের ভিজিট লাগে না, নামান্ন ওষুধের দাম লাগে মাত্র। হীরাবাগের পরিদর্শক কিম্বা অপর কোন চাকরদিগকে বকসীস দেওয়া নিষিদ্ধ ও তাহারাও কখন পান খাইতে জল খাইতে পয়সা চাহিয়া আমাদের দেশের ঐ শ্রেণীর লোকের মত যাত্রীদের জ্বালাতন করে না।

হীরাবাগের কথা লিখিবার আমার দুই উদ্দেশ্য—প্রথম এই কলিকাতা-বাসী অনেকে কার্য বা ভ্রমণ উপলক্ষে বসে আসেন বা আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে হীরাবাগে বাস করা যে হোটেলে থাকা অপেক্ষা স্ববিধা-জমক এ কথা উপরিলিখিত বিবরণ পড়িলেই জানা যাইবে—কারণ বসেতে সহরের ভিতর মাসিক ২০ টাকার কমে একখানি ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, সে স্থলে হীরাবাগে বিদ্যুৎ-আলো-যুক্ত ২খানি ঘরের মাসিক ভাড়াই-বোধ হয় ৪০ টাকার কম নহে; তারপর আসবাব বাসন বিছানা সমস্তই পাওয়া যায় ও সর্বোপবি. অতিশয় নিরাপদ ও পরিষ্কার স্থান; স্বদূর দেশবাসীগণ হোটেলে না থাকিয়া হীরাবাগে থাকিলে কম খবচায় থাকিতে পারিবেন এ কথা লেখা বাহ্যিক। তারপর বক্তব্য এই যে কলিকাতার মত বাঙ্গালী-প্রধান সহরে কোন বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত

এরূপ কোন ধর্মশালা নাই কেন? ইহা কি বাঙ্গালীদের খুব গৌরবের কথা? অবশ্য কলিকাতাতেও হিন্দুদের থাকিবার জন্ত একটি ধর্মশালা বড়-বাজারে বাশতলার গলিতে, হাওড়া ষ্টেশনের নিকটে আছে; কিন্তু সেখানে স্ববন্দোবস্তেব অভাব ও আশঙ্কাতীত অপরিষ্কার। লঙ্কার বিষয় যে বাঙ্গালী-প্রধান কলিকাতা সহরে সদয়-হৃদয় মাড়োয়াড়ী মহাআগণ এই ধর্মশালাগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দানশীল লোকের অভাব তাহা নয়—কিন্তু কেন যে এই একটা লোক-হিতকর কার্যে বাঙ্গালী ধনী সম্প্রদায় অগ্রসর হন না ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয়। বাঙ্গালীর দেশে মাড়োয়াড়ী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অথচ শিক্ষাভিমानी বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কলিকাতা সহরেও বাড়ী ভুলভ ও সব সময়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাওয়া দুষ্কর। স্তরাতঃ কলিকাতা বা মফঃসলবাসী ধনী ব্যক্তিগণ আপনাদের পিতা-মাতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত যে ধর্মশালা স্থাপন করিবেন কার্যব্যপদেশে কলিকাতায় আসিলে তাঁহারাও সেখানে থাকিতে পারিবেন।

অবশ্য মফঃসলস্থ ধনী ও রাজা জমীদারগণের কলিকাতায় থাকিবার নিজেদের বাড়ী আছে একথা লেখকের অজ্ঞাত নহে—তাঁহারা সে বাড়ীতে বার মাস বাস করেন না—এ-সকল বাড়ী পড়িয়া নষ্ট হওয়া অপেক্ষা ভদ্র-লোকদিগের থাকিবার স্থান রূপে ব্যবহার করিতে দিবার মত বন্দোবস্ত স্বচ্ছন্দে তাঁরা করিতে পারেন। আশা করি—কলিকাতার ধনী বাঙ্গালী-সম্প্রদায় হীরাবাগের স্থায় একটি ধর্মশালা কলিকাতায় স্থাপন করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন ও বাঙ্গালীর কলঙ্ক দূর করিতে যত্নবান হইবেন।

বোম্বাই।

এ, সি, মুখার্জী।

কম্পাতরু

(ওকাকুরা)

অগাধ পরিখা-বাধা তারি পর-পারে
হিমবান শৈলেশ্বের বক্ষের তুষারে
পুষ্পিত অনিন্দ্য তরু শুভ্র নিরাময়,
কত জন্ম জন্ম হায় আকুল হৃদয়
শৈবালে আচ্ছন্ন স্তব্ধ শিলাসন পরে,
মাষামুগ্ধ তারি পানে স্তব্ধ চন্দ্রকরে
রব চাহি, গতপাপ কতদিনে হায়
তারি পুণ্য-মধুস্বাদ লভিব হিয়ায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কামনা

(ওকাকুরা)

দেখিতেছি তারা এক ; মোর ধ্রুবতারা—
জানি কোথা চলিয়াছে তরুণী আমার
ভগ্ন হাল ছিন্ন পাল হায় দিশাহারা
একেলা চলেছি ভাসি সাগর আধার !
নিশার শিশির একি কিশা অশ্রুধারা
সিক্ত যাহে একেবারে উত্তরী আমার ?
কোথা সে জোয়ার, ঝড় পাগলের পারা
যার বলে ভেসে আমি যাব একেবারে
আমাব কামনা-তীর্থে, তোমার দুয়ারে ?

শ্রীপ্রিয়দাদা দেবী ।

অন্তিম ইচ্ছা

(ওকাকুরা)

আমি মরে গেলে পরে, করতাল বাদ্যভরে
কোরো নাকো নগর-কীর্তন,
উড়াওনা চঞ্চল কেতন !
সিদ্ধুতীরে, দেবদাক-ছায়া-বীথিকায
ভাবের পরশে লেখা গানগুলি তার
বক্ষে রাখি সমাহিত করিও আমায় !

মরণ-বিলাপ মোর সেখা দিবানিশি ভোর
আনমনা সমুদ্রের পাখী
তীক্ষ্ণ স্বরে গাহিবে একাকী !
সে বিজন শয়নের শিয়রে আমার
স্মৃতিচিহ্ন যদি কোন না দিলেই নয়,
বোপিও রজনীগন্ধা শুভ্র স্বকুমার !

রব আমি আশা করে যবে হিম বাষ্পভরে
ধরণীর সীমা লুপ্ত হবে,
পূর্ণা তিথি জাগবে নীরবে,
বিরহ-বেদনা-শান্ত হৃদয় তময়
শান্ত করি, সে আমার সোহাগপরশে
শয়ন-করিতে পাশে ত্যজি লাজ ভয় !

শ্রীপ্রিয়দাদা দেবী ।

“পারবে না ফুল ফোটাতে”

রবীন্দ্রনাথের “খেয়া”তে একটি গান আছে

“তোমরা কেউ পারবে না গো
পারবে না ফুল ফোটাতে” ।

জীবনের বিজ্ঞতা যতই বেশি হয় ততই সহজে এব মানে
বোঝা যায়। অনেকবাব প্রেমের ক্ষেত্রে আমরা মনে
করি প্রেমের পরিচয়ের চিহ্ন পাওয়া ভাল, কিন্তু পেলেই
আমরা আরও চাই। আমবা কখনও তৃপ্তি পাই না।

প্রেমের চিহ্ন পেয়ে লাভ কি? একজন ইংরেজ কবি
বলেছেন—

“Never seek to tell thy love
Love that never can be told.”

প্রেম একটা ধরবার জিনিষ নয় যে ভাঙারে জমা করে
রাখা যাবে। প্রেমের প্রকাশ যদি আমরা পাই সেই
প্রকাশটা আমরা সামগ্রী কবে রাখতে পাবি না। প্রেমের
প্রমাণ বাহিরে দেখা যায় না। অনেক সময় এই বিষয়ে
পাওয়া এবং না-পাওয়া সমান, বরঞ্চ না পাওয়া ভাল ;
কেননা, যদি পাই তবে পরে অনেক অনুশোচনা আসে।
আমবা বাইরের চিহ্ন চাই, কিন্তু প্রেম একটা আন্তরিক জিনিষ।

ঠিক এই রকম কর্ম-ক্ষেত্রে। ইউরোপে কাজের
ফল দেখতে আমরা চিরকাল ব্যাকুল। কাজ করলে পর ফল
না দেখলে আমরা তৃপ্তি পাই না। কিন্তু আমরা এত ব্যস্ত
কেন? আমাদেরই কর্মের ক্ষেত্রে একজন অমর কর্তা কাজ
করছেন, তাঁর হাতে সমস্ত বর্ষের ফল পাকবে। সেইজন্যই
ভারতবর্ষের ষাড়া ধার্মিক তাঁরা বলেন নিষ্কাম কর্ম ভাল।
বেশি ব্যস্ত হলে কর্মের ফল নষ্ট হয়ে যাবে।

একজন শিল্পী যখন ছবি আঁকে তখন যদি বেশি ব্যাকুল
হয় তার ছবি নষ্ট হয়ে যায়। ছবি স্ফন্দর হলেও অনেকবার
“আরও স্ফন্দর চাই” বলতে বলতে ছবি খারাপ হয়ে যায়।

সেইজন্য এই জীবনে ধৈর্য্য খুবই দরকার। সমস্ত
পৃথিবী বলছেন “অপেক্ষা করো, তুমি অস্থির হযো না, মনে
শান্তি রাখো। আমার সমস্ত সৌন্দর্য্য আপনি প্রকাশিত
হবে।” ভোর বেলার পাপীদের গান, সূর্য্যাস্তের রঞ্জিত
মেঘ, গাছে আমের মুকুল, বেল-ফুলের স্নগন্ধ, পদ্ম-ফুলের
ফোটা, ও ফলের পাকা সকলই ঠিক সময়ে আসে, কখনও
অসময়ে আসে না। ঠিক সেই-রকম প্রেমের প্রকাশ,
ভালবাসার চিহ্ন, কাজের সফলতা আপনি হয়ে উঠে।
আমরা মিছামিছি ব্যস্ত হব কেন? কারণ—

“কেউ পারবে না গো
পারবে না ফুল ফোটাতে।”

উইলিয়ম পীয়ারসন ।

পুস্তক-পরিচয়

আদর্শ জননী—ঈশোগেন্দ্রলাল চৌধুরীর প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য এণ্ড সন, কলিকাতা। আট আনা। অষ্টম স্তর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসংবলিত।

গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুর লালনপালনের সময় শিশুর কিরূপে শারীরিক পরিচর্যা করা উচিত এবং চরিত্রগঠনের জন্ত কিরূপে কি কি নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা বিশদরূপে সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মাতৃহই নারীজীবনের সর্বোচ্চ পরবী; মাতাই শিশুর ধাত্রী শিক্ষয়িত্রী; হুমাতা হইলে স্নেহস্থান হইয়া থাকে; জননী শিক্ষিতা ও সাধুশীলা হইলে শুধু নিজের বস্ত্রে কিরূপে সন্তানকে সুস্থ সবল সৃষ্টি করিতে এবং শিক্ষা দ্বারা শিশুর কোমল হৃদয়কে সংপথে লগ্নাইতে পারেন তাহার উপায় এই বইএ নানা উপদেশ দিয়া নানা আদর্শতার উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো হইয়াছে। মাতা ও ভাবী জননীদেব এই বইখানি পড়িয়া দেখা উচিত।

উৎস—রায় ঈকুচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর প্রণীত। প্রকাশক—ঈদাশরথি পতি বিদ্যাভিনোদ, কেশিয়াড়ি-মেদিনীপুর। ১৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ আনা।

ইহা একখানি প্রবন্ধের সংগ্রহপুস্তক। এই প্রবন্ধগুলি 'ইহাতে আছে—অভিযোক্ত্যসব (সম্রাট জর্জের), ভূমিসিগণের ভবিষ্যত; কার্তিকে মন্ত্র ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন? ইতি; অপূর্ণ অতিথিসংস্কার, ভাবানুবাদ, মানব-জীবনে স্নেহের স্থান, মেদিনীপুবেব ভাষা, ধর্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট।

কোরক—ঈবিজয়মাধব মিত্রের প্রণীত ও প্রকাশিত, ১৪৯এ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ১১৬ পৃষ্ঠা। ছয় আনা।

কবিতার বই। ৪৫টি কবিতা আছে। অল্প বয়সের লেখা। প্রায় সমস্ত কবিতাই দেবতার নিকট আত্মনিবেদন। ভাব এখনো প্রকৃষ্টিত হয় নাই। হৃদয় এখনো তাল-লয়-সঙ্গত হয় নাই। তবু কোরকে মাধুর্যের নিতান্ত অভাব নাই। একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আমাদের ভালো লাগিয়াছে—

মেদিন উষার গুস্তের গায়
দোখমু একটি পাখী
পক্ষ টানিয়া বক্ষ বাহিছে,
হর্ব-বিভোর আঁধি।
নীলিম-নাথের চুখন-চুত
অমুরাগ-রেণু-রাশি
রঞ্জিল দুব গুস্ত-সাগর,
রঞ্জিল তাত্রে আসি।

কাকলী—ঈশ্বরকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ভদ্র ভিল, নড়াইল। কুস্তলীন প্রেসের ছাপা। ডঃ ক্রাঃ ৩২ পেজি ৭২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা, বাঁধানো দশ আনা।

কবিতার বই, ভগবৎ-গ্রন্থে রচিত। হৃদয়ে তাল না থাকতে পড়িতে অস্বাধি হয়।

ভবানীভাবনা—ঈকোষ্ঠিচন্দ্র সেনগুপ্ত-প্রণীত। ভবানীপুর, বীরভূম। আট আনা।

ভবানীপুর গ্রামের ভবানীশঙ্কর কবিরাজ লেখকের পূর্বপুরুষ, তিনি ভবানীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান। গ্রন্থকার পয়াব ত্রিপদী ছন্দে পদ্য রচনা করিয়া ভবানীপুর গ্রাম, ভবানীশঙ্কর কবিরাজ, ভাহার' প্রতি ভবানীর কৃপা ও আদেশে ভবানীর বিশ্রুতিষ্ঠা, কবিরাজ ভবানী-

শঙ্করের বংশাবলী প্রভৃতির বর্ণনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভবানীর বন্দাদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের মূখ্যপাতে লেখকের ও গ্রন্থমধ্যে ভবানীমূর্ত্তির ও মন্দিরের ছবি আছে। এ বইএর সঙ্গে সাধারণের কোনো সম্পর্ক নাই; ইহা একটি বিশেষ গ্রামের বিশেষ বংশের কথা লইয়া রচিত।

সেবকসঙ্গীত—ঈশ্বরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত।

ব্রাহ্মবাহাদুর। ডিমাई ৮ পেজি ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ব্রহ্ম-সম্বোধনে ও ব্রহ্মভজনে এবং বিষয়বাসনার অনিত্যতা প্রদর্শনে রচিত কতকগুলি গান।

কপালকুণ্ডলাভাস্ত্র—ঈলগিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৭০ অখিল মিত্রীর গলি, কলিকাতা। আট আনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা। কপাল-কুণ্ডলার চরিত্র ও প্রকৃতি এবং উপন্যাসের উপাখ্যানের সহিত দেশী বিদেশী কোন চরিত্র ও উপাখ্যানের সহিত সাধু আছে তাহা তুলনায় সমালোচনা করিয়া সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ দ্বারা রচনার রস সৌন্দর্য্য কৃতিত্ব বিশেষত্ব অতি বিচক্ষণ পাণ্ডিত্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার বই অতি অল্পই আছে; ইহা তাহাদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে। সমালোচনা-ব্যবসারী বা সমালোচক-অভিমানী লোকদের এই বইখানি পড়িয়া দেখা উচিত কিরূপে শ্রদ্ধার সহিত সমালোচককে বিচার করিতে হয়, রচনার মধ্যে বাহ্য গুণপনা ও নৈপুণ্য থাকে তাহাকেই প্রাধান্য দিয়া দোষের ভাগকে অতীত করিতে হয়। ইহা এইসব গুণ একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচনা হইয়াছে।

মণিমুক্তা—ঈশ্বরসময় লাহা কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৭৭ং জয় মিত্র স্ট্রীট কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ২৪ পেজী ৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১০ আনা।

ওরিএণ্টাল সেমিনারীর হেড মাষ্টার ঈশ্বরলজ্জনাথ সরকার "পূর্ব-ভাষে" পরিচয় দিয়াছেন—“রসময় এবার 'হাইন্ডস' ছাড়িয়া 'মণিমুক্তা'য় হাত দিয়াছেন; তবে মণিমুক্তাগুলি সবই বিলাতী, কিন্তু পাকা স্ত্রীদেবের সম্পদ—সচ্ছা জিনিষ।.....বিদেশী ভাষা ও ভাব স্বদেশী হাঁচে কবি এমন হৃদয়পূর্ণভাবে চালিয়াছেন যে উহা দেশী বলিয়াই মনে হয়।.....এই পুস্তকের অনেকগুলি ইংরাজী কবিতা ইংকল-কলেজ-পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায়, অতএব স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের পক্ষে এই সকল কবিতা বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।” কবিতাগুলি বিচিত্র ভাব-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। দেশী হাঁচে চালিয়া অনুবাদেও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তবে হৃদয় সেকলে অক্ষর-মাত্রিক, আধুনিক তাল-মাত্রিক নহে। এজন্য পড়িতে বাধে, তাল কাটে।

সঙ্গীত-সুধা—ঈশ্বর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বিরচিত। কিরণচাঁদ দরবেশ গ্রন্থিত(?)। প্রকাশক ঈনলিনীবন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা। ২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮০ আনা।

ইহাতে ভক্ত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কতকগুলি ব্রহ্ম সঙ্গীত ও কৃষ্ণ সঙ্গীত আছে।

মুরলী—ঈশ্বরবদ্রপ্রসাদ ঠাকুর কর্তৃক রচিত। প্রকাশক জে, এন, বোস। ২৩ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা। ৫৬ পৃষ্ঠা, আট আনা।

কৃষ্ণবিষয়ক ৫৬টি গান।

মুদ্রারক্ষক।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাস্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১৬শ ভাগ

২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

“অতি ব্যগ্র” বিশ্বজনীনতা ।

গত ১লা জুন তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি নতুন রকমের সভার অধিবেশন হইয়াছিল । ঐহারা এই সভা করিয়াছিলেন, তাহারা প্রসিদ্ধ লোক নহেন । ঐ শহবে একটি গির্জা আছে, তাহার নাম সামাজিক বিপ্লবের গির্জা (Church of the Social Revolution)। এই গির্জার প্রাঙ্গণে নানা জাতির জাতীয় পতাকা দাহ করা হয়, এবং সর্বশেষে “সর্বজাতীয় শ্রমজীবীদের পতাকা” (The Banner of International Industrialism) তুলিয়া ধরা হয় ।

পতাকা-দাহ অনুষ্ঠানটির পূর্বে গির্জাতে উপাসনা হয় । উপাসনার পর গির্জার পার্শ্ব হোয়াইট সকলকে প্রাঙ্গণে সম্মিলিত হইয়া তথায় বিশ্বজনীনতার জয় প্রত্যক্ষ করিতে আহ্বান করেন ।

সকলে একত্র হইলে একজন বক্তা বলিলেন, “সমুদয় জাতিকে সম্মিলিত করিয়া একটি বিশ্বজনীন সাধারণতন্ত্র স্থাপনের ইহা অপেক্ষা শুভ মুহূর্ত আর হইতে পারে না ।” তার পর হাইনরিক ওয়েবার নামক একজন জার্মেন নিজ-দেশের পতাকা পবিত্র্যাগ করিয়া তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন । ওয়েবারের পর গ্রেটব্রিটেন, রুশিয়া,

জাপান, ইটালী, সুইডেন, রুমেনিয়া এবং গ্রীসের কোন কোন অধিবাসী নিজ নিজ জাতীয় পতাকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন । সর্বশেষে এলবার্ট হেন্ডেল নামক আমেরিকার একজন লোক আমেরিকার পতাকা আশ্বনে ফেলিয়া দিলেন, এবং সার্বজনিক পতাকা খুলিয়া তুলিয়া ধরিলেন ।

এই ঘটনাটির নিজের কোন গৌরবের জন্ম ইহা এখানে বিবৃত করিলাম না । ইহা একটি লক্ষণ মাত্র । জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে হিংসা ঈর্ষ্যা বিরোধ আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে । তাহাতে কত যে রক্তপাত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, কেহ তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না । অস্ত্র দিকে নানা ধর্মপ্রবর্তক, নানা কবি, ও অজ্ঞাত অনেক মহাত্মা সকল মানুষের একতা ঘোষণা করিয়াছেন, ভবিষ্যতে সকল দেশ এক রাষ্ট্র ও সকল জাতি এক মহা মানবজাতিতে পরিণত হইবে, এবং যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হইবে, ধরা আর নররক্তে প্লাবিত হইবে না, এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া সাধারণ মানুষকেও সেইরূপ আশা দিয়াছেন । অন্ততঃ পক্ষে সমস্ত ইউরোপকে একটি রাষ্ট্রের মত কেমন করিয়া করা যায়, তাহার উপায় এবং ঐ রাষ্ট্রের মূল নিয়মাবলী পর্যন্ত কেহ কেহ স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু তাহার পর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, এবং সকলের চেয়ে “সত্য” জাতিরাই এই যুদ্ধ করিতেছে । তথাপি মানুষ বিশ্বজনীন একতা, ও স্থায়ী শান্তির আদর্শ ও আশা ত্যাগ করিতে পারে না ;—তাহা মানব-

প্রকৃতিতে নিহিত রহিয়াছে। যে ঘটনাটি বিবৃত করিলাম, তাহা এই আদর্শ ও আশার একটি বাস্তব প্রকাশ মাত্র।

ইসলাম-বিরোধী জাতীয়তা।

জাতীয়তা পাশ্চাত্য দেশসকলে যেমন প্রবল, এক জাপান ছাড়া অল্প কোথাও তেমন প্রবল নহে। কিন্তু জাতীয়তার আড্ডাতেই যে বিশ্বজনীনতা অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অল্প দিকে যেখানে জাতীয়তার উদ্ভব খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই, সেখানেও জাতীয়তার উদ্ভব হইতেছে।

যে-সকল দেশে মুসলমানধর্ম প্রচলিত, তথায় মাহুঘের নাম, পারিবারিক ও সামাজিক প্রথা, এবং সভ্যতা অনেকটা এক ছাঁচের। মুসলমান ধর্ম মাহুঘকে এতটা এক রকমের করে, যে, যদি ঐ ধর্ম পৃথিবীব্যাপী হইত, তাহা হইলে উহা দ্বারা এক মহা মানবজাতি গঠনের অনেকটা সাহায্য হইতে পারিত। বিশ্ব-ইসলাম প্রচেষ্টার (Pan-Islamic Movement) দ্বারা অল্পরাগী কর্মী, তাঁরা এইরূপ আশাই করেন। কিন্তু ইসলামধর্ম পৃথিবীব্যাপী হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবার লক্ষণও দেখা যাইতেছে না, এবং যে-সকল জাতি ও দেশ মুসলমানধর্মের অমুসরণ করে, তাহাদেব মধ্যেও বরাবর যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলেও বিদেশী-স্বধর্মীর জন্ত মুসলমান খুব বেশী বেদনা অনুভব করে, এবং তাহার জন্ত স্বার্থত্যাগ করে। অল্প সব ধর্ম-বলস্কীরা ঠিক এই ভাবে বিদেশী-স্বধর্মীর ব্যথার ব্যথী হয় না। ভাবতবর্ষীয় অনেক মুসলমানের তুর্কের সঙ্গে, আরবের সঙ্গে যতটা প্রাণের যোগ, ভারতবর্ষবাসী হিন্দুশিখজৈন-আদির সঙ্গে তেমন যোগ নাই। মুসলমানের এই যে দেশের-সীমালঙ্ঘনকারী ধর্মমূলক স্বাজাতিকতা, ইহা এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। যে যুগে ইউরোপের সকল দেশের খৃষ্টিয়ানেবা ইহুদীদের দেশে আসিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড নামক ধর্মযুদ্ধ করিয়াছিল, তখন খৃষ্টীয় জগতেও এই ধর্মমূলক স্বাজাতিকতা ছিল; এখন নাই। এখন ইউরোপের সব দেশে ধর্মমতের বন্ধন অপেক্ষা স্বাদেশিকতা প্রবল।

মুসলমান দেশসমূহের মধ্যে ইউরোপীয় তুর্ক প্রথম

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এই তুর্ককে তুর্কদের মধ্যে এক “সর্ব-তুরানিক প্রচেষ্টা”র (Pan-Turanian Movement) এবং আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা কেবল সকল তুরানীয়দেব প্রতি প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হইত; কিন্তু ইহাব মূলে আবব-বিদ্বেষ এবং তজ্জনিত ইসলাম-বিদ্বেষও রহিয়াছে। বিদ্বেষ বিরোধেব আমবা সমর্থন করিতে পারি না।

এই প্রচেষ্টাটি নিতান্ত আজকালকার নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে হইতেই ইহার কথা শুনা যাইতেছে। ইহার তুর্কী নাম “যেনী-তুরান” অর্থাৎ নব্য তুরান। তুর্ক-জাতীয়তা পুনরুজ্জীবিত করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহা তুর্ক-তাহার-জাতীয় সমস্ত লোককে একজাতীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিতে চায়। বুলগেবীয়দিগকেও এই মণ্ডলীভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার নেতাবা ইসলামের বিরোধী; কারণ, তাঁহারা বলেন, যে, ইসলামের প্রভাব স্বাদেশিকতা-মূলক জাতীয়তাব প্রতিকূল এবং ইসলামের প্রভাবে স্বতন্ত্র তুর্ক সভ্যতার উদ্ভব হইতে পায় নাই। “নব্য-তুরান”ের নেতারা তুর্ক জাতির আত্মাকে আরব্য-সভ্যতা ও ইসলামের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিতে চান।

এই প্রচেষ্টার সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এই দুটা দিক আছে। সাহিত্যিক বিভাগে তুরানীয় জাতির ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগে আরবজাতির প্রতি বিদ্বেষ বড় প্রবল। “নব্য-তুরান” নেতাবা মনে রাখেন যে আরবেরা তুর্কদের ভাগ্যাকাশে অন্তত গ্রহেব মত হইয়া আছে। তাঁহারা বলেন, তুর্কদিগকে, আরবীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া, খাটি তুর্ক হইতে হইবে, তাহাদিগকে আরবদের ভাষা ও সামাজিক বীতিনীতি ভুলিতে হইবে, আরবী ভাষার চর্চা ও চলন বন্ধ করিয়া তাহার জায়গায় তুর্কদের ভাষা চালাইতে হইবে।

বিলাতী সেক্ট্রাল নিউন্ এজেন্সীব একজন বিশেষ সংবাদদাতা এইসব খবর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে জার্মেনী এই নব্য-তুরান প্রচেষ্টাব আগুনে খুব বাতাস দিতেছে। তাহা সত্য হইতেও পারে। কারণ, আরবদেশ তুর্কদের অধীনতা-শৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিয়া স্বাধীন হইয়াছে; এবং জার্মেনী তুর্কদের বন্ধু ও ইংরেজ আরবের বন্ধু।



লোকমাণ্য শ্রীযুক্ত বালগদ্বাদর টিলক ।

সেক্ট্যান্ নিউন্ এঙ্গেলস্‌র সংবাদদাতা যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহার কতটুকু সত্য বলা যায় না। তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য আমাদের নাই, এবং তাহা করা আমাদের প্রধান বক্তব্য বলিবার পক্ষে আবশ্যকও নয়। সে বক্তব্য এই, যে, বিশ্বজনীনতা চরম ও চূড়ান্ত আদর্শ কিন্তু জাতীয়তার ভিতর দিয়া এই আদর্শে পৌঁছিতে হইবে, এবং এই আদর্শে পৌঁছিবার পরও জাতীয়তা থাকিবে ও থাকিবার প্রয়োজন আছে।

জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা।

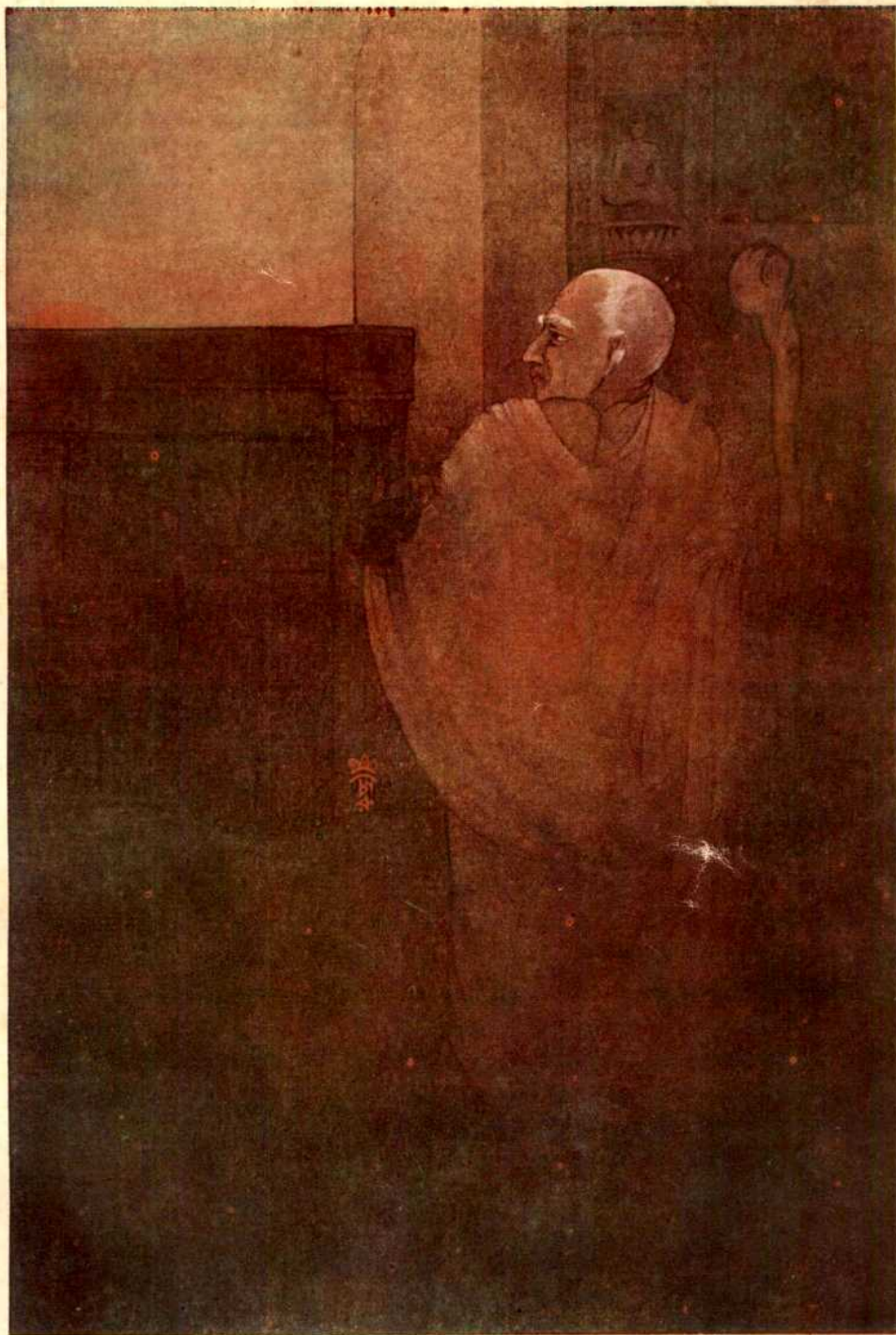
মানুষে মানুষে যেমন ঐক্যবোধ আছে, তেমনি পার্থক্য-বোধও আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন মানুষের চেহারার প্রভেদ যতই হোক না কেন, মোটের উপর সব মানুষের চেহারার এমন একটা মিল আছে যাহাতে করিয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া চেনা যায়, অথ প্রাণী হইতে পৃথক করা যায়। মানুষের অন্তরটারও এইরূপ মিল আছে। এই কারণে বিদ্যার আদানপ্রদান সম্ভব হইয়াছে। মানুষের চিন্তাপ্রণালী ও যুক্তিমার্গ এক রকম বলিয়া একজাতির গণিত বিজ্ঞান দর্শন অথ জাতি নিজের করিতে পারিয়াছে। মানুষের মৌলধাবোন্মেষের ও হৃদয়ের ভাবেরও এইরূপ একটা মূলগত ঐক্য আছে। সেইজন্য একজাতির কাব্য চিত্র মূর্তি অথ জাতিকে আনন্দ দিতে পারে; একজাতির কাব্য ও শিল্প দ্বারা অথ জাতি অল্পপ্রাণিত হইয়াছে ও হইতে পারে। মিশরের শিল্পের প্রভাব গ্রীসের শিল্পে অল্পভূত হয়, ভারতের বৌদ্ধযুগের শিল্প চীন ও জাপানের শিল্পকে অল্পপ্রাণিত ও পরিবর্তিত করিয়াছিল। পারস্যের শিল্প দ্বারা ভারতবর্ষের শিল্প রূপান্তরিত হইয়াছিল। এখন আবার ভারতবর্ষের শিল্পে কখন কখন পাশ্চাত্য ও জাপানী শিল্পের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের দার্শনিক মত প্রাচীনকালে গ্রীসের দার্শনিক মতকে পরিবর্তিত করিয়াছিল, এবং আধুনিক কালে জার্মেনীর ও অগ্রাণ্ড কোন কোন দেশের দার্শনিক মতকে নিজের প্রভাবের অধীন করিয়াছে। ইটালী, ফ্রান্স ও জার্মেনীর সাহিত্যের প্রভা ইংরেজী সাহিত্যের নানা যুগে অল্পভূত হয়। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব বাংলা আধুনিক সাহিত্যে লক্ষিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রভাব ভারতবর্ষের হিন্দী, গুজরাটী, কানাড়ী, মালয়ালম প্রভৃতি নানা সাহিত্যে লক্ষিত হয়; সম্ভবতঃ ইংরেজী সাহিত্যের উপরও বাংলা সাহিত্যে প্রভাব পরে লক্ষিত হইবে।

পোষাক, গায়ের রং, মুখের ও দেহের অগ্রাণ্ড অংশের গড়ন, প্রভৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও যেমন সকল মানুষকে একই শ্রেণীর জীব বলিয়া বুঝা যায়, তেমনি ভাষা, ধর্মমত, আচারব্যবহার, বাসস্থান, প্রভৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও অন্তরে মানুষ যে মূলতঃ এক তাহাও বুঝা যায়। পার্থক্য অপেক্ষা এই বাহ্য ও আন্তরিক ঐক্যই অধিক প্রাধান্যযোগ্য। কিন্তু পার্থক্যও আমরা ভুলি না, ভুলিলে চলে না।

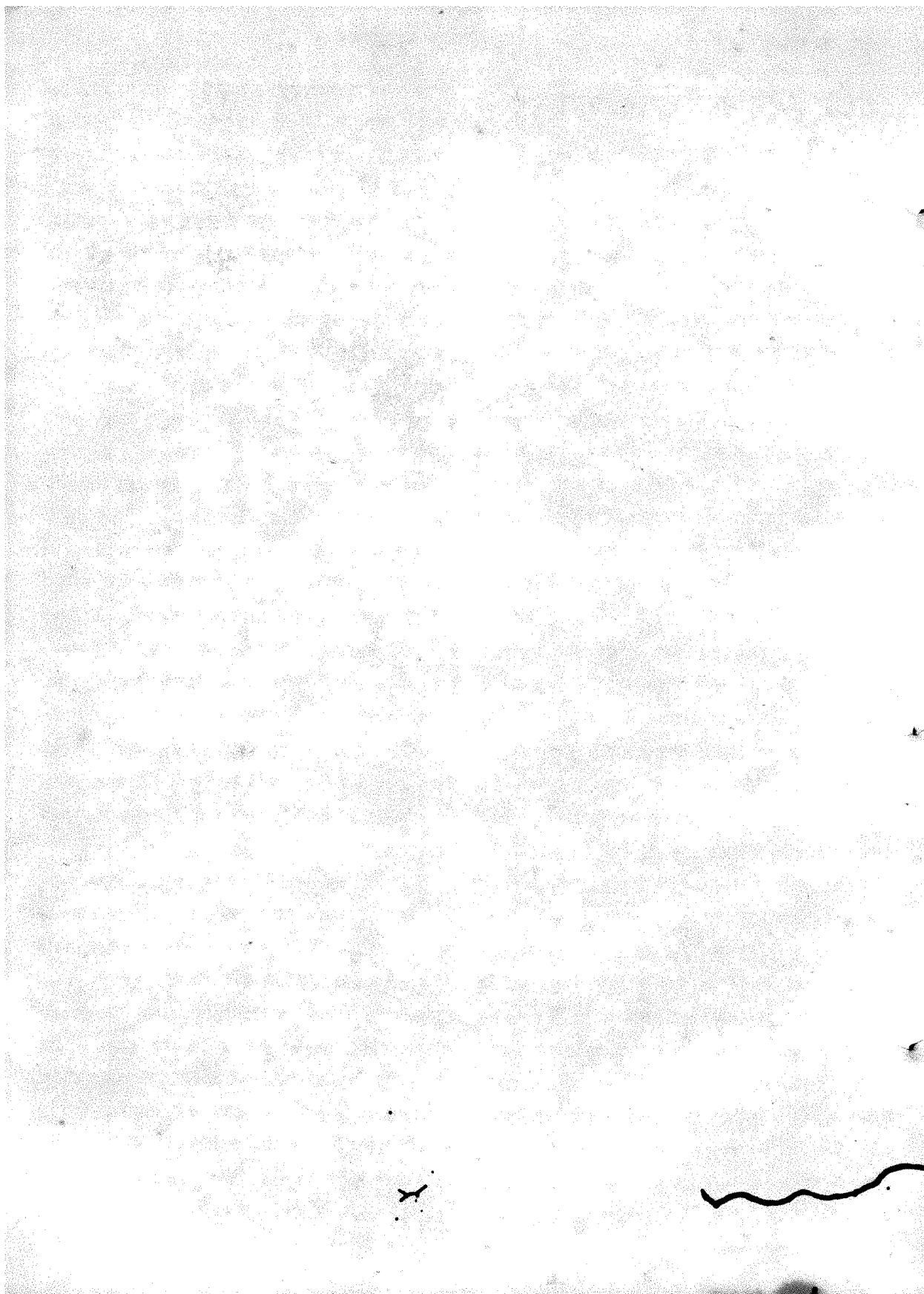
কথা আছে, “উদারচরিতান্যস্ত বহুধৈব কুটুমকম্”—উদারচরিত ব্যক্তির পৃথিবীর সব মানুষকে আত্মীয় মনে করেন। কিন্তু তা বলিয়া বাহার মনুষ্যত্ব আছে সে কখনও অস্ত্রের বাড়ী আড়্‌ডা গাড়িয়া তাহা অন্ন খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সে অল্পভব করে, যে, ভগবান্ তাহাকেও হাত পা দিয়াছেন, চোখ কান দিয়াছেন, দেহের শক্তি ও নৈপুণ্য দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন; অতএব তাহার উচিত নিজের চেষ্টায় নিজের জীবিকা নির্বাহ করা। শুধু তাই নয়। স্বস্থ সবল প্রকৃতির মানুষ, অপরের চিন্তা ও ভাবকে অবজ্ঞা বা বর্জন করেন না বটে, তাহাও গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহা নিজে মনন করিয়া ও অল্পভব করিয়া আত্মসাৎ করেন, এবং অধিকন্তু স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবেও চিন্তা করেন এবং হৃদয়ে নানা ভাব অল্পভব করেন।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, জাতিগতভাবেও তাহাই স্বাভাবিক। অল্প দেশের, অল্প জাতির, বা আমাদেরই দেশের অল্প কালের কোন একজন মানুষ স্বস্থ সবল ছিলেন, উপার্জক ছিলেন, সাহসী ছিলেন, বিদ্বান ছিলেন, চিন্তাশীল ছিলেন, কবি ছিলেন, ভক্ত ছিলেন, ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ যোগযুক্ত ছিলেন বলিয়া আমাদেরই আর কাহারও স্বাভাবিক শক্তি উপার্জন সাহস বিদ্যা চিন্তাশীলতা কবিত্ব ভক্তি বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন নাই, ইহা কেহই মনে করেন না। বেদের ঋষিরা ছিলেন বলিয়া বুদ্ধদেবের, শঙ্করাচার্যের, রামানন্দ রামানুজের, কবীর চৈতন্য নানক তুকারামাদির,



সন্ন্যাসী
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে।

U. RAY & SONS CALCUTTA



রামমোহন রামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল না, আমরা একরূপ মনে করিনা; বাস বাম্পীকি কালিদাস জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তুলসীদাস কৃত্তিবাস কাশীবাস চণ্ডিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যাস্ত কবিদের উদ্ভব কেহ অনাবশ্যক মনে করেন না। ইহাও বলা যায় না যে প্রাচীন ঋষি ও কবিরা যাহা বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন আধুনিকগণ কেবল তাহাবই পুনরুক্তি করিয়াছেন, নূতন কিছু বলেন নাই।

মানুষ যে দেশেব যে জাতিব যে কালেবই ইউক ভগবান যখন তাহাকে কলের পুতুল করিয়া পাঠান নাই, তাহাকে স্বতন্ত্র আত্মা স্বদয় মন বুদ্ধি দিয়াছেন, তখন তাহার নানা দৈহিক ও আত্মিক শক্তিব বিকাশ সাধন ও স্বব্যবহারের জন্ত সে দায়ী। পূর্ব-পূর্ব-যুগে যাহা আমাদের জন্ত আত্মিক মানসিক ঐশ্বর্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন আমবা সাধন মনন দ্বারা নিষ্কৃষ্ট করিব, তেমনি নিজের স্ব-তন্ত্র চেষ্টা দ্বারাও ঐকণ ঐশ্বর্য কিছু উপার্জন করিব; নতুবা ভগবান যে আমাদেরিকে স্বতন্ত্র আত্মা দিয়াছেন, তাহার সার্থকতা কোথায়?

ঈশ্বর কেবল ভাবতবর্ষেব, জুডিয়ার, আরব দেশেব বা চীনের কোন কোন মহাত্মাকেই আত্মা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকেই সত্য দর্শনের শক্তি দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগেরই নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা ঠিক নথ। তিনি কেবল ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানের লোকদিগকেই রাষ্ট্রীয় কার্য নিরূপেব শক্তি দিয়াছেন, অস্ত্র ফোন জাতিকে দেন নাই, ইহা ঠিক নথ। তিনি কেবল পাশ্চাত্যদিগকে এবং প্রাগের মত জাপানীদিগকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষমতা ও যন্ত্রনির্মাণপটুতা দিয়াছেন ইহা ঠিক নথ। তিনি বর্তমানে বাহারা স্বাধীন সেইসব জাতিকেই স্বদেশরক্ষার শক্তি ও স্বদেশপ্রাপ্ততা দিয়াছেন, ইহা ঠিক নথ। তিনি কেবল প্রাচীন হিন্দু, প্রাচীন গ্রীক, আধুনিক জার্মেন, প্রভৃতিকেই দার্শনিক করেন নাই। কবিত্ব-শক্তিতে কোন দেশের, জাতির বা কালের লোককে একচেটিয়া অধিকার দেন নাই। সৌন্দর্য্যবোধ, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, শিল্পনৈপুণ্য, কেবল কতকগুলি জাতিকেই দেন নাই। এমন কোন কাল, দেশ, দেশসমষ্টি, জাতি, বা জাতি-সমষ্টি নাই, যাহাতে এবং যাহাদের চেষ্টায় মানবের বিচিত্র

শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। মানুষ ধর্ম্ম, জ্ঞানে, শক্তিতে, সভ্যতার সকল অঙ্গে আরও উন্নত হইতে থাকিবে, এবং এই ক্রমোন্নতি প্রত্যেক দেশ ও জাতির সাধনসাপেক্ষ। এমন কোন জাতি নাই, এমন কোন মানুষ নাই যাহার সৃষ্টি অনাবশ্যক। সামাজিক প্রথা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দোষে মনে হইতে পারে যে কতকগুলি মানুষের জন্ম ও বাঁচিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক, অস্ত্র সকলে না জন্মিলে এবং না বাঁচিয়া থাকিলেও চলিত। কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেকেরই কিছু হইবাব, কিছু করিবাব, আছে। একজন মানুষেরও যাহা হইবার ও করিবাব সে যদি তাহা না হয় বা না করে, তাহা হইলে মানবসমাজেব অপূর্ণতা কিছু থাকিয়া যাইবে, মানব-সভ্যতার একটু অভাব দূর হইতে বাকী থাকিবে।

এইরূপ প্রত্যেক জাতিবও মানব-জীবনের প্রত্যেক বিভাগে কিছু হইবার, কিছু করিবাব আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষেব, প্রাচীন জুডিয়ার, প্রাচীন আর্বের, প্রাচীন গ্রীসেব, প্রাচীন বোমের, বা আধুনিক ইউরোপ আমেরিকা জাপানেব উপর ভাব দিয়া বা ববাত দিয়া থাকিলে চলিবে না। ধর্ম্ম বিশ্বাস, ধর্ম্মবোধনপ্রণালী, ধর্ম্মমোদিত অস্থান, সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষা, প্রভৃতি দেশকাল জাতি ও ব্যক্তির উপযোগী হওয়া চাই। দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প প্রভৃতিতেও প্রত্যেক জাতির স্ব-তন্ত্র কর্তব্য আছে। সকল বিষয়েই সকল জাতির মধ্যে আদানপ্রদান চলিবে, প্রাচীন হইতে গ্রহণ চলিবে; কিন্তু ধর্ম্ম, সামাজিক ব্যবস্থায়, শিক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, কোন যুগের লোক অস্ত্র যুগের, বা কোন জাতির লোক অস্ত্র জাতির সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী, অধীন বা দাস হইবে না; ইহাই জাতীয়তার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।

জাতীয়তা এই সমুদয় বিষয়েই প্রত্যেক জাতিকে স্ব-তন্ত্র চেষ্টা করিতে অগ্রপ্রাণিত কবে। জাতীয়তা কেবল রাজনীতি-ক্ষেত্রেব মধ্যে আবদ্ধ নহে, বিদ্যা, তাহার উপর দেশী জিনিষ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত “স্বদেশী” প্রচেষ্টা যোগ করিলেই জাতীয়তা পূর্ণাঙ্গ হয় না। বিদ্যা যদি কেহ তাহাব উপব ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ে দেশী সাবক চালচলন ও সামাজিক প্রথা অন্ধভাবে মানিয়া চলেন

তাহা হইলেও জাতীয়তার বিকাশ সম্পূর্ণ হইল না। অধিকন্তু যদি কেহ অঙ্গটার চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি বা রাজপুত চিত্র-শিল্পের হুবহু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, তাহাও এ কালের সজীব জাতীয় শিল্প হইবে না। আমরা যেমন একটা স্বতন্ত্র জাতির মানুষ, তেমনি একটা স্বতন্ত্র কালেরও মানুষ। আমাদের অবস্থা ও আমাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা এক নয়। আমাদের পক্ষে, সমাজে, শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, সব বিষয়ে স্বকীয় চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা বলা মানে এ নয় যে আমরা পুৰাতন কিছু লইব না, বা অল্প দেশের কিছু লইব না। লইব; মানুষের মত লইব, মানুষের মত বর্জন করিব; ফলেব মত নয়। কিন্তু আমাদেরও নিজের কিছু সাধনা নিজের কিছু চেষ্টা চাই; নতুবা আমরা নূতন দেহ ও স্বতন্ত্র আত্মা লইয়া জন্মিলাম কেন?

আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতীয় চেষ্টার ফলকে যে অল্প ব্যক্তির বা অল্প জাতির চেষ্টার ফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইতেই হইবে, তাহা নয়। সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যটা চিন্তাব্যবধান বিষয় নয়। প্রত্যেকে স্বকীয় সাধনা, স্ব-তন্ত্র চেষ্টা, করিতেছে কি না, তাহাই ভাবিবার বিষয়।

জাতিতে জাতিতে বিবোধ স্বরণাতিত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এবং অনেক স্থলেই বিদেশী-বিদ্বেষ স্বজাতিপ্রেমেব বেশে আত্মগবিচয় দেয় বলিয়া জাতীয়তা জিনিষটাকেই অনেকে বিদ্বেষ ও বিরোধের ব্যাপার মনে করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আমি যদি আমার মাকে ভক্তি করি ও ভালবাসি, তাহাব মানে কি এই যে, আমি অন্তরে মাকে অশ্রদ্ধা করি ও শত্রু মনে করি? তাহা হইলে আমাদের জননীজন্মভূমিকে ভাল বাসিলে অপরের জননীজন্মভূমিকে বিদ্বেষ করিতেই হইবে, কে বলিল? অপরের ধন চুবি না করিয়াও, অপরকে বঞ্চিত না করিয়াও, লক্ষ লক্ষ লোক নিজের গবিবার প্রতিপালন করিবার জন্ত ধন উপার্জন করে। পরোক্ষভাবে বাণিজ্যব্যাপদেশে অপরের ধনলুণ্ঠন না করিয়াও এক-একটা জাতিও এইরূপে নিজের উপার্জন দ্বারা বেশ থাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বর্তমান কালের শিল্প-অগ্রসর জাতিদের বড় বড় কারখানার অস্তিত্ব

পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির অবনত দশার উপর নির্ভর করিতে পারে; অনেক স্থলে তাহাদিগকে জোর করিয়া অবনত করা ও রাখা হয়, অনেক স্থলে তাহাদিগকে স্বস্থবিধা ও স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করা ও রাখা হয় বটে; কিন্তু মানবসমাজের ইহাই চরম পরিণতি বা স্থায়ী শেষ দশা নহে। শিল্পবানিজ্যে অহিংসামূলক জাতীয়তা আসিবে; না আসিলে প্রলয় ঘটবে।

একটা জাতির প্রত্যেক মানুষ স্বস্থ শিক্ষিত সচেতন হইলে যেমন সমগ্র জাতিটা পূর্ণ সিদ্ধি ঐশ্বর্য ও আনন্দের পথে অগ্রসর হইতে পারে না, তেমনি প্রত্যেক জাতি স্বস্থ, শিক্ষিত, সচেতন হইলে সমগ্র মানবজাতি সার্বকল্যাণ হইবার পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণ সিদ্ধি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না। এইজন্ত জাতীয়তা ব্যতীত বিশ্বজনীনতা হইতেও পারে না, থাকিতেও পারে না। কিন্তু প্রত্যেক জাতিব জাতীয়তা অল্প সব জাতির জাতীয়তার অবিরোধী হওয়া চাই। নতুবা সংগ্রামেই অনেকের সাধনার ক্ষয় হইবে।

কেহ যদি বলেন যে সমুদয় মানবজাতি সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করুক না? তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে ভবিষ্যতে কোন কোন বড় ব্যাপারে নৈমিত্তিক সম্মিলিত চেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু সব বিষয়ে নিত্য দৈনন্দিন জগদ্ব্যাপী চেষ্টা হইতে পারে না। সমগ্র মানব-জাতিব কথা দূরে থাক, একটা গ্রামের সব লোক সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য, সামাজিক, ও অস্ত্রাস্ত্র কাজ একত্র করিতে পারে কি?

আমাদের দেশে, ধর্মবিষয়েও যে আমাদের পক্ষে স্ব-তন্ত্র সাধনা নূতন করিয়া করিতে হইবে, ইহা অনেকে বুঝেন না, স্বীকার করেন না। কিন্তু অল্প বিষয়েও যেমন এবিষয়েও তেমনি নবীন, সজীব জাতীয়তা ও তত্পর যুক্ত চেষ্টার প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় বিষয়ক জাতীয়তা আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সর্ববিধ কাৰ্য সাধনের শক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট করে, স্বরাষ্ট্র লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে কেহ একথা বলেন না, যে, “প্রাচীন ভারতে অনেক সাধারণতন্ত্র ছিল, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন, ধর্মপাল ছিলেন, তৎপরে পৃথ্বীরাজ, আকবর, শিবাজী, প্রভৃতি ছিলেন, অতএব আবার নূতন করিয়া শক্তিশালিত হই বা প্রয়োজন

কি, স্বরাষ্ট্রলাভের ইচ্ছা বা দরকার কি? এ সব আপনা আপনিই হইবে।” শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত ভারতবর্ষ সুস্থ সবল হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; সেইজন্য স্বদেশী আন্দোলন করা হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছু জের আছে। এক্ষেত্রে ত কেহ বলেন না, “ভারতবর্ষ পূর্বে এশিয়ার নানা দেশ ও দ্বীপ এবং রোম গ্রীস মিশর বাবিলন প্রভৃতি নানা ভূভাগে কৃষিশিল্পজাত নানা দ্রব্য পাঠাইয়া ধনী হইত, এই কথাগুলি আওড়াইলেই আমরা আবার ধনী হইব ও খুব পেট ভরিয়া খাইতে পারিব।” ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি, শিল্প বা বাণিজ্যের চেয়ে সোজা নয়। ইহার জ্ঞান ও ব্যক্তিগত স্ব-তন্ত্র সাধনা চাই। আমাদের পূর্বে পুরুষেরা সাধন করিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিয়াছিলেন, সাম্বিক হইয়াছিলেন, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন, বলিয়া আমরা তাঁহাদের কথাগুলি আওড়াইলেই বা কতকগুলি বাহিরের কাজ করিলেই আমাদের মুক্তি হইবে, ইহা মনে করা গুরুতর ভ্রম। কোন বিষয়েই নিজের ব্যক্তিগত শ্রম ও সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি নাই। আমাদের পক্ষেও সাধনা করিতে হইবে, আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতে হইবে, সাম্বিক হইতে হইবে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পাইতে হইবে। প্রাচীন বলিয়াই কোন প্রণালী বর্জ্য নহে, প্রাচীন বলিয়াই শিরোধার্য্যও নহে। শ্রদ্ধাসহকারে বিচার করিয়া দেশকালপাত্রোপযোগী যাহা তাহা গ্রহণীয় ও বর্জনীয়, এবং নূতন কিছুর প্রয়োজন হইলে তাহা আমাদেরকেই সাধনা দ্বারা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন কবিত্তে হইবে।

স্বাদেশিকতার মূল বিশ্বাস।

মনের যে ভাবটিকে জাতীয়তা, স্বাধীনতা, বা স্বাদেশিকতা বলা হয়, তাহার মূলে, আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, একটি বিশ্বাস বিদ্যমান আছে। তাহা এই, যে, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতি মোটের উপর অপর যে কোন দেশ ও জাতির সমান ছিল, আছে, বা হইতে পারে। মানুষ যখন একটি দেশ বা জাতিকে অল্প কোন দেশ বা জাতি অপেক্ষা নিষ্কণ্টক মনে করে, তখন হয় অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিবা বর্তমানের প্রতি করে,

অথবা অতীত ও বর্তমান উভয়ের প্রতিই দৃষ্টিপাত করে; ভবিষ্যতে কি হইতে পারে, তাহা চিন্তা কবে না। কিন্তু অনেক দেশের অতীত কিরূপ ছিল, তাহা আমাদের জ্ঞান নাই, বর্তমানে কোন দেশ কতটা উন্নত তাহাও সব স্থলে জানি না; ভবিষ্যৎ ত সকলেরই অজ্ঞাত সূত্রাং অনুমানের বিষয়। অথচ কেবল-নিজেব জাতির বা দেশের উপর টান থাকার জন্যই যে লোকে মনে কবে, যে, “অতীতে বা বর্তমানে আমাদের দেশ মহিমান্বিত না থাকিলেও ভবিষ্যতে গৌরব-মণ্ডিত হইবে,” তাহা নয়; ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে অতি অসভ্য জাতি কালক্রমে সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে, এবং যে জাতিব লোক স্ববিধা পাইতেছে তাহারাই উন্নতি করিতেছে; উন্নত দেশ অধঃপতিত হইবার পর আবার উঠিতেছে।

বীরশ্বের জ্ঞান প্রাচীন গ্রীসেব লোকেরা, রোমানেরা বিখ্যাত ছিল; তাহার ভাবে নাই যে অসভ্য গল, ব্রিটন, টিউটন, প্রভৃতিও এ-বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ হইবে। রাজপুত্র বীরদের কথা, অকালী শিখদের কথা, জাপানী সামুরাইদের কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। রোমানেরা যখন সভ্য, তখন ইংলণ্ডের লোকেরা নগ্ন চিত্রিত-দেহ অরণ্যচারী বর্বর। তখন কেহ কল্পনা করে নাই যে কালে ইংলণ্ডের লোকেরা ইটালীর লোকদের চেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী হইবে। প্রাচীনকালে গ্রীস ভারতবর্ষের কাছে কোন কোন বিদ্যা শিখিয়াছিল, গ্রীসের নিকট বিদ্যার জন্ম ইংরেজ, জার্মেন প্রভৃতি ঋণী; এখন ভারতবর্ষ ইউরোপের নিকট বিদ্যা শিখিতেছে। এইরূপ যে ঘটবে তাহা প্রাচীনকালে ঠিক কবিয়া কে জানিত? ভারতবর্ষ এক সময়ে চীনকে ও জাপানকে ধর্ম ও কলা শিখাইয়াছিল, এবং চীনের সভ্যতা জাপানে বিস্তৃত হইয়াছিল; এখন জাপান কোন-কোন বিষয়ে চীন ও ভারতবর্ষ উভয়কেই পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে ত একথা কেহই কল্পনা করে নাই, আমবা যখন বালক ছিলাম, সে ত সে-দিনকার কথা, তখনও কবি হেমচন্দ্র জাপানকে “অসভ্য” বলিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের সময় কে জানিত যে যীশুখৃষ্ট জন্মিবেন, শঙ্করাচার্য্য জন্মিবেন, কবীর, নানক, চৈতন্য জন্মিবেন? যীশুখৃষ্টের সময় কে মনে করিয়াছিল যে

মোহাম্মদ জন্মিবেন? গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লীসেব সময় কে ভাবিয়াছিল যে তৎকালে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অসভ্য ব্রিটিশ দ্বীপে শেক্সপীয়রের মত এমন একজন নাট্যকার জন্মিবেন?

এইসব ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রত্যেক দেশের স্বদেশ-প্রেমিকেব এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমুদয় কাল চিন্তা করিলে তাঁহার দেশ অথবা যে-কোন দেশের নিশ্চয়ই সমকক্ষ। বাস্তবিক সমকক্ষ যদি এখনও না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন্ দেশ, কোন্ জাতি, কোন্ ব্যক্তি কিরূপে কাজ করিয়াছেন, তাহা কি ইতিহাসে সব লেখা হইয়াছে? লেখা হইয়া থাকিলেই বা তাহার খোঁজববর কয়জন রাখে? গ্রীসের মারাথন থার্মোপিলী বীরবদ্ধভূমি বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু রাজপুতানার হলদিঘাট এবং আরও কত অপ্রসিদ্ধ স্থান কি দেরূপ গৌরবলাভ করিয়াছে? এ-সকলের কথা তবু ত সভ্য জগতে অল্প-স্বল্প জানা পড়িয়াছে, কিন্তু আমেরিকার “অসভ্য লাল ইণ্ডিয়ান”রা যে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেমের প্রেরণায় গ্রীকের সমান শৌর্য্য দেখাইয়াছে, তাহা কয়জন জানে? আমেরিকার বিখ্যাত বাগ্মী ও সংস্কারক ওয়েণ্ডেল ফিলিপ্‌স এই “অসভ্য লাল ইণ্ডিয়ান”-দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

“From Massachusetts Bay back to their own hunting grounds every few miles is written down in imperishable record as a spot where the scanty scattered tribes made a stand for justice and their right. Neither Greece nor Germany nor the French nor the Scotch can show a prouder record. And instead of searing it over with infamy and illustrated epithet, the future will recognise it as a glorious record of a race that never melted out and never died but stood up manfully, man by man, foot by foot, and fought it out for the land God gave him”—*The American Journal of Sociology*, September 1916, p.263.

ওয়েণ্ডেল ফিলিপ্‌স বলিতেছেন যে লাল ইণ্ডিয়ানরা জ্ঞান এবং নিজেদের অধিকারের জ্ঞান যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা তাহাদের অক্ষয়-কীর্তি; গ্রীস জামেনী ফ্রান্স স্কটল্যান্ড কোন দেশ তাদের চেয়ে গৌরবজনক ইতিহাস দেখাইতে পারে না। ভবিষ্যৎকালে ইহা স্বীকৃত হইবে যে ইণ্ডিয়ানরা মেঘের মত মাছির মত মরে নাই, তাহারা, প্রত্যেকে, মানুষের মত, তাহাদের ভগবদন্ত এক-এক হাত জমির জন্ত প্রতি হাত জমিতে লড়িয়াছে।

অথচ এই বীরজাতিদের কথা আমরা সামান্যই জানি।

পৃথিবীর সমস্ত বীরপুরুষবেই কি আমরা চিনি? অনেকের নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে উঠে নাই। ষাহাদের নাম উঠিয়াছে, তাঁহাদেরও অনেকে সমুচিত যশ ও পূজা লাভ করেন নাই। নেপোলিয়নেব যোদ্ধা বলিয়া খুব খ্যাতি আছে; কিন্তু নিগ্রো নেপোলিয়ন টুসাঁ লুভ্যারভিয়ার (Toussaint L'Ouverture) প্রায় অজ্ঞাতই রহিয়াছেন। অথচ তিনি স্বজাতিপ্রেমে ও প্রকৃত শৌর্য্য ও মনুষ্যত্বে ইউরোপের নেপোলিয়ন অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তি ছিলেন।

এইরূপ কত সাধু, কত মনস্বী, অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছেন।

কোন দেশ, কোন জাতি, কোন যুগ, কোন ব্যক্তি, ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র নহে। আমরা সকলের কাছেই স্বামী ও কৃতজ্ঞ, কিন্তু ধর্মে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারে কোনও যুগের দেশের বা জাতির অপর কোনও যুগেব দেশের বা জাতির চির-অধীন চির-দাস থাকা অবশ্যসম্ভাব্য বা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। সমান-সমানভাবে পরস্পরের উপর সব-জাতি নির্ভর করিবে। ইহাই জাতীয়তা, স্বাধীনতা, বা স্বাধীনতা মূলমন্ত্র ও মূলবিশ্বাস।

বাঙালী কি লুপ্ত হইবে?

আমরা আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বলিয়াছি যে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে যত মানুষ জন্মিয়াছিল, তার চেয়ে বেশী মানুষ মরিয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ ঘটিয়াছিল; তারপর গত বৎসর ঘটিয়াছে। গত বৎসর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা ৪৬৯৮৯ হইয়াছিল; তুতরাং প্রায় সাতচল্লিশ হাজার মানুষ ১৯১৫ সালে ক্রিয়ায়। হঠাৎ এইরূপ ঘটে নাই। আগে আগে যত মানুষ মরিত, তাব চেয়ে অনেক বেশী জন্মিত। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরের হিসাব লইলে দেখা যায় যে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যার এই যে আধিক্য তাহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল, এবং শেষে জন্মের চেয়ে মৃত্যুরই সংখ্যা বেশী হইয়াছে। ইহা নীচের তালিকায় দেখান হইতেছে। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের আধিক্য + চিহ্ন দ্বারা এবং জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর আধিক্য — চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

বৎসর	আধিক্য বা ন্যূনতা
১৯১১	+ ৩৬৫৬০৭
১৯১২	+ ২৫০৫৫৬
১৯১৩	+ ১২৮০৫৩
১৯১৪	+ ১০৩৯৯২
১৯১৫	— ৪৬৯৩৯

এই তালিকা দেখিলে এরূপ মনে হয় না যে ১৯১৫তে জলপ্রাবন বা দুর্ভিক্ষের জন্ত মৃত্যু বেশী হওয়ায় কেবল ঐ বৎসর দেশে দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে। ঐসব কাবণে দুর্গতি একটু বেশী বাড়িয়া থাকিতে পারে; কিন্তু দুর্গতিটা আগেও ছিল এবং তাহা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯১৫ সালে বঙ্গের ২৭টি জেলার মধ্যে ১২টিতে মৃত্যুর চেয়ে জন্ম বেশী হইয়াছিল, এবং ১৫টিতে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, সমগ্র দেশ ধরিলে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছিল। বোন্ জেলায় মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম বা জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু হাজারকরা কত অধিক হইয়াছিল, তাহা নীচের তালিকায় দেখান যাইতেছে।

জেলা	হাজারকরা মৃত্যুর চেয়ে জন্মের আধিক্য	হাজারকরা জন্মের চেয়ে মৃত্যুর আধিক্য
বর্ধমান	...	৯৬২
বীরভূম	...	২০৩৭
বাকুড়া	...	৪১৭
মেদিনীপুর	০৪	...
ভূগলী	...	৩৮৬
হাবড়া	১৫৮	...
২৪ পরগণা	...	১৫৩
কলিকাতা	...	১০০৫
নদিয়া	...	১০৮৫
মুর্শিদাবাদ	...	১২৬৩
যশোর	...	৯০৭
খুলনা	৭৪৬	...
রাজশাহী	...	৩০৬
দিনাজপুর	২৭০	...
জলপাইগুড়ী	২৮২	...
দারজিলিং	...	২০৮
রংপুর	...	৬৪৫
বগুড়া	...	১০৩৬
পাবনা	...	১৩৩৩

জেলা	হাজারকরা মৃত্যুর চেয়ে জন্মের আধিক্য	হাজারকরা জন্মের চেয়ে মৃত্যুর আধিক্য
মালদহ	...	৬৯০
ঢাকা	৪১	...
মৈমনসিং	২৯	...
ফরিদপুর	৮৮	...
বাখরগঞ্জ	৮৪২	...
চট্টগ্রাম	১৪১৪	...
নোয়াখালী	১৬২৪	...
ত্রিপুরা	১০৯৬	...
সমগ্র বাংলা দেশ	...	১০৩

মাহুস বাঁচিয়া থাকিলে তবে ত দেশের উন্নতির কথা আসে। বাঁচিয়া থাকা, এবং স্বস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকাটা সকলকাল গোড়ার কথা। অতএব, এই যে বঙ্গের অতি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাব প্রতি, বিশেষভাবে এবং সকলের চেয়ে বেশী করিয়া, দেশের লোকদের এবং গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

দেশে যে মাহুস এত মরিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই গবর্ণমেন্টের কৈফিয়তের উপর দৃষ্টি পড়ে। বাংলা-গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন এই অত্যধিকসংখ্যক মৃত্যু হইতেছে “the result largely of widespread epidemics of cholera and small pox, which caused altogether 163,464 deaths, and partly also of reduced vitality consequent on the adverse economic conditions and bad agricultural seasons of this and previous years.” “বেশী মাহুস মরিয়াছে ওলাউঠা ও বসন্তের মড়ক হওয়ায়, অর্থাৎ অবশতঃ জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়ায়, এবং ঐ (১৯১৫) বৎসর ও পূর্বপূর্ব বৎসর ফসল ভাল না হওয়ায়।”

ওলাউঠা ও বসন্তের মড়ক কেন হয়? ওলাউঠার মড়ক সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্ট হইতে কতকগুলি তথ্য ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

“The increased mortality in Dacca is said to be due to want of good water-supply which becomes scanty in the rural areas in the dry season, 2697 deaths being reported in March, 3395 in April and 2144 in December or 8236 out of 11728 deaths in the whole year. The Civil Surgeon of Rajshahi says that the association between drought and cholera is remarkable, and that there can be little doubt that the one

is definitely related to other. In fact outbreaks of cholera must be counted upon as annual events as long as the majority of sources of water-supply remain subject to gross contamination as they do at present."

"Regarding the very high rate in Mymensing the Civil Surgeon says :—

"During the flood, due to pollution of the water-supply a most severe form of cholera epidemic broke out in the Tangail sub-division, Jamalpur becoming gradually badly affected with it. In August when a large part of the district was under water dead bodies of cholera patients were thrown into the flood water which carried the germs and spread the disease far and wide,....."

স্বতবাং দেখা যাইতেছে জলের অল্পতা, এবং ওলাউঠায় মৃত রোগীর শব দ্বারা ও অন্ত্যস্ত প্রকারে দূষিত জল ব্যবহার, এই মড়কেব কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কূপ শোধন করিলে যে মড়ক হইতে পায় না বা কমে তাহা নিম্নোক্ত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে :—

"Except in the Rajshahi division wells are not much resorted to as a source of drinking water-supply in this Presidency. But as a precautionary measure most of those that are situated in localities where cholera broke out were disinfected with permanganate of potash. This precaution was generally attended with good results."

যে-যে জায়গায় জলের কল আছে, তথায় যাহারা নলের জল ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে ওলাউঠা কম হয় বলিয়া নিম্নোক্ত অংশে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে :—

"A serious outbreak of the disease also occurred in Berhampore. In this case special investigation brought to light the fact that the disease was confined to those classes of the population who still persist in drinking unfiltered water brought from the river instead of making use of the pipe-water supply. It was reported that no case of cholera occurred in any house provided with a house connexion. These facts emphasise the value of a pipe-water supply as a preventive of cholera."

বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, কূপ পুষ্করিণী বা অন্ত্র জলাশয়ের জল শব-নিষ্ক্ষেপ মল-নিষ্ক্ষেপ বস্তুপ্রক্ষালন ইত্যাদি দ্বারা দূষিত না করা, দূষিত না করিতে শিক্ষা দেওয়া, দূষিত করণ নিবারণ করা, এবং যেখানে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় লোককে তাহাই পানের জন্ত ব্যবহার করিতে অভ্যাস করান, এইগুলি ওলাউঠার মড়ক নিবারণের উপায়। দূষিত জল ব্যবহার এই রোগ সংক্রামিত হইবার প্রধান কারণ হইলেও, কদর্য, পচা বা অন্ত্র প্রকারে দূষিত খাদ্য ব্যবহার করিলেও যে ইহা সংক্রামিত হইতে পারে, তাহা মনে রাখা কর্তব্য। লোকে অনেক সময়

অজ্ঞতাবশতঃ, কিন্তু অধিকাংশস্থলে দারিদ্র্যবশতঃ এইরূপ খাদ্য খাইয়া ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

ওলাউঠা নিবারণের জন্ত যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহাযে সর্বসাধারণের, জমিদার ও অন্ত্র দনী লোকদের, মিউনিসিপালিটি ও ডিস্ট্রিক্টবোর্ডগুলির, এবং গবর্ণমেন্টের গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে।

সব জেলাতেই এই পীড়া ১৯১৫ সালে দেখা দিয়াছিল। ইহার সকলের চেয়ে বেশী প্রকোপ হইয়াছিল মৈমনসিং জেলায়; তাঁর পর মালদহ, পাবনা, ঢাকা, নোয়াখালী, রংপুর, বাধরগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, ফরিদপুর, হাবড়া ও খুলনা।

বসন্তেব মারী কেন বাড়িয়াছিল, তাহার কারণ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ঢাকা দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে মাত্র। বসন্তরোগে মৃত ব্যক্তির শব জলে বাহাতে নিক্ষিপ্ত না হয়, তাহার উপায় করা উচিত। বসন্তরোগীর বস্ত্রাদি কোন জলাশয়ে ধৌত বাহাতে না হয়, তাহাও দেখা চাই। অন্ত্র নানা উপায়ে ইহা সংক্রামিত হয়! তাহা নিবারণ করা কর্তব্য। এক-একটা ছোট ছোট ঘরে অনেক লোকের বাস, দেহ অপরিষ্কার রাখা ও ময়লা কাপড় পরা, অপরিষ্কার জায়গায় ও ঘরে বাস করা, নন্দীমা আদি অপরিষ্কার রাখা, এইসব কারণেও এই ব্যাধির আবির্ভাব হয়।

দারিদ্র্য ও কৃষির দুর্বস্থা।

বাংলা-গবর্ণমেন্ট আর্থিক দুর্দশাজনিত জীবনীশক্তির-হ্রাস ও কৃষির দুর্বস্থা, অত্যধিক মৃত্যুর এই দুটি কারণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, দেশের লোক বড় গরীব, চাষের উপরই তাদের প্রধান নির্ভর, ১৯১৫ সালে চাষ নানা কারণে অনেক জায়গায় ভাল না হওয়ায়, লোক মরিয়াছে। কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা এই দারিদ্র্যের কথাটা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিতে বা বলিতে দিতে চান না। অম্মাভাবে বা অন্নকষ্টে কেহ মরিয়াছে, তাহাও স্বীকার পারত পক্ষে করেন না; বলেন উদরাময়ে বা হুংপিণ্ডের ক্ষয় বন্ধ হওয়ায় বা আর কোন রকমে মরিয়াছে। কিন্তু উদরাময়টা হয়

কেন? হৃৎপিণ্ডের কাজই বা খামে কেন? অমের দুশ্রাপাতা কি কারণ হইতে পারে না?

আর্থিক হ্রবস্থাবশতঃ লোকের জীবনীশক্তির হ্রাস বন্ধ করিতে হইলে, সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা দিয়া এবং নানা উপায়ে পুরাতন শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও নূতন শিল্পের প্রবর্তন দ্বারা লোকের কৃষি ছাড়া অন্য উপার্জননের উপায় করিয়া দিতে হইবে। তা ছাড়া কৃষিরও উন্নতি করা চাই। আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে কত কৃষিকলেক্স, কৃষির কত উচ্চ মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আমাদের দেশেও সেইরূপ হওয়া চাই। কেবল বুষ্টির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। খাল প্রভৃতি খনন করা আবশ্যিক। বাঁকুড়া জেলায় যে এত দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল, কিন্তু পুরাতন খালের সংস্কার বা নূতন খালের খনন কোথাও সরকার বা ডিস্ট্রিক্টবোর্ড করিয়াছেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাই নাই। বাঁধ খনন হইয়াছে বটে; তাহা প্রশংসনীয়।

বঙ্গের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি।

১৯১৫ সালে বাংলা দেশে ওলাউটা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ বৎসর বা অন্য কোন বৎসরই ঐ দুই রোগে সকলের চেয়ে বেশী লোক মারা পড়ে নাই। ১৯১৫ সালে হাজারকরা ৩২.৮৩ মৃত্যু হইয়াছিল। তার মধ্যে ওলাউঠায় ২.৮৮, বসন্তে .৭২, কিন্তু জরে ২৩.৪৭। এইরূপ ১৯১৪ সালেও ওলাউঠায় ১.৯৬, বসন্তে .২১, কিন্তু জরে ২৩.৪০ মরিয়াছিল। ১৯১০ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত ৫ বৎসরের গড়ে ওলাউঠায় ১.৯৮, বসন্তে .২০, কিন্তু জরে ২১.১৩ মরিয়াছিল। জরই বাংলাদেশের সকলের চেয়ে ভীষণ ব্যাধি। মৃত্যু ত সকল রোগের চেয়ে ইহা হইতেই বেশী হয়; অধিকন্তু যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা নিজে বারবার রোগাক্রান্ত বা অন্য রোগীর সেবায় ব্যতিব্যস্ত ও ব্যয়ভারে জেরবার হওয়ায়, সকল দিকে দেশটা ক্ষুণ্ণিহীন, নিশ্শক্তি, নির্বীৰ্য, উৎসাহহীন, বিমর্ষ, এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রমে অক্ষম হইয়া থাকে।

মানুষকে নির্বীৰ্য্য কবিবার চেষ্টা ম্যালেরিয়া বীরভূম জেলাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়াছিল। ১৯১৪ ও ১৯১৫ দুই বৎসরই বীরভূমে জরের প্রকোপ অন্য সব জেলার চেয়ে বেশী হইয়াছিল, তৃতীয় স্থানীয় তার নীচে মুর্শিদাবাদ। ১৯১৫তে ছিল বংপূব। তাহার পর দিনাজপুর, বগুড়া, নদিয়া, রাজশাহী, মালদহ, প্রভৃতি। এই বৎসরের সরকারী বিপোর্টে ম্যালেরিয়ার কারণ ও তাহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা নাই। কুইনাইন বিতরণের উল্লেখ আছে, ফলাফল সম্বন্ধে মন্তব্য নাই। বস্তার জলে গ্রামের মাঠঘাট ডুবাইয়া দিলে নাকি ম্যালেরিয়া দূর হয়;

এই উপায় কোথাও কোথাও আগামী বৎসর (১৯১৬) অবলম্বিত হইবে বলিয়া লেখা হইয়াছে। রোগের একটি কারণ সম্বন্ধে একটু আভাস একটি মন্তব্য পাওয়া যায়, যদিও তাহার গুরুত্ব কমাইবার চেষ্টাও সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে। কাবণটা রেলওয়ের বিস্তার। যথা:—

"Among rural areas Gokarna in Murshidabad which stood second last year now heads the list with a ratio of 69.58 against 53.06. The Civil Surgeon says that this thana continues to be notorious for returning the highest death-rate under the head fever, the health of the locality going from bad to worse since the construction of the B. A. K. Railway. Although there is evidence of there having been a definite increase of malaria in the country traversed by this line, since its construction, data are not yet available to show what proportion of the deaths returned from this area as due to fever is really to be ascribed to malaria."

যুদ্ধ এবং পীড়ানিবারণার্থ ব্যয়ের হ্রাস।

বার্ষিক স্বাস্থ্য-রিপোর্টের উপব গবর্ণমেন্টের মন্তব্যের একাধিক স্থানে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধের জন্য আর্থিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হওয়ায় যথেষ্ট ব্যয় কবিতো পাবা যায় নাই। কিন্তু যখন যুদ্ধ থাকে না, তখনও দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হয় না। যুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন কাবণে আর্থিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হইলে অন্য সব রকমের ব্যয় কমাইয়া মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এবং বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে থাকা উচিত। কারণ, রোগজনিত মৃত্যু যুদ্ধ গ্ৰেব হইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না, সে বাধা না পাইলে নিজের শিকার লইয়া যাইবেই যাইবে; এবং মানুষ একবার মরিয়া গেলে যুদ্ধের শেষে চিকিৎসিত হইবার জন্য ফিবিয়া আসিবে না। শিক্ষা সম্বন্ধেও ঐ কথা;—যুদ্ধের জন্য বালক-বালিকাদের বয়সবৃদ্ধি থামিয়া থাকিবে না, বয়স বাড়িতেই থাকিবে; এবং কাহারও শিক্ষার সময় পার হইয়া গেলে, যুদ্ধের পর আবার তাহাব সেকাল ফিরিয়া আসিবে না; কিম্বা কাহারও কৃষিক্ষা, কুসভ্যাস, ও আলস্য বন্ধমূল হইয়া গেলে যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে বলিয়াই যুদ্ধের পর তাহা দূর করা অসাধ্য হইবে না।

জার্মেনী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভীষণ শত্রু, তাহাকে পরাজিত করা নিশ্চয়ই দরকাব; কিন্তু জর, ওলাউটা ও বসন্ত আদি পীড়াও কম শত্রু নহে। জার্মেনীর শত্রুতা ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে আবস্ত হইয়াছে, এবং আর ২১ বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাব অবসান হইবে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার শত্রুতা বহুকাল পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অবসান হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিতেছে। প্রতি বৎসর শুধু বাংলা দেশেই দশ লক্ষ লোক জবে মরিতেছে। অন্ত্যাত্ত বোগেও আবও চারি

লক্ষের উপর মানুষ মরিতেছে; জামেনীকে জন্ম করিবার জন্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিদিন ছয় কোটি টাকা খরচ করিতেছেন; এবং তাহা করা খুবই উচিত। কিন্তু জাহ্নবকে বধ করিবার জন্ম বৎসরে ছয় কোটি কিস্তি তাহার শতাংশ ছয় লক্ষ ও খরচ করা যায় না কি? ১৩২২এর বৈশাখে প্রবাসীতে ডাক্তার নীলবতন সরকার একটা অনুমান করিয়াছেন যে জ্বরের জন্ম মৃত্যুতে বৎসবে বাংলা দেশে বার কোটি টাকা লোকসান হয়। এই ক্ষতি নিবাণের জন্ম কি করা হইতেছে?

“মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছা।”

একপ্রকার অলস নিরুদ্যম তথাবধিত দার্শনিকতা আছে, তাহাতে মানুষকে এই বলিতে প্রবৃত্ত করে, যে, “মৃত্যু দৈব ঘটনা, উহার উপর মানুষের হাত নাই।” কিন্তু এরূপ যুক্তির অনুসরণ করিলে কোন রকম আধিযাযিরই প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ, যা কিছু ঘটে, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, বলিয়া, বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক অজ্ঞতা দারিদ্র্য বোগ অকালমৃত্যু এগুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলা ঠিক নয়, এবং আমরা স্বভাবতঃ তাহা মনে করিও না, কারণ, নিজের-নিজের পবিবারে অজ্ঞতা দারিদ্র্য বোগ দূব করিতে, এবং অকালমৃত্যু যাহাতে না ঘটে, তাহার উপায় করিতে, আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। এক-একটি জাতি ও দেশ কতকগুলি পবিবার ও গৃহস্থালির সমষ্টিমাত্র। অজ্ঞতা দারিদ্র্য বোগ অকালমৃত্যুর বিরুদ্ধে সমগ্রজাতি এবং দেশব্যাপী সংগ্রাম হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ সংগ্রাম দ্বারা স্বাভাৱ্য-দেশ-সকলে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা খুব কমিয়াছে, দুর্ভিক্ষ আব হয় না, অনশনে মৃত্যুর কথা বড় শোনা যায় না, রোগ ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর লোকের হইতেছে এবং মোটেব উপর মৃত্যুসংখ্যাও কমিয়া আসিতেছে। “দৈব” বলিয়া চূপ করিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। আমাদেরই দেশের প্রাচীন নীতিকার উপদেশ দিয়াছেন, “দৈবং নিহত্য কুস পৌরুষম্ আশ্বাশ্রুত্যা,” দৈবকে বিনাশ করিয়া আশ্বাশ্রুতি দ্বারা পৌরুষকে প্রতিষ্ঠিত কর, এবং শেষ কথা এই বলিয়াছেন, “যত্নে কৃত্তেহপি যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ,” যত্ন করিয়াও যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাতে দোষ কি?

পাশ্চাত্য সভ্যদেশসকলে মৃত্যুর হাব আয়ত্ত্বি, দার্ক-জনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাব্যবস্থার দরুন এত করিয়াছে, তথাপি এখন যত লোক মবে, তত মৃত্যুরও অনেক অংশ তাহাদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক পরামর্শদাতাবা নিবার্য মনে করেন। অধ্যাপক উইনসলো (C. E. A. Winslow) আমেরিকার নিউইয়র্ক

শহরের স্বাস্থ্যবিভাগের শিক্ষাকর্ষাধ্যক্ষ (Educational Director of the New York Department of Health)। আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে (U. S. A.) একটি “জাতীয় জীবনীশক্তি সংরক্ষণ কমিটি” (Committee on Conservation of National Vitality) আছে। এই কমিটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সম্মিলিত-রাষ্ট্রে বৎসবে যে ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে, তাহার শতকরা ৪০টি স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞানের হুপ্রয়োগ দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। এই-মত কনষ্ট্রাক্টিভ কোয়টার্লী নামক ত্রৈমাসিক কাগজে পূর্বোক্ত অধ্যাপক উইনসলো কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে নিউইয়র্ক শহরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ ১০০০ শিশুর মধ্যে ১৪৪টি মরিয়াছিল; স্বশিক্ষার দ্বারা ও স্বাস্থ্যের নিয়ম জারী করার ১৯০৪ সালে এই সংখ্যা কমিয়া ৯৪ হইয়াছিল।

ডাক্তার হোর্ট দ্বিজ্ঞান করিয়াছেন:—

“Does God fix the death rate? Once men were taught so, and death was regarded as an act of Divine Providence, often inscrutable. We are now coming to look upon a high infant mortality as evidence of human weakness, ignorance and cupidity. We believe that Providence works through human agencies and that in this field, as in others, we reap what we sow—no more and no less.”

ইহার তাৎপর্য এই যে বিধাতা মৃত্যুর হার ঠিক করিয়া দেন নাই। মানুষের দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও লোভে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে। ভগবান্ মানুষের হাত দিয়া কাজ করেন; মানুষ যেমন বীজ বপন করে তেমনি ফল পায়,—বেশীও নয়, কমও নয়।

আমেরিকায় টাইফয়েড জ্বরে মৃত্যুর হার কুড়ি বৎসরে প্রতি লক্ষে ৪৬ হইতে ১৬তে পরিণত হইয়াছে। তথায় বৎসবে ক্ষয়বোণে যে দেড়লক্ষ মৃত্যু হয়, তাহার এক লক্ষ নিবার্য বলিয়া তথাকার ডাক্তারদের ধারণা। তাহার বলেন ৪৫এব উর্দ্ধ বয়সে লোকেরা যদি প্রতিবৎসর একবার করিয়া বিচক্ষণ ডাক্তারের দ্বারা দেহ পরীক্ষা করান, এবং, ঔষধ সম্বন্ধে নয়, খাদ্যশ্রমবিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা লন, তাহা হইলে গড়ে পাঁচ বৎসর করিয়া পরমাণু বাড়িতে পারে।

দেশময় স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্ম খুব চেষ্টা হওয়া দরকার। “স্বাস্থ্য-সমাচারের” মত কাগজের খুব আদর হওয়া উচিত।

বাঁকুড়া-সম্মিলনীর দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড।

দেশে অন্নভাব কতক পরিমাণে আছেই। এই অভাবেব মাত্রা খুব বাড়িলে তাহা দুর্ভিক্ষে পরিণত হয়। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ বৎসরাধিক কাল লাগিয়াছিল, এখন অন্নভাবেব মাত্রা কমিয়া সচরাচর যেক্রপ থাকে, প্রায় সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। দারিদ্র্য দূব করিবার চেষ্টার প্রয়োজন

আগে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। কেবল তুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট লোকদেব উপবাস নিবারণের প্রয়োজন কমিয়াছে। সেইজন্য বাঁকুড়া-সম্মিলনীর তুর্ভিক্ষ ফণ্ডে সম্মিলনীর আর টাকা লইতেছেন না। তাঁহাদেব হাতে উদ্ধৃত যে টাকা আছে, তাহা হইতে খুব গবীৰ কতকগুলি লোককে শীতবস্ত্র দেওয়া হইবে। যে-সকল দয়াবতী ভদ্রমহিলা ও দয়ালু ভদ্রলোক ফণ্ডে অর্থসাহায্য করিয়া সম্মিলনীকে শতশত লোককে অন্নবস্ত্র দিতে সমর্থ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ চৌধুরী আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে ভাগলপুরের উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের পত্নীর অধিকানগর অঞ্চলে যে জমিদারী আছে, তথাকার তুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদিগের মধ্যে তিনি প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকার চাউল বিতরণ করিয়াছেন, তাহাদেব চাষের জন্ত যত টাকা ও ধান আবশ্যক তাহা ধার দিয়াছেন, এবং খাদ্যনার টাকার সুদ প্রভৃতি মাফ করিয়া ও বাঁধপুঙ্খরী আদি খনন করাইয়া লোকের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণ কৰ্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সহৃদয়তা প্রশংসনীয়।

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলক।

মহারাষ্ট্রে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর টিলক অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক লোকের অল্পবাগ ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি কেহ নাই। তিনি দেশেব হিতদানার্থ অনেক স্বার্থভাগ করিয়াছেন ও কাবাবাস আদি অনেক ক্লেণ ভোগ করিয়াছেন। সমুদয় কষ্ট তিনি চরিত্রের দৃঢ়তাপ্রযুক্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে সহ্য করিয়াছেন। গত ২০শে জুলাই তাবিখে তাঁহার ঘটবৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হয়। তদুপলক্ষে, তাঁহাকে বাঁহারা ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা কবেন, তাঁহাবা তাঁহাকে একলক্ষ টাকা উপহাৰ দিতে সংকল্প করেন। আমাদেব দেশে খুব ভাল কাজের জন্তও এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু তিনি এমনই লোকপ্রিয় যে এই একলক্ষ টাকা সংগ্রহ খুব শীঘ্রই হইয়া গিয়াছিল। টিলক মহোদয় এই টাকা নিজের জন্ত গ্রহণ না করিয়া দেশের সেবার জন্ত গ্রহণ কবেন, এবং বলেন যে সাধ্যানুসারে তাঁহার নিজের টাকাও ইহাতে যোগ করিয়া লোকহিতসাধনে তৎপর থাকিবেন।

তাঁহার জন্মোৎসবেব দিন বোম্বাই-গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে পুনার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী তাঁহার নামে এই নোটিশ জারী করেন যে, তিনি একবৎসর নিবপরাধ থাকিবার জামিনধরূপ কেন নিজে ২০,০০০ টাকা জমা দিবেন না, এবং আরও ২০,০০০এব জন্ত দুজন প্রতিভূ দিবেন না, তাঁহার কাণে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। তাঁহাব নামে এই আদেশ হইয়াছিল যেতিনি বহুতা স্বাৰা রাজদ্রোহ অপরাধ করিয়াছেন। পুনার মাজিষ্ট্রেটের নিকট তিনি নোটিস্ অন্বেষণী কাণে দেখাইতে হাজির হন;

মাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিকট ২০,০০০ টাকা জামিন লন, এবং তিনি যদি এক বৎসরের জন্ত “ভাল ছেলের” মত সুব্যবহার না করেন তাহা হইলে প্রত্যেকে ১০,০০০ টাকা করিয়া দিবেন এক্ষণ দুজন প্রতিভূও তাঁহাকে দিতে হয়। তিনি মাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে তিনি বিরক্তিকর এবং মার্ক্জিত-রূচিবিগর্হিত কথা কোন কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজদ্রোহহৃৎ কোন কথা বলেন নাই। সুতরাং তিনি জামিনমুক্ত হইয়াছেন। ইহা আনন্দের বিষয়।

শ্রীযুক্ত টিলক নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি টাইম্‌সের ভারতবর্ষ সংবাদদাতা সার ভ্যালেন্টিন কিরলের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা চালাইবার জন্ত বিলাত যাইবেন। ইহাতে সমাজভয়ভীত অনেকের সমুদ্রযাত্রার পথ প্রশস্ত হইবে। বিলাতের লোকদিগকে নিশ্চয়ই তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন যে ভারতবর্ষের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্ত ভারতবাসীদিগকে হোমরুল বা স্বরাজের অধিকার অবিলম্বে দেওয়া উচিত।

মহারাষ্ট্রে টিলকপ্রমুখ দেশভক্তদিগের উদ্যোগে স্বরাজ-লাভের জন্ত হোমরুল লীগ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির চেষ্টায় স্বরাজসমর্থক নানা পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত, এবং নানাস্থানে বহুতা হইতেছে। মাদ্রাজে শ্রীমতী এনি বেণাণ্টও হোমরুল লীগ স্থাপন করিয়া এইরূপ কাজ করিতেছেন; ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

গতমাসে-তোলা টিলক মহোদয়ের একখানি ফোটোগ্রাফ হইতে আমরা ছবি প্রস্তুত করাইয়া মুদ্রিত কবিলাম।

বঙ্গের ও বিহারের ভাষা।

কয়েক বৎসর পূর্বে ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল; এবার বাঁকীপুরে হইবে। উভয় স্থানই বিহারের অন্তর্গত। বিহারে যে-সকল বাঙালী স্থায়ী বা প্রায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্যোগে সম্মিলনের এই অধিবেশন হইতেছে। অনেক বিহারীও বাংলা বুঝেন; তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ কেহ কেহ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ কথ-কর্তাদের মধ্যে পরিগণিত নহেন। কিন্তু যদি বাঁকীপুরে হিন্দীসাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন হইত, তাহা হইলে তথাকার শিক্ষিত বিহারী ভদ্রলোকেরাই উদ্যোগী কর্মী হইতেন। কারণ, বিহারের কেতাবী ভাষা হিন্দী।

বিহারের “সাদু” ভাষা হিন্দী হইলেও তথাকার কথিত ভাষার-হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সহিতই সাদৃশ্য বেশী।

* “The dialects spoken in Bihar,” “which he [Dr. Grierson] distinguishes collectively as Bihari,

"In declension, it [Bihari] partly follows Bengali and partly Eastern Hindi, but in the most important point, the formation of the oblique base, it follows the former and bears no resemblance to the latter. In conjugation, it differs altogether from Hindi and closely follows Bengali."[†]

এই সাদৃশ্য আগে আরও বেশী ছিল। সেইজন্য বিদ্যা-পতিকে বিহারী ও বাঙালী উভয়েই আপনাদের কবি বলিয়া দাবী করেন, এবং মিথিলার হস্তাক্ষর ও বাংলার হস্তাক্ষর এক। এই অক্ষর মিথিলার পুৰাতন পুথিতে পাওয়া যায়, এবং এখনও মিথিলার ব্রাহ্মণেরা ইহা ব্যবহার করেন।

কোন ভূখণ্ড যদি নিজের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে ত ভাল; নতুবা তাহাকে কোন প্রতিবেশীর নিকট-সংপৃক্ত সাহিত্যকেই নিজের সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। বিহারের কথিত ভাষা হিন্দী ও বাংলা হইতে কতকটা পৃথক হইলেও আধুনিক স্বতন্ত্র বিহারী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। বিহারে আদালতেও আশ্রম-অধোদ্যায় ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, কেতাবী ভাষাও হিন্দী বা উর্দু হইয়াছে। অথচ কথিত ভাষা হিন্দী অপেক্ষা বাংলারই বেশী কাছাকাছি বলিয়া এবং আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক বাংলা সাহিত্য উৎকৃষ্ট বলিয়া, বিহারের কেতাবী ভাষা বাংলা হইলে, এবং বিহারীরা বাংলাকেই আপনাদের সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহা অধিকতর স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তাহা হইল না কেন? এই বিষয়টির আলোচনা বাকীপূরের সাহিত্য-সম্মিলনে কোন বিহারপ্রবাসী যোগ্য বাঙালী কবিলে ভাল হয়। তাঁহাকে বিহারী ও বাংলা ভাষার সাদৃশ্য এবং বিহারী ও হিন্দীর পার্থক্য দেখাইতে হইবে। মিথিলার ও বাংলার অক্ষরের ঐক্য এবং মিথিলার ও নাগরী অক্ষরের প্রভেদও দেখাইতে হইবে। তাহার পর, সম্ভবতঃ কি কি কারণে বিহারে বাংলার বিস্তার না হইয়া হিন্দীর বিস্তার হইল, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

ভাসাভাসা ভাবে দেখিলে মনে হয়, বাংলা ও বিহার যখন এক স্ববাহুল্য ছিল, তখন বিহারে বাংলাই ত চল।

derived from the Magadhi Prakrit, which is also the parent of Bengali, Oriya and Assamese, and it is to these languages that Bihari is most closely allied, and with which it is accordingly grouped." "Dr. Grierson has now shown that the Bihari dialects not only cannot be treated as appertaining to the same language as those of Oudh and Bundelkhand, but that they do not even belong to the same linguistic group."

† The sign of the future tense in Bengali and Bihari is 'b', that of the past 'l' and that of the present definite 'chhi'. The numbers are used, not, to distinguish between singular and plural, but to show respect or the reverse, and the distinction between the conjugation of transitive and intransitive verbs has disappeared." Bengal Census Report, 1901, p. 318.

উচিত ছিল। কিন্তু আসামও এক সময় বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ মিশনরীদের চেষ্টায় ও প্ররোচনায় আসামী একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছে; যদিও আসামের ভাষার সঙ্গে বাংলা "নাধু" ভাষার যে প্রভেদ, চট্টগ্রামের কথিত ভাষায় ও কেতাবী বাংলায় তার চেয়ে বেশী প্রভেদ নাই, এবং পুরাতন আসামীয় কাব্য প্রাচীন বাংলা কাব্য অপেক্ষা আমাদের পক্ষে বেশী হৃর্বোধ্য নহে। যে রকম কারণে ও চেষ্টায় বাংলা ও অসমিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে, বিহারের ভাষাকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য সেরূপ কোন মিশনরী বা সরকারী চেষ্টা হইয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু আমাদের মনে হয় বাংলা ও বিহার এক শাসনের অধীন হওয়াতে, সরকারী কর্মচারী ও প্রথম প্রথম রেলওয়ে স্টেশনের কর্মচারী বেশী পরিমাণে বাঙালী হওয়াতে, বিহারীদের মনে যে স্বাভাবিক বিরক্তি, অসন্তোষ ও ঈর্ষার আবির্ভাব হইয়াছিল (যাহা এখনও আছে), তাহাই বিহারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের অত্যন্ত অন্তরায় হইয়া থাকিবে। প্রদেশজদিগের সহিত ব্যবহারে প্রবাসী বাঙালী মাত্রেরই সৌজন্যের অভাব আগে ছিল বা এখনও আছে, এরূপ বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে; কিন্তু কতকগুলি প্রবাসী বাঙালীর ব্যবহারে ঐক্য ও অনিষ্টতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই দোষ বিহারীদের অসন্তোষ, ঈর্ষা ও বিরক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকিবে। যাহাব প্রতি মনের ভাব এইরূপ, তাহার ভাষা ও সাহিত্য কেমন করিয়া গ্রহণীয় ও আদরণীয় হইতে পারে?

বিহারে বাংলার আদর না হইবার হয় ত আরও একটা কারণ ছিল। বাঙালীদের ভীত বলিয়া একটা অপবাদ আছে বা ছিল। অপবাদটা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, তৎক্ষণ বাঙালীকে "ভাত খাউআ," ও "ভূখা" বলিয়া অনেক খোঁটা অবজ্ঞা করিতেন; এখনও করেন কিনা, জানি না। যে অবজ্ঞার পাত্র, তাহার ভাষা ও সাহিত্য আদৃত না হইবারই কথা।

আমরা বে-জুটি কারণ অনুমান করিলাম, তাহা সত্য কি না, বলা যায় না; অল্প কারণও থাকা সম্ভব। যাহাই হউক, এখন বাংলা বিহার আলাদা হইয়া গিয়াছে। অনেক বিহারী শিক্ষিত হইয়া চাকরী পাইতেছেন, বিহারে পৃথক হাইকোর্ট হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ও পৃথক হইতেছে। নিতান্ত নির্বোধ ব্যতীত আর কেহ এখন আব সাহসে বিহারী বাঙালীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বাঙালীকে অবজ্ঞা করিতে পারে না। বাংলাকে বিহারের কথিত ভাষা করিবার চেষ্টা করিতে আমরা বলি না; এরূপ চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই, যদিও স্বাভাবিক কারণে বাংলা-বিহারের সীমান্তদেশে কোথাও কোথাও বিহারীর পরিসংখ্যে বাংলা

চলিত হইতেছে।* কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রচার বিহারে হইতে পারে। কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার আলোচনা বাকীপুর বকায় সাহিত্য-সম্মিলন করিলে ভাল হয়।

যে ভাষা ও সাহিত্য যত বেশী লোকের দ্বারা ব্যবহৃত ও আদৃত হয়, তাহার উন্নতি ও শক্তি তত বেশী হইবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া, সাহিত্যের বন্ধন প্রেমের বন্ধন। আমরা যদি বিহারীকে বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া আনন্দ দিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গ বিহারে একতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও গদ্যলেখকেরা আমাদের যেরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন, অথচ কোন ইংরেজ তেমন প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র নহেন।

বিহারে বাঙালীর আদর।

“আমরা ভারতবর্ষের প্রধান জাতি হইয়া বসিয়া থাকিব, জ্ঞানে ধর্মে শক্তিতে কেহ আমাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না,” এরূপ ভাব পোষণ করা কোন প্রদেশের লোকেরই উচিত নয়। কিন্তু কোন বিষয়ে কাহারও অবস্থা মন্দ থাকিলে, তাহাতেও সন্দেহ থাকি উচিত নয়। ভারতবর্ষের উন্নতিব জন্ত আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি থাকা আবশ্যিক। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই অল্প প্রদেশের কতকগুলি লোক স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বসবাস করে। এই প্রবাসীদের মধ্যে অনেকে, যে প্রদেশে বাস করেন তাহার হিতচেষ্টা করেন। প্রবাসী বলিয়া সেই সেই প্রদেশে ইহাদের অনাদর হওয়া উচিত নয়। গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে প্রদেশজন্দের গতই ইহাদের আদর হইলে বুঝা যায় যে সমগ্র ভারতবাসী জাতীয়তার দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি। বিহারে বিহারী ও বাঙালীর মধ্যে মনোমালিঙ্গের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি ও শুনিয়া ব্যথিত হইয়াছি। সংপ্রতি রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ মহাশয় বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় আনন্দিত হইলাম। তিনি এক দিকে যেমন বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগ রাখেন, অল্পদিকে তেমন বিহারের হিতসাধনেও তৎপর। আব একটি স্বলক্ষণ জাতীয়তার বৃদ্ধি সূচনা করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছে। বিহারের ছাত্রেরা প্রতি-বৎসর সভা করিয়া আপনাদের কর্তব্য নির্ধারণ করেন, এবং বিহারে শিক্ষা বিস্তারের উপায় আলোচনা করেন।

এবার দারভাঙ্গায় এই আলোচনা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক যত্ননাথ সরকার মহাশয় ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

বাঙালীর নিশ্চেষ্টতা।

বাংলা বোম্বাই মাদ্রাজ এই তিনটি প্রদেশকে ভারত বর্ষের সর্বাঙ্গপেক্ষা অগ্রসর প্রদেশ মনে করা হয়। মাদ্রাজ প্রতি বৎসর রাজনৈতিক ও সামাজিক সমিতির অধিবেশন হয়, জেলায় জেলায় বার্ষিক আলোচনা-সমিতি বসে। কিছু দিন হইতে ঐ প্রদেশে হোমরুল লীগের খুব কশিষ্টতা দেখা যাইতেছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সম্প্রতি আহমেদাবাদ শহরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও শৈক্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, মহারাষ্ট্রে হোমরুল লীগের বেশ উদ্যোগিতা দৃষ্ট হইতেছে। অনগ্রসর প্রদেশগুলির মধ্যে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে সম্প্রতি রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিল্পবাণিজ্যিক আলোচনাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার আগে ঐ প্রদেশকে মজীসভা না দেওয়ার বিরুদ্ধে সভা হইয়াছিল, মিউনিসিপাল বিলের বিরুদ্ধে সভা হইয়াছিল, শিক্ষাবিষয়ক নানা প্রশ্নের আলোচনার জন্ত সভা হইয়াছিল, এবং হিন্দু সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মধ্য-প্রদেশ ও বেরার আগ্রা-অযোধ্যা অপেক্ষাও পশ্চাৎপদ বলিয়া পরিগণিত। সেখানেও সম্প্রতি রাজনৈতিক আলোচনা-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বাঙালীর বাক্যবাগীশ বলিয়া বদনাম আছে। “আমরা কথায় কথায় বলিতাম, “কথা ঢের হয়েছে, এখন কাজ কর,” “এখন আর কথার সময় নাই, কাজের সময় এসেছে”; কাজের জন্তও যে কিছু কথার দরকার তাহা ভুলিয়া যাইতাম। যাহাই হউক, এখন কথা ত বন্ধ হইয়াছে; কাজ হইতেছে কি? কোন দিকে কাজ হইতেছে, অন্ততঃ অগ্রান্ত প্রদেশের চেয়ে, যাহারা এখন কথা বলিতেছে তাহাদের চেয়ে, কি বেশী কাজ হইতেছে, তাহা জানি না; জানিতে পারিলে স্থখী হইব।

বাঙালী কি নীরব সাধনা ও তপস্যার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন? সকলে ভাবিয়া দেখুন ও অনুসন্ধান করুন।

শিবপুর কলেজের ধর্মঘটের পরিণাম।

শিবপুর কলেজের ১৮ জন ছাত্রের ধর্মঘট করা অপরাধে নাম কাটা গিয়াছিল। তার পর উহাদের অভি-ভাবকদিগকে একটা চিঠি দেওয়া হয় যে যাহারা ছেলেদের স্বেচ্ছায় ভর্তি করিতে চান, তাহারা দরখাস্ত করিবেন। প্রায় সকল ছাত্রই দরখাস্ত করে। দরখাস্তগুলির উত্তরে কলেজের শাসকসমিতি যে যে সর্ভে ছাত্রেরা ভর্তি হইতে

* “North of the Ganges, however, Bengali has invaded Bihar territory, and in the portions of Purnea and Muzaffarpur which lie to the east of the Mahananda river, the language in common use is Bengali, and not Hindi.” Bengal Census Report, 1901, p. 315.

পারিবে, তাহা স্থির করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে কোন ধর্মঘটকারী ছাত্র সরকারী ছাত্রবৃত্তি পাইবে না, নূন বেতনে কেহ ভর্তি হইতে পারিবে না, প্রত্যেককে বার্ষিক ১০ হইতে ১৫ টাকা জরিমানা দিতে হইবে, যেসব ধর্মঘটকারী ভর্তি হইবে না তাহাদিগকে কলেজ-সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে না, ধর্মঘটকারীদের যাহারা কেতাবী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে কার্যগত (Practical) অর্থাৎ হাতে-হাতিয়ারে শিক্ষা দেওয়া হইবে না, ইত্যাদি। এই হুকুমগুলির মধ্যে কোথাও স্নেহ মমতা বিবেচনার বাষ্পও নাই; কেবল দমনের চেষ্টা দেবীপ্যমান। কলেজের শাসক-সমিতি (governing body) যেদব সভ্য এইসব হুকুম দিয়াছেন, তাঁরা সকলেই বিদেশী; কাহারও নিজেব, আশ্বীয়েব বা বন্ধুবান্ধবের ছেলে শিবপুর কলেজে পড়ে না, কখন পড়িবেও না, স্তত্রাং দরদ কোথা হইতে আসিবে? দরদ না থাক, শুধু বিচারও ত হওয়া উচিত ছিল। তাহাও হয় নাই। ধর্মঘটকারীদের কি বলিবার ছিল, তাহা শোনা হয় নাই। তাহা শুনিয়া পরিমিত শাস্তি দিলে আপত্তির কারণ ততটা থাকিত না। কলেজের শাসকসমিতির ত্রায়পরতার অভাব ও অববিবেচনা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। শাস্তি যাত্রা ছাড়াইয়া গেলে তাহাকে লোকে কেবল নির্ধ্যাতন মনে কবে। কিন্তু আমাদের একথা বলাও বুঝা; কারণ, লোকে অর্থাৎ দেশী লোকে কি বলে বা ভাবে তাহা কলেজের শাসকসমিতির সভ্যদের নিকট সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অবজ্ঞার ও তচ্ছিল্যের জিনিষ। দেশের লোকের কাছে তাঁহাদের কোন দায়িত্ব নাই বলিয়াই ত এইরূপ অতি কড়া হুকুম দেওয়া সম্ভব হয়। তাঁহারা নিজেদেব ছেলেদের হুরস্তপনা যে চোখে দেখেন, আমাদের ছেলেদের বেলায় সেটা মনে থাকে না; কারণ, তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের যোগ নাই। এরা যে বিজিত জাতির কতকগুলো উচ্চ-বয়সের প্রাণী মাত্র, স্তত্রাং ইহাদের সম্বন্ধে দমন করিবার চিন্তাটাই আগে আসে; কি করিলে কল্যাণ হইবে, তাহা কে ভাবে? কলেজের শাসকসমিতির হুকুমই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত নয়। গবর্ণমেন্ট পুনর্বিচার করিলে ভাল হয়।

রবীন্দ্রনাথ কানাডার মাটি মাড়াইবেন না।

জাপানে কিছু কাল থাকিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রে গিয়াছেন। কানাডার টরন্টো শহরের ডেলী ষ্ট্রাবকাগজে মিষ্টার ভি, জেগীসন লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে কানাডার ভাঙ্কভার শহরে নামিবদর জন্ম নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই,

কানাডায় অবতরণ করেন নাই। তিনি ঐ দেশে ইহা প্রকাশ করিয়া সকলকে জানাইতে বলিয়াছেন যে যত দিন তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় অবজ্ঞা ও নির্ধ্যাতন করা হইবে ততদিন তিনি তাহাদের মাটি মাড়াইবেন না; এইসব জাতিব মনের গতি না ফিরিলে তাহারা ভাবতবাসীর সহিত ভাল ব্যবহার কবিবে বলিয়া তিনি আশা করেন না।

ভারতবর্ষের অস্তিত্ব লোপ।

আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রে এশিয়ার লোক যাহাতে আব অবোধে যাইতে না পারে তাহার জন্ম যখন একটা আইনেব খসড়া প্রস্তুত করা হয়, তখন তাহাতে অগ্রাণু নিষিদ্ধ জাতির মধ্যে জাপানীদেরও নাম ছিল। জাপানের দূত চিন্দা ইহাতে আপত্তি করেন, এবং এই বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন যে “ইহা অত্যন্ত অপমানের বিষয় যে ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের নাম করা হইয়াছে।” জাপানের অনেক লোক ভারতবর্ষকে বড়ই হেয় জ্ঞান করে। ডাক্তার দাঙ্গো এবিনা নামক একজন জাপানী ষ্টুটিয়ান পাত্রী “শিজিন” নামক কাগজে লিখিয়াছেন: “To attempt to classify Japan with India is a mistake, for Japan is to be classed only with such countries as Britain, Germany and France: that is, with modern nations.” “জাপানকে ভারতবর্ষের শ্রেণীতে ফেলা ভুল, জাপানকে কেবল ব্রিটেন, জার্মানী, এবং ফ্রান্সের মত দেশের, অর্থাৎ আধুনিক জাতিদের, সঙ্গে এক শ্রেণীতে ফেলা উচিত।”

সম্প্রতি জাপানের একটি কাগজে লেখা হইয়াছে যে পৃথিবীর মধ্যে লোকসংখ্যায় জাপান পঞ্চমস্থানীয় দেশ; প্রথম চীন, দ্বিতীয় রুশিয়া, তৃতীয় আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্র, এবং চতুর্থ জার্মানী। অবশ্য ভৌগোলিক হিসাবে চীনের নীচেই লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের স্থান; কিন্তু ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব নাই বলিয়া জাপানীরা উহাকে গণনার মধ্যে আনে নাই।

জাপানে চীন দেশের ছাত্র।

জাপানে এখন ৮১৪ জন চীনদেশের ছাত্র আছে। সর্বাপেক্ষা বেশী ছাত্র শিল্প শিখিতেছে; ২১০ জন তোকিওর টেক্সিক্যাল কলেজে এবং ৩০ জন ওসাকার হায়ার টেক্সিক্যাল কলেজে। তা ছাড়া ২৮ জন বাণিজ্য শিখিতেছে, ৫১ জন চিকিৎসা শিখিতেছে, এবং ৮৫ জন শিক্ষকতা শিখিতেছে। আজকালকার দিনে জগতে টিকিবার উপায় চীনদেশের যুবকরা বলিতে পারিয়াছে।

প্লেটো—সোক্রেটিসের আত্মসমর্থন

(মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত।)

সোক্রেটিস।

হে আথেসবাসী নরগণ, আমি জানি না, আমার অভিযোক্তারা তোমাদিগের চিন্তে কি ভাবের উদ্রেক করিয়াছে; তবে আমি নিজে কিন্তু তাহাদিগেব বাক্য-মোহে আপনাকে প্রাণ তুলিয়াই গিয়াছিলাম,— তাহা বা এমনই আপাত-মনোহর ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছে। তবু তো তাহারা বলিতে গেলে সত্য কথা একটিও উচ্চারণ করে নাই। কিন্তু তাহা বা যে অসংখ্য মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তন্মধ্যে তাহাদিগেব এই কথাতেই আমি সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়াছি—তাহারা বলিয়াছে যে আমি আশ্চর্য্য বক্তা; অতএব তোমাদিগেব সতর্ক হওয়া কর্তব্য যে আমি যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত না করি। যখন দেখা যাইবে, যে, আমি মোটেই আশ্চর্য্য বক্তা নই, তখন তাহাদিগের উক্তি আমি অবিলম্বেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিব; সুতরাং তাহারা যে এমন কথা বলিতে লজ্জাবোধ করে নাই, এইটাই আমার নিকটে তাহাদিগের চরম নিম্নজ্ঞতার কাণ্ড্য বলিয়া প্রতীতমান হইতেছে। তবে, যে সত্য বলে, তাহাকেই যদি তাহারা আশ্চর্য্য বক্তা বলিয়া অভিহিত করে, সে স্বতন্ত্র কথা। যদি ইহাই তাহাদিগের অভিপ্রায় হয়, তবে আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি, যে, আমি তাহাদিগের অপেক্ষা ভিন্ন-প্রকৃতির বক্তা। এখন, আমি বলিতেছি, যে, তাহারা সত্য বলিয়া বলিয়াছে, অথবা কিছুই বলে নাই; কিন্তু আমার নিকটে তোমরা সমগ্র সত্য শুনিতে পাইবে। হে আধীনীয় নরগণ, তোমরা নিশ্চয়ই আমার নিকটে উহাদিগের মত পল্লবিত পদবিদ্যাসশোভন অলঙ্কার-পরিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রুত হইবে না। কিন্তু আমার মনে বিনা আঘাসে যখন যে-কথা উদিত হইবে, আমি সেইরূপ কথায়, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া, আমার বক্তব্য বলিয়া যাইব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, যে, আমি যাহা বলিব, তাহা শ্রাব্য। অতএব তোমরা আর কিছুই প্রার্থনা করিও না। কেননা, হে বন্ধুগণ, আমার এই বয়সে, তরুণ যুবকের মত পল্লবিত ভাষায় মিথ্যা

তর্কজাল লইয়া তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কখনই শোভন হইবে না। কিন্তু, হে আধীনীয় নবযুগ, আমি একান্তচিন্তে একটি বস্তু তোমাদিগের নিকটে ভিক্ষা চাহিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা অনেকে বাজারে, মহাজনদিগের গদিতে ও অগ্রভ্রাম্যার কথাবার্তা শুনিয়াছ; এই সকল স্থানে আমি-যে-ভাষায় বাক্যালাপ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, যদি আত্মসমর্থন করিবার কালে আমি ঠিক সেই ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করি, তবে তোমরা তাহাতে বিস্মিত হইও না, কিংবা আমাকে বাবা দিওনা। কেননা, প্রকৃত স্বাস্থ্যটি এই—আমাব বয়স সত্তর বৎসরের অধিক হইয়াছে; আমি এই প্রথম বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং আমি এখানকার বলিবার রীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। আমি যদি বাস্তবিকই অপরিচিত বিদেশী হইতাম, তবে, আমি যে প্রদেশে লালিতপালিত হইয়াছি, তথাকার ভাষায় ও রীতিতে কথা বলিলে তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিতে। অতএব আমি তোমাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা চাহিতেছি—আমাব তো বোধ হয় এই ভিক্ষা শ্রায়সঙ্গত—তোমরা আমার বলিবার রীতি উপেক্ষা করিও; উহা হয়তো তোমাদিগের রীতি অপেক্ষা মন্দ, হয়তো তদপেক্ষা ভাল—কিন্তু তোমরা-শুধু ইহাই দেখিও এবং ইহাতেই মনোনিবেশ করিও, যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রাব্য, কি শ্রাব্য নহে। ইহাই বিচারকের গুণ, যেমন সত্য-কথন ব্যবহারাজীবের গুণ।

২। হে আথেসবাসী নরগণ, আমাব পক্ষে ইহাই বিনীত-সঙ্গত যে আমার পুর্বাতন অভিযোক্তারা আমার বিরুদ্ধে প্রথমে যে-সকল মিথ্যা অভিযোগ রাষ্ট্র করিয়াছে, আমি পূর্বে তাহার প্রত্যুত্তর দিব, এবং তৎপরে পরবর্তী অভিযোক্তাদিগের বর্তমান অভিযোগগুলি হইতে আত্মসমর্থন করিব। কারণ, বহুকাল পূর্বে হইতে বহু বৎসর ধরিয়া বহুজন তোমাদিগের নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কবিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা বা সত্য কথা একটিও উচ্চারণ করে না। আল্ফাটস ও তাহাব সহচরগণ অপেক্ষা আমি ইহাদিগকেই অধিক ভয় করি; যদিচ উহারাও ভীষণ বটে। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা ভীষণতর; তাহারা

তোমাদের অনেককে বাল্যাবধি হস্তগত করিয়া বুঝাইয়া আসিতেছে ও আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ করিতেছে—সোক্রাটীস নামে একজন লোক আছে, সে জানী, সে নভোমণ্ডলের ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, ভূগর্ভস্থ যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বাভ্যাস করি, এবং কৃষ্ণিককে স্মৃতি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পারে। হে আশ্চর্যবাসীগণ, ইহারা আমার এই প্রকার অধ্যাত্ম রটনা করিতেছে—ইহারাই আমার ভীষণ অভিযোক্তা; কারণ, তাহাদিগের কথা শুনিয়া লোকে ভাবে, যে, যাহারা এই-সকল অল্পসম্মানে তৎপর, তাহারা দেবতাতেও বিশ্বাস করে না। তারপর, এই অভিযোক্তারা সংখ্যায় বহু, এবং তাহারা বহুকাল ধরিয়া অভিযোগ করিয়া আসিতেছে; অধিকন্তু, তাহারা এমন বয়সে তোমাদিগকে আমার দোষের কথা বলিয়াছে, যখন তোমাদিগের পক্ষে উহা বিশ্বাস করা খুবই সম্ভব ছিল; কেননা, তোমরা তখন বালক, এবং অনেকে কেবল শিশু ছিলে। তাহারা বস্তুতঃ এমনতর অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে, যাহাতে আমার পক্ষে একটি কথা বলে, এরূপ কেহই নিকটে বর্তমান ছিল না। আর, এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অসঙ্গত ব্যাপার এই, যে, আমি তাহাদিগের নামও অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। ইহাদিগের মধ্যে একজন ব্যঙ্গনাট্যকার আছে, ইহা ভিন্ন আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু যাহারা ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষবশতঃ তোমাদিগকে আমার প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিতেছে; আবার যাহারা নিজেরা আমার নিন্দায় বিশ্বাস করে বলিয়া অপরকেও উহা বিশ্বাস করাইতে প্ররাসী হইয়াছে; সেই-সকল লোকের সঙ্গে পারিয়া উঠাই সর্বাপেক্ষা কঠিন। কারণ, আমি তাহাদিগের কাহাকেও এখানে সাক্ষ্য দিবার জন্ত আহ্বান কিংবা প্রশ্ন করিতে সমর্থ নই; বস্তুতঃ আমাকে আত্মসমর্থন করিতে যাইয়া বাধ্য হইয়াই যেন ছায়ায় সহিত যুক্ত করিতে হইতেছে; এবং আমাকে এমনতর প্রশ্ন করিতে হইতেছে, যাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্ত কেহই উপস্থিত নাই। অতএব, আমি যেমন বলিতেছি, তোমরা মানিয়া লও, যে আমার অভিযোক্তাবর্গ দ্বিবিধ; একদল অধুনা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আসিতেছে; অপর দল পুরাতন; আমি

তাহাদিগের কথা বলিয়াছি। তোমরা স্থির কর, যে, আমি প্রথমে ইহাদিগের বিরুদ্ধেই আত্মসমর্থন করিব; কেননা, তোমরা তাহাদিগের অভিযোগই পূর্বে শুনিয়াছ; এবং তাহারা পরবর্তী অভিযোক্তাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক।

যাক। হে আশ্চর্যবাসীগণ, আমাকে আত্মসমর্থন করিতেই হইবে; এবং তোমরা বহুকাল অবধি আমার বিরুদ্ধে যে কুভাব পোষণ করিয়া আসিতেছ, তাহা দূর করিতে হইবে—তাহাও আবার এত অল্প সময়ের মধ্যে। যদি তোমাদের ও আমার পক্ষে ইহাই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে, আমি আশা করি, আমি এই কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিব, এবং আত্মসমর্থন করিয়া সফলকাম হইব। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, কাজটি কঠিন; কত কঠিন, তাহাও আমার অজ্ঞাত নয়। ঈশ্বরের বাহা অভিপ্রের, কল তাহাই হউক; আমাকে বিধিপালন ও আত্মসমর্থন করিতেই হইবে।

৩। তবে আমরা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, যে, সেই অপরাধটি কি, যাহা হইতে আমার প্রতি এই কুভাবের উৎপত্তি হইয়াছে; এবং যাহার উপরে নির্ভর করিয়া মেলীটস আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। আচ্ছা, আমার নিম্নোক্ত প্রশ্ন আমার কি নিন্দা রাষ্ট্র করিতেছে? তাহারা যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে, তাহার লিখিত প্রতিলিপি পাঠ করা কর্তব্য—“সোক্রাটীস পাপাচরণ ও অযথা সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিতেছে; সে ভূগর্ভস্থ ও অন্তরীক্ষে যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বাভ্যাস করি, কৃষ্ণিককে স্মৃতি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পারে, এবং এই-সমুদায় অপরকেও শিক্ষা দেয়।” তাহাদিগের অভিযোগ এইরূপ একটা কিছু। তোমরা নিজেরাও আরিস্টকানীসের একটি ব্যঙ্গনাটকে দেখিয়াছ, যে, সোক্রাটীস নামক একটা লোক একটা দোলায় তুলিতেছে, ও বলিতেছে, যে, সে আকাশে বিচরণ করিতেছে, এবং এইরূপ আরও কত বিষয়ে কত প্রলাপ বকিতেছে, যাহার সম্বন্ধে আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না। যদি কেহ এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তবে আমি যে সেই জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধাশ্রদ্ধা করিয়া এই কথা বলিতেছি, তাহা নহে; মেলীটস যেন আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কখনও না আনিতে পারে। কিন্তু, হে আশ্চর্যবাসীগণ

নরগণ, প্রকৃত কথা এই যে আমি এই-সকল ব্যাপারের মধ্যে নাই। তোমরা অনেকেই এবিষয়ে আমার সাক্ষী। তোমাদের মধ্যে যাহারা কখনও আমার কথাবার্তা শুনিয়াছে, তাহাদিগকে আমি অল্পরোব করিতেছি, তোমরা পরস্পরকে একথা বল ও বুঝাইয়া দাও। তোমরা এমন বহু জনই তো বর্তমান আছ, তোমরা তবে পরস্পরকে বল দেখি, যে, তোমরা কখনও আমাকে এইরূপ বিষয়ে—অল্পই হউক কি অধিকই হউক—বাক্যালাপ করিতে শুনিয়াছ কি না। তাহা হইলে তোমরা জানিতে পাবিবে, যে, লোকে আমার সম্বন্ধে আর যাহা যাহা বলে, তাহাও এইরূপ মিথ্যা।

৪। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে এই সকল কাহিনীর একটিও সত্য নয়, এবং যদি তোমরা কাহারও নিকটে শুনিয়া থাক যে আমি লোককে শিক্ষা দিতে ব্যস্ত এবং তজ্জন্ম অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাও সত্য নহে। আমি যে অর্থ গ্রহণ করা দোষের বিষয় বিবেচনা করি, তাহা নয়; কেননা, যদি কাহারও লোককে শিক্ষা দিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা আমার নিকটে উত্তম বলিয়াই বোধ হয়। যেমন, লেয়স্টি-নিবাসী গর্গিয়াস, কেমসবাসী প্রডিকাস ও এলিসনিবাসী হিপ্পিয়াস শিক্ষাদানে সমর্থ। কারণ, হে বন্ধুগণ, ইহারা প্রত্যেকেই যে-কোন নগরে যাইয়া যুবকদিগকে আপন আপন সহবাসের জ্ঞান আকুল করিয়া তুলিতে পারেন। এই যুবকেরা বিনাবায়ে ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব নগরের যে কোন অধিবাসীর সহবাস কবিত্তে পারিত; কিন্তু ইহাদিগের প্রভাবে তাহারা তাহা ত্যাগ করিয়া ইহাদিগের সহবাস করে ও তজ্জন্ম তাহাদিগকে অর্থ প্রদান করিয়া অধিকন্তু আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, এখানে পারসবাসী আর-একজন জ্ঞানী লোক আছেন; আমি শুনিয়াছি তিনি এই নগরেই বাস করিতেছেন। কারণ, হিপ্পনিকসের পুত্র কাল্লিয়াসের সহিত আমার দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল; এই ব্যক্তি একাকী সমবেত অপর সকলের অপেক্ষা জ্ঞানোদ্ভিগের জ্ঞান অধিক অর্থ ব্যয় কবিয়াছে। এই হেতু আমি তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ কবিতাম। তাহার দুই পুত্র; আমি বলিতাম, হে কাল্লিয়াস, তোমার পুত্র দুইট যদি গোবৎস কিংবা অশ্ব-শাবক হইত, তবে আমিও তাহাদিগের জ্ঞান বেতন দিতাম।

এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিতাম, যে, তাহাদিগকে স্বর্ণ-পালনের পক্ষে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে যত্ন কবিত; সেই শিক্ষক হইত কোনও অশ্বপাল কিংবা কৃষক। কিন্তু এক্ষণে তাহারা যখন মালুষ, তখন তুমি কাহাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চাও? এমত কেহ তো যে মানবধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম অবগত আছে? কারণ, আমি বিবেচনা করি, যে, তুমি পুত্রদিগের হিতকল্পে এ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা কবিয়াছ। আমি প্রিজ্ঞাসা করিতাম, এক্ষণ কেহ আছে, না নাই? সে বলিল, নিশ্চয়ই আছে। আমি বলিতাম, সে কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? কত বেতন লইয়া শিক্ষা দেয়? সে বলিল, সোক্রেটিস, তাহার নাম এযুস্টিনস; সে পাবসবাসী, বেতন পাঁচ মিনা। তখন আমি ভাবিতাম, এযুস্টিনস যদি সত্য সত্যই শিক্ষাকৌশল আয়ত্ত করিয়া এমন সুচারুরূপে শিক্ষা দিতে পারগ হইয়া থাকে, তবে সে ধন্ত। আমি নিজে যদি এই সমুদায় জানিতাম, তবে অহঙ্কারে ক্ষীত ও গর্বিত হইতাম। কিন্তু হে আখীনীয়গণ, প্রকৃত কথা এই যে আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।

৫। এখন, তোমাদের মধ্যে কেহ হয়তো প্রত্যুত্তর করিতে পারে, “আচ্ছা, সোক্রেটিস, তোমার কাজটা তবে কি? তোমার নামে এই-সকল নিন্দা কেন রাষ্ট্র হইতেছে? কেননা, যদি তুমি অপর্যবে অপেক্ষা অনাদারণ একটা কিছুতে ব্যাপৃত না থাকিতে, অর্থাৎ সাধারণ লোকে যাহা করে, তদপেক্ষা স্বতন্ত্র কিছু না করিতে, তবে তোমার এমনতর খ্যাতি ও তোমাকে লইয়া এত কথা কখনই হইত না। অতএব, আমরা দিগকে বল দেখি, তোমার কাজটা কি, যাহাতে আমরা দিগকে অজ্ঞের মত না জানিয়া শুনিয়াই তোমার বিচাব করিতে না হয়।” যে এক্ষণ বলে, আমাব বোধ হয় সে সত্য কথাই বলে; সুতরাং কিসে আমাব এই নাম হইয়াছে, এবং আমার এই নিন্দার মূল কি, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। তোমরা তবে শুন। তোমরা কেহ কেহ হয়তো মনে করিবে, আমি তামাসা করিতেছি; কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও, তোমাদিগকে যাহা বলিব, তাহা সমস্তই সত্য। হে আখীনীয় নরগণ, আমি শুধু একপ্রকার জ্ঞানের জ্ঞানই এই নামের অধিকারী হইয়াছি। সে কি প্রকার জ্ঞান? যে জ্ঞান হয়তো সকল

মানবেরই আবস্ত। আমি হয়তো প্রকৃতই এরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইতে পারি। কিন্তু আমি এইমাত্র যাহাদিগের কথা বলিয়াছি, তাহারা মানবীয় জ্ঞান অপেক্ষা মহত্তর কোনও জ্ঞানে জ্ঞানী; অথবা আমি উহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। কেননা, আমি নিজে উহার কিছুই জানি না। যে-কেহ বলে, যে, আমি জানি, সে মিথ্যাবাদী, সে আমার নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ বলে। হে আধুনিক নরগণ, তোমরা আমাকে বাধা দিও না,—যদি তোমাদের প্রতীতি হয়, যে আমি, গর্ব করিতেছি, তথাপি বাধা দিও না। কেননা, আমি যাহা বলিব, তাহা আমার কথা নয়; কে এ কথা বলিয়াছেন, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি; তিনি তোমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র। যদি আমার কোন প্রকার জ্ঞান থাকিয়া থাকে, সে জ্ঞান যে প্রকারই হউক না কেন, তাহাব শাস্ত্ররূপে আমি ডেলফীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উপস্থিত করিতেছি। তোমরা বোধ করি খাইরেফোনকে জ্ঞান। সে বাল্যকাল হইতে আমার সঙ্গী ছিল। সে ত্রিশশাব্দকের শাসনকালে তোমাদিগের জনতন্ত্রের সহিত নির্বাসিত হয়, এবং পরে তোমাদিগেরই সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। খাইরেফোন কি প্রকৃতির মানুষ ছিল, তাহাও তোমরা জান; সে কেমন দুর্দ্দমনীয় আবেগে আপনার লক্ষ্যপানে ধাবিত হইত। এই ক্ষণেই সে একবার ডেলফীতে যাইয়া আপলো দেবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইয়াছিল—বন্ধুগণ, আমি যাহাই বলি না কেন, তাহাতে বাধা দিওনা—সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাব অপেক্ষা জ্ঞানী কেহ আছে কিনা। আপলো দেবের হোত্রী উত্তর করিলেন, আমাব অপেক্ষা জ্ঞানী কেহই নাই। খাইরেফোন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে; তাহার ভ্রাতা এখানে উপস্থিত আছে, সে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

৬। এখন দেখ, আমি কেন তোমাদিগকে এই-সকল কথা বলিতেছি। আমার নিন্দার উৎপত্তি কোথায়, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চাই। আমি এই দৈববাণী শুনিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম—দেবতা কি বলিতেছেন? এবং এই সমস্তার অর্থ কি? কেননা আমি নিজে বেশ জানি, যে অল্পই হউক কি অধিকই হউক, আমি মোটেই জ্ঞানী

নহি; তবে তিনি যে বলিতেছেন, আমি সৰ্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী, ইহাব তাৎপৰ্য্য কি? যেহেতু, তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই; কারণ, তাহার পক্ষে ইহা বৈধ নহে। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ কি, বহুকাল পর্যন্ত আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই; পবিশেষে আমি একান্ত অনিচ্ছা-পূৰ্ব্বক ইহাব অনুসন্ধানে এই প্রকারে প্রবৃত্ত হইলাম। বাহাবা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, আমি তাহাদিগের মধ্যে একজনের নিকটে গমন করিলাম; আমি ভাবিলাম, যে, যদি কোথাও সম্ভব হয়, তবে এইখানে আমি দৈববাণী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিব; আমি দেবতাকে দেখাইয়া দিব, “আপনি বলিয়াছিলেন, আমি সৰ্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী; কিন্তু এই ব্যক্তি আমার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী।” অতএব, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম—তাহার নাম বলিবাব আবশ্যক নাই, সে একজন রাজনীতিজ্ঞ ছিল—হে আধুনিক নরগণ, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া আমি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম; আমি তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, যে যদিও সে অপর বহুলোকের নিকটে, বিশেষতঃ আপনার বিবেচনায়, জ্ঞানী বলিয়া গণ্য, তথাপি সে জ্ঞানী নহে। তখন আমি তাহাকে দেখাইয়া দিতে প্রয়াসী হইলাম, যে, যদিও সে আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা করে, তথাপি সে জ্ঞানী নহে। ফলে আমি তাহার ও উপস্থিত বহুজনের বিদ্বেষভাজন হইলাম। সে যাহা হউক, আমি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, “আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী, কেননা, আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহই বোধ করি মহৎ ও মঙ্গলের তত্ত্ব অবগত নহে; কিন্তু এই ব্যক্তি না জানিয়াও মনে করিতেছে যে সে তাহা জানে, আব আমি উহা বাস্তবিক জানিও না, এবং জানি বলিয়া মনেও করি না। অন্ততঃ দেখা যাইতেছে, যে, এই ব্যক্তি অপেক্ষা আমার এইটুকু জ্ঞান অধিক আছে, যে, আমি যাহা জানি না, তাহা জানি বলিয়া মনে করি না।” তৎপরে, যাহারা এই প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, আমি তাহাদিগের মধ্যে একজনের নিকটে গমন করিলাম, কিন্তু আমি ঐ একই ফল লাভ করিলাম। এবং সেখানেও আমি তাহার ও অপর অনেকে

৭। তদনন্তর আমি পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যের নিকটে গমন কবিত্তে লাগিলাম; আমি লোকের বিদ্যেভাজন হইতেছি, ইহা অমুভব করিয়া-দুঃখিত ও ভীত হইলাম; কিন্তু তথাপি আমি বিবেচনা করিলাম, যে, ঈশ্বরের আদেশকে সর্বোপরি শিরোধার্য্য করিতেই হইবে। সুতরাং দৈববাণীর অর্থ কি, তাহা পবীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা কিছু জানে বলিয়া বোধ হইল, তাহাদের সকলের নিকটেই আমাকে যাইতে হইল। হে আখীনীয়গণ—তোমাদিগকে সত্য বলা কর্তব্য—কুকুরের শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহাতে আমার এইরূপ ফললাভ হইল। আমি দেবতার আদেশে এই অমুদয়ানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, যে, যাহাদিগের জ্ঞানের খ্যাতি সর্বাপেক্ষা অধিক, জ্ঞানের অভাবও তাহাদিগেরই প্রায় পরিপূর্ণ; পক্ষান্তরে যে-সকল লোক নগণ্য বলিয়া পরিচিত, তাহারাও শিক্ষালাভের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। এখন, দৈববাণী যাহাতে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদুদ্দেশ্যে হীরাক্লীসের শ্রমের মত আমাকে যত শ্রমসাধ্য পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, তোমাদিগের নিকটে তাহা বর্ণনা করা কর্তব্য। রাজনীতিজ্ঞগণের পরে আমি শোকাস্বক কাব্যকার, ডিয়নীসের জয়-সঙ্গীত-রচয়িতা কবিদিগের নিকটে গমন করিলাম; অভ্যর্থনা এই, যে, যেখানে আমি সদ্য-সদ্য আপনাকে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিব। এক্ষণে, তাহাদিগের যে কবিতাগুলি আমার বিবেচনায় তাহারা অশেষ শ্রম করিয়া লিখিয়াছে, তাহা হাতে লইয়া আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা উহাতে কি বলিতে চাহিয়াছে; আমি তাহাদিগের নিকটে কিছু শিক্ষা করিব, এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। হে বন্ধুগণ, তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতে আমি লজ্জা বোধ করিতেছি, কিন্তু তথাপি উহা বলিতেই হইবে। তাহারা স্নিগ্ধেরা যাহা লিখিয়াছে, বলিতে গেলে উপস্থিত প্রায় সকলেই তাহাদিগের অপেক্ষা তাহার অর্থ স্পষ্টতররূপে বুঝাইয়া দিতে পারিত। অতএব, আমি অল্পকালের মধ্যেই কবিদিগের সম্বন্ধে এই তত্ত্ব অবগত হইলাম, যে, তাহারা যে-সকল কবিতা রচনা করে, তাহা জ্ঞানের সাহায্যে নয়, কিন্তু এক প্রকার প্রকৃতিদত্ত শক্তি ও অমুপ্রাণনা

সাহায্যেই রচনা করিয়া থাকে। তাহারা দৈবজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্বক্তার মত; কেননা, ইহারা অনেক ভাল কথা বলে, কিন্তু যাহা বলে, তাহার অর্থ জানে না। আমার নিকটে কবিদিগের অবস্থাও এই প্রকার বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমি আরও অমুভব করিলাম, যে, তাহারা আপনাদিগের কবিতার জন্ত অত্যন্ত বিষয়েও আপনাদিগকে লোক-সমাজে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে,—কিন্তু তাহারা বাস্তবিক অশরের অপেক্ষা জ্ঞানী নহে। সুতরাং আমি এই ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, যে, আমি রাজনীতিজ্ঞদিগের মত ইহাদিগের অপেক্ষাও এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

৮। পরিশেষে আমি শিল্পকারদিগের নিকটে গেলাম; কারণ, আমি নিজে বেশ জানিতাম, যে, আমি বলিতে গেলে শিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু আমি দেখিতে পাইব, যে, ইহারা বহু উত্তম বিষয় শিক্ষা করিয়াছে। এক্ষেত্রে আমার ভুল হয় নাই; কেননা, আমি জানি না, এমন অনেক বিষয় তাহারা জানে; সুতরাং এ বিষয়ে তাহারা আমার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী। কিন্তু, হে আখীনীয় নরগণ, আমি দেখিলাম, যে, কবিদিগের যে দোষ, নিপুণ শিল্পীদিগেরও সেই দোষ; তাহারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, যে, যেহেতু তাহারা স্ব স্ব শিল্পকর্মে নিপুণ, অতএব তাহারা মহত্তম অমুবিধ কার্য্যেও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাহাদিগের এই ভ্রান্তি তাহাদিগের শিল্প-জ্ঞানকেও মলিন করিয়াছে; সুতরাং আমি দৈববাণীর পক্ষ হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদিগের জ্ঞানে জ্ঞানী না হইয়া ও তাহাদিগের অজ্ঞতা হইতে মুক্ত থাকিয়া আমি যেমন আছি তেমনই থাকিতে চাই, না তাহাদিগের জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, এই উভয়েরই অধিকারী হইতে আকাঙ্ক্ষা করি? আমি আপনাকে ও দৈববাণীকে প্রত্যুত্তর করিলাম, আমি যেমন আছি, সেইরূপ থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়।

৯। হে আখীনীয়গণ, এই পরীক্ষানিবন্ধন আমার একান্ত নিদারুণ ও ভীষণ রহু শত্রু সঙ্ঘাত হইয়াছে; তাহারা আমার অসংখ্য অপবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে, এবং তাহাতেই আমার এই নাম হইয়াছে, যে, আমি জ্ঞানী। কারণ,

পার্শ্বস্তী লোকেরা বিবেচনা করে, যে, আমি যে বিষয়ে অপরের ভ্রম প্রদর্শন করি, সে বিষয়ে আমি জ্ঞানী। কিন্তু হে বন্ধুগণ, আমার বিবেচনায় প্রকৃত প্রস্তাবে এক ঈশ্বরই জ্ঞানী, এবং এই দৈববাণীর দ্বারা তিনি ইহাই বলিতেছেন, যে, মানবীয় জ্ঞানের মূল্য অত্যন্ত, অথবা কিছুই নহে। আমার বোধ হইতেছে, তিনি এমত বলেন নাই, যে, সোক্রাটীস জ্ঞানী, কিন্তু তিনি আমাকে দৃষ্টান্তস্থলে উপস্থিত করিয়া আমার নাম ব্যবহার করিয়াছেন, যেন তিনি বলিতেছেন, “হে মানবগণ, তোমাদিগের মধ্যে যে সোক্রাটীসের মত জানে যে বাস্তবিক তাহার জ্ঞানের মূল্য কিছুই নহে, সেই সৰ্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী।” এই জ্ঞানই তো আমি নিয়ত স্বদেশী ও বিদেশী যাহাকেই জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করি, ঈশ্বরের আদেশে তাহাকেই জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি; এবং যখনই আমার প্রতীতি হয়, যে, সে জ্ঞানী নহে, তখনই ঈশ্বরের পক্ষ হইয়া দেখাইয়া দিই, যে, সে জ্ঞানী নহে। এই প্রকার অনবসরবশতঃ আমার রাষ্ট্রীয় কার্যে উল্লেখযোগ্য অবকাশ ঘটে নাই, এবং আমি গৃহধর্ম ও মনোনিবেশ করিতে পারি নাই; বরং ঈশ্বরের এই সেবার জন্ত আমি পরিপূর্ণ দারিদ্র্যেই বাস করিতেছি।

১০। তারপর, যুবকেরা স্বেচ্ছাক্রমে আমার অঙ্গুগমন করে; তাহারা ধর্মীর সম্মান এবং তাহাদিগের যথেষ্ট অবসর আছে; যখন আমি প্রশ্ন করিয়া লোককে পরীক্ষা করি, তখন তাহারা সেই পরীক্ষা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে; এবং তাহারা আমার অঙ্গুগমন করে ও পরে অস্ত্রের পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হয়। আর, আমার মনে হয়, তাহারা এই পরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইয়া বহুল ও প্রচুর পরিমাণে এমত লোক দেখিতে পায়, যাহারা ভাবে, যে তাহারা যথেষ্ট জানে, কিন্তু জানে অল্পই, অথবা কিছুই জানে না। ইহাতে, যাহারা এই যুবকদিগের দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহারা ইহাদিগের উপরে ক্রুদ্ধ না হইয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, এবং বলে যে সোক্রাটীস নামে একটা অতি ক্ষমন্ত লোক আছে, সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে। যখন কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, “সোক্রাটীস এমন কি করিতেছে ও কি শিখাইতেছে, যাহাতে সে যুবকদিগকে

বিপথগামী করিতেছে”, তখন তাহাদিগের বলিবার কিছুই থাকে না; প্রত্যুত সে সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানে না; কিন্তু পাছে কেহ মনে করে, যে, উহারা প্রশ্নটির উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছে না, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানীর (Philosopher) বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি তাহাদিগের কর্তৃক আছে, তাহাই তখন বলিতে আরম্ভ করে—যথা, আকাশে ও ভূগর্ভে যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান, দেবতায় অবিশ্বাস ও কুযুক্তিকে সূয়ুক্তিরূপে উপস্থিত করিতে শিক্ষা দিয়া সোক্রাটীস যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে। কারণ, আমি বিবেচনা করি, যে, তাহারা এই সত্য কথাটা বলিতে চাহে না, যে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহারা জ্ঞানের ভান করে বটে, কিন্তু জানে না কিছুই। অতএব আমার মনে হয়, এইজন্যই তাহারা বহুকালাবধি আমার ঘোরতর অপবাদ রাষ্ট্র করিয়া তোমাদিগের কর্ণ পূর্ণ করিতেছে; তাহারা উৎসাহী, দুর্দমনীয় ও বহুসংখ্যক; স্বগঠিত দলবদ্ধ হইয়া মনোমুগ্ধকর ভাষার তাহারা আমার নিন্দা প্রচার করিয়া আসিতেছে। ইহারই ফলে মেলীটস, আল্ক্যটস ও ল্যুকোন আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। মেলীটস কবিরূপের, আল্ক্যটস শিল্পী ও রাজনীতিজ্ঞগণের এবং ল্যুকোন বক্তাদিগের পক্ষে রুপ হইয়াছে। এই জ্ঞানই আমি প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, আমার বিরুদ্ধে যে কুভাব এখন বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি তোমাদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হই, তবে আমি নিজেই বিস্মিত হইব। হে আধুনিক নবগণ, তোমাদিগের নিকটে যাহা উপস্থিত করিলাম, ইহাই সত্য; আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তাহা হইতে অল্প বা অধিক কিছুই গোপন করি নাই, কিংবা কিছুই অন্তরালে রাখি নাই। তথাপি, আমি বেশ জানি, যে, আমি এই স্পষ্ট কথা দ্বারাই লোককে আমার শত্রু করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে, যে, আমি সত্য কথাই বলিতেছি; এবং আমার বিরুদ্ধে কুভাব ও উহার কারণ, আমি যেরূপ নির্দেশ কবিতোছি, উহা প্রকৃতই সেইরূপ। এখনই হউক, আর পরেই হউক, যখনই তোমরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর না কেন, তোমরা উহা সেইরূপই দেখিতে পাইবে।

১১। আমার প্রথমোক্ত অভিযোক্তাদিগের অভিযোগ-গুলি সম্বন্ধে আমার এই আত্মসমর্থনই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। অতঃপর আমি শ্রেষ্ঠ স্বদেশভক্ত মেলীটস (সে নিজেকে এইরূপেই অভিহিত করিয়া থাকে) ও পরবর্তী অভিযোক্তাদিগের অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। তাহার দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোক্তা, এইরূপ ধরিয়া লইয়া আমরা আবার তাহাদিগের অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠ করি। উহা এই প্রকার—প্রতিলিপি বলিতেছে, যে, সোফাটাস অবস্থাচরণ করিতেছে, কেননা, সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে; পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, সে তাঁহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; এবং সে অপর নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই অভিযোগ। আমরা এক এক করিয়া ইহার প্রত্যেক ধারা পরীক্ষা করি। মেলীটস বলে, যে, আমি যুবকদিগকে বিপথগামী করিয়া অবস্থাচরণ করিতেছি। কিন্তু হে আত্মীয় নরবৃন্দ, আমি বলিতেছি, যে, মেলীটসই অবস্থাচরণ করিতেছে; যেহেতু সে তুচ্ছ কারণে লোককে বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া গম্ভীর ভাবে একটা কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং সে যে-সকল বিষয়ে মুহূর্তের জন্যও কিছুমাত্র শ্রমস্বীকার করে নাই, সেই-সকল বিষয়ে সে যেন কতই উৎসাহী ও ব্যস্ত, এইরূপ অভিযয় করিতেছে। আমি তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি, যে, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ঠিক।

ক্রমশঃ।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

চীনাদের জীবনযাত্রা

পিকিঙ-অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে যেরূপ গরম, শীতকালে সেরূপ ঠাণ্ডা। গুনিতেছি নদী তখন জমিয়া যায়, সমুদ্রবন্দরেও জাহাজের গতিবিধি স্থগিত থাকে। অথচ ভাদ্রমাসে এত গরম যে পশ্চিমখোলা কামরায় দিবাভাগে বসিয়া থাকা অসম্ভব। ইহার মধ্যে দু'একদিন বৃষ্টি হইয়া গেল—বৃষ্টির পরেই অনেকটা আমাদের কলিকাতার পৌষমাস পাইতেছি। ইরোপ-আমেরিকান বন্ধুগণ এইরূপ দিনকে “delightful, magnificent” বলিয়া থাকেন।

জাপানে কয়েকটা প্রসিদ্ধ বাগান দেখিয়াছি। পিকিঙে একটা দেখিবাব সুযোগ পাওয়া গেল। চীনা বাগানের অল্পকরণেই জাপানী বাগানের উৎপত্তি—সুতরাং জাপানী বাগান দেখা থাকিলে চীনা বাগান দেখিবার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ চীনের সকল জিনিষই জাপানে আছে—তবে জাপানী হাতে সেগুলি অধিকতর সুন্দর ও লাভণ্যময় দেখিতে পাই। অধিকন্তু বর্তমান যুগে জাপানী সমাজ জীবন্ত জাতি—একজন্ত তাহাদের প্রাচীন বস্তুসমূহ সুরক্ষিত সুসংস্কৃত এবং স্থানে স্থানে সংশোধিত ও সম্বর্দ্ধিত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু চীনারা বর্তমান কালে মৃতপ্রায় অবসন্ন-প্রাণ ভাবে কোনরূপে দিনপাত করিতেছে। নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা চীনে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, তাহার সফল কবে ফলিবে এখনও বলা কঠিন। আর প্রাচীন জীবনের ধারা নিতান্ত ক্ষীণ ও পঙ্কিল ভাবে বহিয়া যাইতেছে। তাহাতে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভবপর কিনা সন্দেহ হয়। অস্তুতঃ তাহা দেখিলে মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ মাত্র বুঝা যায়।

মাগুংবংশীয় শেষ সম্রাটের শেষ মন্ত্রী এই উদ্যানের অধিকারী ছিলেন। এক্ষণে ইহাতে রিপাব্লিকের সেনাপতিগণ একটা ক্লাব স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কুজিমা পাহাড়, নদী, সরোবর, সেতু, বক্রপথ, Kiosk বা বিশ্রাম-গৃহ, ইত্যাদিও আছে।

পিকিঙের রাস্তাগুলি দেখিলে চীনাদিগকে যত অপরিষ্কার মনে হয়, কোন উচ্চ বা মধ্যবিস্ত্রেণীর লোকের গৃহে প্রবেশ করিলে সেরূপ অসুখমান করিবার কারণ থাকে না। ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের গৃহ বাহির হইতে অনেকটা কদর্য ও অস্বাস্থ্যকর মনে হইবে। কিন্তু ফটক পার হইয়া প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিলে আর সে ধারণা থাকে না। স্বাস্থ্যজ্ঞান, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, পারিপাট্য ইত্যাদি চীনা সমাজে যথেষ্টই আছে। ভিতরের সঙ্গে বাহিরের এইরূপ প্রভেদ খানিকটা ভারতবর্ষেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মোটের উপর জাপানীরা চীনা ও ভারতবাসী অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যপ্রিয় বলা যাইতে পারে। বিনা আড়ম্বরে সৌন্দর্য্য ভোগ জাপানী সমাজে যেরূপ, সেরূপ বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই।

চীনাদের স্বদেশী হোটেল কয়েকটা দেখা গেল।

ভারতবর্ষে হোটেলের রেওয়াজ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। গোয়ালন্দ দায়ুকদিয়া ইত্যাদি ষ্টেশনে ষ্টেশনে কতকগুলি ভাতের দোকান আছে সন্দেহ নাই। তাহাতে শুইবার থাকিবারও ব্যবস্থা হইতে পারে—ইহা থাকেও। কিন্তু এই ধরণের হোটেলও ভারতবাসীর মজ্জায় বসে নাই—নিতান্ত দাবে না পড়িলে কোন ব্যক্তি হোটেলে আহার নিদ্রা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। ঘরের আরাম হোটেলে পাওয়া অসম্ভব—ইহাই ভারতবাসীর ধারণা। বলা বাহুল্য ইয়োরোপ-আমেরিকায় জনগণের ধারণা উল্টা—বরং ঘর অপেক্ষা ক্লাবে হোটেলেই থাওয়া থাকার সুখ বেশী অথচ খরচ অত্যন্ত অধিকও নয়। জাপানে সরাইগুলিও জাপানের খাটি স্বদেশী জিনিষ। সরাইয়ে বাস করিতে আসিয়া জাপানীরা গৃহবাসের সুখই ভোগ কবে। জাপানীরা দূরিত্র জাতি, ইয়োরোপ-আমেরিকানদের সমান অর্থব্যয় করা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব—ইহাদের অশনবসনাদিও ভারতীয় মাপকাঠিতে উচ্চ অঙ্গের বিবেচিত হইবে না। কাজেই অল্প খরচে সরাইওয়ালীরা অতিথিগণকে গৃহবাসের আরাম প্রদান করিয়া থাকে। যে শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভারতবাসী গোয়ালন্দের হোটেলে আহারাদি করিয়া থাকে সেই শ্রেণীর জাপানীদের জন্তই জাপানে সরাইয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অথচ আমরা হোটেলে বাস নরকযন্ত্রণার মত বিবেচনা করি—কিন্তু জাপানী সরাইগুলিকে লোকেরা নিজের ঘর বিবেচনা করে। বস্তুতঃ হোটেল জিনিষটা ভারতবর্ষে বসে নাই। আমরা ‘চটি’তে, মূদীখানাঘ ও গাছতলায় রান্না করিয়া, অথবা নৌকার পাটাতনের নীচে উনন ধবাইয়া কিম্বা গরুর গাড়ীর ছায়ায় হাঁড়ি চড়াইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত। এই বিষয়ে আমাদের চবম আবিষ্কার “ধর্মশালা” নামক পান্থ-নিবাস। আজকালকার “মহৎ আশ্রম” ইত্যাদি বনামোক্ষে এই ক্ষেত্রে অনাবশ্যক, কারণ এই ধরণের অতিথিশালা আমাদের নিজস্ব নয়—কাজেই চীনা ও জাপানীদের স্বদেশী সরাইয়ের সঙ্গে এই-সমুদয়ের তুলনা চলিতে পারে না।

জাপানী ও চীনাদের পায়খানা আমাদের ভারতীয় পায়খানার অনুরূপ। পাশ্চাত্য ক্রমোদ্ বা চেয়ারাকৃতি ব্যবস্থা এশিয়ার কুজাপি নাই। বড় বড় চীনা হোটেলও

এইরূপই দেখিতেছি। ড়েনেব পায়খানা জাপানেও নাই, চীনেও নাই। এমন কি জলের কলই পিকিঙে আরম্ভ হয় নাই। স্ততরাং কলিকাতার বাসিন্দারা মফঃস্বলে দুএকদিনের জন্ত বেড়াইতে গেলে দুর্গন্ধময় পায়খানা ও নদী পাতকুয়ার জল দেখিয়া যেক্রপ ভাবিয়া থাকেন তাহারা চীনাগণের স্বদেশী হোটেল অথবা বন্ধুগৃহে বাস করিলে ঠিক সেইরূপই ভাবিবেন। বাঙ্গালী জানে যে, কলিকাতার “কলের জল এবং বালাম চাউল” পেটে পড়িলে দরিদ্রের ভবিষ্যৎ শোচনীয় হয়। বাস্তবিকপক্ষে বর্তমান জগতের নূতনতম আরামদায়ক ব্যবস্থাগুলি সবই এইরূপ “কলের জল ও বালাম চাউল।” একবার এই-সমুদয়ের মর্ম্ম বুঝিলে আর মফঃস্বলে বাস অসম্ভব হয়। এই জন্তই ভারতবর্ষে পল্লীসমূহ উজাড় হইয়া যাইতেছে—কে ইহাব গতি বদ্ধ করিতে পারে? সমস্ত ভারতবর্ষকে কলিকাতার “কলের জল ও বালাম চাউল” না দিতে পারিলে পল্লী-সংস্কার সাধিত হইবে না। সেইরূপ চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, পারস্ত, মিশর ইত্যাদি এশিয়ার যে-কোন দেশের কথাই ধরি না কেন, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন ইত্যাদির “কলের জল ও বালাম চাউল” সর্বত্রই আমদানি অবশ্যস্বাভাবী। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরপালনের যে-সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে সেগুলি ছুনিয়ার সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িবে—যতদিন ছড়াইয়া না পড়ে ততদিন ছুনিয়ার অবশিষ্ট অংশকে ইয়োরোপ-আমেরিকা মফঃস্বলরূপে ঘৃণা করিবে—ইহা নিশ্চিত। জাপান স্বাধীনভাবে এই-সমুদয় প্রবর্তন করিতেছেন—স্বত্বের কথা। ভারতবাসীর সে ক্ষমতা নাই—চীনাগণের ক্ষমতা আছে কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে।

বর্তমান যুগে স্বাস্থ্য-জ্ঞান এশিয়াবাসীকে ইয়োরোপ-আমেরিকা হইতেই আমদানি করিতে হইবে সত্য। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা কর্তব্য যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছুনিয়ার কোথাও আজকালকার আরাম পাওয়া যাইত না। কিস্তোতো, মুকুডেন, পিকিঙ, মুর্শিদাবাদ, লক্ষৌ, বাগদাদ, কাইরো ইত্যাদি নগরের কুজাপি ইয়োরোপের নগরপুঞ্জ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, পানীয় জল ও পায়খানা ছিল না। মধ্যযুগের ইয়োরোপ কোন কোন

• বিষয়ে এশিয়ার শিষ্য ছিল, শুধু কোন বিষয়েই নয়। আজ একশত বৎসর ধরিয়া এশিয়া ইয়োরোপ-আমেরিকার শিষ্য, কিছুকাল এই শিষ্যত্ব থাকিবে। নব্য-ইয়োরোপ-আমেরিকার সমকক্ষ হইতে এশিয়ার এখনও দেরি আছে। কাজেই আমাদের এখন অনেক ক্ষেত্রে “ছোট মুখে বড় কথা না বলিয়া” বুদ্ধিমানের মত নীরবে সাধনা করা কর্তব্য।

পিকিঙের বড় বড় দোকানে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র দেখা যাইতেছে। এক পেয়ালার করিয়া দুগ্ধহীন চিনিহীন চা পান সর্বত্রই ঘটতেছে। কিন্তু সৌজন্য শিষ্টাচারে জাপানীদের স্বভাব যত মধুর, চীনাদের যেন সেক্ষপ নয। অতিথি-সংস্কারে চীনাদের ধরণ-ধারণ অনেকটা ভারতবাসীর মত। আমরা মুসলমানধর্ম্মাদিগকে আদব-কায়দা সম্বন্ধে অতিশয় মনোযোগী ভাবিয়া থাকি। কিন্তু এ বিষয়ে জাপানীরা মুসলমানদিগকেও পরাজিত করে। স্তবরাং জাপানের মধুরতা চীনে দুর্লভ। আমরা ঘরে লোক আসিলে ছাঁকা-কন্ধে ও একখিলি পান প্রদান করিয়া থাকি। চীনারা সেইরূপ চা “ইচ্ছা” করিতে বলে। এই পর্যন্ত। কিন্তু জাপানীদের রকম-সকম দেখিলে অতিমাত্রায় মিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইয়োরোপ-আমেরিকানেরা জাপানকে এইদ্রুত দাসস্থলভ নম্রতার দেশ বিবেচনা করিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করে। আমি পূর্ববী লোক—জাপানী ভাবভঙ্গিতে গোলামি না দেখিয়া আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য অনুভব করিয়াছি।

চীনাদের ঘরবাড়ীগুলি ভারতীয় ধরণের। একটা উঠানের চারি ভিটিতে চারিখানা গৃহ নির্মিত হয়—উঠানের আকাশে চন্দ্র স্বর্ঘ্য গ্রহ নক্ষত্র ও পবনদেবের স্বাধীন গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পাবি। খোলাব ছাদ—পাথরের মেজে—ইট বা পাথরের দেওয়াল; কাঠের ব্যবহার অল্প। অবশ্য প্রায় গৃহই প্রাচীরবেষ্টিত।

রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম দুই সারি লোক রঙিন পোষাক পরিয়া কোন উদ্দেশ্যে চলিতেছে। কাহারও সঙ্গে নূতন জামা কাপড়, কাহারও সঙ্গে বাস্তব পেটারা তোরঙ্গ ইত্যাদি। কয়েক জনে একটা স্বেচ্ছাখাট বহিয়া লইতেছে। কয়েকজনের কাঁধে টেবিল, আলমারি, আয়না ইত্যাদির ঝাঁক। ৫ বিছানা

বহিতেছে ইত্যাদি। কলিকাতায় হুটুগৃহে “তব” পাঠাইবার দৃশ্য চোখেই সম্মুখে উপস্থিত! দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“এখে একটা বিরাট শোভাযাত্রা দেখিতেছি। ব্যাপার কি?” দোভাষী বলিলেন—“বরগৃহে কন্যাপক্ষ যোতুক পাঠাইতেছেন। বিবাহোৎসব দুএকদিনের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে। কন্যাদানের পূর্বে অভিভাবকেরা কন্যার জিনিষপত্র শুল্করবাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।”



চীনা সঙ্গত।

চীনে বিবাহপ্রথা পাশ্চাত্য ধরণের নয—জাপানেও নয। মোটের উপর ভারতীয় ব্যবস্থাই এই-সকল দেশে দেখিতে পাই। বিবাহের পূর্বে বর কন্যাকে চিনে না, দেখেও না—কন্যাও বরকে চিনে না, দেখেও না। অসংখ্য যুবকযুবতীর মধ্যে পবম্পব আনাগোনা এবং ভাববিনিময় নব্য ইয়োরোপ-আমেরিকার খাস আবিষ্কার। স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দসই স্ত্রী-নির্বাচন ও, স্বামী বাছাই জগতের

আর কোথাও নাই। চীনেও নাই। এখানে পিতামাতা ও অভিভাবকগণই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। ঘটক, গণক ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা চীনা সমাজে প্রচলিত আছে। বাপদাদাদের নামধাম চরিত্র ইত্যাদির সংবাদ না লইয়া বরপক্ষ অথবা কন্যাপক্ষ বিবাহে সম্মত হয় না। বিবাহের পর স্ত্রী ও স্বামীর ভবিষ্যৎজীবন সুখময় হইবে কি না তাহাও গণকেরা কোষ্ঠি বিচার করিয়া বলিবার জ্ঞান নিমজ্জিত হন। শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহকার্য্য অল্পাধিক হইয়া থাকে। সুতরাং চীনে ও ভারতবর্ষে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই।

শুনলাম—পূর্বে বর কন্যাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিত। বিবাহোৎসব বরের গৃহে সম্পন্ন হইত। ইহাতে বরপক্ষের অর্থব্যয় যথেষ্ট—এজ্ঞাত আজকাল কন্যাপক্ষ নিজেই স্বামীগৃহে কন্যাকে পাঠাইয়া দেয়। বিবাহ বরের গৃহে অল্পাধিক হয়। কাজেই একমাত্র কন্যাধারী দল চীনে দেখা যায়—বরষাত্রী হইবার নিমন্ত্রণ চীনা সমাজে আর নাই।

বিবাহবেশে কন্যা পাঙ্কীতে করিয়া বরের গৃহে উপস্থিত হইলে বর স্বয়ং আসিয়া পাঙ্কীর দ্বাব উন্মোচন করে। এই তাহাদের প্রথম দেখা বা “শুভদৃষ্টি”। তাহার পর উভয়ে যথাস্থানে গমন করিয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রজ্জলিত বাতির সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বসে। এইখানে একজোড়া রাজহংস ও রাজহংসীর সম্মুখে বর জল ঢালিতে থাকে। চীনাদের বিবেচনায় এই পক্ষীযুগল দাম্পত্যপ্রেমেব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এইজ্ঞাত কন্যা পিতৃগৃহ হইতে এই যুগলকে সঙ্গে লইয়া আসে। ইহাদেব সম্মুখে বর ও কন্যা পরস্পরের নিকট চিরজীবনের জ্ঞান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তাহার পর বরের সম্মুখে কন্যা হাঁটু পাতিয়া মস্তক অবনত করে—বরও শেষে কন্যার নিকট হাঁটু পাতিয়া মস্তক অবনত করে। জীস্বামীর সাম্য এইরূপে প্রদর্শিত হয়।

চীনাবিবাহের শেষ অনুষ্ঠান পিতৃপুরুষগণের সমাধি-মন্দিরে অথবা স্মৃতিফলকের সম্মুখে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের পিতা হাঁটু পাতিয়া পূর্বপুরুষগণকে জানাইয়া দেন যে পরিবারের ভিতর এক নূতন ব্যক্তির আমদানি হইল। অবশেষে বর ও কন্যা স্মৃতিফলকের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া

বসে। বিবাহের চারি পাঁচ দিন পরে স্বামী স্ত্রীকে লইয়া স্বপ্তগৃহে যায়—তখন কন্যার পিতা এক ভোজ দিয়া থাকে।

চীনা রমণীর আদর্শ একখানা প্রাচীন চীনাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। “The Spirit of the Chinese People” গ্রন্থে অধ্যাপক কু-হুং-মিঙ্ এই আদর্শ বিবৃত করিয়াছেন। নব্য ইয়োরোপ-আমেরিকার নবীনতম সমাজে রমণীর আদর্শ যাহা, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবর্ষের লোক কু-হুং-মিঙের বিবৃত প্রাচীন চীনা আদর্শ সহজেই বুঝিতে পারিবে—যে-কোন প্রাচ্য মানবের পক্ষেই ইহা বুঝা সহজ। এমন কি ইয়োরোপ-আমেরিকার লোকেরাও কিছুকাল পূর্ব পর্য্যন্ত রমণীজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ ধারণাই পোষণ করিত—বস্তুতঃ বর্তমান কালেও পাশ্চাত্যদেশের বহু নরনারী এই ধরণের রমণীই পছন্দ করিয়া থাকে।

কু-হুং-মিঙের চরম মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

“The chief end of a woman in China is not to live for herself, or for society; not to be a reformer or to be president of the ‘Woman’s Natural Feet Society’; not to live even as a saint or to do good to the world; the chief end of a woman in China is to live as a good daughter, a good wife and a good mother.”

জার্মান অধ্যাপক মুন্থারবার্গ জার্মান সমাজে প্রচলিত রমণীজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ মতই প্রচার করিয়াছেন। জার্মানেবা রমণীকে প্রধানত “Hausfrau” (housewife) বা গৃহকর্ত্তী ভাবে দেখিতে পছন্দ করে। এই হিসাবে আমেরিকার নবীন রমণী-সমাজ জার্মান সমাজের বিপরীত।

কু-হুং-মিঙ্ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একখানা চীনা গ্রন্থ হইতে রমণীজীবনের কর্তব্য প্রদর্শন করিতেছেন—হান্-রাজবংশের আমলে প্যান্-কু নামক ঐতিহাসিকের ভগ্নী Lady Tsao এই গ্রন্থ রচনা করেন। পুস্তকের নাম “Lessons for Women।” অধ্যাপক কু বলিতেছেন “The Chinese feminine ideal, as it is handed down from the earliest times, is summed up in ‘Three Obediences’ and ‘Four Virtues.’”

গ্রন্থকর্তার মতে চারি প্রকার লক্ষণ সমন্বিত হইলে নারীকে গুণবতী বলা যায়। এই চারিগুণের নাম—

(১) Womanly character বা নারীস্থলভ নব্রতা

ও সংঘম

(২) Womanly Conversation বা নারী-শোভন শিষ্টাচার

(৩) Womanly appearance বা নারী শোভন বেশবিশ্রাস

(৪) Womanly work বা নারীস্থলভ গৃহকাৰ্য

আদর্শ রমণীর আর তিন প্রকার লক্ষণ সম্বন্ধে গ্রন্থকর্তী নির্দেশ করিয়াছেন—“When a woman is unmarried, she is to live for her mother, when married she is to live for her husband, and as a widow she is to live for her children.” ভারতবাসী এই আদর্শে নিজের গৃহস্থ ব্যবস্থাই পাইবে—এবং চীনা জাতিকে নিজের অন্তবদ্ধ আত্মীয় বিবেচনা করিবে সন্দেহ নাই।

চীনা সমাজে- বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ভাবতে ও চীনে এই বিষয়েও ঐক্য আছে।

সমাজজীবন আগামী ২০, ২৫ বা ৫০ বৎসরের ভিতর ইয়োরোপ-আমেরিকার এবং এশিয়ার কোন্ দিকে অগ্রসর হইবে তাহা আলোচনা করিতেছি না। সমাজ, পরিবার, বিবাহ, রমণীজীবন, ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন্ আদর্শ শ্রেষ্ঠ তাহাও আলোচনা করিতেছি না। মোটের উপর, এই মাত্র বুলিতেছি যে, ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও চীনারা এবং ভারতীয় নরনারী একই পবিবারের অন্তর্গত। আমাদের ত্রিণ কোটি লোক এবং চীনের চল্লিশ কোটি লোক বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া একই আদর্শে ছনিয়ায় চলাফেরা করিয়াছে। সহজভাবে চীনা ও হিন্দুদের জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিলেও ১০ কোটি নরনারীকে এক সভ্যতার অন্তর্গত বিবেচনা করিতে বিশেষ কল্পনার আবশ্যক হয় না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বাঁকুড়ায় ইংরেজীশিক্ষার প্রথম

প্রবর্তনের বিবরণ

অনেক প্রাচীন বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া না থাকিলে, কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। বাঁকুড়াতে ইংরেজী শিক্ষা কিরূপে প্রথমে প্রবর্তিত হয়, তাহা আমার পিতৃদেব ৬ হরিচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। আমি কেবল তাহা শুনিয়াই নিশ্চিত ছিলাম না: ‘সঙ্গে-সঙ্গে তাহার নোট করিয়াও লইয়াছিলাম। নোটগুলি ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহা “প্রবাসী”তে প্রকাশিত করিলাম। আশা করি, বাঁকুড়াবাসীগণ সাগ্রহে এই বিবরণ পাঠ করিবেন। “প্রবাসী”র পাঠকসাধারণও ইহা পাঠ করিয়া অশ্রুতিবর্ষপূর্বে বাঙ্গলাদেশের একাংশে লোকশিক্ষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা জানিতে পারিবেন।

এস্থলে পিতৃদেবের যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাৎকালিক বর্তমান জেলার অন্তর্গত কোতুলপুর গ্রামে ১২৩৫ সালের মাঘমাসে (ইং ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) ইহার জন্ম হয়। কোতুলপুর এখন বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ও বাঁকুড়া সহরের পূর্বদিকে প্রায় ১৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ব্যবসায় উপলক্ষে ইহার পিতা ৬ ঠাকুরদাস দাস বাঁকুড়া সহরের পশ্চিমপ্রান্তে নতুন-চাঁচী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামের পূর্বভাগে অনতিদূরে বর্তমান ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ অবস্থিত। অষ্টম বর্ষে পিতৃদেব কোতুলপুর হইতে বাঁকুড়ায় আসেন। কোতুলপুরেই ইহার বিদ্যারম্ভ হয়; পরে বাঁকুড়ায় আসিয়া ইনি কিছুদিন গৃহে জৈনিক শিক্ষকের নিকট বাঙ্গলা ও ফার্সি পড়েন, এবং একটি টোলের ছাত্রের নিকট মুন্সবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ ও অমরকোষ অভিধান অভ্যাস করেন। তৎপরে বাঁকুড়ার বাঙ্গলা-স্কুলে কিছু দিন পড়িয়া, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ইং ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ইনি জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া ও বৃত্তিলাভ করিয়া সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন। তৎপরে, বাঁকুড়া গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া প্রায় পনের বৎসর কাল যোগ্যতাব



হরিশচন্দ্র দাস।

সহিত শিক্ষকতা করেন। ইঁহার অনেক প্রসিদ্ধ ছাত্রের নিকট ইঁহার চমৎকার অব্যাপনা-প্রণালীর প্রশংসা শোনা যায়। দেগপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রব রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও ইঁহাব অত্যন্ত ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত এবং জুনিয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষাব পরিবর্তে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হইলে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইঁনি রাসবিহারী-প্রমুখ পবীক্ষার্থী ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া হুগলীকেন্দ্রে গমন করেন। পথে যাইতে-যাইতে ছাত্রগণের সহিত পরীক্ষার্থীরূপে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে ইঁহাব সঙ্কল্প হয়। ইঁনি ছাত্রগণকে ইতিহাস পড়াইতেন না; স্থতরাং এই বিষয়টি তাঁহার ভাল জানা ছিল না। রাসবিহারী বাবু শিক্ষক-মহাশয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পথে যাইতে-যাইতে ইঁহার নিকট ইতিহাসের প্রধান-প্রধান ঘটনাপত্রের আবৃত্তি করেন। পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া কলেজের অধ্যক্ষের অমুমতি লইয়া, ইঁনি ছাত্রগণের সহিত পবীক্ষা দিতে বসিয়া যান। এই পরীক্ষায় ইঁনি প্রথম

বিভাগে সমুত্তীর্ণ হন। পরে ইঁনি শিক্ষকরূপে এফ-এ পরীক্ষাতেও উপস্থিত হইয়া প্রথম বিভাগে সমুত্তীর্ণ হন। বি-এ পরীক্ষাব জ্ঞাত ইঁনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু কোনও অনিবার্য কারণে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ইঁহার এরূপ প্রগঢ় অমুরাগ ছিল যে, পেনশন্ লইয়াও বৃদ্ধবয়সে ইঁনি অবসরক্রমে পুস্তক পাঠ করিতেন। পড়িয়া-পড়িয়া ইঁহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। কোনও নূতন ইংরেজী সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তিনি তাহা আনাইতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমি যখন বি-এ পরীক্ষার জ্ঞাত প্রস্তুত হই, তখন পিতৃদেব পেনশন্ লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন “আমার বি-এ পরীক্ষাটা দেওয়া হয় নাই। যদি কর্তৃপক্ষেরা আমাকে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অমুমতি দিতেন, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত বি-এ পরীক্ষা দিতাম!” বৃদ্ধ বয়সেও ইঁনি এমনই বিদ্যাভ্রাঙ্গী ছাত্র ছিলেন!

বাকুড়া গভর্নমেন্ট স্কুলে শিক্ষকতা কবিত্তে-কবিত্তে ইঁনি স্কুলসমূহের ডেপুটি-ইন্সপেক্টার নিযুক্ত হইয়া মেদিনীপুরে যান। সেখানে কয়েক বৎসর কার্য করিয়া কিছুদিনের জ্ঞাত বর্ধমান যান। বর্ধমান হইতে আবার মেদিনীপুরে আসেন। সেখান হইতে বদলী হইয়া রাঁচিতে প্রায় দশ বৎসর কাল থাকেন। মেদিনীপুরে থাকা কালে ইঁনি সাঁওতালী ভাষায় ও রাঁচিতে থাকা কালে ইঁনি কোল মুণ্ডারী ওরাঁও প্রভৃতি অনার্য ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং এই-সমস্ত অনার্য জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জ্ঞাত প্রভূত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারই উদ্যোগে এই অনার্যজাতিগণকে শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্ত, গভর্নমেন্ট কর্তৃক শত শত পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইঁনি উক্ত ভাষাসমূহে অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন। ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যেও ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার ইংরেজী আবৃত্তি শুনিতে চমৎকৃত হইতে হইত। ইংরেজী উচ্চারণও এরূপ বিশুদ্ধ ছিল যে, স্ত্রী হেনরী হ্যারিশন্ যখন স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টার ছিলেন, তখন ইঁহার সহিত একদিন আলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন “But for your occasional hesitations, one who hears you would

take you for an Englishman.” ইং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পেনশন্ লইয়া ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রায় ২৪ বৎসর কাল পেনশন্ ভোগ করিয়া ইনি ৮২ বৎসর বয়সে ১৩১৬ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোকগমন করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই সদাচারী, মিতাচারী, ও স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, এবং পুঙ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা সংকার্য্যের অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে ইহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল বটে; কিন্তু সম্ভব বৎসর বয়সেও ইনি গ্রীষ্মকালে একদিন অশ্বপৃষ্ঠে ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন।

ইহার বাল্যকালে বাঁকুড়া-জেলায় লোকশিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে ইনি প্রায়ই গল্প করিতেন। তাহাতে তাঁহার বাল্যকাহিনীও কীর্ষিত হইত। তিনি তাঁহার ছাত্র-জীবনের বৃন্তান্ত আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যথা-সম্ভব তাঁহারই কথায় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

“কোতুলপুরে আমার জন্ম হয়। ইহা একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত, এখানে অনেক গন্ধবণিক্ বাস করিতেন। সেকালে লেখাপড়ার চর্চ্চা বেশী ছিল না। ছেলেরা পাঠশালায় কেবল সামান্য লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কসিতে শিখিত। কেহ কোনও হস্তলিখিত পুঁথি পড়িতে পারিলেই বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য হইত।

“আমি কোতুলপুরে শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর মন্দিরের মণ্ডপে শিব-সরকারের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করি। তখন মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। ভূমিতে খড়ির সাহায্যে দাগা বুলাইয়া আমাদের অক্ষর-পরিচয় হইত। মাটিতে দাগা বুলানো শেষ হইলে, আমরা তালপাতায় ‘ক খ’ লিখিতাম। পরে ‘ক ঙ্গ’ ও তৎপরে ‘সিদ্ধিরস্ত্র অ আ ই ঈ’ লিখিতাম। তালপাতায় হাতের লেখা পাকা হইলে, আমবা কলাপাতায় লিখিতাম এবং সর্ব্বশেষে কাগজে লিখিতাম। তখন প্লেট ছিল না। তন্ত্রিতে আমরা অঙ্ক কসিতাম। একটা লোহার কলমে কালী মাখাইয়া তন্ত্রিতে লিখিতাম। ছোট অঙ্ক হইলে, তন্ত্রিতে বা-পাতায় তাহা কসিতাম। বড় অঙ্ক হইলে, মাটিতে খড়ি পাতিয়া তাহা কসা হইত।

“পুস্তকের মধ্যে আমাদের ‘অষ্টশকী’ ‘শকুন্তল’ ও পরে ‘অমরকোষ’ পড়িতে হইত। এই-সকল পুস্তক পড়া

হইলে ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারত’ ও ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’ প্রভৃতি পড়া হইত। মুদ্রিত পুস্তক না থাকায়, হস্তলিখিত পুঁথিই পড়িতে হইত। যাহার পুঁথির প্রয়োজন হইত, গুরু-মহাশয় তাহাব জন্য পুঁথি লিখিয়া দিতেন, এবং পুঁথির আকারানুসারে দুই আনা কিম্বা চারি আনা পয়সা পারিশ্রমিক লইতেন।

“বাল্যকালে আমাদের মাথায় তুঁটি বাঁধা থাকিত। আমরা পাত-তাড়ি বগলে করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে দোয়াত বুলাইয়া পাঠশালায় যাইতাম। আমাদের বসিবার আসন, চট বা মাহুর, পাত-তাড়ির সঙ্গে জড়ানো থাকিত। যাহাদের বাড়ী নিকটে তাহার বাড়ীতে জলখাবার থাইতে যাইত; যাহাদের বাড়ী দূরে, তাহার ‘জলপান,’ অর্থাৎ মুড়ি, চিঁড়ে ও গুড় প্রভৃতি বাঁধিয়া আনিত, এবং জলখাবারের ছুটি হইলে তাহা খাইত।

“বাল্যকাল হইতেই আমি অঙ্ক কসিতে ভাল বাসিতাম। মানসারেও আমি নিপুণ ছিলাম। সন্ধ্যার পর গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গিয়া আমরা মৌখিক অঙ্ক অভ্যাস করিতাম। ইহাকে তাৎকালিক ভাষায় ‘ভাক-বলাবলি’ বলিত। একজন একটি অঙ্কের প্রশ্ন করিত। অমনই অপর সকলে মনে মনে সেই অঙ্ক কসিয়া তাহার উত্তর বলিত।

“সেকালে কোতুলপুর অঞ্চলে ভাকাত ও লেঠেলের অতিশয় ভয় ছিল। কোতুলপুরের নিকটেই বড় বড় মাঠ। এক-একটি মাঠ তিন ক্রোশ চারি ক্রোশ দীর্ঘ। এই মাঠগুলিকে ‘তিন ক্রোশী মাঠ’ ‘চার ক্রোশী মাঠ’ বলিত। সেই মাঠের মধ্যে বা নিকটে কোনও লোকালয় ছিল না। দিনেব বেলাতেই কোনও ব্যক্তি একাকী সেই-সমস্ত মাঠ পার হইতে সাহস করিত না। দস্যুরা পথিককে একাকী পাইলে, তাহার প্রাণসংহার করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। ভাগবত খাঁয়ের দীঘী নামে এখনও একটি বড় দীঘী আছে। দস্যুরা সেই দীঘীর চারিদিকে চাপ-জাল লইয়া মাছ-ধরিয়া বেড়াইত। পথিক তাহাদিগকে জেলে মনে করিয়া দীঘীর ঘাটে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া খাবার খাইত, এমন সময়ে সহসা কোনও জেলে মাছ ধরিবার ছলে নিকটে আসিত এবং পথিক একটু অন্তর্কিত থাকিলে, চাপধালে তাহাকে চাপিয়া

মারিয়া ফেলিত। জ্বলে ধ্বংস কাতলা কই প্রভৃতি বড় বড় মাছ ধরা ও মারা পড়ে, দস্যুরাও সেইরূপে জালদ্বারা মানুষ মারিয়া ফেলিত। এই কারণে, দস্যু কর্তৃক কোনও মানুষ নিহত হইলে, লোকে ঐ অঞ্চলের তাৎকালিক ভাষায় বলিত, ‘কাতলা পড়িবাছে।’ ‘কাতলা পড়া’র কথা শুনিতেই লোকে শিহরিয়া উঠিত। একদিন আমরা সন্ধ্যার পর গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বসিয়া ডাক-বলাবলি করিতেছি, এমন সময়ে অদূরে একটা মাঠের দিক হইতে এক ভয়ানক আর্ন্তনাদ শুনিতে পাইলাম। ‘বাপ্‌রে, মলুম্‌রে’ শব্দ শুনিবামাত্র আমাদের গায়েব রক্ত জল হইয়া গেল। আমরা সকলেই নীরব ও উৎকর্ণ হইয়া সেই দারুণ আর্ন্তনাদ শুনিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর্ন্তনাদ ধামিয়া গেল। গুরুমহাশয় বলিলেন ‘মাঠে একটা কাতলা পড়ল রে!’ আমরা সকলেই সেই কথা শুনিয়া ভয়ে হতজ্ঞান হইলাম ও তৎক্ষণাৎ বাড়ী চলিয়া গেলাম। পরদিন প্রাতে কোঁড়ুলপরবশ হইয়া কতিপয় বালক ও লোকের সহিত সেই মাঠে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, একটা প্রকাণ্ড জোয়ান মাঠে রক্তাক্তদেহে মরিয়া পড়িয়া আছে। বেচারী ডাকাতদের সঙ্গে যে অনেকক্ষণ যুদ্ধিয়াছিল, তাহা মাটিতে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু সে কতক্ষণ একাকী লড়িবে? গ্রাম নিকটে থাকিলেও কেহই তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয় নাই! মাঠে আর্ন্তনাদ শুনিতেই লোকে ভয়ে নিস্তব্ধ হইত, এবং দ্বার বন্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে ঘাইত! সেকালে পথিকগণের জীবন এইরূপ বিপদদঙ্কল ছিল।

“আমার পিতা বাঁকুড়াতে থাকিয়া ব্যবসা করিতেন। তাঁহার নিকটে আমার বড়দাদা এবং মেজদাদাও ছিলেন। বড়দাদার অরবিকারের সংবাদ পাইয়া জননীদেবী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাঁকুড়ায় যান। আমি কোতুলপুরের বাটীতে পিসীমার কাছে থাকিলাম। মা বাঁকুড়ায় গিয়া আর কোতুলপুরে আসিলেন না। তখন আমাকেও বাঁকুড়ায় লইয়া যাইবার জন্ত লোক আসিল। যখন আমার বয়স আট বৎসর, তখন আমি বাঁকুড়ায় আসি।

“নতনচটী গ্রামে তখন পাঠশালা ছিল না। এই

কারণে, আমাদেরকে গৃহে পড়াইবার জন্ত পিতাঠাকুর মহাশয় জনার্দীন সরকার নামে একটি কায়স্থকে নিযুক্ত করিলেন। সকলে ইহাকে ‘দনাই সরকার’ বলিয়া ডাকিত। তাৎকালিক বিদ্যার হিসাবে, ইনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বাংলা ভাষা ছাড়া ইনি ফার্সি ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ফার্সি না জানিলে সেকালে কেহ সম্মান বলিয়া গণ্য হইতেন না। আদালতেও ফার্সিভাষা প্রচলিত ছিল। উকীল মোক্তারেরা ফার্সিতে বক্তৃতা করিতেন; ফার্সিতে আর্জি, জবাব, জবাব-উল্-জবাব ও হদ জবাব লিখিতেন; এবং হাকিমেরাও ফার্সিতে রায় লিখিতেন। সুতরাং সেকালে ফার্সি না জানিলে, বিষয়-কর্ম পরিচালনা করা দুর্ব্বল হইত। আমরা দনাই সরকারের নিকট বাংলাভাষা ও অক্ষরাজ্ঞ শিক্ষা করা ব্যতীত ফার্সিভাষাও শিক্ষা করিতাম। মেজদাদা ও আমি গোলেস্তাঁ পর্যন্ত পড়িয়াছিলাম। দনাই সরকারের নিকট আমরা চারি সহোদর ব্যতীত গ্রামের আরও দুই চারিটি বালক পড়িত। দনাই সরকার আমাদেরকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া ব্যতীত আমাদের কারবারের খাতাপত্রও লিখিতেন।

“দনাই সরকারের নিকট পড়িতে-পড়িতে আমি স্বহস্তে অনেক পুঁথি লিখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে ‘দাতাকর্ণের পালা’ ও ‘প্রহ্লাদ-চরিত্রের’ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পুঁথিগুলি তাঁহার নিকট পড়িতাম। পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্যবসা আমার ভাল লাগিত না। আমাদের গ্রামের একটি ব্রাহ্মণ-যুবক বাঁকুড়ায় টোলে পড়িতেন। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার পাঠাভ্যাস শুনিলাম। তিনি যাহা অভ্যাস করিতেন, আমিও তাহা অভ্যাস করিতাম। এইরূপে আমি মুক্তবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ ও অমরকোষ অভিধান মুখস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাবা এ-সব পছন্দ করিতেন না।

“দনাই সরকারের নিকট পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামগোপাল বাঁকুড়াতে সীতানাথ চক্রবর্তীর গভর্ণমেন্ট-সাহায্য-প্রাপ্ত পাঠশালা বা বাঙ্গলা স্কুলে পড়িতে যাইতাম। স্কুলটি আমাদের বাড়ী হইতে

এক মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত ছিল। নূতনচটী ও বাঁকুড়া সহরের মাঝে রাস্তার উভয় পার্শ্বে যে বড় বড় মাঠ আছে, তখন সেই মাঠগুলি শাল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। মাঝে মাঝে জঙ্গল হইতে বগা জন্তু ও বাহির হইত; এই জঙ্গল স্থলে যাইতে আসিতে আমাদের বড় ভয় হইত।

“আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া স্কুলে যাইতাম। সঙ্গে খাবার লইয়া যাইতাম। বেলা দশটার সময়ে স্কুলের ছুটি হইলে, আমবা পুস্তকের ধাবে বসিয়া খাবার খাইয়া বাড়ী আসিতাম। আবার ভাত খাইয়া চারিটার সময় স্কুলে যাইতাম। বৈকালে আমাদের চিঠিপত্র লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই বাঙ্গলা স্কুলেই মুদ্রিত পুস্তক প্রথম পাঠ করি। সেই পুস্তকের নাম ‘মনোরঞ্জন’। স্কুলে সেই পুস্তক ও বাঙ্গলা ব্যাকরণ পড়িতাম। বাঙ্গলা স্কুলে বেঞ্চ ছিল না। আমরা বাড়ী হইতে নিজ নিজ আসন লইয়া গিয়া স্কুলে বসিতাম।

“বাঁকুড়ার সুবিখ্যাত ডাক্তার চীক্ (Dr. Cheek) ও জর্জ্ গোল্ডসবারি. (Mr. Goldsbury) সাহেবের যত্নে বাঁকুড়ায় একটি ইংরেজী ক্রী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। যাদবেজ মুখোপাধ্যায় এই স্কুল আরম্ভ করেন। মাজিষ্ট্রেট জর্জ্ লক্ (George Locke) ক্রী স্কুলে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইতেন। তখন আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্ত ইংরেজ রাজপুরুষগণেব এমনই যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহ ছিল! আমি গণিতে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলাম। বাঙ্গলা স্কুলে যাইবার আসিবার সময় ইংরেজী স্কুলের ছাত্রেরা আমাদের ধরিত ও অঙ্ক কসিতে বলিত। আমি কঠিন কঠিন অঙ্কও কসিয়া দিতাম। কিন্তু একদিন একটা অঙ্ক কসিতে ভুলিয়াছিলাম বলিয়া সীতানাথ চক্রবর্তী আমাকে অতিশয় প্রহার করিয়াছিলেন।

“কিছু দিন পবে বাঙ্গলা স্কুল ছাড়িয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ব্যবসা শিখিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহা আমার ভাল লাগিত না। সানবান্দা-গ্রামবাসী মধুসূদন মুখোপাধ্যায় আমাদের গ্রামে তাঁহাদের কারবাবের কুটীতে থাকিয়া ক্রী স্কুলে পড়িতেন। মধুসূদন যখন ইংরেজী পড়িতেন, তখন আমি তাঁহার কাছে বসিয়া তাহা শুনিতাম; কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতাম। তিনি যাহা

পড়িতেন তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছুই বলিতেন না। কখনও কখনও বিরক্ত হইয়া তিনি বলিতেন ‘তুমি ইহার কি বুঝিবে হে?’ আমি বলিতাম ‘ভাই, তুমি যদি বুঝিতে পার, তাহা হইলে আমি পারিব না কেন? কি পড়িতেছ, তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া বল না?’ একদিন মধুসূদন আমার আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন ‘হরি, তুমি ইংরেজী পড়িবে?’ আমি বলিলাম ‘পড়িব।’ সেই দিন মধুসূদন আমাকে ডাক্তার চীক্ সাহেবের কাছে লইয়া গেলেন। চীক্ সাহেব আমার বয়স জিজ্ঞাসা কবিলেন। আমি বলিলাম ‘বার তের বৎসর হইবে।’ সেই দিনেই আমি ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হইলাম।

“আমি ইংবেজী স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়াছি শুনিয়া বাবা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন। যাহাতে আমি ব্যবসা শিক্ষা করি, তার জগাই তাঁহার চেষ্টা। কিন্তু লেখাপড়া শিখিবার জন্ত আমার আগ্রহ দেখিয়া, তিনি আমাকে তখন বড় একটা কিছু বলিলেন না। পরন্তু আমাকে নিরস্ত করিবার জন্ত, পুস্তক ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে তাহার মূল্য দিতেন না, এবং ছুটির সময়ে আমাকে ব্যবসা শিখিতে বলিতেন। দিনের বেলায় আমি তালবনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া পুস্তক পড়িতাম, এবং রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে প্রদীপ জালিয়া পাঠ অভ্যাস করিতাম। রাত্রিতে উঠিয়া পড়িবার সময় অত্যন্ত ঘুম পাইত। যাহাতে আমি ঘুমাইয়া না পড়ি, তজ্জন্ত মাধ্যম একটা টিকি রাখিয়া ঘরের মটকার সহিত সংলগ্ন একটা দড়ির সহিত তাহা বাঁধিয়া রাখিতাম। যখন ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতাম, তখন টিকিতে টান পড়িত, আর এমনই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত।

“আমাদের ইংরেজী প্রথম পুস্তকের নাম ছিল Murray’s Spelling। আমি মধুর কাছে পড়া বলিয়া লইতাম ও পরিশ্রম সহকারে তাহা অভ্যাস করিতাম। তখন ক্রী স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন কালীচরণ দত্ত, ও সেকেন্ড মাষ্টার ছিলেন শ্রীমানন্দ মুখোপাধ্যায়। ময়না-পুরের তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রেরা, অর্থাৎ বরদানন্দ গঙ্গানন্দ এবং মহেশানন্দও ক্রী স্কুলে পড়িতেন। আমাদের সঙ্গে সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং গঙ্গানারায়ণ বারিক পড়িতেন। নব্বয় পণ্ডিত আমাদের হিতোপদেশ পড়াইতেন।

“ইং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ার গভর্ণমেন্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। এই স্কুল প্রতিষ্ঠাব কিছুদিন পরে ক্রী স্কুল ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রী স্কুলে আমি দুই তিন বৎসবে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিলাম। পুস্তকাভাবে আমি কোনও সহ-পাঠীর পুস্তক চাহিয়া আনিতাম, এবং সমস্ত রাজি জাগিয়া তাহা পড়িয়া ফেলিতাম, অথবা নকল করিয়া লইতাম। সকলে গভর্ণমেন্ট স্কুলে ভর্তি হইলে, আমিও সেখানে ভর্তি হইলাম। গভর্ণমেন্ট স্কুল সর্বপ্রথমে সিপাহী হাসপাতালে স্থাপিত হয়। আমাদিগকে মাসিক আট আনা করিয়া বেতন দিতে হইত। স্কুলের হেড-মাষ্টার হইলেন, নবীনকৃষ্ণ সরকার। ইহার পরে বীটসন সাহেব (Mr. Beetson), ওয়াটসন সাহেব (Mr. Watson) ও স্পীয়ার সাহেব (Captain Spear) হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। আমি গভর্ণমেন্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলাম, এবং প্রায় তিন বৎসর পড়িয়াছিলাম। স্পীয়ার সাহেব সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু অতিশয় মন্যপান করিতেন। তিনি জাহাঙ্গীর কাপ্তেন ছিলেন।

“ডাক্তার জনসনের একটি ছোট অভিধান আমার একমাত্র সম্বল ছিল। আমি এই অভিধানটি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি যখন স্কুলে ভর্তি হই, তখন ক্লাসের সকল বালকের অপেক্ষা আমার বয়স অধিক ছিল। এই কারণে আমি ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া নিজ ক্লাসের পাঠ্য-ভ্যাস করা ব্যতীত উপরের ক্লাসেরও পুস্তকগুলি কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পড়িয়া ফেলিতাম। আমি অনেক রাজি জাগিয়া পড়িতাম। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্ত আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। শিরঃপীড়ায় মাথায একরূপ ভয়ানক যন্ত্রণা হইত যে মনে হইত তাহা যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আমি একথানা চাদর কপালে শক্ত করিয়া বান্ধিতাম এবং সেই ভয়ানক যন্ত্রণা সম্বোধন করিয়া পড়িতাম। বাঘ হাতে আমি কপাল টিপিয়া ধরিয়া ভাত খাইতাম।

“আমাদের সঙ্গে কাক্টার যত্নাথ. রায়, ইনি পরে ইঞ্জিনিয়ার হইয়া গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি পাইয়াছিলেন), রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইনি পরে হাইকোর্টের Translator হইয়াছিলেন), গঙ্গানারায়ণ বারিক (ইনি পরে বাঁকুড়া গভর্ণমেন্ট স্কুলের শিক্ষক

হইয়াছিলেন), দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি পরে কলিকাতার Collector এবং ‘রায় বাহাদুর’ ও C. I. E. উপাধিলাভ করিয়াছিলেন), হাড়গাসডার গদাধর রায় ও নন্দকুমার রায় প্রভৃতি পড়িতেন। আমরা যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি, তখন স্কুল ইন্সপেক্টর লজ্ সাহেব (Mr. E. Lodge) স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। দুর্গাপতি, গদাধর ও নন্দকুমার ইন্সপেক্টর-সাহেবকে দেখিয়া ক্লাসে থুথু ফেলিয়াছিল ও হাসিয়াছিল। তাহাতে সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং ইহাদের পরীক্ষা করিয়া অসন্তুষ্ট হন। পবে ইহাদিগকে unmannerly (বে-আদব) বলিয়া স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি ইহাদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার বেশ স্মরণ আছে। তিনি বলিয়াছিলেন “These boys should be weeded out from the School.” স্কুল ছাড়িয়া দুর্গাপতি গৃহে পাঠ করিয়া পরিশেষে বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। গদাধরও উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

“আমি ক্লাসের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইতাম, এবং অনেক মূল্যবান পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছিলাম। Dr. Richardson's Selections from British Poets নামক দুই ভলুম পুস্তক ও Addison's Spectator ও অগাধ অনেক পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছিলাম। আমি পুস্তকগুলি আগা-গোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম।

“বাঁকুড়ার গভর্ণমেন্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, প্রথম ব্যাচে (batch) যত্নাথ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এবং বরদানন্দ ও গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর, আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্ত ব্যস্ত হই। হেড-মাষ্টার আমাকে আর এক বৎসর পরে পবীক্ষা দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার আগ্রহাতিশয্যে তিনি পরিশেষে আমাকে পরীক্ষা দিতে অগ্ৰমতি দিয়াছিলেন। আমি হেড-মাষ্টারের পরামর্শ গ্রহণ করিলে ভালই করিতাম। কেননা আমি দেড় নম্বরের জন্ত পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। সেই বৎসর মহেশচন্দ্র চৌধুরী (ইনি পরে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন) এবং হারানচন্দ্র মৈত্র

(ইনি পরে মুর্শিদাবাদের নবাবের হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল হেড-মাষ্টার হইয়াছিলেন), কেবল এই দুইটি ছাত্রই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮১০-১১ খৃষ্টাব্দে যে পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় আমি-উত্তীর্ণ হই ও প্রথম স্থান অধিকার করি। আমার সঙ্গে যদুনাথ রায়, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি মাসিক ৮ টাকা করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলাম।

“ছুনীর স্বাক্ষরশিপি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদের পাঠ্য ছিল। যথা :—ইংরেজী সাহিত্যেব কোনও বিশেষ পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু আমরা Goldsmith's Essays and Vicar of Wakefield, Addison's Spectator and Dr. Richardson's Selections from British Poets এই পুস্তকগুলি পড়িয়াছিলাম। ব্যাকরণের মধ্যে Lennie's Grammar পড়া হইত। ইতিহাসের মধ্যে Goldsmith's History of Rome, History of Greece and History of England, Marshman's History of India, and Stewart's History of Bengal এই পুস্তকগুলি পড়িয়াছিলাম। Crombe's Etymology and Syntaxও পড়া হইয়াছিল। অঙ্কের মধ্যে Arithmetic জ্যামিতির First Six Books এবং Algebra up to Property of Numbers এইগুলি পাঠ্য ছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে যত্নাঙ্ক তর্কপঞ্চানন প্রণীত ‘প্রবোধচল্লিকা’ নামক পুস্তক আমাদের পাঠ্য ছিল।

“আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিনীয়াব স্বাক্ষরশিপি পড়িবার জন্ত ব্যগ্র হইলাম। কলিকাতায় হিন্দুকলেজ, হুগলীতে হুগলী কলেজ, এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর কলেজ এই তিনটি কলেজই তখন প্রসিদ্ধ ছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্য তখন ভাল ছিল না। চারিদিকে খোলা ড্রেন; তাহা হইতে এক বিজাতীয় দুর্গন্ধ বাহির হইত ও সর্বত্র মাছি ভ্ৰম্মন করিত। রাত্রিতে মশারও ভয়ানক উপদ্রব ছিল। বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা না থাকায়, আমাদের দেশের লোকেরা গঙ্গার লবণাক্ত জল পান করিয়া উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইত ও অনেকে মারা

পড়িত। এই কারণে কলিকাতার হিন্দুকলেজে পড়িতে যাওয়ার মত হইল না। যে কারণে কলিকাতায় যাওয়া হইল না, সেই কারণে হুগলীতেও যাওয়া হইল না। অগত্যা কৃষ্ণনগর কলেজেই অধ্যয়ন করিবার সঙ্কল্প করিলাম।

“গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর বাঁকুড়া হইতে বহুদূরে অবস্থিত। বাঁকুড়া হইতে ক্রমাগত ৭৮ দিন হাঁটিয়া গেলে, তবে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হওয়া যাইত। তখন রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই। যানের মধ্যে কেবল গো-যান ও পাকী। পাকী চড়িয়া কৃষ্ণনগরে যাওয়া আমাদের অবস্থার বহির্ভূত; গোযানেরও ভাড়া অত্যধিক ছিল। বিশেষতঃ গোযান ভাড়া পাওয়া যাইত না, কেননা কোনও গাড়োয়ান এত দূরদেশে একাকী যাইতে চাহিত না। পথে দস্যভয় ছিল, এবং পথও সর্বত্র পাকা ও ভাল ছিল না। অগত্যা আমরা পদব্রজেই কৃষ্ণনগর যাইতাম। কাকট্যাতে গিয়া যদুনাথ রায়কে সঙ্গে লইতাম। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক-একজন মুটিয়া থাকিত। মুটিয়া আমাদের বিছানাপত্র ও পুস্তকের মোট মাথায় বহিয়া লইয়া যাইত। আমরা বাঁকুড়া হইতে বর্ধমানে যাইতাম। সেখানে কৃষ্ণনগর কলেজের জঠনক সহপাঠীকে সঙ্গে লইয়া অধিকা-কালনায় উপনীত হইতাম। এই স্থানে গঙ্গা সমুদ্রীর্ণ হইয়া আমরা কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইতাম।”

পিতৃদেব অতঃপর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ধমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলিয়া, আমি এই স্থানেই প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

কে বড়

ভক্তিশ্রমে বড়ী বলে “সেলাম তোমার ভাই সময়।

তোমার জন্ম আমার জন্ম, পুঞ্জিত তোমার ইচ্ছে হয়।”

“কণ্ড কি কথা!” বলে সময়, “কেবা জ্ঞাত মোর কদর?”

(সবাই) তোমায় দেখে আমার চেনে, তুমি আমার নওকো পর।”

আবু ছালে সৈয়দ মোহাম্মদ মোকাম্মার হোসেন চৌধুরী।

পরগাছা

(৩৫)

রাখাল ও মণিমালা পাহাড়পুরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে রাণী জগদ্ধাত্রীর এক-দূর-সম্পর্কের ভাই আসিয়া কর্তা হইয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে, তাহার নাম বহুবাহারী। সে আফিং গাঁজা গুলি চরস প্রভৃতি নেশা সম্বন্ধে অভ্যাস করিয়াছিল; এক্ষণে দিদির দৌলতে সেইগুলির চর্চায় সে বিশেষ রকম মনোযোগ দিয়াছে। রাজ্যবেশে ফিটফাট হইয়া সে নেশার চর্চা আর খুব লম্বা লম্বা হুকুম করে। সমস্ত জমিদারীর সেই কর্তা হইয়া বসিয়াছে। এবং তাহার জী চন্দনমণি অন্দরের কর্তা, সেই রাণী; রাণী জগদ্ধাত্রীর বেনামিতে অন্দরের সমস্ত কর্তৃত্ব সেই করিয়া থাকে। আর তাহাদের দুজনের মাঝখানে তাহাদের ছেলে কুবেরকে দাঁড় করাইয়া তাহারা তাহার এক হাত দিয়া সমস্ত জমিদারী ও অপর হাত দিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর পুত্রস্নেহ বেদখল করিবার চেষ্টায় আছে।

রাজা ধনেশ্বর মরিতে-না-মরিতে বহুবাহারী পুত্র-কলত্র লইয়া আপনার জীর্ণ ভাড়া তালপাতায়-ছাওয়া একমাত্র কুঁড়ে ঘরখানির মায়া একেবারে তাগ করিয়া ছুটিতে-ছুটিতে আসিয়া পাহাড়পুরে জমিয়া বসিয়াছে। অভিনাথ পুত্র কুবেরকে পোষ্যপুত্র করিয়া দিয়া তাহারাই রাজার জনক-জননী হইয়া প্রভুত্ব করিবে।

রাজা ধনেশ্বর মরিবার পূর্বে রাণী জগদ্ধাত্রীকে দত্তকপুত্র লইবার এক অমুহুতিপত্র দিয়া গিয়াছেন বলিয়া বহুবাহারী ঘোষণা করিয়া দিয়া পুত্রের ওসি হইয়া নিজেই রাজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার বীরস্বৈ এখন পাহাড়পুরের জমিদারী যায-যায়।

রাজা ধনেশ্বরের মৃত্যুর পর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট খবর লইতে আসিলেন রাজার কেহ ওয়ারিসান আছে কি না, রাজার কোনো উইল আছে কি না, জমিদারী কে চালাইবে।

বহুবাহারী রাজা ধনেশ্বরের পরিত্যক্ত কিংখাবের পোষাক পরিল, মাথায় জরির তাজ চড়াইল, পায়ে জরির জুতা দিল, কানে বীরবোলী, গলায় হার, হাতে বালা পরিল। কিন্তু কোনোটাই ঠিক মানানসই হইয়া গায়ে

বসিল না। তা হোক, সে স্বাধীন নৃপতি! সাদাসিধা পোষাক ত সে পরিতে পারে না! কিন্তু তাহার মহা সমস্ত উপস্থিত হইল, স্বাধীন নৃপতির তুচ্ছ ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুতে গিয়া দেখা করা উচিত কি না। দেওয়ান রাজন্য তাহাকে বুঝাইল যে ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাঁহার রাজ্যে অতিথি, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার সৌজন্তই প্রকাশ পাইবে, মানহানি হইবে না।

বহুবাহারী খুসী হইয়া বলিল—হাঁ হাঁ, যথার্থ বলেছেন মন্ত্রীমশায়। রাজমন্ত্রী! রাজবুদ্ধি! হবে না কেন? কিন্তু রাজকায়দার যেতে হবে মন্ত্রীমশায়! সম্মুখে দুজন দৌবারিক লাদা তরোয়াল নিয়ে যাবে, পার্শ্বে দুজন আনা-বরদার চলবে, পশ্চাতে দুজন শরীররক্ষী গোলন্দাজ যাবে; আর আমার সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ দিকে আপনি মহামাত্য যাবেন, আর বাম দিকে খাস খানসামা ঘনশ্যাম ওরফে বিহু সোনার ফরসীতে মুক্তার-ঝালর-দেওয়া জড়োয়া সরপোষ চড়াইয়া বহিয়া লইয়া চলিবে।

এই স্বাধীন নৃপতির অদ্ভুত বেশভূষা ও গ্রামভারী চাল-চলন দেখিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের হাস্ত রোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সাহেব তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনিই কি স্বর্গীয় রাজার জামাই?

বহুবাহারী বুক ফুলাইয়া গোঁপে চাড়া দিয়া বলিল—না, আমি জামাই নহি, আমি রাজশালক, রাণীর ভ্রাতা!

—আমি জানতে চাই যে রাজা কোনো উইল রেখে গেছেন কি না। যদি উইল না থাকে তবে রাজার মেয়েই ত রাণীর মরণোত্তর উত্তরাধিকারী হবেন। তা হলে রাণীর অভিভাবক তাঁর জামাতাই হবেন ত?

—সে কখনো হতে পারে না। এ স্বাধীন নৃপতির রাজ্য! কত্য়াকুলে রাজ্য যেতে পারে না! রাজার অমুহুতিপত্র আছে, রাণী দত্তকপুত্র নেবেন। আমার ছেলেই দত্তকপুত্র হবে, এবং সে সাবালগ না হওয়া পর্যন্ত আমিই তার ত্রায়-সম্মত অভিভাবক, আমিই রাজ্য রক্ষা করব।

—রাণীর কি মত আমি রাণীর নিজের মুখ থেকে শুনেতে চাই। আপনারা এইখানে থাকুন, রাণীকে খবর পাঠিয়ে দেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

বহুবাহারী উষ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—সে কখনো হতে

পারে না! স্বাধীন নৃপতির ভাষা, স্বাধীন নৃপতির ভাবী মাতা, কখনো পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হতে পারেন না!

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলিলেন—তিনি দরজায় পরদা ফেলে ওপারে থাকবেন, আমার মেম তাঁর কাছে থাকবেন, আমি এপার থেকে শুধু তাঁর মুখের কথা শুনে যেতে চাই।

বহুবাহারী রাজনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—মন্ত্রী, আপনার অভিপ্রায় কি?

—আজ্ঞে, হজুর যা বলছেন তাতে দোষ দেখি না।

বহুবাহারী ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জন করিয়া উঠিল—হজুর! এখানে আমি ছাড়া আর কে হজুর আছে!

রাজনাথ প্রমাদ গণিল। সে তাড়াতাড়ি ম্যাজিষ্ট্রেটকে ইংরেজিতে বলিল—মাপ করিবেন, ইহার নানাবিধ নেশা করিয়া মাথার একটু গোলমাল হইয়াছে।

বহুবাহারী হুঙ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অমাত্য, স্নেহ ভাষায় কি বললেন?

রাজনাথ কষ্টে হাসি গোপন করিয়া বলিল—হজুর, আমি বললাম যে সাহেব যখন রাজভৃত্য তখন প্রভু তাঁকে অন্তঃপুরে যেতে দিতে অস্বীকার করবেন না।

বহুবাহারী হাসিয়া-হাসিয়া গা ঢুলাইয়া বলিল—অমাত্য, আপনার বুদ্ধির তারিফ করি! রাজভৃত্য, রাজভৃত্য! রাণীব সঙ্গে ভৃত্যের দেখা করতে দোষ কি! হাঁ, সাহেব আপনি মেম-সাহেবকে স্নেহ নিয়ে চলুন তবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট মেমকে রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে পাহারা রাখিয়া তাঁহার মুখ হইতে বহুবাহারী যাহা বলিয়াছিল তাহাই শুনিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রাজা ধনেশ্বরের অহুমতি-পত্র লইয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই সই কি স্বর্গীয় মহারাজের।

রাণী জগদ্ধাত্রী ঢোক গিলিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—

—হাঁ।

ম্যাজিষ্ট্রেট রাজা ধনেশ্বরের স্বাক্ষরিত অপর কাগজের সহিত অহুমতি-পত্রের সই মিলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দলিলের সইএর সঙ্গে অহুমতি-পত্রের সইএর মিল নেই বোধ হচ্ছে। এব কারণ কি?

বহুবাহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—পীড়িত...

ম্যাজিষ্ট্রেট ধমক দিয়া বলিলেন—আপনি চুপ করুন। আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করছি।

রাণী বলিলেন—তখন তিনি পীড়িত ছিলেন।

—আপনি ঠিক জ্ঞানেন এ সই তাঁর নিজের হাতের?

রাণী জগদ্ধাত্রী ক্ষীণস্বরে বলিলেন—হাঁ।

তখন সাহেব ভাবী পোষাপুত্রকে দেখিতে চাহিলেন। অমনি বহুবাহারী বলিয়া উঠিল—দৌবারিক, যাও মহারাজকে নিয়ে এস।

কুবেরও খুব জমকালো জরির জামা ও টুপি পরিয়া আসিল। সে আসিয়া দাঁড়াইতেই বহুবাহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে সম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—মহারাজের আসতে আজ্ঞা হোক! সাহেব, ইনিই মহারাজ! কুবেরের বয়স বছর বারো তেরো। ফর্সা রং হইলেও পাড়ারগেয়ে দৌরাণ্ডে একটু কটাসে রোদপোড়া হইয়া গিয়াছে; চেহারাটা পাকাটে; তামাকে দম কষিয়া-কষিয়া ঠোট ছোটো কালিবর্ণ। হাত পা নলি-নলি, হাড়-বেকনো, শিরা-ওঠা।

সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—এ যতদিন সাবালগ না হয় ততদিন এই ষ্টেট কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে থাকবে, এবং ইহার শিক্ষা সহবতের জন্য একজন শিক্ষিত লোককে নিযুক্ত কবতে হবে।

বহুবাহারী মাথা ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—সে কখনো হতে পারে না। এর অভিভাবক আমি! কার সাধ্য এ রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে! যদি করে, বিষম সমরানল প্রজ্জলিত হবে!

সাহেব হাসিয়া “পাগল!” বলিয়া প্রশ্নান করিলেন।

কিছুদিন পবে একজন ইংরেজ ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। বহুবাহারী বুক ফুলাইয়া গোঁপে চাড়া দিয়া আফালন করিয়া বলিল—

“তীক্ষ্ণ সূচি-অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি,
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি!”

যে ঐ স্নেহ ইংরেজটার শির আনতে পারবে সে পাঁচশত মুদ্রা পুরস্কার পাবে!

জমিদারী-সরকারে গুণ্ডা লাঠিয়াল পোষা থাকে; পাঁচশত টাকাব লোভে অনেক লাঠি চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কিন্তু দেওয়ান রাজনাথ ঠিক সময়ে সতর্ক ও সাহায্য করিতে সাহেব ম্যানেজার মাথা লইয়া পলাইয়া বাঁচিল।

বহুবিকারী ও রাণী জগদ্ধাত্রীর নামে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ারেন্ট জারি করিলেন।

এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্তই রাখালের ডাক পড়িয়াছিল।

পুলিশকে ঘূরের উপর ঘূষ চাপাইয়া ওয়ারেন্ট এড়াইয়া রাখা হইতেছিল। কিন্তু আর বুঝি বাঁচানো যায় না। স্বয়ং পুলিশ-সাহেব সশস্ত্র পুলিশ লইয়া বাড়ী ঘেরাও করিতে আসিতেছেন।

রাখালকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে, কিন্তু বহুবিকারীর প্ররোচনায় রাখালকে কেহ পুছে না; রাখাল নিজে হইতে কোনো পরামর্শ দিতে গেলে বহুবিকারী বলিয়া উঠে—তোমার পরামর্শ শুনেতে পারি না বাবাজী; তুমি আমাদের বিরুদ্ধ-স্বার্থের লোক।

অন্যরে মণিমালাও মায়ের কাছে পর হইয়া উঠিয়াছে। চন্দনমণি সদাসর্বদা জগদ্ধাত্রী দেবীকে আগলাইয়া-আগলাইয়া ফিরিতেছে, মণিমালা যাহাতে কখনো একলা মায়ের কাছে না থাকিতে পায়; চন্দনমণি কুবেরকে সর্বদা রাণীর কাছে-কাছে রাখে, পাছে ভূপালের উপর রাণীর মায়ী বলিয়া যায়। রাণী জগদ্ধাত্রী বিধবা হওয়ার পরই পুলিশ-হাঙ্গামায় পড়িয়া কেমন হতভম্ব জ্বুথুথু হইয়া গিয়াছেন, কাহারও সহিত কথা বলেন না, ভালো করিয়া খান না, ঘুমান না, থাকেন-থাকেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—শেষে এও কপালে ছিল,—রাজরাণী ছিলাম, জেল খেটে মরব!

মণিমালা এমদিন রাখালকে বলিল—এখানে দেখছি আমাদের এরা চায় না, আমাদের এখানে দরকার নেই। চল আমরা আমাদের বাড়ীতে ফিবে যাই।

রাখাল বলিল—সে কি হয় মণি। এদের দরকার না থাক, আমি দেখছি এখানে আমাদের দরকার আছে। এই বিপদের সময়ে ফেলে চলে যাওয়া মাহুষের কান্না হবে না।

—শেষকালে আমাদের একুল ওকুল হুকুল বাবে। তোমার চাকরীটি গেলে তখন আমাদের কি উপায় হবে?

—তখনকার ভাবনা তখন ভাবব। এখন অল্প ভাবনাই অনেক ভাববার আছে।

—অল্পমতি-পত্র তুমি দেখেছ?

—দেখেছি।

মণিমালা একটু ইতস্তত করিয়া বলিয়া ফেলিল—বাবার সহিষ্ঠা ত বাবার বলে বোধ হয় না।

রাখাল বিরক্ত হইয়া জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—মা বলেছেন সে সহি স্বস্তর-মশায়েরই। এখন অল্প ভাবনা ছেড়ে দিয়ে মাকে অপমান থেকে বাঁচাতে হবে।

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

রাখাল জগদ্ধাত্রী দেবীকে লইয়া পাহাড়পুর হইতে পলায়ন করিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকিবে স্থির করিল। মোকদ্দমা শেষ হইলে ও তখন ওয়ারেন্টের ভয়না থাকিলে ফিরিয়া আসিবে।

রাখাল আপনার সঙ্কল্প রাণী জগদ্ধাত্রীকে জানাইল তিনি উদাসভাবে বলিলেন—যা হয় কর, আমি কি জানি? হায় কপাল! শেষকালে আপনার বাড়ীঘর ছেড়ে চোরের মতন পালাতে হবে!

বহুবিকারী রাখালকে বলিল—কাপুরুষ নরাদম! পৃষ্ঠ-প্রদর্শন! এই কি বীরধর্ম!

রাখাল বিরক্ত হইলেও কৌতুক অন্তর্ভব করিয়া হাসিয়া বলিল—পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করবেন ত কি মেয়েমাহুষকে জেল খাটালে বীরধর্ম রক্ষা হবে?

বহুবিকারী সগর্বে বলিয়া উঠিল—কেন? মেয়েরা জলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করুক। আমরা সম্মুখ সমরে প্রাণবিসর্জন করি।

রাখাল হাসিয়া বলিল—আপনি ততক্ষণ সম্মুখ সমর করুন। সেই অবসরে আমি মাকে নিয়ে পলায়নই করি।

বহুবিকারী—কাপুরুষ! ডীক!—বলিয়া রাখালকে গালি পাড়িতে লাগিল।

(৩৬)

পলায়ন করিতে হইবে। কিন্তু পাখীর বেহারা পাওয়া যায় না। যাহাকে বগা যায় সেই বলে—এক পেট ভাতের জন্তে কে জান দিবে?

যাকে অচ্যুতের কথা যায় সেই বলে, কোম্পানির রাজ্য হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর কাহারও প্রজা নহে, কাহারও চোখ-রাঙানি ধমকানির ধার তাহারা আর ধারে না।

তখন অগত্যা ঠিক হইল হাটিয়াই পলাইতে হইবে। আজই গভীর রাত্রিকালে।

সন্ধ্যাবেলা পুলিশ আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিল।

রাখাল গিয়া পুলিশের দারোগাকে বলিল—পাড়ার তিন চার জন মেয়ে বেড়াইতে আসিয়া আটক পড়িয়াছে, যদি তিনি দয়া করিয়া তাহাদের বাড়ী চলিয়া যাইতে দ্যান। দারোগা গভীর হইয়া বলিল—কিছু পান খাইতে পাইলে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

দারোগাকে পান খাইবার জন্য হাজার টাকা দিতে হইল।

রাণী জগদ্ধাত্রী ও মণিমালা প্রস্তুত হইয়া চন্দনমণিকে ডাকিল। চন্দনমণি বলিল—পোড়াকপাল! আমি কেন যেতে গেলাম! আমি গেলে কুবেরের এইসব ধনসম্পত্তি আগলাবে কে?

রাখাল বন্ধবাহরীকে বলিল—আপনি সম্মুখ-সমরের জন্তে থাকছেন ত?

বন্ধবাহরী বলিল—দিদি যখন পালাচ্ছেন তখন আমি কার জন্তে লড়ব? আমিও দিদির সঙ্গে যাব, তাঁকে রক্ষা করতে হবে ত!

রাখাল হাসি চাপিয়া বলিল—তবে আপনি শিগগির মেয়ে-মাছুষ সঙ্গে নিন।

বন্ধবাহরী জীলোকের মতন কাপড় পরিয়া ঘোমটা দিয়া পাড়ার মেয়ে সাজিল। এই বিপদের সময়েও তাহাকে দেখিয়া রাখাল ও মণিমালা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

তখন রাখাল সকলকে বলিল—যে যত পার গহন। পরিয়া লও, তোড়া ভরিয়া টাকা আর মোহর কোমরে বাধিয়া লও, টাকার দরকার হইবে।

চন্দনমণি চীৎকার করিতে লাগিল—ওরে বাপরে! আমার কুবেরের টাকা! সব নষ্ট করলে! বাপরে সব লুটে নিলে! আমি টেঁচিয়ে এখন পুলিশ ডাকব!

রাখাল কিছু না বলিয়া চন্দনমণির দিকে একবার কটমট ঘুরিয়া চাহিল।

বন্ধবাহরী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“বিপদে পড়িলে বাঘ হরিণের পা চাটে!” চন্দনমণি সঙ্গে থাক! এর শোধ নেবার দিন আসবে।

যে বাড়ীতে বিবাহের বধু আসিয়া রাণী হইয়া এতদিন ছিলেন সেই বাড়ী হইতে এতদিনে রাণী জগদ্ধাত্রী অসহায় অকূলে ভাসিলেন।

অসংখ্য দাসদাসীর মধ্যে সঙ্গ লইল শুধু ইনামসিং জমাদার, বিহু খানসামা, বিতাড়িত বৃদ্ধা দাসী ইচ্ছা। চারজন বেহারা ফুলচাঁদ, কুমকা, বড়ু ও কাছিয়া একখানি ডুলি আনিয়া কাঁদিয়া বলিল—অনেক দিন রাণীমায়ের নিমক খাইয়াছি; তিনি হাটিয়া পথ চলিবেন ইহা আমরা প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না; রাণীমা ডুলিতে উঠুন।

রাণী জগদ্ধাত্রী ভূপালকে কোলে করিয়া ডুলিতে চলিলেন আর সকলে হাটিয়া চলিল। মণিমালার বাপের বাড়ী এখন পরের বাড়ী বলিয়াও বটে, আর মাতা ও স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে থাকিবার জন্তও বটে সেও পলাতকদের সঙ্গে গেল।

বর্ষাকাল। মাঠ ঘাট জলে ভাসিয়া গিয়াছে। ধরা পড়িবার ভয়ে পথ ধরিয়া যাইবার জো নাই। রাত্রিকালে মাঠে-মাঠে জল ভাঙিয়া চলিতে হয়; দিনের বেলা কোন গ্রামে লুকাইয়া থাকে। যাহারা না চিনে তাহাদিগকে পরিচয় দ্যায় তাহাদের বাড়ী ঝিকড়পাছিতে, তাহারা জগদ্ধাত্রের তীর্থযাত্রী। মণিমালা পিতার মৃত্যুতে দুঃখিত হইলেও মনে করিয়াছিল এবার তাহাদের দুঃখ ঘুচিল। কিন্তু বিধাতা যে তাহার জন্ত নূতনতর দুঃখ সৃজন করিয়া রাখিয়াছিলেন সে তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে এই দুঃখে একেবারে স্ত্রিয়মাণ হইয়া মুষড়িয়া পড়িয়াছিল।

ঘুরিতে-ঘুরিতে এক গ্রামে গিয়া সকলে পৌছিল, সেই গ্রামে রাজনাথ দেওয়ানের বাড়ী। তাহার নিকট সাহায্য পাইবে আশা করিয়া রাখাল তাহার বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইবার প্রস্তাব করিল।

শুনিয়া বন্ধবাহরী বলিল—হঁ! অমাত্য-প্রধান অতীব সজ্জন! উত্তম সঙ্গ!

প্রস্তাব শুনিয়া রাজনাথ স্পষ্ট বলিল সে কোট-অব-গাউসে চাকরী বাহাল রাখিবার প্রত্যাশা রাখে, অতএব

তাহার দ্বারা কোনো রকম সাহায্য প্রত্যাশা করা মিথ্যা।

সে এই পৃথ্যস্ত করিতে পাবে যে সে ধরাইয়া দিবে না।

সেই দিনের মতো আশ্রয় চাহিলে সে নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহার বাগানের মধ্যে একখানা ভাঙা ঘর দেখাইয়া দিল।

ইচ্ছা-বুড়ি গিয়া বলিল—দেয়ানজি, মুনিবমা একটু শোবেন, যদি একটা বিছানা আর বালিশ দেন।

রাজনাথ মুখ খিচাইয়া বলিল—আর বিছানা বালিশ নেয় না। দুদিন বাদে জেলখানায় ইট মাথায় দিয়ে শুতে হবে, এখন থেকে অভ্যাস করতে বলগে।

ইচ্ছার মনের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করিলে সেই নিমক-হারাম লোকের স্ত্রীরা তখনই বসিয়া পড়িত, তাহার মাথায় সমস্ত আকাশ ভাঙিয়া বজ্রাঘাত হইত।

ঘুরিতে-ঘুরিতে রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিকে লইয়া গোসাঁইগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ মণি-মালার আনন্দ ও গর্জর আর ধরে না। একদিন এমনি অসহায় অবস্থায় তাহার মাতা তাহাকে নির্বাসিত করিয়া-ছিলেন, আজ মাতাকে তেমনি অসহায় অবস্থায় তাহারই আশ্রয়ে আসিতে হইয়াছে। এ তাহার আপনার গৃহস্থালি, এখানকার কর্তী সে-ই।

মণিমালা গায়ে পা দিয়াই ছুটিয়া প্রসাদী ও বিন্মিকে দেখিতে গেল। প্রসাদী হাসিতে গিয়া কাদিল; বিন্মি তাহার স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গভরে গাহিল—

“তুমি আমার দোহাং-পাখী, আমি রে তোর পিঙ্গরা,
আমায় ছেড়ে যাবে কোথায় ওরে কালো ভোমরা।
যে অবধি গেছ তুমি হয়ে আছি কাতবা,
হৃদয়খানি দেখ খুলে হয়ে গেছে ঝাঁঝরা।”

গাহিতে-গাহিতে আজ বড় আনন্দে বিন্মিও সকলের সামনে মন খুলিয়া কাদিল।

গাঁ ভাঙিয়া আসিল রাণী দেখিতে; তাহার রাজকন্তা দেখিয়াছে, রাণী কখনো ত দেখে নাই। এবারও তাহার হতাশ হইয়া ফিরিল।

বাস্তবিক রাণীর রাণীত্বও ত কিছু ছিল না; তিনি এখন ওরেন্টের পলাতক আসামী। মেঘের বাড়ীতেও রাণীর দুদিনের বেশী থাকিতে সাহস হইল না। ফরাসী রাজ্য চন্দননগরে গিয়া থাকা স্থির হইল।

(৩৭)

সকলকে চন্দননগরে রাখিয়া রাখাল পাহাড়পুরে ফিরিয়া গেল।

সে গিয়া দেখিল কোর্ট-অব-গার্ডস জমিদারীর ভার লইয়া বসিয়াছে। চন্দনমণি অন্দরে জাঁকিয়া বসিয়া নবাবী চালে রাজার মা-গিরি ফলাইতেছে; এবং ভাবী রাজা কুবের একটা চাবুক লইয়া অকাবণে যাকে-তাকে মারিয়া-মারিয়া আপনার প্রভুত্ব অভ্যাস করিয়া ফিরিতেছে।

রাখাল ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার বিরুদ্ধে ওরেন্ট প্রত্যাহার করিতে মিনতি করিয়া অনুরোধ করিল। সে কারণ দেখাইল যে, রাণী জীলোক, তিনি যে ম্যানেজার সাহেবকে খুন করিবার হুকুম দিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না; মোকদ্দমা হইলে আদালতে প্রমাণ হওয়াও সম্ভবহয়; এক্ষেত্রে তিনি ওরেন্ট প্রত্যাহার করিলে তাঁহার মহত্ব প্রকাশ পাইবে।

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—আচ্ছা বাবু, এই সর্ব্বে আমি ওরেন্ট প্রত্যাহার করিব যে সেই পাগলা বদমায়েস বন্ধ-বিহারী আসিয়া ধরা দিবে। আমি তাহাকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিব।

রাখাল তাহারও ক্ষমত্ব অনেক অল্পনয় করিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, কোনো ফল হইল না।

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কথা রাণী জগদ্ধাত্রীকে বলিল। তিনি শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বন্ধবিহারী শুনিয়া বলিয়া উঠিল—এ কখনো হতে পারে না। এ ইংরেজের অবিচার! এক অপবাধে দুজনের দুঃকর্ম ব্যবস্থা হতে পারে না।

রাখাল ধমক দিয়া বলিল—তা হলে কি আপনার ইচ্ছে যে আপনার সঙ্গে মা স্ক্রল জেল খাটুন গিবে। তা হলেই ইংরেজের সুবিচার হবে!

বন্ধবিহারী বলিল—না তা নয়! এতে তোমার কিছু কারসাজি আছে! তুমি আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবার অভিলাষ করছে।

রাখাল বিবস্ত্রি চাপিয়া বলিল—আপনার জেল যাতে না হয় তাব জন্তে উকিল ব্যাবিষ্টাব লাগিবে হা-কোর্ট পর্য্যন্ত

লড়ব। এখন মাকে বাঁচাবার জন্তে আপনি একবার ধরা দেবেন চলুন। আমি বলছি আপনাকে আমি জামিনে খালাস করে আনব!

বন্ধ বিহারী গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিল—
এখন আমি অসহায়! যা ইচ্ছে কর। কিন্তু এর প্রতিফল আমি সময় পেলে হাতে-হাতে চুকিয়ে দেবো!

রাখাল হাসিয়া বলিল—আপনাকে আমি শ্রুণী করে রাখব না। সুদে-আসলে আপনি শ্রুণ শোধ করবেন, আমি আপত্তি করব না।

রাখাল একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্ধবিহারীকে হাজির করিল। ম্যাজিস্ট্রেট জামিন মঞ্জুর করিবেনই না; অনেক বলা কহাতে রাখালের ঝুঁকিতে জামিন মঞ্জুর করা হইল। রাখাল গারেন্টের আসামীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট তাহাব সম্মতি লইয়া একদিন হাঙ্গতে আটক রাখিয়া তাহাকেও জামিনে খালাস দিলেন। মকদ্দমা চলিতে লাগিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী এইবার নিরাপদ হইয়া দেশে ফিরিবেন। চন্দ্রনগর হইতে গোসাঁইগঞ্জে আসিয়া গ্রামদেবতা রাধাকান্তের খুব সমারোহ করিয়া পূজাভোগ দিলেন; সমস্ত গ্রামের ভদ্র ও চাষা মেয়ে-পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইল। রাখাল, মণিমালা, প্রসাদী ও বিন্দি ভোর হইতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত লোকের পরিচর্যা করিয়া বেড়াইল। বৃন্দাবনের ও নারায়ণদাসীর সম্মান গ্রামে চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

মণিমালা মাকে দিয়া নারায়ণদাসীকে চেলী ও গহনা, গৌরকে মোহর ও পোষাক, বৃন্দাবনকে গরদের জোড় ও মোহর দেওয়াইল। নারায়ণদাসী খুসী হইয়া বলিল—হা! এতদিনে টের পেলাম যে নাতিবোঁ আমাদের রাজ্যের মেয়ে বটে!

গ্রামের বরে-বরে গরদ চেলী বিলি হইল; গরীব দুঃখীরা যে যাহা চাহিতে লাগিল রাণী জগদ্ধাত্রী তাহাকে তাহা দান করিতে লাগিলেন।

কাঙালী আসিয়া রাখালকে ধরিয়া বলিল—তোমার শাশুড়ীকে বলে যদি আমার একটা চাকরী করে দাও রাখাল!

রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রীকে গিয়া বলিল—কাঙালী-দাদা

আমার পরম উপকারী বন্ধু, সেই আমার চাকরী করে দিবেছিল। তাকে যদি একটা চাকরী দান।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—পাহাড়পুরে ওকে নিয়ে চল। কি চাকরীর যোগ্য তুমিই ঠিক করে দিও।

—ওকে ইংরেজি সেরেস্তায় হেডক্লার্ক করে দিলেই হবে, হেডক্লার্ক একজন দরকার আছে।

তাহাই ঠিক হইল। কাঙালী আশাতীত সফলতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কাঙালী রাখালকে দিয়া চাকরী জোগাড় করিয়া লইয়াই বন্ধবিহারীর সঙ্গে রাজ্যমামা সম্পর্ক পাতাইয়া তাহার মনো-রঞ্জন লাগিয়া গেল। কারণ কাঙালী বুঝিয়াছিল রাখাল এখন আর পাহাড়পুরের কেউ নয়, বন্ধবিহারীর দলই প্রধান ও প্রবল।

মণিমালা একদিন রাখালকে বলিল—দেখ, মা বন্ধমাশার সঙ্গে ফিরে যান, তুমি আর পাহাড়পুরে যেও না। তুমি উনাউ যাও।

রাখাল বিরক্ত হইয়া বলিল—না, তা কি হয়। ঠুকের পৌছে ঠিকঠাক করে দিবে আসি। তারপব যা হয় করা যাবে।

—তা হলে তুমি যাও, আমি এখানে থাকি।

—না না, তা হলে মা কি মনে করবেন? মনে করবেন যে আমরা কুবেরের হিংসে করছি। তোমাকেও যেতে হবে।

আবার বিদায়ের পালা। এবার মণিমালা হাসিতে-হাসিতে বিদায় লইয়া বলিল—ভাই ঠাকুরঝিরা, এবার আর কান্না নয়, ধুলো পায়ে লগ্ন, যেমন যাওয়া অমনি ফেরা। আমি শিগগির ফিরব।

তাহাই বিশ্বাস করিয়া বিন্দিও এবার আনন্দের গান গাহিল—

“শুন শুন ওহে পরাণ-পিয়া,

চিরদিন পরে পাইয়াছি শ্রাম,

আর না দিব ছাড়িয়া।

বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব,

হিমার মাঝারে যেখানে পরাণ

সেখানে রাখিয়া যাব।

অগাধ প্রেমের

নিগড়ে বাঁধিয়া

রাখিব চরণারবিন্দ।

কেবা নিতে পারে

নেউক আসিয়া

পাঁজরে কাটিয়া সিদ্ধ ॥”

(৩৯)

বিচারে বন্ধবিহারীর ছয়মাস জেল হইল। আবার মোকদ্দমা মোশন করা হইল; সে যে ম্যানেজার-সাহেবকে খুন করিবার হুকুম দিয়াছিল বা কেহ তাহার হুকুম অনুসারে ম্যানেজারকে খুন করিতে গিয়াছিল ইহার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না; প্রধান সাক্ষী রাজনাথের কথায় অনেক পরস্পর-প্রতিবাদী উক্তি বাহির হইয়া পড়িল। বন্ধবিহারী অব্যাহতি পাইয়া গেল।

এই মোকদ্দমা-জয়ের উৎসব শেষ হইয়া গেলেই মণিমালা রাখালকে বলিল—এইবার বাড়ী চল, এখানে এরা ত এখন নিশ্চিন্ত হল।

রাখাল বলিল—দাঁড়াও, আগে পোষ্যপুত্র নেওয়া-হয়ে-টয়ে যাক।

মণিমালার বাবা তাঁহার সম্পত্তি কত্নাকে দিয়া যান নাই ইহা যদি সত্য হয়ও, তাহার মা ইচ্ছা করিলে সে সম্পত্তি তাহাকে দিতে পারেন যদি তিনি পোষ্যপুত্র না লন; পোষ্যপুত্র লওয়া না-লওয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন; পোষ্যপুত্র লইতে তিনি যে খুব ব্যস্ত বা ইচ্ছুক তাহাও মনে হয় না; অথচ তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গছাইয়া দিবার যে চেষ্টা করিতেছিল তাহাও ত তিনি প্রাতরোধ করিতেছিলেন না। মণিমালা চোখের সামনে নিজের হকের ধন পরের হস্তগত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া সহ্য করিতে পারিতেছিল না—তাহার নিজের জন্ত নহে, তাহার ভূপাল রাজার দৌহিত্র হইয়াও গরিবের ছেলে হইয়াই যে থাকিবে এই দুঃখ তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু রাখাল বুঝিতে পারিতেছিল না মণিমালা কেন তাহার বাপের বাড়ীতে মায়ের কাছে থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেছে। সে কেবল ইহাই দেখিতেছিল যে এতবড় জমিদারীটার একটা পাকা বন্দোবস্ত না করিয়া দিয়া তাহার কোথাও নড়া উচিত নয়; পাছে তাহার শাস্ত্রী আবার কোনো বিপদে পড়েন।

রাখালের পিসখন্তর শ্রীকৃষ্ণ পাহাড়পুরে আসিয়া রাখালকে বলিলেন—বাবাজী, নিজের পায়ে নিজে কি এমনি করেই কুড়ুল মারতে হয়? কোথাকার কে একটা টোঙর এসে তোমার খন্তরের সম্পত্তি দখল করে বসছে, তুমি চুপ করে তাই দেখছ? ইনাম-সিং জমাদারকে বল—দুহাতে বন্ধা আর কুব্‌বার গর্দান ধরে পাহাড়পুর থেকে দূর করে দিক!

বাখাল বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—পিসে-মশায়, আপনি আমাকে অদর্শ করবার পরামর্শ দিতে এসেছেন! আমার খন্তরের পোষ্যপুত্র নেবাব অনুমতি-পত্র পাওয়া গেছে। এক পোষ্যপুত্র অবর্তমানে পাঁচটি পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র নেবার অনুমতি আছে।

—ও অনুমতি-পত্র ত জাল, বন্ধার তৈরি।

—মা বলেছেন সই মহারাজার। আর নাই হোক সই মহারাজের; মহারাজ অবর্তমানে সম্পত্তি মাঘের হয়েছে, তিনি যাকে খুশী তাঁর সম্পত্তি দেবেন। মা ইচ্ছা করলে পোষ্যপুত্র না নিবে মেয়েকে নাটিকে বিষয় দিতে পারতেন; কিন্তু তাঁরও সে-রকম ইচ্ছের কোনো পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এক্ষেত্রে বিষয় নিতে হলে আমাকে হয় চুরি করে অনুমতিপত্র নষ্ট করতে হয়, নয় ঠেঙাড়ে হয়ে একে একে পাঁচ-পাঁচটা পোষ্যপুত্রের মাথায় লাঠি মারতে হয়, নয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে জালিয়াতির নালিশ করতে হয়। আপনার কি ইচ্ছে আমি এইসব করি! আমাকে কি এমনি অধার্মিক মনে করেছেন! আর যাকে পোষ্যপুত্র নেওয়া হচ্ছে সে ত যে-সে পর নয়, সে আপনার পিসির সম্পত্তি পাবে—মা আর পিসি-মাসিতে কি খুব তফাত?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ওগুলির মধ্যে একটিও করতে হবে না—কেবল এইটুকু মাত্র প্রমাণ করতে হয় যে উইলটা জাল এবং রাগী করেননি। তিনি যে রাজার সই স্বীকার করেছেন তা undue influence বশত: বা ভাইকে বাঁচাবার জন্তে। সেটুকু করতে পারলে অদর্শ করা তো হবেই না, বরং অদর্শের নিবারণই হবে। তুমি যা বলছ তাতে ধর্মজ্ঞান কতটুকু প্রকাশ পাচ্ছে বলা যায় না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের একান্ত অভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

রাখাল চটিয়া বলিয়া উঠিল—আপনি আমাকে প্রলোভন দেখাতে এসেছেন? আমি আপনার কোনো পরামর্শ শুনতে চাইনা।

এইকথার পর শ্রীকৃষ্ণ রাখালকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি মুখ কাচুগাচু করিয়া রাখালের কাছ হইতে অল্পরে মণিমালার কাছে গেলেন।

মণিমালাকে বলিলেন—মণি, ঘরে আগুন লাগাচ্ছে আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল? মাকে পুঁথিওড়ে নিতে বারণ কর না।

মণিমাল দৃষ্টভাবে বলিল—পিসে মশায়, কেঁদে মান আর যেতে সোহাগ? সে আমার চাইনে।

—তোর ভূপালের কি অবস্থা হবে?

—ভূপাল বেঁচে থেকে লেথাপড়া যদি শিখতে পারে ভালোই, নয়ত মাথায় মোট বয়ে রোজগার করবে।

—রাজার নাতির পক্ষে সেটা কি খুব গৌরবের হবে মণি।

—নিজের পরিশ্রমে নিজের উপার্জন খাওয়া যদি গৌরবের না হয় তবে কি ভিক্ষা করে পরের অন্নগ্রহণাওয়া গৌরবের হবে পিসেমশায়!

—রাজা ধনেশ্বরের ভাণ্ডারে লক্ষ টাকা নগদ জমা ছিল। আমাই ইচ্ছে করলে সেটা ত নিতে পারে। সে টাকাটা ত এখন জামাইয়ের হাতেই আছে!

—পিসেমশায়, আমার স্বামী চোর নন!

শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন রাখালের হাতে পড়িয়া মেয়েটার স্বন্দ মতিগতি বিগড়াইয়া গিয়াছে দেখিতেছি! তিনি মনঃস্থ হইয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন।

(৩২)

মহাসমারোহ করিয়া পুত্রোষ্ঠি যাগের আয়োজন হইতে লাগিল। ভাটপাড়া নবদ্বীপ ও কাশী হইতে পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে যাত্রা থিয়েটার বাজি, লক্ষ্মী হইতে নহবৎ, ও নানাদেশ হইতে দ্রব্যসম্ভার আসিয়াছে, পাহাড়পুরে মেলা বসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বড় বড় ঢালা ঘর করিয়া বহু তাষু ফেলিয়া নিমজ্জিতদের বাসা দেওয়া হইয়াছে। ডিভিজনর কমিশনার, স্কেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব

নিমজ্জিত হইয়া আসিয়া গোলাপবাগের মধ্যে বড় বড় তাঁবুতে আছেন।

যাগের আগের দিন রাখাল বহুবিকারীকে বলিল—আজকে একবার কুবেরকে নিয়ে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসুন।

বহুবিকারী বলিল—স্বাধীন নৃপতির ওসকলের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি ঐসমস্ত অবিচারক অত্যাচারীদের মুখদর্শন করি না।

আসল কথা বহুবিকারী স্বাধীন নৃপতিব চাল চালিতে গিয়া যে বিষম দায়ে ঠেকিয়া গিয়াছিল তাহারই ভয়ে সে সাহেবদের কাছে ঘেঁষিতে আপত্তি করিল।

রাখাল হাসিয়া বলিল—স্বাধীন নৃপতি হয়ে থাকলে নৃপতি শিগগিরই গজভুক্ত কপিখ হয়ে যাবেন। আপনি না যান আমি নিয়ে যাব।

বহুবিকারী আর আপত্তি করিল না; রাজনাথের বিশ্বাসঘাতকতায় ঠেকিয়া শিথিয়া সে এখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া ছোট দেওয়ান দীনদয়ালকে আশ্রয় করিয়াছে। বহুবিকারী দীনদয়ালকে বলিতে লাগিল—এ সমস্তই রাখালের হিংসা! কিসে স্বাধীন নৃপতিকে অপমান করবে তারই চেষ্টা! আচ্ছা, আচ্ছা, এ সমস্তই তোলা থাকছে!

কুবের ও ভূপালকে লইয়া রাখাল কমিশনার প্রত্নতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। কুবেরকে চন্দনমণি খুব জাঁকজমকের পোষাক পরাইয়া দিয়াছিল; তাহার কুশী চেহারার উপর সেই দামী পোষাক যেন তাহার পৈতৃক দারিদ্র্যকে ও তাহার অনভিজাত্যকে বেশী করিয়া ঘোষণা করিতেছিল, যেন সে যাত্রার দলের ছোকরা! আর ভূপালকে মণিমাল নিতান্ত সাদাসিধা পোষাকে সাজাইয়া দিয়াছিল, তাহাতেই তাহার কমনীয় প্রিয়দর্শন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাখাল তাহাদিগকে লইয়া বাইতে-বাইতে শিখাইতে লাগিল—দেখ, সাহেবদের কাছে গিয়ে প্রথমে নমস্কার করবে; সাহেবরা হাত বাড়িয়ে দিলে তোমরাও হাত বাড়িয়ে দেবে; বেশ শান্ত হয়ে বসে থাকবে, ছটফট করবে না।...

রাখাল প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিল; তাহার সহিত তাহার পূর্বকার পরিচয় ছিল; তিনি

সম্মান করিয়া রাখালকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাখালের অভিপ্রায় শুনিয়া ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে সঙ্গে কবিয়া কমিশনরের কাছে লইয়া গেলেন।

কমিশনরের সম্মুখে গিয়া শিশু ভূপাল হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল। কুবের করিল না, আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল। কমিশনর তাহা লক্ষ্য করিলেন। কমিশনর হাসিয়া তাহাদের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন, ভূপাল হাত বাড়াইল, কুবের হাত বাড়াইল না। কমিশনর তাহাদিগকে বসিতে বলিলেন। ভূপাল স্থির হইয়া বসিল। কুবের বসিল না, সে একবার চেয়ারের উপর পাতা লোমশ চামড়াখানা তুলিয়া দেখিল; তাহায় কোণে একটা পিয়ানো ছিল, দৌড়িয়া গিয়া তাহাতে হবার টুংটাং করিল; তারপর রাখালের ধমকে মুখ গৌজ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া মুখ বিকৃত করিয়া নাক খুঁটিতে লাগিল।

কমিশনার ভূপালকে দেখাইয়া বলিলেন—রাণী বৃদ্ধি এই ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র নেবেন?

—আজ্ঞে না, এ আমার ছেলে।—বলিয়া রাখাল কুবেরের দিকে ঘুরিয়া নাক হইতে তাহার হাত টানিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—এইটি রাণীর ভাইয়ের ছেলে, রাণী একেই পোষ্যপুত্র নেবেন!

—নিজের মেয়ের এমন সুন্দর ছেলে থাকতে রাণী পোষ্যপুত্র নেবেন কেন?

—স্বর্গীয় রাজার হুকুম আর রাণীর নিজের খুদী।

—পোষ্যপুত্র যদি নিতেই হয় তবে নিজের মেয়ের এমন সুন্দর সভ্যব্য ছেলে থাকতে অপরের ছেলেকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন কেন?

—আজ্ঞে আমাদের হিন্দু আইন অনুসারে মেয়ের ছেলেকে পোষ্যপুত্র নেওয়া যায় না। আরও, আমার ছেলে হয়েছে ও জন্মেছে, আমার ছেলেই ও থাকবে।

—আমি আপনার পরিচয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে পেয়েছি। উনাইএর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রাইলী আপনাকে নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরী দিয়েছিলেন তাও শুনেছি। মিঃ রাইলী আপনাকে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রাশংসাপত্র দিয়েছেন, ম্যাজিস্ট্রেট আপনার কাছে তা দেখেছেন

বলছিলেন। এখন আপনাকে দেখে আর আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি বিশেষ মুগ্ধ হলাম। পাহাড়পুর রাজসংসারে দেখছি একমাত্র আপনিই লেখাপড়া জানা লোক; ভাবী পোষ্যপুত্রের বাবা শুনেছি আধপাগলা বড় বদ লোক। আমাদের ইচ্ছে যে আপনাকেই আমরা রাণীর পোষ্যপুত্রের টিউটর গার্ডেন নিযুক্ত করি। আপনার কি মত?

—আপনারা যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, আমি যথাসাধ্য কর্তব্য করব। আমার শস্তুর-শাস্ত্রীর ছেলেকে শিক্ষিত করা ত আমার কর্তব্য বলেই মনে করি।

—আপনাকে যদি আপাতত আড়াই শত টাকা বেতন দেওয়া হয়.....

—মাপ করবেন, আমি বেতন নিয়ে কাজ করতে পারব না। আমি অমনই করব—এ আমার শস্তুরের পুত্র-স্থানীয়, তাকে শিক্ষণ রক্ষণের জন্তে আমি বেতন নিতে পারব না।

—তা হলে আপনাদের একটা মাসহারা ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার হবে।

—আপনারা সে সম্বন্ধেও কোনো চেষ্টা না করলে আমি অস্থগৃহীত হব। আমি কারো কাছ থেকে জোর করে বা ভিক্ষে করে কিছু নিতে পারব না।

—তা হলে কি মেয়ে জামাই বিষয় থেকে একেবারে বঞ্চিত হবে?

—সে কথা রাণী নিজে বিবেচনা করবেন।

সাহেবেরা রাখালের নিঃস্বার্থ তেজস্বী স্বভাবের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। রাখাল তাহাদের অঙ্গগ্রহের জন্ত তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ দণ্ডবাদ জানাইয়া বিদায় হইল।

পথের ধারে একজন লোক পথের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কুবের তাহার কাছে আসিয়া হঠাৎ তাহার পিঠে লাথি মারিল; সে বেচারী উঁচু-বাঁধা পথের নীচে পগাবে গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

রাখাল ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কুবেরকে বলিল—তুমি ত ভারি বদ ছেলে! ওকে শুধুশুধু মারলে কেন?

কুবের গৌজ হইয়া বলিল—আমি রাজা! আমার সামনে তামাক খাচ্ছিল, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল না!

রাখাল আর রাগ চাপিতে পারিল না, কুবেরের কান

মলিয়া দিয়া বলিল—এরই মধ্যে রাজাগিরি ফলাতে আবস্ত করেছ ঠুপিড। এমনি করে তুমি প্রজাপালন কববে ?

কুবের রাখালের ভয়ে চুপ করিয়া রহিল ; কিন্তু মনে

মনে বলিল—আগে রাজা হই, তারপব কানমলার মজা টের পাইয়ে দেবো !

পরদিনই সে রাজ্যের ছেলে হইয়া গেল। ভবিষ্যতে তাহার রাজ্য হওয়া রদ করিবার সাধ্য তখন এক যম ছাড়া আর কাহারও রহিল না। এখন হইতে কুবেরকে তাহার পিতার নাম রাজা ধনেশ্বর চৌধুরী বলিতে হইবে, বন্ধবিহারী মজুমদার তাহার পিতৃপদ হইতে খরিজ হইয়া গেল।

রাজার দৌহিত্র বিষয়ের অধিকারী হইবে বলিয়া যাহার নাম রাখা হইয়াছিল ভূপাল, সে এখন নিঃস্বল দরিদ্র। আর দরিদ্রের কুঁড়েঘরে যাহার জন্ম হইলেও নাম পাইয়াছিল কুবের, সে ঘটনাচক্রে ধনেশ্বরের উত্তরাধিকারী হইয়া তাহার নামটাকে সার্থক করিয়া তুলিল। ইহাকেই বলে ভাগ্য !

(ক্রমশ)

চাক বন্দোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে বর্ণভেদ

বর্তমানের আলোকপাত ব্যতীত অতীত কালের বর্ণভেদ বুঝা স্বকঠিন। এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আমাদের সম্মুখে যুগল-সমস্তা উপস্থিত :—

ঐতিহাসিক যুগে, হিন্দুবর্ণনমূহের পূর্বতন অবস্থা কিরূপ ছিল ?

প্রারম্ভিকাল মাত্রই অন্ধকারে আবৃত হওয়ায়, ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়া, এই প্রতিষ্ঠানটির মূল-উৎসে আরোহণ করা কি সাধ্যায়ত্ত ?

অতএব, প্রথমে ঐতিহ্য হইতে বর্ণভেদ সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব ; প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ হইতে ও সাহিত্যিক প্রমাণ-পত্রাদি হইতে আমরা পরীক্ষা করিব। অতীতের সম্বন্ধে এতদূর শুধু একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। সাক্ষ্যসমূহের

পরিসর ও লক্ষণাদি ঠিক নির্দেশ করা—ইহা একটা দুরূহ কার্য ; এই পথে অতীব সতর্কতার সহিত, অতি সন্তর্পণে অগ্রসব হইতে হইবে।

বিচারের হিসাবে, হিন্দুর সামাজিক জীবন কতকগুলি গ্রন্থের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। এই-সকল গ্রন্থের রচনাকার্য্য সেই-সকল মুনিঋষির প্রতি আরোপিত হয় যাহারা ন্যূনাদিক পরিমাণে পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্ভূত—মন্ত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি। তাহারা সামাজিক গঠন-পদ্ধতি ও অপরাধের দণ্ডপদ্ধতিকে যে আসনে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইতেই উহা ব্যবস্থা-শাস্ত্র,—অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে “ধর্ম-শাস্ত্র” এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ধর্মশাস্ত্রের ভিতর আইন-সংহিতার অন্বেষণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই আইন-সংহিতার না আছে উৎপত্তিস্থান, না আছে রূপ, না আছে প্রামাণিকতা। সমাজের প্রাচীন গঠনাদি প্রায় সর্বত্রই গোড়ায় পারমার্থিক ভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া থাকে ; পরে তাহা হইতেই লৌকিক পদ্ধতি প্রস্ফুটিত হইয়া সেই পারমার্থিকের স্থান অধিকার করে। কিন্তু ভারতবর্ষে পারমার্থিকের স্থান লৌকিকের দ্বারা ততটা অধিকৃত হয় নাই। হিন্দুসমাজ ধর্মসম্বন্ধীয় প্রথার দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে। মুখ্যতঃ ধর্মশাস্ত্র ধর্মোপদেশেরই সংগ্রহ মাত্র। আইন প্রণয়নের অসম্ভাব্যে, এবং ব্রাহ্মণদিগের চির-বিবর্জমান আধিপত্যের প্রভাবে, উক্ত উপদেশগুলি অবশেষে রাজসরকার হইতে, ও জনসাধারণ হইতে একপ্রকার মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। এই মঞ্জুরী বিলম্বে আসিয়াছিল—এবং কতকগুলি নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ যে হয় নাই তাহাও নহে। উহাদিগের ইতিহাসে ইহা একটা গৌণকল্পের ক্রমবিকাশ। আদিম লক্ষণগুলি যে স্থানিকভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল এরূপ বলা যায় না।

উহারই সমান্তরাল-রেখায় মহাকাব্যগত ঐতিহ্যের প্রবাহও প্রবাহিত হইতেছে। উৎপত্তির হিসাবে অতীব প্রাচীন, ও প্রতिसংস্করণের দরুণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক—এই ঐতিহ্য, অস্পষ্ট-নির্দিষ্ট অথচ অতিবিস্তৃত এতটা কাল-বিভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বরূপতঃ এই ঐতিহ্য, অধিবাসী লোক হইতে ভিন্ন অপূর্ণ কোম এক অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তথাপি, উহার বিশাল কাঠামোর

মধ্যে শুধু যে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিবরণগুলি গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে, মতবাদসংক্রান্ত উপদেশের জন্তও উহার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। তা ছাড়া, এই ঐতিহ্য এমন যুগে গড়িয়া উঠে যখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, ব্রাহ্মণপ্রদত্ত উপদেশের প্রামাণ্য, সর্বপ্রকারে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিসংস্করণের দ্বারা এই ঐতিহ্য প্রত্যক্ষভাবে আবার ব্রাহ্মণে গিয়াই পৌঁছিয়াছে, ব্রাহ্মণের অব্যবহিত প্রভাবে গিয়াই পৌঁছিয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের সহিত উহার অসংখ্য সাদৃশ্য—অনেক সময় আক্ষরিক সাদৃশ্য—পবিত্রীকৃত হয়। ধর্মশাস্ত্র হইতে, বিশেষতঃ মনুসংহিতা হইতে, অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। মহাকাব্যের বিষয়টা যদিও স্বাক্ষাত্যমূলক, উহার ভাষা যদিও “পণ্ডিতী” ভাষা, তথাপি উহার উক্তি সকল-লোকের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও সামরিক কাহিনী হইতেই মূল বিষয়টা গৃহীত হইয়াছে তথাপি পৌরোহিতিক ঐতিহ্যের সহিত মহাকাব্য খুব মাথামাধি ভাবে গিল্পিত হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষেত্রটা এত বৃহৎ, বর্ণনা এত বিচিত্র, যে উহার মধ্যে কিছু কিছু অসংগতি অলক্ষ্যে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারে না। সব ধরিতে গেলে, যেসব নিয়ম পরিবোধিত হইয়াছে, যে পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে, যে প্রামাণিকতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সে সমস্তই দুই পক্ষেই অনেকটা সমান।

ছোটখাটো অর্নেক্যগুলি ধর্মব্যবহার মধ্যে আনিয়াও, কোন গুরুতর অর্নেক্যের আশঙ্কা না করিয়া, স্বতন্ত্র দুই পর্যায়ের দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে যে চিত্র আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই সমগ্র চিত্রটি আমরা এক নজরেই দেখিয়া লইতে পারি।

উহা হইতে যে মতবাদ বাহির হইয়াছে তদনুসারে আমরা দেখিতে পাই, একটি সমাজ, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বর্ণে বিভক্ত, এবং বর্তমানকালের বর্ণভেদের যেসকল নিয়ম,—অনেকটা সেই-সকল নিয়মের দ্বারাই পরিশাসিত। প্রত্যেক জাতের জন্ত যে কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বিভিন্ন ও সীমাবদ্ধ।

বিবাহের নিয়ম খুব যত্নের সহিত নির্ধারিত হইয়াছে। স্বজাতের অন্তর্গত কেবল একটিমাত্র পত্নী, পারিবারিক

অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদিতে স্বীয় স্বামীর সাহায্য করিতে পারে। সেই পত্নী হইতেই পুত্র, পিতার সমান পদমর্যাদা নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হয়। তেমন উচ্চ জাতের নহে এমন কোন মাতাব গর্ভে জন্মিলে সেই পুত্র, মাতার যে জাত সেই জাতে পতিত হয়। পিতৃধনের ভাগ তার হিসসায় কম হইয়া পড়ে। অতএব অন্তত প্রথম পত্নী, পতির যে-জাত সেই জাতেরই হওয়া উচিত। তাছাড়া পিতৃগোত্রে কিংবা মাতার নিকট-সম্পর্কের কাহারও সহিত সেই পুত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ। খাদ্যের সম্বন্ধে যে-সকল সামগ্রী সেব্য ও যে-সকল সামগ্রী নিষিদ্ধ তাহা সম্ভিন্তারে বিবৃত হইয়াছে। মাদক দ্রব্য সেবন, প্রায়শ্চিত্ত-বিহীন পাতকসমূহের মধ্যে ধৃত হইয়াছে। কোন অস্পৃশ্য জাতেব এক দৃষ্টিমাত্রই ভোজনেব দ্রব্য কলুষিত হয়। তবে কখন কখন যে তাহার হাত হইতে খাদ্যসামগ্রী গৃহীত হয় সে নিত্যস্ব ব্যতিক্রমস্থলেব হিসাবে, উপেক্ষা-দৃষ্টির ফলে। তাহার হাতের দান পর্যন্ত—(এই নিয়মটা, সত্য কথা বলিতে কি, অনেকটা বাঁকিয়া-চুরিয়া ফেলা হইয়াছে) কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য। বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রথা ব্রাহ্মণ গুণ্যকর্মের সামিল করিয়া তুলিয়াছে :—ঋতুমতী হইবার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য; বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

জাত হইতে বহিষ্করণই সর্বপ্রধান দণ্ড। সাধারণত ইহা পুনর্নির্ধারণ-বিরহিত নহে। সমাজে আবার ফিরিয়া আসিবার জন্ত ধাপে-ধাপে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। কিন্তু “পাতক ও উপপাতক” (যাহার দ্বারা পতন হয়) এই গুরুতর অপরাধের নামেই বুঝা যায়, স্বজাত হইতে পতনই উহার স্বাভাবিক ফল।

দেখা যায়, বর্তমানকালের পর্য্যবেক্ষক, জাত-সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রাচীনকালের তথ্যাদির আশ্চর্য্য মিল আছে। কিন্তু উহার মধ্যে খুব একটা বড় রকমের প্রভেদ আছে। বর্তমান ভারতের বাস্তব-জীবনে যেটা খুব চোখে পড়ে সেটা এই—জাতের সংখ্যা অগণ্য, উহাদের মধ্যে সাক্ষ্য ও বিশৃঙ্খল মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শাস্ত্রের কথা অনুসারে চারিবর্ণের অধিক বর্ণ নাই :—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। দাসশ্রেণী শূদ্রেরা

সর্বপ্রকার নীচ কাজে প্রবৃত্ত। বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও প্রতিগ্রহ ছাড়া ব্রাহ্মণের আর কোন কর্তব্য নাই। প্রভূত্ব করা, প্রজাপালন করা, ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বেদাধ্যয়ন ইহাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। বৈশ্যের কর্তব্য—গোপালন, ভূমিকর্ষণ, বাণিজ্যব্যবসায়, ভিক্ষাদান। তবে, ধর্ম্যানুষ্ঠান ও শাস্ত্রাধ্যয়নও বৈশ্যের অবহেলার জিনিস নহে। শূত্রের প্রধান কাজ উচ্চতর বর্ণগমূহের সেবা করা। এই কাঠামের বাহিরে, কতকগুলি বর্ষর ও অস্পৃশ্য লোক আছে যাবা ধর্ম্যানুষ্ঠান করিতে পারে না, ব্রাহ্মণিক সমাজে প্রবেশ করিতে পারি না; আর আছে কতকগুলি বৈদেশিক স্বেচ্ছ।

কার্যত এই অমুশাসন-ব্যবস্থার মূল্য কি? প্রাচীন প্রথার প্রামাণ্য ও মর্যাদাসম্বল এই প্রশ্নের মূলে বর্তমান।

প্রথমে একটা কথা বলিয়া রাখি। এই অমুশাসনগুলি ধর্মমত-স্বলভ দৃষ্টির সহিত ব্যক্ত হইলেও, নিয়মপদ্ধতির সাজে সজ্জিত হইলেও, সহজেই দেখা যায় কতকগুলি খুঁটিনাটি উক্তির দ্বারা উহাদের অনেকগুলি অনিশ্চয়তা, অনেকগুলি রক্ষণাচরিত্রা হইয়াছে। গণ্ডির বাহিরে যাইবে না এইরূপ একটা “জোর-হুকুমের” আবরণে প্রামাণিকতার দুর্বলতা ও ব্যবহারিক শৈথিল্যকে গোপন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্ততঃ এইরূপ লক্ষিত হয়। এই-সকল অমুশাসনের মঞ্জুরী ভাসা-ভাসা রকমের, তেমন ঠিক করিয়া কিছুই বলা হয় না। আরও গুরুতর দোষ—পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গতি। প্রত্যক্ষ অথবা গূঢ়ভাবে, বচন হইতে বচনান্তরে, এই-সকল অসঙ্গতি প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়।

এই জাতিতন্ত্রে চার জাতের কথাই আছে। চারিজাত ছাড়া পাঁচ জাত নাই আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি। ষতপ্রকার মিশ্রণ সম্ভব কল্পনা করিয়া, এই-সকল জাতের মিশ্রণ হইতে নূতন নূতন সত্ত্ব জাত বাহির করা হইয়াছে। উচ্চতম জাতের রমণীর সহিত নিম্নতম জাতের পুরুষের সংসর্গে ইতর-বিশেষ অমুশাসনে প্রত্যেক জাতের নিম্নতার ধাপ নির্ণীত হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে। একই জাতের অন্তর্ভুক্ত দম্পতির সন্তান হইলেও, অবশ্যপালনীয় ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান না করিলে তাহার পতিত হয়।

তাহারা এক-একটা ব্রাত্য শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হইতে নির্গত হইলে তদনুসারে ব্রাত্যগণ স্ববিম্বত শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত হইয়া কতকগুলি পৃথক জাতে পরিণত হয়। এই নিয়মপদ্ধতির মধ্যে একটা কৃত্রিম অমুশাসনের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই প্রত্যেক উপবিভাগের এক-একটা পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে; প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক ব্যবসায়।

উহারা কতকগুলি নমুনা মাত্র সন্দেহ নাই। এই শিশ্রণ হইতে, এই জটিলতা হইতে বুঝা যায়,—বাহাদের নাম করা হইয়াছে তাহা ছাড়া আবও অনেক উপবিভাগ আছে। কোন স্মৃতি-সংহিতায় যে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ উপবিভাগ অসংখ্য—সে কথা নিশ্চয়ই যুক্তিসিদ্ধ। (১)

শাস্ত্রবচনের সরলতা হইতে দেখা আমরা কতটা দূরে চলিয়া গেছি!

আব কিছু না হউক, চারি জাত অন্তত তাহাদের বিশেষ-বিশেষ কাজের মধ্যে কঠোরভাবে বন্ধ থাকিতেও পারে। কিন্তু তাহার মধ্যেও দেখা কত ক্রটি-পূরণের ইচ্ছিত! ব্রাহ্মণিক সমাজতন্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে, প্রত্যেক উচ্চ জাতের জীবনযাত্রার এক-একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কিন্তু উচ্চ জাতের পক্ষে নিষিদ্ধ কোন কাজ করিলে যে অপমান হয়, “আপদর্শনের” উল্লেখ করিয়া সেই অপমানকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ভুল বুঝিও না; এটা একটা নিদান পক্ষের কথা নহে, ব্যতিক্রম স্থলের কথা নহে,—ইহা খুব সচরাচর জীবনের কাজে পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রবচনানুসারে মান বজ্রাধিরাখিবার জন্ত ইহা একটা পট্টাপট্টি ছল মাত্র—মাল-বোঝাই শাস্ত্রের নৌকা ডুবি হইলে আবার উহাকে কোনপ্রকারে উদ্ধার করিবার চেষ্টা। শাস্ত্রের ভেঙ্গে যাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা নিষিদ্ধ, তাহাদের তালিকা পাঠ করিয়া দেখা যাক :—চোর, কসাই, ভৃত্য, গায়ক, জুয়া-খেলাব আভাধারী, এবং আরো অনেক ব্যবসায়ের লোক, সাধারণতঃ এই তালিকাভুক্ত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের কালের জায় তখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে অসংখ্য প্রকার উপজীবিকা ছিল। “ব্রাহ্মণ যে-কোন কাজে নিযুক্ত হউক না কেন, ব্রাহ্মণকে ভূদেবতা বলিয়া বিবেচনা

করিবে”—এই কথা ঘোষণা করিয়া মনু দূরদৃষ্টি ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

আদর্শ জ্ঞাত হইতে যেসকল ব্রাহ্মণ বহিষ্কৃত হইত, তাহারা আজকালের মতোই, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ, কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ জাতে বিভক্ত। মনে হয় মনু এ-সমস্ত কিছুই জানিতেন না। এই-সকল জাত সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। অতএব তিনি সমস্ত তথ্যগুলি জড়ো করিয়া একটা সমগ্র চিত্র দিবেন এরূপ গর্ব তাঁহার ছিল না। একটা কাল্পনিক সমগ্রতা বজায় রাখিয়া জাতের মূল-আদর্শটা দেখাইয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন।

স্বজাতের লোক ছাড়া আর কাহারও সহিত রীতিমত বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু, কতকগুলি বিবাহ-অনুষ্ঠানের জন্ত, উত্তরাধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কতকগুলি সম্ভাব্য ঘটনার জন্ত, নিম্নতর জাতের রমণীকে অন্ততঃ শাস্ত্রের গোঁণ নিয়মামুসারে বিবাহ করিবার সম্মতি দিবার উদ্দেশ্যে যেসকল নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই-সকল নিয়ম হইতে এবং সঙ্করজাতিসংক্রান্ত সমস্ত মতবাদ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যবহার-কালে সাধারণ নিয়মটাও তেমন কড়াকড়ির সহিত সমান ভাবে প্রযুক্ত হইত না।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শূদ্রার সহিত বিবাহ বারংবার দৃঢ়তার সহিত নিষিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি ইহাতেও স্পষ্ট দেখা যায়, অনেকটা রফা-রক্ষি করিয়া নিয়মজঙ্ঘনের স্ববিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আহারের নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ থাকিবাব আরও যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে।

পরিণেয়ে কতকগুলি বিশেষ স্থল ছাড়া, সাধারণত মাংস আহারের নিষেধ-নিয়মটা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যে সুরাপান অগ্নি অস্ত্র স্থলে খুব জোরের সহিত নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই বিষয়ে আবার কোন কোন স্থলে পুরুষার্থ লাভের পক্ষে ভাল এইরূপ একটা সাদাসিধা হিতোপদেশ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

চিরাগত প্রথা দৈবপ্রামাণ্যের দ্বারা সমাবৃত হইলেও তাহা ভাঙ্গিবারও কতকগুলি নিয়ম আছে। সূত্রগুলি মনে হয় যেন একেবারে অনতিক্রমণীয়; কিন্তু অনেক

স্থলে, সেই সূত্রগুলিই আমাদের জানাইয়া দেয়। যে, আসল নিয়ম ব্যবহারের মধ্যেই অবস্থিত; প্রত্যেক ধর্মের বিশেষ-বিশেষ ব্যবহার, প্রত্যেক জাতের বিশেষ-বিশেষ ব্যবহারই প্রকৃত নিয়ম, প্রকৃত আইন; এই-সকল ব্যবহার অনুসারেই আইন ও পরোয়ানা জাহির করা ধর্মশীল রাজার কর্তব্য। অনেক পরিমাণে আজিকার দিনেও এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। সমস্ত অতীত ভাবত এই লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত ছিল:—স্বাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে সেই-সকল বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন; এবং তাহাদের কথাটাই ঠিক। (মণ্ডলিকের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

“বিশুদ্ধ আচরণ হইতেই উচ্চ বংশের পরিচয় পাওয়া যায়”—এইরূপ বচনের অভাব নাই। বর্ণসঙ্কর সমস্ত উত্তর-বংশকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। (মহাভারত বনপর্ক; শাস্তিপর্ক)। পূর্ববর্তী উন্নততর যুগে জাতের নিয়ম ঠিক রক্ষিত হইয়াছিল,—এ কথাও অগ্নি কতকগুলি লোক অস্বীকার করেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, বাস্তব-পক্ষে শাস্ত্রীয় নিয়ম কতটা স্থিতিস্থাপক ছিল।

মহাকাব্য হইতেও এইরূপ ধারণা হয়। ধর্মশাস্ত্রের স্রষ্টা মহাকাব্যেরও ঠিক একই রকমের অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। বিষয়টা বড়ই কৌতূহলজনক। বিশেষতঃ মহাকাব্যাদির বিবরণে, এমন অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে যাহা প্রচলিত মতবাদের বিরোধী। সকল ব্যবসায়ের মধ্যেই অলজ্ঞতা প্রভেদ বিদ্যমান এই কথাই আমরা অনিয়া আসিতেছি, তথাপি মহাভারতে দেখা যায় সকল জাতের লোকই যুদ্ধে যোগ দিতেছে,—ব্রাহ্মণ হইলেও দ্রোণ এই যুদ্ধের একজন প্রধান নেতা, গোপালপুত্র হইলেও কর্ণ একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি। শূদ্রবংশজাত হইলেও যযাতি ও বিতুরের সম্মান কম নহে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মধ্যে,—বড় লোক ও খুব নীচ জাতের লোকের মধ্যে, বিবাহ হইতে প্রায়ই দেখা যায়। ক্ষত্রিয় যুবকেরা যাহারা সচরাচর ধর্মশিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে সেই উপদেশামুসারী কাজ করিতে বড় একটা দেখা যায় না। বোদ্ধবর্গের মধ্যে মদ্য মাংস সেবনের নিষেধ-নিয়ম পালন করিতেছে এরূপ দৃষ্টান্তও কম দেখা যায়। অথচ নিয়ম কাহারও অবদিত নাই। অনেক সময়ই তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত নিষেধবাক্য ও

নিন্দাবাদ আখ্যানের মধ্যে বিবৃত হইয়া থাকে। তাহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে ঐ-সকল নিয়মলঙ্ঘন প্রায়ই হইত। ইহার পর আমরা আর বিস্মিত হইব না—যদি দেখি রাজাদেব মধ্যে
 ✓ সকল জাতের লোকই আছে। এমন কি মনু নিজেই বলিয়াছেন, শূদ্র, রাজার ক্ষমতা পরিচালন করিতেছে,—এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে, অবাস্তব নহে। (মনুর ধর্মশাস্ত্র)।

ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর স্বার্থে প্রতি মহাকাব্যের এরূপ স্বভাব-সিদ্ধ পক্ষপাতিতা যে, যে-প্রাধান্ত ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্ত খুব সতর্কতার সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা মহাকাব্যে ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর প্রতি স্বেচ্ছাপূর্বক আবোপ করিয়াছে। সময়-বিশেষে মহাকাব্য ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যাকীর্জনও কম করে নাই। মাতঙ্গের ইতিহাস দেখ। মাতঙ্গের বিশ্বাস, সে ব্রাহ্মণসন্তান। বাস্তবপক্ষে তাহার জন্মদোষ ছিল; শূদ্রের গুণসে তাহার জন্ম হয়; আসলে সে জাতের বাহির। অলৌকিক উপায়ে তাহার জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, নিজ পদমর্যাদা ফিরিয়া পাইবার জন্ত সে কঠোর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু শত শত বৎসর তপস্তার কষ্ট সম্ব করিয়াও কোন ফল হইল না। বৃথাই শত বৎসর কাল সে
 —এক-পায়ের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। ইজের টনক নড়িল। ইন্দ্র দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিয়া ভাল ভাল বর দিতে চাহিলেন। কিন্তু অতৃপ্ত ব্যক্তি যে-একটি মাত্র বর চাহিল তাহা ইজের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব! কোটি কোটি পুনর্জন্মের ফলে তবে কোন নীচ জাত হইতে উচ্চ জাতে ওঠা যায়। শূদ্র নিষিদ্ধ তপস্তায় প্রবৃত্ত হওয়ায় রাম তাহার শিরশ্ছেদ করেন। এইরূপ একটা ঔদ্ধত্যের কাজ সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলাকে বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক জাতের নিজস্ব অধিকার রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক।

জাতের আলোচনা-ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমাদের চোঁটা একটা ঐতিহাসিক শৃঙ্খল স্থাপন করা; এইজন্য আমরা প্রাচীন তথ্যাদি হইতে সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত সামাজিক অবস্থার একটা খাটি চিত্র দেখিতে চাই। এক্ষেত্রে এইরূপ আলোচনা করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? কি মহাকাব্যগত ঐতিহ্য, কি শাস্ত্রীয় উপদেশ ও অল্পশাসন—উভয়ের মধ্যে নিয়ম-

পদ্ধতি একই। এক্ষেত্রেও নানা-প্রকার অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতির মধ্য দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু এই-সকল অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতি একপ্রকার কবুল-জবাবের বাজ করে। সকলেই বলেন, এই নিয়ম-পদ্ধতিটা কৃত্রিম ও শুধু তথ্যবিচারমূলক। উহা তথ্যের পশ্চনভূমির উপর স্থাপিত নহে। প্রতি মুহূর্ত্তেই, তথ্য বিপরীত সাক্ষ্য দেয়, তথ্যের সহিত শাস্ত্রের বিরোধ হয়—তথ্য শাস্ত্রকে ছাপাইয়া উঠে। শাস্ত্রও এ বিষয় সম্বন্ধে বেশী কিছু দাবী করে না। শাস্ত্র উচ্চতর নিয়মাদিকে ব্যবহারের হাতে, প্রথার হাতে, রাখিয়া দেয়। পরিশেষে শাস্ত্র, তথ্যমূলক বিশেষ-বিশেষ অবস্থার হেতু প্রদর্শন করিয়া জটিলতা ও অসঙ্গতি নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করে; এবং এক-একটা কাল্পনিক আদর্শ খাড়া করিয়া তুলে।

জাতিসাক্ষ্যের ব্যাখ্যা কাহারও ভ্রম জন্মাইতে পারে নাই। (Max Muller, Chips) তাহার মধ্যে এত অসম্ভব কথা আছে যে তাহা সহজেই চোখে পড়ে।

এত অসংখ্য জাতের সম্মুখে চতুর্বর্ণের নিয়মটা টোকা ভার। তাই সঙ্করজাতির অস্তিত্ব সমর্থন করিবার এত চেষ্টা। এই চতুর্বর্ণ হইতেই সঙ্কর জাতির আরম্ভ ও উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করা হয়। চতুর্বর্ণ হইতেই এই কতকগুলি জাতের প্রথম উৎপত্তির ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত ভাবে একবার মাত্র ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার পরে আরও যে-সকল জাত উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই যথেষ্ট নহে; উহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাত যে-সকল ভৌগোলিক নাম ধারণ করে প্রথমে তাহা হইতেই ত এই উৎপত্তির ব্যাখ্যাটা মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু শ্রেণীবদ্ধনের দিকে হিন্দুদের যে-একটা প্রবল ঝোঁক আছে, সেই ঝোঁকের মাধ্যমে হিন্দুরা এই-সকল সঙ্কোচকে আদৌ আমলে আনে না। তাছাড়া বাস্তব অবস্থা হইতে হিন্দুদের এই চেষ্টা একটু বল প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় এইরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন এক নল জন্মদোষে ছুঁষ্ট হওয়ায় পৈতৃক জাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সামাজিক সোপানের নিম্ন ধাপে নামিয়া পড়িয়াছে এবং তাহা হইতে আবার একটা নূতন জাত গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং এই জাতের নিয়ম, হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস অনুসারে খুব

কড়াকড় ভাবে রক্ষিত হওয়ায় এই বনিয়াদের উপর নির্ভর করিয়া, তাহারা অসম্বন্ধভাবে উহাকে একটা বৈধ জাতের মধ্যে ধরিয়া লইয়া অসঙ্কোচে একটা পাকা রকমের সিদ্ধান্ত স্থাপন করে।

ইহা হইতে ভারতের স্মার্তবাগীশেরা একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। যে তত্ত্বটি সমাজগঠনের মূলে অবস্থিত সেই মূলতত্ত্ব হইতেই সেই মূলোচ্ছেদী গোলযোগগুলি বাহির হইয়াছে—তাহারা এইরূপ দেখাইতে চাহেন।

এই প্রবণতা এত প্রবল ছিল যে, অনেক প্রকারে উহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বয়ং মনু কি বলেন নাই যে, ক্রিয়াকর্ম বান্দ দেওয়া, ও ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি দোষে কতকগুলি ক্ষত্রিয় শূত্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—যথা পৌণ্ড্রক, কোড, দ্রাবিড়, কাষোজ, যবন শক, পারদ, পল্লব, সীন, কীরাত, দরদ, অর্থাৎ ভারতের সমস্ত অ-হিন্দু জাতি, অথবা বৈদেশিক, দ্রাবিড়ীয়, চীন, পারস্তিক, গ্রীক সীথিয় ও আদিমনিবাসী লোকসকল? ঠিক ধরিতে গেলে ব্রাহ্মণিক সমাজ-গঠনের সহিত তাহাদের উৎপত্তি-সংক্রান্ত কোন যোগ-সূত্র নাই। অথচ পূর্বনির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে, অমুশাসনের মধ্যে, যেন-তেন-প্রকারে উহাদিগকে প্রবেশ করান চাই!

সম্বন্ধজাতিসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রথমেই ত এই নিয়ম-পদ্ধতিরূপ প্রাচীরের একটা অংশ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই চারিটি প্রধান বর্ণ-সম্বন্ধে কি বলিবে?

শূত্রেরা কতকগুলি দাসের সমষ্টি মাত্র—এই কথা শুধু যে একটা খামখেয়ালী কথা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন, রাষ্ট্রপদ্ধতির মধ্যে উহাদের যে অবস্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে, তাহাতে উক্ত কথার দুর্বলতা প্রতিপন্ন হয়। তিন উচ্চতর জাতির দৃঢ়বদ্ধ একতা, জমাটভাব, স্থনিয়ন্ত্রিততা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও তাহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ব্রাহ্মণ জাতির বর্তমান পরিণাম ত আমাদের চোখের সামনেই রহিয়াছে। তাহাদের এখন কিরূপ অবস্থা? আমরা ব্রাহ্মণকে বাহা দেখিয়াছি তাহা একটি প্রকৃত জাতরূপে নহে, পরন্তু কতকগুলি জাতের সমষ্টি-

রূপে। তাহাদের অধিকার সমান নহে, তাহাদের সামাজিক পদমর্যাদা সমান নহে এবং তাহারা বিপুল দূরত্ব-ব্যবধানে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। পুরাকাল হইতে অবনতিগ্রস্ত ও পতিত ব্রাহ্মণের একটা দীর্ঘ তালিকা চলিয়া আসিতেছে। অতএব যে সময়ে ধর্মশাস্ত্রের প্রতিসংস্করণ হয় তখনও ইহার অত্থা হয় নাই। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা যদি বল,—কষ্টেয়ষ্টে তাহাদের নামের চিহ্নটুকুমাত্র রহিয়া গিয়াছে; যেখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নাম প্রকাশ পায় সেখানে দেখা যায়, কোন বিশেষ দলের স্বেচ্ছাকৃত দাবী সমর্থনার্থ আধুনিক কালকে পুরাকালের ভিতর টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহার কতকগুলি প্রামাণিক দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে স্বতন্ত্র ও প্রামাণিক জাত বলিয়া কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতিবাচক একটা সাধারণ নাম মাত্র পাই—তাহার মধ্যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংখ্যা যদি কিছু থাকে ত সে নিতান্তই অণু-পরিমাণে। সম্প্রতি হিন্দু নাট্যসাহিত্যের আলোচনা উপলক্ষে আমি দেখাইয়াছিলাম, কতকগুলি ঔপন্যাসিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্ত হিন্দুরা কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করে। শ্রেণীবদ্ধনের প্রতি অমুরাগ, তথ্যের প্রতি অবজ্ঞা, আমরা বাহাকে যুক্তিশাস্ত্র বলি সেই যুক্তিশাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা, সূত্র-বচনের প্রতি অযথা ভক্তি—এই সমস্ত মিলিয়া একটা কৃত্রিম নিয়ম-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, অযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্ত হিন্দুদিগকে প্রণোদিত করে। যে-কথা সাহিত্য সম্বন্ধে সত্য, তাহা ধর্ম ও ব্যবস্থা নিয়মের পক্ষেও কম সত্য নহে। কোন তত্ত্বকে একটা সাধারণ নিয়মের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে হিন্দু ইতস্তত করে না। যে-সকল সীমানির্দেশ আমাদের চোখে অপরিহার্য, হিন্দুরা তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যে-ব্রাহ্মণ, জাতের কর্তব্য, নিষ্ঠার সহিত পালন কবে তাহার চারিটা অবস্থা বা আশ্রম আছে। শিক্ষানবীশের গ্রাম তাহাকে শাস্ত্র ও যজ্ঞাহুষ্ঠানের নিয়ম-সকল অধ্যয়ন করিতে হইবে ও কিয়ৎকাল পরে সে বিবাহ করিবে এবং সন্তান উৎপাদন করিয়া পারিবারিক ক্রিয়াকর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবে। একটা অবস্থা আছে যখন সে বনে গমন করিয়া

কঠোর তপশ্চায় জীবন যাপন করিবে। আর একটা অবস্থা আছে যখন সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। স্মার্তবাগীশদিগের মতে, এই চারি অবস্থা, জীবন-সোপানের ধাপ; বাহ্যত দেখিতে গেলে, এই ধাপগুলি ব্রাহ্মণের ধর্মজীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এই অপরিহার্যতা আমরা কি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? শাস্ত্রের বচনানুসারে আমরা যদি মনে করি যে, ব্রাহ্মণ মাত্রই কেবল অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যায় ব্যাপৃত, তাহারা সকলেই চারি আশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, এবং জীবনের শেষ দুই ভাগে সন্ন্যাসপ্রভাব বলম্বন করে ও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা সত্য হইতে দূরে পড়িব! ধর্মশাস্ত্রের প্রতিসংস্করণকারীরা শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তকে জুড়িয়া একটা পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছেন। এবং সেই সকল দৃষ্টান্ত নানাদিক পরিমাণে ব্যতিক্রম-স্থল মাত্র। উহা হইতে—যাহা প্রায় কখনই কার্য্যে পরিণত হয় না এইরূপ একটা আদর্শ-জীবনকে অল্পশাসনের দ্বারা সকলের অবশুপালনীয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমরা কি দেখিতে পাই না যে, নাট্য-সাহিত্যেও আলঙ্কারিকেরা কোন একটা বিশেষ নাটকের জন্ত নাটকের একটা স্বতন্ত্র পর্য্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন?—একটা বিশেষ দৃষ্টান্তকে একটা সার্বভৌমিক তত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন?

অতএব দেখা যাইতেছে, এই-সকল ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতার ও নীতিবাদীরা হিন্দু-মনের যে প্রবণতাটি খুব প্রবল ও স্বাভাবিক, সেই প্রবণতা অল্পস্বল্পেই কাজ করিয়া থাকেন। তা ছাড়া, তাহাদের সকল কাজে একটা স্বার্থবুদ্ধি প্রকাশ পায়, যাহাতে করিয়া শাস্ত্রের প্রামাণিকতার মাহাত্ম্য তাহা হইতে অপসারিত হয়। সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত রক্ষা করাই তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য। ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্তনের জন্ত, ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষার জন্ত তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ। তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে যে-সব গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহা তাঁহাদের ক্ষমতা বাড়াইবার জন্ত, তাঁহাদের প্রভুত্ব সুদৃঢ় করিবার জন্ত লিখিত। সাহিত্যের একছত্র অধিপতি;—তাঁহারা ইহা আবার মহাকাব্যগত ঐতিহ্যকে আকার প্রদান করিয়াছেন। উহার মধ্যে আগন্তুভাবে কতকগুলি

বিরোধের কথা থাকিলেও, ব্রাহ্মণিক শাস্ত্রেরই জায় মহাকাব্য পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণের দাবী দাওয়া, ব্রাহ্মণের বিশেষাধিকার সমর্থন করিয়াছে।

ধর্মশাস্ত্র শুধু যে ব্রাহ্মণের জন্ত সমস্ত প্রভুত্বের কাজ, সমস্ত অহুগ্রহ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে তাহা নহে—তাহা ছাড়া দণ্ডের ধাপ-পরস্পরাও এমন করিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছে যাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে সুবিধা হয়।

দেখা গিয়াছে কিরূপে জাতের পক্ষাঘেৎ, স্বকীয় নিয়োজিত দলপতির পরিচালনাবীনে, আভ্যন্তরিক পুলিশের কাজ করে, আবশ্যক-মত অপরাধীকে জাত হইতে বহিষ্কৃত করে, এবং অর্থদণ্ড আদায় করিয়া অপরাধীর নিষ্কৃতিরও উপায় করিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য শাস্ত্রবিদগণ ব্রাহ্মণপরিষদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণিক ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্কল্প এস্থলে স্পষ্টই লক্ষিত হয়; তাছাড়া আমাদের একালেও দেখা যায়, একজন ব্রাহ্মণ একাকী কিংবা জাতের পক্ষায়ৎসভার সহযোগিতায়, এই-সকল নিষ্পত্তির কাজে প্রধান কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। সমস্ত সাহিত্যে ব্রাহ্মণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অল্পপ্রতিষ্ঠ, সমস্ত সাহিত্য ব্রাহ্মণের দ্বারা অল্পপ্রাণিত; আমাদের চিত্রিত সমাজ-গঠনও অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণের দ্বারা অল্পপ্রাণিত। সমস্ত নিঃশেষে না বলিয়া কত কথা হাতে রাখিয়া বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সাহিত্যিক ঐতিহ্যই সাক্ষী।

এই ঐতিহ্য হইতে সরিয়া বর্তমান তথ্যগুলি যেন পর্য্যায়ক্রমে একবার কাছাকাছি আইসে, আবার আশ্চর্য্যরূপে দূরে চলিয়া যায়।

এই জাতের আলোচনা হইতে একটা তথ্য স্পষ্টরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ পায় যে, কতকগুলি স্থায়ী ধরণের মূলতত্ত্বের কার্য্যকল সমান চলিতেছে, অথচ সেই সঙ্গে গঠনাদির পরিবর্তনও হইতেছে। এই ব্যাপারটা নূতন নহে। যে-সকল কারণ হইতে এই পরিবর্তন ঘটে তাহার কার্য্য বহু শতাব্দী হইতেই চলিতেছে। অতএব দেখা যায়, প্রাচীন কালের অবস্থা যাহা ধর্মশাস্ত্রের ও মহাকাব্যের প্রতিসংস্করণের সময়কার অবস্থার অল্পরূপ, সেই অবস্থার অন্তর্ভূত অনেকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় নানাদিক পরিমাণে বর্তমান তথ্যাদি হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। বড় বড়

রেখাগুলি এখনকার মতো এক রকমেরই। কেবল অত্যাশ্চর্য বিষয়ের জ্ঞান জাতের গঠনের মধ্যেও কতকগুলি ছোটখাটো সম্ভবপর পরিবর্তনের অবকাশ রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ পরিবর্তন না হইয়া যায় না।

মোটকথা, সিদ্ধান্তের দ্বারা তথ্যাদির ব্যাখ্যা হয় না, তথ্যাদির দ্বারাই সিদ্ধান্তের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়, সিদ্ধান্তকে উচিত নীমার মধ্যে আনিতে পারা যায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চশস্য

জাপানী টিকি—

এসিয়ার প্রায় সকল দেশেই প্রাচীনকালে মাথার টিকি রাখার প্রথা ছিল। ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান এখন পর্যন্ত সেই প্রাচীন টিকির মোহ একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে গোত্র-চিহ্নরূপে মাথার এক হইতে পাঁচ পর্যন্ত মাথার বিভিন্ন স্থানে টিকি রাখার প্রথা প্রাচীনকালে ছিল। সেই গোত্রচিহ্ন এখন হিন্দুমানির চিহ্নরূপে পরিবর্তিত হইয়া সংখ্যার ও আকারের ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং বঙ্গদেশ হইতে উহা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

চীনে মাফুজাতির অধীনতার চিহ্নরূপে চীনাঙ্গের টিকি রাখা মাফু রাজ্যের আদেশে প্রবর্তিত হয়। চীনারা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া দাসত্বের ধ্বংস টিকির উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। কিন্তু এখনও অল্প পাড়াগায়ে প্রাচীনপন্থী হু-একজন লোক দাসত্বের চিহ্ন হইলেও চিরাগত প্রথার অভ্যাস বলিয়া টিকি ত্যাগ করিতে পারে নাই। কোনো প্রথায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে তাহার অপকারিতা ও অপমান বুঝিতে পারিয়াও তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব ও হ্রস্বলিঙ্গিত লোকের পক্ষে এই রকমই কঠিন হয়।

জাপানে সামাজিক অবস্থার তারতম্য ও বিশেষ বিশেষ পেশা বুঝাইবার জন্ত অতি প্রাচীনকাল হইতেই টিকি রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। অতি প্রাচীন কালে জাপানীর লম্বা চুল রাখিত এবং মাঝে সিঁখি করিয়া দুই ভাগে দুই কাঁধের উপর দিয়া চুল ছাড়িয়া রাখিত, অথবা দুই কানের কাছে দুইটা খুঁটি বাঁধিত। উৎসবে পূর্বে গাছের পল্লব চুলে গুজিত অথবা পাতার মাল্য গাঁথিয়া মাথা বেড়িয়া পরিত। ছয় শতকের মাঝামাঝি সম্রাটের আদেশে উচ্চ রাজকর্মচারীদিগকে চুল বিনাশি করিয়া মাথার চাঁদীর উপরে উঁচু করিয়া খোঁপা বাঁধিতে হইত। কামাকুরা যুগে এই খোঁপার আকার একটা বড় হাতুড়ির মতন হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপরে যুগে যুগে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও খোঁপা বাঁধিতে আরম্ভ করে, কিন্তু এই খোঁপা রাজকর্মচারীদের মতন মাথার চাঁদীর উপরে না হইয়া মাথার পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া খুলাইয়া দেওয়া হইত। জাপানের গৃহ-যুদ্ধের সময় যোদ্ধার মাথার চাঁদিতে লম্বা খাড়া খোঁপা বাঁধা অসম্ভব দেখিয়া মাথার সামনের অর্ধেক চুল একেবারে কামাইয়া ফেলিয়া পশ্চাতে এক-একটি ছোট টিকি রাখিতে আরম্ভ করে। ক্রমে এই মাথা-কামানো রীতি রাজদরবারেও প্রবর্তিত হয়, কিন্তু দরবারীরা মাথার পিছনের টিকি খুলাইয়া না রাখিয়া কড়া বিনাশি করিয়া



জাপানের বোদ্ধ-যুগের পুরুষদের চুল রাখিবার ভঙ্গি।

সোজা সটান খোঁচার মতন করিয়া রাখিত এবং সেই বিনাশি করিতে ব্যবহৃত দড়ির রং হইতে লোকের পদমর্যাদা প্রকাশ পাইত—পঞ্চম শ্রেণীর দরবারীরা বেগুনী, পরবর্তী শ্রেণী সাদা ও সাধারণ রাজকর্মচারীরা লাল সূতা দিয়া টিকি বিনাইত। এই টিকি সটান খাড়া হইয়া থাকিত বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল চা-ঘোঁটন। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকে কপালের উপরকার চুল কামাইয়া পিছন দিকে এক গুচ্ছ লম্বা চুল গোড়ায় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিত। পুরোহিত ও চিকিৎসকেরা একেবারে মাথা কামাইয়া নেড়া হইত। কামাকুরা যুগের গৃহ-বিবাদের পর তৎপরে যুগ দীর্ঘ শান্তি উপভোগ করিয়াছিল। সেই সময় টিকি রাখার রীতি বহু-প্রকারে পরিবর্তিত হইয়া বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় টিকি ও খোঁপার মাঝামাঝি রূপ ধরিয়া মাথার চুল বিবিধ আকারের শিরোভূষণে পরিণত হইয়াছিল। মাথার লম্বা চুল মাথার উপরে কাঁপাইয়া ছড়াইয়া দিয়া ক্রমশ সূচলো করিয়া চাঁদি ও পিছনের সন্ধিস্থলে চোখা করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। ছোট ছোট ছেলেদের সামনের চুলও নানা বিচিত্র আকারে খুঁটি বাঁধিয়া সাজানো হইত; কিন্তু তাহারা বড় হইয়া উঠিলেই সামনের চুল কামাইয়া পশ্চাতে টিকি রাখিত। ১৭৭২ সাল হইতে এই টিকি খুব লম্বা হইয়া উঠিল এবং সেই টিকিকে হৃদয় স্পর্শ করিয়া সাজাইবার দিকে খুব ঘোঁক পড়িয়া গেল। সাধারণ লোকেরাও পিছনের টিকি আস্তে আস্তে উপরের দিকে সরাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং শেষে সেই টিকি পিছন হইতে সামনের দিকে উন্টাইয়া কামানো



জাপানী টিকি।

- (১) জাপানের গেনরোক যুগের বালকদের চুলের ভঙ্গি; সেই সময়ের বয়স্ক পুরুষদের চুলের ভঙ্গি; মাক্সি যুগের ভঙ্গি। (২) মাক্সি যুগের ক্ষত্রিয়-যুবকদের চুলের ভঙ্গি। (৩) আনয়েই যুগের ক্ষত্রিয়দের। (৪) প্রাচীন কালের। (৫) প্রাচীন আমোদের। (৬) মেইজি যুগের অব্যবহিত পূর্বের ক্ষত্রিয়ের। (৭) চাজেন বা চা-মোটন চুলের ভঙ্গি। (৮) যোদ্ধা যুগের শিল্পী ও বণিকের। (৯) ছেলেদের বিবিধ প্রকারের টিকি।

টিকির উপর চেন্দা করা শোয়াইয়া রাখিত। মাথার সামনের চুল কানানোরও বিভিন্ন ভঙ্গি ছিল। কেহ মাঝে মাঝে চুল রাখিয়া চুলের গাছের কেয়ারীর মতন করিত, কেহবা বাগানের পথের মত করিয়া চুল কানাইত, কেহবা সামনের অনেকখানি কানাইয়া ফেলিত, কেহবা অল্প কানাইত। বণিক, কারিগর, বোদ্ধা প্রভৃতি সকলেরই টিকি ও খোঁপার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হওয়াতে এই সময়ে চলিশ পঞ্চাশ রকমের চুল রাখার রীতি প্রচলিত হয়। মজুরদের চেয়ে বণিকদের টিকি লম্বা হইত এবং টিকির পুটে খুব বড় হইত; কারিগরেরা লম্বা খাটো গোছে মোটা টিকির মাঝখানটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া মুড়ো খাঁটা আকৃতির মত করিয়া রাখিত। বাড়ীর চাকরেরা সমস্ত মাথার চুল খুব খাটো করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিত। এবং মাথার টিকি পিছনে একটা লম্বা আঁট বিনানি সটান করিয়া রাখিত। মেইজি যুগ প্রবর্তিত হইলে

সকলের উপর হুকুম জারী করিয়া টিকি কাটিবার আদেশ প্রচার করা হয়, কিন্তু কেহই সহজে টিকি কাটিয়া অসভ্য প্রতিপন্ন হইতে স্বীকার করে নাই। এখনও পাড়াগাঁয়ের অনেক লোক প্রাচীন কালের মতন নানা রকমের টিকি রাখে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। কোন্ টিকি কাহার এবং কোন্ টিকিতে কি পদমর্যাদা প্রকাশ পায় তাহা জাপানীরা এখন ভুলিয়া গিয়াছে; কেবল থিয়েটারের বেশাকারেরা প্রাচীন যুগের অভিনয়-সজ্জার জন্ত এখন পর্যন্ত টিকির কুলজী মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পেশাদার পালোয়ানেরা তাহাদের ব্যবসার চিত্ররূপে মাথার মাঝখানে চুড়ার আকারে টিকি বাধিয়া রাখে। এইসব টিকি পুরুষেরাই রাখিত; স্ত্রীলোকদের কবরী সজ্জার রীতি স্বতন্ত্র।

* *

জাপানের কৌতুককর বিবাহ-রীতি—

হিরোশিমা অঞ্চলের জুনিগাউরা গ্রামের জেলেরা নিজেদের মেয়ের সঙ্গে অপর গাঁয়ের ছেলের বিয়ে হওয়া অপমানের ব্যাপার বলিয়া মনে করে। যখনই তাহারা জানিতে পারে যে তাহাদের গ্রামের কোনো মেয়ে অপর গ্রামের কোনো ছেলেকে ভালবাসিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার সম্বন্ধ করিয়া নিজেদের গ্রামের ছেলেদের কাছে অপরাধ করিয়াছে অমনি সেই গ্রামের ছেলেরা দল বাধিয়া একটা পিপের মধ্যে করিয়া খানিকটা সাকে মদ ও কিছু মাছ সেই বিবাহসহস্রী মেয়েটিকে উপহার দেয়। এই প্রথাকে তারুইরে অর্থাৎ পিপেতে রাখা বলে। মস্ত একটা পিপের মধ্যে অতি সামান্য তুচ্ছ উপহার দিয়া তাহারা অপরাধিনী মেয়েটিকে বিজ্ঞপ্ত ও অপমানিত করে। সে বেচারার এই অপমান এইখানেই শেষ হয় না। কেহ কাহারও কাছে কিছু উপহার পাইলে তাহা দেবতাকে নিবেদন করিয়া গ্রামের সকল লোককে দেখাইতে বা ভাগ দিতে হয়। পিপের মধ্যে একটু মদ আর কিছু মাছ উপহার পাইয়া মেয়েটিকে তাহা লইয়া গ্রাম-দেবতার মন্দিরে যাঁতে হয় এবং বেদীর সমুখের ঢাক পিটিয়া গ্রামের সকল লোককে খবর দিতে হয়। সকলে আসিয়া মন্দিরে জড়ো হইলে সে তাহার বিবাহের সম্মান বা অসম্মানসূচক যে তুচ্ছ উপহার পাইয়াছে তাহা সকলকে বাঁটিয়া দায়। গ্রামের লোকেরা এই বিবাহ-ব্যাপারে খুব খুসি হইবার ভান করিয়া আনন্দ উৎসব করে। ইহাকে তাহারা তারুবিলাকি অর্থাৎ পিপে খোলার উৎসব বলে। এই উৎসবে ভোজের সমস্ত ব্যয় মেয়েটির ভাবী স্বামীকে জোগাইতে হয়। এজন্য অপর গাঁয়ের কোনো ছেলে এই গাঁয়ের কোনো মেয়ের পানি-প্রার্থী খুব সহজে হইতে চায় না। এই ভোজ হইয়া গেলে তখন তাহাদের বিবাহ আর কোন বাধা থাকে না; কিন্তু যদি এই ভোজ না দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই দম্পতি সমাজে ঘৃণিত ও নির্যাতিত হয়। কখনও কখনও বিবাহ হইতেই দেওয়া হয় না; এবং গাঁয়েরও কোনো ছেলে সেই মেয়েকে বিবাহ করিতে চায় না। এই প্রথা প্রচলনের কারণ—দূর দেশের যুবকেরা সমুদ্রতীরে আসিয়া জেলের মেয়েদের সঙ্গে বিনষ্টতা ঘটাইয়া দুচার দিন বাদে চলিয়া যাইত এবং জেলের অপমান ও লজ্জার কারণ ঘটত। তাহাই রোধ করিবার জন্ত এই প্রথা প্রবর্তন।

শিরানো জেলার সেইনাইজি গ্রামে বিবাহের সময় কনে যখন কন্ডাযাত্রীদের সঙ্গে বরের বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায় তখন কন্ডা-যাত্রীদের প্রত্যেকেই এক হাতে একটা সাকে মদের বোতল ও অপর হাতে একটা বাটি লইয়া রাস্তা চলিতে-চলিতে মদ খাইতে-খাইতে যায়।

বরযাত্রীরা কস্তাযাত্রীদের বাইবার পথের মধ্যে মধ্যে এক-একটা বেড়া দিয়া রাখে; সেই বেড়ার আটক হইয়া কস্তাযাত্রীরা বরযাত্রীদেরকে এক-এক পেরালা মদ মুখ দেয় এবং কনে তাহার ঘোমটা তুলিয়া সকলকে এক-একবার তাহার মুখ দেখিতে দেয়; তখন কস্তাযাত্রীরা বেড়া ভাঙিয়া অগ্রসর হইতে পারে। এইরূপে এক-এক বেড়ার আটক সরাইতে বিশ ক্রিশ মিনিট লাগে এবং এক পোয়া পথ চলিতে দুইটা কাটিয়া যায়। বিবাহ-সভা পর্যন্ত মদ খাওয়া চলিতে থাকে এবং এক-এক বিবাহে যে পরিমাণ মদ খরচ হয় তাহার পরিমাণ দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া বাইতে হয়। যে বিবাহে যত মদ খরচ হয় সেই বিবাহ তত জাঁকের।

সাগামি জেলার এক গ্রামে বিবাহের সময় গাঁটছড়া বাঁধা হইলে ও মদ খাওয়া হইলে পর কনে বরের দিকে সলজ্জ ও সপ্রণয় কটাক্ষ করিতে-করিতে বরকে বলে, “প্রিয়তম, অবশেষে আমি তোমার কাছে এসেছি; এ জগতে তুমিই একমাত্র আমার নির্ভরের লোক।” তখন বর ও কস্তাপক্ষের লোকেরা বর ও কনের মায়খানে আসিয়া হাততালি দিতে-দিতে বলিতে থাকে, “ঠিক কথা, ঠিক কথা।” এই প্রথাকে ‘কনের প্রথম কথা’ বলে। বর এই প্রথম কনের কথা শুনে এবং এই মধুরবাণী তাহার জীবনের স্মরণীয় ও সান্থনা হইয়া থাকে।

মুন্সে জেলার হাটিনোহে সহরের বিবাহের সময় যখন ভোজ হইতে থাকে তখন শহরের অপরিচিত লোকেরাও যে-সে বিনা নিমন্ত্রণে চার চার জনে দল বাঁধিয়া বিয়ে-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চার জনের একজন অতি প্রাচীনকালের সামুরাই বা যোদ্ধা সাজিয়া আসে— তাহার মাথার চূড়, টিকি, নকল তরোয়াল এবং মুখের উপর পাউডারের প্রলেপ তাহাকে এমন কিছুতুকিমাকার করিয়া তুলে যে কেহই তাহাকে চিনিয়া উঠিতে পারে না; তাহাদের একজন সেই বুড়ো সামুরাদের স্ত্রী এবং অপর দুজন তাহার চাকর সাজে। সেই চার আগন্তুক গভীর ভাবে গিয়া নিমন্ত্রিতের মতন বেশ সপ্রতিভ ভাবে ভোজে বসিয়া যায়। তাহার। নবদম্পতিকে কাগজে মুড়িয়া কিছু টাকা, একটি হুন্দর কাঠের বাজ্জি ভরিয়া মুড়মুড়ে করিয়া ভাজা শূকরের মাংস ও পাঁচ বোতল সাকে মদ দিয়া আদর করিয়া করে। ভোজের সময় তাহার। খুব গভীর হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে খুব সমাদর করিয়া খাওয়ানো হয়। ভোজের পর মদ খাইতে-খাইতে তাহাদের গাভীখা ভাঙিয়া যায় এবং ঘটা ধানেক ধরিয়া নাচিয়া গাহিয়া তাহার। বিবাহ লয়। বিবাহের সময় তাহাদের টাকা ও সাকে মদ বিণ্ডণ করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং কাঠের বাজ্জিও পিঠার ভরিয়া ফেরত দায়। এই প্রথাকে অপরিচিতের আদর বলে; যত দল অপরিচিত লোকই আসুক না কেন সকলকেই সমাদর করিতে হয় এবং কাহারও সমাদরের একটু ক্রটি হইলে তাহার। চিরজীবন সেই বরকনেকে ঝোঁটা দিতে থাকে এবং সেই বরকনে সমাজে নিম্নিত হইয়া কুণ্ঠিত হইয়া বাস করে।

মুন্সে প্রদেশের হামাবা জেলায় যে-বাড়ীতে বিবাহ হয় সেই বাড়ীতে বিবাহের সময় ছেলের দল বাজ্জি বা বগীদেবীর অনেক-গুলি পাখরের মূর্তি আনিয়া দরজার কাছে রাখা হয় এবং যে-সমস্ত ছেলেরা সেই-সব মূর্তি আনিয়া হাজির করে তাহার। খুব জোরে হাততালি দিতে-দিতে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করিতে থাকে; এই প্রথার অন্তর-গত অর্থ এই যে এই নবদম্পতি তাহাদের ভিটার পাখরের মতো কামের হইয়া, যখন পুত্রে হুবে থাকিবে। মুন্সে প্রদেশেও ঠিক এই রকম প্রথা আছে, কেবল পার্থক্য এই যে বর ও কনে বিবাহ করিয়া বাইবার সময় বগীদেবীর মূর্তিগুলি তাহাদের আগে-আগে বহিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

মুন্সে প্রদেশের সোখা জেলায় বিয়ের দিন সন্ধ্যাকালে কনে যখন বরের বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায় তখন ঘোল সত্তর বছরের কতক-

গুলি মেয়ে তাহাদের মুখ চিত্র করিয়া ও মাথার এক-একখানি লাল কমাল বাঁধিয়া এক-একটা বড় বড় সিন্দুক বহিয়া লইয়া কনের আগে-আগে যায়। সেই সিন্দুকে কনের পোষাক থাকে। তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে নাদনা ঘোড়ার সহস্রেরা গান করিতে-করিতে চলে। বরও বাঁশের টোড়ি বুনিয়া তৈয়ারি একটা ঘোড়া লইয়া যায় এবং তাহার সঙ্গেও পাঁচজন যুবতী কমালে মুখ ঢাকিয়া ঘোড়ার লেজের মতন খড়ের আঁটি কোমরে বাঁধিয়া বলাইয়া বরের সঙ্গে-সঙ্গে চলে। যখন কনে বরের বাড়ীতে পৌছে তখন ঘোড়ার স্থানীয়া এসব মেয়েরা কনেকে অভ্যর্থনা করে এবং ঘটক কনের হইয়া তাহাদিগকে দণ্ডবাদ দিয়া বলে, “সাবাস ঘোড়া, সাবাস!” তারপর সকলে ভোজে বসে; মেয়ের নাচিতে থাকে।

উনজেন প্রদেশের নিশিভাগাও গ্রামের সকল সম্বন্ধী জীলোক যথেষ্ট সাজসজ্জা করিয়া নববৎসরে পিতামাতাকে প্রণাম করিতে যায়। তখন তাহাদের স্বামীদিগকে চাকরের বেশে জীর কাপড়চোপড় ও উপহারের বোচকা পিঠে বাঁধিয়া জীদের সঙ্গে-সঙ্গে যশুরবাড়ী বাইতে হয়। তাহার। বাড়ীতে পৌছিলে তাহাদিগকে খুব সমাদর করিয়া অভ্যর্থনা করা হয় এবং সমস্ত রাত্রি বাপিয়া ভোজের উৎসব চলে। দুড়ি দিন বাপের বাড়ী থাকিয়া মেয়ে স্বামীকে লইয়া নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। তখন যশুরবাড়ী জামাইয়ের বাড়ীতে পালটা দেখা করিতে আসে এবং জামাই যশুরবাড়ীকে ভোজ দিয়া উৎসব করে। জাপানে জীলোকেরা কখনো পুরুষের আগে-আগে চলিতে পায় না; এই একটি দিন তাহাদের জীবন দানীপনার শোখ তুলিয়া স্বামীকে চাকর বানাইয়া লয়।

বুড়াবুড়ীরা অনেক সময়েই তরুণ-তরুণীর প্রণয় সদয় চক্ষে দেখে না; সেরকম অবস্থায় হরণ বা পলায়ন ছাড়া তরুণ-তরুণীর আর অন্য গতি থাকে না। বুজেন প্রদেশে নাগাহামাউর গ্রামে বাপনামে মেয়ের মনের মতন লোকের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলে ছেলেরা তাহার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেয়ে চুরী করে এবং যশুরবাড়ী অন্মত না পাওয়া পর্যন্ত তাহাদের মেয়ে ফিরাইয়া দেয় না। ইয়ামাশিরো প্রদেশে উমেনাহাতা অঞ্চলেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

*
*
*

জাপানের জীড়া কোতুক—

সকল দেশেই পশুপাখীর লড়াই লাগাইয়া কোতুক দেখার রীতি প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে মূলমান-আমলে হাতীর, মহিষের, বাঁড়ের, মোরগের ও ভিতরের লড়াই খুব সমারোহ করিয়া হইত। এখনও মোরগ, ভিতর ও বুলবুলের লড়াই পশ্চিম হিন্দুস্থানে হইয়া থাকে। যুরোপে, বিশেষ করিয়া স্পেনে মধ্যযুগে বাঁড়ের লড়াই খুব প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। জাপানে বাঁড়ে বাঁড়ে লড়াই লাগাইয়া কোতুক দেখার রীতি এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। পাহাড়-ঘেরা কোনো নির্জন মাঠে এই লড়াইয়ের রঙ্গভূমি স্থির করা হয় এবং পাহাড়ের পায়ে পায়ে বাপ করিয়া দর্শকদের বাসবার স্থান করা হয়; লড়াইয়ের নির্দিষ্ট দিনে শত শত বাঁড় লইয়া তাহাদের মালিকেরা উপস্থিত হয়। এতোক বাঁড়ের পায়ে একটা কাপড়ের পেটির উপর সেই বাঁড়ের নাম লুতা দিয়া বুনিয়া লেখা থাকে। কুস্তি লড়াইয়ের মতন দুই পক্ষের বাঁড়ের নাম ডাকা হয়; এবং উভয় দলের মালিকের মধ্যস্থ নির্বাচন করিয়া হার জিতের বিচার নিষ্পন্ন করে। লড়াইয়ের সময় মধ্যস্থ বিচারক বাঁশের বাখারী হাতে লইয়া বাঁড়ের ঝোঁটা দিয়া বা চাবকাইয়া লড়াইয়ে উত্তেজিত করিতে থাকে। কোনো বাঁড় পলাইয়া গেলে বা জিব বাহির করিয়া কেলিলে তাহার

হার হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। তখন উভয় বাঁড়ের মালিক তাহাদের লড়াই থামাইয়া পরাজিতকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। যে বাঁড় জেতে তাহাদের এক-একখানা পাঁচ-রঙা কাপড় পুরস্কার দেওয়া হয় এবং তাহারা তাহা শিঙে বাঁধিয়া সগর্বে বাড়ী ফিরিয়া যায়। এই লড়াই দেখিতে হাজার-হাজার লোক সমবেত হয়।

জানুয়ারী মাসে হিরোশিমা অঞ্চলে কচ্ছপ নাচের উৎসব হয়। কাঠের পাতলা তক্তা কাটিয়া কচ্ছপের মূর্তি গড়া হয়। তাহার চার পায়ে এবং মাথায়ও লেজে পরসা লাগাইয়া ভারী করা হয়। সেই কাঠের কচ্ছপটি বড় ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দশ পনের জনে মিলিয়া খুব জোরে পাখা দিয়া বাতাস দিতে থাকে এবং চাঁৎকার করিতে থাকে, “কচ্ছপ নাচে, কচ্ছপ নাচে।” পাখার বাতাসের তাড়নায় কাঠের কচ্ছপ ঘেঁষের উপরে নড়িয়া বেড়ায় এবং প্রত্যেক লোকই বাতাস দিয়া তাহাকে নিজের দিক হইতে অন্তের দিকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করে। বাহার কাছে গিয়া কচ্ছপ খামিয়া যায় তাহার হার হয় এবং তাহাকে ঘরের মধ্যে সকল লোকের সামনে তিনবার কচ্ছপের মতন হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে হয়। এই খেলায় মহিলারা প্রাণপণ শক্তিতে কচ্ছপের গায়ে বাতাস দিতে থাকেন, কারণ কচ্ছপের মতন হামাগুড়ি দিতে তাহারা লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু ভাগ্য তাহাদের প্রতি প্রায়ই বিমুখ হইয়া বসে এবং পুরুষদের হাসি ঠাট্টার মধ্যে তাহাদিগকেও ঘরের মধ্যে কচ্ছপ-নাচ নাচিয়া ফিরিতে হয়। এই খেলায় ধনী ও ভদ্র সম্প্রদায়েরাই অধিক আনন্দ উপভোগ করে; কারণ বাহারা চাষাভূষা ছোটলোক তাহাদিগকে কাজের জন্ত অনেক সময় হামাগুড়ি দিতে হয়; খেলায় হারিয়া হামাগুড়ি দেওয়াটা তাহাদের কাছে তত বিসদৃশ বা লজ্জার বাপার বলিয়া ঠেকে না।

সাংস্রমা অঞ্চলে দুই দল ছেলে পশ্চিম ও পূর্বমুখে হইয়া ২৪০ ফুট তফাতে সারি দিয়া দাঁড়ায়। পশ্চিমদিকের একজন ৫ ইঞ্চি বেড়ের একটা লোহার বালা বিপক্ষের দিকে ছুড়িয়া ফেলে; পূর্বদিকের দলের একজন ছেলে একটা বাঁশের লাঠি দিয়া সেই বালাটি ধরিতে চেষ্টা করে এবং যদি পারে তবে তখন তাহা বিপক্ষের দিকে ছুড়িয়া ফিরাইয়া দেয়। এইরূপে দুই পক্ষে বালা ছোড়াছুড়ি চলিতে থাকে এবং বাহার হাত হইতে বালা মাটিতে পড়িয়া যায় সে মোড় হয়। যে পক্ষের যত অল্প মোড় হয় সেই পক্ষ জিতে।

ওবি অঞ্চলে, ১৫ই আগষ্ট চন্দ্র-উৎসব উপলক্ষে পোনের বোল বৎসরের ছেলেরা জমা হইয়া দুই দলে দড়ি-টানাটানি খেলা করে।

আকিহোনোর গ্রামে যুবকেরা ৭ই জুন সমুদ্রের বড়বানলের সম্মানের জন্ত উৎসব করে। সেইদিন বন্দরের সমস্ত জাহাজ ও নৌকার উপর ও সমুদ্রের ধারে মাত্র বিছাইয়া গল্প আলাপ, গান বাজনা, ভোজ প্রভৃতিতে আনন্দ-উৎসব জমিয়া উঠে। জাহাজ ও নৌকার মাঝুলে-মাঝুলে লঠন ঝুলিয়া মাজানো হয়; ন'টা রাত্তির সময় গ্রামের বৌদ্ধ মন্দিরে আরতির বস্টা বাজিয়া উঠিলেই সমস্ত লাল লঠনগুলি জ্বলিয়া দেওয়া হয় এবং হাজারখানা ছোট ছোট তক্তার উপর হাজার বাতি বসাইয়া জ্বলিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই হাজার বাতির ভাসমান আলো বড়বানলের প্রতিরূপ হইয়া বড়বানলকে আরতি করে।

অনেক পাড়াগায়ে ইয়ামিজিরু অর্থাৎ কালো ঝোল নামে এক রকম খেলা হয়। কোন এক বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে কিম্বা রাত্রিতে গ্রামের সকল যুবকযুবতী মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড কড়ায় করিয়া ঝোল রাখে এবং এতদ্বারা নিজের নিজের খেলা-মত তরিতরকারি মাছ মাংস ও সবুজা আনিয়া সেই কড়ায় ফেলিতে থাকে, কিন্তু কে কি দিতেছে তাহা অপর কাহাকেও জানিতে দেয় না। এই পাঁচ-মিশালি জিনিষের

উৎকট ঝোল রান্না হইলে সকলে বাইতে বসে এবং ঝোলের মধ্য হইতে নানাবিধ অদ্ভুত বিনিময় খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফুটি করে। কখনো কখনো এই ঝোল হইতে টিকটিকি, বেঙ, আরসোলা প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হয়। এইরূপ এই উৎসবের আর-এক নাম মেতুরাঙুই বা অকাতোর অর্থাৎ কাহার ভাগ্য কি খাবার জুটেবে তাহা কেহই জানে না।

হোকাইদো অঞ্চলে এপ্রেল মাসে বরফ গলিয়া গেলে শত শত যুবতী প্রত্যেকেই ফুল লইয়া বৌদ্ধ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। প্রথম দিনে ছোট ছোট মেয়েরা ও দ্বিতীয় দিনে যুবতীরা এই পুষ্প-প্রদক্ষিণে যোগ দেয়। দেবপূজা হইতে পূর্বে এই উৎসবের উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে ইহার সহিত পূজা বা ধর্মের কোনো সংশ্লিষ্ট নাই, ইহা এখন কেবল মাত্র আনন্দ-উৎসবে পরিণত হইয়াছে। নব বসন্তের আবির্ভাবে দেশ যখন বরফ হইতে মুক্ত হইয়া পুষ্পপল্লবের সজ্জায় আনন্দিত হইয়া উঠে তখন তরুণীরা নিজদের শ্রেষ্ঠ স্থান পোষাকে সজ্জিত হইয়া ফুলের সাজি লইয়া জীবন্ত ফুলের মতন দুই দিন উল্লসিত হইয়া বেড়ায়। এই সময়ে দলে দলে যুবকেরা এই উৎসব দেখিতে আসে এবং তখন অনেক মন দেওয়া-দেওয়া ঘটিয়া থাকে।

* *

জাপানী বীরের সাহস পরীক্ষা—

পরলোকগত এডমিরাল ইতো সাংস্রমা অঞ্চলের লোক। প্রাচীন কালে সাংস্রমা অঞ্চলে বীরদের সাহস পরীক্ষার এক অদ্ভুত রীতি তিন বলিতেন। মধ্যযুগে সাংস্রমা যুবকেরা অদম্য বীরত্ব অর্জনের জন্ত কঠিন ব্যায়াম ও নিয়ম পালন করিত। দেকালে মাসে একটা-দুটো প্রাণদণ্ড হইতই; প্রাণদণ্ডের পর সেই মৃতদেহ যুবকদিগকে তরবারি-চালনা শিক্ষা করিবার জন্ত দেওয়া হইত। মানুষের দেহে তরবারি বিদ্ধ করিবার সময় কোন অঙ্গে কতখানি জোর লাগে এবং তখন যোদ্ধার শরীরে ও মনে কি রকম ভাব জাগে তাহা নির্ণয় করিয়া রাখা দরকার বলিয়া বিবেচিত হইত। ক্ষত্রিয় যুবকেরা যেই শূন্যিত যে কাহারো প্রাণদণ্ড হইবে অমনি তাহার উৎসুক ব্যগ্র হইয়া সেই দিনের অপেক্ষা করিত, এবং সেই দিনে নিজের নিজের তরোয়াল বাঁধিয়া আনন্দে নাচিতে-নাচিতে বধ্য স্থানে ছুটিয়া গিয়া সমবেত হইত। মানুষের দেহে তাহাদের তরবারি চালনার কৌশল পরীক্ষা এবং মনের সাহস ও দেহের শক্তি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া যুবকেরা অধীর হইয়া উঠিত। যাতকের তরবারির আঘাতে দগ্ধিত ব্যক্তির মুণ্ড ছিন্ন হইয়া পড়িয়া মাত্র সেই রক্তাক্ত ও সর্বাঙ্গের আক্ষেপে কম্পাণ্ডিত দেহ অধিকার করিবার জন্ত সমস্ত যুবক হুড়ামুড়ি করিয়া সেই দেহের উপর গিয়া পড়িত। তখন তাহাদের মধ্যে সেই দেহ লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত এবং একজন তাহা ধরিতে-না-ধরিতে আর-একজন ছিনাইয়া লইত। অবশেষে নারিকেল লুটের মতন কেহ একজন সেই দেহকে বুকে জড়াইয়া মাটি আঁকড়াইয়া পড়িত এবং শত শত যুবক তাহার উপরে শুপাকারে পড়িয়া তাহার হাত হইতে সেই মৃতদেহ ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে থাকিত। তখন সমবেত মুষ্টিবিরা ও যুবকদের গুরুজনেরা জোর করিয়া উপর হইতে এক-একটাকে টানিয়া-টানিয়া সরাইয়া দিত, এবং অবশেষে বাহার হাতে সেই দেহ পাওয়া যাইত তাহা তাহারই অধিকার বলিয়া স্থির হইত। তখন সেই যুবক গর্বে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া-পাড়াইত এবং সর্বদা রক্ত মাখিয়া বীভৎস মুষ্টিতে সকলের বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টির সম্মুখে মনের আনন্দে সেই মৃতদেহের উপর তরোয়ালের চোট ও বোঁচা মারিয়া শত্রু-বধের কৌশল ও আনন্দ অভ্যাস করিত। যুরোপে এখন খড়ের মুষ্টি বা খড়-ভরা গুলের গায়ে তরোয়াল ও সজ্জন বিবিধা অস্ত্রচালনা অভ্যাস করানো হয়।

কর্ষক্ষম কৃত্রিম হাত—

বর্তমান যুদ্ধে যুরোপের সকল দেশেরই অনেক লোক মারা পড়িতেছে। বাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহাদের অনেকেই জখম ও অঙ্গহীন হইয়া থাকিবে। বাহাদের হাত কাটা পড়িতেছে তাহাদের সেই অভাব পূরণ করিয়া তাহাদিগকে কর্ষক্ষম করিবার জন্ত নানান বেশে নানাবিধ কৃত্রিম হাত প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। ইহার একাধিক বিবরণ পূর্বে প্রবাসীতে আমরা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি; সংপ্রতি ভিয়েনার মেডিট্রিনিগে-ক্লিনিক নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় অধ্যাপক ডাক্তার সাওয়ারজিক্ তাহার নিজের ও ডাক্তার ষ্টোডোলা নামক জুরীক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের উদ্ভাবিত এক কৃত্রিম হাতের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই হাত মুলোর বাহুরে জুড়িয়া দিলে সেই বাহুর পেশীর চালনায় স্বাভাবিক হাতের মতন সমস্ত



চিমটার মতন কৃত্রিম হাত।

কাজই করিতে পারিবে। অবশ্য এই হাতের কাজ করিবার ক্ষমতা ব্যক্তির নিজের অঙ্গাঙ্গ বুদ্ধি ও কৌশলের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে সন্দেহ নাই। সকল অবস্থার মধ্যে হাতের কাজই অত্যন্ত কৌশলময় এবং কৃত্রিম আঙুলকে স্বাভাবিকের মতন খেলাইতে পারা অত্যন্ত কঠিন। উক্ত ডাক্তার নানা জন্তর উপর পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন যে কোনো অস্ত্রের কতকটা কাটিয়া ফেলিলেও সেই অস্ত্রের অবশিষ্ট অংশে যে স্নায়ু শিরা ও পেশী থাকে তাহাদের দ্বারা ই গতিবিধি ও সমস্ত কাজের জোর উৎপন্ন করা যায়। তখন তিনি যুদ্ধে আহত সৈনিকদের জখমি অঙ্গ ছেদনের সময় স্নায়ু শিরা ও পেশী বাহাতে যথা-সম্ভব সংযুক্তি হইয়া মুলো হাতটা বাহাতে খুব আঁটালো ও নিরেট হয়



স্বাভাবিক হাতের ছায় কর্ষক্ষম কৃত্রিম হাত।

- (১) হাত মুড়িয়া মুঠা করার ছবি। (২) হাত বুলাইয়া রাখার ছবি। (৩) মুঠি খুলিয়া হাত বাঁকাইবার ছবি। বাহুর সঙ্গে এই কৃত্রিম হাত বাঁধা থাকে, ও বাহুর পেশীর চালনাতেই সমস্ত হাতের কাজ হয়।

তাহার দিকে তাহার লক্ষ্য থাকে। এই আঁটালো মুলো অস্ত্রের দীর্ঘপেশী দেড় বা দুই ইঞ্চিতে সংযুক্তি করিয়া বাঁশ পাউণ্ড ভারী জিনিষ তুলিবার ক্ষমতা পাওয়া গিয়াছে। অগ্রবিদ ডাক্তার সাওয়ারজিক্ মুলো হাতের শিরা স্নায়ু ও পেশী সংযুক্তি ও সংযত করিয়া তুলিলেন এবং যন্ত্রকৌশলী অধ্যাপক ষ্টোডোলা সেই মুলো হাতের শক্তিতে চালনক্ষম কৃত্রিম হাত গড়িলেন। এই হাতের আঙুল এক সেট কপিকলের জিয়ার দ্বারা চালনা করা যায়। প্রত্যেক আঙুলকে চালাইবার কপিকল স্বতন্ত্র থাকিতে এবং একের অবস্থানের উপর অপর আঙুলের নির্ভর না থাকিতে এই কৃত্রিম হাতের আঙুল দিয়া যে-কোন আকারের এবড়ো-খেবড়ো জিনিষও চাপিয়া ধরিতে পারা যায়—জিনিষের যেখানটা যেমন উঁচু নীচু আঙুলগুলিও ঠিক তেমনি ভাবে চাপিয়া পড়ে। এতদিন পর্যন্ত এক এক বাবসায়ের জন্ত বিশেষ-বিশেষ রকমের হাত তৈয়ারী হইতেছিল। তাঁতীর কাজে মাক্ টেলিবার জন্ত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী একবার জোড়া ও আর-একবার খোলা দরকার হয়; অতএব মুলো

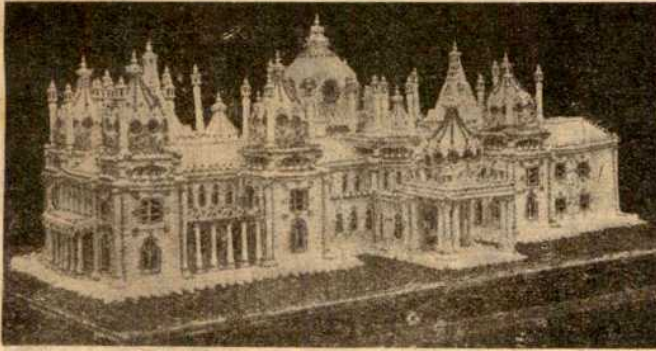
তাত্তরিক যে হাত তৈয়ারী হইত তাহাতে অদ্ভুত ও তজ্জনীর স্থানে ছোট হক থাকিত বাহা ইচ্ছা-মত জোড়া ও খোলা যায়। এই নূতন হাতের সুবিধা এই যে তাহার দ্বারা সকল রকম ব্যবসায়ের কাজই অনায়াসে চলিতে পারিবে। অধিকন্তু ইহার আকার স্বাভাবিক হাতের স্থায় হওয়াতে অঙ্গহীনের মনে যে প্রসন্নতা আসিবে তাহার মূল্য নাই।

চাক্র।

* *

চিনির গৃহ—

কোন মানুষ কিম্বা কোন গৃহের অবিকল প্রতিকৃতি আমরা সচরাচর চিত্রে দেখিতে পাই। কিন্তু চিত্রশিল্পী ভিন্ন অস্ত্রাশ্র শিল্পীরাও এ বিষয়ে কম পটু নহেন। তাহাদের কেহবা মুগ্ধ প্রতিমূর্তি, কেহবা ধাতব প্রতিমূর্তি, কেহবা প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার কেহবা খেতচূর্ণ (Paris plaster) নির্মিত শুষ্ক স্থল মূর্তি গঠন করিয়া বশোভাজন হইয়াছেন। বিলাতের এক এণ্ড কোম্পানী, বাঁহারা লণ্ডনের কুঠাল প্যালেসে আস্ত বাজী প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন তাহার, অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির অগ্নিময় প্রতিকৃতি ও বহু প্রসিদ্ধ ঘটনার অগ্নিময় চিত্র প্রদর্শন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছেন। ইহার দিল্লী-দরবারের সময় আমাদের ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী কলিকাতা প্রভৃতি নগরে আমাদের সম্রাট প্রভৃতির অগ্নিময় প্রতিমূর্তি প্রদর্শন করিয়া বখেট অর্থ ও খ্যাতি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।



চিনির-বাড়ী।

আমাদের ভারতবর্ষেও এই-সকল শিল্পীর অভাব নাই। কৃষ্ণনগরের কুস্তকারগণ ও আগ্রার প্রস্তরশিল্পীগণ তাহাদের অসামান্য কৰ্ম্মনেপুণ্যে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল বোম্বাই-নিবাসী ঐযুক্ত গণপতি কাশীনাথ ক্ষাত্রে খেতচূর্ণ (Paris plaster) নির্মিত স্থল মূর্তি নির্মাণ করিয়া স্বদেশে এবং বিদেশে সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমারকার নামক আর-একজন মহারাষ্ট্র শিল্পী ঐমতী আনিবেসান্ত, ঐমতী সরোজিনী নাইডু, স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতির খেতচূর্ণ-নির্মিত মূর্তি গঠন করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই সুপরিচিত ও ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। দেশদেশান্তর হইতে যে-সকল নরনারী তাজ-মহল দেখিবার জন্ত আশ্রা নগরীতে প্রতিনিয়ত সমবেত হইয়া থাকেন তাহাদের অনেকেই তথা হইতে তাজমহলের ক্ষুদ্র মৰ্ম্মর-প্রতিমূর্তি ক্রয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। সেই-সকল মূর্তি এখনও কত গৃহে

সুসজ্জিত কাচনির্মিত আধারে অথবা কক্ষ-বিশেষে সযত্নে রক্ষিত হইয়া সে গৃহের শোভাবর্দ্ধন ও শিল্পীর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

পাঠক পৃথিবীর বাবতীয় শিল্পীর মধ্যে আজ পর্যন্ত কি এমন কোন ব্যক্তির সংবাদ পাইয়াছেন যিনি তিনি দ্বারা কোন ব্যক্তি বা গৃহের প্রতিকৃতি নির্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন? সম্প্রতি রয়াল মাগাজিন (Royal Magazine) নামক কোন ইংরেজী মাসিক পত্রে তিনি-নির্মিত একটি সৌধের কথা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই মাসিক পত্রিকা নিতান্ত ছিন্ন অবস্থায় আমার হস্তগত হওয়ায় উহা কোন মাস ও বৎসরের তাহা জানিতে পারি নাই। বলা বাহুল্য এতদূর কথা আর কোথাও অবগত হইতে পারি নাই। তাই আজ অশ্রুতপূর্ব ও বিচিত্র শিল্পের কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে প্রদান করিতেছি।

পূর্বোক্ত পত্রিকায় প্রকাশ যে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রাইটন নগরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ৪র্থ জর্জ কর্তৃক একটি সুরমা ভবন নির্মিত হইয়াছিল। সেই প্রাসাদের একটি চিনি-নির্মিত প্রতিমূর্তি ব্রাইটন নগরস্থ কোন দোকানের বাতায়নে রক্ষিত হইয়াছে। এই মূর্তি গঠনে দুই জন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার প্রত্যেকে ২১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া উহার কার্য সমাপন করে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে এই চিনির গৃহ ১২টি ডোম, ৩৪টি চূড়া, ১১টি জানালা ও ২৫০০০ রোপা-গোলক দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে এবং উহার অন্তর্গত প্রতি কক্ষে বৈজ্ঞানিক আলোকের ব্যবস্থা থাকায় সন্ধ্যাকালে ঐ গৃহ আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উহার যেরূপ শোভা হয় তাহা অতীব উপভোগ্য। এই মূর্তিটির দর্শন লাভের জন্ত দলে দলে কত লোক যে

ব্রাইটন নগরে পূর্বোক্ত দোকানের বাতায়ন-নিম্নে সমবেত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্দেশ করা অসম্ভব। দর্শকগণের এতদূর অমুরাগ হইতে মূর্তিটির স্বাভাবিকতা ও শিল্পীর কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়।

এবম্বিধ চিনির গৃহ বা মনুষ্যমূর্তি অস্ত্রাশ্র কেহ গঠন করিয়াছেন কি না কিম্বা বর্তমানে এই শিল্পের কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা আমরা সম্যক অবগত নহি। কিন্তু এই শিল্প যে ক্রমে অস্ত্রাশ্র শিল্পের স্থায় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও আমরাও যে এইসকল মূর্তি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব ইহা নিশ্চয় আশা করিতে পারা যায়।

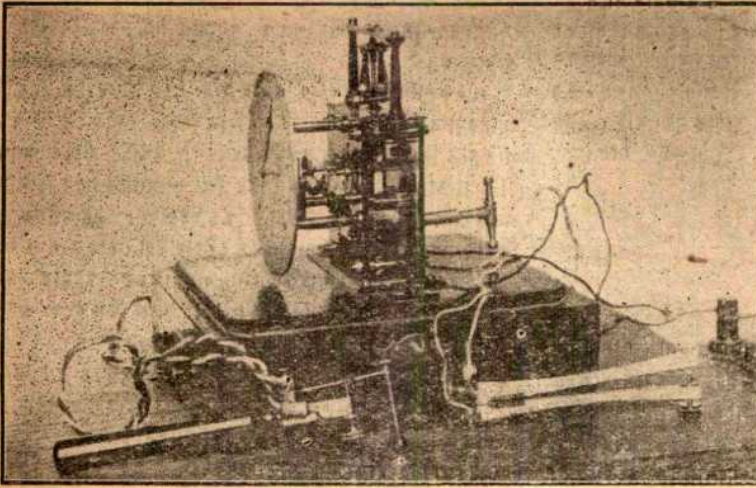
ঐনির্মূলচন্দ্র মলিক।

* *

বিমান-চারীদের যোগ্যতার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—

সাধারণতঃ—যোগ্যতা যেরূপই থাকুক, অমুরোধ-পত্রের জোরেই অনেক সময় চাকরী মিলে। কিন্তু যে-সব কার্যে কোনো জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে, তাহাতে শুধু প্রশংসাপত্র দেখিয়া চাকরী দিলে চলে না। এর মধ্যে যুক্তবিভাগ অস্ত্রতম। ডাক্তার যদি পরীক্ষা করিয়া কাহাকেও সাময়িক শ্রমসাধ্য কার্যের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবেই সে সাময়িক কার্যে নিযুক্ত হয়, নচেৎ নহে।

যে-কোনো সবেল ব্যক্তিই সাময়িক স্থলদৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু বিমান-বিভাগে আরো বেশী যোগ্যতা চাই। এই বিভাগে দৈহিকবলের সঙ্গে বুদ্ধিবল ও শ্রম, দৃষ্টি, স্পর্শ, শ্রবণ প্রভৃতির অমূল্যত্ব খুব ভীষণ ধাকা আবশ্যক। ইংলণ্ডে সাধারণতঃ ডাক্তারের কর্মপ্রার্থীদের দৈর্ঘ্য, ওজন, বুকের বেড়, হৃৎস্পন্দন, ফুসফুসের আকার ও চক্ষুর তীক্ষ্ণতা



দ্য আসোভাল কর্তৃক উদ্ভাবিত ক্রোনোস্কোপ।

বামদিকে হাতুড়ীটি ডাক্তারের হাতে ও ডানদিকের চিমটাটি পরীক্ষার্থীর হাতে থাকে।

পরীক্ষা করেন ও বিশেষ কোনো খুঁৎ না পাইলে তাহাদিগকে 'কার্ভাঙ্কন' বলিয়া মত দেন, এবং তাহারা বিমান-বিভাগে প্রবেশ করে। কিন্তু মানুষের অনুভবশক্তি ও বিচারশক্তি সীমাবদ্ধ, সুতরাং অনেক সময়ে অমুণ্ডলোক ও 'উপযুক্ত' বলিয়া গৃহীত হয়, এবং কয়েক মাস পরে 'অকর্ণপূর্ণা' বলিয়া বিতাড়িত হয়, চাই কি নিজের ও দেশের বিপদ ঘটাইয়া বসে।

পক্ষান্তরে ফ্রান্সে এই পরীক্ষাকার্য্য বর্তমানে যন্ত্রদ্বারা সম্পাদিত হয়, আর সে-পরীক্ষা যেমনই হয়, তেমনি অস্বাভাবিক। দুইজন ডাক্তার মাসিয় ও কামা ও মাসিয় নেপার এই যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা, ও তাহারা এই যন্ত্র পরীক্ষাকার্য্যে প্রয়োগ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পরীক্ষায় প্রথমতঃ দেখা হয় যে কর্ণপ্রার্থী দর্শন, শ্রবণ, বা স্পর্শের অনুভূতি কত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারে। দ্য আসোভালের উদ্ভাবিত ক্রোনোস্কোপ নামক একটা যন্ত্রে ইহা নির্ণীত হয়। এই যন্ত্রে ঘড়ীর মুখের মত একটা অঙ্গ আছে। ঘড়ীর মুখটা যেমন ৬০ ভাগে বিভক্ত, ইহা তেমনি ১০০ ভাগে বিভক্ত। একটা কাঁটা এই একশত ভাগের উপর দিয়া এক সেকেন্ডে একবার ঘুরিয়া আইসে। এই যন্ত্রটি তার দিয়া একটা ছোট হাতুড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। হাতুড়ীটির মধ্যে বিদ্যুৎ-চুম্বকের (electro-magnet) এমন একটা কল বসানো থাকে, যে, ইহা দ্বারা কিছুতে আঘাত করিলেই পূর্বে কটাটি চলিতে আরম্ভ করে। পিত্তল-নির্মিত চিমটার মত আর-একটি যন্ত্রও তার দিয়া মূল যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই যন্ত্রের পিত্তল-কলক ছুটি যদি চাপিয়া ধরিয়া উভয়ের মধ্যে সংস্পর্শ স্থাপন করা যায়, তবে কাঁটাটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। হাতুড়ীটি ডাক্তার নিজে লইয়া, পরীক্ষাধীন ব্যক্তির হস্তে চিমটাটি দেন।

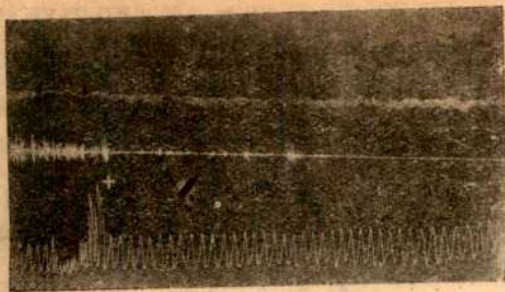
প্রথমে শ্রবণানুভূতির পরীক্ষা। ডাক্তার পরীক্ষার্থীকে বলিয়া দেন যে সে যেন শব্দ শুনিবামাত্র চিমটার মুখ চাপিয়া ধরে; এই কথা বলিয়া ডাক্তার হাতুড়ীটি দিয়া একটা টিনের বাগে আঘাত করেন, কাঁটাটি অমনি চলিতে আরম্ভ করে। আবার পরীক্ষার্থীও শব্দ শুনিয়া চিমটা চাপিয়া ধরিতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই দুই কার্য্যের মধ্যে কাঁটাটি যতগুলি ঘর অতিক্রম করিয়া যায় তাহার সংখ্যা দেখিয়াই বুঝা যায় শব্দ

শুনিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পরীক্ষার্থীর এক সেকেন্ডের একশত ভাগের কত ভাগ সময় লাগিয়াছে। কাঁটাটি যদি ৬ ঘর বাইয়া থাকে তবে বুঝিতে চইবে যে এক সেকেন্ডের একশত ভাগের ৬ ভাগ সময় লাগিয়াছে। যদি ১৭ ঘর বাইয়া থাকে তবে এক সেকেন্ডের ১০০ ভাগের ১৭ ভাগ; ইত্যাদি।

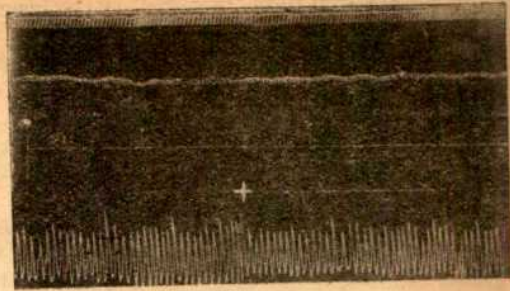
স্পর্শানুভূতিও এই যন্ত্র দিয়াই দেখা যায়। পূর্বে কিছু না বলিয়া ডাক্তার পরীক্ষার্থীর মাথায় বা হাতে হাতুড়ীটি দিয়া মুদ্রভাবে আঘাত করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি স্পর্শ অনুভব করা মাত্রই চিমটা চাপিয়া ধরেন—কাঁটা বন্ধ হইয়া যায়। দর্শনানুভূতির পরীক্ষাও এই প্রকারেই হয়। ডাক্তার হাতুড়ীটি একটু দূরে টেবিলে ছোঁয়ান, দেখিবামাত্র পরীক্ষার্থী চিমটা চাপিয়া



রিভলভার আওয়াজ করিয়া পরীক্ষার্থীর শ্রাবশক্তি পরীক্ষা করা হইতেছে। বৃকে নিউমোগ্রাফ, ডান হাতে সিসমোগ্রাফ ও বাঁ হাতে নাড়ী পরীক্ষার যন্ত্র।



পরীক্ষার্থীর যোগ্যতার সাক্ষ্য। শালা যোগচিহ্নটি যে-সময়ে
রিভলভার আওরাজ করা হয় তাহাই দেখাইয়া দিতেছে।
সকলের উপরে খাসপ্রখাসের গতি। তার নীচে নাড়ীর
গতি। তার নীচে হাতের কম্পন। এই চিত্রে
সবগুলিই খুব অসম। ইহা হইতে বুঝা যায়
যে পরীক্ষার্থী খুব চমকাইয়া গিয়াছে,
অতরাং তার স্নায়ুশক্তি কম। সকলের
নীচেকার দাগগুলি সেকেন্ড বুঝায়।

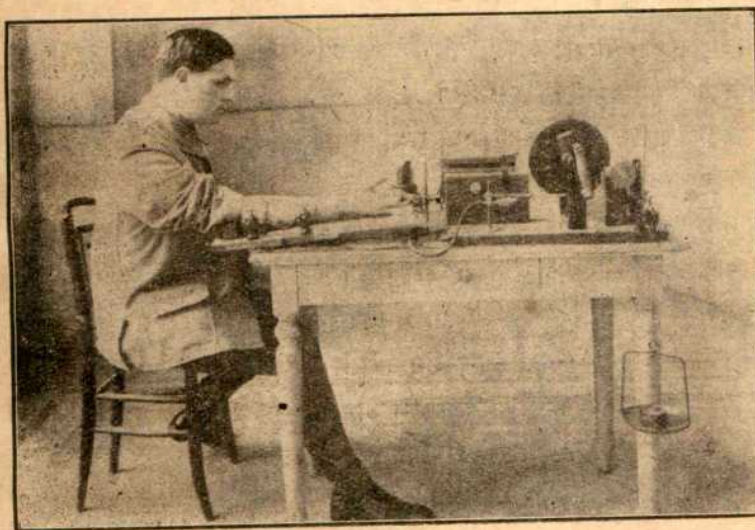


পরীক্ষার্থীর যোগ্যতার সাক্ষ্য।

রিভলভারের শব্দ শুনিয়াও সে খুব বেশী
চমকায় নাই, প্রমাণ—তার খাস প্রখাসের গতি,
নাড়ীর গতি, বা শরীরের কম্পন
কোনটাই বেশী অসম নহে।

খুব চমকাইয়া উঠেন, জোরে নিখাস পড়িতে থাকে, হৃৎকম্প উপস্থিত
হয় ও হাত পা কাঁপিতে থাকে। এরূপ লোক বিমানবিভাগের পক্ষে
সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীর বুকে নিউমোগ্রাফ

(pneumograph) নামক একটি যন্ত্র
পরাইয়া দেওয়া হয়; ইহাতে নিখাসের
গতি ধরা যায়। বাম হস্তের তর্জনী
ও মধ্যমায় অল্প একটি যন্ত্র পরাইয়া
দেওয়া হয়, ইহাতে নাড়ীর গতি ও
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বুঝা যায়। কম্পনের
গতি ধরবার জন্য পরীক্ষার্থীর ডান
হাত 'সিসমোগ্রাফ' (seismograph—
যাহা দিয়া ভূমিকম্প ধরা যায়) যন্ত্রে
সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই তিনটি
যন্ত্রই একটা একটা লেখনীর (style)
সহিত সংলগ্ন থাকে, এবং লেখনীগুলির
মুখ একটা ভূষামাথা চোদ্দের (cylinder)
গায়ে ঠেকিয়া থাকে। হঠাৎ
একটা রিভলভার আওরাজ করিয়া, বা
মাগনেটিক আলো জালিয়া, বা তুহার-
শীতল এক খণ্ড যন্ত্র, পরীক্ষার্থীর গায়ে
ফেলিয়া দিয়া তাহাকে 'চমকাইয়া' দেওয়া
হয়, সঙ্গে-সঙ্গে ভূষামাথা নলটি ঘুরিতে
থাকে ও তাহার লেখনীগুলি পরীক্ষার্থীর
স্নায়ুশক্তির কথা লিখিয়া দেয়।



পরীক্ষার্থীর ক্রান্তি-সহতা পরীক্ষা করা হইতেছে।

আঙ্গুল বাঁকা করিলেই টেবিলের পায়ের কাছে ভারট ওঠে। ঐক্টির
উপর পরীক্ষার্থীর ক্রান্তি লেখা হইয়া যায়।

ধরেন, কাঁটা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে কত সময় লাগিল তাহা পূর্বোক্ত
প্রকারেই নিরূপিত হয়। বাঁহারা শব্দ ও স্পর্শের অনুভূতি $\frac{১}{১০}$ সেকেন্ডে,
এবং দর্শনানুভূতি $\frac{১}{১০}$ সেকেন্ডে, প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহারা
যোগ্য বলিয়া গৃহীত হন। এর চেয়ে বাঁহাদের বেশী সময় লাগে তাঁহারা
বিমান-বিভাগে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের
স্পর্শানুভূতিতে সাধারণতঃ $\frac{১}{১০}$ হইতে $\frac{১}{১০}$ সেকেন্ড, শ্রবনানুভূতিতে
 $\frac{১}{১০}$ হইতে $\frac{১}{১০}$ সেকেন্ড, এবং দর্শনানুভূতি $\frac{১}{১০}$ হইতে $\frac{১}{১০}$ সেকেন্ড
লাগে। যন্ত্র-সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ু-বিচার অসম্ভব।

পরীক্ষার আর একটা বিধ, কণ্ঠপ্রাণীর স্নায়ুশক্তি। সকলেই
জানেন, বাঁহাদের স্নায়ুশক্তি দুর্বল, তাঁহারা কোন উচ্চ শব্দ শুনিবে

পরীক্ষার্থীর হাত ও বাহু সহজেই ক্রান্ত হইয়া পড়ে কি না, ইহাও দেখা
আবশ্যক। একটা যন্ত্রের উপর পরীক্ষার্থী ডান হাতখানা চিত করিয়া
রাখিয়া একটা আঁটার মধ্যে তর্জনী প্রবেশ করাইয়া দেয়। যন্ত্রটিতে
এরূপ বলোবস্ত আছে যে এ অবস্থায় আঙ্গুল বাঁকা করিলেই একটি
ছোট ভার (weight) উপর দিকে উঠিবে ও আঙ্গুল সোজা করিলেই
তাহা আবার নামিয়া যাইবে। পরীক্ষার্থী ক্রমাগত আঙ্গুল বাঁকা-সোজা
করিয়া এই ভারটি উঠাইতে-নামাইতে থাকে। প্রথমে বেশ তাড়াতাড়ি
হয়, পরে যতই আঙ্গুল ক্রান্ত হইয়া আইসে উহার বেগও ততই
কমিয়া যায়। এই ক্রান্তি একখানা ভূষামাথা চাকতির উপর লিপিবদ্ধ
হয়। যে সহজেই ক্রান্তিতে অভিভূত হইয়া থাকিয়া পড়ে, সে বিমান-

বিজ্ঞপ্তি প্রবেশ করিতে পারে না। আকাশবানে বিমানচারীদিগকে যন্ত্র-সঞ্চালক দণ্ডগুলি (levers) খুব দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া থাকিতে হয়, ও যন্ত্র-হঃ নাড়া-চাড়া করিতে হয়, হুতরাং তাহাদের পক্ষে সহজে ক্লান্তিতে অবসর না হওয়া খুবই আবশ্যিক।

ঐ প্রফুল্লচন্দ্র সেন গুপ্ত।

ব্রহ্মপল্লীচিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪

বসন্তকাল। গৃহে গৃহে জ্বীলোকেরা খড়ের টোকা প্রস্তুত করিতেছে। উঠানে বৃহৎ পিপার মত মরাই। ধনীর গোলায় ধান পূর্ণ।

আজ প্রাতে নদীতীরের দৃশ্য অতি মনোরম। পিয়াক-কা-ডিন্ বা পঞ্জিকা-নির্দিষ্ট দিন ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। ঘাটে ধান-বোঝাই নৌকার সারি। যাত্রী ব্যতীত যাহার গৃহে অবস্থান করিবে তাহারও নদীতটে বিরাজমান। মাল-বোঝাই শেষে কতকগুলি বস্তা গড়েন ঘাটের ধূলা-বালির উপর পড়িয়া ছিল। কেহ সেই বস্তা-পৃষ্ঠে বসিয়া ধূমপান করিতেছে, কেহ বড় পাথরটার উপরে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছে, কেহ নৌকারোহী আত্মীয়কে ডাকিয়া সাংসারিক কথা বলিতেছে—নৌকার বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া যাত্রী উত্তর প্রদান করিতেছে। কয়জন বালক-বালিকা যাইতে না পাইয়া তারস্বরে রোদন করিতেছে। যাহার করিবার কিছুই নাই, অনর্থক একটা কোলাহল তুলিয়া সে-ওপারের জঙ্গল কাঁপাইতেছে।

ফো-লোনের বেজায় আনন্দ। মা-পানের সহিত সে এক নৌকায় যাত্রী। সেই নৌকাতে মং-মৌএর, ও তাহাদের নৌকাতে তাহার নিজের যাইবার কথা হইয়াছিল। যাইবার সময়ে মং-মৌ তাহার সহিত নৌকা বদল করিয়াছে। মাথায় রেশমী ক্রমাল বাঁধিয়া দুই উরু চাপড়াইয়া সে গান ধরিয়াছে। তাহার জননী লাঠি হস্তে বকুল-গাছের তলায় বসিয়া আছেন।

যাত্রার পূর্বে জলদেবী 'ঈয়ে নাং'এর পূজা হইল। মন্ত্র-পাঠের সঙ্গে-সঙ্গে চাল-কলা-সুপারি-মসলাদির নৈবেদ্য চাঙারি-সমেত নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল। সমবেত লোকের

কোলাহলের সঙ্গে-সঙ্গে তরঙ্গীগুলি একে একে ছাড়িয়া দিল। বালককিরণোজ্জ্বল জ্বলিল সলিলে দাঁড় ক্ষেপণের তালে-তালে দাঁড়ীরা মঙ্গলাচরণ গান ধরিল। মুহু মুহু হিল্লোলে কনককিরণ মিশিয়া এক অভূতপূর্ব উজ্জ্বল বর্ণ-বিকাশ করিয়া দিল।

দূরে, নব-কিসলয়বস্ত্রপরিহিত বনম্পতির পশ্চাতে গুয়াসার উত্তরীয়ধারী শ্রাম-শৈলরাজ্যপানে বিভোর-নয়নে তাকাইয়া মং-ব্যা মহাশয় ধূমপান করিতেছিলেন,—মা-পান কামরা হইতে নিষ্কাশ্য হইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। ফো-লোনকে দেখিয়া তাহার চঞ্চল নয়নে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সজোরে ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিয়া সেও স্বীয় অপাঙ্গের কোণে উত্তর লিখিয়া দিল।

“পেছনে চেয়ে দেখো বাবা, যেন সকলে বাচ্ খেলছে।”

“মং-লেটের নৌকোই বোধ হয় সকলকে এগিয়ে আসছে?”

লজ্জায় মা-পানের শির নত। মং-মৌই সে নৌকার কর্ণধার।

বামে দ্বাথেইয়ং গ্রামের ঘাট। বিশ-পচিশখানা নৌকা বোঝাই হইতেছে।

“তোমরা কবে বেরুচ্ছ হে?”

“বুধবার সকালে।”

“ঈয়েছইন্ তাগার (কুপ প্রতিষ্ঠাতার) কি খবর?”

“তার ঘর পুড়ে গেছে।”

“কবে?”

“কাল দুপুরে। রাস্তিরটা যাত্রা গেয়ে কাটিয়েছে, আজ ভিক্ষুদের কাছে মাঠে আস্তানা—” আর শোনা গেল না। পিছনের লোকেরা “হেঃএএ—” রবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

প্রায় এগারটা। নদীতীরে জঙ্গল দেখা যায় না। দুই ধারেই গিরিমাটির মত অসমতল ধানক্ষেত। ডান দিকে, দূরের মেঘচুসী আরাকান পর্বতের কিয়দংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; কিয়দংশ নীল ‘এনামেল’ গ্লাসের মত। তাহার অরণ্যাবৃত শিরে গুড়ে-চিনির মঠের মত একটি বৌদ্ধমন্দির।

বাঁকের মুখে তরঙ্গী পালভরে চলিয়াছে। বাঁশের



বর্ষার ৭২৯ পাগোড়ার বাঁধি।

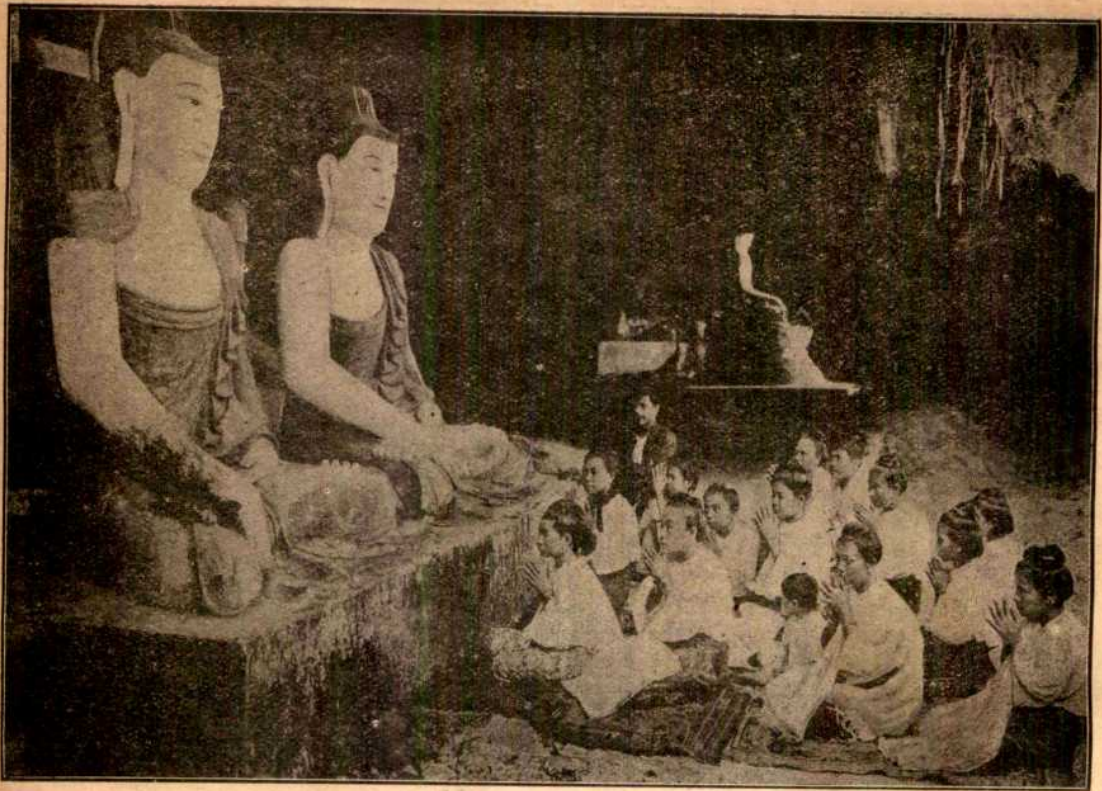
বেড়ায় বের। আমবাগানের কাঁকে দুই চারিটা বৃহৎ টোঙ্ক ঘর নোকোরোহীর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে স্থানের তীর খুব উঁচু সোজা। ক্রমশঃ ঢালু। ঢালুতীরের এক স্থানে রাশীকৃত পলিমাটি। সম্ভব যুৎপাত্র নির্মাণের জন্ত। জেটীর মত ভাসমান কয়খানা তক্তার উপরে জনৈক যুবতী কলসীকক্ষে দণ্ডায়মান; একজন সুন্দরী আবক্ষজলে লুপ্ত প্রসারিত করিয়া দুই করে তাহা মার্জনে নিরত। দুইজন বালক সম্ভরণক্ৰীড়ায় রত। তাহাদের কুকুরটা ঘাটে দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতেছে। উপরে ফলবাগানের মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া। তাহার অনতিদূরে বাঁশঝাড়ের পার্শ্বে, মিশনরিদের কাঠের গির্জা। উভয়ের পশ্চাতে নীল-পর্কতের শিরোভাগ;—মধ্যে বাঁকাচোরা সরু পথ। পথটির উপরে ফলভারাবনত আম্রশাখে বসিয়া একজোড়া হনুমান কলহ করিতেছে।

অপরান্নে হাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে মং-বু মহাশয় বলিলেন—“কাঁটাবনের মাঝে মাঝে ঐ যে পোড়া-কাঠগুলো

দেখা যাচ্ছে ওখানে একটা গ্রাম ছিল। বছর দুই আগে একদিন হঠাৎ একদল ডাকাত এসে পড়ল। প্রাণভয়ে কারেনরা দূরে ঐ হোগলা বনের মধ্যে পালাল। অনেক ধনদৌলত লুণ্ঠ করে তারা গাঁ জালিয়ে চলে গেল।”

তখন—নৃত্যশীল অগ্নিশিখার পশ্চাতে দৃশ্যমান পদার্থের মত, অপরাহ্নকালীন রৌদ্রকিরণপ্রভাবে দূরের শৈলমালা অবিরাম থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

বাস্ত্র ও দ্বিখড়গধারী গণ্ডার-সেবিত জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, সন্ধ্যার পূর্বে বড় একটা গ্রামের ঘাটে নৌকা নঙ্গর করিল। তখন ভাটা। জোয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। নদীর জলে মুখ হাত ধুইয়া মান্নার হাত-পা ছড়াইয়া বসিল। মা-হেনু তোলা-উঠুনে আগুন জালিয়া দিলেন। “মা-পানু মাথা-পিছু দুই আঁজলা হিসাবে চাউল বাহির করিয়া দিল।” চাল ধুইবার সময় ফো-লোন দেখিল ও-ঘাটে মং-মৌ তাহার পিতার নৌকায় রক্ষন করিতেছে। আহা করিয়াই সকলের শয়ন ও নিদ্রা। দিনমানে



বঙ্গের গুহা-মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির পূজা।

অধিকক্ষণ নিদ্রা হওয়ায় মা-পান্ বাহিরে নদীর কাছ
আসিয়া বসিল। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। বাতাস শূণীতল।
মা-পান্ আপন মনে এই গানটি গাহিতে লাগিল—

(বাঙ্গালা উচ্চারণে লিখিত)—

ঈকান্তাঃ ভুঃ ময়া থে লোক
কোন্ মা কা-ইক্ বায়ে
কোন্ মা মানে নাইং মা থাইং নাইং
লোক্ লোক বায়ে
কো মং মং য়ে
গ্যা-গু তান্তাঃ ভেক্ গা লে থাইক্ লো
পান্ মাঃ ফোয়েং সা লোঃ
শেং গো চেইত্ থেঃ মা আলোন্ তায়
অউক্-মে বায়ে ॥

(অনুবাদ)

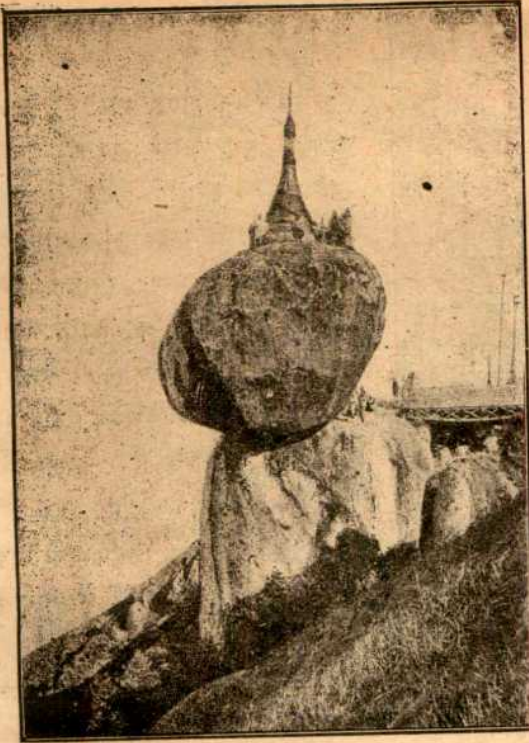
এত্বনে কোনো ঠাই, হেন ভালবাসা নাই
তোমারে যত গো আমি বাসি।
বৈরথ ধরিতে নারি, তোমার মুরতি হেরি
তোমা পানে চেয়ে শুধু হাসি।

বহিঃ মলয় বাত, অলি গুণ্ গুণ্ গাণ,
দুটিয়াছে ঘুল রাশি রাশি।
তোমা তরে এ জীবন, করোছি করেছি পণ
তোমা-রেই শুধু ভালবাসি।

ফো-লোন্ আসিয়া কহিল “কিছু টাকা হাতাবার বেশ
একটা ফন্দী ঠাউরেছি।” সাতনলের কথা মা-পান্ বিস্মৃত
হইয়াছিল। ফো-লোনের কিন্তু তাহার জন্ত আহার নিদ্রা
ছিল না। “ফন্দীটা শুনবে?”

বালক জননীকে সহপাঠীর কথা কিছু বলিতে চাহিলে,
ভাতের ফেন গালিবার সময় জননী যেমন অশ্রুমনস্কভাবে
তাহাকে বলিতে আজ্ঞা করেন, মা-পান্ সেইরূপ ভাবে
বলিল “বল।”

“শুদামে যখন বাবার ধান মাপা হবে—মাপ্ ত'
আমিই—সে সময়ে রেকের মধ্যে হাত পূরে দিয়ে—ঝোড়া-
পিছু কিছু-কিছু ধান কেটে নেবো। বাবাও খুদী হয়ে দু-চার
টাকা কোন্ না দেবেন।”

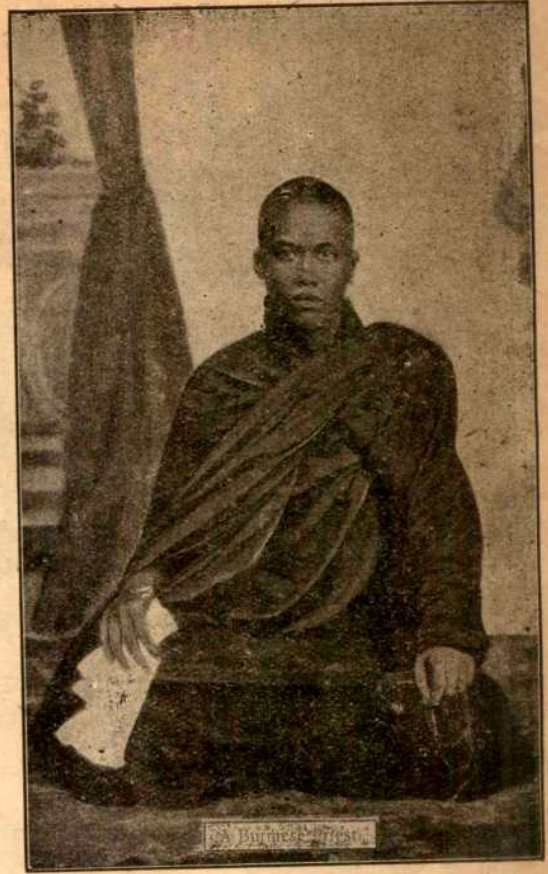


বর্দ্ধার দোহলামান মন্দির।

এই মন্দিরটি পাহাড়ের মাথায় একটা বড় শিলাখণ্ডের উপর নির্মিত।
এই শিলাখণ্ড বাঁহানে দোলে, অথচ এমন ভারসাম্য আছে যে
উটাইয়া নীচে পড়িয়া যায় না; শিলাখণ্ডের আকার
বর্দ্ধার সাম্পান নৌকার মতন বলিয়া মন্দিরটির নাম
সাম্পান পাগোডা; মন্দিরে যাইতে হইলে
প্রধান পাহাড়ের মাথা হইতে মই দিয়া
শিলাখণ্ডে উঠিতে হয়। এই মন্দির
সমুদ্রতল হইতে ৩৬৫০ ফুট
উঁচুতে অবস্থিত।

ধরা পড়িবার ভয় দেখাইয়া মা-পান্ তাহাকে সে সঙ্কল্প
পরিত্যাগ করিতে বলিল। কিন্তু যখন কৌশলটি তাহাকে
ভালরূপে বোঝানো এবং গহনার কথা উল্লেখ করা হইল
তখন সে ফো-লোনকে প্রশংসা করিয়া বলিল—“দুজনে
চুপি-চুপি বাজারে গিয়ে সাতনল কেনা যাবে।”

ত্রয়োদশী রজনীর তৃতীয় প্রহর। শিলাদৈত্যের পৃষ্ঠে
আরোহণ করিয়া নিশানাথ হস্তবর্ষণ করিতেছেন।
মংস্ত্রাজকুমারী তাঁহার গলায় বরমাল্য নিক্ষেপ করিয়া
লজ্জাভরে সলিলতলে পলায়ন করিতেছে। ওপারে,
বনস্পতির সহিত দ্রুতলয়ে কণ্ঠ মিশাইয়া ঝিল্লীকুল ঝাঁঝিট
রাগিণীতে যশকীর্তন করিতেছে।



বর্দ্ধার পুরোহিত।

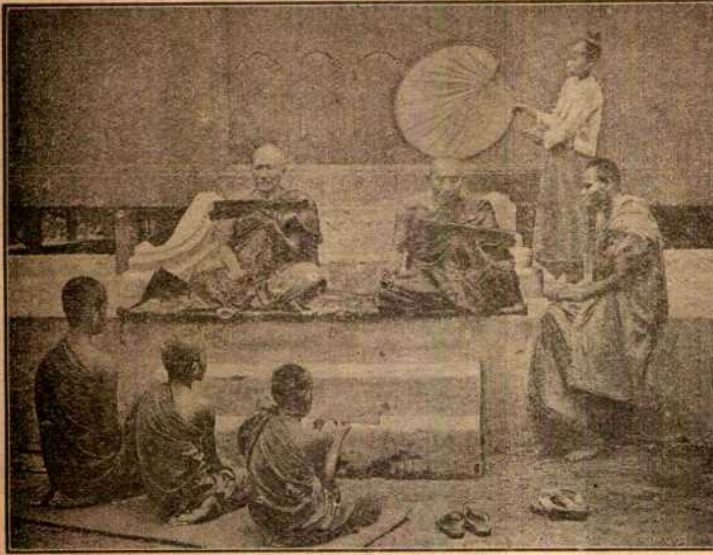
জোয়ারের স্পর্শে নৌকা ছলিতে থাকিলে, মং-বু
মহাশয় জাগরিত হইলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি দাঁড়ীদের
জাগাইয়া দিলেন। দশ পনের মিনিটের মধ্যে নৌকাগুলি
নিঃশব্দে গ্রাম অতিক্রম করিল।

প্রাতে একস্থানে নৌকা লাগাইয়া রন্ধন ভোজন করিতে
হইল। জোয়ার আসিলে নৌকাগুলি পুনরায় বেসিন্
অভিমুখে ছুটিল।

বিস্তৃত নদীবক্ষে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ তুলিয়া একটা মহা-
কায় জাহাজ সাগরমুখে ছুটিতেছিল। মা-পান্ পিতাকে
চাপিয়া ধরিয়া প্রতিমুহূর্তে নৌকাসহ ভুববার আশঙ্কা
করিতে লাগিল।

• “মং-ব—”

বক্তা একজন প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ। জাহাজের পশ্চাতে



বন্দার ফুজি বা পুরোহিতের পাঠশালা ও ভিক্ষু ছাত্র।

রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া, মুখ নীচু করিয়া নৌকা দেখিতে ছিলেন।

“দিগো—বে খোয়া মেলে—এদিকে—কোথায় যাচ্ছ হে?”

“পাতোইং খোয়ামে—এই বেসিনে” বলিয়াই মং-বু-মহাশয় একগাল হাসিলেন। সশব্দে বাষ্পীয় পোত দূরে চলিয়া গেল। সগর্ব্বনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

মা-হেন প্রশ্ন করিলেন “ওঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে না কি?”

“বিশেষ আলাপ! উনি মস্ত বড় লোক,—ওঁর সঙ্গে এক টেবিলে খেয়েছি। ওঁর নামটা কি ভুলে যাচ্ছি—এইহী—বড় ভাল লোক, সেদিন উনি আমার সঙ্গে ‘শেক্‌হ্যাণ্ড’ করেছেন, বেসিনে থাকেন।”

বাঁকের মুখে বেসিন নগরীর কলের চিমনি ও সুউচ্চ প্যাগোডা দেখা গেল। ক্রমে অনেকগুলি জাহাজ ষ্ট্রিমার ময়ূরপাখী সাম্পান নৌকা, বয়া ও জেটি অতিক্রম করিয়া নৌকাগুলি ধীরে-ধীরে একটি সুবৃহৎ গুদামের সম্মুখে আসিয়া নঙ্গর করিল। তীর হইতে নৌকা পর্য্যন্ত ঘোলাজলে ধান ভাসিতেছিল, জলে বড়-বড় তক্তা ভাসানো হইল।

দলের জনকয়েক বস্তা পাঠাইতে নৌকার উপরে রহিল, অল্প সকলে গুদামে ধান মাপিতে অথবা অল্প কাজে চলিয়া গেল। মা-পান্ ফো-লোনকে লইয়া কলকারখানা দেখিতে চলিল।

মং-বু-মহাশয়ের ধানমাপা শেষ হইয়াছে এমন সময়ে সর্ব্বদে ধূলা মাখিয়া মা-পান্ ফিরিল। কলের ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তাহাদের সর্ব্বত্র ঘাইতে অহুমতি দিয়াছিলেন। ইঞ্জিনের অদ্ভুত কার্য্যকারিতার প্রশংসা মা-পানের মুখে আর ফুরায় না।

মিষ্টর থুপি ব্যস্তভাবে সেইদিকে কোথায় ঘাইতেছিলেন। মা-পান্কে দেখিয়া থামিলেন।

মং-বু—“আমারই মেয়ে। আপনার কল দেখতে গিচ্ছো।”

“তোমার মেয়ে? তোমার নাম কি স্তন্দরী? মা-পান্—কুহুম? বেশ নাম!”

মা-পানের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। কি বলিতে হইবে বালিকা খুঁজিয়া পাইল না। শুধু বলিল “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

উত্তর শুনিয়া থুপি সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মা-পানের পিতামাতাও সেই সঙ্গে যোগদান করিলেন। ফো-লোন একটু ম্লান হাসি হাসিল।

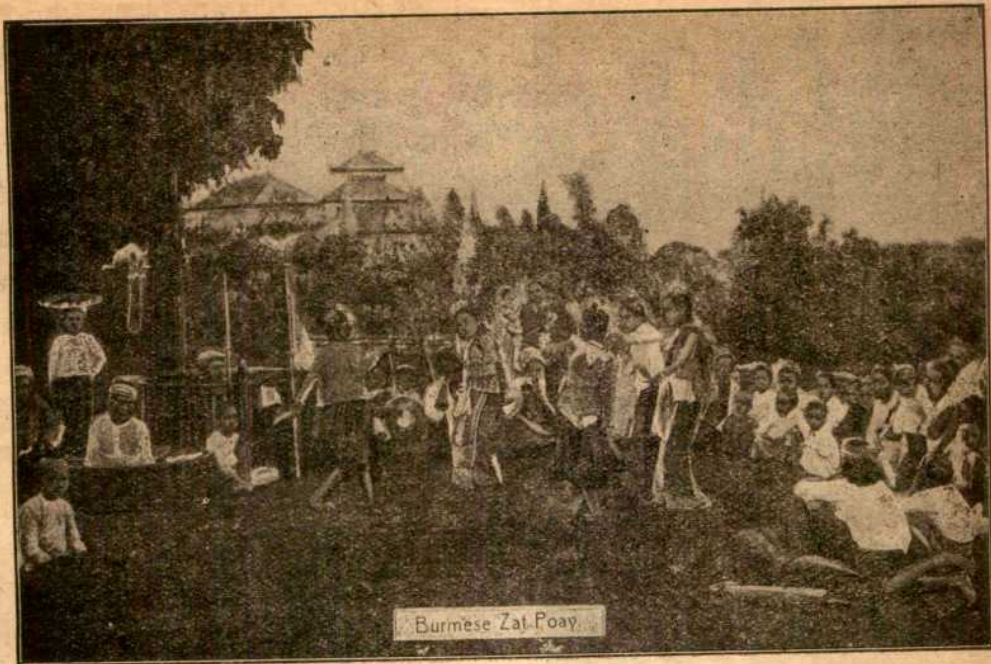
“সহর কেমন দেখলে?—খুব ভালো?—আচ্ছা আমার বাড়ী দেখবে?”

মা-পানের চক্ষু দুইটি ডাগর হইয়া উঠিল। মাতার দিকে চাহিল।

“আপনার দয়া—ও যাবে।”

“আচ্ছা” বলিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন। তিনি বড় ব্যস্ত।

দিনের চেয়ে সন্ধ্যাকালে গুদামের ভিতর জনতা বেশী। প্রকাণ্ড ঘরের একরকম সমস্তটা জুড়িয়াই রাশীকৃত ধান। ধূলা উড়িয়া বিছাতের আলোককেও নিম্প্রভ করিয়া তুলিয়াছে। এক কোণে মং-মৌ ও ফো-লোন মং-লেট্,



Burmese Zat-Poay.

বর্মার উৎসব জাট-পোয়ে ।



A Yen Pwe or Burmese National Dance.

বর্মার রমণীদের নৃত্য ।



বন্দার হন্দরী।

মহাশয়ের ধান মাপ করিতেছে। চট্টগ্রামবাসী বুদ্ধ আব্দুল লতিফ মহাশয় খাতা পেন্সিল লইয়া বুড়ির হিসাব রাখিতেছেন। সবে মাত্র ঘুমভাঙ্গার পর এই হাঙ্গামা, স্বতরাং ফো-লোনের চুরির দিকে তাঁহার নজর নাই।

চুপি-চুপি মং-মৌ বলিল “আর নয় ধরা পড়বে।”

“চেপে যাও, কোনো ভয় নেই।”

পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একজন কর্মচারী সব দেখিতেছিল। থুপি সাহেবকে সংবাদ দিবারাত্রই তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কে?”

“ওই ছোকরা—আমি ছবার দেখেছি।”

অবিলম্বে মং-মৌএর কর্ণমূলে এক প্রবল চপেটাঘাত! মং-মৌ সাহেবকে আক্রমণ করিলে, সাহেব ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ধানের উপর ফেলিয়া দিলেন। “আমি নয়” বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

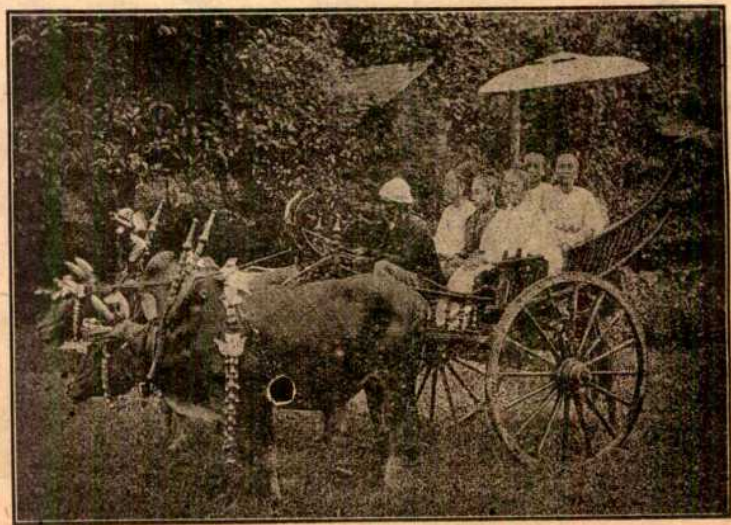
“ও নয় মশাই—” কর্মচারী ফো-লোনকে দেখাইয়া দিল। বামহস্তে ফো-লোনের কব্জি ধরিয়া সাহেব বলিলেন “তুই জেলে যাবি না মার খাবি?”

সকাতরে মং-লেট্ মহাশয় বলিলেন “দয়া করে ছুটা মেরে ছেড়ে দিন।”

বেজ্রাঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে ফো-লোন তারস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। জনমণ্ডলী নির্ঝাক বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে ফো-লোনকে বইয়া তাহার পিতা নৌকাতে ফিরিলেন। মং-মৌএর সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় শোয়েটুন্ বলিল, সে আর ফিরিবে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নিদ্রার পূর্বে মং-লেট্ মহাশয় স্থির করিলেন, পরদিন ফো-লোনকে গোটা দুই টাকা দিতে হইবে।

মং-মৌ যখন গুদাম হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার জ্ঞান ছিল না। পথে সাহেব অথবা ফো-লোনকে পাইলে সে খুন করিত। আলোকিত রাজপথ ধরিয়া সে দ্রুতপদে



বন্দার সওয়ারী গরুর-গাড়ী।



“না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ,
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি!”

চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের দৌজন্তে ।

ম্যানিসিপাল বাজারের সম্মুখে গেল। পিপাসায় কণ্ঠ শুক। লইয়া সাহেবের গৃহে তাহারা উপস্থিত হইল। সাহেব মোড়ে একটি মদের দোকান। ট্যাকে হাত দিয়া দেখিল, পয়সা নাই। বাহা হউক চীনাওয়ান্ পরিচিত। ধারে চলিতে পারে। দোকানটির সম্মুখভাগ খোলা। ভিতরে বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়জন জাহাজী গেরা মদ খাইতেছিল। সাদরে মং-মৌ নিমন্ত্রিত হইল। প্রথম দু এক গ্লাসে মং-মৌ হিসাব রাখিয়াছিল। ক্রমে আট কি আঠারো গ্লাস তাহার স্থিরতা রহিল না।

প্রাতে যখন তাহার চেতনা ফিরিল—সে থানাতে। সঙ্গে একজন সেলবু—নিমন্ত্রিত। কনষ্টেবলের ভাত জল খাইয়া মস্তিষ্কভার কতকটা লাঘব হইল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে প্রথম গোরার বিচার সে বুঝিল না। দেশী ভাষায় তাহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে আদেশ হইলে সে উঠিল।

“তুমি কাল মাতলামি করেছিলে?”

“হ্যাঁ হুজুব।”

“মারামারি করেছিলে?”

“হতে পারে, মনে নাই।”

সাহেব সমস্তই শুনিলেন। অত্যন্ত পিপাসার বশে মদের দোকানে যাওয়া,—গোরাদের সাদর নিমন্ত্রণ—গান—আর—এক গ্লাসের অমুরোবি—আর স্মরণ নাই। হ্যাঁ, সে জঙ্গলী মাছুষ;—বোকা। না, ইতিপূর্বে পুলিশে আসে নাই।

তাহার সত্যতা সন্দেহ হইয়া সাহেব তাহাকে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দিলেন। বাহিবে আসিয়া সে দেখিল গোরটি একজন মুসলমানের সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত। তাহাকে ডাকিয়া মুসলমান বলিল “সাহেব বলছে তোমরা বেকসুর খালাস পেলে অতএব এখন একটু ফুর্তি করা উচিত।” ইঙ্গিতে মদ্যপানের অন্তিম ফল জানাইয়া মং-মৌ নদীর দিকে চলিল।

এদিকে জননীসহ মা-পান বড়ই ব্যস্ত। গতরাতে বাজার হইতে তাহারা রেশমী লুঙ্গী, চাদর ও জামা কিনিয়াছিল। সেইগুলি ও হার, চুড়ি, আংটি প্রভৃতি গহনা পরিয়া, ঘনকৃষ্ণ কেশস্তবকে ফুল গুঁজিয়া, মুখে চন্দন মাখিয়া, পান খাইয়া, কষ্টমুকুবে স্বীয় রূপের দর কবিয়া, লাল মখমলের চটি-জুতা পায়ে দিয়া, আধ হাত লম্বা ‘শালে’ চুরুট হাতে

লইয়া সাহেবের গৃহে তাহারা উপস্থিত হইল। সাহেব তখন নীচের অফিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। তাহাদের উপরে লইয়া গেলেন।

মা-পান একরূপ বাড়ী কখনও দেখে নাই। কার্পেটে মোড়া ঘর, নানাবিধ আসবাব-পত্র, ঘোড়া কুকুরের ছবি, দরজায় ঢুকিতে সাদা ঝালর, বারাণ্ডায় ফুল-গাছের টব, আর কত কি। মা-পানের মাথা গরম হইয়া উঠিল।

মার্কেল পাথরের গোল টেবিলের সম্মুখে পাশাপাশি চেয়ারে তিনজনে বসিয়াছিল। সাহেব মধ্যে। ‘বয়’ তিনগ্লাস বরফ-লিমনেড দিয়া গেল। মা-পান কখনও বরফ খায় নাই। মুখভঙ্গী যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিয়া বরফ খাইতে হইল। মা-হেনু কয়টি চুরুট সাহেবকে দিলেন।

“বেশ চুরুট! কুসুমই বোধ হয় তৈরী করেছে?”

সগর্বে মা-হেনু বলিলেন “আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর মত চুরুট করতে কেউ পারে না।”

“আমার জন্ম কতকগুলি তৈরী করবে?”

সলজ্জ মা-পান চুরুট পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইল। মাতা বলিলেন “দেড় টাকা শ।” মা-পান মাতার দিকে চাহিল। কিছু বলিতে সাহস করিল না। সাহেব বলিলেন “এ ত অতি সস্তা। এক হাজার চুরুট চাই।”

ভোজনের ব্যবস্থাও গুরুতর। প্রত্যেকের জন্ম পৃথক পাতে রুটি, মাখন, পুডিং, জেলি, মটরড, মাংস, মুরগী, নানাবিধ ফল! রূপার মত কাঁটা চামচ!

আহারান্তে বৃহৎ একটি মুরুর সমক্ষে পাঁচ মিনিট অঙ্গ-ভঙ্গী কবিয়া মা-পান নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “আমাদের এমন আরসি নেই!” ঈষৎ হাসিয়া সাহেব বলিলেন “তোমার মত সুন্দরীর ছবি যদি এই আবাসিতে রোজ পড়ত। আপনি কি সে অঙ্কন করবেন!”

কি বলিতে যাইয়া সাহেব থামিয়া গেলেন।

বারাণ্ডার বেঞ্চে তিনজনে বসিয়া আছে। চুরুট হাতে সাহেব অঙ্গমনস্ক।

মা-পান বলিল “কেমন চমৎকার বাগান। আমার বড় থাকতে ইচ্ছে করে।”

চিন্তিতভাবে সাহেব প্রশ্ন করিলেন “তুমি এখানে থাচ্চাও?”

সকলে নীরব। কিছু পরে মা-হেনু কহিলেন “আপনার আজ অনেক কাজ। আমরা যাই, একবার বাজাব যেতে হবে।”

উঠিবার সময় সাহেব বলিলেন “হুন্দরী, তুমি চুরুট নিয়ে আসবে ত?”

“ও নিজে নিয়ে আসবে।”

মা-পানু এক-বাক্স চকোলেট উপহার পাইল।

শুধামের সম্মুখে মং-মৌ তাহাদের সম্মুখে পড়িল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দীর্ঘ কেশরাশি এলোমেলো। সবে-মাত্র ঘাটে স্নান করিয়া নৌকায় শয়ন করিতে যাইতেছে।

চকোলেট-মুখে মা-পানু বলিল “আমরা সাহেবের বাড়ী থেকে নেমস্তন্ন খেয়ে আসছি।”

মাথা নাড়িয়া মং-মৌ চলিয়া গেল।

মা-হেনু বলিলেন “সাহেবরা কখনও মাতলামি করে না।”

মা-পানু বলিল “চুরিও করে না। ধরা পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে নদীতে ডুবে মরা ভাল।”

গ্রামে ফিরিবার কালে মং-বু-মহাশয় ফো-লোনকে নিজ নৌকাতে ডাকিয়া লইলেন। চরিত্র সংশোধন করিতে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। মা-পানু জানাইল, সেও পূর্বে তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। রাত্রিকালে উঠয়ে যখন নৌকার হালের নিকটে গিয়া বসিল, ফো-লোনু বিবাহের কথা উত্থাপন করিল। মুখ ফিরাইয়া মা-পানু শয়ন করিতে চলিয়া গেল।

গ্রামে ফিরিবার পরদিনই সংবাদ আসিল, পার্শ্বের গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে। সম্ভব সেই দিনই মুখিট আক্রান্ত হইবে। অবিলম্বে সকলে টাকাকড়ি লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিল।

অপরাত্নে বিকট চীৎকার করিতে-কবিত্তে ডাকাতের দল গ্রাম আক্রমণ করিল। বিশেষ কিছু হুবিধা হইল না। ফো-লোনু ভালরূপে আত্মগোপন করিতে পারে নাই। জঙ্গল-পথে ডাকাতেরা তাহাকে বন্দী করিল।

এক মাস অতীত। মা-পানের সহিত ধুপি সাহেবেব বিবাহ হইয়াছে। সাহেব মা-হেনুকে ৪০০ টাকা দিয়াছেন।

সেই অর্থে একটা মন্দির প্রাপ্ত হইবে। কায়িক পরিশ্রমে গ্রামবাসীরা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। মং-মৌএর সারাদিনে একদণ্ডও বিশ্রাম নাই। স্থির করিয়াছে কয়জন চীনাগিজি আনাইয়া গাস্থানেকের মধ্যে কার্য সম্পন্ন করিবে। সকলে প্রফুল্ল। একে এত বড় মন্দির গ্রামের গৌরববস্তুরূপ, ততুপরি একজন ধনী খেতাক গ্রামের জামাতা। কো-মং ম্লে মহাশয় আশা করেন সাহেবের কৃপায় অচিরে তাহার একটা উপাধি লাভ হইবে।

সকলেই সুখী। কেবলমাত্র ফোলোনের জননী পুত্র-শোকে অর্ধমৃত। মং-লেট্ মহাশয়কে দেখিলে তাহার বিশেষ কোনও দুঃখ কষ্ট আছে বলিয়া অনুমান হয় না। কিন্তু তাহার গৃহিণী আজ অন্ধ ঋষ। আজ তাহার অঞ্চলের নিধি থাকিলে মন্দির-নির্মাণে সাহায্য করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিত। অতি কষ্টে পেরেক লইয়া তিনি মিস্ত্রিদের বোগান দেন।

সেদিন প্রধান মহাশয় আবার বুঝাইয়া বলিলেন, ফো-লোনের জ্ঞান কোনও চিন্তা নাই। দস্যুরা কখনই তাহাকে হত্যা করিবে না। গভর্ণমেন্ট ডাকাত ধরিবার জ্ঞান পুলিশ নিযুক্ত করিয়াছেন। অচিরে সকলেই ধরা পড়িবে। মং-বু বলিতেছিলেন তাহার জামাতাকে বলিয়া ফো-লোনুকে বিনাদোষে অব্যাহতি দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। ফো-লোনের কোষ্ঠীতে আছে, বর্ষার পূর্বে শনির দশা কাটিলে সে গৃহে ফিরিয়া আসিবে।

একদিন প্রাতে মা-সে উঠানে বসিয়া আঙুন পোহাইতেছেন, একটি বালিকা হাঁকাইতে-হাঁকাইতে দৌড়াইয়া আসিয়া জানাইল, ফো-লোনু আসিতেছে।

“এই দেখ দিদি তোমার ছেলে। এর জ্ঞান তোমার নাওয়া খাওয়া বন্ধ।”

“এখনও ডাকাতের সর্দার, পোষাক দেখ।”

“আমি তখন বলিনি ফো-লোনু এর পব কত টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরবে?”

“দেখ, ভাই গায়ে কি-রকম দতি ও বাঘের উষ্ণি পরা।”

ফো-লোনু বলিল “মা, চটপট খাবার বন্দোবস্ত কর, বড় ক্ষিদে পেয়েছে—এই তোরা সব ভাগ সামনে থেকে।”

শোয়ে-টুন প্রশ্ন করিল “যুদ্ধটা কি খুব বড় গোছের হয়েছিল?”

“বড় হতে পেলে কই? কুস্তাবা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। আমরা কিন্তু অনেক মেরেছি। আমি দলেব কষ্ঠা ছিলাম—সর্দারের মন্ত্রী সেনাপতি ছুইই। তিনি নিজে যুদ্ধ করতেন না। তাঁরই বন্দুক নিয়ে আমি একগুলিতেই কজনকে মাঝে করেছি।”

মা হেন প্রশ্ন করিলেন “কত টাকা পেয়েছ?”

“টাকাকড়ি গহনাগাটা নিয়ে একটা হাতীতে কবে অনেক মাল আনছিলাম। একদিন রাত্রে সর্দার তেজী-বাজীতে সবই ভুতেদের জিম্মায় পাঠালেন। সকালে মাল কোথা গেল, মাল কোথা গেল, খোঁজ পড়ল।—সর্দার বলে ভুতেদের জিম্মায় আছে, ভবিষ্যতে ভাগ পাবে। নইলে দেখতে কত টাকা আনা যেত। যাক, এব পর আসবে।”

“সর্দার কি আবার এ গাঁয়ে পড়বেন।”

“তাঁর ইচ্ছে হয়ত আসবেন, না ইচ্ছে হয়ত না আসবেন। তবে আমার মত না নিয়ে আসবেন না বোধ হয়।”

মং-মৌ বলিল “খুব ধান্না দিচ্ছ যা হোক।”

সভয়ে পাঁচ জনে মং-মৌকে অমন কথা মুখে আনিতে নিষেধ করিল।

“তুমি আমাদের হয়ে তাঁকে আসতে বারণ করো। তুমি মনে করলেই হবে।” অনেকেই মং-বু মহাশয়ের কথায় সায় দিল।

“আচ্ছা দেখা যাবে। তবে আমার বোধ হয় বছরান্তে একটা চৌধু ফৌজ আদায় না করে তিনি ছাড়বেন না।”

প্রধান মহাশয় এতক্ষণ সমস্ত শুনতেছিলেন। ক্রোধ-ভরে দুই জন মাতব্বর ব্যক্তিকে ডাকিয়া চলিয়া গেলেন।

— মং-লেট মহাশয় ডাকাতির কথা-কহিতে পুত্রের কানে কানে নিষেধ করিয়া দিলেন।

ব্যাপারটা এই। ফো-লোনকে বন্দী করিয়া দস্যু-সর্দার বো-তা প্রথমে তাহাকে মোটবাহীরূপে নিযুক্ত করবে। ক্রমে তাহার সেনাপতি অর্থাৎ বন্দুকধারী চেলায় পদে উন্নতি হয়। সভ্যই সর্দার নিজে যুদ্ধ

কবিত না। আক্রমণকালে মালবাহী হাতীব সঙ্গে গভীর অরণ্যে লুকাইয়া থাকিত। যুদ্ধ অর্থে চীৎকার করিতে-করিতে গ্রাম আক্রমণ এবং গ্রামবাসীর দূরে পলায়ন। অনিচ্ছাসঙ্গেও বন্দুকধারী ফো-লোন ছিল নেতা। শেষে একটি গ্রাম লুণ্ঠনকালে, তাহারা পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। সেই সময়ে দলের কয়জন পুলিশ-হস্তে নিহত হয়। পুলিশের কেহই হতাহত হয় নাই। জঙ্গল-মধ্যে বনফলে দুই দিন উদর পূরণ করিয়া ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরিয়াছে।

অপরাত্নে কয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত প্রধান মহাশয় আসিয়া বলিলেন “ফোলোনকে পুলিশের হস্তে প্রেরণ করাই কর্তব্য। তবে তাঁহারা তাহাকে জেলে দিতে ইচ্ছা করেন না। একমাত্র উপায় আছে।”

ফো-লোন একখানি পত্র লইয়া অবিলম্বে বেসিনে পুলিশ-ইন্সপেক্টেণ্টে মহাশয়ের নিকট যাউক। চিঠিতে থাকিবে, ‘ফো-লোন অতি সং-ছোকরা।’ তাহার মত সচ্চরিত্র যুবক গ্রামে দেখা যায় না। মায়ের অমুগত। কোনওরূপ নেশাভাঙ নাই। আপামর গ্রামবাসীব নিবেদন তাহাকে একটি কনষ্টেবলের কার্য্য দেওয়া হউক।’

পরবর্তী শুভদিনে কো-মং-মো মহাশয়ের লিখিত ইংরেজী চিঠি লইয়া ফো-লোন বেসিন যাত্রা করিল।

* * *

একটা বাগান-বাড়ীর ফটকের বাহিরে, সেতুর প্রাচীরের উপরে বসিয়া ফো-লোন পান চিবাইতেছে, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন কর্কণকণ্ঠে কহিল “এই—ওখান থেকে উঠে যা, সাহেবের ঘোড়া তোকে দেখলে ভয় পাবে।”

চমকিয়া ফো-লোন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল—মা-পান!

“অ্যা তুমি ফো-লোন!” মা-পান নিশ্চল। “তোমাকে না ডাকাতে ধরে নিয়ে গিছল? তুমি ভালো আছ?”

মা-পান আজ সে মা-পান নাই। রূপযৌবন গা ফাটিয়া বাহির হইতেছে। মূল্যবান রেশমী পরিচ্ছদ, হীরার-ফুল, সোনার নেকলেস চূড়ি! পডন্ত রৌদ্র লাগিয়া পাছে মাথা ধরে তাই বাম হস্তে রেশমী ছাতা খোলা।

“আমি এখন পুলিশের লোক।”

কি স্পর্ধা! সহরস্বস্ত সকলে যাহাকে সম্মান করে তাহাকে ওরূপ তুইতোকারি করা!

“তুমি এখানে কিজন্তে?”

“সহরের এ অংশটা আমার ভাবে।”

হায় হায়! চার্টগেয়ে কুলি চুলোয় যাক, একটি ছাগলও পর্যন্ত রাস্তায় নাই যে শ্রতুত্ব দেখান যায়!

“তাহলে আমার বাগান থেকে যদি কেউ ফুল চুরি করে তুমি ধোরো। সাহেব বলছিলেন পুলিশের বড় সাহেবকে লিখবেন! তুমি কতদিন চাকরি করছো?”

“হুদিন। আচ্ছা তুমি এখন নিজে বাজার করতে যাও?”

“না, চাকরেরা যায়। আমি এখন, ওই-যে বড় বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওখানে মা-পিনের কাছে যাচ্ছিলুম।”

তাহার হীরার আংটির উপরে রৌদ্র পড়িয়া ফো-লোনের চক্ষু বলসিয়া দিল।

“তোমার খুব বরাত মা-পান্!”

“আমাকে তোমার সেই ছেলেবেলার সাথী বলেই জেনো!—আচ্ছা তুমি বড় চাকরি চাও? সাহেবকে তোমার কথা বলব?”

“তাহলে বড় ভালো—” আরও কি বলিতে গিয়া যুবক চূপ করিল। তাহার শিরায় শিরায় একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিল।

“মাঝে-মাঝে আমার বাড়ীতে এসে দেখা করো। তবু গাঁয়ের খবর পাবো।”

“আমি যাই।”

ফো-লোন্ চলিয়া গেল।

“হ্যা—আবার কাকর সঙ্গে কথা কইচ দেখলে ইনস্পেক্টর সাজা দিতে পারে।”

“এ-যাত্রা থাকিন্ খুব সেরে গেছেন, আমার ভয় হয়েছিল বাঁচবেন না।”

“সামান্য জরে কেউ মরে না স্বন্দরী।”

“খুব বেশী জ্বর হয়েছিল। ও-ব্যায়ামে অনেক লোক মারা গেছে।”

সন্ধ্যাকালে বারান্দায় একটি আরাম-কেন্দারায় শুইয়া

সাহেব বৃক্ষশাখায় পাকা আম দেখিতেছিলেন। মা-পানের সম্মুখে, গোলাপ ফুলের মত ঘুমন্ত শিশু। ডাক্তারেরা সাহেবকে অবিলম্বে বিলাতগমনের উপদেশ দিয়াছেন। রোকদ্দামানপুত্রকে কোলে তুলিয়া জননী বলিল “আহা, বাবা যাবে বলে থোকা কাঁদছে।”

“বোধ হয় পিপড়ে কামড়েছে বলে কাঁদছে। পিটটা দেখো দেখি?”

সভয়ে কাতরে বাড় হইতে পিপীলিকা ছাড়াইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া, * থোকাকে কাঁধে ফেলিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে জননী বলিল—“থোকাবাবু বাবার জন্তে কাঁদছে।”

“আমি গেলে তোমার কষ্ট হবে?”

“হ্যা প্রভু—বড়ই কষ্ট হবে। আটমাস পরে যখন ফিরবেন আমাকে আনবেন।”

“তুমি বাড়ী যাবে নাকি?”

“গাঁয়ের সবাই আমার টম্কে দেখতে চেয়েছে।—সেদিন মা আমাকে আপনার কথাবার্তা শিখতে বলেছে। একটু একটু শিখেছি, না? এই সেদিন কি বল্লে—হ্যা, টম্ আমাদের ইঞ্জলিস্ সন্। লুকিংগা-লাস, লু-পি। আচ্ছা টম্ ইংরিজি বলতে পারবে?”

“তুমি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়েই থেকো।”

“হ্যা যাবো। এমন ছেলে সেখানে কেউ দেখেনি। কেমন টক্-টক্ করছে রং দেখো। আমাকে সবাই ফরসা বলে, আমি ওর চেয়ে ঢের কালো।”

গর্কিতা মাতা থোকাবাবুর কপোল বার-বার আঘাণ করিতে লাগিল।

“দেখ দেখ; আবার কুকুর দেখা হচ্ছে! আপনি টম্কে না দেখে কুকুরই দেখছেন।”

“টম্ কথা কইতে শিখুক, তাকেও দেখবো।”

“কুকুর বুঝি কথা কইতে পারে?”

“পারে বৈকি। এই আমায় বলে মা-পানের কোলে যে বড় ইঁদুরটা রয়েছে ওটাকে মেরে ফেলবো?”

* বর্ধিরা স্ব-হস্তে কোনও প্রাণী হত্যা করে না। তবে মৃতাবস্থায় পাইলে মাংসাদি আহার করিতে বাধ্য নাই। ব্যাধ ও জ্বরেরা বর্ধি-সমাজে ইতর শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। লেখক।

সভয়ে স্বামীর বক্ষে পুত্রকে রাখিয়া মা-পান্ বলিল
“এবার কুকুরকে বলুন টম্ আপনার ছেলে, ইহুর নয়।”

“টম্ বর্মী ছেলে। বড় হলে ফুঙ্গি গুরুর পাঠশালে
‘কাজী’ ‘খা-গোয়ে’* পড়বে; উক্সে উক্সি—”

সভয়ে বাধা দিয়া মা-পান্ বলিল “না, না।”
“মাথায় ঝুঁটি রেখে রুমাল বাঁধবে। লোকে বলবে
বর্মী ছেলেটি—”

“না, না।”

“তবে লোকে কিরিক্সী ‘কাবেয়া’ বলুক, সেই কি
ভালো?”

মা-পান্ পুত্রকে স্বীয় কোলে তুলিয়া লইল।

“আমি গেলে বোধ হয় আমাকে ভুলে যাবে? তোমার
মা সেই লোকটার কি নাম বলছিলো—হ্যাঁ, মং-মৌ!”

“মং-মৌ, সেই ছুতোর! যাকে সেদিন এই বাড়ী
সারতে ছকুম দিয়েছিলুম?—আমি তাকে বিয়ে করব?
কক্ষণ না!”

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী মা-প্যানের পরামর্শ-মত পরদিন প্রাতঃ-
কালীন আহারের পর মা-পান্ আটমাসের খোরাকী স্বরূপ
মোট ২৫০ টাকা পাইবার বায়না ধরিল।

“খাক্সে নিশ্চয় কিছু, বাস্তবিক বলছি আমার কাছে
কিছুই নেই!”

“আপনি আমাকে ভোলাচ্ছেন!”

“সত্যি নেই। বরং তুমাসের মাইনে আগাম নিয়ে খরচ
করেছি।”

“এই বছরখানেক আগে মাকে চারশ টাকা
দিয়েছেন?”

“সেই জন্তই ত’ হাতে কিছু নেই!”

মা-পান্ নির্বাক।

“এখন দিতে পারলে বড় ভালো হত। ফি-মাসে কে
এখানে টাকা নিতে আনবে?”

সাহেব পুবাঁতন বস্ত্রগুলি দেবাজ হইতে মাতুরের উপরে
রাখিতেছিলেন। ধীরে-ধীরে বলিলেন “তোমাদের আসতে
হবেনা, আমি সব বন্দোবস্ত করে যাব।”

“আমার বড় ইচ্ছা ছিল আপনি কতবড় লোক
সকলকে একবার দেখাই।” মা-পান্ কাঁদিয়া ফেলিল।

“আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।”

“মং-লেট কাকা আজ বিকেলে বাড়ী যাবেন। মনে
করুছিলুম সেই সঙ্গে যাব।”

“আচ্ছা একটু পরে বলবো।”

মা-পানের জিনিষপত্র গোছানো হইল। আরসিটি
চাহিলে সাহেব বলিলেন, এত বড় আরসি লইয়া গেলে
সকলে ঠাট্টা করিবে। বুরুশ, চিরুনি, লঠন প্রভৃতি
কয়েকটি দ্রব্য পাওয়া গেল। বিনাশকালে সাহেব বলিলেন
“আমি এলে তুমি আবার এসো।”

“দয়া করে খবর দেবেন। আমি আপনার দাসী।”
তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত।

ছেলে-কোলে মা-পান্ নৌকাতে উঠিল। খোকার
কপোল আশ্রয় করিয়া * তাহাকে নাচাইতে-নাচাইতে
মং-লেট বলিলেন “তোমার কি সুন্দর ছেলে মা—কেমন
খোকা, কেমন খোকা!”

সেলাম করিয়া কুলি দুইজন প্রস্থান করিল।

মা-পান্ বিছানা পাতিয়া পুত্রকে শোয়াইয়া দিল।

ভাটার-টানে প্রবলবেগে নৌকা চলিয়াছে। যে সুন্দর
প্রাসাদে মা-পান্ দেড় বৎসরকাল সর্বসময়ী কৰ্মীরূপে বিরাজ
করিয়াছিল সে প্রাসাদ আর দেখা যায় না। রমণীয়
বেসিন্ নগরীও জঙ্গলের অন্তরালে—কিন্তু তাহার মানস-
পটে সমুদয় ঘটনাই বায়স্কোপের চিত্রের মত অহরহ ফুটিয়া
উঠিতেছে। একি স্বপ্ন! এত আদর যত বিষয় বিভব
মুহূর্তের মধ্যে উড়িয়া গেল।

কাহারও সঙ্গে তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল
না। অনেক সাধ্যসাধনার পর আহার হইল। এক সময়ে
মং-লেট মহাশয় বলিলেন “কো-লোনের খুব উন্নতি হয়েছে।
সবাই বলছে সে শিগুগির জমাদার হবে।”

“হ্যাঁ তার জন্তে আমি সাহেবকে বলেছিলুম। রাস্তায়
টম্-টমে যেতে-যেতে তাকে রাস্তায় পাহারা দিতে অনেক

* বর্শ পড়ুয়াছেলেদের ‘আ’কড়ীওলা ক’ ‘আনাগোনা খ’।

* এদেশে চুশন প্রথা নাই।—লেখক।

দিন দেখেছি। হুঁ একবার গাড়ী থামিয়েও তার সঙ্গে কথা কয়েছি।”

“সবাই বলছে তাব নিজের গুণে সে এতবড় হয়েছে। ডাকাতের সঙ্গার বো-তাকে সেই ধরিয়ে দিয়েছে, তাই এত উন্নতি।”

প্রাতঃকালে একটা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া রন্ধনের আয়োজন হইতেছিল। একদল মেয়ে স্নান করিতে আসিল। সকলেরই মুখে টেমের প্রশংসা। তাহাদের সঙ্গে সাতার কাটিয়া স্নান করিতে করজন যুবতী মা-পানকে বিশেষ করিয়া অহুরোধ করিল। মা-পান বলিল ‘বাথ্রুমে’ স্নান করা তাহার অভ্যাস। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী মা-পিনু বলেন অসভ্যেরাই নদীতে স্নান করে।

পিজালয়ে মা-পান সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। সাহেব তাহাকে কঠোর শাসনে রাখেন নাই সত্য, কিন্তু কোনও যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বে স্বামীকে তাহার পরিচয় দিতে হইত এবং আফিসের কোনও কর্মচারীর সহিত বাক্যালাপের অহুমতি ছিল না। সেই হিসাবে পিজালয় স্থখকর বটে। প্রথম-প্রথম আহারকালে তাহার কান্না পাইত। একদিন তাহার বাটীর ব্যবস্থা শুনিয়া মাতা বলিলেন “ইচ্ছে হয় খাও, না ইচ্ছে হয় ফেলে দাও—বেলা ভাল লাগে না।”

গ্রীষ্মকাল একরকমে কুটিল। বর্ষার দিনে হাঁস মুরগীসহিত ক্ষুদ্র ঘরে থাকা অসম্ভব। সহরে কোথাও যাইবার অভিলাস হইলে সহিসকে খবর পাঠাইলেই হইত, অবিলম্বে বারাণ্ডায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইত। এখানে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির সময়ে গ্রাম-মধ্যে এক কোমর জল দাঁড়ায়। আবশ্যক হইলে নৌকা-যোগে ভিজিতে-ভিজিতে এ-বাড়ী সে-বাড়ী যাতায়াত করিতে হয়। ছেলেবেলার মত এখন আর বারাণ্ডায় বসিয়া খেলানার খড়ের মন্দির ভাসাইতে ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া এই সময়ে তাহাদের লেট বা ত্রত উপবাস জপতপের কাল। লেটের তিনমাস বিবাহ, কর্ণবেধ বা কোনও প্রকার আমোদ প্রমোদ করা নিষিদ্ধ। প্রৌঢ় স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই দিবসে একাহারী হইয়া সাবাদিন মালাঙ্গপেই অতিবাহিত করেন। বাকী সকলে দিবসান্ত্রে কুড়ি ঘণ্টা নিদ্রাতেই কাটিয়।

মেঘ কাটিয়া সূর্য উঠিলে মাঠে লাঙ্গল দেওয়া রীতি। সর্কান্দে কাদা মাখিয়া সন্ধ্যাকালে সকলে বাটীতে প্রত্যাবর্তন করে। আহারের পরেই শয়ন ও নিদ্রা। যে জ্বীলোকেরা দিনমানে গৃহে থাকে, তাহারা সাংসারিক কার্য নইয়াই ব্যস্ত। ফলতঃ বেসিনবাসীর তুলনায় সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র ও অসভ্য।

একদিন ছোট ভগ্নীর সহিত মা-পানের একটু বচসা হইল।

“আমাদের আন্তাবলও তোদের বাড়ীর চেয়ে ভালো।”

“একশ বার! এ বাড়ী ঢের খাবাপ! কিন্তু কি করবে দিদি বল। দিন-কতক পরে ত আবার সেখানে যাবেই, তবে মিছিমিছি মন খারাপ করা কেন?”

স্বামীর পত্রপ্রাপ্তির আর আশা নাই। বড় ইচ্ছা ছিল, একদিন তাঁহার পত্র আসিলে পাঁচজনে তাহাকে ঘিরিয়া পত্র শুনাইতে বলিবে। সে সাধ মিটিল না। একদিন মাতা বলিলেন, “তিনি কি গরজে পত্র লিখিবেন? সব টাকা-কড়ি ত’ কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়াছেন।”

শীতে ধান কাটিবার পালা। সে মাঠে যাইত বটে কিন্তু টমকে কাছ-ছাড়া করিত না। ধুলা রৌদ্র লাগিয়া চেহারা খারাপ হইয়া যাইবার ভয়ে সারাদিন চালা-ঘরে থাকিত। প্রথর রৌদ্রের সময় কেহ কেহ কান্তে হস্তে একটু বিশ্রাম করিতে আসিয়া দুই চারিটি কথা কহিত মাত্র। মং-মৌ মাঠে আসে না যে খোকাবাবুকে কাঁধে করিয়া বেড়াইবে বা খড়ের গহনা নির্মাণ করিয়া সাজাইবে। মা-পানের সহিত সে বেশী কথা কহে না। মা-পানের আগমনকালে সে তাহাকে আনিতে ঘাটে গিয়াছিল, কিন্তু মা-পান সামান্য সূত্রধরের দিকে ফিরিয়াও দেখে নাই।

৬

শশিকলার ছায় টম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন সে মাতার লুঙ্গী অথবা মং-মৌর অঙ্গুলি ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে। হামা দিয়া কাক ধরিতে যায়। স্ত্রীবিধা পাইলেই কাদার উপরে গিয়া চাপড় মারে। মা-পানের মুখ হইতে চুফট-কাড়িয়া গইতে গেলে তিনি বলেন, ঘষন না হ’লে ইংরেজের ছেলে চুফট খায় না। ঠাকুরদাঙ্গা একদিন তাহাকে চুফট খাওয়াইতে গিয়া মেয়ের কাছে অপমানিত হইয়াছিলেন।

শুভদিনে মাল-বোঝাই নৌকা লইয়া অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিল। শত অসুখরোগ সত্ত্বেও মা-পানের কথা রহিল না; সকলেই বলিলেন, অশাচিত ভাবে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। বাটীতে ফিরিয়া মা-পান ভগ্নীকে বলিল “এবার যদি শুনি তিনি ফেরেননি, থোকাকে তোর হাতে ন্যেপে দিয়ে আমি সম্মাসিনী হব।”

“কি বলল দিদি! ও-মা—মাগো—! নিশ্চয় তোর মাথা ধারণ হয়েছে!”

“দেখিস্ তুই, বেসিনের কুমোর-পাড়ায় যে সরাইখানা আছে মাথা মুড়িয়ে সেখানে গিয়ে থাকবো। ঘর ঝাঁট দেবো আর ছত্তরে জল ঝোগাব।”

* * * * *

তখন সন্ধ্যা। মং-ব্য মহাশয় গ্রামে ফিরিলেন। ছেলে কোলে মা-পান নদীতীরে তাঁহাদের স্মৃতি প্রতীক্ষা করিতেছিল। তীরে উঠিয়াই তিনি বলিলেন “অনেক কথা আছে, তোমরা এস।”

বাশঝাড়ের তলায় আসিয়া চুরুট ধরাইতে-ধরাইতে বলিলেন “সাহেবের বদলি একজন নতুন সাহেব এসেছে। তিনি বলেন সাহেবের শরীর সারেনি। একজন আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। ব্যস্ত হইয়া—আরও খবর আছে। তারপরে তিনি মা-পানকে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন।”

মা-হেনু প্রশ্ন করিলেন “কত টাকা;—এসেছে?”

উত্তর না দিয়া তিনি কন্ঠার দিকে দেখিলেন। জনতা হইতে বাহির হইয়া মা-পান সন্ধ্যার অন্ধারে মিশাইয়া গেল।

কয়দিন সে বাটী হইতে বাহির হয় নাই। কেহ আসিলে বিছানায় গিয়া শয়ন করিত।

একদিন বৈকালে, মং-মৌএর সহিত পথে তাহার সাক্ষাৎ হইল। মং-মৌকে দাঁড়াইতে অসুখরোগ করিয়া মা-পান বলিল “থোকা তোমার কোলে যেতে চাইছে। আজ কাল ত’ আর তারদিকে ফিরেও দেখো না।”

থোকাকে কাঁধে বসাইয়া মং-মৌ ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করিল “কোথেকে আসছে?”

“ফো-লোনের মা টমকে দেখতে চেয়েছিলেন। সেখান থেকেই আসছি।”

“ফো-লোন কবে আসবে কিছু শুনলে?”

“শিগ্গিরই বুঝি আসবে, আমি জিজ্ঞেস করিনি। আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। শুনছে বোধ হয় একটা চটী তৈরী করাবো। তোমার পরামর্শ চাই।”

মং-মৌ থোকাকে তাহার মাতার কোলে দিতে গেল।

“কাঁধে করে আমার সঙ্গে নিয়েই এসনা। ও তোমাষ বড় ভালবাসে।”

বাটীর নিকটে আসিয়া মা-পান বলিল “অনেক দিন তুমি আমাদের বাড়ী আসনি। মাথা ষাও কবে আসবে বল। তোমার পরামর্শ ছাড়া কাজে হাত দিতে পারব না। আমার দিব্যি আজ রাত্রে এসো।”

* * * * *

“বেনেলে মায়ে: লা—কিহে কেমন আছ?”

“মা-বা-য়ে:—ভাল আছি। আশা করি আপনাদের কুশল? ২৬ প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত আছেন?” *

“হ্যা বাবা। তুমি এখন বাড়ী যাও।”

ফো-লোন চলিয়া গেলে প্রধান মহাশয় বলিলেন “দেখ্চেন ছোকরার কেমন উন্নতি হয়েছে। কিরকম জ্ঞানীর মত কথাবার্তা শুনলেন?”

“সত্যবটে রূপেগুণে ওর মত গ্রামে কেউ নাই। তবে একটা জিনিস আমার নজরে বাধল। পয়সা খরচ করে কালা মাঝির নৌকাভাড়া করে আসবার আর মোট বইবার স্মৃতি অতগুলো মুটে নিয়ে আসবার কি দরকার ছিল? গ্রামের কারুর নৌকা কি যাতায়াত করে না?”

“ভাই হে লক্ষ্মীদেবী সাবানাংএর রূপা হলে সবই হয়।”

আহারকালে মাতা ফো-লোনকে বলিতেছিলেন “মা-পানের সঙ্গে একবার দেখা কর্বি না কি? সে তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল।”

“সত্যি!”

“সত্যি বলছি। অনেকবার ছেলে কোলে এসে তোর আসবার কথা জিজ্ঞেস করেছে।”

“কিছুই আশ্চর্য নয়। হ’ বড়ই দর্প হয়েছিল। আচ্ছা তুমি ঠিক দেখেছ আমি যখন আসি সে আমায় দেখেছে?”

* পত্র লিখন অথবা কথোপকথনকালে ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে নমস্কার প্রসূতি আর্জিবাদন প্রথা প্রচলিত নাই। লেখক।

“সে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল আমি দেখেছি।”

হাসিয়া ফো-লোন্ ভাবিল নৌকাভাড়ার টাকা আটটা তবে বুধা যায় নাই।

সেদিন সন্ধ্যাকালে ফো-লোনের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া গ্রামের সকলেই স্বীকার কবিয়াছিল সেরূপ ভোজ্য সে-গ্রামে ইতিপূর্বে হয় নাই। জ্যাম্, বিলাতী-হুগ্গ-মিশানো চা, বিস্কুট, নানাবিধ ফল, সাদা-পিপীলিকা-মিশ্রিত বাঁশের গোড়ার সশ্শড়ি, কুমীরের কালিয়া, আরও কত কি! ফো-লোনের আদর-সম্ভাষণ ও মং-মৌএর পরিবেষণে সকলেই ধন্ত-ধন্ত করিয়াছিল। আহা! গ্রামের কয়জন যুবক যুবতী কর্তৃক ‘বুদ্ধদেবের পরিণয়’ গীতাভিনয় হয়। বাটী ঘাইবার কালে মং-মৌ টমের জন্ত কয়খানি বিস্কুট ও একবাক্স লজ্জুস চাহিয়া লইয়া গেল।

পরদিন সকালে আটটার সময় ফো-লোনের প্রাতঃ-ভ্রমণের ইচ্ছা হয়। বিলাতী কোট বুট টেরিতে শোভিত ফো-লোন্ সাহেব নদীতীরে গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতে ছিল। ঘাটে মা-পানের সহিত সাক্ষাৎ। পূর্বেদিবসও উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু ফো-লোন্ কথা কহে নাই। আজ নিজেই কথা পাড়িয়া সে টমের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ফো-লোনের প্রশ্নের উত্তরে মা-পান বলিল “নাঃ, এ বিস্কুট মং-মৌ আজ সকালে খোকার জন্তে মাকে দিয়ে গেছে। আমরা কেউ কিনিনি।”

“কাল রাত্রে এগুলি আমার বাড়ী থেকে চুরি যায়। আমি তাকে জেলে দেবো।”

বিজ্ঞপ্তি শুনিয়া মা-পান্ও হাসিয়া উঠিল।

“তুমি জানো আমি এখন কে?”

হাসিয়া মা-পান্ বলিল “মং-মৌও সকালে মাকে তাই বলছিল।”

“তোমার কাছে সে ঘন-ঘন যায়, না?”

“হ্যাঁ, টম্ তাকে বড় ভাল বাসে।”

“বেসিনে যেতে তোমার ইচ্ছে করে?”

“না, দেশই ভালো।”

“আমরাও এখানে থাকতে ইচ্ছে হয়। তবে কি জানো, সেখানে বড় সাহেবের নজরে থাকা যায়। সাহেব যে রকম ভালবাসে, শিগ্গিরই হয়ত ইনস্পেক্টর হ’ব।”

“তা হলে বেশ হয়।”

“হ্যাঁ, তবে দানিষ্ট বাড়বে।”

“তোমার বাড়ী এসে আনন্দ হচ্ছে?”

“হ্যাঁ, মাকে দেখবার জন্তে মনটা বড় অধীর হয়েছিল।”

“অনেক বন্ধুবান্ধবও ত আছে।”

“কাল একজনের সঙ্গে বিকেলে দেখা হয়েছিল। সে দূকপাতই করেনি।”

“হয়ত ভেবেছিল তুমি কথা কইবে না।”

“মং-মৌর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে খবর দিতে ভুলো না।”

“আহাহা—আর আনিখোতা করুতে হবে না।”

“সকলেই বলে। এই তুমি বললে সে তোমার বাড়ী ঘন-ঘন যায়।”

“ওঃ—আমি সরাই করাব সেই জন্তে।”

“তা হলে রাস্তিরে যাব নাকি?”

“বারণ করুতে পারি না।” মা-পান্ ক্রতবেগে প্রশ্নান করিল।

সাজসজ্জা করিয়া ফো-লোনের জনক জননী মং-ব্য মহাশয়ের গৃহে বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিলেন। কোণী গণনা করাইয়া রাজ্যঘোটক মিল হইয়াছে। মং-লেট মহাশয় শোয়েটুনের হস্তে পাঁচটি টাকা দিয়া অল্প গ্রামের ভালো একদল যাত্রা ও পুতুল নাচের বায়না করিয়া আসিতে বলিলেন।

শুভ দিবসের প্রত্যুষে মনোমত বেশভূষা করিয়া, একটি গরুর গাড়ীর অগ্রে অগ্রে শ্রীমান ফো-লোন্ বিবাহ-যাত্রা করিল। শোয়েটুন্ গাড়ীর চালক। বর রেশমী ছাতা খুলিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। গাড়ীর উপরে শয্যা-দ্রব্য, বস্ত্র, বাক্স, পানের ডিবা, পিক্‌দানি প্রভৃতি ঘর-বসন্তের দ্রব্যাদি। বারাণ্ডা হইতে প্রতিবেশীরা বরকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। মা-সে নিজ সম্পত্তি হইতে কিছু টাকা খরচ করিয়া সম্মানীদের জন্ত বেশ বড় একটা সিঁদে পাঠাইয়া দিলেন।

মং-ব্য মহাশয় বলিলেন “আপনারা অল্পমতি করুন বাবাজীকে নিয়ে যাই। অল্প প্রস্তুত

বারাণ্ডার দাওয়ায় জীলোকেরা নূতন কাঠের পায়ে পায়সাম রাখিয়াছিলেন। বরকতা তাহার সম্মুখে উপবেশন করিল।

প্রধান মহাশয় বলিলেন—“এবার ছুজনে আহাৰ করো। ছিঃ মা, লজ্জা করে না।”

রাত্রির প্রারম্ভেই বাসর-ঘরের ছাদে বৃষ্টিধারার স্রায় প্রস্তর বর্ষণ হইতে লাগিল। দম্পতিযুগল তখন ফুলশয্যা শয়ন করিয়া কথোপকথনে নিযুক্ত। হাসিয়া মা-পান্ বলিল “আইবুড়োরা এসেছে।”

“অনেকদিন ভেবেছি আমিও একদিন এই বাড়ীর ছাদে ঢিল ছুঁড়বো।”

“ধাঃ।”

রাত্তার মং-মোঁ বলিল “আর নয় ছাদ ভেঙ্গে যাবে। গ্রামভাটীটা আদায় করে চল আমার বাড়ী গিয়ে ছবাজী খেলা যাক!”*

(সমাপ্ত)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা

মীরাবাই

প্ৰত আধিন সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বামিনীকান্ত সোম মহাশয় “মীরাবাই” শীর্ষক নিবন্ধে ঐ ভক্তিমতী হিন্দুনারীর জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। “ভক্তমাল” এবং অল্প দু’একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থে সামান্যভাবে মীরাবাই-এর জীবনতিহাস বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সোম-মহাশয় যেরূপ বিশদভাবে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, দুঃখের বিষয়, আমরা অল্পের সেক্ষেপে প্রয়াস দেখিতে পাই না। ইহাতে তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, প্রবন্ধটি অতি মনোবোণ-সহকারে পাঠ করিয়াছি এবং তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। কিন্তু কএকটি স্থলে ভক্তমালে বর্ণিত ঘটনা-পরম্পরার সহিত অনৈক্য দেখিতেছি। অবশ্য, কোন ঘটনাগুলি সত্য এবং কোনগুলিই বা পরবর্তীকালের লেখকবর্গের কল্পনা-প্রসূত, তাহা বর্তমানক্ষেত্রে স্থির নিরূপণ করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু এই অনৈক্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা কর্তব্য-বোধ করিতেছি।

* Mr. E. D. Cunningham-এর With the Jungle-folks in Upper Burma নামক গ্রন্থেও এত্ৰ হইতে এই গল্পটির অধিকাংশ উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি—বর্ম্মি, পালি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সুপণ্ডিত—মোলমিন্-নিবাসী শ্রমণ শ্রীযুক্ত অগ্রবংশ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই গল্পটি পাঠ এবং অনুমোদন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। মৌলিক বর্ম্মিগান দুইটি ও পত্রখানির লক্ষ্য আমি তাহার নিকট ধনী। লেখক।

(ক) সোম মহাশয়ের প্রবন্ধে মীরাবাই-এর জন্মস্থান কুড়কী গ্রাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। “ভক্তমালে” দেখিতেছি, মীরাবাই-এর জন্মস্থানের নাম মেরতা গ্রাম।

(খ) সোম-মহাশয়ের প্রবন্ধে লিখিত আছে যে উদা গিরিধর লালজীকে দেখিতে চাহিলে, মীরাবাই-এর আবুল-আহ্মানে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহলে পরপুরুষ প্রবেশ করিয়াছে সংবাদ পাইয়া ক্রুদ্ধ রাণা মীরাবাইকে অশেষপ্রকার ভৎসনা করিয়া তাঁহার প্রেমানন্দকে দেখিতে চাহেন। নৃসিংহমূর্তিতে প্রকটিত মীরার ইষ্টদেবের দেখা পাইয়া মূর্ছিত হন। এবং সেই রজনী হইতেই, সপ্ন, বিধি-প্রভৃতির সাহায্যে মীরার প্রাণ নাশ করিবার চেষ্টা বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

কিন্তু “ভক্তমালে” আছে যে ‘পাংসা’ আকবর তানসেন সহ বৈষ্ণববেশে রাষ্ট্রদ্রোহী পুত্রে আসিয়া তাঁহার পান শুনিয়া মোহিত হন। তিনি নগর ত্যাগ করিলে প্রকাশ পায় যে মহলে পব-পুরুষ প্রবেশ করিয়াছিল; ইহাতে রাণা

বধু ভ্রষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈরা।

ছুটিয়া কাটিতে গেলা তরবারি লৈরা।

*

*

*

*

বিষ-আদি খাওয়াইল, কিছুই না হয়।

হরির ভক্তজনে বিদ্র কৈ করয়।

এবং কলে—

বৈষ্ণব আসিতে হবে বারণ করিল।

রাষ্ট্রদ্রোহী অন্তরে কিছু ক্ষোভিত হইল।

পুত্র হৈতে নিকাশিলা গেলা বুলাবন।

(গ) সোম-মহাশয় লিখিয়াছেন যে বুলাবন-ধামে মীরাবাই শ্রীজীবগোবিন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। “ভক্তমালে” আছে, মীরাবাই শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দীর সহিত ঐক্লপ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহাই যুক্তিযুক্ত এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে।

বুলাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন।

বাহা হৈল শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দী দরশন।

শ্রীমদ্ব্যংগ-মধন সরকার।

মীরাবাই ও জৌনপুর-প্রসঙ্গ।

আখিনের প্রবাসীতে মীরাবাই প্রসঙ্গে (৭৭ পৃঃ ৩য় প্যারা) আছে “১৫৫৫-১৫৬০ সন্বতের মধ্যবর্তী সময়ে মীরাবাইর জন্ম হয়” আবার শেষ প্যারায় (৫৮ পৃঃ) আছে “৫৬ বৎসর বয়সে ১৬২০-১৬৩০ সন্বতের মধ্যবর্তী সময়ে মীরাবাই দেহত্যাগ করেন।” ১৫৫৫-৬০ মধ্যে জন্ম হইলে ১৬২০-৩০ পর্যন্ত ৬০-৭৫ বৎসর হয়।

বিক্রমজিত বেশী দিন মীরাবাইকে কষ্ট দিতে পারেন নাই। রাণা সংগ্রাম ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাহার বহু অপত্যের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় তাহার জীবিতাবস্থায়ই মারা যান। তৃতীয় রত্ন সিংহ অল্পকালই রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। পরে চতুর্থ বিক্রমজিত রাণা হন। করিম্ভার মতে ১৩৮ হিজরার (ডিসেম্বর ১৫৩১—জানুয়ারি ১৫৩২ খ্রীঃ) জঙ্ঘরাধিপতি বাহাদুর শাহ চিতোর ধ্বংস করেন। প্রবন্ধে প্রকাশ যে চিতোর ধ্বংসে মীরার নির্বাসনের পর। অতএব বোধ হয় মীরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর দেবরের ভয়ে বিক্রমের সিংহাসন-প্রাপ্তির পরই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় চিতোর ত্যাগ করেন। অকবর চিতোরে মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না—প্রথমতঃ চিতোর তাহার প্রধান শত্রুর রাজধানী, দ্বিতীয়তঃ মীরা যখন চিতোবে তখন

অকবরের জন্মই হয় নাই। মীরার শেষ জীবনে, বুলাবনে, অকবরের সহিত সাক্ষাৎ সম্ভব বটে কিন্তু সাক্ষাতের কোন প্রমাণ নাই। তানসেন অকবরের চাকরী ২৮১ হিজরা (১৫৭৩ খৃঃ) কাছাকাছি কোন সময়ে পান। মীরার তুলসীদাসের উপদেশ গ্রহণ সম্ভব নহে। কবিতার ভাবে বোধ হয় চিতোর ত্যাগ কঙ্গিবার পূর্বে তুলসীর মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু তুলসীর জন্ম (১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ) অর্থাৎ চিতোর ধ্বংসের এক বৎসর পরে, তখন মীরার বয়স ২২ ৩০ বৎসর।

জোনপুর প্রদেশে আছে (৫৮৫ পৃঃ ৩য় প্যারা) “শাক্য বংশের ঐতিহ্যকাল ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ। অকবরের রাজত্বকালের পূর্বে পর্য্যন্ত প্রায় শত বর্ষকাল—এবং বরাবর স্বাধীন ছিল।” ১৩২৭ হইতে অকবরের সিংহাসনপ্রাপ্তি (১৫৫৬ খ্রীঃ) ১৫৯ বৎসর হয়। করিষ্টার মতে মহম্মদ তোপ্‌গলু ৭২৬ হিজরা (১৩২৪ খ্রীঃ) আপনার পিতার প্রধান মন্ত্রী খোজা সরবরকে খান-জাহাঁ ও পরে মলিক-উশ-শরফ (পূর্বে দেশের রাজা) উপাধি দিয়া আপনার রাজ্যের পূর্বাংশেব শাসনকর্তা করেন। খোজা, প্রভুকে দুর্বল দেখিয়া স্বাধীন হয়। ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পালিত পুত্র মুবারক রাজা হয় ও এই বর্ষ ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করে। ১৪৭৬ খৃঃ সিকন্দর লোদী হুসেন শকীকে তাড়াইয়া রাজ্য কাড়িয়া লয়। ১৭২ হিজরা (১৫৬৪-৫) খৃঃ অকবর জোনপুর গিয়াছিলেন। সেই সময়ে আপন সেনাপতি মুনজম খাঁ খান-খানাকে একটি পুল প্রস্তুত করিতে অমুরোধ করেন।

মুনজম খাঁ (মুন্সী খাঁ নহে) যে পুল প্রস্তুত করেন তাহার গায়ে তারিখ-লেখা একটি কবিতা আছে। ইহাতে জানা যায় ১৭৫ হিজরা (১৫৬৭-৮ খৃঃ) পুল শেষ হয়। এই মুনজম খাঁ বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রসিদ্ধ খান-খান। ইনিই দাউদের নিধনকর্তা ও বঙ্গবিজেতা।

ঈশ্বরমতলাল শীল।

নমঃশূজের উচ্চশিক্ষা।

কার্তিক মাসের প্রবাসীতে “নমঃশূজের উচ্চশিক্ষা” শীর্ষক নম্ববে নমঃশূজ ছাত্রদিগের পাশের সংখ্যা, যাহা “নমঃশূজ-হিতৈষী” হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। এবৎসর যে-সকল নমঃশূজ ছাত্র পাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা প্রবেশিকা পরীক্ষার ৩৯ জন; আই, এ ৭ জন; আই, এস, সি ১ জন; বি-এ, ৪ জন; বি, এস, সি ১ জন; এতদ্বিধা এম, এও ১ জন পাশ করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দাস,
চাঁদগী ডাক্তার।

“বিরহ ভাবিয়া কান্দে ছুঁঁ দোহাঁ কোলে”

দেখা-ভিক্ষা দিতে তুমি যখন আস প্রিয়া

বিরহেরই ভয়-ভাবনায় ভরে সকল হিয়া—

নিমেষ-পাতের আগেই বুঝি স্বপন যাবে টুটে,

আবার দেখা এই জীবনে জুটেই কি না জুটে;

গিলন-ক্ষণে বিরহেরই ব্যাথা ভরে বুক,

হাসতে গিষে কান্না আসে এ বড় কৌতুক!

ঈঃ—

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

তৃতীয় অধ্যায়।

তিব্বতীয় নিষ্ঠুরতার পূর্বাভাস।

আনি যখন দার্জিলিংএ সাবজুলামার নিকট তিব্বতী-ভাষা শিক্ষা করিতাম, তখন তাঁহার নিকট তিব্বতের এক সাধুলামার জীবনের করুণ কাহিনী শুনিয়াছিলাম। সাবজুলামা তিব্বতে এই ব্যক্তির নিকট বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিতেন; তাঁর নাম ছিল, সেন্‌চিন দোরজিচান। এই ব্যক্তি দলাইলামার সহকারী লামার শিক্ষক ছিলেন। সমুদায় তিব্বত রাজ্যে এই সাধু ব্যক্তির জ্ঞান আর কেহ জনসাধারণের অধিক ভক্তির পাত্র ছিল না। বন্ধুবর শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে এই ব্যক্তির শিক্ষাধীনে কিছুকাল ছিলেন। শরৎবাবু যদিও এই লামার সংশ্রবে অধিক দিন আসেন নাই, কিন্তু তাঁহার এই পরিচয়ের ফল বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। শরৎবাবু তিব্বত হইতে আসিবার অব্যবহিত পরেই তিব্বতরাজ্যে রাষ্ট্র হইল যে শরৎবাবু ইংরেজের চর হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র যে তিন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে শরৎবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েদ করা হইল। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন তাঁহাকে রাহাদানি সংগ্রহ করিয়া দেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি শরৎবাবুকে গৃহে স্থান দেন, তৃতীয় এই সাধুলামা। ইহাকে কারাগারে দিয়াই নিরত হয় নাই—এই নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। আমার বন্ধু সাবজুলামার নিকট এই মহাত্মার জীবনের বিষয় শ্রবণ করিয়া যথার্থই আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। ইহার বৌদ্ধধর্মে যে কিপ্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভক্তি প্রীতি যদি কাহারও প্রতি উচ্ছৃঙ্খিত হয় তবে এই ব্যক্তির প্রতি হইতে পারে। যে-ভাবে এই মহাত্মা নিদারুণ মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক দেবোচিত। সাবজুলামার নিকট আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা নয়। আমি যখন ছদ্মবেশে লাসায় ছিলাম তখনও বিশ্বস্ত

ব্যক্তিদের মুখে এই কাহিনী শুনিয়াছি। শরৎবাবু তিব্বতে গিয়াছিলেন, এই শুভব রাষ্ট্র হইবামাত্র লামা সেন্চিন দোরজিচান বুঝিলেন যে তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে বলিতে লাগিল, “শরৎবাবুর সহিত সংশ্লিষ্ট হৈতু আপনি ঘোব বিপদে পতিত হইলেন, আপনি কি করিয়া রক্ষা পাইবেন জানি না।” তিনি উত্তর করিলেন, “প্রাণ যায় বাবে, আমি আমার কর্তব্য পালন করিয়াছি, বৌদ্ধধর্মপ্রচার আমার জীবনের ব্রত; আমি কি তিব্বতের লোক ছাড়া আর কাহারও নিকট আমার ধর্মের কথা বলিব না? বিদেশীর নিকট বলাতে দোষ কি? শরৎবাবু ‘চর’ কি ‘বৌদ্ধধর্মচোর’ জানি না। যাহা আমার উচিত বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই করিয়াছি।” বাস্তবিক এই বৌদ্ধসাধুর প্রাণের একান্ত বাসনা ছিল, যে, যাহাতে দেশবিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে—এই ধর্মের বিলয় কেন হইল স্মরণ করিয়া কত ক্ষোভ করিতেন, এমন কি তাঁহার কয়েক জন শিষ্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ঘুমপাল মন্দিরের তিব্বতী লামা আমার শিক্ষক মহাশয় অন্ততম। আপানে প্রচারোৎসাহী ধর্মাত্মা অনেক আছেন; তিব্বতে এভাবে একান্ত বিরল। বাস্তবিক সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা ইহার প্রাণে ছিল না। ইহার উদার মত তিব্বতের অভিজাত কুলেব বড় প্রীতিকর ছিল না।—ইহার শত্রুরও অভাব ছিল না। ছিদ্রাষেবী শত্রুগণ ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল। এই সময় শরৎবাবু-সংক্রান্ত কথা তাহাদের বড় মনোমত বোধ হইল। সেন্চিন দোরজিচানের বিপদ ঘনাইয়া আসিল। শরৎবাবুর তিব্বত-বাস প্রচারিত হইবামাত্র সেন্চিন দোরজিচানের প্রতি প্রাণদণ্ডা প্রচারিত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের এক দিবসে সাধুলামাকে হত্যা করা হয়। তাঁহাকে কনবোর (তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম) জলে নিমজ্জিত করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হয়। আমার বন্ধু সাবতুলামা এই করুণ দৃশ্যেব বর্ণনা করিতে করিতে চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন, সেই দৃশ্য আমার চক্ষে আজও ভাসিতেছে, আমিও বড়ই ক্ষোভের সহিত সেন্চিন দোরজিচানের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিতেছি। সে দিনের কথা স্মরণ করিলে আজও আমার প্রাণ ব্যথিত হয়

যেদিন ব্রহ্মপুত্রের (কনবোর) কূলে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর শাস্ত সমাহিত ভাবে উপবেশন করিয়া লামাশ্রেষ্ঠ ধর্ম-পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন, চারিদিকে রৌকদ্যমান তিব্বতবাসী তাঁহাকে ঘিরিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সে সাধুব কোনদিকে ভ্রক্ষেপ নাই—ধানী বৃক্ষের শ্রায় প্রশান্ত মনে তিনি ধ্যানস্থ। মৃত্যুর সময় নিকট হইলে তিনি ঘাতকদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি প্রস্তুত হইয়াছি, এইটুকু পাঠ করিয়া, আমাব এই অঙ্গুলি উর্দ্ধে তুলিয়া তিনবার সঙ্কেত করিব, অমনি তোমরা আমায় নদীর জলে নিক্ষেপ করিবে।” ঘাতকেরা হৃদয় রঞ্জু দিয়া তাঁহার দেহ বন্ধন করিল। চারিদিকে দর্শকগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহারা ভীষণ তরঙ্গায়িত কনবোর ফেনিল জলের দিকে তাকাইয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, চক্ষের জলে তাহারা ক্রমে দৃষ্টিশক্তি হারাইল, সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিবার শক্তি আর থাকিল না। তাহাদের সকলের পূজনীয়, সকলের নমস্যা সাধুর জীবনের এ শোচনীয় পরিণাম তাহাদের প্রাণকে দগ্ধ করিতেছিল। লামা যেই উর্দ্ধে হাত উত্তোলন করিলেন, অমনি তাহাদের ক্রন্দনের রোল গগন ছাইয়া ফেলিল, “হায় এখনই ত সব শেষ হইবে!” “হায় হায় কি হইল?” এই রব সকলের মুখে। ঘাতকদিগের আজ হাত কাঁপিতেছে, তাহাদের পাষণবশ্চ ভেদ করিয়া আজ অশ্রু চক্ষে দেখা দিয়াছে,—আজ তাহারা কর্তব্য সম্পন্ন করিতে কাতর,—সেন্চিন দোরজিচান স্থিরকণ্ঠে আবার বলিলেন, “আর কেন তোমরা বিলম্ব করিতেছ, আমারও সময় হইয়াছে, স্বীয় আমায় জলমগ্ন কর।” তাহারা অশ্রুসিক্ত মুখে কর্তব্য পালন করিল, লামার পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড এক প্রস্তর বাঁধিয়া লড়ি ধরিয়া জলে নিমজ্জিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পবে তাঁহার মৃতদেহ জল হইতে উঠাইয়া লইল—সকলে সবিস্ময়ে দেখিল প্রাণবায়ু তখনও বহির্গত হয় নাই। আবার তাঁহাকে নদীর জলে ডুবাইয়া দিল। আবার তুলিয়া দেখে তখনও তাঁহার প্রাণ যায় নাই। এই সময় দর্শকবৃন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল, “এ সাধুব মৃত্যু নাই—তোমরা আর ডুবাইতে পাবিবে না, ছাড়িয়া দাও ছাড়িয়া দাও।” ঘাতকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি আশ্চর্য্য বিষয় তখন লামা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে

ধীরে বলিতে লাগিলেন, “তোমরা আমার জন্ত শোক করিও না, আমার পৃথিবীর কার্য শেষ হইয়াছে, আমি আনন্দের সঙ্গে মরিতেছি, আমার শুভদিন আসিয়াছে, তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্মের জয় হউক, আমি আর কিছু চাই না, এইবারে আমায় ডুবাইয়া দাও আর দেবী করিও না।”

এইবারে ঘাতকেরা দেহ তুলিয়া দেখে যথার্থই তাহা প্রাণহীন হইয়াছে। তখন তিব্বতী প্রথামুসারে মৃতদেহ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া সকলে কাদিতে-কাদিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। আমি যেদিন সাবতুংলামার মুখে এই কাহিনী শুনিলাম, সে দিন হইতে ইহা আমার প্রাণে গাঁথা আছে। আমি যে তিব্বতযাত্রী। আবার আমার জন্তই বা এমন করিয়া কাহাকে জীবন দিতে হয়, কে জানে ?

চতুর্থ অধ্যায়

ছলনায় যাত্রারস্ত।

১৮৯৮ সালের প্রথম দিবসে সুপ্রভাতে উঠিয়া আমি যথারীতি ধর্মপুস্তক পাঠে এবং ধ্যানে কাটাইলাম। আজিকার দিন আমার সার্থক হউক—এই আমার প্রার্থনা। জাপানেব জয় হউক। জাপানের মহিমাম্বিত সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘ আয়ু, এবং সর্বাদ্বীন কুশল কামনা করিয়া আজিকার দিন ধন্য করিলাম। সমুদায় বৎসরটা তিব্বতীভাষা শিক্ষায় অতিবাহিত করিলাম। বৎসরান্তে দেখিলাম, কি লিখিত, কি চিন্তিত—তিব্বতীভাষা আমি একপ্রকার আয়ত্ত-করিয়া লইয়াছি—অতএব তিব্বতযাত্রায় আর বিলম্ব করা উচিত নয়। যাত্রা-বিষয়ে স্থিরসংকল্প হইলাম। এখন কোন্ পথে যাত্রা শ্রেয় সেই বিষয় লইয়া শরৎবাবুর সহিত পরামর্শ চলিতে লাগিল। দাবজিলিং হইতে তিনটি পথ দিয়া তিব্বত-বাজ্যে গমন করা যায়। প্রথম থামবু রোং অর্থাৎ পীচ উপত্যকা দিয়া, দারজিলিং হইতে নর্যাটং দিয়া পূর্বে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপর দিক দিয়া। তৃতীয় সিকিম দিয়া কামলাজ্যেং দিয়া বরাবর একেবাবে লামা। এই তিনটি পথেই তিব্বতের সীমানায় সপ্তম্ভ গ্রহরী দিবারাত্র পাহারা দিতেছে; স্তত্রাং প্রবেশ অসম্ভব। শরৎবাবু বলিলেন নর্যাটং-পথে গিয়া গ্রহরীকে অস্থলয়-বিনয়

করিয়া বলিলে সে হয়ত জাপানী ধর্মশিক্ষার্থী বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু এ-প্রস্তাব আমার মনঃপুত হইল না। আমি স্থির করিলাম নেপালের পথ দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিব। নেপাল ভগবান বুদ্ধের চরণ-রেণুলাভে পবিত্র দেশ,—বৌদ্ধ-স্মৃতিপূর্ণ,—বৌদ্ধগ্রন্থের অমূল্য-ভাণ্ডার,—সেই রমণীয় নেপালরাজ্য আমার গন্তব্য স্থান হইল। কিন্তু হঠাৎ কি করিয়া দারজিলিং ত্যাগ করি। দারজিলিংএ বিস্তর তিব্বতীর বাস, তাহারা সকলেই শুনিয়াছে তিব্বতযাত্রার জন্ত আমি তিব্বতীভাষা শিক্ষা করিয়াছি। তাহারা যদি ঘৃণাকরে জানিতে পারে আমি তিব্বতে যাইতেছি, তাহা হইলে হয় আমায় হত্যা করিবে, না হয় আমায় তিব্বতে ধরাইয়া দিয়া প্রচুর পুরস্কার লাভ করিবে। অতএব যে-কোন প্রকারে হউক তাহাদের চক্ষে ধূলি দিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া যাত্রার পূর্বে দারজিলিংএ প্রচার করিয়া দিলাম “দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমার এখনই জাপানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।” এই বলিয়া সকলের নিকট রিদায় লইলাম। শরৎবাবু ভিন্ন প্রকৃত কথা কেহ জানিত না। যাত্রার পূর্বে আমার স্বদেশী বন্ধুগণ, হিগো ইতো প্রভৃতি আমায় ৬৩০ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তাহাই আমার পথের সম্বল হইল।

শ্রীহেমলতা দেবী।

শোধবোধ

(মোপাদার গল্প হইতে)

আমি পোনর-বচ্ছব ভিরলঞ্চে যাইনি। সেখানে আমার বন্ধু স্ত্রাবভালের বাড়ী; প্রুসিয়ানেরা যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন তাব বাড়ী ভেঙে গিয়েছিল; সে এখন আবার তা সারিয়ে নিয়েছে। তাব বাড়ীতে গিয়ে শীকার করে বেড়াবার জন্তে আমায় সে নিমন্ত্রণ করেছিল; তাই আবার এখানে এসেছি।

এই জায়গাটার সঙ্গে আমার খুব ভালবাসা হয়ে-গিয়েছিল। এক-একটা জায়গায় এমন একটা মোহিত-করা সৌন্দর্য থাকে যে লোকে যে-আবেগের সহিত তার

প্রেমসীকে ভালবাসে সেইসব জায়গার ওপরও ঠিক সেই-রকম টান হয়। যে-সব লোককে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এই-রকমে মুগ্ধ করে, এক-এক জায়গার হয় একটা বরণা নয় একটা বন কিম্বা একটা জলা অথবা একটা পাশাড় ঠিক যেন একটা আনন্দ-উৎসবের স্মৃতির মতন কোমল-ভাবে জড়িয়ে তাদের মনের মধ্যে জমা হয়ে থাকে। কবে কখন একদিন উজ্জল আলোকের মোহিনী মায়ায় সজ্জিত হয়ে একটা পুষ্পিত বন বা নদীর ঘাট চোখে পড়েছিল কিম্বা তার ছবি মনে আঁকা হয়ে থাকে এবং সময়ে-সময়ে বার-বার তার কথা মনে পড়ে। যেমন পথে ঘাটে বা মেলায় কোনো অচেনা স্ত্রীর কোনো এক বসন্তের প্রভাবে চোখের উপর আনন্দ বুলিয়ে মনের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে যায়, কিম্বা তার স্মৃতি কখনো ভোলা যায় না।

ভিরলঞ্জের সকল-কিছুই আমার ভালবাসার ছিল—তার ছোট-ছোট বনের ভিতর দিয়ে সৰু সৰু সোঁতাগুলি শিরা ধমনীর মতন জমিতে ক্ষেতে রসরস জুগিয়ে ফেরে। জলায়-জলায় কত মাছ, কত পাখী। চমৎকার!

আমি আনন্দমনে পাখীর মতন উড়ে চলেছিলাম, আমার কুকুর ছুটি আগে-আগে শীকার খুঁজে ফিরছিল এবং বন্ধু স্তারভাল আমার ডাইনে কিছুদূরে রহন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলছিল। একটা বনের মোড় ফিবেই আমার চোখে পড়ল একটা পোড়ো বাড়ী।

তখনই আমার মনে পড়ে গেল এই বাড়ীটার যে ছবি আমি ১৮৬৯ সালে দেখেছিলাম—লেপাপোছা বাকবাক পরিষ্কার; বাগানঘেরা দরজার সামনে মুরগী হাস পাখরা চরছিল। পোড়ো বাড়ী তার ভাঙাচুরো কঙ্কালসার দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এর চেয়ে শোকাবহ দৃশ্য আর কিছু নেই। আমার মনে পড়ল একদিন আমি যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তখন এই বাড়ীর গিন্নি আমায় আদর করে কফি তৈরি করে খাইয়েছিল। সেইদিন স্তারভালের কাছে এদের পরিচয় শুনেছিলাম—বাড়ীর কর্তা চোরা-শীকারী ছিল, চুরি করে শীকার করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা পড়ে; তাদের ছেলেটিকে আমি দেখেছিলাম, ঢেঙা একহারা জোয়ান,—দুঁদে চোরা-শীকারী বলে তারও

খ্যাতি রটে গিয়েছিল; এইজন্ত তাদের লোকে বলত বুনো।

আমি স্তারভালকে ডাক দিলাম। সে তিন টপকে আমার কাছে এলে আমি তাকে বুনোদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তখন সে এই গল্পটি বললে।—

জারমানীর সঙ্গে ফ্রান্সের যখন লড়াই বাধল, বুনো ছোকরার বয়স তখন তেত্রিশ। সে মাকে বাড়ীতে একলা ফেলে সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে যুদ্ধে চলে গেল। বুড়ীর জন্তে কেউ বড় একটা বেশী আহা করলে না, কারণ লোকে জানত যে তার অবস্থা বেশ সচ্ছল গোছালো। বুড়ী গাঁয়ের এক টেরে বনেব ধারে নিরালা বাড়ীতে একলাই থাকত। এতে তার ভয় লাগত না, তার বাড়ীর মরদদের মতন তারও মরদ কম ছিল না; টেঙা একহারা পোস্ত রকমের জোয়ালো মেয়েমানুষ সে, সে কারুর সঙ্গে রসিকতাও করত না, কারুর রসিকতা বরদাস্তও করত না। গোঁয়ো মেয়েরা হাসি-তামাসার অবসর পায় না, সেটা পুরুষদের কাজ; মেয়েদের একঘেয়ে কষ্টের জীবন তাদের ম্লান আর সর্পির্ন করে তোলে, তাইতে তাদের মুখ কঠোর হয়ে ওঠে এবং হাসিতে তাদের মুখ একটুও উজ্জ্বল হয় না।

বুনো বুড়ী একলাটি তার দিন গুজরান করত। হুণ্ডায় হুণ্ডায় হাটের দিন খাবার-দাবার কিনতে একবার মাত্র গায়ে ঢুকত। শীত পড়াতে চারিদিক বরফে ছেয়ে গেল; নেকড়ে বাঘ বেরিয়েছে বলে শোনা যেতে লাগল। বুড়ী হাটে-মাঠে যাবার সময় তার ছেলের চোরা-শীকারের সঙ্গী একটা মচে-ধরা ক্ষয়া-কুঁদোর বন্দুক হাতে করে নিয়ে যেত। সেই লম্বা বলিষ্ঠ কঠোর প্রকৃতির বুড়ীকে একলাটি গম্ভীর মুখে বরফের উপর দিয়ে আস্তে-আস্তে বন্দুক নিয়ে যেতে দেখলে গাটা কেমন ছমছম করে উঠত।

একদিন গায়ে জারমানরা এসে পড়ল। তারা ভাগ করে গাঁয়ের লোকের বাড়ী বাড়ী বাসা নিলে, যার যেমন অবস্থা আর যার বাড়ীব যেমন ওসাব তার বাড়ীতে তত জন। বুনো-বুড়ীব অবস্থা ভালো বলে তার ভাগে পড়ল চার জন—লম্বা চওড়া জোয়ান, ধপধপে করসা, মুখ-ভরা চাপদাড়ি, নীল চোখ এবং যুদ্ধের হররানি হটরানি সস্বেও দিব্যি মোটা-মোটা; সদ্য-জয়-করা দেশে এসেও তাদের ব্যবহার বেশ শাস্তি মিষ্ট রকমেরই; তারা তাদের বুড়ো আশ্রয়দাতার

খুব খাতির করেই চলত এবং যতটা পারত তার মেহনত ও খরচ বাঁচাতে চেষ্টা করত।

তাদের চারজনকে প্রায়ই দেখা যেত সেই ঠাণ্ডা কনু-কনে বরফজমা দিনেও কুয়োর ধাবে দাঁড়িয়ে খালি গায়ের উপর বরফের মতন ঠাণ্ডা কনু-কনে জলের আছড়া দিয়ে স্নান করছে, ঠাণ্ডা লেগে গা এমন লাল হয়ে উঠত যে মনে হত তাদের গোলাপী রঙের চামড়া ফেটে এখনই যেন রক্ত বেরুবে। কখনো বা তাদের দেখতে পাওয়া যেত কেউ রান্নাঘর নিকুচ্ছে, কেউ কাঠ চেলাচ্ছে, কেউ তরকারী কুটছে, কেউ কাপড় কাচছে—যেন চারটি সুবোধ ছেলে বুড়ো মায়ের ঘরকন্নার সকল কাজ করে দিচ্ছে।

পরের চার ছেলেতেও বুড়ী ব নিজের এক ছেলের অভাব পোরাতে পারেনি, বুড়ী সদাই তার ছেলের কথা ভাবত—সেই শালের কোঁড়ার মতন ডেঙা ছেলে, তার বাঁশ্বীর মতন নাক, কটা কটা চোখ সদাই বুড়ীর মনে পড়ত। সে যখন-তখন থেকে-থেকে তার অতিথি চারজনকে কাউকে না কাউকে জিজ্ঞাসা করত—“হ্যাঁগা, তোমরা কি জানো হেইশ নম্বর পলটন—ওর নাম কি, ফরাশীদের পলটন—এখন কোথায় আছে? আমার ছেলে সেই পলটনে আছে।” জবাবে তারা ভাঙা-ভাঙা ফরাশী ভাষায় বলত “না জানি না ত; জানি না।”

ঘরে তাদের নিজেদের মায়ের কথা মনে করে তারা বুড়ীর দুঃখ বুঝত এবং তাঁকে সাব্বনা দেবার জন্তে তার সেবায় দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে যেত। যদিও তারা শত্রু তবুও বুড়ী তাদের ভালবাসতে শুরু করেছিল। সাধারণ লোকেরা দেশের শত্রু বণেই লোককে ঘৃণা করতে পেরে ওঠে না; সেটা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ ক্ষমতা। যারা নিম্নশ্রেণীর আর গরীব, সকল লেঠার হেপা পোহায় বেশী করে তারাই; দান্দা ফদাদে তারাই আগে মারা পড়ে, কামানের মুখে আগে তারাই যায়, যুদ্ধের নৃশংসতায় তারাই সব চেয়ে বেশী ভোগে, তাদের দারুণ দারিদ্র্য নতুন নতুন চাপে দুঃসহ হয়ে ওঠে; কারণ তাবা দুর্বল, তারা অবোধ, তারা বাধা দিতে অক্ষম; কিন্তু তারা কিছুতেই ঠিক করে বুঝে উঠতে পারে না বড়লোকদের লড়াইয়ের মানে, তাদের ঠুনকো গৌরবের মহিমা আর পবিত্র পলিটিক্যাল

দায়িত্বের চুলচেরা হিসাব যার হেরফেরে পড়ে ছ'মাসের মধ্যে দু'হুটো জাতকে-জাত জয়ী আর জিত উভয়েই সমানভাবে একেবারে জেরবার হয়ে যায়।

গাঁয়ের লোকেরা বুনো-বুড়ীর জারমান চারজনকে উদ্দেশ্য করে বলত—ওরা বুড়ীর মায়ায় বাঁধা পড়েছে।

একদিন সকাল বেলায় বুড়ী যখন একলা বাড়ীতে ছিল তখন সে দেখলে একটা লোক গাঁয়ের দিক থেকে মাঠ পার হয়ে তার বাড়ীর দিকে আসছে। ঠাণ্ডের ঠাণ্ডের দেখে সে বুঝতে পারলে আসছে যে সে ডাকপিয়াদা। ডাকহরকরা এসে তাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। ভাঙা খাপ থেকে ভাঙা চশমা বার করে সে চিঠি পড়লে—

“ঠাকরুণ,

এই চিঠি আপনাকে দুঃসংবাদ দিতে যাচ্ছে। আপনার ছেলে ভিক্টর, কালকে মারা গেছে, একটা কামানের গোলা তাকে ছুটুকরো করে ফেলেছিল। আমি তার কাছেই ছিলাম, আমরা এক পলটনেরই লোক, যদি কিছু ভাল-মন্দ ঘটে তাহলে আপনাকে খবর দিতে সে আমাকে বলেছিল। আমি তার পকেট থেকে তার ঘড়ীটা নিয়ে রেখেছি তার স্মরণচিহ্ন যুদ্ধ শেষ হলে আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।

প্রাণঃ সীজাব রিভো, তেইস নম্বর পলটনের সেনা।”

চিঠিতে তিন হস্তা আগেকার তারিখ ছিল।

সে কাঁদলে না, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; এমন আঘাত তার লেগেছিল, সে এমন শক্তিত হয়ে গিয়েছিল যে তখন তার বেদনা-বোধ ছিল না। ধানিক পরে তার মনে পড়ল ভিক্টর মারা গেছে। তখন আন্তে আন্তে তার চোখ জলে ভরে উঠল এবং ব্যথায় তার সমস্ত প্রাণ ছেয়ে গেল। একে একে তার কত কথাই মনে হতে লাগল, সে কথার কি তীব্র জ্বালা!—সে আর কখনো তার ছেলেকে কোলে করতে পাবে না! পুলিশের গুলিতে বাপ মারা পড়েছিল; জারমানরা তার ছেলেকে মেরেছে, কামানের গোলায় ছুটুকরো হয়ে কাটা পড়েছে! মায়েব চোখের সামনে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটে উঠল; সে যেন দেখতে লাগল, তার বীর ছেলে গায়ে গোলা লাগতেই দারুণ রাগে লম্বা গোঁপ কামড়ে দরেছে, তার চোখ বিক্ষমিত হয়ে উঠেছে, তারপর তার মাথা ঢলে পড়েছে।

ওরা তার দেহটাকে নিয়ে করলে কি ! যদি তারা তার ছেলেকে তার কোলে ফিরিয়ে এনে দিত, যেমন সে একদিন তার স্বামীকে ফিরিয়ে পেয়েছিল—কপালের মাঝখানে গুলির ঘায়ে রক্ততিলক আঁকা !

হঠাৎ সে কথার শব্দ শুনতে পেলে; তার জারমান অতিথিরা গা থেকে ফিরছে। সে চিঠিখানা চট করে পকেটে লুকিয়ে ফেলে চোখ মুছে অবিলম্বে দাঁড়িয়ে রইল। তারা চার জনেই পরম খুসিতে খুব হাসতে-হাসতে এসে হাজির হল, তারা একটা খরগোস চুরি-করে শীকার-করে এনেছে এবং ইসারায় তাই দেখিয়ে আজকের খোরাকটা বেশ জুতসই হবার সম্ভাবনা বুড়ীকে জানিয়ে দিলে। বুড়ী অমনি খাবারের জোগাড়ে লেগে গেল; কিন্তু খরগোসটাকে মারতে গিয়ে তার হাত আর উঠল না, যদিও একাঙ্গ এই তার নতুন নয়। তখন জারমানদের একজন মাথার ওপর এক কিল মেরে খরগোসটাকে নিক্ষেপ করে দিলে।

খরগোসটা মরে গেলে বুড়ী ছাল ছাড়াতে বসল। কিন্তু তার হাতে রক্ত লাগতে দেখেই সে শিউরে উঠল—তাজা গরম রক্ত তার হাতের ওপর ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাচ্ছে অস্বস্তি করে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল। এই খরগোসের মধ্যে সে দেখছিল তার নিজের ছেলেকে, সেই তার লম্বা জোয়ান ছেলে ছটুকরো হয়ে কাটা পড়েছে, সর্বাঙ্গ তার রক্তারক্তি, এই খরগোসটার মতন হয়ত সেও ধড়ফড় করছিল।

সে জারমানদের সঙ্গে খেতে বসল, কিন্তু এক গ্রাসও সে মুখে তুলতে পারলে না। তারা তার দিকে লক্ষ্য না করেই মনের আনন্দে গোটা খরগোসটা গিললে। বুড়ী চুপ করে গুম হয়ে বসে একএকবার তাদের দিকে আড় চোখে চাচ্ছিল আর কি ভাবছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, “আমরা একসঙ্গে এক মাস হল আছি। আমি কিন্তু এখনো তোমাদের নামও জানি না।”

অনেক করে যখন তারা বুঝতে পারলে সে কি বলছে তখন তারা তাকে নিম্নের-নিম্নের নাম বললে। কিন্তু তাতেই তার হল না, সে তাদের নাম আর বাড়ীর ঠিকানা কাগজে লিখিয়ে নিলে; তারপর তার চোখা নাকের উপর চশমা চড়িয়ে বুড়ী একবার সেই কাঁকড়া-বিছের মতন

অবোধ্য লেখার ওপর চোক বুলিয়ে নিয়ে কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটের মধ্যে ষে-চিঠিখানা তাকে তার ছেলের মরার খবর এনে দিয়েছিল তারই গায়ে রেখে দিলে।

খাওয়া শেষ হলে বুড়ী তাদের বললে—“আমি তোমাদের ক্ষত্রে একটা মজা করছি রোসো।” এই না বলে সে যেখানে জারমানরা শুতো সেখানে বিচুলি বয়ে নিষে যেতে লাগল।

সে এত কষ্ট করছে দেখে তারা যখন আশ্চর্য্য হচ্ছিল তখন সে তাদের বুঝিয়ে দিলে যে এতে তাদের বেশ গরম হবে। তখন তারাও বুড়ীর সঙ্গে বিচুলি বইতে লেগে গেল। আঁটির পর আঁটি বিচুলি সাজিয়ে-সাজিয়ে চাল পর্য্যন্ত উচু করে তুললে এবং ঘরের মধ্যে বিচুলির দেয়াল-দেওয়া আর-একটা ঘর বানিয়ে তুললে। সেই গরম ঘরে বিচুলির মিষ্টি গন্ধ শুঁকে তারা খুব কসে ঘুম দেবে।

রাত্রে খাবার সময়ও তাকে কিছু খেতে না দেখে জারমানদের একজন দরদ জানিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে। সে বললে তার পেট ব্যথা করছে। আঙুন পোহাবার ক্ষত্রে সে বেশ গুনগনে আঙুন জাগিয়ে তুলেছিল। জারমান চারজন মই বেয়ে মটকার নীচে ওপর-ঘরে শুতে চলে গেল।

দরজা বন্ধ হতেই বুড়ী আন্তে-আন্তে মইটি সরিয়ে নিলে। নিঃশব্দে বাঁর-দরজা খুলে রান্নাঘর থেকে আরও বিচুলি আনতে বেরিয়ে গেল। বরফের ওপর দিয়ে খালি পায়েই সে আনাগোনা করছিল যেন একটুও শব্দ না হয়; মাঝে-মাঝে সে থমকে দাঁড়িয়ে জারমান চারজনের পাল্লা দিয়ে নাক ডাকানোর শব্দ শুনছিল।

সব ঠিকঠাক করে এক আঁটি বিচুলি এনে সে আঙুনে ধরলে আর জলে উঠতেই ঘবময় বিচুলির গাদায় সেই আঙুন ছড়িয়ে দিলে। তারপর সে বেরিয়ে এসে দেখতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘরের ভিতরটা আলোয় আলো হয়ে উঠল। দেখতে-দেখতে ঘরের ভিতরটা প্রকাণ্ড তন্দুরের মতন দাউ-দাউ আঙুনে গন-গন করতে লাগল, আর তার আলো জানলা দরজা দিয়ে বাইরে বরফের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ বাড়ীর মটক। হুঁড়ে উচ্চ চীৎকার আকাশ বিদীর্ণ করে দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল—তব্বের আর জ্বালার হাত হতে পরিজ্ঞাপ পাবার জন্তে মানুষের ব্যাকুল আর্তনাদ। চাল ভেঙে ঘরের মেঝের এসে পড়তেই মটক। হুঁড়ে আশ্বনের শিখা উজ্জ্বল-লক-লক করে উঠল; সমস্ত বাড়ীটা একটা প্রকাণ্ড মশালের মতন তখন দাউ-দাউ করে জ্বলছিল।

আশ্বনের শোঁ শোঁ শব্দ, আড়া খুঁটি পড়ার শব্দ, আর মাটি ফাটার শব্দ ছাড়া আর কারুর কোনো সাড়া-শব্দ শোনা যাইছিল না। সমস্ত চালটা ধসে পড়তেই আকাশময় বিস্তৃত কালো ধোঁয়ার গায়ে আশ্বনের হাজার ফুলকি ছড়িয়ে গেল যেন একটা প্রকাণ্ড পাখী সলমা-চুমকি-জাঁটা পেগম মেনে নৃত্য করছে। চারিদিকে বরফে-ঢাকা মাঠ আশ্বনের আভায় লাল-মিনার-কাজ-করা রূপার একখানা প্রকাণ্ড থালার মতন স্থন্দর দেখাচ্ছিল।

দূরে একটা ঘড়ী বেজে উঠল।

বুনো-বুড়ী তার ঘরের আশানের সামনে তখনও বন্দুক-হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল—তার ছেলের বন্দুক—তার ভয় পাচ্ছে জারমান চারজনের কেউ পালিয়ে বাঁচে।

যখন সে দেখলে সব শেষ হয়ে গেছে তখন সে বন্দুক-জ্বলকে ছুড়ে জারমানদের চিত্তার আশ্বনে ফেলে দিলে; অমনি একটা গুলি আওয়াজ হয়ে গেল।

এখন লোক জড়ো হতে আরম্ভ হয়েছিল,—পাঁয়ের চাষারা আর জারমানরা। তারা এসে দেখলে বুড়ী খুঁসি হয়ে একটা গাছের গুঁড়ির উপর চূপ করে বসে আছে।

একজন জারমান অফিসার চোস্ত ফরাশী ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলে “তোমার সিপাইরা কোথায়।”

সে হাত বাড়িয়ে পোড়া বাড়ীর দিকে দেখিয়ে চোঁচিয়ে বলে উঠল “ঐ ওখানে।”

সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। জারমান অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করলে “আশ্বন লাগল কেমন করে?”

সে বললে “আমি নিজেকে লাগিয়ে দিয়েছি।”

কেউ তার কথা বিশ্বাস করলে না, মনে করলে হুঁচটনায় বুড়ীর মাথা বিগড়ে গেছে। তখন সে সকলকে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার—ছেলের মরার খবরের চিঠি আঁসা থেকে

বেড়া-আশ্বনে পড়ে বেচারার জারমানদের কাতর আর্তনাদ পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল ও সে যা যা করেছিল সমস্তই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বর্ণনা করে শোনাতে।

যখন তার বলা শেষ হল তখন সে পকেট থেকে দুখানা কাগজ টেনে বার করলে এবং কৌনখানা কি ভালো করে দেখবার জন্তে চোখে চশমা লাগিয়ে নিভস্ত আশ্বনের সামনে মেলে ধরলে। তা থেকে একখানা বেছে সকলের দিকে দেখিয়ে বললে “এতে ভিক্তরের মরার খবর এসেছে।” তার পর আর-একখানা দেখিয়ে বললে “এতে গুদের নাম ঠিকানা লেখা আছে, তোমরা গুদের বাড়ীতে খবর দিতে পারবে।”

জারমান অফিসার এসে তার ঘাড় চেপে ধরেছিল। সে শান্তভাবে তার দিকে ফিরে বললে “গুদের মায়েদের লিখো, আমি ভিক্তর সাইমনের মা, যাকে লোকে বুনো-বুড়ী বলে সেই আমিই তাদের মেরেছি। কেমন করে মেরেছি সেটা বলতেও ভুলো না যেন।”

অফিসার জারমান-ভাষায় চোঁচিয়ে কি একটা হুকুম দিলে। অমনি জারমান সৈন্তেরা এসে তাকে ধরলে আর বাড়ীর তপ্ত-লাল দেয়ালের গায়ে ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিলে। বারো জন সৈন্ত কুড়ি কদম দূরে চকিতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলে। বুড়ীও একটুও নড়ল না। সে বুঝতে পেরেই চূপ করে অপেক্ষা করছিল।

আবার এক হুকুম হতেই সব-কটা বন্দুক একসঙ্গে একবার আওয়াজ হয়ে গেল, তারপর একে একে পর পর বারো বার।

বুড়ী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল না; যেন তার পা ছুটো কেটে দেওয়া হয়েছে এমনি ভাবে আন্তে আন্তে নীচে নেবে গেল।

জারমান অফিসার তার কাছে এগিয়ে গেল। বুড়ী প্রায় দুখানা হস্কে কেটে গেছে, কিন্তু তখনো সে ছেলের মরার খবরের চিঠিখানা মূঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে আছে, তাতে রক্ত মাধামাধি।

আমার বন্ধু স্ত্রারভাল বললে “জারমানরা এর শোধ তোলবার জন্তে আমার বাড়ীটা পুড়িয়ে দিয়েছিল।”

কিন্তু আমি ভাবছিলাম যারা এই বাড়ীতে দন্ধে মারা গেছে সেই চার বেচারার মায়েদের কথা; আর সেই আর-

এক মাঘের কথা যে এই নৃশংস ভয়ানক প্রতিহিংসা নিয়ে
ঐ দেয়ালের গায়ে গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিল।

আগি আঙনে-পোড়া একটুকরা পাখর মাটি থেকে
কুড়িয়ে নিলাম

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য

সাহিত্য কথাটা যতই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হউক না কেন
এই ব্যাপকতাব একটা সীমা আছে, এই সীমাবোধ সাধারণ
পাঠক বা সমালোচক সকলের মনেই স্বতঃই উদয় হয়।
পুস্তকমাত্রের কি সাহিত্যের অন্তর্গত হইবে?—কোথায়
সাহিত্যের সীমাবেধ? এই প্রশ্নটির বখাষ উত্তর দেওয়া
বড় কঠিন। রেলওয়ে গাইড (Railway Guide) বা
পাক-প্রণালীকে আমরা যথার্থ সাহিত্য বলিতে পারি না,
মেঘনাদ-বধ কপালকুণ্ডলাকে আমরা বেশ জোর করিয়া
সাহিত্য বলিতে পারি। এইরূপ কতকগুলি পুস্তক-বিশেষের
সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ সম্ভব হইলেও আইন করিয়া
সাহিত্যের সীমা নির্দেশ করা স্বকঠিন। কারণ এমন
অনেক কেতাব আছে যেগুলির সম্বন্ধে ‘হাঁ’ ‘না’ কিছুই
সঠিক বলা যায় না। সেইগুলিকে লইয়াই গুণগোল।
পঞ্জিকা, ডাইরেক্টরী অথবা বিজ্ঞান-জগতের কোন একটা
তত্ত্ব লইয়া যে সকল পুস্তক লিখিত হয়, সে-সকলকে অনেকে
সাহিত্য বলিতে চান না। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র,
জ্যোতিষশাস্ত্র এ-সকল অনেকেব মতে সাহিত্যের গভীর
মধ্যে আসে, অনেকের মতে আসে না। সাহিত্যে আমরা
খুঁজি কি? ভাবের গরিমাব সহিত ভাষার পারিপাট্য,
জ্ঞানের গভীরতার সহিত ভাষার সরলতা, জ্ঞানানন্দের সহিত
একটু সৌন্দর্য্যবোধাত্মক রস। সাধারণ সাহিত্যে কোন
সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ না থাকাই ভাল। বিষয়টিও যেন
সাধারণের মনযোগে আকর্ষণ করিতে পারে। ভাব ও ভাষা
দুই-ই সাহিত্যের লক্ষ্য বলা যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশের
জন্তই ভাষা। চুল-খাড়া-করিয়া, ছেঁড়া-শ্চাকড়া-পরিয়া, তেল-
না-মাখিয়া বেড়াইলেই সন্ন্যাসী হয় না। তবে যদি তুমি
ভাবের ঘোরে পোষাকের দিকে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিয়া থাক
তাহাতেই বা দোষ কি?

ভাবটিকে মাহুষ ও ভাষাটিকে পোষাক বলিতে পাবা
যায়। মাহুষ প্রাকৃত অবস্থায় উলঙ্গ; আধ্যাত্মিক চরম
উন্নতিতেও তাহার খোলস খসিয়া পড়ে। কিন্তু যতদিন
তাহা না হয়, ততদিন সভ্য সমাজে বিচরণ করিতে হইলে
পোষাক চাই, নচেৎ যাহুঘরে স্থান লইতে হয়। এখানে
কৃত্রিমতা খাটিবে না। লোকচক্ষু পরছিন্ন অশ্বেষণে বিশেষ
জাগ্রত। তবে পোষাকের আড়ম্বরের সহিত জ্ঞানের
দৈন্ত্য মাহুষকে স্বন্দর করা দূরে থাকুক, হেয় করে।
সাহিত্য-জগতেও এই নিয়মই বর্তমান।

শেক্সপীয়ারের প্রথম জীবনের নাটকের সহিত
মধ্য-জীবন ও শেষ-জীবনের নাটকের তুলনা করিলে এ
বিষয়টি বেশ বুঝা যায়। রবীন্দ্রবাবুর মত “খুসী তোমার
ফুটে উঠে শরত আকাশে” লিখিতে হইলে প্রথমে তাঁহার
মত নিজের মনে ‘খুসীকে ফুটান’ চাই।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ স্বরূপ হওয়া চাই। সাহিত্যের
ভিতর দিয়াই আমরা সমাজের সর্বতোমুখী ক্রমবিকাশের
ইতিহাস প্রাপ্ত হই। সাহিত্যের একটা জীবন আছে।
সুতরাং সাহিত্যের অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা যেন শব্দ-
বিজ্ঞান বা অলঙ্কার-শাস্ত্র বা ছন্দের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া
নিজেকে সিদ্ধকাম মনে না করি।

সাহিত্যেব সৃষ্টি হইল কিরূপে?

মাহুষ সামাজিক জীব, সে কেবল নিজের জন্ত ভাবে না,
পাঁচ জনের ভাবনা তাহার মধ্যে থাকে। আবার নিজের
চিন্তা ও ভাবগুলি সে নিজের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতে
পাবে না। সে নিজের বিষয়ে বা পরের বিষয়োবাহা ভাবে
তাহা প্রকাশ করিবার জন্ত ভাষাব সাহায্য লয়। আর
সমাজের এবং নিজের আদর্শ-মতে এই ভাষার পারিপাট্যের
দিকে, সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখে। ভাষার সৌন্দর্য্যের
দিকে লক্ষ্য না রাখিলে সাহিত্য বিকলাঙ্গ হয়—আর সমাজের
দিক দিয়া বিচাৰ করিতে হইলে ইহা নীতিবিরুদ্ধও বটে।

সাহিত্যের বিষয়।

(১) ব্যক্তিগত জ্ঞান, নিজের সম্বন্ধে চিন্তা, কল্পনা।

(২) মানবের মানব সম্বন্ধে জ্ঞান, চিন্তা এবং কল্পনা।

যথা—জন্ম, মৃত্যু, পাপপুণ্য ও তাহাদের পরিণাম।
পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধ, জগতের সহিত সম্বন্ধ ইত্যাদি।

(৩) সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা ও কল্পনা।

যথা—উন্নতি, অবনতির কারণ, ইতিহাস; সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা।

(৪) প্রকৃতির সহিত সাহিত্যিকের সম্বন্ধ, সাধারণের সম্বন্ধ, তাহার সৌন্দর্য, কার্যকারিতা ইত্যাদি।

সাহিত্যিক যেভাবে প্রণোদিত হইয়া লেখেন; সেই ভাবটি যদি তাহার ভাষার মধ্য দিয়া পাঠকের হৃদয়ে ফুটাইতে পারেন, সেই ভাবটি তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য অল্পভূতির উদ্রেক করিয়াছিল, সেই অল্পভূতিটি যদি পাঠকের হৃদয়ে জাগাইতে পারেন; প্রকাশকালে যে-ভাষা বা ছন্দের সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহা যদি মনোরম হয়, তবে না তিনি সাহিত্যিক? এবং ভাষা বাহাতে সাধারণের মনরঞ্জন করিতে পাবে সেই জন্তই না ব্যাকরণের সৃষ্টি?

সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব।

সাহিত্যকে সকল সময় ঠিক সমাজের দর্পণস্বরূপ বলিতে পারা যায় না—কারণ তাহাতে সাহিত্যিকের চণ্ডার রং এর ছাপ পড়ে। সেইজন্য অনেক সময় সাহিত্যকে সাহিত্যিকের দর্পণস্বরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে। সাহিত্যিক অনেক সময় জগতটাকে নিজের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া-পিটিয়া নূতন একটা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। অথবা জগতের কোন অজানা কোণে কোন অনলুপ্ত সৌন্দর্য লুক্কায়িত ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া দেন—ইহাতেই না তাহার ব্যক্তিত্ব?

সাহিত্যের উপকারিতা।

ইহা আমাদের কুপমগুরু হইতে উদ্ধার করে, ঘরে বসিয়া জগতের বাহিরের এবং ভিতরের ম্যাপ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজেকে জগতের ছাঁচে ঢালিয়া মানানসই করিয়া লইতে পারা যায়। ব্যক্তিত্বের অভিমান দূর হয়—আবার জগতকে নিজের ছাঁচে ঢালিয়া আগন্তকের প্রসার করিতে পারা যায়।

সাহিত্যে ভাষার ধারা।

আজকাল অনেকের ধারণা হইয়াছে যে ভাষার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন সাহিত্যিকের নহে, সেটা বিশেষজ্ঞের। এটি একটি মারাত্মক ভ্রম। যেমন দেহতত্ত্বটি বাদ দিলে মনস্তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়গম্য হয় না, সেইরূপ

(পরিভাষা ও ভাষার অতিগুরু দিকগুলি বাদ দিলেও)

ভাষার যে একটা ধারা আছে সেটার দিকে (তাহার পরিবর্তন, সৌন্দর্য, অবনতি, উন্নতি) লক্ষ্য না রাখিলে তাহার মধ্য দিয়া মানবজীবন ও সমাজের যে পরিবর্তনশীল প্রবাহ গিয়াছে, তাহার অন্বেষণেও সম্যক কৃতকার্য হইতে পারা যায় না। সকল বড় বড় সাহিত্যিকেরই ভাষা একটা বিশেষ ধারা আছে। আবার প্রত্যেক যুগের ধারারও একটা বিশেষত্ব থাকে। সেইটিও তাহার বা সেই সময়ের জীবন-নদের প্রবাহের একটা দিকনির্ণয়-যন্ত্র। আমরা অনেক সময় পড়িতে-পড়িতে দুই একটি অংশ প্রাপ্ত হই যাহার সম্বন্ধে নিঃসঙ্কেতে বলিতে পারি যে “এটি অমকের লেখা,” হয়ত আমরা কি কারণে এরূপ ধারণা করিলাম তাহা ধরিতেও অনেক সময় অক্ষম হই, কিন্তু তবুও যেন ইহা নিতান্ত পরিচিত জনের কথার মত কানে বাজে—শব্দ-বিছাদিত বাক্যগঠন-প্রণালী ও ছন্দের মধ্যে তিনি ধরা পড়েন—ভাবটি যতই সাধারণ হউক না কেন, ভাবটিকে তিনি ভাষার যে ছাঁচে ফেলেন সেই ছাঁচটি যে কাহার মুখের ছাঁচ তাহা আমাদের বুদ্ধিতে বাকি থাকে না।

ভাষাকে ভাবের পোষাক বলিলেও একটু ভুল থাকিয়া যায়, কারণ আমরা একটি পোষাক খুলিয়া আর-একটি নির্ঝিল্লি পরিতে পারি। কিন্তু ভাষায় লেখকের যে-ছাপ থাকিয়া যায় তাহা মুছা যায় না। শেক্সপীয়ারের ভাষা পরিবর্তন করিয়া শেক্সপীয়ারকে উপভোগ করিতে পারা যায় না। কালাইল এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“Style is not the Coat of a writer, but his Skin.” লিখিবার ভঙ্গী লেখকের জামা নয়, তাহা তাহার গায়েরই চামড়া। কিন্তু যাহার বাস্তবিক বলিবার নিজস্ব কিছু আছে তাহার বলিবার ধারাটিও একটু নূতন ঠেকে। “Every spirit builds its own house.” প্রত্যেক মন তার নিজের আবাস গড়িয়া লয়।

ভাষার বিশেষত্বের ভিতরে লেখকের মুখের বিশেষ-বিশেষ রেখাগুলি পর্যবেক্ষণ করা সাহিত্যের আনন্দ-রসের একটি প্রধান প্রসবণ। (This means that literature is a fine art—ইহা হইতে বুঝা যায় যে সাহিত্যও একটি সূক্ষ্মাঙ্গ শিল্প কলা)।

সাহিত্যে কাব্য ।

কাব্য কি ?—প্রশ্নটির উত্তর এ পর্যন্ত সঠিক কেহ দিতে পারেন নাই। তবে চেষ্টা করিতেও কেহ ছাড়েন নাই। সেন্ট আগষ্টাইন জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন—“যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে আমি জানি না, যদি না জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে আমি জানি।” এই উত্তরটি ঠিক ভগবান সম্বন্ধে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাহাই। ইহা অপেক্ষা সঠিকভাবে নির্দেশ করিতে যাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই ফাজিলামি।

কেহ বলেন “কাব্য ছন্দবিশিষ্ট রচনা”, কেহ বলেন “সত্যের কঠোর রসকে কল্পনার ভিড়ানে ফেলিয়া মিষ্ট করিয়া লওয়া।” কেহ বলেন “ভাবের অকষ্ট-প্রসূত উচ্ছ্বাস যে-চিন্তার ও ভাবার সাহায্য লইয়া প্রকাশ হয় সেই চিন্তাময়ী ভাষাই কাব্য।”

মেকলে সাহেব বলেন “সেই শব্দবিজ্ঞান-শিল্পকে আমরা কাব্য বলি যাহা শব্দের বিজ্ঞানের সাহায্যে কল্পনাবাজ্যে এরূপ মোহ আনিয়া দেয় যে তখন কল্পনাতে সত্য ভ্রম হয়—চিত্রকরেরা রংএর দ্বারা যেরূপ চিত্রে বাস্তবতার মোহ আনিয়া দেয়—সেইরূপ।”

কোলরিজ সাহেবের মতে—“ইহা বিজ্ঞানের বিপরীত, আনন্দই ইহার লক্ষ্য, সত্য ইহার লক্ষ্য নহে।”

গার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের মতে—“ইহা সকল জ্ঞানের স্মৃতিতত্ত্বগুলি এবং বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিরই ভাবময়ী উচ্ছ্বাস।”

এইরূপ নানা উপায়ে কাব্য কি তাহা বলিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

কাব্যের উপাদান।

মনুষ্য-জীবনের প্রশ্নগুলির মীমাংসাই সাহিত্যের কাজ, যদি এরূপ বিশ্লিষ্টভাবে বলা সম্ভব হয় তাহা হইলে বলা যায় যে ভাবরাজ্যের এবং কল্পনারাজ্যের মধ্যে যে জীবন, তাহার মীমাংসাই কাব্যের কাজ; চিন্তারাজ্যের মধ্যে যে জীবন তাহার মীমাংসাই বিজ্ঞানের কাজ।

কিন্তু শুধু ভাব এবং কল্পনা লইয়াই কাব্য হয় না। কাব্য একটা শিল্পও বটে। সেই শিল্পের বাহ্যিক একটা সৌন্দর্য আছে। সেটার স্থান ছন্দে।

ছন্দ যেখানে ভাব এবং বস্তুনাতে মিলিত হয় সেইখানেই হইল কাব্যের স্থিতি।

কবির কথায় বলিতে গেলে—এই যে ছন্দের এবং ভাবের মিলন—এটা নিত্যস্থ স্বাভাবিক হওয়া চাই। নায়ক-নায়িকার মিলনের মত, জীবাত্মার পরমাশ্রার মিলনের মত, রূপ এবং গুণের মিলনের মত, উল্লাস এবং হাশ্বের মত, দুঃখ এবং ক্রন্দনের মিলনের মত এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই। এ-মিলন যেন তাহাদের পরস্পর আকর্ষণে ঘটিত হইয়া থাকে, এ-মিলন বাঙ্গালী হিন্দুর বিবাহ-ঘটিত মিলনের মত নহে। তবে না ইহা কাব্য ?

ছন্দকে কাব্যের পোষাক বলিতে পারা যায় না। মনস্তত্ত্ব-বিংগণের নিকট ইহা জানা যায় যে ছন্দ, স্বর বা সঙ্গীত, কাব্যের মধ্যে যে-ভাবটি নিহিত থাকে, চর্চাকালে আমাদের মধ্যেও সেই ভাবপুঞ্জকে মথিত করিয়া, আমাদের কাছে কাব্যের রাজ্যে আনাইয়া দেয়, এবং একটি অপূর্ণ মোহ উৎপাদন করে। ছন্দপাত করিয়া কাব্যরসাস্বাদ করিতে যাওয়া আর মুক্তাধবল শিশিরবিন্দু-সকলের সঙ্গে হস্ত প্রয়োগ করিয়া সৌন্দর্য উপভোগ করিতে যাওয়া একইরূপ কৃতকার্যতা আনয়ন করে।

কাব্যে সত্যতা।

বিজ্ঞান আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞান দান করিয়াই চূপ করিয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু কাব্য—এসকল বস্তু বিষয়ক জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কিরূপ ভাবের উন্মেষন করে, কিরূপ কল্পনার তরঙ্গ উথিত করে তাহাই দেখায়।

কাব্যের সর্বাঙ্গীন সার্থকতার ও সত্যতার মাপ করিতে হইলে কবির বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান যথার্থ কি না এবং তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত উচ্চ বিষয়ের ছবিগানি এবং ঐ বিষয়-জ্ঞাত, হৃদযোথিত তরঙ্গমালা প্রাকৃতিক না কৃত্রিম, সে বিষয়েও পরীক্ষা চলিবে।

মনুষ্য-সমাজে কবির স্থান।

কেহ কেহ বলেন—ঘরের যেমন কার্নিস—বাড়ীর যেমন বাগান, কবিও সমাজের তেমনই একটি অনঙ্গসৌষ্টবের সামগ্রী মাত্র। কিন্তু তাহা নহে। কবি আমাদের সৌন্দর্য উপভোগ করিবার চক্ষু ফুটাইয়া দেন। এই বাস্তব-জগতে

অতিক্রিয়ের সংবাদ আনিয়া দেন। জীবজগত বাস্তবকে যে-শান্তির আশায় যুগের পর যুগ আঁকড়াইয়া ধরিতেছে ও বিতুলমনোরথ হইতেছে কবি তাহার ভয়ঙ্কর জোড়া লাগাইবার জন্য অতিক্রিয়ের রাজ্য হইতে আনীত শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতেছেন। জগতে কয়জন লোক চক্ষু থাকিতেও অন্ধ নয়? কান থাকিতেও কালা নয়?

সাহিত্যে নাটক এবং উপন্যাস।

আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থানাভাবের জন্যও বটে আর নাটক এবং উপন্যাসের সম্বন্ধের নৈকট্যের জন্যও বটে, এই দুইটি একত্র আলোচিত হইল। উভয়ের সাদৃশ্য এবং পার্থক্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেই উভয়েরই স্বরূপ প্রস্ফুটিত হইবে।

মানুষ নিজেকে জগৎ হইতে স্বতন্ত্রভাবে ভাবিতে পারে না, নিজের বিষয় ভাবিতে হইলেই জগতের ভাবনা আসে, নিজের সমালোচনা করিতে গেলে জগতের সমালোচনা আসে; এমন কি মানুষ নিজের বিষয় প্রথমে ভাবিতে শিখে না, তাহার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর ভাবনাই তাহাকে শেষে আত্মচিন্তায় লিপ্ত করে, ইহাই মনস্তত্ত্ববিৎগণের মত। মানব এই ভাবনার অভিব্যক্তির জন্যই যুগের পর যুগ সাহিত্যের সাহায্য লইয়া আসিতেছে। সাহিত্যের শিল্পের দিকটা সমাজের ক্ষতি এবং সুবিধার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে যুগে যুগে এক একটা নূতন আকার ধারণ করে। মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস—এই শিল্পের এক-একটা আকার। নাটকে ঠিক সাহিত্যশিল্প বলা যায় না—কারণ ইহা বাস্তবের অঙ্কুররূপ রঙ্গমঞ্চের সাহায্য লয়। উপন্যাসই এই আকারগুলির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণাবয়ব। উপন্যাসকে মেরিঅন ক্রফোর্ড (Marion Crawford) পুকেট-নাটক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

উপন্যাসের উপাদান।

(১) ঘটনা—অর্থাৎ যে-সকল কার্যকলাপ অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছে।

(২) চরিত্র—যাহাদিগকে লইয়া এবং যাহাদের দ্বন্দ্ব এই-সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে।

(৩) চরিত্রগুলির কথোপকথন—এইটিকে একটি পৃথক বিভাগ না বলিয়া দ্বিতীয় বিভাগের অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

(৪) দৃশ্য এবং কাল—যে-সকল স্থানে এবং যে-যে সময়ে ঘটনা পরস্পরা ঘটয়া গিয়াছে।

(৫) ভাষা।

এই পাঁচটি বিভাগে উপন্যাসকে মোটামুটি বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়।

উপন্যাসের আর-একটি অঙ্গ আছে যাহা উপেক্ষার জিনিষ নয়, যাহা লেখকের জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক উপন্যাসক্ষেত্রে বর্তমান,—এইটি হচ্ছে মনুষ্যসমাজের কতকগুলি দিকের সমালোচনা—কতকগুলি তত্ত্বের নির্দেশ ও সমাধান—লেখকের জগৎ ও সমাজ সম্বন্ধে ধারণা।

নাটকেও মোটামুটি এই কয় ভাগেই বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—

(১) নাটকে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য বলা যায় না—ইহাকে রঙ্গমঞ্চের নির্দিষ্ট নীমার মধ্যে থাকিতে হয়, এবং রঙ্গমঞ্চের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ইহারও অবয়বের পরিবর্তন সমাধিত হইয়া আসিতেছে।

(২) ব্যক্তিস্বাধীনতা—উপন্যাসে লেখক প্রকাশ্যভাবে বা অবাঞ্ছিতভাবে চরিত্র, ঘটনাবলী, দৃশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া ঘটনাবলীর স্বচ্ছতা সম্পাদন করিতে সক্ষম। নাটকে ঘটনাবলী ও চরিত্রের স্বতঃবিকাশ হইতেই আমাদের যাহা কিছু ধারণা-করিয়া লইতে হইবে—লেখক কোন সাহায্য করিতে পাইবেন না (অন্ততঃ গাঢ়া কা না দিয়া)।

(৩) উপন্যাসের অবয়ব লেখকের ইচ্ছামত বৃহৎ হইতে পারে, কারণ তাহা কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পাঠ শেষ করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম নাই। পক্ষান্তরে নাটকের অভিনয়ের সময় খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ছাঁটিয়া-ছুটিয়া লইতে হয়। এই কার্য অনেক সময় রঙ্গমঞ্চের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। এ-বিষয়ে শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথই চরম দৃষ্টান্ত। আকারে কত ক্ষুদ্র হইয়া সাহিত্য-জগতে উহা কত বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ম্যাকবেথ ও উহার পত্নী সাহিত্যজগতে সর্বোপেক্ষা প্রাণময়—সর্বোপেক্ষা বৌতুলোদ্দীপক সৃষ্টি—অথচ বত সংক্ষেপ! বঃটি বখায় গড়া!

সাহিত্যে প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ বহুমুখী। ইহার অবয়ব ও উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট। সেই কারণে ইহাকে এখনও সাহিত্যের একটি স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ বিভাগ বলিতে পারা যায় না।

বঙ্গসাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার দিকে খুব অল্প সাহিত্যিকই অগ্রগামী।

বেকনের প্রবন্ধকে ‘অতি সংক্ষিপ্ত জ্ঞাননির্ঘাস’ বলা যাইতে পারে। মণ্টেস্কের প্রবন্ধ—চিন্তাপ্রবাহ, অন্তর্পুঁথি ইহাতে প্রামাণিক উল্লেখ এবং উদাহরণের একটি খিচুড়ি বিশেষ।

লকের প্রবন্ধ Human Understanding ত দার্শনিক চিন্তায় ঠাসাঠাসি একটি বৃহদাকার গ্রন্থ। মেকলে, স্পেনসারের প্রবন্ধগুলি এক একখানি পুস্তক। পাশ্চাত্য মনসীগণের প্রবন্ধক্ষেত্রে এইরূপ বিরোধী অবস্থা ইহাতে আমরা প্রবন্ধের স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সন্দিগ্ধতা আসিতে পারিলাম না।

শব্দার্থ-নির্দেশ-ধুরন্ধর জনসনের ব্যাখ্যামুসারে “চিন্তা-রাশিকে হজম হইবাব পূর্বাবস্থায় যদি বমন করা হয় তাহা হইলে তাহাকে প্রবন্ধ কহে”—তাহাতে ভাত, স্তাল তরকারি সবই থাকে। তাঁহার মতে ত ইহা তবে সাহিত্যের রোগ-বিশেষ।

আমাদের ভাষায় Essayকে প্রবন্ধ বা রচনা এবং Treatiseকে ‘পুস্তিকা’ বলা যাইতে পারে।

প্রবন্ধের বিষয় একটি; নিয়মের বাধাবাদি বিশেষ কিছুই নাই; ভাবের সম্পূর্ণ পরিষ্কৃতি বা চিন্তার উদ্দাম-লহরী প্রবন্ধে থাকিবে না। আকার নাতিবৃহৎ (২-১০ পৃষ্ঠা)। Treatiseএ লেখক নিরপেক্ষভাবে, ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত পর্যন্ত না করিয়া নির্দিষ্ট বিষয়ট আলোচনা করিবেন। কিন্তু Essayতে—লেখক যথেষ্ট নিজ মতামত প্রকাশ করেন ইহাই অভিপ্রেত।

সাহিত্যে ক্ষুদ্র বা চুটকি গল্প।

চুটকি-গল্প দিন-দিন সাহিত্যের প্রিয়তম অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার কাহিনীর কতকগুলি কারণ দেখা যায়।

(১) এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে সাধারণ পাঠক

হোমিওপ্যাথিক ডোজেই সাহিত্য পছন্দ করেন। ইহা ত স্বাভাবিক।

(২) মাসিক-পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠবস্বরূপ এগুলি না থাকিলে তাহার এত প্রচলন সম্ভব হইত না।

(৩) কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাই উপন্যাসের বর্তমান সংস্করণ। এবং উপন্যাসের চরম পরিণতি ইহাতেই। একথাটা একেবারেই ঠিক নয়। তাহার কারণ উপন্যাসের ন্যায় ইহা নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া সমাজের অভিব্যক্তি দেখাইতে পারে না, পরন্তু ইহা একটি ঘটনা বা একটি চরিত্রের অভিব্যক্তি লইয়া কৃতার্থ।

চুটকির দোষ।

(১) ইহার দোষ এই যে ইহা একটি ভাবের বা কল্পনার স্বতন্ত্র বিকাশের ভিতর দিয়া তাহার চরমোৎকর্ষ ফুটাইতে চেষ্টা করে। ভাবপরম্পরার সংঘর্ষের মধ্যে যে ভাববিশেষের জীবন, তাহাই উপভোগ্য; চুটকিতে তাহার স্থান নাই।

(২) চরিত্রগুলির একটি দিক আমরা দেখিতে পাই—পরন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংঘর্ষের মধ্যে তাহাকে না চিনিলে ত চেনাই হইল না—চুটকিতে তাহার ব্যবস্থা নাই।

ইহা ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে উপন্যাসের পরিণতি চুটকিতে হইতে পারে না। চুটকি একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

চুটকির বিশেষত্ব।

(১) ইহা ক্ষুদ্রাকারে উপস্থাপন হয়।

(২) বিষয়টি এবং চরিত্রগুলি যেন তাহার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করিতে পারে।

(৩) ইহা একটি নির্দিষ্ট চরিত্র বা চরিত্রের নির্দিষ্ট একটি দিক বা ঘটনাবিশেষ বা সময়বিশেষ বা ভাববিশেষ বা আদর্শবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া চলিবে। এই কেন্দ্রটি স্থির থাকিবে। পরিধির স্থিতির দরকার নাই (The centre is fixed, circumference anywhere)।

উপন্যাসে একরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। চুটকিতে একটি মূল উদ্দেশ্য এবং তাহারই পরিণতি থাকিবে। অপর-গুলি তাহার স্রাবণ বা সৌষ্ঠব বা পরিকল্পনারূপে ব্যবহৃত। ইহা অত্যন্ত বটিন কাছ? বামা-শামার কর্ম নয়। সমা-

লোচকেরা এইজন্ত চুট্‌কি লেখাকে উপভাস লেখার চেয়ে
কঠিন কাজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(৪) ইহাতে চরিত্রগুলির কথোপকথন থাকিতে পারে,
নাও থাকিতে পারে; অথবা শুধু কথোপকথনের দ্বারাই ইহা
পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

চুট্‌কি-গল্প-গঠন-প্রণালী।

(১) একটি চরিত্রকে লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী ঘটনাবলী
সৃষ্টি করা।

(২) একটি ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী চরিত্রের
সৃষ্টি।

(৩) একটি দৃশ্যের কল্পনা করিয়া লইয়া তদনুযায়ী
চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ।

উপভাস যে-সকল উপাদানে গঠিত, চুট্‌কিও সেই-সকল
উপাদানে; স্বতরাং স্বতন্ত্র উল্লেখ নিম্নয়োজন। *

শ্রীগঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।

দেয়ালি

আঁধার রাতি উজ্জার করি উজল হল দিশি;
দীপের মালা পরিয়া গলে রূপলী আজি নিশি।

হৃদয়ভরা নবীন অমরুপে,

আঁধারে আজি দেবতা মম জাগে,

দয়িতে আজি পুজিতে চাহি প্রণয়-শতদলে,
আঁধার রাতি উজ্জার করি অযুত বাতি জলে।

আকাশে আজি আসেনি শশধর,—

চাঁদিনী নিশি হাসেনি মনোহর,

দীপের ছায়া আকাশ-পটে তারকা হয়ে ফোটে,

আঁধার রাতি উজ্জার করি হরষ-ধারা ছোটে।

নিড়াড়ি লয়ে চাঁদের যত আলো,—

ধরার পরে ঢালো গো আজি ঢালো,

পথের ধারে আলোর মালা পরায়ে দিল সিঁথি

সগরি রাতি জাগরি রহ দেয়ালি আজি তিথি।

সরস্বতীলা সেন।

* Wm. Henry Hudson's *An Introduction to the Study of Literature* অবলম্বনে লিখিত।

দেশের কথা

দেশের কথা বলিতে গেলেই হৃর্তিক, মহামারি, শিক্ষার
অভাব এইগুলোই মনে পড়ে—আশার কথা বড় একটা মনে
পড়ে না। বাঁকুড়ার হৃর্তিকের প্রশমন হইয়াছে, আপাতত
এইটাই একটু আনন্দ-সংবাদ। “বাঁকুড়া-দর্পণ” লিখিয়াছেন—

অবিধাৎ যতটুকু লক্ষ্য হইতেছে তাহাতে দেশের দুর্গতি দুরীকৃত
হইবার আশা উদ্ভূত হয়। অন্নভাবের মহৎ দুঃখ দিন দিন কমিয়া
আসিতেছে। আশু ধান গৃহস্থে হইতেছে। তদ্বারা অনেক দীন
দরিজের উদ্বাসের সংস্থান হইবে। হৈমন্তিক ধানও প্রচুর পরিমাণে
উৎপন্ন হইবে আশা হয়। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়ই কৃষিকার্যের
পক্ষে ক্ষতিকর। প্রতি বৎসর এখানে গড় যে পরিমাণে বৃষ্টি হয়
তাহা অপেক্ষা ৮ ইঞ্চি বৃষ্টি অধিক হইয়াছে। আদিনি মাসে মহা
দুর্ভোগ।

বাঁকুড়া জেলার অবস্থা যেমন একটু শোধরাইল অমনি
অজ্ঞাত জেলার দুরবস্থা আরম্ভ হইল। দেখা যায় হরদরে
আমাদের দেশের অবস্থা সেই একপ্রকারই থাকে। এমনি
আমাদের দুর্ভাগ্য! এবারে অতিবৃষ্টিত অনেক স্থানে
অল্লবিস্তর শস্ত-হানি ঘটিয়াছে। বস্তায় শ্রীহট্ট ও কাছাড়
জেলার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। শিলচর হইতে প্রকাশিত
“সুরমা” সংবাদ দিয়াছেন—

প্ৰতিবৎসরের অপেক্ষাও এবার শিলচরে দাবনের মাজাখিকা
ঘটিয়াছিল। বিগতবৎসরের বস্তা, কাছাড়জেলার সাময়িক উপদ্রব
ঘটাইলেও, এমনভাবে শস্তহানি করিতে পাবে নাই। তখন বর্ষাকালের
বস্তাবিনষ্ট শস্তক্ষেত্রে কৃষকেরা আবার নুতন ধানের বীজ বপন করিয়া
প্রচুর শস্ত লাভ করিয়াছিল। এবার ‘পাকাধানে মই’ পড়িয়াছে।

যে-খান জলস্রাব হইয়াছে তাহা আর আসিবে না। কৃষকেরা
প্রাণপাত করিলেও এবার মাঠে বান ফলিবে না। বিগতবৎসরের বস্তায়
হাইলাকান্দি সবভিষিনের অত্যন্ত স্থানই জলময় হইয়াছিল। এবার
শিলচর সদরের এলাকার মত হাইলাকান্দি মহকুমার কসলও সমূলে
বিনষ্ট হইয়াছে। যে দিকে তাকাও, কাছাড়জেলার বড় বড় ধানক্ষেত-
পূর্ণ হাওরগুলি অপার জলরাশি বৃকে লইয়া ধু ধু করিতেছে। এবার
কার বস্তা চা-ক্ষেত্রে অনিষ্ট সাধনেও কার্পণ্যপ্রকাশ করে নাই।
বস্তা ও বৃষ্টির ফলে এ যাত্রা চা-এর শোচনীয় ক্ষতি ঘটিয়াছে। পরন্তু
দেশে পোয়াস নাই। পোয়াসের অভাবে গবাদিপশুর দারুণ বিপত্তি
দেখা দিয়াছে। গো-মহিষগুলি ক্রমেই অস্থি-স্ফীকৃত হইতেছে এবং
দেশব্যাপী গো-মড়কের আশঙ্কা ঘনাইয়া আসিতেছে।

এবারে বর্ধমান জেলাতেও পুনরায় বস্তা হইয়াছিল।

“বাঁকুড়া-দর্পণে” প্রকাশ—

অজয় নদীতে বস্তা হওয়ার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভেনিয়া প্রভৃতি
৫০ খানি গ্রামের ২০ বর্গ মাইল স্থান ভীষণরূপে দাবিত হয়। ২৩শে
সেপ্টেম্বর অবধি এই দুইটিনা ঘটায় প্রায় বাতুর অনেক রক্ষা করিতে
পারে নাই, কেবল আপনাপন প্রাণ লইয়া পলাইয়াছে। প্রায় সমস্ত

পুঁই ভূমিমাং হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে ১৯১৩ সাল অপেক্ষা জল ৩ ফুট বেশী উঠিয়াছিল।

ইহা ছাড়া ঢাকা নোয়াখালী ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানেও জল-প্রাবন ঘটিয়াছিল, তবে স্রুথের বিষয় শস্তহানি বিশেষ হয় নাই। কাঁথির খবরও বিশেষ আশা-প্রদ নয়। “নীহার” লিখিয়াছেন—

এবংসর আবাদের প্রথমাবস্থায় অতিবৃষ্টি ও পরে বৃষ্টির অভাবে চাষের কার্যের নানা বিঘ্ন ঘটয়াছিল, তবুও লোকে প্রাণপাত পরিশ্রমে যে-আবাদ করিয়াছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই এবার বেশ হৃদয়সল জন্মিবার আশা করিয়াছিল; কিন্তু ভাদ্রমাস হইতে প্রবল বৃষ্টি হইতে থাকায় অস্থায়িক জল-নিকাশের অভাবে মাঠের জল অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়া স্থান-বিশেষে ফসলের অঙ্গবিস্তার ক্ষতি করিয়াছে। বৃষ্টি বাতাসেও অনেক ঝঞ্ঝর শব্দ আগড়া মারিয়া এবং জলে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে।

পঞ্চাট, বাঁধ, বোশা ও উচ্চ স্থানাদি স্থায়ীভাবে জলমগ্ন থাকায় ধবাসির খায়া ভূগ সমূলে নষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত খাদ্যভাব ঘটিয়াছে। তারপর জলে কাণায় থাকিয়া গবাদি নানা রোগে আক্রান্ত হইতেছে। ইহাতে অনেক গোরু বাছুর মারাও হইতেছে।

“মোহাম্মাদী” স্বীয় সমাজের দোষ ক্রটি দেখাইয়া দিয়া সর্বদাই সমাজের উন্নতিব জন্ত সচেষ্ট। এমনই হওয়া দরকার। নিজের দোষ না দেখিলে বা তাহা সংশোধন না করিলে উন্নতির আশা কোথায়? আমার বা আছে তা-ই ভালো, কোনো কিছুই পরিবর্তন বা সংশোধন-অপ্রয়োজনীয়, এ-ভাবে জাতীয় উন্নতির পক্ষে মারাত্মক। মুসলমানের বর্তমান শিক্ষাহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া এবং হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানেরও সমতালে অগ্রসর হওয়া উচিত এই অতি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া “মোহাম্মাদী” ভালোই করিয়াছেন। আমরা সানন্দে “মোহাম্মাদী”র উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত আহমদ আলী।

মুসলমানের যে-মস্তক জ্ঞানবিজ্ঞান ও উন্নত ধ্যানধারণার কেন্দ্র ছিল, আজ তাহা সর্বস্বার্থ, ঘেঘহিংসা, পরজীৱিতারতা ও কুচিন্তার কেন্দ্র হইয়াছে। একমাত্র ইচ্ছারোগীর তুর্কাদিপক্ষে ছাড়িয়া দিলে অস্ত্র কোথাও তাহার জীবনীশক্তির সাদা পাওয়া যায় না, সকলেই যেন সূত, হুনিয়া যেন আর সে মরা টানিতে অক্ষম। শিক্ষা, সম্রাট ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস আরব-ভূমি আজ মূর্থতার লীল-নিকেতন। পারস্ত এখনও বিলাসে নিমগ্ন এবং পিরারি পিরারি মিটি মিটি বুলির ভিতর হাবডুহু হইতেছে। স্পেনের কথা বলিবার আবশ্যক নাই। মধ্য এশিয়ার দশা আরবেরই অনুরূপ। আফ্রিকার মুসলমান রাজ্য ও জনপদসমূহ বিভিন্ন প্রবলজাতির লীলা-নিকেতনে পরিণত। টিউনিস, আলজেরিয়া ও মরোক্কো প্রভৃতি স্থান হস্তান্তরিত। চীনের সংবাদ রাখে কে? ভারতবর্ষ ধর্মব্যবসায়ীগণের বাজারে পর্য্যবসিত। বাহাদের ঐশ্বর্য্যের একটি অংশ পাইলে হুনিরা উদ্ধার পাইত, আজ

তাহাদেরই জাতা ভগ্নীরা হুনি অঙ্গের জন্ত লালারিত। ফলতঃ যে-দেশের মুসলমানদিগের শতকরা ৯৫ জন মূর্থ, তাহাদিগকে হইয়া যে ধর্মব্যবসায়ীরা ছিন্মিনি খেলিবে তাহাতে বিচিৎ কি?

ভারতের মুসলমানকে চিরদিন হিন্দুর সহিত এদেশে বসবাস করিতে হইবে, সুতরাং হিন্দু এক পা বাড়াইলে তাহাকে ছই পা বাড়াইতে হইবে, যেহেতু সংখ্যায় সে হিন্দু অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু দু পা বাড়ান ত দুয়ের কথা, হিন্দু কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে-খবরও সে রাখে না। এমতাবস্থায় সে কি করিয়া হিন্দুর সহিত প্রতিযোগিতায় আশ্বর্য্য করিবে। সংসারে জীবিতের সহিতই জীবিতের বন্ধন সম্ভাব হইয়া থাকে। অনুগ্রহ করিয়া কেহ মরা লাশ মাধায় বহন করে না, করিলেও ছই এক খটা পরে সমাধিস্থ করে। দেশের মঙ্গলের জন্ত স্বায়ত্ত-শাসন বরাদ্দ চাইই, এবং গবর্ণমেন্টও তাহা হুদিন অগ্র পশ্চাৎ দিবে না। তাহাতে বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই, নিলেও তাহা কেহই শুনিবে না। তখন মুসলমানের অবস্থা কিরূপ হইবে? হিন্দুর সহিত সব বিষয়ে সমকক্ষ না হইলে, নিজের আপ্য কি করিয়া তাহার বুদ্ধি লাভে। তখন ধর্মব্যবসায়ীরা গিয়া কতোয়া দিয়া কিছু করিতে পারিবেন কি? ফল কথা, বাচিতা থাকিতে হইলে, এখনই কর্তৃকর্ত্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে, জাতির উদ্ধারের পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। শিল্প বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, একতা সম্প্রতি, সমবেত শক্তি-গঠন ইত্যাদি বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় জলের বিস্তৃক্ততার উপর আমাদের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেকাংশে নির্ভর করে। দুঃখের বিষয় দুধ, ঘী, সরিষার তেল প্রভৃতি প্রধান প্রধান আহাৰ্য্য দ্রব্যেই আজকাল যথেষ্ট পরিমাণে ভেজাল মিশ্রিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে “২৪ পরগণা বার্তাবহ” যথার্থই লিখিয়াছেন—

কলিকাতার খাদ্য-দ্রব্যসমূহে ভেজাল ও কৃত্রিমতার মাত্রা আর চরম সীমায় উঠিয়াছে। কলিকাতা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল বিহার অধুনা গলীগ্রামেও সেই ভেজালের ঢেউ গিয়া পৌঁছিয়াছে। তাই অধুনা “সহরে ব্যারাম” সেই অল্প অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ গলীবাসীকেও আক্রমণ করিয়াছে। ছই বৎসর পূর্বে আটা ময়দা প্রভৃতি কোন কোন দ্রব্য খাটী পাওয়া বাইত, অন্ততঃ চাউলের গুঁড়া ব্যতীত অস্ত্র কোন বস্তু ইহাতে মিশ্রিত হইতে পারে বলিয়া লোকে অনুমান করিতে পারিত না। সম্প্রতি একাশ পাইয়াছে যে আটা ও ময়দাতেও দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ীগণ খুব বেশী পরিমাণ ভেজাল ঢালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আটা ময়দার সহিত আজকাল একরকম কোমল প্রস্তর ব্যতি যুগ্মভাবে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে!

ভেজাল-মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্যই যাহাতে বাজারে বিক্রী হইতে না পারে, মিউনিসিপালিটি হইতে তেমন আইন প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক।

“স্বরাজ্য” পল্লীগ্রামের পানীয় জল দূষিত হওয়ার একটি প্রধান কারণ নির্দেশ করিয়াছেন।

সকলেই জানেন, পাট গাছ বিশেষরূপে না পচাইতে হইলেও উহা দীর্ঘকাল ব্যবহৃত জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কৃষকগণের ভাষাতে

এই ক্রিয়াকে পাটের 'জাগ' দেওয়া বলে; বলাই বাহুল্য, যে-জলে পাট জাগ দেওয়া হয়, তাহা বিশেষরূপে পঢ়িয়া থাকে। এই পটা জলকে যদি অল্প জলের সহিত সর্বপ্রকার সংগ্রহ না করিয়া রাখা যাইতে পারিত, তাহা হইলে পাটের জাগে পানীয় জলের দূষিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু যাহারা পল্লীসমূহের সামান্য-মাত্র খবরও রাখেন, তাহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে বাঙ্গলা দেশে ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে। আবার শ্রাবণ মাসের ঘন বৃষ্টি ও নদীসমূহের উচ্ছ্বসিত জলে বঙ্গপল্লীর পথ ঘাট মাঠ নদী-নালা ডোবা, বিল পুকুর—সমস্তই একাকার হইয়া যায়, তখন আর ইহাদিগকে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। সুতরাং কোনও কারণে এই অঞ্চল জলাশয়ের একাংশে জল দূষিত হইলে, ঐ দোষ যে সহজেই উহার অস্তিত্ব অংশেও অল্প-বিস্তর ছড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? বস্তুতঃ পাট-পটা জলের দ্বারা এই দেশের সর্বপ্রকার জল দূষিত হইতেছে।

যেখানে-সেখানে পাট-পটানো নিবারণ কবিত্তে হইলে কর্তৃপক্ষকে ঐ মর্মে একটি আইন জারি করিতে হয়। তবেই পল্লীবাসীর প্রাণবক্ষা হয়।

হ।

ভারতপ্রাণা ভারতীর যবন-দেশে যবনীবেশ

পূজারী পণ্ডিত James Adam যবনী-বেশধারিণী ভারতী দেবীর পদপ্রান্তে হিরাক্লিটীয় তত্ত্বজ্ঞানের (Heraclitean philosophy) নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন দিব্য পছন্দ-সই ইংরাজি চণ্ডে; পরন্তু সেই যাবনিক তত্ত্বজ্ঞানের নৈবেদ্য-সজ্জার মধ্য হইতে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানের পুণ্য গন্ধ নিঃস্রবিত হইতেছে কেমন ঘেচমৎকার, তাহা তিনি মূলেই জানিতে পারেন নাই; জানিতে পারিবেনই বা কেমন করিয়া? আমার কিন্তু ভ্রাণে তাহা ছাপা থাকিতে পারে না এইজন্ত—যেহেতু দেশীয় শাস্ত্রোদ্যানের ফলপুষ্পেব প্রাণ-জুড়ানিয়া স্নিগ্ধ সৌরভ আমার অনেক কালেব পুরাতন বন্ধ। তবে কিনা—নৈবেদ্যের ভালি-গুলাব আকৃতি এবং গঠন যবন দেশীয়; আর সেইজন্ত—আধার-পাত্রেয় হাঁপায় পড়িয়া আধেয়-দিশী সামগ্রীগুলিও দর্শক-গণের চক্ষে যবন-দেশীয় বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া 'কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমি তাই Adam মহোদয়ের প্রকল্পিত নৈবেদ্য-সজ্জার আদ্যোপান্ত স্তম্ভিকিয়া দেখিয়া যে যে স্থান হইতে দেশীয় শাস্ত্রোদ্যানের যে যে ফলফুলের স্বগন্ধ

নিঃস্রবিত হইতেছে, সেই সেই স্থানে সেই সেই ফলফুলের নামের ছাপ বসাইয়া দিতেছি;—তাহা হইলেই দর্শকগণের ভ্রমের দ্বারে কপাট পড়িয়া যাইবে। পণ্ডিতবর বলিতেছেন

“The God-head in Heraclitus is the creative power [জগজ্জননী শক্তি] or substance [জগদ্বিধান ‘প্রাধান’ কিনা মূলপ্রকৃতি] which at definite intervals [কল্পে কল্পে] evolves itself [পরিণত হ'ন] into a world, and in course of time [প্রলয়কালে] absorbs all things again.... The universe itself as well as each individual part of it, must traverse the ‘upward and downward’ road [প্রতিলোম এবং অহলোম মার্গ]. But the upward and downward road, Heraclitus insists, is one and the same [সাংখ্যাচাৰ্য্যদিগের মতেও it is one and the same ;

upward road প্রতিলোম	downward road অহলোম
↑ অগ্নি জল পৃথিবী	অগ্নি জল পৃথিবী ↓

Road এক; direction দুই]; and we have finally to consider the Godhead [জগজ্জননী শক্তি or মূল প্রকৃতি aforesaid] as the harmony transcending every opposition [as the ত্রিগুণের স্বন্দাতীত সাম্যাবস্থা]. To Heraclitus the whole world [শুন-বৈষম্যে আপাদমস্তক ওত-প্রোত ব্যক্ত প্রকৃতি] is one gigantic battle-field of adverse powers forever waging internecine feud [সাংখ্যাশাস্ত্রেও তাহাই বলে—বলে যে, সম্ব রজো এবং তমোগুণেব মধ্যে ঝুটাপাটি চলিতেছে বিশ্বত্রন্ধাও জুড়িয়া দিনরাত্রি অনবরত].....The doctrine of the flux [‘চলাং তু প্রকৃতিং প্রাচঃ’ (বাংলা) ‘প্রকৃতির নামই চলা’,—এই doctrine *] is only another

* মহাভারতের শান্তিপর্কের ৩১৮ অধ্যায়ে দেখ।

way of expressing this universal warfare [viz.,

সত্ত্ব versus রজঃ—যেমন স্বথ versus দুখ ; রজঃ versus

তমঃ—যেমন উদ্যম versus অবসাদ ; সত্ত্ব versus তমো

যেমন জ্ঞান versus মোহ]. To sum up : In Heraclitus the three conceptions, Logos [‘মহান’ বা হিরণ্যগর্ভ], Fire [লোকাদি অগ্নি] and God [অপর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা] are fundamentally the same. Regarded as the Logos, God [হিরণ্যগর্ভ] is the omnipresent Wisdom [বিশ্বব্যাপী মহতী বুদ্ধি বা মহান] by which all things are steered [সর্ব জগতের কাণ্ডারী]; regarded in his physical (অবোধাত্মক) aspect, that is to say as Fire, he is the substance which creates [জগৎপ্রসবিতা সবিতা—লোকাদি অগ্নি]; and in both these aspects (in both বোধাত্মক and অবোধাত্মক aspects) he is everchanging fire [অবোধাত্মক বহুৰূপী তেজ] and yet forever changeless unity [বোধাত্মক অদ্বিতীয় সং]. ‘the one is all, and the all is one.’ [শেষের এই মহা-বাক্যটি শুনিয়া দিব্যধামবাসী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা বলিলেন “ওঁ” কিনা “Amen”]. পণ্ডিতবর James Adam এইরূপে হিরাক্লিটসের প্রচ্ছন্ন সাংখ্যবাদের (অর্থাৎ যাবনিক ভাষার পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন সাংখ্যবাদের) গুণগানের পালা সাদৃশ্য করিয়া তাহাব কিয়ৎকাল পবে জগদ্বিখ্যাত প্লেটো’র প্রচ্ছন্ন বেদান্তবাদের গুণ-গানের পালা আরম্ভ করিতেছেন এইরূপ :—

“Passing over the minor Socratical schools, I propose to devote the remaining lectures to Plato We shall find, I think, that the famous allegory of the Cave in the *Republic* is a convenient starting point for our investigation.” অতঃপর যাবনিক ভাষার অবগুষ্ঠনেব আড়ালে ভারতী দেবীর মুখচন্দ্রে কলঙ্কাকৃতি চন্দনের ছাপ (অর্থাৎ বাংলা অক্ষর-পাঁতি) মানাইয়াছে কেমন সুন্দর, তাহা আঁখি ভরিয়া চাহিয়া দেখিবার বিষয় ; অতএব দেখা হো’ক :—পণ্ডিতবর বলিতেছেন,

“We are first invited to conceive a number of prisoners [একদল বন্ধু জীব] immersed in a long and gradually sloping subterranean chamber [মনোময় কোষ হইতে প্রাণময় কোষে, প্রাণময় কোষ হইতে অন্নময় কোষে—স্থূল হইতে স্থূলতরে ক্রমশঃ পরিণমমান ‘gradually sloping’ অবিদ্যার গুহাগারে নিমজ্জিত]. They are so firmly bound that they cannot move head or limb ; they see nothing either of themselves or one another, the necessity of their situation compelling them always to direct their gaze on the wall in which the cave ends. At some distance above and behind the prisoners, a fire is burning [আভাস-চৈতন্য বা জীব-চৈতন্য জ্বলজ্বল করিতেছে] and between them and the fire is a transverse path [প্রাণ-ক্রিয়া-সকলের চলা-ফেরা-কার্যের গুপ্তপথ—সংক্ষেপে প্রাণময় কোষ]. Along this roadway carriers are continually passing with all kinds of implements and images upon their heads [with ইন্দ্রিয়রূপী implements and স্থূলশরীর-রূপী images upon their heads]—statuettes of men and other animals, wrought in wood and stone and every sort of material. The wall skirting the path-way intercepts of course, the shadows of the carriers [of the প্রাণময়-কোষের গুপ্তপথে চলাকেরাকারী প্রাণ-ক্রিয়া-রূপী বাহকবৃন্দ], but the objects [অন্নময়-কোষরূপী বা স্থূল-শরীর-রূপী জড়-মূর্ত্তি-সকল] which they carry overtop the wall, and are reflected by the light of the fire [by the light of the আভাস-চৈতন্য] upon the end wall of the dungeon. Thus it happens that the prisoners see only a constant succession of shadow-shapes that ‘come and go,’ and having never seen anything besides, they naturally

suppose these moving phantoms to be the sole realities.....The next division of the simile deals with prisoner's release from bondage. When the chains are unloosed and he is suddenly compelled to stand erect, and turn round and walk, and raise his eyes towards the light, he is at first dazzled, and perplexed, and in his bewilderment would fain still cherish the delusion that after all there is more light and truth in the shadows he formerly saw, than in the originals he now beholds. Finally his guide succeeds in dragging him forth into the upper world, away from the sun-illuminated lantern [away from আভাস-চৈতন্য] into the actual sunlight [into কূটস্থ চৈতন্য]. Slowly his eyes become accustomed to brightness. At first he discerns only the shadows and images [আবছায়া এবং প্রতিমা] of what we in this world call real [of বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব]; afterwards he is able to look upon the originals [গোড়ায় তত্ত্ব] from which they come, and so on progressively from higher to yet higher [from মনোময় কোষ to বিজ্ঞানময় কোষ, from বিজ্ঞানময় কোষ to আনন্দময় কোষ ; প্লেটোর ভাষায়—from opinion-রাজ্য অর্থাৎ from অবিদ্যা-রাজ্য to idea-রাজ্য অর্থাৎ to তত্ত্ব-রাজ্য, from idea-রাজ্য to harmony-রাজ্য] until at last he endures to gaze upon the sun [upon সক্তিদানন্দ ব্রহ্ম] and see him as he is in his own domain [in his আপন মহিমা—‘স্বৈ মহিম্বি’].

প্লেটো তাঁহার গুহা-রূপকটির উপসংহার-স্থলে এ যাহা বলিয়াছেন, ইহা আমাদের নিকটে কিছুই নূতন নহে আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েরই বেদান্তবিৎ আচার্য্যেরা যাহা এক-বাক্যে বলিয়া থাকেন—তাহাই তিনি বলিয়াছেনঃ—কি? না ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার-লাভই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। প্লেটোর

বেদান্তবাদ এইরূপ সর্ববাদি-সম্মত গ্রন্থস্ত বেদান্তবাদ ; আর সেইজন্ত, তাহা শঙ্করাচার্য্যের স্বমতানুযায়ী বেদান্তবাদের সহিত সর্বোংশে মেলে না। শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তবাদ অদ্বৈতবাদ শুধু না—তাহা অতি-অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদ যে, অমূলক, তাহা আমি বলি না ; উল্টা আরো আমি বলি এই যে, তাহা পরাকাষ্ঠা সত্য-মূলক ; কেননা, বাস্তবিকই একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য সমস্ত জগতের সার সর্ব্বম্ব। সেই সঙ্গে এটাও কিন্তু বলি যে, রাজ্য-দ্রষ্ট রাজ্য যেমন নামে রাজ্য—কাজে নিঃসঞ্চল পথের ভিখারী, দ্বৈত-দ্রষ্ট অতি-অদ্বৈতবাদ তেমনি নামে অদ্বৈতবাদ কাজে শূন্য-বাদ। এটা অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, চলিবার সময় যেমন একই মুহূর্ত্তে দুই পা এক সঙ্গে বাড়ানো অসম্ভব—ভাবিবার সময় তেমনি একই মুহূর্ত্তে দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয় তত্ত্বের ভরপুর মনঃসমাধান করা অসম্ভব ; কিন্তু তা বলিয়া এটা আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, রাত্রিকালে ভরপুর বিশ্রাম এবং দিনমানে ভরপুর শ্রমশীলতা যেমন উভয়ে উভয়ের পরম উপকারী, তেমনি, ভজনকালে পরমাত্মাতে চিন্তের ভরপুর তন্ময়ীভাব এবং সাধনকালে সাংসারিক কৰ্ত্তব্য-অহুষ্ঠানে ভরপুর তৎপরতা উভয়ে উভয়ের পরম উপকারী। প্লেটোর বেদান্তবাদ শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী বেদান্তবাদ না হইলেও তাহা বেদান্ত-বাদে তাহাতে আর ভুল নাই ;—তাহা সর্ববাদিসম্মত সাধু বেদান্তবাদ, আর, সেইজন্ত তাহা সাধুসঙ্জনগণের সাধুবাদের পাত্র।

প্লেটোর শাস্ত্রের সহিত দেশীয় শাস্ত্রের এত এত স্থানে এত এত রকমের মিল রহিয়াছে যে, সমস্ত মিল-গুলি সৈন্ত-সাজাইবার মতো করিয়া পাঠক মহোদয়ের নেত্রের সম্মুখে কাতারে কাতারে সাজাইয়া দাঁড় করানো সহজ ব্যাপার নহে। তাহা মস্ত একজন ভীমতুল্য ক্ষত্রিয়-বীরের কাৰ্য্য হইতে পারে, পরন্তু আমার গ্রাম দ্বিধাধর্মের পক্ষে তাহা একপ্রকার অনাধ্য-সাধন। তবে একটি কাৰ্য্য আমি করিতে পারি—ভারত-প্রাণা ভারতী দেবী যাবনিক ভাষার অবগুষ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া যবন-বিদ্যা-মণ্ডপের (Academy) উদ্যান-বীথিকায় চলা-ফেরা করিতেছেন কেমন আশ্চর্য্য অপলিজ্ঞাতভাবে,

তাহার নিদর্শন-স্বরূপে দেবীর স্থলর স্থলর চারি-পাঁচটি চরণ-চিহ্ন তাঁহার ভক্ত সেবকগণের নয়ন-গোচরে নিবেদন করিতে পারি; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

(১) জ্ঞানের মূলতত্ত্ব।

Republic-of-Plato'র প্রণয়ন-কর্ত্তা R. L. Nettleship বলিতেছেন

“Both to ordinary people and the philosophers among the Greeks the good meant the object of desire, that which is worth having, that which we most want.”

তাহা যেন বুঝিলাম; কিন্তু সজ্জন-গণের সেই যে পরম প্রার্থনীয় বস্তু—কী সে বস্তু? যে-সকল অস্থায়ী বস্তুর প্রলোভনে অবোধ লোকের অসংযত চিন্ত আকৃষ্ট হয়, তাহাই কি? না আর কোনো কিছু? কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীর ২৫শা২৬শ শ্লোক দুটিতে এ প্রশ্নেব সমুচিত উত্তর দেওয়া হইয়া চুকিয়াছে অনেককাল পূর্বে। সে-দুটি শ্লোক এই:—

যমরাজা ॥ যে যে কামা হ্রলভা মর্ত্যলোকে, সর্কান কামান্ শ্চন্দতঃ প্রার্থয়স্ব ॥ ইমা রামাঃ সরথাঃ সত্য্যা নহীদৃশা লন্তনীয়া মনুষ্যৈঃ ॥ আভি মৎপ্রস্তাভিঃ পরিচারয়স্ব ॥ বাংলা ॥ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যে-সকল কামনার বস্তু মর্ত্যলোকে হ্রলভ, তাহার মধ্যে, যাহা তোমার প্রাণ চায়, প্রার্থনা কর। এই যে-সকল দিব্য স্ত্রী, দিব্যরথ, দিব্যবাদিহ্র, এমন-সকল সামগ্রী পৃথিবীর মনুষ্যেরা পায় না বহুজন্ম সাধ্যসাধনা করিলেও—সমস্তই দিলাম আমি তোমাকে—এই সকল লইয়া পরম স্থখে জীবন ধাপন কর।

নচিকেতা ॥ ধোভাবো মর্ত্তস্ত যদন্তকৈতৎ সর্কে- স্মিয়াণাৎ জরয়ন্তি তেজঃ ॥ অপি সর্কং জীবিতং অল্পমেব ॥

তর্বেব বাহাস্ তব নৃত্যগীতে ॥ বাংলা ॥ মর্ত্যজীবের এই যে কালকের ভাবনা, এই কালকের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ জর্জরিত হইতে থাকে; তাহাতে আবার, জগৎসুদৃ জীবের সমস্ত পরমাণু একসঙ্গে ছোড়া দিলেও তাহা বৃদ্বদের ছায় ক্ষণস্থায়ী। অতএব তোমার অশ্বরথ তোমারই থাকুক— তোমাব নৃত্যগীত তোমারই থাকুক।

নচিকেতার এই মর্মেভেদী প্রত্যুত্তর শুনিয়া—কে-এমন হত-চেতন যে না মুক্তকণ্ঠে-স্বীকার করিবে যে, ইন্দ্রিয়-রোচক অস্থায়ী ভোগ্য সামগ্রীসকল বাস্তবিকই কোনো জ্ঞানবান্ জীবের পরম প্রার্থনীয় বস্তু নহে। কী তবে মনুষ্যের পরম প্রার্থনীয় বস্তু? বেদান্তশাস্ত্রে বলে—জন্মমৃত্যুবিহীন অটল ধ্রুব বস্তুই মনুষ্যের পরমপ্রার্থনীয় বস্তু; আর তাহারই নাম সৎ ॥ এমতে পাইতেছি:—সৎ=নিত্যবস্তু=পরমার্থ=পরম অর্থ=পরম প্রার্থনীয় বস্তু=‘the Good’। আমাদের দেশের প্রচলিত আট-পছরিয়া ভাষাতেও—সৎকর্ম=good deed, সদাচার=good behaviour, সংসদ=good company, ইত্যাদি। অতএব এ-কথা একটুও মিথ্যা নহে যে, দেশীয় শাস্ত্রে যাহার নাম ‘সৎ’—প্রোটো’র শাস্ত্রে তাহারই নাম ‘the Good’। এই গেল সৎ; তাহার পরে আসিতেছে চিত্ত ॥

এই সাদা সাতের আঁকটি যে, লেখ্য কাগজের অঙ্কের সামিল তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। আর এটাও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ সাদা সপ্তাঙ্কটি লিখিত হইবার পূর্বেও উহা কাগজের ঠিক ঐ স্থানটিতে বর্তমান ছিল—তবে কিনা অদৃশ্য-ভাবে। সপ্তাঙ্কের ঐরূপ অদৃশ্য সাদা মুষ্টি সাদা কাগজের সকল স্থানেই বর্তমান আছে। লেখক যখন সাদা কাগজে কোনো-একটি কালো অক্ষর বিছাদ করেন—করেন তখন তিনি আর কিছু না—ঐ কালো অক্ষরটির যে-একটি অদৃশ্য সাদা মুষ্টি লেখ্য কাগজে পূর্বে হইতেই বর্তমান রহিয়াছে তাহারই উপরে দাগা বুলান্। তিনটি বিষয় এখানে পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সাদা কাগজে কালো অক্ষর যখন যাহা আবিস্কৃত হয় তাহা যেমন বাগজেব অন্তর্গত কোনো-একটি অদৃশ্য সাদা অক্ষরের-দৃশ্য প্রতিলিপি, তেমনি, জ্ঞান-গোচরে লক্ষ্যবস্তু যখন যাহা আবিস্কৃত হয় তাহা জ্ঞানের অন্তর্গত কোনো একটি অব্যক্ত তত্ত্বের স্বব্যক্ত প্রতিকল্প।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

ভিন্ন ভিন্ন কালো অক্ষরের মূলস্থিত ভিন্ন ভিন্ন সাধা

অক্ষর অদৃশ্য হইলেও—সকল অক্ষরের মূলস্থিত একমাত্র দৃশ্যবস্ত্র যেমন লেখ্য কাগজ নিজে, তেমনি, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য বস্তুর মূলস্থিত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব অব্যক্ত হইলেও—সকলের মূলস্থিত একমাত্র স্বব্যক্ত তত্ত্ব-জ্ঞান অসংশয়।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

লেখ্য কাগজ যেমন আপনার অন্তর্কর্ত্তী সমস্ত অদৃশ্য সাদা অক্ষরের এবং আপনার পৃষ্ঠবর্ত্তী সমস্ত দৃশ্যমান কালো অক্ষরের একমাত্র গোড়া'র ক্ষেত্র, জ্ঞান তেমনি আপনার অন্তর্কর্ত্তী সমস্ত অব্যক্ত সত্যের এবং আপনার সম্মুখবর্ত্তী সমস্ত স্বব্যক্ত সত্যের একমাত্র গোড়া'র সত্য। এখন দেখিতে হইবে এই যে, গোড়া'র ক্ষেত্র সেই যে, লেখ্য কাগজ, তাহা যেমন তাহার পৃষ্ঠবর্ত্তী অক্ষর-সকলের অধিষ্ঠান-ভূমিরূপে প্রকাশমান, তেমনি, গোড়া'র সত্য সেই যে, জ্ঞান, তাহা সম্মুখস্থিত বস্তুসকলের বাস্তবিক-সত্তারূপে প্রকাশমান। বাস্তবিক-সত্তা যে, কিরূপ সত্তা, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে যে, তাহা হাতি নয় অথচ হাতির মূলে আছে; ঘোড়া নয় অথচ ঘোড়া'র মূলে আছে; স্বপ্ন নয় অথচ স্বপ্নের মূলে আছে; নিদ্রা নয় অথচ নিদ্রার মূলে আছে। এক কথায়—বাস্তবিক-সত্তা সকল-বস্তুরই গোড়া'র মতো জ্ঞানের সহিত মাখামাখিভাবে চিরবর্ত্তমান। বাস্তবিক-সত্তা'র আরেক নাম ধ্রুব-সত্য এবং তাহা সংশয়-শূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত একেবারেই একীভূত। এমতে পাইতেছি

সত্য = জ্ঞানের সহিত একীভূত বাস্তবিক সত্তা
= বাস্তবিক সত্তার সহিত একীভূত জ্ঞান
= চিৎ ; তবেই হইতেছে যে,

সত্য = চিৎ।

এইজ্ঞান বলি যে, দেশীয় শাস্ত্রে বাহার নাম চিৎ - প্রেটোর শাস্ত্রে তাহারই নাম 'the True.' এই গেল চিৎ ; তাহার পরে আসিতেছে—আনন্দ।

এই স্থানটিতে কবি-Keats এর Endymion-কাব্যের শিরস্থানীয় প্রথম পংক্তিটি আমার মনে পড়িতেছে, তাহা এইঃ—“A thing of beauty is a joy

for ever”। ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, ‘the Beautiful = নিত্য আনন্দ।

দ্বিজ্ঞান ॥ সৌন্দর্য্য পদার্থটি কি ?

প্রবোধিতা ॥ আমি যদি তোমাকে বলি যে “তোমার দ্বিজ্ঞান বিষয়টির সম্বন্ধে আমি একটি পুস্তক রচনা করিয়া তোমাকে তাহা উপহার প্রদান করিব,” বলিয়া—তৎ-পরতা'র সহিত তাহা রচনা করিতে বসিয়া যাই, তাহা হইলে তাহা যে কত বৎসরে শেষ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; তবে এটা স্থির যে, দশ বৎসরের কমে না। অতএব গুরুপ একটা অপরিমেয় বৃহৎকার্য্যে কোমর বাঁধিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আমার জ্ঞান দ্বিকালোত্তীর্ণ লোকের পক্ষে নিতান্তই একটা বিসদৃশ কার্য্য। আবার তা'ও বলি—তোমার প্রেমের উত্তর-প্রদানে বিরত হওয়াও আমার পক্ষে শোভা পায় না। অতএব, যাহা সবিস্তরে পর্যালোচনা কবিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইতে থাকে ক্রমাগতই—শেষ হইতে চাহে না কিছুতেই, সেই অপার এবং অনি-কর্ত্তনীয় বিষয়টি আমি তোমাকে যত পারি সংক্ষেপে—ঠাঠেঠাঠে ইঞ্জিত ইঙ্গিত দিয়া—বলিয়া খালাস হইতেছি;—প্রণিধান কর।

(১) জীব-মাত্রেয়ই প্রাণ তাহার শরীরের মর্ম্মস্থানীয় কতকগুলি আটপহরিয়া ব্যাপারের সৌসামঞ্জস্যের উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

(২) আমাদের প্রাণের গোড়া-ঘাসা অব্যক্ত সৌসামঞ্জস্যের ব্যাপারটিকে যখন আমরা কোনো সম্মুখস্থিত বস্তুতে স্বব্যক্ত দেখি, তখন, সেই বস্তুটিতে আমাদের প্রাণকে যেন আমরা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান দেখিতেছি—আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হয়; আর সেই কারণে তাহাকে আমরা হৃদয় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি।

(৩) এমতে পাইতেছি—

হৃদয় বস্তু = প্রাণের প্রতিমা = দ্বিতীয় প্রাণ।

(৪) আমাদের প্রাণকে আমরা অন্তরে অল্পভব করি, আর, তাহা আমাদের অতিশয় প্রিয় বস্তু। সেই অল্পভব-মান প্রাণকে আমরা যখন আবার প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করি, তখন আমাদের আনন্দ ধরে না। তাহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি কোথায়? না হৃদয় বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-দির সৌসামঞ্জস্যে।

(৫) অস্তরে প্রাণের অধিষ্ঠান-মাত্রে যদি আমাদের আনন্দ হয়, তবে বাহিরে প্রাণকে প্রত্যক্ষবৎ মূর্তিমান দেখিলে তাহা অপেক্ষা আরো কত না আনন্দ হইবার কথা? স্নন্দর বস্তু দেখিলে তাই আমাদের আনন্দ উখলিয়া উঠে। স্নন্দর বস্তু=আনন্দের ধনি।

(৬) প্রকৃতি পরমাত্মার প্রাণের প্রতিমা, আব সেইজন্য পরমা স্নন্দরী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য=পরমাত্মার আনন্দ। ইতি কথোপকথন সমাপ্ত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় বল্লীর বর্ষ অম্বুবাকে লেখে “আনন্দাঙ্ক্যাব খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্য তিসংবিশন্তি” ॥ বাংলা। “আনন্দ হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবন ধারণ করে; আর, তাহার পরে আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করে।” ঐ উপনিষদের ২য় বল্লীর ৭ম অম্বুবাকে লেখে

“অসং বা ইদমগ্রে আসীৎ। ততোবৈ সদ্ অজায়ত। তৎ আত্মানং স্বয়ং অকুরুত। তস্মাৎ তং স্কৃতং উচ্যতে ইতি। যদৈবতং স্কৃতং রসোবৈবসঃ। রসং হেবায়ং লঙ্কা আনন্দীভবতি। কোহেবাভ্যাতং কঃ প্রাণ্যাং যদেব আকাশে আনন্দো ন স্তাৎ। এষ হেবানন্দয়াতি ॥ বাংলা ॥ সৃষ্টির পূর্বে সকলই অব্যক্ত ছিল। সেই অব্যক্ত হইতে এই ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অব্যক্ত পরব্রহ্ম আপনাকে আপনি ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে আপনা-কর্তৃক প্রকাশিত পরমাত্মাকে ‘স্কৃত’ (অর্থাৎ স্নন্দররূপে ব্যক্তীকৃত) বলা যায়। এই যে ‘স্কৃত’ পরমাত্মা ইনি রসস্বরূপ [ইহার ভাব এই যে, যিনি স্নন্দর করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এবং সেই সঙ্গে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি পরম স্নন্দর]। এই রস-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দাঘ্রিত হ’ন। কেবা শবীর-চেষ্টা করিত—কেবা জীবন ধারণ করিত—যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন [অর্থাৎ জগতে ব্যক্ত না হইতেন]। ইনিই সকলকে আনন্দ দান করিতেছেন।” ফল কথা এই যে, প্রথমতঃ, জগজ্জ্ঞান পরমাত্মার প্রেমের পাত্র—সুতরাং পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ; কেননা প্রেমের পাত্র সম্মুখে আবির্ভূত হইলে আনন্দ অবশ্যস্তাবী। দ্বিতীয়তঃ, জগজ্জ্ঞানেব

পাল্টাপ্রমে তিনি আপনাকে আপনি বাঁধা দিতেছেন—সুতরাং তিনি রসস্বরূপ পরম স্নন্দর; কেননা তাঁহাতে রস না থাকিলে কিসেব গুণে তাঁহাতে ভক্তেরা প্রাণমন আত্মা সমর্পণ করেন? তবেই হইতেছে যে, আনন্দ এবং রস অথবা, যাহা একই কথা, আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য একেব্রাই এপিঠি-ওপিঠি।

এমতে পাইতেছি :—

জ্ঞানের মূলতত্ত্ব।

দেশীয় শাস্ত্রে যাহা সং চিৎ আনন্দ—

প্রেটো’র শাস্ত্রে তাহাই

the Good, the True, the Beautiful।

(২) সাধনের মূল মন্ত্র।

ভগবদ্গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে লেখে

“ওঁ তৎসং ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণজ্জিবিধঃ স্মৃতঃ।”

[বাংলা] “ওঁ তৎসং এই তিনটি মন্ত্রাঙ্গ দ্বারা ব্রহ্মের নির্দেশ সর্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।” যে-কোনো বস্তু আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তাহাকেই সত্য বলিয়া অবধারণ করি, এবং ‘তৎ’ [that] বলিয়া নির্দেশ করি। তাই বেদান্তের পরিভাষায় সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাংকেতিক নাম ‘তৎ’। তৎ = ‘the True’। ‘সং’ = ‘the Good,’ ইহা পূর্বে দেখিয়াছি। সৃষ্টিস্থিতিপ্রগয়কর্তা পরমেশ্বরের সাংকেতিক নাম ওঁ, ইহা সকলেরই জানা কথা। অতঃপর ওঙ্কারের সহিত ‘তৎসং’ মন্ত্রাঙ্গ দুটির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অম্বুধাবন করিয়া দেখা যাক্।

রাজার ~~তৎ~~ এ যফলা দিলে যেমন রাজ্য হয়, সতের ~~তৎ~~ এ যফলা দিলে তেমনি সত্য হয়। সং এবং সতের মধ্যে তাই সম্বন্ধ এইরূপ :—

(১) সং = নিত্য বস্তু = মঙ্গল = পরমাত্মা স্বয়ং। (২) সত্য = সতের কিনা পরম পুরুষের প্রকৃতিরাজ্য; আর সে-যে প্রকৃতিরাজ্য তাহা ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ উত্তম মধ্যম এবং অধম এই তিন শ্রেণীর প্রজার বাসস্থান।

পরমাত্মার নিরঞ্জন (অর্থাৎ নিখুঁত) পূর্ণ প্রকাশ পরমাত্মা স্বয়ং, তাই সে রকম প্রকাশ জগতের মধ্যে কুত্রাপি সম্ভাবনীয় নহে। জগতে—তাঁহার (১) কিয়ৎ প্রকাশ, (২) কিয়ৎ অপ্রকাশ, (৩) অপ্রকাশ হইতে

প্রকাশে সমুখান, (৪) প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে চলিয়া পড়ন, এই চারিটি ব্যাপার ক্রমাগতই চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে। ইহার সামান্য-গোচের দৃষ্টান্ত একটি এই :—

(১) মধ্যাহ্ন = প্রকাশ

(২) সায়াংসন্ধ্যা = প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে চলিয়া পড়ন।

(৩) রাত্রি = অপ্রকাশ

(৪) প্রাতঃসন্ধ্যা = অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুখান।

এইরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যথা যথা সময়ে সতের ক্রোড়ে বিশ্রাম করিয়া এবং সেই আরাম-নীড় হইতে যথা যথা সময়ে গাজ্রোখান করিয়া গন্তব্য পথে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইতেছে। সংস্করণ পরমাত্মা তাহার এই প্রকৃতিরাজ্যের মঙ্গলময় অবীশ্বর; আর, সত্য-রূপা প্রকৃতি সেই মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার স্বরূপের প্রতিকরণ। তবেই হইতেছে যে, সূর্য্য এবং সূর্য্যালোকের দ্বারা সৎ এবং সত্য একেরই এপিঠ ওপিঠ। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই তাই ভিতরকার একটি নিগূঢ় কথা এই যে, ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা পরমেশ্বর—প্রকৃতি এবং পুরুষ—উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ—সত্য এবং মঙ্গল—তৎ এবং সৎ—দুইই একাধারে। এই গেল দেশীয় শাস্ত্রের মূলমন্ত্র—ওঁ তৎসৎ। এখন প্লেটোর শাস্ত্রের মূলমন্ত্র কী তাহা দেখা যাক :—Republic of Plato'র গ্রন্থকার R. L. Nettleship বলিতেছেন—

“It is essential to the clear understanding not only of Plato but Greek philosophy generally...to realize the place held in them by the conception of the ‘good’ [of the সৎ]. We see at once from what Plato now proceeds to say of the good, that three ideas, which to us seems to have little connection with one another are for him inseparable. The good is at once : first the end of life, that is the supreme object of all desire and aspiration [পরম-প্রার্থণীয় বস্তু = পরমার্থ = পরমমঙ্গল = সৎ]; secondly, the condition of knowledge [চিত্তের গোড়া'র কথা], or that which makes the world intelligible [or

বাস্তবিক সত্তা = সত্য = তৎ]; thirdly the creative and sustaining cause of the world [এক কথায়—‘ওঁ’].”

Plato'র শাস্ত্রের এই তিনটি মন্ত্রাঙ্গের মালা গাঁথিয়া পাইতেছি “সৎ তৎ ওঁ ।” সাকল্যে পাইতেছি—
সাধনের মূলমন্ত্র।

দেশীয় শাস্ত্রে	প্লেটোর শাস্ত্রে
ওঁ তৎ সৎ	সৎ তৎ ওঁ

(৩) অবিদ্যা।

অবিদ্যা বস্তুটা কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে তাহার একটি সহজ উপায় হ'চ্ছে জড়পদার্থ বস্তুটা কি, তাহা বুঝিয়া দেখা; কেননা জড় এবং অবিদ্যার মধ্যে দুই পা মাত্র ব্যবধান। তা'র সাক্ষী :—

জড়, (১) জড়তা, (২) মূঢ়তা, অবিদ্যা।

আজ আমাদের এই শাস্ত্রালোচনী সভায় জড়পদার্থের স্বরূপ-সম্বন্ধে B.A.-বেদান্তবাগীশ এবং তর্কালঙ্কার খুড়া'র মধ্যে আপোষে বোঝা-পড়া হইবার কথা আছে। হাত-তালি পড়িয়াছে! দুজনা একসঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া কেমন দেখ স্বীয়ভাবে সাম্নাসাম্নি উপবিষ্ট হইলেন! দৌহার মধ্যে বোঝা-পড়া হইয়া শেষে কিরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হয় দেখা যাক।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ আপনাদের শাস্ত্রে জড়পদার্থ সামান্য নহে পদার্থ; আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু জড়পদার্থ পদার্থই নহে।

তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ আমাদের শাস্ত্রেই প্রামাণিক শাস্ত্র।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ জিজ্ঞাসা করি—জড়পদার্থ বস্তুটা কি?

তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ তাহা যে বস্তুটা কি—তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। বস্তুটা তাহা আর-কিছুনা—শুদ্ধ কেবল পবমানু-গণের সংঘাত।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ সংঘাত আবাব একটা বস্তু নাকি? সংঘাত তো জানি একপ্রকার অবস্থা—সংহত অবস্থা।

তর্কালঙ্কার খুঁড়া ॥ মানো-তো এটা যে, সংঘাত বলিয়া একটা পদার্থ জগৎস্বত্ব সকল বস্তুরই সঙ্গের সঙ্গী? তাহা যদি মানো, তবে তাহাকে বস্তু বলিতে ভয় কিম্বা ?

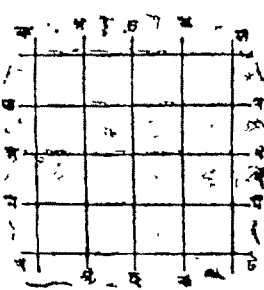
B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ যদি বলা যায় যে, সংঘাতের নামই বস্তু, তবে প্রচারান্তরে বলা হয় যে, কোনো একটি বস্তুর অবয়ব-সংঘাত ভাঙিয়া গেলে, বস্তুটিও সেইসঙ্গে না-ভাঙিয়া-যাইয়া রক্ষা পাইতে পারে না। আমি যদি আপনাকে দেখাইতে পারি যে, একটি বস্তু-খণ্ডের সূত্রাঙ্গগুলির সংঘাত ভাঙিয়া গিয়াছে, অথচ বস্তুখণ্ডটি যেমন তেমনি অটুট রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনি কী বলিবেন?

তর্কালঙ্কার খুঁড়া ॥ বলিব যে, আমাদের বেদান্তবাগীশ-বি-এ-বাবাজির মতো সেরা বাজিকর জগতে নাই! এও কি কখনো সম্ভবে যে, বস্তুর সূত্রাঙ্গগুলি পরস্পরের সন্নিবিষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, অথচ বস্তুটি স্বল্পমাত্রও ছিন্ন হইবে না?

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ এই কাচের চাক্টি লউন। উহার ইংরাজি নাম magnifying glass কিনা পরিবর্দ্ধক কাচ। উহার মধ্য দিয়া

এই বস্তু-খণ্ডটি ঠাহর করিয়া দেখুন। কিরূপ দেখিতেছেন?

তর্কালঙ্কার খুঁড়া ॥ তোমার ঐ হাতের পেন্সিলটা আমাকে একবার দেও দেখি; দেখিলাম



এইরূপ ॥

দেখিলাম যে, কথ, গঘ, চছ, জঝ, লট, তথৈব, কল, তথ, দধ, নম, খট, এই তন্তুগুলার একটিও আর-একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাই—সবগুলাই স্ব স্ব প্রধান।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ আর-একবার ভাল করিয়া ঠাহরিয়া দেখুন;—এটা কি দেখিতেছেন না যে বস্তুখণ্ডটির সূত্রাঙ্গগুলির সংঘাত ভাঙিয়া গিয়াছে, অথচ বস্তুখণ্ডটি যেমন-তেমনি অটুট রহিয়াছে?

তর্কালঙ্কার খুঁড়া ॥ তুমি বাজিকরই বটো! তোমারই জিত! এ যা দেখিতেছি—ইহা-দৃষ্টে সংঘাতকে আর

বস্তু বলা চলে না; তন্তুর সংঘাতকেও না, তন্তুগত তুলার আঁশের সংঘাতকেও না, তন্তুগত তুলার আঁশের পরমাণুগণের সংঘাতকেও না—কোনও সংঘাতকেই বস্তু বলা চলে না। বস্তু তবে ও'র কৌলান্ধ্য না জানি! বড় এষে তুমি আমাকে প্যাঁচে ফেলিলে! ভেবে' দেখি রো'সো! আচ্ছা; বস্তু-খানি যেন হ'ল তন্তু-গুলার সংঘাত; তন্তু যেন হ'ল তুলার আঁশের সংঘাত;—তুলার আঁশ যেন হ'ল পরমাণুগণের সংঘাত; কিন্তু পাল্লা-মানু তো আর কোনো কিছু সংঘাত নহে—পরমাণুকে তবে বস্তু বলিতে দোষ কি? আমার পূর্বের কৃত সংজ্ঞা-নির্ধারনটির অন্তর্য শোধন কবিয়া এক্ষণে আমি তাই বলিতে চাই এই যে, জড়পদার্থ বস্তুটা আর কিছু না—শুধু কেবল পরমাণু-মাত্র।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ আমি যদি আপনাকে দেখাইতে পারি যে, পরমাণু-মাত্রই অবয়ব-সংঘাত?

তর্কালঙ্কার খুঁড়া ॥ যে-দণ্ডে তাহা তুমি আমাকে দেখাইবে সেই দণ্ডে আমার এই জ্বায়ের পুঁথিটাকে আমি জ্বলে নিক্ষেপ করিয়া তোমার ঐ বেদান্তের পুঁথিটিকে মাখায় করিয়া পূজা করিব।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ “স্বধর্ম্মে নিদনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ” এ কথাটা আপনার নিকট হইতেই আমি শিক্ষা-লাভ করিয়াছি; অতএব আপনার মুখে ওকথা শোভা পায় না। আমি আপনাকে কেবল এই দোজা কথাটি স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, এটা যখন আপনি স্বীকার করেন যে, একটি ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য কীটেরও বক্ষ এবং পৃষ্ঠের মধ্যে প্রভেদ আছে, আর, এটাও যখন আপনি স্বীকার করেন যে, এক যাত্রায় পৃথক ফল জ্বায়-বিরুদ্ধ, আব, আপনি যখন জিজ্ঞাস্য বিষয়টার অগ্রপঞ্চাৎ বিবেচনা করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, কোনো সংঘাতকেই পরমাণু বলা চলে না, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, একটি ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম পরমাণুরও একাধিক এবং অপরাধের মধ্যে প্রভেদ আছে, সূত্রাং পরমাণু-মাত্রই তাহার দুই অর্ধের সংঘাত; আর, সেই জন্ত পরমাণুকেও বস্তু বলা চলে না।

তর্কালঙ্কার খুঁড়া ॥ এ যাহা তুমি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া

দেখাইলে, ইহার উপরে কাহারও বিরক্তি চলিতে পারে না।
তুমি যদিচ সেদিনকাল বই না—B.A.-বেদান্তবাগীশ,
তথাপি তোমার নিকটে পরাভব স্বীকার করিতে আমাব
লক্ষিত হইবার কোনো কারণ নাই; কেননা “বৃহন্নলা
সারথিবশ্ব কুতস্তস্ত পরাভবঃ”—“সামন্তো যশ্ব বেদান্তঃ
কুতস্তস্ত পরাভবঃ।”*

যা হোক—আজ আমাব মস্ত একটা ভুল ভাঙিয়া
গেল! বুঝিলাম এক্ষণে যে, রাজ্যস্থল লোক না-বুঝিয়া
যাহাকে বলে জড়বস্তু তাহা অবস্তুরই আর-এক নাম।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে বোঝা-পড়া হইয়া চুকিল—শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

একটি কথা এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য; সে কথা এই যে,
জড়বস্তু যে, বস্তু নহে, তাহা নহে। জড়বস্তুও বস্তু—চেতন-
বস্তুও বস্তু। তবে কি? না জড়বস্তুকে আমরা যে-রকম
বস্তু ঠাণ্ডাবাই—উহা সে-রকম বস্তু নহে—উহা পরমাণু-সংঘাত
নহে। জড়বস্তুতে সংঘাতের আরোপ=বস্তুতে অবস্তুর
আরোপ। বৈদান্তিক ভাষায়—ইহাকে বলে অধ্যারোপ।
অবিদ্যা কী? না ঐরূপ অধ্যারোপের কারণ-রূপি
অজ্ঞান; এক কথায়—ভ্রমজ্ঞান। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য
তাহার প্রণীত সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসঙ্গৃহ নামক পুস্তকে
অবিদ্যার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপ:—

“বস্তুনি অবস্তু-আরোপো যঃ সোহধ্যারোপঃ...। অসং-
ভূতে রজ্জু-আদৌ সর্পাদ্যারোপণং যথা। তৎকারণং অজ্ঞানং
.....অবিদ্যা ইতি নিগন্ততে। তদেতৎ সন্ ন ভবতি
না সৎ বা। সতো ভিন্নং অভিন্নং বা ন দীপস্ত প্রভা যথা।”
[বাংলা] “রজ্জু-আদিতে যেমন সর্পস্তের আরোপ, তেম্নি
বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলা যায়। এই-
প্রকার অধ্যারোপের কারণরূপি অজ্ঞান (সংক্ষেপে ভ্রমজ্ঞান)
অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়। এই যে অবিদ্যা ইহা সৎও না
অসৎও না। দীপের প্রভাকে যেমন দীপ হইতে ভিন্নও
বলা যাইতে পারে না—অভিন্নও বলা যাইতে পারে না,
অবিদ্যাকে তেম্নি সৎ হইতে ভিন্নও বলা যাইতে পারে না
অভিন্নও বলা যাইতে পারে না।” শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই
যে বলিয়াছেন—“অধ্যারোপের কারণ-রূপি অজ্ঞান—

অবিদ্যা,” ইহার পরিবর্তে কেহ যদি বলেন “অজ্ঞানমাত্রই =
অবিদ্যা”, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। মুর্ছাগত ব্যক্তি
তো ঘোর অজ্ঞানাক্ষম; কিন্তু তথাপি তাহার সে অজ্ঞানকে
অবিদ্যা বলা যাইতে পারে না এইজন্ত—যেহেতু সে-অজ্ঞান
হইতে রজ্জুতে সর্পভ্রম বা আর-কোনো প্রকার ভ্রম উৎপন্ন
হইতে পারে না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়াছেন যে,
কেবল অধ্যারোপের কারণ-রূপি অজ্ঞান (অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান) =
অবিদ্যা, তা বই, অপর কোন প্রকার অজ্ঞান অবিদ্যা
নহে।

জিজ্ঞাস্ত ॥ অবিদ্যার লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া
শঙ্করাচার্য্য দুইভাবের দুইটি কথা পরে পরে বলিয়াছেন।
প্রথমে বলিয়াছেন—অবিদ্যা অধ্যারোপের অর্থাৎ ভ্রম-
জ্ঞানের মূল কারণ; তাহার পরে বলিয়াছেন—অবিদ্যা
সৎও নহে অসৎও নহে। এ দুইটি কথার পৃথক পৃথক অর্থ
বুঝিতে আমার কিছুই কঠিন বোধ হইতেছে না;
বুঝিতে পারিতেছি না কেবল হৃদয়ের
মধ্যে বন্ধনের আঁট কিরূপ; সেইটাই আমাকে আপনি আজ
বুঝাইয়া দিন।

প্রবোধয়িতা ॥ অবিদ্যা অধ্যারোপের, অথবা যাহা
একই কথা, ভ্রমজ্ঞানের মূল কারণ বলিয়াই তাহাকে সৎও
বলা যাইতে পারে না অসৎও বলা যাইতে পারে না। নিম্নে
প্রতিধান কর—

অবিদ্যাকে সৎ বলা যাইতে পারে না কেন।

সৎ হইতে সত্যজ্ঞান ছাড়া ভ্রম-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।	অবিদ্যা হইতে ভ্রম- জ্ঞান ছাড়া সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।
---	---

এই কারণে অবিদ্যাকে সৎ বলা যাইতে পারে না।

অবিদ্যাকে অসৎ বলা যাইতে পারে না কেন।

অসৎ হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না	অবিদ্যা হইতে ভ্রম- জ্ঞান উৎপন্ন হয়
---------------------------------------	--

* এখানে সামন্ত শব্দের অর্থ—‘অধিনায়ক’। ‘প্রকৃতিবাদ
অভিধান দেখ।

এই কারণে অবিদ্যাকে অসং বলা যাইতে পারে না।

তবেই হইতেছে যে, অবিদ্যা সংও না অসংও না।

জিজ্ঞাসু। “অবিদ্যা হইতে” না বলিয়া আমি যদি বলি

“অজ্ঞান হইতে” ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে তাহাতে কী দোষ হয়?

প্রবোধদ্বিতীয়া। অবিদ্যা যে, কাহাকে বলে, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে; আর, অজ্ঞান যে কাহাকে বলে, তাহাও তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। তা’র সাক্ষী:—

(১) অবিদ্যা=বিদ্যার অভাব।

(২) অজ্ঞান=জ্ঞানের অভাব।

এটা তো তুমি মানো যে, একজন অধম মূর্থও জ্ঞানবান জীব? অতএব এটা স্থির যে, বিদ্যার অভাবে মনুষ্যের জ্ঞানের অভাব হয় না। বিদ্যার অভাবে হয় তবে কী? না মনোমধ্যে ভ্রম-জ্ঞানের আধিপত্য-বিস্তার। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়াছেন—

“অধ্যারোপের অথবা, যাহা একই কথা, ভ্রমজ্ঞানের মূল কারণ—অবিদ্যা।

এটা যেমন দেখিলাম যে, বিদ্যার অভাব অবিদ্যা, এটাও তেমনি দেখা চাই যে,

বিশেষ জ্ঞান=বিদ্যা।

আর সেইজন্ম

বিশেষ-জ্ঞানের অভাব=অবিদ্যা।

চক্ষের সামনে একগাচি দড়ি পড়িয়া রহিয়াছে—এরূপ অবস্থায়,

“ওটা লম্বাকৃতি বস্তু” এইরূপ জ্ঞান=সামান্য জ্ঞান

“ওটা দড়ি” এইরূপ জ্ঞান=বিশেষ-জ্ঞান

“ওটা দড়ি নহে” এইরূপ জ্ঞান=বিশেষ জ্ঞানের অভাব

“সম্মুখে অন্ধকার” এইরূপ জ্ঞান=সম্মুখস্থিত বস্তুর বিষয়ক সামান্য জ্ঞানেরও অভাব।

এখন জিজ্ঞাসা করি যে, যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম বা ষষ্টি-ভ্রম বা লতা-ভ্রম হয়, তখন সে-যে ভ্রমজ্ঞান, তাহা কোন প্রকার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়? “সম্মুখে অন্ধকার” এই প্রকার জ্ঞান হইতে—না “ওটা রজ্জু নহে” এই প্রকার জ্ঞান হইতে? দেখা’র সহিত জানা’র উপমা দিয়া বলিলাম যে, “সম্মুখে অন্ধকার” এই প্রকার জ্ঞান; কিন্তু প্রকৃত কথাটি

যাহা বক্তব্য তাহা এই যে, সম্মুখে কিছুই না—এই প্রকার জ্ঞান=অজ্ঞান। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, অন্ধকার-দেখা যেমন না-দেখা’রই আর-এক নাম; তেমনি কিছুইনা-জানা না-জানা’রই আর-এক নাম। অতএব “সম্মুখে অন্ধকার” অথবা, যাহা একই কথা, “সম্মুখে কিছুই না” এই প্রকার জ্ঞান (যাহার আর-এক নাম না-জানা, তাহা) হইতে রজ্জুতে সর্পভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না ইহা বলা বাহুল্য। উৎপন্ন হয় তাহা “ওটা রজ্জু নহে” এইরূপ বিশেষ-জ্ঞানের-অভাব হইতে; তা’র সাক্ষী:—ঐ লম্বাকৃতি বস্তুটা যেহেতু রজ্জু নহে, এই হেতু উহা—হয় সর্প, নয় ষষ্টি, নয় লতা ইত্যাদি। তবেই হইতেছে যে সামান্য-জ্ঞান বর্তমান থাকি সত্ত্বেও বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইতে—অবিদ্যা হইতে—ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়; তা বই কিছুইনা-জানা-রূপি জ্ঞান হইতে অথবা, যাহা একই কথা, অজ্ঞান হইতে ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই যে ভ্রমজ্ঞানের মূল-কারণ-রূপা অবিদ্যা ইহা সংও নহে অসংও নহে;—সং নহে কেন? না যেহেতু সং হইতে সত্যজ্ঞান ছাড়া ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; অসং নহে কেন? না যেহেতু অসং হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না—ভ্রমজ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না। বেদান্ত শাস্ত্রে তাই বলা হইয়াছে “অবিদ্যা সদসদভ্যাং অনির্বচনীয়্যা” অবিদ্যা সংও নহে, অসংও নহে, এইরূপ একটা স্ববিরোধী পদার্থ। বেদান্তের সদসদভ্যাং অনির্বচনীয়্যা অবিদ্যা কিরূপ—এই তো তাহা দেখিলাম; এখন যবনী অবিদ্যা কিরূপ তাহা দেখা যাক্।

পণ্ডিতবর R. L. Nettleship বলিতেছেন

“Plato goes on to show that the philosopher has knowledge, while the mere philomathes [অর্থাৎ mere learned man কিনা পুণ্ডিত বিদ্যার জাহাজ] has only ‘opinion.’ Now when we say we ‘know’ a thing we imply that it has being; and the being of a thing is exactly conterminous with its knowableness...on the other hand what is the negation of being is the negation of knowableness...Now in ordinary language we distinguish ‘knowing’ [জানা] from

thinking [মনে করা] or opinion, which lies between these two extremes of perfect knowledge and perfect ignorance...The object of knowledge is what is [অর্থাৎ being]...Opinion also must have an object...On the other hand, it cannot have the same object as knowledge. It results that the object of opinion must both be and not be. We can neither say that it is ...nor that it is not [অর্থাৎ সদসদ্ভ্যাং অনির্কচনীযং] এইরূপ দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত শাস্ত্রে যাহাকে বলে অবিদ্যার ভ্রমাত্মক object, অর্থাৎ objectএব ভান মাত্র, প্লেটো'র শাস্ত্রে তাহারই নাম object of opinion ; কেননা দুইই 'সদসদ্ভ্যাং অনির্কচনীযং' তবেই হইতেছে যে দেশীয় শাস্ত্রে যাহার নাম অবিদ্যা প্লেটো'র শাস্ত্রে তাহারই নাম Opinion ।

(৪) হিরণ্যগর্ভ এবং বৈশ্বানর ।

পণ্ডিতবর R. L. Nettleship বলিতেছেন

"He (অর্থাৎ Plato) makes the world as we perceive it with the senses after the pattern of a world which is intelligible [He makes the ভৌতিক জগৎ consisting of অম্ময়াদি কোষ after the pattern of বুদ্ধিজগৎ consisting of বিজ্ঞানময় কোষ]; which means not that there are really two worlds, but that, as we might say, the world as it is revealed through the senses [স্থূল জগৎ] is the manifestation of an intelligible order [of মহতী বুদ্ধি, সংক্ষেপে of অহান্ অথবা, যাহা একই কথা, of সমষ্টি বিজ্ঞানময় কোষ]. At the end of the Timaeus we find the distinction between the creator and the intelligible world tending to disappear [we find the distinction between হিরণ্যগর্ভ and সমষ্টি-বিজ্ঞানময়াদি কোষ অথবা, যাহা একই কথা, between হিরণ্যগর্ভ এবং তাঁহার শরীর বা উপাধি, tending to disappear], while the sensible world itself

[while দৃশ্যমান বিশ্বচরাচর consisting of সমষ্টি-অম্ময়-কোষ which is বৈশ্বানর বিরাট পুরুষের শরীর বা উপাধি] becomes God made manifest to the human senses [becomes বৈশ্বানর-দেব কিনা বিষ্ণু]."

অর্থাৎ 'আমরা যেমন শব্দরাচার্য্য'কে তাঁহার বিজ্ঞানময়-কোষ-রূপী সূক্ষ্মশরীরের মস্তকের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলি যে, ইনি বেদান্ত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন ; এবং তাঁহাকে তাঁহার অম্ময়-কোষ-রূপী স্থূল শরীরের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলি যে, ইনি ভারতবর্ষের নানা দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন ; প্লেটো তেমনি জগদাত্মাকে তাঁহার বিজ্ঞানময় কোষরূপী অথবা, যাহা একই কথা, মহতী বুদ্ধিরূপী সূক্ষ্মশরীরের মস্তকের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন যে, এই intelligible orderই—বিজ্ঞানময় বিধিব্যবস্থাই—creator of the world এবং তাঁহাকেই তাঁহার দৃশ্যমান-বিশ্বরূপী স্থূল শরীরের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন যে, ইনিই God manifest to human senses. বেদান্ত-শাস্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে ; —পরব্রহ্মকে তাঁহার সূক্ষ্মশরীরের মস্তক-রূপী সমষ্টি বিজ্ঞানময় কোষের সহিত অথবা, যাহা একই কথা, মহানের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলা হইয়াছে যে, ইনিই সৃষ্টিকর্তা হিরণ্য-গর্ভ, এবং তাঁহাকে তাঁহার দৃশ্যমান বিশ্বরূপী স্থূলশরীরের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলা হইয়াছে যে, ইনিই বিরাটপুরুষ বা বৈশ্বানর ।

পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ বেদান্ত-গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে —"হিরণ্যগর্ভঃ স্থুলেশ্বিনি দেহে বৈশ্বানরোহভবৎ" [বাংলা] "হিরণ্যগর্ভ এই সকল স্থূল শরীরে প্রবেশ করিয়া বৈশ্বানর হইলেন ।" Plato'র শাস্ত্রেব সহিত দেশীয় শাস্ত্রের এইরূপ আঠেপৃষ্ঠে মিল ।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন "Before we leave the subject of the World-soul it is necessary to touch upon the difficult question "What does Plato mean by describing it as created ?" তিনি তাে বলিবেনই—"difficult question !" আমার নিকটে কিন্তু উহা কিছুই difficult নহে । Plato'র

শাস্ত্রে বাহার নাম World-soul দেশীয় শাস্ত্রে তাঁহার নাম বোধাবোধাত্মক হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ is 'created' এক কথা সত্য; কিন্তু তাঁহার creator কে? তাঁহার creator তিনি আপনিই। হিরণ্যগর্ভ অব্যক্ত হইতে সর্ব প্রথমে জন্মেন, তাই তাঁহার আর-এক নাম 'প্রথমজ'; আবার, তিনি আপনিই আপনার জন্মদাতা।—অর্থাৎ আপনিই আপনাকে অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণত করেন, তাই তাঁহার নাম স্বয়ম্ভু। ফল-কথা এই যে যেমন আপনি না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না, তেমনি আপনাকে সৃষ্টি না করিলে অন্যকে সৃষ্টি করা যায় না। নিশাবসানে যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি আপনা হইতেই জাগিয়া ওঠে—প্রলয়াবসানে তেমনি ব্রহ্ম আপনা-হইতেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হ'ন;—এইরূপে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২য় বঙ্গীর ৭ম অমুবাণ্ডটি যদিচ পূর্বে বাংলা-অমুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, তথাপি তাহার মূল বাদ দিয়া শুদ্ধ কেবল বাংলা অমুবাদটি এই জায়গাটিতে পুনরুল্লেখ করা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২য় বঙ্গীর ৭ম অমুবাকের বাংলা অমুবাদঃ সৃষ্টির পূর্বে সকলই অব্যক্ত ছিল। সেই অব্যক্ত হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অব্যক্ত পরব্রহ্ম আপনাকে আপনি ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে আপনাকর্তৃক প্রকাশিত পরমাত্মাকে 'স্বকৃত' (অর্থাৎ স্বন্দররূপে ব্যক্তীকৃত) বলা যায়। এই যে, স্বকৃত পরমাত্মা ইনি রস-স্বরূপ। [ইহার ভাব এই যে, যিনি স্বন্দর করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এবং সেইসঙ্গে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি পরম স্বন্দর]।

শ্রীমদ্বৈজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

“মা ফলেষু কদাচন”

(বৃন্দ, কবি)

ভবিষ্যতের হাতে ফলাফল,
কাজ ক'রে শুধু যাই,
পাশাগুলো আছে মুঠোর মধ্যে
ধান পড়াটা তো নাই।

শ্রীমদ্বৈজ্ঞাননাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

বলাকা—শ্রীমদ্বৈজ্ঞাননাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১১৮ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাগজে সুপরিচ্ছন্ন ছাপা ও উত্তম বাঁধ। মূল্য মাত্র একটাকা।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরাবি এক এক অবস্থায় নিজের উদ্ভাবিত পুরাতন প্রণালীকে অতিক্রম করিয়া নূতনের সৃষ্টি করিয়া নব-নব-উদ্বেগ-শালিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যাসন্ধ্যাতে যে প্রতিভার উদ্বোধন হইয়াছিল, মানসী সোনার তরী চিত্রাতে তাহার প্রতিভা; কিন্তু কাব্যরচনার সেই ধারা ক্ষণিকা ও ধোয়াতে ভিন্ন থাকে বহিরাবাসিক জনকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছে। তাহার পর গীতাঞ্জলী গীতিমালা ও গীতাঞ্জলি যে স্বরের স্বরধ্বনী বহাইয়া চলিয়াছিল তাহা অকস্মাৎ পাগলা-ঝোয়ার স্রোত বলাকাব নূতন অসম ছন্দে উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বাঁপাইয়া পড়িয়া রসিক-চিত্ত প্রাণিত করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রতি পদে আপনাকে আপনি অতিক্রম করিয়া চলে, বলিয়া মহাত্মবিদেরা তাহার সহিত গান দিয়া ছুটিতে না পারিয়া মহাকবির অসাধারণ প্রতিভাকেই নিন্দা করিয়া বলে যে তাহাকে ধরিতে পারা যায় না, তাহা অবোধ্য। আমাদের দেশের প্রাচীন কাব্যরচনার প্রণালী ছিল ছন্দে ঘটনার বর্ণন ও জ্ঞান তত্ত্বের জ্ঞান বোনা। তাহা ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যখন নব নব ছন্দে অনির্বচনীয় মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুরু করিলেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার স্বর যখন কানে বসিল তখন একদল ভক্তের আবির্ভাব হইল। কিন্তু আবার যখন কবিতা রচনার অ-কথা ভাষা ছাড়িয়া কবি কথা ভাবার ঐশ্বর্য্য দেখাইতে লাগিলেন, তখন সেই ভক্তগাই বলিতে লাগিল—কবি আগে বেশ লিখিতেন, এখন এসব কি হইতেছে? ক্রমে তাহাও সহিয়া গিয়াছিল। আবার সকলকে বিস্মিত বিপর্দায় করিয়া নূতন ছন্দে নূতন ভাবের কবিতার আবির্ভাব হইয়াছে—সেগুলি পাঁধা হইয়াছে বলাকার। এখনও হু-একটি নিলুকের কণ্ঠ শোনা যাইতেছে, কিন্তু সে উক্তি ভয়ে-ভয়ে অন্ধোচ্চারিত শব্দ, শব্দই তাহা নীরব হইবে। বলাকার পাগলা-ঝোরা অসম ছন্দ একাধিক কবিশ্রমপ্রার্থী অমুকরণ করিতেছেন; তাহাতেই ইহার দর বাচাই হইয়া গিয়াছে। বলাকার কবিতাগুলি নদীর মতন 'অ পন বেগে পাগলপার,' ভাবের গাভীরো পাগলা-ঝোয়ার মতন পনিপূর্ণ ও উচ্ছৃঙ্খলিত, বলাকার মতনই মানস-সরোবরের যাত্রী। বাহার মানস-সরোবরে দেবী সরস্বতীর আসন-শতদল ফুটিয়া আছে সেখানে এই বলাকা যেতপদ্মকলিকার অশ্রুজপ্রস্রিত মালিকার মতন বিহার করিবে ইহা অনিশ্চিত। বলাকাব মালায় তাজমহল, ছবি, কিসম, নূতন বঙ্গ, বলাকা, প্রভৃতি অতুল্য।

চতুরঙ্গ—শ্রীমদ্বৈজ্ঞাননাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১২৩ পৃষ্ঠা। উত্তম কাগজ, পরিষ্কার ছাপা। মূল্য বারো আনা মাত্র।

এখানি গল্পের বই। চারটি ছোট গল্প—জ্যৈষ্ঠাশ্বায় শচীশ দাশিনী জীবিলাস—পরম্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে এই বইএ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন বঙ্গের বঙ্গের আপনাদের নূতন রূপকে অতিক্রম করিয়া নূতনতর হইয়া আসিয়াছে, গল্পও সেইরূপ। সাধনা ও ভারতীর যুগের গল্প একরূপ, প্রবাসীর যুগে অপরূপ, আবার ভারতীর যুগে আরেকরূপ, সবুজপত্রের যুগে অপরূপ। রবীন্দ্রনাথের তুল্য সর্বতোমুখী

প্রতিভা জগতে এ পর্যন্ত আর হয় নাই। ছোটগল্প লেখার তাঁর সমকক্ষ জগতের কোনো সাহিত্যে কেহ নাই। চতুরঙ্গের গল্প চারটিতে তেজালো ভাষার ইহাই দেখানো হইয়াছে যে সমাজধর্মের চেয়েও প্রাণধর্ম অবল এবং তাহা অবহেলা বা শাস্তিতে দমাইয়া রাখিবার বস্তু নহে। এই চারটি গল্পের চারটি চরিত্রই আপন মহিমায় এমন উজ্জ্বল হইয়া চিত্রিত হইয়াছে যে তাঁহাদের সম্মুখে অতি উন্নত জ্ঞানভিত্তিক বিচারককেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে হয়। এই অপকণা দৃষ্ট ঘরা বঙ্গসাহিত্য জগতের সকল সুধী রসিকের সেবা ও ববণীয় হইয়াছে। কোনো বাঙালী যদি ইহার সমাদর করিতে না পারে তবে সে কুপার পাত্র।

আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস—

ঐমতোল্লনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা। সচিন। রত্নাল অষ্টাংশিত ২৬৬ পৃষ্ঠা। দাম আড়াই টাকা।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বইএর পরিচয় দিয়াছেন—“আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস সমস্তটাই ভারতীয় পত্রিকায়.....বাহির হইয়াছে..... প্রথম খণ্ডে আমার বাল্য জীবন কাহিনী বর্ণিত, দ্বিতীয় খণ্ডে আমার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই প্রবাসের শেষ পর্যন্ত বিবৃত, এবং সেই সঙ্গে বোম্বাই মহারাষ্ট্র ও সিন্ধু দেশের ইতিহাস, পারস্য জাতি, জৈন স্বামীনারায়ণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম-সম্প্রদায়, আর্য্যসমাজ ও আর্থানা-সমাজের বিবরণ অল্প-বিস্তর দেওয়া হইয়াছে।.....এই গ্রন্থে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা এ উভয়েরই সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইবে। চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে ‘নানা’ মুনির নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত.....দ্রব্য বিবেচনা করেন, আবার বীরবল-প্রমুখ অপর একদল সাহিত্যিক আছেন যাহারা ঐ ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। আমি প্রয়োজন-মত এই দুইপ্রকার ভাষার উপযোগ করিয়া উভয় পক্ষেই মনোবাক্য করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমার মনে হয় বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ভাষারও তারতম্য আবশ্যক হইয়া পড়ে।”

ঐমতোল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ভারতের নবযুগের সন্ধিক্ষণ; যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ধর্মসাধনার কর্তৃসাধনায় সাহিত্য ও শিল্পসাধনায় বঙ্গের অগ্রণী, ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজকাণ্ডে অধিকার লাভের পথ সিভিল-সার্ভিসে ভারতবাসীর অবশেষের অগ্রণী তিনি স্বয়ং। এহেন ব্যক্তির জীবনমুহুর্তে জন্মস্থান বঙ্গদেশের ও কর্তৃস্থান বোম্বাই প্রদেশের যে পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বিচিত্র তথ্যে পরিপূর্ণ, কোতুলজনক ও অতীব সুস্পষ্ট। বহু অসিদ্ধ লোকের চবিত্র ও কর্তৃ, বহু দর্শনীয় স্থান, বহু সমাজের ও পরিবারের রীতিনীতি অজিজ্ঞাত-লব্ধ বর্ণনার সহিত বহু চিত্রের সমাবেশে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

পাঁপাড়ি—ঐমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। কাগজ ছাপা হ্রদ্র, প্রচ্ছদ মৃদু, গঠনগুণিক নহে। ১১৪ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা।

গল্পের বই। মুক্তি, ভেইয়া, বোচারা, দুঃখী, কালো জুড়ি, পূর্ণ, কালো ছায়া, দুই সন্ধ্যা—এই আটটি গল্প আছে। সবকটি গল্পই করণ-রসে অভিষিক্ত। গল্পভঙ্গিতে ওস্তাদ-লেখকের কারিকুরি অতি সহজে ফুটিয়া উঠিয়াছে; কালো জুড়ি ও কালো ছায়া গল্প পড়িতে-পড়িতে ওস্তাদ ফরাশী গল্পলেখকদের লেখা পড়িতেছি বলিয়া মনে হয়। বহু সরল ভাষার মধ্য দিয়া অতিশুদ্ধ মনস্তত্ত্ব কলিকা হইতে পুষ্প-

বিকাশের মতন অতি অনায়াসে অখণ্ড আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও লেখকের এতটুকু চেষ্টার লক্ষণ ধরা যায় না, একপ পরিপতি ও অবসান যেন ঘটনাক্রমে হইতেই হইত,—ইহাই মণিলাল বাবুর গল্পরচনার বিশেষত্ব। মণিলাল-বাবু তাহার পূর্ববাত্রী ও সহবাত্রী বহু লেখককে অতিক্রম করিয়া দেবী সরস্বতীর পূজার মন্দিরে যে-অর্ঘ্যরচনা করিয়াছেন তাহা দেবী গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ভক্তেরাও সেই নির্মাল্য মাদরে গ্রহণ করিবেন।

নালক—ঐঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ৮৭ পৃষ্ঠা, আট আনা।

বুদ্ধদেবের কাহিনী এই বইএ বর্ণিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকর—রঙের ও শব্দের উভয়েরই ছবি আঁকিতে তাহার সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ নাই। এই কাহিনীর বর্ণনার পংক্তিতে পংক্তিতে কত রং কত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সেই-সব ছবি কবিত্বের রসের ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে ঝলমল করিতেছে। পাঠ করিতে করিতে মন সৌন্দর্য্যের রসে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই বইখানি একটু বড় বালকবালিকার হাতে দিলে তাহার ইহা হইতে যে আনন্দ স্ফোগ করিবে তাহা বাংলা সাহিত্যের আর অতি অল্প পুস্তকেই পাইবার সম্ভাবনা আছে।

তান্দ্র-আবীর—ঐমতোল্লনাথ দত্ত কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ২৪০ পৃষ্ঠা। উত্তম এটিক কাগজে সুপরিচ্ছন্ন ছাপা। দাম পাঁচ টাকা।

কবিতার বই। লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবির আধুনিকতম মৌলিক কবিতার সমষ্টি—দেবী সরস্বতীর পূজার অল-আবীর, উজ্জ্বল ও রঙিন। এই কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দের কারিকুরি বাঙ্গালীর প্রতিমাকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত করিয়াছে—পিয়ানোর গানের একমাত্রিক তাল হইতে মহাসরস্বতীর পঞ্চম-সওয়ারি তাল পর্যন্ত কত তালের কতবিধ ছন্দ, কোথাও এতটুকু স্থলন নাই ফ্রট নাই তাল কাটে নাই; এমন অবলীলায় ছন্দ-রচনার খুব কম কবিই কৃত্তি দেখাইতে পারিয়াছেন। দেবী বীণাপাণির আসন-শতদল ভাবের শতদল মেলিয়া কবিত্বের সৌরভে ভুরভুর করিতেছে—কুহুম-পঞ্চাশৎ কাজরি-পঞ্চাশৎ বাণীর কণ্ঠের শতাবলী হার, অপর কবিতাগুলি বাণীর বন্ধের ধুকধুকি। এই বইএর অনেক কবিতার মধ্যে কবির প্রবল দেশাত্মবোধ ও সমাজসুযোগ প্রকাশ পাইয়াছে; দেশের ও সমাজের অবনতি ও দুর্দশা দেখিয়া কবি কোথাও অশ্রু বিদর্ভন করিয়াছেন, কোথাও বা মোহ-গ্রন্থদের চেতনা সঞ্চারের জন্য কঠিন তিরস্কার করিয়াছেন। কবির চিত্ত একদিকে যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরস আহরণ করিয়া সরস্বতীর চরণতলে মধুচ্চক রচনা করিয়াছে, অপরদিকে মানব ও মানবসমাজ এবং স্বদেশ ও স্বদেশীসহিত মমত্ব উপলব্ধি করিয়া সকলের মধ্যে আপনাকে বিতরণ করিয়াছে। জাতির পীতি, মিচ্ছলা একাদশী, গঙ্গাহ্রদি বঙ্গভূমি, ইজ্ঞতের স্রষ্টা, মৃত্যুশয়র প্রভৃতি কবিতায় কবির চিত্ত ব্যথিতের ব্যথায় আত্মীয়তা অনুভব করিয়া আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; এসব কবিতা বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবী হইয়া থাকিবে। গ্রন্থশেষে কবির ভগবানে আত্মনিবেদন ও নির্ভর পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে, চক্ষু সিক্ত করে।

মুদ্রারক্ষক।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নাগ্নমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩২৩

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রাচীন কাহারা ?

এখন কাহারা পৃথিবীতে সশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাদের বয়স বেশী তাঁহারা প্রাচীন, কাহাদের বয়স কম, তাঁহারা নবীন ; ইহা বুঝা খুবই সোজা। কিন্তু কাহারা পুরাকালে পৃথিবীতে বাস করিতেন, এখন দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন, না আমরা,—কাহারা এখন পৃথিবীতে বাস করিতেছি,—আমরা প্রাচীন ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে একটু ভাবিয়া দেখিতে হয়। কাহারা পুরাকালে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলা যাইত ; কারণ তাঁহাদের বয়স আমাদের চেয়ে বেশী হইত। কিন্তু তাঁহারা ত এখন বাঁচিয়া নাই, তাঁহারা বর্তমান কালের মানুষদেরই মত ৫০৬০৭০৮০৯১০ বা একশত বৎসর * বাঁচিয়া থাকিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাদের ও আমাদের প্রাচীনতা বা নবীনতা কেমন করিয়া স্থির হইবে ? একটা উপায় আছে। পৃথিবী তখনও ছিল, এখনও আছে ; মানবজাতি তখনও ছিল, এখনও আছে। সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর বা

মানবজাতির বয়স যত ছিল, এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর ও মানবজাতির বয়স তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। একএক জন মানুষ কেবল নিজের জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হয় না, যে কালে জন্মগ্রহণ করে, তখনকার সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও সে লাভ করিয়া প্রবীণ হইতে পারে। পুরাকালে পৃথিবীতে মানবজাতি বতর্টা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পাইয়াছি, এবং এখন তাহার উপর আরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পুঞ্জি বাড়িয়াছে ; কেননা, তখনকার পৃথিবী ও মানবজাতি অপেক্ষা এখনকার পৃথিবী ও মানবজাতি বয়োবৃদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সেকালের মানুষদের চেয়ে একালের মানুষদেরই প্রবীণ হইবার বেশী সুযোগ রহিয়াছে। অতএব, স্মৃতিতে কেমন কেমন ঠেকিলেও, সেকালের লোকেরা অর্থাৎ আমাদের পূর্ব-পুরুষরা ছিলেন নবীন, এবং আমরাই প্রাচীন।

কিন্তু আমরা প্রাচীনতর পৃথিবীতে এবং প্রাচীনতর মানবসমাজে বাস করি বলিয়াই অধিকতর প্রবীণতার দাবী বা ভান করিতে পারি না। সেকালের জ্ঞান ও ভ্রমোদর্শন নিজস্ব করিয়া তাহার উপর একালের, বা স্বোপার্জিত, বেশী কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিলে তবে অধিকতর প্রবীণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারি। একালের মানব-সমাজ সেকালের মানব-সমাজ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও অভিজ্ঞানী ; কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষকে

* আমরা পুরাকালের মানুষদের আয়ুস দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিতেছি ; পুরাণ ও কাব্যে বর্ণিত কাহারও কাহারও ২৫ শত বা ২১০ হাজার বৎসর পরমায়ু কথার কল্পনামাত্র।

অধিকতর প্রবীণতার দাবী করিতে হইলে তাহাকে নিজের আন্তরিক ঐশ্বৰ্যের প্রমাণ দেখাইতে হইবে। যাহারা এখন বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধতমেরাই যে সকলের চেয়ে প্রবীণ ও জ্ঞানী, তাহা ত বলা যায় না। বয়স বাড়িলেই জ্ঞান বাড়ে না। অধিকাংশ মানুষ গাছ-পাণ্ডের মত বয়সেই বড় হয়, অল্প জ্ঞান সঞ্চয় করার পর কতকগুলি সংস্কার লইয়া কেবল বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয় মন আত্মা দিনের পর দিন বিকাশ পাইতে থাকে না। আমার বয়স বেশী, অতএব হে ছোকরাগণ, আমাকে মান্য কর, এমন কথা মুখে বা মনে মনে কেবল মূর্থ লোকেই বলে। যে যত মনন করিয়াছে, ধ্যান করিয়াছে, সাধন করিয়াছে,— তা যে-কোন ভাল বিষয়েই হোক না—সে তত বৃদ্ধ। একজন পঁচিশ বৎসরের মানুষ একজন ষাট বৎসরের মানুষের চেয়ে বৃদ্ধ হইতে পারে। যুবকেরাও, প্রাচীনতর পৃথিবীতে জন্মিয়া প্রাচীনতর মানবসমাজে বাস করেন বলিয়াই যে শ্রবীণতর, এমন যেন মনে না করেন। পূর্বেরকার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দখলীকার হইয়া, তত্পরি নিজের সাধনালব্ধ কিছু দেখাইতে পারিলে, তবে তাঁহারা প্রবীণতর বিবেচিত হইতে পারেন।

সেকালের লোকদের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন এবং একালের লোকদের ধৃষ্টতা বর্জন আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সংবস্তর প্রতি শ্রদ্ধা ভিন্ন কোন সিদ্ধিলাভ, কোন উন্নতি সম্ভবে না। আমাদের উদ্দেশ্য, সেকালের লোকেরা যাহা বলিয়া লিখিয়া করিয়া গিয়াছেন তাহাও বিচারপূর্বক গ্রহণ করা, এবং একালেও আমাদের আত্মশক্তিদ্বারা পূর্বসঞ্চিত ঐশ্বৰ্য্য বৃদ্ধি করা। একালের সর্ববিধ উন্নতিচেষ্টাকে দাবিয়া রাশিবার জন্ত সেকালের যে “প্রাচীনতা”র দোহাই দেওয়া হয়, সেই “প্রাচীনতা”টি বাস্তবিক প্রাচীন কিনা, তাহা পরীক্ষা করা, এবং সেই “প্রাচীনতা”র প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা, আমাদের উদ্দেশ্য। সেকালকে আমরা উড়াইয়া দিতে চাই না, তাহা অসম্ভব; সেকাল আমাদের হাড়েহাড়ে ঢুকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেকালকে আমরা আমাদের জীবনগতির একমাত্র নির্ণায়কও করিতে পারি না। আমাদের পৃথিবী, আমাদের মানবসমাজ, একালের পৃথিবী, একালের মানবসমাজ। একালের মানব-

সমাজের অবস্থা সেকালের মানবসমাজের অবস্থা হইতে কোন কোন বিষয়ে পৃথক্। একালে জীবন যাপন করিবার জন্ত সেকালের অভিজ্ঞতা যতটা কাজে লাগে, তাহা অবশ্যই লইব, কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে এবং নূতনপথ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিতেও হইবে।

সেকাল মানে কেবল সেই অনেক শত বা অনেক হাজার বৎসর আগেকার কাল নয়, গতকল্যও সেকালের অন্তর্গত।

ধর্মের প্রকাশ কি শুধু অতীতে আবদ্ধ?

বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান প্রভৃতি যে-সকল বড় বড় ঐতিহাসিক ধর্মসম্প্রদায় আছেন, তাহাদের ধর্ম পুরাকালে নির্দিষ্ট আকারে অপরিবর্তিতভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাহাদের ধর্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করি নাই, ধর্মমতগুলিরও ভাল করিয়া অতুশীলন করি নাই; কিন্তু কোন কোন ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছু কিছু পড়িয়াছি। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-সম্বন্ধে দেখিতে পাই যে আগে আরও অনেকগুলি “স্বসমাচার” (gospel) গ্রন্থ ছিল, এখন চারিখানিতে দাঁড়াইয়াছে। এইগুলির ইংরেজী অনুবাদ আগে যেমন ছিল, এখন সংশোধিত সংস্করণে (revised version) তাহা হইতে কোন কোন গুরুতর বিষয়ে প্রভেদ রহিয়াছে। স্মরণ্য ধৃষ্ট যাহাই বলিয়া থাকুন,—এবং তিনি ঠিক কি বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবিত কালে কোন রিপোর্টার লিখিয়া রাখেন নাই কিম্বা কেহ গ্রামোফোনে ধরিয়া রাখেন নাই,—তাঁহার নামে পরিচিত ধর্মের ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁহার অনুচরদের মধ্যে অনেক ধার্মিক ব্যক্তি কেবল তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়াই নিযুক্ত হন নাই, নূতন পারমাণবিক বাণীও তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। স্মরণ্য গৌড়া খৃষ্টিয়ানেরা যাহাই বলুন, তাঁহাদের ধর্মের প্রকাশ অতীতেই আবদ্ধ নহে, একালেও উহার দ্বারা প্রবাহিত।

কেবল অতীত কালে আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হইয়া সেই জল হৃদসরোবরাদিতে যদি সঞ্চিত থাকিত, একালে যদি আর বৃষ্টি না হইত, এবং আমরা সেই পুরাকালের

সঞ্চিত জলই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতাম, তাহা হইলে, উহার সহিত, কেবল অতীত কালে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ এবং শাস্ত্রমধ্যে নিবদ্ধ ব্রহ্মবাণীর তুলনা দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এখনও নূতন করিয়া আকাশ হইতে জল পড়ে, এখনও নদী বহে, এখনও পুকুরে, হ্রদে জল বাড়ে। তেমনি মানুষের আত্মা এখনও ঈশ্বরের প্রকাশ হয়, এখনও মানুষ সত্য দেখে, বাণী শুনে।

খৃষ্টিয়ানদের বাইবেলের মত মুসলমানদের কোরান তাঁহাদের বিবেচনায় অসম্ভব ব্রহ্মবাণী। তাহা সস্বৈর কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক সম্প্রদায় আছে, এবং এই সেদিন পঞ্জাবে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। সূফিরাও মুসলমান বলিয়া পরিচিত; অথচ তাঁহাদের সমুদয় মত ও বিশ্বাস যে কোরান হইতে গৃহীত তাহা বলা যায় না।

হিন্দুদিগের মধ্যে বাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা এরূপ মনে করেন না যে পুর্বকালে একই সময়ে বেদ পুরাণ তন্ত্র স্মৃতি আদি প্রকাশিত বা রচিত হইয়াছিল, যদিও অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের এইরূপ ধারণা আছে যে সমুদয় শাস্ত্রই সমান প্রাচীন। শিক্ষিত কথটি আমরা শুধু “ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত” অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, সংস্কৃত ও বাংলা শিখিয়া বাঁহারা চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাও শিক্ষিতপদবাচ্য। শিক্ষিত হিন্দুগণ সমুদয় শাস্ত্রকে বেদের সমান প্রামাণিক মনে করেন না বটে, কিন্তু সমুদয় শাস্ত্রই যে মানা উচিত তাহাও বলেন। এই শাস্ত্রগুলির মধ্যে বেদ প্রাচীনতম, অন্তর্গত তদপেক্ষা পরবর্তী কালের। কিন্তু সকলের চেয়ে আধুনিক বাহা, তাহা যখন প্রকাশিত ও রচিত হইয়াছিল, হিন্দুসমাজে তাহার পর আর কি নূতন ব্রহ্মবাণী অবতীর্ণ হয় নাই? তাহার পর হিন্দুসমাজের সাধকেরা ধার্মিকেরা বাহা বলিয়াছেন, তাহা কি প্রাচীন কোন-না-কোন শাস্ত্রেরই অমূল্য, পুনরুজ্জীবিত, রূপান্তর, বা ব্যাখ্যা, না নূতন কিছু?

অত্যাশ্চর্য প্রদেশে তুলসীদাস, রবীদাস, দাদু, তুকারাম, একনাথ, প্রভৃতি যে-সকল সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থ ও উক্তি আদি আমরা সকলে ভাল করিয়া না জানিতে পারি; কিন্তু বস্তু যে-সকল সাধক জন্মিয়াছেন,

তাঁহাদের বিষয় আমরা কিছু বেশী জানি। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের কথা আমরা বলিব না; কারণ, হিন্দুসমাজভুক্ত অধিকাংশ লোক ত ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেনই না, ব্রাহ্মেরাও অনেকে আপনা-দিগকে অহিন্দু মনে করেন। অতএব বাঁহাদিগকে বেহ অহিন্দু মনে করেন না, এরূপ লোকদের কথাই বলিব। রামপ্রসাদী গান বেদের সর্বত্র প্রচলিত। তাহাতে যে-সকল পারমার্থিক ভাস্ত্র আছে, তাহার সমস্তই কি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত? আমাদের ত তাহা বোধ হয় না। যদি কেহ সেরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার একটি একটি রামপ্রসাদী গান লইয়া, তাহার পাশে শাস্ত্রীয় সংস্কৃত বাক্য বসাইয়া, উভয়ের অভিন্ন কিম্বা অন্ততঃ সাদৃশ্য দেখাইয়া দেওয়া উচিত। আমাদের বোধ হয়, ইহা কেহই করিতে পারিবেন না। ইহাও স্বীকার্য যে রামপ্রসাদের পদাবলী হইতে হিন্দুসমাজ ভক্তিমार्গের নূতন পাথেয় পাইয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রতীত হইবে, যে, সংস্কৃত হিন্দুশাস্ত্রগুলি রচিত হইবার পরেও হিন্দু রাম-প্রসাদ মানুষকে নূতন ভক্তিতত্ত্ব শুনাইয়াছেন, এবং তাঁহার দ্বারা হিন্দুধর্মের নূতন বিকাশ হইয়াছে।

তাঁহার অনেক পূর্বে চৈতন্য আবির্ভূত হন। তাঁহার কথা বৈষ্ণবেরা সংস্কৃত কোন শাস্ত্র অপেক্ষা কম ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন না, বস্তুতঃ তাঁহারা তাঁহাকে অবতার মনে করেন। অস্ত্র যে-সকল হিন্দু বৈষ্ণবধর্মী নহেন, তাঁহারাও চৈতন্যের বাণী ভক্তির সহিত শিরোধার্য করেন। তাঁহার প্রতি হিন্দুসমাজের ব্যক্তিবিশেষের মনের ভাব যেরূপই হউক, তিনি যে হিন্দুসমাজকর্তৃক হিন্দু বলিয়া গৃহীত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার সমুদয় উপদেশ সংস্কৃত কোন-না-কোন শাস্ত্রের অমূল্য, পুনরুজ্জীবিত বা ব্যাখ্যা, ইহা কেহই বলিতে বা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার দ্বারাও যে জগতে নূতন ধর্মালোক আনীত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের মধ্যে অনেকে বাঁহাকে দেখিয়াছেন, বাঁহার কথা শুনিয়াছেন, সেই পবনময় রামকৃষ্ণও হিন্দু বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধেও ইহা বলা যায়, যে, উহার সমস্তই সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে গৃহীত, ইহা কেহ দেখা-

ইতে পারিবেন না। তাঁহার উপদেশ দিবার প্রণালী, তাঁহার কথিত নানা দৃষ্টান্ত, তাঁহার উক্তিनिहित নানা তথ্য, এ সকলের মধ্যে নূতনত্ব খুব আছে। এই-সব নূতন জিনিষ পুরাকালের শাস্ত্র হইতে আসে নাই, অথচ ভদ্রারা হিন্দুগম্য ও ধর্ম ঐশ্বর্যবান হইয়াছেন এবং হিন্দু নামের গৌরব বাড়িয়াছে।

এই-সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে ধর্মের প্রকাশ শুধু অতীতকালে আবদ্ধ নহে; তাহার বিকাশ ও প্রকাশ এখনও চলিতেছে এবং পরেও চলিবে। কেহ নূতন কিছু বলিলে বা করিলেই তাহাকে হিন্দুধর্মের বা অন্য কোন ধর্মের বিরোধী মনে কবিবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন চিন্তা অতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা জীবনের লক্ষণ; তাহাকে আদর করিতে না পারা জরার চিহ্ন ও মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। কোন কোন পীড়া হইলে মানুষ আলো সহ্য করিতে পারে না, আলোতে কষ্ট পায়, আলোকে ভয় করে। জ্ঞান ও ধর্মের নূতন আলোককে ভয় করাও স্বাভাবিক লক্ষণ নহে।

গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

গত ১১ই ডিসেম্বর দরবারে বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বঙ্গ রাজনৈতিক অপরাধ ও তাহার দমন ও নিবারণ জন্ত গবর্ণমেন্ট যাহা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সংক্ষেপে তাঁহার বক্তৃতার তাৎপৰ্য্য এই যে বাংলাদেশে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত ষড়যন্ত্র আছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে দুর্বল করা এবং পরিশেষে ইহার উচ্ছেদ সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক হত্যা, ভাষাভাষা, প্রভৃতি এই ষড়যন্ত্রকারীদের কার্য্যপ্রণালীর অন্তর্গত। এই প্রকার একটি দলের অস্তিত্ব সন্দেহে গবর্ণমেন্টের হাতে প্রমাণ আছে। সর্বসাধারণে সে-সব প্রমাণের কথা জানেন না বলিয়া তাঁহারা গবর্ণমেন্টকে দোষ দেন, সে-সব তথ্য জানিলে দোষ দিতেন না। এজন্ত গবর্ণর প্রমাণসাধারণকে দোষ দিতেছেন না। প্রমাণগুলি গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিশ্বাস-উৎপাদক, কিন্তু এ-প্রকারের নহে যে, বিচারালয়ে সেগুলি আইনসম্মত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। এইজন্য, যে-সব লোককে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে

আটক করা হইতেছে, তাহাদিগকে বিচারার্থ কোন বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় না। গবর্ণমেন্ট যে-সব তথ্যের প্রমাণে কাজ করিতেছেন, তাহা সর্বসাধারণকে জানাইবার মত নহে।

কথাগুলি গবর্ণর বেশ ভদ্রভাষায় বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বঙ্গের রাজনৈতিক অসন্তোষ নিবারণের কোন পন্থা নির্দিষ্ট বা সূচিত হইতেছে না। “আমরা ঠিক করিতেছি বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; তোমরা সব কথা জাননা বলিয়া মনে করিতেছ যে আমরা জুলুম করিতেছি, জানিলে বলিতে না। কিন্তু তোমাদিগকে আমাদের হাতের প্রমাণগুলি জানাইবার উপায় নাই। কিন্তু তোমরা সমালোচনা করিতেছ বলিয়া আমিও তোমাদিগকে দোষ দিতেছি না।” এরূপ কথায় গবর্ণমেন্ট ও প্রজার মধ্যে ঐক্য ও মিলনের ভূমি, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদনের উপাদান, কিছু পাওয়া যাইতেছে না। অথচ দেশে শান্তি রক্ষা করা যেমন দরকার, দেশের লোককে বুঝানও তেমন দরকার যে অত্যাচার অবিচার হইতেছে না। কিন্তু গবর্ণর বলিতেছেন প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। তাহা হইলে আমবা কেমন করিয়া

সমস্ত হইব যে অবিচার জুলুম হইতেছে না? গবর্ণরকে আমরা অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু তিনি ত স্বয়ং সমস্ত বিষয় নিজের চক্ষে দেখেন না, নিজের কানে শুনে না; পুলিশের গোয়েন্দা, এবং সহযোগীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক “রাজার সাক্ষী” হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রীসভার সভ্য ও সেক্রেটারী পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর লোকের সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, বিচারশক্তি, প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণর দরবারের বক্তৃতা করিয়াছেন। সূতরাং বিনাপ্রমাণে কেমন করিয়া তাহাতে সমস্ত হওয়া যায়? আর যদি গবর্ণর স্বয়ংই সমস্ত দেখিতেন শুনিতেন, তাহা হইলেও প্রমাণ আবশ্যক হইত। কারণ তিনিও মানুষ, তাঁহারও ভ্রম প্রমাদ হইতে পারে। গবর্ণমেন্টপক্ষ হইতে যাহা বলা হইতেছে, তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক এমন কথা আমরা বলিতে পারি না, কারণ আমরা এবিষয়ের খাতি খবর কিছুই জানি না, কিন্তু গবর্ণমেন্টপক্ষের সব কথাই যে নির্ভল, প্রমাণ অভাবে

তাহাও বলিতে পারি না। বিপ্লবপ্রয়াসী দলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। একরূপ দল একটা আছে। তাহাদের সংখ্যা, প্রভাব ও শক্তি সম্বন্ধে আমরা ঠিক কিছু জানি না। কিন্তু এই দলের ব্যাপ্তি, লোকসংখ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি সম্বন্ধে পুলিশ গবর্ণরের মনে যে ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে, আমরা তাহা ভ্রমশূন্য মনে করি না। গত বৎসর বঙ্গে ৬১৩ টা ডাকাতির মধ্যে পুলিশের লোকেরাও কেবল ২৪টাকে রাজনৈতিক বলিয়াছে; এবং তাহারা মোটে ৩৬টা অপরাধকে বিপ্লবপ্রয়াসীদের কৃত বলিয়াছে। সংখ্যাবহুল দেশব্যাপী শক্তিশালীদলের কাজ একরূপ হইবার কথা নয়।

যে-সকল দেশে প্রজাশক্তির প্রভাব সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতার উপরে, যেখানে সরকারী কর্মচারীদিগের উন্নতি অবনতি পদস্থ থাকে না থাকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সর্বসাধারণের মতের উপর নির্ভর করে, তথায় বিশেষ কোন শাসননীতি ভাল কি মন্দ সকল লোককে বুঝাইতে হইলে সরকারী কর্মচারীদিগকে যাহা করিতে হয়, এদেশেও ঠিক তাহাই করা দরকার। কারণ, সরকারী কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত বা অপসৃত করিবার ক্ষমতা আমাদের না থাকিলেও, আমাদের মনটা ঠিক স্বাধীন দেশের লোকদেরই মত; তাহাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস সমস্তোষ যে-সব কারণে হয়, আমাদেরও সেইসব কারণে হয়। আমরা অক্ষম বলিয়া আমাদের মনের ভাব উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে; কিন্তু বিশ্বশক্তি নিগূঢ়ভাবে কার্য করে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ ।

ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয় যে কে দোষী, কে নিরপরাধ? দেশে ষড়যন্ত্র আছে, অতএব পুলিশ যাহাকে ধরিবে, তাহাকেই আটক করিয়া রাখিতে হইবে, শাসননীতি একরূপ হইতে পারে না; এবং কার্যতঃ দেখা যাইতেছে যে পুলিশকর্তৃক ধৃত ২১ জন লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সর্বসাধারণের ধারণা এই যে যাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইতেছে, তাহাদের মধ্যেও বিস্তর লোক নিরপরাধ। গবর্ণর কয়েকমান আগে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ধৃত

ও আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় এবং হাইকোর্টের জজ হইবার উপযুক্ত একজন রাজকর্মচারী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন। তিনি এই কথা বলার পরও প্রাক্তন সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে কোন কোন স্থলে ধৃত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি তাহা বলা হয় নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এবিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের বক্তব্য জানিতে পারা যায় নাই।

ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে একজন কর্মচারী যত কেন ঘোঁষা ও পরিশ্রমী হউন না, পুলিশের ধৃত এত লোক সম্বন্ধে যথাসময়ে ধীর ভাবে সমস্ত প্রমাণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর কি না। আমরা সম্ভবপর মনে করি না।

এ-সব বিষয়ে অনেক কাগজে অনেক কথা লেখা হইয়াছে, আমরাও আগে অনেক লিখিয়াছি, কিন্তু এদেশে প্রজার মতের শক্তি অত্যন্ত কম বলিয়া তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি আবার বলিতেছি, যাহাতে একজন মানুষের উপরও অবিচার না হয়, একটি পরিবারও অকারণে অভিভাবকশুল্ক ও অভাবগ্রস্ত না হয়, একটি ছাত্র বা অল্প যুবকের ভাবিষ্যৎ অকারণে মাটা না হয় এবং সে লোকসমাজে বিনাদোষে দাগী বলিয়া গণ্য না হয়, যাহাতে জেলায় জেলায় সরকারের প্রতি বিরক্তি ও প্রতিহিংসার ভাব নিরপরাধ দুর্বল আইনসঙ্গত-প্রতিকার-লাভে-অসমর্থ আবদ্ধ লোক ও তাহাদের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে প্রধুমিত হইতে না থাকে, তাহার সমুচিত উপায় গবর্ণমেন্টের করা কর্তব্য।

এদেশে সর্বসাধারণের মতের প্রভাব নাই বলিলেই হয়। ইংলণ্ডে জনসাধারণের মত প্রবল। ইংলণ্ড জার্মেন শত্রুর খুব নিকট। জার্মেন চর হয় ত এখনও তথায় আছে। তথায় জলপথে ও আকাশপথে জার্মেনদের উপদ্রব আছে। বিল্লোতে সন্দেহভাজন লোককে ঘেরাপ চটপট আবদ্ধ করা দরকার, এখানে তাহা নয়। একজনও ত্রিটিশ সাম্রাজ্যজ্যোহী লোক বা জার্মেন চর তথায় একদিনও স্বাধীন থাকিলে যতটা অনিষ্টের সম্ভাবনা, এখানে ততটা

নয়। বিলাতের পুলিশ-ধরূপ বিশ্বাসভাজন, এখানকার পুলিশ সেরূপ বিশ্বাসভাজন নয়। বিলাতে ও ভারতে এই-সকল প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, বিলাতে দেশরক্ষা-আইন অনুসারে কোন সন্দেহভাজন লোক সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইলে-মন্ত্রণা বা পরামর্শ-সমিতির (advisory board) মত অনুসারে করা হয়। এ দোশে এইরূপ মন্ত্রণাসমিতির অধিকতর প্রয়োজন আছে, এখানে কোন মানুষকে ধরিবার আগেই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ বিচক্ষণ বিচারকদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এখানে গৃহ ব্যক্তির স্বাভাবিক সমর্থনের সুযোগ পাইবার অধিকতর প্রয়োজন আছে, এখানে গৃহব্যক্তির নিষ্কল্যাণ বা সরকারী ব্যয়ে আইনজ্ঞের পরামর্শ ও সাহায্য পাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে আইনভঙ্গ করিয়াছে, তাহাকে শাস্তি দেওয়া একান্ত কর্তব্য; যে বাস্তবিক আইনভঙ্গ করিতে প্রয়াসী মাত্র তাহাকেও এ সময়ে আটক করা সরকার মনে হইতে পারে। কিন্তু নিরপরাধের নিগ্রহ সর্বতোভাবে পরিহার্য।

রাজদ্রোহ নিবারণের উপায়।

✕ লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতা পড়িয়া বুঝা যায় যে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী প্রতি ভারতবাসীদের অসন্তোষের সহিত ষড়যন্ত্রের সম্পর্ক আছে। তিনি বলিতেছেন:—

I and my colleagues believe that there is in Bengal a widespread well organised conspiracy, whose aim is to weaken the present form of Government and, if possible, to overthrow it, by means which are criminal. No British Government can complain if the people whom it governs wish to modify its form or to take any legal steps to bring about change. Government may regret such a wish, it may oppose change in every legal way, but it will not be true to British tradition if it does more. But no Government, British or not British, can tolerate the use of crime to overthrow it or to weaken it; a Government which did that would be untrue to the people whom it governs. It is our plain duty to put down the conspiracy with a firm hand.

ইহা বেশ স্পষ্টকথা, এবং গবর্ণর যতটা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের কোন অর্নেক্য নাই; কিন্তু রাজ-

পুরুষেরা যে দমননীতিকেই কার্যতঃ ঘেষ্ট মনে করিয়া, চূপ করিয়া আছেন, ইহা আমরা স্মরণ বা সন্তোষের বিষয় মনে করি না। গবর্ণর বলেন, প্রজারা আইনসম্মত ভাবে শাসন-প্রণালী পরিবর্তন করিতে চাহিলে, গবর্ণমেন্ট তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না, যদিও আইনসম্মত উপায়ে এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পাইতে পারেন। কিন্তু এই পরিবর্তন-চেষ্টায় বাধা না দিয়া, প্রজাদের প্রার্থিত পরিবর্তন মঞ্জুর করাটাও যে চলিতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত নয় কি? নামে নয়, কাজে, স্বায়ত্তশাসন পাইলে দেশটা যে বহু পরিমাণে ঠাণ্ডা-হইবে, ইহা নিশ্চিত। অবশ্য, বিপ্লবপ্রয়াসীদের লক্ষ্য কি বলিতে পারি না, সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দিতে পারে না, স্বাধীন থাকিবার শক্তিও আমাদিগকে দিতে পারে না। ইংরেজের সহিত তাহার আলোচনা করা বুঝা। যাহারা পৃথিবীর প্রবল জাতিদের মনের ভাব জানে, আধুনিক যুদ্ধের আয়োজনের অর্থ বুঝে, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা জ্ঞাত আছে, এমন কোন লোক গুপ্ত বা প্রকাশ্য বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীনতালাভের কল্পনা মনে স্থান দিতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিয়া কতটা ক্ষমতা আমরা লাভ করিতে পারি, ইংরেজের সহিত তাহারই আলোচনা হইতে পারে, ও করা উচিত। আমাদের মতে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির মত, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মত, স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ আমরা পাইলে, বিপ্লবপ্রয়াসী সন্তুষ্ট না হইত, তাহাদের দল বাড়িবার পক্ষে খুব বাধা পড়িত। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে taking the wind out of their sails, গবর্ণমেন্ট এই উপায়ে তাহা করিতে পারেন; বিপ্লব-প্রয়াসীদের নৌকার পালে যে বাতাস লাগিতেছে, তাহার মুখ ফিরাইয়া তাহার জোরে এই উপায়ে অল্প কাজ, আইনসম্মত কাজ, হইতে পারে। আমরা জানি, স্বাধীনতা মানবহৃদয়ের পক্ষে বড়ই আকর্ষণের বস্তু, ইহার নামটীতে পর্যাপ্ত উদ্ভাদনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বাধীনদেশের লোকদের প্রধান প্রধান অধিকারগুলি, ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহের মত, আমরা পাইলে, অর্থাৎ দেশের কেবল আভ্যন্তরীণ কাজে আমরা কার্য্যতঃ প্রায় স্বাধীন হইলে, নাহলে স্বাধীন হইবার জন্য বিদ্রোহিতা যুবকদের জগদেও স্থান পাইবে না।

বিত্রোহিতা নিম্নলি করিবার ইহাই চূড়ান্ত উপায়। কারণ, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যতই শক্তিশালী হউন, তাহারা মানুষের হৃদয়কে নতুন করিয়া গড়িতে পারিবেন না, স্বাভাবিক এবং আত্মসম্মানবোধের ইচ্ছা ও আশা তাহা হইতে উৎপাটিত হইবে না। নৈরাশ্র বিত্রোহিতার স্নানক। বিত্রোহিতাকে বিনষ্ট করিতে হইলে নৈরাশ্র দূর করিতে হইবে। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ভারতবাসীদের মনে এই আশা জন্মাইয়া দিউন, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও তাহাদের স্বাভাবিক হইতে পারে, মানুষের মত আত্মসম্মান বজায় থাকিতে পারে, মানুষের সর্ববিধ শক্তির ও অধিকারের, অল্পদেশের লোকদের মত, বৃদ্ধি ঘটতে পারে, তাহারা খাড়া হইয়া মানুষের মত মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারে; তাহা হইলে বিত্রোহিতা দূর হইবে, বিপ্লবপ্রয়াসীদের দলে নতুন লোক যোগ দিবে না। ব্রিটিশ উপনিবেশসকলে স্বাধীনতার অভিলাষ খুব আছে, কিন্তু বিত্রোহিতা নাই।

আমরা যে আশা দেওয়ার কথা বলিতেছি, তাহার মানে স্তোকবাক্য নয়; তাহাতে অসন্তোষ বরং আরও বৃদ্ধি পাইবে। আইন করিয়া স্পষ্টভাবে জানাইতে হইবে যে আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই কোন্ সময়ে উপনিবেশগুলির মত স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা দেওয়া হইবে, এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাহার কিয়দংশ আমাদের দিতে হইবে এবং বাকী দিবার আয়োজন ও শিক্ষাদান আরম্ভ করিতে হইবে।

দেশের দারিদ্র্য ও বিপ্লবপ্রয়াসের একটা পরোক্ষ কারণ। তাহা কমাইবার আন্তরিক চেষ্টা গবর্ণমেন্ট-পক্ষ হইতে হওয়া চাই।

শিক্ষা ও জনসেবা।

বিপ্লবপ্রয়াসীদের দলে নতুন লোক প্রবেশ করিবার কথা উপরে একাধিকবার বলিয়াছি। গবর্ণর স্বয়ং বক্তৃতায় এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন দলের কতকগুলি লোক মস্তিষ্করূপ, তাহারা মন্ত্রণা দেয় ও কার্যপ্রণালী স্থির করে। তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক তাহাদের হস্তরূপ; তাহারা খুন, ডাকাতি প্রভৃতি করে। তাহার পর অনেকে আছে যাহারা আড়কাটির মত দলে নতুন নতুন লোক (প্রায়ই যুবা) আনিবার চেষ্টা করে।

অনেক শিক্ষক এইরূপ আড়কাটির কাজ করে, এবং অনেকে নতুন লোক জুটাইয়া দলবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে জনহিতৈষী নানা সমিতিতে প্রবেশ করে।

গবর্ণর এইসব কথা বলিবার পূর্বে হইতেই শ্রমজীবী বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, প্রভৃতির প্রতি পুলিশের খর দৃষ্টি আছে, এবং তাহার ফলে এইরূপ কতকগুলি বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে; যদিও যাহারা বিশেষ খবর রাখেন এমন অনেক লোকের মতে ঐ ইন্সকুলগুলি দ্বারা কোন অনিষ্ট হইতেছিল না। গবর্ণর এক্ষণে পরিষ্কার করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার ফলে শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত ও অল্পবিধ জনসেবকগণ আরও অল্পবিধায় পড়িবে। কারণ, চৌকিদার, পুলিশ কনষ্টেবল, জমাদার, প্রভৃতির প্রকৃতিই এই যে তাহারা ডাকিয়া আনিবার হুকুম পাইলে বাধিয়া আনে, কোন-প্রকার জনহিতৈষী সমিতির উপর দৃষ্টি রাখিতে বলিলে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া নিজ-নিজ কার্যভার লাঘব করে এবং হান্দামা একেবারে চুকাইয়া দেয়।

আমরা কখনও দেশশাসক হই নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই; সুতরাং বলিতে পারি না, গবর্ণর বিত্রোহিতীদের দল-বৃদ্ধির প্রণালীর যতটা বিস্তারিত ও পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আবশ্যক ছিল কি না। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, বিশেষ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের নাম করিবার একান্ত প্রয়োজন ছিল না। এইরূপ নাম করা দ্বারা গবর্ণমেন্টের ও দেশের বিশেষ কি উপকার হইবে, বৃদ্ধিতে পারিতেছি না। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত প্রবাসী-সম্পাদকের কোন সম্পর্ক নাই। বরং নানা কারণে প্রবাসী-সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক মাতব্বর লোকের ও তাহাদের কোন কোন বন্ধু ও অল্পচরের অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের পাত্র। এইজন্য আমরা নিরপেক্ষভাবে ব্যাপারটির আলোচনা করিতে সমর্থ।

শিক্ষাদান ও অল্পবিধ জনসেবা ব্যাপদেশে বিত্রোহিতারা যে নিজেদের দল পুরু করিবার চেষ্টা করে, গবর্ণরের তাহা বলিবার হয়ত এই শুভ উদ্দেশ্য ছিল, যে, অভিভাবকেরা যেন ছেলেদিগকে এ-সব কাজে যাইতে না দেন, কারণ তথায় তাহাদের কুসঙ্গী জুটিতে পারে। কিন্তু ইহা আমাদের অস্বাভাবিক; বাস্তবিক লভ্য কার্যমাইকেলের কি উদ্দেশ্য

ছিল জানি না। উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, ফল যাহা হইবে, তাহা অজ্ঞান করা কঠিন নয়। অতি সাবধান লোকে জনসেবার কার্যে আরও কম যাইবে, ছেলেদিগকে আরও কম যাইতে দিবে, এবং অর্থ-সাহায্যও আরও কম করিবে। তাহার মানে কি? মানে বুঝিতে হইলে আমাদের দেশে জনসেবা সাধারণতঃ কি কি রকমের হয়, তাহার উল্লেখ আবশ্যক। জনসেবকেরা দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপ্রপীড়িত লোকদের সাহায্য করেন, নিবন্ধর দরিদ্র লোকদিগকে শিক্ষা দেন, রুগ্নের চিকিৎসা ও শস্ত্রব্যার ব্যবস্থা করেন, ম্যালেরিয়া নিবারণ ও অন্ত্রবিধ উপায়ে কোন কোন স্থানের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন, ইত্যাদি। দুর্ভিক্ষ ও বন্যা হইলে গবর্ণমেন্ট লোকের অনেক সাহায্য করেন; কিন্তু জনসেবকদের সাহায্য ব্যতীত সকল দরিদ্রের প্রাণরক্ষা গবর্ণমেন্ট কখন করিতে পারেন নাই, পরেও পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। রুগ্নের চিকিৎসা এবং নানা স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতিও গবর্ণমেন্টের একার চেষ্টায় সমস্ত হয় না, এবং সম্মিলিত সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টাতেও অল্পই হইতেছে। নিরক্ষর দরিদ্রদের শিক্ষাদানরূপ কর্তব্য গবর্ণমেন্ট অতি-অতি সামান্য-ভাবে করিয়াছেন বলিলে গবর্ণমেন্টের অজ্ঞান নিন্দা করা হইবে না, বোধ হয়।

এ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট-পক্ষের কোন উক্তি বিপন্ন, নিরক্ষর, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, নিরক্ষর লোকদের হিতসাধন-চেষ্টা মন্দীভূত হইলে, তাহা দুঃখের বিষয় হইবে। রামকৃষ্ণমিশনের প্রতি লর্ড কারমাইকেলের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কুফল নিবারণিত হইবে না।

লর্ড কারমাইকেলের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না; সেরূপ মনে করিবার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু সত্বদেয় সাধনেরও এরূপ উপায়ই অবলম্বন করা কর্তব্য, যাহাতে কুফল না ফলে, বা সর্কাপেক্ষা কম কুফল ফলে। দুই লোকে আগুন লাগাইয়া অপরের ঘর পুড়াইয়া দেয়; কিন্তু এইরূপ ঘর-জ্বালান নিবারণের জন্ত কেহ সাফাং বা পরোক্ষভাবে দিয়াশলাইয়ের কারখানা বন্ধ করিয়া দেয় না। অনেক বঙ্গনারী কেরোসীনে পরিহিত শাড়ী জ্বাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করে; কিন্তু তজ্জন্ত কেরোসীন আমদানী ও বিক্রি বন্ধ হইতে পারে না। আফিং, কুচিলার

বিষ, ও সেকো বিষ খাইয়া লোকে আত্মহত্যা করে, এবং অপরকেও গুপ্ত হত্যা করে; কিন্তু এই-সব বিষের অবাধ বিক্রি আইন দ্বারা বন্ধ করা হয় নাই, কোন রাজকর্মচারী বিক্রেতাগিকে পরোক্ষভাবে ও বক্তৃতাদিদ্বারা কখনও নিরুৎসাহও করেন নাই। শিক্ষাদান ও অন্ত্রবিধ জনসেবা ব্যাপদেশে রাষ্ট্রীয় অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, হয় ত হইয়াছে; কিন্তু ইষ্ট যে তদপেক্ষা খুব বেশী হইয়াছে, তদ্বিষয়ে লর্ড কারমাইকেলেরও কোন সন্দেহ নাই, নতুবা তিনি রামকৃষ্ণমিশনের প্রতি প্রকাশ্যভাবে শ্রদ্ধা জানাইতেন না।

আমাদের বোধ হয় পুলিশকে গোপনে সন্দেহভাজন লোক বা লোকসমষ্টির প্রতি প্রথর দৃষ্টি রাখিতে বলিলেই যথেষ্ট হইত, জনসেবাপরায়ণ সন্তাদির উল্লেখ না করিলেও চলিত, এবং নাম ধরিয়া রামকৃষ্ণমিশনের উল্লেখ করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

লর্ড কারমাইকেল যাহা বলিয়াছেন, তাহার আর-এক-প্রকার কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। রাজপুরুষেরা বক্তৃতা ও সরকারী রিপোর্টে ছাত্রদের চরিত্রের উন্নতির উপর খুব জোর দেন। কিন্তু সচরিত্র মানে জড়ভরত গোছের গোবেচারী নয়। সচরিত্রতার মধ্যে মন্দ কাজ না করা, এবং ভাল কাজ করা, দুই-ই আছে। তা ছাড়া মাহুষের শক্তিটা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না; তাহাকে ভাল কাজে না লাগাইলে মন্দ কাজে লাগে। সরকারী ব্যবস্থায় ছাত্রদের রাজনৈতিক আইনসম্বন্ধ প্রচেষ্টার সহিত নিষ্ক্রিয় সম্পর্ক রাখাও নিষিদ্ধ। যদি জনসেবার কাজেও প্রকারান্তরে প্রবল বাধা পড়ে, তাহা হইলে তাহারা কোন্ ভাল কাজটা করিয়া মহচ্চরিত্র হইবে, কোন্ ভাল কাজ তাহাদিগকে মন্দ কাজ হইতে দূরে রাখিবে? অনেক বাক্যবাগীশ তথাকথিত জননায়কদের মত সমাজ-সেবার সমস্ত বোঝাটা যুবকদের ও ছাত্রদের ঘাড়ে চাপাইবার পক্ষপাতী আমরা নহি; কারণ তাহাদের প্রধান কাজ জ্ঞান উপার্জন। কিন্তু অবসর-সময়ে জনসেবা করা তাহাদের এবাস্ত কর্তব্য। নতুবা তাহারা স্বার্থপর, আমোদপ্রিয় ও ক্ষুদ্রেতা হইবে। ইহা নরহিতৈষী কাহারও বাঞ্ছিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, লর্ড কারমাইকেল যাহা বলিয়াছেন, তাহা

29-2

প্রিয়নাথ সেন।

খ্যাতিমান সাহিত্যরসিক ও সমালোচক প্রিয়নাথ সেন মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যোগ্য পুত্র মন্থনাথ সেনের অকালমৃত্যুর শোক পাইয়াছিলেন, নিজেও বৃদ্ধ



প্রিয়নাথ সেন।

পিতাকে কাঁদাইয়া গেলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং এইসকল ভাষার বিস্তর পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। “স্ববর্ণবণিক-সমাচার” পাঠে অবগত হইলাম, তিনি

কলিকাতা আহিরীটোল-নিবাসী স্বনামধন্য মধুরমোহন সেনের বংশধর.....তিনি বাঙ্গালীপুঞ্জের একজন নির্দ্বন্দ্ব সাধক ছিলেন। লক্ষাধিকমুদ্রা ব্যয়ে সজ্জিত তাঁহার পুস্তকাগারে বহু মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য পুস্তক সমৃদ্ধ সংগৃহীত আছে। মৃত্যুর পূর্ব দিবসেও তিনি খ্রিষ্ট টাকার পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহার কিয়দংশ পাঠ করেন।

প্রথমে “প্রবাসী”তে মুদ্রিত এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্মৃতি”তে প্রিয়নাথ সেন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

এই সন্ধ্যাসন্ধ্যাত রচনার দ্বারা ই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাহার উৎসাহ অশুকুল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্য প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসন্ধ্যাতে তাঁহার মন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সিন্ধুর নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষায় সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে

বসিলে ভাববাহ্যের অনেক দূরদিক্‌স্তর দৃষ্ট একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্তরীক্রে শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধু আমার যৌবনের আরম্ভ কালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাহার আনন্দের দ্বারা আমার কবিতাগুলির অন্তিমক হইয়াছে। এই স্মরণটি যদি না পাইতাম তবে দেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ধা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে কলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

সাহিত্যরসিকের ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা আর কি হইতে পারে? রবীন্দ্রনাথ এখন সুদূরে। দেশে থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে সেন মহাশয় সম্বন্ধে আরও কত কথা জানিতে পারা যাইত। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সম্ভবতঃ বন্ধুর সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন।

প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ দরিদ্র হইল।

শিল্প-কমিশন।

আমরা শিল্পজাত যত রকম দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে। কাঁচা মাল অধিকাংশই ভারতে উৎপন্ন হয়, অল্পস্বল্প বিদেশ হইতে আমদানী করিলেই চলে। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্ত যে-সব দেশ বিখ্যাত তাহারা তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে কাঁচা মাল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে। কার্পাস-সূত্র ও বস্ত্র নির্মাণ ইংলণ্ডের একটি প্রধান ব্যবসা; বিস্তৃত তুলা একগাছিও ইংলণ্ডে জন্মে না; সমস্তই আমেরিকা, মিশর ও ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করিতে হয়।

প্রধানতঃ ভারতবর্ষের কাঁচা মালের সাহায্যে ভারতেই কেমন করিয়া নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্ধারণার্থ গবর্ণমেন্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিশনের বৈঠক ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শহরে হইতেছে। কমিশন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য লইতেছেন। ইহার সভ্যগণ অনুসন্ধান করিয়া যে-সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং গবর্ণমেন্টকে যে-সকল পরামর্শ দিবেন, তাহা কেবলমাত্র বা বিশেষ করিয়া ভারত-বাসীদের উপকারের জন্ত, এই ভ্রম যেন কেহ না করেন।

ঐহাদের উদ্যোগ, মূলধন, শিল্পজ্ঞান এবং গবর্ণমেন্ট ও রেল কোম্পানীদের উপর প্রভাব বেশী, তাহারাই বেশী লাভবান হইবেন। কিন্তু উদ্যোগিতা থাকিলে ভারত-বাসীদেরও চেষ্টা সফল হইবে, বলা যাইতে পারে।

অনেক রকম শিল্পদ্রব্য আছে, যাহা কারিগরেরা নিজেদের বাড়ীতে বসিয়া প্রস্তুত করিতে পারে, এবং তাহা করিয়াও লাভ রাখিয়া বাজারে বিক্রী করিতে পারে। এইরূপ অনেক জিনিষ কারখানায় প্রস্তুত হয় না; কোন কোনটি কারখানায় প্রস্তুত হইলেও, তাহার সঙ্গে কারিগরের বাড়ীতে প্রস্তুত জিনিষের প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। এই-সকল শিল্প কি, এবং কি কি অল্পকূল অবস্থার সমবায়ে কারিগরেরা তদুদ্যোগ জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, তাহা স্থির করা কমিশনের একটি প্রধান কাজ।

তাহার পর বড় বড় কারখানার কথা। তাহার জন্ত চাই কল কারখানা খাড়া করিবার জন্ত জমী, তৎসমুদয় খরিদ করিবার জন্ত মূলধন, কাঁচা মাল, কাঁচা মাল কিনিবার জন্ত মূলধন, বিশেষজ্ঞ, পরিচালক, কারিগর ও অল্প শ্রমজীবী, যতদিন না কারবার হইতে লাভ হয় ততদিন ঐ-সকল ব্যক্তির বেতন দিবার মত মূলধন, উৎপত্তি-স্থান হইতে কারখানায় যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে কাঁচা মাল আনিবার বন্দোবস্ত, এবং কারখানা হইতে বাজারে শিল্পদ্রব্য যথাসম্ভব অল্পখরচে চালান করিবার উপায়, ইত্যাদি। কোন্ প্রদেশের কোন্ জায়গায় কোন্ জিনিষের কারখানা করা উচিত, তাহা স্থির করাই প্রথম কর্তব্য। যেখানে কাঁচা মাল সুবিধা দরে পাওয়া বা আমদানী করা যায়, যেখানে অল্প মজুরীতে শ্রমী পাওয়া বা আমদানী করা যায়, এবং যেখানে হইতে কাঁচা মাল সহজে অল্পব্যয়ে বাজারে জিনিষ চালান করা যায়, কারখানা স্থাপনের স্থানটি এরূপ হওয়া দরকার।

ভারতবর্ষের সমুদয় খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ জিনিষ হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক-প্রকার ব্যবস্থা ও চেষ্টার আবশ্যক, যাহা জাপান প্রভৃতি দেশে হইয়াছে। কোন ব্যবসাতে লোকে সাহস করিয়া মূলধন খাটাইতে অগ্রসর না হইলে গবর্ণমেন্টের হস্ত গ্যারান্টি করা দরকার হইতে পারে, যেমন এদেশে সরকার অনেক

রেলওয়ে নির্মাণে করিয়াছেন। যে-সব জিনিষ এদেশে ব্যবসাহিসাবে প্রস্তুত হইতে পারে বিনা, সন্দেহ আছে, তাহা তৈয়ার করিবার নিমিত্ত সরকারী পরীক্ষা-কারখানা আবশ্যক হইতে পারে। নূতন রকম কাঁচা মাল হইতে নূতন উপায়ে কাগজ বা অল্প কোন রকম জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে কিনা, তত্ত্ব পরীক্ষা-ও-গবেষণা-গৃহ (research laboratory) আবশ্যক। যাহাতে লোকে সহজে শিল্প-সম্বন্ধীয় নানা বিশ্বাসযোগ্য খাতি খবর পাইতে পারে, তাহার জন্ত প্রত্যেক প্রদেশে একটি স্বতন্ত্র শিল্পের বিজ্ঞপ্তি-বিভাগ (Industrial Intelligence Department) থাকার দরকার। ইহা বাণিজ্যিক বিভাগ (Commercial Intelligence Department) হইতে স্বতন্ত্র হওয়া চাই। অবস্থা-বিশেষে গবর্ণমেন্টকে কিছু মূলধনও ধার দিতে হইতে পারে। জাপানে জাহাজ-নির্মাতারা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সাহায্য (Subsidy) পাইয়া থাকে। কোন কোন ব্যবসায় এ দেশেও তাহা আবশ্যক হইতে পারে। টাকা কর্ত্ত করিবার সুবিধার জন্ত ব্যাঙ্ক, সমবায়-সমিতি, রেল ও ষ্টীমারের সস্তা মাসুল, বিদেশ হইতে আমদানী শিল্পদ্রব্যের উপর শুল্কস্থাপন দ্বারা দেশী শিল্প সংরক্ষণ, গবর্ণমেন্টের ব্যবহারেব জন্ত সমস্ত জিনিষ যথাসম্ভব ভারত-বর্ষ হইতে ক্রয়, বিশেষজ্ঞ, পরিচালক, ও কারিগর প্রস্তুত করিবার জন্ত প্রাথমিক স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা দান, শ্রমজীবীদের বুদ্ধি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্ত দেশমধ্যে সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন, তাহাদের কার্য-ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্ত দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বৃদ্ধি এবং সকলের পক্ষে পুষ্টিকর যথেষ্ট-খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগবিধান,—এইরূপ অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে দেশের লোকের চবিত্তের পরিবর্তন ও উন্নতি ব্যতিরেকে শিল্পবিষয়ে উন্নতি হইবে না। মূলধন আদি বাহিরের আয়োজন, এবং শিল্পনৈপুণ্য তাহা চাই-ই। তা ছাড়া, শ্রমশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা, পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা ও ক্ষমতা, সময়-নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা, এইরূপ নানাবিধগুণ যে জাতিব মধ্যে যত বেশী, তাহাদের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের শক্তিও তত বেশী।

ভারতপ্রবাসী সমস্ত ইংরেজকে সৈনিক হইতে বাধ্য করিবার প্রস্তাব।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের মুখপত্র প্রায় সব কাগজে এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত ও সমর্থিত হইতেছে যে ভারতপ্রবাসী সমর্থ-বয়সের সমুদয়-ইংরেজকে সৈনিক হইতে বাধ্য করা উচিত। এ-টা সম্পূর্ণ ইংরেজদের ব্যাপার, আমাদের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, ভাবিয়া, দেশের খবরের কাগজ-ওলারা ও অন্ত্র লোকেরা ইহার বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক ইহা বস্তু আমাদের সম্পর্ক আছে।

যদি ভারতপ্রবাসী সমর্থ বয়সের সব ইংরেজকে সশস্ত্রযুদ্ধ শিক্ষা করিতে ও সৈনিক হইতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যয় ও শিক্ষার খরচ ভারত-বর্ষের রাজকোষ হইতে দিতে হইবে; অর্থাৎ আমরা যে ট্যাক্স দি, তাহা হইতেই টাকা খরচ করা হইবে। সুতরাং আমাদের দেখা উচিত যে ইহাতে আমাদের লাভান্ন কি আছে। এংলোইণ্ডিয়ানদের কাগজে এই প্রস্তাবের সপক্ষে বলা হইতেছে, যে, ভারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহা দরকার। ভারতবর্ষকে কোন্ বহিঃশত্রু আক্রমণ করিবে? চীনের সঙ্গে, তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজের শত্রুতা নাই। ভারত আক্রমণ করিবার মত তাহাদের অবস্থাও নয়। রুশিয়ার সঙ্গে, জাপানের সঙ্গে, ইংরেজের বন্ধুত্ব রহিয়াছে। জার্মেনী স্বদূরে। সুতরাং বহিরাক্রমণের কথাটা ছল মাত্র। আভ্যন্তরীণ উৎপাতের মধ্যে অল্প-সংখ্যক ডাকাতি ও মধ্যে মধ্যে ২১ জন পুলিশ খুন আছে। তাহার প্রতিকার পুলিশের দ্বারাই হইতেছে। ১৮৫৭ সালের পর দেশে বিদ্রোহ হয় নাই। তাহার পর দেশকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে। তন্নিম্ন ইংলণ্ডের বিপক্ষে যে এত বড় যুদ্ধ চলিতেছে, ইহাকে স্মরণ মনে করিয়া ভারতবাসীরা বিদ্রোহ করে নাই, বরং সকল প্রদেয় হইতে তাহারা মাছুষ দিয়া, টাকা দিয়া, জিনিষ দিয়া, ইংলণ্ডের সাহায্য করিয়াছে। এমত অবস্থায় আভ্যন্তরীণ উৎপাতের ওজুহাতে সমুদয় এংলোইণ্ডিয়ানকে সশস্ত্র করিবার প্রস্তাব

ভারতবাসীদিগকে খুব বেশী রকমে ভীত ও নিব্বীণ্য করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে বলিয়া আমরা সন্দেহ করি। সুতরাং এ প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিতে গবর্ণমেন্টকে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

আমরা মানবোচিত সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে ইচ্ছা করি; কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা নহে। পক্ষান্তরে আমরা ইহাও চাহি না যে কতকগুলি অস্থায়ী বাসিন্দা বিদেশী লোক আমাদেরই টাকায় সশস্ত্র হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইবে, এবং আমরা সর্বদা ভয়ে তর্কিত হইয়া থাকিব। রাষ্ট্রীয় অধিকার-বিশিষ্ট মানুষের একটা লক্ষণ এই যে সে প্রয়োজন-মত স্বেচ্ছায় আত্মবিক্ষার অস্ত্রধারণ করিতে পারে; পরাধীন মানুষ তাহা করিতে পারে না। নিরস্ত্র থাকিতে বাধ্য হওয়ার অপমান এইখানে। বহুকাল হইতে কংগ্রেস এই কারণে ও অন্যান্য কারণে অস্ত্র-আইন উঠাইয়া দিতে বা সংশোধন করিতে গবর্ণমেন্টকে বলিতেছেন। অপমানের মাত্রাটা আরও যাহাতে বাড়ে, তাহাতে আমরা সম্মতি দিতে পারি না।

তা ছাড়া, ইহা কেবল মান-অপমানের কথাও নহে। এক শ্রেণীর লোক সশস্ত্র ও অপর শ্রেণী নিরস্ত্র হইলে উভয়ে সম্প্রীতি থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের একটি দ্বারা অসুসারে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবেচ্য জ্ঞান একটি দণ্ডই অপরাধ। যাহাতে পরোক্ষ ভাবে এইরূপ বিবেচ্য জ্ঞানিতে পারে, গবর্ণমেন্টের তাহা ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। গবর্ণমেন্টের ইহা অগোচর নাই যে ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফিরঙ্গীরা ইচ্ছা করিলেই সশস্ত্র হইতে পারে এবং দেশী লোকেরা ইচ্ছা করিলেই পারে না বলিয়া, পূর্বোক্ত শ্রেণীর কোন কোন লোক উদ্ধত ও অবিরোধক হয়, এবং তাহারা যথেষ্ট সাবধানতার সহিত অস্ত্র ব্যবহার না করায় এবং ক্রোধ দমন না করায় মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনায় কোন কোন হতভাগ্য ভারতবাসী হত বা আহত হয়। এই জন্য সশস্ত্র হওয়া সম্বন্ধে দেশী লোক এবং ইংরেজ ও ফিরঙ্গীর বর্তমান পার্থক্য আরও বেশী বাড়ান আমরা অবাস্তব মনে করি। যদি এরূপ কিছু করিতেই হয়, তাহা হইলে বরং দেশী লোকদিগকেও ভারতীয় হইয়া

যুদ্ধ শিখিবার অধিকার, দেওয়া হউক, এবং সমর্থ বয়সের শারীরিক যোগ্যতাবিশিষ্ট সমুদয় দেশী লোককে সৈনিক হইতে বাধ্য করা হউক। গবর্ণমেন্টের নিকট ইহাই আশা-
দের নিবেদন।

কংগ্রেসের কাজ।

যুদ্ধ শেষ হইবামাত্রই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ কতকটা পরিবর্তিত হইয়া সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত হইবে, তাহা নহে; কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র পুনর্গঠনের দিকে সাম্রাজ্যের গতি হইবে, তাহা নিশ্চিত। এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের যে স্থান ও অধিকার আছে, স্বশাসক (self-ruling) উপনিবেশগুলির ততটা অধিকার নাই। সিংহলের মত, রাজ্যব অধীন উপনিবেশ-গুলির (crown colonies) রাষ্ট্রীয় অধিকার সামান্য। ভারতবর্ষের মত অধীন দেশগুলির স্থানও খুব নীচে। এখন বিলাতী পালেমেন্টে যুদ্ধ ও শান্তির প্রস্তাব স্থির হয়, সাম্রাজ্যের রক্ষার বন্দোবস্ত স্থির হয়, সাম্রাজ্যের বাণিজ্যনীতি নির্ধারিত হয়, অন্তান্ত রাজ্য, সাম্রাজ্য ও সাধারণতন্ত্রের সহিত সকল বিষয়ে সম্বন্ধ স্থির হয়, উপনিবেশসমূহের এবং অধীন দেশ-সকলের শাসনকর্তা ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হন,—এক কথায় সমগ্র সাম্রাজ্য-সম্বন্ধীয় সব কাজ ইংলণ্ডে হয়। স্বশাসক উপনিবেশগুলি দাবী করিতেছেন যে যুদ্ধের পর তাঁহারা আর উপনিবেশ থাকিবেন না, সাম্রাজ্যের অংশীদার হইবেন। তাঁহাদের একটা প্রস্তাব এই যে একটা সাম্রাজ্যিক পালেমেন্ট হউক, তাহাতে তাঁহারাও সভ্য নির্বাচন করিয়া পাঠাইবেন। কিন্তু তাঁহারা এটা চান না যে ভারতবর্ষও এই সাম্রাজ্যে একজন অংশীদার হয়। ভারত অধীনই থাক, এবং তাঁহারাও মনিব হন, এই তাঁহাদের ইচ্ছা। কিন্তু মনিব-পদবা-লিঙ্গ এই মানুষগুলি আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, কোথাও ভারতবাসীদিগকে মানুষ জ্ঞান করেন নাই, তাহাদের খুব নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা করিয়াছেন। এই জন্ত আমরা নূতন মনিবগুলি চাই না। কিন্তু তাহারা যে কয়েক বৎসরের মধ্যে সাম্রাজ্যে অংশীদার হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং এই নূতন পরাধীনতা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় দেখা চাই। একমাত্র উপায় আমাদেরও সাম্রাজ্যের অংশীদার হওয়া। উপনিবেশগুলির মত স্বশাসক হওয়ার উপর তাহা নির্ভর করে।

স্বশাসক হইবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা আমাদের আগে হইতেই আছে। এখন এই নূতন কারণে সেই প্রয়োজনের গুরুত্ব বাড়িয়াছে। অতএব ইচ্ছা ও চেষ্টাও তদন্তরূপ প্রবল হওয়া দরকার। প্রবল ইচ্ছা জন্মান ও প্রবল চেষ্টার আয়োজন করা, ইহাই এবারকার কংগ্রেসের প্রধান কাজ।

মোস্লেম লীগেরও ইহাই প্রধান কাজ। প্রস্তাব ধার্য্য করিলেই এই কর্তব্য পালন করা হইবে না। সমস্ত দেশের লোককে সংবাদপত্র, ক্ষুদ্রপত্রী, পুস্তিকা, পুস্তক ও ব্যাখ্যান দ্বারা স্বশাসক হইবার প্রয়োজন বুঝাইতে হইবে, এবং তজ্জন্ত সচেষ্ট কবিত্তে হইবে। স্বরাজ্যে দেশের লোকেরই অবিশ্বাস থাকিলে স্বরাজ্যপ্রাপ্তির অন্তরায় তাহার মত আর কি হইতে পারে?

বিলাতেও উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাইয়া তথাকার লোককে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব কল্যাণের জন্ত ও ভারতবাসীর প্রতি শ্রায়সঙ্গত আচরণের জন্ত, ভারতবর্ষেব স্বরাজ্য পাওয়ার প্রয়োজন বুঝাইতে হইবে। তজ্জন্ত যে দুই তিন লক্ষ টাকা চাই, তাহা আশাদিগকেই তুলিয়া দিতে হইবে।

সাময়িক ব্যাপারেব মধ্যে পার্টনা-বিশ্ববিদ্যালয় বিল, এবং ভারতরক্ষা আইনের ও মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রয়োগ যে-ভাবে হইতেছে, তাহা, কংগ্রেসের আলোচনা করা বর্তব্য।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী।

ত্রিপুরা জেলার বগায়, হুর্ভিক্ষে ও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবে, বাঁকুড়া জেলার হুর্ভিক্ষে, খুলনার ওলাউঠার সময়, অজয় নদীর বগায় বিপন্ন গ্রামসকলে, এবং অন্ত নানা স্থানে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী কিরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকেরা জানেন। মণ্ডলী কোন কোন জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মণ্ডলী “কলেরা নিবারণের উপায়” এবং “ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়” নামক দুটি ক্ষুদ্রপত্রী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পল্লীগ্ৰামের লোকদের কাজে লাগিবে। অন্তান্ত কাগজপত্র, শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিজ্ঞেননাথ মৈত্র, মেধো হাঁসপাতাল, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে পাওয়া যাইবে। তিনি এই মণ্ডলীর অবৈতনিক সম্পাদক।

একজন নজরবন্দীর কথা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতরক্ষা আইন অনুসারে নজরবন্দী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়। একটি প্রশ্ন এই:—ইহা কি সত্য যে নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ না দিয়াই নজর-বন্দী করিবার ছকুম দেওয়া হইয়াছিল? তত্বত্তরে গবর্ণমেন্ট-পক্ষ হইতে মাননীয় কার সাহেব বলেন যে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, এবং তিনি সে সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুযোগ নজরবন্দী করিবার ছকুম দিবার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল, না পরে, উত্তর হইতে তাহা বুঝা গেল না। লাট সাহেবের কাছে নগেন্দ্র দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ না দিয়া নজরবন্দী করা হইয়াছে। এই দরখাস্ত

অনেক দৈনিক ইংরেজী কাগজে বাহির হইয়াছিল।
সম্ভবতঃ এই দরখাস্তের পর তিনি স্বযোগ পাইয়াছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালীর সম্মান।

শুনা যাইতেছে, ইণ্ডিয়ান মিলিটারী সার্ভিস বিভাগের ডাক্তার কাপ্তেন জ্যোতিলাল সেনকে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার জন্য মিলিটারী ক্রস দিয়া পুৰস্কৃত করিবাব জন্য তত্ত্বতা সেনানায়ক স্থপারিস করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয়ের পুত্র। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কাপ্তেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় মিলিটারী ক্রস দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। কুটের অবরোধের পর যাহারা বন্দী হন, ইনি তন্মধ্যে একজন। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি ইহার মাতৃদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইহলোকে আর বীর পুত্রের মুখ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

ব্রিটিশ সেনাদলে ভিক্টোরিয়া ক্রস সাহসিকতার জন্য সর্বোচ্চ সম্মান। মিলিটারী ক্রস তাহারই নীচে।

নকল যুদ্ধ।

কলিকাতার কয়েকটি ইংরেজী দৈনিক কাগজে নোশেরায় কতকগুলি বাঙালী সিপাহী ও পাঠান সিপাহীর মধ্যে নকল যুদ্ধের একটি বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। তাহাতে বাঙালীর ছেলেদের রণকৌশলে পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা সম্ভবজনক। কিন্তু ইহা লইয়া বড়াই করা এবং বলা যে পাঠান সিপাহী অপেক্ষা বাঙালী সিপাহীর শ্রেষ্ঠতার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, নিতান্তই ছেলেমানুষী; কোন সাবালক বাঙালী সম্পাদকের তাহা করা উচিত নয়। করিলে, যে-সব জাতি যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়। উপহাস ইতিমধ্যেই কাগজে বাহির হইয়াছে। নকল যুদ্ধ পুরুষোচিত ক্রীড়ার মত; রণকৌশল শিখাইবার জন্য এই খেলা খেলিতে হয়। ক্রিকেট, ফুটবল, হকী, প্রভৃতির চেয়ে এ-খেলা শক্ত বটে, এবং ইহাতে বেশী কৌশলের এবং নেতৃত্ব-শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা আসল যুদ্ধের সমতুল নয়।

বাঙালীর ছেলেদের সাহস সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য তাহাদের কোন একটা সাধারণ কৃতিত্বে তৃপ্তিলাভ করিলেও আমরা উৎফুল্ল হইয়া বড়াই করিবার কারণ দেখি না। এ রকম বাহাদুরী ত তাহারা দেখাইবেই। যে-সব জাতি অনেক দিন হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের

যে রূপ কীর্তি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়, আমাদের ছেলেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে তেমন কিছু করিলে আমাদের তাহাতে উৎফুল্ল হওয়া হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্বশোভন ও সম্ভবতঃ হয়, যদি আগে অ-বাঙালী কাগজে বাঙালীর ছেলেদের প্রশংসা বাহির হয়, এবং পরে তাহা বাঙালীদের কাগজে উদ্ধৃত হয়। কাঁচা ভিত্তির উপর বড়াইয়ের বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করিতে যাওয়া স্ববুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

সমাজসংস্কার ও বাংলাদেশ।

লক্ষ্মী শহরে আগামী বড়দিনের ছুটির সময় যেমন কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তেমনি জাতীয় সমাজ-সংস্কার-সমিতিরও অধিবেশন হইবে। বাংলাদেশেই সমাজ-সংস্কারের আঁরস্ত হয়। রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেন্টের সাহায্যে সতীদাহ উঠাইয়া দেন। জীদন সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু ব্যবস্থা কিরূপ গ্রাসসম্মত ছিল, তাহা দেখাইয়া তিনি সে বিষয়েও হিন্দুনারীদের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় হিন্দু-বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হয়, এবং কতকগুলি বিধবার বিবাহও তিনি দেন। তাহার পর ব্রাহ্মসমাজে এখনও মধ্যে মধ্যে বিধবাদের বিবাহ হয়, এবং হিন্দুসমাজে ২৪টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু এ-বিষয়ে মোটের উপর বাংলাদেশ পিছাইয়া পড়িতেছে, এবং অল্প অনেক প্রদেশে অগ্রসব হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার শুভ চেষ্টা সফল হয় নাই; কিন্তু বহুবিবাহ অন্তান্ত নানা কারণে পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা বেশবচ্ছন্ন সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে বাল্যবিবাহ নাই। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের ফলে হিন্দুসমাজেও অনেক বুদ্ধিমান লোক এই আন্দোলন বাংলাদেশে করিয়াছেন। তন্মিত্ত অল্প নানা কারণে ছেলেদের বাল্যবিবাহ শিক্ষিতসমাজে অনেকটা বন্ধ হইয়াছে; লোকে বুঝিয়াছে যে অল্পবয়সে বিবাহ দিলে ছেলেদের শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, এবং ছেলেকে আইবড় রাখিয়া পাস্ করাইতে পারিলে বিবাহের বাজনা দর বাড়ে। তাহা হইলেও, অল্প কোন কোন প্রদেশে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যে রূপ আন্দোলন আছে, সে রূপ কিছু বাংলাদেশে এখন নাই। মেয়েদের বিবাহের বয়স, বিশেষতঃ শিক্ষিত-সমাজে, এখন আগেকার চেয়ে কিছু বাড়িয়াছে। বাল্যবিবাহ মেয়েদের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া বুঝায়, অল্পপরিমাণে এই স্বফল ফলিয়াছে। তদপেক্ষা গুরুতর কারণ, বোধ হয়, বরদের চড়া দর।

স্নেহলতার আত্মহত্যার পর বর-পণের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হইয়াছিল। উহার পরও অনেক বালিকা আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু বাঙালীর খড়ের আগুন দাউ দাউ কবিতা অল্পক্ষণের জন্ত জলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গিয়াছে। ডাক্তারদের সাক্ষ্য, কলিকাতার স্বাস্থ্যকর্তার রিপোর্টে, শহর-নির্মাণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সুবিখ্যাত অধ্যাপক গেভিস সাহেবের বক্তৃতায়, ইহা বাববার উল্লিখিত হইয়াছে যে আমাদের অবরোধ-প্রথা এবং তদুপায়ী স্বল্পলোক ও স্বল্প-বায়ু অস্তঃপুর নির্মাণ-প্রথা আমাদের বিস্তারিত নারীর ক্ষয়রোগ এবং তজ্জনিত মৃত্যুর কারণ। বাল্যবিবাহ এবং তজ্জনিত অকালমৃত্যুও যে অনেকের মৃত্যুর কারণ, তাহাও পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্তে ও আন্দোলনে এবং উল্লিখিত কারণসমূহে এখন এইটুকু ফল হইয়াছে যে নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে এখন হিন্দুনারীরাও প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা ও বায়ুসেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা সামান্য আরম্ভ মাত্র। অবরোধের জন্ত বাংলা বোম্বাইয়ের খুব পশ্চাতে রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রে অবরোধ নাই। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এবং পঞ্জাবের অবস্থাও এ বিষয়ে বাংলা অপেক্ষা ভাল। নারীর শিক্ষার জন্ত চেষ্টাও বাংলা অপেক্ষা মহারাষ্ট্র ও অগ্ন্যাগ্ন কোন কোন প্রদেশে প্রবল।

সমাজ সংস্কারের ছাটি প্রধান উদ্দেশ্য, মানুষকে তাহার বংশ-ও-জাতি-জনিত অসুবিধা হইতে বর্জ্যসাধ্য মুক্ত করা, এবং নারী নারী বলিয়া তাহাকে অনেক সমাজে যে-সব কৃত্রিম অসুবিধায় ফেলা হয়, তাহা হইতে মুক্তি দেওয়া। নারীদের কথা পূর্বে বলিয়াছি। নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির, জাতির জন্ত, লাঞ্ছনা ও অসুবিধা এখনও রহিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কতকটা স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্বাব হইতে এবং, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে, গরজে পড়িয়া নেতারা এইদিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদের উৎসাহ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি লোকমাত্র এখনও এইসকল জাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। বহুগতান্ধা লাঞ্ছনা সচ্য করার নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির মধ্যে সামাজিক বিদ্বেষিতা দেখা দিয়াছে। পূর্বে ও উত্তর বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের একটি কারণ, হিন্দুসমাজের লোকদের “নিম্ন”শ্রেণীর লোকদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য। মুসলমান-সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব আছে, হিন্দুসমাজে তাহা নাই। “নিম্ন”শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টিয়ানও হইতেছে। পঞ্জাবে ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে “নিম্ন”শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা উন্নতির জন্ত চেষ্টা বেরূপ প্রবল ও স্বশৃঙ্খল, বঙ্গে ঠিক সে রকমের চেষ্টা বেশী নাই।

বঙ্গে ও অগ্ন্যাগ্ন প্রদেশে নারী-জীবন।

মোটের উপর বাংলাদেশে নারীর জীবন অগ্ন্যাগ্ন কোন কোন প্রদেশের নারী-জীবন অপেক্ষা, বোধ হয়, অধিক দুঃখপূর্ণ। একথা আমরা পূর্বেও মধ্যে মধ্যে বলিয়াছি। বঙ্গে নারীর আত্মহত্যার সংখ্যাধিক্যের প্রতিও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু পূর্বে ঠিক সংখ্যার উল্লেখ করি নাই। এখন তাহা করিতেছি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সরকারী রিপোর্টে কি কি পীড়ার ও অগ্ন্যাগ্ন কারণে কত স্ত্রীলোক ও কত পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা লিখিত আছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে ঐ বৎসর ১৪৫২ জন পুরুষ এবং ২০১৮ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। পুরুষদের প্রায় দেড়গুণ অধিক স্ত্রীলোক যে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই কারণ আছে। জীবন নিতান্ত দুর্বল না হইলে লোকে আত্মহত্যা করে না।

এখন আমরা ১৯১৫ সালে চারিটি প্রদেশে পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যার সংখ্যা সরকারী রিপোর্ট হইতে সংকলন করিয়া দিতেছি।

১৯১৫ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা।

প্রদেশ	মোট বাসিন্দা	আত্মহত্যাকারী	
		পুরুষ	নারী
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৩৯,১৬,৩০৮	৪৪১	৫২৩
বিহার-ওড়িশা	৩,৪৪,৯০,০৩৮	৬০৫	১১০৫
আগ্রা-অযোধ্যা	৪,৬৮,২০,৫৫৬	৬৬৪	১৭২৯
বাংলা দেশ	৪,৫৩,২৯,২৪৭	১৪৫২	২০১৮

এই তালিকায় দেখা যায় যে সব প্রদেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক আত্মহত্যা করিয়াছে; স্বতরাং সর্বত্রই শিক্ষাদ্বারা নারীর মনকে দৃঢ়তর করিবার, নারীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার, এবং নারীর পক্ষে দুঃখজনক সামাজিক প্রথার সংস্কার ও অগ্ন্যুপায়ে নারীর জীবনকে অধিকতর আনন্দপূর্ণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। অগ্ন্য তিনটি প্রদেশের সহিত বাংলা দেশের অবস্থা তুলনা করিলে দেখা যায়, যে, আগ্রা-অযোধ্যার লোকসংখ্যা অপেক্ষা বাংলা দেশের লোকসংখ্যা বেশী; অথচ বঙ্গে আগ্রা-অযোধ্যা অপেক্ষা অধিক স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বঙ্গের লোকসংখ্যা মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের লোকসংখ্যার তিনগুণের কিছু বেশী, চারিগুণ অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু বঙ্গে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের, অতিসামান্য-কম-চারিগুণ স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বাংলার লোকসংখ্যা বিহার-ওড়িশার লোকসংখ্যার দেড়গুণ অপেক্ষা অনেক কম; কিন্তু আত্মঘাতিনী বঙ্গনারীর সংখ্যা আত্মঘাতিনী

বিহার-ওড়িশাবাসিনীদের প্রায় দ্বিগুণ, দেড়গুণ অপেক্ষা অনেক বেশী। অতএব, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে অত্র তিনটি প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে নারীদের আত্মঘাতিনী হইবার গুরুতর কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইসব কারণ আবিষ্কার করিয়া, ব্যাবির প্রতিকার চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর কর্তব্য।

তালিকা হইতে ইহাও দেখা যায় যে মোটবাসিনীসংখ্যার অনুপাতে আগ্রা-অযোধ্যা এবং বিহার-ওড়িশা অপেক্ষা আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যাও বঙ্গে অধিক। ইহারও কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। দেশের রাষ্ট্রীয়, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও আর্থিক দুর্বস্থা নরনারী উভয়েরই জীবনকে ক্লেশকর করিতে পারে। কোন কারণে পুরুষের, কোন কারণে নারীর, হুঃখ অধিক হয়, এবং মোটের উপর যে নারীর হুঃখই সর্বত্র বেশী তাহা তা দেখাই যাইতেছে।

বিলাতে পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যা।

কেহ যেন মনে না করেন, পৃথিবীর সকল দেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারী বেশী আত্মহত্যা করে। প্রমাণস্বরূপ আমরা ইংলণ্ডে আত্মহত্যার একটি তালিকা দিতেছি।

বৎসর	আত্মঘাতী পুরুষ	আত্মঘাতিনী নারী
১৯০১	২৩১৮	৮০৩
১৯০২	২৪৬০	৮০৭
১৯০৩	২৬৪০	৮৭১
১৯০৪	২৫২৩	৮২২
১৯০৫	২৬৮৩	৮৬২

পুরুষ বা নারী যে-জাতিই বেশী আত্মহত্যা করুক, উহা একটি সামাজিক ব্যাধি; উহার চিকিৎসা চাই। ইউরোপের সকল দেশের গড় ধরিলে আত্মঘাতীর সংখ্যা আত্মঘাতিনীর সংখ্যার ৩ঃ গুণ। এইজন্ত সেখানকার অবস্থা ও ভারত-বর্ষের অবস্থা বিভিন্ন বলিয়া, চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, বাঙালীর মেয়েরা উপত্যাস পড়ে বলিয়া আত্মহত্যা করে। কিন্তু ইউরোপের মেয়েরা যে শতগুণ বেশী উপত্যাস পড়ে?

শিক্ষা ও শ্রমজীবীদের কার্যকারিতা

আগ্রা-অযোধ্যার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, ডি লা ফু সাহেব এবং বঙ্গের ডিরেক্টর হর্নেল সাহেব শিক্ষকমিশনের নিকট যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে সার্বজনীন অবশ্যকর্তব্য শিক্ষার সপক্ষে মত দিয়াছেন। তাঁহাদের স্ততে ইহা দ্বারা শ্রমজীবীদের কার্যক্ষমতা বাড়িবে। বড় কারখানার কার্যে নিযুক্ত একজন ইংরেজও এইরূপই মত দিয়াছেন। ইহার নাম টি, এল, টালটন। ইনি কুরারডুই এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার এবং বার্ড কোম্পানীর কয়লার খনিসকলের

প্রধান এঞ্জিনিয়ার। আমাদের ধারণা পূর্বাবধি এইরূপই আছে।

ভারতীয় শ্রমজীবীদের কার্যকারিতা।

ভারতবর্ষীয় শ্রমজীবীদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাত্ত্ব-লৌহ ও ইম্পাত কারখানার সাধারণ কার্যাদ্যক্ষ টাটুওইলার সাহেব (Mr. T. W. Tatwiler) শিল্পকমিশনের সমক্ষে ভারতীয় শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহা উৎসাহবর্দ্ধক। তিনি বলেন :—

My opinion of the Indian workmen taken as a whole is that they are very intelligent and quick to learn, and they generally shape well when they are trained properly. Indians, given every facility and encouragement, just as industriously apply themselves to this particular kind of work as Europeans, possibly more so during the hot weather, as the tropical conditions are less irksome to them. And this applies to all Departments.

If an Indian has proper food and nourishment, he should be a steady worker and better able to stand the climate of the country than a foreigner, who usually comes out without his family and misses the wholesome influence of public opinion such as exists in his own country, and is therefore apt to dissipate, which is hardly conducive to his regular attendance.

As a rule, the Indian is more amenable to discipline than the foreigner, who on the strength of his contract or under the impression that he is indispensable to his employers is apt to get a swelled head and to disregard discipline. Again, the Indian has a permanent interest in the place and the country, and naturally takes more interest in his surroundings and helps to develop the social and intellectual side of his community. When an Indian is substituted for a foreigner, there is a great saving in salary.

I am sure that where Indians have been substituted for Europeans in these Works, the quality of our products has not suffered.

বাঁকুড়ার কথিত ভাষা।

ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “আমরা জানি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের লোকেরা ‘কু’ ধাতু খুব ব্যবহার করিয়া থাকে। ‘খাওয়া হইল’ স্থলে তাহারা ‘খাওয়া করা হইল’ বলিবে।” আমরা বাঁকুড়ার মানুষ, সেখানেই আমাদের জন্ম ও বসবাস। আমরা কু ধাতু বেশী ব্যবহার করি বটে। যেখানে পুব্যালোকে বলিবে “আনাও”, আমরা কেহ কেহ সেখানে বলি, “আন করাও”। কিন্তু “খাওয়া করা হইল”টা ভূতপূর্ব জন্ত বাহাদুরের সৃষ্টি। ওরূপ কথা আমরা বলি না। “ভারতী”র কোন কোন লেখিকারও মধ্যে মধ্যে এইরূপ অজুত বাঁকুড়ী কথার উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। বাঁকুড়ার কথিত ভাষার জন্ত আমরা একটুও লজ্জিত নহি। কিন্তু আমাদের ঘাড়ে অজুত কথা চাপাইলে জংলী বাঁকুড়ী মহুয়া আমরা, আমাদেরও হাসি পায়।

প্লেটো—সোক্রেটিসের আত্মসমর্থন

(মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত)

পূর্বাষুভূতি ।

১২। সোক্রেটিস—আচ্ছা, মেলীটস, এস, আমাকে বল দেখি, যুবকেরা যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পারে, তাহা তুমি বহুমূল্য জ্ঞান কর কি না?

মেলীটস—হাঁ, করি।

সোক্রেটিস—তবে এস, এই বিচারকদিগকে বল, কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে? এ তো স্বম্পষ্ট, যে, তুমি যখন এ বিষয়ে এতটা ব্যগ্র, তখন তুমি ইহা জ্ঞান। তুমি বলিতেছ, যে, আমি তাহাদিগকে মন্দ করিতেছি, এবং সেই জন্যই তুমি আমাকে রাজদ্বারে আনিবাছ এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ। এখন এন, ইহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বল, কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে। মেলীটস, তুমি তো দেখিতেছ, যে, তুমি নীচব রহিয়াছ এবং তোমার বলিবার কিছুই নাই? তথাপি তোমার নিকটে ইহা লজ্জাজনক বোধ হইতেছে না? আমি যে বলিতেছি, যে, তুমি এই সকল বিষয়ে কিছুমাত্র শ্রমস্বীকার কর নাই, তোমার নীরবতাই কি তাহার পর্যাপ্ত প্রমাণ নহে? ওহে সাধু, বল, কে তাহাদিগকে ভাল করিতেছে?

মেলী—নিয়মসমূহ (Nomoi—the Laws)।

সোক্রে—কিন্তু, হে পুরুষোত্তম, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই; আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যে, সে কোন্ ব্যক্তি যে যুবকদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, এবং যে সর্বপ্রথমে এই নিয়মগুলিরই জ্ঞানলাভ করিয়াছে?

মেলী—এই বিচাবকগণ, সোক্রেটিস।

সোক্রে—তুমি কি বলিতেছ, মেলীটস? ইহার যুবকদিগকে শিক্ষা দিতে ও তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ?

মেলী—নিশ্চয়ই।

সোক্রে—ইহার সকলেই? না, কেহ কেহ সমর্থ, কেহ কেহ অসমর্থ?

মেলী—সকলেই।

সোক্রে—হীরার দিব্য, ভূগি বেণ বলিতেছ; তবে তো উপকারী বান্ধব খুব প্রচুরই দেখা যাইতেছে! আচ্ছা, আর একটা কথা; এই শ্রোতৃবর্গ যুবকদিগের উন্নতিসাধন করেন, কি করেন না?

মেলী—হাঁ, তাঁহারাও করেন।

সোক্রে—মন্ত্রিগণও কি করেন?

মেলী—হাঁ, মন্ত্রিগণও।

সোক্রে—কিন্তু, ওহে মেলীটস, তবে রাজসভার সদস্যগণ অবশ্যই যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছেন না? অথবা তাঁহারা সকলেই তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন?

মেলী—হাঁ, তাহাবাও উন্নতিসাধন করিতেছেন।

সোক্রে—তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, আমি ভিন্ন আধীন্যেরা সকলেই যুবকদিগকে মহৎ ও সুন্দর কবিতা গড়িয়া তুলিতেছে, একা আমিই তাহাদিগকে মন্দ করিতেছি। তুমি ইহাই বলিতেছ?

মেলী—হাঁ, আমি খুব ঘ্রোব কবিতাই এইরূপ বলিতেছি।

সোক্রে—তুমি আমাকে নিতান্ত দুর্বল্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। আচ্ছা, আমার কথার উত্তর দাও। তোমার কি মনে হয়, যে, ঘোটক সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ? ঘোটকের উন্নতি সাধন করে সকল লোকেই, কিন্তু একজন উহাদিগকে মন্দ করে? না, যাহা ইহার সর্বথা বিপরীত, তাহাই সত্য? একজন, অথবা অল্পজন—অর্থাৎ অশ্বপালগণ—ঘোটকের উন্নতি সাধনে সক্ষম; কিন্তু বহুজনই ঘোটকের সংস্পর্শে আসিলে ও ঘোটক ব্যবহার করিলে তাহাদিগের অবনতি ঘটাইয়া থাকে? হে মেলীটস, ঘোটক ও অশ্বাশ্রয় সমুদ্র সম্বন্ধে কি এ কথাই ঠিক নয়? নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে ঠিক, তা' তুমি ও আফ্রাটস 'না'-ই বল বা 'হাঁ'-ই বল। যুবকদিগের সম্বন্ধে আমাদের মতো ভাণ্ড বড়ই বেশী হইত, যদি কেবল একজন তাহাদিগের অহিত করিত এবং অপর সকলেই তাহাদিগের হিতসাধনে রত থাকিত। কিন্তু, মেলীটস, প্রকৃত কথাটা এই, যে, তুমি যথেষ্ট প্রমাণিত করিয়াছ, যে, তুমি যুবকদিগের সম্বন্ধে কখনও ভাব নাই; এবং তুমি যে সকল অভিযোগে আমাকে বিচাৰালয়ে

আনিয়া উপস্থিত করিয়াছ, সেই-সকল বিষয়ে তুমি যে কিছুমাত্র শ্রমস্বীকার কর নাই—তোমার সেই শ্রমবিমুখতা তুমি নিজেই জ্ঞান্যমান প্রকটিত করিয়াছ।

১৩। ওহে মেলীটস, দ্যোপিতার দোহাই, আমা-
দিগকে বল দেখি, সজ্জনেব সহিত বাস করা ভাল, না,
অসং লোকের সহিত বাস করা ভাল? ওগো মহাশয়,
জবাব দেও; আমি তো তোমাকে এমন একটা কঠিন
কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি না। অসং লোকে কি নিয়তই
প্রতিবেশীদিগের অনিষ্ট এবং সাধুজন ইষ্ট করে না?

মেলী—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—এমন কেহ আছে কি, যে স্বীয় সহচরদিগের
দ্বারা উপকৃত না হইয়া বরং অপকৃত হইতে চায়? হে
ভদ্র, উত্তর দাও; কেননা, আইন তোমাকে উত্তর
দিতে আদেশ করিতেছে। এমন কেহ আছে কি, যে
অপকৃত হইতে ইচ্ছা করে?

মেলী—নিশ্চয়ই কেহ নাই।

সোক্রা—বেশ কথা; আমি যুবকদিগকে মন্দ ও অসং
করিয়া তুলিতেছি বলিয়া তুমি যে আমাকে এখানে টানিয়া
আনিয়াছ, তা' আমি এই কাজটি ইচ্ছাপূর্বক করিতেছি,
কি অনিচ্ছাপূর্বক করিতেছি?

মেলী—ইচ্ছাপূর্বক করিতেছ বলিয়াই আমি তোমাকে
এখানে আনিয়াছি।

সোক্রা—সে কি কথা, মেলীটস? আমার এত বয়স
হইয়াছে, তবু তুমি তোমার এই বয়সেই আমার অপেক্ষা
এত অধিক বিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছ, যে, তুমি আনিয়াছ,
অসং লোকে নিয়তই স্বীয় নিকট-প্রতিবেশীদিগের
অনিষ্ট ও সাধুজন ইষ্ট করিয়া থাকে, আর আমিই এমন
অজ্ঞানতায় ডুবিয়া রহিয়াছি, যে, আমার এইটুকু জ্ঞান
নাই, যে, আমি যদি আমার সহচরগণের কাহাকেও অসাধু
করিয়া তুলি, তবে তাহা দ্বারা আমারই কোন না কোনও
অনিষ্ট ঘটিবে? সুতরাং তুমি বলিতেছ, আমি ইচ্ছা-
পূর্বকই এতবড় একটা অপকর্ম করিতেছি? ওহে
মেলীটস, আমি তোমার এমনতর কথা বিশ্বাস করি না,
এবং আমার মনে হয় যে তুমি অপর কোন লোককেও
ইহা বিশ্বাস করাইতে পারিবে না। হয় আমি যুবকদিগকে

মোটাই মন্দ কবিতেছি না, না হয়, যদিই বা মন্দ করি,
অনিচ্ছাপূর্বকই করিতেছি; সুতরাং এই উভয় মতানুসারেই
তুমি মিথ্যাবাদী। যদি আমি অনিচ্ছাপূর্বক তাহাদিগকে
মন্দ করিয়া থাকি, তবে এইপ্রকার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের
জন্ত তুমি যে আমাকে রাজদ্বাবে উপস্থিত করিবে, এমন
কোনও বিধি নাই; কিন্তু তুমি আমাকে একান্তে ডাকিয়া
লইয়া গিয়া তিরস্কার করিবে ও শিক্ষা দিবে, ইহাই বিধি।
কারণ, ইহা তো সুস্পষ্ট, যে, আমি অনিচ্ছাপূর্বক যে
দুর্কর্ম করিতেছি, দুর্কর্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেই উহা
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব। কিন্তু তুমি আমার সংস্পর্শে
থাকিতে ও আমাকে শিক্ষা দিতে চাহিতেছ না; তুমি
তাহা পরিহার করিয়া আমাকে বিচারালয়ে লইয়া
আসিয়াছ, যদিচ নিয়ম এই, যে, যাহাদিগের দণ্ডেব
প্রয়োজন তাহারাই এখানে অনীত হইবে, কিন্তু
যাহাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার নহে।

১৪। কিন্তু, হে আখীনীয় নরগণ, প্রকৃত কথা এই,
যে, আমি যেমন বলিয়াছি, মেলীটস এই-সকল বিষয়ে
কখনই অল্প বা অধিক কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করে
নাই। সে যাহা হউক, তুমি আমাদিগকে বল দেখি,
মেলীটস, আমি কিরূপে যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছি?
তুমি যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, তদনুসারে স্পষ্টই
প্রতীয়মান হইতেছে, যে, পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায়
বিশ্বাস করে, আমি তাহাদিগকে সেই দেবগণে অবিশ্বাস
ও অপর নূতন দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া
যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছি; তুমি ইহাই বলিতেছ, না?

মেলী—হাঁ, আমি খুব দৃঢ়তার সহিত এইরূপ বলিতেছি।

সোক্রা—তাহা হইলে, হে মেলীটস, যে দেবগণ সম্বন্ধে
এই আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের দোহাই,
তুমি আমাকে ও এই বিচারকগণকে বিষয়টা আরও স্পষ্ট
করিয়া বল। কেননা, তুমি কি বলিতেছ, আমি
বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি বলিতে চাও, যে, আমি
যুবকদিগকে কোন কোন দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা
দিই? তাহা হইলে তো আমি নিজে দেবগণের অস্তিত্বে
বিশ্বাস করি, এবং আমি তবে একেবারে নাস্তিক নই
ও আমার অপরাধটাও একাত্মীয় নয়; অথবা তোমার

অভিপ্ৰায় এই, যে, পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, আমি তাঁহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি অপর দেবতায় বিশ্বাস করি; সুতরাং তুমি বলিতেছ, যে, আমার অপরাধ এই, যে, আমি অপর দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিতেছি? না, তুমি বলিতেছ যে আমি দেবগণের অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস করি না, এবং অপরকেও তাহাই শিক্ষা দিতেছি?

মেলী—আমি ইহাই বলিতেছি, যে, তুমি দেবগণের অস্তিত্বে একেবারেই বিশ্বাস কর না।

সোক্রে—ও বিচিত্রবুদ্ধি মেলীটস, তুমি কি উদ্দেশ্যে এরূপ বলিতেছ? আমি কি অপর লোকের মত চন্দ্র-সূর্য্যকেও দেবতা বলিয়া বিশ্বাস কবি না?

মেলী—হে বিচারপতিগণ, আমি দ্যোপিতার দিব্য করিয়া বলিতেছি, সোক্রেটীস চন্দ্রসূর্য্যকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে না; কেননা, সে বলে, সূর্য্য প্রস্তর ও চন্দ্র মৃৎপিণ্ড।

সোক্রে—হে প্রিয় মেলীটস, তুমি কি ভাবিতেছ, যে, তুমি আনাক্সাগরসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছ? তুমি বিচাবকগণকে এতই অবজ্ঞা করিতেছ ও তাঁহাদিগকে এমনই নিরক্ষর ভাবিতেছ, যে, তাঁহারা জানেন না, ক্লাজমেনাই-বানী আনাক্সাগরসের গ্রন্থগুলি এইপ্রকার মতে পরিপূর্ণ? আর, যুবকেরা আমার নিকটেই এই-সকল মত শিক্ষা করিতেছে, যদিচ তাহারা অনেক সময়ে রঙ্গালয়ে বড় জোর এক ভ্রামাতেই এগুলি ক্রয় করিতে পাবে, এবং যদি সোক্রেটীস এগুলিকে নিজের বলিয়া প্রচার করে তবে তাহাকে পরিহাসও করিতে পারে, বিশেষতঃ যখন মতগুলি এমনই অজুত? কিন্তু, দ্যোপিতার দোহাই, তুমি কি বাস্তবিকই আমার সম্বন্ধে এই মত পোষণ কব, যে, আমি কোন দেবতার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করি না?

মেলী—আমি দ্যোপিতার দিব্য করিয়া বলিতেছি, তুমি দেবতার অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস কর না।

সোক্রে—ওহে মেলীটস, তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য; এবং আমাব বোধ হয়, যে, তুমি নিস্তেজ ও জ্ঞান, যে, তোমাব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। হে আখীনীয়গণ, আমার এইরূপ

বোধ হইতেছে, যে, মেলীটস একান্ত উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল; সে বস্তুতঃ যৌবনস্থলভ ঐক্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবিশুদ্ধকারিতার বশবর্তী হইয়াই আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। বোধ হইতেছে, যেন সে আমাকে পবীক্ষা করিবার জন্ত একটা ধাঁধা রচনা করিয়াছে। সে যেন মনে মনে বলিতেছে, “এই জ্ঞানী সোক্রেটীস কি তবে বুদ্ধিতে পারিবে, যে, আমি রহস্যতামাসা করিতেছি এবং আপনি আপনার কথা খণ্ডন করিতেছি? না, আমি তাহাকে ও অন্ত যাহারা আমার কথা শুনিবে তাহাদিগকে প্রতারণিত করিতে সমর্থ হইব?” আমি দেখিতে পাইতেছি, যে, মেলীটস অভিযোগে নিজেই নিজের বিপরীত কথা বলিতেছে; সে যেন বলিতেছে, “সোক্রেটীস দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া, অথচ দেবতায় বিশ্বাস করিয়া, অপরাধী হইয়াছে।” কিন্তু এটা একটা পরিহাস-রসিকের কথা।

১৫। হে বন্ধুগণ, আমরা তবে বিচার করিয়া দেখি, কেন আমার নিকটে ইহাই অভিযোগের অর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। মেলীটস, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আর তোমরা, আমি প্রারম্ভেই যে অহুরোধ করিয়াছি, তাহা স্মরণ রাখিও: এবং আমি যদি আমার চিরাত্যস্ত প্রণালীতে কথা বলি, তবে আমাকে বাধা দিও না।

ওহে মেলীটস, এমন লোক কেহ আছে কি, যে মান-বীয় ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু মানবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? বন্ধুগণ, মেলীটসকে উত্তর দিতে বল, আর তোমরা একটার পব একটা বাধা দিও না। এমন কেহ আছে কি, যে অশ্ববিষয়ক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু অশ্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? অথবা বংশীবাদনে বিশ্বাস করে, কিন্তু বংশীবাদকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? হে পুরুষোত্তম, এমন কেহই নাই। তুমি যদি উত্তর দিতে না চাও, তবে আমিই তোমাকে ও উপস্থিত আর সকলকে বলিয়া দিতেছি। কিন্তু তুমি এই পরবর্ত্তী প্রশ্নটার উত্তর দাও। এমন বেহ আছে কি, যে দৈব ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না?

মেলী—না, নাই।

সোক্রা—কত বড় অল্পগ্রহই করিলে, যে, ইহাদেব দ্বারা বাধ্য হইয়া আমার কথাটার জবাব দিলে। তুমি তবে বলিতেছ, যে, আমি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি ও তাহাই শিক্ষা দিই, তা' সে দেবাত্মা নূতনই হউক বা পুরাতনই হউক। তোমার কথা অল্পসারে আমি অন্ততঃ দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; তুমি অভিযোগে শপথ করিয়া এইপ্রকার বলিয়াছ। কিন্তু, আমি যদি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে ইহা একান্ত নিশ্চিত, যে, আমি দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করি। কেমন, কথাটা ঠিক নয়? ইা ঠিক। তুমি যখন উত্তর দিতেছ না, তখন আমি ধরিয়া লইতেছি, যে, তুমি আমার সহিত একমত হইয়াছ। কিন্তু, আমরা কি দেবাত্মাদিগকে দেবতা, কিংবা দেবগণের সন্তান, বলিয়া মনে করি না? বল, ইা, কি না?

মেলী—ইা, নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, যে, আমি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি দেবাত্মারা একপ্রকার দেবতা হন, তবে আমি যে বলিয়াছি, যে, তুমি একটা ধার্মী রচনা ও রঙ্গ তামাসা করিতেছ, তাহা ঠিকই বলিয়াছি; কেননা, তুমি বলিতেছ, যে, আমি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, অথচ পুনশ্চ দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, যেহেতু আমি দেবাত্মার বিশ্বাস করি। কিন্তু, যদি দেবাত্মারা দেবকণ্ঠা কিংবা অন্ত জননীর গর্ভ-জাত দেবগণের আরঙ্গ সন্তান হন—তাহারা যাহারই সন্তান হউন না কেন—তবে এমন মানুষ কে আছে, যে, দেব-সন্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অথচ দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস কবে না? যদি কেহ অশ্ব-ও-গর্দভ শাবকের (অর্থাৎ অশ্বতরের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অথচ অশ্ব ও গর্দভের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে, তবে তাহা যেমন অসঙ্গত, এটাও ঠিক সেইরূপ অসঙ্গত। ওহে মেলীটস, তুমি আমাকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা আমার প্রকৃত কোনও অপরাধ আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ; ইহা ছাড়া আব কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু, এমন কোন কোশল নাহি, যদ্বারা, যে মানুষের বিন্দু-

মাত্রও বুদ্ধি আছে, তাহাকে তুমি বুঝাইতে পারিবে, যে, একজন দৈব ও দৈবাত্ম ব্যাপারে বিশ্বাস করে, অথচ সে দেবাত্মা ও দেবতা (ও বীরগণের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

১৬। বিস্তু, হে আখীনীয় নরগণ, প্রকৃত বথা এই, আমি যে মেলীটসের অভিযোগ-বর্জিত অপরাধে অপরাধী নই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমার বোধ হয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; বরং এতদ্ব্যন্থ যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। বিস্তু আমি পূর্বেই তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি—যে, আমার বিরুদ্ধে বহুলোকের চিত্তে বিষম বিদ্বেষ সঞ্চার হইয়াছে—তোমরা বেশ জানিও, যে, তাহা সত্য। যদি আমি অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হই, তবে মেলীটস বা আল্ক্যটস নয়, কিন্তু ইহাই—এই বহুজনের নিন্দা ও বিদ্বেষই আমাকে অপরাধী ধার্য্য করিবে। নিন্দা ও বিদ্বেষ কত অসংখ্য সাধু লোকেরই প্রাণ হরণ করিয়াছে, এবং আমি বিবেচনা করি, আরও করিবে; আমাতেই যে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে, এমন আশঙ্কা নাই।

এখন, কেহ হয় তো বলিবে, “আচ্ছা, সোক্রাটীস, তোমার কি লজ্জা বোধ হইতেছে না, যে, তুমি এমন ব্যব-
সায়ে নিযুক্ত হইয়াছিলে, যাহাতে ‘তোমাকে এক্ষণে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইতেছে?’ আমি তাহাকে এই জ্ঞায্য প্রত্যুত্তর দিতেছি,—হে বন্ধু, তুমি যদি বিবেচনা কর যে, যে মানুষের কিছুমাত্র মূল্য আছে, তাহার পক্ষে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এইটি গণনা করা কর্তব্য, যে, সে বাঁচিবে, না মরিবে, কিন্তু তাহার শুধু ইহাই দেখা কর্তব্য নহে, যে, সে যাহা কবিত্তেছে তাহা জ্ঞায্য কি অজ্ঞায্য, তাহা সাধুজনের বার্য্য, কি অসাধু লোকের কার্য্য, তবে তুমি সঙ্গত বথা বলিতেছ না। তোমার কথা অল্পসারে, যে-সকল দেবাত্মজ বীরগণ ঠিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই, বিশেষতঃ থেটিসনন্দন আখিলীস, মুখ ছিলেন। আখিলীস কলঙ্কের তুলনায় বিপদকে এমনই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যে, তিনি যখন হেক্টোরকে সংহার করিবার জন্য একান্ত আবুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাহার জননী—তিনি দেবী ছিলেন—আমায় মনে হই, এইরূপে

তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন :—“হে বৎস, যদি তুমি স্বীয় সখা পাট্রক্লসেব মৃত্যুর প্রতিশোধ লও, এবং হেক্টোরকে বধ কর, তবে তুমি নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, 'কারণ, (তিনি বলিলেন) হেক্টোরের পরেই তোমাব নিয়তি বিহিত হইয়া রহিয়াছে'।” যখন জননী এইরূপ বলিলেন, তখন তাঁহার বাক্য শুনিয়া তিনি বিপদ ও মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করিলেন; কাপুরুষের মত জীবন ধারণ করা ও প্রিয়জনের মৃত্যুর প্রতিশোধ না লওয়াই তাঁহার নিকটে অনেক অধিক ভয়াবহ বোধ হইল; তিনি বলিলেন, “আমি পাপাচারীর দণ্ডবিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ মরিতে চাই; আমি যেন অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি নৌবন্দ সমীপে লোকের উপহাসভাজন হইয়া ধরিজীর ভারস্বরূপ অবস্থান না করি।” তুমি কি বিবেচনা কর, যে, তিনি বিপদ ও মৃত্যুকে গ্রাহ্য করিয়াছিলেন? হে আত্মনীয় নরগণ, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সত্য। কোনও ব্যক্তি নিজে সর্বোৎকৃষ্ট ভাবিয়া যেখানেই আপনাকে স্থাপন করুক না কেন, অথবা তাহার অধিনায়ক কর্তৃক যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন, আমার বিবেচনায় তাহার সেইখানে অবস্থান করাই কর্তব্য; তাহার পক্ষে কলঙ্ক ভিন্ন মৃত্যু কিংবা অপর কিছুই গণনা করা উচিত নহে।

১৭। হে আত্মসমর্থনগণ, তোমরা আমাদিগকে পরিচালিত করিবার জ্ঞান যাহাদিগকে নায়ক নির্বাচন করিয়াছিলে, তাঁহারা পটেইডাইয়া, আক্ষিপলিস ও ডীলিম্মে আমাকে যখন যে স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটিলেও অপব সকলের ত্রাস তখন সেই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলাম। সুতরাং, যখন আমি বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, যে, ঈশ্বর আমাকে জ্ঞানদ্বারা এবং আপনাদের ও অপরের পরীক্ষায় জীবন বাপন করিতে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন যদি আমি মৃত্যু কিংবা এইপ্রকার অন্য কিছু ভয়ে ভীত হইয়া আমার জীবন-ব্রত ত্যাগ করিতাম, তবে তাহা একটা অদ্ভুত কৰ্ম হইত। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপারই হইত; এবং তখন বস্তুতঃ ত্রাস-সম্ভতরূপেই কেহ আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতে পারিত, যে, আমি দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, যেহেতু, আমি দৈববাণী অগ্রাহ্য করিয়াছি, মৃত্যু-ভয়ে

ভীত হইয়াছি, এবং জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কেননা, হে বন্ধুগণ, মৃত্যুকে ভয় করা জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা করা—ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়; যেহেতু, মৃত্যুভয়ের অর্থই এই, যে, আমরা যাহা জানি না, তাহাই জানি বলিয়া বিবেচনা করি। কাবণ, মৃত্যু মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মহিষ্ট কল্যাণ কি না, তাহা কেহই জানে না; অথচ লোকে যেন উহা সম্যক অবগত আছে এই ভাবিয়া উহাকে সর্বপ্রধান অমঙ্গলরূপে ভয় করে। ইহা কি সেই নিতান্ত লজ্জাজনক অজ্ঞানতা নয়, যে অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা যাহা জানি না, তাহাও জানি বলিয়া ভাবিয়া থাকি? বন্ধুগণ, এতদ্বারা হইতে পারে। জনসাধারণের সহিত আমার এইটুকু পার্থক্য আছে; এবং যদি আমি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী বলিয়া প্রতীয়মান হই, তবে তাহা এই জন্য, যে, আমি যখন পরলোক সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানি না, তখন আমি মনেও করি না, যে, আমি জানি। কিন্তু আমি জানি, যে, অজ্ঞানতাবশতঃ করা ও যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তিনি দেবতাই হউন বা মানুষই হউন—তাঁহার অবাধ্য হওয়া অকল্যাণকর ও ঘৃণ্য। আমি যেগুলি অকল্যাণ বলিয়া জানি, সেগুলির জ্ঞান, যেসকল বিষয় কল্যাণ কি না আমি জানি না, তাহা আমি কখনই ভয় করিব না, বা পরিহার করিতে প্রয়াসী হইব না। সুতরাং তোমরা যদি এক্ষণে আত্মসমর্থনগণের মূল্যে কর্ণপাত না করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও,—সে বলিয়াছে, যে, হয় আমাকে মূলেই এখানে আনয়ন করা উচিত হয় নাই, না হয়, যখন আমাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইয়াছে, তখন আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাই কর্তব্য; সে তোমাদিগকে বলিতেছে, যে, যদি আমি অব্যাহতি পাই, তাহা হইলে তোমাদিগের পূজ্যগণ সকলেই সোক্রাটীস যাহা শিক্ষা দিতেছে তাহাতে নিরত হইয়া সর্বতোভাবে বিপথগামী হইবে—তোমরা যদি এই হেতু আমাকে বলিতে, “ওহে সোক্রাটীস, এবার আমরা আত্মসমর্থনগণের কথায় কর্ণপাত করিব না, এবার তোমাকে আমরা নিষ্কৃতি দিব; কিন্তু তোমাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যে, তুমি এই প্রকার অসুসন্ধান ও জ্ঞানদ্বারা আঁতড়াইয়া

করিবে না; যদি তুমি আবাব ইহাতে লিপ্ত হও, তবে তুমি প্রাণ হাবাইবে।” আমি যেমন বলিলাম, যদি তোমরা এই নিয়মে আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতে, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতাম, হে আত্মীয়গণ, আমি তোমাদিগকে প্রজ্ঞা করি ও ভালবাসি; কিন্তু আমি তোমাদিগের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরেরই অনুগামী হইব; যতদিন আমার নিঃশ্বাস বহিবে ও দেহে সামর্থ্য থাকিবে, ততদিন আমি জ্ঞানান্বেষণ এবং তোমাদিগকে শিক্ষাদান ও সংপথ প্রদর্শন করিতে বিরত হইব না, যখনই তোমাদিগের কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহাকে আমার চিরাভ্যন্ত ভাবে আমি বলিব, হে পুরুষোত্তম, তুমি আত্মীয়, জ্ঞান ও বীৰ্য্যের জন্ত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও স্ববিখ্যাত নগরীর অধিবাসী, তোমার কি লজ্জা হইতেছে না, যে তোমার ঈশ্বর্য্য কিসে পরিপূর্ণ হইবে, এবং মান ও খ্যাতি বর্দ্ধিত হইবে, তাহার জন্ত তুমি এত শ্রম করিতেছ? তুমি কি জ্ঞানের জন্ত, সত্যের জন্ত, কিরূপে আত্মা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে তাহার জন্ত, যত্ববান হইবে না, বা তাহাতে মনোনিবেশ করিবে না? যদি সে আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয় এবং বলে, যে, সে এই-সকল বিষয়ে যত্ববান, তবে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িব না, কিম্বা চলিয়া যাইব না; কিন্তু আমি তাহাকে প্রশ্ন করিব, পরীক্ষা করিব ও তাহার বাক্য খণ্ডন করিব; এবং যদি আমার বোধ হয়, যে, তাহার গুণ নাই, অথচ সে বলে যে আছে, তবে তাহাকে আমি এই বলিষা তিরস্কার করিব, যে, সে যাহা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তাহাকেই অল্পমূল্য, ও যাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ, তাহাকেই বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছে। যুবক ও বৃদ্ধ, বিদেশী ও স্থপূরবাসী, যাহাবই সহিত আমার সাক্ষাৎ হউক না কেন, তাহার প্রতিই আমি এইরূপ করিব, বিশেষতঃ স্থপূরবাসীদিগের প্রতি; কেননা, তাহার জন্মাবধি আমার অধিকতর নিকটবর্তী। কাবপ, তোমরা বেশ জানিও, ঈশ্বর আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন; এবং আমি বিবেচনা করি, যে, এই নগরে তোমাদিগের পক্ষে আমার ঈশ্বর-সেবাব অপেক্ষা মহত্তর সৌভাগ্য আর ঘটে নাই। কেননা; আমি আর কিছুই না করিয়া শুধু সর্বত্র যাতায়াত করিতেছি, এবং

যুবক ও বৃদ্ধ তোমাদের সকলকেই বুঝাইতে চাহিতেছি, যে তোমরা দেহের জন্ত ভাবিও না; অগ্রেই অর্থের জন্ত এমন ব্যস্ত হইয়া থাকিয়া মরিও না; কিন্তু আত্মা যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্ত যত্নশীল হও; আমি বলিতেছি, অর্থ হইতে ধর্ম উদ্ভূত হয় না, কিন্তু ধর্ম হইতেই অর্থ ও মানবের স্বকীয় ও রাষ্ট্রীয় অপর যাবতীয় শুভ প্রসূত হইয়া থাকে। যদি আমি এই প্রকার শিক্ষা দিয়া যুবকদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকি, তবে অনিষ্ট গুরুতরই হইয়াছে; কিন্তু যদি কেহ বলে, যে, আমি ইহা ছাড়া আর কিছু শিক্ষা দিতেছি, তবে সে অলীক কথা বলিতেছে। অতএব, হে আত্মীয়গণ, আমি বলিতেছি, তোমরা আত্মাটসের কথামত কার্য্য কর, বা করিও না; আমাকে নিষ্কৃতি দেও, কিম্বা নিষ্কৃতি দিও না; কিন্তু যদি বা আমাকে সহস্রবারও মর্ষিতে হয়, তথাপি আমি আমার জীবনব্রত কখনই পরিবর্তন করিব না।

১৮। হে আত্মীয় নরগণ, আমাকে বাধা দিও না; আমি তোমাদিগের নিকটে যে ভিক্ষা চাহিয়াছি, তাহা স্বরণ রাখ, এবং আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে বাধা না দিয়া আমার কথাগুলি শুন; কেননা, আমি বিবেচনা করি, শুনিলে তোমাদিগের উপকার হইবে। আমি তোমাদিগকে অস্ত্র এমন কিছু বলিতে যাইতেছি, যাহা শুনিয়া তোমরা হয় তো চীৎকার করিয়া উঠিবে; কিন্তু কখনই তাহা করিও না। আমি যেমন, তাহা তো তোমাদিগকে বলিলাম; এখন বেশ জানিও, তোমরা যদি আমাকে বধ কর, তবে আমার অপেক্ষা তোমরা নিজেদেরই গুরুতর অনিষ্ট করিবে। মেলীটস বা আত্মাটস আমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না, কারণ ইহা তাহাদিগের সাধ্যাত্ত নহে; কেননা, আমি বিশ্বাস কবি যে, অধম ব্যক্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠজনের অনিষ্ট সাধিত হইবে, ইহা ঈশ্বরের বিধিই নয়। অবশ্য তাহারা হয় তো আমাকে হত্যা করিতে পারে, অথবা নির্বাসিত করিতে পাবে, বিদ্বা রাষ্ট্রীয় অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারে; তাহারা ও তত্ত্ব অনেক হয় তো এগুলিকে ভয়ঙ্কর অমঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করে; আমি বিজ্ঞ তাহা

করি না; আমি মনে করি, তাহারা এক্ষণে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা—অর্থাৎ কোন লোককে অজ্ঞান-মত বধ করিবাব চেষ্টাই—বহুগুণে গুরুতর অকল্যাণ। এক্ষণে, হে আখীনীয় নরগণ, কেহ কেহ ভাবিতে পারে, যে, আমি আমার আল্ল-সমর্থনের উদ্দেশ্যেই এই-সকল কথা বলিতেছি; কিন্তু আমি তাহা মোটেই কবিতেনি না; আমি তোমাদিগের জন্তই এত কথা বলিতেছি। তোমরা আমাকে দোষীর মত দণ্ড দিবা এবং এইরূপে ঈশ্বরের দান অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হইও না। কারণ তোমরা যদি আমাকে প্রাণে বধ কর, তবে সহজে এমন অস্ত্র একজন পাইবে না। একটা হস্তজ্ঞানক উপমা ব্যবহার কবিয়া বলা যাইতে পারে,—যে বিশালবগুঃ ও তেজস্বী অথ স্বীয় দেহেব বিশালতাবশতঃ ক্লিষ্ট অলসপ্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্ত যেমন দংশনের প্রয়োজন, তেমনি ঈশ্বর এই নগরীকে দংশন করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে নিয়োগ কবিয়াছেন। আমার মনে হয়, এই পূর্বীকে আক্রমণ করিবার জন্ত ঈশ্বর আমাকে এইপ্রকার একটা দংশনরূপে প্রেরণ করিয়াছেন; কারণ, আমি সমস্ত দিন সর্বত্র তোমাদিগের উপরে উৎপত্তি হইয়া তোমাদিগকে জাগাইতেছি, উপদেশ দিতেছি, তিরস্কার করিতেছি; এই কৰ্মে আমার কদাচ নিবৃত্তি নাই। বন্ধুগণ, তোমাদিগের পক্ষে সহজে এমন অস্ত্র কেহ মিলিবে না; তোমরা যদি আমার কথা শুনিতে, তবে আমাকে অব্যাহতি দিতে। স্থপ্ত ব্যক্তিদিগকে জাগাইয়া দিলে তাহারা যেমন ক্রুদ্ধ হয়, তোমরাও হয় তো সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছ; আল্লসেব কথানুসারে কার্য্য করিলে তোমরা অবশ্য অক্লেশে এক আঘাতেই আমাকে মারিয়া কেলিতে পার; এবং এইরূপে যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে দয়া করিয়া আমার স্থলে আর কাহাকেও প্রেরণ না করেন, তবে অতঃপর অবশিষ্ট জীবনকাল নিদ্রাতেই যাপন করিতে পার। আমি যেপ্রকার, ঈশ্বরই যে আমাকে সেইপ্রকার করিয়া এ পূর্বীকে দান করিয়াছেন, তাহা তোমরা ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে—ইহা কখনই মানব-প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া বোধ হয় না, যে আমি এতবৎসর ধরিয়া আমার যাবতীয় বৈষয়িক

ব্যাপারে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি ও সমুদয় গৃহস্থালির কৰ্ম্মে অযত্ন হইতেছে, তাহা সম্বন্ধ করিয়াও নিয়ত তোমাদিগকে লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছি; এবং পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিজ্ঞনের নিকটে যাইয়া ধর্মোপার্জননে যত্নশীল হইবার দৃঢ় উপদেশ দিতেছি। আমি যদি একরূপ করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু লাভ করিতাম, কিংবা এই-সকল উপদেশ দিয়া বেতন গ্রহণ করিতাম, তবে ইহার কারণ বুঝা যাইত। কিন্তু, এক্ষণে তোমরা নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ, যে, যদিচ প্রতিপক্ষ নিঃস্বজের মত আমার বিরুদ্ধে কতই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের নিঃস্বজতা এতদূর যাইয়া পৌছিতে পাবে নাই, যে, তাহারা বলিবে এবং সাক্ষ্য উপস্থিত কবিবে, যে, আমি কখনও বেতন চাহিয়াছি বা গ্রহণ কবিয়াছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যে সত্য, আমি বোধ কবি আমার দারিদ্র্যই তাহার যথোচিত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

১৯। হয় তো তোমাদের নিকটে ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, যে, আমি যদিচ ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্র হাতাঘাত করিয়া উপদেশ দিতেছি ও বহুবিষয়েই ব্যাপৃত রহিয়াছি, তথাপি আমি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে জনসভায় গমন করিয়া তোমাদিগের সহিত রাজ্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে সাহসী হইতেছি না। ইহার কারণ কি, তাহা তোমরা বহুবার বহুস্থলে আমাকে বলিতে শুনিয়াছ; কাণটি এই—আমি ঈশ্বর সন্নিধানে এক দৈব ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়াছি; মেলীটস পবিহাস করিয়া অভিযোগ-পত্রে ইহারই উল্লেখ করিয়াছে। আমি বাল্যাবধি এই ইঙ্গিত পাইতেছি; ইহা একপ্রকার বাণী; আমি যখনই এই বাণী শুনিতে পাই, তখনই আমি যাহা করিতে যাইতেছি, তাহা হইতে ইহা আমাকে নিবৃত্ত করে; কিন্তু ইহা কখনও আমাকে কোনও কৰ্ম্মে নিয়োগ করে না। এই বাণীই আমাকে রাষ্ট্রীয় কৰ্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছে; এবং আমার বোধ হয়, নিষেধ করিয়া অতি উত্তম কৰ্ম্মই করিয়াছে। কারণ, হে আখীনীয় জনগণ, তোমরা বেশ জান, যে, আমি যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতাম, তবে অনেক দিন পূর্বেই প্রাণ হারাইতাম, এবং তোমাদিগের বা আমার নিজের কোনই

হিত সাধন করিতে পারিতাম না। আমি সত্য কথা বলিতেছি বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। এমন কোন লোক নাই, যে, কি তোমাদিগের, কি অল্প জনতন্ম্বে, রাষ্ট্র মধ্যে বে বহু অন্তায় ও অবৈধ কৰ্ম্ম অল্পাধিক হইতেছে, দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিয়াও নিরাপদ থাকিতে পারে। যে বাস্তবিক জ্ঞানের গুণ সংগ্রাম করিতে উদ্যত, সে যদি অল্পকালের জন্যও প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে, তবে তাহাকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবেই কার্য্য করিতে হইবে।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

কবি ও ঋষি

স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে এমন অনেক দিব্যশক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে যাহাদেব স্বচ্ছ মানস-দর্পণে বিশ্বের গূঢ়তত্ত্ব-সকল প্রতিফলিত হইয়া ধরা দিয়াছে, এবং যাহারা সেই-সকল আত্মোপলব্ধ সত্য জ্ঞানসমাজে প্রচার করিয়া মানব-সভ্যতাব বিকাশ-ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ইহাদের সকলকেই মন্ত্র- বা সত্যদ্রষ্টা ঋষি আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। শুধু বেদমন্ত্র কেন, অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিমাत्रেই অপৌরুষেয়। কারণ তাহা মানবের মধ্য দিয়া পরমতত্ত্বের পূর্ণ-জ্যোতির আংশিক প্রকাশ। এবং এই-সকল ভগবদ্-অনুগ্রহীত মহাপুরুষ ঋষি, তা সে তাঁহারা যে-দেশের ও যে-যুগেরই হউন না কেন। যদিও প্রাচীনকালে প্রধানতঃ বেদমন্ত্রের রচয়িতাদেরই আমাদের দেশে ঋষি বলা হইত, তথাপি কপিল-কণাদাদি ষড়্দর্শনকার এবং ব্যাস বাস্করাদি প্রভৃতি মহা-কবিগণও ঋষি নাম পাইয়াছেন। ইহারা কেহই মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন না। সুতরাং অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগেরও শ্রেষ্ঠ মনীষী বা কবির বিশিষ্ট গুণ বুঝাইবার জন্য ঋষি শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না। গতার্থ (= বুৎপত্ত)-বাচক ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থধুরিলেও এরূপ প্রয়োগে কোন দোষ আসে না। অলৌকিক জ্ঞান বুদ্ধি বা মনীষার আলোকে যাহার

চিত্তাকাশ উজ্জ্বল এবং এক স্বর্গীয় প্রেরণায় যিনি নিজ হৃদয়ে পরম সত্যের অনুভূতি লাভ করেন তিনি ঋষি।

সুতরাং ঋষি যে শুধু প্রাচীন যুগেই আবির্ভূত হইতেন এবং এখন আর দৃষ্টিগোচর হন না, এরূপ কথা বলা চলে না। যখনই কোন কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিরন্তন ধ্রুব সত্যের একটি অভিনব দ্বার খুলিয়া দেন তখনই আমরা ঋষির সাক্ষাৎকার লাভ করি। আজ কবির কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক কবি আপনার কাব্য-সৃষ্টিব অন্তরালে যে-সকল গভীর তত্ত্বের আভাস দেন তাহা ঋষিব সত্য-দর্শন হইতে ন্যূন নহে। বৈদিক ঋষিগণ হইতে আৰম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যাহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম, সত্যমূলক ভগবানের পরম-বাণী প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা একাধারে কবি ও ঋষি। দৈশা, মুশার জায় যাহাবা ত্রিশী শক্তির প্রভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ কবিয়া সত্যধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা Prophets বা ঋষি নামে বিদিত হইলেও তদানীন্তন যুগের কবি ছিলেন। তাই কবি শেলী বলিয়াছেন—Poets were called, in the earlier epochs of the world, legislators or prophets। শেলীর এই উক্তিই মর্ম্ম এই যে, এই-সকল মহাপুরুষগণ প্রকৃতপক্ষে কবিই ছিলেন, লোকে তাঁহাদিগকে কবি না বলিয়া শাস্ত্রকার বা ঋষি আখ্যা দিয়াছে। লর্ড বেকনও তাঁহার একটি প্রবন্ধে ('Of Religion') প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কার্য্যই ছিল তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কবিগণই ছিলেন তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার। বৈদিক ঋষিগণের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ম্যাকডোনেল সাহেব স্ববচিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' কয়েকটি ঋকের অনুবাদ করিয়া তাহাদের কাব্যসৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই-সকল আত্মজ্ঞানী ঋষি যে ভগবৎ-প্রভাবান্বিত কবি ছিলেন তাহা আমাদের স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হইবার কাৰণ নাই। ঋষির জ্ঞান কবিরও সেই 'vision and the faculty divine'—সেই পরমজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি—থাকে বাহ্যতে উভয়কে একই শ্রেণীতে ফেলিতে পারা যায়। একথা যদি সত্য হয় যে, 'Poetry is the record of the best and happiest

moments of the happiest and best minds' *

—কবিতা আনন্দোদ্ভাসিত-চিত্ত মনীষীর অসীমানন্দপূর্ণ শুভ মুহূর্ত্তগুলির পরিচয় দেয়। তাহা হইলে আর কবিষ্টে ও ঋষিষ্টে প্রভেদ কি? একদিকে যেমন “ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছেনা কহে,” তেমনই অপরদিকে আবার কবির শ্রেষ্ঠ-মুহূর্ত্ত-সঙ্গীত আনন্দধারাপ্লুত আত্মোপলব্ধি ও কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

কবি যে আপনার প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে নিরন্তর এক অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণা, এক অনির্বচনীয় উদ্গাদনা, এক স্বর্গীয় আবেশ অন্বেষণ করেন, তাহার উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা সেই রহস্যময়ী শক্তি যাহার মধ্যে কবি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া বিহ্বল প্রাণে বলিতে থাকেন—

এক কোড়ুক নিত্য নূতন
ওধো কোড়ুকময়ী,
আমি বাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশারে আপন হয়ে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে বাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতশ্রোতে কুল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।

কবির এই অন্তরবাসিনী প্রেরণাই তাঁহার জীবন-দেবতা। কবি নিজে এই দেবতার হস্তের বীণাটি মাত্র। তিনিই কবিকে দিয়া আপনার গান গাওয়াইতেছেন, আপনার বাণী প্রচার করিতেছেন। একথা যে শুধু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এবং ইহা যে শুধু তাঁহারই নিজস্ব আত্ম-হুতুতি, তাহা নয়। শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেরই এই অসীম রহস্যময়ী শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। শেলী তাই কবির হৃদয়ে প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—It is as it were the interpretation of a diviner nature through our own—ইহা যেন আমাদের মধ্য দিয়া কোন স্বর্গীয় প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ। মহাকবি গেটেও এই ঐশী শক্তির বশত স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও ইহাকে Genius of

Life বা জীবন-দেবতা বলিয়াছেন, ‘which does with him what it pleases and to which he unconsciously resigns himself, whilst he believes he is acting from his own impulse’*—‘এই জীবন-দেবতা কবিকে যদৃচ্ছা চালিত করেন, এবং কবি যখন মনে করেন তিনি নিজের ভাবাবেশে লিখিতেছেন তখন তিনি প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞাতসারে এই শক্তির নিকট আত্মোৎসর্গ করেন।’ গেটের এই উক্তি কি রবীন্দ্রনাথেরই “তুমি যা বলাও আমি বলি তাই” কথাটির রূপান্তর মাত্র নহে? এই দিব্য শক্তি যাহার জীবন-দেবতা Genius of Life, এবং যিনি এই শক্তির প্রভাবে diviner nature বা স্বর্গীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন তিনি ঋষি হইতে কম কিসে?

তবে যে সকলে কবিকথাকে ঋষিবাক্যের ভ্রাম্য শিরোধার্য্য করিয়া লয় না তাহার কারণ লোকের ঋচি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঋষি মাত্রেরই মত বা উক্তি কি আমরা সকলেই গ্রহণ করি? চার্লস ঋষির নাস্তিকতা কিবা কপিল ঋষির সাংখ্য মত যেমন সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই, সেইরূপ সকল কবির প্রচারিত মত বা তত্ত্ব সকলে মানিয়া লইতে না পারেন। আধুনিক ঋষিদের মধ্যে টলষ্টয়ের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত তাঁহার মত অনেকেরই—বিশেষতঃ পৌড়া খৃষ্টানদের—মনঃপূত হয় নাই। কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কাব্য-সাধনার মূল মন্ত্র ছিল সমগ্র বিশ্বে এক ঐশ্বরিক সত্তার ব্যাপ্তি বা প্রকাশের উপলব্ধি, অথবা আমাদের ভাষায় “সর্বত্র ব্রহ্মময়ং জগৎ।” ইহা ইংরেজ পাঠক কবির একটা মত বা ধারণামাত্র বলিয়া মনে করেন। কারণ তাঁহাদের ধর্মে ঠিক ইহার অনুরূপ কিছু নাই। আমরা কিন্তু মনে করি যে, ইংরেজ কবির হৃদয়ে এই মহাসত্যটির উন্মেষই তাঁহাকে ঋষিষ্টে উন্নীত করিয়াছে, কারণ তিনি কবিত্ব-প্রভাবে হিন্দু ঋষির তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন এই সর্বব্যাপী সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—A motion and a spirit that impels all ‘thinking things, তখন আমাদের উপনিষদের “যেনাচ্ছন্নোমতম্” মনে পড়িয়া যায়, এবং

* Shelley, of

* Eckermann, March 11, 1828.

ইংরেজ কবি হিন্দুর এই তত্ত্বের কত নিকটে পৌঁছিয়া-
ছিলেন তাহা বুঝিতে পারি। এইখানেই তাঁহার ঋষিধ্ব।
স্বতরাং কোন বড় কবির মত বা তত্ব আমরা গ্রহণ
করিতে পারি না বলিয়া যে তিনি ঋষি হইতে পারেন
না এরূপ যুক্তি দাঁড়াইতে পারে না। আর মনে
রাখিতে হইবে যে ঋষি বলিতে ঠিক saint বা সাধু
বুঝায় না। স্বতরাং কোন কোন কবি সামাজিক হিসাবে
আদর্শ জীবন যাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের
ঋষিত্বের হানি হয় নাই। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের
মধ্যেও শকুন্তলার জনক বিশ্বামিত্র এবং ব্যাসপিতা পরাশর
অকলুষিত-চরিত্র ছিলেন না। শুধু চন্দ্র নয়, সূর্য্যও কলঙ্ক
আছে। কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে যাহা কালিমা হইয়াছে সূর্য্যের
স্বীয় দীপ্ত তেজ তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

এ কথা বলা নিস্ত্রয়োজন যে কবিগাজেই ঋষিত্বের
দাবী করিতে পারেন না। নূতন বাণী শুনাইতে বা নূতন
তত্ত্ব প্রচার করিতে বড় বেশী কবি জন্মগ্রহণ করেন না।
কল্পনার হাওয়ায় ভাষার রঙ্গীন ফাল্গুন উড়াইতে পারিলেই
বড় কবি হওয়া যায় না। এই শ্রেণীর কবিদের প্রতিভা
ধাকিতে পারে; কিন্তু সেই প্রতিভা যদি প্রদীপ্ত অনলের
ছায় উজ্জ্বল না হয়, এবং তাহার সহিত যদি গভীর অন্তর্দৃষ্টি,
প্রগাঢ় আত্মগুহুত্ব, এবং সর্বোপরি এক দিব্য শক্তির
আবেশ সম্মিলিত না হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ
কবি বলিব না, এবং তাঁহাদের কবিত্বে ঋষিত্বের গুণ
ধাকিতে পাবে না। ইংরেজিতে এইরূপ শ্রেষ্ঠ কবিকে
transcendental poet বা অতীন্দ্রিয়দর্শী কবি বলে।
আমাদের আধুনিক সাহিত্যের কাব্যরুপ অনেক কবির মধুর
ঝঙ্কারে মুগ্ধরিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও
বোধ হয় ঋষিকবি বলা যায় না। একথা যাহারা স্বীকার
করেন না তাঁহাদের সহিত তর্কের কোন প্রয়োজন দেখি
না। কারণ যাহারা বুঝেন না যে রবীন্দ্রনাথই এখন
সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর চিন্তা-ধারা পরিচালিত
করিতেছেন, তাঁহাদের তর্ক দ্বারা ইহা বুঝাইতে যাওয়া
বিড়ম্বনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি
অধ্বিতীয় মনীষী। তিনি নোবেল প্রাইজ্ পাইয়াছেন
বলিধাই যে বড় কবি হইয়াছেন তাহা নহে। দেশ তাহার

অনেক পূর্বেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিয়া লইয়া-
ছিল। তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে তাঁহাকে মহাড়ম্বরে
সম্বর্ধনা করিয়া দেশ তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। পাশ্চাত্যে
তাঁহার কিরূপ আদর হইয়াছে তাহা কাহারও অবদিত
নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিল্টন, ভাণ্টে
অপেক্ষা বড় কবি বলিয়াছেন। তাঁহার নোবেল প্রাইজ্
পাইবার এক বৎসর পূর্বে North American Review
নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে যে একটি স্মরণীয়
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একস্থলে আছে—

In the Bengali poems of Rabin dranath Tagore you
will find that common emotional appeal united in a
music and a rhythm many degrees finer than Swin-
burne's—a music and rhythm almost inconceivable
to Western ears—with the metaphysical quality, the
peculiar subtlety and intensity of Shelley; and that
with a simplicity that makes this miracle appear the
most natural thing in the world. As far as I know
no western poet yet born has done precisely this.
Not Milton; he is far too grandiose for the human
heart. Not Wordsworth; he is at once too subtle
and too ponderous. And not the great mystic poets
of the West..... Not even Dante and St. John
of the Cross, though they stand nearest (they are very
near) to this great mystic poet of Bengal.*

যাহার সম্বন্ধে বিদেশী সমালোচক বলিতেছেন যে
পাশ্চাত্যে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন
নাই যিনি কবিত্বের সহিত আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে রবীন্দ্র-
নাথের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন, আমরা
সেই আমাদের রবীন্দ্রনাথকে চিনিলাম না, ইহা বিচিত্র
নহে কি?

ঐক্যবিহারী গুপ্ত।

পরখ্

(বন্দ কবি)

ডাক শুনি নাই কানে আজো তাই

জাঁক শুনে লাগে তাক।

ফাপুনে ফারাক বুঝিব বেবাক

কে কোকিল কেবা কাক।

ঐসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ময়না

(ব্রেট হার্টের গল্প হইতে)

অনেককাল আগে পচষার কয়লার খনিগুলির কাছাকাছি একটা জায়গায় খনির কুলী মজুর কণ্ট্রাক্টর কেরানী বাবু প্রভৃতিকে নিয়ে একখানি ছোটখাটো গ্রাম গড়ে উঠেছিল। গ্রামটি লোক-সমাজের চোখের একেবারে বাইরে। ছোট ছোট নদী, শিউলিবনে-ঢাকা পাহাড়ের ঢিবি আর বড় বড় শালবনে মিলে তাকে এমন করে লুকিয়ে রেখেছিল যে অনেক চেষ্টা করলেও বাইরের জগৎ কি লোকসমাজ তাকে আপনার গণ্ডীর ভিতর আনতে পারত না। গোথুলির ম্লান লাল আলো যখন সেই গ্রামের ছোট ছোট খোলায় বাড়ীগুলির উপর ছড়িয়ে পড়ত, তখন গ্রামখানিকে দেখে মনে হ'ত যেন মৃষ্টিমতী সন্ধ্যালক্ষ্মী। সে গ্রামের ছোট ছোট রাঙা বাঁকা পথগুলি মাঝে মাঝে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আবার কিছু দূর থেকে উঁকি মেরে দেখা দায়। সেই-সব পাহাড়ের গা দিয়ে আর তলা দিয়ে অনেকগুলি ক্ষীণশ্রোতা ছোট ছোট নদী ঝিক-ঝিক করে। তাদের জলের তুলনায় বালির রাশিই বেশী। সন্ধ্যার মত পথ আর নদীগুলি যেখানে লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত, সেখানে পাহাড়গুলি বুড়ী সেন্নে চিরগন্তীর মৃষ্টি ধরে বসে থাকে; তারা কখনও টলে না। গ্রামের কিছু দূরে অনেকগুলি খোয়াই আর খাদ ক্ষুধিত দৈত্যের মত হাঁ করে পড়ে ছিল। তাদের মুখের ভিতর হীরার মতন স্বকৃষ্ণকে অসংখ্য পাথরের দাঁত।

গ্রামে অর্থের সন্ধানে নানাদেশের নানালোক এসে জুটেছিল। বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ছোটনাগপুরী—সবরকম মানুষই সেখানে মজুত। গোবর্দ্ধন সরকার নামে এক প্রায় নিরক্ষর বাঙালী এই গ্রামে এসে বেশ ধনী হয়ে উঠেছিল। প্রথম যেদিন তাকে এখানে দেখা যায়, সেদিন তার সম্বল ছিল কেবল একটি হাঁকো, একটি ছাতা আর একটি ক্যাশিশের ব্যাগ পেটে-আঁতে-লাগা; উপরি একটি স্থপুষ্ট পিলে। কুলির কাজে হাত দিয়ে চঞ্চলা লক্ষ্মীর কপায় আর নিজের বুদ্ধি ও হিসাবের জোরে সে অনেক ব্যবসা ফেঁদে বসল।

শেষকালের ব্যবসাই হ'ল তার কাল। গোবর্দ্ধনের বাড়ীর সামনে একখানা মস্ত লম্বা খোলায় ঘর। রোজ সন্ধ্যা ছটার সময় যখন কয়লাখনির চিম্নিতে তীক্ষ্ণ স্বরে ছুটির বাঁশী বেজে উঠত, তখন শ্রান্তক্লান্ত কুলি-মজুরের দল কয়লার গুঁড়ো মেখে ঘামে সারা অঙ্গ ভিজিয়ে পাহাড়ের গায়ের সরু বাঁকা পথগুলি বেয়ে হিম্মি-বাংলা-মেশানো অপূর্ণ ঝিচুড়ী গান গাইতে গাইতে তার সেই ঘরখানায় এসে হাজির হ'ত। পরিবারহীন কুলিরা এইখানেই সন্ধ্যা বেলার আহারটা সেরে যেত; সেইসঙ্গে অল্পবিস্তর মদও খেতে ভুলত না। এই স্থযোগে গোবর্দ্ধন কিছু টাকা ক'রে নিচ্ছিল। কিন্তু বিধি এবার বাম। লোককে মাতাল করতে গিয়ে নিজেও মদ ধরে গোবর্দ্ধনও রীতিমত মাতাল হ'য়ে উঠল। এখন সে গ্রামের লোকের কল্যাণে মাতাল গোবুরা নামেই স্থবিখ্যাত।

গোবর্দ্ধনের পতন স্বরূপ হ'ল বটে, কিন্তু গ্রাম বেড়েই চলল। মাছুষ বাড়লেই তাদের সভ্য করবার জন্তে একদল লোক জুটে যায়; কোথা থেকে এক ধুঁঠান পাত্রী এসে একখানা ঘরে গিঁজা খুলে বসল। গ্রামের স্ত্রী পুরুষ মদ খেয়ে একসঙ্গে মাতলামি করে, ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন গালাগালি মারামারি করেই কাটায়, এদের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা দরকার। কাজেই পাত্রীমশায় প্রতি রবিবার তাদের ধরে লম্বা লম্বা উপদেশ দিতে লাগলেন। পরকাল সম্বন্ধেও অনেক ভয় দেখাতে ছাড়লেন না। গ্রামের মাঝখানে একখানা আটচালা ঘরে এক পাঠশালা বসল। দুঘর ধুঁঠান-ভদ্রলোকও গ্রামের অধিবাসী হলেন।

পাঠশালার তরুণ শিক্ষকটির নাম ছিল নবীন। কিন্তু পোড়োর দল তাকে মাঠার বলেই ডাকত। একদিন রাতে পাঠশালার ঘরে মাঠার একলাটি বসে এক বোঝা বালি-কাগজের খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। বড় বড় কাঁচা অক্ষরে হিজিবিজি কত কি লেখা; মাঠার যথা-সাধ্য সেগুলিকে সভ্য করে তোলবার চেষ্টা কচ্ছেন, এমন সময় দরজার গায়ে আস্তে আস্তে টুক টুক করে শব্দ হ'ল। সারাদিন কাকে তাঁর চাকের ধোলা উণ্টে উণ্টে অনেক শব্দ কবেছে, তাতে তাঁর চাকের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি, কিন্তু দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর পাড়িয়ে যখন অভ্যাগতটি

শিকল ঠক্ ঠক্ করতে লাগল তখন তার দিকে না তাকিয়ে আর উপায় কি? ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে, একটা তেলচিটে লাল আঙিয়া গায়ে, এলো-থেলো চুলে একটা ছোট মেয়েকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাষ্টার প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু একটু পরেই মনে পড়ল, ঐ ভাগর কালো চোখ দুটি, ঐ রোদে-পোড়া তামাটে মুখখানি ঐ রুক্ষ ঝাঁকড়া কালো চুলের রাশি, ঐ লাল-ধূলা-মাখা ছোট ছোট হাত-পাগুলি সবই ত' তাঁর পরিচিত। এ ত' গোবর্দ্ধন সরকারের মাতৃহীনা কন্যা ময়না।

ময়নাকে সে গ্রামের সবাই চিন্ত। গ্রামের চারি প্রান্তে এমন কোনো স্থান ছিল না, যা তার অগম্য। মাষ্টার ভাবলেন “এমন সময় ময়নার এখানে কি দরকার?” ময়না ভয়ানক দুর্দান্ত মেয়ে। কার সাধ্য তাকে পোষ মানিয়ে নরম করে রাখে। ময়নার বাবার দুর্বল চরিত্র আর রণচণ্ডী ময়নার খেয়াল পাগলামি ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব গ্রামে প্রায় প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ময়না পাঠশালার ছেলেদের সঙ্গে সমানে মারামারি আর কুস্তি করত; উপরি তাদের নানা রকম ঠাট্টা বিজ্ঞপ করতেও ছাড়ত না। কাঠুরিয়া শালবনে কাঠ কাটতে গেলে ময়না তাদেরও সঙ্গী। কত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে মাষ্টার ময়নাকে খালি পায়ে খালি মাথায় তপ্ত বাসির চরের উপরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। নদীর ধারে কুলিদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বাঁধা। ময়নার শুকনো মুখখানি দেখে অনেক সময় সেখানকার মেয়েরা তার ক্ষুধা পিপাসা দূর করবার চেষ্টা করত। এই-সব ঘেচে-দেওয়া দানেই ময়নার নিরুদ্দেশ যাত্রার সময়কার সমস্ত অভাব দূর হ'ত। এর বেশী দয়াও যে ময়নাকে কেউ কোনো দিন করেনি তা নয়। এই দুঃস্বপ্ন বুনো ময়নাটিকে মাছুষ নামের ষোণ্য করে তোলবার ইচ্ছায় পাত্রী মহাশয় কুলিদের হোটেলের তার একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ময়না কি বাগ মানবার মেয়ে? একটু রাগ হলেই সে হোটেলওয়ালাকে ঘটা বাটি ছুড়ে ধারতে শুরু করে দিত, কেউ কিছু ঠাট্টা করলে তারও নিস্তার ছিল না। আর নীতি-বিদ্যালয়ে গিয়ে সে এমন বিস্ত্রোহ বাধিয়ে বসল যে ক্ষমা-ধর্মের প্রচারক খুঁটীয় পাত্রীকেও অক্ষমার শরণ নিতে হ'ল। ময়নাব উৎপাত

ছেলে-মেয়েদের জামা কাপড় আস্ত থাকবার জো ছিল না, আর নীতিশিক্ষা যা হ'ত তা' ত বলাই বাহুল্য। কাজেই পাত্রী মহাশয় তাকে প্রায় কান ধরেই বা'র করে দিলেন। তার ছেঁড়া কাপড়, জটবাঁধা চুল আর ক্ষতবিক্ষত পা দুখানি দেখলেই তার স্বভাব আর কীর্ষিকলাপের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নাকে দেখে মাষ্টারের একটু দয়া হ'ল। তার বন্ধুকে কালো চোখের নির্ভীক দৃষ্টি তাঁর মনে একটু প্রভাবও উদ্ভেক করে তুললে।

মাষ্টারের মুখের উপর চোখ রেখে ময়না নির্ভয়ে গড়-গড় করে অনেকগুলো কথা বলে গেল—“তুমি একলা আছ বলেই আমি এখন এলাম। তোমার পোড়োগুলো থাকলে আমার একটুও আস্তে ইচ্ছে কর না। ও-গুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আচ্ছা, তুমি এখানে পাঠশাল কর, না? আমিও এখানে পড়ব।”

ময়নার কাপড় চোপড় আর চেহারা দেখে লোকের মনে দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। তার উপর দু ফোঁটা চোখের জল ফেললে ত' কথাই নেই; তবে ওতে মনটা নরম হওয়া ছাড়া আর বড় বেশী কিছু হ'ত না। কিন্তু ময়নার রুদ্র মূর্তিই কোন্ কীকে মাষ্টারের মনে প্রভাকে ভেকে আনলে। বিচার করে দেখলে হয়ত লোকে বলত এখানে প্রভা করা উচিত নয়। কিন্তু মন জিনিষটাকে মোটেই ভাল বিচারক বলা চলে না। কোনোখানে নূতনঘের খোজ পেলেই তার চিরনবীন প্রাণ আপনার অজ্ঞাতেই আপনার প্রজ্ঞাটুকু সেখানে সঁপে বসে।

কপাটের শিকলের ভিতর আঙুলগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে মাষ্টারের অনিমেঘ দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রেখে ময়না তখনও একটানা নদীর স্রোতের মত বকে চলেছে,—“আমার নাম হ'ল গো ময়না, ময়না সুন্দরী দাসী। সত্যি বলচি, মা কালীর দিবিয় আমার নাম ময়না। আর বাবার নাম গোবর্দ্ধন সরকার, ঐ যে গো সেই মাতাল বৃড়োটা, গোব'রা, গোব'বা, বুঝেছ এবার? ময়না দাসী, মনে থাকবে ত নামটা? আমি পাঠশালে নেকাপড়া করতে আসব।”

মাষ্টার বল্লেন, “তা' বেশ ত।”

ময়নাকে রাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্তে সকলে তার সব কাজেই বাধা দিত, সব বখাতেই অহত করে বসত।

এমন কি অনেক সময় বেশ নির্দয় ব্যবহার পর্যন্ত করত। তারও যে একটা হৃদয় আছে, সেটা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। সেই থেকে বাধা পাওয়াটাই ময়নার কাছে একান্ত স্বাভাবিক বলে মনে হ'ত। এখন মাষ্টারকে অমন সহজে তার কথায় সাদ্দ দিতে দেখে সে ত' অবাক! কথা বলা থামিয়ে নিজের এক গোছা চুল নিয়ে সে নিঃশব্দে আঙুলে জড়াতে লাগল। প্রথমে সে দাঁত দিয়ে শক্ত করে ঠোঁটটা চেপে দাঁড়িয়ে ছিল, অল্পে অল্পে সে ঠোঁট দু'খানির বাঁধন খুলে কিসের আবেগে ঘেন একটু কেঁপে উঠল। ময়নার দৃষ্টি ক্রমে নেমে এসে পড়ল তার পায়ে নখের উপর, এত কালের রোদে-পোড়া তামাটে গাল দুটিরও ঘেন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠবার চেষ্টা। হঠাৎ মাষ্টারের মাজুর-খানার উপর আছড়ে পড়ে তার যা কান্না "ওগো যমে আমায় ভুলেছে কেন গো।" সে কান্না আর ঘেন শেষ হবে না। কঁাদতে কঁাদতে ক্রমশঃ সে নিঃশব্দ হয়ে পড়ল! সে কান্না শুনে মনে হয় তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি দুঃখের ভারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তার কান্নার বিরাম নেই দেখে মাষ্টার তাকে ভুলে বসিয়ে নিজেও তার পাশে চুপটি করে বসে রইলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু পরে সে আবার কি সব বলতে শুরু করলে, "আমি লক্ষ্মী মেয়েই হব, আমি ভাল মেয়ে হব, ওগো আমি ত' কিছু....."

তাকে কথা বলতে শুনে মাষ্টারের সাহস হ'ল, তিনি বল্লেন, "তুমি পাত্রী সাহেবের ইস্কুল ছেড়ে দিলে কেন?"

ময়না বললে, "পাত্রী আমায় বলে কি না, 'তুমি ছুটি বালিকা, পরমেশ্বর তোমাকে স্মৃণা করিবেন।' কেন ও আমায় অমন করে বলবে? আমাকে ওর পরমেশ্বর দেখতে পারেন না, আমি কেন সেখানে যাব? কখনো যাব না। কালী মাস্টার দিব্যি ঘাব না, বীণুর দিব্যি ঘাব না। যে আমায় ঘেমা করে তার কাছে আমি যাই না।"

"এমনি করে তুমি তাঁকে বলেছিলে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলুম না ত' কি?"

ময়নার কথা শুনে মাষ্টার হেসে উঠলেন। বাইরে তখন শাল গাছের সারির ভিতর দিয়ে জুড় পবন সঁ। সঁ।

কবে ছুটে বেড়াচ্ছিল; এমন সময়ে ছোট্ট খোলার ঘব-খানার নবীনচন্দ্রের প্রাণ-খোলা অট্টহাসিটা বড় বেখাপ্পা শোনাল। তখনই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি হাসির ভুলটা সেরে নিলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাষ্টার ময়নার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

ময়নার মুখ চোখ ফেটে কথাগুলো ঝড়ের মত ছুটে বেবিয়ে পড়তে চায়। তার বাবা? বাবা আবার কে? সে ওর জন্তে কবে কি করেছে? কার জন্তে পাড়ার মেয়ে-গুলো ময়নাকে অমন করে নাক সিঁটকায়? পথ চলতে দেখলে লক্ষ্মীছাড়ীরা "ঐরে গোবরা মাতালের মেয়ে" বলে চোঁচিয়ে অস্থির করে। বলতে বলতে ময়নার শোক উছলে উঠল; "ওগো মাগো! আমি কেন মরি না গো! ওগো যম কি পথ ভুলে গেছে। সবাই মরে কেবল আমিই মরি না। আমি এখুনি মরব, এখুনি মরব।" বলে ময়না মেজের মাথা খুঁড়তে লাগল। তার কান্না আর থামে না।

শিশুর মুখে অমন অস্বাভাবিক কথা শুনে মাষ্টার তাকে আর সকলেরই মত করে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু তার ছিন্ন বেশ আর মাতাল পিতার মৃষ্টিটি তোমার আমার মত তিনি ভুলে যাননি। ময়নার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে মাষ্টারের সে কত কথা! তারপর তাকে ধরে তুলে, কাপড় জামা ঝেড়ে, চুলগুলি চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে তাকে কাল পাঠশালায় আসতে বলে দিলেন। গ্রাম্য পথের অনেকখানি পর্যন্ত ময়নার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে মাষ্টার তাকে বিদায় দিলেন। তাদের সামনের সরু পথটিতে তখন চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ময়না চলে গেল; মাষ্টার তার দিকে তাকিয়েই আছেন। মেয়েটি মাথা নীচু করে চলতে চলতে মনসা-কাঁটার বেড়া-দেওয়া গ্রামের গোরস্থানের পাশের পথে এসে পড়ল, সেইখানে পথটি বেঁকে পাহাড়ের আড়ালে চলে গিয়েছে। ময়না বাঁকের কাছে একবারটি দাঁড়াল। আকাশের গায়ে কত উচুতে তখন শান্ত তারাগুলি জ্বলছে আর নীচে ঐ ছোট্ট মেয়েটি বেদনার ছায়ায় মত দাঁড়িয়ে। মোড় ফিরতেই ময়না অদৃশ্য হয়ে গেল, মাষ্টারও আপন কাজে পাঠশালায় ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর মন আর কাজে ভিড়ছে না। তাঁর ঝাপসা চোখে বালি-বাগজের

খাতার উপর ছেলেদের টানা জাঁকা বাঁকা লাইনগুলি সারিসারি সীমাহীন গ্রাম্যপথ হয়ে উঠল, কত বিষণ্ণ শিশু-মূর্তি কঁাদতে কঁাদতে তারই উপর দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পাঠশালার আটচালা ক্রমশঃ এমন নিষ্কিন ঠেকুতে লাগল যে মাষ্টার সহ্য করতে না পেরে দরজা বন্ধ করে বাড়ী চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ময়না পাঠশালায় হাজির। আজ তার মুখখানি একটু ধোয়া মোছা, চিরুণির সঙ্গে যুদ্ধ করে চুলগুলিও খানিকটা বাগে এসেছে। চোখে আজও মাঝে মাঝে আগুনের হলকা দেখা দিচ্ছিল, কিন্তু ব্যবহারটা অনেক ধীর ও শাস্ত হয়ে এসেছে।

নূতন ছাত্রী ময়না এসে মাষ্টারের জীবনের ধারা যেন একটু বদলে গেল। এ ছাত্রীটি মাষ্টারকে ঠিক তার আসনটি দেয় না। তার দাবীও বেশী, অত্যাচারও বেশী। কাজেই মাষ্টার আর ছাত্রী দু-জনেই অনেক পরীক্ষা আর স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে চলতে হয়। ফলে দুজনের মধ্যে একটা বিশ্বাস ও মমতার যোগ স্থাপিত হল। মাষ্টারের সামনে ময়না খুবই বাধ্য, কিন্তু একটু অবজ্ঞা কি অবহেলা কল্পনা করেই সে আড়ালে মহা অনর্থ বাড়িয়ে তুলত। মাঝে মাঝে ময়নাকে জ্বালাতন করতে গিয়ে যুদ্ধে তার কাছে হার মেনে দুর্দান্ত ছাত্রী সমস্ত মুখে নখের আঁচড় আর সারা অঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন কাপড় জামা পরে কাঁপতে কাঁপতে ময়নার নামে মাষ্টারের কাছে নালিশ করতে আসত। তখন সে বেচারার মাথা ঠাণ্ডা রাখা দায়। ময়নার অত্যাচারে লোকে সেই পাঠশালায় আর ছেলেমেয়ে পাঠাতেও ভয় পেতে লাগল। যাদেব সে ভাবনা নেই, তাদের কথাই স্বর একটু অর্ধ রকম। তারা বলে, “আহা তবু ত নবীন মাষ্টার মেয়েটার একটা গতি করে দিলে!” তাদের ধন্যবাদে তরুণ মাষ্টারের মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

সেই জ্যোৎস্নারাত্রির প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে মাষ্টারের প্রভাবে ময়নার অতীত জীবনটা ক্রমশঃ ছায়ার মত মিলিয়ে আসতে লাগল। পাত্রীর মত ধর্মশিক্ষা দেবার চেষ্টা তিনি একদিনও করেননি। পড়ান বইএর মধ্যে কোনো কোনো কথা পড়ে কখনো কখনো আপনিই

তার চোখ জ্বলে ভরে আসত। সে অশ্রু মাছুষের উপদেশে ফোটান নয়।

২

প্রথম পরিচয়ের তিন মাস পরে একদিন সন্ধ্যা বেলা মাষ্টার খাতাপত্র নিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় সেই-দিনকার মত কপাটে ঠক্কু করে শব্দ করে ময়না এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। সেই উজ্জল কালো চোখ দুটি আর লম্বা লম্বা কালো চুলগুলি না থাকলে আজকার ময়নাকে সেই আগেকার ময়নার ছায়া বলেও কেউ ভুল করত না। সে এসে বললে, “আজকে বুঝি তোমার অনেক কাজ রয়েছে?” উত্তর পাবার আগেই আবার বললে “আমার সঙ্গে একবার আসবে?” মাষ্টার শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই সে আগেকার মত মাথা দুলিয়ে জোর দিয়ে বলে উঠল, “তবে শীগগির উঠে এস।”

দুজনে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়ল। গ্রাম ছাড়িয়ে এসে মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় যাবে?” সে বললে, “আমার বাবাকে দেখতে।”

আজ প্রথম ময়নার মুখে বাবা কথাটি শোনা গেল। এতদিন সে “সেই বুড়োটা” “গোবর্দ্ধনসরকার” “গোবরা” প্রভৃতি নামেই কাজ চালাত। তিন মাসের মধ্যে আজই সে প্রথম বাবার কথা পাড়লে; মাষ্টার জানতেন ঐ বিষয়টা এড়িয়ে চলতে ময়নার খুব চেষ্টা। তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা জেনে মাষ্টার নীরবে ময়নার পিছন পিছন চলেন। মাষ্টারের হাতখানি ধরে ময়না কত খাদে খোয়াইয়ে, কত ঝোড়ে ঝোপে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বাইরের কোনো কথাই আর তখন তার মনে ছিলনা, শুধু এই খুঁজে বেড়ানর ব্যাপারটাই তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিল। মাঝখানে শুকনো ঋতু পাতার আগুন জ্বলে এক জায়গায় কতকগুলো কুলি আগুন গোঁয়াছিল, ময়নাকে চিন্তে পেরে তারা তাকে নাচতে গাইতে অনুরোধ করলে, একজন মদ খাওয়াবারও চেষ্টা করলে, কিন্তু ময়নার সেদিকে ত্রুক্ষেপই নেই। কোথাও দু’একটা লোক মাষ্টারকে দেখে সন্ত্রস্ত পথ ছেড়ে দিলে। একটা ঘণ্টা কেটে গেল এমনি করে। কত জায়গায় ঘুরে ঘিরেও সন্ধান না পেয়ে তখন তারা

একটা খাদের ধার দিয়ে ফিরে আসতে লাগল। হঠাৎ রাজির নিস্তরতা ভঙ্গ করে দূরে কিসের যেন একটা শব্দ হল। গাছপালা আর পাহাড়ের ঢিবির গায়ে লেগে শব্দের প্রতিধ্বনিও কয়েকবার দম্ দম্ শব্দ করে উঠল। নদীর ধারের কুকুরগুলো শব্দ শুনে মহা খেউ খেউ জুড়ে দিলে। এদিকে ওদিকে কয়েকটি আলোও যেন ছুটোছুটি করে চলে গেল। তাদেব খুব কাছেই একটা ছোট নদী। ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে কয়েকখানা পাথর পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়ল সেই নদীর জলে। শালবনের ভিতর দিয়ে একটা দম্‌কা হাওয়া হাহা করে বয়ে গেল, যেন স্ক্যাপার কান্না। তারপর সব নিস্তর। সে নিস্তরতা আরও নিবিড়, আরও গভীর, আরও ভীষণ। ময়নাকে সাহস দেবার জন্তে মাঠার ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু ময়না ত নেই। কোথায় উড়ে গেল? ভয় পেয়ে মাঠার নদীর ধার দিয়ে খানা ধন্দ ডিঙিয়ে ছুটে চলেন। গ্রামের শেষে গোরস্থানের ধারের সেই পাহাড়ের কাছে থেমে দেখলেন, ঐ যে পাহাড়ের উপর দিয়ে পাখীর ডানার মত আঁচলখানি উড়িয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ময়না ছুটে চলেছে।

পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে দেখলেন এক জায়গায় কয়েকটা আলো আর মানুষের ছায়া নড়ছে। একদল লোক স্নান বিমর্ষ মুখে বসে আছে। শোনা গেল, একজন বলছে, “লোকটা মদ খেয়ে সব উড়িয়ে, ধারে মাথার চুলটি অবশি বিকিয়ে দিয়েছে। কটা পয়সা পাবার জন্তে জুয়া খেলে পয়সা ত একটাও মিলল না, উপরি হেরে গিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হ’ল। শেষকালে কিনা এই পরিণাম!” মাঠার হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবামাত্র ময়না তাদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে একটা গর্তের কাছে টেনে নিয়ে চলল।

ময়নার মুখখানা একেবারে শাদা! তাতে রক্তের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তার পাগলামি আজ কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যার আগমনের অপেক্ষায় সে ছিল, তার আবির্ভাব হয়েছে। আজ তার হুর্ভাবনা কেটে গিয়েছে, সে আজ মুক্তি পেয়েছে। গর্তের কাছে গিয়ে মেয়েটি একটা ছেঁড়া কাপড়ের সুপের মত কি দেখিয়ে দিলে। মাঠার ঝুঁকে পড়ে দেখলেন,

গোবর্দ্ধন সরকার একটা পিস্তল হাতে করে পড়ে আছে। তার শরীরটা একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা।

৩

শিকলকাটা ময়না এখন আগেকার তুলনায় অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। শোকই তাকে ক্রমশ জগতের অচ্য পাঁচ জনের মত করে তোলাবার চেষ্টা করছিল। তার বাবার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন রাখবার জন্তে মাঠার নিজ খরচে গোবর্দ্ধন সরকারের নামে তার চিতাভস্মের উপর একটা সমাধি করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা বেলা সেদিক দিয়ে বেড়াতে গেলে মাঠার প্রায়ই দেখতেন সমাধির উপর বনফুলের মালা সাজান রয়েছে। ‘একটি ছোট মাটির প্রদীপও মাঝে মাঝে জ্বলতে দেখা যেত। ফুলের মালাগুলিতে পাশাপাশি ধুঁতরা, আকন্দ, টাঙ্গা, কাঠ-গোলাপ সবই থাকত। মধু আর বিষের এই গলাগলি দেখে তরুণের মনে কি একটা বেদনা জেগে উঠত।

সেদিন ভাঙ্গি গরম। বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাঠার দেখলেন, বনের ঠিক মাঝখানটিতে একটা ঝুঁকে-পড়া গাছের ডালের উপর ময়না বনলক্ষ্মীর কোলের শিশুটির মত বসে আছে। তার কোলে রাজ্যের ঘাস পাতা, কচি কচি শালের পল্লব, বুনো ফুল ফল, আরও কত কি! মুখ নীচু করে ময়না গুনগুন করে একটা সাঁওতালী গান গাচ্ছিল। দূর থেকে মাঠারকে দেখে সে একটু সরে বসে তার অপূর্ণ সিংহাসনে বজুর জন্তে জায়গা করে দিলে। অতিথিসংকার হ’ল বুনো কেশুর আর ফল দিয়ে। তার আগ্রহ আর আড়ম্বর দেখে কে! তার কোলে নানা রকম বিযাক্ত ফুল দেখে মাঠারের বড় ভয় হ’ল। তিনি বলেন তাঁর ছাত্রী হতে হলে সে ওসব ছুঁতে পাবে না। ময়না সেগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনও সে ছোঁবে না।

ময়না একটু সভ্য ভাব্য হয়ে উঠলে অনেক সদয়-হৃদয়া গৃহিণীই তাকে ঘরে ঠাই দিতে রাজি হলেন। তাদের মধ্যে দাসগৃহিণীর সকলের থেকে বেশী স্নানাম। ভদ্রমহিলা ধুঁটান। কাজেই ময়নার মত কুড়োনো মেয়ের সেই বাড়ীতেই একটু স্বচ্ছন্দে থাকা সম্ভব। আদব-কায়দা ও রীতিনীতির বিষয়ে দাসগিণি ছিলেন কিন্তু খুব

কড়া। নানা রকম রীতিনীতির দড়াদড়ি দিয়ে নিজেকে আটপৃষ্ঠে বেঁধে কতশত সাধাসাধনার পর তিনি যখন প্রকৃতি দেবীর সকল ছাপই নিজের মন থেকে অনেকটা উঠিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন তখনই তিনি খুশী হয়ে বলেছিলেন, “এতদিনে স্বর্গের পথে এক পা বাড়ানর আশা হল।” কিন্তু এত করেও তাঁর ক্ষুদ্র “সংস্কার”গুলি অনেক পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল রয়েই গিয়েছিল। মাঘের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে প্রকৃতি ছেলেদের পেয়ে বসলেন। দাসগিম্মির ছেলেবেলার যত অমার্জনীয় অপরাধ তাঁর হৃদয়ে ঢোকবার রাস্তা না পেয়ে, সেই কড়া পাহারার পথ এড়িয়ে কোন্ সুযোগে গিড়কীর দরজা দিয়ে ছেলেমেয়েদের হৃদয়ে কীকি দিয়ে ঢুকে পড়ল। এত ছেঁটে কেটেও দাসগিম্মি তাঁর ঘরখানিকে স্থল্লর ফুলের বাগান করে তুলতে পারলেন না। সৌখীন বাবুদের কৈয়ারি-করা ফুলের বাগানের মত সারাক্ষণই এক রকম রূপ ধরে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকবার মত ছেলেমেয়ে তাঁর নয়। বুনা ফুলের মত নানাভাবে অঙ্গস্বরূপে ফুটে ওঠাই ছিল তাদের স্বভাব। থোকা, নর, ফুল, রাজু কেউই মায়ের মনের মতন হয়নি। এক কেবল নগেন্দ্রনন্দিনী গুরুদেব নগুই তাঁর আদর্শ-মত পড়ে উঠেছিল। সেই তাঁর একমাত্র সান্না। নগুর বয়স তের চোদ্দ হবে। সে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাস্ত শিষ্ট। হাসি ঠাট্টা জানে না, কখনও মার কথার অবাধ্য হয় না।

এই বাড়ীতে মাষ্টার ময়নার স্থান করে দিলেন। দাস-গিম্মির একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, নগুই ময়নার আদর্শ। ময়না ছুটুগি করলে গৃহিণী তার কাছে নগুর গুণাবলীর অনেক ব্যাখ্যা শুরু করে দিতেন। ময়না অল্পতপ্ত হলেও গৃহিণী নগুরই আদর্শ তার চোখের সামনে খাড়া করে তুলতেন। একদিন শোনা গেল ময়না ও গ্রামের আর-সব ছেলে-মেয়েদের আদর্শরূপে পাঠশালায় শোভা পাবার জন্যে নগু নেহাৎ অল্পগ্রহ করে তরুণ মাষ্টারের ছোট্ট বিদ্যালয়টিতে আসছে। তিনি একান্ত বাধিত হয়ে নগুকে ভর্তি করে নিলেন। কিন্তু নূতন ছাত্রীটির কল্যাণে তাঁর কাজ অনেক বেড়ে গেল। যখন-তখনই তাঁর কলম ভেঙে যায়, মাষ্টার না কেটে দিলে হয় না। খাতা ছিঁড়েও অহরহই

যাচ্ছে, সেটাও মাষ্টারকেই সেলাই করে দিতে হয়। হাতের লেখা কি অঙ্কের খাতা দেখে দেবার সময় নগু প্রাণ মাষ্টারের পিঠের উপর পড়ে অল্প সকলকে আড়াল করে রাখে। তার একরাশ কালো কঁোকড়া চুল রেশমের পর্দার মতন মাষ্টারের মুখের সামনে এলিয়ে পড়ে মাষ্টারকে তার একলার সম্পত্তি বলে ঘোষণা কবে। পাঠশালায় কোন জিনিষ ফেলে গেলে মাষ্টার না খুঁজে দিলে নগু কিছুতেই সেটা খুঁজে পায় না। তরুণ মাষ্টারও মাঝে মাঝে ছাত্রীকে খুশী করবার জন্যে তার কাছে একটু বেশী নজর দিতেন। একদিন সন্ধ্যায় মাষ্টার নগুর কি একটা জিনিষের খোঁজ করতে তার বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেদিন নগুর সঙ্গে তাঁর অনেক গল্পগাছাও হয়েছিল। লোকে দেখে মনে করেছিল মাষ্টার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বুঝি নগুকেই সব চেয়ে বেশী পছন্দ করেন।

তার পরদিন সকাল বেলা ময়না পাঠশালাে এল না। বেলা বেড়ে চলল, দুপুর হ’ল, কিন্তু ময়নার দেখা নেই। নগুকে জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল, তারা দুজনে এক-সঙ্গেই ভাত খেয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু ময়না একগুঁয়েমি করে অল্প পথে চলে গেল। সন্ধ্যা হ’ল, তবু ময়না এল না। মাষ্টার দাসগিম্মির কাছে খোঁজ করতে গেলেন, বোচারী ত’ শুনে ভয়ে অস্থির। দাস-মহাশয় ব্রহ্মাও খুঁজেও ময়নার কোনো খোঁজ পাননি। নর রাজুরাও কিছু জানে না। দাসগিম্মি বলেন “তবে বুঝি মেয়েটা জলে ডুবে গেছে! ওমা গো কি হবে! পাকৈ কাদায় যে সারা অঙ্গ ভরে যাবে, গোর দেবার সময় কি করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব?” মাষ্টার বিষন্ন মনে পাঠশালায় ফিরে এলেন। আলো জ্বলে মাজুরের উপর চুপ্টি করে বসতে গিয়ে দেখলেন এক-টুকরো ছেঁড়া কাগজে ময়নার হাতের আঁকা বাঁকা অক্ষরে তাঁরই নাম লেখা রয়েছে। কাগজখানা অঙ্কের খাতার একটা ছেঁড়া পাতা, খুব সময়ে মোড়া ও ভাত দিয়ে ভাল করে আঁটকান; পাছে কোনো লোকে তার ভিতরের লুকোনো কথাগুলি জেনে ফেলে সেই ভয়ে উন্টা পিঠে বড় বড় করে লেখা “মালীক ভিত্ত অন্ন কেহ খুলিবে না।” আশ্বে আশ্বে অতি সন্তর্পণে চিঠিখানা খুলে মাষ্টার পড়তে আরম্ভ করলেন :—

সত কোটি প্রশ্নাম পুংরসঃ নিবেদন, পরে, মাষ্টার মশায় ভূমি চিঠিটা পড়বার অনেক আগেই আমি এদেষ থেকে পালিয়ে যাব। আর কোনো দিনও ফিরে আসব না। কোনো দিনও না, আর একবারটিও না। আমার ফকির-মালাগুলো জানকিয়াকে দিতে চাও ত দিয়ে দিও, আমার মাজিন্দের ছবিখানা শৈলিকে দিও। কিন্তু নগিকে কিছু দিও না। খবদার কিছু দিও না বলে রাখছি। আমার তাকে কেমন লাগে জানো? দেখলে হু চখু জোলে যায়। আজ আব কিছু লিখব না। ইতি

শেবিকা শ্রীমতি ময়নাহুম্মরী দাসী।

চিঠিখানা হাতে করে বসে মাষ্টার কত কি ভাবতে লাগলেন। ক্রমে রাজি গভীর হয়ে এল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ কালো পাহাড়ের পিছন থেকে তার চক্চকে মুখখানি বার কবে পাঠশালার সরু পথটি আলো করে দিলে। দিনের বেলা এই পথের উপর দিয়ে কত চাঁদের মত খোকা খুকী তাদের ফুলের মত পা ফেলে পাঠশালায় এসেছিল, মাষ্টারের বোধ হয় তাও মনে পড়ছিল। আর কিছুক্ষণ হেবে তিনি যেন একটা কিনারা পেলেন। চিঠিখানাকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে পথে উড়িয়ে দিলেন।

পরদিন ভোরবেলা কাক কোকিল ডাকবার আগেই মাষ্টার শালবনের ভিতর দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলেছেন; থু থু শব্দে দুটো-একটা শেয়াল নৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল; কাকগুলো দিনের আলোর দেখা পেয়ে কোলাহল করতে করতে বাসা ছেড়ে উড়ে বেরলো। অনেক দিন আগে যে ঘন বনের মধ্যে গাছের ডালে পাখীর মতন ময়নাকে বসে থাকতে দেখেছিলেন, ঘুরতে ঘুরতে মাষ্টার সেইখানে এসে হাজির। সেট ছুয়ে-পড়া গাছের ডালটি আজও তেমনই রয়েছে, তার উপরে কচি পাতার ছাটাটিও মেলা আছে, কিন্তু সিংহাসন আজ খালি। যুবক আর একটু এগিয়ে আসতেই ভীক বন পশুর মত কে যেন গাছপালার মধ্যে চমকে ছুটে পালাল। ঝুঁকেপড়া গাছের ডালপালা ঝিঁড়তে ছিঁড়তে শুকনো পাতার উপর দিয়ে মড়মড় শব্দ করে সে কোন্ এক ঝোপের কোলে লুকোল। মাষ্টার কাছে গিয়ে গাছের ডালপালাব ঘন বুনুর ভিতর কি মারতেই পলাতক ময়নার কালো চোখের উপর নজর

পড়ল। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল, কাকের মুখেই কথা নেই। শেষকালে ময়নাই তাদের নীরব আলাপের শেষ করলে। কোনো ভূমিকা না করেই সে বলে উঠল, “তোমার কি চাই?”

অভিনয়ের পালাটা মাষ্টার আগেই মুখস্থ করে এসেছিলেন, অত্যন্ত নরম স্বরে বলেন, “গোটা কয়েক ফুল আর কেশুর।”

“সে-সব পাবে-টাবে না। চলে যাও এখান থেকে। নুগ্রেজুনন্দিনীর কাছে নাওনা গিয়ে দুষ্ট কোথাকার।” রাগের চোটে নগ্রেজুনন্দিনীর নামে জোর দিতে গিয়ে ময়না অনেকগুলো রফলা জুড়ে দিয়েছিল।

“মইহু, আমার যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কাল থেকে কিছু খাইনি। ক্ষিদে মরে যাচ্ছি।” এই বলে তরুণ মাষ্টার ক্লান্ত শরীরে গাছের উপর হেলে পড়লেন।

এইবার ময়নার মনটা একটু নরম হল। অনেক দিন আগে সে যখন ভবঘুরের মত পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াত, সেই দুঃখের দিনের কথা মনে করে মাষ্টারের ক্লান্ত এই বেদনাটা সে বুঝলে। তাই অমন বুক ভাঙা করণ স্বরে ময়না একটু বিচলিত হল। তার সন্দেহটা কিন্তু তখনও একেবারে ঘোচেনি। সে বললে “ঐ গাছের গোড়াটায় খুঁড়ে দেখ, অনেক পাবে এখন; কিন্তু কাউকে বোলো না যেন।” ময়নার ভাঁড়ারের চোরের অভাব ছিল না।

মাষ্টার মশায় যে কিছু খুঁজে পেলেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। ক্ষুধায় বোধ হয় তাঁর সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ময়নার বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। শেষকালে আর স্থির থাকতে না পেয়ে পাতার ঝোপের ভিতর থেকে পাখীর মত ঘাড় বঁকিয়ে একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে “আচ্ছা, আমি যদি নীচে নেমে তোমায় গোটা কয়েক ফল পাকুড় বের করে দি, তাহলে আমায় ছোঁবে না তুমি?” মাষ্টার তৎক্ষণাৎ বাজি। ময়না বললে, “যে আমায় ছোঁবে, সে যমের বাড়ী যাবে।”

চুক্তিভঙ্গের ফলে মাষ্টার ইহুগং ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তখন ময়না ঝপ করে গাছের

উপর থেকে লাফ দিবে পড়ল। এইবার কিছুক্ষণ নীরব ভঙ্গের পালা। একটু পরেই ময়না পাকা গিল্মির মত বিজ্ঞভাবে জিজ্ঞাসা করলে, “এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?” মাঠার তখনই আরোগ্য লাভের লক্ষণ দেখাতে শুরু করলেন। তারপর ময়নাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ীমুখো হলেন। ছ’টার পাঁ যেতে না-যেতেই ময়না তাঁকে এক ডাক দিলে। ময়না যে তাঁকে ডাকবে তা’ তিনি আগেই জানুতেন; কাজেই ডাকবা মাত্রই ফিরলেন। ময়নার মুখখানা একেবারে শাদা হয়ে গিয়েছে, তার বড় বড় ভাঙ্গা ভাঙ্গা চোখ দুটি জলে টলটল ক’বছে। মাঠার তাব কাছে গিয়ে ছোট দুখানি হাত ধরে তার সজল চোখের দিকে চেয়ে বললেন, “মইল্ল, সেই যেদিন তুমি প্রথম আমাকে দেখতে এসেছিলে, সেই সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়ে কি?” হ্যাঁ, ময়নার সে কথা খুবই মনে আছে। “তুমি পাঠশালা পড়তে পার কি না আমায় জিজ্ঞেস করলে, তুমি বলেছিলে লেখাপড়া শিখবে, ভাল মেয়ে হবে, তাই আমি বললাম”

ময়না তাড়াতাড়ি বললে “থাক, থাক।”

শুধক বললেন, “আজ যদি তোমার মাঠার এসে বলে যে তার সেই ছোট ছাত্রীটিকে নইলে একলাটি তার দিন কাটে না, সেই ক্ষুদ্রে মেয়েটি এসে তাকে ভাল হ’তে না শেখালে কিছুতেই চলবে না, তাহ’লে তুমি তাকে কি বল?”

মেয়েটি কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করে রইল। মাঠারও তার উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করে রইলেন। একটা খরগোষ ছুটে এসে তার নরম-নরম দুটি পা তুলে ঝকঝকে চোখ দুটি মেলে ঐ দুটি নীরব মাছের দিকে চেয়ে রইল। একটা কাঠবিড়ালী সেই পোড়ো গাছটা বেয়ে খানিকটা ছুটে এসে সেইখানেই থেমে তার লাজটি উটে পিঠে বুলাতে লাগল। মাঠার চুপিচুপি বললেন, “মইল্ল, সবাই যে তোমার জন্তে বসে।” মইল্ল একটু মিষ্টি হাসি হাসলে। দখিন হাওয়া সেই সময় গাছের মাথায় মাথায় একটা কাপন দিয়ে গেল, ঘন ডালের ঝাঁক দিয়ে একটি আলোর রেখা এসে সেই অস্থিরচিহ্ন ছোট মাছটির ঠিক মুখের উপর পড়ল। হঠাৎ ঝট করে উঠে ময়না মাঠারের হাতখানা

ধরলে। কি একটা কথাও বললে কিন্তু বোঝা গেল না। তার কালো চুলগুলি কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে মাঠার একটি চুম্বন করলেন। তারপর বনের দ্বান আলো ও ভিজে মাটিব গন্ধ পিছনে রেখে ছুজনে খোলা পথের আলোয় বেরিয়ে এলেন।

৩

অল্প ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আগের তুলনায় অনেকটা ভাল ব্যবহার করলেও নগেন্দ্রনন্দিনীর উপর ময়নার বেজায় রাগ। তার সেই হিংসাত্মক বোধ হয় তখনও নিবে যায়নি। নগুর গোলগাল শরীরে চিম্টি কাটা বোধ হয় তার বেশী স্ব্ধতর বোধ হত। মাঠারের চোখের উপর এরকম শক্ততার ততটা স্থবিধা না হওয়ায় ময়না এক নূতন পথ অবিকার করলে।

ময়নাকে প্রথম দেখে তার পুতুল-টুতুল থাকা সম্ভব বলে মাঠারের মনে হয়নি। তবে অনেক বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদও প্রথমে যা মনে করেন না, পরে তা দেখতে পান। কাজেই ময়নারও একটা পুতুল আছে দেখা গেল। তার চেহারাটা ঠিক ময়নারই পুতুল হবার উপযুক্ত। তারই যেন একটি ছোট প্রতিমূর্তি। দাসগিল্মি একদিন হঠাৎ এর অস্তিত্ব অবিকার করে ফেলেন। আগেকার দিনে পুতুলটা ছিল ময়নার ভ্রমণের সাথী। তার প্রতি সঙ্গে পুরা কালের কষ্ট সঙ্ঘের অনেক নিদর্শন আঁকা আছে। রোদে জলে তার গায়ের আসল রং অনেককাল উঠে গেছে, তার জায়গায় এখন খানা-ডোবার কাদা লেপা। ময়নাকে আগে যেমন দেখাত, এর চেহারাও অনেকটা সেই রকম। তারই ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের নেকড়া এর কাপড়। ছোট মেয়েদের মতন ময়না কোনোদিন একে আদর করত না। পাঠশালার উঠানে একটা গাছের কোটরের ভিতর বেচারী সারাদিন একলাটি শুয়ে থাকত। ময়না একলা বেড়াতে যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিত। ঠিক ময়নার মতন তারও কোনো বাবুআনা কি সখের সঙ্গে সঙ্গী ছিল না।

দাসগৃহিনীর মনে করণার সঞ্চার হওয়ায় তিনি ময়নাকে একটা নূতন পুতুল কিনে দিলেন। ময়না খুব গভীর ভাবেই সেটা নিলে, কিন্তু মনে মনে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। পুতুলটার লাল লাল গাল আর নীল নীল চোখ

ঠাউরে দেখতে দেখতে ময়নার একদিন মনে হল, এর সঙ্গে যেন নগুর কিছু সাদৃশ্য আছে। পুতুলটার কপাল-
গুণে ময়নার চোখে সেটা ধরা পড়ে যাওয়াতে সে
তক্ষণ পুতুলের মোমের মাথাটা পাখরের উপর আছড়ে
ভাঙলে; তারপর তার গলায় একটা দড়ি বেঁধে যখন-
তখন রাস্তা দিয়ে-হিঁচড়ে বাড়ী থেকে পাঠশালা আর
পাঠশালা থেকে বাড়ীতে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াতে
লাগল। কখনও বা বেচারী নির্দোষীর নিরীহ শরীরে ছুঁচ
ফুটিয়ে বসিয়ে রাখত। কুশপুস্তলি পুড়িয়ে লোকে যেমন
শত্রুর অমঙ্গল কামনা করে, ময়না এর ওপর দিয়ে সেই
রকম কোনো অভিশাপ করতে চাইত, কি নগুর শ্রেষ্ঠতার
আর-একটা নিদর্শন দেখে রাগে ও-রকম করত তা ঠিক
বলা যায় না।

ময়নার এই রকম অনেক খেয়াল ছিল বটে কিন্তু গুণও
ছুটো চারটে ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েদের মত সে কোনো
কাজে হাত দিতে ইতস্ততঃ করত না। তার সাহস বড়ই
বেশী। সব কাজই সে ঝাঁ করে শুরু করে দিত। কোনো
প্রশ্ন করলে উত্তর দিত বেশ একটু গর্বের সঙ্গে। তবে
উত্তরগুলি যে সব সময়েই অপ্রাস্ত হত তা বলা চলে না।
তবে সাহস ও স্পর্দ্ধা দেখলে মাষ্টারের মনেও মাঝে মাঝে
নিজের বিজ্ঞা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হত।

ময়না যখন মাষ্টারেরই একলার জিনিষ হয়ে পড়ল,
তখন আর তার খেয়াল নিয়ে আমোদ করে কাটান চলল
না। তাকে ভাল ত মাষ্টার খুবই বাসতেন; কিন্তু তাকে
মাহুষ করে তুলতে হবে ত। এই বিষয়ে অনেক ভেবে
চিন্তে মাষ্টার ঠিক করলেন ময়নাকে বিচার করা তাঁর পক্ষে
ঠিক সম্ভব নয়। গ্রামের পাজীর পরামর্শ-মত কাছ করলে
বোধ হয় নিরপেক্ষ বিচার হওয়া সম্ভব। পাজীর সঙ্গে
তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল না; কিন্তু ময়নার মঙ্গলের কথা
বিশেষতঃ তাঁদের পরিচয়ের সন্ধ্যার কথা মনে করে তাঁর
এই অপ্রিয় কাজটাও বেশ একটা গৌরবের বাজ বলে মনে
হল। সেদিন সন্ধ্যায় ঐ বনের পাখীটি যখন আর কায়ও
কাছে ধরা না দিয়ে স্বেচ্ছায় তাঁরই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল
তখন তার ভার ভগবান্ নিশ্চয়ই ওই ক্ষুদ্র মাহুষটির
উপরই দিয়েছিলেন।

পাজী তাঁকে দেখে খুবই খুসী হয়ে উঠলেন। নিজের
বাতের ব্যথা প্রভৃতির বিস্তৃত কাহিনী শুনিতে তিনি দাস-
গৃহিণীর বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের কথা
তুলেই পাজী-মশায় ঐ আদর্শগৃহিণী আর তাঁর কন্যার
শতমুখে প্রশংসা আরম্ভ করলেন। নগুর প্রশংসা ত তাঁর
মুখে ধরে না। মেয়ে বলতে হয় ত ঐ মেয়ে। যেমন
তার রূপ তেমনই তার গুণ। মাষ্টার দেখলেন এর পর
ময়নার কথা তোলা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।
পাজীর মতে বোধ হয় ময়নার নরক ভিন্ন গতি হবে না।
অগত্যা মাষ্টার ময়নাকে একান্ত তাঁরই আশ্রিত ভেবে
একটা সামান্য ছুতো করে বেরিয়ে পড়লেন। এই সামান্য
যটনাটি আবার ছাত্রী ও মাষ্টারকে আগেকার মত
পরস্পরের খুবই কাছে এনে ফেললে। মাষ্টারের এই
ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে ছাত্রী খুবই খুসী হয়ে উঠেছিল।
হারানো জিনিষ খুঁজে পেলে লোকে তাকে যেমন চোখে-
চোখে রাখে ময়নাও তার গুরুটিকে তেমনি করে ঘিরে
রাখলে। আবার এখন খাওয়াদাওয়ার পর আগেকার
মতন দুজনে মাঠে মাঠে বনে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
তাদের এই পথ চলার কোনো লক্ষ্য ছিল না। ছুটিতে
পথ চলাতেই তাদের আনন্দ।

একদিন চলতে চলতে ময়না হঠাৎ থেমে একটা কাটা
গাছের গুঁড়ির উপর চড়ে বসল। সেখানে বসে মাষ্টারের
মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন তাঁর মনের ভিতর ডুবুরী
নামিয়ে খোঁজ আরম্ভ করলে। মাথা নেড়ে কালো চুলগুলি
নাচিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে “আচ্ছা, তুমি পাগল, নয়?”
“না।” “তোমার ক্ষিদে পায়নি?” (ময়নার মতে ক্ষিদে রোগটি
মাহুষকে যখন-তখন পেয়ে বসতে পারে।) “না।” “তার
কথা ভাবছ না?” মাষ্টার খুব মিষ্টি স্বরে বলেন, “কার কথা
মইছ?” “সেই কটা মেয়েটার কথা।” (ময়না নিজে
কালো বলে নগুকে এই নাম দিয়েছিল।) “না।” “সত্যি
বলছ?” “হ্যাঁ।” “দাবি ক’রে বল।” “আচ্ছা, তোমার দাবি
বলছি।” ময়না ছুটে এসে মাষ্টারকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে
তাকে চুমু খেয়ে আবার পাখীর ডানার মত আঁচল উড়িয়ে
ছুটে চলে গেল। এর পর তিন চার দিন ময়না অস্বাচ্ছন্দ্য
মেয়েদের মত “ভাল” হয়ে চলতে স্বীকার করেছিল।

এই গ্রামে মাষ্টারী আরম্ভ করবার পব মাষ্টারেরা দু' বৎসর কেটে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর আয়বুদ্ধির কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। কাজেই তিনি অন্য জায়গায় যাবার জোগাড় করতে লাগলেন। একথা তিনি তাঁর বন্ধু গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া আর কোনো লোককে বলেননি। আগামী বৎসব বসন্ত কালে তাঁর যাবার কথা; কিন্তু লোকে বড় গোলমাল করে বলে তিনি কথাটা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন; ময়না পাছে শুনে ফেলে সে ভয়টাও ছিল।

ময়নার কথা তিনি সহজে ভাবতে চাইতেন না। তার কথা মনে পড়লে তিনি স্বার্থপরের মত নিজেই নিজেকে অনেক মন-গড়া উত্তর দিতেন। ভাবতেন, ময়নার প্রতি টান, ও কিছু না; ওটা কল্পনা, পাগলামি, বোকামি; আমার থেকে বড় আর দৃঢ়চিত্ত লোকের হাতে পড়লেই বোধ হয় ময়নার ভাল হবে। ময়নার এখন এগার বারো বছর বয়স, আর তিন চার বছর পরে ত' সে বেশ বড়সড়ই হয়ে উঠবে। তখন ত' আমাকে ভুলেই যাবে; আমি কেন মধ্যে মায়া বাড়িয়ে নিজের পথ বন্ধ করি!

কর্তব্যের ঘাতে ক্রটি না হয় এই মনে করে তিনি ময়নার আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল সকলকে এক-একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তার এক মাসি বেহারে স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন, তিনিই কেবল তাঁকে অনেক দণ্ডবাদ দিয়ে চিঠির উত্তর দিয়েছেন। চিঠিতে ময়নার ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলেও মাষ্টার মাসির বাড়ী ময়নার কত আদর যত্ন হবে, স্নেহশীলা রমণীর কাছে থাকলে সে কত শান্তিশিষ্ট হবে, এইসব অনেক আকাশকুসুম গড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিঠিখানা ময়নাকে পড়ে শোনাতে গিয়ে তাঁর চমক ভাঙল। চিঠির দিকে সে ফিরেও তাকালে না। চুপ করে বসে বসে শুনলে, পড়া হয়ে গেলে কাগজখানা কেটে কয়েকখানা মাছষের আকৃতি করে তার গায়ে “কটা মেয়েটা” লিখে পাঠশালার ঘরের দেয়ালময় লাগিয়ে বেড়ালে।

শীতকাল কেটে গিয়ে বসন্ত দেখা দিল। গাছে গাছে নূতন পাতা, ছোট ছোট ফুড়ি ও শালবনের উজ্জ্বল শ্রাম বর্ণ, বসন্তের দূতরূপে, আগেই এসে উপস্থিত। পাহাড়ের

গায়ে এক-একটা কাঠ-গোলাপের গাছ ফুলের ভারে হাত-মুণী বালিকার মত মাথা হেঁট করে আছে। বড় বড় মাঠের দিকে তাকালে আর কোথাও ধূসর রং দেখা যায় না; কে যেন সমস্ত বনে উপবনে মাঠে ঘাটে সবুজ তুলি বুলিয়ে গিয়েছে, এক তিলও ফাঁক নেই। মাঝে মাঝে দুটি চা'রটি ঘাসের ফুল মিটমিট করে চেয়ে আছে। গোরস্থানের গায়ে কালপুরুষ আরো দু' চারটি শুপ বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিছু দূরে গোবর্দ্ধনসরকারের সমাধি পড়ে আছে, তারও গায়ে সবুজ শেয়ালা অনেকখানি রং ধরিয়ে দিয়েছে।

শহরে এক সার্কাসের দল এসেছিল; তারা ফিবে যাবার পথে আশেপাশের গ্রামগুলিতে দু' এক দিনের জন্তে আড্ডা গেড়ে গেড়ে যাচ্ছে। ময়নাদের গ্রামও বাদ যায়নি। গ্রামের নবীন দলের মধ্যে জলস্থল পড়ে গিয়েছে। মাষ্টারের পাঠশালার শিশুগুলি সার্কাস ছাড়া আর কোনো কথাই বলে না। তাদের কাছে জিনিষটা একেবারেই নূতন। মাষ্টার ময়নাকে একদিন সার্কাস দেখাবেন বলেছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ময়না ও মাষ্টার সার্কাসে গিয়েছেন। ঘোড়দৌড়, তারের উপর নাচ, সঙের খেলা সবই হ'ল। মাষ্টার ময়নার দিকে চেয়ে দেখলেন কোনোটাতেই তার গম্ভীর মুখে হাসির উদ্রেক করতে পারলে না। খেলা শেষ হয়ে গেলে ময়না একটা লম্বা নিখাস ফেলে চোখ দুটি কুঁচকে ভুরুগুলি নামিয়ে আনলে। তারপর মাষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কাঠহাসি হেসে বললে “আমায় বাড়ী নিয়ে চল।” কথাটা বলেই ময়না মুখ নীচু করে কি যেন ভাবতে লাগল। মাষ্টার সারা পথ তাকে হাসাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ। সে দু' হাতে তাঁর হাত-খানা ধরে তাঁর চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু মাষ্টার যেন একটু ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলেন না। কোনো রকমে ময়নাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই মাষ্টার আপন পথে প্রস্থান করলেন।

এরপর দু' তিন দিন ময়না দেরী করে পাঠশালায় আসতে লাগল। তাঁর পথের সম্মল সঙ্গীটির অভাবে সেবারকার শুক্রবারে মাষ্টারের সাক্ষ্য ভ্রমণই হ'ল না। বইখাতা গুছিয়ে বাড়ী যাবার জোগাড় করতে করতে

শুনলেন মিহি গলায় কে বলছে, “দেখুন, মাষ্টার মশায়।”
মাষ্টার ফিরে দেখলেন নরু। ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে
বল্লেন, “কি হে, কি হয়েছে? বলে ফেল শীগগির করে।”
“দেখুন, আমি আর ভোলা ভাবছিলাম যে ময়না
আবার পালিয়ে যাবে।”

অপ্রিয় কথা লোকে যার কাছে শোনে তার উপরই
একটু অযথা-ভাবে চটে ওঠে। মাষ্টারও বিরক্ত হয়ে বল্লেন,
“কি সব যা’ তা’ বক্ছ?”

“হ্যাঁ দেখুন, সত্যি বলছি, ও আজকাল বাড়ী থাকে
না; আমি আর ভোলা ওকে সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে
কথা বলতে শুনেছি। আজও ওকে তাদের কাছে দেখে
এলাম। কাল ও আমাদের বল্লেন যে ও সেই মেয়েটার মতন
বল নিয়ে তারের উপর নাচতে পারে; আরো কত সব
খেলা আমাদের দেখালে।” তাড়াতাড়ি কথা বলতে বলতে
ইপিয়ে ইপিয়ে নরুর প্রায় গলা বন্ধ হয়ে আসছিল,
সে খেমে গেল।

মাষ্টার বল্লেন, “সার্কাসের কোন্ লোকটার সঙ্গে
দেখলে?”

“ওই যে সেই ঝকঝকে টুপি-পরা লোকটা। সেই বাবরী
চুল। আব সোনার বোতাম পরা আর সোনার চেনও
আছে।” ঢোক গিলতে গিলতে অনেক কষ্টে নরু এই কথা
কথা বললে।

মাষ্টারের মনে হ’ল বুকের ভিতর কি একটা যেন শক্ত
হয়ে উঠছে, বই খাতা ফেলেই তিনি দৌড় দিয়ে পথে
বেরিয়ে পড়লেন। নরু ছোট ছোট পা ফেলে তাঁর সঙ্গে-
সঙ্গে দৌড়ে চলতে খুব চেষ্টা করতে লাগল। পথের
মাঝখানে হঠাৎ খেমে মাষ্টার প্রায় নরুর ঘাড় পড়বার
জোগাড়। আবার কথা শুরু করে মাষ্টার বল্লেন, “তারা
কোথায় কথা বলছিল?”

“সেই আটচালার কাছে।”

বড় রাস্তার উপর এসে মাষ্টার দাঁড়ালেন, নরুকে বল্লেন,
“যা ছুটে গিয়ে দেখে আয় ময়না বাড়ী আছে কি না, থাকলে
আটচালার এসে আমাদের বলিস্। না থাকলে আর আসতে
হবে না। যা দৌড়ে যা।”

নরুর ছোট পায়ে যত শক্তি ছিল তত জোরে সে দৌড়
দিল।

আটচালার কাছে আসতে কতকগুলো লোক হাঁ কবে
মাষ্টারের দিকে চেয়ে রইল। মাষ্টার পকেট থেকে রুমাল-
খানা বের করে মুখটা মুছে ঘরে ঢুকলেন। ঘর ব্যাণ্ডা
চারি ধারে খুঁজেও ময়নার দর্শন পাওয়া গেল না। এক
দিকের ব্যাণ্ডায় একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তার মাথায়
জরির টুপি। তার সাজসজ্জা, চুলকাটা দাড়িখোঁটা দেখেই
মাষ্টারের ভক্তি চটে গিয়েছিল। লোকটা তাঁকে দেখতে
পেয়েও চুরুট হাতে কবে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন
কিছুই জানে না। মাষ্টার তার ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।
হুজনে চোখোচোখি হ’তেই মাষ্টার আর-একটু কাছে সরে
এলেন। কিন্তু কথা বলতে শুরু কবতেই গলার ভিতর
কি যেন একটা ঠেলে উঠে তাঁর স্বর বন্ধ করে দিচ্ছিল।
তাঁর নিজের গলাব স্বর শুনে তিনি নিজেই ভয় পেয়ে
গেলেন। কেমন যেন ক্ষীণ, ভাঙা, বহু দূরের একটা স্বর।
মাষ্টার বল্লেন, “শুনলাম ময়না বলে” আমার পাঠশালার
একটি মেয়ে তোমাদের দলে ভর্তি হবার জন্তে তোমার
কাছে কি সব বলেছে। সত্যি না কি?”

লোকটা চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে এদিক ওদিক পাইচারি
করতে কবতে বললে, “যদি বলেই থাকে?”

মাষ্টারের গলার স্বর আবার বন্ধ হয়ে এল, অতি কষ্টে
গলাটা পরিষ্কার করে নিষে আবার কথা শুরু করলেন, “তুমি
যদি মানুষ হও তাহ’লে আমি তার অভিভাবক এইটুকু বল্লেনই
যথেষ্ট হবে। তার ভবিষ্যতের জন্ত আমিই দায়ী। তুমি
যে তাকে কি রকম জীবনের পথে নিয়ে যাচ্ছ তা তুমিও
জান, আমিও জানি। মানুষের মত কথা বলতে চাও ত’
বল। ওর মা নেই বাপ নেই ভাই বোন ত্রিসংসারে কেউ
নেই। তুমি কি তাদের অভাব পূরণ করবে?”

লোকটা চারিদিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসি হাসলে।

মাষ্টার বল্লেন, “তোমার কাছে অনুরোধ করছি ওকে
আর কিছু বোলো না, আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি
ওকে.....” বলতে বলতে আবার যুবকের গলার স্বর
কঁপে বন্ধ হয়ে এল।

লোকটা কি বুঝল জানি না, একটা চাষাড়ে রকম ঠাট্টা
করে বললে “আমার সঙ্গে চালাকি খাটবে না।”

তার কথার চাইতে কথার স্ববে, চাহনিব ভঙ্গীতে আ

ধরণধারণেই মাষ্টারের বেশী অপমান বোধ হ'ল। লোকটা হেসে দাঁত কটা ঢাকবার আগেই মাষ্টার এতক্ষণের বাগেব জ্বালা মিটিয়ে তার মুখের উপর এক ঘুসি মারলেন! জানোয়ারটার মাথার টুপি দশ হাত দূবে ছিটকে পড়ল, চুপটটা হাত থেকে ছটকে পাশের একজন লোকের গায়ের চাদরে গিয়ে পড়ল। অত জ্বোরে ঘুসি মারতে গিয়ে মাষ্টারের হাতখানা ত' ফেটে চটে রক্তারক্তি। সার্কাসওয়ালার সখের ছাঁটা দাড়িও কিছু দিনের জ্ঞাত একটু নূতন রূপ ধারণ করলে।

কিছুক্ষণ ধরে খুব মারামারি, ঝুটোপুটি, গালাগালি চলল। চারদারে অনেক লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে এসে হাজির। হঠাৎ একদল লোক এসে জ্বরির টুপীধাবীকে ঘিবে দাঁড়াল। মাষ্টারের যখন হ'ল হ'ল তখন সেখানে আর প্রায় কেউ নেই। একজন লোক তার বাঁ হাতখানা ধরে দাঁড়িয়ে, ভান হাত দিয়ে তখনও দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু সেই হাতের মুঠির ভিতর একটা বক্বকে ছুরি। কখন যে কে সেখানা তাব হাতে দিয়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই।

দাসমশায় মাষ্টারের হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাষ্টার আবার ফিরবার চেষ্টা করে ক্ষীণস্বরে বল্লে, “ময়না?” দাসমশায় বলেন, “সে বাড়ীতে।” পথে যেতে যেতে তিনি বলেন যে ময়নাই তাঁকে বাড়ী গিয়ে ডেকে এনেছে; সে গিয়ে বলে যে একটা লোক মাষ্টারকে খুন করছে। দাসমশায়ের সঙ্গে বিছুর গিয়ে মাষ্টার পাঠশালার পথে চললেন। কাছাকাছি গিয়ে পাঠশালার দরজা খোলা দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন ময়না। একলা ঘরে ময়নাকে বসে থাকতে দেখে ত' তিনি অবাক।

মাষ্টার স্বভাবতই একটু স্বার্থপর ছিলেন। সার্কাস-ওয়ালার সেই চাষাড়ে ঠাট্টাটা এখনও মাষ্টারের মনে কাঁটার মত বিধে উঠছিল। তিনি ভাবছিলেন ময়নার প্রতি তাঁর ভালবাসাটাকে এমন চোখে দেখা বোধ হয় লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, তা' ছাড়া ময়না ত' স্বেচ্ছায়ই তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা ছেড়ে গিয়েছে। তবে আর তার কথা অত ভেবে কি ফল? এত লোকে যখন ওর আশা ছেড়ে দিলে

তখন তাঁরই বা কি দায়? ওকে যে মাহুষ করা যাবে না সে ত' দেখাই যাচ্ছে। জগতে কি আর কেউ অনাথ নেই? তাদের মতন করেই না হয় গুরু দিন চলবে। যার জ্ঞাত্রে এত কাণ্ড সে ত' বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছিল। লাভের মধ্যে তাঁর ঞ্জাটা নিয়ে টানাটানি। লোকে এখন তাঁকে কি বলবে?

এই আত্মচিন্তার সময় ময়নার সঙ্গে দেখা করতেই তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। ঘরে ঢুকে তিনি ময়নাকে বলেন, এখন তাঁর অনেক কাজ, ময়না না থাকলেই ভাল হয়। ময়না উঠে দাঁড়াতে মাষ্টার ছই হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সেখানে বসে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ চেয়ে দেখলেন, ময়না তখনও সেই ভাবে দাঁড়িয়ে। সে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাষ্টার মুখ তুলতেই বললে, “তুমি কি লোকটাকে মেরে ফেলেছ?” মাষ্টার বলেন, “না।”

মেয়েটি খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “কেন একেবারে মেরে ফেললে না ওকে? ওই জ্ঞাত্রেই ত' তোমার হাতে ছুরিখানা দিয়েছিলাম।”

মাষ্টার যেন আকাশ থেকে পড়লেন, “তুমি ছুরি দিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ, আমিই দিয়েছিলাম। আমি সেই কোণের গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম তুমি লোকটাকে মারলে, তারপর হুজনেই পড়ে গেল। তার আমার পকেট থেকে ছুরিটা পড়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে সেটা তোমার হাতে তুলে দিলাম। মারলে না কেন এক ঘা?” ময়না একটানে সব কথাগুলো বলে নিলে। তার কালো চোখ দুটো জ্বল-জ্বল কবে উঠল, ছোট হাতখানাও শক্ত মুঠি বেধে উঠল।

মাষ্টার নির্বাক!

ময়না আবার কথা শুরু করলে, “তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতে তাহ'লে আমি বলতুম যে আমি ওই বাজিকরদের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছিলাম জানো? তুমি যে আমায় না বলে চলে যাচ্ছিলে। আমি সব জানি। তুমি যখন ডাক্তারকে বলছিলে তখনই আমি শুনেছিলুম। নগিদের বাড়ী একলাটি থাকতে আমার বয়ে গেছে। মরে গেলেও থাকতাম না।”

খুব হাত মুখ ভঙ্গী করে কথা বলে ময়না নিজের জামার

ভিতর হাত গলিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট সবুজ পাতা বের করলে। পাতাগুলোকে হাত বাড়িয়ে অনেকখানি দূরে ধরে সেই আগেকার মত সাঁওতালী স্তরে খুব জোর দিয়ে ছবলতে লাগল, “তুমি বলেছিলে এই বিষ পাতা খেলে আমি মরে যাব। বেশ হবে, এইগুলো খেয়ে মরব, নয়ত ওদের সঙ্গে চলে যাব। এখানে আমায় কেউ দেখতে পারে না, সবাই আমায় ঘেরা করে, আমি কণ্ঠনো এখানে থাকব না। তুমিও নিশ্চয় আমাকে দু চক্ষে দেখতে পার না, নইলে অমন করতে দিতে না।”

ময়না ধরধর করে কাঁপতে লাগল, তার চোখ দিয়ে বড় বড় দু কঁোটা জল গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল পাছে ধরা পড়ে যায় তাই চট্ট কবে সে জলটা মুছে ফেললে, গালে বোলতা বসলেও লোকে তত তাড়াতাড়ি কবে না। “আমায় যদি কয়েদ করে রেখে যেতে না দাও তবে আমি বিষ খাব। খাব না কেন? আমার বাবা ত’ আস্বহত্যা করেছিল। তুমি যেদিন বলেছিলে এগুলো খেলে মাহুষ মরে যায় আমি সেই দিন থেকেই এগুলো বুক করে নিয়ে বেড়াই।”

মাষ্টারের চোখের সামনে গোবর্দ্ধন সরকারের নির্জ্জন সমাধিটা ও ক্ষুদ্র বালিকার ক্রুদ্ধ মূর্তিটি ভেসে উঠল। তার হাত দুখানি ধবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, “আমার সঙ্গে যাবে মইছু?”

বালিকা ছুটে এসে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে মহানন্দে লম্বা টান দিয়ে বললে, “হু.....।”

“যদি আজকেই—আজ রাত্রেই যাই?”

“আজ রাত্রেই যাব।”

যে বাঁকা সরু পথের উপর দিয়ে ময়না একদিন ক্লাস্ত চরণে মাষ্টারের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই পথে আজ দুজনে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়ল। সে পথে তার চরণচিহ্ন আর কোনো দিন পড়বে বলে মনে হ’ল না। আকাশের তারাগুলি তাদের মাথাব উপর জলে উঠল। আজ মাষ্টার ও ছাত্রীর শিক্ষা সমাপ্ত হ’ল। পাহাড়ঘেরা গ্রামখানির পাঠশালার দরজা আজ তাদের কাছে চিরদিনের মত রুদ্ধ।

শ্রীশাস্তা দেবী।

জগৎপ্রসিদ্ধ মহাপ্রাচীর

পৃথিবীর “সপ্ত আশ্চর্য”জনক (Seven wonders of the world) বস্তুর কথা ছেলেবেলা হইতে সকলেই শুনিয়া আসিতেছি। মিশরে পিরামিড দেখিয়া একটা সাধ মিটিয়াছিল। আজ চীনের Great Wall বা বিরাট প্রাচীর দেখিতে বাহির হইলাম। ইহাও দুনিয়ার একটা বিস্ময়জনক কাণ্ড।

হোটেল হইতে রিক্শাতে রেলস্টেশনে আসিলাম। লাগিল প্রায় এক ঘণ্টা। পথে একটা শোভাযাত্রা দেখিলাম। দোভাষী বলিলেন—“কনফিউসিয়ানধর্ম্মীরা মৃতব্যক্তির সংস্কার করিবার জন্ত এইরূপ সমারোহ করিয়া থাকে।” একটা প্রকাণ্ড মঞ্চের মধ্যে শব রক্ষিত—বহু লোকে ইহা বহিয়া লইয়া যাইতেছে। নানাশ্রকার কাগজের বাগান এবং মাহুষের মূর্তি বহন করিয়া রহস্যময় কুলি অগ্রসর হইতেছে।

স্টেশনে পৌঁছিলে মোসাকেরখানার ভূত্যেরা এক পেয়লা গরম চা দিল। গরম জলে ভিজান একখানা তোয়ালেও পাইলাম। চীনাদের দস্তরই এইরূপ দেখিতেছি। রেল বসা গেল। পিকিঙ সহর ছাড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা। পথে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর-চীনের সুপরিচিত ভূট্টা, বজরা, জাওয়ার ইত্যাদির ক্ষেত্র। অল্প দূরেই সম্রাটগণের একটা বিলাসভবনের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইল। দোভাষী বলিলেন—“উহার নাম Summer Palace বা গ্রীষ্মপ্রাসাদ। ইহা প্রস্তুত করিতে সম্রাটেরা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। পর্যটক মাজেই এই প্রাসাদ দেখিতে আসে।” থানিক পরে একটা সমর-বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী দেখিতে পাইলাম। স্টেশনে নীলবসনাবৃত নরনারী, শ্রাম্পানি শকট, কুল-তরমুজ-ডিম-বিজ্রোতা এবং পল্লীকুটির ও গ্রাম্যপথ কাহারও চোখ এড়াইতে পারে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্থান-কাণ্ড স্টেশনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। পিকিঙ হইতে এই স্থান ৩৩ মাইল। স্টেশনের নিকটে এক্সিনিয়ারিং কারখানার কলযন্ত্র ও আসবাবপত্রের পরিচয় পাওয়া গেল। রেলপথ উন্মুক্ত হইবার পূর্বে এখানে একটা সামান্য পল্লীমাত্র ছিল। এই পথে সওদাগরদিগের উষ্ট্রদল অনেক দেখা যায়।

‘গান্’ শব্দের অর্থ দক্ষিণ, ‘কাও’ শব্দের অর্থ pass বা সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ। এই পল্লী দক্ষিণ পথ। মঞ্জোলিয়ার পাহাড় হইতে চীনে প্রবেশ করিতে হইলে এই পথেই আসিতে হইত। এই ধরণের আরও কতকগুলি “কাও” বা “পাস্” আছে বটে—কিন্তু গান্কাওই সর্বপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই পাসের ভিতর দিয়া চীন হইতে মঞ্জোলিয়া, তিব্বত, সাইবিরিয়া এবং পশ্চিম এশিয়া, ইয়োরোপ ইত্যাদি সকল জনপথে যাতায়াত-আসা চলিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলো এই পথেই চীনে আসিয়াছিলেন।

ভারতীয় খাইবার পাস, বোলান পাস ইত্যাদির নাম শুনিয়াছি। চীনে আসিয়া একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গিরিপথ স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ হইল। গান্কাও স্টেশন হইতে ১১ মাইল পর্ধ্যন্ত এই পাস বা সঙ্কীর্ণ পথ। রেল নির্মিত হইয়াছে। গাড়ী চলিতে লাগিল। দুই ধারের তরুহীন পর্বতমালা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। প্রকৃতির সৃষ্টিতে “কাও” নিতান্ত সঙ্কীর্ণই ছিল। এঞ্জিনিয়ারদের হাতে পড়িয়া “পাস” বেশ প্রশস্ত হইয়াছে।

দোভাষী বলিলেন—“মহাশয়, চীনের প্রায় সকল রেল-পথই বিদেশী এঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত। কিন্তু এই যে-পথে যাইতেছি ইহা আমাদের খাটি স্বদেশী। একমাত্র চীনা এঞ্জিনিয়ারেরা এই রাস্তা নির্মাণ করিয়াছেন। অথচ এই পথ প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ও বিদ্যাসাপেক্ষ বিবেচিত হইয়াছিল। এগার মাইলের মধ্যে গান্কাও হইতে ১২০০ ফুট উচ্চ ভূমিতে আমরা উঠিব!”

কোন কোন স্থানে প্রাচীরবেষ্টিত পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম। একটার সম্বন্ধে দোভাষী বলিলেন—“এই নগরে গান্কাও পাসের তত্ত্বাবধায়ক ও গ্রহরীর কর্মকেন্দ্র ছিল। মিউ সত্ৰাটগণের আমলে এই নগর স্থাপিত হয়।”

এই পথে পার্বত্য দৃশ্য অতি মনোহর। স্থানে স্থানে প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ উচ্চ গিরিশৃঙ্গে দেখিতেছি, কোথাও বা নিম্নতম পাদদেশে দেখা যাইতেছে। ভরলয়িত পর্বতমালায় ইষ্টক-প্রাচীরের গতি সর্পাকৃতি বোধ হয়।

একস্থানে দোভাষী বলিলেন—“এই সহরে একটা স্তম্ভর

মর্মরস্তম্ভর আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে মিউসত্ৰাটগণের আমলে ইহা নির্মিত। বহুসংখ্যক স্তম্ভর বৌদ্ধমূর্তি এই ফটকে খোদিত দেখিতে পাই। ছয় ভাষায় এবং ছয় প্রকার লিপিতে কতকগুলি বৌদ্ধসূত্রও ফটকগাত্রে অঙ্কিত আছে।”

ফরাসী পণ্ডিতের লিখিত গাইড-বুকে দেখিলাম প্রথম সংস্কৃত লিপি এইরূপ :—“সর্ব-দুর্গতি-পরিশোধন-উষ্ণীষ-ধারণী।” দ্বিতীয় সংস্কৃত লিপি :—“সমস্ত-মুখ-প্রবেশ-রশ্মি-বিমলোষ্ণীষ-প্রভা-সর্ব-তথাগত-জয়সম-বিরোচন-ধারণী।”

চীনা ভাষায় যে লিপি খোদিত আছে তাহার ইংরেজি অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

“Oh! Admirable! Adoration to the Dharmakaya and to the three jewels. Venerable origin, principal middle and end of all that has shape and appearance, perpetually happy, we.....the thirty-seven Bodhi without obstacle.....sleep and awakening in fact not the wheel of the Law Nirvana..... Our Buddha the union of the priesthood, the victory over the six masters, the deeply beneficent knowledge of the master who answers (abhidharma), longevity, the ensemble of the lotus, the happy gate of the mahabodhi, who increases and sustains a long career, the eight actions to Kapilavastu, to Mokie (Magadha?), to Va(ranasi) ...the kingdom of Sravasti...to establish for the first time a pagoda.

ফটকগাত্রেস্থিত মোগল ভাষায় লিখিত মঙ্গলাচরণের ইংরেজী অনুবাদ এই :—

Om Swasti! May peace and prosperity reign! He who is gifted with this quality, that has triumphed over colour, shape, corporeity and substance.

He who in the renunciation of illusion from top to bottom (?), before and behind,

And who in the eternal liberation of the ego added to really pure joy,

Has reached the summit before the majestic Dharmakaya, I bow the head.

ভারতমণ্ডল চীনসাম্রাজ্যের উত্তরদক্ষিণ পূর্বপশ্চিমে কিরূপ বিস্তৃত ছিল চতুর্দশ শতাব্দীর এই গিরিপথে আজও তাহা বুঝিতে পারি। বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস না জানিলে ভারতবর্ষকে জানা হইবে না। এইজন্ত সমগ্র এশিয়াকে ভারতের ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানক্ষেত্র করিতে হইবে। সংস্কৃতভাষা, দেবনাগরী অক্ষর এবং বুদ্ধমূর্তি



পিপীলিকাভূকের বাস।

অষ্ট্রেলীয়ার হংসচঞ্চু প্র্যাটিপাস্ সরীসৃপ ও শুভ্রপায়ী জীবের—টিকটিকি ও ছুঁচোর—মধ্যবর্তী। ইহারা জলে ও স্থলে উভয়ত্রই বিচরণ করে। নদীর ধারে পাড়ের গায়ে হুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া ছুঁচোর বাসার মতন ইহারাও বাসা করে এবং সেই বাসায় মাদী হংসচঞ্চু নরম তলতলে দুটি ডিম পাড়ে। ইহাদের বাসায় যাইবার হুড়ঙ্গের একটা মুখ জলের তলায় থাকে এবং আরেকটা মুখ ডাঙার দিকে থাকে।

আমেরিকার জাগুয়ার নামক বাঘ অধিকাংশ সময় গাছেই বাস করে। আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলীয়ার নানা প্রকারের পিপীলিকাভুক্ হয় গাছে নয় মাটির মধ্যে হুড়ঙ্গ কাটিয়া বড় একটা গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে।

চাক্র।

তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর

(শ্রীএকাই কাণ্ডটি কর্তৃক বিবৃত)

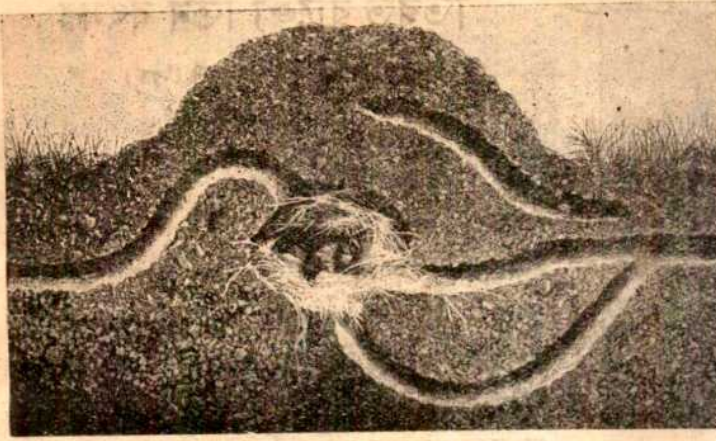
পঞ্চম অধ্যায়।

নেপালযাত্রা

দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আগমনের পর জীব বাহাদুর নামে তদানীন্তন নেপাল-সরকারের কলিকাতার প্রধান কর্মচারীর সহিত আমার সৌভাগ্যক্রমে পরিচয় হইল। এই ব্যক্তি এখন লাসায় নেপালরাজ্যের মুখপাত্ররূপে বাস করিতেছেন। আমি এই নেপালীরাজপুরুষের নিকট হইতে নেপালের দুই পদস্থ ব্যক্তির নিকট পরিচয়-পত্র গ্রহণ করিয়া নেপাল যাত্রা করিলাম।

১৮৯৯শালের ২০এ জানুয়ারী আমি বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলাম। ভগবান শাক্যমুনি বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিমাথা পরম তীর্থ এই। কি আশ্চর্য্য সৌভাগ্যক্রমে সিংহলবাসী শ্রীযুক্ত ধর্মপালের সহিত আমার এখানে সাক্ষাৎ হয়। ইহার সহিত আমার অনেক প্রীতিকর আলাপ হইল। আমি তিব্বত যাইতেছি শুনিয়া দলাই লামার জ্ঞা কিছু উপহার আমার সঙ্গে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার উপহার—রৌপ্যময় ক্ষুদ্র মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের ক্ষুদ্র মূর্তি এবং তালপত্রে লিখিত একখানি বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক। আমি আনন্দের সহিত আমার সিংহলবাসী বন্ধুর উপহার দলাই লামার জ্ঞা লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ধর্মপাল তিব্বত-ভ্রমণের একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “লাসা দর্শন করিবার অত্যন্ত অভিলাষ আছে বটে, কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে যাইতে পারি না।”

বুদ্ধগয়ায় প্রথম রাত্রি আমি বোধি-বৃক্ষতলে ধ্যানে কাটাইলাম। সেদিন আমার হৃদয়ের ভাব অবর্ণনীয়। এই বৃক্ষতলেই না ভগবান বুদ্ধ আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই দিন রজনীতে প্রকৃতির কি প্রশান্ত, কি মনোরম দৃশ্যই না দেখিলাম। বোধি-বৃক্ষের উপর যখন চন্দ্রোদয় হইল তখন আমার প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। আমার হৃদয়ে ভগবান বুদ্ধ জাগ্রত হইলেন, আমি তখন তাঁর উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করিলাম। বুদ্ধগয়ায় দুই এক দিন বাস করিয়া রেলযোগে নেপাল



ছুঁচোর বাসার স্বড়ঙ্গ পথ।

বানর জঙ্গলের মধ্যে খুব বড় বড় উঁচু গাছের মধ্যে ছোট গাছ বাছিয়া তাহার উপর ডালপালা দিয়া মঞ্চের মতন বাসা নির্মাণ করে। ইহাদের বাসার গাছ প্রতিবেশী গাছেদের তুলনায় ছোট হইলেও ইহাদের বাসা মাটি হইতে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ ফুট উচুতে হয়। বড় গাছের ঘেরার মধ্যে ছোট গাছ বাছিয়া বাসা তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্য এই যে ঝড়-বাতাসের ঝাপট বড় গাছের উপর দিয়াই যাইবে, তাহাদের বাসার কোনো ক্ষতি হইবে না। এক-এক গাছে দুই-তিন বানরদম্পতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসানির্মাণ করিয়া রাজ্যধাপন করে। এই বাসা তাহাদের ঘুমাইবার ঘর এবং স্মৃতিকাগারও বটে।

এইরূপে ইঁদুরজাতীয় ও অগ্ন্যন্ত স্তম্ভপায়ী জন্তুরাও বাসানির্মাণ করিয়া থাকে। ছুঁচো মাটির মধ্যে স্বড়ঙ্গ কাটিয়া সেই স্বড়ঙ্গের মধ্যস্থলে একটা বড় গর্ত করে এবং তাহাতে খড় কুটা বিছাইয়া বাসা নির্মাণ করে। ছুঁচো গর্তের মধ্যেই সারা জীবন কাটায়। কদাচ বাহির হইয়া পড়িলে গর্তে ঢুকিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে।

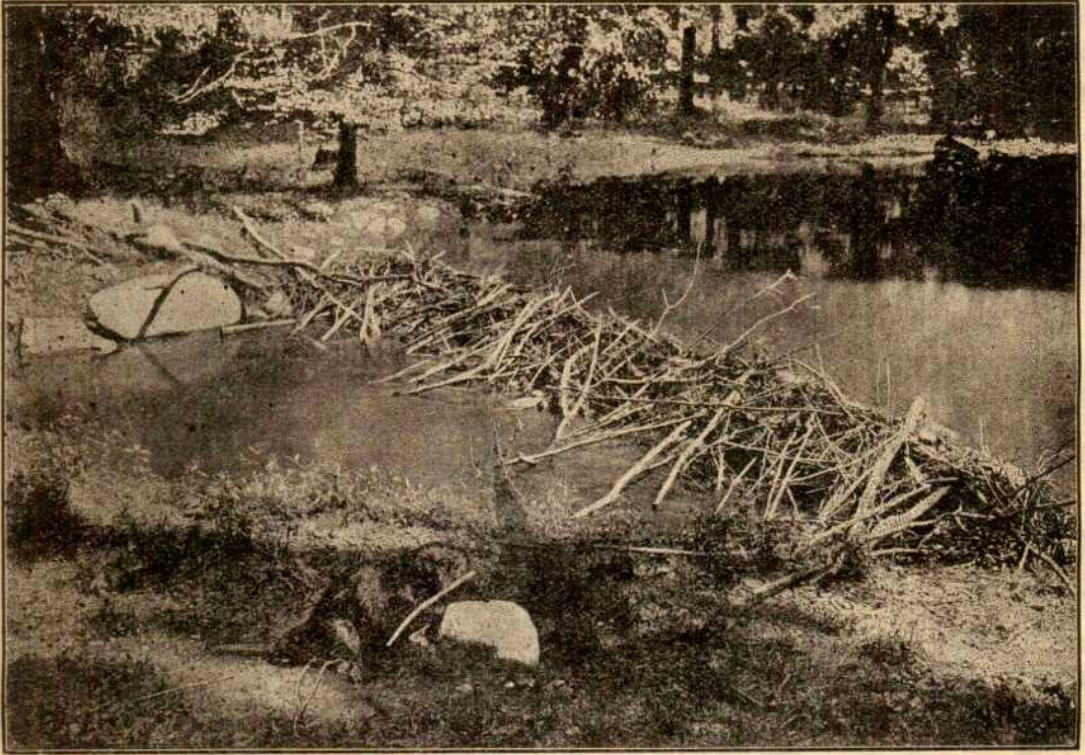
বীবর ইঁদুরজাতীয় প্রাণী। ইহারা জলা জায়গায় বাস করে। জলা জায়গার অগভীর এক অংশ আপনাদের বাসস্থান স্থির করিয়া অগ্ন্যন্তের বানের জল যাহাতে সেদিকে না আসে সেজন্ত খুব লম্বা ও উঁচু একটা বাঁধ দিয়া তাহারা নিজেদের বাসা রক্ষা করে। এই বাঁধ কাঠ, পাথর, ডালপালা ও মাটি সাজাইয়া তৈয়ারী হয় এবং লম্বায়

পাঁচ-সাত'শ ফুট পর্য্যন্ত, উচ্চে বার-তের ফুট এবং তলায় কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত চওড়া হয়। এই বাঁধ জল হইতে ক্রমশ ঢাল হইয়া উঠিয়া মাথায় হাত দুই পরিসর থাকে। কখনো কখনো এক মাইল লম্বা বাঁধও দেখা যায়। এইরূপে বাঁধ দিয়া তাহারা একটা ছোট পুকুরের মতন করে এবং সেই পুকুর ক্রমশ মজিয়া গিয়া পানা শেওলায় ভরিয়া উঠিলে তাহার উপর কাঠ পাতিয়া মাটি লেপিয়া ভেলা গড়ে ও তাহার উপর কুঁড়েঘরের মতন বাসানির্মাণ করে। তারপর



হংসচকু প্লাটিপাসের বাসা ও স্বড়ঙ্গ পথ।

তাহার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়া গোড়া কাটিয়া একটা বড় লম্বা গাছ এমন করিয়া তাহার বাসার সামনে ফেলে যে তাহা তাহার কুঁড়েঘরের দরজার আগড়ের কাজ করে এবং বাসা হইতে ডাঙায় বা বাঁধে যাইবার সাঁকোর কাজও করে।



বীবরের জাঙাল ও বাসা।

ফললের পাতা স্বকোশলে বুনিয়া স্বদৃশ্য গোল গোল বাসা তৈয়ারী করে। এই বাসার বুনন এমন ঘন পোক্ত হয় যে ইহা পাড়িয়া বলের ত্রায় গড়াইয়া দিলেও তাহা খুলিয়া বা ভাঙিয়া যায় না এবং তাহার মধ্যকার বাচ্চাদের গায়ে একটুও চোট লাগে না। এই বাসার মুখ এমন স্বকোশলে ঢাকা থাকে যে সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

মেঠো ইঁহুরের বাসার মতন সুন্দর বাসা গড়ে ম্যাডাকাস্কার দ্বীপের লেমুর ইঁহুর। লেমুর বানরের জাতি। লেমুর ইঁহুর, ইঁহুর ও বানরের মধ্যবর্তী জাতি। ইহারা খুব লম্বা গাছের আগভালে পাখীর বাসার মতন বাসা কাঠি ও পাতা দিয়া বুনিয়া প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে পশুর লোম বিছাইয়া দায়। এই বাসায় ধাড়ীর প্রাণের সময় বিশ্রাম করে এবং সন্তান পালনও করে।

কাঠবিড়ালী পাতা, শেয়ালা এবং গাছের আঁশ দিয়া বুনিয়া হয় দু-ফিরকি ডালের উপর নয় গাছের কোটরে বাসা তৈয়ারী করে। ফিরকি ডালের উপর বাসা করিলে তাহা

আশপাশের জিনিষের সঙ্গে এমন ভাবে মিলাইয়া করে যে কোথায় তাহার বাসা আছে তাহা সহজে ধরিতে পারা যায় না। জুন মাসে সেই বাসায় কাঠবিড়ালী তিন-চারটি বাচ্চা প্রসব করে; তাহাদের গায়ে তখনও লোম থাকে না, চোখও ফোটে না।

ডরমাউস বা নিড্রালু ইঁহুর সারা শীতকালটা ঘুমাইয়া কাটায়। এই সুদীর্ঘ বিশ্রামের সময় ঘাপন করিবার জন্ত ও নিড্রালু সন্তানপ্রসবের জন্ত তাহারা কাঠি পাতা শেয়ালা ও ঘাস বুনিয়া গোল গোল বাসা তৈয়ারী করে এবং তাহার মধ্যে বিশ্রামকালের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। দুধা-ভেড়ার মতন তাহারা লেজে চর্কি জমাইয়া রাখে, খাদ্যের অভাব হইলে উপবাসের সময় সেই জমা চর্কি খরচ করিয়া দেহের পুষ্টি করে। ইহাদের বাসা দু-রকমের হয়—এক, মাটির উপর; দ্বিতীয়, মাটি হইতে দু-তিন হাত উঁচুতে গাছের গায়ে।

সুমাত্রা ও বর্বিয়ো দ্বীপের লাল বানর এবং ওরাংওটাং

চারপেয়ের বাসা।

আমরা পাখীদিগকে বাসানিৰ্মাণ করিয়া সন্তানপালন করিতে দেখিয়া এমনি অভিযুত যে, অনেক স্তম্ভ-পায়ী চারপেয়ে জীবও যে বাসানিৰ্মাণ করিয়া থাকে তাহার সন্ধান লইতে আমরা ভুলিয়া যাই। শেয়াল, বেজী, খরগোস, ছুঁচো, ইঁদুর প্রভৃতি যেসব জন্তু গর্তের মধ্যে থাকে তাহার গর্তের তলায় খড়কুটা দিয়া বাসানিৰ্মাণ করিয়া তাহার উপর সন্তানপালন করে।

এই-সমস্ত বাসা স্থায়ী রকমের, পাখীদের ছায় কেবল মাত্র প্রজননের সময় নিৰ্ম্মিত সাময়িক বাসা নয়। কাঠবিড়ালী ও মেঠো ইঁদুর প্রজননের সময় গাছের উপর বা ক্ষেতে শস্তের গাছে সন্তান পালনের জন্ত সাময়িক বাসা বাঁধে।



ওরাংওটাং বানরের বাসা।

কাণ্ডারু অপুষ্ট অবস্থায় প্রস্তুত শাবক ও অষ্ট্রেলিয়ার পিপীলিকাহুক্ ডিম পালন করিবার জন্ত আলাদা বাসা নিৰ্মাণ করে না বটে, কিন্তু উভয় জন্তুরই মাদীদের পেটে এক-একটি যে খলি থাকে তাহাই তাহাদের সন্তান বা ডিম্বপালনের বাসার কাজ করে।

মেঠো ইঁদুর মাঠ ছাড়িয়া কখনও লোকালয়ে যায় না। ফসলের সময় তাহাদের সন্তানপ্রসবের কাল। ক্ষেতে ফসলের গাছ বড় হইয়া উঠিলে তাহার ডাঁটার গায়ে



মেঠো ইঁদুরের বাসা।

২১০ সালে স্ব-হাও সম্রাট সকল চীনা প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন। তিনি ভিন্নভিন্ন কেন্দ্রের প্রাচীরগুলি যথারীতি সংস্কৃত ও বর্ধিত করিয়া এক বিরাট প্রাচীর সৃষ্টি করেন। এইজন্ত সাধারণভাবে চীন সাম্রাজ্যের ঐক্যস্থাপনিতাকে বিরাট প্রাচীরের প্রবর্তক বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনি পূর্ববর্তী নরপতিদিগের আরম্ভকার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। পূর্বের সান-হাই-কোয়ানের নিকট প্রাচীর পীতঙ্গাগরে মিশিয়াছে—পশ্চিমে মঙ্গোলিয়ার শেষসীমা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। মোটের উপর ২৫০০ মাইল প্রাচীরের দৈর্ঘ্য। সমস্ত চীন দেশটা যেন একখানা প্রাসাদ—সম্রাটের নিজ সম্পত্তি; তাহার এক দিককার বেড়াই এত লম্বা। প্রাচীন কালের রাষ্ট্রশাসন এইরূপ পারিবারিক বা ব্যক্তিগত নীতি অনুসারেই পরিচালিত হইত।

পঁচিশ শত মাইলের সর্বত্রই পর্বত নাই, কাজেই প্রাচীর বহুস্থানেই সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। সকল কেন্দ্রের অংশই সুগঠিত বা সুরক্ষিত ছিল এরূপ বলা যায় না। তবে গ্রান-কাও পাসের সমীপবর্তী অংশ সকল দিক হইতেই গৌরবজনক। যথাকালে দেশরক্ষার জন্ত এখানে দুর্গের কার্য্য যেরূপ হইত আজ দেখিবার জিনিস হিসাবেও এখানে সেইরূপ যথেষ্ট আকর্ষণ আছে।

কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতেছি—এত বড় দেওয়াল প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা ছিল কি? দেওয়াল প্রস্তুত করিতে এবং রক্ষা করিতে যত খরচ পড়িয়াছিল তাহাতে কতগুলি সূদূত দুর্গ নিশ্চিত হইতে পারিত না কি? অধিকন্তু সেনাবিভাগকে সুশিক্ষিত করা যাইত না কি? অথচ এই প্রাচীরের দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত দেশ রক্ষা হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগল কুবলা খাঁ চীনসাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে মাণ্ডুরাজ চীনের সম্রাট হইলেন। ইহারা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যখন চীনে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন কেহই তাঁহাদিগের পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

বিরাট প্রাচীর একটা বিরাট পাগলামির সাক্ষ্যস্বরূপ আজ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীনতম কালের কোন সময়ে হয়ত ইহার সার্থকতা ছিল। কিন্তু অল্পকালের ভিতরেই

উহা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য বিংশ শতাব্দীতে ইহার কোন মূল্যই নাই। বরং ইহা দেখিয়া হাঙ্গ সংবরণ করাই কঠিন। বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল Great Wall বা মহাপ্রাচীরই কালে হাঙ্গান্দ হইয়া পড়ে। আজকাল ইয়াক্সিরা যখন Monroe Doctrine মনরো-নীতির দোহাই দিয়া ইয়োয়োপীয় রাষ্ট্র-পুঞ্জকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বহির্ভূত করিতে চাহে তখন দুনিয়ার লোক হাস্য সংবরণ করিতে পারে কি? অথচ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ইয়াক্সিদের এই বহিষ্কার-নীতি বা “মহাপ্রাচীর” দুনিয়ায় যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল। প্রাচীর, বন্ধন, আবেষ্টন, নিয়ম, স্বত্ব, শাস্ত্র, রীতি, নীতি ইত্যাদি যাহাই দেখি না কেন—কোন জিনিষই চিরকালের জন্ত নয়। যথাসময়ে ইহাদের মূল্য ফুরাইয়া আসে, তখন এইগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, অনেক সময়ে আপনা-আপনিই ভাঙ্গে অথবা বাহির হইতে সামান্য আঘাত পাইলেই ভাঙ্গে। এইরূপে প্রাচীর-গড়া ও প্রাচীর-ভাঙ্গা মানবেতিহাসের স্তম্ভ স্বরূপ। প্রত্যেক দেশে বহুসংখ্যক “চীনা-প্রাচীর” উঠিয়াছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—আবার উঠিবে আবার ভাঙ্গিবে। হে চীনের বিরাট প্রাচীর, তোমার গড়নে ভাঙ্গনে দুনিয়াবাসী সংসারের চরমজ্ঞান লাভ করিতেছে—“আজ যাহা সং, কাল তাহা অসং হইতে পারে। আজ যাহা বিদ্যা, কাল তাহা অবিদ্যা হইতে পারে। আজ যাহা নীতি, কাল তাহা দুর্নীতি হইতে পারে। আজ যাহা ধর্ম বলিয়া পূজ্য, কাল তাহা অধর্ম জ্ঞানে বর্জনীয় বিবেচিত হইতে পারে।”

রাত্রিকালে গ্রানকাও পল্লীতে ফিরিলাম। রেলওয়ে হোটেলে বাস করা গেল। প্রায় আমাদের দেশী ডাক-বাঙ্গলার মত এই পাছনিবাস। হারিকেন লর্ডন এবং মোমবাতীর ব্যবহার বহুদিন পরে করিতে হইল। দুইজন ইয়াক্সি আজ এইখানে অতিথি—ইহারাও পর্য্যটক। একজন বারবৎসর হইতে চীনে আছেন—ক্যান্টনে খুষ্ঠান বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক—ক্যান্টন উপভাষায় কথা কহিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের কার্ণেগী ইন্সটিটিউশনের ভূগোল-বিভাগ হইতে ইনি চীনের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।



চীনের উষ্ট্রযান।

Great Wall-এর সমীপবর্তী গিরিভূর্গে দেখিতে পাইব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

অবশেষে মহাপ্রাচীরের পাদদেশে পৌঁছলাম। মুকুডেন হইতে পিকিং আসিবার কালে সান্-হাই-কোয়ান ষ্টেশনে বিরাট প্রাচীর ভাঙ্গিয়া রেলপথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখানেও প্রাচীর-ভাঙ্গের পরিচয় পাইলাম। ষ্টেশন হইতে মাইলখানেক পদব্রজে যাইয়া একটা ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া গেল। ফটকটা দেখিতে দুর্গের প্রবেশ-পথের মত। ফটক পার হইয়া মঙ্গোলিয়ার প্রান্তরে পদার্পণ করিলাম। দোভাষী বলিলেন—“আমরা যে-রেল-পথে আসিয়াছি তাহা মহাপ্রাচীরের নিম্নস্থিত স্থড়ঙ্গের সাহায্যে মঙ্গোলিয়ার প্রান্তরে গিয়া পড়িয়াছে। ঐ দেখুন অদূরে একখানা মালগাড়ী স্থড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইল।”

এইবার মহাপ্রাচীরের উপর উঠিলাম। উচ্চতা প্রায় ২৭ ফুট, প্রস্থ প্রায় ৩০ ফুট। সাধারণতঃ পার্কৃত্য সুরকির ইটে প্রাচীর নির্মিত। নিম্নভাগে কোথাও কোথাও প্রস্তর আছে। প্রাচীরের উপরিভাগে বহুসংখ্যক পর্যবেক্ষণ-গৃহ

বা প্রহরী-শালা দেখিলাম। এই সমুদয়ে সৈন্তগণ বাস করিত। প্রত্যেক মাইলে এইরূপ প্রহরী-গৃহ তিনটা করিয়া আছে।

জ্ঞানকাণ্ড পাসের নিকট ভূমি আগা-গোড়া পর্বতময়, কাজেই তরঙ্গায়িত ও সর্পগতি পর্বতশৃঙ্গের শিরোদেশে প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। প্রাচীরের প্রত্যেক অংশ হইতে গিরিভূর্গের বিভিন্ন অংশ দেখিতেছি মনে হয়। বলা বাহুল্য প্রাচীরের গঠন দুর্গ-দেওয়ালেরই অমুরূপ। সৈন্তগণ সুরক্ষিত থাকিয়া শত্রু ধ্বংস করিবার সুযোগ পায়।

চীনদেশের উত্তরে মঙ্গোলিয়া। প্রাচীনকালে মোগল-জাতি হৃদ্যন্ত ও লুণ্ঠনপ্রিয় ছিল। চীনারা বহুবার তাহাদের উৎপাত সহ্য করিয়াছে। মোগলবংশসম্বৃত চেঙ্গিজ খাঁর দৌরাণ্যে এশিয়া ও ইয়োরোপের ইতিহাসে স্মরণীয়। ইহা ত অল্পকালের কথা। কিন্তু চীনারা চেঙ্গিজ খাঁর বহু পূর্ব হইতেই মোগল উপদ্রব ভুগিয়া আসিতেছে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতেই চীনসম্রাটগণ মোগল-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত সাম্রাজ্যের উত্তরসীমায় স্থানে-স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করেন। কোন একজন রাজা বা সম্রাট সমগ্র প্রাচীর নির্মাণ করান নাই। খৃষ্টপূর্ব ২৪৬

নিম্নোক্ত ছবিগুলি কলিকাতার পল্লীতে

“কলিকাতা পল্লী”

“কলিকাতা পল্লী”



যাত্রা করিলাম। পরদিন ২৩এ জাম্হুয়ারী সিগাউলি পৌঁছিলাম। এখানে ইংরেজ রাজ্যের সীমানা, ইহার পরেই - নেপাল রাজ্যের এলাকা। এদেশে আমার তিব্বতী-ভাষাজ্ঞান কোন কাজেই লাগিবে না। আমাকে হিন্দুস্থানী বা পার্শ্বতীয় ভাষায় কথা না বলিলে আর চলিবে না, তা আমি এই দুই ভাষাই জানি না। মনে ভাবিলাম সিগাউলিতে কয়েক দিন বাস করিয়া দুই চারটি প্রয়োজনীয় পার্শ্বতীয় কথা শিখিয়া লইব। আমার সৌভাগ্যবশতঃ দেখি যে সিগাউলির বাঙ্গালী পোষ্ট-মাষ্টারটি চমৎকার পার্শ্বতীয় জানেন। ইংরেজিও তাঁর বেশ জানা ছিল। আমি কাগজ পেনসিল লইয়া প্রয়োজনীয় সমুদায় কথার পার্শ্বতীয় প্রতিশব্দ লিখিয়া লইতে লাগিলাম। পরদিন প্রাতে আমার নোটবুক লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি,—এমন সময় দেখিলাম রেল হইতে তিনজন তিব্বতী ভদ্রলোক অবতরণ করিলেন। একজনের বয়স ৪০ বৎসর হইবে, দ্বিতীয়টি বৌদ্ধ পুরোহিত, অল্পমান ৫০ বৎসর বয়স হইবে, তৃতীয়টি তাঁহাদের ক্ষুদ্র বয়সী বোধ হইল। ইহাদের দেখিয়াই আমার মনে হইল, যে, আমি যদি এই তিব্বতী ভদ্র-লোকটির সহিত নেপালে যাইতে পারি তবে বড় চমৎকার হয়। সাহসে ভর করিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে গেলাম। শুনিলাম সম্প্রতি তাঁরা তিব্বত হইতে আসিয়াছেন, এবং এখন নেপাল যাইতেছেন। ভদ্রলোকটি তিব্বতবাসী। এইবারে - তাঁরা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কোন দেশের লোক জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম “আমি চীনদেশবাসী।” তখন প্রশ্ন হইল “তুমি চীন হইতে কোন্ পথে আসিয়াছ, জলপথে না স্থলপথে?” এইবারে আমায় ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিতে হইল। আমি সেই সময় শুনিয়াছিলাম আজও জলপথে আসিলে কোন চীনাকে তিব্বতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। অতএব বলিলাম “স্থলপথে।” তার পর প্রশ্ন হইল, “তুমি চীনের কোন্ অংশের লোক?” আমি বলিলাম “ফুসী।” “তুমি নিশ্চয়ই চীনে ভাষায় কথা বলিতে পার।” ‘না’ বলি কোন মুখে? ‘হাঁ’ বলিলাম বটে, কিন্তু পাছে ধরা পড়ি এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

ভদ্রলোকটি তখন গড়গড় করিয়া চীনে ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন। কি বিপদেই পড়িলাম! তাঁহার কথা এক অক্ষরও বুঝিলাম না, বলিলাম “মহাশয় পিকিংএর শুদ্ধভাষায় কথা বলিতেছেন, আমি পাড়ার্গেসে কথা জানি, শুদ্ধভাষা ভাল বুঝিতে পারি না।” তখন প্রশ্ন হইল “চীনে ভাষা লিখিতে পার কি?” কি ভাগ্যে লিখিতে এমত পারি! তাঁহার আজ্ঞাক্রমে চীনে ভাষায় বিদ্যা প্রকাশ করিলাম। অধিকাংশ তাহার অবোধ, তিনি দুই একটি কথা বুঝিলেন। অতঃপর আমার ভাষা পরীক্ষা স্থগিত হইল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভদ্রলোকটি তিব্বতী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি বলিলে স্থলপথে চীন হইতে আসিয়াছ, কোন্ পথে আসিয়াছ বল ত।” “লাসার পথে মশাই। দারজিলিং হইয়া বুদ্ধগয়ায় তীর্থ করিয়া এখন নেপাল রাজ্যে যাইতেছি।” আমার এখনও অব্যাহতি নাই—আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “লাসায় তুমি ছিলে কোথায়?” আমি বলিলাম “সেরা বিহারে।” সেখানকার প্রধান পুরোহিতকে জানি কিনা জিজ্ঞাসা করাতে আমি “জানি” বলিয়া উত্তর দিলাম। দারজিলিংএ সবদুঃ লামার নিকট লাসার বিষয় যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার পরিচয় কিছু কিছু দিলাম। আমার মুখে লাসার ভিতর-কার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটির আর সংশয় রহিল না যে আমি লাসায় যাই নাই। তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি নেপালে কাহার নিকট যাইতেছ, পূর্বে কখন গিয়াছিলে কি না?” আমি বলিলাম “নেপালে এই আমার প্রথম আগমন, আমি জীব বাহাহুরের নিকট হইতে নেপালের মহা বৌদ্ধের পুরোহিতের নিকট পরিচয়-পত্র লইয়া যাইতেছি।” তিনি বৌদ্ধের প্রধান পুরোহিতের নাম শুনিয়াই উৎকর্ষ হইলেন, বলিলেন “জীব বাহাহুর আমাব বিশেষ বন্ধু। কার নিকট পরিচয়-পত্র লইয়া যাইতেছেন নাম শুনিতে পারি কি?” আমি তাড়াতাড়ি পরিচয়-পত্রখানি বাহির করিলাম। তিনি দেখিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন “কি আশ্চর্য! এ যে আমার নামেই!” আমার বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা রহিল না। ‘কি সৌভাগ্য! যার নিকটে যাইতেছিলাম তিনি আমার অগ্রেই উপস্থিত! তখন হইতে সেই ভদ্রলোকটির আশ্রিত ও সঙ্গী হইলাম। তিনি

পরদিনই পদব্রজে নেপাল যাত্রার প্রস্তাব করিলেন, বলিলেন “অশ্বারোহণে যাইবার প্রয়োজন নাই, দুইজনে পদব্রজে প্রকৃতিব শোভা দেখিতে দেখিতে ও সদালাপ করিতে করিতে স্নেহে চলিয়া যাইব। আমি ‘তথাস্তু’ বলিয়া বাজি হইলাম। আমবা কথাবার্তা বলিতেছি এমন সময় দুইজন ভৃত্য হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল তাঁহাদের সমুদায় জিনিষপত্র চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পান্থনিবাসে গিয়া দেখিলাম ভ্রলোকটিব ৩৫০ টাকা, কাপড় বই প্রভৃতি চুরি গিয়াছে। আমিও সেই পান্থশালায় ছিলাম, কিন্তু আমার কিছু চোরে লয় নাই। আমার নবপরিচিত বন্ধুব নাম বুদ্ধবজ্র, সঙ্ঘের পুরোহিতটির নাম মাযার, তিনি লাসার ডিবন বিহারের তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক। ২৫এ জাহুয়ারি আমরা উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া পরদিন নেপাল সীমানার বীবগঞ্জে পৌঁছিলাম। সেখানে “ভীষতবাসী চীনা” বলিয়া রাহাদানি পাইলাম। সেখান হইতে বিস্তীর্ণ দলাই জঙ্গল পার হইয়া ২৮এ তারিখে বিছাঘরিতে পৌঁছিলাম। সেখানেই রাজিবাস করিলাম। রাজি ১০টার সময় যখন আমি যথারীতি দৈনিক পুস্তক লিখিতেছি এমন সময় নৈশ নিস্তব্ধতা ও প্রকৃতির অপার শাস্তি ভঙ্গ করিয়া এক ভীষণ গর্জনে ক্ষত হইল। সেই গর্জনে যেন আমাদের গৃহখানি কাঁপিয়া উঠিল। আমি গৃহের জানালা হইতে মুখ বাড়াইবা দেখি, এক প্রকাণ্ড বাঘ উদর তৃপ্তি করিয়া জল পান করিতে আসিয়া মনের আনন্দে গর্জনে করিতেছে। বিছাঘরি হইতে দুইদিন ক্রমাগত নদীর তীর বাহিয়া চলিলাম। তৃতীয় দিনে দেখি আমাদের সম্মুখে ভূগুন্ড-বিহীন এক উচ্চ পর্বত দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। সে বড় কঠিন পথ। ৩৯ মাইল ক্রমাগত উঠিয়া “বিসাপনিগড়িতে” পৌঁছিলাম। এখানে নেপাল রাজ্যের গড়। এখানে বিস্তর সিপাহীর সমাগম দেখিলাম। বিসাপনিগড়ির শিখর দেশে দাঁড়াইয়া হিমালয়ের হিমাদ্রীমণ্ডিত শিখরমালা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। এ যে কি মহান দৃশ্য তাহা আর বলিবার নয়। আমি দারজিলিং এবং টাইগার হিল হইতে চির তুষার-মণ্ডিত অনন্তহিমাদ্রী দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা আজ এই

মহান দৃশ্যের তুলনায়, স্বপ্নে দৃষ্ট ছবির ত্রায় মান আকার ধারণ করিল। যুগযুগের সঞ্চিত তুষারভার মস্তকে করিয়া হিমালয় আজ আমার নিকট কি অপূর্বভাবে দেখা দিল! এত্নতি আমার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইবার নয়। গাড়ি হইতে ক্রমে মকু উপত্যকায় নামিলাম। সেখানে রাজিবাস করা গেল। ১লা ফেব্রুয়ারি প্রাতে “চন্দ্রগিরি” উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দেখি চন্দ্রগিরির পার্শ্বদেশ হইয়া অপর্ধ্যাপ্ত “রোডোডেনড্রন” ফুল ফুটিয়া আছে। চন্দ্রগিরির শিখর হইতে আবার মহান হিমালয়ের শুভ্রতুষার-কিরীটের দর্শন পাইলাম। শিখর হইতে নামিবার পথে সহসা বিচিত্র চিত্রপটের ত্রায় কাটমণ্ডুর উপত্যকা নয়নগোচর হইল। বিস্তীর্ণ উপত্যকা হইতে দুইটি মন্দির মণ্ডক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আমার বন্ধু বলিলেন, একটি কাশ্যপবুদ্ধ ও একটি শিখী বুদ্ধের স্মরণার্থ পবিত্র মন্দির।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দীনদরিজের সহায়তায়।

কাটমণ্ডুর কাশ্যপ মন্দিরের আশে-পাশের গ্রামখানিকে ‘বৌধ’ বলে। লামা বুদ্ধবজ্র এই গ্রামখানির প্রধান পুরুষ এবং ঐ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

প্রাত্যেক বৎসরে, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে তিব্বত, মঙ্গোলীয়া, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে বিস্তর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। গ্রীষ্মকালে “গিরিবজ্র” গুলিতে ম্যালেরিয়ার ভয়ে এই সময়ে সকলে আসিয়া থাকে। এই যাত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশই তিব্বত-বাসী। তন্মধ্যে ধনীর সংখ্যা অত্যন্ত কম, অধিকাংশ লোক অতিশয় দরিদ্র। তাহারা সমুদায় শীতকালটা ঘাষাবরের ত্রায় পথে ঘাটে থাকিয়া কোন প্রকারে দিন কাটায়। শীতের পর দেশে ফিরিয়া যায়।

তিব্বতরাজ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যেই আমার নেপালে আগমন। নেপাল হইতে তিব্বত যাইবার বিস্তর ছোট বড় পথ আছে। কিন্তু আমার গুপ্ত অভিসন্ধির কথা কাহাকেও বলিতে পারি না, এমন কি আমার সদয় বন্ধু লামা বুদ্ধবজ্রকেও কিছু বলিতে পারি নাই। তিনি আমাকে চীনে বলিয়াই জানিতেন এবং প্রশস্ত পথে তিব্বত

দিয়া চীনে যাত্রা করিব এই তিনি জানেন। গুপ্ত পথে তিব্বত রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে এই আমার অভিসন্ধি। আমার অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করিবার স্বযোগ নিয়ত অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে-সকল দরিদ্রযাত্রী নেপাল হইতে তিব্বত যায়, তাহারাও প্রধান প্রধান গিরিপথগুলি দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না, কারণ বিস্তর উৎকোচ না দিলে, এ-সকল পথে রাহাদানি মিলে না। দরিদ্ররা কখনই ওসব পথে যায় না। আমার অল্পমান ঠিক হইল। তখন ভাবিলাম এই-সকল দরিদ্র লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পথের সংবাদ ভাল করিয়া লইতে হইবে। অতএব দুই হস্তে “বৌদ্ধ” মন্দিরের দরিদ্র-দিগকে দান করিতে লাগিলাম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা আমার ভক্ত হইল। তখন অবলীলাক্রমে তাহাদের নিকট হইতে পথের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অনেক চিন্তার পর, মানস সরোবরের নিকট দিয়া তিব্বতে যাইব মনস্থ করিলাম। এ পথটি কিছু দীর্ঘ। কাটমণ্ডু হইতে পশ্চিমে “লো” নামক প্রদেশ দিয়া যাইতে হয়। এই পথেই যাত্রা করিব স্থির করিলাম। কিন্তু সহজ পথ থাকিতে এ দুর্লভ পথ দিয়া যাত্রার কথা শুনিলে লোকে আমায় সন্দেহ করিবে। অতএব একটা শুভর চাই। আমি লামা বুদ্ধবজ্রকে বলিলাম যে “বৌদ্ধ শাস্ত্রে মানস সরোবরের তীরে কৈলাশ পর্বতের বিস্তব বর্ণনা আছে। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থ। এতদূর আসিয়া একবার এই পবিত্র স্থান দর্শন না করিলে ক্ষোভের সীমা থাকিবে না, অতএব আমি মানস সরোবর হইয়া তিব্বত যাইব।” লামা বুদ্ধবজ্র আমার কথা শুনিয়া অনেক নিষেধ করিলেন, বলিলেন “পথ যেমন খারাপ, তেমনই দহ্যপরিপূর্ণ। তুমি যদি যাও মৃত্যু নিশ্চিত।” আমি বলিলাম “জন্মিলেই মৃত্যু, তীর্থে যদি মৃত্যু হয়, তার চেয়ে বৌদ্ধ লামার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?” আমাকে দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া তিনি আমার যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। “খাম” নামক অঞ্চলেব তিনজন যাত্রী সঙ্গী পাইলাম। তন্মধ্যে একজন ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ। তাহারা আমার জিনিষপত্র বহিয়া লইয়া যাইবে এই স্থির হইল। খামের লোকেরা বিখ্যাত ডাকাত। টুকজি পর্য্যন্ত একজন সঙ্গী পাইলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

তুঙ্গ হিমালয়।

১৮৯৯ সালের মার্চ মাসের এক সপ্তাহান্তে তিনজন পুরুষ ও এক বৃদ্ধার সঙ্গে আমাব বন্ধু-প্রদত্ত তুবার-শুভ্র এক অশ্বে আরোহণ করিয়া কাশ্মপ বৃদ্ধের মন্দির হইতে বিদায় লইলাম। সেদিন আমার শরীর ভাল ছিল না, তৎপূর্ব্ব দিন জ্বর হওয়াতে শরীরটা বড়ই দুর্ব্বল ছিল; কিন্তু আর ত আমি নিশ্চিত মনে কাটমণ্ডুতে বাস করিতে পারি না। কোন দিন বা আমি জাপানী বলিয়া ধরা পড়ি এবং আমার তিব্বত যাত্রা স্থগিত হয়! কাটমণ্ডু হইতে উত্তরপশ্চিম-মুখে বাহির হইয়া ইংরেজ রেসিডেন্সির মধ্য দিয়া নাগার্জুন পর্ব্বত পার হইয়া সন্ধ্যার সময় “জিতলী পিড়ি” নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সে রাজি এক মুদীর কুটীরের ধারে রাজিবাস করিলাম। নেপালের বর্ত্তমান অধিপতি পরম হিন্দু, স্বতরাং নেপাল রাজ্যে জাতিভেদের প্রকোপ মন্দ নহে, স্বতরাং আমি সহজে কোথাও আশ্রয় পাই নাই। পর্ব্বত-শুভ্রায়, বনে জঙ্গলে, গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে অধিকাংশ সময় রাজি বাপন করিতে হইয়াছে। এইবারে আমি হিমালয়ের যে নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিলাম সেখানে আমার পূর্ব্ব নিশ্চয়ই কোন বিদেশী পদার্পণ করে নাই। স্বতরাং এদেশের দু এক কথা বলিলে সকলেরই ভাল লাগিবে।

কাটমণ্ডু হইতে যাত্রার তৃতীয় দিবসে প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিশূল গণ্ডকীর (কিরং নদীর) পশ্চিম পারে চুঙ্গি নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সহরটি ক্ষুদ্র এবং বাণিজ্যের কেন্দ্র। সহরের উত্তরে একটি স্থন্দের নির্জন বনের মধ্যে পার্কত্য নদীর কুলকুল ধ্বনি শুনিতে শুনিতে নিদ্রার শাস্তিময় জোড়ে বিশ্রাম-স্থ উপভোগ করিলাম। পরদিন উষাকালে উত্তর-পশ্চিমে “পোথরা” অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এ স্থান হইতে তিব্বত সীমান্তে “কিরং” পাঁচ দিনের পথ। কিন্তু সে পথে কঠিন প্রহার ব্যবস্থা আছে, স্বতরাং এ পথে আমার যাত্রা করা হইবে না। আবার তিন দিনে ৪০ মাইল পথ ভাঙ্গিয়া “বারেং বারেং” ও “সারেং” গ্রাম পার হইয়া “আপ্ত নদী” উত্তীর্ণ হইয়া “আলগাটা” নামক প্রসিদ্ধ স্থানে পৌঁছিলাম। এ স্থান

তিব্বতেব সহিত বাণিজ্যের কেন্দ্র। বুড়ী গঙ্গা বা বুড়ী গঙকীর পশ্চিম তীরে এই সহর। লোহার ঝুলান সেতু পাব হইয়া এখানে পৌঁছিলাম। সেখানে প্রায় ৫০ জন তিব্বতীকে দেখিলাম। “আলগাটু” পার হইয়া ২ দিন ক্রমাগত পাহাড়ের পর পাহাড়, উপত্যকার পর উপত্যকা, কত বিস্তীর্ণ বন, কত পার্বত্য নিব্বরিণী, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম পার হইয়া পোখরায় পৌঁছিলাম। জাপানের উদ্যান-বাটিকাপূর্ণ সহরের গ্রাম পোখরার মনোহর শোভা দেখিলাম। পোখরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। শ্রামল স্তম্ভ উপত্যকা, পুষ্পাচ্ছাদিত পর্বতগাত্র পার্বত্য নিব্বরিণীর কলনাদে মুগ্ধিত। পোখরার নগরী যেন একখানি প্রকৃতির স্বচিত্র চিত্রপট। হিমালয়ের বিবিধ প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু “পোখরা”র গ্রাম স্তম্ভর দৃশ্য কোথায়ও দেখি নাই। পোখরা আর-এক কারণে সমধিক প্রসিদ্ধ, এত সুলভ দ্রব্যের সম্ভার কোথায়ও দেখি নাই। পোখরায় ৬ দিন বাস করিয়া ২৫ টাকা দিয়া একটি তাঁবু প্রাপ্ত করিয়া লইলাম।

পোখরা ছাড়িয়া ঠিক উত্তর মুখে যাত্রা করিয়া উচ্চ পর্বতশিখরের সম্মুখীন হইলাম। এই পর্বতমালা এমন খাড়া যে অশ্বপৃষ্ঠে গমন স্থানে স্থানে দুঃসাধ্য হইল। সঙ্গী পর্বতগাত্র দিয়া অন্তরমনস্কভাবে যাইতেছি, হঠাৎ একটা গাছের ডালে আমার গলা আটকাইয়া আমাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ধরাশায়ী করিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার অশ্বটি তৎক্ষণাৎ থামিয়া পড়িল, আমি ঘোড়ার লগাম ছাড়ি নাই। সে যাত্রা ভীষণ মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলাম। লাগামটি হাত হইতে খুলিয়া গেলেই আমি এত ছুট নিম্নে পড়িয়া প্রাণ হারাইতাম। আমি পড়িয়া গিয়া এমন প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলাম যে মাটি হইতে উঠিতে চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিলাম না, অশ্বপৃষ্ঠে উঠা আমার আর সাধ্য হইল না। আমার সঙ্গী কুলিদ্বয় পর্যায়ক্রমে আমায় পৃষ্ঠে বহন করিয়া, একমাইল উপরে পর্বতশিখরে উপস্থিত করিল। সেখানে তাঁবু গাড়িলাম। দুইদিন ক্রমাগত কর্পুরের আরক গায়ে মালিশ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। সেই পর্বতশিখরের অপর পারে প্রকৃতির নিৰ্জন রাজ্যে পদার্পণ করিলাম। সেখানকার প্রকৃতির শাস্ত গভীর নিস্তব্ধ ভাব আমার প্রাণে

মুগ্ধিত হইয়া গেল। সেই গভীর নিৰ্জনতা ভেদ করিয়া যখন কোকিলের কুঙ্কনি পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনিত হইত, তখন অপূর্ণ ভাবাবেশে প্রাণ ডুবিয়া যাইত, এবং কবিতা আমার অন্তরে জাগ্রত হইত।

শ্রীহেমলতা দেবী।

ব্রাহ্মণসাহিত্য, বেদ ও বর্ণভেদ

(Emile Senartএর ধরাশী হইতে)

যে যুগে হিন্দুধর্মের গঠন স্থিরনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই যুগের সহিত ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্যের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দুইটি প্রাচীনতম রচনা-ধারার যুগল পত্তনভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক ব্রাহ্মণিক সাহিত্য এবং তাহার নীচে বৈদিক যুগের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার;—এই শ্রেণীকৃত রচনা-সংকলনকে আমরা বিশেষরূপে “বেদ” নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

এক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য বাহিয়া বেদ পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে।

পুরাকাল হইতে, পুরোহিত সম্প্রদায়ের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা “যজুর্” মধ্যে জমাট বাঁধিয়া আছে। আমরা ইহার কতকগুলি সংগ্রহ পাইয়াছি। এই মূল-উৎস হইতেই “ধর্মশাস্ত্রের” কলস পূর্ণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া শেষ-বিশ্লেষণে দেখা যায়, উহা ন্যূনাদিক পরিমাণে প্রত্যক্ষভাবে অমুক-অমুক পুরোহিত-সম্প্রদায়ের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ। এই পারিভাষিক সাহিত্য আবার যে-সকল বিস্তৃত রচনাকে “ব্রাহ্মণ” বলা যায় সেই “ব্রাহ্মণ”ভাগের চূড়ান্ত দেশে অবস্থিত। ধর্মচিন্তাসকল যজ্ঞব্যাপারে কিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, “ব্রাহ্মণ” তাহারই পুরাতন সাক্ষী। এই গ্রন্থগুলি বড়ই অদ্ভুত; কতকগুলি ক্রিয়া-কর্ম-অনুষ্ঠানের কথা উহাতে পর-পর বদুচ্ছভাবে বর্ণিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে আবার ঠেলাঠেলি করিয়া চলিয়াছে—“নিরুক্ত”সম্বন্ধে কতকগুলি বদুচ্ছভাবে উক্তি, একটা গুহ্য রহস্য-ধারা, কতকগুলো ছেলেমানুষি ধরণের সিদ্ধান্ত, ও কতকগুলো দুঃসাহসী ভিত্তিহীন কল্পনারস্থিত আলোচনা। আমরা এক্ষণে যে

বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই উহাতে নাই। তবে ঐ সম্বন্ধে আগন্তুভাবে কখন কখন দুই একটা আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই মাত্র। কিন্তু তাহার মূল্য খুব বেশী; কেননা, মোটের উপর ইঙ্গিতগুলি বেশ স্পষ্ট রকমের।

Weber নামক একজন বড় সমাজদাবের মতে,— “এই “ব্রাহ্মণ”-যুগ হইতে জাতের গঠন পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কাল্পনিক আদর্শের ভাবে ও সংহিতার আকারে মন্থর ধর্মশাস্ত্রে, যে অবস্থা আমাদের নিকট এক্ষণে প্রকাশ পায়, তখন হইতেই সেই অবস্থা আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাই।” সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দি না থাকিলেও, যেসকল প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ও জ্ঞাতব্য বৃত্তান্তের খণ্ডাংশ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই।

উহার মধ্যে চতুর্বর্ণ নিজ নিজ বিশেষ-অধিকার-সমেত পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত তখন দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষত তখনকার ব্রাহ্মণদের অধিকার ও কর্তব্য, আধুনিককালে বর্ণিত কর্তব্য ও অধিকারের সম্পূর্ণ অমুরূপ; বংশকে বিভক্ত রাখিবে—এইরূপ উপদেশ বিধিমাতে প্রদত্ত হইয়াছে। তিন উচ্চ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ মুখ্যত এক পত্নী গ্রহণ করিবেন কিন্তু গৌণভাবে অত্র পত্নী গ্রহণে কোন বাধা নাই। দীক্ষার প্রতি নিয়ত অবহেলা প্রদর্শন করিলে, জাত হারাইতে হয়। অত্যাচ্ছ আরো অনেক দোষের দ্বারা জাতিচ্যুত হইতে হয়; তবে কি না, ধাপে ধাপে নিষ্কিষ্ট কতকগুলি প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে যাহার অমুষ্ঠানে এই চরম-দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পতিতের সহিত সর্বপ্রকার ব্যবহার নিষিদ্ধ; সর্বপ্রকার সংস্রব নিষিদ্ধ; তাহাদের হস্ত হইতে কোন খাদ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে না! পাছে তাহারা ঠুইয়া ফেলে এইজন্য সর্বদাই ভয়ে-ভয়ে থাকিতে হয়। নীচ জাতের সহিত আহার করিতে পারা যায় না। নীচ জাতের বাসন-কোসন ব্যবহার করা যায় না। ভিক্ষকের ব্যবসায় অশুচি দ্রব্যের স্পর্শ অনিবার্য বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ ভিক্ষক হইতে পারে না। সুরাপান অমুমোদিত নহে; মাংসাহার, অন্তত কোন কোন স্থলে, একেবাবই নিষিদ্ধ। বিভিন্ন পশুর চর্ম ব্যবহার নিষিদ্ধ। শাস্ত্রতঃ না হোক ব্যবহাবতঃ

মিশ্রজাতদিগের এখানে স্থান আছে,— অনেকগুলির নাম ধরিয়া সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে।

নিয়মগুলির মধ্যে একটু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও এরূপ বুঝা না যে, উহারা গঠনের পথে চলিয়াছে। আনাদের বর্তমানকালেও যখন আমরা প্রথা বা আচার-ব্যবহারকে কতকগুলি সাধারণ সূত্রে পরিণত করি, তখনও এইরূপ অনেকগুলি ব্যতিক্রমের স্থান পূর্ণক বরিয়া রাষি। এই-সকল অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতি হইতে মূল-অভিপ্রায়টি যেন আমরা বিনিমুক্ত করিয়া লই।—বিশেষ-বিশেষ স্থল-অনুসারে; বিভিন্ন ব্যাখ্যার উৎপত্তি হয়।

কতকগুলি বচনব আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে, প্রতীয়মান হইবে যে, শোণিত-মূলক বিশেষ অধিকার অপেক্ষা, জ্ঞান ও ধর্মই ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্যের মূল্যরূপে নির্দ্বারিত হইত। কিন্তু এই ভাবের অর্থ কি—তাহা আমরা অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি, এবং পরবর্তী সাহিত্যও সেই অভিজ্ঞতার অনুরূপে সাক্ষ্য দিয়া থাকে :—ইহা প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণের জ্ঞানধর্মের মাহাত্ম্যই কীর্তন করে; কেবলমাত্র জ্ঞান হইতে যে-সকল অধিকারের সৃষ্টি হয়, উহা কোন প্রকারেই তাহা বিশ্বত হইতে দেয় না। এক স্থলে, উহা অক্ষরে অক্ষরে সমর্থিত হইয়া থাকে। অজ্ঞতা বা ব্যসনানিষ্ক্রিয়তঃ অবশ্যকর্তব্য ধর্মাহুষ্ঠানে যদি কেহ অবহেলা করে, তখন সে জাতিচ্যুত হয়।

অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি খুবই যত্ন ধরণের হইলেও—উহা হইতে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকারের মূল্য খুবই কম ছিল? আজিকার দিনেও অনেক স্থলেই আমরা দেখিয়াছি ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত ও অপরাধের দণ্ড খুবই লঘু ধরণের। তা ছাড়া এ কথাটাও যেন ভাবিয়া দেখা হয়, ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এখানে সর্বত্রই কীর্তিত হইয়া থাকে, যজ্ঞাহুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ অসম্ভব-রকমের দক্ষিণা পায়, এমন কি, সেই দক্ষিণা, শত সহস্র গাভী পর্যন্ত উথিত হইয়া থাকে। অপরাধী একজন নীচ জাতের লোক হইলে, বিচার-নিষ্পত্তিকাবী ব্রাহ্মণ অমান-বদনে বলে যে, তাহার নীচ জাতিত্বই তাহাব অপবাদেব বিশিষ্ট হেতু! এই-সকল ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থকারেরা, প্রতিসংস্কারকেরা, ব্রাহ্মণের দ্বারা

এরূপ স্থবিধা করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রায়শ্চিত্ত-দণ্ড-বিধিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অপরাধী ব্রাহ্মণের দণ্ডের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই যে বিশেষ-অনুগ্রহ ইহা হইতেই সপ্রমাণ হয়, ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার কিরূপ সুরক্ষিত ছিল।

অবশ্য, যে ভূখণ্ড হইতে ধর্মশাস্ত্র বা মহাকাব্যের উৎপত্তি হয়, এই সাহিত্য সেই ভূখণ্ডেরই সাহিত্য। চতুর্বর্ণের নিয়ম-তন্ত্রটা কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার সমসাময়িক সাক্ষী অন্বেষণ করিতে গেলে, স্বেচ্ছাপূর্বক অন্ধ হইতে হয়। কিন্তু এই নিয়ম সম্বন্ধে এত অত্যাশঙ্কিত আছে, একটা রুদ্ধধারিতার দ্বারা এরূপ ওতপ্রোত যে, শুধু এই নিয়মটির মধ্যে নহে, যে-গোড়ামির আকার অধুনা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই নিয়মের পদ্ধতিটার মধ্যেও কতকগুলি মনোভাব, কতকগুলি স্বার্থ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ইহা একটা কৃত্রিমতা ধোঁবে, ভিত্তিহীন নিরঙ্কুশ কাল্পনিকতা দোষে দুষ্ট। অন্ততঃ উহার মূল আদিম-সাহিত্যের মধ্যেও নিহিত দেখা যায়। ইহা নিঃসন্দেহ যে, বৈদিক স্মৃতিসমূহের মধ্যে অনেকগুলি সেই যুগেরই সমসাময়িক—যে-যুগে পুরোহিত সম্প্রদায়ের দ্বারা উহা শাখাপল্লবে বিস্তার লাভ করে। তন্মধ্যে যে বৈদিক স্মৃতি ভারতে জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় সেই স্মৃতি খুব একটা প্রাচীন দলিল বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আদি-পুরুষের শরীর হইতে কিরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্গত হইয়াছে উক্ত স্মৃতি তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বচনটিতে উক্ত হইয়াছে,—“ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, রাজস্র তাঁহার বাহু, বৈশ্ব তাঁহার উরু-যুগল।” যে-সর্বমাস্ত্র সঙ্কলনের মধ্যে এই বচনটি স্থান পাইয়াছে তাহা যে খুব আধুনিক তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বাহাই হউক, এই বচনটিতে সমস্তের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়া পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছে। পূর্বেও যে চারি জাতের অনুরূপ চারি বর্ণ ছিল এই বচনটিকেই তাহার সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমার মতে ইহা অপেক্ষা “ঠুনকো” ধরনের কথা আর দ্বিতীয় নাই। একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার বক্তব্যটি বুঝাইব। Haug এবং তাঁহার পর M. Kern সাধারণ মতের বিরুদ্ধে আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন যে, বৈদিক যুগে জাতের কথা সম্পূর্ণরূপে শুধু জানা ছিল তাহা নহে, পরন্তু আরো উচ্চতনকালে আরোহণ করিয়া দেখান যাইতে পারে—যে সময়ে ইরানীয় ও হিন্দুদের পূর্বপুরুষেরা পাশাপাশি বাস করিত, সে সময়েও জাতের অস্তিত্ব ছিল। তাঁহারা কোন্ যুক্তি-বলে এ কথা বলেন? হয় তাঁহারা আবেস্তার কতকগুলি বচনের উপর—নয় প্রাচীনকালে ইরানের লোবদিগের চারি “পিত্তে” বিভক্ত থাকার সম্বন্ধে যে খুব-আধুনিক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বলেন। এই চারি “পিত্তে” চারিবর্ণের অনুরূপ। পারস্যের ইতিহাসে কোথাও জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য নাই। কিংবা Kern ও Haug-এর মতে, জাতের ধারণাটা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের সহিত এরূপ অকাট্যরূপে অনুরূপ যে হিন্দুদের স্ত্রায় পারসীকদের মধ্যেও বর্ণভেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল—অসকোচে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন। এই দুই পর্য্যায়ের মধ্যে একটা বাহ্যিক যোগ আছে আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের মধ্যে যে একটা মৌলিক যোগ আছে, অবশ্যস্বাবী যোগ আছে, তাহা কিছুতেই সপ্রমাণ হয় না।

আমার কথাটা আর একটু বুঝাইয়া বলিব। শাস্ত্রীয় মতবাদ কেবল চারি বর্ণই স্বীকার করে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, এই কাঠামটা খুবই সংকীর্ণ। উহার মধ্যে অসংখ্য জাত। তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে এইখানেই একটা প্রধান বিরোধ—এ বিরোধ সহজে মীমাংসা হইবার নহে। কালভেদের হেতু প্রদর্শন করিয়া কি এই বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করা যাইতে পারে? কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি,—একাধিক নিদর্শনের দ্বারা, এমন কি পরস্পর-বিরুদ্ধ কথার দ্বারা, শাস্ত্রীয় মতবাদ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে, স্বীকার করিয়াছে যে, অনেকগুলি জাত পূর্বকাল হইতেই ছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের জাত বাস্তবিকই ছিল কি না সন্দেহহীন। তা' ছাড়া মনে হয়, জাতের বিস্তৃত পর্য্যায়গুলি শাস্ত্রীয় নিয়মের সহিত খাপ খায় না, কঠোর রুদ্ধধারিতার সহিত খাপ খায় না, এবং জীবন্ত জাতের যে বিশেষ লক্ষণ দল-গঠন ও স্বায়ত্তশাসন—তাহার সহিতও খাপ খায় না।

লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা ভারতে ব্রাহ্মণ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছে এবং এক হিসাবে ঐ নামে একীভূত হইয়াছে তাহারা বস্তুত বহু বিভাগে বিভক্ত ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। তাহাদের প্রত্যেক বিভাগই বিশেষ-লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সচরাচর “ব্রাহ্মণ জাতের” উল্লেখ করিয়া থাকি; আসলে বলা উচিত “ব্রাহ্মণিক জাতসমূহ।” যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের এক-একটু বিশেষত্ব আছে তাহাদের সকলকেই আমরা সাধারণভাবে একজাত বলিয়া থাকি। পতিত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনু যাহা কবুল করিয়াছেন, তাহা হইতে সপ্রমাণ হয়, তিনিও এইরূপ করিয়াছিলেন। এখনকার মতো তখনও সকল ব্রাহ্মণই সম্মানিত সাধারণ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইত। মহাভারতের একস্থানে আছে, যাতা যে বংশেরই হউক না কেন, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণই। মনুর নিয়মের সহিত যে-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহার মীমাংসা অসম্ভব বলিয়া প্রথমে মনে হইলেও, তাহা যে অগত্যা মীমাংসার অতীত একরূপ নহে। মতবাদ যাহাই বলুক না কেন, জাত বদলাইয়াও ব্রাহ্মণ থাকা যায়।

আমাদের চারিদিকে নিরীক্ষণ করা যাউক। এখনকার রাজপুত—যাহারা পাশ্চাত্য ভারতের সামরিক বংশের লোক তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে। পদমর্যাদা ও ব্যবসায়ের হিসাবে তাহারা ক্ষত্রিয় জাতির অন্তরূপ। তাহাদের সকলকেই কি এক জাত বলা যাইতে পারে? না তাহারা কোন বিশেষ-জাতের একটি উন্নতিশীল খণ্ডাংশ মাত্র? আমরা ত পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের চোখের সামনে এমন কত জাত দেখিয়াছি যাহারা অধিকারী না হইয়াও উচ্চ উপাধি দখল করিয়া বসিয়াছে এবং তাহার দ্বারা একটা সামাজিক সুবিধা করিয়া লইয়াছে। এগুলেই ব্যাপারটা নূতন হইবে কেন?

এইখানে আমরা একটা নূতন অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিব; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই নামে চারি আদিয় “জাত” বুঝায় না, ইহারা চারি “শ্রেণী” বা “বর্ণ”। এই শ্রেণীগুলি খুব প্রাচীন হইলেও হইতে পারে। পরে উহাদিগকে “জাতের” স্বন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বরূপত পৃথক্ ও উৎপত্তিস্থল পৃথক্,—প্রকৃত জাতগুলি

—(যাহা উক্ত চতুর্ভুজ হইতে নিঃসৃত) গোড়াগুড়ি হইতেই খণ্ডাংশে বিভক্ত ও সংখ্যায় বহুল হইয়াছিল।

মতবাদ ও তথ্যের মধ্যে যে অনৈক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেবল এইরূপ ব্যাখ্যাই উহার মীমাংসা করিতে সমর্থ।

এইখানেই ইরানীয় বচনগুলির সহিত তুলনা,—তাহার সমগ্র মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইরানীয় চারি পিষ্টা ও চারি হিন্দুবর্গের মধ্যে যে একটা সৌগম্য আছে—এইখানেই তাহার গুঢ় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (Ludwig Rigveda) “অথুব” বা পুরোহিত ব্রাহ্মণের অন্তরূপ; “রথেশ্ব” বা যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়ের অন্তরূপ; “রাষ্ট্রিয়-ফুইয়া” বা গৃহপতি, বৈশ্যের অন্তরূপ; “হইতি” বা হস্ত-সাধ্য কাজে ব্যাপৃত শ্রমজীবী, শূদ্রের অন্তরূপ। সাধারণ সাদৃশ্যটা খুব চোখে পড়ে। কতকগুলি সংশয়াত্মক পার্থক্য ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণিক কিম্বদন্তী অনুসারে বৈশ্যেরা কৃষী ও বণিকরূপে খ্যাত; কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্য উহাদিগকে শ্রমজীবীরূপে সচরাচর গৃহপতিই বলিয়া থাকে। ইরানীয় পর্যায়ের সহিত খুব কাছাকাছি মিল আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু হইতি শ্রেণী সম্বন্ধে তেমন কোন স্থাপ্পষ্ট স্থানিদিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না যাহাতে করিয়া শূদ্রের সহিত ঠিক তুলনা করা যাইতে পারে; শূদ্রের জায় “হইতি”কেও এক পাশে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে—তাহারা ধর্মের হিসাবে ও সমাজের হিসাবে নীচ। উভয় পক্ষেই, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যাহারা প্রবেশ করে, তাহাদের এক রকমেরই দীক্ষা;—তাহারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে। (১) অতএব তুলনাটা সর্বাংশে সম্পূর্ণ। (২)

ইরানের পিষ্টা-সমূহকে প্রকৃতরূপে জাত বলা যায় কি না ইহা লইয়াই বিবাদ; এবং এই বিবাদ ভ্রাত্য বিবাদ। যাহা হইতে জাত উৎপন্ন হইতে পারে, ইরানে একরূপ কতকগুলি জাতের অন্তর ছিল কি না,—যেমন ভারতে কতকগুলি

(১) Spiegel পৃ ৭০০। ইহা খুব সম্ভব যে, ভারতের জায় ইরানেও, উপবীত গ্রহণ তিন শ্রেণীর মধ্যই বদ্ধ ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর অধিকার অসম্পূর্ণ ছিল এবং ঐ শ্রেণী নিকট অবস্থায় হাপিত হইয়াছিল (Geeger)। জোরোষ্ট্রার বন্দোবলম্বীকে যে দীক্ষা দেওয়া হইত “হইতি”র দীক্ষা প্রাপ্ত হইত কি না, তৎসম্বন্ধে Spiegel অসংকোচে স্বীকার করিলেও, তাহা সংশয়াত্মক বলিয়া মনে হয়।

(২) Spiegel Eran Alterthumsk।

জাতের অঙ্কুর হইতে জাতের উৎপত্তি হইয়াছে) —এ বিষয়ের নির্ধারণ করা—সে স্বতন্ত্র কথা। সে যাহাই হউক, আবেষ্টায় চারি পিষ্টা চারি শ্রেণী মাত্র—জাত নহে। হিন্দুদিগের চতুর্বর্গ গোড়ায় এইরূপই ছিল। যদি উভয় পক্ষে বিভাগ সম্বন্ধে মিল থাকে, তো সে দূর অতীতের জিনিস বলিয়াই এই মিল দেখা যায়। এবং জাতটা কেবল ভারতেই যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,— তাহার অর্থ,—জাতের সহিত ঐ শ্রেণীবিভাগের স্বরূপ-গতি কোন মিল বা অবচ্ছেদ্য যোগ নাই।

আমি জানি, এই দুইয়ের মধ্যে একটা মিল স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে; এইরূপ স্বীকার করা হয় যে, অব্যতিক্রমী আদিম একতা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া গিয়া উহা হইতে বর্তমান কালের ঋণাংশ-সকল উৎপন্ন হইয়াছে। উহার অসম্ভাব্যতা এক নজরেই উপলব্ধি হয়। জাতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে-সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, পরে আমি সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। আপাতত, সাহিত্য-কিংবদন্তী হইতে যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে আমি তাহাতেই আপনাকে বদ্ধ রাখিব। আমাদের এই অসুসজ্জানের পথে, যে-সকল প্রাচীনতম সামগ্রী আমরা প্রাপ্ত হইব তাহা হইতেই জাতের নিদর্শন সংগ্রহের চেষ্টা করিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহানামন

(প্রথম হলকা)

“রাজা নেই ব’লে অরাজক নয়

কপিলবাস্তু পুরী,

সম্রাটগারের সমস্তরা আছে,

বাজা ওরে বাজা ভুরী।

নগর-জ্যেষ্ঠ শ্রীমহানামন

আদেশ করেন সবে

রাজদস্যর এই দস্যুতা

নিরোধ করিতে হবে।

কোশল-ভূপতি-প্রসেনজিতের

তনয় পিতৃবাতী

বৃদ্ধ পিতার রাজ্য হরিয়া

দেয়াকে উঠেছে মাতি;

পর-ধন পর-রাজ্যের ক্ষুধা

প্রাণে জলে ধব্ধ ধব্ধ,

দাসীর পুত্র দস্য হইয়েছে

দাক্ষণ এ বিরুদ্ধক।

এই নগরের মালধে ওর

মা একদা ছিল দাসী,

মহামনা মহানামনের দ্বারে

অন্নপিত্ত গ্রাসি—

পুষ্ট যে হ’ল তাহারি পুত্র

দুয়ারে পেতেছে থানা,

ঘোচাতে মায়ের দাস্ত্রের স্মৃতি

বুঝি হেথা দেছে হানা।

অধমের ধারা ধরেছে ধুষ্ট

ভুলে গেছে উপকার,

অধঃপাতের পিছল পথে পা

দিয়েছে কুলাঙ্গার।

ভেবেছে দর্পী,—শাক্যসিংহ

বনে গিয়েছেন ব’লে,—

শাক্য-কুলের পৈতৃক ভিটা

হরণ করিবে ছলে;

খবর পেয়েছে,—হিংসা-বৃষ্টি

ছেড়েছে শাক্য-কুল,—

তাই সে এসেছে নিরস্ত্র জনে

করিবারে নির্মূল।

হার মেনে ফিরে গেছে বারবার

আবার এসেছে ভেড়ে,

ধুষ্টের চূড়ামণিরে এবার

সহজে না দিব ছেড়ে।

বুদ্ধের জ্ঞাতি শাক্য আমরা

করি না প্রাণের হানি,

তবুও যুঝিব, সহজে না দিব

রাজ্যহীন রাজধানী।

অমোঘ-লক্ষ্য আমরা শাক্য
 হই না মুষ্টিমেয়,
 লড়িবে ভূম্ব হাতীর সঙ্গে,
 যুদ্ধিব,—না ছাড়ি শ্রেয় ।
 ঘোষণা দেছেন নগর-জ্যোষ্ঠ
 শোনো ওগো শোনো সবে
 প্রাণীর প্রাণের হানি না করিয়া
 যুদ্ধ করিতে হবে ।
 কে করিবে এই নূতন লড়াই ?—
 এস জোড়া-তুণ এঁটে,
 শত্রুরে মোরা প্রাণে না মারিব
 ছেড়ে দিব কান কেটে ।
 শত্রু-সৈন্য বিব্রত করা
 এই আজিকার ব্রত,
 কোশলের সেনা ভোলে না যেন রে
 শাক্য-রণের ক্ষত ।
 প্রাণে প্রাণে দেশে যায় যাক্ ফিরে
 কান-কাটা পল্টন
 মরণ-অধিক লজ্জার লেখা
 বহে যেন আমরণ ।”

(দ্বিতীয় হলকা)

মাড়া পড়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
 কপিলবাস্ত জুড়ে,
 নিজা তজ্জা ভয় সব যেন
 মস্তেতে গেল উড়ে ।
 প্রহর না যেতে বর্ষে চর্মে
 ছেয়ে গেল দশদিক
 মরাল সহসা সাজোয়া পরিয়া
 সজ্জাক সাজিল ঠিক ।
 রাজাহীন দেশে জনে জনে রাজা
 জনে জনে হুজুয়,
 স্বদেশের মান রাখিতে সমান
 ব্যগ্র ও নির্ভয় ।

মজুর কৃষাণ গোপনে আপন
 হাতিয়ারে দায় শান,
 চারিদিকে শুধু ‘সাজ্’ ‘সাজ্’ ‘সাজ্’
 চারিদিকে ‘হান্’ ‘হান্’ ।
 বাহির হইল বিরাসী হাজ্জার
 শাক্য তীরন্দাজ,
 হাতীর সমুখে ভীমকল-পাঁতি
 অভিনব রণ আজ ।
 একদিকে ব্যূহ কোশল-সেনার
 পিষিতে চাহিছে চাপে,
 আর দিকে যত হিংসা-বিরত
 রুদ্ধ আবেগে কাঁপে ।
 বাণে বাণে প্রাণ অস্থির তবু
 ‘সমঝি’ যুঝিছে সবে,
 প্রাণের হানি না করিয়া যে আজ
 ‘যুদ্ধ’ করিতে হবে ।
 লঘু করে বাণ করে সন্ধান
 স্থলযুদ্ধ-ক্ষিপ্ত গতি
 অশ্বেচালনে অঙ্গ-হেলনে
 বিদ্রোহ-হেন জ্যোতি ।
 তীর হানি শুধু কোশল-সেনার
 কান কুণ্ডল কাটে,
 বরা পাতা হেন কাটা কানে কানে
 ছেয়ে কেলে মাঠে ঘাটে ।
 কেটে পাড়ে তুণ ধনুকের গুণ
 অমোঘ লক্ষ্যে বিন্দে,
 সারথির হাতে বগ্না ঘোড়ার
 কেটে দিয়ে ধায় সিঁথে ।
 করে টলমল বিকল কোশল-
 সেনা অস্ত্রুত রণে,
 বাণ দিয়ে যেন করে বিজ্ঞপ
 শাক্যেরা খুসী মনে ।
 ঢালে ভোঁতা করে শত্রুর খাঁড়া,
 ধড়গ না হানে ফিরে,
 অস্ত্রুত বোঝা যুঝিছে বোদ্ধ
 নিরস্ত্রনার তীরে ;

বুকের উপরে শত্রুর ছুরি
 মরণ সে ক্রব জানে,
 হাতে হাতিয়ার শত্রুরে তবু
 মারিবে না কেউ প্রাণে !
 হাজারে হাজারে বুকের জাতি
 চলেছে মরণ ভেটে
 হস্ত-বন্দনে মরিছে শাক্য
 মৃত্যুর কান কেটে ।
 (তৃতীয় হলকা)

সন্ধ্যা আসিল, কণিক সন্ধি
 অনিল অন্ধকার,
 শাক্য-দুর্গে তুর্ধ্য ধনিল—
 কেবো সবে এইবার ।
 শাক্য-কুলের মৌমাছি গুরে ।
 মৌচাকে দেবে চাবি,
 হের বিব্রত আবাস্তি-সেনা
 হস্তী মদসারী ।
 অসমান রণ চলে কতখন ?
 এইবার ফিরে আস ।—
 শাক্য-গড়ের কোমর-কোঠায়
 বাজে তুরী উভরায় ।
 পড়ে অর্গল-দুর্গ-দুয়ারে
 পরিখায় ফোলে জল,
 কান-কাটা সেনা কান দাবী ক'রে
 করে দূরে কোলাহল ।
 প্রাণহারা সেনা সেই কোলাহল
 শুনিবারে নাহি পায়—
 দাবীর চেয়ে সে ঢের বেশী দিয়ে
 শুয়েছে মৃত্তিকায় ।

(চতুর্থ হলকা)

কপিলবাস্ত করি' অবরোধ
 ব'সে আছে বিরুদ্ধক,
 ঘাঁটি-মুহুড়ায়-কড়া পাহারার
 বেড়া দেছে কণ্টক ।

যুদ্ধ নাহিক, দীর্ঘ দিবস
 কাটিছে শুদ্ধ ব'সে,
 শাক্যদুর্গ দুর্মান্দাজের
 থাকায় নাহি ধ্বসে ।
 রসদ ফুরায়, কি হবে উপায় ?
 ফোজ উঠিছে ক্ষেপে,
 ছাউনীর ধারে ব্যাধি উকি মারে,
 কত রাখা যায় চেপে ?
 চোখ-রাঙানিতে ভুরু-ভঙ্গীতে
 চেপে রাখা যায় কত ?
 অসন্তোষের আকোশ নিতি
 ফণা তোলে শত শত ।
 “ছাউনী নাড়িব” কহে বিরুদ্ধক ।
 মন্ত্রী তা' শুনি কয়
 “আমাদের চেবে অবরুদ্ধেরা
 ঢের বেশী ক্লেশ নয় ;
 দাঁতে তৃণ করি' তারা তো এখনো
 আসেনি শিবিরে সবে,
 এখন নড়িলে শত্রু হাসিবে
 লোকে অপয়শ ক'বে ;
 এখন নড়িলে পায়ে ঠেলা হবে
 করগত সিদ্ধিরে ।”
 সেনাপতি কয় “মুখ দেখানো যে
 দায় হবে দেশে ফিরে ।”
 কহে বিরুদ্ধক “তাই হোক ; তবে
 পল্টন খসী নয় ।”
 “আছে কুটনীতি পল্টন মোর”
 মন্ত্রী হাসিয়া কয় ।

(পঞ্চম হলকা)

শাক্য-পুত্রের সন্তাগারেতে
 সন্ত মিলেছে যত,
 শত্রুর দূত এনেছে যে চিঠি
 তাহারি বিচারে রত ।
 শুদ্ধোদনের শূন্য আসনে
 বুকের ছবি ভাঁয়,

রাজাহীন দেশে রাজার যে কাজ
দশে মিলে করে তার ।
পাকা পাকা যত মাথা ঘেমে ওঠে,
কথা ওঠে কতশত ;
পঙ্ক্তির পরে টিপনি করে
যার যেবা মনোমত ।
“শাক্যের প্রতি নেই বটে শ্রীতি,
নেইও বিশেষ ঘেষ”
লিখেছে কোশল “দ্বার যদি খোলো
দেখে যাই এই দেশ,

তীর্থ সাকার এ দেশ আমার
মায়ের মাতৃভূমি,
এরে ছারেখারে দিতে নারি, শুধু
পথ-রজ্জ যাব চুমি ।”
“সে তো বেশ” কহে সন্ত জিনেশ ;
“বড় বেশ নয়” কন—
সন্ত দেবল “ছল এ কেবল,
চোরের এ লক্ষণ ।”
সন্ত নালদ “কহিল রসদ
দুর্গে আদৌ নাই,
আজ নয় কাল দুর্গ-দুয়ার
খুলিতেই হবে, ভাই,
অনশনে নিতি মরে ছেলে বুড়া
পুত্র কন্তা জায়া,
কপিলবাস্ত জুড়িয়া পড়েছে
মৃত্যু-কপিষ ছায়া ।
মরার অধিক যজ্ঞনা নেই,
মরিতেই যদি হয়
অস্ত্রে মরিব, অনশনে হেন
তিলে তিলে মরা নয় ।”
তর্ক বাড়িল আওয়াজ চড়িল
শাস্ত সম্মাগারে,
বোঝা নাহি যায় কি যে হবে, হায়,
কোন দল জিনে হারে ।

অনশন ? কিবা অস্ত্রে মরণ ?
বকাবকি এই নিয়ে,—
যমের মহিষ গুঁতাবে, কিন্তু
কোন শৃঙ্গটা দিয়ে ?
নাম-গুটিকার কুণ্ডাতে শেষে
গুটি দিল গিয়ে সব,
গুটি গুনে ঠিক হইল—হা দিক
দুয়ার খুলিতে হবে !

(বঠ হলকা)

দুর্গদ্বারের অর্গল আজ
খুলিতে গিয়েছে টুটে,
পল্টন লয়ে পশে বিরুদ্ধক
কল-কোলাহল উঠে ।
এ কি অদ্ভুত ? কোথা গেল দূত—
ময়ূরপুচ্ছধারী ?
পল্টন লয়ে কেন পশে পুরে ?
এ দেখি জুলুম ভারি !
একা এসে দেশ দেখে চলে’ যাবে
এই কথা ছিল আগে,
রাজদস্যুর দস্যু-স্বভাব
কোন ছুতা পেয়ে জাগে ?
শাক্যপুরীর ধনৈশ্বর্য
দেখে আপনার চোখে
লোভের নাড়ীটা হয়েছে অবল,
ঠেকাবে কে বল শুকে ?
পল্টনগুলা করে লুণ্ঠন
যার-তার ঘরে ঢুকি’ ;
নাগরিকে আর সৈনিকে, হায়,
বেধে গেল ঠোকাঠুকি ।
ভুলি প্রতিজ্ঞা রাজা বিরুদ্ধক
হুসুম করিল জারি—
“শাক্যের কুল কর নির্মূল
কি পুরুষ কিবা নারী ।”

ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-রোল
 কঁাদে নারী কঁাদে শিশু,
 নাহি দ্যায় বান তাহে শয়তান
 নিদারুণ বিজ্রীকীষ।
 অশ্রুত জ্বলিছে থড়গ ঝলিছে
 রক্তে ফিনিক্ ছোটো;
 তর্জনে হাহাকারে একাকার
 আর্ন্ত ধুলায় লোটো;
 আহত লোকের বুকের উপরে
 ছুটে চলে ক্ষেপা ঘোড়া,
 তাণ্ডবে মাতি নাচে ক্ষেপা হাতী
 বীভৎস আগাগোড়া।

(সপ্তম হলকা)

নগরমুখ্য শ্রীমহানামন্
 ক্ষুদ্র হৃদয়ে, হায়,
 জীবন ভিক্ষা মাগিতে প্রজ্ঞার
 চলেছেন ক্ষত পায়।
 চলেছে বৃদ্ধ ভগ্ন-হৃদয়
 মরণ-পাংশু মুখে,
 নগ্ন চরণে, দাঁড়াইতে রাজ-
 দস্যুর সম্মুখে।
 চলেছে সজ্জ স্বগত-পশু
 ছুটি হাত বুকে জুড়ে
 দেশের দেশের দুর্গতি দেখি
 হৃথের দহনে পুড়ে।
 ভাবিছে বৃদ্ধ “একি্রে বিষম
 একি্রে মনস্তাপ,
 কোন্ কালামুখ রাজ্যকামুক
 চিন্তিল মনে পাপ,
 সে পাপের ছায়া কায়া ধরি পশে
 কপিলবাস্তুপুরে
 পুণ্যের ঘরে একি অনাচার
 হাহাকার দেশ জুড়ে।

বৃদ্ধের দেশে একি্রে যুদ্ধ
 একি হানাহানি, হায়,
 প্রাণ দিলে যদি রোধ করা যেত
 রুধিতাম আমি তাই।”

(অষ্টম হলকা)

ভিক্ষা মাগিছে বৃদ্ধ আপন
 দাসীর ছেলের কাছে,
 “জয়ন্তু রাজন! বৃদ্ধা একজন
 প্রসাদ তোমার যাচে;
 নিজ পরিচয় দিতে নাহি ভয়,
 মহানামনের নাম
 হয়তো শুনেছ,—জননীর মুখে,—
 ওগো কীষ্টির ধাম!
 অতিথি একদা হ’ল তব পিতা
 আমারি সে উপবনে
 ভাবী রাণী সনে নয়নে নয়নে
 মিলিল শুভক্ষণে;
 এ বৃদ্ধা একদা মায়েরে তোমার
 করেছে সম্প্রদান,—
 “জানি তা’ জানি তা’” কহে উদ্ধত
 “ছাড়ি’ ভণিতার জান
 কী প্রসাদ চাও খুলে বল তাই।”
 “নিরীহ প্রজ্ঞার প্রাণ”—
 কহিল বৃদ্ধ নীরবে সহিয়া
 অবিনয় অপমান।
 “নিজ প্রাণ নিয়ে পালাও বৃদ্ধ,
 অধিক কোরো না আশ”
 কহে বিরুদ্ধ মুগ্ধ বিরোধ
 হাসিয়া অট্টহাস।
 “রাজন!” “কি চাও?—যাও, যাও, যাও,
 পালাও সপরিবারে,
 এর বেশী কিছু কোরো না ভিক্ষা
 আমার এ দরবারে।

কান কুণ্ডল কেটেছে আমার
তোমার নিরীহ প্রাণা,
সমুচিত সাজা দিব আমি তার
বলে দিমু এই সোজা ।”
মৌন কণেক রহিয়া বৃদ্ধ
কহেন জুড়িয়া কর
“জননীরে স্মরি’ এ ভিক্ষা তবে
দাও কোশলেশ্বর !
নিখাস রুধি’ আমি যে অবধি
ভুবিয়া থাকিব জলে
সে অবধি লোক কোরো না আটক
যাক্ যেথা খুসী চ’লে ।
তারপর তুমি দিয়ে জনে-জনে
শাস্তি ইচ্ছামত ।”
“ভাল; তাই হবে”— বলে’ রাজা ভাবে—
“বুড়ার দম বা কত ?
কত বা পালাবে ?—যাবে, দেখা যাবে ;
বুড়াটা পালায় যদি !—
তবে এ নগরে কি পথে কি ঘরে
রক্তে বহাব নদী ।”

(নবম হলকা)

অবারিত দ্বার পালায় যে যার
যেথা হু’চক্ষু যায়,
কপিলবাস্ত হরিষে বিষাদে
মূরছি পড়িল প্রায় ।
কেউ বেগে ধায় পিছে না তাকায়
প্রাণ নিয়ে সোজাশুজি,
কেউ যেতে যেতে কিরে এসে ফের
তুলে নিয়ে যায় পুঞ্জি ।
বসন ভূষণ ফেলে কেহ ধায়
ছেলে আঁকড়িয়া বুকে,
ফ্যালফ্যাল চায় ইতিউতি ধায়
কথা নাই কাবো মুখে ;

সোনা কুশাসনে জড়ায় গোপনে
বিপ্র পালায় রড়ে,
যেতে তাড়াতাড়ি শ্রেষ্ঠীর ভুড়ি
ঝন্ঝন্ রবে নড়ে !
কাণ্ড দেখিয়া কোশল-সৈন্ত
চোখ পালালিয়া চায়,
রাজার হুকুমে হু’হাত গুটায়
দাঁতে দাঁত ঘষে, হায় !

(দশম হলকা)

হোথা বিরুদ্ধক বিরক্ত মনে
পাটলি ব্রহ্মের কুলে
পল গণি’ গণি’ হয়েছে অধীর
ধবল-ছত্র-মূলে ।
“জনহীন প্রায় হ’ল যে নগরী,
মন্ত্রী, এ কী বালাই,
এখনো যে দেখি মহানামনের
উঠিবার নাম নাই !
জলে দেহ রাগে, কে জানিত আগে
বুড়ার এতটা দম ?
ফেরফার কিছু নেই তো ভিতরে ?—
সুড়ঙ্গে সংক্রম ?—
ভুব দিয়ে কেউ দেখুক কি হ’ল,—
ফেরফার থাকে যদি
উচিত শাস্তি করিব বুড়ার
রক্তে বহাব নদী ।”
মনে মনে কয় মন্ত্রী “তেমন
কিসে আর হবে সখে,
লোক কই আর ?—রক্ত-তৃষা কি
মিটাবে অলঙ্কারে ?”

(একাদশ হলকা)

পশু গণি’ গণি’ প্রহর কেটেছে
নারে আর দেবী নয়,
কোনো কৌশলে কঁাকি দিয়ে বুড়া
পালায়েছে নিশ্চয় ।

পাটলির জল তোলপাড় করে
কোশল-রাজের লোক,
মহানামনে পাকড়া করিতে
নাকে মুখে লাগে জৌক।
পাঁক তোলে আর আঁকুবাকু করে,
টোকে টোকে জল খায়;
জলের তলায় কই হুড়ঙ্গ ?
কই বুড়া কই ? হায় !
সহসা ফুকারি কহিল অনেক
“না না পালায়নি কেহ,
শালের শিকড় আঁকড়িয়া আছে
আড়ষ্ট মৃতদেহ !
ছল ক’রে বুড়া ডুবেছিল জলে
বুড়ার কি কড়া জ্ঞান,
জলের তলায় মরিল হাঁপায়ে
বাঁচাতে পরের প্রাণ !”
ক্রোধে চীৎকারি কহে বিরুদ্ধক
“ভারি—ভারি বাহাদুরী
খাবি খেতে খেতে খল-পনা,—মরে’
গিয়ে তবু জুয়াচুবী !”

(দ্বাদশ হলকা)

ক্রেপের মরণ বরণ করিয়া
অমর হইল কারা ?
মুত্তি-ছায়াপথ উজলি জগৎ
তার হ’য়ে আছে তারা !
মরণের সাথে করি মহারণ
হ’ল মৃত্যুঞ্জয়,
দেশভ্রামেদের আয়ু কে বাড়াল
নিম্ন আয়ু করি’ ক্ষয় ?
মানুষে মানুষে বিশ্বাস কার
প্রতি নিশ্বাসে বাড়ে ?
কার সংঘম চরম সময়ে
ধর্মের দণ্ড কাড়ে ?

কে ধর্মিষ্ঠ স্বদেশনিষ্ঠ
ধর্মের রাধি’ মান
দেশের সেবায় করিল সহজে
নিজের জীবন দান ?
বীরের স্বর্গে অমল অর্ঘ্য
কারা পায় সব-আগে ?—
মহানামনের মহা নাম জাগে
তা’-সবার পুরোভাগে।
শাক্যকুলের দ্বিতীয় সিংহ
বুদ্ধ সে গৃহবাসী—
আড়াই হাজার বছরেও মান
নহে তার মশোরাশি। *
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আর্য্যপ্রকৃতির সাম্য হইতে বৈষম্যে পরিণতি

প্রাচীন গ্রীকজাতি এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি গোড়ায় একই জাতি ছিল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তাহা সশেষে ঘটনা-ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশই বাড়িতে থাকিয়া পরিশেষে দাঁড়াইল আসিয়া এমনি-এক চরম সীমান্ত প্রদেশে—যে প্রদেশে প্রভেদের আর এক নাম উদয়াস্তের বৈপরীত্য।

পূর্বে বলিয়াছি যে, পিথাগোরাস Philosophy-শব্দের নির্জীব শরীরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। Philosophy শব্দের অর্থ জ্ঞানের প্রতি প্রাণের ভালবাসা—সংক্ষেপে **জ্ঞানানুভূতি**। এই যে জ্ঞানানুভূতি—এই জ্ঞানানুভূতি আর্য্যজাতির একটা অস্থিমজ্জাগত বিশেষত্ব। পুরাতন গ্রীসের দেবপ্রতিমা এবং দেবালয় প্রভৃতির পরমাশ্চর্য্য গঠন-সৌকর্য্যোপপ্রতিভা’র হস্ত তো দেখিতে পাওয়া যায় খুবই, তা ছাড়া—জ্ঞানানুভূতিগেব হস্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা কম না। আর্য্যজাতীয় এবং অনার্য্যজাতীয়

শিল্পের মধ্যে কত না প্রভেদ? এক দিকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিসর বাবিলোন্ প্রভৃতি বড় বড় সাম্রাজ্যের বড় বড় শিল্পকার্য্য-ঋগঞ্জনের তাক্ লাগাইবার মতো করিয়া পরিগঠিত হইয়াছিল ত্রিশ্রম্য-প্রিয়তার বিন্দুশ বিল্লাজি ছাঁচে, আর এক দিকে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাতন গ্রীসের উচ্চ অঙ্গের শিল্প-কার্য্যসকল ভারুকের মনে ভাব জাগাইয়া তুলিবার মতো করিয়া বিরচিত হইয়াছিল জ্ঞানানুরাগের সুন্দর রমণী ছাঁচে। জ্ঞানানুরাগের পুষ্পালিলা সরস্বতী এক্ষণে বটে তাহার এই সাধের জন্ম-ভূমিতে উৎপাতের-উপর-উৎপাতের বালুকাস্তরে চাপা পড়িয়া মরিয়া রহিয়াছে বলিলেই হয়;—পুরাকালে কিন্তু তাহা গ্রীস দেশেও যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি, উভয়ই সমান বেগবতী ছিল। প্রভেদ কেবল এই যে, গ্রীসদেশে তাহা জ্ঞানের বাহির-অঞ্চল'কে—বিষয়-রাজ্য'কে—নিখুঁত স্বন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার পথে ধাবমান হইয়াছিল; আমাদের দেশে তাহা জ্ঞানের ভিতর-অঞ্চল'কে—বিষয়-রাজ্য'কে—ঐরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার পথে ধাবমান হইয়াছিল। এক কথায়—বাহিবেব সৌন্দর্য্য এবং ভিতরের আনন্দের মধ্যে যে রূপ প্রভেদ, পুরাতন গ্রীসদেশীয় শিল্প এবং আমাদের দেশীয় শিল্পের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। ঋগবেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঊষ্ঠ পঞ্চিকার ১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ডে আছে

“ও শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেযাং বৈ শিল্পানাং অল্পকৃতীহ শিল্পং। যদেব শিল্পানি আত্মসংস্কৃতি-বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈ র্জজমান আত্মানং সংস্কৃতে।” [বাংলা] “এই-সকল দেবশিল্পকে শিল্প বলা যাইতেছে। আর আব শিল্পসকল দেবশিল্পের অল্পকরণ মাত্র। এই যে মস্তরূপী শিল্পমূহ ইহারা আত্মার সংস্কাব সাধন করে। যজমান এতদ্বারা আত্মাকে ছন্দোময় করিয়া গড়িয়া তোলেন।” এতদ্ব্যতীত ঋগবেদের অনেক স্থানে রথশিল্পীদের রথনির্মাণের সহিত ঋষিদিগেব স্তোত্র-রচনাব উপমা দেওয়া হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় আছে “যোগঃ কৰ্ম্মকৌশলং” [বাংলা] “যোগ একপ্রকার কৰ্ম্মকৌশল” অথবা, যাহা একই কথা, যোগ একপ্রকার আধ্যাত্মিক শিল্প-

নৈপুণ্য।* ভাবতবর্ষীয় ঋষিদিগের জ্ঞানানুরাগ এইরূপ উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক শিল্পের মধ্য দিয়া পরাবিদ্যার দিকে অগ্নিশিখার স্তায় উদ্ভূত হইয়াছিল; পক্ষান্তরে, স্বর্ণকারের নল-প্রদাহিত ফুংকার-বলে অগ্নিশিখা যেমন জ্বালা স্বর্ণখণ্ডের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে—গ্রীসদেশীয় আধ্যাত্মিকের জ্ঞানানুরাগ তেমনি উচ্চ অঙ্গের লৌকিক শিল্পের মধ্য দিয়া পরাবিদ্যা হইতে অপরাবিদ্যার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

প্রাচীনকালের সভ্যতা'কে মোটের উপর দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—(১) আধ্যাত্মীয় সভ্যতা এবং (২) অনাধ্যাত্মীয় সভ্যতা। এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার ভিতরের লক্ষ্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ ছিল দুই বিভিন্ন-ধর্ম্মী অভীষ্টের প্রতি। আধ্যাত্মীয় সভ্যতার ভিতরের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল—ঐশ্বর্যের প্রতি তত না, যত জ্ঞানের প্রতি; অনাধ্যাত্মীয় সভ্যতা'র ভিতরের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল—জ্ঞানের প্রতি তত না, যত ত্রিশ্রম্যের প্রতি। বিমল গঙ্গা এবং শ্রামল যমুনা'র সঙ্গমস্থানেব স্থায় আধ্যাত্মীয় সভ্যতাব সঙ্গম ঘটয়াছিল,—প্রাচীন গ্রীসেও যেমন—প্রাচীন ভারতেও তেমনি। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, গ্রীসদেশীয় আধ্যাত্মিকের সহিত পশ্চিম-এসিয়ানিবাসী এবং উত্তরপূর্ব-আফ্রিকানিবাসী অনাধ্যাত্ম সভ্য জাতিগণের মেলামেশা ঘটয়াছিল স্বগম জলপথের মধ্য দিয়া খুব সুবিধামানিক; পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিকের সহিত দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় অনাধ্যাত্ম সভ্যজাতিগণের মেলামেশা ঘটয়াছিল দুর্গম অরণ্য এবং পর্বতের মধ্য দিয়া অনেক কষ্টে; আব সেইজন্য, গ্রীস দেশীয় আধ্যাত্মিকের সহিত দুই বাঘা-ভালুকা গোচের অনাধ্যাত্ম সভ্য জাতির—ফিনীসীয় এবং মিশর দেশীয় অনাধ্যাত্ম সভ্যজাতির—যেমন পুরা-মাত্রা মিশ্ খাইয়াছিল, আমাদের দেশের আধ্যাত্মিকের সহিত দাক্ষিণাত্যনিবাসী অনাধ্যাত্ম সভ্যজাতির তাহার দিকির দিকি মাত্রাও মিশ্ খাইতে পারে নাই, আর

* বীরভূমের জমিদার বাণেশ্বর স্বর্গীয় প্রতাপনারায়ণ সিংহ—যিনি আমার প্রকাশ্যে বর্ষভ্রাতা এবং প্রিয় বন্ধু ছিলেন, তাঁহার পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ সিংহ আমার এইস্থানের এইকথাটি শুনিয়া আমাকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার বিরচিত একটি যোগবিবয়ক ইংরেজী প্রবন্ধে ঐ কথাটি আরো ফুটাইয়া বলিয়াছেন এইরূপে:—“Yoga is the art of building up a useful life in consonance with the laws of spirit।”

সেইজন্ম দাক্ষিণাত্যনিবাসী অনার্য সভ্যজাতির। আর্য্য-বর্ষের স্বতিপুরাণ-শাস্ত্রে রাক্ষস এবং বানরের দলে নিষ্কিপ্ত হইয়াছিল। নালী ঘা যেমন চর্ম্মে দেখা দিলে মর্ম্মে প্রবেশ না করিয়া ছাড়ে না, তেমনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আর্য্যজাতি-দৌহের প্রকৃতিগত সাম্যের ভিতবে ঐ অবস্থাগত বৈষম্যটি অল্পে অল্পে পথ কাটিয়া কাটিয়া মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইল। ঘটিল যাহা—তাহা এই :—

আর্য্যাবর্ষের সংস্কৃতভাষী জাতির জ্ঞান-ভক্ত আর্য্য প্রকৃতি, এবং বালি ও রাবণের স্বজাতিগণের ঐশ্বর্য্যভক্ত অনার্য্য প্রকৃতি পরস্পরের সহিত সমান-সমান ভাবে মেলা-মেশা করিতে স্তুবিধামতো পথ পাইল না ; আর, তাহার ফল হইল—ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজের মধ্যে ঐশ্বর্য্যানু-রাগের সংশ্লব হইতে জ্ঞানানুরাগের বিশ্লেষণ এবং পরা-বিদ্যার সেবা-কার্য্যে বিঘ্নগুলীর সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির ঐকান্তিক বিনিয়োগ। পক্ষান্তরে, পুরাতন গ্রীকদিগের জ্ঞান-ভক্ত আর্য্যপ্রকৃতি এবং ফিনীসীয় শ্রুতি জাতিদিগের ঐশ্বর্য্য-ভক্ত অনার্য্য-প্রকৃতি পরস্পরের সহিত সমান-সমান ভাবে মেলা-মেশা করিতে পথ পাইয়াছিল দিব্য স্তুবিধামতো ; আর, তাহার শুভ ফল যাহা ঘটয়াছিল তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বাণিজ্যব্যবসায়স্বত্রে পশ্চিম-এসিয়া এবং উত্তরপূর্ব-আফ্রিকার সঙ্গে পুরাতন গ্রীসের আদান-প্রদান চলিয়াছিল নানা রকমের, আর সেই স্ত্রযোগে ঘন-জাতীয় আর্ধ্যসন্তানেরা শিল্প-বাণিজ্যাদি ঘটিত অপরাবিদ্যায় ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যসন্তানদের অপেক্ষা ঢের বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।^১

জ্ঞানানুরাগ এবং ঐশ্বর্য্যানুরাগের মিলন-পারিপাট্যের ফল যাহা ফলিয়া উঠিল পুরাতন গ্রীসেব শেষ বয়সে, তাহা মস্ত একটা জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যাপার :—মহাপণ্ডিত আরিষ্টটেলের মস্তিষ্ক-বলোপাঙ্কিত জ্ঞানের আলোক এবং তাহার দিগ্বিজয়ী-শিষ্য বীর-কেশরী আলেকজান্ডারের বাহুবলোপাঙ্কিত ঐশ্ব্যের প্রতাপ জোড়ে মিলিয়া পৃথিবী মধ্যে হলস্থল বাধাইয়া দিল। আলেকজান্ডারের মইশ্ব্য কটালের বানের জায় হু হু করিয়া ঝাঁপিয়া উঠিলও যেমন দেখিতে দেখিতে, আর, প্রকাণ্ড একটা বৃন্দগণের

জায় ফাটিয়া সহস্রধা ছটকিয়া পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়া গেলও তেমনি দেখিতে দেখিতে। বিধাতার মনে কি আছে তাহা আগে-থাকিতে আঁচিতে পারা দেবতারও অসাধ্য :—দর্শকেরা সকলেই মনে করিলেন “এইবার আলেকজান্ডারের অতুল কীর্ষিকলাপ সর্ব্বহৃদ রসাতলে যায় বা !” ইতিমধ্যে আলেকজান্ডারের ধরাবলুপ্তিত ঐশ্ব্যের ভস্মরাশির মধ্যে জ্ঞানায়ি ধোঁয়াহিতে ধোঁয়াহিতে ক্রমে ক্রমে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়া পৃথিবীর অবৈজ্ঞানিক পুরাতন যুগ একেবারেই উন্টাইয়া দিল।

যুগ উন্টাইয়া দিবার অধিনায়কদিগের প্রধান জটিলার স্থান হইল আলেকজান্ডারের সেই অক্ষয় কীর্ষিস্তম্ব যাহার আলেকজান্ডারিয়া-নাম অতি অল্পকালের মধ্যেই সারা পৃথিবী-ময় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই ইউরোপ এসিয়া আফ্রিকার সন্ধিস্থলবর্ত্তী লক্ষ্মীসরস্বতীর মহা পীঠস্থানে—প্লেটো’র পরা-বিদ্যা, আরিষ্টটেলের নানামুখীন বিদ্যা, ইউক্লিড মুখ্য পণ্ডিত-গণের জ্যামিতিবিদ্যা, হিপার্কসমুখ্য পণ্ডিতগণের জ্যোতি-র্বিদ্যা, আর্কিমীডীসমুখ্য পণ্ডিতগণের যন্ত্রবিদ্যা—এক কথায় পুরাতন গ্রীসের চিরসঞ্চিত বিদ্যার সমস্ত পুঁজিপাটা—একত্র সমবেত হইয়া ঐ স্তম্ভল তীর্থস্থানটিকে সর্ব্ববিদ্যার জ্যোতিষ্ক করিয়া তুলিল। যুগপরিবর্ত্তনকারী বিজ্ঞানের সেই তেজঃপুঞ্জ প্রাতঃসূর্য্য দিক্‌চক্রবালে মাথা তুলিবা-মাত্রই তাহার বিশ্ব-বিজয়িনী রশ্মিছটা আরব্য ইহুদীয় এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের চিরপোষিত অজ্ঞানান্ধকারের দুর্গকপাটে ঘনঘন আঘাত করিতে আরম্ভ করিল ; তাহার পরে দিক্-চক্রবালের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশে উত্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে তমোহুদ রশ্মিজাল প্রসারণ করিতে লাগিল। এইখান হইতেই শাস্ত্রমূলক পুরাতন জ্যোতিষের রশ্মিছটা প্রাণ-মূলক নূতন বেশে সাজিয়া বাহির হইয়া ইটালীর এবং ইটালী হইয়া অন্যান্য ইউরোপীয় প্রদেশের বাইবেল-ভক্তি-প্রসূত মোহান্ধকার ছিন্নবিছিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। এইখান হইতেই প্লেটোনিক পরাবিদ্যাবিমল রশ্মিছটা ভারতীয়-ব্রহ্মবিদ্যা মিশ্রিত নূতন বেশে সাজিয়া বাহির হইয়া ইহুদীয় ধর্ম্মের মোহমেঘেব ফাটকে আটক পড়িয়া কিয়ৎকাল-যাবৎ চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার

পরে যেমুমুক্ত হইয়া ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতসমাজে নিঃসম্মতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরাবিদ্যা-ভাগীবধীর গোমুখী কিঙ্ক আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমি এটা ভুলিলে চলিবে না। যাহাদের চক্ষু আছে তাঁহাদের কাহারো নিকটে একথা ঢাকা থাকিতে পারে না যে, প্লেটো'র গুরু ছিলেন একদিকে যেমন তাঁহার সমকালের সফ্রেটিস্ চার্লিস আনা মাত্রা, আর একদিকে তেমনি তাঁহার পূর্ববর্তী কালের পিথাগোরীয় এবং আইওনীয় সম্প্রদায়ের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা বারো আনা মাত্রা; আর শেষোক্ত আচার্য্যগণের গুরু ছিলেন (পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে আমি যেমন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি) ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা; তা ছাড়া, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-শাস্ত্রের নব-বিধান-খণ্ডের ভিতরে তত্ত্বজ্ঞানের আভাস যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তেরই গুরু ছিলেন প্লেটো। আমি তো বলিলাম “গুরু ছিলেন প্লেটো”; কিন্তু আমার মন তাহাতে কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। আশ্চর্য্য এই যে, আমার মন যাহা বলিতেছে তাহা পণ্ডিতবর Holmesএর প্রণীত Creed of Buddha নামক পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে এইরূপ;—

“In christendom the character of Jehova has been profoundly modified (though the change which has been effected is as yet potential rather than actual) by the influence of the Founder of Christianity, whose ideas, whatever may have been the history of their development in his mind, belong in their essence to the creed of the Far East.”

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত—ঈসা মহাপ্রভু আমাদের দেশের জ্ঞানি-জনের সহিত কখন বিরূপ সংস্রবে আসিয়া-ছিলেন তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে আমি প্রস্তুত না-থাকা কারণে আমার মনোগত পূরা সত্য-কথাটির পরিবর্তে আমাকে এইরূপ একটি আধা সত্য-কথা বলিয়াই অগত্যা ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের নববিধান-খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানের আভাস যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তেরই গুরু ছিলেন প্লেটো। কিন্তু তাহা হইলেও প্রকারান্তরে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, আমাদের দেশের ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যেরাই খ্রীষ্টীয় তত্ত্বজ্ঞানের আদি গুরু—

কেননা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে আমি এই গুপ্ত রহস্যটি প্রকাশ্যে টানিয়া বাহির করিতে পারংপক্ষে ক্রটি করি নাই যে, আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরাই পুরাতন গ্রীসের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যগণের আদি গুরু ছিলেন।

এখানে আমি অতিশয় ব্যাপক অর্থে গুরুশব্দ ব্যবহার কবিতোছি ইহা বলা বাহুল্য; আর, বর্তমান প্রকরণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত করিবও আমি তাই। প্রচলিত অভিধান-শাস্ত্রে বলে শুধু এই যে, শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন গৌড়পাদ আচার্য্য; পরন্তু আমাব এখানকার অভিধান-শাস্ত্রে অধিকন্তু বলে এই যে, শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন গৌড়পাদ ব্যতীত ব্যাস, কপিল, বৃদ্ধদেব প্রভৃতি অনেকানেক মহাত্মা। তেমনি আবার—প্রচলিত অভিধান-শাস্ত্র কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত যে, চৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁহার সামকালিক রামানন্ড নরোত্তম হরিদাস প্রভৃতি শিষ্যগণের গুরু ছিলেন, তথৈব, ঈসা মহাপ্রভু তাঁহার সামকালিক পীটর জোহান্ন প্রভৃতি শিষ্যগণের গুরু ছিলেন; পরন্তু আমাব এখানকার অভিধান-শাস্ত্রে অধিকন্তু বলে এই যে, চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার পরবর্তী কালের বদ্বদেশীয় বৈষ্ণব-মাত্রেরই গুরু—ঈসা মহাপ্রভু খৃষ্টান মাত্রেরই গুরু।

জিজ্ঞাস্য ॥ তা যদি আপনি বলেন—তবে চৈতন্য মহাপ্রভুও তো বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার গুরু ছিলেন কে? ঈসা-মহাত্মারই বা গুরু ছিলেন কে?

প্রবোধয়িতা ॥ এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু ছিলেন নারদ শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ভাগবত সম্প্রদায়ের পূর্বতন আচার্য্যেরা; পরন্তু ঈসা-মহাপ্রভুর গুরু ছিলেন যে, কে, এ কথাটার একটু সমঝিয়া উত্তর দেওয়া আবশ্যক। এটা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাঁহার স্বদেশীয় আচার্য্যগণ তাঁহার গুরু ছিলেন না; কে যে তবে তাঁহার গুরু ছিলেন—সেইটিই হচ্ছে বিষয় সমস্ত। জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রচারকদিগের হৃদগত ভক্তির সহিত আমার চিদগত যুক্তির তেলে-তলেনেত্র জ্বায় অ-বনিবনাও। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রচারকদিগের হৃদগত ভক্তি বলে—ঈসা মহাপ্রভুর গুরু স্বয়ং ঈশ্বর; ইহাদের এই কথাটি এক হিসাবে যেমন

সর্ববাদি-সম্মত সত্য; আর এক হিসাবে তেমনি একটুও সত্য নহে। ঈশ্বর স্বয়ং যেমন সকল মহুষ্যেরই গুরু, আর তা ছাড়া পশুপক্ষীদিগেরও গুরু, তেমনিভাবে তিনি ঈসা-মহা-প্রভুরও গুরু, এ কথা কেহই অস্বীকার করেনও না— অস্বীকার করিতে পারেনও না। খৃষ্ট-ভক্তেরা কিন্তু এই সর্ববাদি-সম্মত কথাটি বলিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া—যে-ভাবে আমরা বলি বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবদিগের গুরু চৈতন্য মহাপ্রভু, শিখদিগের গুরু নানক, মুসলমানদিগের গুরু মহম্মদ, পক্ষিষাবকের গুরু মাতা-পক্ষিণী, সেই ভাবে বলেন যে ঈশ্বর স্বয়ং আঁকা কেবল ঈসা-মহাপ্রভুরই গুরু, তা বই আর-কোনো ব্যক্তিরই গুরু নহেন। এই জায়গাটিতেই খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদিগের হৃদগত ভক্তির সহিত অপরাপর নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের চিহ্নগত যুক্তির তেলে-ভুলের জায় কিছুতেই মিশ্র থাকিতে পারে না। আমার বিশ্বাস এই যে সেন্ট মাথিউ'র লিখিত খ্রীষ্ট-চরিতে এই যে একটি কথা লিখিত আছে

“There came wise men from the east to Jerusalem. Saying where is he that is born king of the Jews? for we have seen his star in the east and are come to worship him.”—

এ কথাটা যদিচ আর আর পুরাতন কালের পৌরাণিক ইতিহাসের জায় একটা সাজানো উপন্যাস মাত্র, তথাপি উহার ঘবনিকার আড়াল হইতে খুব একটি সম্ভবণর সত্য-কথা উঁকি দিতেছে—যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা তাহা দেখিতে পান। সে কথাটি এই যে, মহাত্মা ঈসার মর্ত্য-জীবনের কৃত্য-কার্য্যটি আমাদের দেশের জ্ঞানিজনকর্তৃক সর্বাস্তঃকরণের সহিত অম্লমোদিত হইয়াছিল; আর, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ঈসা-মহাপ্রভুর প্রথম বয়সে তিনি কোনো-না-কোনো স্থানে আমাদের দেশের জ্ঞানিজন-গণের সহিত সংস্রবে আসিয়াছিলেন। কিন্তু হাজার হোক—আমার মনোগত কথাটার এটা একটা অত্যন্ত কাঁচা ধরণের অভাবপক্ষীয় প্রমাণ মাত্র, আর সেইজন্য তাহা অধিকাংশ পাঠকগণের সন্তোষভাজন না হইবারই কথা। আমি তাই আমাদের দেশের জ্ঞানিজনের সহিত ঈসা-মহাপ্রভুর সংস্রবের কথাটা আমার মনের মধ্যে চাবি বদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার পরিষর্ষে এইটুকু দেখাইয়াই ক্ষান্ত

থাকিব মনে করিয়াছি যে, প্লেটোনিক তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাব ঈসা-মহাপ্রভুর মনোমধ্যে কতক না কতক পরিমাণে কার্য্য করিয়াছিল অবশ্যই—কেননা তাঁহার আবির্ভাবের অনতি-পূর্বে প্লেটোনিক তত্ত্বজ্ঞানের বীজ কয়েকজন মাথালো হইয়া নূতন স্ফুর্তিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল—ইহা সকলেরই জ্ঞানা কথা।

ঈসা-মহাপ্রভুর মুখ্য মন্তব্য কথাটি ছিল এই যে, ঈশ্বর সর্বজগতের পিতা এবং জাতি-বিজ্ঞাতি-নির্বিশেষে সমস্ত মহুষ্যই তাঁহার সমান স্নেহের পাত্র। পক্ষান্তরে, ইহুদী শাস্ত্রিগণের মুখ্য মন্তব্য কথাটি ছিল এই যে, জিহোবা তাঁহাদের স্বজাতির একপ্রকার নিজস্ব ঈশ্বর। এটা ছিল তাঁহাদের একটা আবহমানকালের চিরপোষিত হৃদগত বিশ্বাস যে, জিহোবা-ঈশ্বর যেমন তাঁহাদের স্রষ্টাতিহাস স্বপ্নে স্বপ্নী ছুঁধে ছুঁধী এমন-আর কোনো জাতিরই না; আর সেইজন্য ভবিষ্যতে যখন তাঁহার মসীহা অবতার (Messiah) স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া নিখিল সমাগরা পৃথিবীর রাজ্য-ভার স্বহস্তে লইবেন, তখন ইহুদী জাতি যেমন তাঁহার যোলো আনা অম্লগ্রহের পাত্র হইবে এমন-আর কোনো জাতিই না। ঈসা মহাপ্রভুর Heavenly Father (স্বর্গীয় পিতা) এবং তাঁহার স্বজাতীয় শাস্ত্রি-মহোদয়দিগের রাজেশ্বর জিহোবার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ইহা বলা বাহুল্য। Heavenly Father নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন করা তখনকার কালের ইহুদী শাস্ত্রীদিগের কর্ণে যতই নূতন ঠেকিয়া থাকুক না কেন—আমাদের দেশের বেদবিৎ পণ্ডিতগণের নিকটে তাহা কিছুই নূতন নহে; তা'র সাক্ষী—বিগত কার্তিক মাসের প্রবাসীতে আমি নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি :—

“দৌষ্পিতঃ.....মুড়তা নঃ” [বাংলা] “হে দৌষ্পিতা আমাদিগকে স্বর্গী কর।” দৌঃশব্দের অর্থ heaven বা ছালোক বা নাক্ষত্রিক জগৎ। ছানোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১১শ খণ্ডে আছে “ঔপমত্ত্ব কং স্ব-মাত্মানং উপাসস ইতি। দিবমেব ভগবো রাজ্যমিতি। হোবাচ স্তুতেজা আত্মা বৈশ্বানরোহয়ং স্বমাত্মানং উপাসসে” [বাংলা] রাজা প্রাণ করিলেন “ঔপমত্ত্ব, কোন্

আত্মাকে তুমি উপাসনা করিয়া থাক ?” ঔপমত্যব বলিলেন “দোঁ’কে মহারাজ।” রাজা বলিলেন “এই যে দোঁ-আত্মা তাহার তুমি উপাসনা করিয়া থাক, ইনি স্বতেন্জা” বলিয়া প্রশ্ন। ঐ অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডে আছে “তন্ত হ বা এতন্ত আত্মনো বৈশ্বানবন্ত মূর্দ্ধিব স্বতেন্জা” [বাংলা] “এই যে বৈশ্বানর আত্মা ইহার মস্তক স্বতেন্জা”; ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, সূর্য্যাস্তসূর্য্যকোড়ে করিয়া নাস্ত্রিক জগৎ বা স্বতেন্জা বা দোঁ বা heaven সমস্ত জগতের মাথা—কি না মূল নিয়ামক; আর, সেই জন্ত বলা যাইতে পারে যে, যিনি নাস্ত্রিক জগতের অধীশ্বর, তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর; আর, যিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর, তিনি জ্ঞানবান্ জীবগণের আত্মার অধীশ্বর এবং ভক্ত-জনগণের প্রাণের অধীশ্বর। স্বর্গবেদের এই দ্যৌষ্পিতাকেই শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার মাধ্যান্দিয় শাখার ৩৭শ অধ্যায়ের ২০শ মন্ত্রে “পিতানোহসি” “তুমি আমাদের পিতা” বলিয়া ডাকা হইয়াছে; তা ছাড়া, কাব্য-পুরাণাদিতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অধীশ্বর, পরমপুরুষকে জগতের মাতাপিতা বলিয়া ভূয়োভূয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে; তাব সাক্ষী রঘুবংশের গোড়াতেই আছে “জগতঃ পিতরৌ বন্দে” [বাংলা] “জগতের পিতামাতাকে বন্দনা করি।” এই যে, আৰ্য্যজ্ঞাপিগণের পরমারাধ্য দ্যৌষ্পিতা বা Heavenly father—যিনি নাস্ত্রিক জগতের অধীশ্বর এবং ভক্তজনগণের হৃদয়ের অধীশ্বর, ঈসা-মহাপ্রভু সেই Heavenly father-এরই—দ্যৌষ্পিতারই—একান্ত অমুরক্ত ভক্ত ছিলেন, তা বই, তিনি তাঁহার স্বজাতির নিজস্ব ঈশ্বরের কি না জিহোবার এফটুও ভক্ত ছিলেন না। ঈসা-মহাপ্রভু ইহুদীয় শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজেশ্বর জিহোবার পরিবর্তে তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরের—Heavenly father-এব—দ্যৌষ্পিতা’র—পূজার প্রবর্তন করিতে কত ন্যূ চেষ্টা পাইয়াছিলেন! কিন্তু রাজেশ্বর জিহোবা’র অবমাননা ইহুদী শাস্ত্রীদিগের প্রাণে সহিবে কেন—কাজেই ইহুদীশাস্ত্রীগণের সমস্ত দলবল অ্যাক্জোট্ হইয়া ঈসা-মহাপ্রভুকে বিদ্রোহী বলিয়া হটু করিয়া দিলেন। ঈসা-মহাপ্রভু জীবৎকালে ইহুদীদিগের নেতৃপক্ষীয় শাস্ত্র-মহোদয়ের

রোমীয় শাসনের প্রতাপানলে একরূপ দুর্কিসহ অস্ত্রদাহে গুমরিয়া গুমরিয়া সাবা হইতেছিলেন যে, মদীহা কবে জেরুসালেমের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের শোকাশ্রকে আনন্দাশ্রতে পরিণত করিবেন তাহারই প্রত্যাশা তাঁহাদের জীবনের প্রধানতম উপজীবিকা হইয়া দাঁড়িয়াছিল; কাজেই তাঁহাদের রাজরাজেশ্বরের জিহোবাকে তাঁহারা কোথায় জেরুসালেম-মহানগরীর রাজসিংহাসনে বসাইবেন—তাহার পরিবর্তে তাঁহাকে এক tabernacle হইতে উঠাইয়া আনিয়া আর এক tabernacleএ বসাইতে—হৃদয়-tabernacleএ বসাইতে—কিছুতেই তাঁহাদের মন সরিল না। ফল কথা এই যে, তেলে-জলে যেমন মিশ্ খায় না, তেমনি জ্ঞান-প্রেম-ভক্ত আৰ্য্যপ্রকৃতির সহিত ঐশ্বর্য্য-ভক্ত অনার্য্যপ্রকৃতির আদবেই মিশ্ খায় না। ঈসা-মহাপ্রভু জন্মিবাছিলেন-বটে অনার্য্য-বংশে, কিন্তু তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহাব স্বজাতীয় অনার্য্য প্রকৃতিকে আৰ্য্য ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লওয়া হইয়াছিল বলিলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছুই নাই। আমার বিশ্বাস এই যে, ইংরাজী শাসনের মধ্য দিয়া আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্যগণের উপরে যেমন ইউরোপীয় বিদ্যার প্রভাব তলে তলে কার্য্য করিতেছে, তেমনি ঈসা-মহাপ্রভুর আবির্ভাবের এক-আধ শতাব্দী পূর্বে হইতেই রোমীয় শাসনের মধ্য দিয়া ইহুদী শাস্ত্রীদিগের উপরে গ্রীস্ দেশীয় বিদ্যার—আব সেই সঙ্গে নব-প্রোটোনিক তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাব তলে তলে কার্য্য করিয়াছিল; আর, ঈসা-মহাপ্রভুর প্রথম বয়সে কতক বা সেই গ্রীক প্রভাবের—কতক বা বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক-দিগেব ভগবদভক্তি-মিশ্রিত বিশ্বব্যাপী মৈত্রীতাবের—বাতাস তাঁহার গায়ে লাগা’তে, তাহারই গুণে তিনি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন।* তা’ছাড়া—বৌদ্ধ কিম্বদন্তীর সহিত খ্রীষ্টীয় কিম্বদন্তীর একটি স্থানে খুব স্পষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপঃ—বুদ্ধদেব যেমন মার-কর্ত্তক আক্রান্ত হইবা-

* বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহাযান-পন্থীদিগের মধ্যে ঈসা-মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিয়ৎকাল পূর্বে হইতেই নিরীশ্বরতার বাধ ভাঙ্গিয়া ভগবদভক্তির স্রোত প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল—বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

মাত্র মার'কে পরাক্ষয় করিয়াছিলেন, ঈশা মহাপ্রভু তেঙ্গি সয়তান কর্তৃক আক্রান্ত হইবা-মাত্র সয়তান'কে পরাক্ষয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, আমাদের দেশের এই যে দুইটি শাস্ত্রীয় ভাবার বচন—“গাঙ্গলিক অভিষেক” (baptism), “দ্বিতীয় জন্ম” (new birth), এ দুইটি বচন খৃষ্ট-চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রের মধ্য দিয়া না-তো-আর কোন্ শাস্ত্রের মধ্য দিয়া? আবার খ্রীষ্ট-ধর্মের আদিম প্রচারকদিগের মনের উপরে প্রেটোনিক তত্ত্বজ্ঞান আধিপত্য করিয়াছিল নিতান্ত কম না;—সেন্ট প্যাউল যে, ইহুদী তত ছিলেন না যত গ্রীক ছিলেন, আর, সেন্ট জর্জন্ যে, নব-প্রেটোনিক তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্বহস্ত-লিখিত পত্রাবলী এবং পুস্তকেই মধ্যাহ্ন-দিবালোকের স্তায় স্বব্যক্ত। প্রেটোনিক তত্ত্বজ্ঞান-সরস্বতী যে, বাহ্য-পরিচ্ছদেই মনোনিবেশ—পরন্তু যবনিকার আড়ালে তিনি মুষ্টিমতী ভারতী—ইহা আমি অগ্রহাষণের প্রবাসীতে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি। এই সকল পর্দার আড়ালের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া-শুনিয়া আমার মনোমধ্যে এইরূপ একটা ধ্রুব বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমাদের দেশের পরাবিদ্যা নানাপ্রকার গুপ্ত স্বড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়া অলঙ্কিত ভাবে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় ধর্মরাজ্যে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল প্রভূত পরিমাণে। [Holmesএর হৃন্ময় পুস্তকখানি (The Creed of Buddha) সম্প্রতি কেবল আমার হস্তে আসিয়াছে। এই পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় আমার মনের মতো কয়েকটি ছত্র দেখিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি আমার প্রবন্ধটি ছাপাইতে দিবার পরে আমি তাঁহার পুস্তকের শেষাংশের একটি পরিচ্ছেদে আমার মনের কথাটি চমৎকাব স্পষ্টাকারে প্রতিফলিত দেখিয়া আমার আনন্দ হইল এমনি—যেন আমি হাতে চাঁদ পাইলাম!—সে পরিচ্ছেদটি এই :—

“To the pious Christian, who believes that Christ brought his ideas—or shall I say, his store of ‘theological information’?—down to earth from the supernatural Heaven, the suggestion that he borrowed ideas from India, or any other terrestrial land, may possibly seem profane, yet Theology itself admits, or

rather insists, that Christ was (and is) ‘very man’ as well as ‘very God’; and if he was ‘very man’, if he was open to all human influences, we may surely take for granted that his pure and exalted nature was peculiarly sensitive to the spiritual ideas of his age. That Christ had come under the influence of the spiritual ideas of the Far East is a hypothesis which explains many things, and for which therefore there are many things to be said. To attempt to prove in detail the indebtedness of the ‘Gospel’ to the ‘Ancient Wisdom’ would carry me far beyond the limits which the aim of this work has imposed upon me. But I would ask any one who can approach the question with a genuinely open mind to make the following simple experiment. Let him first saturate himself with the spiritual thought of India,—with the speculative philosophy, half metaphysical, half poetical, of the Upanishads, and with the ethical philosophy of Buddha. Let him then study the sayings of Christ, making due allowance for the distorting medium (of Jewish prejudice and Messianic expectation) through which his teaching has been transmitted to us. He will probably end by convincing himself, as I have done, that the spiritual stand-point of the sages of the Upanishads, of Buddha, and of Christ were, in the very last resort, identical.]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরগাছা

(৪০)

রাণী জগদ্ধাত্রী পোষাপুত্র লণ্ডয়ার উৎসব শেষ হইয়া গেলে মণিমালা রাখালকে বলিল—এইবার ত এখানকার সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল, এইবার চল।

রাখাল বলিল—এখনো যাবার সময় হয়নি। এত লোকের স্বপ্নজুখ একটা ছোট ছেলেব হাতে পড়েছে; সে যদি সং হয়ে গড়ে না ওঠে ত লোকেব সর্বনাশ করবে; বিশেষতঃ কমিশনার সাহেব আমার হাতে ওর শিক্ষার ভার দিচ্ছেন।

‘মণিমালা স্বামীর সহিত কখনো তর্ক করিতে পারিত না। সে নিরস্ত হইল।’

এ বাড়ীতে মণিমালাবও বন্ধন দৃঢ় হইতে লাগিল। কুবের অকস্মাৎ দিদির এ বাড়ীতে প্রধান অবলম্বন মনে করিয়া তাহার নেওটে হইয়া উঠিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী একটা নূতন কিছু বড়মামুষী করিতেছি মনে করিয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পোষ্য-পুত্রটির নিতান্ত গ্রাম্য চেহারা ও অশিষ্ট ব্যবহার তাঁহার মোটেই ভালো লাগে নাই। রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট পুত্রকে প্রিয় করিয়া তুলিবার জন্ত চন্দনমণি সদাই সচেষ্ট ছিল। কুবের একবারও তাহার কাছে গেলে সে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিত—ওরে হাবা ছোঁড়া, যা না তোর পিসিমার কাছে, ভূপাল যে তোর পিসিমার মন জুড়ে বসছে; শেষে স্ত্রীধন সম্পত্তিটা কি তাকে দিয়ে ফেলবে।

কুবের রাণীর কাছে গেলে তিনি মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কুবের যদ ডাকিত—পিসিমা! অমনি জগদ্ধাত্রী তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিতেন—পিসিমা! যাকে সর্বস্ব দিয়ে ফতুর হলাম সে একদিন মা বললে না। দূর হ চক্ষুশূল আমার সামনে থেকে।

কুবের পিসিমার তিরস্কারে ও মায়ের শিক্ষায় যদি কোনো দিন রাণী জগদ্ধাত্রীকে মা বলিয়া ডাকিত তাহাও তাঁহার ভালো লাগিত না, বেজার হইয়া বলিতেন—অনভ্যেসের কোঁটা কপাল চড়চড় করে। তোমার আর আড়ষ্ট হয়ে মা বলতে হবে না।

কুবের তিরস্কৃত হইয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া গেলে মা তাহাকে আবার ধাক্কা দিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিত। তখন নিরুপায় কুবের কোনোখানে আশ্রয় না পাইয়া রাগে ও দুঃখে একলাটি এককোণে গৌজ হইয়া বসিয়া থাকিত; স্নেহের অভাবে তাহার কঠিন মন কঠিনতর হইয়া উঠিতেছিল।

কুবেরের কোনো কিছুর দরকার হইলেও তাহার মা তাহাকে রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিত। তাহাতেও রাণী জগদ্ধাত্রী রুষ্ট হইয়া রুষ্ট স্বরে বলিতেন—তোর মা আর বাবাই ত সব করছে, এটা করতে কি হল যে আদিখ্যেতা করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে? ইহার ফলে এই হইত যে বেচারী কুবেরের অভাব না মা, না পিসিমা কেহই পূরণ করিতেন না। এইসব কারণে কুবেরের বিরক্ত মন তাহার অধীন চাকর-দাসীদের উপর অকারণে অত্যাচার করিয়া লঘু হইতে চাহিত; এবং তাহার ফলে সে রাখালের নিকট তিরস্কার ও প্রহাষ লাভ করিত।

সকল দিক হইতে তাড়া খাইয়া সে একাকী ম্লান মুখে উদাস দৃষ্টিতে কোথাও চুপ করিয়া প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাকিত।

ইহা মণিমালার চোখে পড়াতে তাহার মন এই হতভাগ্য বালকের উপর করুণায় ভরিয়া উঠিল। তারপর হইতে সে তাহাকে ঐরূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেই তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া স্নেহ-গলিত স্বরে বলিত—বেন ভাই, অমন করে দাঁড়িয়ে আছ? কে বকেছে? তুমি আমার ঘরে এস, কি চাই তোমার?

সেইদিন হইতে মণিমালা খুঁজিয়া-খুঁজিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সকল অভাব মোচন করে, স্নেহ দিয়া যত্ন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দায়।

শেষে হইল এই, একটু কোথাও ব্যথা পাইলেই কুবের দিদির চোখে পড়িবার মতো জায়গাতেই আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু সাহস করিয়া কখনো নিজে সে দিদির ঘরে যাইতে পারে না; কারণ তাহার মা কোনো দিন তাহাকে মণিমালার কাছে দেখিলেই চোখ টিপিয়া আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে তিরস্কার করিত, মণিমালার ঘরে যাইতে নিষেধ করিত, এবং নিবস্তুর তাহার মনে বিষ উদ্গিরণ করিয়া বলিত—রাম সকলেব বন্ধু কিন্তু রামের বন্ধু কেউ নয়! ঐ যে ভূপালের মা, খবরদার ওকে এতটুকু বিশ্বাস করিসনে। ওরা তোর সব চেয়ে শত্রু, কারে পেলে পাঁশ পেড়ে কাটবে, বিষ খাওয়াবে।

এইরকম কথা বালকের মনে একটা অনির্দিষ্ট আতঙ্ক সঞ্জন করিত। তাহার মন মণিমালার কাছে যাইতে চাহিলেও সে যাইতে পারিত না।

কুবেরকে মণিমালা যে যত্ন করিতেছে এবং কুবেরও যে ক্রমে মণিমালার অঙ্গুগত হইয়া উঠিতেছে ইহা চন্দনমণির স্বেদদৃষ্টি এড়াইল না। চন্দনমণি একদিন দেখিতে পাইল কুবের ভয়চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে চোরের মতন চুপেচুপে মণিমালার ঘরের দিকে যাইতেছে। চন্দনমণি বাঘিমীর গতন লাফাইয়া আসিয়া ছেলের কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার গালে জোরে এক চড়ক ঘাইয়া দিয়া বলিল—অপ্সেয়ে, উড়ে ফড়িং

পুড়ে মরে! শস্তুরের খপ্পরে গিয়ে পড়েছিল। মার চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান, এও জানিসনে।

কিন্তু চন্দনমণির এত সাবধানতা ও শাসন সত্ত্বেও কুবেরের চুরি করিয়া দিদির মমতার কাছে ধরা দিতে যাওয়া রোধ করা গেল না। চন্দনমণি সমস্ত দিন সংসারেব কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত, পাঁছে কেউ কুবেরের ভাগ্য লুটিয়া খায় এই তার সব চেয়ে বেশী ভয়; রাণী জগদ্ধাত্রী সমস্তক্ষণ ভূপালকে লইয়া তন্ময় হইয়া থাকেন; স্নতরাং চুরি করিয়া দিদির আদর কুড়াইয়া বেড়াইতে কুবেরকে বেশী বেগ পাইতে হইল না।

(৪১.)

মণিমালা যখন অন্তরে কুবেরকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন রাখালও বাহিরে আপনাকে নানা কর্মেব পাকে জড়াইয়া তুলিয়াছে। কুবেরকে পড়ানো, ঘোড়ায় চড়াইয়া সঙ্গে-সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাওয়া, তাহাকে সং উপদেশ দেওয়া রাখালের প্রধান কাজ হইয়াছে; কমিশনার তাহাকে পাহাড়পুর বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন; কোর্ট অব ওর্ডার ম্যানেজার সকল কাজে তাহারই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন; গ্রাহারা কেহ কোনো বিপদে পড়িলে তাহাকেই আসিয়া ধরে—সেও ম্যানেজারকে অহরোধ করিয়া তাহাদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করে। কোথাও আগুন লাগিলে রাখাল ঘোড়া ছুটাইয়া সেখানে গিয়া আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করে; গৃহহীন-দিগকে পাহাড়পুরে আনিয়া আশ্রয় দায় এবং যাহাঁতে শীঘ্র তাহাদের নষ্ট গৃহ পুনর্নির্মিত হয় তাহার চেষ্টা ও সাহায্য করে। কোথাও বন্যা হইলে রাখাল খাবার ও কাপড়ে নৌকা বোঝাই করিয়া সেই গ্রামে গিয়া বাস করে; কোথাও কলেরা হইলে হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাস্তু লইয়া দিন নাই রাত নাই রোগী দেখিয়া বেড়ায়,—প্রায় লোকই পরিকার পরিচ্ছন্নতার মর্ম জানে না, তাহাদের কড়া ছকুমে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করায়। কোথাও জলকষ্ট আছে সংবাদ পাইলে সেখানে ইন্দারা করিয়া দিবার জন্ত ম্যানেজারকে অহরোধ করে; যেখানে রাস্তা নাই, সেখানে ডিক্টিটে বোর্ডকে দিয়া রাস্তা করাইয়া দায়। বেচন মণ্ডল খুব ধনী, বাড়ীতে হাতী পোষে, অথচ তাহার খড়ের

বাড়ী, বছর বছর অগ্নিকাণ্ডে সে গৃহহীন হইয়া কষ্ট পায়, অনেক ক্ষতিও হয়; কিন্তু বাপপিতামহ কেহ ইট পোড়ায় নাই, ইট পোড়ানো তাহাদের সহিবে না, এই ভয়ে তাহারা কোঠা বাড়ী করে না; রাখাল সকল অমঙ্গলের ঝুঁকি নিজের উপব লইয়া নিজের নামে তাহাদিগকে ইট পুড়াইয়া দিয়া তাহাদের কোঠাবাড়ী করিবার স্বযোগ করিয়া দিয়াছে; ইহার জন্ত তাহারা সপরিবারে রাখালের কাছে কৃতজ্ঞ। নূতন পথ হইতেছে, পথের উপর “গ্রামদেবতী”র গাছ পড়িল, কেহ কাটিবে না, গাছটা থাকিলে পথটাতে বিশ্রী একটা মোচড় পড়ে, রাখাল নিজে কুড়ুল ধরিয়া সে গাছ কাটিয়া ফেলিল, অথচ লোকে আশ্চর্য হইয়া দেখিল জামাই-বাবু মুখে রক্ত উঠিয়া মরিল না; ইহাতে সকলে রাখালকে ভয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তুফানি সাহার জমি জরিপ হইয়া আমিনরা আবিষ্কার করিয়াছে তুফানি একশত বিঘা জমি ছাপাইয়া ছিপাইয়া খাইতেছিল; তুফানি আসিয়া রাখালের সম্মুখে একশত টাকা রাখিয়া হাত কচলাইতে-কচলাইতে বলিল, বাবু পান খাইবার জন্ত এই টাকা লইয়া যদি উহার জমিটা ছাড়াইয়া ছান; তুফানি রাখালের কাছে চাবুক খাইয়া টাকা তুলিয়া লইয়া দৌড় দিল, কিন্তু কিছুদিন পরে সে দেখিল তাহার বিনা তছিরে একষটি বিঘা জমি সে ক্ষেত্রত পাইয়াছে—সেই জমিটুকুই তাহার হকের পাওনা, বাকী জমিটা সে বাস্তবিকই ছাপাইয়া খাইতেছিল। রাখাল ম্যানেজারকে বুঝাইল যে পাহাড়পুরে ছেলেদের একটি বড় ইংরেজি স্কুল, মেয়েস্কুল, খয়রাতি ডাক্তারখানা ও হাঁস-পাতালের নিত্যন্ত অভাব আছে; ম্যানেজার নিমিত্ত মাত্র হইল, রাখালই প্রজাদের ডাকিয়া সভা করিয়া তাহাদিগকে স্কুল ও ডাক্তারখানার উপকারিতা বুঝাইয়া টাকা আদায় করিয়া গবর্নেন্টকে লিখিয়া স্কুল ডাক্তারখানা ও হাঁসপাতাল স্থাপন করিল। ডাক্তার ও মাষ্টারদিগকে লইয়া সে সাহিত্য ও দেশহিতের উপায় আলোচনায় লাগিয়া গেল। এইসব কারণে রাখাল ইতরভদ্র সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। তাহার দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ হৃদয় চেহারা, গভীর প্রকৃতি, সাধু চরিত্র, শুচি বাক্য ও অন্তায়-অসহিষ্ণু তেজস্বী ক্রোধন স্বভাব দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভয় করিত; যে

(৪২)

বাক্তি তামাক পর্যন্ত খায় না, রহস্য করিয়াও অশ্লীল বা মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করে না, যে এতটুকু ক্রটি দেখিলে রূঢ় কঠিন দণ্ডবিধান কবে, আবার যে বিপদে সহায়, সম্পদে সুখী, উৎসবে বিনা নিমন্ত্রণে আনন্দের ভাগী, তাহাকে সকলে শ্রদ্ধা সম্বন্ধ যথেষ্টই করিত, কিন্তু বন্ধু বলিয়া কেহ অন্তরঙ্গ হইতে পারিত না।

রাখাল যখন গৌরবের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়া সকলের সম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তখন মুখিকধর্ম্মীরা তাহার গৌরব-মন্দিরের ভিত্তি তলে-তলে খুঁড়িয়া কোঁপরা করিয়া ফেলিতেছিল। রাখালের গৌরবে সুখী ছিল না তিনজন—বঙ্কবিহারী, চন্দনমণি ও কাঙালী। বঙ্কবিহারী স্বাধীন-নৃপতির জনক, তাহার কাছেই সকলের আসা উচিত; কিন্তু কেহ যে তাহাকে পুছে না সে শুধু রাখালেরই জ্ঞাত! প্রজারা তাহাকে জানাইলেই ত সে স্থল ডাক্তারখানা মঞ্জুর করিয়া দিত; প্রজারা দরখাস্ত করিল না, সে ত আর রাখালের মতন ছোটলোক নয় যে প্রজাদের কাজ যাচিয়া করিয়া বেড়াইবে। রাখাল ছোটলোক, সে সাধারণ লোকের সমকক্ষ হইতে লজ্জা বোধ করে না; কিন্তু বঙ্কবিহারীর ত রাজমর্যাদা আছে, সে ত আর যে-সে গরীব টোঙার লোক নয়! আর রাখালের এই যে কাণ্ড সে ত তাহাকেই চাপা দিবার জ্ঞাত।

বঙ্কবিহারীর এই ধারণা যে যথার্থ, তাহার প্রধান সাক্ষী ও সমর্থক ছিল কাঙালী। রাখাল কোনো কাজ করিলেই কাঙালী অর্থপূর্ণ স্বরে বলিত—রাজামামা, রাখালের মতলব কি বুঝেছেন তো? আপনার রাজবুদ্ধি, আপনাকে খুলে বলতে হবে কেন!

কাঙালী যাহা নাও ইঙ্গিত করিত বঙ্কবিহারী তাহার অকথিত কথার মধ্য হইতে তাহাও হাতড়াইয়া বাহির করিত।

অমনে গেলেই চন্দনমণি বলিত—তুমি যে একেবারে নিবে গেলে! মত-সব রাহ এসে জুটেছে! ভূপাল কুবিরের রাহ, মণি আমার রাহ, রাখাল তোমার রাহ!

তাই ত! বঙ্কবিহারী এই ত্রি-রাহুর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বিশেষ রকম চিন্তিত হইয়া উঠিল।

একদিন সন্ধ্যায় তোষাখানায় কিংখাবের তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া বঙ্কবিহারী রূপাব গড়গড়ায় জ্বরির লম্বা শটকা লাগাইয়া মৃগনাভি-দেওয়া অম্বুরি তামাক খাইতেছিল; রাখাল পাশের ঘরে বসিয়া কুবেরকে পড়াইতেছিল। ষাওয়ার পরিচারক ব্রাহ্মণ প্রাণকৃষ্ণ আসিয়া খবর দিল আহার প্রস্তুত হইয়াছে। রাখাল কুবেরকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বঙ্কবিহারীকে বলিল—মামা খেতে চলুন।

—ই হা বাবা চল চল।—বলিয়া বঙ্কবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল—এই, কোই ছায়?

আরদালি বাবুরাম মিশ্র সামনে আসিয়া বলিল—হজুর! বঙ্কবিহারী বলিল—মিশির, হামারা জুতি ঘুমায়ে দেও! বাবুরাম হাত জোড় করিয়া বলিল—হজুর, মায় বাহ্মন; হজুরকো লিয়ে-মায় জ্ঞান দেগা, পর ইজ্জৎ নেহি দেগা!

ব্যাপার দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল। বঙ্কবিহারী রাখালের সম্মুখে বাজকায়দা করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—বে-আদব, বে-ইমান, তুমকো হাম বরখাস্ত কিয়া!.....কোই খানসামা হাজির নেই ছায়?

না, কোনো খানসামা সে তল্লাটে নাই। খানসামা ডাকিতে আরদালি ছুটিস। বঙ্কবিহারী খানসামার আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ জুতা ফিরাইয়া না দিলে সে যাইবে কেমন করিয়া? কোন্ প্রাতঃস্মরণীয় নবাব জুতা ফিরাইয়া দিবার লোক না পাইয়া শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়াছিলেন তবু নবাবী চাল ছাড়িয়া নিজে ভুতা ফিরাইয়া পরিয়া পলায়ন করেন নাই বলিয়া শোনা আছে; নবাবের প্রাণের কাছে বঙ্কবিহারীর ধাবার জুড়াইয়া যাওয়া ত অতি তুচ্ছ!

রাখাল হাসিয়া বলিল—আপনিই পায়ে করে জুতোটা ঘুরিয়ে পড়ুন না।

বঙ্কবিহারী নবাবী চালে বলিল—ও রকম করে পাছকা পরা আমার অভ্যাস নাই।

রাখাল হাসিতে-হাসিতে বলিয়া ফেলিল—জুতোপরা অভ্যাসটাই আপনার কত দিনের?

বন্ধবিহারীর চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল।

কাঙালী তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া জুতা ঘুরাইয়া দিল।

রাখাল ঘুণায় মুখ ফিরাইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

বন্ধবিহারী কাঙালীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—হাঁ, তুমি আমার ভগ্নীপুত্র আছ, কোনো দোষ নাই, দিতে পার, দিতে পার, তুমি ভক্তিমান আছ, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করবেন।

—আমি আপনাকে ভক্তি করি, রাখালের তা সঙ্গ হয় না। দেখলেন ত কেমন করে চলে গেল।

—এর উচিত প্রতিফল দিতে হবে। তুমি বুদ্ধিমান আছ, ভেবে চিন্তে সম্বর একটা উপায় নিরূপণ কর।

—যে আছে, ভেবে দেখব।—বলিয়া কাঙালী বাসায় গেল। বন্ধবিহারী খাইতে অন্দরে গেল।

খাইতে বসিয়া রাখাল দেখিল তাহার লুচিগুলি কাঁচা আছে, এবং বন্ধবিহারী ও কুবেরের পাতের লুচিগুলি বেশ খর-ভাজা। সাত ভূতে জুটিয়া তাহার কুবেরের ডাঙার সমস্ত খাইয়া ফুকিয়া উড়াইয়া দিতেছে ইহা চন্দন-মণি সঙ্গ করিতে পারিতেছিল না; এজন্ত সে প্রত্যেকের পাওনা যথাসাধ্য করমকষিয়া করিয়া কমাইয়াছে। যে এক-সের চাউলের সিধা পাইত, সে এখন আধসের পায়; আগে যত মাছতরকারী রান্না হইত এখন তাহার অর্দ্ধেক হয়, পাচকেরা ঘি-তেলের টানটানি লইয়া অসন্তোষ ও রক্ষনে অক্ষমতা প্রকাশ করে; চাকর-দাসীরা খাইতে পায় না বলিয়া খুঁৎখুঁৎ করে; যাহারা আগে লুচি খাইত তাহাদের কুটি ও যাহারা কুটি খাইত তাহাদের ভাত বরাদ্দ হইয়াছে;—চন্দনমণি ত আর সমস্ত লুটাইয়া দিয়া কুবেরকে ফতুর হইতে দেখিতে পারে না। সকলেরই বরাদ্দ কমিয়াছিল, কেবল রাখাল মণিমালা ভূপাল ও রাণী জগদ্ধাত্রীর নিয়মিত বরাদ্দ কমাইতে তাহার সাহসে কুলায় নাই; তবে রাখাল ও মণিমালার বরাদ্দ নামে মাত্র ঠিক ছিল, তাহাদের লুচির ছুপিষ্ট ভাজা হইত না। আর বরাদ্দ বাড়িয়াই চলিয়াছিল চন্দনমণির নিজের ও তাহার স্বামী বন্ধবিহারীর। ক্ষীর-পারা দুধ না হইলে তাহার

খাইতে পারে না, আধা-ছানার মণ্ডা ছাড়া মুখে রুচে না, পোনাও কালিয়া লুচি কচুরি সর ননী প্রায়ই চাই—কারণ এই রকমই তাহাদের খাওয়া চিরকালের অভ্যাস।

রাখাল লুচি ছিঁড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল—মামী, এই কাঁচা লুচির চেয়ে দুটি সুস্বাদু ভাতের ব্যবস্থা যদি করে দাও.....

চন্দনমণি সমস্ত শরীর ছলাইয়া কপালে চোখ তুলিয়া বলিল—ওমা! লুচি কাঁচা আছে কি গো! এমনি লুচিই ত আমার বাবুদাদার বাড়ীতে হয়!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—তোমার বাবুদাদা বুঝি খুব বড়লোক!

—বড়লোক আবার নয়। সাতমহল বাড়ী, হাতী-শালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া! পায়রার ডিমের মতন গঞ্জমোতির একছড়া হার আছে; বাবুদাদা হাতীর দাঁতের তক্তপোষে শোন; গোলাপজলে মুখ ধোন! শিকার করতে যান বাঘ সিংহী গণ্ডার সজ্জা কত কি; হাতীর পিঠের ওপর সোনার জ্বিন কষে!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—ঘোড়ার জ্বিন মামীমা, হাতীর হাওদা।

চন্দনমণি আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিল—ওমা! মণি! তোদের এখানে বুঝি হাওদা বলে! আমাদের এখানে বলে জ্বিন। তোদের বুনো দেশের বুনো কথা শুনে হাসি পায় বাছা। হাওদা! হাওদা আবার একটা কথা হল!

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—কিন্তু লুচির সঙ্গে সিমের তরকারীও কি তোমার বাবুদাদা ভালোবাসতেন?

—উঃ বড্ড! সাতটা বাগানে শুধু সিম হত! একবার এত সিম হয়েছিল যে সোম-বচ্ছর কাঠ কিনতে হয়নি, সিম আর আমসির জালে রান্না হল! বাবুদাদা বলতেন; আহা! এমন সিম সব পুড়িয়ে ফেলছিস তোরা চন্দন! আমায় সিমের কোণ্ডা কালিয়া ছেঁচকি করে দিস! সকাল বেলা পাঁউরুটি জল-খেতেন কিনা, সন্ধ্যাে উঠে বারো মাস ত্রিশ দিন সিম-ছেঁচকি আর পাঁউরুটি টাটকা করে দিতে হত।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—পাঁউরুটি করতে জানো নাকি মামীমা?—

—প্ছ! আমরা করতে যাব কেন? হালুইকর বামুন ছিল; বেলে বেলে তেলে ফেলত আর ফোঁস ফোঁস করে ফুলে উঠত!

ইহার পর আর কেহই কোনো কথা বলিতে পারিল না। রাখাল মাথা নীচু করিয়া আহায়ে মনোযোগ দিল। মণিমালা ভূপালের মাছের কাঁটা বাছিবাব জন্ত খুব ঝুঁকিয়া পড়িল। কেবল বন্ধবিহারী সহধর্মিণীর আভিজাত্যগোরবের সম্মুখে সকলকে অধোবদন ও নিরন্তর দেখিয়া বুক ফুলাইয়া মোজা হইয়া বসিয়া ঘন ঘন গৌঞ্জে চাড়া দিতে লাগিল।

নমণি রাখালকে পাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়া বলিল—সিম-ছেঁচকি খেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে কি বাবা? আলুর তরকারী এনে দেবো কি একটু?

রাখাল মুখ তুলিয়া প্রসন্ন মুখে বলিল—আমি গরিবের ছেলে মামী, আমি তোমাদের মতন কোনো বাবুদাদার ঐশ্বর্য্য চোখেও দেখিনি; আমি যে-দাদামশায়ের বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলাম সেখানে এই সিম-ছেঁচকিও আমার জুটত না, দিদিমা আমাকে কলাপোড়া ভাত দিতেন! তাই, আমার কিছুতেই কষ্ট হয় না; আমার মনে কষ্টের টিকে দেওয়া হয়ে গেছে।

মণিমালায় চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরিতে লাগিল, মণিমালা ভূপালের মাছের কাঁটা-বাছা ফেলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনমণি রাখালের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—তা ত বটেই, ঠিক কথাই ত। তুমি গরিব গেরস্তবরের ছেলে, তোমার যা-তা একটা কিছু হলেই হল। কিন্তু আমি ত দাদাবাবুর বাড়ীতে মানুষ! হলে হবে কি? আমারও ভালো জিনিস মুখে রুচত না। বাড়ীতে সোনার সামিগুগিরি থইথই করছে, আমি তা খেতে পারতাম না, আমি সেই ময়রার দোকানে গিয়ে মুড়িমুড়কি কিনে খেতাম! ছেলেবেলায় পয়সা ত পেতাম না—এক-একখানি করে তাবিজের দাঁতি খুলে খুলে ময়রাকে দিতাম আর মুড়িমুড়কি খেতাম!

রাখাল হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাবুদাদা কৃপণ ছিলেন বুঝি? পয়সা হাত থেকে বেরুত না?

—কৃপণ! এক-ঝাঁকা সিকি-পয়সা ছিল; সিকি-পয়সার রেওয়াজ উঠে যেতে সেই এক-ঝাঁকা সিকি-পয়সা নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ঢেলে দিলেন; গাঁয়ের ছেলেরা তাই নিয়ে ময়না-পুকুরে ছিনিমিনি খেলত! ... তুমি যে কিছুই খেলে না বাবা?

রাখাল হাত শুটাইয়া বসিয়া ছিল। বলিল—সামান্য জিনিস খাওয়া অভ্যেস করেছিলাম মামী, কিন্তু কাঁচা খেতে অভ্যেস করিনি।

চন্দনমণি মুখ নাড়িয়া বলিল—লুচি খাওয়া তোমার অভ্যেস নয় কিনা, তাই অমন লাগছে। আচ্ছা, কাল থেকে ভাতের ব্যবস্থাই করে দেবো!

(৪৩)

রাখাল আঁচাইয়া ঘরে আসিতেই মণিমালা তাহার হাত ধরিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল—এইবার বাড়ী চল।

রাখাল ব্যথিত হাসি হাসিয়া বলিল—বাড়ী! বাড়ী ত আমার কোথাও নেই মণি! গোসাঁইগঞ্জে রাঙাদিদিমা তোমাকে যে কষ্ট দেন, মামী আমাকে তা এখনো দিতে পারেননি। আমি তোমাকে সে কষ্টের মধ্যে আর টেনে নিয়ে যাব না, আমার এ কষ্টের চেয়ে সেখানে তোমার কষ্ট আমার মনকে বেশী পীড়া দায়।

—রাঙা-দিদির কাছে না হয় না থাকব, ছুজনে এক-খানা কুঁড়ে করে তোমার উপার্জনের খুন্সুড়ো আমি হাসিমুখে খাব; সেখানে আমি তোমাকে ত যত্ন করতে পারব।

—গোসাঁইগঞ্জে গিয়ে থাকব অথচ যাদের ধৈর্য্যে আমি মানুষ তাদের থেকে পৃথক হয়ে থাকব এ আমাকে দিয়ে হবে না। যেতে হলে তাঁদের সংসারেই থাকতে হবে। কিন্তু মণি এখানে আমার কিছু কষ্ট নেই, কেন তুমি ব্যস্ত হচ্ছে? কুবের আমাদের হাতে এসে পড়েছে, তাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবে?—সে ত শুধু তোমার মামার ছেলে নয়, সে যে এখন তোমারই মা-বাপের ছেলে; তোমার ভাই!

এ কথায় মণিমালাকে নিরন্তর হইতে হইল, কিন্তু

তাহার মন আরাম পাইল না। তাহারা চলিয়া গেলে কুবেরের কষ্ট খুবই হইবে, কিন্তু—

এই কিন্তুটা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার সাহায্য করিল অতি গোপনে কাঙালী।

কাঙালী বন্ধবিহারীকে পরামর্শ দিল যে বন্ধবিহারী বোর্ডে দরখাস্ত করুন এই বলিয়া যে নাবালগ রাজার শিক্ষা ও রক্ষণের ভার রাখালের উপর দেওয়া অত্যন্ত হইয়াছে, কারণ রাখালের স্বার্থ কুবেরের স্বার্থের বিরোধী; এরূপ বিরুদ্ধ-স্বার্থের লোকের হাতে বালক রাজার ভার পড়াতে রাজার শারীরিক মানসিক ক্ষতি ও অপকার হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বালক রাজার মুক্ত্য হইলে যখন রাখালের পুত্রেরই বিষয়ের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা তখন রাখালের নিকট কুবেরের হিত আশা করা অগ্নি হইতে জল লাভের আশার ন্যায় নিতান্তই অসম্ভব।

বন্ধবিহারী খুসী হইয়া বলিল—বাবাজী, তুমি তীক্ষ্ণদী আছ! ভবিষ্যতে তোমাকে মন্ত্রী করে দেবো! বাবাজী, তুমিই দরখাস্তটা মুসাবিদা করে লিখে দিও—তুমিই আমার দক্ষিণ হস্ত, হবে না কেন, ভক্তিমান ভগ্নীপুত্র আছ!

—এই দরখাস্তটাতে যদি রাণীমার দস্তখত করিয়ে দিতে পারেন তবে খুব জোর হয়।

—তার আর চিন্তা কি! সে হয়ে যাবে!

কাঙালী দরখাস্ত লিখিয়া দিল। বন্ধবিহারী সেইখানা লইয়া গিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে সই করিয়া দিতে বলিল। জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—এটা কি?

—কুবেরের জন্তে একজন ভালো মাষ্টার রাখবার দরখাস্ত।

—কেন, রাখাল ত পড়াচ্ছে?

—রাখাল ত সদাসর্বদা নানান কাজ নিয়ে নাম কিনতেই ব্যস্ত, ও কি কুবেরকে পড়ায়, না ও খোঁজ রাখে? আর ও অস্থায়ী লোক, বাড়ী চলে যাবে শুনিছি, কুবেরের ভালো হয়েছে এ আর চোখে সহ্য হচ্ছে না। এ রকম হিংস্র লোকের হাতে কুবেরকে ছেড়ে দেওয়া আর যমের মুখে ছেড়ে দেওয়া দুইই সমান। আপনি দেখেছেন ত দিদি, রাখাল কুবেরকে কি রকম শাসনই না করে? সেদিন একটু তামাক খেয়েছিল বলে বেদম করে মারলে। স্বাধীন

নৃপতির গায়ে হাত তোলা! রাজা সে, তামাক খাবে না?

জগদ্ধাত্রী দেখিলেন কথাগুলো সমস্তই যুক্তিসঙ্গত বটে। তিনি কলম লইয়া সই করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রত্যেক-বার সই করিবার সময় তাঁহাকে নামের বানান ও অক্ষর লিখিতে দেখাইয়া দিতে হইত; বন্ধবিহারী বলিতে লাগিল—এইখান থেকে লিখুন,—ঐ, ম, তয়ে দীর্ঘদ্বি, রয়ে আকার, মুন্ধ্য গয়ে দীর্ঘদ্বিকার, বর্গীয় জ, গ, দয়ে ধয়ে আকার, তয়ে রফলা—এ লিখে মাত্রা দিন, হাঁ, এই দিকে এইখানে দীর্ঘদ্বিকার দিন, তারপর দয়ে একার, বয়ে দীর্ঘদ্বিকার, চয়ে ঔকার—এদিকে একার, এপাশে আকার দিয়ে মাথা উড়িয়ে দেন, হাঁ ঠিক হয়েছে, ধয়ে হষউ, রয়ে আকার, মুন্ধ্য গয়ে দীর্ঘদ্বিকার। পাশে একটা কসি টেনে দেন, হাঁ।

দরখাস্ত ম্যানেজারের মারফতে বোর্ডে প্রেরিত হইবে; ম্যানেজারকে দেওয়া হইল। ম্যানেজার কুবেরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রাখাল-বাবু উপর টুমি খুসী আছে?

কুবের ঘাড় জোরে নাড়িয়া বলিল—না।

—কেন?

—বড় বকে, মারে।

—দোস্‌বা মাষ্টার হোলে টুমি খুসী হোবে।

কুবের উৎসাহিত হইয়া বলিল—হাঁ।

তারপর ম্যানেজার রাখালকে ডাকিয়া বলিল—রাখালবাবু, দেখেছেন?

রাখাল দরখাস্তের নীচে রাণী জগদ্ধাত্রীর সই দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল—‘না এমন কথা লিখলেন? মাও আমাকে সন্দেহ করছেন!’

—কিন্তু একথা তার একবারও মনে পড়িল না যে রাণী জগদ্ধাত্রীর নিজের শিক্ষা ও বুদ্ধি মোটেই নাই, তিনি যে-রকম দুর্বল চরিত্রের লোক তাহাতে তাঁহাকে দিয়া কিছু করাইয়া লওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিত হাসি হাসিয়া রাখাল বলিল—এ কথাটা আমারই মনে পড়া উচিত ছিল; কুবেরের শিক্ষণ ও রক্ষণের ভার আমার নেওয়া একেবারেই উচিত হয়নি এখন বুঝতে পারছি। আপনি এ দরখাস্ত বোর্ডে পাঠিয়ে দিন।

—তার চেয়ে আপনি পরত্যাগ করে আমার মারফতে বোর্ডে একখানা ইস্তফা-পত্র পাঠিয়ে দিন, আমি এ দরখাস্ত পাঠাব না।

রাখাল ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ভাবিয়া বলিল—না সাহেব, এ কথা ত আমার নিজেকে থেকে মনে পড়েনি, এই দরখাস্ত আপনি দেখালেন বলে মনে পড়ল। আমি ইস্তফা দেবো না, বরখাস্ত হওয়ার অপমানই আমাকে স্বীকার করতে হবে—সেটা আমার গ্রায্য প্রাপ্য।

সাহেব ম্যানেজার আপন মনে বলিয়া উঠিল—
O how noble !.....রাখালবাবু, আমি আপনাকে যত দেখছি আপনার ওপর তত শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

রাখাল লজ্জিত হইয়া বলিল—আপনি আমাকে বন্ধুত্বের সম্মান দিয়েছেন বলে ওরূপ মনে করছেন। আমি ত শুধু ত্রায় আর কর্তব্য পালন করতে চেষ্টা করি, মানুষের এতে প্রশংসা পাবার কিছু নেই, না করলে নিন্দা পাবার কারণ আছে বটে।

বোর্ড হইতে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া গেল; রাখালকে বরখাস্ত করা হইল। এত বড় গর্কিত রাখালের এই অপমানে বন্ধুবান্ধবী ও কাঙালী খুব উৎফুল্ল হইল, কিন্তু আর সমস্ত দেশের লোক এত বড় মানী-লোকের গৌরব-হানি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আবার রাণী জগদ্ধাত্রীর সহকরী আর-এক দরখাস্ত পড়িল রাখালের স্থানে কাঙালীকে শিক্ষক ও রক্ষক নিযুক্ত করা হোক।

ম্যানেজার রাখালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা রাখালবাবু, এই ষ্টেটের কর্মচারীদের মধ্যে কাউকে কি ওভার টিউটর গার্ডিয়ান হওয়ার উপযুক্ত মনে হয়?

রাখাল অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—কাঙালী হলে আপাতত কাজ চলতে পারে; তবে সে আমার আনা আমার দেশের লোক, তাকে নিযুক্ত করলেও আপত্তি হবে।

ম্যানেজার হাসিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর আবেদন দেখাইল। রাখাল দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল—তা হলে ঠিকই হয়েছে, আপনি সুপারিশ করে দিন।

—কত মাইনে দেওয়া যাবে ওকে? এখন এক-শ টাকা পাচ্ছে।

—তুশো টাকা হলেই ঠিক হবে বোধহয়।

—বড় বেশী হল না? আমি একশ পঁচিশ কি দেড়শ লিখব ভাবছিলাম।

—কাজের দায়িত্ব বড় বেশী, আর পদের মর্যাদার অমুরূপ বেতন না হলে লোকের কাছে ও সম্মান পাবে না।

—আচ্ছা তবে তাই হবে।

ম্যানেজার কুবেরকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—
কাঙালীবাবু মাষ্টার হোলে তুমি খুসী হোবে?
কুবের উৎফুল্ল হইয়া বলিল—হাঁ, খুব।

—কেনে?

—কাঙালী-বাবু আমাকে রাজাবাবু বলে, ওর সামনে আমি তামাক খাই, তবুও আমাকে কিছু বলে না—এক-দিন আমাকে তামাক সেজে দিয়েছিল।

ম্যানেজার হাসিল।

কাঙালী তুশো টাকায় কুবেরের শিক্ষক নিযুক্ত হইল। কিন্তু সে রাখালের উপর হাড়ে চটিয়া গেল—কারণ, ম্যানেজারসাহেব তাহাকে আড়াইশো টাকা বেতন দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, রাখাল মাঝে পড়িয়া পঞ্চাশ টাকা কমাইয়া দিয়াছে—সাহেবের খানসামা জুমনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে নাকি জানিয়াছে!

(৪৪)

রাখাল মণিমালাকে বলিল—মণি, আমার এখানকার কাজ চুকে গেছে, এইবার চল।

মণিমালার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিম্প্রভ হইয়া গেল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—এখন যাওয়া ঠিক হবে না, লোকে বলবে এতদিন আমরা স্বার্থের জন্তে পড়ে ছিলাম, যেই কাজ গেল অমনি আমরা চলে যাচ্ছি। আরও, আমরা চলে গেলে কুবেরের বড় আবস্থা হবে।

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—তা বটে। কিন্তু এখানে শুধু-শুধু বসে ভাত ধরস করটা কি ভালো দেখাবে?

মণিমালা মনে মনে খুসী হইয়া বলিল—তবে এখন চল মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আসি।

রাণী জগদ্ধাত্রী ভাত খাইয়া শুইয়া একটি সোনা-বাঁধানো কলি-হাঁকায় তামাক খাইতেছেন, সর্ব্বর মা ও বুনকিয়া

দাসী পা চাপিতেছে, চন্দনমণি মাথার কাছে বসিয়া পাকা চুল তুলিয়া দিতেছে। মণিমালা পিছনে পিছনে রাখালকে সেই ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছ'কাটা তিনি চন্দনমণির হাতে দিয়া বলিলেন—বৌ, বৌ, শিগগির এটা লুকোও!

চন্দনমণি ছ'কা লইয়া বলিল—তুমি দিদি ওদের দেখে ভয় কর!

জগদ্ধাত্রী লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—ভয় নয়, ওরা খায় না তাই ওদের কাছে খেতে লজ্জা করে।

চন্দনমণি কোনো দিন তামাক খাইত না; সে দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া রাখাল ও মণিমালা যাহাতে দেখিতে পায় এমন ভাবে খুব সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ভড়র ভড়র করিয়া তামাক টানিতে লাগিল। রাখাল ও মণিমালা তাহা দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনমণি উচ্চরবে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, রাণী জগদ্ধাত্রীও খুলখুল করিয়া হাসিতে লাগিলেন—রাখাল ও মণিমালা খুব জন্ম হইয়া গিয়াছে।

চন্দনমণি বলিল—দেখলে দিদি! এ বাড়ীর কর্তা তুমি আর আমি; ওরা ত নয়! ভয় করতে হয় ওরা করবে, আমাদের যা খুসী আমরা করব। পছন্দ না হয় ওরা নিজের পথ দেখুক!

জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিলেন—ওরা যাবে যাবে শুনছিলাম, কবে যাবে?

—গেলেই হল, কোনো কাজ নেই কম নেই, উড়ে বসে খুরো লুসছেন আর কুবিরের হিংসেতে জলে মরছেন বৈ ত নয়!

জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া গেলেন।

চন্দনমণি প্রথম স্বেষাগ পাইয়া কাছে বেসিয়া বসিয়া জগদ্ধাত্রীর চুলের রাশি হাতে তুলিয়া বলিল—এমন রেশমের মতন চুল এক ঢাল, তুমি বাঁধো না কেন দিদি?

—পিঠের ওপর পড়ে' যখন গা-টা গিজ-গিজ করে তখন এক-একবার ভাবি বাঁধি, কিন্তু মণি আর রাখাল কি মনে করবে ভেবে বাঁধতে পারিনে।

চন্দনমণি আর কথাটি না বলিয়া উঠিয়া গিয়া আলমারী খুলিয়া আয়না চিরুণী ফিতে কাঁটা অরির গোটা আনিয়া বলিল—দিদি উঠে বস।

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া বসিয়া হাসিয়া বলিলেন—এই বুড়ো বয়সে কি সং সাজাবি বৌ! চুলটা না হয় জড়িয়ে দে, খোঁপায় আর গোটা দিসনে! বুড়ো বয়সে লোক হাসবে?

চন্দনমণি চুল বিছুলি কবিত্তে করিতে বলিল—বুড়ো! আমি পুরুষমানুষ হলে তোমায় নিকে করতাম!

জগদ্ধাত্রী খুসীতে খুলখুল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

চন্দনমণি একখানি কালা-ফিতে-পাড় ফরাসডাঙার ধুতি বাহির করিয়া জগদ্ধাত্রীকে পরাইল; গহনার বাক্স খুলিয়া গলায় হার, বাহাতে অনন্ত, আঙুলে আংটি পরাইল।

জগদ্ধাত্রী খুসী হইয়া বলিলেন—করছিস কি বৌ? বিধবা মানুষের কি এসব পরতে আছে?

চন্দনমণি বলিল—বিধবার পরতে নেই নোয়া সিঁচুর আলতা! গহনা পরতে দোষ নেই।

চন্দনমণি জড়োয়া বালা তুলিয়া পরাইতে গেল।

জগদ্ধাত্রী কুণ্ঠিত হইয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন—না, না, নীচে-হাতটা শুধু থাক।

রাণী জগদ্ধাত্রীর মনের মধ্যে যে বিলাসিতা অতৃপ্তিতে ব্যথিত হইয়াও লোকলজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া ছিল, তাহা চন্দনমণির সাহায্যে ও সমর্থনে সার্থক হইতে পারিয়া রাণীকে অত্যন্ত আরাম ও আনন্দ দিল।

মণিমালা ও রাখাল চন্দনমণির তামাক খাওয়া দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল; ক্ষণেক বিলম্ব করিয়া আবার তাহারা আসিয়া দেখিল এই অভাবনীয় ব্যাপার।

মণিমালা অবাক হইয়া মায়ের কাণ্ড দেখিল। তাহার নিকটে একটু লজ্জিত হইলেও এই সজ্জায় তাহার মন খুসী আছে দেখিয়া সে দুঃখিত হইল। একেই সে মায়ের কাছে বিনা পাহারায় আসিতে পাইত না বলিয়া বড় একটা বেসিত না, তাহার উপর মায়ের এই বেশ দেখিয়া মায়ের জিসীমানায় থাকিতে তাহার আর প্রবৃত্তি মাত্র রহিল না।

রাখাল অজ্ঞায় দেখিতে পারে না। সে স্পষ্ট মুখের উপর বলিয়া বসিল—মা, এ আবার কি সং সাজলেন? এ আপনার উপযুক্ত হয়নি। এতে স্বর্গীয় মহারাজকে অপমান করা হচ্ছে।

রাণী জগদ্ধাত্রী মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন।

চন্দনমণিও রাখালের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মণিমালাও চলিয়া গেল।

রাখাল চলিয়া গেলে চন্দনমণি ঠোট উল্টাইয়া বলিয়া উঠিল—বাপরে! যারপরনাই ছেলে কুবির, সে কিছু বললে না, আর উনি কোথাকার কে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হয়ে এলেন শাসন করতে!

চন্দনমণি জগদ্ধাত্রীর কানে গুঞ্জন করিতে লাগিল—কণ্ঠনো গুনো না দিদি; তুমি বড়, না ওয়া বড়! মহারাজের মান কিসে থাকবে বা যাবে তা তুমি বোঝবেশী, না ঘুটে-কুড়ুনির ছেলে একটা কোথাকার হাভাতে টোঙর সে বেশী বোঝে? কুবির ত তোমায় কিছু বলে নি। যতক্ষণ সে কিছু না বলছে, ততক্ষণ তোমার কাকে ভয়?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া থাকিলেন। দেখিয়া চন্দনমণি বলিল—কণ্টক বিদায় করে দিলেই পার! তুমি না বলতে পার; আমি বলব।

জগদ্ধাত্রী তাহাতেও কোনো হাঁ কি না বলিলেন না দেখিয়া চন্দনমণিও সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

(৪৫)

রাণী জগদ্ধাত্রীর ঘর হইতে কিরিয়া আসিয়া মণিমালা রাখালকে বলিল—আর আমাদের এ বাড়ীতে থাকা উচিত নয়, আমরা ক্রমে ফাল্গুন হইতে উঠছি।

রাখাল চিন্তাশূন্য মুখে বলিল—কিন্তু এখন আমরা চলে গেলে এই পরিবারটাকে একেবারে সর্বনাশের মুখে ফেলে দিয়ে যাওয়া হবে। চন্দনমণি মাকে দুর্বল পেয়ে তাঁকে অধঃপাতের পথে ঠেলে নিয়ে চলছে।

—আমরা থেকে কি করব? কি বা করছি?

—আমরা অনেকখানি বাধা হয়ে আছি। আমরা সরে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। ওদিকে কাঙালী বড় হাঙ্গা ধরনের লোক, তার হাতে কুবের পড়েছে, কাঙালীকে সামলে রাখাও আমার কর্তব্য।

মণিমালা আবার নিরস্ত হইল।

কিন্তু চন্দনমণি নিরস্ত হইতে পারিতেছিল না। দিদিকে

অত্যাচারীর কবল হইতে রক্ষা করিবার আশ্রয় ও দরদ তাহার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

রাখাল সেদিন খাইতে বসিয়া বলিয়াছিল কাঁচা লুচি অপেক্ষা সুসিদ্ধ অন্ন তাহার অধিক রুচিকর। লুচি স্থপক হইল না, লুচির স্থান অন্ন গ্রহণ করিল। সেদিন রাজে এক-জায়গায় বসিয়া বহুবিহারী ও কুবের খাইল লুচি এবং রাখাল খাইল ভাত।

মণিমালা ঘরে আসিয়া রাখালকে বলিল—আর থাকা উচিত নয়, এখনো মানে মানে যাই চল।

—কেন, অপমান কোথায় দেখলে? লুচির চেয়ে ভাতই ত আমি ভালো বাসি; আমি ভাত খেতে চেয়েছিলাম বলেই ভাত হয়েছে।

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি আপনার বাড়ীতে শাক ভাত খেতে পার, কিন্তু পরের বাড়ীতে কেউ যদি নিজের লুচি খেয়ে তোমাকে ভাত খেতে দায় সেটা কি অপমান নয়? তোমার পায়ে পড়ি তুমি এখান থেকে চল।

—দাঁড়াও, আমি যে কটা কাজ আরম্ভ করেছি শেষ করে নিতে দাঁও, তারপর তোমার কথা শুনব।—পাঁচটা পরগণায় পাঁচটা বড় স্থল আর ধনরাতি ডাক্তারখানা করছি; এখানকার স্থলটাকে কলেজ করবার জন্তে লেখা লেখি হচ্ছে, হয়ত হবে। দেশটার একটু জী কিরিয়ে দিয়ে, লোকগুলোকে একটু মানুষ হবার পথ দেখিয়ে দিয়ে তবে যাব, ততদিনে কুবেরও সাবালগ হয়ে যাবে।

—এমনি করতে করতে তোমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, তখন কি আর তুমি কোনো কাজকর্ম করতে পারবে?

—নাইবা পারলাম মণি! আমাদের ছোটো পেটের জন্ত ভাবনা?

—যাট, জুপাল আর বিভা বেঁচে থাক, আমাদের ছোটো পেট হতে যাবে কেন?

—ওদের ভাবনা কুবের ভাববে মণি। আমি কুবেরের মজলের জন্তে আমার সমস্ত আশা ভরসা বিসর্জন দিলাম, আমার ছেলেদের সে দেখবে না? সে মামা, জুপাল ভাগনে; আর জুপাল অমনি তার মামার অশুগ্রহ নেবে না, ষ্টেটের সেবা করে তার বদলে রাজার ভাগনে হয়ে

প্রতিপালন হবে। কুবের তোমাকে কত ভালো বাসে দেখছ ত? সে ছুশালকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না, বিভাকে দেখলেই বৃকে করে নেয়।

মণিমালায় হৃদয় এই কথায় কুবেরের প্রতি স্নেহে ভরিয়া উঠিল। আহা বালক সে, সে দ্বিদিবে তাহার পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াও সকলের অনাদরে তাহার ব্যথিত হৃদয় সেই দ্বিদিরই স্নেহে জুড়াইতে চাহিতেছে। তাহাকে মণিমালা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই, সেও যে পরম নিশ্চিত মনে তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই স্নেহের বন্ধন কি কখনো টুটিবার?

মণিমালা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তবে একটি কথা আমার শুনতে হবে তোমাকে; তুমি আর সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে পাবে না, তোমাকে আজ থেকে ঘরে খেতে হবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল—তোমার মনের মধ্যকার রাজ-কস্তাটি এই কথা তোমাকে দিয়ে বলাচ্ছে। তা, আচ্ছা, তাই হবে।

আজ হইতে রাখাল এক-বাড়ীতে থাকিয়াও কতকটা ভিন্ন হইয়া পড়িল। এক সংসারে বামা হইলেও মণিমালা রাখালের খাবার যাহা পাইত তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া দিত।

একাদশী। রাখাল আজ ভাত খাইবে না। মণিমালা চন্দনমণিকে বলিল—মামী, আজ ষ্টব একাদশী।

চন্দনমণি অন্তরিক্তে মুখ ফিরাইয়া বলিল—লোকের বেরতো নিয়ম করতে হয়, নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে করা উচিত। আর নইলে সংসারে যা রান্না হবে তাই খেতে হবে। জোনাজাতের করমাস-মতন রাঁধতে হলেই ত চিত্তির।

মণিমালায় অন্তর্যন্ত রাগ হইল বলিয়া সে আর কোনো কথাই না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। ঠাকুর-বাড়ীতে রাজে ঠাকুরের ভোগ হয় লুচি। মণিমালা ঠাকুর-বাড়ীর পরিচারক গুরুপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিল—গুরুদাদা, আজ ষ্টব একাদশী, রাত্তিরে লুচি খাবেন; বাড়ীতে লুচি ভাজার সুবিধে হবে না; তুমি একপোয়া ময়দা কিনে ঠাকুরের লুচি ভাজা হলে যদি একটু কষ্ট করে ভেজে দ্যাও।

এখন আমার হাতে পয়সা নেই, ময়দার দাম তোমায় ছুদিন পরে দেবো!

হায় রাজার মেয়ে! একপোয়া ময়দা কিনিবার পয়সা হাতে নাই!

গুরুপ্রসাদ ব্যথিত হইয়া বলিল—দিদি, পয়সা দিতে হবে কেন? ঠাকুরবাড়ীর ময়দাও ত সে তোমারই বাপের পয়সার।

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার বাপের পয়সায় তাহার আর অধিকার কে?

শীঘ্রই বাড়ীর চাকর-দাসীরা টের পাইল যে জামাই-বাবুর আজ একাদশী; কিন্তু চন্দনমণি তাহার খাওয়ার ব্যবস্থা কিছুই করিল না। সকলেই চন্দনমণিব উপর দারুণ বিরক্ত হইয়াছিল, ইহাতে সকলে বেশী করিয়া বিরক্ত হইল।

খাবারের পরিচারক প্রাণকৃষ্ণ সন্দেশ ও চিনি লইয়া গিয়া মণিমালাকে দিয়া আসিল; ঘিহু ভাঙার হইতে ক্ষীর ও কলা লইয়া গিয়া দিয়া আসিল। মণিমালা স্বামীর জন্ত চাকরদের এই চুরি-করা দানও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। তাহাকে কুন্তিত হইতে দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ ও ঘিহু বলিল—এসব ত আপনারই জিনিষ আপনাকে এনে দিচ্ছি দিদি!

রাজে রাখাল খাইতে বসিয়া আহারের বিবিধ প্রচুব আয়োজন দেখিয়া হাসিয়া বলিল—দেখ ত কত আয়োজন হয়েছে, আর তুমি বল কিনা যে মামী বিরক্ত হন! লুচি কাঁচা ছিল বলেছিলাম বলে আজকে কেমন খর লুচি ভেজে দিয়েছেন!

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিতে পারিল না।

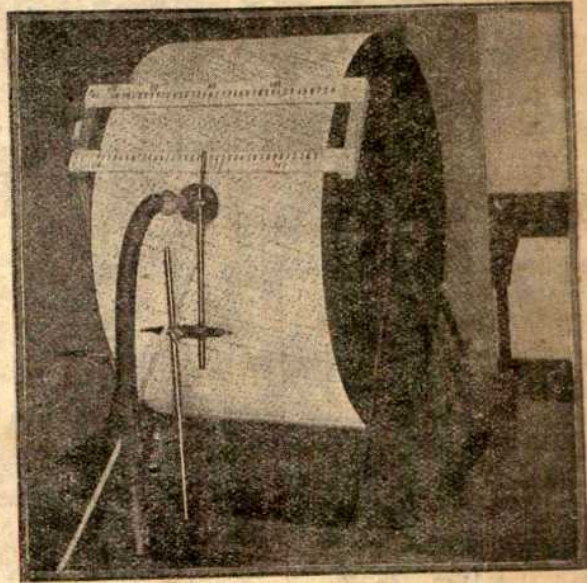
রাখাল মণিমালায় নান মুখ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। বুঝিতে পারিল এই আহার জোগাড় করিতে মণিমালাকে অনেক দুঃখ সহিতে হইয়াছে। রাখালের গ্রাস আর মুখে উঠে না, মুখের খাবার গলা দিয়া নামে না। রাখাল গন্তীর হইয়া মাথা নত করিয়া খাইতে লাগিল। মনে মনে ঠিক করিল এ বাড়ীতে এই তাহার শেষ আহার, আর না।

মণিমালা রাখালের জন্ত দুখ পর্যন্ত লইতে আসিল না দেখিয়া চন্দনমণি আশ্চর্য হইয়া গেল। উহারা কি আজ তবে উপবাস থাকিবে, না নিজেরাই তোলা উননে কিছু রাঁধিয়া বাড়িয়া লইল, ইহা জানিবার জন্ত চন্দনমণির মন

পঞ্চশস্ত্র

বধিরের সঙ্গীত শিক্ষা—

জন্মবধিরেরা প্রায়ই বোবা হয়। ইহার কারণ এই যে তাহারা ছেলেবেলা হইতে অঙ্কের কথা না শুনিতে পাওয়ায় ভাবা শিখিতে পারে না। তাহাদের স্বর-যন্ত্র প্রথমে হৃৎ থাকিলেও ক্রমে অব্যবহারে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। আবার বাঁহারা জন্মবধির নহেন, তাহারা কথা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু বিপুলরূপে সঙ্গীতশিক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন ব্যাপার। কোনো বাদ্যযন্ত্রে স্বর বাঁধিবার সময়ে বা গলা সাধিবার সময়ে স্বর ঠিক-মত হইতেছে কি না তাহা আনন্দ-দিগের কর্ণই বলিয়া দেয়। কিন্তু সম্প্রতি একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহার সাহায্যে সঙ্গীত-বিদ্যায় চক্ষুই কর্ণের কার্য করিতে পারিবে। এই যন্ত্রটির নাম 'টোনোস্কোপ বা স্বর-দর্শক'।



টোনোস্কোপ বা স্বর-দর্শক যন্ত্রের কাঠামো।

বিন্দুগুলি ও স্বর-জ্ঞাপক সংখ্যাগুলি

দেখা যাইতেছে।

যন্ত্রটির প্রধান অঙ্গ একখানি পরদা। উহার উপরে ১৭,৫০০টি বিন্দু সাজানো আছে। আলোকের ভ্রাসবৃত্তি অনুসারে শুধু কতকগুলি বিন্দু দেখা যায় আর বাকীগুলি অস্পষ্ট হইয়া যায়। বিন্দুগুলি সাজাইবার কৌশল এজন্য যে, যে-বিন্দুগুলি কোনো বিশেষ আলোকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা রেখার মত সাজানো থাকে। মানুষের গলায় যতগুলি স্বর উঠিতে পারে, এই রেখার সংখ্যাও তত—প্রত্যেক রেখা এক একটি স্বর বুঝায়, রেখাগুলির ধারে ধারে কতকগুলি সংখ্যা বসানো আছে, তাহাতে বুঝা যায় কোন্ রেখা কোন্ স্বর।

টোনোস্কোপের সামনে একটা গ্যাসের বাতি জ্বলে। বিন্দু-চিত্রিত পরদাখানা একটা চোবের (cylinder) গায়ে ঝাঁটা থাকে। চোবটি স্থিতি বা তড়িৎ-বলে ঘুরিতে থাকে। অনেক দেখিয়া থাকিবেন যে নিকটে কোনো শব্দ হইলে আলোর শিখা নাচে। স্বতরাং এ

ছটকট করিতে লাগিল। চন্দনমণি এক বাটি দুধ হাতে করিয়া সন্ধান লইতে মণিমালার ঘরে গেল। রাখাল বিবিধ উপকরণ লইয়া খাইতে বসিয়াছে দেখিয়া ত তাহার চক্ষু স্থির! সে খাইতে না দিয়া এ যে রাখালের সুখের দশা করিয়া তুলিয়াছে, এই আপশোষ তাহার মনের সর্ব্বাঙ্গে চিম্টি কাটিতে লাগিল! সে অবাক হইয়া রাখালের রাজভোগ খাওয়া দেখিতে লাগিল।

চন্দনমণি আসিয়া স্তম্ভিত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রাখাল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে রুঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—অবাক হয়ে কি দেখছ?

সেই কথার আঘাতে নচেতন হইয়া চন্দনমণি খতমত খাইয়া বলিল—দুধ এনেছি। কিসে ঢেলে দেবো?

রাখালের মন ক্রোধে ঘুণায় লজ্জায় অপমানে পূর্ণ হইয়া ছিল। সে বা হাতের তেলো মাথায় চাপড়াইয়া কর্কশ স্বরে বলিল—মাথায়!

তাহার ক্রোধন স্বামী না জানি কি অনর্থ বাধায় এই ভয়ে মণিমালার তাড়াতাড়ি বলিল—আমার ত আর আলাদা বাসন নেই মামী, বাটি স্বাক্ষর রেখে যাও।

—এ বাটি যে রূপোর!

মণিমালার ম্লান মুখে হাসি টানিয়া বলিল—রূপো আমি চিনি মামী।

—যদি চুরি যায়? শিগগির করে ফেরত দিয়ে এসো।

—আমার বাবার বাটি, একটা যদি আমি চুরিই করি!

চন্দনমণি মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার বাবার ঘরে ছিল তবে ছিল, এসব এখন কুবিরের।

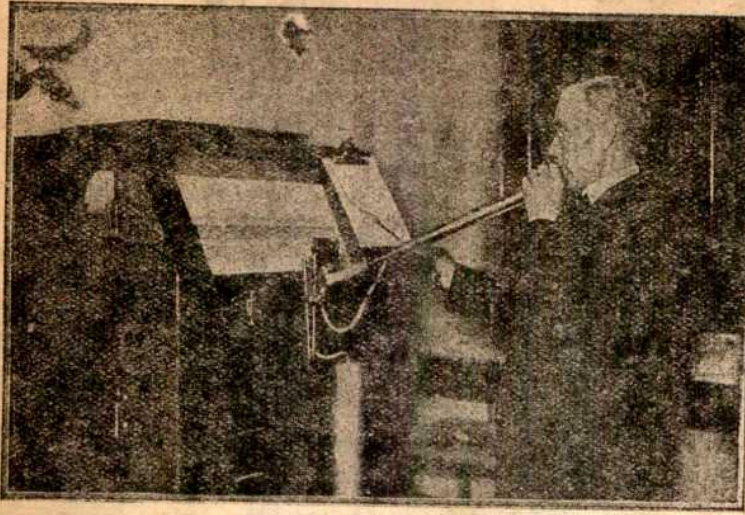
—কুবের এখন আমার বাবারই ছেলে, আমার ভাই। তুমি আর কুবেরের কেউ নও মামীমা।

চন্দনমণি একেবারে সঙ্কুচিত এতটুকু হইয়া ত্বকের বাটি রাখালের সামনে নামাইয়া রাখিয়া মণিমালাকে বলিল—বাটিটা বাসনের ঘরে রেখে এসো। রূপোর বাসন-সব কোন্ ঘরে থাকে জানো ত?

মণিমালার মুখ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—মামীমা, এ আমারই বাবার বাড়ী! তুমি এখানে কদিন এসেছ?

চন্দনমণি উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করিল। (ক্রমশ)

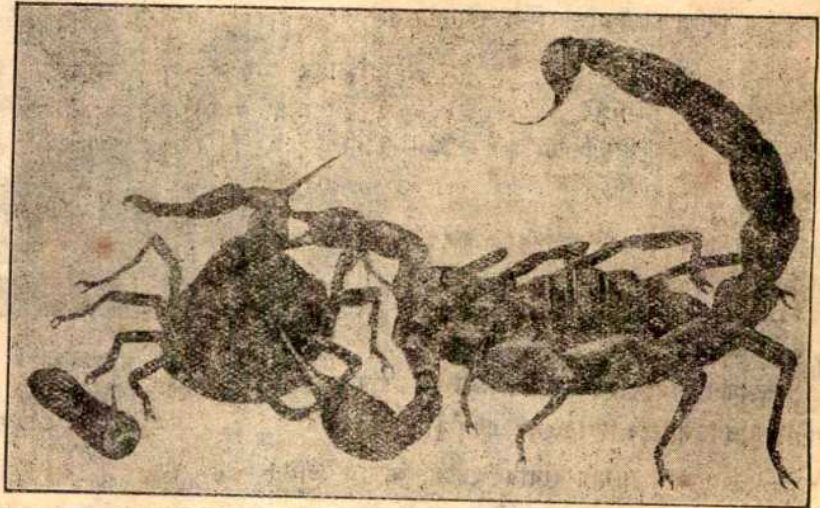
চাক বন্দোপাধ্যায়।



কালি-বোবা কথা কহিতে শিখিতেছে।
একটা কপার উচ্চারণে স্বরদর্শক বা টোনোস্কোপ যন্ত্রে যোগ্য
অঁক পড়ে, সেইরূপ অঁক উৎপাদন করিবার
চেষ্টার দ্বারা কথা কহিতে শেখা।

অবস্থায় কেহ যন্ত্রের নিকটে সঙ্গীত
আলাপ করিলে শব্দতরঙ্গে আলোর
শিখাটি প্রকম্পিত হয়। হ্রস্ব বত
উচ্চ হয় অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে
শব্দ-তরঙ্গের সংখ্যা বত বেশী হয়
শিখাটি ততই ছোট হইয়া যায়।
যে-স্বরে শিখাটি বত-টুকু ছোট হয়,
শিখার সেই অবস্থার আলোকে
টোনোস্কোপে শুধু সেই স্বর-জ্ঞাপক
রেখাটিই দেখিতে পাওয়া যায়।
সুতরাং গায়ক বিভিন্ন রেখাগুলি
দেখিয়া ও তাহাদের পার্থক্য সংখ্যা
দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে তাহার
স্বর ঠিক হইতেছে কি না।

ধরা যাক, একজন বধির ব্যক্তি
উদারার 'প' স্বরটি সাধিতেছেন।
শিক্ষার্থী এই স্বরটি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ
করিলে আলোটি বতটা কমিয়া যায়,
তাহাতে পরদায় চিহ্নিত উদারার 'প' রেখার বিন্দুগুলি শুধু দেখা
যাইবে—অল্প বিন্দুগুলি অস্পষ্ট থাকিবে। যদি স্বরটি একটু বেশী উচ্চ
বা নিম্ন হইয়া যায় তাহা হইলে আলোটিও একটু বেশী বা কম কমিবে
এবং পরদায় 'প' রেখা দেখা যাইবে না—অল্প কোনো রেখা ফুটিয়া
উঠিবে। ইহাতেই গায়ক নিজের ভুল ধরিতে পারেন এবং ঠিক যে-স্বর
উচ্চারণ করিলে পরদায় চিহ্নিত 'প' রেখাটি ফুটিয়া উঠে, চেষ্টা করিয়া
তাঁহাই অভ্যাস করিতে পারেন। এমনি করিয়া তিনি কানের সাহায্য
বিনাও অস্পষ্ট স্বর সাধিতে পারেন। যন্ত্রটির কাণ্ড এত সুন্দর যে স্বরের
একশত ভাগের একভাগ এদিক-ওদিক হইলেও ধরিয়া দিতে পারে।



মাদি কাঁকড়া-বিছে স্বামীহত্যা করিতেছে।

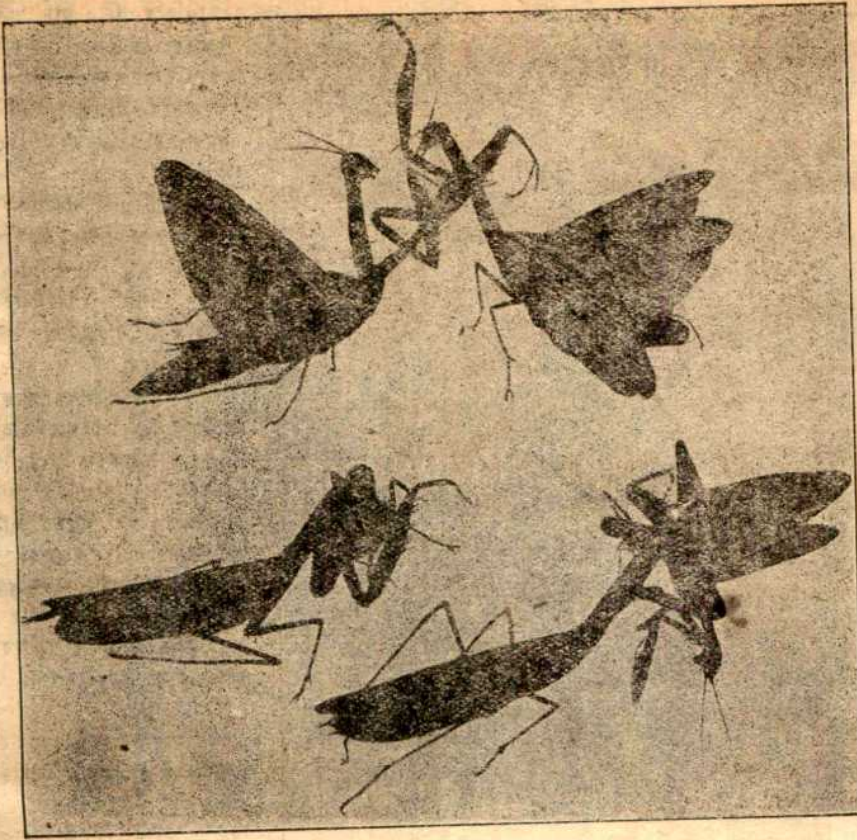
জীবের রাক্ষসী প্রবৃত্তি—

মানুষে মানুষ খায় শুনিলে আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে;
এমন কি কোনো জীবেরই প্রাণবধ করা অস্বাভাবিক বলিয়া আমরা মনে
করি। কিন্তু প্রাণী-জগতের রীতিনীতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে
জীবের রাক্ষসী প্রবৃত্তি প্রকৃতি-দত্ত। নিম্নতম পর্যায়ের প্রাণী থেকে
মানুষ পর্যন্ত সকলেই হয় স্বজাতির নয় অপর জাতির প্রাণবধ করিয়া
আত্মরক্ষা ও শরীর পোষণ বা বংশধার রক্ষা করে। লগুনের
ন্যাশন্যাল রিভিউ পত্রিকায় প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্বজ্ঞ কুমারী শ্রীমতী
ফ্রান্সেস পিট এ বিষয়ে একটি কৌতুককর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

এই যন্ত্র-সাহায্যে স্বল্প ব্যক্তিরও শিক্ষা-
কের সহায়তা ছাড়া বিস্তারিত সঙ্গীত শিক্ষা
করিতে পারেন। যাহারা বেহালা, বাঁশী,
কর্ণেট প্রভৃতি বাজান, তাঁহারাও নিজের
বাজানো ঠিক হইতেছে কি না তাহা যন্ত্র
বাজাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঠিক করিতে
পারেন। যন্ত্র বাজাইয়া যদি দেখিতে পান
যে টোনোস্কোপে স্বরলিপির অনুরূপ রেখাই
দেখা যাইতেছে, তবেই বুঝিতে পারেন যে
তাঁহাদের বাজনা ঠিক হইতেছে। এ ছাড়া
ইহাতে বধিরেরা কথা বলা শিখিতে পারেন,
বাগ্মিত-শিক্ষার্থীরা স্বরের রকমারি শিখিতে
পারেন। যন্ত্রটির উদ্ভাবয়িতা ডাক্তার সি
এফ. লোরেন্স এবং কার্ল ই সি-শোর
(Dr. C. F. Lorenz and Carl E.
Seashore)। তাঁহাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে
যন্ত্রটি আরো অনেক প্রয়োজনীয় কাজে
লাগিবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

**
**



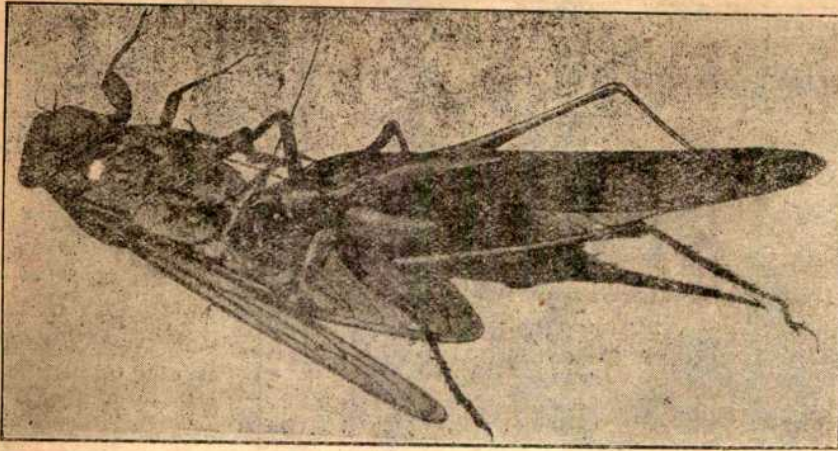
ফড়িঙের প্রমাণ—ফল গ্রণীর প্রাণনাশ ও দেহ ভক্ষণ।

প্রকৃতি শক্তির ভক্ত। অক্ষম অসমর্থ দুর্বল প্রাণীকে প্রকৃতি বিনাশ করে, হয় অপর কোনো বলবন্তর জাতির দ্বারা অথবা স্বজাতির পরমাত্মীর দ্বারা। বিনাশের দ্বারা যোগ্যতমের উত্তরন যখন প্রকৃতির নিয়ম, তখন সেই বিনষ্ট প্রাণীর শরীর মিছামিছি পচিয়া মাটি হয় কেন মনে করিয়া প্রকৃতি তাহা বিনাশকারীর খাদ্যরূপে তাহার শরীরপোষণের কাজে লাগাইয়া দায়—প্রকৃতির ভাঙারে এতটুকুও অপচয় হইবার তো জো নাই। সিংহ ব্যতী প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী অপর প্রাণীর রক্ত মাংস খাইয়াই নিজেদের প্রাণধারণ করে; বিড়াল নিজের সদ্যজাত বাচ্চা ও ইহুর সমান আনন্দেই ভক্ষণ করে। পাছে বংশ বৃদ্ধি হইয়া খাদ্যভাব ঘটে বা জীর অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এই ভয়ে অনেক জন্তু নিজেদের সদ্যজাত শাবকদের বধ করে ও কেহ কেহ খাইয়া আহারের অভাব মোচন করে। বানর ও হুমুমানের মদ্য বাচ্চা হইলে পালের পোতা তাহার পেট চিরিয়া প্রাণবধ করে, এজন্য মদ্য বাচ্চার জননী শিশুসন্তানকে বুক লইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া ফিরে, জমকের আক্রমণ হইতে ছেলেকে রক্ষা করিবার জন্ত জননী নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে, অনেক সময় ভয় ভুলিয়া মাঝবের ঘরের মধ্যে আশ্রয় লয়, দুর্দান্ত জনক ছেলের পেট নখে চিরিয়া মারিয়া ফেলিলেও জননী ছেলেকে বুক হইতে নামায় না, শেষে পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে হয় ফেলিয়া দায় নয়ত আপনার পেটে রাখিয়া দায়—প্রাণ ধরিয়া ফেলিতে পারে না। পেঁচা ও সোনালি ঈগল প্রভৃতি শিকারী পাখীর মাদিরা একই দিমে সমস্ত ডিম পাড়ে না; অথবা

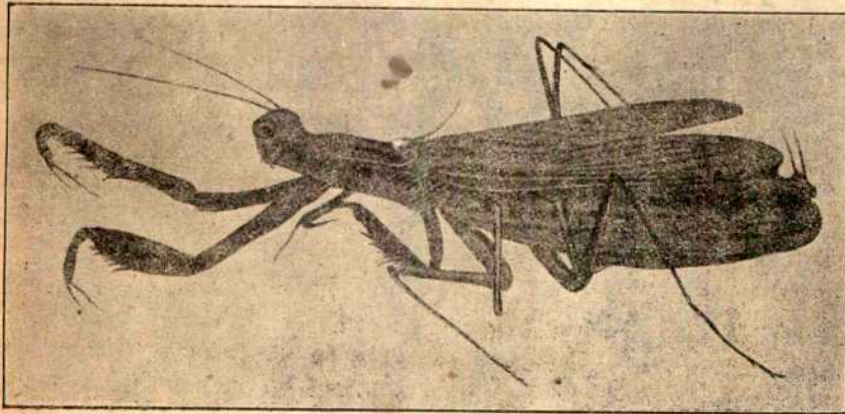
দ্বিমাটি পাড়িয়াই তাহার। তা দিতে বসিয়া যায়; হুতরাং আগেকার ডিমের বাচ্চা পরের ডিমের বাচ্চার অপেক্ষা আগে জন্মিয়া অল্পজন্মের চেয়ে বড় হুতরাং বলিষ্ঠ হয়; খাদ্যের সময় কাড়াকাড়ি লড়াইতে বড়তাই জয়ী হয় ও ছোটরা জখম হয়; জখমী বিকলাঙ্গ ভাইবোন বা সন্তান লইয়া পরিবারকে ভারী-জাল্ড করিতে তাহার। চাহে না; কাজেই সেই আহতকে একবারে বধ করিয়া জঠরানলে আহুতি দিয়া তাহার। নিশ্চিন্ত হয়। পরগোব ইহুর প্রভৃতি ভীষণ প্রাণী বিপদের সম্ভাবনা অথবা ধৃত বা বন্দী হইবার আশঙ্কা দেখিলে সমস্ত হইয়া তাড়াহুড়ি বাচ্চাগুলিকে নিজেদের খাইয়া সন্তানদের বন্ধনভর্য মোচন করে। সাপ, গিরগিটি, কুমীর, মাছ, জলের সোনাপোকা প্রভৃতি বহু প্রাণী নিজেদের ডিম ও বাচ্চা অথবা দুর্বল স্বজাতিকে খাইয়া থাকে। জলচর গিরগিটির সদ্যজাত বাচ্চাগুলি বেড়াটির মতন দেখিতে হয়; জনক-জননীর। নিজের সম্ভান ও

প্রতিবেশীর সম্ভানের পার্থক্য ধরিতে না পারিয়া নির্বিচারে আত্মপর ভেদ ভুলিয়া বাচ্চা ও বেড়াটি দুই খাইয়া থাকে। প্রজাপতির পলু ও কীড়া গাছের পাতার গারে থাকিয়া পাতা খাইয়া বাঁচে; কিন্তু পাতা খাইবার সময় একটা কীড়া অপর কীড়ার নাগাল পাইলে আর বাছবিচার করে না, পাতার সঙ্গে জাতভাইকে হুক পেটে পুরিয়া ছাড়ে। সাপের দাঁত মুখের ভিতর-দিকে থাকিলে, এজন্য সাপ কিছু কামড়াইয়া ধরিলে তাহা সমস্তটা গিলিয়া ফেলা ছাড়া বেচারার আর উপায় থাকে না, উগলাইতে গেলে তাহার দাঁত ভাঙিয়া প্রাণান্তকর ব্যাপার ঘটে; সাপ ইহুর মনে করিয়া ছুঁচা ধরিলে তাহার বিপদের অস্ত থাকে না, না পারে হুগন্ধ ছুঁচাকে গিলিতে, না পারে উগলাইয়া ফেলিতে; দুইটা সাপে একটা ব্যাং বা ইহুর কামড়াইয়া ধরিলে উভয়েরই বিপদ, যে উহারই মধ্যে আকারে বড় ও প্রবল সে ছোট দুর্বল জাতভাইকে হুক গিলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়।

কাকড়া-বিছে, ফড়িং, মৌমাছি, মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণীর মদ্যরা বাঁচিয়া থাকে শুধু বংশরক্ষার জন্ত; মাদি গর্ভধারণ করিলেই তৎক্ষণাৎ মদ্যকে মারিয়া ফেলে এবং কেহ কেহ বা মারিয়া খাইয়া ফেলে। এই সব প্রাণীর মাদিরা মদ্যদের চেয়ে আকারে বড় ও বলিষ্ঠ হয়, কিন্তু প্রাণিনির মন ভুলাইবার জন্ত মদ্যদের রূপ হুম্বর হয়; ইহাদের মদ্যরা প্রাণিনিদের কিছুতেই তুষ্ট করিতে পারে না, প্রাণ নিবেদন করিতে গেলে হাতাহাতি না হইয়া যায় না, সাধাসাধনায় যদি বা মন গার তবে তাহা প্রাণের বললে; প্রাণ জানাইতে আসিয়া



মাদি ফড়িং স্বামীকে বধ করিতেছে।



মাদি ফড়িং স্বামীকে গিলিতেছে।

প্রণয়িনীর বিরাগ বৃদ্ধিতে না পারিয়া বেশী সাধ্যসাধনা করিতে গিয়াও অনেক বেচারী প্রাণে মারা পড়ে। কাকড়া-বিছে দাড়া দিয়া প্রণয়ীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে, এবং সেই মরণ-আলিঙ্গনের সময় সে বেচারী বেশী ছটফট করিয়া মরিতে আপত্তি করিলে প্রণয়িনী লাজ উন্টাইয়া তাহার প্রণয়ীর গায়ে বার দুইচার হল ফুটাইয়া সকল নড়াচড়া ঠাণ্ডা করিয়া দায়।

পক্ষী বৃক্ষরক্ষী—

গাছ পত্রপল্লবের ছাতার তলে পাখীর মাথা রাখিবার জায়গা করিয়া দায়, পাখী গাছের শত্রু পোকা-মাকড়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়া গাছের প্রতাপকার করে। কোনো গাছকে না কাটিয়া শীত্র-মারিয়া ফেলিবার দরকার হইলে তাহাতে পাখী বসিতে না দিলেই কাজ সহজ হইয়া আসে। বাস্তবিক ইহা পরীক্ষিত সত্য। আমেরিকান ফরেস্ট্রি নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে; আমেরিকায় ছেলেরা খেলনা বন্ধুক লইয়া পাখীদের বধ করিয়া বা ভয় দেখাইয়া বেড়ায়, তাহার ফলে

লোকালয়ে পাখীর আসা বাও কম হইতেছে ও জনপদের উদ্ভিদ পোকার কবল হইতে রক্ষা ক দায় হইয়া উঠিয়াছে। জগতে সমস্ত পাখী উচ্ছেদ হইয়া গেলে সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত উদ্ভিদের বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। সকল পাখী চেয়ে কাঠঠোকরাই গাছের বেশ উপকারী বন্ধু, ইহার গাছে গায়ে পিপড়ে পোকা-মাকড় টিয়া খুঁটিয়া খাইয়া ফেলে, কাঠ গাছের শুকনো ফোঁপরা কাঠে ভিতরেও যাহারা জন্মিয়া গাছে তাজা অংশও কুরিয়া খায় তাহা রাও কাঠঠোকরার চৌকির চৌকর হইতে অব্যাহতি পা না, কাঠঠোকরা গাছের কাঠ ফুটা করিয়া গোপন গহ্বর হইতে গাছের শত্রু পোকা-মাকড়দের সন্ধান করিয়া বাহির করে; হুতরাং যে গাছে কাঠঠোকরা বসে বা বাসা করে সে গাছের আর মার নাই।

আমার কলিকাতার বাসার উঠানের ধারে একটা বেলগাছ আছে, তাহাতে কাকের আড্ডা ছিল; উঠান নোংরা করে বলিয়া কাক বসিলেই তাড়া দেওয়া হইত। এইরূপ ছয় বৎসরের চেষ্টায় কাকদের শোকে তাহাদের আশ্রয়-বৃক্ষটি শুকাইয়া পল্লবহীন কুস্কালসার হইয়া পড়িয়াছে।

ছেলেদের ঘড়ি ঘড়ি ক্ষুধা পায় কেন ? —

দি জানীল অফ্‌ দি আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন পজে বহু পরীক্ষালব্ধ ফল প্রকাশিত হইয়াছে যে একজন স্কুলে ভর্তি হইবার বয়সের বাড়ন্ত ছেলে একজন জোয়ান বয়সের চাষার মদ্য অপেক্ষা দেড়া খাবার না পাইলে তাহার পুষ্টির ও বাড়ির ব্যাবাস ঘটে। উঠন্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা জোয়ান লোকের চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ ৫ সওয়াগুণ বেশী খাদ্য রসরসে পরিণত করিয়া লইতে পারে; সেইজন্য তাহাদের ঘন ঘন ক্ষুধার উজ্জেক হয় এবং ক্ষুধানলে খাদ্যের আলানি না জোগাইলে জঠরানলে দেহের ক্ষয় হইতে থাকে। উঠন্ত বয়সের ছেলে-দের নিম্নলিখিত পরিমাণে খাদ্য দরকার হয়—

	প্রোটিন	তৈল	কার্বোহাইড্রেট বা শর্কর
মোট খাদ্য	২০.৫	২৫.৬	৬০.৫
অপচয়	৩.৮	৫.৪	৪.২
নিট দেহপুষ্টি	১৬.৭	২০.২	৫৬.৩



গৃহলক্ষ্মী ।

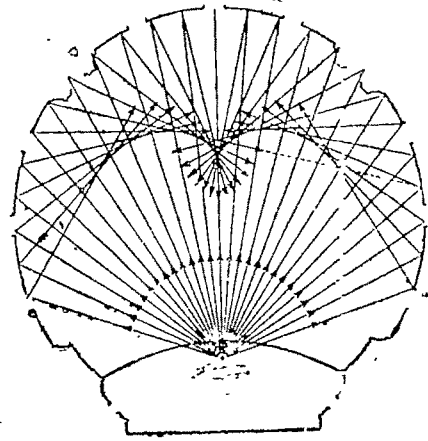
চিত্রকর শ্রীযুক্ত এ. ডি. নেটসন মহাশয়ের দৌজছে ।

এই দেহপুষ্টি খাদ্য হইতে আদায় করিতে হইলে কটি মাখন দুখ চিনি ভাত তরিতরকারি খাইলেই পাওয়া যায়; তদতিরিক্ত অল্প কিছু খাওয়া খাদ ও মুখ বদলের জন্য মাজ। উঠন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের এই সব টাটকা খাদ্য খুব ঘন ঘন খাইতে পাওয়া দরকার।

* *

বক্তৃতা-ঘরে প্রতিধ্বনি—

ঘরের দেওয়াল নিরেট কঠিন হইলে ও জানালা দরজা অল্প থাকিলে সেই ঘরে শব্দেব প্রতিধ্বনি হয়। বক্তৃতা অভিনয় বা সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি হইলে শ্রোতাদের বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয়, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে জড়া জড়ি হইয়া যায়। আবার খুব উঁচু ও ফাঁকা ঘর হইলে ধ্বনি ভাসিয়া বাহির হইয়া যায়, শ্রোতারা শুনিতে পায় না। এই ক্ষেত্রটি সংশোধনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বক্তৃতা-মঞ্চের পিছনে শব্দের প্রতিফলক লাগাইতে হইয়াছে, যাহাতে শব্দ প্রতিহত হইয়া শ্রোতার কানে পৌঁছে, উপরে বা বাহিরে ভাসিয়া না যায়। লর্ড রেলি আবিষ্কার করেন যে ঘরের দেয়ালের গায়ে চুলের বোনা বনাত কাপড় দেয়াল হইতে একটু ছাড়িয়া আঁটিয়া দিতে পারিলে সেই ঘরের সমস্ত শব্দ সেই কাপড়ে শুবিয়া যাইবে ও তাহাতে আর প্রতিধ্বনি হইতে পারিবে না। কি রকম আকারের প্রেক্ষাগৃহ বা শ্রোতৃমন্দির হইলে সমস্ত ধ্বনি সোজা গিয়া ও প্রতিফলিত হইয়া একই সঙ্গে শ্রোতার কানে পৌঁছিতে পারে অল্প কবিতা তাহারও নক্সা আঁকা হইয়াছে; ধ্বনি ও



শ্রোতৃসভার আদর্শ নক্সা।

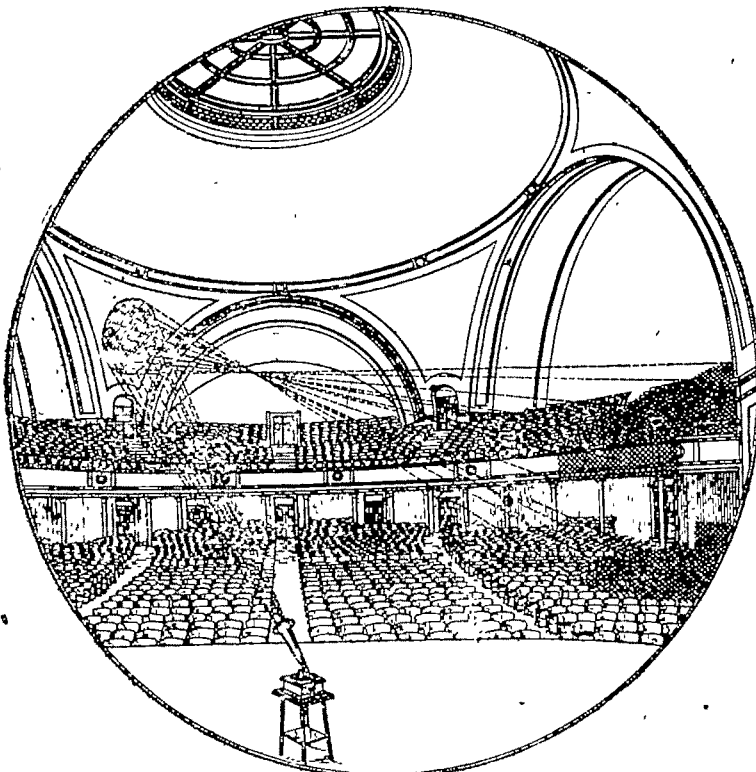
এ দিকের মঞ্চ হইতে বক্তৃতা বা সঙ্গীতের শব্দ শ্রোতাদের দিকে যাইবে ও প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপৌচর হইবে, তাহাতে একই ধ্বনি শোনা যাইবে, এক শব্দের প্রতিধ্বনির সহিত অপর শব্দের ধ্বনি মিশিয়া গুণগোল হইবে না।

প্রতিফলিত ধ্বনি একসঙ্গে কানে আসিলে কোনো অসুবিধা বোধ হয় না, কেবল ঘরের একটু বিকৃতি বোধ হয়। কিন্তু ধ্বনির পরে প্রতিধ্বনি শুনিতে পেরে ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি মিশিয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া তোলে।

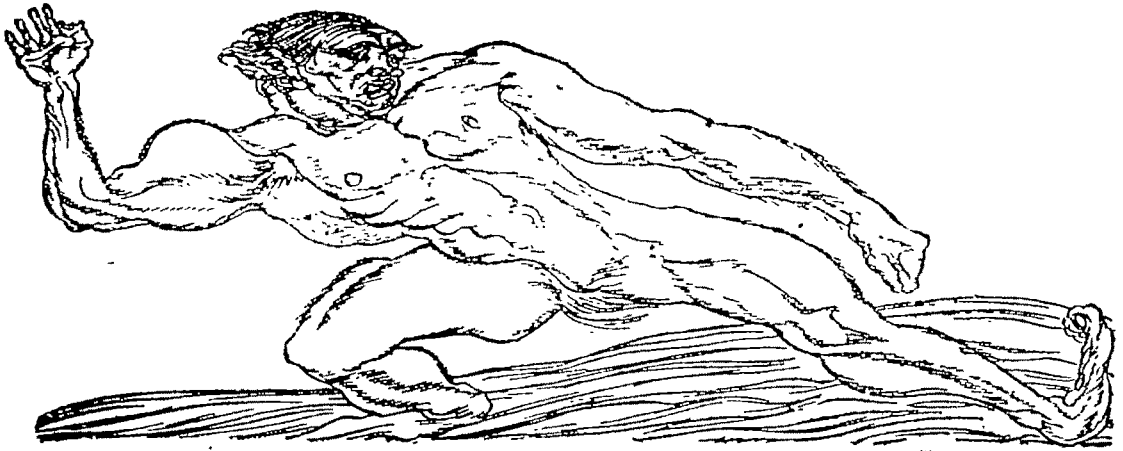
* *

খুস র খেয়ালে ছবির সাধনা—

আর্ট সম্বন্ধীয় জৈয়মাসিক পত্র ফরম; তাহাতে ইংরেজ শিল্পী অষ্টিন ও. স্পেয়ার এবং ফ্রেডেরিক ক্যাটার এই মত প্রচার করিতেছেন যে ভালো চিত্রকর হইবার বাসনা থাকিলে রেখাসন্নিপাতে মুক্ত স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা অর্জন করা সর্বপ্রায়ে দরকার; ইহার চম্ভ কোনো উদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া ভবিষ্যতে সেইসব রেখাপাতে কি আকৃতি হইবে তাহার চিন্তা ভুলিয়া আগনার খুসী খেয়াল-মত যাতা রেখা বেগ-রাবা হইয়া টানিয়া যাইতে হইবে, এই-সব রেখার একত্র সন্নিপাতে যে-সব ছন্দ, যে-সব টান ও যে-সব আকৃতি ব্যাপনা হইতে চুটিয়া উঠিবে তাহারাই ক্রমে চিত্রকরের



বক্তৃতা বা সঙ্গীত-শালায় প্রতিধ্বনি।



চিত্রকরের খেয়াল-খুসীর রেখার টান।



চিত্রকরের খেয়াল-খুসীর রেখার টানে ছবি ও
নক্সার আদ্যার জন্ম।

ইচ্ছাধীন ও আত্মাধীন হইয়া পড়িবে। খেয়ালের রেখার টানে হাত
বসিলে পরেও হাত অবলীলায় খেলিবে, এবং নিরুদ্ধে রেখার সমবায়
যে-সব আকৃতির আনন্দ পাওয়া যায় তাহারাই চিত্রকরকে কতবিধ

চিত্রকরের খেয়াল-খুসীর রেখার টানে কল্পনার
অদ্ভুত খামখেয়ালী।

নক্সার পরিকল্পনা ইচ্ছিতে জানাইবে, পরে তাহারাই কত কাজে
লাগিবে। বস্তুতঃ তা বহু অবিকল নকল ও প্রকৃষ্ট মাপজোখের
ভাবনা ভুলিয়া হাতকে মনের আনন্দে যে না খেলাইতে পারে সে কখনো
উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইতে পারে না; আবার যা-খুসী তাই আঁকিলেই
চিত্রকর হওয়া যায় না; যার মনে রূপের আনন্দ রেখার ছন্দে ধরা পড়ি-
য়াছে সেই যা-খুসী তাই রেখা বুনিতে বুনিতে রূপের আনন্দ ধরিবার
আল তৈয়ারি করিতে পারে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উপদেশ দিয়াছিলেন
খেয়ালের গায়ের কাটা চটা শেয়ালা দাগের মধ্যে অবশ্যপ করিলে
যাহার রূপ ধরিবার চোখ আছে সে কত নক্সা কত ছবি কত আকৃতি
আবিকার করিতে পারে; যে চিত্রকরের মন তাছা সে তাহা হইতেই

নতুন সৃষ্টির আশাস সংগ্রহ করিবে। হাতকে স্বচ্ছল গতিতে বেপরোয়া ছাড়িয়া দিয়া একই রেখা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া টানিয়া কিছু গড়িয়া তুলিবার দিকে বাইতে হইবে, কিন্তু কি গড়িব সে চিন্তা বা কেমন করিয়া গড়িব সে চেষ্টা একটুও থাকিবে না, একই রেখার জড়াজড়িতে বাহা হইয়া উঠে উঠিবে। এইরূপে ব্যক্তির ভাব নিজস্ব পথে আকার পাইয়া মুটিতে থাকিবে।

ইহাদের মতের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের মতের অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলালের ছবিতে এই দুই শিল্পীর নির্দিষ্ট বেপরোয়া জোড়ালো রেখাসম্পাতের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়, তাহার ছবির রেখাসম্পাতে কৃতা দ্বিধা ইতস্তত একটু থাকে না।

চাহ।

কষ্টিপাথর

জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ।

পর্যাবীণতা—ব্যক্তিগত দাসত্বকেও পর্যাবীণতা বলা যায়। কিন্তু দাসত্ব ও অধীনতার আর-এক সূচী আছে, বাহ্যিক নাম দেওয়া যাইতে পারে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দাসত্ব বা অধীনতা। পৃথিবীতে বর্তমানে যে-সকল প্রাচীন রাষ্ট্র বা জাতির অস্তিত্ব আছে, তাহাদের অধিকাংশই কোন না কোন সময়ে অস্তের অধীনতা সহ্য করিয়াছে। ব্যক্তিগত দাসত্ব-এখা পৃথিবী হইতে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। কিন্তু জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দাসত্ব এখনও প্রবলভাবে কার্য্য করিতেছে ও সভ্যতার উন্নয়নের বৃদ্ধির সঙ্গে, তাহা যে কোন দিন লুপ্ত হইবে, এরূপ আশার কারণ আজও দেখা যাইতেছে না।

বাসীণতা স্বাভাবিক, পর্যাবীণতা অস্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতিই নিজের শক্তিবলে ও পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহকে আক্রমণ করিয়া উন্নতির দিকে—বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। বাহিরের কোন শক্তি যদি এক জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসে, তবে তাহার জাতীয় বিকাশ আর স্বাভাবিক-রূপে ঘটে না, সে জাতি পদু ও দুর্বল হইয়া যায় ও সুকৃষ্ণে অগ্রসর হয়।

এক জাতি আর-এক জাতির অধীন হইলে, তাহার জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যে বিকাশের বাধা হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রথমতঃ—ধনোৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ধারায় অনেক বাধা উপস্থিত হয়। যে জাতি প্রভু হইয়া বসে সে অধীন জাতির উৎপন্ন ধনাদিতে নিজের ভাগ বণ্টনসাধ্য জোর করিয়া বা কলে-কৌশলে আদায় করিয়া লয়। নিজের স্ববিধার জন্য এমন সমস্ত নিয়ম ও বিধি নিষেধাদি প্রচলন করিতে থাকে যে, অধীন জাতির পক্ষে সেগুলি হিতকর হইতেই পারে না। অধীন জাতি যদি প্রভুজাতির তুলনায় নিতান্ত অসহ্য ও বর্বর হয়, তবে তাহাকে স্বদেশে দাসরূপে কেবল প্রভুজাতির কার্য্যের জন্যই জীবন ধারণ করিতে হয়। আর যদি অধীন জাতিও কতকটা সভ্য ও উন্নত হয়, তাহা হইলেও প্রভুজাতির শক্তি এবং কৌশলবলে, তাহাকে পরিশ্রমলব্ধ ধনের অনেক অংশ হইতেই বঞ্চিত হইতে হয়। দেশমধ্যে ধনোৎপাদনের যে-সকল লাভজনক পন্থা থাকে, প্রভুজাতিই তাহা হস্তগত করিয়া লয়, এবং অধীন জাতির উন্নতির পথে যতপ্রকার বাধা দেওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে সে ছাড়ে না। কারণ দাসজাতি চিরদিনই তাহার পদানত ও সেবাপরায়ণ হইয়া থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক ইচ্ছা; আর

বাহ্যতে ইহার বিপরীত ঘটতে পারে সেরূপ ব্যবহার সে সহজে প্রশ্রয় দেয় না। ফলে প্রভুজাতি ক্রমে ধনী ও ক্ষমতাশালী, এবং দাসজাতি দরিদ্র ও নিপুঞ্জ হইয়া পড়িতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—দুর্বল ও স্বল্পসম্পদ জাতি, প্রবলতর ও সম্ভ্রান্তর জাতির সংস্পর্শে আসিলে, তাহার সামাজিক জীবনেও মহা অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে অধীন দুর্বল জাতির জীবনে যে পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহার সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক সময়ে যে বিপ্লব ঘটে, তাহার ফল জাতীয় জীবনের পক্ষে হিতকর হয় না। নতুন নতুন অভ্যাস ও এখা তাহার সমাজমধ্যে ঢুকিয়া তাহার বহুদিনের নির্দিষ্ট জাতীয় জীবনের গতি অনেক সময়ে রুদ্ধ ও বিকৃত করিয়া তোলে ও জীবনী-শক্তির মূল শিথিল করিয়া দেয়। নতুন সভ্যতা ও প্রবলতর জাতির সংস্পর্শে অনেক নতুন ও সাংঘাতিক ব্যাপিও সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে ও জাতির জাতীয় স্বাভাবিক শোচনীয় হইয়া উঠে। অল্পদিকে প্রবল ও দুর্বল দুই জাতির সংমিশ্রণে সম্ভববর্ণের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই সম্ভব বা মিশ্রজাতি প্রায়ই দুর্বল, জীবনীশক্তিহীন ও ধ্বংস হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে জীলোকদের উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস হইয়া যায় ও শিশুসন্তা বাড়িতে থাকে। মিশ্রণের ফলে প্রায়ই সমাজে নানারূপ ব্যভিচার ও দুর্নীতিও প্রবেশ করিতে থাকে এবং তাহাতেও জাতির জীবনীশক্তিকে হীন করিয়া ফেলে।

তৃতীয়তঃ—জীবনের সর্ববিভাগে পর্যাবীণ জাতির কার্য্যকরী শক্তির সূচী পাইবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে না। রাষ্ট্র ও দেশশাসন প্রভৃতি ক্ষমতার কার্য্য কচিং তাহাদের হাতে পড়ে। এইরূপে শারীরিক, মানসিক—সকল-প্রকার বিকাশের পথেই তাহারা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহার ফলে তাহাদের মনুষ্যোচিত শক্তি ও বুদ্ধি-সমূহ ক্রমশঃ নিপুঞ্জ হইয়া পড়ে; এবং যতই পর্যাবীণতার কাল দীর্ঘতর হইতে থাকে, ততই তাহারা অধিকতর অকর্ণা, অপটু, পরিশ্রমকাতর, উৎসাহহীন ও সর্ববিষয়ে পদু হইতে থাকে। যে কোন জাতিই দীর্ঘকাল পর্যাবীণতা ভোগ করিয়াছে, তাহাদেরই জাতীয় জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ—পর্যাবীণ জাতির জীবনে বাহ্য সর্বোপেক্ষা বেশী অনিষ্ট হয়, তাহা হচ্ছে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীনতা। ক্রমাগত বাধা পাইয়া, অগতির কর্ণক্ষেত্রে তাহাদের যে কোন স্থান আছে, ইহা তাহারা তুলিয়া যায়, ও গতানুগতিক ভাবে, নিতান্তই স্বল্পকালিতবৎ তাহারা জীবন কাটাইতে থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদের বুদ্ধি মলিন হইয়া যায়। প্রতিভার মৌলিকতা ও নবনব উন্মেষ তাহাদের মধ্যে বিরল হইয়া উঠে। পরপর্যায়িত জাতিরা নিজের বিশেষত্ব হারাইয়া, কেবল প্রভুজাতিরই শিখানো কথা আবৃত্তি করিতে থাকে; তাহারাও প্রবর্তিত পন্থা উহাদের একমাত্র গতি হইয়া উঠে। ইহা একপ্রকার মৃত্যুই বলা যাইতে পারে। জীবদ্ভাবৎ, অরাজক জাতি নিজের প্রাণশক্তি এইরূপে হারাইয়া, আপনাদের অজ্ঞাত-সারেই শোচনীয় ধ্বংসের পথে নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হইতে থাকে।

শিল্পবিশিষ্টতার হ্রাস ও দারিদ্র্য—জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ সূচী শিল্পবিশিষ্টতা প্রতিযোগিতা। ধনোৎপাদন ও বণ্টনের উপরে জাতীয় স্থিতি ও উন্নতি অশেষ পরিমাণে নির্ভর করে। সমাজের কতকাল কৃষি ও শিল্পের দ্বারা ধনোৎপাদন করে, নানা উপায়ে সেই ধনের বণ্টন হয়, ও বাণিজ্য দ্বারা তাহার বিমূর্তন ঘটে; এবং এইরূপে সমাজ-শরীরের বিভিন্নাঙ্গ বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়া সমাজকে সুস্থ ও সবল রাখে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক সমাজ নিজের প্রয়োজন নিজেই সাধন করে, কচিং বা অল্প সমাজের সঙ্গে

আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অস্তাব পূরণ করিয়া লয়। কিন্তু যখন কোন দুর্বল ও স্বল্পসম্প্রদায় প্রবলতর বুদ্ধিমান জাতির সংস্পর্শে আসে, তখন অনেক সময় এই-সকল ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়া যায়। প্রবলতর বুদ্ধিমান জাতি, নিজের উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বলে, দুর্বলতর স্বল্পবুদ্ধিজাতির শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া লয়; ধনোৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবস্থা সমাজের নিজের অধিকারচ্যুত হইয়া বৈদেশিক শক্তির কারায়ত্ত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে দুর্বল জাতি ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের ভ্রাস হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দেয়; এবং এইরূপে প্রতিযোগিতার পরায়ত্ত হইয়া দুর্বল দরিদ্র জাতি ধ্বংসের মুখে ঘাইতে থাকে। আধুনিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবলতর জাতির নানারূপে অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া শিল্পবাণিজ্যের নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে ও পৃথিবীময় দুর্বলতর স্বল্পসম্প্রদায় জাতিদের শিল্পবাণিজ্য হস্তগত করিয়া লইতেছে। দুর্বলতর স্বল্পবুদ্ধি জাতিবা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারিয়া ক্রমে ক্রমে দরিদ্র ও হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে।

সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার—বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যের চেষ্টাতেই জীবনের লক্ষণ। আর জীবদেহ যতক্ষণ বাহিরের সঙ্গে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণই সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সমাজের পক্ষেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। যতক্ষণ সমাজ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণই সে জীবন্ত থাকে, আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিলেই তাহার মৃত্যু অবশ্যস্বাভাব্য। জীবদেহ যখন বর্ধিত হইতে থাকে, তখন সে তাহার বাহিরের নানা শক্তিসমূহকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়,—বাতা ও আশ্রয় নানা পরিবর্তনের সঙ্গে নানা বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। এই সম্বন্ধের সকলতার উপরেই জৈব-বিকাশের গতি নির্ভর করে। সমাজও তাহার বিকাশের পথে বাহ্যশক্তি-সকলকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের বিবিধ পরিবর্তনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আপনাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে থাকে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের শক্তিই জীবন্ত সমাজের লক্ষণ। অবশ্য, এই চলা বা গতিও নিরবচ্ছিন্ন নহে, ইহার সঙ্গে স্থিতিও আছে। আর প্রকৃতপক্ষে গতি ও স্থিতি এই উভয়ে মিলিয়াই বিকাশকে গড়িয়া তোলে। স্থিতি দ্বারাই সমাজে বৈশিষ্ট্য বা তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষিত হয়;—প্রাচীন কালের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ—তাহার পারস্পর্য্য ইহাতেই বজায় থাকে। আর ইহাকে ভিত্তি করিয়াই সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাহ্যশক্তির সঙ্গে আপনাকে হ্রস্বতর করিয়া লয়। স্তব্ধতা স্থিতি ও গতি এই উভয়ই সমাজের স্বার্থ বিকাশ ও উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয়; যে সমাজ কেবল স্থিতিতেই আঁকড়াইয়া থাকে, বাহ্যশক্তির সঙ্গে মিলিয়া আপনাদের বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি, আচার প্রথা প্রভৃতির পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে না, সে সমাজ পঙ্গু ও জড়। জীবন্ত-ত-বৎ সেই সমাজ শীঘ্রই ধ্বংসের মুখে যায়। অপর পক্ষে যে সমাজ কেবলই গতিতে বা চলাকে আদর্শ করিয়া লইয়াছে, সে সমাজ নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলে; চারি পার্শ্বের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে কেবলই চলিতে গিয়া সে নিজের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিধ-মানবের সম্বন্ধে কোন স্থানই অধিকার কবিত্তে পারে না। যে সমাজ স্থিতি ও গতি এই দুইকেই যথাযোগ্য মিলাইয়া, কালপ্রবাহের সঙ্গে আপনাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, সেই সমাজই আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া স্বার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে এই লক্ষণ অনেক পরিমাণে দেখা যায়। প্রাচ্য জাতির মধ্যে আধুনিক জাপান বিকাশ ও উন্নতির পথে আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। সে বর্তমান জগতের নবীন আদর্শ ধরিয়া ফেলিয়াছে ও সমস্ত প্রাচীন জড়তা ও দৈন্ত্য পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যমান-ব-সমাজে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পক্ষান্তরে আপনাদের প্রতিবাদী চীন ঠিক ইহার উল্টাপাথে চলিয়াছে। এই স্থিতিজাতি স্থিতিতেই প্রবলরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বহুশত বৎসরের আবর্জনার জাল 'সনাতনী'র মোহে লুপ্ত থাকার করিয়া তাহাতেই পরমানন্দ বোধ করিতেছে। বিদ্যমানবের গতিপথে যে-সকল নব নব সমস্তার উদয় হইতেছে, তাহার সঙ্গে সে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না, ও আপনাদের অতি প্রাচীন বিধিব্যবস্থা, আচার-প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতিতে প্রবল আসক্তির বশে নির্বিকারে রক্ষা করিয়া, পঙ্গুতা ও জড়তার ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এরূপ ভাবে চলিলে তাহার মৃত্যু যে অদূরবর্তী হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ জীবন্ত ছিল। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষ কোন দিনই 'সনাতনী'র মোহে জড়তাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। নব নব অবস্থার সঙ্গে সে আপনাদের বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া, নব নব সমস্তার সমাধান করিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন বর্ষশাস্ত্রের 'যুগধর্ম' ও 'আপদ্ধর্মে'ই সে বিবরণের যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষ স্থিতির ও বৃক চীনের ভ্রাম্য নিজেদের পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। নূতন পৃথিবীর নূতন আদর্শের সঙ্গে সে আপনাকে মিলাইয়া লইতে পারিতেছে না। পূর্বপুরুষের গোঁবের মোহে অন্ধ হইয়া সে জীবনহীনতাকেই প্রশ্রয় দিতেছে ও অনাদিকালের জঞ্জালজাল সমস্তে রক্ষা করিয়া মৃত্যুব্যাধির বীজকেই পুষ্টি করিয়া তুলিতেছে। কিরূপে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনকে মিলাইয়া লইতে হয়, কি করিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শ বজায় রাখিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ও বিকৃতবুদ্ধি চিরকথ ব্যস্তির জ্বা, শ্রেয়কে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। যে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি পরস্পরের সঙ্গে ভাব ও আদর্শের আদানপ্রদান করিতেছে, বিভিন্নজাতি পরস্পরের সাহায্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি করিতেছে,—সমুদ্র, আকাশ, জলবায়ু বা প্রাকৃতিক কোন শক্তিই যখন মানুষের উৎসাহকে বাধা দিতে পারিতেছে না, ঠিক সেই সময়েই আমরা 'সমুদ্র-সাত্ত্বানিবেশ' বিধি দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া আপনাদের দুর্ঘাটলোকহীন অন্ধকার মধ্যে আরামে বাদ করবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি। এই বিশ শতাব্দীর নব জাগরণের দিনেও যে জাতি এইরূপে জড়তাকে প্রশ্রয় দিয়া দিব্য আরামে ঘুমাতে পারে, তাহাদের যদি ধ্বংস না হয়, তবে আর কাহার হইবে? নবীন পৃথিবীর নব নব আদর্শ, নব নব ভাবকে আমাদের 'অচলায়তনের' দৃঢ় প্রাচীর দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেই আমরা বিপুল চেষ্টা কবিত্তেছি ও তাহার ফলে সেই অচলায়তনের মধ্যেই যে আমাদের জীবন্ত সমাধি ঘটতে পারে তাহা ভুলিয়া যাইতেছি।

(নারায়ণ, আখিন)

প্রবন্ধকার সরকার।

* * *

অশোকের ধর্ম্মলিপি।

মৌর্য নরপতি অশোক তাহার সাঁইখ্রিশ-বর্ষব্যাপী রাজত্বকালের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, তাহার বিশাল সম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাঁইখ্রিশ লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার হায়দরাবাদ রাজ্যে আর একটি নূতন অশোক-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিগুলি

ইতিহাসে কখন অশোক-লিপি, কখন বা অশোক-অমুশাসন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেহবা তাহাকে শুদ্ধ কবিতা বলিয়া থাকেন অমুশাসন-লিপি। অমুশাসন অর্থে সাধারণতঃ রাজার আদেশ বুঝা। কিন্তু মহারাজ অশোক সে অর্থে উহা কোথাও ব্যবহার করেন নাই।

অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ লেখবাজি আদেশমূলক নহে, উহা উপদেশ-মূলক। এই ধর্মলিপির মধ্যে কোন-প্রকার রাজ-আদেশের কঠোরতা নাই, উহার মধ্যে আছে বিবেক প্রতি মৈত্রী-ভাব-অমুপ্রাণিত মহা-প্রতাপাধিত এক সম্রাটের উদার কোমল উপদেশবাণী। উহাতে আছে মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, আত্মীয় বৃন্দদের উপকার, পরোপকারিতা, জীবের দয়া, অস্ত্রের বিবাসের প্রতি শ্রদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, নতোর প্রতি সমাদর। ধর্মলিপি পাঠে প্রতীতমান হয় যে প্রাণী-জগতের হিতসাধনই অশোকের মূলমন্ত্র ছিল। লোকের বাহা অবশ্যকর্তব্য ও প্রকৃত কল্যাণপ্রদ, তাহাই মহারাজ অশোক সহজ ও সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ধৌলি ও জোগড় অমুশাসন-মধ্যে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন; সকল সমুদায়ই আমাব পুত্র, এই মহাবাক্য পর্যন্তগায়ে উৎকীর্ণ করিয়াছেন। রাজনীতি ও ধর্মোক্তি এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য করিয়া এক ধর্মরাজ্য স্থাপনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। অশোকের পূর্বে যদিও মিশর, বাবিলন, আসিরীয় ও পারস্য প্রভৃতি দেশে অমুশাসন উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাহার পবেও অনেক নরপতি এবং প্রকার অমুশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানবের কল্যাণার্থে প্রস্তরগায়ে নীতিতত্ত্বের এক প্রকার উচ্চ আদর্শ অমর তুলিকায় আর কেহ কখনও উৎকীর্ণ করেন নাই। এই-সকল অমুশাসনলিপি যদি আদেশমূলক হইত, তাহা হইলে ইহার লব্ধনে কোন-না-কোন-প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত। উৎকীর্ণ অমুশাসন-মধ্যে কোথাও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা নাই। ধর্মলিপিগুলি প্রধানতঃ প্রজাবৃন্দের উপদেশরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের বহু-প্রকার পন্থা নির্দিষ্ট আছে, এই-সকলের মধ্যে অমুশাসনলিপি ও মুদ্রালিপিই সর্বাঙ্গতঃ প্রামাণিক। ইহা হইতে যে কেবল কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা অবগত হওয়া যায় তাহা নহে, উহা হইতে অতীত যুগের ভাষা, লিখনপ্রণালী, লিপিব্যবহার ক্রমোন্নতি, সমাজ, ধর্ম, বাজকীয় রীতিপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়েও অসংখ্য জ্ঞানলাভ করা যায়। এই নিমিত্তই অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ লেখবাজি ঐতিহাসিকের নিকট এত মূল্যবান।

অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ লেখবাজি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইয়া থাকে—প্রথম শিলা বা গিরিলিপি, দ্বিতীয় কলিঙ্গ-লিপি; প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যে আবিষ্কৃত বলিয়া ইহা কলিঙ্গলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই লিপি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যে স্থানে উক্ত অমুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, সেই স্থানের নাম অমুশাসন একটিকে বলা হয় বোলিলিপি, দ্বিতীয়ট জোগড়লিপি। ইহাদের মধ্যেও বোলিতে দুইটি এবং জোগড়ে দুইটি মোট চারিটি লিপি আছে। ১. স্তম্ভ-লিপি—এগুলি প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভগায়ে খোদিত বলিয়া স্তম্ভলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এতগুলি ভাবড়া লিপি, সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট, ক্রম্মিগি বা ক্রম্মিন দেবী, নির্রিব, দেবী বা Queen's Edict, সারনাথ, কোশাবী, এলাহাবাদ, সাকী ও বরাবর গুহালিপি, তৎপরে নবপ্রকাশিত মাকি অমুশাসন। যে যে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানের নাম অমুশাসন এই লিপিগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

এই অমুশাসনাবলী পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে।—প্রথম, শিলা-লিপি—চৌদ্দটি শিলালিপি ও চারিটি কলিঙ্গলিপি এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, দ্বিতীয়, স্তম্ভলিপি—ইহার সংখ্যা সাতটি, তৃতীয়, খণ্ড বা ক্ষুদ্র

শিলালিপি—যথা ভাবড়ালিপি, সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট ও মাকি এই শ্রেণীভুক্ত; চতুর্থ, ক্ষুদ্র বা অলঙ্ঘ্য স্তম্ভলিপি—যেমন ক্রম্মিন দেবী, নির্রিবলিপি, সারনাথ-স্তম্ভলিপি, কোশাবী বা প্রয়াগলিপি ও সাকীলিপি। পঞ্চম, গুহালিপি—বরাবর গুহালিপি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

আবিষ্কৃত শিলালিপির সংখ্যা চতুর্দশটি। অশোকের রাজত্বের আয়োদ্য ও চতুর্দশ বৎসরে এই গিরিলিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অমুশাসনে অশোক তাহার অভিব্যক্তি-বৎসর হইতে রাজত্বকাল গণনা করিয়াছেন। অশোকের অভিব্যক্তি-কাল খ্রীঃপূঃ ২৬৯ বা খ্রীঃপূঃ ২৬৮ বলিয়া একরূপ নির্ণীত হইয়াছে। স্মরণ্য খ্রীঃপূঃ ২৫৫ বা খ্রীঃপূঃ ২৫৬ অব্দ মধ্যে অশোকের শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মৌর্য-সাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তস্থিত ছয়টি বিভিন্ন স্থানে এই চৌদ্দটি অমুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা সাহাবাজগড় (পেশোয়ারের নিকট), মানসেরা (উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে), কালনী (দেবানন্দ জেলায়), গিরি (কাঠিয়াবাড়), ধৌলি (ভুবনেশ্বরের নিকট), ও জোগড় (গজ্যাম জেলায়)। এই স্থানগুলি অশোক-সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সীমান্তভাগে অবস্থিত। সাহাবাজগড় ও মানসেরা অমুশাসনগুলি ষেরোজি অক্ষরে লিখিত, অবশিষ্ট অমুশাসন ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত।

অশোকের খণ্ড বা ক্ষুদ্র গিরিলিপির সংখ্যা ছয়টি। একই লিপি বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে তিনটি দক্ষিণ প্রদেশে ও তিনটি উত্তর ভারতে অবস্থিত। দক্ষিণে মহীশূর প্রদেশে চিত্তনগড় জেলার অন্তর্গত সিদ্ধপুর, সটিঙ্গরামেশ্বর এবং ব্রহ্মগিরি এই তিনটি স্থানে উক্ত অমুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। উত্তর ভারতে রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে বৈরাট, দক্ষিণ বিহারে সাহাবাদ জেলায় সাসেরাম এবং জবনপুর জেলায় রূপনাথ এই তিনটি স্থানে উহা খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। বৈবাতের নিকটবর্তী ভাবড়া নামক স্থানে কোন এক গিরিভূড়ায় একটি বৌদ্ধবিহারভূমিতে এক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা ভাবড়া লিপি নামে পরিচিত। ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করিয়া এই লিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। গরার আট কোশ উত্তরে কল্কনদীর পশ্চিম পারে বরাবর বৈলশ্রেণী অবস্থিত; এই বৈলশ্রেণীমধ্যে কতকগুলি গুহা নির্মিত; সেই গুহামধ্যেই উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

চীন পরিব্রাজক হিউএন-ত্সান্গ (বুখান-চুবাও) অশোক-নির্মিত বোলি স্তম্ভের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বোলিটির মধ্যে এ পর্যন্ত দশটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তম্ভ একটি সমগ্র প্রস্তর হইতে নির্মিত ও নানাবিধ কার্যকার্যশোভিত। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) লৌড়িয়া নন্দনগড়স্তম্ভ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়া হইতে নেপাল যাইবার পথে লৌড়িয়াগ্রাম, ইহা দেখিয়া হইতে তিন মাইল উত্তরে। এই স্তম্ভটি ৪০ ফুট উচ্চ। নানাবিধ কার্যকার্যে বিভূষিত।

(২) প্রয়াগস্তম্ভ—ইহার দৈর্ঘ্য ৩২' ও ব্যাস ২'-২"। এলাহাবাদ কোর্টে এলেক্সান্ডার বারাকের নিকট এক্ষণে উহা স্থাপিত। প্রথম স্তম্ভটি স্তম্ভলিপি, কোশাবীলিপি ইহাতে উৎকীর্ণ আছে। ইহার উপরিভাগে অশোক অমুশাসন, তাহার নিম্নে একদিকে কোশাবীলিপি ও অপরদিকে দেবী অমুশাসন (Queen's Edict), তাহার নিম্নে সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপি।

(৩) রামপুরস্তম্ভ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত পিয়ারিয়া গ্রামের এক মাইল দূরে রামপুর নামক একটি গ্রামমধ্যে এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। ইহাতেও প্রথম স্তম্ভটি স্তম্ভলিপি খোদিত।

(৪) লৌড়িয়া অররাজ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়ার পথে

কেশরী সুপের দশকোশ দূরে সরস্বতী মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লোড়িয়াগ্রাম। এই স্থানে একটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে, ইহার দৈর্ঘ্য ৩৬-৬"। এই স্তম্ভগারে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) দিল্লী তোপ-রাস্তা—দিল্লীর সন্নিকট ফিরোজাবাদের অন্তর্গত কোখিল পাহাড়ের চূড়ায় এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। আদালার নিকট-বর্তী তোপ-রাহতে ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুলতান ফিরোজতোপগজ কর্তৃক ইহা আনীত হইয়াছে। হুলতান এই স্তম্ভটি দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং বহুত্রে সহস্র সহস্র ব্যক্তির সাহায্যে উহা দিল্লীতে আনয়ন করেন। ইহাতে সাতটি স্তম্ভলিপি অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্তম্ভটি দিল্লীসিাবালিক বা ফিরোজসার লাট নামে কখন কখনও উক্ত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪২-৭"।

(৬) দিল্লী মিরাট স্তম্ভ—এই স্তম্ভটি দিল্লীর অন্তর্গত একটি উচ্চ ভূমির উপর সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইহা এক্ষণে ভগ্নপ্রায়। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুলতান ফিরোজতোপগজ এই স্তম্ভটিও মিরাট হইতে আনয়নপূর্বক দিল্লীতে তাহার মুগ্ধাবাসের নিকট স্থাপন করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাৰত-প্ৰব্রমেন্ট ইহার বর্তমান স্থানে ইহাকে পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন। স্তম্ভগারে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ আছে।

(৭) দাঁচী-স্তম্ভ—সম্ভারতের অন্তর্গত ভূপালরাজ্যে সুবহুং দাঁচী-সুপের উপর দক্ষিণদ্বারে এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। সারনাথ, কৌশাধী ও প্রয়াগলিপির পাঠ ইহাতে অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

(৮) সারনাথ স্তম্ভ—ইহাতে দাঁচী ও কৌশাধী লিপির পাঠ বিস্তারিত ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

(৯) রুগ্মিন্দ দেবী স্তম্ভ—বস্তি জেলার অন্তর্গত হুলহার গ্রামের ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে রুগ্মিন্দ দেবীর মন্দির; এই মন্দির-সমূহে একটি স্তম্ভ বিরাজিত। রুগ্মিন্দেই প্রাচীন লুম্বিনী গ্রাম। এই স্থান গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান বলিয়া অশোক এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন ও এই লিপি উৎকীর্ণ করেন।

(১০) নিম্নীত স্তম্ভ—বস্তী জেলার অন্তর্গত নেপাল তরাই-প্রদেশে নিম্নীত নামক গ্রামে এই স্তম্ভ এক্ষণে স্থাপিত আছে। নিম্নীতসামগর নামক একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরে উহা প্রতিষ্ঠিত। এক্সপ প্রবাস বে পূর্বে এই স্তম্ভটি গৌতমবুদ্ধের পূর্ববর্তী কনকমন নামক বুদ্ধের জন্মস্থানে প্রোথিত ছিল।

সিঙ্গিগাহে, তীর্থসমূহে, রাজপথে এই-সকল অমুশাসন পথিকের নয়ন আকর্ষণ করিত। যাহাতে সর্বসাধারণের বৃত্তিবার পক্ষে সুবিধা হয়, সেই নিমিত্ত অমুশাসনগুলি সেই সময়কার প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

(নারায়ণ, কার্তিক)

ঐতর্য্যচন্দ্র, বহু।

* * *

জাতি বা বর্ণভেদের কথা।

জাতিভেদ একটা সামাজিক ব্যবস্থা। ব্যবস্থা মাজেই অবস্থার উপরে নির্ভর করে। সমাজের এক অবস্থার যে ব্যবস্থা কল্যাণকর হয়, অস্ত্র অবস্থায় তাহা হয় না।

এই জাতিভেদ একটা সনাতন ব্যবস্থা নয়। আর্য্য আজ যাহাকে জাতিভেদ বলিয়া জানি, প্রাচীন আর্য্যসমাজে তাহা ছিল না। আমাদের বর্তমান জাতিভেদ ব্যঙ্গগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালে একই বংশ, একই পরিবারে অমিয়া, কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহবা ক্ষত্রিয়, আর কেহবা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য তিনটি জাতি নহে, কিন্তু তিনটি বিশেষ সামাজিক বৃত্তিমাাত্র। এক লোকে নিজে বা সমাজের সকল কাজ করে না, করিবার উচিত্তে পারে না, পারিলেও তাহাতে যে অবস্থা শক্তিময় হয় তাহার উপযুক্ত মূল্য মিলে না। এইজন্য সমাজে শ্রমবিভাগ আরম্ভ হয়। বৈশ্যেরাও মাটি ফুড়িয়া উঠে না, ক্ষত্রিয়েরাও ইচ্ছালোক হইতে নামিয়া আসে না। ব্রাহ্মণেরাও ব্রাহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হন নাই। সমাজ-জীবনের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে, সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, সমাজ-অঙ্গী হইতে ফুটিয়া ও সমাজের অঙ্গবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে গড়িয়া উঠে। সকল বর্ণেরই মূল সামাজিক বৃত্তির বা কর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

কৃষিবাণিজ্যাদি যেমন একটা সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম; শাসন-সংরক্ষণ যেমন একটা সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম; যজন-যাজন, ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মশিক্ষান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, এ সকলও একটা অত্যাৱশ্যকীয় সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম। সমাজের লোকের অল্প ও আবাসাদির ব্যবহার জন্ত যেমন বৈশ্যবৃত্তির আশ্রয়ে বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার শাসন সংরক্ষণের ব্যবহার জন্ত যেমন ক্ষত্রিবৃত্তির আশ্রয়ে ক্ষত্রিবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ সমাজের ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবহার জন্ত ব্রাহ্ম-বৃত্তির আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ-বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এসকল বর্ণ আকাশ হইতেও উড়িয়া আসে নাই, সমাজের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেও একেবারে পরিমূর্ত আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দুইলোকে স্বাৰ্ধবণ হইয়া, বড়যন্ত্র করিয়াও এগুলিকে গড়িয়া তুলে নাই। এই বর্ণত্রয় সমাজ-বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের আত্ম-প্রয়োজনে, সমাজ-জীবনের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনের জন্ত, ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক কিছুই নাই।

অম-বস্ত্রাদির উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, সমাজের শাসন ও সংরক্ষণ, এবং ধর্ম্মযাজন ও ধর্ম্মসাধন,—এই তিনটি সমাজ-জীবনের প্রধান কর্ম। সকল সমাজে, সকল দেশে, সকল কালেই এই তিনটি কর্ম ছিল, আর সর্বত্রই এই তিনটি মূল্য সামাজিক বৃত্তির আশ্রয়ে তিনটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে এই-সকল সামাজিক বৃত্তির অন্তর্করণ করিয়া তিনটি বিশিষ্ট বর্ণ বা জাতির সৃষ্টি হয় নাই। আদিতে একই পরিবারের মধ্যে কেহবা কৃষিবাণিজ্য কর্ম করিত, কেহবা সমাজ-শাসন ও সমাজ-রক্ষা করিত, আর কেহবা যজনযাজন করিত। ফলতঃ তখন দুইটি মাত্র বৃত্তিই, বোধ হয়, বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল, সমাজের সকলকেই ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। শান্তির সময় যেমন কেহবা কৃষি-গোৱক্ষ প্রভৃতি করিত, কেহবা যজনযাজনাদি করিত, সেইরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, সকলেই অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধে ও বরাট্র ও স্বজাতির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইত। যুদ্ধবিগ্রহাদি যখন একজন পৈন্যনিদ ব্যাপার ছিল, তখন সকলকেই ক্ষাত্রকর্ম শিক্ষা ও ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। তখন সমাজে প্রকৃতপক্ষে একই বর্ণ ছিল, সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল, অথবা অস্ত্র দিক্ দিয়া দেখিলে, দুই বর্ণ মাত্র ছিল, কেহবা বৈশ্য, কেহবা ব্রাহ্মণ ছিল। যুদ্ধবিগ্রহাদি যত কমিয়া বাইতে লাগিল, শান্তি যত স্থায়ী হইতে আরম্ভ করিল; ততই একঘল লোক ক্ষাত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে কৃষিগোৱক্ষ বাণিজ্যাদি কর্মে, আর একঘল যজন-যাজন ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি কর্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তখনও বর্ণভেদ গড়িয়া উঠে নাই। এই অবস্থাতেও একই পরিবারের, এমন কি একই পিতামাতার দশজন সন্তানের মধ্যে কেহবা বৈশ্যবৃত্তি, কেহবা ক্ষাত্রবৃত্তি, কেহবা ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ইহার বহু পরেও ক্ষত্রিয়ের পুত্র ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয়ের, আর বৈশ্য ও শূদ্রের পুত্র ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাহ্মণের কর্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে কোনও প্রকারের নিষেধ ছিল না। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি বৃত্তি ছিল, কিন্তু বর্ণবিভাগ বা বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত

হয় নাই। মহাভারতে বর্ণভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু একবর্ণের লোকের পক্ষে অপর বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই। ভারতযুদ্ধের কালে ব্রাহ্মণেরা অবাধে ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতেন; দ্রোণ ও কৃপ তার সাক্ষী। বৈশ্যেরা ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন—রাবের তার সাক্ষী। গুপ্তেরা যজ্ঞ-বাজন না করুন, অন্ততঃ নীতি ও ব্যবহারবিদ হইবা রাজসভায় মন্ত্রীর আসন পাইতে পারিতেন, —বিদূর তাহার প্রমাণ। তবে বর্তমান মহাভারতে আমরা যে সমাজ-চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে সমাজে একটা বর্ণবিভাগ যে কতটা পাকিয়া উঠিয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তবে এই বর্ণ-বিভাগ যে একদিন সমাজে এতটা কঠিন আকার ধারণ করে নাই, অথবা করিয়া থাকিলেও মহাভারত বচনার সময় তাহার সংস্কারসাধন যে আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার প্রমাণ এই মহাভারতেই আছে। চাতুর্বিধ্য মধ্য স্তঃ গুণকর্মবিভাগঃ—গুণ ও কর্মের বিভাগ করিয়া আমি ব্রাহ্মণদি চারিবিধ-সম্বিত সমাজব্যবহার সৃষ্টি করিয়াছি—গীতার এই বাক্যই তার প্রমাণ। জাতিভেদটা তখন, গুণকর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মগত বা বংশগত হইবা পড়িয়াছিল বা পড়িতেছিল। আর এইরূপ জন্মগত বা বংশগত জাতিভেদ লইয়া একটা বিরাট ধর্মরাজ্য সংস্থাপন অসাধ্য, ইহা দেখিয়াই, এই ধর্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রধান আশ্রয় ভগবান ঈশ্বর পুনরাব এই বর্ণভেদকে গুণকর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দুর্বোধন কর্তৃক অজ্ঞাতজাতিগুলি রাধেরের ক্ষত্রিয়দের প্রতিষ্ঠা প্রদান ইহাও আর-এক প্রমাণ। বিদুরের জন্মকথা ইহার তৃতীয় প্রমাণ। পঞ্চ পাণ্ডবের জাতক-কাহিনীর অন্তরালে, কোন্ নিপুট সমাজ-রহস্য লুকাইয়া আছে, তাহাই বা ভেদ করিবে কে? বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্তও কঠোর এবং অমূল্যন্যায় জাতিভেদ-প্রচার সমর্থন করে না। বর্তমান মহাভারতখানি যখন সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়, তখন বর্ণবিভাগটা অনেক পরিমাণে পাকিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তখনও পুরাতন স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। আর তারই জন্য যেখানেই এই জাতিভেদের বিরোধী প্রমাণ ছিল, সেখানেই একটা গোঁজামিল দিয়া ঐ পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে আধুনিক অবস্থার ও ব্যবহার একটা সঙ্গতি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

আদিতে গুণকর্ম-জন্মগতই বর্ণবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা যেমন সত্য, এই গুণকর্ম-প্রতিষ্ঠিত বর্ণবিভাগ যে ক্রমে, স্বাভাবিক উপায়েই, সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের আন্তঃপ্রয়োজনেই আবার জন্মগত ও বংশগত হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপই সত্য। দুইটোকে চেষ্টা করিয়া, বর্ণবিভাগেরও সৃষ্টি করে নাই, আর বর্ণবিভাগ হইতে পরে বর্তমান বর্ণভেদেরও প্রতিষ্ঠা করে নাই। বর্ণবিভাগ ও বর্ণভেদ দুই, সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন কালে আজিকার মতন লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। প্রাক্ষাণ্ড বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। শিক্ষার্থীগণ উপযুক্ত গুরু নিকটে বাইরা আপন আপন অভ্যাসে বিদ্যা শিক্ষা করিত। এরূপ অবস্থায় যে-বিদ্যা ভাল করিয়া জ্ঞানিত, সহজেই সকলের আগে ও সর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও আগ্রহ সহকারে সেই বিদ্যা আপনাদের পুত্র ও অপরাপর পরিবারবর্গকেই শিখাইত। কার্যকরী বা বাস্তবিক বিদ্যা কিংবা technical এবং professional knowledge, এইরূপ ভাবে পুণ্যমুদ্রণেই রক্ষিত ও প্রচারিত হইল। পিতার বা পিতৃব্যের নিকট হইতে প্রত্যেক পরিবারের বালকেরা তাহাদের বংশের বিশেষ বিদ্যা-সকল শিক্ষা করিত। ধর্মবাজন তখন একটা বিশেষ বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম তখন যজ্ঞাদি জটিল কর্মের উপরেই নির্ভর করিত। যজ্ঞের মন্ত্রাদি মুখে মুখে শিখিতে হইত। কোন্ ভাবে কোন্ যজ্ঞ

করিতে হয়, তাহার ক্রম এবং কৃপণতার উপরে যজ্ঞের সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে,—এই ক্রমের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম বা এই নিপুণতার একটুও অভাব হইলে সমস্ত যজ্ঞকর্ম পণ্ড হইয়া যায়—লোকের এই বিশ্বাস ছিল। এরূপ অবস্থায় ধর্মবাজনকর্ম শিখিতে ও শিখাইতে বিস্তর জ্ঞান স্বীকার করিতে হইত। বিশেষতঃ ক্রমে যখন এই-সকল যজ্ঞকর্ম ঘারা পুরোহিতেরা বিস্তর দক্ষিণা লাভ করিতে লাগিলেন, তখন নিজেদের ব্যবসার রক্ষা করিবার জন্ত যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে একটা মন্ত্র-গুপ্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। কেহ-অপরকে সহজে আপনাদের বিদ্যা আর শিখাইতে চাহিত না। এই ভাবে যাহা আবিতে কেবল সামাজিক বৃত্তিগত ছিল, এই নূতন অবস্থায়, নূতন ও জটিল শিক্ষার প্রয়োজনে, ক্রমে তাহা বংশগত হইয়া পড়িল। যেমন যজ্ঞ-বাজনাদি ব্রহ্মকর্ম, সেইরূপ শাসন ও সংরক্ষণাদি রাষ্ট্রকর্ম বা ক্ষাত্রকর্ম, এবং কৃষি-বাগিচাদি বৈজ্ঞানিক ও কালক্রমে বংশগত হইয়া পড়িল। প্রাচীন সমাজের অবস্থায় এইরূপ হওয়া কেবল অনিবার্য নহে, কিন্তু প্রয়োজনীয় হইয়াও উঠিয়াছিল। এইরূপে কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণজন্মগত হয় নাই, কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কেহবা ধর্মোদী, কেহবা শাসনোদী, কেহবা যজ্ঞোদী, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীনকালে মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা হইতেই যে এরূপ বিভাগ গড়িয়া উঠে নাই, ইহা কে বলিবে? বিভিন্ন সমাজের সংমিশ্রণেও এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, ইহাও সত্য। কিন্তু প্রাচীনতম যুগে, সামাজিক সংমিশ্রণের অবসর ও প্রয়োজন উপস্থিত হইবার পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে-সকল শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তাহা যে সম-ব্যবসারীদের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ও মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা হইতে জন্ম নাই এমন কথা বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যে এই কারণেই নানা শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং অধিকাংশ ব্যবসারই পুরুষক্রমজন্মগত হইয়া পড়ে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। গুপ্তেরাও এই কারণে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, কেহবা সংগৃহ, কেহবা অন্ত্যজ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি জাতির অঙ্গসেবা যাহারা করিত, তাহাদের “জল চল” হইয়া গেল; তাহারা সংগৃহ হইল। বাহাদের এ সুযোগ ও সুবিধা ছিল না বা ঘটিল না, তাহারা অপস্কৃত ও অন্ত্যজ রহিয়া গেল।

এই ভাবেই কালক্রমে আমাদের বর্তমান জাতিভেদ বা বর্ণভেদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সমাজের আন্তঃপ্রয়োজনে অবস্থাবিশেষে এই বর্ণভেদের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহুদিন সে পুরাতন অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে, কিন্তু সে ব্যবস্থা বদলায় নাই। ইহাই ত দোষের কথা।

(নারায়ণ, কাস্টিক)

ঐবিপিনচন্দ্র পাল।

* * *

বৌদ্ধ-ধর্মো দলাদলি।

পাঁচজন মিলিয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর মতান্তর হইলেই দলাদলি হয়। দলাদলিতে যখন মূল কাজ পণ্ড হয়, তখন দোষের। যখন মূল কাজের ঐক্য হয়, তখন গুণের। বৌদ্ধ-ধর্মো দলাদলি হইয়াছিল তাহাতে ধর্মের উন্নতিই হইয়াছিল; দুই দলই ধর্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরিয়াছিলেন। একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে।

অতি তুচ্ছ যে কথা লইয়া দলাদলি হয়, পালিতে হুতাহাকে দশবৎ বলে, সংস্কৃতে দশবত্ত। অর্থাৎ দশটি জ্বিনিম লইয়া দলাদলির সূত্রপাত। কথা :—

(১) অনেক ভিক্ষু শিংয়ের পাত্রে একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা তো ভিক্ষা করিয়া খাইতেন, সব সময়ে তো লুণ দেওয়া ব্যঞ্জন পাঠিতেন না। আবার সেকালে সকলে সকলের লুণ খাইতেন না। লুণ না দিয়া ব্যঞ্জন রান্না হইত। তাই পরিবেশনও হইত। লোকে লুণ শিশাইয়া খাইত। যাঁহারা কড়া ভিক্ষু, তাঁহারা বলিলেন, ভিক্ষুর আবার সঞ্চয়? যাঁহারা তত কড়া ভিক্ষু নন, তাঁহারা বলিলেন, একটু লুণ সঞ্চয় করিলাম তাতে বহিয়া গেল কি? আমাদের পাত্র আছে, চৌবর আছে, লখন আসন এসব তো আমাদের থাকে, একটু লুণ থাকিলেই সর্ব্ববাল হইয়া গেল? এই আপত্তির নাম সিদ্ধিলোপ কল্পে।

(২) বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, বেলা ঠিক দুই প্রহরের পর কোন ভিক্ষু আহার করিতে পারিবে না। তাহার পর যদি খাইতে হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে। কিন্তু ইহারা তো ভিক্ষু, ভিক্ষা করিয়া রান্না ভাত আনিয়া তো খাইতে হইবে? সেকালের লোকে খাইত বেলায়, রাঁধিতও বেলায়। হুতরাং অনেক ভিক্ষুর খাওয়া হইত না, অনেকের আধ-পেটা হইত। তাই তারা মনে করিত, দুই প্রহরের সময় ছায়া বেগুণ থাকে, তাহা হইতে দুই আঙ্গুল ছায়া সরিয়া গেলেও খাওয়া খাইতে পারে। কিন্তু কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, সে কখন হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা দুই প্রহরের পূর্বে খাইতে হইবে, সে আজ্ঞা কি আমরা লঙ্ঘন করিতে পাবি। হুতরাং মতান্তর হইল, দলাদলির একটা কারণ হইল।

(৩) ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, একদিনে দুই গ্রামে খাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোন কোন ভিক্ষু মনে করিতেন, যদি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়, আগে স্বগ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু খাইয়া গেলে দোষ কি? প্রথমতঃ দু'বার খাওয়া দোষ, দ্বিতীয় দোষ আগে স্বগ্রামে খাইয়া, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ গেলে, যে বেচারী নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার রান্না অন্নব্যঞ্জন সব ফেলা যায়। কারণ ভিক্ষুরা তো একবার খাইয়া পিষা আবার দূর জিনিষ খাইয়া উঠিতে পারেন না। হুতরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন যে গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ বাইলে ঘরে খাইয়া খাইতে পারিবে না। কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, এ নিয়ম ঠিক। অন্ত্রে বলিলেন, গ্রামান্তরে খাইতে হইলে যদি পেটে কিছু না থাকে তাহা হইলে খাইতে বড় কঠিন হয়। হুতরাং কিছু খাইয়া গেলে দোষ কি? এও একটা বিবাদের কারণ।

(৪) এক-এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করিতেন। যাঁহারা এক ঘরে বাস করেন তাঁহাদের এক আবাস। আবাস শব্দের অর্থ ঘর। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আবাস শব্দের অর্থ পরগণা বা ভিহি। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গায় যত ভিক্ষু থাকিবে, সব এক জায়গায় আসিয়া উপোষ্য করিবে। উপোষ্য শব্দের অর্থ উপবাস, বাস্তালয় যাহাকে উপোষ্য বলে। কিন্তু কেহ কেহ বলিলেন এ নিয়ম বড় কড়া; যাহার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে পোষ্য করিবে। বুদ্ধেরা বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেই হইবে। আর সকলে বলিলেন, পৃথক পৃথক হইয়া পোষ্য করিলে, উপাসকদিগের সুবিধা হ'ব, তাহাদের ধর্ম্মকথা শুনাইবার সুবিধা হয়, এবং তাহাতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। বুদ্ধেরা বলিলেন, সকলে একত্র বসিয়া উপবাস করিলে, লুকাইয়া খাইবার সুবিধা হয় না, পৃথক পৃথক উপবাস করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেজন্য আবার ভিক্ষুদের দোষিবার দরকার হয়। হুতরাং ইহা একটা বিবাদের কারণ হইল।

(৫) বৌদ্ধদের সকল কর্ম্মই সত্যে নির্বাহিত হইত, অর্থাৎ এক বিহারের যত ভিক্ষু সকলে একত্র বসিয়া (ভোট লইয়া) বিহারের কার্য্য নির্বাহ করিতেন। সকল ভিক্ষু উপস্থিত না থাকিলে, কোন কোন

বিহারের ভিক্ষুরা, অনুপস্থিত ভিক্ষুদের অনুমতি পাওয়া ঘাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য নির্বাহ করিয়া লইতেন। এ বিষয়ে যে মতামতি হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদল বলিবেন, “অনুপস্থিতেরা যে তোমাদের হইয়া মত দিবেন একথা তোমরা কি করিয়া ভাবা।” আর একদল বলিবেন, “তাঁহারা তো উপস্থিত ছিলেন না, আমরা কি, করি, কাজ তো ফেলিয়া বাধা যায় না।”

(৬) গুরু করিয়া গিয়াছেন আমিও করিব। পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ কি? বুদ্ধেরা বলিবেন তথাগতের যাহা উপদেশ তাহার তো ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। তোমার গুরু কোথাব কি করির গিয়াছেন, সেটা তো আর তথাগতের উপদেশের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে না। অতএব তোমাকে সে কার্য্যটি ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, বঃ, বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আমার গুরুও করিয়া গিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে? হুতরাং ইহা লইয়া বিবাদের একটা কারণ হইল।

(৭) দুই প্রহরের পর ভিক্ষুরা অন্ন আহার করিবে না ও ফলরস খাইতে পারিবে। ঘোলটাকে ভিক্ষুরা রস বলিয়াই মনে করিতেন। ঘোল খাওয়ার তাঁহাদের দোষ ছিল না। দই মণ্ডরা হইলে তবে তো ঘোল হয়। অনেক ভিক্ষু দইয়ে জল দিয়া পাতলা করিয়া তাহাকে ঘোল বলিয়া খাইতেন। এই যে ‘আমণ্ডরা’ দই এটা ভিক্ষুকের পক্ষে নিষিদ্ধ। অনেক ভিক্ষু বলিলেন, এ নিষেধের কোন মানে নাই। এ জিনিসটা তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে, ঘোলও জল দিয়া তৈয়ারী হয়। একটা ‘মণ্ডরা’, একটা ‘আমণ্ডরা’। এতে আর এতই তফাৎ কি? বুদ্ধেরা বলিলেন, বেশ তফাৎ আছে। একটাতে মাখনটা থাকিয়া যায়, আর একটাতে থাকে না। মাখন তো ফলের রসও নয়, জলও নয়, হুতরাং সেটা তো খাওয়া উচিত নয়। হুতরাং মাখন খাওয়া বা ‘আমণ্ডরা’ রই খাওয়াও তা। এ কার্য্যটি একেবারেই করা উচিত নয়। হুতরাং এটাও একটা বিবাদের কারণ।

(৮) মদ পানিয়ার উটবার পূর্বে জল বসিয়া সেইটাকে খাওয়া। অর্থাৎ তাড়ি হইবার পূর্বে ঝাঁকুওয়ালা রস খাওয়া। ইহা লইয়াও দলাদলি হইল। বুদ্ধেরা বলিলেন, “ওতো মদ। মদ খাওয়া ভিক্ষুদের নিষেধ। হুতরাং মদ হওয়ার পূর্বে উহাকে খাইলে পেটে যাইয়া মদ হইবে।” অগ্রে বলিলেন, “আমরা তো মদ খাইলাম না, তথাগতের আদেশ তো পালন করিলাম, পেটে যাইয়া মদ হইলে আমরা কি করিব।”

(৯) যে আসনের ছিল না থাকে, বৌদ্ধদের তাহাতে বসিতে নাই। ছিলেনগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে যে স্থান আসন হয়, তাহাতে বসি ভিক্ষুদের নিষেধ। ভিক্ষুরা অনেকে চান এইরূপ। স্থান আসনে বসিতে। বুদ্ধেরা বলেন, তাহাতে ভগবানের যে আজ্ঞা আছে উচ্চাসনে বা মহাসনে বসিবে না, সে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। অতএব ছিলাকাটা আসনে বসিতে নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, ছিলা কাটিলাম আর না কাটিলাম তাহাতে কি আসিয়া গেল? আমরা উচ্চাসনেও বসিতেছি না, মহাসনেও বসিতেছি না। তবে আমরা ভগবানের আজ্ঞা কি করিয়া লঙ্ঘন করিলাম।

(১০) সোনারূপা গ্রহণ করা বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুদের নিষেধ। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোনারূপা লইতেন। তাঁহারা উপোষ্য-শালায় একটু জলপূর্ণ পাত্র রাখিতেন এবং উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্য্যপন কাহাপন বা কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়া দিত, ভিক্ষুরা সোনারূপা লুইতেন না, কিন্তু আপনাদের লোক দিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খরচ করিতেন। কার্য্যপন বলিতে সেকালে চোকা চোকা তামার পয়সা

প্রতি ঘে-বিনয় গ্যারিসন দেখিয়েছিলেন তা কোনো রাজা-রাজড়াকেও দেখাতে পারতেন। অদ্ভুত ছিল তাঁর চিন্তের শক্তি! ভ্রমভায় তিনি বীণথুষ্টেবই পদাঙ্ক অমুসরণ করে-ছিলেন, যিনি দারুণ মৃত্যুযজ্ঞণায় কাতর হয়েও বলেছিলেন—
“পিতা, এদেব ক্ষমা কর, এরা জানে না কি করচে!”

পোষাকপরিচ্ছদেব পারিপাট্য ভালো জিনিষ সন্দেহ নেই—তা তার ঘে যতই নিন্দা করুক। তবে এর চেয়েও বড় সৌন্দর্য আছে, তা হচ্ছে মনের সৌন্দর্য বা হৃদয়ের সৌন্দর্য, সেটি স্বাভাবিক ও সহজ সৌন্দর্য।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের কথা

আমাদের সমাজের অনেক বিধিই প্রাচীনকালে সঙ্কল্পে প্রবর্তিত হইলেও কালক্রমে সমাজেব পৌড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। লৌকিকতা একরূপ একটি সমাজবিধি। আমাদের দেশে জনসাধারণের আয় এত অল্প যে ছুবেলা দুমুঠা পেট ভরিয়া খাওয়া কুলায় না, তার উপর আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে আজ বিবাহে কাল শ্রাদ্ধে অপর একদিন উপনয়নে বা অন্নপ্রাণনে নিমজ্জিত হইয়া লৌকিকতা দিতে দিতে কষ্টেব একশেষ হয়, অথচ না দিলেও মান থাকে না, এই জন্তই অনেকে লৌকিকতা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিতেছেন। এসম্বন্ধে “চুচুড়া বার্তাবহ” লিখিয়াছেন—

প্রাচীন আর্ধ্যগণ সমাজকে পীড়িত করিবার উদ্দেশ্যে লৌকিকতার সৃষ্টি করেন নাই। আমাদের বিশ্বাস—সমাজের স্থিতি-কল্পে, সমাজের মঙ্গলের জন্ত,—লৌকিকতা প্রবর্তন হইয়াছিল। আজকাল আমাদের দেশে বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্ত অসংখ্য “প্রজিডেন্ট কোম্পানী” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সকল কোম্পানীকে প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা দিয়া রাখিলে, বিবাহদির সময় প্রস্তুত-চাঁদার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, অথবা চতুগুণ টাকা পাওয়া যায়—ফলে একসঙ্গে একটা মোটা টাকা কর্তৃকর্তার হাতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

হিন্দুব লৌকিকতা সেই অরণ্যভীত কাল হইতেই, নীরবে, এইরূপ প্রতিডেট ফণ্ডের কাজ করিয়া আসিতেছে। তোমার কস্তার বিবাহে হাজার টাকার প্রয়োজন, তোমার পিতার শ্রাদ্ধে ৫০০ শত সূত্রার আবশ্যক; তোমার বন্ধুগণ, আহার আত্মীয়স্বজনী, সেই ব্যয় সংকুলানের জন্ত প্রত্যেক সাধ্যমত তোমার সাহায্য করিলেন। লৌকিকতার অঙ্কিম—এইরূপে ঋণের সময় আমরা কিছু টাকা হাতে পাইলাম। আমাদের ব্যয়ভারেরও কিছু লাভ হইল। আবার তাহাদের বাটতে

কোনও জিয়া কর্প হইলে, তুমি ও আমি এইরূপ সাহায্য করিব। এই যে পরস্পরের সাহায্য ইহাই লৌকিকতার পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা লৌকিকতা বর্খা না করিয়া কেলিয়াছি। আমরা ধনী লৌকিকতার পৌরব করি, দরিদ্রের লৌকিকতার আদর করি না। এই ইতর বিশেষের সমুদানেই ‘লৌকিকতা’ কলুষিত হইয়াছে। যদি মনবী হও—ইহারই পরিবর্তন কর। দরিদ্র আত্মীয়ের কাছে অর্থ, বস্ত্র, উপঢৌকন লইও না,—তাঁহাব শ্রম, ভক্তি, শ্রদ্ধাই অমূল্য লৌকিকতা। ধনীকে ও তাঁহাকে সমদৃষ্টিতে অভিনন্দন কর। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে। একরূপ লৌকিকতার ধনী আনন্দ বাড়িবে, দরিদ্রের সঙ্কোচ মুচিবে,—তোমাব উৎসবও সার্থক হইবে। যাঁহার যেকণ অবস্থা তিনি সেইরূপে লৌকিকতা রাখুন। তুমি কর্পবর্তী—মাথের তাহাই গ্রহণ করও। তারতম্য করিতে যাইও না।

ভদ্রলোককে উৎসবে আহ্বান করিয়া, টেয়া আদায়ের মত উপঢৌকন আদায় করা অতীব অশ্রদ্ধ। বাস্তবিক লৌকিকতা রক্ষার জন্ত টাকা খরচ করিয়া পবেব বাড়ী থাইতে গেলে সে সুবিমল “ভোজনানন্দ” লাভ হয় কি? আমরা নিম্নেরাই দেখিয়াছি একই দিন ৪৫ বাটী হইতে বিবাহের নিমন্ত্রণ হইলে অনেকটা বিরত হইয়া পড়িতে হয়। এক দিনে অনেকগুলো টাকাও খরচ হইয়া যায়। পাঁচ বাড়ীতে লৌকিকতা করিতে ১০০ টাকা ব্যয় করিলাম—আমাদের গোষ্ঠীস্থক গিয়া পেট ভরিয়া থাইয়া আসিলেও যে সে টাকা উঠিবে না!

আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে কোনো বিশেষ বিষয়ে অমুসন্ধান করিবার জন্ত সরকারী কমিশন নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে অনেক কমিশন বসিয়াছে, অনেক লোকের সাক্ষ্য লওয়াও হইয়াছে, বহু সৌরগোল হইয়াছে, কিন্তু ফলে কিছুই হয় নাই। সম্প্রতি এক শ্রম-শিল্প কমিশন প্রধান প্রধান শহরে বৈঠক বসাইয়া শিল্প সম্বন্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে “চাকুনিহির” লিখিয়াছেন—

দেশে যে বোর দরিদ্রতা উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিবারণের উপায় করিতে না পাবিলে অচিরেই বাঙ্গালী কলিমজুরের জাতিতে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।

এখন এক কৃষিকার্য্য বাতীত এ দেশের লোকের হস্তে অস্ত্র কোনও ব্যবসা নাই বলিলে অতুক্তি হয় না। কেবল কৃষিকার্য্য দ্বারা কোনও দেশ ধনী হইতে পারে না। কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন অর্থদ্বারা একটী সমগ্র জাতির বর্তমান-সময়োপযোগী নানাপ্রকার অর্থাৎ দূর হইতে পারে না। আবার আমাদের কৃষি-ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে যৌত্র-বৃত্তির সামগ্রস্তের উপর নির্ভর করে।

দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধিত না হইলে কৃষিব্যবসা দ্বারা আমাদের দরিদ্রতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

এ দেশের শিল্পাদির উন্নতি সাধন করা যে প্রয়োজন তাহা বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। কি ভাবে এ দেশের শিল্পাদির উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহার অমুসন্ধান জন্ত গবর্ণমেন্ট প্রথমে কর্পোরারী নিয়োগ করিয়া স্থানীয় অমুসন্ধান করিয়াছিলেন; তৎপর তদ্বিস্তৃত আপানে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি ঐ বিষয় অমুসন্ধান জন্ত এক কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের পক্ষ হইতে যে-সকল ব্যক্তি ঐ কমিশনের সমুখ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন তাঁহারা তাঁহাদের স্বসমাজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিরন্তন প্রাথমুসায়ে এ দেশের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে

গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিতে নিবেদন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ ও অস্ত্রাশ্রয় প্রকার সাহায্য ব্যতীত কোনও দেশের শিল্পের উন্নতি যে অসম্ভব তাহা জাপান, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস-পাঠক অবগত আছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিলাতী গবর্ণমেণ্ট কিরূপে আইনাদি করিয়া বিলাতী শিল্পের উন্নতি ও রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তৎকাল এ দেশের শিল্প নষ্ট করিয়াছিলেন তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে।

আমাদের দেশে শিল্পাদির উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতি ঘটতেছে ইহা নিদ্বার্য নিমিত্ত কোনও প্রকার সাফা গ্রহণের আবশ্যকতা আছে, তাহা কেহই মনে করিবেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট শিল্পাদির উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কি উপায়ে তাহা সংঘটিত হইতে পারে তাহা বিশেষ কোনও মতভেদ আছে এবং তৎকাল সাফা গ্রহণের আবশ্যকতা আছে তাহা পূর্বে আমরা মনে করি নাই। আমরা এখন দেখিতেছি, এ দেশের শিল্পোন্নতি বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি আমাদের দেশস্থ ইয়োরোপীয় শিল্পী ও বণিকগণ ঠিক তাহা বুঝেন না। ইয়োরোপীয় শিল্পী ও বণিকগণের মতামতেরই আমাদের গবর্ণমেণ্টকে চলিতে হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ক্রমেই সাফা গ্রহণের আবশ্যকতা হইয়াছে।

ইংরেজ সাক্ষীগণ একবাক্যে বলিতেছেন, এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনও আর্থিক সাহায্য করা সম্ভব নহে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধিত হইলে এ দেশে ইয়োরোপীয় শিল্প প্রবোধ আর নষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইয়োরোপীয় শিল্পের আর এ দেশে নষ্ট হয় ইহা ইংরেজ শিল্পী ও বণিকগণের নিম্ন স্বার্থের বিরোধী এবং অস্ত্রাশ্রয় কারণেও উহা কখনও তাহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

শিল্প-কমিশন প্রসঙ্গে “মোহাম্মাদী” বলেন—

ভারতের নষ্টপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য এদেশের মজলারী ব্যক্তিগণ বহুদিন হইতে চেষ্টা ও আলোচন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, এই অকৃতকার্যতার জন্য এদেশের লোকের কর্ণশক্তি ও যোগ্যতার প্রতি আংশিকরূপে দোষারোপ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যেক অভিজ্ঞ পাঠকই স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্যের প্রতি রাজ-পক্ষের অনন্যবোধিতা বা উপেক্ষাই তৎকাল প্রধানতঃ দায়ী। গবর্ণমেণ্টের বর্তমান বাণিজ্যানীতি ও ইউরোপীয় বণিকদিগের সমর্থনমূলক শুদ্ধাদির ব্যবস্থা এদেশের শিল্পবাণিজ্যাদি ধ্বংসের প্রধান কারণ। এদেশের স্বার্থরক্ষাকে রাজস্বাধিনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা-বিধান বিবিধরূপে করা হইলে—ভারতবর্ষ এতদিনে জাপান অপেক্ষাও অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারিত। আজকালও একখানা পিগমাস নৌপ (মাঝান) যাহা কলিকাতায় চারি আনার বিক্রয় করা হয়, জাপানে তাহার মূল্য বার আনার কম নহে। জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বদেশের শিল্পাদিগকে উৎসাহিত ও লাভবান করার জন্য বিশেষরূপে সমস্ত শিল্পপ্রবোধ উপর ঐরূপ অতিরিক্ত শুদ্ধাধাপ করিয়াছেন। তাই অল্পদিনের মধ্যে জাপান ইউরোপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

মামলাবাজিতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ধনী পণ্ডের ভিখারী হইতেছে, কিন্তু মামলাব কমতি নাই। অধিকাংশ মামলার উৎপত্তি জমিজমা লইয়া। এক বিধা জমি কিনিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে চারিপাশের লোকের সঙ্গে মামলায় জড়িত হইতে হইবে। নিতাই এরূপ ঘটনা

ঘটিতেছে। ইহার প্রতীকার কি এবং কে তাহা করিবেন? “জ্যোতিঃ” লিখিতেছেন—

মামলা ছাড়, দেশ স্বাধীনপূর্ণ হোক, তোমাদের জীবিত হইবে, ইত্যাদি সরূপদেশ দিয়া দেশের লোকের কাছে কোন কল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তোমরা মামলাবাজ, তোমরা নজ্জার ইত্যাদি গাল-গালিও অরণ্যে চীৎকারবৎ নিষ্ফল। যে কোন সমাজের প্রতীকারের অসীম ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের শাসন-কর্তার নিয়মতন্ত্রের (constitution) ব্যতিক্রম কিছুই করিবেন না। এক সময় মনে করিতাম দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, দেশেব সমস্ত উৎপাদনের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া যাইবে। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের অর্থপিপাসা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে দেশের ভাল-মন্দের কথা চিন্তা করিবার অবসরও তাহাদের নাই।

“জ্যোতিঃ”র মতে বিচারকেরাই একমাত্র আশাশ্রয়।

দেওয়ানী কি কোজদারী আদালতের হাকিমেরা অবিরত দেখিতেছেন যে কতকগুলি খামলাকারী মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করে, মিথ্যা সাক্ষী তৈয়ার করে, আদালতের সমক্ষে দাঁড়াইয়া শপথপূর্বক আপোণোড়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যায়। সেই সমস্তকে দমন করিবার জন্য যদি তাহার বদ্ধপরিবর হন তবে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দুই বছরের মধ্যে এদেশের সর্বপ্রকার বোকাদমার সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও বেশী কমিয়া যাইবে; এবং তখন স্ববিচারবিধানের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

স্ব।

হতভাগ্যের সান্ত্বনা

পূজার ফুলে সাজিয়ে সাজি হাজির হলি যবে,

দেবতা তোরে বিমুখ হল? লক্ষ্য তাতে হবে?

চরণে সে ঠেলল সাজি

লুটালো ফুল ধূল্য আজি?

তার চরণ ত ছুঁয়েছে ফুল! এই ত সকল পূজা,—

ওবে অবোধ, ও অভাগা, মনটাকে তোর বুঝা!

তোর কপালে এমন হল?—এমনটাকেই নে না,

অমন যদি না হল তার আশাই ছেড়ে দে না!

না হয় গাছে ফুটল না ফুল,

কাঁটার বেলা হয়নি ত ভুল?

হাসি যদি না জোটে ত কান্না কাড়ে কে?

যে এসেছে বরণ করে তারেই নে ভেকে।

এমন হল, এমন নহে ? এই কি নহে ভালো ?

অন্ধকার ত জমাট আছে, নাই বা জলুক আলো !

বসন্ত তোর নাই বা আশুক,

আকুল ধারায় বর্ষা নামুক,

গ্রীষ্মকালের রক্ত দহন তাই বা মন্দ কি ?

কারুব দয়ায় হৃদয়টা তোর নয় যে বন্ধকী !

তুই যে শুধু নিষেই গেলি, পেলি না এক কড়া,

দেউলে হলি উজাড় করে মোহরের সাত ঘড়া,

এই ত রে স্নিত, এই ত রে জয়,

ছাড় রে সকল লজ্জা ও ভয়,

হতভাগার ভাগ্য দেখে স্তব্ধ বহুমতী !

ধন্য হল অভাগা তোর সকল ক্ষয় ও ক্ষতি ।

কববি পূজা ? কবু না রে তুই গোপন হৃদয়-তলে,

পবাণে ফুল না ফুটে ত পূজবি চোখের জলে ।

তুই পারীষা পঞ্চমা জাত,

তোর জীবনে নাইরে প্রভাত,

চিরবাত্রি অন্ধকারে করতে হবে যাপন,

একনা রবি একপাশেতে কেউ না রে তোর আপন ।

তোর ভয়েতে দেবতা যে সেও ছুতের ভয়ে সারা !

তুই ত রলি মুক্ত, হল মন্দির তার কারা !

দেবতা থাকুক মন্দিবে তার

তোব ভয়েতে কদ্বিষা ঘর,

বাহিবে তার পূজোপচার তুই অভাগ্য সাজা,

হতভাগাব জঘ আঞ্জি তোর ভগ্ন ঢাকে বাজা !

১৭ বৈশাখ ১৩২৩

বাত্রি ১টা ।

বিশ্রী ।

পুস্তক-পরিচয়

ছোট-বউ—শ্রীকবীন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক প্রণীত । প্রকাশক
মিঃ কোং, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং, কলিকাতা । ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৮০ পৃষ্ঠা ।
দাম ছয় আনা ।

ইহা ঠিক উপজাসও নয়, ছোট গল্পও নয় ; লেখক তাই ইহার সংজ্ঞা
নির্দেশ করিয়াছেন বড় গল্প । গল্পটি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি,
আগাগোড়া স্থখপাঠ্য । ভাবার একটু-আধটু ক্রটি এখানে-সেখানে
চোখে লাগিলেও, বর্ণনার মধ্যে কোনো কৌশল বা কারিকুরি না
থাকিলেও, আশ্রয়নের আকর্ষণে বিনা আয়াসে পড়িয়া যাওয়া যায় ।
স্রী-চরিত্রগুলি ফুটিয়াছে মন্দ না ।

ভগবান দত্তের তিন ছেলের তিন বউ ও এক বিধবা কস্তা লইয়া
সংসার । মেজো বউ ধুব বড়লোকের মেয়ে, দেমাকী ঠেকারী-গেনারী ;
ছোট বউও ধনী কস্তা কিন্তু সে আত্মদে স্পষ্টবাদী ; বড় বউ সাদাসিধা
মানুষ, গেরস্তের মেয়ে ; বাড়ীর বিধবা মেয়ে প্রমদা জয়কতে—অর্থাৎ
যে-দিক প্রবল বলিয়া জয়ী হইবার সম্ভাবনা দেখে বেচারী সেইদিকে
হয় । মেজো বউ বড়মানুষী দেখাইয়া বস্তুরকে পর্যন্ত অপমান করিত,
ছোট বউ তাহাকে বাধা দিয়া-দিয়া সকলের মনের দুঃখ বশাস্তব
নিবারণ করিবার ব্রত লইয়াছিল ।—ইহাই গল্পের মোটামুটি দ্রষ্ট ।
এই গল্প পরিসরের মধ্যে ঘটটা সম্ভব সব-করটি স্রী-চরিত্রই বেশ
ফুটিয়াছে । পুরুষ-চরিত্র একটিও ফুটে নাই, বোধহয় অপ্রধান বলিয়া
লেখক সেদিকে মন দ্যান নাই ।

৮ হারুন-অর-রশিদদের গল্প—শ্রীদেব কল্লল-করিম কর্তৃক
প্রণীত । প্রকাশক নূর লাইব্রেরী, ১২১ সারেস লেন, কলিকাতা ।
দুই রঙের কালিতে বর্ডার দিয়া ছাপা ; উপহারের পৃষ্ঠাটি তিন রঙের
ছাপা ; মলাটটি হৃদয় ; অনেকগুলি ছবি আছে ; ৫৭ পৃষ্ঠা । দাম কিন্তু
মাত্র আট আনা ।

হারুন-অর-রশিদ বলিয়ার নামের সঙ্গে এমন একটি রোমান্টিক
ভাব জড়িত আছে যে তাহার কাহিনী বিচিত্র রকমে কল্পনাকে উদ্ভাস
করিয়া তোলে । লেখক সেই অদ্ভুতকল্পী রাজার একটি মাত্র কাহিনী
লইয়া শিশুদের জন্য বর্ণনা করিয়াছেন—এই কাহিনীটি হারুন-অর-
রশিদদের সহিত আবুল-হোসেনের কোতুবকাহিনী, ইহা আরবা-উপন্যাসে
ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের কোতুবকাহিনীকায় আমাদের সাধারণলোকেরও
পরিচিত হইয়াছে । কিন্তু আবুল-হোসেনের পুরাতন কাহিনী তাহার
কোতুবকাসের জন্য চিরনূতন ; এবং লেখকের বর্ণনার ভঙ্গিতে নূতনতর
হইয়া উঠিয়াছে । গদ্য রচনাতেও যে ছন্দ তাল রচনা করা যায় তাহা
অনেক লেখকই জানেন না । গদ্যের ছন্দতাল রচনায় ওস্তাদ শ্রীযুক্ত
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । আমাদের এই লেখকও গদ্যে ছন্দতাল রচনায়
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ; মোলায়েম কবিত্বময় ছন্দতালযুক্ত ভাষার
নুপুংস পায়ে দিয়া লেখকের বর্ণনা বেশ নৃত্য করিয়া চলিয়াছে । আর-
একটি বিশেষত্ব লেখক চলন্ত কথার ভাষায় রচনা করিয়াছেন, অথচ
কোপাও জড়তা নাই বা কথা অকথা ভাষার খিচুড়ি হয় নাই । ইহার
দ্বাং বুঝা যায় যে লেখক বাস্তবিক বাঙালী, তিনি বাংলা ভাষার প্রাণের
পরিচয় পাইয়া আনন্দ হইতে রচনা করিয়াছেন । ভাষার ধাত ব্যুৎপাদ
লিখেন এমন লেখক বাংলা দেশে খুব কম ; সেই কন্মের মধ্যে এই
লেখককে পাইবা আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি । তাহার রচিত
এই বইখানি গ্রামাণ্ডেব শিশুসাহিত্যের দীনতা মোচনে যথেষ্ট সাহায্য
কবিবে । আমরা তাহার লেখনী হইতে আবার উপহার পাইবার
প্রত্যাশা করি ।

লেখককে একটি বিষয়ে সাবধান হইতে অনুরোধ করি। দৈহিক ব্যাপার মাত্রই অতি স্থূল এবং সেইজন্য গোপনযোগ্য। এই কারণে লোকের সামনে খাইতে পর্যন্ত মানুষের লজ্জা হয়, সংস্কৃত-সাহিত্যে বিন্দুকের বাওয়ার লোভ বর্ণনা করিয়া হান্তরসের সৃষ্টি করা হইত। এতদ্ব্যতীত অল্প কোনো শারীর চেষ্টার বর্ণনা সাহিত্যে চলে না; করিলে তাহা অমূল্য বা বীভৎস হয়। পাঠ্যধারার বাওবা বা চাবুক মারার স্থাননির্দেশ সহজেই বাদ দেওয়া চলিত।

ঘুমের গল্প—ঈহেমদাকান্ত চৌধুরী কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক বেঙ্গল বুক ক্লাব, ১২ রামমোহন-দত্ত রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। রয়াল ১৬ অং ৭৬ পৃষ্ঠা। অনেকগুলি ছবি আছে। মূল্য আট আনা।
এই বইএ ওশিংটন-আর্ভিওর রিপুভলিউন উইল্‌স্‌ ও সিউপী হলো নামক গল্প দুটি এবং আবু-হোসেনের গল্পটি ছেলেদের অল্প সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আলম-কুড়ের কোতুকর ঘুমের গল্প পড়িয়া শিশুরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিবে। গল্পগুলির মধ্যে হান্তকোতুকের উপাধান যথেষ্ট আছে, এবং লেখকের ভাষা তাহা অচ্ছন্ন করিয়া ফেলে নাই।

চামুণ্ডার শিক্ষা—

সুদখোর সওদাগর—

ঈনগেন্সনাথ রায়চৌধুরী
প্রণীত। প্রকাশক—
ঈসারদাকুমার দত্ত, ১৭ ব্রীজ-

রোড, চৈতলা, আজিপুর, কলিকাতা। সচিত্র। ৮৫ ও ৮৪ পৃষ্ঠা।
মূল্য উভয়েরই দশ আনা করিয়া। বই দুখানি হৃদয়।
এই দুখানি বইএ মহাকবি শেক্সপীয়ারের টেমিং অফ্‌ দি স্ট্র ও মারচ্যাণ্ট অফ্‌ ভেনিস নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকদ্বয়ের উপাধানভাগ ছেলেদের অল্প বেশী ছাঁচে চলিত কথায় বিবৃত হইয়াছে। চলিত কথায় রচনা করিয়া লেখক স্ববুদ্ধি ও বাংলা ভাষার উপর অধিকারের পরিচয় দিয়াছেন; রচনা সুন্দর ও স্থূললিত হইয়াছে। বালকবালিকারা এই দুই বইএ বহু শিক্ষা ও কোতুকের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুখানি বইএর ও অপরতের শ্রেষ্ঠ নাটককারের পরিচয় লাভ করিবে।
মুদ্রারক্ষস।

গায়ে হলুদ—গল্প-পুস্তক, ১৪১ পৃঃ। ঈপ্রিয়শোবিন্দ দত্ত, এম-এ, বি-এস্‌ প্রণীত, এবং ৭ ইঞ্চর দাসের লেন ঢাকা হইতে প্রমুখ্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য বইখানিতে প্রভাতকুমার ও ললিতকুমার এই দুইটি গল্প আছে। গল্পের আধ্যানভাগ সাদাসিধা; প্রভাতকুমার প্রেমে পড়িয়া পিতার অমতে বিবাহ করায়, সাধারণত যেমন ঘটে তেমনি ঘটিল, অর্থাৎ পিতা তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। অবশেষে কিন্তু অমুচুপ পিতা পুত্র ও পুত্রবধূকে আবার গ্রহণ করিলেন। ললিত-কুমার ডাক্তার, সে বড়ো পড়িয়া ডুবিয়া বাইতে-বাইতে রক্ষা পায়, এবং একটি মেয়েকে জল হইতে উদ্ধার করে। মেয়েটির নাম নির্মলা। নির্মলার থাকার মধ্যে ছিল পিতা, তিনিও জলে ডুবিয়া মারা যান। অপর্যাপ্ত নির্মলা ডাক্তার-বাবুর পরিবারভুক্ত হইবাই থাকিল। নির্মলাকে ডাক্তার ভালোবাসে অথচ ঘটনাচক্রে বিবাহ করিয়া বসিল আর-এক-জনকে। ডাক্তারের স্ত্রী সম্বান প্রদব করিয়া গীড়িত হইয়া পড়িলেন। মরিবার সময় তিনি সম্বানটিকে নির্মলাকে কোলে দিয়া এবং স্বামীকে নির্মলাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন।

বইখানির ভাষা সরল অনাড়ম্বর। গল্প দুটি কিন্তু জমে নাই। পড়িতে-পড়িতে পরে কি হইবে জানিবার কোতুহল জাগে না। গল্পের

শেষ কিরূপ হইবে তা গোড়া থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। গল্পবর্ণিত কোনো চরিত্রের স্বপ্ন বা দুঃখে মন বিচলিত হয় না।

বইখানির ছাপা পরিষ্কার, কাগজ ভালো।

হ।

দীক্ষা ও গুরুত্ব—ঈহুগেন্সনাথ সান্যাল প্রণীত। প্রকাশক ডাক্তার ঈকানাইলাল গুপ্ত, বি, এ, ১২১ নং বারানসী বোম্বের ট্রিট, কলিকাতা। ১৩৯ পৃঃ। মূল্য ১/০ আনা।

“বং প্রাণপরিভাণঃ শিরসো বাপি কর্তনম্”—প্রাণ যায় বাউক, কেহ মাথা কাটিয়া ফেলে ফেলুক, তাহাও ভাল; কিন্তু মহেশ্বরের আরাধনা না করিয়া জল গ্রহণ করিব না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গুরু নিকট শিষ্য দীক্ষা গ্রহণপূর্বক সাধন করিতে আরম্ভ করেন। আজ-কাল সম্ভাবন্যনা ঘূরে, প্রায়জীর্ণপও করিবার অবসর পাওয়া যায় না। এই ভাবই সম্প্রতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আবার অনেক স্থলে দীক্ষা অনাবশ্যক, ও গুরুকরণ বার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। এরূপ সময়ে “দীক্ষা ও গুরুত্বের” মত পুস্তকের কতদূর আদর হইবে বলা যায় না। তথাপি ইহার প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে—তত্ত্ব গুরু বলিতে বস্তুত কি বুঝিতে হয়, এবং দীক্ষা আবশ্যক কেন, গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে কয়েক ব্যক্তির সংবাদরূপে তাহা সহজ ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক সময়ে কোনো বিষয়কে বস্তুত সম্যক না জানায় লোকের মনে নানা বিরুদ্ধ ধারণার উদয় হয়। বিশেষত যদি কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির এইরূপ হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোকেরা তাহাই অমুসরণ করিয়া একটা বিষয় অনর্থের সৃষ্টি করিয়া ফেলে। গুরুবাদ-সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছে। যাহারা ইহা সন্ধিস্থ আলোচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা আলোচ্য গ্রন্থে অনেক সাহায্য পাইবেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীমদগোমঙ্গলম্—ঈবিভূতীশচন্দ্র কাব্যবাকরণতীর্থ-প্রণীতম্, কলিকাতা, ২৪ নং, মিডিল রোড, ইটালী, গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত, ৪৭ পৃঃ, মূল্য ১/০।

এই পুস্তকে গোত্রাতির উপযোগিতা ও তাহার বর্তমান হ্রদশার প্রতীকার-সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের প্রামাণ্যে সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গভাষাতে আলোচনা করা হইয়াছে। গোপালন-সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রসমূহে যাহা নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, তাহাই তুলিয় দিয়া বাস্তব আলোচনা করিলে ভাল হইত, পর্যাপ্ত হইত। ধর্মশাস্ত্রান্যের প্রচুর বিধি আছে, ইহার পর আরো নূতন-নূতন বিধিবাক্যসমূহ গ্রন্থন করিয়া পূর্বের বিধিগুলির সহিত যোগ করিলে তাহাতে বস্তুত ক্ষতি হয়। গোচরভূমি দান করা খুব ভাল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ভূমিতে “পিতৃমাতৃ: স্বম্যা বা নামকৃতং যোক্তং প্রস্তবধারিতং প্রথমেৎ”—এইরূপ বিধি ঠিক নহে। লেখকের সংস্কৃতের আদর্শও ইহাতেই বুঝা যাইবে।

মহিম্নঃ স্তোত্রম্—(গুরুবিপণিত পুণ্যদস্তপ্রণীতম্) অমর-টীকাবঙ্গভাষা-সমতম্, চতুর্ভূষণোপাধ্যায়-ঈশ্বরনামোহন শর্ম্মা সম্পাদিতম্। পন্নীক্স প্রেস্‌, নাগডাঙ্গা, রংপুর। মুদ্রাকার ৬২ পৃঃ, মূল্য ১/০।

মূল স্তোত্র সুপ্রসিদ্ধ। টীকাটি কয়েকখানি কীটদষ্ট পত্রে অসম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত। ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। টীকাকারের নামও পাওয়া যায় নি। ছাপা মোটেই ভাল নহে।

আমিহের প্রসার,—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, [কল্পটিং পরিব্রাজকল্প] বেদান্তবাচস্পতি জীঘৃক্স যদুনাথ মজুমদার, এম.এ., বি.এল-কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, যশোর, প্রথম খণ্ড ১৪০ পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৬২ পৃঃ। মূল্য প্রতিখণ্ড ৮০ আনা।

বেদান্তের পোড়া-আগার, তা বেদের মধ্যেই হটক আর বর্তমান শিক্ষিতমানব উপেক্ষিত পুরাণেই হটক, সর্বত্রই এই এক অতিসত্য কথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভেদদৃষ্টি বা ভেদবুদ্ধিতে জীবের ভ্রম-শোক-মোহ প্রভৃতি দুঃখ, আর অভেদ বা একা-দৃষ্টিতে সেই-সব দুঃখের বিনাশ হয়, জীবের স্বরূপ প্রকাশ পায়, সে পরম আনন্দে পূর্ণ হয়। কাচ স্বরূপত স্বচ্ছ-সুনির্গল, কিন্তু তাহাতে কালী লাগিলে যেমন তাহার স্বরূপ ঢাকিয়া যায়, তাহার স্বচ্ছতা-সুনির্গলতা প্রকাশ পায় না, আত্মাও সেইরূপ স্বভাবত স্বচ্ছ ও আনন্দময়, কিন্তু ভেদদৃষ্টিতে তাহা মলিন হইয়া উঠে, তাহার স্বাভাবিক আনন্দময়তা তিরোহিত হইয়া যায়, এবং শোক-মোহ-ভ্রম ইত্যাদি দুঃখজন্য দেখা দেয়। অমুকুল বায়ুর সঞ্চারে মেষ অপগত হইলে যেমন সূর্য্যের স্বরূপ প্রকাশ হয়, সেইরূপ ভেদদৃষ্টি অপসৃত হইলে, একাব্যক্তির ক্ষুদ্রণ হইলে আত্মার আনন্দ পুনর্ব্বার আবিস্কৃত হয়।

আত্মাকে বা আপনাকে সকলেই ভালবাসে, আপনায় এতি কাহারো ঘেব হয় না, আপনাকে কেহ ঘৃণা করে না; আত্মা বা আপনা ছাড়া অপর বস্তু-বাক্তির প্রতি লোকের ঘেববুদ্ধি হয়, তাহাতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এখন অপর বস্তু-বাক্তি বলিতে যদি কিছুই না থাকে, যদি জীব কেবল আপনা-মাত্রই থাকে, তবে তাহার আর ঘৃণা থাকে না। আপনায় নিকটে আপনায় ভ্রম হয় না, খুব নির্ভরে থাকা যায়; কিন্তু যখন নিকটে আর-একটা কিছু দাঁড়ায়, আপনা ছাড়া অপর কিছু আছে বলিয়া মনে হয়, তখন ভ্রমও উপস্থিত হয়। এইরূপে এই যে, আপনা হইতে পৃথক করিয়া দেখা, আপনা বা আত্মা হইতে ভেদবুদ্ধি, ইহাই শোক-মোহ-ইত্যাদি বিবিধ দুঃখ আনয়ন করে, জীব মুক্তা-যন্ত্রণার ছটফট করে। এই ভেদবুদ্ধি বা বৈতবুদ্ধি নষ্ট হইলে, এবং অভেদবুদ্ধি বা অবৈতবুদ্ধির উদয় হইলে সর্বত্রই স্বর্গের অবসান হয়, জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আনন্দময় হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত মহাবাক্যগুলি এই কথাই প্রকাশ করিতেছে:—

“যদা হোতৈব এতন্নিরুদ্রমন্তরং কুরুতে, অথ তন্ত ভ্রমঃ ভবতি।”

তৈত্তি. ২.৭।

“ভ্রমঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ।” ভাগবত, ১১.২.৩৭।

“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রিত য ইহ নানৈব পশ্যতি।”

“যদা হোবেধ এতন্নির...মন্তরঃ প্রতিষ্ঠাঃ বিনশতে, অথ সোহন্তরঃ গতো ভবতি।” তৈত্তি. ২.৭।

“বস্তু সর্বাণি ভূতান্জান্নান্যোবাসু পশ্যতি।

সর্বভূতেশু চাত্মানং ততো ন বিজ্ঞপ্তসুতঃ॥

যস্মিন সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাসুদ বিজানতঃ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমজ্ঞানতঃ।” ঈশা ৬-৭।

“সর্বভূতহমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।” গীতা.

“সর্বভূতেশু যঃ পশ্যেদ ভগবদ্-ভাবমাত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্রয়ো যঃ ভগবতোত্তমঃ।” ভাগবত.

এই যে অবৈতজ্ঞান, ইহাইই অপর নাম হইতেছে—সর্বভূতে আত্মার ও আত্মায় সর্বভূতের দর্শন, সংক্ষেপে সর্বত্র আত্মদর্শন। ভাগবতের ভাষায় ইহাওই বলে সর্বভূতে ভগবানের এবং ভগবানে সর্বভূতের

দর্শন (যেমন গীতার অর্জুনের বিষ্ণুরূপদর্শন, এবং ভাগবতে যশোদার জীবালগোপালের মুগ্ধস্নেহের ভুবনদর্শন)।

এই অবৈতজ্ঞান বা সর্বত্র আত্মদর্শন কি, ইহা লইয়া আচার্য্যগণের বিবিধ মত আছে। ইহার আলোচনা এখানে নিম্নপ্রয়োজন, আমরা মোটামুটি একরূপ কিছু বলিব।

কন্ডার বিবাহ হইলে যত দিন সে জননী না হয়, তত দিন তাহার নিজেরই বেশবিস্তার প্রভৃতি সৌন্দর্য্যবিধান বা যজ্ঞ-আদরে বিশেষ লক্ষ্য থাকে, তাহাতেই সে পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু জননী হইলে সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সে ভাব পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়। দেখা যায়, তখন সে নিজের জন্ত ব্যাকুল নহে, তাহার সমগ্র দৃষ্টি তখন শিশুটির দিকে গিয়াছে, শিশুরই সাজ-সজ্জা, আদর-মত্তে তাহার দিন কাটিতেছে,—পূর্বে তাহাই নিজের জন্ত কাটিতেছিল। পূর্বে নিজেরই রোগাদি পীড়ায় কষ্ট অনুভব করিত, এখন শিশুর রোগ হইলে নিজেরই রোগ হইয়াছে মনে করে, তাহাকে কেহ আশ্বাস করিলে সেই আশ্বাস নিজেরই ভাবে, “পুত্রে নষ্টে মৃত্যুতে অহমেব মৃত্যো নষ্টঃ”—মনে করিয়া ব্যাঙল হয়। একটি পুত্রের পর আর একটি, তাহার পর আর একটি, এইরূপ যত পুত্র জন্মে, জননী তাহাদের সকলেরই জন্ত ঈর্ষাপ করে। পূর্বে কেবল নিজের কথা ভাবিত, এখন কতজনের কথা ভাবিতে হয়। কেন ঈর্ষাপ হয়?

কোনো নিরাশ্রয় পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিয়া লোকের মনে দুঃখ হয়। কেন, তাহার নিজের শরীরে ত কিছুই হয় নাই, তবু তাহার দুঃখ হয় কেন?

ইহার একমাত্র উত্তর, সে তাহাদের মধ্যে আত্মদর্শন করে। পুত্র জন্মের পূর্বে জননী কেবল নিজেরই দেহের মধ্যে আপনাকে বা আত্মাকে দেখিত, কিন্তু শিশু জাত হইলে সে তাহারও মধ্যে নিজেকে দেখিতে পায়। দয়ালু ব্যক্তি ঐ পীড়িতের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পান। নিজের পরিচ্ছিন্ন দেহসজ্জাত ছাড়া পুত্রগণেরও মধ্যে নিজেকে বা আত্মাকে দেখিতে পায় বলিয়াই সেই জননী তাহাদিগকে ঘৃণা করে না, তাহাদের নিকটে ভ্রম পায় না, নির্ভরে থাকিতে পারে।

এই যে, এইরূপ আত্মদর্শন, ইহা যত-যত বাড়িবে, যত অধিক-অধিক ব্যক্তিতে এইরূপ আত্মদর্শন হইবে, তত-ততই সর্বাধিক ঘাইবে, উদারতা আসিবে; ঘেব কমিয়া ঘাইবে, ভালবাসা উৎপন্ন হইবে; কেবল স্বার্থ লইয়া লোক পশু হইবে না, পরার্থ লইয়া দেব হইয়া উঠিবে; কেবল নিজেরই উদয় পোষণ করিতে ব্যস্ত থাকিবে না, প্রথমে অন্যকেই পোষণ কবিবার জন্ত উদ্বৃত্ত হইবে, তাহাতেই আত্মোৎসর্গ করিবে, এবং তাহাতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে। ইহাই নিম্নোক্ত মোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন:—

“আত্মোপম্যান সর্বত্র সমং পশ্যতি বোহর্জুন।

জুংঘং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।”

ইহা একপ্রকারের আত্মদর্শন; গীতার এই শ্লোক-অনুসারে ইহাকে সমদর্শন বলিতে পারা যায়। অন্তরূপও আত্মদর্শন আছে কিন্তু বলিয়াছি এখানে সে আলোচনার দরকার নাই।

আলোচ্য পুস্তকে এই সমদর্শন-রূপই আত্মদর্শন বিবৃত হইয়াছে। পুস্তককার ইহাবই নাম দিয়াছেন আ নি ত্বে র প্র সা র । তাহার মতে ইহার বিবক্ষিত ভাবার্থ এই যে, কেবল নিজেরই মধ্যে নিজেকে বা আত্মাকে সন্নিবিষ্ট না রাখিয়া অন্তরের মধ্যে ইহাকে প্রসারিত করিবে হইবে অর্থাৎ অপরদেরও মধ্যে আত্মাকে দেখিতে হইবে। কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া এই কথাটাই তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তাহার চেষ্টার আংশিক সফলতা হইয়াছে। কিন্তু যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। সনাতন ধর্মের যে-সকল বিধান ব্যাখ্যা করিয়া তিনি নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই বা ঠিক করিতে পারেন নাই। যাহা বলার দরকার ছিল, তাহা বলেন নাই, বা যাহা অনাবশ্যক তাহা বলিয়াছেন। স্থানে স্থানে অসম্বন্ধ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক কথা এলো-মেলো-ভাবে বিশৃঙ্খলভাবে লেখা হইয়াছে, পুনরুক্তি করা হইয়াছে। পুস্তক-প্রণয়নের যুক্তিযুক্ত প্রণালী উপেক্ষিত হইয়াছে। যে শাস্ত্রবচন যাহা সমর্থন করিতে পারে না, তাহাও তাহার সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, দর্শনশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাবার ও ছাপার ভুলও প্রচুর রহিয়াছে। আমবা ইহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দিব।

“আমিহের প্রসার” নামটা সম্ভব মনে হয় না। ললিত বাবু ইহা পূর্বেই ধরিয়াছেন মনে হইতেছে। গ্রন্থকার ঐ শব্দে যে, বস্তুত আত্ম প্রসার বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি একাধিকবার ‘আমিহের প্রসার’ প্রয়োগ করিলেও, তাহারই লেখা হইতে বুঝা যায়:— “কিন্তু দেহকে আত্ম প্রসারের উপকরণ জ্ঞান না করিয়া...আত্মার প্রসারের চেষ্টা” (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৭ পৃ.)। আলোচ্য গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের নাম দেওয়া হইয়াছে Expansion of Self. ইহাতেও ঐ কথাটা বুঝা যাইতেছে। আবার অন্যত্র (ঐ ২২ পৃ.) “সর্বজ্ঞ আত্মার দর্শন বা একত্বজ্ঞানই আত্ম প্রসার বা আমিহের প্রসার।” এখানে তাহার মতে আত্ম-প্রসার=আমিহের প্রসার। কিন্তু আত্মা=আমি, আমিহ নহে। অতএব আত্ম-প্রসার=আমি-প্রসার, অথবা আমার প্রসার। আমিহের প্রসার হইতে পারে না। আমি ও আমিহ এক নহে। আবার আমিহের প্রসার বলিতে হইলে আত্ম-প্রসার বলা চলে না, বলিতে হইবে আমিহের প্রসার। এবং তাহা হইলে Expansion of Self বলা চলিবে না, Selfness বলিতে হইবে।

অহম=আত্মা, অতএব অহম=আমি হইলে, আত্মা=আমি। অতএব আমিহ=আত্মহ। ইহার মধ্যে কোনো ভুল নাই।

গ্রন্থকার আবার (প্রকাশকের নিবেদন, /০) এই আমিহকে অহংতত্ত্বের সহিত এক ধরিয়া এক বিষয় গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতও ঐ দুইটি এক পদার্থ নহে। “আমিহে বা অহংতত্ত্বে যে কর্তৃত্ববুদ্ধি তাহাই অহঙ্কার। স্তত্রাং আমিহের প্রসাবে অহঙ্কারের প্রসার।” ইহার তাৎপর্যটা কি, এবং হেতু-হেতুমস্তাবটাই বা কি হইল বুঝা যায় না।

‘আমি-আমি’ ‘আমার-আমার’, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় অহঙ্কার-মমকার বন্ধের কারণ। অতএব ইহার বিনাশই প্রার্থনীয়। গ্রন্থকার ইহাই দেখাইতে চাহেন, এবং ইহা এক ভাবে ঠিকই যে, এই ‘আমি-আমি’ ‘আমার-আমার’ ভাবকে প্রসার করিতে পারিলেই তাহার বন্ধন-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, আর মুক্তির শক্তি ফুটিয়া উঠে। অর্থাৎ কেবল নিজেবই দেহের মধ্যে ‘আমি’ বা আত্মাকে দেখিলে হইবে না, সকলেরই মধ্যে দেখিতে হইবে। কেবল আমাব নিজেবই লোক-জনকে ‘আমাব’

ভাবিতে হইবে না, “বহুধৈব কুটুম্বকম্” ভাবিতে হইবে। মনে হয়, ইহাই তিনি “নিবেদনে” বলিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু ভাবার তাহা পরিশুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে (২৭ পৃ.) মায়া শীর্ষক প্রবন্ধটিতে জগতের প্রকৃতিরূপা ভগবৎজক্তি মাযার সহিত বাঙলায় মেহ-ময়া-মমতা-অর্থে প্রচলিত মাযার অভেদ করিয়া এক অভূত কল্পনা করা হইয়াছে। “বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সম্বন্ধানের প্রতি যে মমতা, উহা যদি সে প্রসার করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র মায়া, ব্রাহ্মী মায়া বা মহা-মায়াতে পরিণত হইল।” ইহা নূতন ব্যাখ্যা মন্দে নাই।

“রত্নশক্তিই সম্বন্ধজিতে পরিণত হয়” (১ম খণ্ড, ১১৭ পৃ.), “রত্নও বৈরাগ্য ক্রিয়াশীল, সম্বন্ধও রত্নপ ক্রিয়াশীল” (ঐ, ১১৮ পৃ.), “দেহই বাসনার আধার” (২য় খণ্ড, ৮৭ পৃ.), এই-সকল উক্তি কোনো দার্শনিকের প্রবন্ধে আশা করা যায় না। “পরমব্রহ্মের পর ‘আমিহে’ পরিণত হয়” (১ম খণ্ড, ২৩ পৃ.), ইহাও চমৎকার।

“ব্রহ্মস্বর্যই আমিহের প্রসারপ্রাপ্তির একমাত্র সোপান” (১ম খণ্ড, ৪৭ পৃ.) হইলে আর সমস্তই বার্থ হইয়া যায়, এবং গ্রন্থকারেরও ইহার পর লেখনী পরিত্যাগ করা উচিত ছিল।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন “সাধাবণ ব্যক্তিধর্মের পক্ষে সনাতন শাস্ত্রানুসারে আমিহের প্রসারের জন্য বিবাহ অবশ্যকর্তব্য কর্ম” (১ম খণ্ড, ১৯ পৃ.)। কিন্তু ইহা যেখানে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা ত কিছুই হয় নাই, বরং বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ, উচ্চ ভাব আছে, যাহা দ্বারা বস্তুতই আত্মার প্রসার হইতে পারে, তাহার কোনো উল্লেখ না করিয়া একবারে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে।

দেবান্দ্রের সঙ্গোপ-নামক প্রবন্ধে নানা গোলমাল করা হইয়াছে। ছান্দোগ্যের উদ্ধৃত বাক্যবলীতে (২-২) অধ্যাত্মিক মুখ্য আশ্রয়ের দৃষ্টিতে উদ্গীষ বা প্রশ্নের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। এখানে প্রশ্নাত্মার যে কোনো সম্বন্ধ নাই। অথচ গ্রন্থকার “প্রাণায়ামের দ্বারা ই প্রশ্ন সাধন” সমর্থনের জন্য ঐ বাক্যবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার এই প্রশ্নে প্রশ্নায়াম-শব্দের ব্যুৎপত্তিও নূতন দেওয়া হইয়াছে— “প্রাণান বয়সতীতি প্রশ্নায়ামঃ”।

সমস্ত গ্রন্থখানি বাঙ্গলায় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু “নিশীথ স্বপ্ন-সংবাদ”টি সংস্কৃতে লিখিত হইল কেন বুঝা যায় না। যে সংস্কৃতে প্রবন্ধটি লিখিত, তাহাতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়েরই পৌরুষের হানি হইয়াছে। ভাষাটি অতি জঘন্য, ইহা সংস্কৃত বাক্যপদ্ধতির (idiom) দ্বারা দিয়াও যায়নি, বাঙলা-গন্ধে পরিপূর্ণ, এবং প্রভূত ব্যাকবর্ণ-দোষে দুষ্ট। খাঁটি সোজা বাঙলায় লিখিলে প্রবন্ধটা “কোকিলের অভিশাপ” শীর্ষক লেখকের মত ভালই হইত।

বাহ্যভায়ে আর একনিমিত্ত কথার উল্লেখ করিয়া আমরা শেষ করিব। গ্রন্থকার কুফানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন (১ম খণ্ড, ১০৩ পৃ.) তাহা কি ঠিক হইয়াছে? তাহার “আমিহের প্রসারের” ইহাই কি আদর্শ? গ্রন্থকার এই পুস্তকে উহার উল্লেখে কিছু লাভ করিয়াছেন কি?

ঐবিশ্বেশ্বর গুপ্তাচার্য।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নামমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১৬শ ভাগ

২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২৩

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ ।

বাংলা ভাষায় গবেষণার ফল প্রকাশ ।

বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে :—

“বঙ্গের পৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ছাত্র, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রকৃষ্ট প্রভৃতি বঙ্গের বর্তমান মনোবিদগণও যদি, তাঁহাদের জ্ঞান-পরিমার সম্পূর্ণ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তরকালেও ষাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত-রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্বয়ং জ্ঞানের চরম ফল লিপি-বদ্ধ করিয়া যান,—এবং এই-প্রকারে যদি স্বকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন একদিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্যাকেই আগ্রহপূর্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে ষাঁহারা কোন বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী, ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্বয়ং ভাষাভাষাতেই প্রকাশপূর্বক জন্মভূমির ভাষা জননী বঙ্গভাষার পৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন।”

অতঃপর ইহাও লিখিত হইয়াছে :—

যদি বর্ধার দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্গভাষাকে অঙ্গুর করার বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্বোপেক্ষা প্রাধান্য, সামুভের অনন্ত-সাধারণ-কমনীয়, নিজের জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের পৌরব অঙ্গুর অথবা বর্দ্ধিত করিবার জন্ত,—বাঙ্গালী নিজের নিজের জ্ঞানধামতার পরিচয়, স্বয়ং উপার্জিত জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐখ্য-সম্ভার নিজ-নিজ ভাষাভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত যশের সম্মোহনী প্রতীকার বশবর্তী না হইয়া বঙ্গদেশের ও স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র

বঙ্গভাষাকেই সেবা বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুঃস্থ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য, ক্রমেই সফল হইয়া আসিবে।”

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে “স্বয়ং অসিদ্ধ” হইলেও, তৎকর্তৃক পঠিত অভিভাষণে অপরের জন্ত সাধনার পথ নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

“দেশনাত্মক মূখ উজ্জ্বল করিব, আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব,—আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া হুল্লর করিব, যাঁহাতে আর দশজন অন্তঃমায়ের সম্ভান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে,—এইপ্রকার পবিত্র সঙ্কল্পকণ গদ্যজলে অভিষেকপূর্বক, কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর ধন অর্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে।”

অতঃপর সুসজ্জিত ও সুন্দর মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য করা যায়, ইহা নূতন কথা বটে।

অভিভাষণে একাধিক বার যশের আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হইয়াছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক ও অস্ত্র গবেষকগণ যশ চান না, ইহা আমরা বলিতেছি না; সত্বপায়ে খ্যাতি লাভ করিবার ইচ্ছা অসাধু ইচ্ছাও নহে। কিন্তু তাঁহারা কেবল যশের জন্তই গবেষণা করেন, এবং যশের জন্তই গবেষণার ফল বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করেন, ইহা, গবেষকদিগের অন্তর্ধ্যামী না হইলে, বলা যায় না। আমরা অন্তর্ধ্যামী নহি, সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছু বলিব না। আমাদের মনে হয়, সর্বোপরি জ্ঞানের পিপাসা—বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য জানিবার কোতুল, তাহার পর জগতের ও ভারতের জ্ঞানসম্ভার বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা, এবং

মাতৃভূমিকে গোঁববাসিত করিবার আকাঙ্ক্ষাও আমাদের গবেষকদিগকে অল্পপ্রাণিত করিষা থাকিতে পারে। নূতন আবিস্ক্রিয়া সত্য কি না, খাঁটি কি না, তাহা পথ করিবার কষ্টপাথর ভারতে দুর্লভ। কষ্টপাথর আছে বিদেশে। আবিস্ক্রিয়াগুলির সত্যতা পরীক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিদেশী ভাষায় তাহা লিখিত হওয়া আবশ্যক। তা ছাড়া, বিদেশী ভাষায় পাবিত্যধিক শব্দের প্রাচুর্য্য বশতঃ তাহাতে লেখাও সহজ। সম্ভবতঃ এই-সব কাৰণে বাঙালী গবেষকগণ ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন।

সে যাহা হোক, এখন অভিভাষণের আসল প্রস্তাবটির আলোচনা করি। এ বিষয়ে আগে একটা অবাস্তুর কথা আগেই শেষ করিয়া ফেলি। বাঁকিপুত্রের ইংরেজী দৈনিক এক্সপ্রেস প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

However sound the precept of the President is, we would have been glad if he had more effectively followed it by his own practice. The Conic Sections and other mathematical works of the President are all in English, and it would have been a great advance in the language if they had been written in Bengali.

অবশ্য, শুধু উপদেশেব চেয়ে উপদেশ-ও-দৃষ্টান্ত ভাল বটে। কিন্তু এস্থলে এক্সপ্রেস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অবিচার করিয়াছেন; কারণ তিনি মৌলিক গবেষণাই মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কনিক সেকশন্স মৌলিক গবেষণার বহি নহে, উহা কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সঙ্কলিত পুস্তক। আমরা গণিতজ্ঞ নহি, কিন্তু শুনিয়াছি, আশুবাৰু যৌবনে গণিতে কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়াছিলেন। অভিভাষণ হইতে জানা যায়, সেই অল্পবয়সেই তাঁহার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ কবিবার ইচ্ছা আগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু পারিভাষিক শব্দ রচনা করা কঠিন বলিয়া বা অন্য কোন কারণে, ইংরেজীতেই তাঁহার সামান্য গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যশের তৃষ্ণা তাঁহা ছিল কি না, জানি না।

আসল প্রস্তাবটি যে অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা, সর্ববিধ অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেই (in the abstract) খুব উৎকৃষ্ট। অবস্থার বিচার না করিয়া উপায় প্রণালী বা পন্থা নির্দেশ কবিলে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বার্ক্‌ বলিয়াছেন :—

"Circumstances (which with some gentlemen pass for nothing) give in reality to every political principle its distinguishing colour, and discriminating effect. The circumstances are what render every civil and political scheme beneficial or noxious to mankind."

এই কথাগুলি রাষ্ট্রনৈতিক ভিন্ন অঙ্কক্ষেত্রেও খাটে। অভিভাষণে কশিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কশিয়ার রাগান্বিত মেণ্ডোলোয়েফ্‌ কশীয় ভাষায় নিজ গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু কশিয়ার ও বাংলার অবস্থার প্রভেদ মনে রাখা দরকার। কশিয়া স্বাধীন, বাংলা পরাধীন। কশদের মাতৃভাষা এবং কশিয়ার রাজভাষা একই। কশীয় ভাষায় যাহা লিখিত হয়, তাহার আদর অন্তর্দেশে হইতে বিলম্ব হইলেও তাহা কশীয় রাজশক্তির সাহায্য এবং কশদের আদর অবশ্যই পাইতে পারে। পরাধীন দেশেব লোকদের গুণ, বিশেষতঃ অশ্বেত লোকদের গুণ, "সভ্য" জগতে স্বীকৃত হওয়াই কঠিন। ফিলিপাইন রিভিউ সত্যই বলিয়াছেন :—

Dependent peoples are always looked upon by westerners as short of qualifications; and, whatever their actual merits may be, they (their merits) are lost sight of under cover of such advisably prevailing belief that they (said people) are short of qualifications.

এই কারণে কশ রাসায়নিকের গুণগরিমা যত সহজে স্বীকৃত হইবে, বাঙালী বৈজ্ঞানিকের গুণ তত সহজে স্বীকৃত হইবে না। বাঙালীর মাতৃভাষা ও রাজভাষা স্বতন্ত্র। স্বতরাং বাঙালী বৈজ্ঞানিক বাংলায় নিজ গবেষণা প্রকাশ করিলে তাহা রাজশক্তির সাহায্য পাইবে না। সবকারের গোচর করিবার জন্য তাহাকে আবার ইংরেজীতে তর্জমা করিতে হইবে। প্রথমেই বাংলায় গবেষণা লিখিয়া ফেলিলে, অন্তের আবিস্ক্রিয়া দ্বারা গৌরবলাভপ্রয়াসী অসাধু লোকদের তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া নিজের গবেষণা বলিয়া জাহির করিবার সুবিধা হয় বটে। বাঙালী বৈজ্ঞানিকের দ্বারা ইংরেজীতেই লিখিত গবেষণা চাপা দিয়া রাখিয়া তাহা নিজের বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা ইংলণ্ডেই হইয়াছিল।

বাঙালী বাংলায় লিখিলে তাহা যে কেবল গবর্ণমেণ্টেরই

অগোচর থাকে, তাহা নয়; দেশের লোকও তাহাকে নূতন কিছু বলিয়া গুছে না বা অজ্ঞতাবশতঃ নূতন বলিয়া চিনিতে পারে না। আশুবাবুর অভিভাষণে দেখিতেছি যে “প্রথম যৌবনে” যখন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার “সতত ধ্যান ছিল, যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি কবিতে পারিব।” অতএব বাংলা সাহিত্যে নূতন কোথায় কি হইতেছে, তাহা বখর তিনি যৌবনকাল হইতেই রাখিয়া আসিতেছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। বাইশ বৎসর পূর্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার গবেষণাপ্রস্তুত তত্ত্ব বাংলা মাসিক পত্রে ছুটি প্রবন্ধে নিবন্ধ করিয়াছিলেন। এগুলির কোন খবর বিদেশীরা লইবে, এমন আশা করা যায় না; কিন্তু আশুবাবু রাখিয়াছিলেন কি না জানিতে ইচ্ছা হয়। ১৩১৮ সালে মৈমনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে আচার্য্য বসু তাঁহার অভিভাষণে তরু-লিপি (Plant Autograph) সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত্য প্রাথম প্রচার করেন। তখন বিদেশীরা ইহার সম্মান লয় নাই, পায় নাই। কয়েক বৎসর পরে ইহা ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। এই অভিভাষণ ১৩১৮ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছিল। হয়ত জ্ঞানভাব-বশতঃ সর্কসাধাবণে ইহার মৌলিকত্ব বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কি ইহার আদর করিয়া-ছিলেন? তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবার জন্ত হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া দেশবিদেশের অনেক অধ্যাপক নিয়োগ করাইয়াছিলেন; কিন্তু ভাস্কর বসুকে বোধ হয় তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চেয়ে নিকট বোধে, বাংলায় বা ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে কখন আহ্বান করেন নাই। বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত্য বিদেশী ভাষায় পুস্তকাকারে ও রয়্যাল সোসাইটির কার্যবৃত্তান্তে প্রকাশিত হওয়ায়, এবং নানা সভ্যদেশে তিনি তজ্জন্ত আদৃত হওয়ায়, সম্ভবতঃ এখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতিকে বাংলা লিখিতে উপদেশ দিতেছেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিরূপে জগদীশচন্দ্র প্রস্তাব করেন যে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলে তিনি পরিষদে নিজের গবেষণা-বিষয়ে বাংলায় বক্তৃতা কবিবেন, এবং বন্দোবস্তের জন্ত যে

ব্যয় হইবে, তাহারও কিয়দংশ তিনি দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু মাতৃভাষার সেবা ও মাতৃভাষাকে “গৌরবান্বিত” করিবার এই যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন, বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বা আশুবাবু চাঁদা দিয়া বা অন্যপ্রকারে তাহার পোষকতা কতটুকু করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। কেহ কিছু করিয়াছেন বলিয়া ত শুনি নাই।

অভিভাষণে, ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া বঙ্গ-ভাষাতেই লিখিতে, “একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেবা বলিয়া গ্রহণ” করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাই যেমন আমাদের দেশে, অনাদৃত ধূতিপরা মানুষ ছাটকোট পরিলে শ্রেণীবিশেষকর্তৃক সম্মানিত হয়, তেমনি মাতৃভাষায় অনাদৃত জিনিষ ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত হইবাব পব কাহারও কাহারও নিকট সম্মান পায়। বিজ্ঞান কয়জন বুঝে বা পড়ে? কিন্তু কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নানা প্রকারের প্রবন্ধ, এসব বিস্তর লোকে পড়ে। রবিবাবু এসব বরাবর বাংলাতেই লিখিয়া আসিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার এই বাংলা চেহারাকে উপাধিভূষিত করেন নাই। যখন মডার্ন রিভিউ কাগজে তাঁহার লেখার ইংরেজী বাহির হইতে থাকে, তখনও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। যখন ইংলেণ্ডে তাঁহার বচনার ইংরেজী বাহির হইয়া গেল, তিনি নোবেল প্রাইজ পাইলেন, তখন “রূপান্তরিত” রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহিত্যাচার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তখন আশুবাবুই ভাইস-চ্যান্সেলার। আমরা তখন এই-সব কথা লিখিয়াছিলাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বেঙ্গলী কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখান হইয়াছিল যে, যতদিন রবিবাবু লেখা ইংরেজীতে বাহির হয় নাই, (মডার্ন রিভিউয়ে কিন্তু হইয়াছিল), ততদিন তাঁহার গৌরব ইংরেজকে বৃদ্ধান যাইবে না বলিয়াই, তৎপূর্বে তাঁহাকে ডি-লিট উপাধি দেওয়া হয় নাই! ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক।—ইংরেজকে বৃদ্ধাইতে পাবা যাইবে না, এই ওজুহাতে যে-দেশে উপাধি দেওয়াও চলে না, সে দেশে আশুবাবু প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করার সুসাহায্যতা সম্বন্ধে অন্ততঃ সন্দেহ করা যাইতে পারে।

প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ,—“জগদীশচন্দ্র বসু জননী

বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি।” ইহা বোধ হয় স্বীকৃত হইবে, যে, আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞানভূমির গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন। বঙ্গভাষার গৌরববৃদ্ধির ভারও যদি তাঁহারা লইতে নাই পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি খুব বেশী দোষ দেওয়া যায়? অর্থনীতির একটা নিয়ম আছে, যে, শ্রমবিভাগ (division of labour) দ্বারা কাজ বেশী হয় ও ভাল হয়। বৈজ্ঞানিকগণ একাগ্রভাবে গবেষণা করুন, এবং যে ভাষাতে সহজে ও শীঘ্র গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাই করুন; পরিভাষা রচনা করিবার জন্ত যে সময় ও চিন্তার দরকার, তাহা তাঁহাদের যাড়ে চাপাইলে যদি মোটের উপর আবিষ্কৃত্য করিবার জন্ত সময় ও শক্তি পূর্ণ ভাবে তাহাতেই প্রযুক্ত না হয়, তাহা কি ক্ষোভের বিষয় হইবে না? আমাদের মনে হয়, যিনি বাংলায় যে বিষয় লিখিতে চান, তিনি তাহা লিখুন। কিন্তু যিনি তাহা করিতে রাজী নহেন,—তা সে যে কারণেই হউক,—তাঁহার পুস্তকাদি অল্পবাদ করাইবার বন্দোবস্ত সম্মিলন করুন। সেরূপ প্রস্তাব সভাপতি বা আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি তিনজন লোকের বহি ছাপাইবার ভাব ধনী লোককে বা সর্বসাধারণকে লইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তন্মধ্যে মৌলিক গবেষণার, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার, বহি একখানিও নাই। যদি বাঙালী বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণা শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি দ্বারা বাংলায় লিখাইয়া ছাপাইবার জন্ত একটা ফণ্ড স্থাপিত হয়, এবং আশুবাবু তাহার পৃষ্ঠপোষক (Patron) এবং প্রথম টাদাদাতা হন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তাঁহার ধেরূপ ক্ষমতা, এই-সব বহি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়াও ধার্য হইতে পারে। তাহা হইলে বাঙালীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধি, এবং বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি, দুই-ই হইবে, এবং আশুবাবুর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের মূল নিয়মাবলী।

শুনিতেছি, সাহিত্য-সম্মিলনের বাঁকিপুরের অধিবেশনে উহার ভিত্তি ও কাঠামো ঠিক করিয়া দিবার জন্ত মূল নিয়মাবলী প্রণয়নার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। সব

জিনিষেরই মূল নিয়মাবলীর প্রয়োজন আছে; তাহার গড়ন, এবং কাজ করিবার পদ্ধতি কিরূপ হইবে, তাহা স্থির করিয়া দিবার আবশ্যক আছে। কিন্তু আগে হইতে কোন বিজ্ঞাপন না দিয়া হঠাৎ এরূপ কমিটি কেন করা হইল বুঝা যাইতেছে না।

একটা আম গাছ কিম্বা অন্য কোন গাছ কি ভাবে বাড়িবে, তাহা না দেখিয়া তাহার শৈশবেই তাহার চারিদিকে ও উপরে একটা শক্ত কঠিন বেড়া ও ছাদ দিয়া দিলে কি ফল ভাল হয়? কোন শিশুর পা কত বড় এবং কি রকমের হইবে, তাহা জানিতে হইলে যৌবন পর্য্যন্ত দেখিতে হয়; তাহার আগেই, শৈশবে বা কৈশোরে, একটা তোমার-আমার খেয়াল-মত শক্ত জুতা তাহাকে পরাইয়া দেওয়া কি ভাল? কংগ্রেসের বয়স ৩০ পার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মূল নিয়মাবলী এই কয়েক বৎসর আগে মাত্র প্রণীত হইয়াছে। যাহা হউক, যদি এখনই কিছু করিতে হয়, বিধি-মত সময় দিয়া, কলিকাতার সাহিত্যপরিষদ, সাহিত্যসভা, মফঃস্বলের সমুদয় সাহিত্য-পরিষদ, সম্মিলনের পরিচালনসমিতি, সম্মিলনের ভূতপূর্ব সমুদয় সভাপতি, প্রভৃতি সকলের মত লইয়া কাজটি করা উচিত। নতুবা কমিটির কাজ পণ্ড হইবে, তাঁহারা হইবেন “গায়ে মানেনা আপনি মোড়লে”র মত। এতদিন সাহিত্যপরিষদের কার্যনির্বাহক সভা, সম্মিলনের সাধারণ সমিতি হইতে নির্বাচিত দশ জন সভ্যের সহযোগিতায়, সম্মিলনের কার্য সম্পাদন করিতেছিলেন। এই পরিচালন-সমিতিকে কি অকস্মাৎ উড়াইয়া দেওয়া হইল? পরিষদ কয়েকমাস হইল, বাংলাদেশের ও তাহার বাহিরের সমুদয় বঙ্গীয়-সাহিত্যিক সভাসমিতির সহযোগিতা লাভের চেষ্টার স্বরূপ করিয়াছেন। সম্মিলনেরও উদ্দেশ্য যখন সমুদয় বাংলাসাহিত্যবিষয়ী চেষ্টাকে একলক্ষ্য ও পরস্পর সহযোগিতাস্বত্রে আবদ্ধ করা, তখন সাহিত্যপরিষদের এই চেষ্টাকেই সাহায্যদানে প্রবলতর কবিলে কি ক্ষতি হইত? একই কাজ করিবার জন্ত একাধিক রকম আয়োজনে কেবল যে শক্তির অপচয় হয়, তাহা নয়, দলাদলিরও স্বরূপ হইত। শুনিলাম বাঁকিপুরে কমিটি নিযুক্ত হইবার পূর্বে অনেক সভ্য, বিষয়টির ভাল করিয়া

আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদের মত লইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু সভাপতির শাসনদণ্ড-পরিচালনে এসব চেষ্টা ভূমিসাৎ হইয়াছিল।

ইহা হউক, কমিটিতে সমুদয় সাহিত্যপরিষদ, এবং পরিচালন-সমিতির প্রতিনিধি কে কে হইলেন, কেন হইলেন, কে তাঁহাদিগকে নির্বাচন করিল, এসব কথা সর্বসাধারণের জানিবার অধিকার আছে। সাহিত্যপরিষদের সভাপতি মহাশয়কে বা সহকারী সভাপতিদিগকে কেন বাদ দেওয়া হইল, তাহাও জিজ্ঞাস্য।

স্বর্গীয় গুরুচরণ মহলানবিশ।

সাধারণব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনতম সভ্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজের শ্রমশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, বিষয়বুদ্ধি, ও সাধুতা দ্বারা সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রবান কৃতিত্ব নহে। তাঁহা অপেক্ষা অল্প শিক্ষা ও অল্প টাকার পুঁজি লইয়া তাঁহা অপেক্ষাও দরিদ্র অবস্থা হইতে এই বাংলাদেশেই তাঁর চেয়ে বহুগুণ অধিক অর্থ অনেকে উপার্জন করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে তিনি বাল্যকালে কেবলমাত্র পাঠশালায় শিক্ষা পাইয়াও নিজের চেষ্টায় ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে উন্নত আদর্শ উপলব্ধি করিয়া জীবনে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সেই আদর্শ অনুসারে বহু পরিমাণে চলিতে পারিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে অনেকের মানসিক দৃষ্টি কুসংস্কার ও বৃথা ভাবুকতার কুহেলিকা ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু মহলানবিশ মহাশয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধর্ম ও সামাজিক নানা বিষয়ের অস্বজ্ঞিপূর্ণ আলোচনা করিতে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার চিন্তা ও বিচার করিবার শক্তি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। নূতন নূতন বিষয় জানিবার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত প্রবল ছিল। অধুনা দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় নিজে বেশ বড় বড় লেখা ভিন্ন পড়িতে পারিতেন না; সুবিধা হইলে অপরকে দিয়া পড়াইতেন। “প্রবাসী” সম্বন্ধে শেষ কিছুদিন বলিতেছিলেন, “তোমরা বড় ফিকা কালীতে ছাপিতেছ।”

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির নির্মাণে তিনি

প্রধান কর্মী ছিলেন। উপাসনায় তিনি এমন নিষ্ঠাবান ছিলেন যে স্তম্ভ খাতিতে এক রবিবাবও মন্দিরের উপাসনায় অস্থগৃহীত হন নাই। তিনি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীনিবাস স্থাপন করেন, এবং ব্রাহ্মবালক বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ধোঁকাছে হাত দিতেন, তাহা খাড়া করিয়া তুলিতেন। এ বিষয়ে তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মবীর ছিলেন। তাঁহার আহার নিম্নোক্ত ভ্রমণ পাঠ-লিখন প্রভৃতি অতি নিয়মিত ছিল। জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত কোন কাজের বা হিসাবের বাকী বকেয়া রাখিয়া যান নাই। কাজের আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা ছিল। তিনি সমাজের সকল রকম কাজ করিয়া গিয়াছেন; সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং শেষ পঁচিশ বৎসর সমাজের দাতব্য-বিভাগের ভার তাঁহার হাতে ছিল। ইহা তাঁহার অতি প্রিয় কাজ ছিল। দাতব্য ভাণ্ডার হইতে জাতীয়তাবাদনির্বিশেষে কতকগুলি অসহায় লোক সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। কখন কখন দেখা যাইত তিনি পথের ভিগারীকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া আহার করিতেছেন। শিশুরা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তাহাদের জন্য বিস্কুট, কুল, কমলালেবু, প্রভৃতি সঙ্গে রাখিতেন ও তাহাদিগকে দিতেন। ইতর প্রাণীদিগকে আহার দেওয়া তাঁহার একটি প্রিয় কাজ ছিল। তাঁহার ছুতলায় বারান্দাসংলগ্ন একটি তক্তায় পক্ষীদের জন্য প্রত্যহ অন্ন রাখিতেন। তাহা তাহার আনন্দে ভোজন করিত। বৃহৎ পরিবারের কর্তা যেমন বাড়ীর ছোটবড় সকলের খবর লইয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ যথাসাধ্য সমাজের সকল বিভাগের নানা গৃহস্থের খবর লইয়া বেড়াইতেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-লেখক।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া লুসিটেনিয়া জাহাজে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথে জার্মেনরা ঐ জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। যোগ্য পুত্রের এই আকস্মিক অগম্যত্বতে চণ্ডীবাবু অত্যন্ত শোক পান। ইন্দুপ্রকাশ আমেরিকা

মাইবার পূর্বেই সাহিত্য-সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী তাঁহার পিতামাতার শোকে সমবেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর চণ্ডীবাবুর জামাতা বিজ্ঞানকলেজের অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ শেঠ গবর্ণমেন্ট-কর্তৃক অবরুদ্ধ হন; কারণ জানা যায় নাই। ইহাতে তাঁহাদের পারিবারিক ক্লেশের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই নিরপবাধ জামাতা কেমন করিয়া মুক্তি পাইতে পারেন, সেই চেষ্টায় চণ্ডীবাবু ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ফিরিবার সময় ট্রাম গাড়িতে উঠিতে গিয়া পড়িয়া যান, এবং তাঁহার দেহের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহারও এইরূপে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পরিবারবর্গ যেকি রূপ শোক পাইয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নহে।

চণ্ডীবাবু “মা ও ছেলে”, “কমলকুমার”, প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত-রচয়িতা বলিয়াই তিনি অধিক পরিচিত। ইহা বি-এ শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এইরূপ পুণ্যশ্লোক পুরুষের জীবনচরিত লিখিবার স্বযোগ অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এ-বিষয়ে চণ্ডীবাবু ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার লিখিত জীবনচরিতের হিন্দী অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

চণ্ডীবাবুর বাগ্মিতা ছিল। তিনি মজলিশে বেশ গল্প জমাইতে পাবিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিস্তারিত গল্প তিনি জানিতেন, এবং তাহা বলিতে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল।

পর্যটক পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস।

রাজা রামমোহন রায় ঘোল বৎসর বয়সে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচবিতে এই কথা লিখিত আছে; কিন্তু তাঁহার তিব্বত ভ্রমণের বিশেষ কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তিব্বত অজ্ঞাত দেশ বলিয়াই পরিচিত ছিল। এই অজ্ঞাত দেশে গিয়া তাহার বৃত্তান্ত সভ্য সমাজে বিস্তারিত ভাবে প্রথম প্রকাশ করেন, একজন বাঙালী। তিনি বায় বাহাদুর



রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই।

শরচ্চন্দ্র দাস, সী, আই, ই,। সম্ভ্রতি ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। ভৌগোলিক আবিষ্কার বড় বিপৎসম্মুল কাজ। ইহাতে শক্ত দেহ, শক্ত মন, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, কৌশল, সবই দরকার। হিমালয়েব তুষাবরাশি অতিক্রম করিয়া, যে-দেশের লোকেরা বিদেশীদিগকে বরাবর সন্দেহ করিয়া তাহাদের তিব্বত প্রবেশে বাধা দিয়া আসিতেছে, সেই দেশে ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালে দুই দুইবার গিয়া তথাকার রীতিনীতি ও ধর্মের বিষয় অবগত হইয়া, পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া, তিনি যে ফিরিয়া আসেন, ইহা খুব বাহাদুরী। তাঁহার দুইবার তিব্বত-প্রবাসের বৃত্তান্ত ভারতগবর্ণমেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া, রাজনৈতিক কারণে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত গোপনে রাখা হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে তাহা রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি দ্বারা

সম্পাদিত হইয়া ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিব্বতের ধর্ম, জাতিতত্ত্ব (ethnology) এবং নানা কুসংস্কার সম্বন্ধে বহুমূল্য তত্ত্ব নিবদ্ধ আছে। শরচ্চন্দ্র তিব্বত হইতে তিব্বতী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক পুস্তক আনিয়াছিলেন। তন্মধ্যে খুব মূল্যবান গ্রন্থগুলি তিনি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কোন কোনটিব সম্পাদনে তিনি তাঁহার বন্ধু উগোন্ গ্যাংসো এবং অন্তান্ত লামা (তিব্বতীয় পুরোহিত)দিগের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি একখানি তিব্বতী-ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করেন। তিনি ১৮৮৪ সালে সিকিম ও তিব্বতসীমান্ত প্রদেশে যাত্রা করেন। পর বৎসর চীনদেশ দর্শন করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি শ্রামদেশে গিয়া রাজবংশীয় বজ্রজ্ঞান বরোরসের নিকট বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং শ্রামদেশের রাজা দ্বারা ভূষিত-মত পদকে ভূষিত হন। তাঁহার ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য তিনি রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী কর্তৃক পুরস্কৃত হন। গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে বার্ষিক ৫০০ টাকা আয়ের জায়গীর, এবং রায় বাহাদুর ও সী, আই, ঈ, উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি গত বৎসর জাপান ভ্রমণ করেন, এবং তৎসম্বন্ধে মডার্ন রিভিউ কাগজে ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার তিব্বত-যাত্রার বৃত্তান্ত মডার্নরিভিউ মাসিক পত্রে বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যের একমাত্র অধ্যাপক।

বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সমগ্র বাংলা দেশে একমাত্র রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ, মহাশয়ই জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহাই নিশ্চয়ই মত। কেননা, উক্ত রায় সাহেব ১৯০২ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস সম্বন্ধে বহুতর দিব্য জ্ঞান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই সব বহুতর ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। তৎপরে আবার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বহুতর করিতে তিনি নিযুক্ত হন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামতনু লাহিড়ী গবেষণা-ফেলোশিপ (Ramtanu Lahiri Research Fellowship) স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া। এই ফেলোশিপের মাসিক রুত্তি ২৫০ টাকা। “ফেলো”কে তাঁহার গবেষণার ফল বৎসরে বারটি বহুতর আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতে হয়। ১৯১৩র ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্বোক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনই পঁাচ বৎসরের জন্য এই কাজে নিযুক্ত হন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস একা দীনেশ বাবুই জানেন, এবং তিনি এ-বিষয়ে সমস্ত জ্ঞানের আধার এবং এ-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অফুরন্ত, বাংলা-ভাষার ও সাহিত্যের সমস্ত যুগেরই সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক ও অন্তবিধ জ্ঞান প্রত্যেক বাঙালী অপেক্ষা বেশী!

এই “ফেলো”র কর্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিটসে (১৯১৩, ৭ম খণ্ড, ২৩৮১ পৃষ্ঠা) এইরূপ লিখিত আছে :—

(i) To devote himself to the investigation of the History of Bengali Language and Literature from the earliest times.

(ii) To deliver annually a course of twelve public lectures embodying the results of his investigations, the lectures to be published by the university.

(iii) To submit to the syndicate every six months a report of the progress of work done by him during the preceding six months. The Fellowship to be suspended if on the report of a competent authority the work be not found to be satisfactory or up to the standard expected.

দ্বিতীয় সর্গ অহুসারে ফেলোর বহুতরগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশ করিবার কথা। আমরা যতদূর জানি বিশ্ববিদ্যালয় এই কর্তব্য পালন করেন নাই। এক একটি বহুতার দাম আড়াই শত টাকা। এরূপ বহুমূল্য জিনিষ মাঠে মারা যাওয়া কি ভাল? তৃতীয় সর্গ অহুসারে ফেলোকে ছয়মাস অন্তর নিজের কাঙ্ক্ষ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার কথা। আমরা যতদূর জানি দীনেশবাবু একটি বারও রিপোর্ট দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে দীনেশ

বাবুকে মাসে মাসে রিপোর্ট দিতে হইবে। তাহারই বা, কি হইল, জানিতে চাই। তৃতীয় সর্গে ইহাও আছে যে ফেলোর কাজ যদি উপযুক্ত ব্যক্তির মত অনুসারে সম্বোধকর বা আদর্শদেই না হয়, তাহা হইলে ফেলোশিপ স্থগিত করা হইবে। আমরা যতদূর জানি দীনেশ বাবুর বক্তৃতা এরূপ কোন উপযুক্ত পরীক্ষকের বিচার্য্যীন করা হয় নাই। যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বিচারক কে? তাহার যোগ্যতা কি? এবং তাহার রায়ই বা কি?

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করিতে হইলে সংস্কৃত ছাড়া, এবং হিন্দী, বিহারী, ওড়িয়া, মরাঠী, কানরী, আসামী প্রভৃতি ভাষার সহিত পরিচয় থাকা দরকার। তা ছাড়া ভাষাবিজ্ঞানে দখল থাকা চাই। এসব দিকে দীনেশ বাবু কতটা জ্ঞানবান বা কি পরিমাণে অজ্ঞ তাহা বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? তিনি যে যে কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার জ্ঞান খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া যোগ্য লোকদিগকে দরখাস্ত করিতে কেন বলা হয় না? গোপনে গোপনে কাজ সারিবার কারণ কি?

এইপ্রকারে বহু বৎসব ধরিয়া একই ব্যক্তিকে কোনপ্রকারে টাকা পাওয়াইয়া দেওয়াই ইংরেজীতে বলে জবারি। দীনেশবাবু বাংলাভাষার ও সাহিত্যের কিছু জানেন না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন, তিনি সবই জানেন, নিতুলরূপে জানেন, কোন যুগেরই কথা তাঁর চেয়ে বেশী কেহ জানেন না, এবং তাহার জ্ঞানের অস্ত্র নাই, একথাও কিন্তু নিতান্ত আহাম্মক ভিন্ন কেহ বলিবে না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীনতম বাংলা সম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা ও প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার করিয়াছেন, দীনেশ বাবু সেরূপ করেন নাই। শাস্ত্রীমহাশয়কে কেন বিশ্ববিদ্যালয় একবারও নিযুক্ত করেন নাই? অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় দীনেশবাবু অপেক্ষা বহু ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান। তিনি বাংলা ভাষার ব্যাকরণসমেত যেরূপ অভিধান একা রচনা করিয়াছেন, তাহা এক অসাধারণ কীর্তি। তাহার জ্ঞানের আদর বিশ্ববিদ্যালয় কেন করিলেন

না? শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইতিহাসে সুপণ্ডিত। বাংলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইলে প্রাকৃতের নানা রূপের খবর রাখিতে হয়, হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা জানিতে হয়, বাংলা দেশের আগেকা ইতিহাসটাও জানিতে হয়। এসব বিষয়ে বিজয় বাবুর খুব পড়াশুনা আছে, এবং তিনি বেশ বিশদভাবে বক্তৃতা করিতেও পারেন। তিনিও ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নূতন কথা শিক্ষিত বাঙালীকে শুনাইতে পারিতেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সুযোগ দিলেন না কেন? আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে। যিনি যতবড় পণ্ডিতই হউন, একজনের চেষ্টায় কখন কোন বিষয়ের সব তথ্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। প্রত্যেক যোগ্য লোকই এক একটা বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিতে পারেন; এবং বাংলা দেশে যোগ্য লোকের একান্ত অভাব হয় নাই। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র "The Advancement of Learning"; "The Advancement of the Art of Adulation"ও নহে; কিম্বা "The Advancement of persona grata"ও নহে। স্মরণীয় সীতিকেষ্টের যে-সব সম্ভা ধামাধরা নহেন, তাঁহাদের দেখা উচিত যে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার সদ্ব্যয় হয়, এবং যে কাক্সের যাহা সর্ব্ব তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়।

অবরুদ্ধ পুত্রের জগ্ন মাতার অনুরোধ।

আমরা নিম্নমুক্তিত পত্রখানি প্রকাশার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

Bara dighi Square

Noakhali

The 6th January 1917

—অবকাশম্বে—

আমার পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রকুমার গুহ রায় বর্তমান সময় তাহার মাতামহীর বাটী পুতুরদিয়া গ্রামে আবদ্ধ থাকিবার আদেশ পাইয়াছে। বিগত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে সে কামিং সাহেব বাহাদুরের নিকট ইংরাজীতে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছে। তাহার অবিকল নকল অধ্য আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনি দয়-পরবশ হইয়া উক্ত দরখাস্তখানি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে এই দরিদ্রা স্ত্রীলোকের বিশেষ উপকার হইবে। নিবেদন ইতি—

বিনীত—

শ্রীমতী শশীসুখী গুহ রায়।

To

The Additional Secretary, Political Department,
Government of Bengal.

(Through the Superintendent of Police, Noakhali.)

The humble memorial of Nagendrakumar Guha Roy, Son of Tarini Charan Guha Roy at present interned in his mother's house at Pukurdia, Police Station Lakhmipur, District Noakhali, most respectfully sheweth,

I. That your Honor's humble memorialist submitted a memorial to your Honor through the Superintendent of Police, Noakhali, on the 3rd October, 1916, in which he prayed for granting him an interview with the 'Judicial Officer' to whom His Excellency said in one of his speeches that all evidence were produced before the final order of internment and before whom he would clearly and finally explain his conduct. But your Honor's humble memorialist regrets to say that he has not yet been favoured with any reply to that memorial though it is now over two months.

II. That your Honor's humble memorialist has read with keen interest the interpellations made in the last meeting of the Bengal Legislative Council by some Hon'ble members concerning his internment and his attention has been drawn to a reply made on behalf of the Government by the Hon'ble Mr. Kerr, to a question put by the Hon'ble Babu Akhilchandra Dutta.

III. That the Hon'ble Mr. Kerr in reply to the question as to your Honor's petitioner's submitting an explanation said that an opportunity was given to your Honor's memorialist to submit an explanation and he took advantage of that opportunity. Your Honor's humble memorialist is at a loss to ascertain when and how and to whom he was given such opportunity of submitting an explanation. The memorial which he submitted on the 3rd October, 1916 to your Honor and in which he prayed for giving explanation before the 'Judicial Officer' has not been responded to by your Honor till to-day. In that memorial he stated that Mr. Bartley of the C. I. D. "Took down the antecedents of your Honor's memorialist and a short history of his past deeds and movements. Besides that he put before your Honor's memorialist lots of names of suspects wanting him to say whether he knew them".

IV. That your Honor's humble memorialist begs further to submit that save and except asking him the names of some suspects of Comilla, Calcutta and other places wanting him to say whether he knew them, Mr. Bartley did not give your Honor's memorialist the least hint or idea as to the allegations or charges made against him nor did he ask for any explanation from your Honor's memorialist in any form whatever. What your Honor's humble memorialist did was that he of his own accord in order to convince Mr. Bartley of his innocence, impossibility or improbability of joining the anarchist propaganda and of his abhorrence of anarchical crimes, explained his conduct, deeds and sentiments. But as he was kept quite in the dark as to the allegations made against him, such a general explanation which he gave of his own accord might not have covered the charges against him and it was rather futile for your Honor's memorialist to enter his defence without

having the least knowledge of the charges or allegations made against him.

V. That your Honor's humble memorialist begs to claim his legitimate right as a loyal and peaceful British subject of His Majesty the King Emperor, of being allowed an opportunity of disproving the allegations or charges made against him, and fervently prays that your Honor would be graciously pleased to grant him the said right which he has not yet been till to-day.

VI. And for this act of kindness your Honor's memorialist shall as in duty bound ever pray.

Dated, Pukurdia
(P. S. Lakhmipur, Dt.
Noakhali)

The 15th December, 1916.

(Sd.) NAGENDRAKUMAR
GUHA ROY.

ইহার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক।
গবর্ণমেন্ট এই দরখাস্তের কি জবাব দিয়াছেন, সর্বসাধারণকে
জানাইলে ভাল হয়।

নিজ নিজ নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য, গবর্ণমেন্ট
ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী সমুদয়
লোককে কি এইরূপ সুযোগ দিয়া থাকেন ?

পৌষ মাস।

কথায় বলে, কারো পৌষ মাস, কারো বা সর্বনাশ।
পৌষ মাসে শস্য গৃহাগত হইত, অন্নান্নাভাব থাকিত না, জ্বর
ও অন্যান্য ব্যাধি থাকিত না, দেশে আনন্দের ঢেউ খেলিত।
এই জন্য পৌষমাসের এত আদর। এই জন্য লোকে
প্রার্থনা করিত,

এসো পৌষ যেয়ো না,
জনম জনম ছেড়ো না,
যদি বা ছাড়বে তুমি,
পরশে মরব আমি।

এখন পৌষও লোকের অন্নান্নাভাব যায় না, লোকে
জ্বরের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না। তথাপি,
অন্নান্নাভাব কতকটা ঘুচে, এবং পীড়াও অনেকটা কমে।
সেইজন্য এখনও আমরা ঐ প্রার্থনা করিতে পারি। তা ছাড়া,
এখন আর এক কারণে পৌষমাস আদরণীয় হইয়াছে।
এই মাসে ভারতবর্ষের লোকেরা সমবেত হইয়া সকল
বিষয়ে আপনাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে।

কংগ্রেসে সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতি ও ধর্মের
লোকের স্থান আছে। ইহাতে সমবেত হইয়া সকলেই
রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে পারেন, দেশের



মাননীয় অধিকাচরণ মজুমদার।

আর্থিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন। এই প্রকারে শিল্পোন্নতি-পরামর্শ-সভায় ভারতবর্ষের সকল জাতি ও ধর্মের লোক যোগ দিতে পারেন। মাদকব্যবহার-নিবারণের জন্য বৎসর বৎসর যে পরামর্শ-সভার অধিবেশন হয়, তাহাতেও ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের লোক যোগ দিতে পারেন।

এসব ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা ভিন্ন ভিন্ন জাতের লোকদেরও অনেক পরামর্শ-সভা এই পৌষ মাসে হইয়া থাকে।

সকলেই চান মঙ্গল। ভাল কিসে হয়, সকলেরই সেই চেষ্টা। কিন্তু, কল্যাণ যে কি, এবং কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, তাঁহাদের চেষ্টার দ্বারা মঙ্গল যে সাধিত হইতে পারে, এই আশা সকলেরই আছে। এই আশা না থাকিলে কেহ কোন-প্রকার সংস্কার বা পরিবর্তনের চেষ্টা করিত না। সত্যের জয় হইবে, ত্রায়ের জয় হইবেই হইবে, মঙ্গল যাহা তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, এ-বিশ্বাস না থাকিলে সামান্য



মাননীয় সীতানারায়ণ রায়।

চেষ্টাও কেহ করিত না,—বিদ্রোহ, লাহরী, উৎপীড়ন, দারিদ্র্য, কারাবাস, মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্কর করা ত দূরের কথা। এই আশা ও বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে সব সময়ে সকল সংস্কার-প্রয়াসীর মনে থাকে না বটে; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই সকল গুণ্ডচেষ্টার মূলে এই আশা ও বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ধর্মবিশ্বাস। ইহা আমাদের কাছে বলে, যে, বিশ্ব মঙ্গল-নিয়মে শাসিত, বিশ্বের গতি মঙ্গলের দিকে। হিতসাধন কবিতো যে চেষ্টিত, সমুদয় বিশ্বের শক্তি তাহার সহায়; অহিতসাধনে যে নিযুক্ত, বিশ্বশক্তি তাহার প্রতিকূল। এইজন্য ছবুও ছুচরিত্র লোকের নেতৃত্বে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না, এই বিশ্বাসটা আমাদের মধ্যে খুব দৃঢ় হওয়া উচিত।

কংগ্রেস ও মস্লেম লীগ।

এবার কংগ্রেস ও মস্লেম লীগের অধিবেশন লক্ষ্মী শহরে হইয়াছিল। এবার উভয় সভার বিবেচ্য এই যে উভয় সভারই সভাপতি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্র লাভের অমূল্য মত প্রকাশ ও যুক্তি

প্রদর্শন করেন, এবং উভয় সভাতেই স্বরাজের অমূল্য প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে ধার্য হয়। এবারকার কংগ্রেসের বিশেষত্ব এই যে সুবার্টে গৃহবিবাদে পর এই অধিবেশনেই প্রথমে, আইনসভা আন্দোলনের পক্ষপাতী সকল দলের রাজনৈতিক একত্র সম্মিলিত হইয়া সম্মিলিত ভারতের দাবী সর্বসাধারণের ও গবর্ণমেন্টের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। কংগ্রেস ও মসলেম লীগেব সহযোগিতায় স্বরাজ-প্রার্থীদের ভারতশাসন-পদ্ধতিব একটি খসড়াও প্রস্তুত হইয়াছে।

সকল প্রদেশের, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের, সকল দলের দাবী এখন এক। এখন, যে-সব ইংরেজ স্বরাজবিরোধী তাহাদের বুলি প্রধানতঃ দুটি। প্রথম, “তোমরা এখনও স্বরাজেব উপযুক্ত হও নাই।” তাহাব উত্তর এই, যে, “মহাশয়দের মতে আমরা কোন কালেই স্বরাজের উপযুক্ত বিবেচিত হইব না; কারণ আমাদের যোগ্যতা স্বীকৃত হইলে মহাশয়দের প্রভুত্ব, বিশেষ অধিকার ও লাভের পথে কষ্টকর রোপিত হইবে।” দ্বিতীয়, “তোমরা দেশের লোকদের নামে দাবী করিবার কে?” তাহার উত্তর, “আমরা যে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতিনিধি নহি, তাহাদের অতাব আকাঙ্ক্ষা আমরা জানি না, তাহাদের নামে কোন দাবী আমরা করিতে পারি না, একথা বলিবার আপনারা কে? আপনাদের ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহার, চেহারা, জাতি, দেশ, সব আলাদা; আপনাদের কাছে দেশেব লোকেবা কখন কি-প্রকারে জানাইল যে আমরা তাহাদের কেহ নহি?” বাস্তবিক যে-সব ইংরেজ স্বরাজ-বিরোধী, তাহাদের এই-সব কথার মত আশ্বাসের কথা, হাস্যকর কথা আর হইতে পারে না। আর একটা বুলি আছে, যে, যোদ্ধা জাতিরা শিক্ষিত লোকদিগকে মানিবে না। কিন্তু যোদ্ধা জাতিদের মধ্যেই যে শিক্ষিত লোক রহিয়াছে, তাহারাও যে কংগ্রেস ও মসলেম লীগে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের স্বরাজের দাবী করিতেছে। তা ছাড়া, জিজ্ঞাসা করি, “মহাশয়েরা যে কথায় কথায় যোদ্ধা জাতিদের প্রতি এত দরদ দেখান, তাহাদের জ্ঞান কি বিশেষ অধিকার মঞ্জুর করাইবার জ্ঞান গবর্ণমেন্টকে অস্বপ্ন দেখিতেছেন। মহাসাহসী, রণকুশল, ভিক্টোরিয়া-ক্রশ-ভূষিত ভারতীয় সৈনিকরাও সৈন্যদলে লেফটেনেন্ট হইতে পারে না, বাহা যুদ্ধে অনভিজ্ঞ অজ্ঞাতশস্ত্র অনেক ছোকরা ইংরেজ বরাবর হইয়া আসিতেছে। ইহাও জানাইতে চাই, যে, ভারতীয় সিপাহীবা তাহাদের স্বদেশ-বাসী শিক্ষিত লোকদিগকে খুব মায়া করে, ইহা আমরা অনেকে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানি।” এখন ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশ ও জাতি হইতেই সিপাহী লওয়ার রীতি ক্রমে ক্রমে প্রবর্তিত হইতেছে। সুতরাং এ-আপত্তিটা করিবার

উপায়ও অচিরে অন্তর্হিত হইবে। আরও অনেক বুলি আছে; তাহার উল্লেখ এখন করিব না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় লাটের বক্তৃতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান-সভায় বড় লাট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, তিনিও একসময়ে ১৮ বৎসব বয়সের ছিলেন, এবং ভবিষ্যতেব মোহন স্বপ্ন দেখিতেন; সেইজন্ম এদেশেও ঐক্য স্বপ্নদর্শক যুবকদের সঙ্গে তাহার সহানুভূতি আছে। দুঃখের বিষয়, ইংরেজ যুবক নিরাপদে স্বপ্ন দেখিতে পারে, এবং নিরাপদে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টাও করিতে পারে, কিন্তু আমাদের ছেলেরা স্বপ্ন দেখিলে পর যদি সে-বিষয়ে পরস্পর কথা বলে, কিম্বা চিঠি লেখালেখি করে, কিম্বা স্বপ্নটা কেমন করিয়া বাস্তবে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করে,—কাহারও গায়ে একটু আঁচড় দিবার কল্পনামাত্রও না করিয়া চেষ্টা করে,—তাহা হইলেও তাহাদের অনেকে নানাবিধ স্বকারী কুসংসারীর সন্মেল-ভাজন হয়, এবং অনেক সময় উৎপীড়িতও হয়। যে কয়েক শত যুবক নজববন্দী ও অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই রকমেব নিবপরাধ স্বপ্নদর্শক যুবক যে অনেক আছে, তাহাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

বড় লাট বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন, এবং সেই গঠিত চরিত্র লইয়া রাষ্ট্রবাসীর কর্তব্য (duties of citizenship) পালন। তিনি বলেন—As I look back to my university days, I believe even as undergraduates we dimly held by these two ideas—character and the responsibility of citizenship. “আমাব বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের কথা ভাবিলে মনে পড়ে যে আমরা বি-এ পাশ করিবার আগেও চরিত্র এবং রাষ্ট্রবাসীর (citizen-এর) দায়িত্ব এই দুটি আইডিয়াকে হৃদয়ে পোষণ করিতাম।” আমাদের ছেলেরাও তাহা করিতে পারে। কিন্তু বড় লাট ইংরেজের ছেলে ও ভারত-বর্ষের ছেলেদের অবস্থার মধ্যে একটা মস্ত বড় প্রভেদ ভুলিয়া যাইতেছেন। আমরা রাষ্ট্রে বাস করি বটে, কিন্তু রাষ্ট্রবাসীর অধিকার (citizenship) ত আমাদের নাই। অধিকার এবং দায়িত্ব (right and responsibility) এই দুটি জিনিষের কথা একসঙ্গেই বলা উচিত। ইংরেজের ছেলেরা শুধু দায়িত্বের কথা ভাবিলেই চলে, কারণ অধিকার তাহার আছে। আমাদের ও আমাদের ছেলেদের কোন খাটি রাষ্ট্রীয় অধিকার নাই; সুতরাং তাহাদের কাছে দায়িত্বের কথা বলিলে তাহাদের মনে উৎসাহ না বাড়িয়া অসন্তোষের বৃদ্ধি হয়। যাহার অধিকার নাই,

তাহারও অবশ্য দায়িত্ব আছে, অধিকার লাভের চেষ্টার দায়িত্ব আছে; কিন্তু তাঁহারা অধিকার দিতে রাজি নন, তাঁহারা দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন। আমরা আশা করিতে পারি কি যে বড়লাট যেমন দায়িত্ব চাপাইতে চান, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে অধিকারও দিতে চান?

চরিত্র বলিতে ইংরেজ নিজের দেশে যাহা বুঝেন, এই দেশেও কি ঠিক তাহাই বুঝেন? এখানকার বহু বহু সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজের কথায় ও কাজে ত তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংরেজের ছেলের character বা চরিত্র আছে বলিলে কেবল সে গোবেচারী ভালমাসুখ, কাহারও মন্দ করে না, এরূপ বুঝায় না; নানারকম ভাল কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি তাহার আছে, এবং ভয়ে বা স্বার্থনাশের আশঙ্কায়, সে তাহা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, ইহাও বুঝায়। সে যে নির্মলস্বভাব তাহা বুঝায়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সত্যবাদিতা, স্পষ্টবাদিতা, সংকল্পে সাহস, স্বদেশপ্রেম, দুঃস্থলোকের সেবা করিবার জন্ত স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্তি, নির্ভীকতা, দৃঢ়চিত্ততা, এই-রকম নানা পুঙ্খবোচিত গুণও বুঝায়। আমাদের দেশে ইংরেজরা আমাদের ছেলেদিগকে গোবেচারী, ভালমাসুখ, খুব বাধ্য দেখিতে চান। বাধ্যতা ও নির্দোষিতা অবশ্য সদগুণ; তাহার বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলিতেছি না। কিন্তু সাহস ও স্বদেশপ্রেম দেখিলে অধিকাংশ ভারতপ্রবাসী ইংরেজ সন্দেহ করেন যে, গতিক বড় ভাল নয়। দুঃস্থ লোকের শিক্ষা, চিকিৎসা, ইত্যাদিতে কেহ নিযুক্ত হইলে সে সন্দেহ-ভাজন হয়। বিলাতে মেরুদণ্ডটা সোজা করিয়া চলা দৃঢ়চিত্ততা ও চরিত্রবস্তার একটা লক্ষণ। ভারতপ্রবাসী বহুবছ ইংরেজের কাছে দেশী লোকের চরিত্রবস্তার একটা লক্ষণ বাঁকা মেরুদণ্ড।

চরিত্র বলিতে এই-সব ইংরেজ কি বুঝেন, তাহার একটা প্রমাণ দি। ইহা আমরা অনেকেই জানি যে কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সমিতিতে রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিয়া একটি ছেলেরও চরিত্র কলঙ্কিত হয় নাই; কিন্তু থিয়েটার গিয়া অনেকে খুব অসচ্চরিত্র হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রদিগকে, কংগ্রেসাদির বক্তৃতা না শুনিয়া, “থ্যাটি নির্জলা বিদ্যামুশীলনের হাওয়া” (atmosphere of pure studyতে) কালযাপন করিতে উপদেশ কতবার দেওয়া হইয়াছে, এবং তজ্জন্ত নিয়মও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পতিতা অভিনেত্রী ও দৃশ্যবিত্ত অভিনেতার দ্বারা যে-সব থিয়েটারের হাওয়া দূষিত, সেখানে না যাইতে কখন কোন সরকারী ইংরেজ ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন কি? ছাত্রাধ্যয়নমু তপঃ, ইহা আমরা মানি। কিন্তু যাহাতে বাস্তবিক ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয়, তাহাতে

“থ্যাটি-বিদ্যামুশীলনের হাওয়া” কেমন করিয়া থ্যাটি থাকে, বুঝিতে পারি না। আমরা চাই যে আমাদের ছাত্রেরা তুষারের মত অতি শুভ্র, অতি পবিত্র, অতি নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব হইবে; আমরা ইহাও চাই যে তাহার সর্বপ্রকার মানব-হিতকর কার্যে ত্যাগী বীর হইবে। বিবেচ্য তাহাদের মূলমন্ত্র হইবে না, প্রেম ও সেবা মূলমন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের সাধনে তাহার কুসুমকোমল ও বজ্রকঠোর হইবে। মন্দ হইতে তাহার সর্বপ্রযত্নে বিরত থাকিবে, কিন্তু ভাল যাহা, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে দৃঢ়তার সহিত করিবে। ভারতবর্ষীয় যুবকদের চরিত্রের এই আদর্শ যে-সব ইংরেজ গ্রহণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে প্রশংসা করি।

বড়লাট, ওকালতী ছাড়া যুবকদের আরও নানা উপার্জনের পথ যাহাতে খুলিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন। পথ যখন খুলিবে, আমরা তখন আনন্দিত হইব।

শিক্ষকতার কাজটিকে তিনি আরও গৌরবান্বিত করিতে চান, এবং শিক্ষকদের বেতন বাড়াইতে চান। শিক্ষক মানে শুধু ইন্সুলের মাষ্টার, না কলেজের অধ্যাপকও? গবর্ণমেন্ট-কলেজের মোটামোটা মাহিনার অধ্যাপকতা ও অধ্যক্ষতাগুলিও যখন কেবলমাত্র গুণ অমুসাবে যোগ্য-ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে, তখনই বড়লাটের কথা সার্থক হইবে। ইন্সুলের শিক্ষকদের বেতন বাড়ান খুব দরকার। কিন্তু শিক্ষার জন্ত গবর্ণমেন্ট যত টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইতেই যদি শিক্ষকদিগকে আরও বেশী বেতন দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িবে কিরূপে, এবং দেশ হইতে অজ্ঞতা দূর হইবে কেমন করিয়া? অতএব, বড়লাটের কথার মানে যদি এই হয় যে, শিক্ষার বিস্তারের গতিও বাড়িবে, এবং শিক্ষকদের বেতনও বাড়িবে, তাহা হইলে আনন্দের বিষয়। আশা করি, তাঁহার কথা শিক্ষাবিস্তার রোধের কারণ হইবে না; এবং বেসরকারী দরিদ্র স্কুলগুলিকে কোন নির্দিষ্ট উচ্চ হারে শিক্ষকদিগকে বেতন দিতে বাধ্য করা হইবে না।

বড়লাট উপাধিপ্রাপ্ত যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “তোমাদের দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থাব উন্নতি করিবার জন্ত তোমাদের উপর ডাক পড়িয়াছে। আমি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করিতেছি যে তোমাদিগকে সেই আস্থানে সাড়া দিতে সমর্থ করিবার জন্ত আমার সাধ্য যাহা কুলায় তাহা আমি করিব।” এই প্রতিজ্ঞা যদি বড়লাট পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি চিরস্মরণীয় হইবেন, এবং দেশের খুব কল্যাণ হইবে। যে-সব যুবক বিনা বেতনে, কেবল হিতসাধনের জন্ত, দরিদ্র অজ্ঞ লোক-

দিগকে শিক্ষা দিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে বিনা দোষে নজরবন্দী বা আবদ্ধ হইয়াছে, অনেক জায়গার প্রমজীবী বিদ্যালয়গুলি যে পুলিশের উপদ্রবে উঠিয়া গিয়াছে, বড়লাট তাঁহার অস্বীকার পালনের প্রথম কিস্তি-স্বরূপ, এই-সব যুবকদের বিচার হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও উকীল জজদের দ্বারা করাইলে, এবং ঐ বিদ্যালয়গুলি চালাইবার বন্দোবস্ত করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

আবার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।

বড়লাট বলিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া কি-প্রকারে ইহার উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপায় স্থির করিবার জন্ত আগামী বৎসর শীতকালে একটি কমিশন বসিবে। কমিশনের সভ্যগণ নিযুক্ত হইবেন কেবল শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিয়া। বিলাত হইতে তিন জন বিশেষজ্ঞ আসিবেন। ভারতবর্ষ হইতে (ইংবেজ কি দেশী লোক, সরকারী বা বেসরকারী লোক তাহা উল্লিখিত হয় নাই) ষাঠার সভ্য নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকেও শিক্ষা-বিষয়ে খুব যোগ্যতা দেখিয়া নিযুক্ত করা হইবে। শিক্ষা-বিষয়ক সমস্যাগুলি, কেবল শিক্ষাকে কেমন করিয়া খুব কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা যায়, সেইদিক্ হইতে সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইবে। ইহার মানে দুরকম হইতে পারে। (১) অনেক ইংরেজ রাজনৈতিক কারণে শিক্ষার বিস্তারকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, তাঁহারা যেন তেন প্রকারে শিক্ষার প্রসার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক। এক অর্থ এই হইতে পারে যে বড়লাট এ দলের লোক নন, তিনি শিক্ষাকে একটা রাজনৈতিক বিপদ মনে করেন না। তাহা হইলে ভাল। (২) একদল লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষার উৎকর্ষসাধন, এ-দুটা পরস্পর বিরোধী; যদি দেশে খুব সরেস শিক্ষা চাও, তাহা হইলে বিস্তারের কথা ভাবিও না। সাধারণতঃ ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের যৌক সরেস ও ফলদায়ক (good and efficient) শিক্ষার উপর (যদিও আমাদের ধারণা এই যে ইহা শিক্ষার বিস্তার রোধ করিবার একটা ফন্সী মাত্র)। যদি বড়লাট এই-প্রকার অতি-সরেস ও অতি-ফলদায়ক শিক্ষার ভক্ত হন, এবং শিক্ষার বিস্তার তেমন আবশ্যক মনে না করেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইতে পারি না। আমরা দেখিতেছি, যে-যে দেশে শিক্ষা খুব সরেস, সেই-সেই দেশে শিক্ষার বিস্তারও খুব বেশী; আমবা ছই-ই চাই। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বরং শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত না হইলে, শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হইবার যোগ্যতম সব ছেলে-মেয়েকে শিক্ষালয়ে আনা গেল কি না, তাহাতে খুব

সন্দেহ থাকে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি শিক্ষা না পায়, তাহা হইলে ইহা ঐক্য সত্য যে যোগ্যতম বিস্তার লোক শিক্ষা পাইল না। দশ হাজার ছাত্রের মধ্যে যদি কুড়িটি খুব প্রতিভাশালী লোক পাওয়া যায়, এক লক্ষ ছাত্রের মধ্যে বাছিতে পাইলে যে সংখ্যায় তাদের চেয়ে বেশী ঐরূপ লোক পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং প্রথমোক্ত কুড়িটিব চেয়ে তাহাদের কাহারো কাহারো প্রতিভাও যে বেশী হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষাকে খুব সরেস ও ফলদায়ক করিতে গিয়া যদি দুর্মূল্য করা হয়, তাহা হইলে আরও বিপদ। সবদেশেই শিক্ষার বেশী ফল ফলে গরীবের ছেলেমেয়েদের হৃদয়মনে। তাহারাই যদি বাদ পড়িল, তাহা হইলে দেশের প্রতিভার ক্ষুরণ কেমন করিয়া হইবে, এবং দেশের সমস্ত গৃহ হইতে অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত কি-প্রকারে হইবে?

বিলাতের বিশেষজ্ঞ তিন জন, ভারতবর্ষীয় অবস্থা-বিষয়ে বিশেষ-অজ্ঞ হইতে পারেন। এখানকার সভ্যগণও কিরূপ হইবেন জানি না।

এইসব কারণে কমিশনটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ এই যে ভারতবর্ষের পাঁচটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুধু কলিকাতাটার উপরই কেন কমিশন বসান আবশ্যক বোধ হইল। ইহার দোষ ক্রটি বাহা বাহা আছে, তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি। কিন্তু ইহাও জানি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অজ্ঞ কোন ভারতবর্ষীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে অপকৃষ্ট শিক্ষা পায় না। অধিকন্তু, এখানে অজ্ঞ জায়গার চেয়ে উচ্চশিক্ষা দিবার আয়োজন ও তাহা পাইবার সুযোগ বেশী; সুতরাং শিক্ষা পায়ও অধিকতর ছাত্র। ইহার জন্ত শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রশংসাভাজন। গবেষণা ও নূতন জ্ঞান সঞ্চয় এখানেই ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী হয়। আমরা জানি এই বিশ্ববিদ্যালয় ইংবেজদের চক্ষুশূল,—সম্ভবতঃ এইসব কারণেই। কিন্তু অজ্ঞান প্রদেশেব লোকেরা ইহার হাজার ক্রটি-সঙ্গেও, ইহার মত উচ্চশিক্ষার স্থান পাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে। প্রমাণস্বরূপ এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক লীডারের মত উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হিন্দুস্থানীদের কাগজ। সম্পাদক মাদ্রাজী। তিনি যে বাঙালীদের ভক্ত বা পক্ষপাতী, এরূপ বদনাম তাঁহার অতি-বড় শত্রুও করিতে পারিবে না। তিনি কি বলিতেছেন দেখুন—

We will make no concealment of our apprehension about the latter part of Lord Chelmsford's address. Why does he want a commission to investigate into the affairs of Calcutta University? 'We as the Government of India, have carefully considered the

situation with regard to the Calcutta University.' What is that situation, and what is there alarming or disquieting about it? How does it differ from the situation with regard to the other Indian University? From the Indian point of view there is a great deal that is wrong with all of them, and an independent commission which will give due weight to Indian national requirements and report without fear or favour will be welcomed. But such as they are the University whose whole policy calls for improvement vastly more than Calcutta is Allahabad. Such as the Indian Universities are at present, the least unsatisfactory is the Calcutta University, thanks to the wealth of talent it easily commands, its strong and fairly independent Senate, and the splendid work done by Sir Asutosh Mookerjee as Vice-Chancellor. At the same time it is true that the University which gives the least satisfaction to Anglo-Indian critics is also Calcutta. It has been evident for some considerable time that the Government of India are not quite happy over the affairs of that University. The Chancellor of another University nearer home has even gone the length of utilizing his Convocation address to cast a stone at it. What the Government of India's present ideas are on the constitution proper to an Indian University, we have been allowed to know in connection with the proposed Patna University. These all are circumstances which cannot be dismissed as irrelevant in an examination of the decision to appoint a commission of investigation. Has the University Senate itself been consulted regarding it? We are not aware that it has been. Nor is it a proposal that is put forward; it is a decision which has been announced. This amounts to a censure of the conduct of affairs by the Senate. Is there a justification for it? Not that we know. In the circumstances we must maintain that there is no case for a commission of investigation and we must regret the decision of his Excellency's Government. Of course it does not follow that we prejudge the work the commission will do. We shall rather be moved by the hope that its deliberations may bear good fruit—unlike those of many another commission.

ভারতবাসীর শিক্ষার নিন্দার উত্তর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান-সভায় ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী, যে-সব ইংরেজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিন্দা করে, তাহাদের কথার উত্তর-স্বরূপ ছদ্মন ইংরেজের মত উদ্ধৃত করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সার হেনরী মেনের মত এই:—

'It is not true, I am sorry to have to repeat this thing so many times, but it is not true, that the knowledge which is diffused under the influence of the University is either slight or superficial, except in the sense in which the proposition might be advanced of any university in any European country, and under the circumstances of India the very diffusion of even slight knowledge over such multitudes of minds would be a fact of the utmost importance and interest.'

যাহারা দেশী লোকদের শিক্ষার নিন্দা করে, তাহাদের বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্বেগ সঙ্কেত সার হেনরী মেনের সন্দেহ

ছিল। ডাক্তার জর্জ এডাম স্মিথ নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

'It is surely unjust to sneer at the Hindu Bachelor of Arts because he neither speaks nor writes a foreign tongue with the grace and accuracy of one who learned it from his mother's lips. A little reflection and experience will convince those who are indifferent to a kind of progress with which they have no sympathy, that there is little or no intellectual inferiority on the part of Hindu graduates to the mass of Cambridge, Oxford or Scottish University men.'

পঞ্জাবেও ইংরেজীশিক্ষিত সিপাহী চাই।

পঞ্জাবের ছোট-লাট বাঙ্গালী ইংরেজীজ্ঞান সিপাহীদের উল্লেখ করিয়া পঞ্জাবের ইংরেজীশিক্ষিত ন্যূনকল্পে এন্ট্রান্স-পাসকরা লোকদিগকেও সিপাহী হইবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? বাংলা দেশের কোন সিপাহী আগে সৈন্যদলে ছিল না। যুদ্ধ করিতে জ্ঞানার আবশ্যকতা শিক্ষিত বাঙালী বুঝে; স্বতরাং সিপাহী হইবার সুযোগ পাইবার পর কতকগুলি বাঙালী যুবক সিপাহী হইয়াছে। পঞ্জাবের অবস্থা স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের অন্য যে-কোন প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাব হইতেই গবর্নমেন্ট বেশী সিপাহী পান। সমস্ত দেশী সৈন্যের অর্দ্ধেক পঞ্জাবী। যুদ্ধের সময় যত নতুন নতুন সিপাহী ভর্তি হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক লাখের উপর পঞ্জাবী। স্বতরাং পঞ্জাবী সিপাহী ছিল না বলিয়া শিক্ষিত লোক-দিগকে বুঝাইয়া স্বঝাইয়া সিপাহী করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, একরূপ বলা যায় না। একটা কারণ নিশ্চিত এই যে বাঙালী ইংরেজীজ্ঞান সিপাহীদের মধ্যে সেনানায়কেরা এমন কিছু দেখিয়াছেন, যাহাতে বুঝা গিয়াছে, যে, সাধারণ নিরক্ষর সিপাহী অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ। এইজন্য পঞ্জাব হইতেও এইরূপ শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর সিপাহী লওয়া হইতেছে। শিক্ষিত ভারতবাসীর শত্রু ষ্টেটসম্যান্‌ও স্বীকার করিয়াছেন যে পঞ্জাবের ছোটলাট পরোক্ষভাবে, শিক্ষিত পঞ্জাবীদিগকে শিক্ষিত বাঙালীদের দৃষ্টান্ত অমুকরণ কবিত্তে বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী সিপাহীদের প্রশংসাই করিয়াছেন। ইহা স্বথের বিষয়। টাইম্‌স্ অন্ড্‌ ইণ্ডিয়া এই উপলক্ষে একটি খুব গ্রাম্য কথা বলিয়াছেন। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যখন সৈনিক হয়, তখন তাহারা জানে যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে তাহারা কমিশন (অর্থাৎ লেফটেনেন্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, প্রভৃতি সেনানায়কত্ব) পাইবে। এদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছেলেদিগকে যখন সিপাহী হইতে আহ্বান করা হইতেছে, তখন তাহাদিগকেও কমিশন পাইবার আশা দেওয়া উচিত। ঠিক কথা।

যদি ইংরেজীজ্ঞান রণদক্ষ সিপাহীদিগকে কমিশন

দেওয়া হয়, তাহাদের তাহা প্রাপ্তির আংশিক কারণ যে বাঙালী সিপাহীরা হইবে, ইহা স্তূপের বিষয়।

পঞ্জাবের শিক্ষিত যুবকদিগকে সিপাহী হইতে আত্মহীন করিবার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে। তাহা কতকটা রাজনৈতিক, কতকটা আর্থিক। এ পর্য্যন্ত খুব অল্প বাঙালীই সিপাহী হইয়াছে বটে, কিন্তু ইংরেজীশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের একটা শ্রেষ্ঠতা অনিবার্য্য। সৈনিক বিভাগে প্রধানতঃ বাঙালীরই একরূপ শ্রেষ্ঠতা থাকা হয়ত বাঞ্ছনীয় মনে হয় নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে বাঙালী সিপাহীরা শিক্ষিত বলিয়া, অনেক খবরের কাগজে তাহাদিগকে অধিক বেতন দিতে বলা হইয়াছে। ইহা দ্রাব্য দাবী; অথচ বেতন সম্বন্ধে পার্থক্য করিলে অল্প সিপাহীরা অসন্তুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যদি অল্প প্রদেয় হইতেও, বিশেষতঃ বীরভূমি পঞ্জাব হইতেও, সাধারণ সিপাহীর বেতনে ইংরেজী শিক্ষিত সিপাহী পাওয়া যায়, তাহা হইলে শিক্ষিত বাঙালী সিপাহীর জন্য বেশী বেতনের দাবীর আর তেমন জোর থাকিবে না। সরকার পক্ষ হইতে বেতনসমস্তার হয় ত এইরূপ সমাধান স্থির হইয়াছে। কিন্তু এসবই অসম্ভব এবং যে কারণেই পঞ্জাব হইতে ইংরেজীশিক্ষিত সিপাহী সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হইয়া থাকুক, তাহাতে আমাদের কোনই অসন্তোষের কারণ নাই। বরং ইহা একটা লাভ, যে, স্টেটসম্যানের মত শত্রুপক্ষও একথা স্বীকার করিতেছেন, যে, পঞ্জাবের ছোটলাটের শিক্ষিতদের প্রতি আহ্বানে, ভারতবাসীদিগকে পূর্বে পূর্বে যে “লিপি-কর” বা “কেরাণী” এবং “যোদ্ধা” এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইত, তাহা ভাঙিয়া গেল। (“Sir Michael O’Dwyer’s appeal breaks down the ancient division of Indians into “writers” and “fighters”.”)

উকীলের আত্মোৎসর্গ।

রাজসাহীর ২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক উকীল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, মহাশয় গত ২৭শে ডিসেম্বর পদ্মানদী হইতে, নিমজ্জমান দুটি স্ত্রীলোকের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া নিজে প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোক দুটিকে বাঁচাইয়াছেন, কিন্তু দুইহাতে দুজনের বোঝা বহিয়া তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন, এবং স্রোতের টানে পড়িয়া ডুবিয়া যান। একরূপ বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ চিরস্মরণীয় করা কর্তব্য। যে ঘাটে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার নিকট যতীন্দ্রবাবুর কোনও উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন অবিলম্বে স্থাপিত হওয়া উচিত।

পৌষের পরামর্শসভাগুলি কি চান।

পৌষে কংগ্রেস, মসুম লীগ প্রভৃতি, যে-সকল সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতিদের অভিভাষণে, নির্দ্ধারিত প্রস্তাবসকলে এবং বক্তাদের বক্তৃতায় কি কি সংস্কার, পরিবর্তন, ও উন্নতি আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিল, কেহ যদি তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত ভারত-বর্ষের লোকদের মনের গতি কোন্ দিকে যাইতেছে। আমরা সমুদয় সভার বৃত্তান্ত, অভিভাষণ প্রভৃতি পাই নাই, দৈনিক কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাও সমস্ত সংগ্রহ করিতে এবং পড়িতে পারি নাই। স্তূতরাং এই আবশ্যক কাজটি করিবার চেষ্টাও আমরা করিতে পারিলাম না। কেবল কয়েকটিমাত্র সভার ব্যক্ত কয়েকটি আকাঙ্ক্ষার কথা লিখিতেছি।

সমাজ সংস্কার সভা, শিল্পোন্নতি সভা, মাদকসেবন-নিবারণ সভা, এসকলের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা সকলেই জানেন। অন্তান্ত সভার কোন কোন আকাঙ্ক্ষার কথাই আমরা বলিব।

বঙ্গের স্তবর্ণ বণিক সভা।

সর্বত্র সকল শ্রেণীর বালক ও বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। বরপণ কুপ্রথা দূরীকরণ। উচ্চশিক্ষা লাভের পর যুবকদের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া। শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন।

ওড়িয়া ছাত্রদের পরামর্শ-সভা।

ছাত্রদের মাসিক পত্র, এবং নানা শিক্ষাক্ষেত্রে লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন। বাল্যবিবাহ নিবারণ। বরপণ-আদায় নিবারণ। বিদেশে শিল্প শিক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাইবার নিমিত্ত ফণ্ড স্থাপন।

সমগ্র ভারতের মুসলমান শিক্ষাসভা।

দেশ-মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার প্রচলন।

ক্ষত্রিয়-উপকারিণী মহা সভা।

সভাপতি কাম্বীরের মহারাজা। উচ্চশিক্ষার বিস্তার। বিবাহাদি শুভকর্মে বাইনাচ বন্ধ করা। বরপণ প্রথা নিবারণ।

একলিপি-বিস্তার সভা।

সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দী ভাষা ও নাগরী লিপির প্রচলনের চেষ্টা।

কায়স্থ সভা।

সভাপতি সার্বাসবিহারী ঘোষ। নারীদের শিক্ষা। নারীদের অবরোধ-প্রথা এবং বাল্য বিবাহের উচ্ছেদ সাধন। কায়স্থদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে একত্র আহ্বান ও বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলন।

খজী-সভা।

সভাপতি কাশ্মীরের মজী দেওয়ান বাহাদুর অমরনাথ। ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলন। বিবাহ আদান প্রভৃতিতে ব্যয় সংক্ষেপ। শিক্ষা বিস্তার। বালিকাদের শিক্ষা। বাল্যবিবাহ নিবারণ। বালিকাদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৬, এবং বালকদের ২১ করা। শিক্ষাদান দ্বারা বিধবাদের অবস্থাব উন্নতি সাধন।

সমগ্র ভারতের হিন্দুসভা।

সভাপতি মহীশূর জিবাজুড় ও বড়োদার ভূতপূর্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত ভী, পী, মাধব রাও। সম্মিলিত পারিবারিক ও সামাজিক ভগবদারাদনা (ইহা খৃষ্টিয়ান, মুসলমান ও ব্রাহ্মদের মধ্যে চলিত আছে)। সমুদয় হিন্দু বালক-বালিকাকে অবৈতনিক প্রাথমিক ও ধর্মবিষয়ক শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন। প্রাথমিক শিক্ষা দেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার, জ্ঞান গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি সাধন এবং তাহাদের সহিত এখনকার চেয়ে ভাল ব্যবহার করা। যাহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে পুনর্বার হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী করিয়া হিন্দুসমাজে স্থানদান। হিন্দু বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাদের যত্নোপযুক্ত যত্ন করা। বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ সাধন।

ছাত্রদের সম্মিলন-সভা (মাস্ত্রাজ)।

সভাপতি সারু স্ত্রীশ্রীমতী আইয়ার (হিন্দু, ব্রাহ্মণ)। কলেজের তত্ত্বাবধায়ক-সমিতিদিগকে অস্বরোধ যে তাঁহারা ছাত্রদিগকে পিতামাতার ধর্ম-অস্বাধীন শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করুন। সাম্প্রদায়িক ছাত্রনিবাস ছাড়া, এরূপ একটি সার্বজনিক ছাত্রনিবাস স্থাপন যেখানে ইচ্ছা করিলে জাতিধর্মনির্ভেদে যে-কোন ছাত্র থাকিতে পারিবে। (এই প্রস্তাব প্রায় সকলের মত-অনুসারে গৃহীত হয়।) ছাত্রদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অস্বরোধ। ধূমপান নিষেধ। বাল্যবিবাহ নিবারণ। নাবীদিগকে জাতীয় আদর্শ-অনুসারে দেশভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান।

ভাটিয়া-সভা।

ভাটিয়ারা বোম্বাই পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু বণিক জাতি। সভায় এইমত ব্যক্ত হয় যে সভা বিবাহের শাস্ত্রোক্ত আদর্শের দিকে অগ্রসর হউন; সেই আদর্শ অনুসারে কালে নারীর বিবাহের বয়স ১৮ ও পুরুষের ২৫ হইবে; কিন্তু আপাততঃ কন্ডার বয়স যেন ১৪ এবং বরের ১৮র কম না হয়।

খিয়সকিয়াল-সভা।

ধর্মের পুনরুজ্জীবন। সকল ধর্মের ঐক্য প্রচার। ঈশ্বরের সহিত যোগ উপলব্ধি। মানুষের কোন সংকাজই ধর্ম হইতে বিচ্ছেদ্য নহে। রাজনীতির উদ্দেশ্য দেশের

মঙ্গল করা, অতএব ধর্মের সহিত রাজনীতির খুব সম্পর্ক আছে। আমাদিগেব কেবল দেবমন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় ধার্মিক হইলে চলিবে না, বাজারে, আদালতে, চিকিৎসা-কার্যে, যুদ্ধে, ব্যবসাতে, ধার্মিক হইতে হইবে। ধর্মকে সকল কাজের মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট করিতে হইবে।

সমগ্র ভারতের দেশী খ্রীষ্টিয়ানদিগের

সভায় জাতীয়তাব।

এই সভার সভাপতি উৎকলের শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট অভিভাষণে বলেন যে, দেশী খ্রীষ্টিয়ানেরা, রাষ্ট্রীয় উন্নতিচেষ্টায় অল্প সমস্ত দেশীলোকদের সহিত সহায়ত্ব দেখান না, ইহা সত্য নহে। তিনি আরও বলেন যে ধর্মাস্তর গ্রহণে মানুষের জাতীয়ত্ব (nationality) পরিবর্তন হইতে পারে না। যে শিশু যে দেশে ও যে জাতির মধ্যে জন্মিয়াছে, তাহার ধর্ম যাহাই হউক, তাহার পূর্বপুরুষদের সমুদয় জ্ঞানধর্মসম্ভাতির গৌরবের সে উত্তরাধিকারী। তিনি রামায়ণ মহাভারত, দ্রৌপদী ও সীতা, বানরদের সহিত রামের মিত্রতা, প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া দেখান যে সেকালে নারীব কিরূপ গৌরব ছিল, এবং ইহাও বলেন যে সেকালে অনাথ জাতিরা অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইত না। তাঁহার বংশের কোনও মহিলা “সতী” হইয়া স্বামীর সহযত্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখ করিয়া বলেন, “তাঁহার রক্ত আমার শিরায় বহিতেছে, আমাকে সর্বদা ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে অনুপ্রাণিত করিতেছে।”

দেশীখ্রীষ্টিয়ান সভায় মিঃ ডেভিড নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পঠিত এক প্রবন্ধে বলেন যে দেশীয়খ্রীষ্টিয়ানদের দেশী নাম থাকা উচিত নয়, খাটি বাইবেলীয় নাম রাখা উচিত; তাঁহাদের পোষাকও বিলাতী ফ্যাশনের হওয়া উচিত। সভাপতি মধুসূদন দাস মহাশয় বলেন, “খ্রীষ্টিয়ান বলিয়াই আমি মনে করি, আমার এরূপ কিছু করা কর্তব্য নহে যাহাতে আমাকে আমার দেশে বিদেশীর মত দেখাইবে।” তার পর শ্রীযুক্ত চক্র চৌধুরী বলিলেন যে দাস মহাশয় সভাস্থ সকলের মনের কথা বলিয়াছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে মিঃ ডেভিডের প্রবন্ধটি সভার কার্যবিবরণে ছাপা হইবে কি না। ছাপা হইলে লোকে দেশী খ্রীষ্টিয়ানদের মনের ভাব ভুল বুঝিবে। যদি ছাপা হয়, তাহা হইলে ইহা লিখিয়া দিতে হইবে যে সভাস্থ অধিকাংশ লোকের মত মিঃ ডেভিডের বিপরীত। সভাপতি মহাশয় সভার মত জানিতে চাহিলেন। এক মিঃ ডেভিড ছাড়া আর সকলেই বলিলেন যে তাঁহার প্রবন্ধ ছাপা হওয়া উচিত নয়।

এই-প্রকারে দেশী ভাবের জয় হইল।

ইতিহাস

[বাঁকপুর সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-

শাখার সভাপতির অভিভাষণ]

প্রাচীন লীলার ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে দীর্ঘনিঃশ্বাসে রাখিয়া উঠে “বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।” যে পবিত্র ক্ষেত্রে আজ আমাদের এই সম্মিলন ও উৎসব, ইহাই যে বঙ্গ-সভ্যতার ও বাঙালী জাতির ইতিহাসের জন্মভূমি, তাহাই বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। মিথিলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগের যে প্রদেশ মহাভারতেব সভা-পর্বে (সভা ৩০ অ, ৩) গোপালকক্ষ নাম পাইয়াছিল, বায়ু এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে প্রদেশ গোমন্ত বা গোবিন্দ জাতির আবাস বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল (মার্কণ্ডেয় ৭৭ অ, ৪৪ ; বায়ু ৪৫ অ, ১২৩), সেই প্রদেশের এক সময়ের গোড়নাম আমাদের সমগ্র বঙ্গভূমির অতি আদরেণ ও গৌরবের নাম। যৎসূত্রপূরণকার বলেন (১২ অ, ৩০) যে রাজা আবন্ত গোড়-দেশে আবন্তনগর নির্মাণ করিয়াছিলেন ; গোড়বহো কাব্যে পাই যে কবির সময়ের মগধের অধিপতি ঐ গোড়-দেশ এবং মগধের অধীশ্বর ছিলেন, এবং বঙ্গদেশ তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল (৪১৩, ৪১৭, ৪৮ ও ৪১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এলবেকনি দেখিয়া গিয়াছিলেন যে কুম্ভরাজ্যের থানেশ্বর পর্যন্ত ভূভাগ গোড়নামে অলঙ্কৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমদিকে সে গোড়দেশের প্রসারের কথা দূরে থাকুক, কুশনদীর কচ্ছ-প্রদেশেও প্রাচীন গোড় নাম প্রচলিত নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব অতি সহজলভ্য গ্রন্থ পড়িয়া হয়ত বিদ্যালয়ের বালকেরাও শিখিয়াছেন যে ঝাঁহারা পাল রাজা নামে খ্যাত ঝাঁহারা মুখ্য ভাবে এই মগধাদিদেশেই বাস করিতেছিলেন, এবং উত্তর বঙ্গ ও অন্যান্য বিভাগ আপনাদের অবিকারভুক্ত করিয়া শাসন করিতেছিলেন। বাকুপতির সময়ের মত তখনও এই রাজাদের গৌরবের উপাধি ছিল গোড়-মগধেশ্বর। নারায়ণ-পালের উত্তরাধিকারীরা যখন আদি গোড় ও মগধ হারাইয়া বঙ্গের একটি উপবিভাগে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন যে মিথিলা-মগধের জনশ্রোত ও সভ্যতাস্রোত বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশে প্রবাহিত

হইতেছিল, এবং সমগ্র বিহার প্রদেশ, রাষ্ট্রকূট, গুজর প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও মধ্য ভারতীয় জাতির বিশেষত্ব চিহ্নিত হইতেছিল, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। বলীর বংশের অর্থাৎ অবিড় জাতীয় পুণ্ড্র, হুঙ্ক ও বঙ্গ নামে পরিচিত লোকেরা যে বহু পূর্বকাল হইতে মগধের ভাষা, ধর্ম ও রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, চীন পরিব্রাজকদের বর্ণনায় তাহা অতি সুস্পষ্ট। মহীপাল যখন বরিন্দ ও পুণ্ড্র বর্জন লাভ করিয়াছিলেন, তখন মহা-নন্দার পশ্চিম পারে পূর্বপুরুষদের আদিভূমিতে ক্ষমতা প্রসার করিতে ছাড়েন নাই ; কিন্তু যাহা ভাঙ্গিয়াছিল তাহা গড়ে নাই। পাশ্চাত্য ও মধ্যদেশের প্রভুতায় বিহার পরিবর্তিত হইল ; দেশের লোক মাথার উম্মীষ বাদিল, ভিন্ন অক্ষর লিখিয়া ভিন্ন ভাষা শিখিল, ভোজননের সামগ্রীতেও পরিবর্তন ঘটাইল। আর সমগ্র বাঙ্গলায় মগধের সভ্যতা ও গোড়ী রীতি স্বরক্ষিত হইয়া নূতন বিকাশ লাভ করিল। বিকাশের ধাবাবাহিকতা বিচার করিলে আমরাই আজ বঙ্গদেশে প্রাচীন মগধের সভ্যতার বড় ভাগের উত্তরাধিকারী এবং আজ এই বিহার-প্রবাসে প্রাচীন বিহারের পরিষ্কৃত প্রতিনিধি। তাই পরিবর্তিত বিহারের লোকেরা আজ আমাদের চিনিতে পারিতেছে না, এবং আমরাও এই প্রাচীন লীলাভূমিতে দেশবাসীর সাড়া না পাইয়া প্রাচীন-স্মৃতি বহন করিয়া বলিতেছি—“বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।”

তবে এই উৎসবের নাট্যমন্দিরে যদি বিশ্বজনীন নূতন স্বর ভাঁজিতে পারিতাম তাহা হইলে এ বাঁশরী আবার বাজিত ; ভারতীয় পূজার মণ্ডপে পুরোহিতেরা যদি বিশ্ব-জনীন নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সকলেই এখানে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিত। কেবল যে এ দেশের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাস গাঁথা পড়িয়াছে তাহা নয়, ভারতবর্ষের সেকাল একালের সকল প্রদেশের ও সকল জাতির ইতিহাসেব সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাসের অচ্ছেদ্য মিলন আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতায় যদি বঙ্গদেশকে স্বতন্ত্র করিয়া তুলি, এবং ঐ দেশের মধ্যেই সকল প্রাচীনতা ও জীবিত লোভে যদি কালিদাসকে নবদীপে জন্ম লইতে বাধ্য করি, অর্থাৎ

ভট্টের নাম হইতে ভাটিপাড়ার উৎপত্তি মনে করি, সুন্দর-বনকে বেদের আরণ্যকভাগের জনিত বলি, এবং সর্বশেষে বহরমপুরকে ব্রহ্মপুর করিয়া সেখানকার মাটি হইতে স্বয়ং ব্রহ্মার আদি পদ্মাসনের ‘হসিল’ তুলি, তাহা হইলে আওরংজেবের আমলের পালিস্-করা পাথর কিংবা নেপালী মালমসলা আমাদের ইতিহাসের মন্দির গড়িবার সময় কাজে লাগিবে না, এবং আমাদের ক্ষুদ্র মন্দিরে কোন সাক্ষরভৌম পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে আসিবেন না। “পাল” কথাটি ষাঁহাদের নামে সমাসে ঘোড়া পাওয়া যায় বলিয়া ষাঁহার পাল নামে কীৰ্ত্তিত, তাঁহাদের প্রথম আমলের রাজাদের শরীর যদি খাটি বাঙ্গলার মাটির গড়ন না হয়, তাহা হইলে আমাদের ইতিহাসকে লজ্জায় মুখ ঢাকিতে হয় না। পিতৃ-পুত্রদের ঐতিহাসিক তর্পণে যদি বংশপ্রবর্তক চম্পিশঙ্কন শ্ববির নামের সঙ্গে সঙ্গে বলীর দ্রবিড়-মেলের পুত্রদিগকে স্মরণ না করি তাহা হইলে কেবল ঐতিহাসিক সিদ্ধির গায়েই জল দেওয়া হইবে।

এখানে বড় বড় ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে আসি নাই,—ক্ষমতাও নাই। আমি ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের পুরোহিত নহি। কথাটা বিনয়ের অভিনয়ের জ্ঞান বলি নাই; এখনও যে দেবীর মন্দির গড়া হয় নাই, সেখানকার কাজের জ্ঞান কেহই এখনও পুরোহিত্য পাশ্চ নাই। কেহ বা মাটি খুঁড়িতেছে, কেহ বা পাথর ফুড়াইতেছে, কেহ বা দেশে দেশে বিবিধ জাতির লোকের কাছে উপযুক্ত মালমসলার অন্বেষণ করিতেছে। ষাঁহারা গাড়ি গাড়ি-মাল ঢোলাই করিতেছেন তাঁহাদের গাড়িতে কখন কখনও দুই একটুকরা উপকরণ তুলিয়া দিয়াছি বলিয়াই আজ এই বৃহৎ উৎসবের দিনে আমার প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে; সেজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে সকলকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আজ এই সুবিধায় ষাঁহারা ইতিহাসের উপাদানের ভার বহিতেছেন, এবং ষাঁহারা এই কার্যে ব্রতী হইতে চাহিতেছেন, বিশেষ ভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দুই চারিটি কথা বলির। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা হইতে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পর্যন্ত আমাদের সকল মালগুদামে যে-সকল উপকরণ রক্ষিত হইতেছে, তাহা বাছাই করিয়া লইয়া

ভবিষ্যৎ কারিগরেরা মন্দির গড়িবেন এবং খ্যাতি লাভ করিবেন; মন্দিরের ভবিষ্যৎ পুরোহিতেরা বিলক্ষণ দক্ষিণা পাইয়া সুখী হইবেন। সেই যশ এবং দক্ষিণা এখন লাভ করিবার জ্ঞান যদি কোন ভাববাহক উৎকণ্ঠিত বা উৎসুক হয়েন, তবে তিনি আপনার কর্তব্য করিতে পারিবেন না। সংগৃহীত পাথরের দুচারিখানি সাজাইয়া যদি কেহ ঘর গড়িয়াছেন ভাবেন, তবে তিনি বড়ই ভুল করিবেন। যে সাহিত্য চিন্তা-বিনোদনের জন্ত, তাহার পাক। মন্দিরে চণ্ডিদাসের দিন হইতে এ পর্যন্ত অনেক শতাব্দী বাজিয়া আসিতেছে, অনেক সুস্বাদু ভোগ নিবেদিত হইতেছে। সে ভোগের লোভে সে মন্দিরের দরজায় আমরা সকলেই ছড়াছড়ি করিয়া থাকি; এমনকি ইয়োরোপ আমেরিকার লোকেরাও হাত পাতিয়া ভোগ লইয়াছে, এবং আমাদের একালের কবি পুরোহিতকে অনেক দক্ষিণা দিয়াছে। ইতিহাস লইয়া এত সৌরভ লাভের দিন এখনও আসে নাই; সেদিন বহুদূরে। এখন ইতিহাসের নামে দেখিতে পাই যে চারিদিকের চালাঘরে কেবলই ইট পাথরের পালা, এবং কোথায়ও বা প্রত্নতত্ত্বের টেকিতে, ব্যাকরণের মুঘলে খান-কতক ইট ভাঙ্গিয়া সুরকি করা হইতেছে। ষাঁহারা খ্যাতি ও দক্ষিণা চাহেন, এই কচকচির ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান নাই। ষাঁহারা একথা বুঝিয়া-সুঝিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারবাহক হইতে চাহেন, তাঁহারাই নিষ্কাম ব্রত লইয়া আনুন।

এখানে খ্যাতিও নাই দক্ষিণাও নাই, বরং উন্ট। একটু-খানি নিগ্রহ লাভের সম্ভাবনা আছে। সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ না করিয়া, যে ঘটনা ঠিক যাহা, তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে; উহাতে যদি চিরদিনের পোষা সংস্কারের গায়ে আঘাত লাগে, যদি আপনার দলেব লোকেরা অন্তদলের লোকের কাছে উপহাসিত হয়, যদি ইয়োরোপীয়দের চক্ষে ভারতের কোন রীতি বা অস্থান অসুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলেও অসঙ্কোচে সত্যের মর্যাদা রাখিতে হইবে। ইয়োরোপের বিজ্ঞান ও ইতিহাস-মন্দিরে বড় বড় পুরোহিতেরা অসঙ্কোচে প্রচার করিতেছেন যে দৈবাত যদি তাঁহাদের দেশের লোকের শরীরে আর্ধ্য নামক কোন জাতির রক্ত থাকে

তবে উহা ছিটেকোটীর অবিক নহে; একটা নিম্নোপ্রায় জাতির সহিত আল্লাইন জাতির সংস্রবে যে বেশীর ভাগ ইয়োরোপীয় জাতির উৎপত্তি, একথা স্পষ্ট স্বীকৃত হইতেছে। কেহ যদি স্পষ্টভাবে আবিষ্কার করেন যে সেকালের আর্থোরা এবং একালের আমরা খাঁটি কুলীন বংশেই জন্মিয়া আসিয়াছি, সে ত ভাল কথা। কিন্তু যদি একটু উন্টা কথা বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি আমরা সত্যকাম জাবালের মত নির্ভীক হইতে পারিব না? কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে আমি ইতিহাসের ধান ভানিতে আসিয়া নৃতত্ত্বের শিবের গীতের দৃষ্টান্ত দিতেছি কেন? নৃতত্ত্ব না হইলে যে ইতিহাস হয় না তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আর্থ্য এবং আর্থ্যেতর জাতি লইয়াই ভারতবর্ষ, এবং সংখ্যায় আর্থ্যেতরেরাই অত্যন্ত অধিক। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের ভাষায়, ধর্ম এবং পারিবারিক অস্থানাদিতে যে আর্থ্যেতর জাতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহা আর্থ্যেতর জাতির তথ্য না জানিলে কেহ ধরিতে পারিবেন না। বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে ও মিশ্রণে কেমন করিয়া স্বরণাভীত কাল হইতে এই জাতির শরীর, মন, প্রকৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস, ভাষা ও সামাজিক অস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে ও পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, সেই ইতিহাসই দেশের যথার্থ ইতিহাস। যথার্থ ইতিহাস কি তাহা ভুলিয়া যাই বলিয়াই যখন কোন প্রাচীন সময়ের একখানি ক্ষুদ্র দান-লিপিতে কোন একটি বিশ্বৃত প্রদেশজয়ী রাজার একখানি গ্রামদানের বিবরণ পড়ি, তখন উহা হইতে ইতিহাসের কোন উপাদান না পাইলেও অনির্দিষ্ট একজন প্রাচীন রাজার বীরত্ব, বদান্ততা প্রভৃতির বর্ণনায় শতাধিক পৃষ্ঠা লিখিবার উদ্যোগ করিয়া থাকি। একজন রাজা নির্ভুর হইতে পারে, বা দয়ালু হইতে পারে, বা আর কিছু হইতে পারে; কিন্তু জাতি-সাধারণের অবস্থা বা চরিত্র বুঝিতে হইলে, দেশের লোকের ধাত বুঝিতে হইলে, তিন ছত্রের ভাষ্যফলকের লুপ্ত রাজার নাড়ি টিপিয়া কিছু বুঝিতে পারা যায় না। রাজাদের নামের তালিকা, ও দেশ জয়ের বিবরণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; কিন্তু যাহাতে লোক-সাধারণের কোন বিবরণের আভাস পাওয়া যায় না তাহা ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র উপাদান মাত্র। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি

হইতে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে, হইবে এবং হওয়া উচিত। কিন্তু আর্থ্যেতর জাতিসমূহের শরীর, ভাষা, ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার অস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধিত ভাষায় লিখিত ধর্মশাস্ত্রাদির মত পবিত্র, পূজ্য, এবং জাতব্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়া চাই। নৃতত্ত্বই যে ইতিহাসের গোড়া, বিভিন্ন অবস্থায় লোক-সাধারণের পরিবর্তনের বিবরণই যে যথার্থ ইতিহাস, ইয়োরোপেও তাহা অল্পদিন পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়দের যে প্রাচীন সংস্কার ছিল, তাহার বশবর্তী হইয়াই উহারা বলিতেন, এবং এখনও অনেক বলিয়া থাকেন, যে, ভারতবর্ষে কখনও ইতিহাস লিখিত হয় নাই। নূতন ভাব লইয়া আমরা বলিতে পারি যে কোন দেশেই হয় নাই।

ইয়োরোপের অবস্থা ও প্রকৃতির ফলে সেখানে যাহা ছিল বা আছে, তাহা যদি আমাদের না থাকে, তবে যে-অবস্থার ফলে তাহা আমাদের নাই, তাহা বুঝিয়া লইয়া ভারতের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস বুঝিবার পথ পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু লক্ষ্যায় মাথা হেঁট করিয়া একটা গোঁজামিল দিয়া ইয়োরোপীয়দের কাছে একটা কাল্পনিক অবস্থা খাড়া করা চলে না। আন্তর্জাতিক বিবাদ মিটিয়া গেলে যেখানে সকলেরই মিলিত বংশধরেরা এক ঐতিহ্য মাথায় বহিয়া চলে, সেখানে বিবাদের দিনের দলবিশেষের গৌরবের কথা লইয়া এক-একটা-বিশেষ বিশেষ জাতীয় কীর্তিস্তম্ভ রচিত হইতে পারে না। বিদেশ হইতে শক, যবন, হনেরা আসিয়া যখন একেবারে আমাদের সমাজশরীরে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল, তখন বিশেষ ভাবে দৃষ্টজনিত কোন এক পক্ষের গৌরবের কথা স্বতন্ত্র সাহিত্যে রক্ষিত হইয়া আদৃত হইতে পারে নাই। কোন প্রদেশেই এমন স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় নাই যাহাতে জাতিতে জাতিতে ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে পারিয়াছিল কিংবা ইয়োরোপীয় ছাঁচের ইতিহাস রচিত হইতে পারিয়াছিল। অতি-প্রাচীন গল্পে পড়ি যে নির্দাসিত রাজপুত্র প্রচুর বললাভ করিয়াও প্রাচীন রাজ্য-লাভের উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং বিপুলায়তন ভারতবর্ষের একটি স্থানের বা "অরণ্য ঠানে রজ্জ্বম্মাপেন্দ্রসামি" বলিয়া নূতন রাজ্য গড়িয়াছেন,

তখন প্রাচীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। অনেক বৃত্তস্থ জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিবার প্রচুব স্থান পাইয়াছিল এবং ভারতবাসী হইয়া গিয়াছিল। সেকালের সকলেই হিন্দেন ছিল বলিয়া পরস্পরের মিলনে বাধা হয় নাই। পরে যখন অল্প জাতির লোকেরা আসিলেন, এবং নতুন রকমের ধর্মবিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়া বলিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষত্বটুকু ঘোল আনা বজ্রায় রাখিবেন, তখনকার দ্বন্দ্ব ইয়োরোপীয় ধরণের ইতিহাস রচিত হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা দৃষ্টান্ত দিব। ঠাহারা খ্রিষ্ট জাতীয়ের বঙ্গভূমিতে আর্ধ্য-সভ্যতা লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের লোকদিগকে আর্ধ্য-আদর্শ লইবার জন্য কোন-প্রকার পৌড়ন করেন নাই; দেশেব লোক নতনদের সৌন্দর্য্যে অথবা গৌরবে মুগ্ধ হইয়াই নতন লোকদিগের মিত্র প্রতিবেশী হইয়াছিল, এবং গুণ এবং ক্ষমতা দেখিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্যই নতনকে শ্রেষ্ঠ পদবী দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসারের সময়েও কোনও উৎপীড়ন ঘটে নাই। ব্রাহ্মণদের নামে যতই দুর্গাম থাকুক, তাঁহারা যাচিয়া যাচিয়া উচ্চশ্রেণীর খ্রিষ্ট জাতীয়দিগকে ধর্মকর্মের জন্য পুরোহিত দিয়াছিলেন, এবং শূদ্রবর্গের প্রসার বাড়িয়া দিয়া শূদ্রের নবশাখার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। খ্রিষ্টেরাও যাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া স্পর্শ কবিত না, তাহাদিগকে ইহারাও স্পর্শ করেন নাই, অথবা খ্রিষ্টের কাছেও মান মর্যাদা রাখিতে হইলে স্পর্শ করিতে পারিতেন না। একপ স্থলে বাঙ্গালায় আর্ধ্য আগমনের কোন্ গৌরবের কথা সোংসাহে ও সাগ্রহে পড়িবার মত ছিল যে সেই কথা লইয়া সেই সময়ের ইয়োরোপীয় ছাঁচের ইতিহাস রচিত হইবে? যত জ্ঞাতব্য বা-শিক্ষাপ্রদ হউক না কেন, যাহাতে রক্ত গরম করিবার মত উদ্দীপনা নাই, তাহাকে কেহ যেন ইতিহাসই বলিতে চাহেন না। এ ভ্রান্তি না গেলে আমাদের ইতিহাস রচিত হইবে না। ভ্রান্তি যে ঘুচিতেছে, ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ যে চিহ্নিত হইতেছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছি; কাজেই আশায় ও আনন্দে বলিতে পারি যে আমাদের ইতিহাসের বিপুল ও স্বন্দর মন্দির গড়িয়া উঠিবে, এবং সকল ভারবাহীর পরিশ্রম সফল হইবে।

ত্রিবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্লেটো—সোক্রেটাসের আত্মসমর্থন

(মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত)

পূর্বস্ববৃত্তি।

২০। আমি যাহা বলিলাম, তোমাদিগের নিকটে তাহার অকাটা প্রমাণ—বাক্যের প্রমাণ নয়, কিন্তু তোমরা যাহাকে আদর করিয়া থাক, সেই কার্যের প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। তবে শুন, আমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে; তাহা হইলে তোমরা জানিতে পারিবে, যে এমন একজনও নাই, যাহার নিকটে আমি মৃত্যু-ভয়ে অত্যাশ কৰ্ম করিতে সম্মত হইব; আমি বরং এমত আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিব। আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা আদালতের একটা চলিত কথা, কিন্তু কথাটা সত্য। হে আধীনীয়গণ, আমি এই পুরীতে আর কোনও পদ লাভ করি নাই, শুধু মঙ্গলসভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম। তখন আমাদের আন্টিঅথিস গোত্র অধিনায়ককে প্রতিষ্ঠিত ছিল,—যখন, যে দশজন সেনাপতি আর্গিন্থাসাইর নৌযুদ্ধে স্বীয় সেনাদিগকে উদ্ধার করেন নাই, তোমরা অবৈধরূপে একযোগে তাহাদিগের বিচার করিতে চাহিয়াছিলে; কাজটি যে নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা পরবর্তীকালে তোমরা সকলেই বৃত্তিতে পারিয়াছিলে। সেই সময়ে অধিনায়কগণের মধ্যে আমি একাকী এই অবৈধ কার্যের প্রতিবাদ ও ইহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিয়াছিলাম। বক্তারা তখন আমাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং তোমরা চীৎকার করিতেছিলে ও আমাকে তোমাদিগের মতে মত দিতে আদেশ করিতেছিলে; কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম, যে, কারাগার বা মৃত্যুর ভয়ে তোমাদিগের সহিত অত্যাশ কার্যের প্রস্তাবে মত দেওয়া অপেক্ষা ত্রায় ও নিয়মের জন্য বিপদকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়ঃ। যখন নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এই ঘটনা ঘটে। পরে যখন স্বল্পনায়কতন্ত্র (Oligarchy) স্থাপিত হয়, তখন ত্রিশম্বায়ক আমাকে ও অপর চারিজনকে ভোজনগারে ডাকিয়া পাঠাইয়া আদেশ করেন, যে, আমাদেরকে সাল্যামিস হইতে সাল্যামিস-বাসী লেওনকে আনয়ন করিতে

হইবে; অভিশ্রাম এই যে তাঁহারা তাহাকে হত্যা করিবেন। তাঁহারা অপর বহু লোককে এই-প্রকার অনেক আদেশ করিতেন; অভিসন্ধিটা এই ছিল, যে, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব বহুসংখ্যক লোক তাঁহাদিগের অপকর্মে জড়িত হইয়া পড়িবে। কিন্তু তখন আমি বাক্য নয়, অপিত কার্য্য-দ্বারা দেখাইয়াছিলাম, যে, আমি (একটা গ্রাম্য কথায় বলা যাইতে পারে) মৃত্যুকে এতটুকুও গ্রাহ্য করি না, কিন্তু অন্তায় ও অপবিত্র কার্য্যকে বিশ্ব-সংসারে সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রাহ্য করিয়া থাকি। সেই শাসনকর্ত্তৃগণ এত ক্ষমতাশালী হইয়াও আমাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া এমত কাতর করিতে পারেন নাই, যে, আমি অন্তায় করিতে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু যখন আমরা মন্ত্রণাগার হইতে বাহির হইলাম, তখন ঐ চারিজন সালামিস যাইয়া লেওনকে লইয়া আসিলেন, আর আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। যদি ত্রিশ-মায়কের শাসন অধিরে অবদান না হইত, তবে আমি হয় তো এই জন্ত প্রাণ হারাইতাম। এই বিষয়ে তোমরা অনেকেই আমার সাক্ষী রহিয়াছ।

২১। এখন, তোমরা কি মনে কর, যে, আমি যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতাম, সাধুজনের মত স্নায়-মর্শ্বের সহায়তা করিতাম, এবং সকলেরই যেমন কর্তব্য, তেমনি এই-প্রকার সহায়তা করা সর্বোপরি শ্রেয়ঃ বলিয়া মানিয়া লইতাম, তবে আমি এত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম? আত্মজ্ঞবাসিগণ, নিশ্চয়ই নয়; না, অন্ত কোন লোকও পারিত না। কিন্তু আমি সারা জীবন, কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, কি নিজের গৃহস্থালিতে, যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাতে তোমরা আমাকে এইরূপই দেখিতে পাইয়াছ, যে, আমি স্নায়মর্শ্ব উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনও কাহারও নিকটে অবনত হই নাই; অপরের নিকটেও নহে; আর আমার নিম্নকেরা যাহাদিগকে আমার শিষ্য বলিয়া অপবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে, তাহাদিগের নিকটেও নহে। আমি কিন্তু কখনও কাহারও গুরু হইয়া বসি নাই। যদি কেহ আমার কথা ও আমার জীবনব্রতের বাস্তা শুনিতে চাহে, সে যুবকই হউক বা বৃদ্ধই হউক, আমি কখনও তাহাকে আমার সম্মুখে বসিত করি না; আমি যে

অর্থ পাইলে আলাপ করি ও অর্থ না পাইলে আলাপ করি না, তাহা নহে; কিন্তু আমি সমভাবে ধনী ও দরিদ্র সকলকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার দিয়াছি; এবং যে-কেহ আমার কথা শুনিতে ও আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়, আমি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত আছি। এইসকল লোকের মধ্যে যদি কেহ ভাল হয়, বা ভাল না হয়, তবে স্নায়তঃ আমি তাহার কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না; কেননা, আমি কখনও কাহাকেও কোনও-প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, বা শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতও হই নাই। যদি কেহ বলে, যে, সে কখনও আমার নিকটে কিছু শিক্ষা করিয়াছে, বা সে একাকী গোপনে আমার নিকটে এমন কিছু শুনিয়াছে, যাহা অপর সকলেই শুনে নাই, তবে তোমরা বেশ জানিও, যে, সে সত্য কথা বলিতেছে না।

২২। তবে কেন লোকে দীর্ঘকাল আমার সহবাসে যাপন করিয়া আনন্দ লাভ করে? আত্মীয়গণ, তোমরা তাহা শুনিয়াছ। আমি তোমাদিগকে সমস্তই সত্য বলিয়াছি। কারণটি এই, যে, যাহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু জ্ঞানী নয়, তাহাদিগকে আমি যে পরীক্ষা করি, তাহা শুনিয়া তাহারা আনন্দ সন্তোষ করে; কেননা, ব্যাপারটা অমনোহর নয়। আমি বলিতেছি, যে, দৈববাণী, স্বপ্ন ও অন্ত যত উপায়ে ঈশ্বরের বিধি মানবের নিকটে প্রকাশিত হয়,—সর্বপ্রকারেই ঈশ্বর আমাকে এই কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন। হে আত্মীয়গণ, ইহাই সত্য; সত্য কি না, তাহার পরীক্ষাও সহজ। কারণ, আমি ইতোমধ্যেই যুবকদিগের অনেককে বিপথগামী করিয়াছি ও অনেককে বিপথগামী করিতেছি, ইহা যদি সত্য হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্যোমবুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই বুদ্ধিতে পারিত, যে, আমি যৌবনকালে তাহাদিগকে অসহুপদেশ দিয়াছি; এবং তাহারা এক্ষণে বিচারালয়ে আসিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত ও প্রতিশোধ লইত। আর, যদি তাহারা এইরূপ করিতে অনিচ্ছুক হইত, তবে তাহাদিগের আত্মীয়বর্গের মধ্যে বেহ না কেহ—তাহাদিগের পিতা বা ভ্রাতা বা অপর কোনও স্বগণ—আমি যদি তাহাদিগের কোনও অনিষ্ট

করিতাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিত ও প্রতিশোধ লইত।
বস্তুত: তাহারা অনেকে এখানে উপস্থিত আছে, আমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। প্রথমত: আমার স্বগোত্র ও সম্বয়সী, ক্রিটবোলসের পিতা ক্রিটোন এখানে উপস্থিত; তৎপরে স্ফীটস-বাসী লুসানিয়াস,—সে আইথিনিয়াসের পিতা; এবং এপিগেননৌসের পিতা কীফিস-বাসী আন্টিফোনও এখানে বর্তমান। তারপর এখানে এমন অনেকে উপস্থিত আছে, যাহাদিগের ভ্রাতারা আমার সহবাসে কালাপান করিয়াছে। থেমজটিডসের পুত্র, থেমজটসের ভ্রাতা নিকট্রাটস—থেমজটসের মৃত্যু হইয়াছে, স্বতরাং সে অবশ্যই নিকট্রাটসকে নীরব থাকিতে উপরোধ করে নাই—এবং ভীমডকসের পুত্র এই পারালস; থেমগীস তাহার ভ্রাতা ছিল; এবং আরিষ্টোনের পুত্র এই আডাই-মাক্টস; তাহার ভ্রাতা প্রাটোন (Plato) এখানে উপস্থিত; এবং আইআটা ডোরস; তাহার ভ্রাতা এই আপলডোরস। আমি তোমাদিগের নিকটে আরও অনেকের নাম করিতে পারিতাম। মেলীটসের একান্ত কর্তব্য ছিল, যে, নিজের বক্তৃতার কালে সে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও সাক্ষ্যপ্রদানের জন্ত আহ্বান করে। কিন্তু তখন যদি সে আহ্বান করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকে, এখন আহ্বান করুক; আমি মঞ্চ হইতে অবতরণ করিতেছি; সে বলুক, তাহার এমত সাক্ষ্য কিছু আছে কি না। কিন্তু হে বন্ধুগণ, তোমরা দেখিতে পাইবে, যে, প্রকৃত কথা ইহার সর্বৈব বিপরীত; মেলীটস ও আল্যুটসের কথাগুলিসারে আমি যাহাদিগের আত্মীয়গণকে উদ্বারগামী করিয়া তাহাদিগের অকল্যাণ শাপন করিতেছি, তাহারাই এই অসংপথপ্রদর্শক, অহিতাচারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। যাহারা আমার প্ররোচনায় বিপথগামী হইয়াছে, তাহারাই যে আমার সাহায্য করিতে চাহিবে, তাহার বরং সঙ্গত কারণ আছে; কিন্তু যাহারা বিপথগামী হয় নাই, যাহারা এখন পরিণতবয়স্ক পুরুষ, তাহাদিগের সেই স্বজনবর্গ যে আমাকে সাহায্য করিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছে, সত্য ও ত্রায় ভিন্ন—তাহারা জানে, যে, মেলীটস মিথ্যাবাদী, এবং আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই সত্য—ইহা ভিন্ন, তাহার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

২৩। যাক্, বন্ধুগণ। আত্মসমর্পনের জন্ত আমার যাহা বলিবার আছে, এই কথাগুলি ও হয় তো এই-প্রকার অস্ত্রাস্ত্র কথাই তাহার প্রায় সব। তোমাদিগের মধ্যে কেহ হয় তো আপনার ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে। সে নিজে আমার অপেক্ষা একটা তুচ্ছতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বিচারকালে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে বিচারকগণকে কত কাকুতি মিনতি করিয়া মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছে; এবং আপনার সম্মানসম্মতি ও অস্ত্রাস্ত্র আত্মীয়স্বজন এবং বহু বন্ধুবান্ধবকে বিচারালয়ে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের গভীর অমুকম্পার উদ্রেক করিতে প্রয়াসী হইয়াছে; আর আমি, সে যাহাকে চরম বিপত্তি বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাতে পতিত হইয়াও এ-সকলের কিছুই করিতেছি না। ইহা দেখিয়া সে হয় তো আমার প্রতি কঠোর-হৃদয় হইয়া উঠিয়াছে, হয় তো ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে ক্রোধের বশীভূত হইয়াই স্বীয় মত জ্ঞাপন করিবে। যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে—“যদি” বলিলাম এই জন্ত, যে, তাহার এমত হওয়া উচিত নহে—যদিই বা এমত কেহ থাকে, তবে আমার বোধ হয় আমি তাহাকে সঙ্গতরূপেই এই কথা বলিতে পারি—“ওহে পুরুষোত্তম, আমারও আত্মীয়স্বগণ আছে, কেননা, হোমরের কথায় বলিতে পারি, ‘আমিও বৃক্ষ বা প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হই নাই,’—কিন্তু আমি মাছুষ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি;” স্বতরাং হে আধীনীয় নরগণ, আমারও আত্মীয়স্বজন ও তিনটি পুত্র আছে; একটি এখনও কিশোরবয়স্ক, অপর দুইটি শিশু। কিন্তু তথাপি আমি তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া তোমাদিগের নিকটে মুক্তি ভিক্ষা করিব না। কেন আমি এই-প্রকার কিছুই করিব না? হে আধীনীয়গণ, আমি যে গর্ভভরে কিংবা তোমাদিগকে অসম্মান করিবার উদ্দেশে এই-প্রকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহা নহে; আমি নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারি কি না, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আমার ও তোমাদিগের ও সমগ্র পুরীর সুনামের জন্ত আমার ইহা শোভন বলিয়া বোধ হইতেছে না, যে, আমি এই বয়সে এবং এমন নাম থাকিতেও—সে নাম সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক—এই-প্রকার কাজ করিতে বাইব। নোকে, অন্তত: সিদ্ধান্ত

করিয়া রাখিয়াছে, যে, সোক্রেটাস ও জনসাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানে কিংবা মনুষ্যত্বে কিংবা ঈশ্বর অথবা কোনও গুণে, বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, তাহারা যদি এই-প্রকার আচরণ করে, তবে তাহা লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি বহুবার কত বিশিষ্ট লোককে এই-প্রকার আচরণ করিতে দেখিয়াছি; যখন তাহাদিগের বিচার উপস্থিত, তখন মনে হয় যে তাহারা কি অদ্ভুত ব্যবহারই করিতেছে; তাহারা যেন ভাবিতেছে যে যদি তাহারা মরে, তবে কি ভীষণ দশাতেই পতিত হইবে—যেন তোমরা যদি তাহাদিগকে বধ না কর, তবেই তাহারা অমর হইবে। আমার মনে হয়, যে, এই লোকগুলি পুরীর উপরে কলঙ্ক আনয়ন করে; কেননা, কোনও বিদেশী ইহা দেখিয়া ভাবিতে পারে, যে, আধীনীয়গণের মধ্যে যাহারা গুণগ্রামে বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাহাদিগকে তাহারা শাসনকার্যে ও অন্ত্যস্ত সম্মানার্থে পদে নির্বাচন করে, তাহারা জীলোক অপেক্ষা একটুকুও শ্রেষ্ঠ নহে। হে আধীনীয়গণ, তোমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিন্দুমাত্রও খ্যাতি আছে, তাহাদিগের একরূপ করা কর্তব্য নহে; যদি আমরা একরূপ করিতে চাই, তাহা করিতে দেওয়াও উচিত নহে; কিন্তু তোমাদিগের ইহাই প্রদর্শন করা কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বিচারালয়ে এই-প্রকার করুণরসের অভিনয় করে ও তদ্বারা পুরীকে উপহাস-ভাঙ্গন করিয়া তুলে, তাহার প্রতিই, যে এসকলের কিছুই না করিয়া একেবারে নিরুদ্ভা বসিয়া থাকে, তাহার অপেক্ষা, তোমরা অনেক অধিক নির্দয়।

২৪। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, খ্যাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিচারকের চরণে কাকুতি গিনতি করা কিংবা তাঁহার অহুকাপ্পার উল্লেখ করিয়া মুক্তি-ভিক্ষা করা আমাব নিকটে গ্রাহ্যসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; বরং তাঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়া ও ব্যাখ্যা দেওয়াই কর্তব্য। বিচারক এই নিয়মে বিচারকের আসনে উপবেশন করেন নাই, যে, যাহারা তাঁহার অগ্রগ্রহভাজন, তিনি শুধু তাহাদিগকে গ্রাহ্য বিধান করিবেন; কিন্তু তিনি সমুদায় বিচার করিবেন; তিনি এই শপথ করিয়াছেন, যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা অগ্রগ্রহ বিবরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু নিয়মামুসারে সমুদায়

বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। স্বতরাং আমাদের কর্তব্য নয়, যে, আমরা তোমাদিগকে শপথ লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা দিব, তোমাদিগেরও উচিত নয়, যে, তোমরা এমন শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ, উহা আমাদের উভয়পক্ষের কাহারও পক্ষেই ধর্ম্মাচরণ হইবে না। অতএব, হে আধীনীয়গণ, তোমাদিগের মধ্যে একরূপ আচরণ করিতে আমাকে আদেশ করিও না; আমি তাহা শোভন বা গ্রাহ্য বা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না, বিশেষতঃ মনে রাখিও, আজ মেলীটস আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে—আজ আমাকে এমন আদেশ করিও না। কারণ, যদি আমি তোমাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হই, এবং মিনতিদ্বারা জয়লাভ করিয়া তোমাদিগকে শপথভঙ্গ করাইতে পারি, তাহা হইলে আমি স্পষ্টই তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিব, যে, তোমরা দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিও না; এবং তাহা হইলে আমি আমার আত্মসমর্থনের দ্বারাই জাজ্ঞান্যমান এই অভিযোগ প্রমাণিত করিব, যে, আমি দেবতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু তাহা একেবারেই সত্য নহে, কেননা, হে আধীনীয়গণ, আমি যেমন দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, আমার অভিযোক্তারা কেহই তেমন করে না। আমি আমার বিচারভার তোমাদিগকে ও ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছি; আমার ও তোমাদিগের পক্ষে যাহা সর্বোত্তম, তাহাই বিহিত হউক।

(পাঁচশত একজন বিচারকের মধ্যে ২৮১ জন এই মত প্রকাশ করিলেন যে সোক্রেটাস অপরাধী, ২২০ জন বলিলেন, তিনি নির্দোষ।)

২৫। হে আধীনীয় নরগণ, তোমরা যে আমাকে অপরাধী স্থির করিলে, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই; না হইবার অনেক কারণ আছে; একটি কারণ এই, যে, তোমরা যে এই প্রকার করিবে, তাহা আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত নয়; আমি বরং উভয় পক্ষের মত-সংখ্যা দেখিয়াই অধিকতর বিস্মিত হইয়াছি; কেননা, আমি কখনও ভাবি নাই, যে, দুই-পক্ষের সংখ্যার পার্থক্য এত অল্প হইবে; আমি ভাবিয়াছিলাম যে উহা অনেক অধিক হইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে, যদি কেবল ত্রিশজন অপর পক্ষে মত

দিত, তবেই আমি মুক্তি লাভ করিতাম। সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, যে, আমি এখন মেলীটসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি; শুধু নিষ্কৃতি পাইয়াছি তাহা নহে, কিন্তু অতি সুস্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, যদি আন্স্‌টন ও ল্যুকোন আমার অভিযোক্তা হইয়া উপস্থিত না হইত, তবে সে এক পঞ্চমাংশ মতও পাইত না, সুতরাং তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইত।

২৬। সে তবে আমার প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে। বেশ; আমি তাহা হইলে, হে আধীনীয়গণ, উহার স্থলে কোন্ দণ্ডের প্রস্তাব করিব? অথবা ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, আমি যাহার উপযুক্ত, তাহাই প্রস্তাব করিব? আমি যে এমন কৃশিক্ষা পাইয়াছিলাম, যে, নিষ্কর্ষা হইয়া জীবন যাপন করি নাই, তজ্জন্ম আমি কিরূপ দণ্ডের উপযুক্ত হইয়াছি? অর্থদণ্ড, না কারাবাস, না নির্বাসন, না মৃত্যু? সাধারণ লোকে যাহা মূল্যবান্ জ্ঞান করে—অর্থ, পারিবারিক ঐক্য, সেনাপতিত্ব, জনসভায় বাক্পটুতা এবং অস্ত্রাশ্রয় পুরুষপদ, সমিতি ও দলাদলি, এই নগরে যাহা সর্বদাই গঠিত হইতেছে—আমি সে সমুদায়ই উপেক্ষা করিয়াছি; কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম, যে, আমি যেরূপ ধর্মভীরু, তাহাতে এই-সকল ব্যাপারে লিপ্ত হইলে আমার আর রক্ষা থাকিবে না; সুতরাং আমি এমনস্থলে যাই নাই, যেখানে যাইয়া আমি তোমাদিগের কিংবা আমার কোনই উপকার করিতে পারিব না; আমি বলি, যে, আমি তৎপরিবর্তে সেইখানেই গিয়াছি, যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে আমি প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া তোমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছি; আমি তোমাদিগের প্রত্যেককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, যে, তোমরা প্রথমেই নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য শ্রম করিও না; কিন্তু তোমরা কিরূপে জ্ঞানে ও ধর্মে পূর্ণতা লাভ করিবে, পূর্বে তাহারই জন্য যত্নবান্ হও; তোমরা এই পুরীর সম্বন্ধে ভাবিবার পূর্বে পুরীর কোনও বিষয় সম্বন্ধে ভাবিও না; অস্ত্রাশ্রয় বিষয় সম্পর্কেও তোমরা এই পন্থারই অনুসরণ করিও। এই-প্রকার জীবন যাপন করিয়া আমি কোন্ দণ্ড ভোগ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি? হে আধীনীয়গণ, যদি সত্য সত্যই আমাকে আমার উপযুক্ততাক্রম দণ্ডের প্রস্তাব করিতে হয়, তবে

বলিতে হইবে, আমি কোনও স্বখদেব্য দণ্ডেরই উপযুক্ত। সে দণ্ড এমন কোনও হিতকর বস্তু হইবে, যাহা আমার পক্ষে উপযোগী। তবে, যে হিতকারী দরিদ্র ব্যক্তি তোমাদিগকে উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে অবসর কামনা করে, তাহার পক্ষে কি উপযোগী? হে আধীনীয়গণ, সাধারণ ভোক্তাগারে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অপেক্ষা এমন ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই। অলুস্পির উৎসবে তোমাদিগের মধ্যে যে অস্থাবনে কিংবা অস্থগুগ্গহ রথ্যপরিচালনে জয়লাভ করিয়াছে, তাহাব অপেক্ষাও এই ব্যবস্থা ঐ ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কেননা, শেষোক্ত ব্যক্তি তোমাদিগকে স্বখী বলিয়া কল্পনা করিতে সমর্থ করে, আর আমি তোমাদিগকে স্তব্ধ হইতে শিক্ষা দিই; এবং তাহার আহ্বারের অভাব নাই, কিন্তু আমার আছে। অতএব আমি গ্রাবত: যে-প্রকার দণ্ডের উপযুক্ত, আমাকে যদি তাহাই প্রস্তাব করিতে হয়, তবে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে তোমরা সাধারণ ভোক্তাগারে আমার আহ্বারের ব্যবস্থা কর।

২৭। আমি অল্পকম্পা উদ্বেকের প্রয়াস ও মিনতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তোমরা যেমন আমাকে গর্ভিত ভাবিয়াছিলে, এখনও হয় তো আমি এই-প্রকার বলিতেছি - বলিয়া তোমরা আমাকে তাহাই মনে করিতেছ। কিন্তু, হে আধীনীয়গণ, তাহা সত্য নহে; প্রকৃত কথাটা বরং এই—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি ইচ্ছাপূর্বক কোনও মানুষের প্রতিই অত্যাচারণ করি নাই; কিন্তু আমি তোমাদিগকে তাহা বুঝাইতে পারি নাই, কেননা, আমরা অল্পকাল পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, যে, যেমন অস্ত্রাশ্রয় জনসমাজে নিয়ম আছে, তেমনি যদি তোমাদিগের মধ্যে এই নিয়ম থাকিত যে, যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহার বিচার কেবল একদিনেই শেষ হইবে না, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিতাম। কিন্তু এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার বিষয় অপবাদ দূর করা সহজ নহে। কিন্তু আমার যখন এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে, আমি কাহারও প্রতি অত্যাচারণ করি নাই, তখন আমি কখনই নিজের প্রতিও অত্যাচারণ করিব না; আমি

নিজের মুখে কখনই বলিব না, যে, আমি অকল্যাণকর দণ্ডের উপযুক্ত; স্বতরাং আমি কেন আমার প্রতি এমনতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে বলিব? মেলীটস যে দণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে, আমাকে বা সেই দণ্ড ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে? আমি তো জানি না, তাহা আমার পক্ষে ভাল না মন্দ? তাহার স্থলে আমি এমন কোনও দণ্ড আদর করিয়া গ্রহণ করিব, যাহা, আমি বেশ জানি, সকলের পক্ষেই অন্তঃপ্রস্তুত? আমি তাহাই প্রস্তাব করিব? কারাবাস? প্রতি বৎসর যে এগারজন কারাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আমি কেন তাহাদিগের দাস হইয়া কারাগারে জীবন যাপন করিতে যাইব? না আমি এই প্রস্তাব করিব, যে, আমার অর্থদণ্ড হউক এবং যতদিন উহা না প্রদত্ত হয়, ততদিন আমি কারাগারে আবদ্ধ থাকিব? কিন্তু আমি এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি, কেন আমি এমত প্রস্তাব করিব না, কেননা, দণ্ড দিতে পারি, আমার এত অর্থই নাই। তবে কি আমি নির্দাসনেব প্রস্তাব করিব? তোমরা হয় তো আমাকে এইরূপ দণ্ড দিতে সম্মত হইবে। কিন্তু আমি যদি এতই মুখ হই যে এ কথাটাও বুঝিতে পারি না, যে, তোমরা আমার একই পুরবাসী হইয়াও আমার কথাবার্তা ও যুক্তি তর্ক সহিতে পারিলে না, প্রত্যুত সেগুলি তোমাদিগের পক্ষে এমনই ভাববহ ও বিবেচ্যভাজন হইয়া উঠিল, যে, তোমরা এক্ষণে তাহা হইতে মুক্তি অন্বেষণ করিতেছ; আর অন্য দেশের লোক সেগুলি অক্লেশেই সহ্য করিবে—তাহা হইলে তো আমার জীবনের প্রতি আসক্তি একান্তই প্রবল। না, আধীনীয়গণ, তাহা কখনও হইতে পারে না। আমি যদি এই বয়সে এই পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াই এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে নির্দাসিত হইয়া জীবন যাপন করি, তবে সে জীবন আমার পক্ষে মধুরই হইবে বটে! কারণ, আমি বেশ জানি, যে, আমি যেখানেই যাই না কেন, এখানকার মত সর্বত্রই যুবকেরা আমার কথা শুনিবে। এবং যদি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিই, তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠগণকে বলিয়া আমাকে নির্দাসিত করিবে; আর, যদি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া না দিই, তাহা

হইলে তাহাদিগের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিবে।

২৮। এখন, কেহ হয় তো বলিবে, “ওহে সোক্রেটিস, তুমি কি আমাদিগের পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া নীরব ও নিষ্কর্মা হইয়া জীবনযাপন করিতে পার না?” কেন পারি না, তাহা তোমাদিগের সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া যাবপরনাই কঠিন। কারণ, যদি আমি বলি, যে, এরূপ করিলে ঈশ্বরের অবাধ্যতা করা হইবে, এই জ্ঞান আমি নিষ্কর্মা থাকিতে পারিব না, তাহা হইলে আমি মিথ্যা বিনয় করিতেছি ভাবিয়া তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে না। আবার, আমি যদি বলি, যে, তোমরা আমাকে যেমন আলাপ করিতে শুনিয়াছ, তেমনি প্রতিদিন ধর্ম ও অমর্ত্য বিষয়ে কথাবার্তা বলা ও আপনাকে ও অপরকে পরীক্ষা করাই মানবের পক্ষে মহত্তম সৌভাগ্য, এবং অপরীক্ষিত জীবন মানুষের পক্ষে ধারণযোগ্যই নয়,— আমি এরূপ বলিলে তাহা তোমরা আরও কম বিশ্বাস করিবে। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, আমি বলিতেছি, যে, ইহাই সত্য; যদিচ তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ নহে। অথচ কিন্তু আমি এমত ভাবিতেও অভ্যস্ত হই নাই, যে, আমি কোনওরূপ দণ্ডের যোগ্য। আমার যদি অর্থ থাকিত, তাহা হইলে আমি যত অধিক সম্ভব অর্থদণ্ডের প্রস্তাব করিতাম; কারণ তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি হইত না; কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে, আমার অর্থ নাই; তবে আমি যাহা দিতে সমর্থ, তোমরা যদি তাহাই দণ্ড করিতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। আমি হয় তো এক মিনা দণ্ড দিতে পারি; আমি তাহাই প্রস্তাব করিতেছি। হে আধীনীয়গণ, এই প্লাটোন, ক্রিটোন, ক্রিটবোলস এবং আপলডোরস আমাকে ত্রিশ মিনা প্রস্তাব করিতে অমরোধ করিতেছে, তাহারা বলিতেছে যে তাহারা ইহার প্রতিজ্ঞা হইবে; আমি তবে ত্রিশ মিনাই প্রস্তাব করিতেছি; এই অর্থের অন্য ইহারাই আমার যথাযোগ্য প্রতিজ্ঞা থাকিবে।

(বিচারকগণের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যকের মতানুসারে সোক্রেটিসের প্রাণদণ্ড বিহিত হইল।)

২২। হে আধীনীয় নরগণ, তোমরা দীর্ঘকাল লাভ করিতে পাবিলে না; অথচ যাহারা এই পুর্বীর প্রতি দোষারোপ কবিত্তে চাহে, তাহাদিগের নিকটে এই অল্প-কালের জন্ত তোমরা এই নাম ও নিন্দা উপার্জন করিলে, যে তোমরা জ্ঞানবান পুরুষ সোক্রাটীসকে হত্যা করিয়াছ। কারণ, জ্ঞানী হই বা না হই, যাহারা তোমাদিগের নিন্দা করিতে চাহিবে, তাহারা আমাকে জ্ঞানী বলিবেই বলিবে। তোমরা যদি অল্পকাল অপেক্ষা করিতে, তোমাদিগের বান্ধিত আমার মৃত্যু নিয়তি-বশে আপনাই উপস্থিত হইত। কেননা, তোমরা আমার বয়ঃক্রম দেখিতেছ; তোমরা দেখিতে পাইতেছে, যে, আমি জীবনপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াছি। আমি তোমাদিগের সকলকেই এই কথাগুলি বলিতেছি, তাহা নহে; কিন্তু যাহারা আমার প্রাণদণ্ডে মত দিয়াছে, তাহাদিগকেই এইরূপ বলিতেছি। এবং আমি তাহাদিগকে এ কথাও বলিতেছি,—বন্ধুগণ, তোমরা হয় তো ভাবিতেছ, যে, আমি যুক্তির অভাবেই পরাজিত হইলাম; অর্থাৎ আমি যদি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার অভিপ্রায়ে সকলই বলা ও সকলই করা উচিত বিবেচনা করিতাম, তাহা হইলে যে-প্রকার যুক্তি উপস্থিত করিতাম, তাহার অভাব-বশতঃই আমার প্রতি এই দণ্ড বিহিত হইল। কিন্তু এ কথাটা একেবারেই ঠিক নহে। আমি যুক্তির অভাবে পরাজিত হই নাই; কিন্তু অতিসাহসিকতা ও নিলজ্জতার অভাবেই পরাজিত হইয়াছি। আমি এমত ভাষায় তোমাদিগের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করিতে চাহি নাই, যাহা তোমাদিগের পক্ষে শ্রুতি-মধুর হইত; আমি তোমাদিগের সম্মুখে বিলাপ ও অশ্রুবর্ষণ ও এইরূপ অল্প কিছুই করি নাই, বা বলি নাই; আমি তাহা আমার পক্ষে একান্ত অযোগ্য মনে করি, কিন্তু তোমরা অপরের নিকটে এই সমুদায় শুনিতেই অভ্যস্ত হইয়াছ। ইহাও আমার পরাজয়ের কারণ। আমি আত্মসমর্পণকালে এমত বিবেচনা করি নাই যে বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া আমার কাপুরুষোচিত আচরণ করা কর্তব্য; এখনও আমি এ সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্তন করি নাই; আমি বরং কাপুরুষের মত বিলাপ ও অশ্রুপাতপূর্বক আত্মসমর্পণ করিয়া বাঁচিয়া

থাকা অপেক্ষা, আমি যেমন করিয়াছি, তেমনি আত্মসমর্পণ করিয়া মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিব। কেননা, কি বিচারালয়ে, কি-যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বা অপার কাহারও পক্ষেই এমত আচরণ কর্তব্য নহে, যে, যাহা-তাহা করিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। যুদ্ধে অনেক সময়ে স্পষ্টই এমত ঘটয়া থাকে, যে, পরাজিত ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া এবং শস্ত্রাধারিত শত্রুগণের চরণে ভূপতিত হইয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইতে পারে। এবং প্রত্যেক বিপদেই এমন অল্প অনেক উপায় আছে, যাহাতে যদি কেহ সকলই করিতে ও বলিতে সাহসী হয়, তবে সে মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, এইরূপে মৃত্যুক পরিহার করা কঠিন নহে, প্রত্যাগত পাপকে পরিহার করাই অধিকতর কঠিন; কারণ, পাপ মৃত্যু অপেক্ষা দ্রুতগামী। আমি বৃদ্ধ ও মন্থর-গতি বলিয়া এক্ষণে প্লথতর মৃত্যু আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে; আর, আমার অভিযোজ্যতা চতুর ও দ্রুতগামী; এজন্য তাহারা অধিকতর দ্রুতবাবনপটু পাপের পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। এবং আমি তোমাদিগের হস্তে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিবার জন্ত এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি; আর তাহারা সত্যসমীপে পাপ ও অন্ত্যায়ের দণ্ড ভোগ করিবার জন্ত প্রত্যাবর্তন কবিত্তেছে। আমি আমার দণ্ড আদরে গ্রহণ করিতেছি, তাহারাও তাহাদিগের দণ্ড আদরে গ্রহণ করিতেছে। যাহা যেরূপ ঘটবার, বোধ করি তাহা সেই-রূপই ঘটয়াছে; এবং আমার মনে হয়, এ-সমুদায় যথায় যোগ্যই বিহিত হইয়াছে।

৩০। হে আমার দণ্ডদাতৃগণ, অতঃপর আমি তোমাদিগকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেছি। কারণ, আমি এখন সেই অন্তিম কালে উপনীত হইয়াছি, যখন মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে; যখন মৃত্যুকাল আসন্ন, তখনই লোকে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া থাকে। বন্ধুগণ, তোমরা যাহারা আমাকে হত্যা করিতেছ, তাহাদিগকে আমি বলিতেছি, তোমরা আমাকে বধ করিয়া আমাকে যে দণ্ড দিতেছ, আমার মৃত্যুর পরেই তদপেক্ষা সহস্রগুণে কঠিনতর দণ্ড তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। এখন তোমরা এই ভাবিয়া এই কর্ম করিতে যাইতেছ, যে, তোমা-

দিগকে জীবনের কোনও হিসাব দিতে হইবে না ; তোমরা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে ; কিন্তু আমি-তোমা-দিগকে বলিতেছি যে ফল ইহার একেবারেই বিপরীত হইবে। আরও বহুতর লোকে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবে ; আমিই তাহাদিগকে এক্ষণে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতেছি, যদিচ তোমরা তাহা বুঝিতে পার নাই ; তাহারা আমা-অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ও নব্যতর ; সুতরাং তাহারা তোমাদিগের পক্ষে অধিকতর দুর্বল হইয়া উঠিবে, এবং তোমরাও তাহাদিগের প্রতি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইবে। যদি তোমরা ভাবিয়া থাক, যে, লোকে তোমাদিগকে তিরস্কার করিলে তাহাদিগকে বধ করিয়াই উহা নিবারণ করিবে, তবে তোমরা ঠিক ভাবিতেছ না ও ঠিক পথের সন্ধান পাইতেছ না। কেননা, অব্যাহতি লাভের এটা পথই নয় ; ইহা না সাধ্যায়ত্ত, না উৎকৃষ্ট ; প্রত্যুত সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুগম পন্থা এই যে, তুমি অপরের কণ্ঠরোধ করিও না, কিন্তু যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পার, আপনাকে সেইরূপ করিয়া গঠন কর। তোমরা যাহারা আমার দণ্ডবিধান করিয়াছ, তাহাদিগকে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া আমি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি।

৩১। আর, তোমরা যাহারা আমি নির্দোষ বলিয়া মত দিয়াছ, যতক্ষণ কাবাধ্যক্ষ একাদশ রাজপুরুষ কর্ত্রে ব্যস্ত থাকেন এবং যতক্ষণ না আমি সেই স্থানে গমন করি, যথায় আমাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে, ততক্ষণ, যে ঘটনা ঘটিল তৎসম্বন্ধে আমি তোমাদিগের সহিত আলাপ করিতে পারিলে আনন্দিত হইব। অতএব, বন্ধুগণ, তোমরা ক্ষণকাল আমার নিকটে অবস্থান কর, কেননা, যতক্ষণ সম্ভব, আমরা পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে পারি, তাহাতে কিছুই বাধা দিতেছে না। তোমরা আমার প্রিয় ; এইমাত্র আমার পক্ষে যাহা ঘটয়াছে, আমি তাহার অর্থ তোমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে চাই। হে বিচারপতিগণ,—তোমাদিগকে বিচারপতি বলিয়া সম্বোধন করাই সম্ভব—আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটয়াছে। আমি আজীবন দৈব ইন্দ্রিত পাইয়া আসিতেছি ; এত দিন উহা নিয়তই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, এবং আমি যদি অতি

তুচ্ছ বিষয়েও অন্তায় করিতে উদ্যত হইতাম, তবে প্রতিবাদ করিত। আর, আমার পক্ষে এক্ষণে কি ঘটয়াছে, তাহা তোমরা নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ ; এমন ঘটনা ঘটয়াছে, যাহা লোকে চরম বিপত্তি বলিয়া ভাবিতে পারে, এবং ভাবিয়াও থাকে। কিন্তু, আমি যখন প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বাহির হইলাম, যখন এইখানে বিচারালয়ে প্রবেশ করিলাম, কিংবা যখন আত্মসমর্থন করিতে লাগিলাম, তখন তাহার কোন স্থলেই, এই দৈব ইন্দ্রিত আমাকে বাধা প্রদান করে নাই। অথচ অনেক সময়েই অশ্রুশ্রবণে কথাবাৰ্ত্তার মধ্যে এমত হইয়াছে, যে, আমি যেই কথা বলিতে যাইতেছি, অমনি এই দৈববাণী আমাকে রোধ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাপারে উহা আমার বাক্য কিংবা কার্য কিছুই প্রতিবাদ করে নাই। আমি ইহার কারণ কি মনে করি ? তোমাদিগকে বলিতেছি। আমার পক্ষে যাহা ঘটিল, তাহা নিশ্চয়ই শুভ ; আমাদিগের মধ্যে যাহারা মনে করে, যে, মৃত্যু অশুভ, তাহারা স্নাত্তধারণা পোষণ করিতেছে। আমি ইহার মহা প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। কারণ, আমি যদি কোন না কোনও শ্রেয় লাভ করিতে না যাইতাম, তবে আমার চিরসহচর দৈব ইন্দ্রিত অবশ্যই আমার কার্যের প্রতিবাদ করিত।

৩২। আমরা এইরূপে বিচার করিলেও বুঝিতে পারিব, যে, মৃত্যু যে কল্যাণের কারণ, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মহতী আশা বর্তমান রহিয়াছে। কেননা, মৃত্যু এই দুইয়ের একটি—হয় মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং তাহার কোন বিষয়ের কিছুমাত্র অল্পভূতি থাকে না ; না হয়, লোকে যেমন সচরাচর বিশ্বাস করে, মৃত্যুর অর্থ আত্মার একপ্রকার পরিবর্তন এবং ইহলোক হইতে অন্তলোকে প্রস্থান। মৃত্যু যদি অল্পভূতির বিলোপ হয়, উহা যদি সেই ব্যক্তির স্বষ্টির মত হয়, যে নিশ্চিত হইলে স্বপ্ন অবশি দেখে না, তবে তো মৃত্যু একটা অত্যশ্চর্য লাভ। কারণ, যদি কোনও ব্যক্তিকে বরস্বরূপ এমত রজনী চাহিতে হয়, যে রজনীতে নিশ্চিত হইলে সে স্বপ্ন অবশি দেখিবে না, এবং সেই রজনীর সহিত তাহাকে যদি তাহাব জীবনের অত্র দিব ও রাত্রি তুলনা করিয়া বলিতে হয়, সে আপনাদের জীবনে কয় দিবস যামিনী এই রাত্রির অপেক্ষা অধিকতর সুখে ও

স্বর্ধূরূপে ধাপন করিয়াছে, তবে আমি বিবেচনা করি, যে, শুধু সাধারণ লোকে নয়, কিন্তু পারশ্বের মহারাজও দেখিতে পাইবেন, যে, অল্প দিবসের তুলনায় এইপ্রকার রাজ্যের সংখ্যা অতি অল্পেই গণনা করা যাইতে পারে। মৃত্যু যদি এইপ্রকার হয়, তবে আমি উহাকে লাভই বলিতেছি। কেননা, এই সংজ্ঞাহীনতার অবস্থায় অনন্তকাল এক রাজ্যের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। পক্ষান্তরে, মৃত্যু যদি ইহলোক হইতে অন্তলোকে মহাবাজা হয়, এবং একথা যদি সত্য হয়, যে, সেখানে উপরত সকলেই বাস করিতেছে, তবে হে বিচারপতিগণ, ইহা অপেক্ষা মহত্তর কল্যাণ আর কি হইতে পারে? যদি আমরা যমালয়ে উপনীত হইয়া ইহলোকের তথাকথিত বিচারকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই, এবং তথায় সেই-সকল সত্য বিচারক প্রাপ্ত হই, তাহারা, আমরা-শুনিতে পাই, পরলোকে বিচার করিয়া থাকেন—যদি তথায় আমরা মিনোস, ও রাতামাসুস, আইআকস ও ট্রিপ্টলেমস এবং অন্যান্য দেবসম্বল বীর পুরুষদিগকে দেখিতে পাই, তাহারা স্বীয় স্বীয় জীবনে ক্রায়বান বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে কি এই মহাবাজা একটা তুচ্ছ ব্যাপার নহে? অথবা অর্কেয়স ও মোসাইঅস এবং হীসিঅডস ও হমীরসের (Homer) সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় এমন কি আছে যাহা তোমরা দিতে না পার? এই-সকল কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে আমি তো পুনঃ পুনঃ মরিতে চাই। আমি যদি পরলোকে পালামিডীস ও টেলমোনতনয় আইআস এবং অন্যান্য তাহারা প্রাচীন কালে ক্রায় বিচারে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গ লাভ করিতে পারি, তবে তাহা কি অপূর্ণই হইবে; তাহারা ইহলোকে যে দুঃখ বহন করিয়াছেন, তাহার সহিত, আমি যাহা বহন করিলাম, তাহার তুলনা একটা উপেক্ষার বিষয় হইবে না। বিশেষতঃ আমি তথায় কামনার চরম চরিতার্থতা লাভ করিব—আমি এখানে যেমন লোককে পরীক্ষা করিতেছি, সেখানেও তেমনি সকলকে পরীক্ষা করিব, এবং দেখিব, কে প্রকৃত জ্ঞানী, এবং কে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানী নহে। হে বিচারপতিগণ, ট্রয়-সংগ্রামে গ্রীকবাহিনীর নেতা কিংবা অড্রাসেস্ বা সিফ্রাস অথবা

অপর যে লক্ষ পুরুষ ও রমণীর নাম করা যাইতে পারে, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইলে আমরা কোন ঐর্ষ্য না প্রদান করিতে পারি? সেখানে ইহাদিগের সহিত কালধাপন ও কথোপকথন এবং ইহাদিগকে পরীক্ষা করা কি অনির্বচনীয় আনন্দ বলিয়াই অল্পভূত হইবে! অন্ততঃ সেখানে তাহারা কখনই এজন্য কাহাকেও প্রাণে বধ করেন না। কারণ, ইহলোকবাসী অপেক্ষা তাহারা তথায় অন্তরূপে অধিকতর সুখে বাস করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে; যদি প্রচলিত কাহিনী সত্য হয়, তবে অধিকন্তু তাহারা অনন্তকাল অমর।

৩৩। হে বিচারপতিগণ, তোমাদিগেবও এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া কর্তব্য; তোমরা এই সত্য অন্তরে ধারণ করিও, যে, সাধুজনের পক্ষে কি জীবনে কি মরণে কোনই অমঙ্গল ঘটিতে পারে না; এবং দেবগণ তাহার জীবনের কোন বিষয়ের প্রতিই উদাসীন নহেন। আমার পক্ষে যাহা ঘটিল, তাহা আপনিই ঘটে নাই; আমি উজ্জলরূপে অল্পভব করিতেছি, যে, এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ও বিষয়দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করাই আমার পক্ষে শ্রেয় বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। এই জন্যই দৈব ইঙ্গিত আমাকে একবারও প্রতিনিবৃত্ত করে নাই, এবং আমি আমার দণ্ডদাতা ও অভিযোক্তাদিগের প্রতি বড় বিরক্ত হই নাই। তাহারা অবশ্যই যে ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমাকে দণ্ড দিয়াছে ও অভিযোগ করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাহারা আমার ক্ষতি করিবে বলিয়াই ভাবিয়াছিল। এই জন্য আমি তাহাদিগকে ক্রায়তঃই তিবন্ধার করিতে পারি। তথাপি আমি তাহাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা চাহিতেছি। হে বন্ধুগণ, আমার সম্মানেরা যখন যৌবনে উপনীত হইবে, তখন যদি তোমরা দেখিতে পাও যে, তাহারা ধর্ম অপেক্ষা অর্থ কিংবা অন্য কোনও বিষয়ের জন্য অধিকতর যত্নবান হইয়াছে, তবে তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদান করিও, ও আমি যেমন তোমাদিগকে দুঃখ দিয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে দুঃখ দিও; এবং যদি কিছু না হইয়াও তাহারা ভাবে যে তাহারা একটা-কিছু হইয়া বসিয়াছে, তবে আমি যেমন তোমাদিগকে ভৎসনা করিয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে এই বলিয়া ভৎসনা করিও, যে, যে-সকল বিষয়ে যত্নবান

হওয়া কর্তব্য, তাহাতে তাহারা যত্ববান্ নহে, ও প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠাবান্ না হইয়াও তাহারা মনে করিতেছে, যে, তাহারা একটা কিছু হইয়া পড়িয়াছে। যদি তোমরা এইরূপ কর, তবেই আমি নিজে ও আমার পুত্রগণ তোমাদিগের হস্তে সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এক্ষণে প্রস্থানের সময় উপস্থিত; আমি মরিতে চলিলাম, তোমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চলিলে; আমাদিগের মধ্যে কে কল্যাণতর পথে গমন করিল, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকলের পক্ষেই তাহা অপরিজ্ঞাত।

সমাপ্ত।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

চিত্রকর

(১ম)

ক।

সে ছবি আঁকত। কালো কালো একরাশ কৌকড়ানো চুলের আড়ালে বড় বড় আবেশভরা চোখ দুটি, ঘোবনের লাবণ্যে মণ্ডিত কমনীয় মুখমণ্ডল,—তাতে না ছিল আনন্দের আভা, না ছিল বিষাদের ক্লমছায়া। সবাই জানত—সে পাগল।

নাম ছিল তার সুনন্দ। পাহাড়ের কোল-ঘেঁসা ছোট্ট গ্রামখানির এক স্বদূর প্রান্তে একটা ঝরনার ধারে তার কুটার। পাখীর গান, ঝরনার কল্লোল, গাছের ছায়া, সবুজ মাঠের সোনালী ফসল,—চারদিকে কেবলি শোভা, কেবলি সঙ্গীত। ভোরে ও সন্ধ্যায় যখন কুয়াসার ধূসর আবরণ চারদিকে স্বপ্নলোক রচনা করত, ঝিঁঝিঁ-ভাকা নিঝুম রাত্রি ও নির্জন দ্বিপ্রহর যখন সুনন্দের নিঃসঙ্গ জীবনকে বিশ্বসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিত, সে তখন তারি মধ্যে তার সৃষ্টিছাড়া আনন্দের সন্ধান পেত, পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা আবছায়ার মতো তার অন্তরের কোণে ভেসে ভেসে উঠত—মনের মধ্যে আনাগোনা করত শুধুই রং আর তুলি, তুলি আর রং।

এই খাপছাড়া পাগলের কাছে কেউ বড় একটা ঘেসত না বটে, কিন্তু তার চিত্রবিদ্যার খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি রাজদরবার থেকেও প্রায়ই তার

কাছে ছবির জন্ত তাগিদ আসত; যখন তার খেয়াল হত পূর্ণোৎসাহে রাজার হুকুম তামিল করত, আবার যেদিন খুসী রাজার লোকজনদের কুটার থেকে তাড়িয়ে দিত।

খ।

সেদিন সারারাত বুষ্টির পর সকালবেলার মেঘভাঙা রোদে চারিদিক ঝলমল করছিল। মাঠের ভিজে ঘাস ও গাছের ভিজে পাতার ওপর ভোরের আলো ঝিকমিক করছিল। ঘুম থেকে উঠেই সুনন্দের সেদিন কি এক খেয়াল চাপল, সে তাড়াতাড়ি তুলি রং আর পট নিয়ে বাইরে একখানা চৌকী টেনে চুপচাপ করে বসল। দূরে গমের ক্ষেতে ভোরের হাওয়ার তরঙ্গলীলা চলছিল; মাঠের শেষে আকাশেব গায়ে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী—ঠিক ধূসর মেঘের মতো। নীচে যেখানে ঝরনার শাদাফুল একখানা কালো পাথরের ওপর ঝরঝর করে পড়ছিল, তারি আশেপাশে একটা ঝোপের মতো,—অনেকগুলো বনফুলের গাছ, তাতে রংবেরঙের অসংখ্য ফুল।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো সুনন্দ একদৃষ্টে ফুলগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ঝরনাফুলের পতনবেগে গাছগুলো একটু একটু কাঁপছিল, উৎক্ষিপ্ত জলকণা মুক্তাফুলের মতো পাতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল।

সুনন্দ স্বপ্ন দেখছিল,—যেন সেই ফুলগাছগুলোর মধ্যে অসংখ্য একটা সজীবতার সাড়া পড়ে গেছে, ঝরনার কলসঙ্গীতে যেন একটা আনন্দবার্তা জেগে উঠেছে, বাতাস যেন একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আবেশে পাগলের মতো ছুটছুটি করছে।

হঠাৎ সুনন্দ চেয়ে দেখল—লতা, পাতা, ফুল ও সবুজ শম্পাস্তরঙ্গের বিচিত্র বর্ণসম্ভারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক স্নানরী যুবতী! আফিমফুলের মতো তার রং, দুটি রক্ত-গোলাপের পাপড়ির মতো পাতলা পাতলা তার ঠোঁট দুটি। চাঁপার কলির মতো তার কোমল করাঙ্গুলি পাতার আড়ালে এদিক ওদিক ফুলের সন্ধান করছিল। বুকের আঁচলে জড়ানো একরাশ ফুল-কোমল বক্ষের তালে তালে মৃদু মৃদু কাঁপছিল।

সৌন্দর্য-দেবতার খেয়ালী পূজক সুনন্দ নির্বাক

বিশ্বয়ে ভক্তের মতো নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আকাশের স্থনীল চিত্রপটের ওপর কী এ-অপরূপ আলো! দূরে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে সোনার ঢেউ দিগন্তের নীলিমার গায়ে লুটিয়ে পড়ছে; ঝরণার জলরাশি অবিশ্রাম কলগীতিতে প্রবহমান, নীচে ফুল ও পাতার বাসন্তী-কুঞ্জ,— মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্যে বিকশিতা এক সুন্দরী তরুণী! বর্ষমুক্ত প্রভাতের তরুণসূর্য্য গলিত-স্বর্ণধারায় তার অভিষেক করছে, শীকরশীতল প্রভাতী হাওয়া ভুরু ভূতোর মতো তাকে ব্যঞ্জন করছে, ঝরণার স্বচ্ছ সলিলধারা আনন্দগানে তার কোমল চরণদুটি ঘোঁত করে বয়ে যাচ্ছে।.....

মুহূর্তের জ্ঞাত যুবতী তার বড় বড় চোখ দুটি তুলে চাইল। সুন্দর চমকে উঠল,—এবে শাস্তি!—তারি মতো বিশ্বপরিত্যক্তা এক হতভাগিনী!.....পুরাতন, ওগো চিরপুরাতন, অকস্মাৎ আজ এ কোন্ নবীনতার স্বমায় সুন্দর হয়ে এলে?

গ।

শাস্তি যখন সুন্দরের ঘরকন্নার কাজ গুছিয়ে নিল তখন গ্রামের সকলে ভাবল এবারে হয়ত পাগলের খেয়াল বদলে যাবে। কিন্তু তার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বরঞ্চ শাস্তির সৌন্দর্যের নেশায় সুন্দর যেন একেবারে মাতাল হয়ে উঠল, তার হাজার রকম সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের মধ্যে ছবি আঁকবার খেয়াল যেন দশগুণ বেড়ে গেল। এবারে শাস্তিই তার সকল ছবির আদর্শ। দিন নেই, রাত নেই, শাস্তিকে ঠায় বসে থাকতে হয়, আর সুন্দর পটের ওপর রং ফলাতে ফলাতে ভাবত—কেমন করে ঐ আঙুরের মতো নিটোল গাল দুটির লালিমা, ঐ ভাসা-ভাসা চোখের মদिर-মাধুর্য্য, ঐ যৌবনপুষ্পিত দেহের পেলব লাবণ্য তুলির রেখা-সম্পাতে পটের ওপর ফুটিয়ে তোলা যায়।

দেশে যতই সুন্দরের ছবির জয়জয়কার পড়ে গেল ততই নিত্য নূতন যশোলাভের তীব্র খেয়াল তাকে একেবারে পেয়ে বসল।

কিন্তু এদিকে যে শাস্তির নিষ্ঠুর চিন্তে পুজার অর্ঘ্যখালি অনাদরে শূন্য হয়ে যাচ্ছে, একাবিন্দু জলের পিপাসায় তার সমস্ত অন্তর যে চাতকের মতো হাহাকার করে মরছে

সেদিকে সুন্দরের দৃষ্টি দেবার অবসর ছিল না। তার সে শিল্পীর-চোখ যখন শাস্তির প্রতি-অঙ্গের রেখায় রেখায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিত, তখন নারীস্বের আহত মর্যাদার ক্ষোভে, হঃখে, কুণ্ঠায় শাস্তির বেপথু অন্তর অবনত হয়ে পড়ত।

দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো তারি বিচিত্র ভঙ্গীর প্রতি-কৃতিগুলোর দিকে তাকিয়ে শাস্তি ভাবত যেন তার রূপ-লাবণ্য তিলে তিলে, অপরূপ করে ঐ ছবিগুলো তার স্বামীর অন্তরে তার জায়গাটুকু সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে বসেছে। তার হুঁচোখ দিয়ে ঈর্ষ্যার আগুন ঠিকরে পড়ত,—কিন্তু ব্যর্থ সে আক্রোশ, নিষ্ফল সে মর্মস্বন্দ হাহাকার।

শাস্তির সকল মর্মবেদনাকে সার্থক করে যেদিন শুভ পুষ্পস্তবকের মতো একটি সুন্দর শিশু তার কোল জুড়ে বসল সেদিন তার অন্তরের প্রীতির অবরুদ্ধধারা মাতৃ-স্নেহের উচ্ছ্বসিত প্রবাহে শত মুখে উৎসারিত হয়ে উঠল।

সুন্দরের অন্তরে তখন অপত্যস্নেহের কোনো স্থান ছিল না। সেখানে সে সৌন্দর্য্য-দেবতার যে-রাক্ষসী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার বেদীমূলে দিনে দিনে পলে পলে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি উৎসর্গ করে সে রিক্ত হয়ে বসেছিল।

ঘ।

‘ওগো, আজ মাপ কর, শুধু আজকের দিন। খোকার বড্ড অসুখ, কেমন যেন ছটফট করছে।’

‘কিছুতেই তা’ হতে পারে না। আর দশদিন মাত্র বাকী। জানো, এ প্রদর্শনীতে রাজা স্থির করবেন, দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী কে।’

‘শুধু আজ—একটা দিন—একটা দিন আমায় ভিল্লে দাও। খোকা আমার যেন কেমন করছে।’

‘ও—ও কিছু নয়। আর সময় নষ্ট কোরো না বলছি। এ দশদিন তোমার একটুও ছুটি নেই।.....’

পাশের ঘরে শিশুর কাতরকণ্ঠ শোনা গেল,—‘মাগো—মা।’.....

‘ঐ!—শোন শোন! ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।’

‘কেবু আমার সময় নষ্ট করছ? ভালো হবে না বলে

রাখছি, শাস্তি! জানো তুমি আমার এ ছবির জন্ত দু'দশটা
ধোকাকে অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারি?.....'

স্বনন্দর চোখের দিকে চেয়ে শাস্তা শিউরে উঠল।
কাতরদৃষ্টিতে চেয়ে বলল—'ওগো তুমি অমন করে
চেয়োনো!—যাচ্ছি—চল!—হায় নিষ্ঠুর!.....'

পাশের ঘরে আবার কান্নার শব্দ শোনা গেল। স্বনন্দ
তাড়াতাড়ি শাস্তার হাত ধরে টেনে নিয়ে ছবির ঘরে কবাট
বন্ধ করে দিল।.....

'হাঁ, ঠিক হয়েছে। এবার হাতখানা মাথার দিকে
এমনি করে তুলে ধর। হাঁ, হাঁ, ঠিক এই রকম!.....আঃ;
ফের চোখে জল!—সব মাটি করবে দেখছি। চোখ মুছে
ফেল, ভালো করে মুছে ফেল।.....হাঁ, এবারে ঐ শাশীর
দিকে তাকিয়ে একটু হাস!.....'

পাশের ঘরে আবার কান্নার শব্দ শোনা গেল।.....
'আঃ, জ্বালালে! কি এক আপদই জুটেছে!—কোণের
জানালায় একটু কাঁক ছিল, স্বনন্দ তাড়াতাড়ি নেটা এঁটে
দিল।

সারাদিন বসে থাকবার পর ঠিক সন্ধ্যার কাছাকাছি
শাস্তি ছুটি পেল। পিঙ্করমুক্তা বিহঙ্গীর মতো থোকার ঘরে
ছুটে গিয়েই সে উচ্ছ্বসিতস্বরে কঁদে উঠল।

তখন অন্তগামী সূর্যের রক্তিম আভাষ গাছপালা বাড়ী-
ঘর রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। দূরে গ্রাম্য কৃষকদের গোহাল
থেকে রাশি রাশি ধোঁয়া উঠছে; গম-ক্ষেতের মাঝে সরু
পথ দিয়ে তখনো ছ'একদল গোমহিষ মন্থরগতিতে গৃহে
ফিরছে।

স্বনন্দ ভ্রমর হয়ে এই সাক্ষ্যদৃশ্য দেখছিল, এমন সময়
বাড়ীর ঝি হঠাৎ ছুটে এসে কান্দতে কান্দতে বলল—'ওগো
তুমি একটিবার এসে দেখে যাও, থোকা বুঝি আর নেই!'

'অ্যাঁ, কি বললে? থোকা নেই?—যাক, আপদ
চকেছে!—না—না, রোস, দেখি একবার!.....'

অসম্পূর্ণ ছবিখানার দিকে তাকিয়ে স্বনন্দ ণানিকক্ষণ কি
ভাবল।.....

'হাঁ, রোস!—যুতশিশুর ছবি—ঐ খানটায়—ঠিক
মানাবে!—দাঁড়াও ঝি, আমি কাগজ আর পেঙ্গিল নিয়ে
যাচ্ছি!.....'

ঙ।

'আজকের রাতই শেষ। কাল সকাল থেকে তোমাব
ছুটি। চেয়ে দেখদিকিন একবার ছবিখানার দিকে!—
সারা দুনিয়া খুঁজে এলেও এরকম আর একখানা
মিলবে না!—আজ আমাব কেবল বলতে ইচ্ছা হচ্ছে,—
ধন্য আমি! ওগো আমি ধন্য!... ..ওঃ কাল যখন রাত-
সভায় ছবির আবরণ খুলে ছবিখানা হাজার হাজার
লোকের সামনে তুলে ধবব, কল্পনা করতে পারো কি শাস্তি
কী সে কোলাহল জাগবে তখন!—তখন কি সবাই
একবাক্যে বলবে না যে দেশের সেরা শিল্পী—স্বনন্দ?.....
তুলির আর একটু স্পর্শ!—ঐখানে ঐ টল্টলে গালের
ওপর আর একটুখানি রং ফলানো!—তাব'র?—সব
স্বন্দর! সব সার্থক!—আজ আর রাত্তিরে আমি ঘুমাব
না শাস্তি!—ঠিক সকালবেলা সূর্যোদয়ের প্রথম সোনালী
আভাটুকু যখন ঐ কাচের শাশীর ভিতর দিয়ে তোমাব
মুখের ওপর এসে পড়বে, তখনি তোমার গালের গোলাপী
রংটুকু আমি ছবির ওপর ঠিক তুলে নিতে পারব।.....
ঐখানটায় সোফার ওপর তুমি ঘুমোও; মুখখানা শাশীটার
দিকে ঘুরিয়ে রাখো।—শুধু আজকের রাত, শাস্তি, কাল
সকাল থেকেই তোমার ছুটি!.....'

বাইরে ঘরের ছাদের ওপর দিয়ে কয়েকটা রাত্রিচর
পাখী হঠাৎ বিকট চীৎকার করে উড়ে গেল। সে শব্দে
এক মুহূর্তের জন্ত স্বনন্দ যেন একটু চমকে উঠল।.....

চারদিক নিস্তরঙ্গ। দেয়ালের গায়ে ঘড়ীটা ক্রমাগত
টিকটিক করছিল,—ক্রমে একটা—দু'টা—তিনটে বেজে
গেল। শাস্তির শীর্ণ দেহলতা তখন সোফার ওপর এলিয়ে
পড়েছে।

স্বনন্দেব চোখে ঘুম নেই। তার হাতে রঙের তুলি,—
কতক্ষণে সকাল হবে, কখন সে তুলির শেষ স্পর্শে ছবিখানা
সম্পূর্ণ করবে—অধীর আগ্রহে সে তারি প্রতীক্ষা করছিল।
ছবির গায়ে কক্ষের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল
করছিল—স্বনন্দ আনন্দ ও গর্বের বিহ্বল হয়ে নিপলক
দৃষ্টিতে তাই চেয়ে দেখছিল।

... ..ক্রমে পাঁচটা বেজে গেল। পূর্বাকাশে ধীরে
ধীরে স্নান দীপ্তি জেগে উঠল। স্বনন্দ তখন চাকুলে

অধীর। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে কেবলি দেখতে লাগল উদয়ের আর কতক্ষণ বাকী, কতক্ষণে সান্দীটার ওপর তক্ষণ সূর্যের প্রথম কিরণেরথা প্রতিফলিত হবে।...

আর দেবী নেই,—এক মিনিট—দু’মিনিট—তিন মিনিট!—তুলিতে রং মাখিয়ে কল্পিত বক্ষে পলকহীন দৃষ্টিতে স্নান শাস্তির ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চেয়ে রইল।

...কাচের সান্দীর ভিতর দিয়ে একটি সোনালী আলোর রেখা ধীরে ধীরে শাস্তির মুখের ওপর এসে পড়ল, মুহূর্তের জন্ত যেন তার বিবাদ-পাগুর মুখমণ্ডল স্নান হস্তচ্ছটা অচুরজিত হয়ে উঠল, মুহূর্তের জন্ত তার বিশীর্ণ গণ্ডের ওপর যেন প্রথম যৌবনের শোণিতোচ্ছ্বাস স্নিগ্ধ লালিমায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল!.....

ধীরে—ধীরে স্নান পটের ওপর তার তুলি স্পর্শ করল,—ছবির লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলে যৌবনের দীপ্তি একনিমেষে ফুটে উঠল, আর তারি সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিম সন্ধ্যা-কাশের শেষ রক্তিম আভাটুকুর মতো শাস্তির গণ্ডের ক্ষণিক লালিমাটুকু ধীরে ধীরে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল।.....

সার্বকতার আনন্দে স্নান পাগলের মতো চীৎকার করে উঠল,—‘নিয়েছি, নিয়েছি—ঠিক তুলে নিয়েছি!... এবার সব পরিশ্রম সার্বক—সব শেষ!.....শাস্তি, এবার তোমার ছুটি!.....’

অধীর উচ্ছ্বাসে ছুটে গিয়ে শাস্তিকে বক্ষে জড়িয়ে চুষন করতেই স্নান চমকে উঠল—শাস্তির ক্ষীণ তলতলা প্রাণ-হীন—অসাড়—শীতল!*

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

ছুঁচ ও তলোয়ার

(কবির নাম আবদুর রহিম, ইনি ইতিহাসের বৈরাম খাঁর পুত্র।)

বড় দেখে কভু ছোটোরে কোরো না হেলা,
ছোটো জিনিসের ছোটো ছোটো কাজ মেলা;
ছুঁচের যখন হ’য়ে পড়ে দরকার
তখন কি ভাই কাজে লাগে তলোয়ার?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* কোনও ফরাসী উপস্থাপকের পরিচ্ছেদ-বিশেষের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

চীনের শিকাগো

ছপে প্রদেশ।

রাজি আড়াইটা পর্যন্ত চেঙ-চাও জংসনের মোসাকের-খানায় কাটাইলাম। ঠিক যেন মোকামা টেননের আব-হাওয়া। খোলা মাঠে পড়িয়া রেলযাত্রীরা নিজে ঘাইতেছে বা উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিয়াছে। নিকটবর্তী হোটেল দোকানের হাল্লা শুনিতে পাইতেছি। দোভাষী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আহারের কি ব্যবস্থা হইবে? চীনা সরাইয়ে ত মাছমাংসের কারবার অত্যধিক।” দোভাষী বলিলেন—“ভাবনা কি? সম্মুখেই মুসলমানের সরাই আছে। মুসল-মানেরা হিন্দু আহাৰ্য্য দিতে পারিবে।” মুসলমানেরা শূকর খায় না। কিন্তু কনফিউশিয়ানধর্মীরা আহাৰ্য্যে বসিলে কোন বস্তু বাদ দেয় না। কাজেই চীনা মতে মুসলমানের খাদ্যে হিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে না। অবশ্য এখানে হিন্দু শব্দের অর্থ ভারতবাসী। হিন্দু নামে যে একটা ধর্মমত আছে তাহা ছনিয়ার কোন লোক জানে না। ইয়োরোপ-আমেরিকার কয়েকজন পণ্ডিত ছাড়া পাশ্চাত্যেরা হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। এমন কি মিশরীয়, জাপানী ও চীনা জনগণও হিন্দু নামক “সনাতন ধর্মের” নাম শুনে নাই।

পিকিঙ হইতে গাড়ী আসিল। এই গাড়ীতে হান্-কাও যাত্রা করিলাম। সকাল প্রায় দশটা পর্যন্ত হোনান প্রদেশেই আছি। পরে ছপে প্রদেশ সুরু হইল। হোনান ও ছপের সীমান্ত প্রদেশ পর্বতময়। উত্তর চীনের শস্ত-ভ্রামল বজার প্রান্তর আর দেখিতে পাইতেছি না। চারি-দিকে সবুজ ভূগমণ্ডিত অথবা প্রান্তরময় তরুহীন পর্বতশৃঙ্গ দেখিতেছি। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে গিরিজুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। প্রদেশ হইতে প্রদেশের আশ্রয় রাখিবার জন্ত এই পর্বতসমাকুল জনপদ বিশেষরূপেই ব্যবহৃত হইত। গাড়ী হইতে কোথাও কোথাও প্রাচীন দুর্গ-দেওয়ালের অংশ দেখা গেল।

মাঝুরিয়ায় প্রবেশ করিবার পর হইতেই ষ্টেশনে ষ্টেশনে শস্ত সৈন্য দেখিয়াছি। এই অঞ্চলেও দেখিলাম। শুনিতেছি ছপে প্রদেশের পাত্রী এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ

গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের পর্বতে বিহার করিতে আসেন। এক ষ্টেশনে কয়েক-জন খেতাজ গাড়ীতে উঠিলেন।

হুপে প্রদেশের পল্লী-কুটিরগুলি দরিদ্রতর বোধ হইতেছে। খড়ো চালা এবং মাটির দেওয়াল চোখে পড়িতেছে। খোলার ছাদ এবং ইটের দেওয়াল আর দেখিতেছি না। গো-বলদের ব্যবহার চীনের অন্তর দেখি নাই—এই অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে এবং শকটের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এখানকার ডুলিও কিছু নূতন ধরণের।

পাহাড়িয়া ভূমি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এখন হইতে চারিদিকে ধানের জমি। কোরিয়া ছাড়িবার পর ধাত্তক্ষেত্র দেখি নাই। আজ মধ্য চীনের উভয় সীমায় চিরপরিচিত উদ্ভিদের শোভা দেখিতে পাওয়া গেল। উত্তর চীনেব সর্বত্র বজরা, ভুট্টা এবং কান্ধুনের দৃশ্য বিরাজমান। নদী খাল বিল ইত্যাদি একাধিক পার হইলাম। জল সর্বত্রই ঘোলা। জেলের ডিম্বি, ধীবর-পল্লী ও কৃষক-কুটির দেখিয়া পূর্ববঙ্গের চিত্র স্মরণে আসে।

ধানিক পরে আধুনিক ধরণের কলকারখানাবহুল নূতন অট্টালিকার নগরাংশ দৃষ্টিগোচর হইল। বুঝিলাম হান্-কাও সমীপবর্তী। প্রাচীন ও মধ্যযুগের এশিয়া হইতে নবীনতম ইয়োরোপ-আমেরিকার আবহাওয়ায় উপস্থিত হইলাম। অল্প পরে ইয়াংসি-কিয়াঙ নদীর ধারে-ধারে চলিতেছি। নদীর উপর ষ্টিমার, সমুদ্রপোত, নৌকা ইত্যাদির গতিবিধি দেখিতেছি। কিনারায লোহালকড়, কাঠ, মালগুদাম ও কার্যালয়ের আবেষ্টন। চীনের শিকাগোতে আসিয়া উপস্থিত।

পিকিঙ হইতে ৭৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হান্-কাও অবস্থিত। ইয়াংসি-কিয়াঙের সমুদ্র-মোহনা হইতে এই স্থান প্রায় ৬০০ মাইল পশ্চিমে। বাঙ্গালীর পক্ষে এলাহাবাদ ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে অবস্থিত, শাং-হাই বন্দরের চীনারা হান্-কাওকে চীনের প্রায় সেই অংশে অবস্থিত বিবেচনা করিবে। ইয়াংসি-কিয়াঙ চীনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরার্ককে উত্তরচীন এবং দক্ষিণার্ককে দক্ষিণ-চীন বলা হয়। এই নদীকে আমাদের বিদ্য পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা চলিতে পারে। উত্তর চীন দেখা থাকিলে

দক্ষিণ চীন দেখা হয় না, আবার দক্ষিণ চীন দেখা থাকিলে উত্তর চীন দেখা হইল না। দুই চীনের লোকজন বাহ্যদৃশ্য প্রাকৃতিক আবেষ্টন বিভিন্ন। ভাবতবর্ষের আখ্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যও এইরূপই বিভিন্ন। ইয়োরোপ যে হিসাবে এক হইয়াও বহু, ভারতবর্ষও সেই হিসাবে এক হইয়াও বহু, চীনও সেই ধরণেই এক হইয়াও বহু।

হুপে প্রদেশের লোকসংখ্যা আড়াই কোটি। একটা প্রদেশই আধখানা বাঙ্গালা দেশ আর কি! স্তত্রাং ৪০ কোটি নরনারীব চীন দেখা কার্য একটা বিরাট ব্যাপার। হাতীর কান দেখিয়া হাতীর বর্ণনা করিলে একরূপ দৃশ্য মনে আসিবে, তাহার পিঠ দেখিয়া তাহার পরিচয় দিতে হইলে অল্প এক দৃশ্য মনে আসিবে। চীন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্বদা এই কথা মনে রাখা আবশ্যক।

কনসেশন-মহালা।

হোটেলের কামরায় বসিয়া দক্ষিণ দিকে ইয়াংসি-কিয়াঙের জল দেখিতে পাইতেছি। হোটেল হান্-কাও নগরে ফরাসী কনসেশনে অবস্থিত। পিকিঙের হোটেলের মত এই হোটেলও ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী জনগণের কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত। চীনারা এখানে বাবুরচি ও খানসামা। দুইজন ভারতবাসীকে কর্মচারী দেখিলাম—একজন পার্শী, অপর জন গোয়ানিবাসী খুস্তান। রাড্রে এক নূতন মাছ খাওয়া গেল। নাম “ম্যাগারিন” মাছ। ম্যাগারিন চীনাদের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর নাম। ইয়াংসি নদীর সর্বোৎকৃষ্ট মাছ বলিয়া ইহাকে খেতাজরা এই নাম দিয়াছে।

আমাদের দেশে গাড়োয়ান আব কুলীদিগকে যেমন কোনমতেই সন্তুষ্ট করা যায় না, চীনের প্রত্যেক নগরে ও ষ্টেশনে তাহাই দেখিতেছি। সেদিন কয়েক-জন জাপানী পর্যটকও চীনা-সমাজের এই দোষ উল্লেখ করিতেছিলেন।

রিকৃশতে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। হোটেলের আশে-পাশে ফরাসী কনসেশনের ভিতর নানা-প্রকার বিদেশী দোকান, ব্যাঙ্ক, মহাজন-সমিতি ইত্যাদি রহিয়াছে। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, আসবাব সবই যেন মার্সেইয়ের মত। এই অংশে থাকিলে চীনের কোন নগরে আছি মনে হয় না। সম্মুখে তরুশোভিত সুপ্রশস্ত বাঁধা-পথ। নদীর কিনারায এই বাঁধ। কলিকাতার চাঁদপাল-ঘাটের

নিকট গঙ্গার উপর গড়ের মাঠের রাস্তা যেক্রপ, হান্কাও নগরের এই বীধও সেইরূপ। ইহা চীনের 'গৌরব নয়—বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের আধিপত্যের চিহ্ন।

ফরাসী কনসেশন-মহাল্লার দুই ধারে আরও কনসেশন-মহাল্লা রহিয়াছে। একদিকে জার্মান ও জাপানী রাষ্ট্রদ্বয়ের আধিপত্য-ক্ষেত্র—অপরদিকে রুশ ও ইংরেজ রাষ্ট্রদ্বয়ের আধিপত্য-ক্ষেত্র। কনসেশন-মহাল্লা বা বিদেশী আধিপত্য-ক্ষেত্রের ভিতর পানীয় জলের কল, নর্দমা ইত্যাদি স্বাস্থ্য-রক্ষার আধুনিক ব্যবস্থা আছে।

ইংরেজ কনসেশন চীনা নগরের সংলগ্ন। এইখানে দেখিলাম বহু শিশু সৈন্ত পাহারাওয়ালার কার্যে নিযুক্ত। লাল-পাগড়ীওয়ালা ভারতীয় গ্রহরী পিকিঙের ইংরেজ-মহাল্লায়ও দেখিয়াছি। চীনারা ভারতবাসীকে সাধারণতঃ এইরূপ বরকন্দাজ, দারবান্ ও পাহারাওয়ালার ভাবেই জানে। এই শ্রেণীর লোক হইতে অনেকসময়ে চীনা জনসাধারণ নির্যাতন ভোগ করিয়া থাকে। কাঞ্জাই ভারতবাসীর নামে চীনের লোকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করে। চীনের যত স্থানে এইরূপ বিদেশী কনসেশন-মহাল্লা আছে সেই-সকল স্থানে ন্যূনাদিক পরিমাণে ভারত-বিদ্বেষ জন্মিয়াছে।

একটা রাস্তায় দেখিলাম তড়িতের বাতিতে রাত্রি গুল্জার হইয়া আছে। ইয়োরোপ-আমেরিকার প্রাণালীতে দোকানে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে। এই রাস্তার পরেই চীনাদের স্বদেশী নগর। দোভাষী বলিলেন—“রাস্তার উপর যে-সকল বড় বড় গৃহ দেখিতেছেন এইগুলি মাত্র দুই তিন বৎসরের জিনিষ। ১৯১১ সালে বিপ্লবের সময়ে হান্কাও সহরের প্রায় সকল গৃহই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।” চীনের আধুনিক ইতিহাসে হান্কাও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কারণ এইখানেই স্বরাজতন্ত্রীরা মাঞ্চুসম্রাটের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম খড়্গা ধারণ করেন। আজও এই অঞ্চলে স্বরাজবাদীগণের দল অতিশয় প্রবল। চীনের নানা স্থান হইতে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের জন্ত আন্দোলন পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু হান্কাওবাসীরা এই আন্দোলনে বাধা দিতেছে।

কনসেশন সহরের রিক্শ চীনা সহরে প্রবেশ করিতে পারে না। চীনা সহরের রিক্শ কনসেশন সহরে আসিতে

পায় না। ইহার নাম “নিজ বাসভূমে পরবাসী।” হোটেল হইতে যে বিক্শতে বাহির হইয়াছিলাম, চীনা সহরের সীমান্তে আসিয়া তাহা ছাড়িতে হইল। এইবার চীনা সহরের রিক্শতে বসি গেল। দুই সহরের আবহাওয়া, আবেষ্টন, রাস্তা ঘাট, বাড়ীঘর ইত্যাদিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই অঞ্চলে পথগুলি এত সঙ্কীর্ণ যে রিক্শ চলাও কঠিন। দোভাষী বলিলেন—“আজকাল এখানে যতটা পরিষ্কারপবিচ্ছন্নতা দেখিতেছেন তাহা পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরে দেখিতে পাইতেন না।”

নদীর ধারের বড় রাস্তার উপর ব্যবসায়ী-পরিষৎ-সমূহের গৃহ অথবা কনুলাদির কার্যালয়। নদীতে আমেরিকান, জাপানী, চীনা ও অন্যান্য জীমার এবং জাহাজ ভাসিতেছে। সমুদ্র হইতে প্রায় ৬০০ মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত অর্থবধানের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি জগতের আর কোন দেশে আছে কিনা জানি না। হান্কাও এই কারণে জগদ্বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। অপরদিকে হান্কাও চীনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিক হইতেই হান্কাও সহরে আসা যাওয়া করা যায়। ফলতঃ আন্তর্জাতিক-বিষয়েও হান্কাও প্রধানতম কেন্দ্র। এই দুই কারণে বিদেশী বণিকগণ হান্কাও নগরের কনসেশন-মহাল্লাকে বিশেষরূপে উন্নত করিতে যত্নবান্।

বস্তুতঃ ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার জন্তই বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ চীনসম্রাটের নিকট প্রধান প্রধান কেন্দ্রে খানিকটা ভূমি চাহিয়া লইতেন। এই ভূমির উপর তাঁহারা নিজেদের কার্য চালাইবার উপযুক্ত ঘরবাড়ী, জেট, মালগুদাম, ইত্যাদি নির্মাণ করিবাব ক্ষমতা পাইতেন। বিদেশীরা সহজে এই-সকল অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চীনসম্রাট ইহাদের কামানবন্দুকের প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নানা সময়ে নানা জাতিকে এইরূপ অধিকার বা Concession বিতরণ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য বাণিজ্য-বিষয়ক অধিকার প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় এবং আইন-বিষয়ক অধিকারও প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ যে যে নগরের মধ্যে কনসেশন-মহাল্লা আছে সেই-সকল নগরের এই অঞ্চল যথার্থই চীনসরকারের বহিভূত। কনসেশন-ভূমিতে এবং পরাধীন ভূমিতে বিশেষ পার্থক্য নাই।

হংকঙ ইংরেজের অধিকৃত পুরা পরাধীন ভূমি। সেইরূপ পোর্টআর্থারও পুরা পরাধীন ভূমি। কিন্তু টিনসিন, হ্যানকাও, শাংহাই ইত্যাদি ৪০।৫০ কেন্দ্রে কনসেশন-ভূমি মাত্র আছে। এই ভূমির উপর কোন এক বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকার নাই। বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ সমবেত হইয়া সেই ভূখণ্ডের শাসন করিয়া থাকেন—কিন্তু চীনা সরকারের পক্ষে হংকঙ ও পোর্টআর্থার ইত্যাদি যেকোন, এই-সকল কনসেশন-ভূমিও প্রায় সেইরূপ।

পিকিঙে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের কনসেশন ভূমি নাই। এই সহরের এক অংশে তাঁহাদের সকলের দূত ও প্রতিনিধিগণের জন্ত কার্যালয়ের উপযোগী স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। এই অংশে বিদেশী ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত বাড়ীঘর দেখা যায় না। একমাত্র সরকারী কাছারি এবং দূতগণের বাসগৃহ এই অংশের বিশেষত্ব। পিকিঙ চীনের রাষ্ট্রবেস্ত্র, এইজন্ত বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের কার্যালয় এবং বাসগৃহ পিকিঙেই অবস্থিত। ওয়াশিংটনে, লণ্ডনে, বার্লিনে, তোকিওতে, পারীতে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকেন্দ্রে এই ধরনের দূত-ভবন আছে। রাষ্ট্রদূতগণ স্বকীয় সরকারের প্রতিনিধি বা ডেলিগেট-স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অতিথিভাবে বাস করেন। এইজন্ত দূতভবনকে লেগেশন (Legation) বা প্রতিনিধি-সৌধ বা অতিথিশালা বলা হইয়া থাকে।

ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মানি ইত্যাদি প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিগণ তাঁহাদের স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রতিনিধি-ভবন-সমূহকে সাধারণ চোখেই দেখিয়া থাকেন। এই-সকল প্রবল দেশে লেগেশন-গৃহগুলির প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শিত হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত সম্বন্ধে সভ্য রাষ্ট্রের আতিথ্য আদব কায়দা যেকোন হওয়া উচিত তাহার বেশী কিছু করা হয় না। কিন্তু পিকিঙে বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের ভবন চীনা সরকারের কার্যালয়-সমূহ অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রতিনিধিগণের জন্ত একটা জনপদ স্বতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। এই জনপদে একটা লেগেশন-সহর বা অতিথি-নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এরূপ লেগেশন-সহর হুনিয়ায় আর কোথাও নাই। লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় দূতভবন অবস্থিত। তোকিওতেও কোন এক স্বতন্ত্র জনপদের মধ্যে সকল

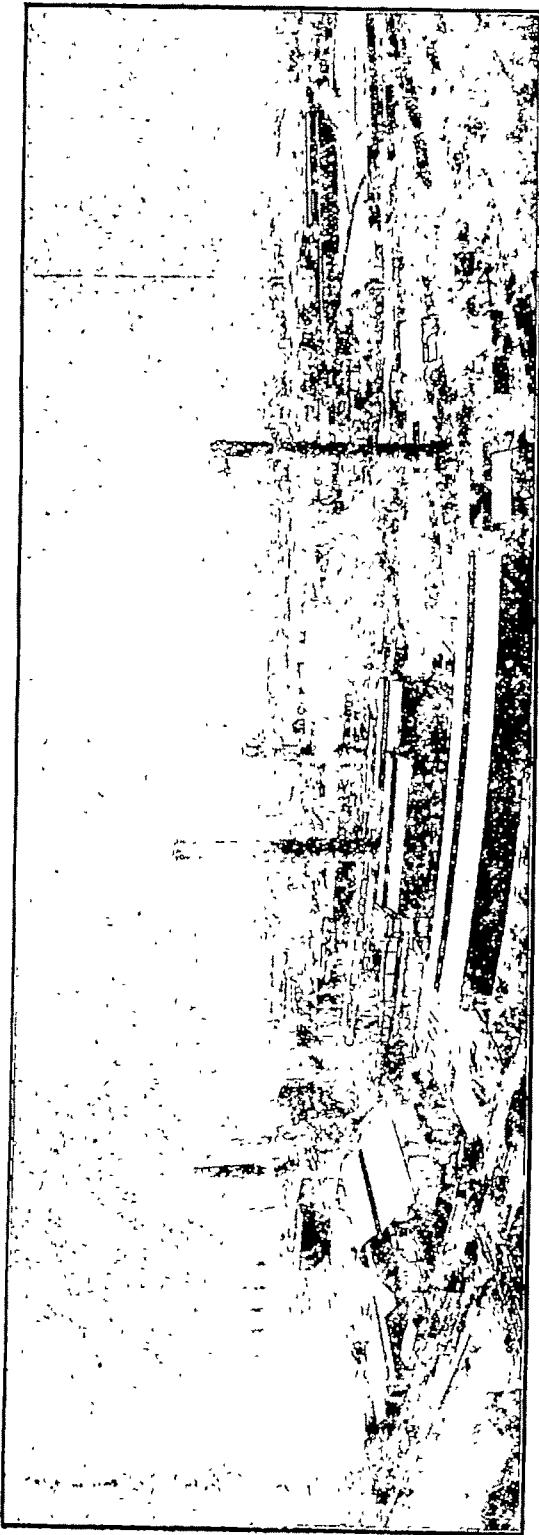
রাষ্ট্রদূতের ভবন নাই। কিন্তু পিকিঙে যাহা দেখিয়াছি হ্যানকাওর কনসেশন-মহালা হইতে তাহাকে গৃহীত করা কঠিন। কনসেশন-ভূমিতে বাণিজ্যিকধিকারের সঙ্গে বিদেশীরা অন্যান্য যতপ্রকার অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন, পিকিঙের লেগেশন-ভূমিতে চীনা সরকারের অতিথিমাত্র হইয়াও তাঁহারা প্রায় সেই-সবল তদ্বিবাহিত ভোগ করিতেছেন।

হ্যান-ইয়াঙে লৌহ-বারখানা।

ইয়াংসি পূর্বে-পশ্চিমে প্রবাহিত। হ্যানকাওয়ের অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে উচাঙ নগর অবস্থিত। উচাঙ ছপে প্রদেশের রাষ্ট্রবেস্ত্র। প্রাচীনতম বাল হইতেই উচাঙ চীনা সমাজে প্রসিদ্ধ। তিনহাজার বৎসর পূর্বেও এবং কনফিউশিয়াসের আমলে এই জ্ঞানের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্যাগোডা, মন্দির এবং অন্যান্য অট্টালিকা অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। ১২১১ সালের বিপ্লবে হ্যানকাও নগরের মন্দিরগুলি ধ্বংস হইয়াছে—কিন্তু উচাঙের কতিপয় প্যাগোডা দণ্ডায়মান আছে।

এতদিন উচাঙই প্রধান ছিল—হ্যানকাও মাত্র একটা ধীর-পল্লীরূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী রাষ্ট্রের কনসেশন এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর ইংরেজেরা সর্বপ্রথম এই আধিপত্য ভোগের অধিকার পান। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে হ্যানকাও উচাঙকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—এমন কি সমুদ্রবন্দর শাংহাইকেও পরাস্ত করিতে অগ্রসর। জাপানের ইয়োকোহামা, ওসাকা এবং কোবে যেকোন অল্পকালের ভিতর ক্ষুদ্র উন্নতির সাক্ষী, মধ্যচীনের হ্যানকাও নগরও সেইরূপ।

চীনারা হ্যানকাওকে নয় প্রদেশের প্রবেশদ্বার-রূপে বর্ণনা করিয়া থাকে। চীনের আন্তর্দেশিক বাণিজ্যে ইহার মূল্য এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ শিকাগো যেকোন ইয়াক্সিহানের বিরাট বাণিজ্যবেস্ত্র, হ্যানকাও সেইরূপ চীনের ভিতরকার সর্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। সম্প্রতি হ্যানকাও হইতে কাণ্টন পর্যন্ত ১৮০০ মাইল বিস্তৃত রেলপথ নির্মিত হইতেছে। তাহার প্রভাবে



হানকাও লোহ-কারখানা

হানকাও আরও উন্নত হইবে। অধিকন্তু জলপথে স্বল্প দেশের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সংস্কৃতি আছে।

হানকাও নগরের শিল্প-কারখানা নগর্য নয়। প্রাচীন ধরণের নানা শিল্প-কারখানা উচাঙ-হানকাও জনপদে বহু কাল হইতেই আছে। আধুনিক রীতিবদ্ধ কারখানাও বর্তমান যুগে স্থাপিত হইয়াছে। বয়নক্যাক্টরি, দিয়াশলাই-ফ্যাক্টরি, তামাক ফ্যাক্টরি ইত্যাদি কারবারে বাষ্পের ব্যবহার এবং যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তিত। এই-সমুদয়ের কোন কোনটা বিদেশী ধনীদিগের সম্পত্তি—চীনাগের অধীনেও বহুসংখ্যক নব্য-কারবার চলিতেছে। বস্তুতঃ এই-সকল স্বদেশী শিল্পের প্রভাবে বিদেশী দ্রব্যের আমদানি চীনে অনেকটা কমিয়াছে। এই হিসাবে চীনাগের অবস্থা আশাপ্রদ সন্দেহ নাই।

চীনের মধ্যে একটিমাত্র লোহ-কারখানা আছে।

তাহাও এই জনপদেই অবস্থিত। স্থানের নাম হানকাও-ইয়াঙ। ইহার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও এঞ্জিনিয়ার ত্রীমুন্ট উ (Woo) মহাশয়ের সঙ্গে আমেরিকা হইতে হনলুলু আসিবার সময়ে আলাপ হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত হানকাও-ইয়াঙ যাত্রা করিলাম।

কুশ-কনসেশনের ঘাটে একটা ক্ষুদ্র ষ্টীমলাঞ্চে বসি গেল। ইহা লোহকারখানা কোম্পানীর সম্পত্তি।

এখান হইতে ১৫মিনিটে হানকাও-ইয়াঙে পৌছিলাম। প্রথমে ইংরেজ-কনসেশনের ঘাট, বাঁধ এবং অট্টালিকা-সমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। পরে চীনা সহরের ঘাট এবং বাড়ী ঘর দেখিতে পাইলাম। সর্বত্রই ষ্টীমার, জাহাজ ও নৌকার গতিবিধি দেখিতেছি। যতই চীনা মহান্নার দিকে অগ্রসর হইতেছি ততই স্বদেশী বণিক-তরগীর সংখ্যা বেশী দেখিতেছি। আমরা গঙ্গার উপর পাটনাই নৌকা, ঢাকাই নৌকা ইত্যাদির সারি দেখিয়া থাকি। ইয়াংসি-বক্ষে সেইরূপ বিভিন্ন চীনা প্রদেশের স্বদেশী নৌকা দেখিলাম। এই সকল "Junk"এর ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক নাম আছে।

হানকাও হইতে হানকাও-ইয়াঙ বাইতে হইলে নদীর উপর উল্লান চলিতে হয়। লাঞ্চে একসঙ্গে দুই কিনারার দৃশ্যই দেখিতে পাইতেছি। ইয়াংসির প্রস্থ এখানে দুই মাইল হইবে। উচাঙের পারে অনতিদূরে পাহাড় দেখা যায়—

সহবটা ঘেন পাহাড়েব পাদদেশে অবস্থিত, পুৰাতন নগর-প্রাচীরও দেখা গেল।

ক্রমশঃ অগণিত বণিক-তরলীব সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। এইগুলি স্থানকাণ্ডের পারেই দেখিতেছি। চীনেব এক প্রসিদ্ধ নদী এই স্থানে ইয়াংসিতে মিশিয়াছে। তাহার নাম স্থান। দুয়ের সঙ্গমস্থলে সময়ে সময়ে ৩০,০০০ এমন কি ৪০,০০০ নৌকাও বাঁধা থাকে। ইয়াংসিতে বেশীক্ষণ থাকা নৌকা-সমূহের পক্ষে নিরাপদ নয়। এইজন্য মাঝিরা এই দ্বিতীয় নদীর কূলে কূলে লঙ্ঘন করিয়া মাল-বিনিময় করে। এত নৌকা সমবেত হয় যে ৫১৬ মাইল পর্যন্ত ইহাদের সারি দেখা যায়। লোক হইতে বুঝিলাম যেন এই স্থান-ইয়াংসি-সঙ্গমে মাংসলের জঙ্গল দেখিতেছি। এই বিরাট মাংসল-জঙ্গল দেখিলেই চীনাঙ্গের স্বদেশী আমদানি রপ্তানির পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

স্থান-ইয়াংসির সঙ্গমেই Iron and Steel Works অবস্থিত। এইখানে একটা পাহাড়ের উপর পুরাতন মন্দির-সদৃশ অট্টালিকা দেখা গেল। বিপ্লব পক্ষীয় সৈন্তগণ ১৯১১ সালে এই পাহাড়ে এক বড় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। স্থান-ইয়াংসি গোলা-বাক্সের কারখানা এবং ইটের কারবারও আছে।

লোহকারখানা প্রায় বিশ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। আজকাল এখানে ২৫০০ শ্রমজীবী কর্ম করে। বিদেশী ওস্তাদ বা অধ্যক্ষ একজনও নাই। প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে জার্মান এঞ্জিনিয়ার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনা যুবকগণ কর্ম করিতেছেন। ইহাদের নায়কতায় কারখানার সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র শিল্প-বিদ্যালয়ও পরিচালিত হইতেছে। রেলের লাইন, সেতুর বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি প্রস্তুত করাই এই কারখানার উদ্দেশ্য; এঞ্জিন তৈয়ারি করা হয় না।

কর্মকর্তারা বলিলেন—“আপনাদের সাক্ষিতে তাতা-প্রতিষ্ঠিত যে কারখানা আছে তাহার তুলনায় আমাদের এই কারবার খেলানার সামগ্রী মাত্র।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“স্থান-ইয়াংসি এই কারবার খুলিবার কারণ কি?” উ বলিলেন—“উচাঙ প্রদেশের শাসনকর্তার খেয়াল বলা যাইতে পারে।

এখান হইতে কয়লার খাদ ১০০ মাইল পশ্চিমে এবং লোহার খনি প্রায় ৭০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। কাজেই ইহাদের মধ্যবর্তী কোন কেন্দ্র কারখানা স্থাপন করা যুক্তি সম্মত বিবেচিত হইয়াছিল। শাসনকর্তা বুঝিলেন তাঁহার রাজধানীর সম্মুখে এই নব্য-কারবার খুলিলে উচাঙ-স্থানকাও জনপদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।”

এই কারবার হইতে এখনও লাভ বাহির হয় নাই। আজ ইংরেজের নিকট কর্তারা টাকা ধার লইতেছেন, কাল জার্মানদের নিকট ধার লইতেছেন। এক্ষণে জাপানের টাকাই বেশী খাটিতেছে। কাজেই জাপানের প্রভাব ইহা পরিচালনায় বিশেষ লক্ষিত হয়। ইংরেজ জাপানকে এইরূপ অনেক কারণে ইয়াংসি অঞ্চলে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করিতেছেন।

চীনের ভিতর ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ, আমেরিকান ও জাপান রাষ্ট্রসমূহ নানা স্থানে রেলপথে নির্মাণের অধিকার পাইয়াছেন। তাঁহারা এই কারখানা হইতে সকল-প্রকার সরঞ্জাম খরিদ করিতে বাধ্য। এইরূপ চুক্তি আছে বলিয়া এখানকার মাল পড়িয়া থাকে না। চীনা সরকার এই উপায়ে কারখানাকে “সংরক্ষণ” করিতেছেন। এই চুক্তি না থাকিলে বিদেশী রেল-মহাজনেরা তাঁহাদের স্বদেশ হইতেই লোহালকড় আনাইতেন। ভারতীয় রেল-কোম্পানীরা বিলাত হইতেই মাল আনাইয়া থাকেন। সম্প্রতি তাতার কারখানা বিলাতী কারখানাগুলির প্রতিযোগী হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় কে জয়ী হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত।

চীনের শুন-কর ও রাজস্ব বিভাগ।

দুইজন ইয়াক্সিব সঙ্গে আলাপ হইল। একজন আকর-তত্ত্ববিৎ, দশ-বার বৎসর কাল চীনের নানা স্থানে খনন-কার্যে নিযুক্ত আছেন; অপর-জন চীনা সরকারের শুন-কর বিভাগে কর্মচারী।

চীনে কর আদায় করা এক বিষয় কাণ্ড। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি অনুসারে গবর্নমেন্টের কার্য-তালিকা অভ্যস্ত ছিল। কাজেই অল্প মাত্র কর পাইলেই গবর্নমেন্টের খরচ চলিয়া যাইত। বিভিন্ন

প্রাদেশিক গবর্নেন্ট এবং জেলা-গবর্নেন্টগুলি মূল গবর্নেন্টের অধীনতা বেশী স্বীকার করিতেন না। এদিকে তাঁহারাও জনসাধারণ হইতে অল্পমাত্র খাজনা পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। মধ্যযুগে ইয়োরোপে এবং ভারতবর্ষেও অনেকটা এই অবস্থা ছিল।

চীনে আজও সেই অবস্থা রহিয়াছে। প্রদেশ-সমূহ এক-প্রকার পরস্পর স্বাধীন বলিলেই চলে। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে মাল চালান করিতে হইলে ব্যবসায়ী-গণকে শুদ্ধ দিতে হয়। সকল প্রদেশ যে এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত সেই ধারণা জন্মে নাই। অধিকন্তু এক এক প্রদেশে এক এক নিয়ম প্রচলিত। তাহার উপর শুদ্ধ আদায় হইলে তাহা অনেক সময়ে সরকারী কোষাগারে পৌঁছে না।

এই-সকল অস্ববিধা নিবারণ করিবার জন্ত চীনা গবর্নেন্টকে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরেজ কর্মচারী এক বিভাগের কর্তা—উহা Salt Gabelle বিভাগ। এই ব্যক্তি পূর্বে ভারতবর্ষে কর্ম করিতেন—এক্ষেণে চীনে রহিয়াছেন। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা বিদ্যালয়-স্বরূপ। এইখানে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে কর্মচারীরা মিশর, পারস্য, চীন ইত্যাদি দেশে কর্ম প্রাপ্ত হন।

ইংরেজ কর্মচারীর অধীনে ছুন-কর বিভাগে যথেষ্ট শ্রমশীলা আসিয়াছে—চীনা স্বরাজের ধনাগমও বাড়িয়াছে। চীনাগের আর-একটা রাজস্ববিভাগ ইংরেজের অধীনে বহুকাল হইতে পরিচালিত হইতেছে। বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের বণিকগণ সমুদ্রপথে চীনের নানা বন্দরে মাল আমদানি করে। তাহাদের উপর Custom-Duty বা শুদ্ধ বদান চীনাগের রীতি। কিন্তু এই শুদ্ধ আদায় করিয়া উঠা চীনাগের ক্ষমতায় কুলায় নাই। এই কারণে Maritime Custom অর্থাৎ সামুদ্রিক শুদ্ধ বিভাগ ইংরেজ কর্মচারীদের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজের শাসনে আসিয়া শুদ্ধের পরিমাণ যৎপরোনাস্তি বাড়িয়াছে। এই দুই বিভাগে আজকাল প্রায় ২১৩ হাজার ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-শাসিত দেশ; চীনের স্বরাজও কি ব্রিটিশ-শাসিত নয়? আবার শুনিতেছি ভূমিকর বিভাগও নাকি ইংরেজের হস্তে প্রদত্ত হইবে। যাহা হউক,

চীন সরকার অন-তেন-প্রকারেণ টাকা ত আদায় করিতেছেন। কিন্তু এই ধন তাঁহার কোষাগারে থাকিতে পায় কি? এবিষয়ে চীনের দুর্ভাগ্য কম নয়। ছুন-কর এবং আমদানি-কর উভয়ই বিদেশী উত্তমর্গগণের নিকট বদ্ধক রহিয়াছে। ১৮২৪ সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে চীনগবর্নেন্ট পাশ্চাত্য দেশে টাকা ধার লন। তাহার পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সার নামক স্বদেশ-সেবকেরা বিদেশীদিগকে চীন হইতে তাড়াইবার আয়োজন করেন। সেই প্রয়াস বিফল হয়। পক্ষান্তরে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ চীন সরকারের নিকট Indemnity বা ক্ষতিপূরণ চাহেন। সেই টাকা দিবার ক্ষমতা চীনাগের ছিল না। কাজেই উহাও ঋণ। তাহার পরে দেশের মধ্যে রেল প্রতিষ্ঠা এবং স্থশাসনের বন্দোবস্ত করিবার জন্তও টাকা আবশ্যক হয়। এই টাকাও বিদেশের উত্তমর্গগণ হইতেই আসিয়াছে। অবশেষে ১৯১১ সালে স্বরাজ স্থাপিত হইবার পর শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্ত বিরাট ঋণ গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেকবার টাকা ধার দিবার সময়ে বিদেশীরা যথোচিত Security বা জামিন বদ্ধক চাহিয়াছেন। চীনের রাজস্ববিভাগ চিবকালই অকর্মণ্য। বিদেশীরা বলিলেন “তোমাদের অমুক অমুক বিভাগে যত আয় হইবে সবই বদ্ধক রাখ। অধিকন্তু ঐ-সকল বিভাগ পরিচালনাও বিদেশী কর্মচারী নিযুক্ত কর।” চীন সম্মত না হইয়া কি করিবেন?

ঐবিনয়কুমার সরকার।

অকর্ম্মার ক্ষমতা

১
আন্ধণের বাছুর—চল ভাই পালা দিয়ে

এক দৌড় দি।

গোয়ালার বাছুর—ভয়ে জাজ নাড় দেখি,

দৌড়ে কাজ কি?

২
মুরোপ—চল যাই মল্লক্ষেত্রে একচোট লড়ি;

এসিয়া—কাজ নাই, শিবনেত্রে মালা ঝপ করি।

ঐক্ষীরোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

বর্ণ, শ্রেণী ও জাত

(Emile Senart-এর ক্যাপী হইতে)

আমি পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি, হিন্দু মূল-গ্রন্থাদি অমুসারে, চারি জাতের পদ-মর্যাদা সমান ছিল না। এই চারি জাত দুই দলে পবিণত হইয়াছিল,—এক দলের ভিতর তিনটি উচ্চশ্রেণীর জাত এবং অপর দলের ভিতর কেবল একটি মাত্র জাত সম্মিষ্ট।

প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত “আর্য্য”গণ অথবা আর-এক নামে অভিহিত—“দ্বিজ”গণ। দীক্ষাপ্রদত্ত নব-জন্মগ্রহণের দ্বারা এই দ্বিজদিগের স্বাভাবিক জন্ম দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দীক্ষা-সংস্কার হইতে বর্জিত শূদ্রেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা বা শাস্ত্রালোচনা করিতে পারে না,—কেননা তাহার পূর্বে দীক্ষা অপরিহার্য্য। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানও করিতে পারে না। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারাই উচ্চশ্রেণীর জাতেরা চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। বড়-ছোট তাহারা কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নিকট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে। কেবল ইহারই দ্বারা খুব সামান্য পরিমাণে সাধারণ সমাজের মধ্যে তাহারা একটা স্থান পায়। দীক্ষার দ্বার দিয়াই মহৎ আধ্যাত্মিকের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়; মনুষ্যস্বভাবেরই বলিয়াছেন, এই দ্বিতীয় জন্ম পার না হইলে, আধ্যাত্ম শূদ্র হইতে উৎকৃষ্ট নহে। অতএব এইরূপ বিভাগ অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা শুধু সামাজিক বিভাগ নহে—ইহা ধর্মসম্বন্ধীয় বিভাগ। তিন উচ্চ জাতের কোন মৃত ব্যক্তিকে শূদ্র যদি বহন করে তাহা হইলে সে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কতকগুলি দোষের নিন্দা করিতে হইলে, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে ঐ দোষের জন্ত উহারা শূদ্রের সামিল হইয়া পড়িয়াছে;

অর্থাৎ স্বজাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। মনুষ্য বলেন, শূদ্রের কোন “পাতক” হইতে পারে না। বস্তুত শূদ্র এমন কোন দোষ করিতে পারে না, যাহার দরুন তাহার অধঃপতন হইতে পারে। এমন কোন উচ্চ স্থানে তাহারা উঠিতে পারে না, যেখান হইতে তাহারা নীচে পড়িতে পারে।

আমরা যে-যুগের অল্পসম্বন্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই

যুগে এই গভীর-অঙ্কিত ভেদভেদের অমুরূপ একটা জাতিগত পার্থক্য থাকাই সম্ভব। শূদ্রদিগের শাসনাধীনে যে-সকল লোক ছিল তাহারা কেবলই আদিম-দেশবাসী—(উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে স্থানান্তরে যাত্রাকালে আর্য্যোবা বাহাদিগের সংস্রবে আইসে) অথবা কতকগুলি মিশ্রজাতের অন্তর্ভুক্ত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। একথাটা গোপকল্পের কথা। গোড়ায় নিশ্চয়ই আর্য্য ও শূদ্রের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে একটা জাতিগত বিরোধ ছিল। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে, একটা অপরিহার্য্য মিশ্রণ সংঘটিত হইয়া ঐ মিশ্রণ উহাদের মধ্যে ব্যবধান ও নীতিগত বিরোধের লাঘব করিয়াছে, কিন্তু স্মৃতিকে কখনই মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।

শূদ্রের প্রতি কতদূর অবজ্ঞা ও বৈরিতা প্রদর্শিত হইত তাহা কি বিচার করিয়া দেখিতে ইচ্ছা কর?—একটা বচনে—শূদ্রের হত্যা এবং গির্গিটি ময়ূর ও ভেকের হত্যা একই সীমা-রেখার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে; কোন শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, গুরুকে গুরু-দক্ষিণা দিবার জন্ত অনায়াসে একজন শূদ্রকে গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিজগণের সম্মুখে এমন-কি বাহ্য-সম্বন্ধেও—যদি কোন শূদ্র যথোচিত ব্যবধান রক্ষা করিয়া না চলে, তাহা হইলে তাহাকে খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্যে শূদ্র ও আর্য্যের মধ্যে অর্থাৎ দ্বিজগণের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ সম্বন্ধ—একটা বৈরিতার সম্বন্ধ ধর্মশাসনের স্তায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শূদ্র ও আর্য্য এই দুই শব্দে শুধু যে পদমর্যাদার অসমতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, পরন্তু দুইটি বিভিন্ন ধর্মসম্বন্ধীয় ঐতিহ্যের মধ্যে গভীরতর যুক্তাযুক্তির ভাব প্রকাশ পায়। বৈদিক মন্ত্রাদিতে দেখা যায়, উহাদের মধ্যে পুরাপুরি সংগ্রাম চলিয়াছিল।

বর্ণ—আক্ষরিক অর্থে রং—সংস্কৃত ভাষায় জাতের নামে চলিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে “বাদ-সাদ” দ্বিভাষা কিছু আছে তাহা আমি পরে দেখাইব। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত, মতবাদ-সিদ্ধ চারি জাত “বর্ণ”-নামেই নিয়ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই অর্থ বেদে নাই। দুই পবম্পব-বিরোধী উক্তি সম্বন্ধেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা “আর্য্য-

বর্ণ" ও "দাসবর্ণ"। উহাদের কতকগুলি পর্যায়-শব্দ আছে যাহা আরো স্পষ্টার্থবাচক, যথা "কৃষ্ণচর্ম", "কৃষ্ণ মনুষ্য"। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধপক্ষ বুঝাইবার জন্যও কখন-কখন "কৃষ্ণবর্ণ" প্রযুক্ত হয়। এই-যে বৈপ্যরীত্যবাচক উক্তি, আরো কিছুকাল পরে, উহারই অমুরূপ উক্তি এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যথা :— "আর্য্য" ও "শূত্র", "আর্য্যবর্ণ" ও "শূত্রবর্ণ"।

একটা ক্রমপরিণাম-সূত্রে, পরে এই "বর্ণ"শব্দ দুই বিভিন্ন বৈরীজাতির ভেদ নির্দেশ করিতে লাগিল—অপেক্ষাকৃত শ্বেতচর্মের ভেদ ও কৃষ্ণচর্মের ভেদ। পরবর্তী সাহিত্যে আর্য্য-বংশোদ্ভব তিন জাত "আর্য্যবর্ণ" বলিয়া অভিহিত হইলেও গোড়ায় উহা একবচনাত্মক "আর্য্যবর্ণ" ছিল। সমস্ত "কর্মা-রং"-বিশিষ্ট জাতি সাধারণভাবে "আর্য্যবর্ণ" বলিয়া অভিহিত হইত।

অতএব ইহা নিশ্চিত, যে, এই পদ্ধতির শব্দপ্রয়োগ একটা বিভিন্ন অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রেণী-বিভাগের সুবিধার জন্য এইরূপ প্রয়োগের আরম্ভ হয়—গোড়ায় ইহার অর্থ অমুরূপ ছিল। পরে আদিম অর্থ হইতে একটু তফাৎ হইয়া পড়ে। এই কথাটি যেন আমরা মনে রাখি।

বৈদিক যুগের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মেরূপ ধারণাই থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, বৈদিক সূক্ত ও মন্ত্রের মধ্যে, তিনটি বৃহৎ শ্রেণীভেদ দেখা যায়, যথা :—পুরোহিত, অধিপতি, ও সাধারণ লোক; আমরা দেখিতে পাই, বিভিন্ন নামে, এই পুরোহিতগণ যজ্ঞকার্য্যে যজ্ঞের আনুষঙ্গিক মন্ত্রাদি রচনায় ব্যাপৃত। যুদ্ধবিগ্রহ ও জনসভার মধ্যে আমরা অধিপতিকে দেখিতে পাই। সাধারণ লোক সম্বন্ধে বহুবচনের প্রয়োগ দেখা যায়। তাহারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ "কুল বা গোত্রের" অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তাহারা অধিপতি বা রাজাকে ঘিরিয়া থাকে।

তখন হইতেই পুরোহিতের কার্য্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়; অস্ত্রের অনধিকার চর্চ্চা হইতে তাহারা সুরক্ষিত হয়। সর্ব্বত্রই রাজার ক্ষমতা, অথবা সাধারণতঃ রাজত্ববর্ণের পদগৌরব স্থিরনির্দিষ্ট হইয়া, ন্যূনাদিক পরিমাণে স্ফুলাঙ্গক্রমিক হইয়া পড়ে। এই ত্রিবিধ শ্রেণী-

বিভাগের মধ্যে, এতৎসংক্রান্ত শাস্ত্রীয় উপদেশাদির মধ্যে, আধুনিক "জাত"-সংক্রান্ত মতবাদে বা ব্যবহাবে কোন স্থষ্টি লক্ষণ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন শব্দের মধ্যে কখন কখন নৈকট্য স্থাপিত হইয়াছে, দেখা যায়। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, এই তিন শ্রেণীই আর্য্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। একটা শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই,—"বিশগণ স্বতই 'রাজার' সম্মুখে মস্তক অবনত করে; এবং 'ব্রাহ্মণ' রাজার পুরোবর্তী।" পুরোহিতের ক্ষমতা তখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল ইহা স্বীকার করিলেও, ঐ ক্ষমতার ঠিক অবস্থাটি বেশ বুঝিতে পারা যায়; রাজা ও পুরোহিতের নির্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে, সমগ্র প্রজামণ্ডলীর সহিত রাজা ও পুরোহিতের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। আমরা দেখিতে পাই এই শ্রেণীগুলি ন্যূনাদিক পরিমাণে বৃদ্ধিভার ও পরস্পরের প্রতি দ্বৈধপরায়ণ; কিন্তু তবু ইহারা শ্রেণী মাত্র—"জাত" নহে।

তথাপি ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে না, ব্রাহ্মণিক মতবাদের তিন প্রধান জাত, উক্ত ত্রিবিধ শ্রেণীর ঠিক অমুরূপ। কিন্তু এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে?

তিনটি জাত যে-যে নামে অভিহিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে—কেবল "ব্রাহ্মণ" এই নামটি বৈদিক সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় (যে "পুরুষের" কথা উপরে বলা হইয়াছে এবং যিনি এই পদ্ধতিটাকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, সুবিধা-মত, সেই পুরুষের মুখ হইতেই এই সূক্তটি বাহির করা হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা আমরা পরে তলাইয়া দেখিব)। ইহাও অতি বিরল। আদিম "ব্রহ্মণ"ই পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়; ইহা ক্রীতবিলম্ব শব্দ। সমস্ত পুরোহিতিক ক্রিয়া-কর্ম্মকে একই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য এই শব্দটি নির্দিষ্ট হইয়াছে। যোদ্ধৃবর্ণের দুই উপাধি "ক্ষত্রিয়" ও "রাজত্ব"। ক্ষত্রিয় উপাধিটি, ক্ষমতা-অর্থে দেবতাদিগের নামের সহিত অনেকবার সংযোজিত হইয়াছে, দুই-একবার অধিপতিদিগের নামের সহিতও সংযুক্ত হইয়াছে, (ঐ বাক্যগুলি আধুনিক যুগের বলিয়া সন্দেহ হয়) কিন্তু "রাজত্ব" শব্দ একেবারেই অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে, সাদাসিধা "রাজত্ব" শব্দটি অভিজাত-বর্ণের প্রচলিত উপাধি; "ক্ষত্র" এই শব্দের ভিতর

রাজকীয় ক্ষমতা নিহিত। বৈদিক স্মৃতিাদির মধ্যে “বৈশ্ব” শব্দ অপরিচিত; বহুবচনান্ত আদিম “বিশ” শব্দ সেই-সব “কুল” বা “গোষ্ঠী”-সমূহের নাম—যাহাদের লইয়া দেশের সমস্ত জনসাধারণ সংগঠিত। আৰ্য্যজ্ঞাতির অন্তর্ভুক্ত “ব্রহ্ম,” “ক্ষত্র” ও “বিশ” এই ত্রিবর্গ কেবল মাত্র বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদিগের পরবর্তী সাহিত্যে, এই ত্রিবর্গ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে-সকল গ্রন্থে কখন কখন “ব্রহ্মণ,” “ক্ষত্রিয়,” “বৈশ্ব” ব্যবহৃত হইয়াছে, সে-সকল গ্রন্থেও “ব্রহ্ম,” “ক্ষত্র” ও “বিশ,” এই ত্রিবর্গের বারম্বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই উহার উৎপত্তির প্রাচীনত্ব সূচিত হয়।

আমার বিবেচনায় স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, উহা কোন পারিভাষিক বিদ্যা হইতে উৎপন্ন। যে নিয়ম-পদ্ধতির সহিত উহা যোগসূত্রে আবদ্ধ সেই নিয়ম-পদ্ধতিটি বেদ-প্রতিভাত অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম বলিয়া বোধ হয় না। ঐ শব্দ-গুলির মধ্যে যে নিয়ম পদ্ধতি আবদ্ধ রহিয়াছে, উহা বিচার-বিবেচনার ফল বলিয়া মনে হয়, একটা সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সহিত, অন্ততঃ আদিম ত্রিবর্গ-বিভাগ-প্রসূত একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থার সহিত উহাকে উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ব্রাহ্মণিক মতবাদের দ্বারা বৈদিক সাক্ষ্যসমূহের ব্যাখ্যা করিলে তবেই প্রকৃত সম্বন্ধটা ফিরিয়া পাওয়া যায়।

আৰ্য্যশাখাবংশসমূহের নীচে, চিরন্তন বৈরীরূপে কেবল “দাসবর্ণ”ই বৈদিক স্মৃতিাদিতে বর্ণিত হইয়াছে; উহার শত্রুজাতি, উহাদের আর-এক নাম “দহ্য”। বৈদিক স্মৃতিাদিতে শূত্রের উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে সাহিত্যে “দহ্য” শব্দ পুনর্ব্বার গৃহীত হইয়াছে এবং উহার লোকসমাজের নিম্নতম স্তরে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণিক সমাজ-কাঠামোর ভিতর দশমরমত উহাদের কোন স্থান নাই। কখন কখন—এমনকি বর্তমানকালেও—উহা বা সমাজ-বহিষ্কৃত বা চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হয়, বৈদিক যুগে শূত্রের অল্পরূপ কোন নিম্নস্তরের লোক ছিল না—আৰ্য্য সমাজের একেবারে বাহিরে ছিল না, অথবা এমন একটা শিথিল-বন্ধনের অধীনতা উহাদের ছিল যে তাহাতে তাহাদের পক্ষে বিশেষ

কোন হীনতা হয় নাই—নয়, যদিবা কোন নিম্নস্তর সে সময়ে ছিল একরূপ হয়,—যে-সকল কবিদের গান আমাদের হস্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই-সকল গানের রচয়িতা কবিগণ উহাদিগের জন্ত কোন পৃথক স্থান নির্দেশ করা,—সাধারণ দস্যুসমূহের বাহিরে তাহাদের স্থান নির্দেশ করা—আবশ্যক মনে করেন নাই। বৈদিক যুগের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে যে এই পদ্ধতিটা বিকাশলাভ করে নাই—প্রত্যুত উহা একটা সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতি—ইহা তাহারই আর-একটা অভিনব প্রমাণ।

বেদোক্ত “বিশ”গণ যে বিশেষ-কোন জাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, “পুরোহিত” ও “অধিপতি” শ্রেণীর বাহিরে—কেবল সাধারণ জনসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল,—ইহার যে-নিদর্শন আমরা পাইয়াছি তাহা বিশ্বত হইলে চলিবে না। স্তত্রাং ব্রাহ্মণিক মতবাদ, আদিম “বিশ” হইতে যে “বৈশ্বের” ব্যুৎপত্তি করিয়াছে, তাহা কতকটা খামখেয়ালি ধরণের, ও ইতিহাসের হিসাবে অলীক। “অৰ্য্য” শব্দ বৈদিক স্মৃতিাদিতে ব্যবহৃত হইলেও—উহা “আৰ্য্য” শব্দেরই পর্য্যায়-শব্দ, ইহা স্থনিশ্চিত। কিন্তু বিশেষরূপে বৈশ্বদিগের সম্বন্ধেই উহা প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব ইহা খুব স্মরণে রাখা আবশ্যক যে বৈশ্ববাই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন লোক ছিল; সাধারণ লোকের স্ত্রুলাংশ উহারাই ছিল। যাহাকে প্রকৃতপক্ষে “জাত” বলা যায়, সেই জাত অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, এক-একটা বিশেষ ব্যবসায়ের ব্যাপৃত, একটা সাধারণ বংশের বন্ধনে আবদ্ধ, কতকগুলি বিশেষ নিয়মের অধীন, কতকগুলি নিজস্ব প্রথার দ্বারা পরিশাসিত। স্তত্রাং উপরি-উক্ত অস্পষ্ট দলবিভাগের সহিত “জাতের” আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

আমি এযাবৎকাল স্বীকার করিয়া আসিয়াছি—এবং সকলেই সচরাচর স্বীকার করিয়া থাকে যে,—ব্রাহ্মণিক মতবাদে “বর্ণ” শব্দটি “জাতের” ঠিক অল্পরূপ। আমি যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহা আমার পাকা স্বীকারোক্তি নহে; স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে আপাততঃ মানিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র। আমি আমার এই স্বীকারোক্তিকে একটু সীমাবদ্ধ করিতে চাহি।

প্রথমে প্রাতিদ্বন্দী লোক-সমূহের মধ্যে রংএর ভেদ, ‘বর্ণ’

শব্দে সূচিত হয়। পরে ঐ-সকল লোক ঋগ্বেদে আরো বিভক্ত হইয়া পড়িলে, বর্ণ শব্দ “সাদা” “কালো” এই দুই আদিম বর্ণে আবদ্ধ না থাকিয়া আরো বিস্তার লাভ করিল, এবং বর্ণ শব্দ আরো অসংখ্য পর্যায়ের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। উহা মূলোৎপত্তির সমস্ত পদাঙ্ক-রেখা হারায় নাই। বর্ণ শব্দে সাধারণভাবে জাত বুঝায় না, পরন্তু কেবলমাত্র “চারি জাত” বুঝায়। “হবিবংশে”র কোন এক স্থানে যাহাকে “চারি বৈধ জাতি” বলা হইয়াছে, এই বর্ণ শব্দ কেবল সেই “চারি-জাতি”র সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গোপকল্পের জাতগুলি বা মিশ্রজাতগুলি—যাহা ব্রাহ্মণিক মতবাদসম্বন্ধে বিভাগের অনুরূপ নহে পরন্তু যাহা প্রকৃত জাতের অনুরূপ, (যে জাতকে জীবন্ত ভাবে আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি)—ধর্মশাস্ত্রে ঐ-সকল অপ্রধান ও মিশ্র জাতের আর-একটা নাম আছে—তাহা “জাতি”। এই “জাতি” শব্দ ঠিক “জাতের” সমার্থ্যই প্রকাশ করে; কেননা “জাতি”র অর্থ “জন্ম, বংশ”। আমার বিশ্বাস, মনু, যজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা সর্বত্রই জাতিশব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন, “পরিবার” বা “গোত্র” অর্থে নহে। এই দুই শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যের প্রতি সম্যক-লক্ষ্য না করায় অনেকের ভুল করিয়াছেন। ব্রাহ্মণিক মতবাদের ভিতর যে দুই উপাদান সম্মিলিত দেখিতে পাওয়া যায় সেই উপাদানগুলির স্বত্তি এই পার্থক্যের দ্বারা খুব নিম্নতরযুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে :—

কোন এক দূর-অতীতের সঞ্চয়-ভাণ্ডার যে-বেদ, সেই বেদ হইতে এমন-এক শ্রেণীবিভাগের আভাস পাওয়া যায়, যাহার সহিত ইরাণের শ্রেণীবিভাগের তুলনা করিয়া এবং আরো অত্যান্ত নিদর্শন দেখিয়া, বেদোক্ত শ্রেণীবিভাগের বহুপ্রাচীনত্বের সম্বন্ধে অকাট্য সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সামাজিক সাহিত্যে, উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, জাতের পদ্ধতিটা আমরা অবগত হই। এই সাহিত্য বৈদিক ঐতিহ্যের নিগড়ে বন্দী হইয়া, বৈদিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারিণী অসংকোচে মানিয়া লইয়াছে। অতীতের স্বত্তি ও বর্তমানের বাস্তবতা উভয়ে মিলিয়া-

মিশিয়া একটা বিচুড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবন্ত জাতের পদ্ধতিটা প্রাচীন বংশ-বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগের কাঠামের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই-সকল অসঙ্গতিতে ভীত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ের আলোচনা হইতে বিরত হন নাই। জাত ঋগ্বেদে বিভক্ত হওয়ায় উহার মধ্যেও শ্রেণীবিভাগের ভাবটা রহিয়া গিয়াছিল,— তাহাতেই তাঁহাদের কাজ আরো সহজ হইয়া পড়িয়াছে।

আজিকার দিনেও, শ্রেণীগতগর্ভ সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। অসংখ্য জাতের মধ্যে যে অসমতা, যে পার্থক্য বিদ্যমান, ব্রাহ্মণের শ্রেণীগত গর্ভই তাহার মূলে। এই শ্রেণীগত গর্ভ আরো প্রকাশ পাইবার কথা সেই সময়ে যখন আর্য জাতির সংখ্যা কম ছিল, জাতিসংমিশ্রণ ততটা অগ্রসর হয় নাই, লোকেরা ঋগ্বেদে ততটা বিভক্ত হয় নাই। এমন-কি অভিজাত যোদ্ধাবর্গের মধ্যেও শ্রেণীগত স্বার্থ, একটা প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে ও একপ্রকারে সাম্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। নিশ্চয়ই, এই ভাবটি, এই আঁপেক্ষিক একতা, —উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও পাণ্ডিত্যসম্বিত পুরোহিত-শ্রেণীর পক্ষে যেমন অপরিহার্য ছিল তেমনি উহাকে রক্ষা করাও সহজসাধ্য ছিল। শ্রেণী ও জাতের মধ্যে ঐকান্তিক অসঙ্গতি আদৌ ছিল না। এই দুই পদ্ধতি একত্র মিলিত হইতে পারিত, একত্র মিলিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারিত। উৎপত্তির সূত্রদ্বয়কে এক করিয়া ফেলাতেই ভুল হইয়াছে।

কেবল ব্রাহ্মণিক মতবাদই এই গভীর পার্থক্যের উপর একটা মায়াজাল বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। উহার অন্তর্গত প্রভাবের বশবর্তী হইয়াই, ছোট ছোট জীবন্ত জাতদিককে সেই-সকল পর্যায়ের মধ্যে আনা হইয়াছে যাহাদের মূল্য এক্ষণে কতকটা নামমাত্র হইয়া পড়িয়াছে। ঐ-সকল ছোট ছোট জাতকে এমন এক পদ্ধতির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যে পদ্ধতির নিকট উহার গোড়ায় অপরিচিত ছিল। ঐ পদ্ধতি হইতে উহার স্বাভাবিক নিয়মে পরিপুষ্ট হয় নাই, প্রত্যুত পাণ্ডিত্যের জোরে উহাদের ঐরূপ অর্থ ঘটাইয়া তোলা হইয়াছে।

বৈদিক যুগে জাত ছিল কি না, এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার

করেন যে “পুরুষ স্ক্রুটি” খুবই আধুনিক, স্তত্রাং উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ইহার পূর্ববর্তী মন্তব্যসমূহও এই সমস্তার সমাধান করিতে পারে না। তাহার ফলে অন্ততঃ এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বৈদিক যুগে জাতের অস্তিত্ব সন্দেহে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়েরই আলোচনার স্বত্বস্বানরূপ মূল-ভিত্তিটিকে একটু বদল করা উচিত।

বৈদিক স্ক্রুটিতে বর্ণ শব্দে জাত বুঝায় না,—এই কথায় কিছুই আসিয়া যায় না যদি ইহা সত্য হয় যে, কোন এক সময় উহা জাতের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিম্বা কালবিনশে উহার ঐ অর্থ প্রচলিত হইয়াছিল। যদি অধিবাসী লোকের মধ্যে একটি জিবর্গ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, যদি আরো দূর অতীতে উহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেও স্থিরসিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে উহা “শ্রেণী” ছিল কি “জাত” ছিল। সর্বপ্রকার পারিবারিক অবস্থার মধ্যে “শ্রেণী”র ভিতরেও পদমর্যাদার নির্দিষ্ট সোপানপরম্পরা পরিলক্ষিত হয়, স্তত্রাং শুধু পদমর্যাদা-সোপানের অস্তিত্বে কোন নিগূঢ় বিশেষ প্রকাশ পায় না। জাত-জিনিসটা আসলে সংকীর্ণ চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, পার্থক্য-সম্বন্ধিত—স্তত্রাং উহার মূল অস্তিত্ব নিহিত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বৃহৎ পর্যায়গুলির নীচে, এই বিস্তৃত মণ্ডলগুলির-ভিতর, এমন কোন উপাদান বৈদিক স্ক্রুটির মধ্যে পাওয়া যায় কি না,—যাহা জাতের সংগঠনে সাহায্য করে, যথা জাতিত্ব, ব্যবসায়, ধর্ম, নিবাস,—সেই-সকল বৈদিক গঠন যাহা জাতের অনুরূপ,—ইহাই প্রকৃত সমস্তা। ইহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর একটা এই দেখিতে হইবে,—এই অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হইবে কি না।

M. Ludwig যেক্রপ যোগ্যতাব সহিত বেদ ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন এমন আর কেহ দেখে নাই; আর তিনি বেদ সঙ্ক্ষে জাতের বিচ্ছিন্ন যেক্রপ বোঁক্ দিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ আর কেহ করে নাই। কোন অভাব-বাচক সিদ্ধান্ত—এমন কি খুব প্রামাণিক অভাব-বাচক সিদ্ধান্তও তাঁহাকে থামাইয়া দিতে পারে নাই। মোট কথা, তিনি কিছুই আবিষ্কার করেন নাই। তিনি শ্রেণীবিভাগ

আবিষ্কার করিয়াছেন কি?—হাঁ করিয়াছেন। জাতের বিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন কি? না, করেন নাই। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, কতকগুলি জটিল ক্রিয়া-কর্ম অনুষ্ঠান, কতকগুলি গান,—গৌরোহিততন্ত্রকে যে খুব দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছিল এবং এই পুরোহিতের কার্য প্রায়ই বংশগত ছিল,—সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। বাহুবলে বলীয়ান কতকগুলি ধনশালী অধিপতি-শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল কি না এবং অগাধ দেশের গ্রাম ভারতেও বিশেষ করিয়া জয়ের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল কি না—Mr. Ludwig ইহাও প্রদর্শন করেন নাই। জাতের যে-সকল নির্দিষ্ট সীমাবন্ধন আছে, তিনি বেদে সেই-সকল সীমাবন্ধনের কথা কিছুই পান নাই; তিনি ইহাও সপ্রমাণ করেন নাই যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত একীভূত “মঘবনেরা” কোন রুদ্ধদ্বার দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুখ্যতঃ Mr. Ludwig নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, জন-সাধারণরূপ “বিশ”গণের উপরে পুরোহিত ও অভিজাতবর্গ—এই দুই স্পষ্ট পৃথক শ্রেণী অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়াছেন। এই-সকল নিদর্শন জাত-পদ্ধতির অস্তিত্ব খাপনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া যদি তিনি বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে সে শুধু ব্রাহ্মণিক্য পদ্ধতির দৃষ্টিভূমি হইতে। তিনি মনে করেন—অন্ততঃ মৌনভাবে—যে, এই পদ্ধতি হইতে যথার্থ তথ্য প্রকাশ পায়। স্তত্রাং, অতীতকালে যখন শ্রেণী ও জাতের মধ্যে কিছু-কিছু মিলের চিহ্ন দেখা যায়, তখন জাতটা সমগ্রভাবেই ছিল এইরূপ সপ্রমাণ হয়। আমার মতে, ইহা “চক্রক”-গাম্যভাস, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাই প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। Mr. Zimmer উক্ত কথার স্বযোগে উন্টা পক্ষের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উন্টা দিক্ হইতে আর-একটা এই স্থির করিতে হইবে,—খুব প্রাচীন স্ক্রুতিদি যে-সময়ে রচিত হয়, সেই যুগে জাত-জিনিসটা আদৌ ছিল কি না। যদি ভাবিয়া দেখা যায়, ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে জাত-পদ্ধতির যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, (আমি এখানে শ্রেণী হিসাবে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের আধিপত্যের কথা বলিতেছি না) - সমস্ত পর্ববর্তী সাহিত্যে, জাত কত কম স্থান অধিকার

করিয়াছিল, তাহা হইলে শুধু বচনাদির মৌনতার গুরুত্ব এতলে খুব কমই বলিতে হইবে। আমার বিশ্বাস—যদি বংশের খুব প্রাচীন গঠনপদ্ধতি হইতে, স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশ অনুসারে, জৈবিক ধরণের ক্রমবিকাশ অনুসারে, ভারতের জাতিতত্ত্বসংক্রান্ত, অর্থ-নীতি সংক্রান্ত, ভূগোল-সংক্রান্ত, মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত বিশেষ অবস্থার মধ্যে জাতের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার প্রচেষ্টাদি খুব ধীর-গতিতে হওয়াই সম্ভব; ঐরূপ আদিমকাল-স্থলভ উপাদানের উপর, জীবনের নিত্যন্ত সহজ সংস্কারের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত থাকিলে,—বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সম্বিত সূক্তাদি হইতে, জাতের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে, কেজোধরণের বেশী সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব নহে।

হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে যে-পদ্ধতির প্রকাশ দেখা যায় উহা প্রাচীন সূক্তাদির যুগে ছিল না, অন্ততঃ ছিল বলিয়া গ্রন্থকারগণকর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। ইহা অনিশ্চিত, কেননা,—ব্রাহ্মণিক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত মূখ্য সংজ্ঞাগুলি এমন সকল বিষয় হইতে, উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার শুধু আদিম অবস্থাটাই সূক্তাদির নিকট পরিচিত ছিল; কেননা,—ব্রাহ্মণিক মতবাদের সাধারণ সূত্রটি যেকোন তাহাতে মনে হয়, সূক্তাদির প্রভাবের বশীভূত হইয়া সূক্তাদির সমকালবর্তী ঐতিহ্যের কাছাকাছি যাইবার জ্ঞাত উহার যেন একটা আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্রাহ্মণিক পদ্ধতি বরাবরই তথ্যমূলক এমন একটা অবস্থার দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল যাহা খুবই বিভিন্ন। প্রকৃত কথা এই—বেদ হইতে যে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিগত অবস্থা অবগত হওয়া যায়, তাহার সহিত জাতের পূর্ণ-বিকাশ অসঙ্গত ও অসংলগ্ন; কিংবা এমনও মনে হয় না যে,—উহা তখন হইতেই ছিল—(যদিও প্রাগবস্থায়) এবং উহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া এখনকার নির্দিষ্ট আকার ও গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমার খুবই সন্দেহ হয়, বচনাদি হইতে এই প্রশ্নের কোন একটা নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায় না। হিন্দু প্রাচীনকালের সূক্তাদির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বিকল্প ছিল এখনো তাহা খুব অসম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ঠিক কোন সময়ের সহিত উহার মিল হয়, সে সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট—সুতরাং এইরূপ

সন্দেহ করিবার আরও বেশী হেতু আছে। সূক্তাদি হইতে প্রাচীন যুগের একটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু উহার সহিত কতকগুলি খাটি হিন্দু-লক্ষণও মিশ্রিত দেখা যায়। সূক্তাদি সময়ের পর যে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই সভ্যতা উক্ত সূক্তাদির প্রতি অতিরঞ্জিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে; অথচ ঐ সভ্যতা ধর্মসংক্রান্ত, ভূগোল-সংক্রান্ত, সমাজসংক্রান্ত এমন একটা ভূমির উপরে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছিল যাহা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন।

এই একই জিনিসের দুই বিভিন্ন দিক্ কিরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে পরস্পর সম্বন্ধ ছিল, আজ কে তাহা সাহস করিয়া নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করিবে?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরগাছা

(৪৬)

এতদিন মণিমালার মত হইয়াছে ত রাখালের মত হয় নাই, রাখালের মত হইয়াছে ত মণিমালার মত হয় নাই, আজ উভয়েরই এক মত হইয়াছে—এ বাড়ীতে আর থাকা নয়। বিদায় লইবে বলিয়া রাখাল ও মণিমালা রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকটে গেল।

রাখাল ও মণিমালা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই জগদ্ধাত্রী বলিলেন—আমি এই ভাবছিলাম তোমাদের ডেকে পাঠাব। আমরা কাল তিথি করতে যাচ্ছি। ম্যানেজার-সাহেব কুবেরকে যেতে দিলেন না। সে রইল; তাকে তোমরা দেখো। বরু আর বৌ আমার সঙ্গেই যাবে।

চন্দনমণি অমনি সোহাগ জানাইয়া বলিল—কুবেরের ত দিদি আর বাবুদাদা-অন্ত প্রাণ। দিদি আর বাবুদাদা তার কাছে থাকলেই হল। আমরা ত যেন তার কেউই নই। তবে আমরা থেকে আর করব কি, তোমাদের কল্যাণে দিদির সঙ্গে একটু তিস্তিধর্ম করে আসিগে।

রাখাল চন্দনমণির কথা লক্ষ্য না করিয়াই রাণী জগদ্ধাত্রীকে বলিল—মা, আমরা এখান থেকে যাব বলে বিদায় নিতে এসেছিলাম।

রাণী জগদ্ধাত্রী রাখাল ও মণিমালার মুখের দিকে ছলছল চোখে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, কোনো কথা বলিতে পারিলেন না।

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল—তা ত তোমরা যাবেই বাবা, পরের বাড়ী আর কদিন থাকবে, না বেশী দিন থাকি ভালো দেখায়। তা এত তাড়াতাড়ি কেন, আমরা তিথি সেরে ফিরে আসি, তার পর যেয়ো।

রাণী জগদ্ধাত্রীর চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

রাখাল ও মণিমালার বিদায় লওয়া আর হইল না। রাণী জগদ্ধাত্রী তীর্থযাত্রা করিলেন।

রাণী জগদ্ধাত্রী ও চন্দনমণির অবর্তমানে রাখাল ও মণিমালার উপর রাণীর স্ত্রীধন সম্পত্তি রতনপুর পরগণা হইতে সংসার পর্যন্ত দেখিবার ভার পড়িয়াছে। মণিমালা হাসিমুখের মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিয়া ভোর হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বাড়ীর চাকর দাসী, ঠাকুরবাড়ী অতিবশালা প্রভৃতির তত্ত্ব লইয়া ফিরিতেছে; যে-সব চাকর বাড়ীতে থাকে না, সিধা পায়, তাহারা বরাদ্দের উপর ছুটা আলু কি একটা মূল্য বেশী পাইয়া খুসী হইয়া যাইতেছে। সকলেই হাস হাস করিতেছে—এমন সোনার মনিব থাকিতে কোথাকার একটা ছোটলোক দৃষ্টিকপণ মাগী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া এমন রাজবাড়ীকে মুদিধানার চেয়েও হেয় করিয়া তুলিয়াছে—যেখানে লোকে এককাল আমাপা জিনিস খাইয়াছে লইয়াছে, সেখানে আজকাল শুধু দাড়িপাল্লার টানাটানি আর মুখখিচুনি রাজত্ব করিতেছে!

রাখাল রতনপুর পরগণা তদারক করিতে গিয়াছে। সেখানে বহুবিকারী গিয়া কেবল গালি ও চাবুকে প্রজ্ঞার সহিত পরিচয় করিত, রাখাল সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলের সমান হইয়া তাহাদের স্বখদুঃখের কাহিনী জানিতেছে; সে দেশের অভাব অসুবিধা নিজে দেখিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছে। প্রজ্ঞারা বলাবলি করিতে লাগিল—এবার সেই বকটা আসিলে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া রূপলহরী নদীর জলে ভাসাইয়া দিবে। রাণী মরিলে স্ত্রীধন সম্পত্তি মেয়েই ত পাইবে, তখন এই জামাই-বাবুই কর্ত্তা হইবে; তাহারা রামরাজস্ব্যে বাস করিবে।

কিন্তু তাহারা জানে না যে তাহাদের এই স্বখের আশা মরীচিকা, আলোয়ার আলো—রাখাল প্রস্তুত হইয়া আছে রাণী জগদ্ধাত্রী তীর্থ করিয়া ফিরিলেই এখানকার সম্পর্ক চূকাইয়া সে বিদায় লইবে।

বহু তীর্থ পর্যটন করিয়া প্রায় বৎসর খানেক পরে রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। রাখাল ও মণিমালার বিদায় লওয়া আবার স্থগিত রাখিতে হইল।

কবিরাজ কাস্তলাল মিশ্র চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন; মুশ্কেল কি ভাগলপুর হইতে অপর বৈদ্য আনিবার জল্পনা হইতেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। রাণী জগদ্ধাত্রী বলিলেন—রাখাল, আমার রতন-পুর পরগণা ভূপালকে দেবো; একটা লেখাপড়া করে আন, সেই করিয়ে নাও।

রাখাল বলিল—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি ভালো হবেন। ভালো হয়ে থাকে যা দিতে ইচ্ছে হয় দেবেন।

বহুবিকারী বলিল—বাঃ! এও কি একটা কথা হল! মামুষের শরীরগতিকের কথা ত বলা যায় না; যদি নাই ভালো হলেন? লেখাপড়া যখন করে দিতে চাচ্ছেন সেই করিয়ে রেখে দেওয়া ভালো। ভালো হয়ে উঠে ইচ্ছে না হয় সে দানপত্র বাতিল করতে ত পারবেন। আমি ছোট দেওয়ানজীকে দিয়ে লিখিয়ে আনছি.. ...

বহুবিকারী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বহুবিকারীর পরোপকারের প্রবৃত্তি হঠাৎ এরূপ প্রবল হইতে দেখিয়া রাখাল ও মণিমালা আশ্চর্য ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

ভোষাখানায় বহুবিকারীর ঘরে দেওয়ান দীনদয়াল ও কাঙালীর ডাক পড়িল। তিন জনের পাকা মাথার স্তম্ভ-পর্যায় একখানি দানপত্র অতি সম্বন্ধ মুসাবিবা ও পরিষ্কার করিয়া লেখা হইয়া গেল।

বহুবিকারী সেখানিকে হাতে করিয়া দোয়াত কলম লইয়া আসিয়া অজ্ঞানপ্রায় রাণী জগদ্ধাত্রীর শিয়রে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল—দিদি, দিদি! ও দিদি, শুনছেন?

চটকা ভাঙিয়া রাণী জগদ্ধাত্রী জোর করিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন—অ্যা?

—রতনপুরের দানপত্র লিখে এনেছি, সই করে দেবে ?

—দাও।—বলিয়া জগদ্ধাত্রী তাঁহার কম্পিত হস্ত শূন্যে বাড়াইলেন। দুই হাত কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় পড়িয়া গেল।

বন্ধবিহারী জগদ্ধাত্রীর গলার নীচে হাত দিয়া তাঁহাকে তুলিয়া বসাইতে গেল।

রাখাল ভৎসনা করিয়া বলিল—ওঁকে মেরে ফেলবেন নাকি ? বিষয়টাই পাওয়া বড় হল ?

বন্ধবিহারী রাখালের কথা কানে না তুলিয়া আস্তে আস্তে জগদ্ধাত্রীকে উঁচু করিয়া তুলিল। এবং বন্ধ-বিহারীর চোখের ইসারায় চন্দনমণি একটা বড় তাকিয়া তাঁহার পিঠের নীচে দিয়া তাহার উপর আর-একটা বালিসে তাঁহার মাথাটি আস্তে আস্তে রাখিয়া দিল। একখানা খাতার উপর দানপত্র মেলিয়া ধরিয়া বন্ধবিহারী কলমে কালি তুলিয়া কলম জগদ্ধাত্রীর হাতে ধরাইয়া দিল এবং স্থস্থ বেলায় যাহাকে নামের বানান বলিয়া দিতে হইত এই অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় তিনি অভ্যাস-বশত আলপনার রেখা টানার মতন রেখা মাত্র টানিয়া নিজের দস্তখতটি খতের উপর ফুটাইয়া তুলিলেন। তারপর তিনি অচেতন হইয়া চলিয়া পড়িলেন। বন্ধবিহারী ও চন্দনমণি তখন দানপত্র লইয়া ব্যস্ত; রাণী জগদ্ধাত্রীর দিকে তাহাদের লক্ষ্য করিবার তখন অবসর নাই। রাখাল ও মণিমালা ধরাধরি করিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে ডালো করিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিল এবং কাস্তলাল কবিরাজ তখন ক্ষিপ্ত হস্তে মকরধ্বজ মাড়িতেছিল। অনেক পাখার বাতাস ও তাহুতের পর যখন জগদ্ধাত্রীদেবীর জ্ঞান হইল তখন বন্ধবিহারী রাখাল ও কাস্তলাল মিশ্র কবিরাজকে সেই দানপত্রে সাক্ষীর স্বাক্ষর করিবার জন্ত অমরোধ করিল—বাবাজী, তুমি আর কবিরাজজী এই দানপত্রের সাক্ষী হও—সই কর।

রাখাল দানপত্রে সই করিতে গিয়া দেখিল যে তাহাতে জুপালের নামের পরিবর্তে কুবেরের নাম কাঙালীর হাতের স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। এবং

সাক্ষী বলিয়া আগে হইতেই কাঙালী ও দীনদয়াল সই চুকাইয়া রাখিয়াছে। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়াইয়া যাহারা প্রবঞ্চনা করিতে পারে তাহাদিগকে রাখাল কুকুর মনে করে। রাণী জগদ্ধাত্রীকে বিস্মৃত করা হইবে বলিয়া সে আত্মসংবরণ করিল, নতুবা এক এক পদাঘাতে তাহাদিগকে তাহার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল। রাখাল সেই দলিল টান মারিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল, সই করিল না। বন্ধবিহারী একলাফে তাহার উপর গিয়া পড়িয়া কুড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—হাঁ হাঁ ক্রোধ হতে পারে তোমার বাবাজী, ক্রোধ হতে পারে। জ্ঞায্য! জ্ঞায্য!

রাখাল আর তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

দলিল সই করিবার বিক্ষেপের ফলে, জগদ্ধাত্রীর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, দুর্বলতার অবসাদে চেতনা লুপ্তপ্রায় হইল। যাম-যায় অবস্থা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ, দুধ ও বেনারস রস খাওয়াইয়া কোনো রকমে প্রাণটাকে দেহে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছে।

(৪৭)

আজ একাদশী। আজ ঔষধ পথ্য দেওয়া যাইবে না, আজ জগদ্ধাত্রীর মৃত্যু নিশ্চয়। বন্ধবিহারী ব্যস্ত হইয়া ব্যবস্থা করিতে লাগিল কেমন করিয়া তাঁহাকে তে-শুন্ত হইতে মাটিতে উঠানে নামানো হইবে; কে কে সঙ্গে শ্রাণানে যাইবে; বাড়ীর ভাঙারে কত মণ চন্দন-কাঠ আছে, তাহাতেই দাহ শেষ হইবে, না, আরো কাঠ লাগিবে; যদি লাগে ত বাজার হইতে আর কতখানি চন্দন-কাঠ সংগ্রহ হইতে পারিবে; গাওয়া দি কয় হাঁড়া আছে; এই-সমস্ত জিনিস লইয়া-যাইতে কতজন ভারী লাগিবে; পথে শব লইয়া যাইবার সময় ঐ বাতাসা ও পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতে হইবে; ভাঙারে কয় ছালা ঐ মজুত আছে, প্রহ্লাদের মা না হয় আরও কিছু ঐ চট করিয়া ভাজিয়া ফেলুক; খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করা হোক কত টাকার পয়সা পাওয়া যাইবে; হারা-ময়রাকে বাতাসা করিতে বলিয়া আসুক; যিহ্ন খানসামা মালখামা

হইতে নূতন ধোয়া খান কাপড় বাহির করিয়া কতকগুলি কাপড় ও উত্তরীয় কাড়িয়া ফেলুক ; শব ঢাকা দিবার জন্ত একখানা জামিয়ার বাহির করিয়া দিক । বহুবাহারী সমস্ত একে একে মনে করিয়া-করিয়া আদেশ করিতেছিল এবং সেই-সমস্ত আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কি না চন্দনমণি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহাই দেখিয়া বেড়াইতেছিল ।

মণিমালা মায়ের পা দুখানি কোলে করিয়া বসিয়া অত্যন্ত কাদিতেছিল ; রাণী জগদ্ধাত্রীর কোলের কাছে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ভূপাল ফুলিয়া-ফুলিয়া কাদিতেছিল ; ঘরে বাহিরে সমস্ত চাকর দাসী আশ্রিত আত্মীয় পরিজন জড়ো হইয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছিল ; কবিরাজ বিছানার ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া নাড়ী ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল কখন কোন মুহূর্ত্তে সেই অতি ক্ষীণ স্পন্দনটুকুও স্থগিত হইয়া যায় । রাখাল শিয়রের কাছে শুক হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল । দাঁড়াইয়া থাকিতে-থাকিতে রাখাল হঠাৎ বলিয়া উঠিল—কবিরাজজী, কোনো উপায় আর নেই কি ?

কবিরাজ বলিল—দাবাই ও পথ্য পড়িলে আরো দুচার দিন লড়িতে পারা যাইত । তার মধ্যে ভগবান চাহে ত এই কঠিন অবস্থা কাটিয়া রোগ আরামের পথে যাইতে পারে ।

রাখাল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জ্বোর দিয়া বলিল—আপনি ওষুধ দিন । মণি, চট করে গিয়ে একটু গরম দুধ নিয়ে এস, একটা বেদানার রস কর ।

রাখাল ঔষধের পুরিয়া লইয়া ধলে ঔষধ মাড়িতে বলিল । সেই শব্দে বহুবাহারী ও চন্দনমণি ছুটিয়া ঘরে আসিয়া বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ ! রাখাল ! তুমি করছ কি ? আজ যে একাদশী !

রাখাল ঔষধে মধু ও আদার রস মিশাইতে মিশাইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—জানি ।

—আজকে ওষুধ খাবেন কি করে ?

—আমি আশ্বে আশ্বে চাটিয়ে দেবো, তাহলেই খেতে পারবেন ॥

—পাপ হবে যে ?

—হয় আমার হবে । সমরাজ্যার সঙ্গে বোঝাপড়া আমিই করব ।

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল—ধর্ম আর রইল না !

রাখাল ঔষধের খল হাতে করিয়া উঠিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—নাঃ !

এমন সময় মণিমালা দুধ আনিল ।

চন্দনমণি আশ্চর্য হইয়া বলিল—ওমা মণি ! তুইও এইসব অকল্যাণের কাজ করছিস ! জানিস একাদশীর দিন বিধবার খাবার জোগাড় করলে বিধবা খাওয়া দেখলে নিজে বিধবা হয় । পতিহত্যার পাতক হয় !

রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রীকে ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে বিরক্ত হইয়া চাপা গলায় বলিল—তবে মামী, তুমি এখন থেকে যাও ত, একাদশীতে বিধবার খাওয়া দেখে তুমিও আর আমার গুণের মামাটিকে হত্যা করো না !

চন্দনমণির কিন্তু বহুবাহারীর প্রতি কিছুমাত্র দয়া দেখা গেল না, সে ঠায় দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া একাদশীতে বিধবার খাওয়া দেখিল । বহুবাহারী চন্দনমণির স্বামীভক্তি ও এযোত রক্ষার আগ্রহ যে কতখানি তাহা জানিয়া প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন হইল তাহা তাহার বিন্ময়ে বিক্ষারিত চোখের দৃষ্টি দেখিয়া কিছুই বোঝা গেল না ।

সমস্ত দিন প্রাণলোলুপ আগন্তুক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার পর সন্ধ্যার সময় কবিরাজের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—যাক এযাত্রা রাণীজী রক্ষা পাইয়া গেলেন ।

বাড়ীর সকলে যে পরিমাণ প্রফুল্ল হইল, বহুবাহারী চন্দনমণি দীনদয়াল ও কাঙালী সেই পরিমাণে বিষন্ন হইয়া গেল ।

(৪৮)

রাণী জগদ্ধাত্রী রোগমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বড় দুর্বল । কবিরাজ বলকারক রসায়ন ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন—ঔষধ পথ্য যত্ন গুজ্জ্বার একটু জট হইলে পীড়া যদি পুনরায় ফিরিয়া হয় তবে আর বাঁচানো যাইবে না ।

রাখাল ও মণিমালা যাওয়ার কথা তুলিয়া গিয়া রাজিদিন প্রাণপণে তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছে । এবং যাহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে এজন্য শ্রীধর কথককে আনাইয়া প্রত্যহ কথা শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে । বহুবাহারী ও চন্দনমণি সর্বনাশ

কুণ্ঠিত হইয়া দূরে দূরে থাকে; বাড়ীতে আর তাহারা জোর করিয়া আধিপত্য করিতে পারে না; সকল তাতেই তাহাদের কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ। কাজেই আস্তে-আস্তে বাড়ীর সমস্ত ভার রাখাল ও মণিমালার হাতে আসিয়া গেল; তাহারা কৰ্ম ও সেবার আনন্দে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল, বাড়ীর সকলে তাহাদের যত্নে প্রফুল্ল ও পরিতুষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন রাণী জগদ্ধাত্রী বসিয়া কথা শুনিতেছেন, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে, কথকের কৰুণ-রস বর্ণনায় সকলের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতেছে, নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র রাজার সর্বস্ব লইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত লঙ্ঘিত ও অপমানিত করিতেছেন—শুনিতে-শুনিতে রাণী জগদ্ধাত্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—আমারও এইরকম দশা হবে; কুবেরের যে-রকম রকম-সকম দেখছি তাতে সে আমার লক্ষ্যশূল দেবে বলে ত বোধ হয় না; নিজের একটা জ্বীন ছিল, সেটাও ভূপালকে দিয়ে ফেলেছি; ভূপালও যদি আমার তাড়িয়ে দ্যায় তবে হরিশ্চন্দ্রের মতন দশাই আমারও হবে।

মণিমালার পাশে বসিয়া ছিল। বলিল—কুবেরকে তুমি সর্বস্ব দিয়েছ, সে কি মা তোমাকে অশ্রদ্ধা করতে পারে? আর ভূপালকে তুমি কিছু না দিলেও সে আপনার প্রাণ ফেলতে পারবে তবু তোমাকে ফেলতে পারবে না, তুমি যে তার মায়ের মা!

রাণী জগদ্ধাত্রী হঠাৎ জ্বলন্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—অত বড় রতনপুর পরগণাটা ভূপালকে দিলাম তবু সেটা কিছু দেওয়া হলনা! বাবা! তোমাদের খাঁই আর কিছুতে মেটে না! আমার পেটে যদি একটা ছেলে হত তবে ঐ বা কোথায় পেতিস?

মণিমালার বিষম দৃষ্টিতে একবার জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নত করিয়া চূপ করিয়া রহিল। চন্দনমণি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন বরষাটির দিদি বলিলেন—রতনপুর পরগণা ভূপালকে দিয়েছ ছাই! বন্ধ সেটা কুবেরের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।

রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত আশ্চর্য ও ব্যথিত হইয়া

মণিমালার লঙ্ঘিত বিষম নত মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সত্যি মণি?

মণিমালার চূপ করিয়া বসিয়া কার্পেটের নক্সার উপর আঙুল বুলাইতে লাগিল।

জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওদের সর্বস্ব নিয়েও পেট ভরছে না! শেষকালে আমার ঠকিয়ে ভূপালের মুখের গ্রাস চুরি করে নিলে!

জগদ্ধাত্রী আর কথা শুনিতে পারিলেন না; দৌড়-ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—ঝুনকিয়া, রাখালকে ডেকে আন।

রাখাল কথা শুনিতেছিল। মা ডাকিতেছেন শুনিয়া উঠিয়া অন্তরে আসিল।

রাখালকে দেখিয়াই জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—রাখাল, এতদিন তোমরা আমাকে বলনি কেন?

—কি মা?

—বন্ধ আমাকে ঠকিয়ে ভূপালের বিষয় চুরি করে নিয়েছে।

—এ কি বলবার কথা মা?

—তুমি এক্ষুনি লিখে নিয়ে এস; আমি সজ্ঞানে সই করে ভূপালকে রতনপুর পরগণা দান করব।

—তা হয় না মা, ও সম্পত্তি কুবেরকেই দেওয়া হয়ে গেছে। দিয়ে ফিরিয়ে নিলে কুবেরের মনে কষ্ট হবে। ভূপাল কি একটা তুচ্ছ সম্পত্তির জন্তে আমার সঙ্গে বিবাদ করতে যাবে? কুবের সকলকার বড় হয়েছে, সেই তার আত্মীয় স্বজন আশ্রিত প্রতিপাল্যদের দেখবে।

জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওরা আমার সব নিলে!

এই ঘটনায় বন্ধবিহারী, চন্দনমণি ও কুবের জগদ্ধাত্রীর চক্ষুশূল হইয়া পড়িল। তাহারাও কুণ্ঠায়, লজ্জায় চাকর-দাসীর কাছেও আর মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, মনে করিত যেন সকলের মনের মধ্যে নিরন্তর নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে—চোর! চোর!

উহারা যতই দূর হইয়া যাইতে লাগিল রাখাল,

মণিমালা ও ভূপাল ততই জগদ্ধাত্রীর নিভাস্ত্র আপনার ও নির্ভরের পাত্র হইয়া উঠিল। জগদ্ধাত্রী একদিন বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সোনার কাঁচি দিয়া আপনার রেশমের জায় কোমল সূক্ষ্ম দীর্ঘ কেশরাশি কাটিয়া ফেলিলেন; তারপর সেশুলিকে কালো রেশম দিয়া বাধিয়া বাধিয়া কতকগুলি চুলবাধা গুছি করিয়া বড় রূপার খালে সাজাইলেন; পেড়ে কাপড় ছাড়িয়া আবার সাঁদা ধুতি পরিলেন; হার ও অনন্ত খুলিয়া বাস্কে রাখিলেন; সোনা-বাধানো হাঁকাটাকে শ্বেতপাথরের মেঝেতে আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া সোনার বেড়টা বাস্কে রাখিলেন। ঝুনকিয়াকে বলিলেন—মণিকে ডাক।

মণিমালা আসিয়া মায়ের পরিবর্তন দেখিয়া অবাক হইয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—মণি, আমার মাথার এই চুলের গুছি, আমার গায়ের গহনা ভূপালের বোঁ হলে তাকে দিস। নিয়ে যা। এইমাত্র আমার সম্বল বাকী আছে, আর কিছু নেই। শনির দৃষ্টি পড়বার আগে তুই নিয়ে রাখ। পঁচিশ হাজার টাকার ক্রোম্পানীর কাগজ আছে—তাও আমি ভূপালকে দেবো মরবার সময়।

মণিমালার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলিল—তোমার নাতবোঁকে তুমিই হাতে করে সাজিয়ে দিয়ে যা।

জগদ্ধাত্রী চোখ মুছিয়া বলিলেন—সে সূখ আমার কপালে নেই। রাখাল ত অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দিতে দেবে না। আমি আর কতদিন বাঁচব? তুইই আমার নাম করে ভূপালের বোঁকে দিস।

মণিমালা চোখে আঁচল ঢাকা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী বলিলেন—ঝুনকিয়া, এই খালাটা, আর গহনার বাক্সটা মণির ঘরে রেখে দিয়ে আস।

চন্দনমণি যখন শুনিল যে বড় হাতীর দাঁতের বাস্কর একবাক্স গহনা বেহাত হইয়া গিয়াছে, তখন সে আপনার কপালে নির্ঘাত এক চড় মারিয়া বলিল—পোড়াকপাল আমার! গহনাস্ত্রলোর কথা ছাই একটুও মনে ছিলনা!... আচ্ছা!...

চন্দনমণি ছুটিয়া গিয়া বহুবিকারীকে বলিল—কুবিরের বিয়ের একটা শিগগির জোগাড় কর।

—হঠাৎ?

—দরকার হয়েছে।

শামুক আঁটিয়া গেলে যেমন ভাব হয় তেমনই একটা দৃঢ় ও অর্থপূর্ণ ভাব সহদৃষ্টিগীর মুখে লক্ষ্য করিয়া বহুবিকারী বলিল—আচ্ছা, কাঙালীকে বলি, তার জানা শোনা যদি কোনো ভালো মেয়ে থাকে।

কাঙালী বহুবিকারীর নিকট শুনিয়া খানিকক্ষণ মুখ উচু করিয়া ভাবিয়া বলিল—এক ভালো মেয়ে ত মনে পড়ছে না। রাজরাণী হবার যোগা মেয়ে ঘটক লাগিয়ে খুঁজতে হবে।

বহুবিকারী বলিল—ঠিক বলেছ, ঘটকদের নিযুক্ত করাই শ্রেয়।

কাঙালী সেইদিন বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া শীঘ্র তাহার পরিবার পাহাড়পুরে আনাইবার ব্যবস্থা করিল।

বেদিন তাহার পরিবার আসিয়া পৌঁছিল সেইদিন কাঙালী কুবেরকে বলিল—রাজাবাবু, তুমি আমার বাড়ীতে যাও না কেন? আমার বাড়ীতে কেমন পায়রা আছে, হীরামন পাখী আছে, ধরগোশ আছে.....

কুবের উৎসুক হইয়া বলিল—সত্যি মাষ্টার মশায়? আমি দেখতে যাব।

কুবের কাঙালীর বাড়ীতে যাইতেই কাঙালী ও তাহার স্ত্রী আত্মা বহু সমাদর করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তারপর কাঙালী ডাকিল—কাতু, এইদিকে এস, রাজাবাবুকে নিয়ে গিয়ে তোমার চিড়িয়াখানা দেখাওগে।

কাঙালীর কস্তা কাত্যায়নী লজ্জারক্ত নতমুখে আসিয়া কুবেরের সামনে দাঁড়াইল। গৌরী স্তম্ভরী সে, বয়স তাহার চৌদ্দ বৎসর। সে একখানি ধোয়া জরি-পেড়ে নীলাশ্রয়ী শাড়ী, হাতে ছগাছি সোনার চুড়ি, কানে দুটি ছল ও আলতা-দেওয়া পায়ে ঘুঙুর-দেওয়া মল পরিয়া আসিয়াছিল; এই সামান্য আভরণেই তাহাকে স্তম্ভর দেখাইতেছিল।

কাঙালী বলিল—কাতু, রাজাবাবুকে ডেকে নিয়ে যাও।

কাত্যায়নী লজ্জিত হাসিমুখে একটু তুলিয়া সঙ্কোচে চঞ্চল দৃষ্টিতে কুবেরের দিকে একটু চাহিয়া ধীর মৃদু কণ্ঠে বলিল—আম্বন।

কুবের সেই স্তম্ভরী কিশোরীর আত্মানে পুলক-মোহের মাদকতায় তন্ময় হইয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইল। মলের ঘুঙুরের মৃদুগুঞ্জে আকৃষ্ট হইয়া বংশীরবে মুগ্ধ সর্পের মতো কুবের কাত্যাবনী সঙ্কে-সঙ্কে চলিষা গেল।

আবার যখন মলের শব্দ ফিরিয়া আসিতে শোনা গেল তখন আত্মা একটু উচু গলাতেই কাঙালীকে বলিতেছিল—
কাতুর কি তেমন অদেষ্ট হবে যে রাজার গলায় মালা দেবে।
রাজবাণী পাটরাণী হওয়া সে কি যেমন-তেমন ভাগ্যের কথা। সে আমাদের বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সাধ!

উচু করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; কথা কয়টা কুবেরের কানে পৌছিল। সেইদিন হইতে মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর পশুপক্ষী কয়টির উপর কুবেরের এমন মমতা পড়িয়া গেল যে দিনান্তে তাহাদের একবার না দেখিলে সে স্থির থাকিতে পারিত না, এবং তাহাদিগকে এমন নিবিষ্ট ভাবে এত বেশীক্ষণ ধরিত সে পর্য্যবেক্ষণ করিত যে কুবের প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো নূতন আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে বলিয়া ধারণা হইতে পারিত।

বন্ধবিহারী যখন ঘটক লাগাইয়া মেয়ে খুঁজিতে ব্যস্ত ছিল, কাঙালী যখন মেয়েকে কুবেরের সহিত পবিচয় করাইতে ব্যস্ত ছিল, কুবের যখন কাত্যাবনী চিড়িয়াখানায় ভষ্টি হইয়া প্রাণীতত্ত্বের গবেষণায় ব্যস্ত ছিল, তখন চন্দনমণিও নিশ্চিন্ত ছিল না। সে আস্তে আস্তে গিয়া জগদ্ধাত্রীর কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। জগদ্ধাত্রী মুখ ঘুরাইয়া তার হইয়া বসিলেন। চন্দনমণি বলিল—দিদি, এই বেশই তোমার এখন ঠিক মানিয়েছে—আজ বাদে কাল তোমার বেটার বৌ ঘরে আসবে।.....আচ্ছা দিদি, কুবিরেব বিয়ে দেবে না? আমবা ত বুড়ো হতে চল্লম, কবে আছি কবে নেই, জীবনের সাধ আফ্লাদটা করে নেওয়া যাক এইবেলা। তোমারও ত একটি আদব যত্ন করবার লোক চাই—বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে নিয়ে এস।

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন, কোনো কথাই বলিলেন না। চন্দনমণি কিন্তু দমিবার পাত্র নহে, সে এতদিন যে-সঙ্কেচে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা জোর করিয়া তেলিয়া ফেলিয়া সে এখন নিরন্তর জগদ্ধাত্রীকে কাছে-কাছে হামেহাল হইয়া তাঁহার সেবা করিয়া তুষ্টসম্পাদন করিবার চেষ্টা করিবে সঙ্কল্প করিল।

কুবের জগদ্ধাত্রীর ঘরের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। চন্দনমণি ডাকিল—কুবির, শুনে যাও, দিদি ডাকছেন।

কুবের বিরক্ত মুখে আসিয়া গৌজ হইয়া দাঁড়াইল।
জগদ্ধাত্রী কোনো কথাই বলিলেন না। চন্দনমণি বলিল—তোমাব মা যে তোমার রিয়েব সম্বন্ধ কবছেন, তোমার বিয়ে হবে।

কুবেরের বিরক্ত মুখ প্রশন্ন হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে স্থিত মুখে চাহিল; কিন্তু তাঁহার মুখে হর্ষের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া কুবের সেখান হটতে প্রস্থান করিল। চন্দনমণিও আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

উহার চলিয়া গেলে জগদ্ধাত্রী রাখালকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—রাখাল, কুবেরের বিয়ে দিতে হবে, তুমি মেয়ের খোঁজ কর।

—বন্ধমামা ত খোঁজ করছেন।

—খোঁজ করছে বুঝি? আমাকে না জানিয়েই? না, ওদের খোঁজ করতে হবে না, তুমি খোঁজ কর।

—এত ছেলেকানুষের বিয়ে দেবেন না মা। কুবের এখন লেখাপড়া কল্লক, সাবালগ হোক, তখন বিয়ে দেবেন।

জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া গেলেন আর কোনো কথা বলিলেন না।

রাখাল চলিয়া গেলে বন্ধবিহারীকে ডাকাইয়া জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—বন্ধ, কোথাও ভালো মেয়ের সন্ধান পেলি?

—হাঁ, মহিষবাথানের বেচন চক্রবর্তীর মেয়ে নাক-ফুঁড়িকে ত আপনি দেখেছেন; তোকা সন্দবী মেয়ে; তার সঙ্গে কুবেরের বিয়ে দিলে হয় না?

—তা মন্দ কি? বেচনকে বলে দাও একদিন মেয়েকে নিয়ে আসুক, আমরাও একবার ভালো করে দেখি শুনি, কুবেরও একবার দেখুক।

বেচন চক্রবর্তী খবর পাইয়াই মেয়েকে নূতন চুনবী কাপড় কাঁচা করিয়া মাগরার ধরণে পরাইল; পাটের জাদ দিগা চুল বাঁধিয়া গৌজ খোঁপার নীচে জাদের খোঁপনা ছলাইল; কপালময় পেটে-পাড়া চুলের

নীচে-তেগ-সিঁহুর লেপিল; কানন, খাড়ু, হাঁহুলী ও শুজরী প্রভৃতি গহনার ভার সর্বাঙ্গে চাপাইল; কানে সার মাকড়ি ও নাকে বেসর ও বুলকি ঝুলাইল; পায়ে আলতা; হাতে মেহেদি ও চুলে মাথাঘসার মসলা লেপিয়া রাজার মনোহরণ বেশে কত্তা সাজাইল। তারপর একখানি ডুলিতে তাহাকে মুড়িয়া-সুড়িয়া বসাইয়া দিয়া নিজে একটা বেটো ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। রাজদরবারে যাইতেছে বলিয়া নিজেও একটু সাজিয়া লইয়াছিল—কবিয়া মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া তাহার উপর একটা মলমলের চাপকান পরিয়াছিল এবং একখানা তসরের চাদর উত্তরীয় করিয়া বুক ও একখানা পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধিয়াছিল,—রাজদর্শনের সময় সঙ্গে পটবস্ত্র থাকা আবশ্যক; বহুদিনের তেল ও শিশির খাওয়ানো দিল্লীওয়াল জুতা পায়ে ও একখানি ময়লা গামছা 'উরমাল' হাতে লইয়াছিল!

নাকফুড়িকে দেখিয়া জগদ্ধাত্রী বলিলেন—বাঃ! বেশ মেয়ে। একেই আমার বৌ-মা করব।

তাহার সেই বেশভূষা, আড়ষ্টভাব ও তামাটে-পাকা চেহারা দেখিয়া মণিমালা ত হাসিয়া খুন। সে অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া জগদ্ধাত্রীকে বলিল—এ মেয়ের সঙ্গে কুবেরের বিয়ে দিখো না মা।

রানী জগদ্ধাত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কেন? তোমাদেব কিছুই পছন্দ হয় না! এ মেয়ে মন্দ কিসে হল?

—কুবেরের পছন্দ হবে না মা।

—এখন মেয়ে আবার পছন্দ হবে না! বা ত ভূপাল তোর মামাকে ডেকে আনত, তোর মামীকে এসে দেখুক।

ভূপাল হাসিতে-হাসিতে দৌড়িয়া গিয়া কুবেরকে বলিল—মামা মামা, শিগগির এস, একটা কেমন জানোয়ার এসেছে দেখসে।

কুবের আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি জানোয়ার?

ভূপাল হাসিতে-হাসিতে গড়াইয়া পড়িয়া বলিল—হতুমধুমো!

কুবের উৎসুক হইয়া ভূপালের সহিত হতুমধুমো দেখিতে ছুটিল। আসিয়াই নাকফুড়িকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

—দেখলে মামা হতুমধুমো!—বলিয়া ভূপাল হাসিতে-হাসিতে গড়াইয়া পড়িল।

রানী জগদ্ধাত্রী বলিলেন—কুবের, দেখ কেমন কনে? বিয়ে করবিত?

চন্দনমণি বলিল—দিবি মেয়ে, এ আর কুবেরের পছন্দ হবে না! ওর বেশ পছন্দ হয়েছে।

কুবের বলিয়া উঠিল—ছাই পছন্দ হয়েছে। আমি মাষ্টার মশায়েব মেয়ে কাতায়নীকে বিয়ে করব।

সকলে আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিল—মাষ্টার মশায়? কাঙালী? তার মেয়েকে আবার কোথায় দেখিল?

কুবের চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল—মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে, আবার কোথায়?

ভূপাল কুবেরের সঙ্গে-সঙ্গে যাইতে-যাইতে জিজ্ঞাসা করিল—মামা, দিদিমার সামনে কাতায়নীকে বিয়ে কববে বলতে লজ্জা করল না?

কুবের বুক ফুলাইয়া বলিল—আমি রাজা! আমার আবার কাকে লজ্জা, কাকে ভয়! আমার যা খুসী আমি ত তাই করব। নইলে কি ঐ হতুমধুমোকে বিয়ে করব নাকি!

ভূপাল হতুমধুমোকে স্বরণ কবিয়া আবার হাসিতে গড়াইয়া পড়িল। বলিল—মামা, ওর নাম শুনেছ? দিবি নাম—নাকফুড়ি!

কুবের নাক সিঁটকাইয়া বলিল—যেমন চেহারা, তেমন সজ্জা, তেমন নাম।

বেচারী নাকফুড়ি আবার ডুলিতে চড়িল। বেচন চক্রবর্তী আবার ঘোড়ায় চড়িয়া মহিষবাথানে ফিবিয়া গেল।

ডাক কাঙালীকে, দেখ তাহার মেয়েকে,—রাজবাড়ীময় সাড়া পড়িয়া গেল।

বন্ধবিহারী কাঙালীকে ডাকিয়া স্নেহপূর্ণ ভৎসনা করিয়া বলিল—বাবাজী, তোমাব নিজের স্ত্রীর মেয়ে আছে! তোমাকে স্ত্রীব মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম সেদিন, তুমি ত তখন বললে না কিছু?

কাঙালী কাষ্ঠ-বিনয় অভিনয় করিয়া বলিল—বাজা-মামা, আমি কি কখনো মনেও করতে পারি যে আমাব

মেয়ে রাজরাণী হবে; সে কি রাজ্যবাবু যোগ্য। সে সাধ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার মতন হবে। লোকে হাসবে যে।

—না, না। তুমি অতি বিনয়ী সাধু সজ্জন আছ। তুমি আমাকে ভক্তি কর। তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে না ত হবে কে? তোমার মেয়েকে অন্তরে নিয়ে এস; রাণী-দিদি, তোমার রাণী-মামী, মণি-টনি সকলে দেখবে একবার।

রাজবাড়ীর কিংখাবের ঘেরাটোপ-দেওয়া রূপো-বাঁধানো পাঙ্কীতে লম্বা-লাঠিধাড়ে চৌগোঁপাওয়ালা দারোয়ানের পাহারায় বেষ্টিত হইয়া কাত্যায়নী শুধু একখানি কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া স্বল্প আভরণকে নিজের রূপে সুন্দর করিয়া রাজবাড়ীতে দেখা দিতে আসিল। সকলে দেখিয়া বলিল—হাঁ, রাণী হইবার মতন রূপ বটে।

ভূপাল ছুটিয়া গিয়া কুবেরকে বলিল—মামা, মামা, কেমন মামী এসেছে দেখসে।

কুবের হাসিয়া বলিল—বাঃ! আর জ্যাঠামি করতে হবে না।

রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন—মণি, ভাখ, এ মেয়ে রাণী হবার যুগ্মি কি না।

মণিমালা হাসিয়া বলিল—মা, শুধু রূপ হলেই রাণীর যুগ্মি হয় না,—বাহির-ভিতর দুইই বার ভালো, তারই রাণী হওয়া উচিত—তার ওপর যে অসংখ্য লোকের সুখদুঃখ নির্ভর করবে!... ..কাতু ত আমার অচেনা মেয়ে নয়? ওদের গাঁয়ে গিয়ে ত আমি বছর খানেক ঘর করে এসেছি।

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল—যাকে দেখতে নারি তার হার্টন বাঁকা! তোমরা ক্যাঙালীকে দুচক্ষে দেখতে পারনা, তাইতে তার এমন সোনার মেয়েও তোমাদের মনে ধরে না।

মণিমালা হাসিয়া বলিল—ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে না মামী, দিলে কান্নার ভালো হবে না।

—যাট যাট! শুভকর্মে অমন অলঙ্কণে কথা বোলো না বাছা।

—একবার বললাম আর বলব না। ঐটুকু মেয়ের কৌদলের জালায় পাড়ার লোক অস্থির থাকত, গায়ে পড়ে ঝগড়া করত ও।

—ছেলেবেলা অমন অবস্থা সবাই হয়েই থাকে। এখন ত দিব্যি শাস্ত শিষ্ট হয়েছে; মুখে রা-টি নেই। ক্যাঙালীর মেয়ে কখনো খারাপ হতে পারে?

এ কথা আর উত্তর নাই। মণিমালা একটু হাসিয়া, উঠিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনমণি জনান্তিকে বলিয়া উঠিল—উঃ! কী বিষম হিংসে।

রাণী জগদ্ধাত্রী মুখ ভার করিয়া বলিলেন—বৌ, বন্ধকে বল গণপতি ভট্টাচার্যকে দিয়ে একটা বিয়ের দিন দেখিয়ে ঠিক করুক। এই মেয়ের সঙ্গেই কুবেরের বিয়ে দিতে হবে।

(৫০)

রাজবাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার লাগিয়া গেল—রাজ্য-বাবুর বিয়ে! বিবাহের ব্যয়-মঞ্জুরীর জন্ত বন্ধবাহারীর অহরোধে কাঙালী বোর্ডে দরখাস্ত লিখিয়া দিল। রাণী জগদ্ধাত্রীর দস্তখতে সেই দরখাস্ত চল্লিশহাজার টাকা ষ্টেট হইতে পাইবার হুকুম মঞ্জুর করিয়া আনিল।

কিন্তু বন্ধবাহারী এক ফর্দ করিল যাট হাজার টাকার। রাণী জগদ্ধাত্রীকে বুঝাইল যে স্বাধীন নৃপতির বিবাহে মাত্র যাটহাজার টাকা খরচ ত অতি সংক্ষেপে নমো নমো করিয়া কাজ সারা।

রাণী জগদ্ধাত্রী বলিলেন—তা ত বটেই! কিন্তু বাকী বিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় কোথায়? আমার ত তোরা কিছু বাকী রাখিস নি।

—কেন? আপনার কোম্পানির কাগজ রয়েছে ত।

—সে আমি ভূপালকে দেবো মনে করেছি।

—হাঁ সে ত দিতেই হয়। কিন্তু এখন কাজ আটকাচ্ছে, ঐটা ভাঙিয়ে এখন খরচ হোক, তারপর কুবের সাবালগ হয়ে রাজ্য হলে ষ্টেট থেকে সে আপনাকে পঁচিশ কেন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেবে।

রাণী জগদ্ধাত্রী কোম্পানির কাগজখানি বাহির করিয়া বন্ধবাহারীর হাতে দিলেন। শুভকর্মে অনেক বিঘ্ন ভাবিয়া কাঙালী স্বয়ং কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিতে কলিকাতা যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল।

রাখাল যখন অনিল যে কাত্যায়নীর সহিত কুবেরের

বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার ভয় হইল যে সে সত্যি! রাখাল আর মণি কুবেরের হিংসাতেই কুবের এবং বন্ধুবিহারী ও চন্দনমণির সঙ্গে কাত্যায়নীর যোগ হইলে কাহারো ভিত্তিবার জো থাকিবে না। কাঙালীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া রাখাল কাঙালীকে বলিল—কাঙালী-দা, এ কাজটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?

কাঙালীর মুখ শুকাইয়া গেল, রাখাল কোম্পানির কাগজের কথা বলিতেছে মনে করিয়া শুক মুখে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

—বংশজের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া।

কাঙালী হাঁক ছাড়িল।—কেন ক্ষতি কি?

—তুমি এতবড় কুলীন, দেশে সমাজ নিয়ন্ত্রণ হলে আগে তোমাকে মালাচন্দন দিয়ে বরণ করতে হত; বংশজের বাড়ী অল্পগ্রহ করে ভাত খেতে তুমি পাঁচটাকার কম দক্ষিণায় রাজি হতে না; আর আজ অক্লেশে তুমি সেই কুলমধ্যাদা একেবারে বিসর্জন দিতে যাচ্ছ! আমি ত কুল-ফুল মানিনে, তোমরা মানো বলেই বলছি।

কাঙালী লজ্জিত হইয়া বলিল—কি জানো রাখাল, মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে—

—তোমার আরও মেয়ে রয়েছে। তোমার ছেলের মেয়ে রয়েছে, আরও হবে। তাদের মুখের দিকে ত তাকাচ্ছ না। তাদের এর পর কি গতি হবে? কোথায়ই বা তাদের বিয়ে দেবে, আর সমাজেই বা তোমার অবস্থা কি হবে তা ভেবে দেখেছ কি?

—পরস্রা থাকলে বিয়ের জন্তে আটকাবে না।

—তুমি ত মাত্র দুশো টাকার চাকরী কর।

—রাজা জামাই হলে সেই তার শশুরবাড়ীর মেয়েদের ভালো জায়গায় বিয়ের খরচ দেবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল—অনিশ্চিতের আশায় নিজের জাতের সম্মানটা খোচানো ভালো হচ্ছে কি না, আর একবার ভালো করে ভেবে দেখো!

কাঙালী গুম হইয়া রহিল। রাখাল চলিয়া যাইতে না যাইতেই রাজবাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে রাখাল বিবাহে ভাঙচি দিতে গিয়াছিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী শুনিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—বৌ যে বলে, রাম সবার বন্ধু, রামের বন্ধু কেউ নয়,

সে সত্যি! রাখাল আর মণি কুবেরের হিংসাতেই গেল।

চন্দনমণি বলিল—দেখলে দিদি, আমি কি মিথ্যে কথা বলি, না হিংসে করে বলি। মণি যে কুবেরের অত যত্ন করে, তার মতলব কি বুঝিনে, কুবির রাজা হলে ওর স্বর্গে চেপে স্থখ করবার ফিকির!

কুবের বলিয়া উঠিল—সে আর হচ্ছে না। আমি সবাইকেই চিনে নিয়েছি। আগে আমি স্বাধীন রাজা হই, তারপর দেখাব মজা!

চন্দনমণির একটা বড় রকমের দুর্ভাবনা ঘুচিল।

ইহার পর রাখাল মণিমালা ও ভূপালকে দেখিলেই রাণী জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া বসেন। তাহাদের সহিত কথা বলা একরকম বন্ধ হইয়া গেল এবং চন্দনমণির সহিত ঘনিষ্ঠতা আবার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

চাক বন্দোপাধ্যায়।

ছোটলোক

আনত-মুখে বেদনা বুকে, ভিখারী উঠানে

দাঁড়াল যেই,

ভরিয়া মুঠি, আগিল ছুটি—বধু সে।

কপালে ঘোমটা নেই?

“হ্যাগা বউ—ওমা—ওকি—ছি ছি ছি।

কি ছোট-লোকের এ আনিয়াছি ঝি”—

দূরে গবাক্ষে গর্জে শাস্ত্রী তার।

হুঁহাতে বক্ষে টানিল ভিখারী

দেহ-লতা বালিকার।

সীঁথির সিঁদুরে ভিখারী-অশ্রু বরিল রক্তমণি

“ওমা—ওকি—ওগো!” ছুটিল শাস্ত্রী করে সম্ভারজনী।

চমকি দাঁড়াল—“এ যে গো বেয়াই!

—কাঁধে কেন ছেঁড়া-ঝুলি?”

হাসিয়া ভিখারী কহিল—“বেয়ান!

তুমিই দিয়াছ তুলি।—”

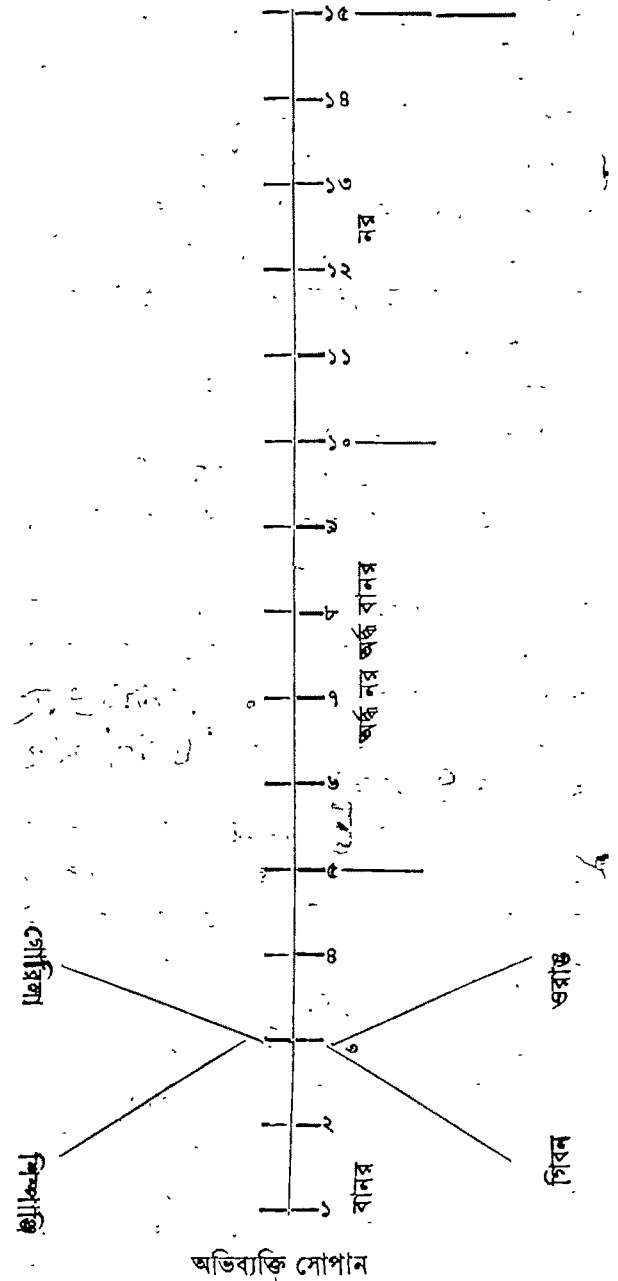
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে

খাত্তের ক্রম-বিকাশ

বানর-বংশ হইতেই যে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা একরূপ নিঃসংশয়-রূপেই স্থির হইয়া গিয়াছে। জ্ঞাতিক্ষমত্রে গোরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বনমানুষেরা যে আমাদের পরম আত্মীয়, সে কথা আর অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। মানুষ আর এই সব বনমানুষেরা যে একই পিতামাতার উত্তর-বংশীয় সন্তান, কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত আবার এমন কথাও বলিয়া থাকেন। ইহা যে অসম্ভব সে কথা বলা যায় না। সে যাই হোক, ইহা যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন, বানর হইতে সহসা টপ করিয়া মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা সহসা হয় নাই। ধীরে ধীরে ক্রমাভিব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। সুবিধার জন্য এই অভি-ব্যক্তিকে কয়েকটি stage বা অবস্থার ভাগ করা যাইতে পারে। এবং ইহার জ্ঞাত মাথার খুলির আয়তনের উপর নির্ভর করিতে হয়।

ধরিয়া লওয়া যাক মানুষ এবং গোরিলা ও শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বনমানুষদের পূর্বপুরুষ একই। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে, বর্তমান বনমানুষের মাথার খুলির যে মাপ, মানুষের পূর্বপুরুষের মাথারও সেই মাপ। একটা শিম্পাঞ্জির মাথার মাপ ৩০০ কিউবিক সেন্টিমিটার (cubic centimeter); তাহা হইলে, মানুষ ঘাহাদের হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদেরও মাথার মাপ ৩০০ কিউবিক সেন্টিমিটার। বর্তমান সভ্য মানুষের মাথার মাপ কিন্তু ১৫০০ কিউবিক সেন্টিমিটার। তাহা হইলে এই দেখা যাইতেছে, বানর-অবস্থা হইতে মানুষ বৃত্তি উঠিয়াছে, তাহার মাথার খুলির আয়তনও তেমনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথম ছিল ৩০০, ক্রমে ক্রমে ১০০ করিয়া বাড়িয়া ১৫০০ হইয়াছে। অল্প কথায় ৩ হইতে ১৫তে উঠিয়াছে। অর্থাৎ ৩ হইতে ৪; ৪ হইতে ৫; এইরূপে এক এক সিঁড়ি উঠিয়া বর্তমান সভ্যবস্থায় ১৫তে উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নের চিত্রে বানর হইতে মানুষের ক্রমোন্নতি দেখান যাইতেছে।



(৩ সিঁড়িতে মানুষের পূর্বগামী বানরের স্থান দেখান হইয়াছে; এ-সময় তাহার মাথার খুলি ৩০০ সি, সি ছিল। ১৫ ধাপে বর্তমান সভ্য মানুষের স্থান; মাথার খুলির মাপ, ১৫০০ সি, সি। ১০ সোপান হইতেই যথার্থ নরের সৃষ্টি। ৩ হইতে ৫ সোপান পর্যন্ত নবাকার বানর; ৫ হইতে ১০ পর্যন্ত বানবাকার নব। ১০ হইতে যথার্থ নর।)

এতাব্যকাল মানুষের খাদ্যের মধ্যে জাস্তব ও উদ্ভিজ্জ — এই উভয়বিধ পদার্থ থাকিতে দেখা যায়। তাহাকে কোন কালেই শুধু নিরামিষ বা শুধু আমিষ থাইয়া জীবন ধারণ করিতে দেখা যায় না। আমিষ ও নিরামিষের পরিমাণ কিন্তু সকল অবস্থাতেই সমান থাকিতে দেখা যায় না। মানুষ যেই এক-এক ধাপ করিয়া উন্নতির সোপানে উঠিয়াছে অমনি তাহার খাদ্যের মধ্যে আমিষ ও নিরামিষের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে। কিছুপ ভাবে হইয়াছে, তাহা আমরা পবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাহার পূর্বে জীব-ও উদ্ভিদ-জগৎ হইতে মানুষ যে-সকল খাদ্য আহরণ করিত, তাহাদের নামোন্লেখ করিব। জাস্তব খাদ্যের মধ্যে সর্ষপ্ৰকার মাংস, মংস্ত, পক্ষীমাংস, ডিম, বেড়, সাপ, গিরগিটি, পোকামাকড়, শামুক, ঝিহুক, কীট পতঙ্গ, হৃদ, মধু প্রভৃতি ছিল। উদ্ভিজ্জ খাদ্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

(অ) বীজ,—উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে বীজই সর্ষপ্রধান, কেননা ইহা যেমন পুষ্টিকর এমন অল্প কিছু নহে। বীজে প্রোটিন (proteid) পরিমাণে খুবই বেশি।

(আ) ফল—ইহাদের মধ্যে শর্করা ও কতকগুলি লবণ আছে, প্রোটিন (proteid) নাই বলিলেই হয়।

(ই) কন্দমূল প্রভৃতি—ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ স্বেত-শর্করা (starch) থাকিতে দেখা যায়।

(ঈ) শাকশব্জি,—পত্র পল্লবাদি ইহার অন্তর্গত।

এ-সকল ছাড়া স্থল-বিশেষে ও দেশ-বিশেষে বেঙের ছাতা (mushroom), সমুদ্রজাত উদ্ভিদ, এবং বৃক্ষ-বিশেষের বহুল ও গঁদও খাদ্যরূপে ব্যবহার হইয়া আসিতে দেখা যায়।

উপরে যে-সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম করা গেল, স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাদের তেমন স্বাদ থাকে না এবং ইহারা অনেকটা অস্বাদ পদার্থে পূর্ণ থাকে। কর্ণ দ্বারা ইহাদের গুণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে, তখন ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি হয়; শিঠা, শিকুড়ে কমিয়া তাহার স্থানে শাঁসাল পদার্থ জন্মাইতে দেখা যায়। অনেক উদ্ভিদ আবার স্বাভাবিক অবস্থায়, কটু, তিক্ত এবং বিষাক্ত থাকে, চাষের দ্বারা তবে খাদ্যের উপযোগী হয়। এই স্থানে এই কথাটি

মনে রাখা আবশ্যক, চাষ আবাদ প্রভৃতি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে, এত বড় বিপুল বিশেষ মানুষ শুধু উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিয়া একদিনও টিকিতে পারে নাই। উদ্ভিদ ছাড়া তাহাকে খাদ্যের জন্য জীব জানোয়ারের উপরও বড় কম নির্ভর করিতে হয় নাই। সাধারণের ধারণা কিন্তু ইহার বিপরীত। ইহারা মনে করেন সত্যযুগে মানুষকে খাদ্যের জন্য জীবহিংসা করিতে হইত না, সে সময় গাছে গাছে, লতায় লতায়, প্রচুর স্বরসাল ফল ধরিয়া থাকিত, কেবল গাড়িয়া থাইবার কষ্টটুকু স্বীকার করিলেই হইত। আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। পৃথিবীতে আজও এমন অনেক অসভ্য বর্ষের জাতি আছে, যাহারা কৃষিকাজ জানে না, বস্ত্র ফল মূলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করে। কৃষিকাজ না জানিলেও, ইহারা কিছু-কিছু কাজ বুঝে। এই কারণে কাঁচা অবস্থায় যে-সকল উদ্ভিদ খাওয়ার উপযোগী নয়, তাহাদের প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা খাদ্যের উপযোগী করিয়া লয়। তবুও কিন্তু ইহাদের শুধু উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিয়া চলে না। ইহাদের মংস্য মাংস প্রভৃতিও ব্যবহার করিতে হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, চাষ আবাদ প্রবর্তিত হইবার পূর্বে, শুধু উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিলে, মানুষের টিকিয়া থাকা সম্ভব হইত না। সাধারণের আর-একটি ভুল বিশ্বাস এই যে, কলা, লেবু, আম, জাম, আঙ্গুর, লেবু প্রভৃতি স্বমিষ্ট স্বরসাল ফলমূল আজ আমরা যে অবস্থায় দেখিতেছি, চিরকালই তাহারা সেইরূপই ছিল। ইহারা মনে করেন, এককালে বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, ইহারা অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ইহাদের বর্তমান অবস্থা যে সম্পূর্ণভাবে কর্ণ-জাত, এ কথা অনেকেই অবগত নহেন। আদিম অবস্থায় ইহারা হয়ত একবারেই খাদ্যের উপযোগী ছিল না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জঙলা আম ও বাগানের আমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আক ও নারিকেলও শুধু কর্ণের দ্বারা তাহাদের বর্তমান উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

খাদ্যের ক্রমোন্নতি।

বনমানুষ হইতে মানুষ হইবার কালের মধ্যে মানুষের খাদ্যের যে-সকল পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাদের মোটামুটি

তিনটি যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক যুগের বিশেষত্ব এই যে খাদ্যভ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদের উন্নতি হইয়াছে।

প্রথম যুগের সহিত আমাদের পরিচয়, যখন মানুষ তাহার অভিব্যক্তি-সোপানের ১০ম ধাপে পদার্পণ করিয়াছে। এ সময় সে পশুশীকার করিতে ও মাছ ধরিতে শিখিয়াছে। ইহার পূর্বে তাহাকে প্রধানতঃ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত; কেননা, কি করিয়া পশুশীকার করিতে হয়, কেমন করিয়া মাছ ধরিতে হয়, তাহা সে জানিত না। কিন্তু ঘেঁই সে শীকার-কৌশল উদ্ভাবন করিল, অমনি মানুষ তাহার খাদ্যতালিকা হইতে উদ্ভিদের পরিমাণ হ্রাস করিয়া, মৎস্য-মাংসের উপর অধিকতর-রূপে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ ১১ ধাপ হইতে ১২ ধাপে উঠিবার সময়। এই যুগের বিশেষত্ব এই যে, এ সময় মানুষ উদ্ভিজ্জ ভ্রব্যকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ না করিয়া, তাহাকে প্রস্তুত করিয়া খাইতে শিখিল। উদ্ভিদকে রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া জলে, ভিজাইয়া নরম করিয়া, অথবা অগ্নির সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে ধরিল। এক্ষণে করিতে থাকায়, যে-সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ পূর্বে ব্যবহারের উপযোগী ছিল না, তাহারাও ব্যবহারের যোগ্য হইল; তাহার ফলে এ সময় খাদ্যের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইল।

তৃতীয় যুগের আরম্ভ অভিব্যক্তি-সোপানের ১৩ ধাপ হইতে। এ সময় মানুষকে কিছু হিসাবী হইতে দেখা যায়। ইহার পূর্বে তাহাকে কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে দেখা যায় না। এখন হইতে সে ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয় করিতে শিখিল। এই সময়ই সে প্রথম চাষ করিতে আরম্ভ করিল। এই জন্ত তাহার খাদ্যের তালিকা পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণে বর্ধিত হইতে লাগিল।

বনমাহুষ হইতে মাহুষের পদবীতে উন্নীত হইবার কালে, খাদ্যের যে-সব ক্রমিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এখানে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বানরাবস্থা (anthropoid stage)—এ সময়

আমাদের পূর্বপুরুষদের খাদ্য অবিকল বর্তমান কালের বনমাহুষদের মত ছিল। ফলমূল, বীজ, পত্র প্রভৃতিই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল বটে, তবে কিয়ৎপরিমাণে পোকা মাকড়, বেঙ সাপ প্রভৃতিও যে না চলিত এমন নয়।

নর-বানরাবস্থা (homosimian period)—অন্ত অবস্থার তুলনায় এ অবস্থাটি অধিক দিন স্থায়ী বলিয়া বিবেচনা হয়। এ সময় মাহুষকে বানর নাম ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে নর নাম গ্রহণের জন্ত নিয়ত চেষ্টিত থাকিতে দেখা যায়। এ যুগের বেশীর ভাগ সময় যদিচ তাহাকে প্রধানতঃ কাঁচা উদ্ভিদ খাইয়া জীবনধারণ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এখানে তাহার খাদ্যের প্রকার-ভেদ বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সময় হইতে দেখা যায়, সে এক স্থানে না থাকিয়া সর্বদা পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। পূর্বাপেক্ষা চালাক চতুরও হইয়াছিল। ছোটখাট জীব জ্ঞানোয়ারকে বাগে পাইলে, ধরিয়া ভক্ষণ করিতেও শিখিয়াছিল। ফল কথা, এ সময় হইতে মাহুষ ক্রমশঃ আমিষাহারী হইতে আরম্ভ করিল এবং নিরামিষের পরিমাণ কমাইতে আরম্ভ করিল।

শিকারী ও মৎস্যজীবী অবস্থা

(Early hunting and fishing period)

এ-সময় মাহুষ পশু শিকার করিয়া ও মাছ ধরিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল। পশু শিকার করিতে ও মাছ ধরিতে নানা-প্রকার কৌশল অবলম্বনের আবশ্যক, মাহুষ এসময় তাহা উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কাঁদ তৈরী, ধনুর্কাণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে নিতান্ত কম বুদ্ধির আবশ্যক করে না। অতএব এসময় মাহুষের বুদ্ধি পূর্বের অপেক্ষা অনেকটা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। অস্ত্রশস্ত্র বা কাঁদ ভিন্ন বড় বড় পশু শিকার করা সম্ভবপর নয়, আর কোনরূপ একটা কৌশল অবলম্বন না করিলে যথেষ্ট মাছও ধরা সম্ভব নয়। এই-সবল কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে থাকায়, মাহুষের বুদ্ধিবৃত্তির এসময় বিশেষ পরিচালনা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইহার ফলে,

তাহার জ্ঞানব পরিমাণ বেশ একটু পরিসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সভ্যকথা বলিতে কি, এই সময় হইতেই মানুষ যথার্থ মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্বে, তাহার আচার-ব্যবহার, বিদ্যাবুদ্ধি, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই অনেকটা বানরের মতই ছিল। এসময় সে শিকার অন্বেষণ ও মৎস্তের সন্ধানে সর্বদাই একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিত। ইহার জন্ত তাহাকে মৎস্ত-মাংসের অভাব অনুভব করিতে হইত না। ইহার ফল এই হইল যে, সে খাদ্য হইতে উদ্ভিদের পরিমাণ কমাইতে লাগিল—এখন সে দস্তুরমত আমিষাশী হইয়া পড়িল। তাহার পাকাশয়ে পূর্বের মত উদ্ভিজ্জ খাদ্য আর তেমন সম্ব হইতে থাকিল না, কাজেই তাহাকে বেশী মাত্রায় আমিষের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল। ইতিপূর্বে যে-সকল স্থান উদ্ভিদবহুল, সেই-সকল স্থানেই মানুষ বাস করিত; এখন হইতে আর তাহাকে তাহা করিতে হইল না। যেখানেই শীকার ও মৎস্ত আছে, মানুষ সেই সেই স্থলে গিয়া বাস করিতে লাগিল। মানুষের এই শীকার-জীবী অবস্থাতেই, তাহাকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়।

এখন পর্য্যন্ত মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখে নাই। কি করিয়া রাখিতে হয়, তাহা তাহার মাধ্যম আসে নাই। এরূপ অবস্থায়, খাদ্যদ্রব্যকে খুব ভাল করিয়া না চিবাওয়া, গলাধঃকরণ করিবার জো ছিল না। ইহার ফলে উদ্ভিদ খাদ্যের শ্বেতসার-ভাগ লালব সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইত এবং মুখের মধ্যেই তাহার জীর্ণকার্য অনেকটা সম্পন্ন হইত, কেননা লাল সহযোগে শ্বেতসার একরূপ শর্করায় পরিণত হয়, লালার সহিত মিশিতে না দিলে, তাহা হইতে পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, রন্ধন-বিদ্যা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য এখনকার মত অপরিবর্তিত আকারে মানুষের পাকাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। আদি রন্ধনযুগ (The early cooking period) এসময় মানুষ খাদ্যদ্রব্যকে রন্ধন করিতে শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু কৃষিকাজ ও পশুপালন-ব্যাপার তখনও তাহার

কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। মানুষ যে-দিন প্রথম রাখিতে শিখিল, অভিব্যক্তির ইতিহাসে সে-দিনটি একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন মনে করিতে হইবে। কেননা মানব-সভ্যতার জন্মই সেইদিন হইতে। ইহার পর হইতেই কৃষিকাজের সূচনা হইতে দেখা যায়। মানুষ প্রথমতঃ উদ্ভিদখাদ্যই রাখিয়া থাইত, আমিষকে—এমন কাঁচা অবস্থায় আহার করিত। ইহার একটা কারণও না ছিল এমন নয়। সে অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিল উদ্ভিদকে রাখিয়া থাইলে যত সহজে জীর্ণ হয়, এমন কাঁচা অবস্থায় নহে। আমিষের বেলায় রন্ধনের সে কোন আবশ্যক উপলব্ধি করে নাই। কেননা কাঁচা মাংস সে অতি সহজেই জীর্ণ করিতে সমর্থ হইত। আব একটা কথা এই যে, যাহাকে অত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া শীকার করিত, তাহাকে সেই দণ্ডেই উপভোগ করিবার জন্ত তাহার মনে স্বাভাবিক স্পৃহা জন্মিবাবই কথা। রাখিবার বিদ্যও সম্ব করিতে পারিত না। রন্ধনের দ্বারা মাংস অধিকতর সুস্বাদ হয়, সত্য, কিন্তু জীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে কাঁচা মাংস যে রাখা মাংস অপেক্ষা বেশী সুবিধাকর সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অসভ্য ও বর্বর অবস্থায় মানুষ সুগন্ধ, সুস্বাদ ও সৌন্দর্যের কোন ধারই ধারে না। এগুলি সভ্যতার আনুষঙ্গিক ফল। রন্ধন-বিদ্যা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বহুদিন ধরিয়া মানুষ প্রথমতঃ আমিষ থাইয়াই জীবন ধারণ করিত। শীকারলব্ধ জীবকে ঔৎসুক্য ও আনন্দের সহিত টপ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিত, এবং তাহা সহজে জীর্ণ করিয়াও কেলিত। এই কারণে আমিষকে রাখিবার সে কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি করে নাই। কিন্তু উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাহার ধারণা অগুরুপ হইয়াছিল। এসময় অধিকাংশ উদ্ভিদই কাঁচা অবস্থায় তাহার পক্ষে জীর্ণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এই কাবণে মানুষ সর্বপ্রথমে উদ্ভিদ-খাদ্যকেই রাখিয়া থাইতে পরিয়াছিল, আমিষ-খাদ্যকে নহে।

অবশ্য এরূপ মনে করা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, রন্ধন করিতে শিখিবার পূর্বে মানুষ কাঁচা উদ্ভিদখাদ্য যাহাতে সহজে জীর্ণ হয়, তাহার জন্ত কোন চেষ্টাই অবলম্বন করে নাই। সে উদ্ভিদখাদ্যকে রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিত, মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া নরম করিয়া লইত। এসকল

উপায়ে উদ্ভিদখাদ্য যে অনেকটা সহজ-পরিপাচ্য হয়, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া ইহাও জানা যায়, যে, এসময় বিবাক্ত উদ্ভিদকে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, তাহার বিবাক্ত অংশ তফাৎ করিয়াও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। এই-সকল কারণে যে-সকল উদ্ভিদকে সে ইতিপূর্বে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ ছিল, সেগুলিও খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই কারণে তাহার উদ্ভিদ-খাদ্যের তালিকা যে কিয়ৎপরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; কিন্তু যে-দিন মানুষ রন্ধন করিতে শিখিল, সেই দিন হইতেই তালিকাটি অসম্ভবরূপে ক্ষীণ হইয়া উঠিল। কেননা যে-সকল উদ্ভিদ কোনরূপেই গ্রহণযোগ্য ছিল না, তাহারাও রন্ধনের দ্বারা আহারের উপযোগী হইয়া দাঁড়াইল। ইহার ফলে, মানুষের পূর্বেরকার শীকারবৃত্তি অনেকটা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। সে যে শীকার অভ্যাস একবারে ত্যাগ করিল, কিংবা আমিষে আর তাহার কোন লোভ থাকিল না, এমন নহে। তবে সে পূর্বের অপেক্ষা আমিষের পরিমাণ অনেকটা কমাইয়া ফেলিল। এখন তাহার খাদ্যের মধ্যে অর্ধেক উদ্ভিদ ও অর্ধেক আমিষ থাকিতে দেখা গেল।

রন্ধনের দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের এমন অবস্থা হয়, যাহাতে আর তেমন চিবাইবার আবশ্যক করে না। এই কারণে মানুষ যে-দিন রাঁধিতে ধবিল, সেইদিন হইতে তাহার চিবাইবার অভ্যাসটাও অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতে লাগিল। শ্বেতদাঁত-জাতীর খাদ্য আর পূর্বের মত লাল। সহযোগে মুখের মধ্যেই জীর্ণ হইবার স্বযোগ পাইল না।

কৃষিজীবন (agricultural life)

মানুষ কবে হইতে কৃষিকাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ঠিক বলা বড় কঠিন। যতই কম হউক, ইহা অস্তুতঃপক্ষে ৪০০০ বৎসরের কম নয়। মানুষ আগে কৃষিকাজ, না আগে পশুপালন করিতে শিখিয়াছে, তাহাও ঠিক বলিবার উপায় নাই। এদিকটা মহাদেশে এমন কয়েকটি অসম্ভ্য জাতির ইতিহাস পাওয়া যায়, যাহারা চাষবাস করিবার পূর্বে পশুপালন করিতে শিখিয়াছিল।

অসময়ের জন্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হইতেই সম্ভবতঃ কৃষিকার্যের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

কৃষিকাজ ও পশুপালন করিতে শিক্ষা করা অবধি মানুষের খাদ্যের তালিকা অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। কৃষি-জীবন আরম্ভ করিবার পূর্বে ফলমূলাদির আহবানের চেষ্ঠায় মানুষকে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কিন্তু এখন আর তাহার কোনই আবশ্যক ছিল না। কেননা সে ইচ্ছামত এখন হইতে সকল দ্রব্যই একস্থানে থাকিয়া উৎপন্ন করিতে পারিত। বন্য নারিকেল, তাল, ডুমুর, খেজুর প্রভৃতি যাহা পূর্বে একবারে খাবার উপযোগী ছিল না, এসময় তাহারা উপাদেয় ফলে পরিণত হইল। চাষের দ্বারা উদ্ভিদের যে কতদূর উন্নতি সম্ভব, তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত গোল আলু ও কপি। এ-দুটি জিনিসই এক সময়ে নিতান্ত অখাদ্য ছিল, কিন্তু চাষের গুণে আজ তাহারা তরকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এইরূপে কৃষিকাজের দ্বারা মানুষ তাহার খাদ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ উভয়ই অসম্ভব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইল। কৃষিবিদ্যায় যখন তাহার একটু অভিজ্ঞতা জন্মিল, তখন মানুষ ধান গম যব প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইল। এ সময় মানুষ যে শুধু উদ্ভিদ-খাদ্যেরই উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহা নহে, জাস্তব খাদ্যেরও এ সময় বড় কম উন্নতি হয় নাই। পশুপালন করিতে শিক্ষায়, সে এ সময় হইতে নানা-প্রকার পশুপালন করিয়া তাহাদের মাংস ও দুগ্ধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পুষ্টি, তাহাদের ডিম্ব ও মাংস ব্যবহার করিতে লাগিল। ফলতঃ মানুষ যেদিন হইতে কৃষিজীবন অবলম্বন করিল, সেইদিন হইতে কি জাস্তব, কি উদ্ভিদ সকল-প্রকার খাদ্যেরই বিশেষ উন্নতি সাধিত হইল। তবে জাস্তব খাদ্য অপেক্ষা উদ্ভিদ-খাদ্যেরই যে বেশী উন্নতি হইয়াছিল সে কথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণে এ সময় মানুষের খাদ্যের মধ্যে আমরা নিরামিষের পরিমাণ বেশী এবং আমিষের পরিমাণ অল্প থাকিতে দেখি। বর্তমান কালেও সম্ভ্য মানুষ প্রতিদিন যাহা খাইয়া থাকে, তাহার মধ্যে নিরামিষের ভাগই বেশী, এবং আমিষের ভাগ অপেক্ষাকৃত কমই বলিতে হইবে।

মানুষের কৃষিজীবী অবস্থাকে দুইটি যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম যুগে আমরা মানুষকে

কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া চাষ-বাস করিতে দেখিতে পাই না। সে একটি উর্বর ভূমিখণ্ড পছন্দ করিয়া, সেখানে কিছুদিনের জন্ত থাকিয়া শস্তাদি বপন করিল, তাহার পর উৎপন্ন শস্ত সংগ্রহ করিয়া অল্পত চলিয়া গেল। এ সময় তাহার বাড়ী কি গ্রাম বলিয়া কিছু ছিল না। ইহার পর আমরা মানুষকে ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিয়া চাষ-বাস করিতে দেখি। মানুষকে বর্তমান সময়ে যে অবস্থায় দেখিতেছি, ইহা সেই অবস্থা আর কি।

পূর্ব অবস্থায় মানুষ যে শুধু চাষ করিত তাহা নহে, তাহার সঙ্গে শীকাবও করিত। কৃষিজীবনের প্রথম অবস্থায়, মানুষ এক স্থানে স্থির হইয়া না থাকায়, সে তেমন ভাবে আত্মোন্নতি করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কেননা সে সময় তাহাকে খাদ্যের সম্বন্ধে প্রায় সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত—ভাবিবার বা চিন্তা করিবার তাহার অবসর মাত্র ছিল না। যে-দিন মানুষ ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে ধরিল, মানুষের সভ্যতার ও উন্নতির প্রকৃত আরম্ভও সেইদিন হইতে মনে করিতে হইবে। সেও আবার কম দিনের কথা নহে। যেমন-তেমন করিয়া ত্রিশ হাজার বৎসর ত হইবেই। প্রাচীন ভারতবর্ষ, বাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশে অন্ততঃ ৩ হাজার বৎসর পূর্বে মানুষ এক স্থানে বাস করিয়া কৃষিকাজ করিত, পণ্ডিতরা এমনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কৃষিকার্যের যেমন যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, মানুষ বনজাত উদ্ভিদ খাওয়া ততই কমাইতে আরম্ভ করিল। এখন আর সে উদ্ভিদকে পূর্বের মত কাঁচা অবস্থায় আহার করিত না, ফলফুলারী ভিন্ন অল্প সকল উদ্ভিদ-খাদ্যকেই সে অগ্নির সাহায্যে রান্ধিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কাঁচা উদ্ভিদ-জীর্ণ করিবার শক্তিও তাহার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইল।

আমরা দেখিতে পাইলাম, বানর-অবস্থা হইতে সভ্য নর-অবস্থায় উপস্থিত হইবার সময়ের মধ্যে, প্রাতি যুগেই মানুষের খাদ্যের মধ্যে আমিষ ও নিরামিষ দুই

বর্তমান ছিল। তবে উহাদের পরিমাণ সব সময় ঠিক এক-রকম ছিল না। বনমাণুষ ও অর্ধনর-অর্ধবানর অবস্থায় আমাদের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধির যতই বিকাশ হইতে লাগিল, ছোট ছোট জীব জানোয়ার পোকামাকড়, পাখী সরীসৃপ প্রভৃতি ধরা তাহাদের পক্ষে পূর্বের অপেক্ষা ক্রমশঃ সহজসাধ্য হইতে লাগিল। এই কারণে এ সময় হইতে তাহার খাদ্যের মধ্যে আমিষের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহাকে প্রধানতঃ নিরামিষাশীই বলিতে হইবে। ইহার পর ক্রমোন্নতি দ্বারা সে যখন শীকার যুগে উপনীত হইল তখন তাহার খাদ্য প্রধানতঃ আমিষ হইয়া দাঁড়াইল, তখনও নিরামিষ একবারেই যে ছিল না তাহা নহে, ছিল বটে কিন্তু তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। তাহার পর মানুষ যখন রন্ধন করিতে শিখিল, তাহার খাদ্যের মধ্যে নিরামিষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু তখনও আমিষের পরিমাণ বড় অল্প ছিল না, প্রায় নিরামিষের সমানই হইবে। এ সময় মানুষ অর্ধ আমিষাশী ও অর্ধ নিরামিষাশী হইয়া পড়িয়াছিল। পৃথিবীতে আজও এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহারা চাষ করিতে জানে না, কিন্তু কি কবিয়া রান্ধিতে হয়, তাহা অনেকটা জানে। এই-সকল অসভ্যদের অবস্থা এবং রন্ধন-যুগের মানুষের অবস্থা অনেকটা যে একই রকম তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই-সকল অসভ্য জাতিদের খাদ্যে অর্ধেক আমিষ ও অর্ধেক নিরামিষ থাকিতে দেখা যায়। একথা অবশ্য খুবই সত্য, এই-সব অসভ্য জাতিরা যে-সকল স্থানে বাস করে, সেখানকার জমি খুবই অল্পবর্ষ, সুতরাং শুধু উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে গেলে, তাহাদের জীবন রক্ষা হয় না। কিন্তু একথাও একরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, জমি স্বাভাবিক উর্বরতা যতই থাক না কেন—তাহাতে আপনা হইতে যাহা জন্মায় তাহা মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে কোন মতেই যথেষ্ট মনে কবা যাইতে পারে না। অগ্নির ব্যবহার করিতে শিখিবার পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদের খাদ্যের মধ্যে আমিষের পরিমাণ যদিচ নিতান্ত অল্প ছিল না, তথাপি সে সময় তাহাদের পাকাশয়ের এমন অবস্থা ছিল, যাহাতে আস্ত কাঁচা উদ্ভিদ খাইয়া তাহার।

অন্যাদে জীর্ণ করিতে সমর্থ হইত। মাছুষ ধীরে ধীরে যতই উন্নতির মুখে অগ্রসর হইতে চলিল, কাঁচা উদ্ভিদ জীর্ণ করা তাহাদের পক্ষে ততই কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। বর্তমান কালে সভ্য জাতিদের কাঁচা উদ্ভিদ জীর্ণ করা একবারে অসম্ভব বলিলেই হয়।

রন্ধন-কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে মাছুষের খাদ্য-তালিকায় উদ্ভিদের পরিমাণ বেশ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু কৃষিকাজের আরম্ভ হইতে ইহার পরিমাণ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশুপালন বিদ্যার উন্নতি হওয়ায় আমিষ খাদ্যেরও একবারে বৃদ্ধি না হইয়াছিল এমন নয়, তবে কৃষিকাজ দ্বারা শস্তাদির যতদূর ফলন সম্ভব হইয়াছে, আমিষের জোগান ততটা হইতে পারে নাই। এই কারণে মোটের উপর বলিতে গেলে, বর্তমান কালে মাছুষের খাদ্যে নিরামিষের ভাগই বেশী।

পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত এমন দুই একটি অসভ্য জাতি আছে, যাহারা কেবলমাত্র আমিষের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিয়া আছে। এক্ষণে দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে। অধিকাংশ মাছুষই বর্তমান কালে অধিক পরিমাণ নিরামিষ ও অল্প পরিমাণ আমিষ খাইয়া জীবনধারণ করে। হিন্দুদের মধ্যে এমন দুই একটি শাখা আছে, যাহারা কেবলমাত্র নিরামিষের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যদিচ বনমাছুষ ও নর-বানর অবস্থায় প্রধানতঃ নিরামিষাশী ছিল, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, আমিষের মাত্রা বাড়াইতে বাড়াইতে শেষে তাহারা পাকা আমিষাশী হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময় তাহারা পশু শীকার করিয়া ও মাছ ধরিয়া জীবন অতিবাহিত করিত। উদ্ভিদ-খাদ্য অতি অল্পই গ্রহণ করিত। ইহার পর যেদিন তাহারা আগুনের ব্যবহার শিখিল, সেদিন হইতে তাহাদের খাদ্যে উদ্ভিদের পরিমাণ আবার বাড়িয়া উঠিল। শেষে তাহারা অর্ধ আমিষ ও অর্ধ নিরামিষ ভোজী হইয়া পড়িল। তাহার পর বেদিন হইতে কৃষিকাজের প্রবর্তন হইল, সেদিন হইতে তাহার খাদ্য পুনরায় নিরামিষ-প্রধান হইয়া দাঁড়াইল।

আমাদের কথা যে মিথ্যা কল্পনা মাত্র এমন যেন কেহ

মনে না করিয়া বসেন। মাছুষকে এক সময়ে লক্ষাধিক বৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ আমিষ খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। মাছুষ যতদিন কৃষিকাজ শিখে নাই, ততদিন আমিষের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিয়া উপায় ছিল না। বর্তমান কালে মাছুষের খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের সমাধান করিবার সময় উপরের কথাটি ভুলিলে চলিবে না। আমিষ আহার রোগের আকর ও মৃত্যুর সহচর, আর নিরামিষ আহারই স্বাস্থ্যকর ও দীর্ঘায়ুকের এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা খুব সম্ভব মনে করা যায় না। মাছুষের অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা এই দেখিতে পাই এককালে মাছুষ নিরামিষ অপেক্ষা আমিষের উপরই বেশী নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। একথা অবশ্য খুবই সত্য, মাছুষ যে-সময় শীকার করিয়া বেড়াইত, কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিত না, সে সময় তাহার পক্ষে অধিক পরিমাণ আমিষ জীর্ণ ও দেহজাত করা খুবই স্বাভাবিক ও অনায়াসসাধ্য ছিল; কিন্তু তাহার পর যেদিন হইতে সে কৃষিকাজ অবলম্বন করিয়া একস্থানে বসবাস করিতে ধরিল, সেদিন হইতে তাহার পাকাশয়ের এমন পরিবর্তন হইতে লাগিল, যাহাতে অধিক আমিষ সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িতে লাগিল। এখন তাহার পাক্যজের এমন অবস্থা হইয়াছে, যাহাতে তাহা রাঁধা আমিষেরই অধিক উপযোগী মনে করিতে হইবে। যাহারা ছুটাছুটি না করিয়া শুধু একই স্থানে বসিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে অধিক আমিষ গ্রহণ স্বাস্থ্যহানিকর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কুকুর স্থাপদ জন্তু—আমিষই তাহার স্বাভাবিক খাদ্য। কুকুরকে যদি ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করিতে না দিয়া, একস্থানে দিনরাত আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সে পূর্বের মত আর মাংস সহ্য করিতে পারে না ইহা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি। নিকর্যা অলস ব্যক্তির পক্ষে অধিক আমিষ আহার অপকারক হইলেও আমিষকে যে একবারে খাদ্যতালিকা হইতে বিদায় করিতে হইবে তাহার অহিংসা ছাড়া আর কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

চিত্তসংঘম

বর্তমান যুগ বিশেষজ্ঞের যুগ। এখনকার সমস্যা হচ্ছে, একটি ইঞ্জিন থেকে কেমন করে' দশ ঘোড়ার শক্তি পাওয়া যাবে, কিন্তু সে-ইঞ্জিন এক-ঘোড়ার শক্তিযুক্ত ইঞ্জিনের সমান স্থান অধিকার করবে। তেমনি আজকের সমাজও একজন লোকের কাছে দশ ব্যক্তির সামর্থ্য প্রত্যাশা করে। কোনো একটি বিষয়ে যিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন সমাজ তাঁরই গলায় জয়মালা পরায়। ‘পাঁচ কাজে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে কোনো কাজই স্পন্দিত হয় না। সাফল্য পেতে হলে চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োজন। অনেক কাজ কোনো-প্রকারে সম্পন্ন করার চেষ্টা না করে’ একটি কাজ ভালোরকম করা, এই হল আমাদের যুগধর্ম। এ-যুগে কর্মপ্রচেষ্টা যার নানাদিকে বিক্ষিপ্ত তাঁর সাফল্যের আশা বিরল।

লগুনে এক দোকানের সামনে একখানা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল—“এখানে মালবহন ও সংবাদবহন হয়, কার্পেটের ধুলা ঝাড়া হয়, এবং যে-কোনো বিষয়ের উপর কবিতা রচনা হয়।” বলা বাহুল্য লোকটি উপরোক্ত কোনো কাজেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

যারা সফল হয় আর যারা বিফল হয় তাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে তাদের কাজের পরিমাণের তারতম্যে নয়—কাজের রকমে; অর্থাৎ নিপুণ বা অক্ষম কাজে। যারা ব্যর্থ হয় তাদের মধ্যে অনেকে কাজ করে যথেষ্ট, কিন্তু সে-কাজের কোনো বিলি-বন্দোবস্ত নেই—তা এলোমেলো কাজ। কাজের পরিমাণ যথেষ্ট হলেও শক্তির সংঘম ও চিত্তের একাগ্রতার অভাবে সব পণ্ড হয়ে যায়। এই-সব লোক তুচ্ছ ঘটনাকে সুযোগে পরিণত করতে পারে না। সাধু উদ্যমের পরাজয়কে তারা জয়গৌরবে ভূষিত করতে জানে না। এদের সামর্থ্যের অভাব নেই, সময় প্রচুর; কিন্তু এরা একবার আগে যায়, পরের বার পশ্চাতে তাকায়—এমনি করে’ জীবনকে এরা কেবল শূন্যতায় ভরে’ তোলে। এমনি একটি লোককে জিজ্ঞাসা কর’ তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? সে বলবে—“আমি কিসের উপযুক্ত তা তো ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু আমি জানি পরিশ্রম

ব্যর্থ হবার নয়, তাই স্থির করেছি সারা জীবন দারুণ পরিশ্রম করে’ চলব, এমনি করতে করতে কিছু-না-কিছু একটা জুটে যাবে।” কিন্তু তা অসম্ভব। বুদ্ধিমান জীব কি সোনারূপার খনির সন্ধানে সারা দেশ খুঁড়ে বেড়াবে? যদি কিছু পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে যে প্রতিনিয়ত ঘোরে সে কিছুই পায়না। মনপ্রাণ দিয়ে আমরা যা চাই আমরা তাই পাই; আর, কিছু না চেয়ে যদি কেবলই খুঁজি তবে পাইনা কিছুই। ফুলের কাছে আসে অনেক পতঙ্গ, কিন্তু একমাত্র মৌমাছিই ফুলের মধুটুকু লুটে নিয়ে যায়। বাল্যের পড়া-শুনা ও পরিশ্রমের ফলে আমরা যতই কেন রসম সংগ্রহ করে’ বিশ্বের পথে বেড়ই না, তাতে ফল কিছুই হবেনা, যদি আমাদের মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের কাজের একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকে। নাবিক যদি না জানে কোন্ বন্দবে তার যাত্রা তবে তার ভাগ্যে স্ববাতাস বইবে না।

কালাইল বলেন—“অতি দুর্বল যে সে-ও একের ওপর শক্তি সংহত করে’ কিছু করতে পারে, কিন্তু পরম শক্তিমানও তার সামর্থ্য নানার ওপর বিক্ষিপ্ত করে’ প্রায়ই ব্যর্থ হয়। জলের বিন্দু অবিরাম পতনের দ্বারা কঠিনতম প্রস্তরের মধ্যেও ছিদ্রপথ প্রস্তুত করে, কিন্তু ধরতোয়া স্রোতস্বতী তারই ওপর দিয়ে গভীর কলোলে, চলার চিহ্নমাত্র না রেখে, বয়ে যায়।”

এক পাদরি বলেছিলেন—“ছেলেবেলায় মনে করতুম বজ্রই মাছুষ মারে। বড় হয়ে বুঝলুম মাছুষ মারে বিদ্রোহে, বজ্রে নয়। তখন থেকে স্থির করেছি আওয়াজ কম করে’ আলো দেব বেশী।”

বন্ধুকের কতকগুলো ছররা গলিয়ে একটা বড় গুলি বা বুলেট তৈরি কর, সেটা চারজন লোকের দেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে। দারুণ শীতের দিনেও সূর্যালোককে সংহত কর, দেখবে অতি সহজেই আঙুন জলে উঠবে।

মাছুষের মধ্যে যারা অতি-মানব, যারা বীরপুরুষ, তাঁরা সব ছিলেন একাগ্রচিত্ত; এক লক্ষ্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, একই জায়গায় তাঁরা অবিরাম তাঁদের বিয়াট হাতুড়ির যা লাগিয়েছেন যতদিন না উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এক উদ্দেশ্য এই-সব বীরপুরুষদিককে আচ্ছন্ন করে’ রাখে,

গতি তাঁদের একই দিকে, প্রতিজ্ঞা তাঁদের দুর্জয়, সংগ্রামে তাঁদের আনন্দ। কি পাঠ্যাবস্থায় কি পর-জীবনে, লোহা যখন গরম হয় তখন তার ওপর আঘাত করতে তো হবেই, উপরন্তু লোহার ওপর আঘাত করে' করে' তাকে গরম করে' তুলতে হবে।

উদ্দেশ্য নিয়ে খেলা কারো না।

ডিকেন্স বলতেন—“পড়ায় বা কাজে যে গুণ আমাদের কাজে আসে সেটি হচ্ছে মনঃসংযোগের অভ্যাস। তুচ্ছ সাধারণ ব্যাপারের ওপর প্রতিদিন অদ্ভুত নিষ্ঠার সহিত মনঃসংযোগ না করলে আমার সকল কল্পনা বা আবিষ্কার বিফল হ'ত। যার ওপর আমি সমস্ত মন অর্পণ করতে না পারি তেমন কাজে আমি কখনো হাত দিই না।”

সকল কাজেই সম্পূর্ণ মন দেওয়া দরকার পড়ায়, কাজে বা খেলায়।

চার্লস কিংশলে বলেন—“যা যখন দরি তাই নিয়েই পড়ি, তখন জগতে আর কিছুই থাকে না। এটি সাকল্যের মন্ত্র। অনেকে কিন্তু কাজে যেমন মাতেন, আমোদ আহ্লাদে তেমন তন্ময় হতে পারেন না।”

সব-জিনিষের কিছু কিছু জানতে গিয়ে আপনাদের খণ্ড খণ্ড করেন বলে' অনেকে বড় হতে পারেন না। এসব লোক সাধারণের সম্মম আকর্ষণ করলেও জগৎকে কিছু দিতে পারেন না।

লিটনকে অনেকে জিজ্ঞাসা করতেন তিনি এত বই লেখেন কখন? সময় পান কেমন করে? তার উত্তরে লিটন বলেন—“আমি এত কাজ করি, তার কারণ আমি একই সময়ে অনেক কাজ করি না। ভালো কাজ করতে হলে অতিরিক্ত কাজ করা চলে না। আজ অতিরিক্ত কাজ করলে কাল ক্লাস্তিবশত খুব কম কাজ হবে। কলেজ ছেড়ে সংসারে নেমে রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ করে' আমি আমার সমসাময়িক লোকদের চেয়ে কিছু কম পড়িনি। আমি অনেক বেড়িয়েছি, অনেক দেখেছি; দেশের রাষ্ট্রে যোগ দিয়েছি, জীবনের শত কাজে ব্যস্ত থেকেছি, তা সত্ত্বেও আমি প্রায় ষাটখানা বই লিখেছি। তার মধ্যে কোনো কোনো বই লিখতে আমাকে যথেষ্ট পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করতে হয়েছে। আমি কিন্তু লেখা

পড়ায় দিন তিন ঘণ্টার বেশী খবচ করিনি, পার্লামেন্ট বসবার সময় তা-ও নয়। কিন্তু এই তিন ঘণ্টা সময় সমস্ত মন আমি কাজে নিযুক্ত করেছি। কিছুমাত্র চিন্তাবিক্ষেপ ঘটেনি।”

কোলরিজ ছিলেন অদ্ভুত মানসিকশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যের স্থিতি ছিল না। তিনি ছিলেন কল্পলোকের ভোগী; ফলে তাঁর তৎপরতা ও শক্তি এবং অনেক দিক দিয়ে তাঁর জীবনও শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি স্বপ্নের মধ্যে বেঁচে ছিলেন এবং স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তাঁর জীবন-অঙ্কে যবনিকা পড়েছিল। সর্বদাই তিনি মনে মনে মতলব আঁটতেন, কিন্তু মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে-সব মতলব কাজে পরিণত হয়নি। প্রায়ই কিছু একটা করতে উদ্যত হতেন, কিন্তু করা আর হবে উঠত না। চার্লস ল্যাষ লিখেছিলেন—“কোলরিজের মৃত্যু হয়েছে। শোনা যায় তিনি মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে চল্লিশ হাজারের বেশী লেখা রেখে গিয়েছেন—কিন্তু তার মধ্যে একটিও সম্পূর্ণ নয়।”

একই বিষয়ে যে-পরিমাণে শক্তি নিয়োজিত রেখেছেন সেই পরিমাণেই মহাপুরুষেরা বড় হয়েছেন এবং কর্মে সার্থকতা লাভ করেছেন।

একখানি মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' হগার্থ সেটি একাধিক দৃষ্টে দেখতে থাকতেন যতক্ষণ না তা তাঁর মনের ওপর ছাপ রেখে যেত। তারপর তিনি ইচ্ছা হলে মন থেকে সেই ছবিখানি আঁকতে পারতেন। প্রত্যেক জিনিষই এমন মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করতেন, মনে হ'ত যেন তিনি তা দেখবার স্বযোগ আর কখনো পাবেন না। এই অভ্যাসের ফলেই তিনি তাঁর চিত্রে সমস্ত খুঁটি-নাটি এমন আশ্চর্যরূপে ফোটাতে পারতেন। তাঁর শিক্ষা খুব যে বেশী ছিল তা নয়, কিন্তু সে-অভাব তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তির দ্বারা পূরণ করে' নিয়েছিলেন।

জেলখানায় যারা পুস্তক রচনা করেছেন তাঁরা একাধি পর্যবেক্ষণের-মুলা জানেন। কোনো আগন্তকের আগমন, কুঠরির দ্বারের সম্মুখ দিয়ে একটি কর্মচারী বা কয়েদীর গমন, এইরূপ অতি তুচ্ছ ঘটনাও এমন করে' চোখে পড়ে যেন বহুকালের মধ্যে তেমন ঘটনা আর ঘটবে না।

নিউইয়র্ক শহরের বিখ্যাত রাস্তা ত্রভণে দিয়ে বিরাট মিছিল চলেছে; পথের দুধারে সারে সারে অসংখ্য লোক, ব্যাণ্ড বাজছে—এমন অবস্থায় হোরেস গ্রীলি “আটর হাউস”-এর ধাপের ওপর বসে’ উপুড়-করা টুপির ওপর কাগজ বেখে “নিউইয়র্ক ট্রিবিউন”-এর জন্তে সারগর্ভ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা কবেছেন।

কোনো এক কড়া লেখায় বিরক্ত হয়ে এক ভদ্রলোক “ট্রিবিউন”-আফিসে এসে সম্পাদকের খোঁজ করলেন। একটা ছোট ঘরে নীত হয়ে তিনি দেখলেন সম্পাদক ঘাড় শুঁজে ছুঁ করে’ লিখে চলেছেন। কুপিত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনার নাম গ্রীলি?” সম্পাদক কাগজ থেকে মুখ না তুলেই চটপট বললেন—“আজ্ঞে হ্যাঁ। কি দরকার?” ভদ্রলোক তখন মুখ খুললেন, বা মুখে এল তাই বলে’ গালাগালি করতে লাগলেন। সম্পাদকের মুখে কথা নেই, তিনি লিখেই চলেছেন; পাতার পর পাতা শেষ হয়ে যাচ্ছে, গ্রীলির মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন নেই, আগন্তকের কথা তাঁকে এতটুকু বিচলিত করছে না। অবশেষে গালাগালি করে’ ক্লান্ত হয়ে পড়ে’ কুপিত লোকটি বিরক্তভরে ঘন ফিরে যাচ্ছেন এমন সময় গ্রীলি তাড়া-তাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে ভদ্রলোকের পিঠ ধাবড়ে অতি শাস্ত ভাবে বললেন—“বহন বহন, যাবেন না মশাই; মনটাকে হালকা করে’ নিন; তাতে আপনাব ভালো হবে। আর এতে করে’ আমি কি লিখব তা ভাববার খুব সুবিধে হচ্ছে। যাবেন না, বহন।”

ড্যানিএল ওবস্টারকে দেখে সিডনী স্মিথের মনে হয়েছিল তিনি যেন প্যান্টালুন-পরা একটি ষ্টীম-ইঞ্জিন!

উইলিয়াম পিট দেশের রাষ্ট্র প্রধান হবার জন্তেই বৈচে ছিলেন এবং মবেও ছিলেন। তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যেব সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারেনি। আর কিছুতেই তিনি মন দিতেন না, ঐ এক চিন্তাতেই তিনি বিভোর ছিলেন; ধরচেব দিকে লক্ষ্য ছিল না, তাই এককজীবন যাপন করেও এবং বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা আয় থাকা সত্ত্বেও তিনি অনেক ঋণ রেখে মারা যান। স্বদয় থেকে তিনি তাঁর সুগভীর প্রেমকেও সমূলে উৎপাটিত করেন—তা তাঁর উচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূল ছিল বলে’! মৃত্যুর পরে যশোলাভ

করবার জন্তে তিনি মৌটেই উৎসুক ছিলেন না, তাই পরবর্তীগণের জন্তে তাঁর একটি বক্তৃতাও বেখে যাননি। সমস্ত সামর্থ্য একই পথে চালিত কবে’ পচিশ বৎসর ইংলণ্ডের রাজদণ্ড তিনি চালনা করেছিলেন। বামে বা দক্ষিণে কোনো দিকে লক্ষ্য না করে’ অবিরাম গতিতে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অবশ্য, একই বিষয়ের প্রতি অস্থরাগ যদি আমাদের চিত্তকে সংকীর্ণ কবে বা আমাদের বিচিত্র শক্তির সামগ্রস্য বিধানের পথে অস্তরায় হয়, তবে তা বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু সব-জাতি হবার চেষ্ঠায় আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে শতভাগে খণ্ডিত করার চেষ্ঠাতেও প্রচুর অপকারের সম্ভাবনা।

শিশু যখন চলতে শেখে তখন তার দৃষ্টি যদি কোনো এক বস্তুতে আবদ্ধ করতে পার তাহলে সে কোনোগতিকে হেঁটে সেখানে গিয়ে পৌছোবে, কিন্তু সেই জিনিসটি তার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিলেই সে তখুনি পড়ে যাবে।

পাশ্চাত্যভূমিতে কেহ কর্মের অহুসদ্ধানে আবেদন করলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—“তুমি কি করতে পার?” সে কোন কলেজে পড়েছে বা তার পিতৃপিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় না। (আমাদের দেশে যদিও একথা খাটে না।) সেখানে বড় বড় ব্যবসায়ের মাধ্যম যাবা আছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোক সে-ব্যবসায়ের নিম্নতম ধাপ থেকে উঠে ক্রমে সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

সহযোগী সেনানায়কদের চেয়েও বেশী পরিমাণে একাগ্রতা খাটিয়েছিলেন বলেই গ্রান্ট আমেরিকার অস্তযুদ্ধ অবিলম্বে শেষ করতে পেরেছিলেন। ওয়াশিংটনের চরিত্রেও এই গুণটি পরিষ্কৃত ছিল। তীক্ষ্ণ ও যথার্থ পর্যবেক্ষণ চিত্তসংযম-শক্তি-লাভের একটি উপায়। ডারুইনের অদ্ভুত সাফল্যের ইহাই প্রধান কারণ।

সাধারণত মন বা চায় তা আমাদের বুদ্ধি এবং শক্তির অপ্রাপ্য নয়। ধন, বিদ্যা বা সাফল্যের যে শ্রোত তা সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার মতই নিয়ন্ত্রিত এবং নিশ্চিত; তারও নড়চড় নেই। সকল সাফল্যের ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই বুদ্ধিবৃত্তি এবং সমস্ত মানসিক এবং শারীরিক শক্তি একই অবিচলিত উদ্দেশ্যের ওপর সংস্থাপিত; সকল

বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এক অবিচলিত ধৈর্য্য; এবং লোভ হতাশা এবং ব্যর্থতা জয় করবার অনীম সাহস।

মাহুষ এবং তার কাজ—এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! মাহুষের সামর্থ্যের সকল রশ্মি একটি বস্তুর ওপর সংহত করতে পারা না-পারার ওপরই এই প্রভেদের উৎপত্তি নির্ভর করে। নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞান প্রায়ই ভাশা-ভাশা রকমের হয়ে থাকে।

যথার্থ আর্টের স্বরূপ হচ্ছে উদ্দেশ্যের স্থিরতা। পটের ওপর যিনি অনেক ভাব ফোটাতে চেষ্টা করেন, সকল মুষ্টিগুলিকেই যিনি প্রাধান্য দান, তিনি বড় চিত্রকর নহেন। প্রকৃত শিল্পী তিনি, যিনি বহু-বিচিত্রের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী ঐক্য প্রকাশ করেন, প্রধান ভাবটি যিনি চিত্রের অন্তরস্থিত মূর্তিতে ফুটিয়ে তোলেন; অগ্ন্যায় মূষ্টিগুলি, চিত্রের ছায়াস্বপ্না, সমস্তই সেই একটি মূর্তিতে প্রতিফলিত হয়েই সার্থক হয়। অনিয়ন্ত্রিত জীবনেও—তা মাহুষ যতই কেন নানাবিষয়ে অভিজ্ঞ হউন বা তাঁর শিক্ষা যতই উদার হোক না—এমন একটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকে যেখানে অল্প ক্ষুদ্র শক্তিগুলি সংহত হয়ে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

প্রকৃতিতে কোনো শক্তির অপব্যয় নেই। হঠাৎ বা অকারণ কিছু ঘটে না। পত্র পুষ্প, নীহারকণা, অণুপরমাণু সকলের ওপরই এক-একটি উদ্দেশ্যের ছাপ স্পষ্ট; তা অবিচলিত অভুলি-নির্দেশে দেখাচ্ছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ স্থষ্টিকে, অর্থাৎ মাহুষকে।

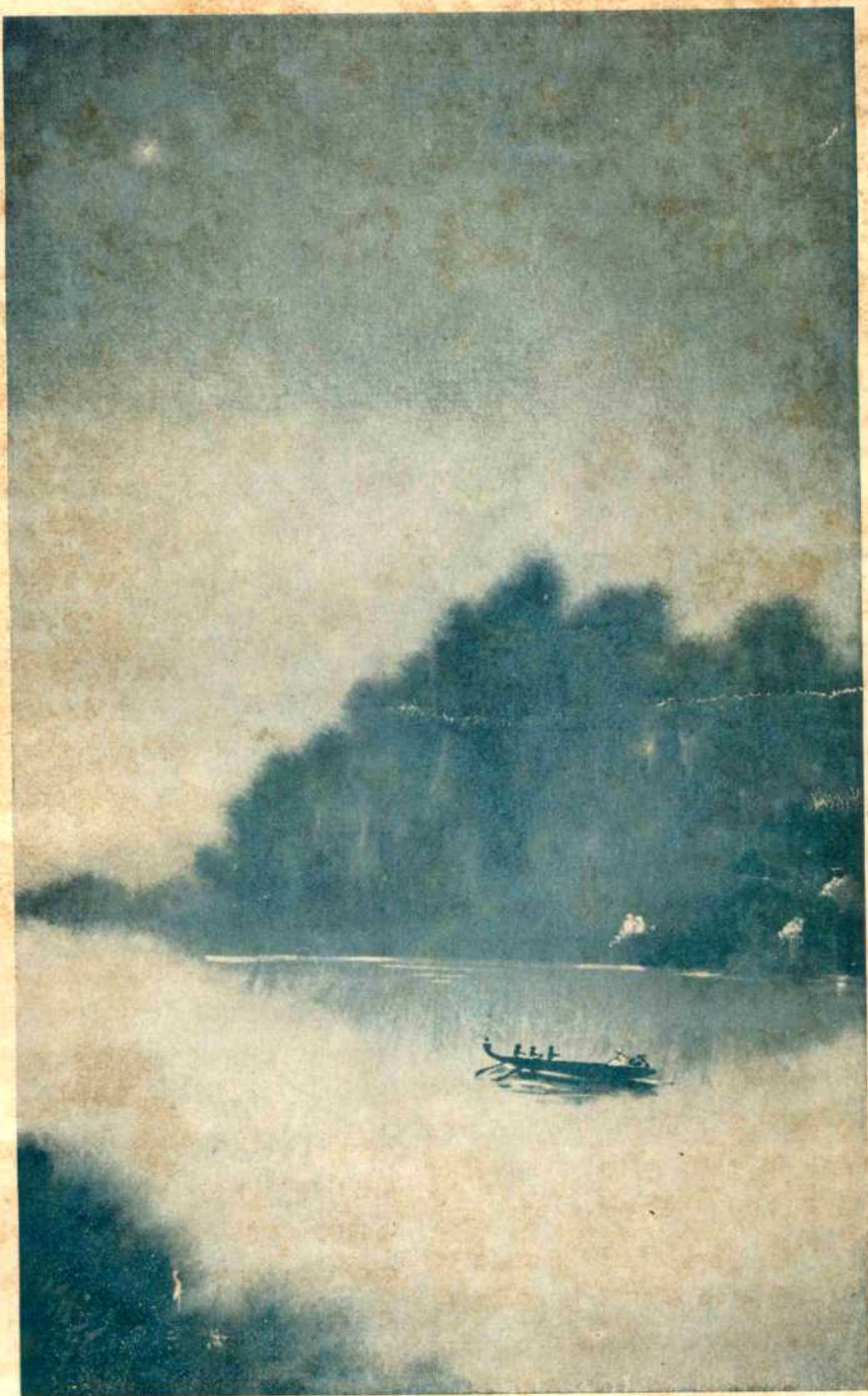
লক্ষ্য উচুদিকেই হওয়া উচিত, কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে সেই লক্ষ্যের ওপর মানসচোখে যে-লক্ষ্য আমরা বিধিত পারব। অসম পাষণ্ডের মধ্যে যে কখনো দেব-সন্দর্শন করেনি সে কেমন করে তা থেকে দেবতার মূর্তি রচনা করবে? যা-তা একটা পাঁচমুণ্ডলি উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কাজ হবে না। ধরুক থেকে যখন তীর ছোড়া হয় তখন সে-তীর একেবারে লক্ষ্য অভিমুখেই ছুটে যায়, পথে আর কাঁকে আঘাত করতে পারে তার সম্মানে ঘুরে বেড়ায় না। চুষক-শলাকা আকাশের সকল আলোকের দিকে ফেরে না কোনটি ভালো দেখবার জন্তে। স্বর্ধ্যালোকের রশ্মিচ্ছটা তার চোখে ধাঁধা লাগাচ্ছে, উদ্ভাদল তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অগণ্য তার

জ্ঞান চোখে যুহু চাহনিত্তে তার স্নেহলাভের জন্তে ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে, কিন্তু সে অবিচলিত; প্রচণ্ড রৌদ্রও যেমন, বাদলের অবিরাম বর্ষণ ও মত্ত ঝঞ্ঝার হাহা-কারের মধ্যেও তেমনি তার একাগ্রদৃষ্টি ঐক্যতারার দিকেই। কারণ সমস্ত তারকা অশ্রান্ত পদক্ষেপে যুগের পর যুগ তাদের কেন্দ্র পরিক্রমণ করছে, কেবল ঐক্যতারাই স্বদূর শূন্তে অফুরান পথ অতিক্রম করে' চলেছে—যে-পথ একবার প্রদক্ষিণ করে' আসতে পঁচিশ হাজার বছর কেটে যাবে। তাই মাহুষের হিসেবে এক দিনের জন্তে নয়, এক শতাব্দীর জন্তেও সে স্থির অচঞ্চল। জীবনযাত্রাতেও আমাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থেকে, সত্যের পথ থেকে, কর্তব্যের পথ থেকে বিচলিত করবার জন্তে শত শত রঙীন আলোক আমাদের ডাকছে, অবিরাম ডাকছে। কিন্তু এই-সব চাঁদ যাদের আলো ধার-করা, এই-সব উক্কা যারা কেবল জল-জল করে কিন্তু পথ নির্দেশ করে না, এরা যেন আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে। তাহলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

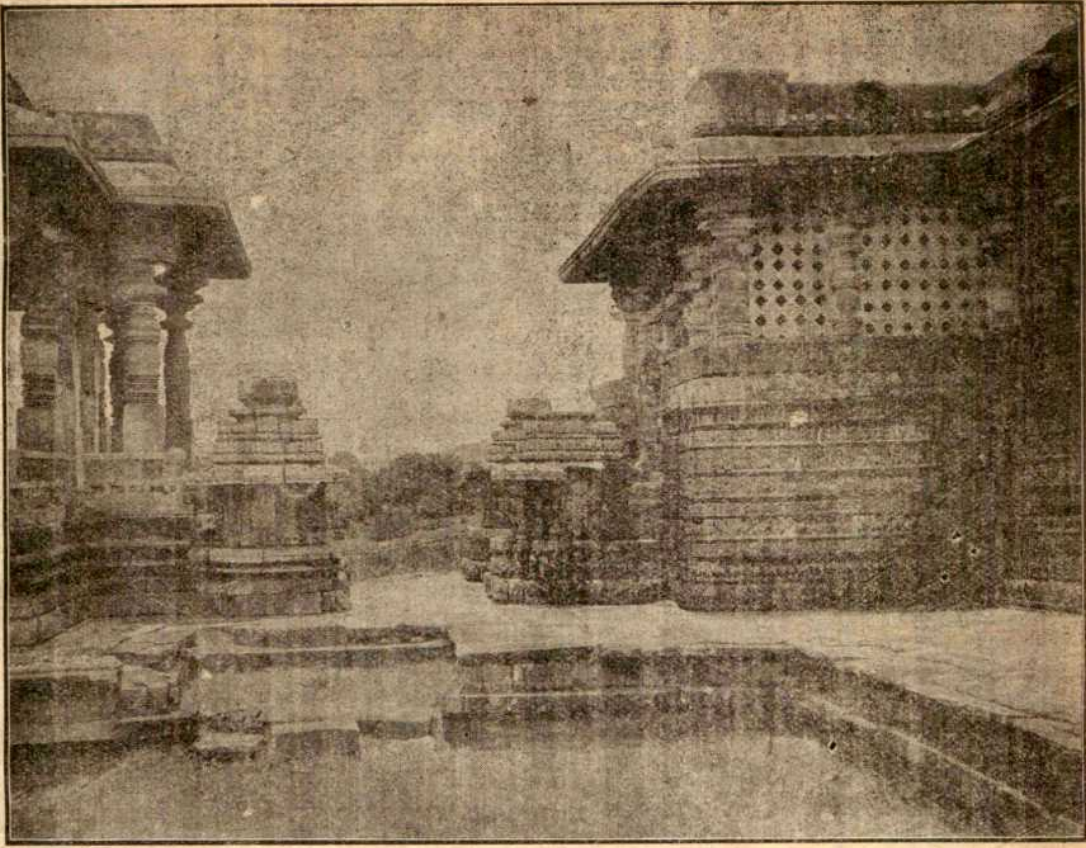
মহীশূরে চালুকা স্থাপত্য

কোন জাতি বড় কি না তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় তাহার চিন্তার ধারা অনুশীলন করিলেই। এই চিন্তার ধারা অনুশীলন হইতেই জানা যায় সেই জাতি সভ্যতা, সমাজ ও ধর্মের অগ্গতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং সেই অগ্রসরের মূল্য বিশ্বসমাজে কতদূর ও তাহার স্থান কোথায়। জাতির চিন্তার বিকাশ যে শুধু পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে তাহা নহে, ইহা তাহার আচার ব্যবহার স্থাপত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়াও যথেষ্ট প্রকাশ পায়। জাতিবিশেষের যুগের পর যুগের চিন্তার ক্রমপরিণতির ইতিহাস শিল্পে ও স্থাপত্যে যেমনটি পাওয়া যায় তেমনটি বুঝি আর কোথায়ও পাওয়া যায় না, কারণ শিল্প ও স্থাপত্য মানবের চিন্তার ধারাকে আকার দান করে ও যাহা শুধু মনোরাঞ্জ্যেরই জিনিস ছিল তাহাকে বাস্তব রাজ্যের জিনিস করিয়া তোলে। সেইজন্ত কোনও জাতি-বিশেষকে বুঝিতে হইলে তাহার



দূরের পালা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেনের সৌজন্যে।



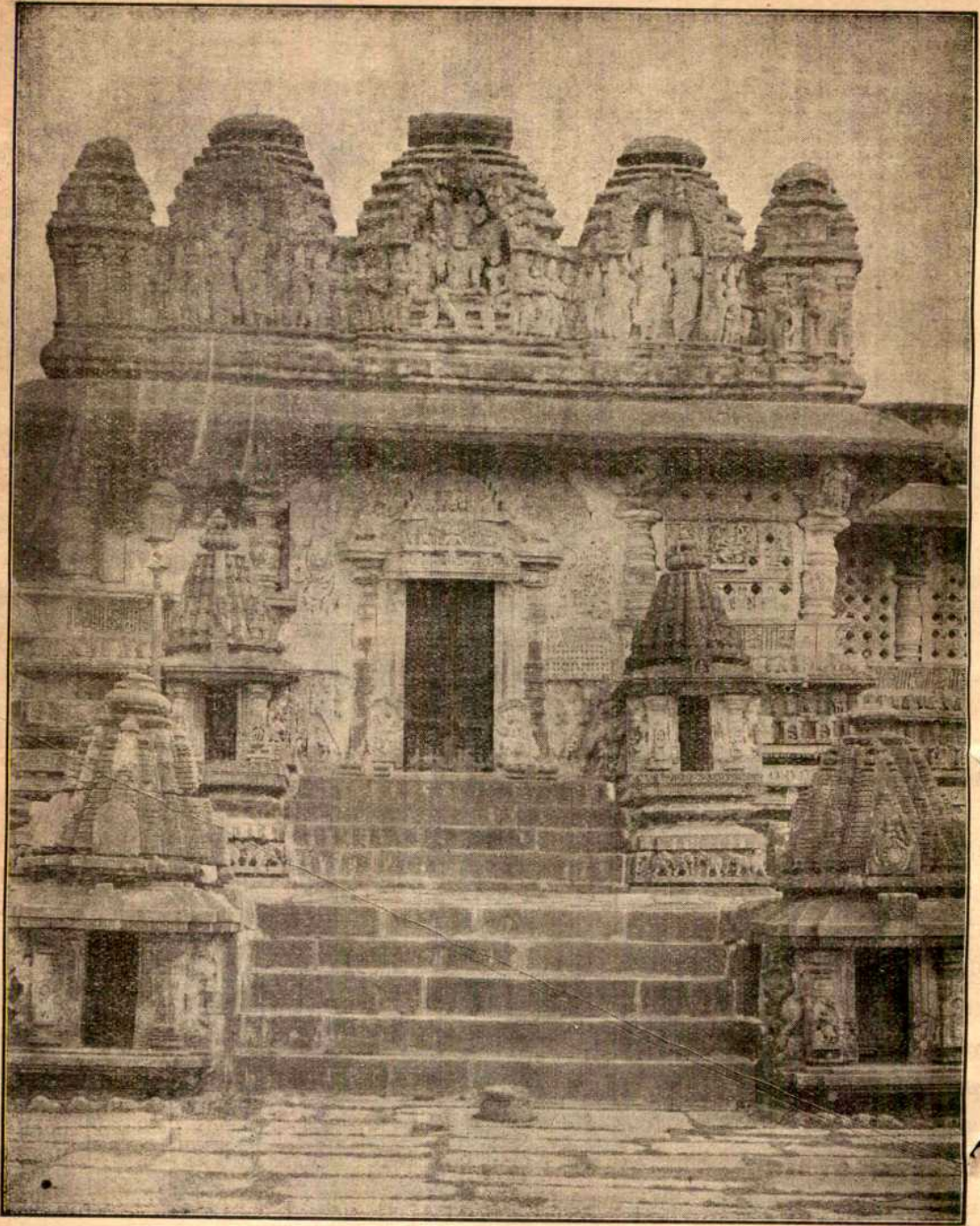
মন্দিরের মনোহর কার্যকার্য।

স্থাপত্যকে বুঝিতে হইবে ; তবে তাহাকে ভালরূপে বোঝা যাইবে। ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলেও ভারতশিল্পের ইতিহাসকে দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষের এই শিল্পের ইতিহাস দেখিতে গেলেই যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইবে, কেননা—অতীত ভারতের অল্পম শিল্পসৌন্দর্য্য ও স্থাপত্যের জ্ঞান তাহার বিপুল অর্থ ব্যয়, সুনিপুণ শিল্পীগণের প্রাণপাত পরিশ্রম, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও উৎসাহের পরিচয় আনন্দের অবতারণা করিবে ও আমাদের বর্তমান ঐন্দ্রিয় ও অন্ধাঙ্কুরণ-প্রবৃত্তির চিন্তা বিবাদ উৎপাদন করিবে। অতীত ভারতের স্থাপত্যগরিমার পরিচয় ভারতের যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আজ এস্থলে ঐরূপ একস্থানের শিল্পগৌরবের পরিচয় দিব।

মহীশূরে যে-সকল প্রাচীন মন্দিরাদি দৃষ্ট হয় সাধারণতঃ সকলে ইহাকে চালুকা-স্থাপত্য নামে অভিহিত করিয়া

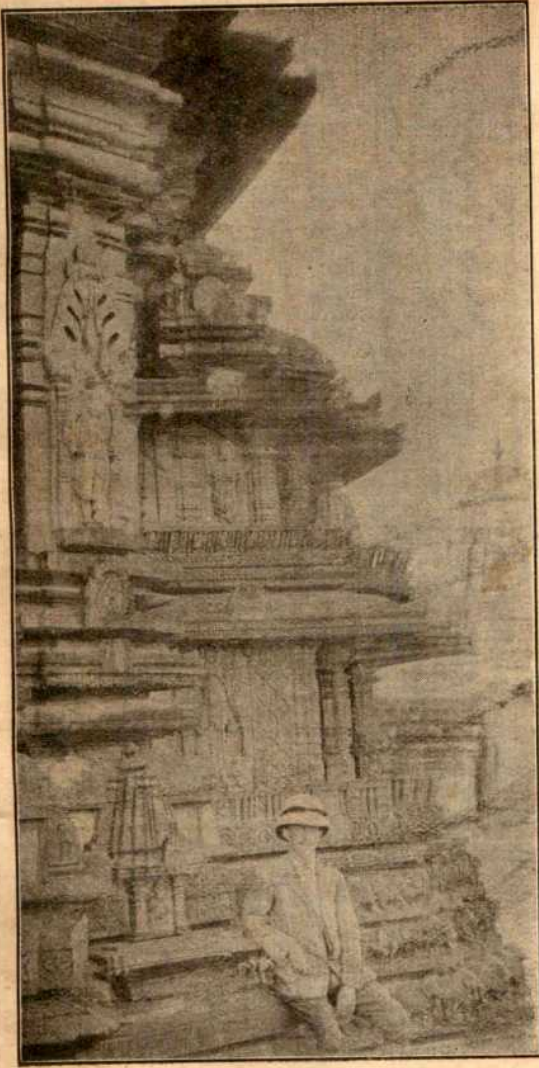
থাকে, কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া দেখিতে গেলেই বুঝা যায় যে, ইহা চালুকাদের কার্য্য নহে। ইহার অধিকাংশই হয় শলাদের সময়ের কাজ। মহীশূরে এই হয় শলা-স্থাপত্যের অনেক সুন্দর সুন্দর নিদর্শন এখনও বেশ ভাল ভাবে আছে। অবশ্য বহু মন্দিরাদি ধ্বংসস্থাপে পরিণত হইয়াছে। এই-সকল ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরাদির স্থাপত্য-নিদর্শন এখনও চমক লাগাইয়া দেয়। হিন্দুরা যদি এ-বিষয়ে একটু অরহিত হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের গৌরবের—তাঁহাদের কেন, জগতের গৌরবের—সামগ্রীগুলি এমন-ভাবে নষ্ট হইয়া যাইত না। মহীশূর রাজসরকারের চেষ্টায় অবশ্য এখন আর কিছু নষ্ট হইতেছে না।

মহীশূরের শিল্পের প্রধান গৌরব হলুদ ও বেলুড়ের মন্দিরাদির স্থাপত্য। এই স্থাপত্যের কএকটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ দেখা যায় মন্দিরগুলি বহুভুজাকৃতি



মন্দিরের তোরণ।

অর্থাৎ নক্ষত্রাকৃতি। কিন্তু ইহার সকল ভূজ অর্থাৎ দিক চতুর্দিকে প্রবেশপথ। একটা প্রকাণ্ড ছাদের তলা দিয়া সমান নহে—চারিদিক অপেক্ষাকৃত লম্বা। তিনদিকে সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের প্রবেশ-পথে পৌঁছান যায়। দেয়ালে কোলজা-কাটা থাকে থাকে নানা মূর্তি সজ্জিত ও শিল্পীদের বিশেষ চেষ্টা ছিল—প্রবেশদ্বারে শিল্পের পরিচয়টি

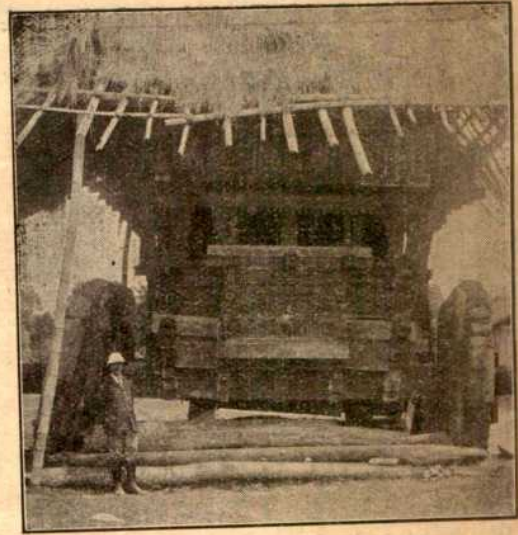


মন্দিরের এক কোণ।

বেশী করিয়া দেওয়া, কারণ প্রবেশদ্বারের শিল্পে যত স্থনিপুণ হস্তের ও বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় অতদূর ঠিক অতটা পরিমাণে উহা পাওয়া যায় না। মন্দিরের মধ্যে আলোক প্রবেশের বন্দোবস্ত একরূপ নূতন উপায়ে করা হইয়াছে। পাথর ফুটা করিয়া জানালার কাজ করা হইয়াছে। সচ্ছিন্ন প্রস্তরের মধ্য দিয়া বেশ আলোক আসিতে পারে। স্তম্ভগুলিতে শিল্পকার্যের তেমন প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয় না—কিন্তু দেখিলেই মনে হয় যেন কলের সাহায্যে কুঁদিয়া এগুলিকে মসৃণ করা হইয়াছে। মন্দিরে নানা-

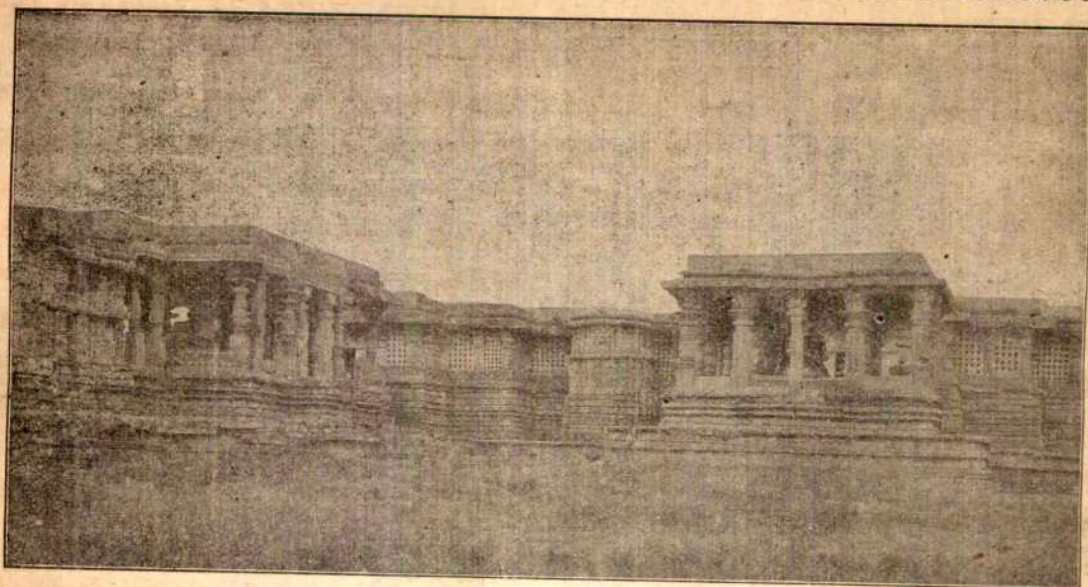
রকমের স্তম্ভ আছে, তবে প্রায় সকলগুলিই জোড়া জোড়া। মন্দির ১০-১৫ ফুট চওড়া চত্বরের উপর অবস্থিত।

হলুবিদে দুইটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। হৃৎশলেশ্বরের মন্দিরটি ইহাদের মধ্যে প্রাচীন। বিনয়াদিত্যের (১০৪৭—১১০০) সময় ইহার নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি ইহার নির্মাণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় কেদারেশ্বরের মন্দিরটি বীর বজ্রাল ও তাঁহার রাণী অভিনবা কৈতলী দেবী কর্তৃক ১২১৯ খৃঃ নির্মিত হয়। প্রথমটির ৮৬ বৎসর নির্মাণের পর বংশের উৎখাত ও অরাজকতা প্রভৃতির জন্ত নির্মাণ-কার্য বন্ধ হইয়া যায়। দেবজী, মাসানা, মায়ানা প্রভৃতি দক্ষ শিল্পীগণ নির্মাণ-কার্যে রত ছিলেন। ফাগুসান সাহেব অনুমান

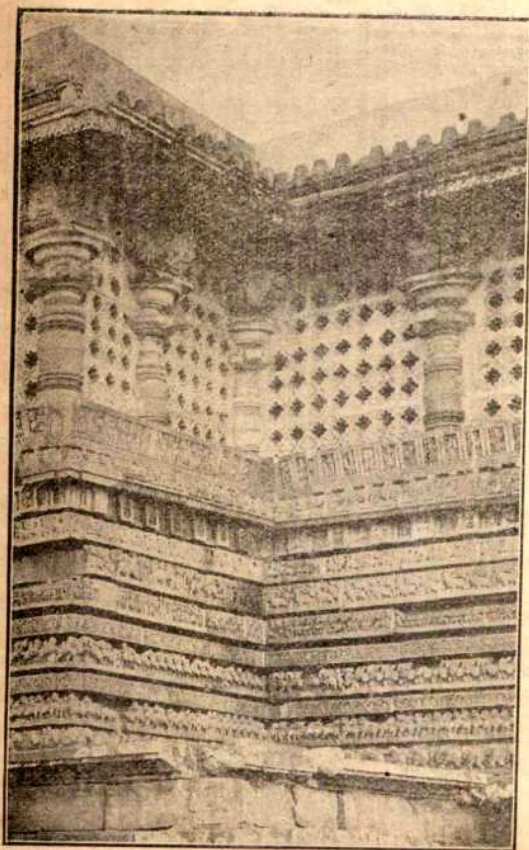


রথ।

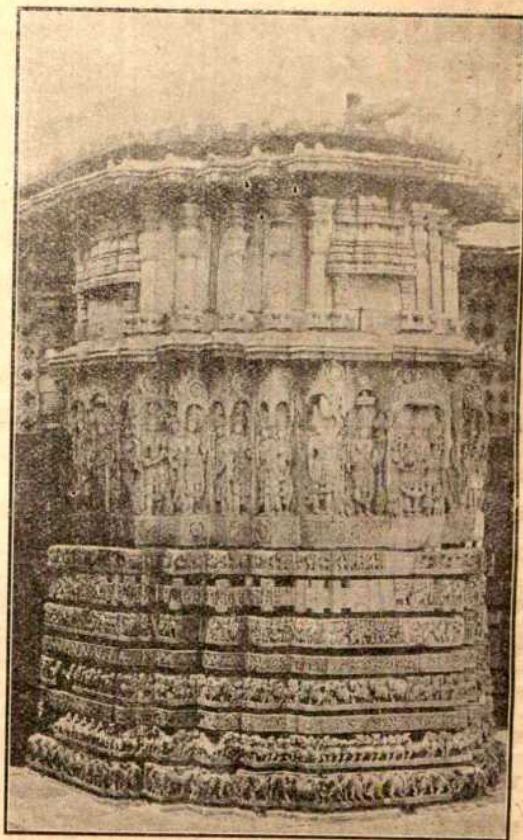
করেন যে, সোমনাথপুরের মন্দিরের মত এখানকার ভিতরের মন্দির দুইটির উপরে দুইটি গম্বুজ ও প্রধান চত্বরের উপর বহু গম্বুজ নির্মাণের ইচ্ছা শিল্পীদের ছিল। নিকট হইতেই প্রস্তরখণ্ডগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল ও খণ্ডগুলি যথাস্থানে সজ্জিত ও সংলগ্ন করিবার পর তাহার উপর খোদাই করা হয়। প্রস্তরগুলি যখন কাটিয়া সজ্জিত করা হয় তখন ঐগুলি নরম ছিল—কিন্তু বহুদিনের রৌদ্রবাতাস ও শিশির পাইয়া এখন বেশ শক্ত হইয়া গিয়াছে, যদি তাহা না হইত তবে এই সহস্র বৎসর তাহারা এমন অবিকৃত



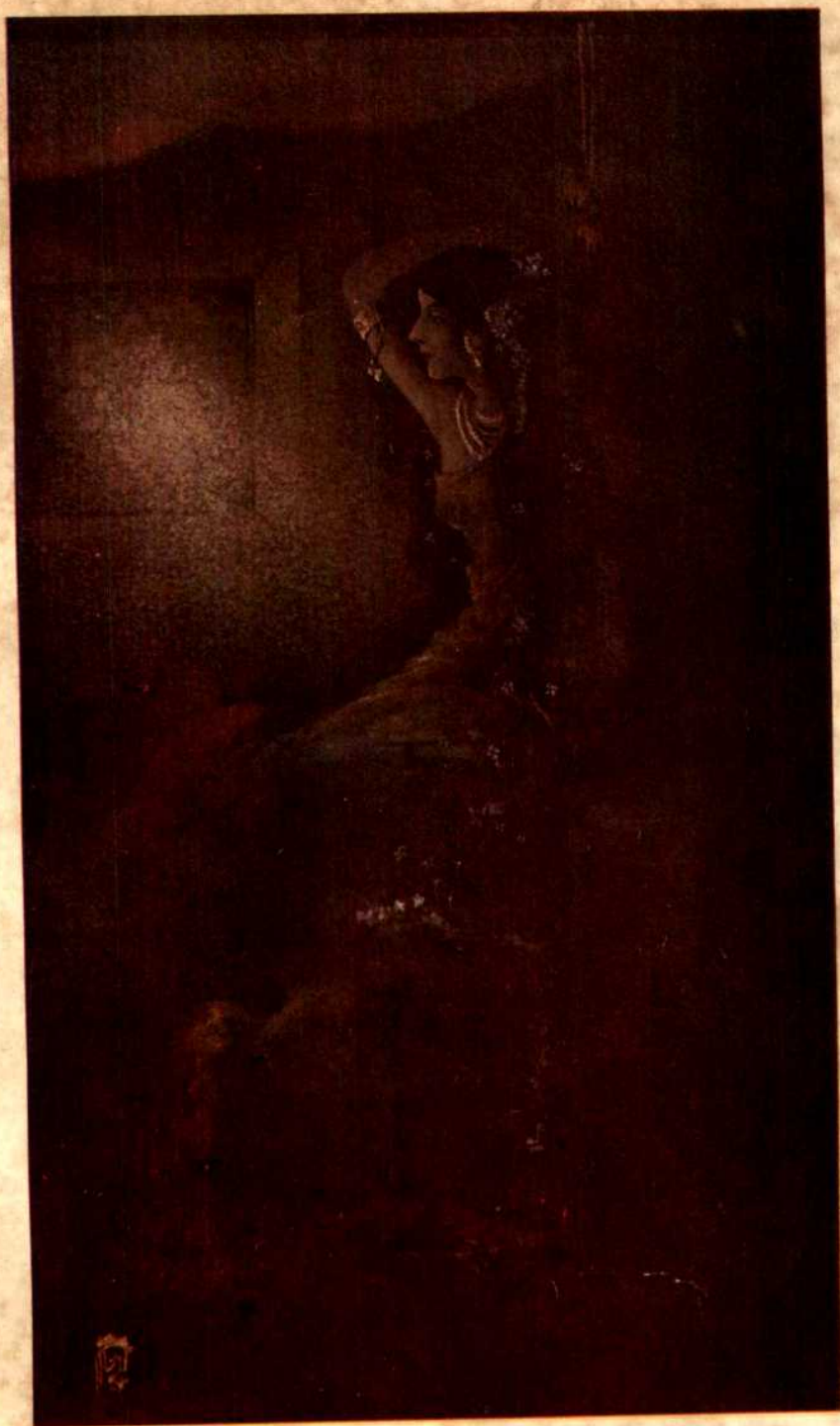
হরশলেশ্বরের মন্দিরের দৃশ্য ।



মন্দিরের এক বাঁক ।



মন্দিরের একাংশের কারিকার্য ।



“শয়ন-শিরের প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল-রবে।”
চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে।

ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না। মন্দিরটি দ্বা-
বিত্ত—প্রত্যেক অংশই মন্দিরের কার্য্য করিতে পারিত।
পূর্বদিকের স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে নন্দা-বৃষ মন্দির। স্তম্ভগুলির
খোদাই-কার্য্য অতি সুন্দর। সমস্ত মন্দিরের চারিদিক
ব্যাপিয়া সুন্দর চিত্রশ্রেণী (Frieze) ও কার্ণিশ আছে।
এই চিত্রশ্রেণীর গঠনচাতুৰ্য্য ও শিল্পমাধুর্য্য বর্তমানের
ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণেরও বিষয় উৎপাদন না করিয়া
ছাড়ে না। চিত্রশ্রেণীগুলি ক্রমশঃ একটির পর একটি
করিয়া বেশ পুরু হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমেই হস্তীর,
একপ্রকার বিচিত্র ব্যাঘ্রের, অশ্বারোহীর প্রতিকৃতিতে এক
অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তারপর একটু ফাঁকের পরেই
খোদাই করা রামায়ণের নানান চিত্র এবং স্বর্গীয় বিহঙ্গমগণ
ও সর্পশেষে একটা কার্ণিশ। কার্ণিশটি নানাভাবে কাটা।
উপরের যে অংশে কোনও জানালা বা গবাক্ষ নাই সেখানে
আরও একটি চিত্রশ্রেণী আছে। ইহাতে নৃত্যচঞ্চল
সুগায়িকার বিভিন্নরূপ দেহভঙ্গীর চিত্র ও পৌরাণিক নানা-
বিধ চিত্র বিস্তৃতভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সাধারণ স্থপতি-
কার্য্যে দুইরকম আদর্শের নমুনা পাওয়া যায়; এক, পূর্ব
দিকের দেওয়ালের বড় বড় কাজে আলো-ছায়ার সম্পাত
গথিক স্থপতিদের চেয়ে উৎকৃষ্ট; পশ্চিম দিকের নানারূপ
রেখাঙ্কন ও নানারূপ উচ্চ নীচ প্রতিবিভাগ প্রভৃতি শিল্প-
কার্য্যের চরমশৃষ্টি বলা চলে। চিত্রশ্রেণীর দেবচিত্রাবলী যদি
সোজা হজি বরাবর একই লাইন ধরিয়া চলিয়া যাইত ও
তাহার সীমাজ্ঞাপক রেখাগুলি সোজা লাইন হইয়া যাইত
তাহা হইলে এগুলির বড় বিশেষত্ব থাকিত না। কিন্তু
স্বকোশলী শিল্পীগণ গতানুগতিক ভাবে ঐরূপ করিয়া
অধ্যায়ের পর অধ্যায় চিত্র অঙ্কন করিয়া যান নাই। তাঁহারা
সীমাজ্ঞাপক রেখাগুলি একএকটি কোণাকৃতি করিয়া অঙ্কিত
করিয়াছেন এবং কোণায়ও এই কোণের বাহুদ্বয় চিত্রের
গাত্রস্পর্শ করিয়া চিত্রকে বিকৃত করিয়া তুলিবার অবসর
পায় নাই। এই রেখাগুলির অবস্থিতি বিস্তৃতি ও উচ্চতা
গথিক স্থাপত্য অপেক্ষা ঢের উন্নত। আমাদের মনে হয়
মধ্যযুগের শিল্পীদের এই উদ্দেশ্যের চরম পরিণতি এই
হলবিদ মন্দিরের শিল্পসংস্থানেই হইয়াছিল।

বড়টির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর ক্ষুদ্রায়তন

মন্দিরটির কথা বিশেষ কিছু না বালগেও চালতে
পারে। তবুও কিছু বলা গেল। ফাগুদান সাহেব এই
মন্দিরটি সম্বন্ধে বলেন “যদি এই মন্দিরটি পূর্ব ভাবে
চিত্রদ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে বিশ্ব-
বাসী দেখিতে পাইত স্থপতির বিদ্যা কি করিতে
পারে।” ইহার পর আবার কি কিছু বলিতে হইবে?
কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বিদেশী ফাগুদান
সাহেব যাহা দেখিয়া শিল্পশাস্ত্রের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন
বলিয়া বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, স্বদেশী লোকেরা তাহাকে
বহুদিন অবহেলায় ধ্বংসের পথে তুলিয়া ধরিতেও কুণ্ঠিত
হয়েন নাই। একটি গাছ উঠিয়া বেশ জুং করিয়া শিকড়
গাড়াইয়াছিল ও একাংশ তাহার চাপে ভাঙিয়া পড়িয়া-
ছিল। লর্ড কার্জনের শুভ চেষ্টায় ভগ্নাংশের কিছু
মেরামত হইয়াছে ও ইহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে
কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু ভগ্নাংশের মেরামত-
কার্য্যের ফল পূর্বের নিকট দাঁড়াইতেই পারে না। এ
মন্দিরটিও নক্ষত্রাকৃতি ও বোলটি-কোণ-বিশিষ্ট ও খোদাই
কাজে সজ্জিত ছাদ মোচার মাথার মত। এই খোদাই
চিত্রগুলি এমন ভাবে সজ্জিত যে, সমস্ত মন্দিরটির
রেখাবলীর সৌন্দর্য্য খাটো ও অপ্রধান করিয়া না ফেলিয়া
বরং মন্দিরটির সৌন্দর্য্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে।
ইহার বিশেষত্ব এই যে, এইরূপ চিত্র সমাবেশ শুধু
ভারতীয় স্থাপত্যেই পাওয়া যায়—অন্যত্র নাই।

বেলুড়ের মন্দির বৈষ্ণবীয় প্রণালীতে গঠিত।
প্রধান মন্দিরটির চারিদিকে আরও চারি পাঁচটি মন্দির।
মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রাচীর—পূর্ব দিকে দুইটি
সুন্দর তোরণ। তিন ফুট-উচ্চ একটি চত্বরের উপর
মন্দিরটি অবস্থিত। মাথার গম্বুজটি অষ্টভুজ-বিশিষ্ট।
মন্দিরটিতে পূজা প্রভৃতি চলে—সেই জগু ইহাতে
চুনকাম করিতে করিতে ইহার শিল্পগৌরব তক্ষণ-
কার্য্য সব ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাকেই বলে
বানরের হাতে খস্তা দেওয়া। নানা আকারের ২৮টি
বাতায়ন আছে। এই বাতায়নগুলির মাঝে-মাঝে দেয়ালে
নানাপ্রকার পৌরাণিক ঘটনার চিত্র খোদিত দেখিতে
পাওয়া যায়। একটি অতি সুন্দর কার্ণিশ ও তোরণ

আছে। এই তোরণ সম্বন্ধে ফাগুর্সান সাহেব বলেন যে “এই তোরণের প্রত্যেক দিক তৈরী করিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম দরকার করিয়াছে তাহা বোধ হয় পৃথিবীর অল্প কোনও দেশে ঐ পরিমাণ কার্যের জন্ত ব্যয়িত হয় নাই।”

যাহা হউক পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দেশের লোকের স্থাপত্যে ও শিল্পে বেশ একটু আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—এই আগ্রহের ফলে যদি যাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে তাহা মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া যায় তাহা হইলেও ইহার ফল শুভ বলিতে হইবে।

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

পঞ্চশস্য

নেটা হাতের পরীক্ষা—

অনেক লোকের ডাহিন হাত অপেক্ষা বাঁ হাত খেলে ভালো; অথচ ছেলেবেলা হইতে পিতামাতা ও শিক্ষকের শাসন এবং লোকের বাক্যবিজ্ঞপ্ত তাহাদিগকে সক্ষম হাতে সুবিধামত কাজ করিতে বাধ্য দিতে থাকে; দুটাই যখন হাত তখন বাহার যেটাতে সুবিধা সে তাহাতেই কাজ করিতে পারে; সচরাচর লোকে যে হাতে যে কাজ করে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলেই ক্রোধ বা বাক্য করা অস্বাভাবিক; বাহার য হাতে সুবিধা তাহাকে সেই হাতেই কাজ করিতে দেওয়া উচিত, নতুবা কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

আমেরিকার সাউথ দাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপক ফ্রান্সলিন জেন্স, কোন্ ছেলের কোন্ হাত পটু ধরবার জন্ত, একটু যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; এই যন্ত্রে ছেলেদের কোন্ হাতের আলনা নামক হাড় লম্বায় বড় তাহাই মাপা যায়; কমুই হইতে কক্ষির মধ্যে যে ছুথানি জোড়া হাড় থাকে তাহারই ভিতর দিকের লম্বা হাড়-খানির নাম আলনা; যে হাতের আলনা হাড় লম্বায় বড় হয় সেই হাত বেশী পটু হয়, এবং ছেলেদের সেই হাতে কাজ করিতেই অভ্যাস করানো উচিত। এই যন্ত্রে সদাপ্রস্তু শিশু হইতে সকলের হাতই মাপা যায় এবং যত সকাল-সকাল শিশুর হাতের মাপ লইয়া তাহাকে সেই হাত চালনায় অভ্যস্ত করা যায় ততই ভালো। অধ্যাপক মাপিয়া দেখিয়া টিক করিয়াছেন দশ হাজার ছেলের মধ্যে ৪১৭ জন বাঁহা বা নেটা হইয়াই জন্মিয়াছিল, ৯৫৮৩ জন ডাহিনা; অর্থাৎ মানুষের শতকরা ৪১ জন বাঁহা, ৯৬ জন ডাহিনা। হুতরাং প্রকৃতির ব্যবস্থা উদ্ভট হইয়া জুলুম করিয়া নেটাদের ডাহিন হাতে কাজ অভ্যাস করাইলে সেইসব ছেলে জড়বুদ্ধি তোতলা ও অসম্মত হইয়া যায়। এই যন্ত্র তৈয়ারী করা খুব সোজা, চিত্র দেখিলেই উহার নির্মাণ-কৌশল যে-কোনো যন্ত্রজ্ঞানী বুঝিতে পারিবেন; এই যন্ত্রে কমুই হইতে আঙুলের মাথার গিরা পর্যন্ত মাপ লওয়া হয়, কারণ কেবল মাত্র আলনা হাড়ের মাপ নির্ধারণ করা সহজ নয়।

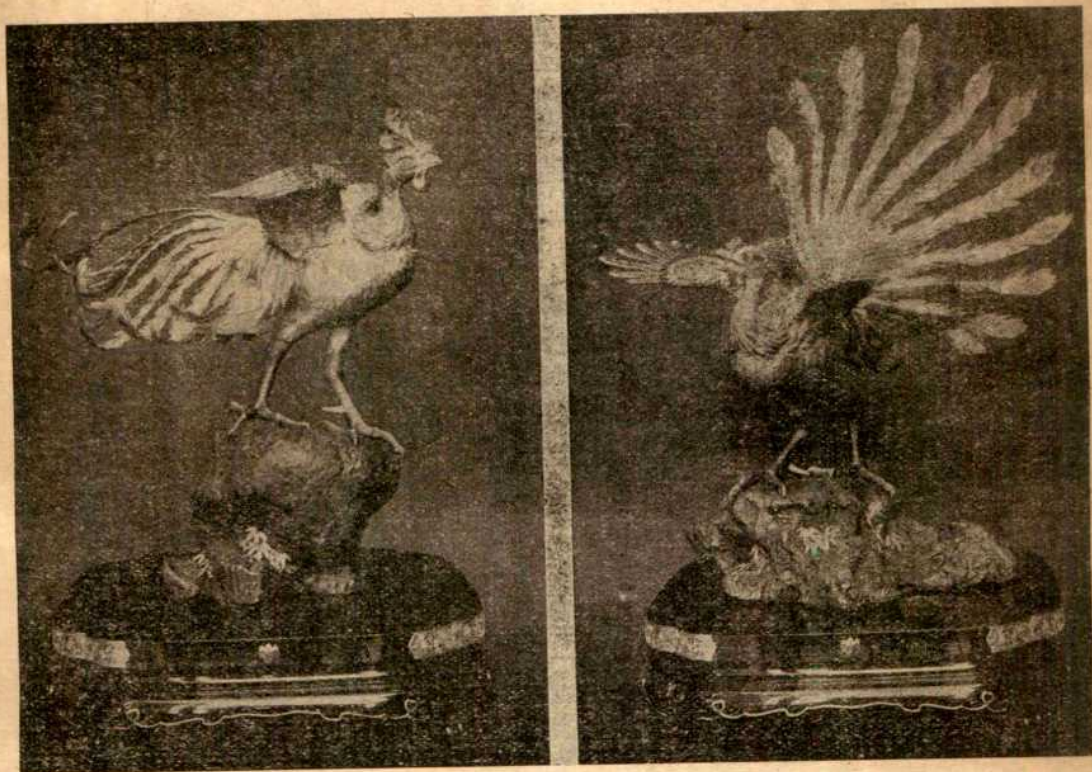


হাতের দক্ষতা নির্ণয়।

বাড়ী বহন—

আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা গোটা গোটা কোঠা বাড়ী এক জায়গায় হইতে উঠাইয়া অপর জায়গায় বসাইতে পারে; কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবাসীতে ইহার বিবরণ ও ছবি আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমেরিকানদেরা জলে স্থলে সমান ভাবে বাড়ী বহিয়া লইয়া যাইতে পারে; এক শহরের এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তায় জমির উপর বাড়ী তুলিয়া লইয়া বসায়; এক শহর হইতে অপর শহরেও বাড়ী বহিয়া লইয়া যায়। নেপোলিয়নের বাসভবন কিনিয়া ফ্রান্স হইতে তাহা জাহাজে তুলিয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিল। সম্রাতি পানামা-পাসিফিক প্রদর্শনী হইয়া গেল; সেখানে বড় বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ী নির্মিত হইয়াছিল; প্রদর্শনীর পরে অত-খরচ-করিয়া তৈয়ারি বাড়ীগুলি নষ্ট করিয়া ভাঙিয়া না ফেলিয়া লোককে বিক্রয় করা হইতেছে এবং খরিদদারেরা সেইগুলিকে জাহাজে তুলিয়া বা ভেলায় ভাসাইয়া জাহাজ দিয়া টানিয়া অভিলষিত স্থানে লইয়া গিয়া বসাইতেছে।

দি ইঞ্জিনিয়ারিং রেকর্ড নামক আমেরিকার কাগজে ইহার একটু বর্ণনা বাহির হইয়াছে। একটা দেবদান্ন কাঠে তৈরি বাংলা-ঘর ৫৫ হাজার টাকা খরচে নির্মিত হইয়াছিল; সেই বাড়ীটিকে মেলার মাঠ হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত এক মাইল পথ তুলিয়া লইয়া যাইতে এক সপ্তাহ লাগিয়াছিল। ঐ বাড়ীটির ওজন ১৬০ টন বা প্রায় সাড়ে চার হাজার মণ। সেইটিকে ডাঙা হইতে ভেলায় তোলা যে বিক্রয় বাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; ঐ অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার পাল বড় ঘন ঘন ও জলের ওঠা নামা খুব বেশী—৯ ফুট। হুতরাং বাড়ীটিকে ভেলায়

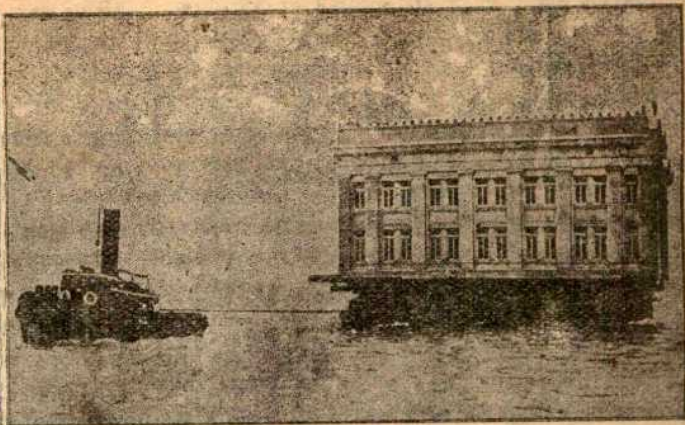
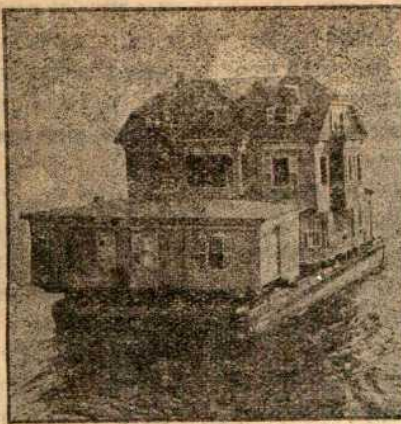


রূপার ময়ূর ।

জাপানের সেকরার তৈয়ারী ।—সম্রাটের অভিষেকের সময় আমীর-সভা (Peers' Club) সম্রাটকে উপহার দিয়াছিল ।



মসজিদের সোপানে ফকির ।
চিত্রকর শ্রীযুক্ত অরুণকুমার নাগ ।



বাড়ী বহন।

চাপাইতে হইয়াছিল খুব চটপট। ভেলায় চাপাইয়া ১৫ মাইল দূরে এক জায়গায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ছয় ঘণ্টায়। সব চেয়ে যে বড় বাড়ীটি নড়ানো হইয়াছিল তাহা ১৩২½ ফুট লম্বা, ৮০ ফুট চওড়া, ৪৩ ফুট উঁচু, ওজন হাজার টন বা সাতাশ হাজার মণ। ছথানা ছয় শত টনের ভড় জোয়ারের সময় খুব উঁচুতে চড়ায় তুলিয়া পাশাপাশি রাখা হয়; ভাটার সময় জল নামিয়া গেলে বাড়ীটিকে সেই ভড়ের উপর চড়ানো হয়; আবার জোয়ার আসিলে তাহাদের ভাসাইয়া ৩২ মাইল দূরে এক জায়গায় বাড়ীটিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এইরূপে বহু বাড়ী মেলার ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

দুধ খাওয়ার নিয়ম—

বিশুদ্ধ দুধ যেমন স্বাস্থ্যপ্রদ, অশুদ্ধ দুধ তেমনি স্বাস্থ্যহানিকর। গরুর বাঁট, গোমাল, দোহাল, ভাড়, দুধ রাখিবার ঘর ও পাত্র প্রভৃতি সমস্তই যদি খুব পরিষ্কার না থাকে তবে দুধের মধ্যে যক্ষ্মা, ক্ষয়, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড, শূল প্রভৃতি কঠিন রোগের বীজ বাসা বাঁধিয়া থাকে; এই অশুদ্ধ দুধ খাইয়াই বৎসর বৎসর অত শিশুর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণ গরুর দুধ খাইলেও মানুষের বহুবিধ গো-রোগ হইয়া থাকে। অনেক মনে করেন দুধ জাল দিয়া লইলে রোগবীজ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু পাস্তুর দেখাইয়াছেন ১৫৮ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট তাপের কমে সব রোগবীজ নষ্ট হয় না। অধিকন্তু ডাক্তার কেলগ, গুড্ হেলথ নামক সাময়িক পত্রে, মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে রান্না করিয়া খাওয়াটা মানুষের একটি স্বাস্থ্যহানিকর বিলাসিতা; রান্না-করা জিনিস স্বাস্থ্য হয় বলিয়া লোকে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত খায় ও তাহার ফলে পীড়িত হয়; রান্না করিলে খাদ্যবস্তুর অনেক পুষ্টিগত উপাদানের অপচয় হয় অথবা উট্টা রকমে অপকারী হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া দুধ কিছুতেই গরম করিয়া খাওয়া উচিত নয়; স্বস্থ পরিষ্কার গরুর বাঁট হইতে সদা-দোওয়া বাঁটি দুধ কাঁচা খাওয়া পরম বুঝা ও রসায়ন, কাঁচা টাটকা দুধে ভাইটামিন, আনজাইম প্রচুর থাকিয়া জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্ক ও পেশী-পোষক প্রোটিন থাকিতে দেহ বলিষ্ঠ হয়, অস্থিপোষক লবণ থাকিতে দেহের লাভণ্য ও কাস্তি উজ্জ্বল করে। দুধ গরম করিলে এসব গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

দুধও কঠিন খাদ্যের মতন চিবাইয়া খাওয়া উচিত; চিবাইয়া খাওয়ার গুণ এই যে খাদ্য লালার সহিত মিশিয়া পেটে গিয়া

শীঘ্র হজম হয় এবং হজম হওয়া মানে দেহে শোষিত হইয়া রসরসে পরিণত হইয়া জীবনীক্রিয়া বৃদ্ধি করে। বাছুর ও শিশুরা মাতৃদুগ্ধ চিবাইয়া চিবাইয়া খায়, অর্থাৎ দুধ পান করিবার সময় তাহারা এক এক ঢোক দুধ মুখে লইয়া মুখ নাড়িয়া পাকলাইয়া পাকলাইয়া বেশ করিয়া লাল-মিশ্রিত করিয়া খায়। এক চুমুকে খানিক দুধ গিলিয়া খাইলে পেটে গিয়া দমস্তটা চাপ দই বাঁধে; সেই চাপ দই হজম করা সকলের সাধো কুলায় না। সুতরাং দুধ ঢোকে ঢোকে মুখ নাড়িয়া খাওয়া উচিত; একেবারে অনেকখানি দুধ খাওয়া উচিত নয়; দুধ দিয়া পায়স পরমান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া খাইলেও গুরুপাক হয়।

কিন্তু বাহাদের পাকাশয়ে অধিক পরিমাণে অম্লরস ক্ষরিত হয় অর্থাৎ বাহাদের অম্লরোগ আছে, তাহাদের পক্ষে অনেকখানি দুধ একেবারে খাওয়া উপকারী; অল্প দুধ খাইলে অধিক অম্লরসের সংযোগে পেটে যে দই চাপ বাঁধে তাহা অত্যন্ত কঠিন হয়, এবং তাহাতে হজমের ব্যাঘাত হয়; বেশী দুধ খাইলে সেই অম্লরস অতখানি দুধকে খুব কঠিন করিয়া জমািতে পারে না।

পাকাশয় একই সময়ে এমন হরকমের অম্লরস ক্ষরণ করিতে পারে না বাহাতে দুধ ও মাংস দুই হজম করিতে পারে; সুতরাং মাংস খাওয়ার পর দুধ বা দুধ খাওয়ার পর মাংস খাওয়া উচিত নয়। ইহা আমাদের আয়ুর্বেদ-সম্মত।

বাহারা বেশী দুধ খায় তাহাদের অপরাপর খাদ্যের মধ্যে ফল ও তরী-তরকারী প্রধান হওয়া উচিত; দুধে চূনের ভাগ বেশী থাকে, এবং শরীরপোষক পটাশ ও সোডা খুব কম থাকে, তাহা ফল ও তরকারীতে—বিশেষ করিয়া আলুতে—খুব প্রচুর থাকিতে হরণপূরণ হইয়া যায়। কেবল দুধ ও দাল, খাইলে ছেলেদের রক্তপিত্ত রোগ হয়—অর্থাৎ দাঁতের গোড়া নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়ে; ইহার কারণ দালে আলকলি বা চুন জাতীয় পদার্থ কম থাকে,—দেহে সঙ্গতি অম্লরসকে আলকলি-পদার্থই সমতা দান করে।

ছাতার বাঁটের চাষ—

ছাতার বাঁট হুন্দর ও সুবিধা-মত করিবার জন্য ছাতার বাঁটের রীতিমত চাষ হইয়া থাকে। ক্রালের সেইন-এ-ওজ অঞ্চলে ১৫০০ বিঘা জমিতে শুধু উহারই চাষ হয়। ক্ষেতে ওক, অ্যাশ,

পদ্মার, মেঘ-পাছ পুতিয়া গাছের চারিগুলি বেশ বড় হইলে গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলা হয়; তখন তাহাদের গোড়া হইতে সোজা সোজা কৌড় বাহির হয়; সেই কৌড়গুলির গায়ে নানাবিধ নকশা কাটিয়া দায়। তিন বৎসরে সেই নকশাগুলি কাঠের গায়ে গভীর ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন সেই কৌড়গুলিকে কাটিয়া, ভালপালা ছাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া এবং তাহার পর গরমজলের ভাপে রাখিয়া তাহাদের গায়ের ছাল ছাড়াইয়া ফেলে। তারপর সেগুলিকে ভিজ্জে ভাত দিয়া সোজা করে ও নিশ্চিষ্ট মাপে-কাটিয়া গয়। কৌড়গুলি তাজা থাকিতেই বাকাইয়া বা ইচ্ছামত স্থানে অপর একটা গাছের জোড়কলম লাগাইয়া বা একটা ভাল অল্প রাখিয়া কাটিয়া বিবিধ ধরণের বাটের হাতল তৈয়ারি করে।

শুক্রে গ্রহে জীব আছে কি ?—

আমেরিকার খ্যাতনামা জ্যোতিষ ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের লেখক জি.জি. গ্যারেট সার্ভিস আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে শুক্র-গ্রহে জীব আছে কি না।

শুক্রে গ্রহের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই অনুমান হয় যে সেখানে জীব থাকার সম্ভাবনা একশত, ও না-থাকার সম্ভাবনা এক। এবং সেইসব জীবের বাহারা শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের চেয়েও অনেক বিষয়ে উন্নত ও পরিণত।

সূর্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আনিতে শুক্রের বতরুণ সময় লাগে, ঠিক ততক্ষণ সময়ই সে নিজের শরীরও একবার ঘুরা পাটায়; পৃথিবী সূর্যকে বতরুণে একবার প্রদক্ষিণ করে ততক্ষণে নিজের শরীর ৩৬৫ বার ঘুরায়; ইহার ফলে পৃথিবীর এক বৎসরে ৩৬৫ অহোরাত্র আসে যায়, কিন্তু শুক্রের এক বৎসরে মাত্র এক পিঠে একটি দিন ও অপর পিঠে একটি রাত্রি, অর্থাৎ শুক্রের এক গোলাকে চিরদিবস ও অপর গোলাকে চিররাত্রি বর্তমান। কোনো কোনো জ্যোতিষীর মতে কিন্তু শুক্রপৃষ্ঠে পৃথিবীর স্তায়ই-দিবারাত্রির পর্যায় ঘুরিয়া চলে।

শুক্রে এক পিঠে অনন্ত দিবস ও অপর পিঠে যদি অনন্ত রাত্রি হয় তবে যে-পিঠে দিন সে-পিঠে এত গরম ও যে-পিঠে রাত্রি সে-পিঠে এত বরফী ঠাণ্ডা হওয়ার কথা যে শুক্রের কোনো পিঠেই জীব উৎপত্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না—ইহা বাঁহারা মনে করেন তাহারা শুক্রের আব-হাওয়া ও আবহের অবস্থা ভাবিয়া দেখেন না। অধ্যাপক হাউসডেন স্বীকার করেন যে চিররাত্রিময় দেশে জীবের অধিষ্ঠান সম্ভবপর না হইলেও দিনের দেশে জীব থাকিবার অসম্ভব অবস্থা শুক্রে আছে। সার্ভিস বলেন চিররাত্রিময় দেশেও জীব থাকিবার কোনো বাধা নাই—রৌদ্রের উত্তাপের অভাব শুক্রগ্রহের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ও বিশেষ রকমের আবহ-অবস্থার পূরণ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

শুক্রে গ্রহ আজন্ম এই অবস্থাতেই আছে; ক্রমশঃ শীতল হইয়া জীবনবাসের উপযুক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি জীব চিররাত্রির দেশের ও কতকগুলি চিরদিবসের দেশের উপযোগী হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের আবহাওয়ার বৈচিত্র্য ও তাপবৈষম্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও আকৃতির জীব ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু শুক্রের অবস্থার সমতা জীব ও উদ্ভিদ উৎপত্তিতেও সমতা রক্ষা করিয়া থাকিবে। জীব ও উদ্ভিদের আকার ও বৃদ্ধি মাধ্যাকর্ষণের টানের প্রবলতার উপর নির্ভর করে; ছোট গ্রহের টান কম বলিয়া সেখানে জীব ও উদ্ভিদের বাড় বেশী হয়। শুক্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অল্প কম; সুতরাং সেখানকার জীবের আকার প্রকার ও চেহারা অনেকটা পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদের মতন হওয়া সম্ভব। শুক্রের হাওয়া পৃথিবীর বাতাসের চেয়ে ঘন; সুতরাং সেখানকার প্রায় সকল জীবেরই

উড়িবার ক্ষমতা আছে বোধ হয়। মাধ্যাকর্ষণ অল্প ও বাতাস ঘন হওয়াতে পাখী-জাতীয় জীবদেরই প্রাধান্য এবং তাহাদের মধ্যেই বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ ঘটিয়া উঠিতেছে; সেখানকার মানুষ-জাতীয় বুদ্ধিমান জীবদেরও ডানা আছে—তাহারাই বোধ হয় পৃথিবীর কাল্পনিক পরী বা সফার। শুক্র-গ্রহের চারপাশে জানোয়ারেরা নিরেট বোকা ধরণের, গাধার সগোত্র গোছের।

শুক্রে গ্রহের জীবেরা অধিকাংশই স্থলচর। তাহারা আবার তিন প্রকারের—(১) শুক্রপৃষ্ঠের মধ্যবলয়ের উপরে যেখানে সূর্যের তাপ বেশী লাগে সে জায়গাটা আফ্রিকার সাহারার মতন মরুময়, সেখানকার জীব পৃথিবীর মরুপ্রদেশের জীবের অনুরূপ; কিন্তু পৃথিবীর মরুভূমিগুলি আবহমান কাল ধরিয়া মরুই ছিল না, অনেক মরুভূমি সমুদ্রের শুষ্ক গর্ভ; কিন্তু শুক্রের মরুপ্রদেশ দুহাজার মাইল ব্যাপিয়া বলয়াকারে লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে সমভাবেই আছে; সুতরাং সেখানকার মরুজীবের মধ্যে বৈচিত্র্য পৃথিবীর বৈচিত্র্যাহীন মরুজীবের চেয়েও ঢের কম। একই অবস্থার মধ্যে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জীবের যে পরিণতি হইয়াছে তাহাতে প্রতিবেশী জীব-সকল হইতে তাহাদের আকৃতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের হইয়া পড়িয়াছে। শুক্রের মরুভলয়ের জীবগুলি অতিকার কিছুতকিমাকার, পৃথিবীর সত্যযুগের মস্ত কুর্খ সন্ন্যাস হইতেও ভয়ঙ্কর কুদর্শন সন্ন্যাস; উদ্ভিদও কণীমনসা-জাতীয়, কুদর্শন কটকী, তাহাদের ডগডগে রঙের বড় বড় খামার মতন ফুল। শুক্রের মধ্যদেশে এইরূপ অদ্ভুত ভয়ঙ্কর অনানুষ্ঠিত জন্মভূমি, সেখানে অল্প দেশের খুব সাহসী জীবও উঁকি মারিতে ভয় পায়। (২) এই মরুভলয়ের পরে যে বলয়টি তাহার বেড় ১৬ হাজার মাইল, চওড়া ২০০০ মাইল; তাহার মরুসমিহিত প্রান্ত গ্রীষ্মপ্রধান ও অপর দূর প্রান্ত শীতপ্রধান—যেমন পৃথিবীর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আলাস্কা বা ভারতবর্ষ ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী দেশগুলি। এই প্রদেশের উপর ঘন মেঘের চম্ভাতপ সদা-প্রলম্বিত থাকে ও মাটির উপর বড় বড় চওড়া চওড়া খাল কাটা আছে; তাহার ফলে এই দেশের উদ্ভিদ ও জীব পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশেরই সমতুল্য হওয়া সম্ভব। (৩) চিররাত্রিময় দেশের জীব—ইহাদের কথা পরে হইবে।

প্রকৃতি পৃথিবীর পরীক্ষাশালায় লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া কত-বিধ জীব গড়িয়া ভাঙিয়া বহু গবেষণায় বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মানুষের যেমন আকার-প্রকার বুদ্ধি-শক্তি তাহাই জীবপরিণতির শ্রেষ্ঠ বিবর্তন। সুতরাং আন্দাজ করা বাইতে পারে যে শুক্রবাসী জীবদের বুদ্ধিমান বাহারা তাহারাও কতকটা মানুষেরই মতন, কেবল স্থানীয় অবস্থার ফেরে যা অজস্র অদল-বদল হইয়া থাকিবে। তাহারা মানুষের মতন খাড়া হইয়া চলে; মস্তিষ্কটা শরীরের উর্দ্ধে মাথার মধ্যেই থাকে; মানুষের মতনই চলিবার জন্ত একজোড়া পায় ও কাজ করিবার জন্ত একজোড়া হাত তাহাদেরও আছে; তবে কার্যপ্রণালী ও অবয়বের আকারের খুঁটিনাটিতে পার্থক্য থাকিতে পারে।

সূর্য হইতে বিকীর্ণ বিদ্যুৎশক্তিতে ব্যাপ্ত আকাশের যে আলো পৃথিবী আছে তাহা অপেক্ষা অধিক বিদ্যুৎশক্তি ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থান। ইহার ফলে শুক্রগ্রহের চুম্বকশক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তি খুব প্রবল হইবার কথা। ইহার প্রভাব সেখানকার জীবের দেহ ও বুদ্ধিকে অধিকতর শক্তিশালী ও কর্মক্ষম করে। অধ্যাপক হাউসডেনের মতে শুক্রের উপরে যে ঘনমেঘের চাঁদোয়া আছে তাহা শৌক্রেয় লোকদের বুদ্ধির রচনা; সেই মেঘান্তরণে সৌর শক্তি সঞ্চিত হইয়া শুক্রপৃষ্ঠে আবশ্যক-মত সঞ্চারিত হয়; এবং এইরূপ সর্বত্র তাপ ও শৈত্যের সমতা সম্পাদন করিয়া তাহারা সুখে বহুদলে বাস করে। পৃথিবীর

বৈজ্ঞানিকেরা দেখিরাছেন যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনার গাছপালা খুব বাড়ে; সুতরাং শুক্কের স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সেখানকার জীব ও উদ্ভিদের পোষণ ও বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করে। শুক্ক একে মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর অপেক্ষা কম, তাহাতে বৈদ্যুতিক ও চুম্বক-শক্তি অধিক এবং মেঘ-শারিরানী তাপ ও শৈত্যের সমতা রক্ষা করে, ইহাতে সেখানকার লোকেরা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে আঁকারে বড়, দেহ-শক্তিতে দড়, মনের জোরে দৃঢ় ও দ্ব্যাবিক বলে পোক্ত। ইহার ফলে তাহাদের এমন সব ইল্লিয় উলগত হইয়াছে যাহা আমাদের ভাণ্ডো জুটে নাই। আমরা যেমন আলো ও শব্দ দেখিতে ও শুনিতে পাই, তাহারা তেমন সহজে বিদ্রোহের অস্তিত্ব বিশেষ কোনো ইল্লিয় দিয়া ধরিতে পারে হয়ত। সে-সময় ইল্লিয় মাথার চারিদিকেই থাকা সম্ভব। তাহারা কথ্য বলে 'ইলেট্টো-ম্যাগেটিক' অর্থাৎ বৈদ্যুত-চৌম্বক শক্তিসম্বিত স্বরে, তাই সে-কথা সমস্ত গ্রহপৃষ্ঠেই শোনা যায়। যদি তাই হয় তবে সেখানকার প্রেমিক এমন কথা বলিতে পারে না যে "সখী, তোমার গোপন কথাটি, শুধু আমার বোলো আমার বোলো।" সেখানে সব কথাই সকলের কাছে ফাঁদ হইয়া যায়। তবে এমনও হইতে পারে যে আমাদের তারহীন টেলিগ্রাফের মতন সে শব্দ সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িলেও সকলেই ধরিতে পারে না, কেবল বাহ্যিক বলা হইতেছে সেই ধরিতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তির মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকিতে মনের কথা মনে মনে চালান করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব; এবং তাহাদের মনেরও এমন বাহ্য বল আছে যাহার শক্তায় বস্তুকেও গতি দান করা যায়। তাহারা শক্তকে চোখের কটাক্ষে বধ করিতে পারে, কামান বন্দুক তাহাদের কিছুই করিতে পারে না; তাহাদের চোখের বদলে, কিম্বা চোখ ছাড়াও, এমন একটা ইল্লিয় আছে যাহা হইতে বিদ্যুৎ ছিটকাইয়া অপরকে সম্বোধিত বা আঘাত করিতে পারে। আমরা যেমন চোখের পর্দায় চারিদিকের বস্তু প্রতিফলিত আলোকের ছবি দেখিয়া তাহাদের সত্তা অনুভব করি, শৌক্যের লোকেরা পারিপার্শ্বিক বস্তুর বিদ্যুৎ-বিকিরণ অনুভব করিয়া তাহাদের সত্তার জ্ঞান লাভ করে হয়ত। বিদ্যুৎ-শক্তি আলোক-শক্তি হইতে প্রবল বলিয়া তাহাদের বস্তুজ্ঞান আমাদের বস্তুজ্ঞান হইতেও প্রকৃষ্টতর ও প্রগাঢ়, বস্তুর গুঢ় অন্তর্দেশের ধবর পর্যন্ত রঞ্জন-রশ্মি বা X-rayর ছবির মতন তাহাদের ইল্লিয়ে ঘরা পড়।

শৌক্যের লোকেরা দীর্ঘায়ত, হৃদয়ঙ্গম-মেহ, হৃদয় হৃদয়; তাহারা অতিমাত্রায় অপারিষ্য শক্তিসম্পন্ন; তাহাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি, মদনের স্বরূপ সমস্ত হইয়াছে। শুক্কগ্রহ সূর্যের নিকটবর্তী বলিয়া সেখানে কতবিধ নব-নব শক্তি নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে; তাহার ফলে সেখানকার লোকেরা অমৃতকর্ষী, আমাদের কল্পনাও তাহাদের কাক্সের কাছে হার মানেন। বস্তুবিজ্ঞানে তাহারা সুপণ্ডিত, তাহারা এক-একজন এক-একটা চলন্ত জীবন্ত বিদ্রোহের ব্যাটারী, তাহারা মাটিতে ইটিয়া চলে আমাদের দোড়ের মতন, আকাশেও উড়িয়া বেড়ায় অনায়াসে। পৃথিবীর সকল দেশের পুরাণেই দেবরাজকে বস্তুপাণি বলিয়া কল্পনা করা হয়; শুক্কের দিনময় লোকেরা বস্তুপাণি বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

শুক্কগ্রহের চন্দ্র নাই। তাহার রাত্রিময় পৃষ্ঠ তারকার আলোক ও বিদ্যুৎ-উদ্ভাসনে আলোকিত। সেই দেশের লোকেরাও বুদ্ধিমান জীব বটে, কিন্তু দিনময় পৃষ্ঠের লোকদের মতন নহে। চন্দ্রলোকে বাতাস নাই বলিয়া সেখানে জীবের সম্ভাবনা মনে হয় না; কিন্তু শুক্কের রাত্রিময় দেশে প্রচুর আবহাওয়া থাকিতে সেখানে জীবের সম্ভাবনা আছে। সে দেশ খুব ঠাণ্ডা বলিয়া জীবদের গা খুব লোমশ ও শীতসহ বলিয়া অনুমান হয়। এইসব জীবেরও বৈদ্যুতিক ইল্লিয় থাকা সম্ভব—তাহা

হইতে গভীর সমুদ্রের জীবের মতন আলোক বিকিরণ হয় ও টর্পেডো বা বৈদ্যুতিক কুঁচলে মাছেব স্থায় বিদ্যুৎ-আঘাত করিতে পারে। তাহারা বুদ্ধিমান জীব হইলেও দিনময় পৃষ্ঠের জীবদের মতন দেখিতে নয়; তাহারা মাটির তলায় বাস করে এবং উপযুক্ত অস্ত্রের সাহায্যে মাটির তলায় ছুঁচোর হুড়ঙ্গ-আবাদের স্থায় তাহারাও বড়-বড় শহর জনপদের পত্তন করে।

শুক্কের দিনময় পৃষ্ঠের ঝাল হইতে জলবাষ্প প্রবাহিত হইয়া রাত্রিময় পৃষ্ঠের দিকে যায় এবং সেখানকার ঠাণ্ডায় জমিয়া বরফের বলয়ে রাত্রিময় দেশটিকে ঘিরিয়া অনধিগম্য করিয়া রাখে, কিন্তু সেই বরফ-বলয়ের বেষ্টিত মধ্যের দেশ বরফ-বিমুক্ত ও সেখানকার বাতাস শুষ্ক—সুতরাং সেখানে জীবের বিচরণের কোনো বাধা নাই। অমূল্য্য বরফ-বলয়ে বেষ্টিত থাকিতে দিনময় দেশের জীব রাত্রিময় দেশে বা এদেশের জীব সেদেশে গত্যাত্য করিতে পারে না;—তাহারা একই গ্রহে জন্মিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া আছে।

চাক্র।

কষ্টিপাথর

মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে মুসলমান।

জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মহাত্মা নিউটন, (১৬৪২—১৭২৭ খৃঃ অব্দে) মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বর্তমান সভ্যজগতের জ্ঞানচক্ৰ উন্নীত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই নিপুট তত্ত্ব ইহার বহুকাল পূর্বেই মোসলেম বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয়। এই মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব, তখন মুসলমান-শিক্ষিতসমাজে এতই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, অবৈজ্ঞানিক কবিগণও নানা প্রাকৃতিক বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক কবি, মোলানা রুমী "মসনবী-এ-মানবী" নামক মহাকাব্যের মধ্য হইতে কয়েকটি কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রাকৃতিক বিদ্যানে, জগতের সমুদয় উপাদান পরস্পর সংযোজিত এবং প্রেমভরে একটা আর একটির প্রতি আকৃষ্ট।

জগতের প্রত্যেক বস্তু অস্ত্রের সহিত সশ্লিষ্ট-প্রয়াসী, যথা চুম্বক লৌহখণ্ড, বৃক্ষ লতার প্রতি আকৃষ্ট।

জ্যোতিষমণ্ডলী (চন্দ্র, সূর্য, তারকা ইত্যাদি) পৃথিবীকে সানদর সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "চুম্বকের সহিত লৌহের যোগ সঞ্চ, তোমার সহিতও আমাদের সেইরূপ সঞ্চ।"

কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—এই ভূমণ্ডল কিরূপে এই ভৌমণ্ডল-বেষ্টিত গুহ্মার্গে অবস্থিতি করিতেছে?

ইহা লগ্ননের স্থায় কিরূপে গুহ্মে স্থিতিতেছে? ইহা না নিয়মমী হইতেছে, না উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে।

দার্শনিক তাহাকে উত্তর দিলেন, "আকাশ বা সৌরজগতের গ্রহাদির আকর্ষণ-শক্তিতে জগৎ বর্টনিক হইতে আকৃষ্ট হইয়া গুহ্মে স্থিতিতেছে।

একটি চুম্বকের শূন্য পোলকের মধ্যে, এক গোহুল্যমান লৌহখণ্ড সংরক্ষিত হইলে তাহা যেরূপ স্থিতিতে থাকে ঠিক তদ্রূপ।"

যে যুগে সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, যে যুগে ধর্ম্মাঙ্ক খৃষ্টিয়ানগণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রবলবেগে বাধা দিতেছিল, সেই যুগেই মোসলেম গণ্ডিতগণ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারা অনুপরিমায়ুর

সংযোজন-তত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক শক্তি ও চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

মোলানা রুমী-বিরচিত ‘মসনবী’ গ্রন্থে বিশ্বনিয়ন্তা খোদাতাআলার মহিমা প্রকাশ-প্রসঙ্গেই কবিতায় মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের আলোচনা আনিয়া পড়িয়াছে। এই মহাকাব্য ছয়শত বর্ষেরও অধিক হইল রচিত হইয়াছে।*

আবদুর রহমান।

* মুসলমানগণ যে, পণ্ডিতপ্রবর নিউটনের সপ্তশতাব্দিক বর্ষ পূর্ব হইতে মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব অবগত ছিলেন, মোসলেম-ঈগণের ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এমাম ফরর উদ্দীন রাজি ঘাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি তাঁহার “মবাহেসে মশরেকিয়া” নামক গ্রন্থে তৎপূর্ববর্তী এসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সাবিত এবং কোরা’র একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ যথা—“আমরা যখন কোন প্রস্তরখণ্ডকে উর্দ্ধদেশে নিক্ষেপ করি, তখন তাহা যে ভূতলশায়ী হয় তাহার কারণ এই যে প্রত্যেক বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ তাহার বৃহত্তম অংশের প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রত্যেক বস্তুর পক্ষে তাহার সমস্তের মূল বা বৃহৎ বস্তুর প্রতি ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহার একটা দৃষ্টান্ত যথা—মনে করুন, ভূপৃষ্ঠের দুইখণ্ড মাটি যদি গুরুত্বশেষে অনতি ব্যবধানে সংরক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার বৃহৎ খণ্ড ক্ষুদ্র খণ্ডকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে। পৃথিবীকে সমান ভাগে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া গুরুত্বার্গে রাখিয়া দিলে তাহা পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একসঙ্গে মিলিত হইবে। পরন্তু ইহাও যদি কল্পনা করিয়া লওয়া যায় যে, পৃথিবীকে সূর্য্য-মণ্ডলের নিকট রাখিয়া দিয়া আর একখণ্ড প্রস্তর বর্তমান পৃথিবীর স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উক্ত প্রস্তর-খণ্ড পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সেই হৃদয় সূর্য্য-মণ্ডলের নিকট উপহিত হইবে। আবার একুণ বদি কল্পনা করা হয় যে, পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গুরুত্বার্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া-নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে, ঐ-সকল খণ্ডাংশ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া পুনর্মিলিত হইবে।” মুসলমান সাধারণ কবিগণও যে কবিতাদিতে নানা বর্ণনা-প্রসঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের অবতারণা করিতেন, আমরা এই ক্ষেত্রে “কবি ওয়াহশী এজদি” প্রণীত “মসনবী শিরি ফরহাদ” গ্রন্থ হইতে আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কবি হিজরী দশম শতাব্দীর লোক।

অনুবাদ—প্রত্যেক সতত-গতিশীল পরমাণুতে এক আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান, সেই পরমাণু অল্প পরমাণুকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

তুমি যদি নিম্ন হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তাহা হইলে কোন বস্তুই তুমি এই আকর্ষণ-শক্তি দেখিতে পাইবে না।

অগ্নিশিখা হইতে বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত, এবং জলাশয় হইতে ভূতল পর্য্যন্ত, পৃথিবীর নিম্নতম নিক হইতে উচ্চ আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত তুমি যদি বৃত্তিতে পার, তবে সর্বত্রই পাশাপাশি ও দলে দলে এই আকর্ষণ বিদ্যমান।

পদার্থ-ঈগণের এই আকর্ষণ সম্বন্ধ, অতি জটিল শৃঙ্খলে লুকাইয়া, বলা বাহুল্য যে, এই আকর্ষণই মূল পদার্থ, এতদ্ব্যতীত আর সমস্তই ছুয়া।

এই আকর্ষণ-শক্তি লৌহখণ্ডে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতেই সে চুম্বকের সহিত জড়িত হইয়া থাকে।

এই আকর্ষণ-প্রভাবই অনায়াসে তৃণ লতা চুম্বকের সহিত হৃদয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুতেই যেন এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাই প্রত্যেক বস্তু, অজ্ঞের প্রতি ধাবিত হইতে বিব্রত।

বস্তুতঃ যখন এই আকর্ষণী শক্তি কোন বস্তুতে প্রবলতর হইয়া উঠে, তখন তাহা প্রেমভারাক্রান্ত হইয়া বস্তুর প্রত্যেক অণুপবমাণুতে বিস্তার লাভ করে।

“নহজলবলাগাৎ” গ্রন্থে আরও স্পষ্টভাবে এই মাধ্যাকর্ষণের প্রমাণ বিদ্যমান।

(আল-এসলাম, আদ্বিন)

* * *

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের লিখন-পদ্ধতির ক্রমাভিব্যক্তি—

বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সাধারণতঃ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ ইহার জন্ম ও শৈশব—অর্থাৎ রামমোহনীর যুগের পূর্ব পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় ভাগ রামমোহনীর যুগ। তৃতীয় ভাগ বিদ্যা-সাগরীয় যুগ। চতুর্থ ভাগ বঙ্কিমী যুগ। পঞ্চম ভাগ আধুনিক যুগ। অবশ্য এই-সমস্ত যুগেরও আবার অনেকগুলি বিভাগ আছে। দৃষ্টান্ত-রূপে বলা যাইতে পারে চণ্ডীদাস প্রভৃতির গদ্যপদ্যময় যুগ। এই গদ্যপদ্যময় যুগের নমুনা আমরা চণ্ডীদাসের পদকল্পতরুতে পাই।

প্রাচীনকালে বাংলা পদ্যই সবিশেষ আলোচিত হইত। বর্তমান যুগেও পদ্য লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে; তুলনায় বাংলা গদ্যের সেরূপ আলোচনা হয় নাই। তবে অধুনা বাংলা গদ্য লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ধারা কোন্ পথে চলিবে তাহা লইয়া খুব আলোচন করিতেছেন।

প্রথম ভাগ

জন্ম—বাংলা গদ্য-সাহিত্য যে কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সঠিক সময় নির্ধারণ করা সহজ নহে। তবে এ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-যুগের পূর্বের বাংলা ভাষায় কোনও গদ্য-রচনা পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে মোটামুটি এক-রকম ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বৌদ্ধ-যুগে প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

শুষ্ক পূরণ—শুষ্ক পূরণে প্রাচীন গদ্যের প্রথম নমুনা দৃষ্ট হয়। ইহা প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বের রচিত। এই সময়ে অল্প কোনও গ্রন্থে গদ্যের নমুনা পাওয়া যায় না। ইহার পরবর্তী বৈষ্ণব-যুগে বাংলা গদ্যের চলন হইতে আরম্ভ হয়।

কারিকা—চৈতন্যপ্রভুর শিষ্য রূপগোষাচারীর কারিকা নামক এক-খানি পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে। পুস্তিকাখানি চারি শত বৎসর পূর্বের রচিত।

চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি—নামক পুস্তকে গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়।

রাগমরী কণা—কৃষ্ণদাসের “রাগমরী কণা” নামক একখানি পুস্তক দেখা যায়। এই পুস্তকে যে-সকল স্থানে কোনও সূত্রের ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন হইয়াছে সেই-সকল স্থানে গ্রন্থকার গদ্য লিখিয়াছেন।

সহজিয়া সম্প্রদায়—সহজিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক লিখিত প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বের অনেকগুলি পুস্তিকা রহিয়াছে। ইহার একখানি “চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি”। অস্তগুলির ভাষাও প্রায় উক্তরূপই।

তত্ত্বের ভাষা—প্রাচীনকালের একখানি তত্ত্ব বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়।

দরবারী ভাষা—দরবারী ভাষায় উর্দু ও সংস্কৃতের অপূর্ণ মিশ্রণ দেখা যায়। এই বিকৃত বাংলা গদ্য এখনও ললিতাদিতে লিখিত হয়। এগুলি বাঁধি গতেব মত।

ভাষাপরিচ্ছন্ন—ইহা সংস্কৃত ভাষাপরিচ্ছন্দের অনুবাদ।

মুসলিমের বারমাস—কোনও মুসলমান গ্রন্থকারের রচিত একখানি

প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার স্থানে স্থানে গদ্য রচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রজকারিকা—বৈষ্ণব সম্প্রদায়-রচিত।

একটু মনোবাগ দিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিশুর মুখের আড়ষ্ট ভাব ক্রমশঃ কাটিয়া আসিতেছে। গ্রন্থকার সহজ সরল মৌখিক ভাষায় নিজের বক্তব্য বলিয়া বাইতেছেন। কোনও স্থানে গ্রন্থকারের ভাবপ্রকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ত বোধ হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত “বৃন্দাবনলীলা” “শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা” প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থগুলির ভাষা বেশ সরল।

এই সময়ের ভাষার রূপ প্রায় উক্ত সময়ের কথা ভাষারই অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। সাধুভাষা ও প্রাকৃতভাষা এই দুই কৃত্রিম বিভাগের আবির্ভাব তখনও হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

এই সময় বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক আলোচনা হইতে বলিয়া বোধ হয় না। কঠিন কঠিন স্বর-সমূহের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য বোধ হয় মধ্যে মধ্যে গদ্য গ্রন্থ রচিত হইতে।

খৃষ্টানী ভাষা—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইয়ুরোপীয়গণ বাংলা গদ্যের উন্নতি করিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও তাঁহারা তাদৃশ কোনও উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহাদের ভাষা সাধারণতঃ ‘খৃষ্টানী ভাষা’ নামে পরিচিত। কেরী, মাসম্যান, কষ্টার প্রভৃতি ইয়ুরোপীয়গণ এই খৃষ্টানী ভাষার জন্মদাতা। ইহারা তৎকালীন উর্দু মিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহজ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহজ হইলেও ইংরেজীর অনুরূপে লিখিত হওয়ার উহা একটু অস্বস্ত রকমের হইয়াছিল।

হালহেডের ব্যাকরণ—শ্রীঃ হালহেড সাহেব ইয়ুরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৭৭৮ অব্দে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

প্রমোত্তরমালা—“বেণ্টোসাহেবের প্রমোত্তরমালা” ১৭৬৫ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজ শাসন আরম্ভের ইহাই সর্বপ্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহার পর আমরা কেরী সাহেবের গ্রন্থ দেখিতে পাই।

ইতিহাস-মালা—“খৃষ্টানী ভাষা”র পুস্তক। ইহা ১৮১২ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়।

এই খৃষ্টানী ভাষা বেশ সরল ছিল। এ পর্যন্ত দেখা গেল, যে, লিখিত ভাষা মৌখিক ভাষারই অনুরূপ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এইবার পণ্ডিতী ভাষার আরম্ভ।

পণ্ডিতী ভাষা বা সাধুভাষার জন্ম—ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে বাংলা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। কেরেকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাংলা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হন। ইহারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। কিন্তু ইহাদের ভাষা বড়ই সংস্কৃত-বেঁসা ও সাধারণের দূরবিগম্য স্বরীর্ঘ উৎকট সমাসাবদ্ধ। ইহারা নিজেদের পাণ্ডিত্য ধারা বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতে বাইরা যে তাহাকে কিরূপে বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন তাহা ‘প্রবোধচক্রিকা’ প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি এই ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নতির স্বরূপাত হয়। ইহার পূর্বে বাংলা গদ্যের সরল ধারাবাহিক আলোচনা হয় নাই। এই সময় হইতেই বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক আলোচনা আরম্ভ হয়। এই পাণ্ডিত্যভিমानी সংস্কৃতজ্ঞরা সিভিলিয়ানদিগের জন্য অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক লেখেন। যথা—শৌলক শর্দীর ‘হিতোপদেশ’, ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যালঙ্কারের ‘পুরুষ-পরীক্ষা’, ও ‘প্রবোধচক্রিকা’ ইত্যাদি।

প্রবোধচক্রিকার স্থানে স্থানে অনুপ্রাসবাহুলা-হেতু উহা চক্কানদের দ্বারা অতিকটু ও অহেলিকার দ্বারা দুর্বোধ্য হইয়াছে।

শিশুবোধক—এই সময়ে দেশীয় বালকগণের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ‘শিশুবোধক’ নামক একখানি পুস্তক লিখিত হয়। শ্রুতমারমতি বালকদিগের জন্য উৎকট ভাষার পুস্তক লেখা হইয়াছিল।

কিন্তু এ সময়ের সকলেই যে পণ্ডিতী ভাষায় লিখিতেন তাহা নহে। পণ্ডিতী ভাষা বা সাধুভাষা তখন কেবল কোর্টউইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সরল গদ্যের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি।

কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত—১৮১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরীতে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত মুদ্রিত হয়। ইহা প্রাচীন কালের বাঁচী গদ্যে লিখিত।

“তোতা ইতিহাস” “বাঙ্গালা ভাষাতে” “শ্রীচৌচরণ মুনীতে” রচিত লন্দন রাজধানীতে চাপা হইল ১৮২৫।

ডবল যন্ত্রি—প্রাচীন গদ্যে ‘দিগের’ এই বিভক্তিটির পূর্বে প্রায়ই একটি ‘র’ প্রযুক্ত হইত, যথা :—‘লোকের-দিগের,’ ‘ভৃত্যের-দিগের’।

যে ভাষার টেকচাঁদ ঠাকুর ‘আলালের ঘরের দুলাল’ রচনা করিয়া-ছিলেন তাহা তিনিই প্রবর্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। কিন্তু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ‘কামিনীকুমার’-রচক কালীকৃষ্ণ দাস ‘গদ্যছন্দের’ যে নমুনা দিয়াছেন তদ্রূপে আলালী ভাষা তাঁহার সময়েও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

গদ্যছন্দ ও গদ্যে ভণিতা—গদ্য রচনার পূর্বে ‘গদ্যছন্দ’ এই কথাটি ব্যবহৃত হইত। গদ্য রচনায় বেক্রপ ভণিতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল গদ্যপুস্তকেও মধ্যে মধ্যে সেক্রপ ভণিতা দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

রামমোহনীয় যুগ

রামমোহনের ভাষা—রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে একটা নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। একালপর্যন্ত বাংলা গদ্যের লিখন-পদ্ধতির তেমন কোনও নিয়ম ছিল না। কাজেই গদ্যের নিয়মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে গদ্যরচনায় প্রযুক্ত হইতে হইয়াছিল।

রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের লিখন-পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখনপদ্ধতিই তৎকালে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাঁহার যুগকে এক-রকম অনুবাদের যুগ বলা যাইতে পারে। তাঁহার ‘বেনাঙ্গমুদ্র ভাষানুবাদ’ বাংলা ভাষার একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা বাতীত রামমোহন রায় বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি আরও কতগুলি পুস্তক লিখেন। দেশীয় লোকে বাহাতে সহজে বাংলা বুঝিতে পারে তিনি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি যে কত সহজ বাংলা লিখিতেন তাহা পাঠ করিলে বোধ্য যায়।

রামমোহনের ভাষা বেশ সহজ সরল ও সুন্দর ছিল। তাঁহার পূর্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের এই নব-শ্রী দৃষ্টিগোচর নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির স্বরূপাত হয়।

এই শতাব্দীতেই কোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, ও ভাষা সংস্কৃত-বেঁসা হয়—আবার এই শতাব্দীতেই খৃষ্টান মিশনারীদিগের বাংলা চর্চ্চা ও রামমোহনের আবির্ভাব। আবার এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ব্যবসায়িক মহাশয়ের আবির্ভাব।

আর একটা কথা, এই শতাব্দীতে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সভা’ ‘বিজ্ঞান অনুসন্ধান সমিতি’ প্রভৃতি স্থাপিত হয়। অনেকগুলি বাংলা মাসিক-পত্রও এই সময় হইতে চলিতে আরম্ভ করে। বিজ্ঞানাদি অনেক বিষয়ের গ্রন্থ এই সময়ে প্রকাশিত হয়। একটু মনোযোগ করিয়া

পর্যবেক্ষণ করিলে ধরিতে পারা যায় যে চারিদিকের বাতপ্রতিঘাতে ভাষা ক্রিয়গতভাবে গড়িয়া উঠিতেছে।

তৃতীয় ভাগ বিদ্যাসাগরীয় যুগ

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যকে সলিলের মত বহু করিয়া তুলিলেন। তিনি যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের কত উন্নতি করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দেশের মধ্যে বাংলা গদ্য চালাইবার জন্য তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বর্ণ-পরিচয় লিখিয়া তিনি দেশীয় বালকদের প্রভূত উপকার সাধন করেন। বাংলা গদ্য-লিখন-পদ্ধতির তিনি যথেষ্ট উন্নতি করেন। 'জটিল ছন্দো-বন্ধ' ত্যাগ করিয়া তিনি সরল ভাষার প্রবর্তনা করেন।

বিদ্যাসাগরীয় যুগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিভাবান বাংলা গদ্যলেখকদিগের আবির্ভাব হয়। ইহাদের সকলেরই ভাষা সরল ও মূল্যবান।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বে বাংলা গদ্যে, ১:১! ১ বিরাট, বিস্ময় ও বিজ্ঞানোৎসাহ প্রভৃতির চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ঐ-সকল চিহ্নের প্রবর্তক।

চতুর্থ ভাগ বঙ্কিমী যুগ

বঙ্কিমীযুগে দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে 'চৈকচাঁদ ঠাকুর', কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির আবির্ভাব।

অক্ষয়বাবুর যুগের পূর্বে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকেই বাংলা ভাষাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, যাহাদের কিছু লিখিবার ক্ষমতা ছিল তাহাদের সেই ক্ষমতাকে ইংরেজী সাহিত্যে নিমোজিত করিতেন। কারণ তাহারা বলিতেন বাংলা 'বর্বরের ভাষা'। তাহাদের বিবাদ ছিল যে বাংলা ভাষা শিশু ও মুর্থের ভাব প্রকাশের উপযোগী হইলেও হৃদয়বৃত্তির স্বরূপের ভাব প্রকাশের উপযোগী নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'আপনার শিক্ষাপূর্ণ বঙ্গভাষার প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একবারেই প্রকাণ্ড প্রকাশ করিলেন।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষাকে 'সলিলের মত বহু ও স্নিগ্ধ' করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তখনও তাহা সলিলেরই মত স্বাদহীন ছিল।.....আজ যে সেই ভাষা 'আনন্দে উজ্জ্বলিত, বেদনায় বিকম্পিত, লজ্জায় সঙ্কুচিত, যুগায় বিকৃষ্ট, ক্রোধে বিগলিত, অমুরাগে উজ্জ্বলিত, আবেগে আন্দোলিত, স্বিধার বিচলিত হইয়া উঠে—আজ যে সেই ভাষা সাহিত্যের সৌন্দর্য্যবিকাশে, দর্শনের কূট বিচারে, বিজ্ঞানের সত্যপ্রচারে, ধর্ম্মের তত্ত্বপ্রকাশে সক্ষম, তাহা বহুজনের বহুচেষ্টার ফল—সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বহুজনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য।'

বঙ্কিমবাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—
"প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্যলেখক। তাহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল তাহা লৌকিক ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এমনকি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপরভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অল্প কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাহারা কদাচ 'বয়ের' বলিতেন না, 'বদির' বলিতেন। 'বি' বলিলে তাহাদের রচনা অন্তর্ভুক্ত হইত, 'আজাই' বলিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, 'রস্তু'

বলিতে হইবে। ফলাফলে বসিয়া 'দই' বলিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শিশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না। শ্রোতার কেহ 'শিশুমার' অর্থ জানেন না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় 'কি বলিতেছেন তাহার অর্থ লইয়া অতিশয় শোলযোগ গড়িয়া গিয়াছিল।'

এই সমস্ত কারণে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি পুস্তক গ্রাম্য-ভাষায় লিখিত হয়।

"বাংলা গদ্য এই দোটারায় শ্রোতে গড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখন-রীতির অনুসরণ করিতে হইবে কি আলালের লিখন-রীতির অনুসরণ করিতে হইবে এই সমস্তার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় অবতীর্ণ হইলেন। এই দ্বিবিধ ভাষার উপযুক্ত সমাবেশে সর্বোৎকৃষ্ট ও সম্পূর্ণত-সম্পন্ন বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তি। সংস্কৃতপ্রিয় পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন বুঝেন নাই যে, নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাষা গুরুপঞ্জীর ভাষার বাংলার সর্ববিধ ভাবের প্রকাশ অসম্ভব, ইংরেজীতে হৃদয়বৃত্তির প্যারিচাঁদ মিত্রও তেমনি বুঝেন নাই যে কেবল প্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় সেরূপ ভাব প্রকাশ অসম্ভব।"

পঞ্চম ভাগ

আধুনিক যুগ

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের লিখন-পদ্ধতি এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহাই বিচার্য্য। অনেকে মৌখিক ভাষাকেই লিখনের ভাষা বলিয়া চালাইতে চান—অনেকে আবার তাহার বিপক্ষে।

এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত—
"কয়েক বৎসর দেখিতেছি, গ্রাম্যতা ও অপভ্রংশ-পূর্ণ ভাষা পুস্তক-প্রবন্ধাদিতে ব্যবহৃত হইতেছে।.....এরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। আপন-আপনি'র মধ্যে কথা কহিতে হইলে কথার মৌলতা, সৌষ্টব্য, সৌন্দর্য্যের দিকে কেহই অধিক দৃষ্টি রাখে না। কথা ভাঙ্গিয়া হটক মুচড়াইয়া হটক যেমন করিয়া হটক, শীঘ্র ও সংক্ষেপে কহিতে পারাই সকলে অত্যাশঙ্ক্য মনে করে। কিন্তু পুস্তকাদি লিখিয়া বাহিরের লোকের সহিত, সমাজের সহিত কথা কহিতে হইলে, লোকে ভিন্ন-প্রণালীতে কথা কহে; শব্দের সৌষ্টব্য, সৌন্দর্য্য, মৌলতা, সম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখে। অনেক বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের ঘরে একপ্রকার, বাহিরে ভিন্ন-প্রকার। মানুষের পরিচ্ছদ ঘরে আপনায় লোকের কাছে এক-প্রকার, বাহিরে অপর লোকের কাছে অর্থাৎ সমাজে ভিন্ন-প্রকার। মলিন বা ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অপরের নিকট গমন করিলে, অপরের অমর্যাদা করা হয়; সকল দেশের লোকেরই এইরূপ সংস্কার। ঘর হইতে বাহির হইতে হইলেই, পরিবার ছাড়িয়া সমাজে প্রবেশ করিতে হইলেই, মানুষ একটু সাজসজ্জা করিয়া থাকে—পরিচ্ছদেও করিয়া থাকে, ভাষাতেও করিয়া থাকে; নহিলে সমাজের অমর্যাদা হয়। অনেকে বলেন পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ঘরে বাহিরে প্রভেদ করা অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক; কিন্তু অস্বাভাবিক হউক আর অযৌক্তিক হউক, প্রভেদটা এত প্রবীণকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এত সর্ববিশেষত্ব যে উহা উঠাইয়া দিতে বলা যেমন বাতুলতা, অস্বাভাবিক তাহা তেমনি ঘৃণিতা এবং অশিষ্টতা। সাহিত্যে এরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে সমাজের অবমাননা করা হয়।

সাহিত্যে এরূপ ভাষা পরিহার করিবার অল্প হেতু আছে। একই শব্দ লোকে নানান্থানে নানান্থকারে ভাঙে। খাইলাম এই শব্দের একাধিক অপভ্রংশ আছে :—১ খেলায়, ২ খালাম; ৩ খেলুয়, ৪ খেলু।

এই-সকল আকারে এত প্রভেদ যে এক জেলার লোকে অনেক স্থলে অল্প জেলার অপভ্রংশ বুঝিতে পারে না। বুঝিতে না পারিবারই কথা।

শিতাকে “মনোহর” ও মাতাকে “উজ্জ্বল” নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষরূপে, শ্রীমদ্ভক্ত রথ চৌধুরী ইত্যাদি মহাশয় ‘লোকের দুই নামও পারে এ’ ডাকনামও একটা ‘লোক’, এই বলিয়া উহার সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি নিজ গ্রন্থে ‘হরিনাম-ঠাকুরের জীবন-বৃত্ত’ গ্রন্থে জয়ানন্দের মত উদ্ধৃত করেন নাই, বোধ হয় তাঁহার পুস্তক প্রকাশের সময়ে জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ আবিষ্কৃত না হওয়াই উহার কারণ। ‘শ্রীমৎ হরিনাম ঠাকুরের জীবনচরিত’ গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বনগ্রামের শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত মহাশয় যে-সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহার নর্থ এইরূপঃ—“হরিনামের মুসলমান-প্রতিপালকের নাম ফ্রাহেরউদ্দীন। তাঁহার সহিত স্থখিত ঠাকুরের এবং তাঁহার পত্নীর সহিত গোবীন্দবীর আশ্রয়তা ছিল। সেই আশ্রয়তার কালে, গোবীর মৃত্যু পক্ষে, তাঁহার নিরাশ্রয় শিশুপুত্রের লালন-পালন-কার, তাঁহারই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রাহেরউদ্দীনের বংশধরগণ এখনও বুড়ন গ্রামে বসবাস করিতেছেন।” উল্লিখিত পরস্পর-বিরুদ্ধ নূতন নূতন বিষয় পাঠ করিয়া, হরিনামের হিন্দুত্ব আমাদের আরও অধিক স্পষ্ট হইয়াছে। ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন প্রামাণিক ও সর্বপ্রথম প্রভৃতি গ্রন্থে হরিনামের জীবনকথা বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণ্যবিষয়ে কোনও কথাই লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ, তিনি যে নীচ যবন কুলে জাত সেই কথাই বারবার উক্ত হইয়াছে, তাঁহার মূখ নিয়াও পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

যে-সকল বৈষ্ণব গ্রন্থকার হরিনামকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারও অবশ্যই উৎকট জাতাভিমানবশতঃ, হরিনামকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে আতি বিচার নাই, বৃথা জাতাভিমানও নাই। তিনি জাতিধর্ম্মনির্কীর্ণে যে সকলকেই সম্মতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকলের প্রতিই সমান যত্ন ও আদর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই পুণ্য—হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, আর নীচ অধম চণ্ডালই হউন, বৈষ্ণব হইলেই সমান গোবর ও ভক্তির পাত্র। বৈষ্ণব হইয়া ধাঁহারা দেখা না বুঝে, জাতিভেদবিহীন নিত্যশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে জাতাভিমানের প্রাবল্যতা আনিয় উপস্থিত করেন তাঁহার। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। হরিনাম যে গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন, ‘হরিনাম ঠাকুর’ ‘ব্রহ্ম হরিনাম’ প্রভৃতি গৌরবাক্য নামে অভিহিত হইয়া যে বেশবাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে, তাঁহার অন্তঃসাম্যধারণ ভগবদ্ভিষ্টা, আলৌকিক নাম-বিশ্বাস ও নামজপেরই অন্ততম ফল মাত্র।

হরিনামের ভগ্নভূমির সম্বন্ধে একমাত্র—বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিনাম—এই প্রোকাশ ব্যতীত অপর কোনও বিশেষ কথাই কোনও প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত নাই। বুড়নের পরিচয়-স্থলে, কোনও কোনও আধুনিক গ্রন্থকার—“শান্তিপুত্রের অদূরবর্তী গ্রাম” বা “বর্তমান ই.বি.এস. রেলপথের বেনাপোল বা বনগ্রাম ষ্টেশনের নিকটস্থ পল্লীবিশেষ” বলিয়াও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সংপ্রতি হরিনামের সেই বুড়নবাস সম্বন্ধেও মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নারু নগেন্দ্রনাথ বসু প্রচারিতা মহাপ্রবন্ধ মহাশয় জয়ানন্দকৃত ‘চৈতন্যমঙ্গল’ গ্রন্থের আবিষ্কার করায়, বুড়নই হরিনামের ভগ্নভূমি কি না, তাহাতেই যোর সংশয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ নিদিয়াছেন—‘বুড়নগ্রাম হরিনামের ভগ্নভূমি নহে। তিনি স্বর্ণনদীতীরবর্তী ‘ভাটকলাগাছী’ গ্রামেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।’ তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিতে গেলে, জয়ানন্দসমগ্র গ্রন্থে গোবিন্দবিগ্ণ কথার মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার। যে মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, তাহাই বা

কোন সত্য? তবে পারে? তবে কি জয়ানন্দের কথাই সত্য? তাহাও সম্ভব নহে।

এই বিজ্ঞান-ভিত্তিক মাদান্তর বক্ষা কবিত্রে হইলে হয় বুড়ন ও ভাটকলাগাছীকে এক গ্রাম, না হয় বুড়নকে ভাটকলাগাছীর বা ভাটকলাগাছীকে বুড়নের অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। শেষের কথাটাই যথার্থ। বুড়ন গ্রামবিশেষের নাম হইলেও পরগণারূপেও পরিগণিত। পরগণা অনেকগুলি গ্রাম লইয়া গঠিত হয় সুতরাং বুড়ন পরগণার মধ্যে ভাটকলাগাছী গ্রামের অবস্থিতি অসম্ভব নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন আর বুড়নের মধ্যে ভাটকলাগাছীর অস্তিত্ব নাই। জয়ানন্দের স্বর্ণনদী এখন সোনাই আখ্যা লাভ করিয়াছে। সোনাই নদীর দক্ষিণ তীরস্থ একটি স্থান ‘হরের ডাঙ্গা’ নামে অভিহিত হইয়া, সেই স্থানখাত সাধুর পুণ্যস্থতি বহন করিতেছে। ইহা পূর্বে ভাটকলাগাছীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীন বুড়ন সাতক্ষীরা সব্রিবিভক্তির অন্তর্গত এবং সাতক্ষীরা নগরের উত্তর-পশ্চিমে ৩.৪ মাইল দূরে, ‘মাইচন্দ্রার দরগাহ’ নিকটে অবস্থিত। বুড়নগ্রাম হইতে ৪০ সাত্বে চারি কোশ দূরে, উত্তরপশ্চিম কোণে ‘হরের ডাঙ্গা’ অবস্থিত এবং বনগ্রাম হইতে ৮ আট ও শান্তিপুর হইতে ১২১৩ বার তের কোশমাত্র দূরবর্তী।

পূর্বে এই স্থানের প্রতি তীর্থসম্মান প্রাপ্ত হইত। এখনও নাকি দুই চারিজন নিরস্ত্রশরীর হিন্দু মুসলমান সেই ভাবেই ‘হরের ডাঙ্গার’ প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এখনও যদি দেশের লোক বিশেষতঃ সাধুর তপাভ্রাঙ্গী বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় সচেষ্ট হন তাহা হইলেই, তাঁহার যথার্থ বাস্তবিতার উপরেই তাঁহার স্মৃতিচিহ্নানি স্থাপিত, পাটবাড়ী প্রভৃতি নির্মিত হইতে পারে। আশা করি দেশের গৌরব বিবেচনায়, দেশের গুণী ও শিক্ষিত সমাজ, অবিলম্বেই এ বিষয়ে অব্যাহত হইবেন।

(শাখতী, কাস্টিক)

প্রাধোয়নাথ বসু কবিশেখর।

সম্পাদকের মন্তব্য।

কষ্টিপাথরের উদ্ধৃত প্রথম বিষয় “মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে মুসলমান”দের কৃতিত্বে ও নিউটনের কৃতিত্বে কতখানি প্রভেদ বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা এখানে বিজ্ঞানভূষণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বায় যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যা-নিপী বাহাজুবের একখানি পত্র উদ্ধৃত কবিতা দিতেছি—

লেখ. বাহা, fact of gravitation পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা যাহা ব্যাখ্যাত, Law of gravitation দ্বারা তাহার অনেক বেশী—science বুঝায়। আমাদের মধ্যে অনেকে এই দুই এক মনে করিয়া Newtonএর প্রাপ্য-গৌরব ভাঙ্গাচাট্যকে দিয়া বসেন। দুই কথার মধ্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ তাহা “পজালী”তে চক্ষুনাশক পক্ষে বুঝাইয়াছি। আমাদের দেশে বহু পূর্বকাল হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ জানা আছে। যার্যতট ও বরাহ সমদামিক ছিলেন। (J. A. I.) উইদের পূর্ব হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ স্বীকৃত হইত। কিন্তু সেট কি রকম, তাহা জানা ছিল না। অর্থাৎ Laws জানা ছিল না। বরাহ চন্দ্রকেব আকর্ষণের সহিত উপমা করিয়াছেন। উইদের সম্বন্ধে আর একটা কথা লিখি। অনেকে জানেন না, দুই জনই পৃথিবীর আবর্তন—rotation of the earth—স্বীকার করিতেন, এবং দুই সম্ভব পৃথিবীর প্রদক্ষিণ—revolutionও স্বীকার করিতেন। “আমাদের

জ্যোতিষী" লিখিবার পর এই দুই theory সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের জ্ঞান আমার স্পষ্ট হইতেছে। যদি একটু আনিতে ইচ্ছা করেন, গত জুলাই মাসের Dacca Review পত্রে The days of the Hindu Calendar পড়িবেন।

জীবোগেশচন্দ্র রায়।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী ভ্রমণ একাই কাগাকুরি ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

অষ্টম অধ্যায়

বিপদের মধ্যে।

বতই দিন যাইতে লাগিল, ততই আমি আমার ভৃত্য দুইটির স্বভাব চরিত্র বুঝিতে লাগিলাম। একজন অতি অল্পেই রাগিয়া উঠে, কিন্তু কর্তব্য নির্ণয়ে ক্ষিপ্ত, অপরটি শাস্ত প্রকৃতির এবং তাব একটু জ্ঞান বুদ্ধিও ছিল। বিদ্যার গর্বও তাব কম ছিল না। শেষোক্ত ভৃত্যটি প্রথমটিকে অপ্রিয় বচন শুনাইত এবং কলহও করিত। বুদ্ধাটি ভাল-মাহুষ। আমি তিনজনকেই সমভাবে দেখিতে চেষ্টা করিতাম বটে, কিন্তু বুদ্ধাব প্রতি আমার সমধিক যত্ন ছিল। বুদ্ধাটিও আমাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করিত। আমি দেখিতাম বুদ্ধাটি যেন আমায় কিছু বলিতে চায়। কিন্তু সঙ্গী দুটির ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করে না। একদিন আমি বুদ্ধাকে অগ্রে রওনা হইতে বলিলাম। কিছু পরে ভৃত্যদ্বয়কে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করিলাম। ভৃত্যদুইটি বোঝা বহিয়া আমার সহিত যাইতে পারিল না, পিছনে পড়িয়া রহিল। আমি তখন গিয়া পথে বুদ্ধাকে ধরিলাম। বুদ্ধা আমায় দেখিয়া ভীতভাবে পশ্চাতে চাহিয়া বলিল “তাহারা কি দূরে আছে?” আমি বলিলাম তাহারা সম্ভবতঃ ৬ মাইল দূরে আছে। তখন সে হাঁপ ছাড়িয়া আবার বলিল “তোমার সর্বনাশ, তোমার চাকর দুটি ভয়ঙ্কর লোক, তারা তোমায় মারিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে—রাগীটা খুনে ডাকাত, খামে কত পাপ যে করিয়াছে তার ঠিক নাই; শাস্তটা এত বড় বদমায়েস না হইলেও, কম লোক না, ঝগড়া করিয়া সে ত একটাকে খুন করিয়াছে; দুজনই পাকা খুনে, মাহুষের প্রাণ লইতে একদণ্ডও ইতস্ততঃ করিবে না। তুমি যেই তিব্বতের সীমায় পৌছিবে, অমনি ঐ রাগীটা

তোমায় মাঝিয়া ফেলিবে—আর তোমার যথাসম্বল লইয়া পলাইবে।” একথা শুনিয়াই ত আমার চক্ষুস্থির, মস্ত মূখে কিছু প্রকাশ করিলাম না—বরং বলিলাম “এ সব কথা আমি বিশ্বাস কবি না, ওরা খুব ভাল লোক।” বুদ্ধা শপথ করিয়া বলিল “আমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি আমার প্রাণ লইও।” আমিও বলিলাম বুদ্ধা মিথ্যা বলিতেছে না। আমার ভারাক্রান্ত চিত্তে আবার সুস্থিত্য আসিয়া জুটিল।

১২ দিনে ১০০ মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা তুব্বা নামক স্থানে পৌছিলাম। হর্বমান জ্বা নামে একজন গোষ্ঠী শাসনকর্ত্তা ভাষায় বাস করিতেছিলেন। গম্বালদার নিকট হইতে পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলাম সেইজন্য শাসনকর্ত্তার অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলাম। এখানে আসিয়া পথের সংবাদ শুনিয়া আবার মন দমিয়া গেল। সকলগুলি পথই সশস্ত্রপ্রহরীদ্বারা রক্ষিত।

একদিন রাজ্যে আমার ভৃত্য দুইটি প্রচুর স্ত্রী পান করিয়া পরস্পরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইল। যখন বসন্তা খুব বাধিয়াছে তখন সব কথা বাহির হইয়া পড়িল, যার যত দোষ আছে তা দুজনই উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—শেষে দুজনই দুজনকে বলিয়া বসিল “আমি কি জানি না তুমি এই চীনে নামাকে মারিয়া ফেলিতে আছ”—দুজনই অপবের স্বক্ষে দোষ চাপ হইতে বাধ্য। ভয়ানক ঝগড়া, দুজনই ক্রোধে অস্ত্র, তাম্বুর নিকট দুজনই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “ও বড় ভয়ানক লোক; ওকে রাখিলে আমি থাকিব না।” আমি ভাবিলাম এমন স্বযোগ আর হয় না, দুজনকেই বিদায় দিয়া বাটিল। বকসিস দিয়া দুজনকেই খুসী করিয়া বিদায় দিয়া বাটিল।

হর্বমান জ্বার গৃহে সিরাব গম্বালদান নামে একজন তিব্বতী ডাক্তার অতিথি ছিলেন। ইনি চিবিং-ও করিতেন এবং স্থানীয় পুরোহিতদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা দিতেন। আমাব সহিত লোকটির পরিচয় হইলে দেখিলাম যথার্থই ভদ্রলোকটি পণ্ডিত। তখন স্থির হইল আমরা তাঁহাকে চীনেব বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিব, তিনি আমাকে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিবেন। আমরা উভয়ে ভদ্রলোকটি ভ্যাগ করিয়া সারং যাত্রা করিলাম। ভদ্রলোকটির

বাড়ী সারেং-পথে। আমরা “শত প্রসবণ” বা “মুক্তিনাথ” নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করিলাম। এখানে যে একসময় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন দেখিলাম। কালীগঙ্গা নদীর ধারে একরাত্রি বিশ্রাম করিলাম। পরদিন নদী পার হইবার জন্য তিন চার ঘণ্টা ধরিয়া নানা চেষ্টা করিয়া অবশেষে অতি কষ্টে পার হইলাম। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে ঘোড়ায় চড়িয়া নদী পার হইতে পারিব, কিন্তু দুই পা ঘাইতে না ঘাইতে, আমার ঘোড়াটির পা কাদায় বসিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া বড় বড় পাথর জলে ফেলিতে লাগিলাম। ঘোড়াটি পাথর ফেলার ছপাছপ শব্দে ভয়ে উন্মত্তবৎ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কোন প্রকারে অপর পারে গিয়া উঠিল। তখন পাথরের উপর পা দিয়া আমি ও আমার বন্ধু অনেক কষ্টে সেই খরস্রোতা পার্বত্য নদী পার হইলাম। বন্ধুটির ঘোড়া ভয়ে আর জলে নামিবে না, তখন তার মুখের দড়ি ধরিয়া আমরা দুজনে টানিতে টানিতে জলের উপর দিয়া আনিলাম। কি যে নাকাল হইয়া সে নদী পার হইতে হইল।

চুক্কীর তলদেশে সিডার ও পাইনের বন। কিন্তু ধবলগিরির উত্তরে যখন গেলাম তখন সেখানে এক-রকম ভোঁতা ভোঁতা সিডার গাছ দেখিলাম, ২০ ফুটের উচ্চ নয়। সেখানে বড় গাছ বড় দেখিলাম না, ঝোপে ঝোপে গুল্মজাতীয় গাছ। বরফের উপর দিয়া ক্রমাগত চলিয়া ১৫ মাইল পথ হাঁটিয়া কিরাং নামক স্থানে পৌছিলাম। এখানে তিব্বতী লোকই অধিক, চারিদিকেই মজ্জলেক্ষা ধ্বজা উড়িতেছে। পরদিন দশ মাইল যাত্রার পর সারেং নগরীর দেখা পাইলাম। সারেং একটি উপত্যকা, পূর্ব-পশ্চিমে ১১ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে ৩ মাইল হইবে। সারেং কেলা, বৌদ্ধ মন্দির, বিহার সবই দেখিলাম। সারেং নগরীতে ৬০টির অধিক বাড়ী নাই।

নবম অধ্যায়

সুন্দর সারেং ও তাহার কদর্য অধিবাসী।

সারেং সহরে প্রবেশের পথে ২৪ ফুট উচ্চ এক পাথরের তোরণ দেখিলাম। শুনিলাম এ যুদ্ধসঙ্কল নয়, নগরের

অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার। এখানে বাস করেন। তোরণ অতিক্রম করিয়া দেড় মাইল দূরে প্রকৃত সারেং সহর। সেখানে ১৪১৫ জন আমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সিরাব গ্যালসান আমাদের সেখানকার প্রধান রাজপুরুষের নিবট লইয়া গেলেন। আমি সেখানকার বৌদ্ধ-মন্দিরে আশ্রয় পাইলাম। বিশেষ সম্মানিত অতিথিদের সেখানে স্থান দেওয়া হয়। লামা ভিন্ন আর কাহারও মন্দিরে বাসের অধিকার নাই। ধর্মগ্রন্থ এখানেও অনেক দেখিলাম। এ সকল গ্রন্থ কেহ পড়ে না। গ্রন্থের আদরই ধর্মের আদর, একুশ ইহাদের বিশ্বাস। সিরাব গ্যালসানের বাটী এই মন্দিরের অতি নিকটে। লোকটি বিপদ্বীক, ঘরে ছুটি বয়স্ক কন্যা; তাহারাই তাঁহার ঘরকন্না বিষয় আশয় কাজকর্ম দেখে। মেয়ে ছুটি বড় কার্যকুশল। এ স্থানের অধিবাসীরা প্রত্যহ রাজে মৃত্যুগীত করিয়া কাটাইত, আর মধ্যে মধ্যে আমার মুখে বৌদ্ধধর্মের কথা শুনিত। আমি কিনা তিব্বতবাসী, সারেং সহরে বাস করিয়া তিব্বতীদের স্নেহ রীতিনীতি শিখিয়া লইলাম। অপরিচ্ছন্নতায় তিব্বতীরা পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য, সারেং-এর লোকেরা বোধ করি অপরিচ্ছন্নতায় তাহাদেরও পরাস্ত করিয়াছে। তিব্বতীরা কচিং মুখে জল দেয়, কিন্তু এখানকার লোকদিগকে কদাচ জলম্পর্শ করিতে দেখি নাই। আমি এক বৎসর এখানে ছিলাম, এই সময়ের মধ্যে দুদিনও কাহাকেও মুখ হাত ধুইতে দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ; কাপড় কাচিবার নিয়ম ইহার। জানে না, কাপড় ছিঁড়িলেই তবে তাহা ছাড়িয়া ফেলে। এদের চামড়ার উপর ময়লার এক পুরু আচ্ছাদন যেন চকচক করিতেছে, বস্ত্রের অবস্থাও সেই-প্রকার। পরিচ্ছন্নতা কি বস্তু তাহা ইহার। স্বপ্নেও জানে না। যে হাতে নাক ঝাড়ে সেই হাতেই খায়। ইহাদের অপরিচ্ছন্নতা অবর্ণনীয়, তাহা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় আসে। এই স্নেহ জাতির সঙ্গে কিছুদিন বাস করিয়া আমি তিব্বতবাসের উপযুক্ত হইয়া উঠিলাম। এইটুকুই আমার লাভ। এ স্থানে আমি কি কাজ করিতাম, তাহার একটি বিবরণ দিই। প্রাতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দিতাম, তৎপরে তিন ঘণ্টা গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিতাম। সন্ধ্যার সময় আমার শিক্ষকের সহিত ধর্ম-প্রসঙ্গে

কাটাইতাম। এখানে বৌদ্ধধর্মের এক বিশেষত্ব দেখিলাম, এখানকার প্রধান সাধু “পদ্ম স্বয়ম্ভু” তিনি একজন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, মদ্যপায়ী, মাংসাশী দেবতা। তিনি ইহাদের আদর্শ। এই স্থানের লোকেরা ইন্দ্রিয়-স্বথকেই চরম বলিয়া জানে, আহার বিহার নিদ্রা ইহাদের কার্য,—আর মধ্যে মধ্যে ধর্মকথা শ্রবণ। তা যেমন সাধু, তার তেমনি ব্যাখ্যা। মধ্যে মধ্যে সিরাব গয়ালসানের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তর্ক হইত। এই লোকটির পাণ্ডিত্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনিও এই দুর্বলতার জন্ত জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই এবং মোগলদের দ্বারা ইনিও একটুতেই চটিয়া উঠিতেন, যদিও ক্রোধ শাস্তি হইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইত না। একদিন ধর্ম-প্রসঙ্গে মতভেদ হওয়াতে তিনি হঠাৎ ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া আমার গলার নিকট জামা শক্ত করিয়া ধরিয়া আর এক হাতে এক লাঠি লইয়া আমায় মারেন আর কি? আমি তাঁর কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, এই না আপনি আদর্শ বৌদ্ধ চরিত্র ব্যাখ্যা করিলেন, আপনার এ কাজটা কিন্তু আপনার আদর্শের মত হইতেছে না। হঠাৎ অপ্রতীত হইয়া তিনি লাঠি নামাইলেন, কিন্তু তখনও দস্তে দস্তে বর্ষণ করিতেছেন, আর চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। ক্রমে আমায় ছাড়িয়া দিলেন। কি আশ্চর্য! আমাদিগের মধ্যে তখনই সন্ধাব হইয়া গেল। সারেন্গে বাসের কালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪।১৫ ঘণ্টাই আমার পাঠ ও চিন্তায় কাটিত। আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র আহার করিতাম এবং ভ্রমণ কবিতাম। প্রত্যেক রবিবার পৃষ্ঠে প্রস্তরের বোঝা লইয়া পাহাড়ে দ্রুত উঠিতাম। তিব্বত-যাত্রী আমি এইরূপে দুই পথ অতিক্রম কবিত্তে অভ্যাস করিতাম। এ সময় আমার স্বাস্থ্য চমৎকার ছিল। যাহোক অতি অল্পদিনের মধ্যে এ দেশের লোকের নিকট একজন মহৎ ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইলাম। সারেন্গে অতি চমৎকার স্থান। সারেন্গে কেবল দুই ঋতু আছে—শীত ও বসন্ত। বসন্তকালে ক্ষেতগুলি হরিৎ শস্যপূর্ণ হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করে আর তখন প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায়। শীতের প্রারম্ভে অন্তমান সূর্যের শেষ কিরণ-ছটায় চির-তুষারাবৃত পর্বত-শিখরেব আরক্তিম শোভা অবর্ণনীয়।

প্রথমে তাহা রক্তাভ তৎপরে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। সারেন্গে ভয়ঙ্কর ব্যাপার তুষাব-ঝড়। তখন কাহাব সাধ্য হইতে বাহির হয়? তখন তীব্র শীতল বায়ু শরীরে বিদ্ধ হয় আর তুষার বৃষ্টি হইতে থাকে। যাহোক তুষারবর্ষণের বড়ই শোভা হয়। প্রকৃতি যেন নির্মল শুভ্র বসন পরিয়া হাসিতে থাকে। বরষের উপর যখন চন্দ্রোদয় হয় তখন এই জ্যোৎস্না আরও অপূর্ব দেখায়। আমি এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই।

দশম অধ্যায়।

খ্যাতি ও প্রলোভন।

১৮৯৯ শালের মে মাসের প্রথমেরই আমি সারেন্গে আসি। প্রায় ৮ মাস পরে এখানে থাকিতে-থাকিতেই আবার নব বর্ষ ফিরিয়া আসিল। নব বর্ষের প্রথম দিনটি আমি চিরন্তন নিয়মামুসারে যাপন কবিলাম। ১৯০০ শালের প্রথম দিনটি আমার প্রাণে নানা ভাবের উল্লাস করিল। স্মরণ করিলাম, স্বদেশ হইতে আমি আজ কত দূরে; হিমাচল-শিখরে এই আমার দ্বিতীয় নব বৎসরের উৎসাহ। আমার বেহ স্নান ও সবল, মন প্রফুল্ল, আমি তিব্বত-যাত্রার জন্ত সকল-প্রকারেই প্রস্তুত হইয়াছি। বর্তমানে সমস্তই আমার অমূল্য, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে জানি না। সমুদয় সারেন্গবাসীদের পরিতোষপূর্বক আহার করাইয়া আমার অন্তরের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিলাম। বহুপূর্ব হইতেই আমি এই ভোজের আয়োজন করিয়াছিলাম, এ দেশের লোকেরা যাহা ভালবাসে তাহা যত্নপূর্বক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এ দেশের ইন্দ্রিয়-স্বনত সাধারণ-লোকেরা আমার আহারে বিহারে সন্তোষ ও নিয়মনিষ্ঠা দেখিয়া আমাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান, এই নববর্ষের বিপুল ভোজের পর আমার সমাদর খ্যাতি প্রতিপত্তির আর পরিসীমা রহিল না। আমার দ্বিতীয় নানাবিধ ঔষধ ছিল, স্তত্রাং ঔষধ বিতরণ করিয়াও আমার প্রতিষ্ঠা কম হয় নাই। কিন্তু এই ভোজের ব্যাপারের দ্বারা এক বিষয় অনর্থ উপস্থিত হইল। আমি বেশ যুনিঃসৃত পাবিলাম সারেন্গে আমায় বাধিয়া রাখিবার জন্ত চারিটক একটি রীতিমত চক্রান্ত চলিতেছে। আমার দৃষ্টিতে

বন্ধু সিংহ গয়ালসান এই চক্রান্তের আদিগুরু। যাহাতে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমি সাবেংএ চিরপ্রতিষ্ঠিত হই, এই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা হইল। পিতার অভিনন্দিত বৃদ্ধি যেরূপে তাহার রূপের ফাঁদে আমায় বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধের রূপায় ও তাঁহার মহৎধর্মের শিক্ষার বলে আমি এই প্রলোভনে জয়ী হইলাম। যদি সিরাব ও তাঁহার কন্যার জালে আবদ্ধ হইতাম তাহা হইলে আজ আমার জীবনে কি হীনাবস্থাই বা না ঘটিত। যা হোক আব ত আমায় সাবেং থাকা চলে না। এবার আমার তিব্বতের পথের সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না, স্থানীয় লোকদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে নানা ভাবে পথের সন্ধান লইতে লাগিলাম এবং তখনই তাহা আমার স্মরক পুস্তকে লিখিয়া লইতাম। অবশেষে সমুদায় বিররুণ-গুলি মিলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে থোরপি দিয়া তিব্বতরাজ্যে প্রবেশ করাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে আবার আমায় তুকজীর নিকটবর্তী মালবায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। একদিকে ইহা ভালই হইল, সাবেংএর লোকেরা আমার অভিনন্দিত বৃদ্ধিতে পারিল না। এখন সব প্রস্তুত—কিন্তু সে সময়ে পথ যে তুষার-পাতে দুর্গম, জুন ও জুলাই মাস ছাড়া এ পথে চলা অসম্ভব। শুনিলাম সে সময়েও পথে বরফ থাকে, কিন্তু এ সময়ে যাত্রা করিলে পথে মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব এখানেই কোন-প্রকারে দিনপাত করিতে লাগিলাম। মালবা গ্রামের প্রধান পুরুষ আদম নারিংএর সঙ্গে আমার সাবেংএ সাক্ষাৎ হইল। আমাকে মালবা যাইতে হইবে, স্ততরাং ভালই হইল। ১৮২২ শালের অক্টোবর মাস। নারিং তিব্বতে চামরের ব্যবসা করেন। সম্প্রতি সেখানে হইতে ফিরিবার পথে সাবেংএ উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আমায় বলিলেন যে তিব্বত হইতে বিস্তর ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার গৃহে গিয়া আমাকে সে-সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই নিমন্ত্রণ আমার পক্ষে ভালই হইল। নারিং ব্যবসার জন্ত ভারতবর্ষে যাইতেছিলেন, মার্চ মাসে মালবায় ফিরিবেন বলিলেন। মার্চ মাসের ১০ই তারিখে আমি সাবেং ও তাহার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

সাবেংএ বাস আমার একেবারে বিফল হয় নাই। কারণ আমার চেষ্টায় প্রায় ১৫ জন লোক মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ৩০ জন তামাক খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। আমার চিকিৎসায় যাহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছিল তাহা-দিগকে আমি এই-প্রকারে আমার স্বর্ণ শোধ কবিত্তে অহুরোধ করিয়াছিলাম। এক বৎসর সাবেংএ বাস করিয়া আমি সেখানকার সমুদায় লোকের সহিত পরিচিত হইয়া-ছিলাম। আমায় বিদায় গ্রহণের সময় সকলে সাধ্যমত মাখন ফল শস্য ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপহার দিল। আমার গ্রন্থ ও সমুদায় জিনিসপত্র অশ্ব-পৃষ্ঠে চাপাইয়া ১০ই মার্চ যাত্রা করিলাম। আমার স্ত্রী অশ্বটির বিনিময়ে সাবেংএর বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিকট হইতে প্রায় ৬০০ টাকা মূল্যের ধর্মগ্রন্থ উপহার পাইয়াছিলাম। গ্রামের বাহিরে গিয়া দেখি প্রায় ১০০ জন লোক আমায় বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি তাহাদের মস্তকে দুই হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলাম। আবার আমি তুকজীর নিকট মালবা নামক গ্রামে ফিরিয়া চলিলাম। সন্ধ্যার সময় কিমিই নামক স্থানে পৌছিলাম। পরদিন কালীগঙ্গার ধারে শুক নামক স্থানে পৌছিলাম। সেখানকার লোকেদেব ধর্মোপদেশ শুনাইলাম। শুকে আবার সিরাব গয়ালসানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার সাবেং পরিত্যাগের সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। সাবেং পরিত্যাগের তৃতীয় দিনে আমি মালবায় পৌছিলাম। আদম নারিংএর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। সোনাম নববু নামে গ্রামাধিকারীর পিতা আমাকে তাঁহার দেবালয়ে থাকিতে বলিলেন, সেখানে দুইটি সুসজ্জিত গৃহ দেখিলাম। বুদ্ধের নানা মূর্তি ও ধর্ম-গ্রন্থে তাহা পরিপূর্ণ। তিনি আমায় সে-সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিতে অহুবোধ করিলেন। আদম নারিংএর বাড়ীর নিকটে পীচের বাগান, অদূরে স্বচ্ছ-তোয়া কালীগঙ্গা নদী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, বনের নীলিমার পশ্চাতেই শুভ্র তুষার-শৃঙ্গ। প্রাকৃতিক দৃশ্য কি সুন্দর! স্বভাবজাত স্ত্রীর প্রচুর আয়োজন! আমি এখানে ধর্মালোচনায় ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। মালবায় পৌছিবার দুই সপ্তাহ পরে তুকজীর

এক ব্যবসায়ীব হস্তে রাঘ শরৎচন্দ্র দাসের নিকট হইতে মহাবৌদি সোসাইটির একখানি কাগজ পাইলাম। কাগজের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে শরৎবাবু আমায় সাবধান হইয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার মারফৎ আমি শরৎবাবুকে ও অন্যান্য বন্ধুদের পত্র লিখিয়াছিলাম। আমার পত্রবাহক তুৎজীর এই ব্যবসায়ী গ্রামেব লোকদেব নিকট আমার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক খবর দিল। পরদিন দেখিলাম আমাকে লইয়া কানাঘুবা চলিতেছে। আমি ইংবেজের দূত, শরৎবাবু সহিত চিঠিপত্র লেখালিপি করি, আমি হয়ত ইংরেজের চর। হয়ত আমাব কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে। অতএব আমাকে সেখানে কোনক্রমেই থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। আদম নারিংএর কানেও একথা গেল, তার-পরদিন অতি গভীর বিষন্ন মুখে তিনি আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ইতিপূর্বেই স্থির করিয়াছিলাম সত্য গোপন করিয়া ইহাকে বিপন্ন করিব না। আমি নারিংএর বিষন্ন গভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম “যদি শপথ কর আমি যাহা বলিব তাহা অন্ততঃ তিন বৎসর কাহাকেও বলিবে না, তাহা হইলে সবই তোমায় খুলিয়া বলিতে পারি, আর কথা যদি না রাখ তাহা হইলে সত্য প্রকাশ হইবে না, নেপালরাজ যাহা করিবার করিবেন।” নারিং শপথ করিলেন, আমি তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিলাম এবং তাঁহাকে ধর্মপুস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রতিজ্ঞা করাইলাম। আমার রাহাদানি দেখাইয়া তীব্রতবাতার কাঙ্ক্ষিনী সমুদায় বলিলাম। আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলি নাই, সত্যের জয় হইল। আদম নারিং আমার কথার প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিলেন। আমি তাঁহাকে আমাব সাহায্য করিবার জন্ত অনুরোধ কবিলাম। আমায় পথের সন্ধান অনেক বলিয়া দিলেন। জুন কি জুলাই মাসে যাত্রা করিব স্থির হইল। আদম নারিংএর নিকট সত্য প্রকাশ করিয়া ভালই হইল। তাঁহার মন প্রশস্ত হইল। কিন্তু আর তাঁহার আতিথ্য ভোগ আমার পক্ষে উচিত নয় ভাবিয়া স্থানীয় দেবালয়ে আশ্রয় লইলাম। সেখানেও আদম নারিংএর বন্ধুতা ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলাম না, তিনি আমার সমুদায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন, আমার অনুরোধে আমার জন্ত পথপ্রদর্শক ও কুলী ঠিক করিয়া দিলেন।

ধবলগিরির উপত্যাকায় তাহার ঋমবৃথং পর্যাস্ত আমার সঙ্গে যাইবে স্থির হইল। মালবা হইতে সোদ্রা গেলে তিব্বতের পশ্চিম প্রদেশ ১০ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি সে পথে যাইব না, পথে নানা স্থান ঘুরিয়া যাইব। অতএব পথে আমার ২৩ দিন দেবী হইতে পারে। সেই ভাবে প্রস্তুত হইয়া ১৯০০ শালের ২২ই জুন মালবা হইতে যাত্রা করিলাম। পান্থবিহীন, পথবিহীন দেশে তিন দিন ক্রমাগত চলিলাম। পার্শ্ববর্তী দেশে বহুদিন ভ্রমণ করিতেছি বটে, কিন্তু এবার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলাম তাহা অতীতপূর্ব। দিনের পর দিন তুষারচ্ছন্ন দেশে ক্রমাগত চলিতেছি—চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে, বরফ আমার শয্যা, বরফ আমার উপাধান, সে তুষারময় পথে আর কিছুই দেখিলাম না।

শ্রীহেমন্তা দেবী।

পাটনায় প্রাচীন চিত্র

খাঁ বাহাদুর খুদাবখ্শ বাকিপুরের সরকারী উকিল এবং তিনবৎসর হাইদরাবাদ রাজ্যে প্রধান জজ ছিলেন। তিনি নিজের সংগ্রহ ও পিতা হইতে প্রাপ্ত ছয় হাজার ফারসী ও আরবী হস্তলিপি, প্রায় দুই সহস্র ইংরেজী গ্রন্থ, অনেক মুদ্রিত ফারসী-আরবী বই এবং একটি সুন্দর বড় মোতলা দালান ও সংলগ্ন জমি সাধারণের নামে লিখিয়া দিয়া খুদাবখ্শ পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ভারতে মুসলমানগ্রন্থের এরূপ প্রকাণ্ড ও মূল্যবান আগার আর একটিও নাই। দিল্লীর বাদশা ও সম্রাট লোকদিগের জন্ত লিখিত অতি সুন্দর সুন্দর হস্তলিপি, চিত্র ও হস্তাক্ষরের নমুনা,—কয়েকজন বিখ্যাত পারসিক কবির স্বহস্তলিখিত গ্রন্থাবলী,—মধ্য-এশিয়া আরব ও স্পেনে লিখিত মূল্যবান আরবী বই—এখানে একত্র করা হইয়াছে। কতকগুলিতে বাদশাহ জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, কুমার দারাশুকো প্রভৃতির হাতের লেখা, অথবা মুসলমান রাজারাণীদের মোহর আছে। এই ভাণ্ডারের তিনখানি সচিত্র হস্তলিপি হইতে মুঘল-মুগে ভারতে চিত্রবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতি স্পষ্ট বৃত্তিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক-খানারই অঙ্কনের বৎসর ঠিক

জানা আছে এবং তাহা হইতে মুঘল দরবারের চিত্রকরদের প্রণালী কোন্ সময় কিরূপ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; কোন্ প্রণালী আগে কোন্টি পরে, অথবা কোন্টি কোন্ বাদশাহের সময়ের তাহার সম্বন্ধে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। প্রথম, আলীমর্দান খাঁ শাহ-জাহানের সঙ্গে প্রথম দেখা করিবার দিন (১৬৪০ খৃঃ) যে “শাহনামা” মহাকাব্য তাঁহাকে উপহার দেন, সেখানি। ইহাতে শুধু চীন চিত্রকরের আঁকা মধ্য-এসিয়া বা “বুখারার” প্রণালীর বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত। এই প্রণালী ভারত-বর্ষে আসিয়া দিল্লীর রাজসভায় হিন্দুচিত্রকরদের হাতে পড়িয়া হিন্দু ও সারাসেন্ কলার মিশ্রণে কিরূপ পরিবর্তিত হইল তাহার প্রথম অবস্থা “তারিখ-ই-খানদান-তাইমুরিয়া” নামক গ্রন্থের ছবিতে অতি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। এখানি আকবরের সভায় আঁকা; তাইমুর হইতে আকবরের রাজত্বের ২২ বৎসর পর্য্যন্ত মুঘল-ইতিহাস-সম্বলিত। প্রতি চিত্রের নীচে তাহার পরিকল্পনাকারী ও সমাপ্তকারী চিত্রীদ্বয়ের নাম। ইহাদের অনেকেই হিন্দু এবং প্রায় সকলেরই নাম “আইন-ই-আকবরীর” ১ম খণ্ডের পশ্চাতে আকবরের চিত্রকরদের নামের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে আকবরের যে কয়েকখানি প্রতিকৃতি আছে তাহা সমসাময়িক এবং সর্বাপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য। দর্শকেরা দেখিবেন যে, এই-সব ভারতীয় চিত্রকর জল ও পর্বত আঁকাব চীন-প্রথা চুরি করিয়া অতি অল্প বদলাই-যাচ্ছে; কিন্তু মুখগুলি ভারতীয়, ঐ শাহনামার মত গালফুলা শ্মশ্রুবিহীন চীনামুখ নহে। বর্ণ ও অলঙ্কারের গৌরবে এই আকবরী যুগের চিত্রগুলি অমূল্য। তৃতীয় গ্রন্থ, শাহজাহানের সময়ে রচিত তাঁহার ইতিহাস, নাম পাদিশাহনামা। এখানিতে ভারতীয় চিত্রপ্রণালী স্বল্প অলঙ্কারের ছটা, রঙের বৈচিত্র্য এবং খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি, এবং অবয়বের কোমলভাৱে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে; আকবরী যুগেব সেই অর্ধ-কর্কশ সতেজভাব নাই, কিন্তু এখনও অবনতি আরম্ভ হয় নাই।

সেই অবনতির দৃষ্টান্ত ১৬৭৬-১৭৫০ খৃষ্টাব্দের নানা সময়ে অঙ্কিত একখান ছবিসংগ্রহে (“মুরাঙ্গা”তে) স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বিংশ বৎসরে লক্ষ্মোএর জঘন্য চিত্রকলার

উৎপত্তি; তাহার উপর ইউরোপীয় চিত্রের প্রভাব পড়িয়াছে, অথচ ইউরোপীয় ভাল ছবির মত প্রকৃতির অনুসরণ, রঙে পবিপক্বতা এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ নাই, কিন্তু মুঘলযুগের গুণগুলিও সব হারাইয়াছে। রণজিৎসিংহের জন্ত অঙ্কিত চিত্রগুলিরও সেই দুর্দশা, যেন ছেলেদের চোখ ভুলাইবার জন্ত আঁকা, চিত্তাশীল বা পণ্ডিত লোকের জন্ত নহে। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ছবি, অতি আশ্চর্য্য কঠিন বা সুন্দর ফারসী হস্তাক্ষরের নমুনা, বাদশাহ ও যুবরাজদের স্বাক্ষর প্রভৃতি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনশত বৎসর পূর্বে পারস্ত, তুর্কিতে, ও মধ্য-এসিয়ায় অঙ্কিত কয়েকখানি ছবিও আছে। হস্তলিপিগুলির মধ্যে আরবী-ফারসীপাঠকদের উপদেশ অমূল্য ৪।৫ খানি গ্রন্থ আছে। সার ওয়ান্টার স্কট ওয়েভার্লি নবেলগুলির যে প্রথম সংস্করণ বেনামী প্রকাশ করেন তাহা দেখিয়া ইংরেজীপাঠক সুখী হইবেন। ভারত-সম্বন্ধে পুরাতন সচিত্র ইংরেজী অনেক মূল্যবান বই এখানে আছে। ফলতঃ সব ইংরেজী বইগুলির মূল্য লক্ষ টাকার উপর হইবে; ফারসী আরবী হস্তলিপির মূল্য ৪।৫ লক্ষের কম নহে। পুস্তকাগারের বাড়ীটিও দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়; নির্মাণ-ব্যয় অর্ধ লক্ষের উপর। দক্ষিণের পাঠাগারটি সরকারী ধরনে তৈয়ারি হয়। মধ্যে খুদাবখ্শ্ চিরনিদ্রায় শায়িত। ইনিই ভারতীয় বড়লী।

স্থানীয় আর্শাগী ব্যারিষ্টার মাছুক সাহেব অনেক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া প্রায় ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ করিতেছেন। তাহার বাড়ীতে যে নিজস্ব চিত্রশালা আছে তাহা দেখিলে ভারতীয় কলাসম্বন্ধে অনেক স্থির সত্য জানা যায়, এবং এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের (জাপান, চীন, তিব্বত, পারস্ত, নেপাল ও মধ্য-এসিয়ার) দৃষ্টান্তের সহিত ভারতীয় চিত্রের তুলনা করিবার সুবিধা হয়। তাহার বাড়ীতে আকবরী-যুগের কয়েকখানি, শাহজাহানী যুগের অনেক, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শত ছবি আছে। মুঘল-রাজসভায় শিক্ষিত হিন্দুচিত্রকরগণ হিন্দু বিষয় লইয়া বিরূপ প্রণালীতে ছবি আঁকিতেন (যাহাকে কুমারস্বামী “রাজপুত-আর্ট” বলেন) তাহার এত বেশী ও এত সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। কতক-

গুলি কৃষ্ণ-চরিতের ও যোগীদের বিষয়ে চিত্র দেখিয়া আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা কবে না; সেগুলি এমনি গভীর ভাবাঙ্ক এবং এত সুন্দর ও সুস্বভাবে আঁকা যে, ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রের নিকট পরাস্ত হইবে না। একখানি চিত্রে রাম লক্ষ্মী জয় করিয়া ঠিক মুঘল-বাদশাহের মত পোষাক পরিয়া রথ, গজ, অশ্ব ও কামান লইয়া (!) কুচ করিতেছেন; আর একখানিতে বৃন্দাবনের গোপেরা মুঘল মনসুদ্দারের মত জামা-পাগড়ী পরিয়া ঢাল তরবার লইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে ভেট করিতে যাইতেছেন। একখানি মুর্শিদাবাদের গজদস্তে খোদা কৃষ্ণলীলা ঠিক বরাহং শুপের পাথরের অল্প উঁচু ছবি (Relief)র মত; একই অন্ধন-পদ্ধতি! কিছু আধুনিক ১৪ খানি ছবিতে দৃতী-সম্বাদ হইতে রাধাকৃষ্ণের মিলন পর্যন্ত দৃশ্যগুলি পরে পরে অতি সুন্দর-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দুইখানি ছবি,—তাম্রিক যোগিনী এবং যমুনার পরপারে কৃষ্ণ বসিয়া, কাছে গাভী ও মহিষ আসিতেছে, চিত্র-হিসাবে অমূল্য; অথচ আধুনিক “ইণ্ডিয়ান আর্টের” দোষ একটিও নাই। এ ছুটি সর্বোচ্চ কোন প্রতিভার পরিকল্পিত।

যত্নাথ সরকার।

দেশের কথা

দেশের উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইলে দেখা যায় দেশের মুষ্টি নিরানন্দ ও উপবাসী। আমাদের দারিদ্র্যের পরিমাণ বুঝিতে হইলে সরকারী রিপোর্ট পড়িবার আবশ্যক নাই, একবার শহরের পথে চোখ খুলিয়া পথিকদলকে পর্যবেক্ষণ করিলেই হইবে অথবা পল্লীগ্রামের কৃষক-কুলের অবস্থা দেখিলেই চলিবে।

আমাদের দেশে অর্থ-সমস্যা হইল প্রধান ও প্রথম সমস্যা। কারণ দেশের এই ভীষণ দারিদ্র্য না ঘুচিলে, দেশের লোক দুবেলা ভূম্বা পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলে, শীতে একখানা শীতবস্ত্র গায়ে দিতে না পারিলে, অল্প কোনো চিন্তা তাদের মনে স্থান পাইতে পারে না। আগে জীবনধারণ পরে কাজ বা চিন্তা।

এই দারিদ্র্যের প্রধান কারণ দেশের শাসনতন্ত্র

আমাদের হাতে না থাকা। এবং সেই জন্তই স্বাধীন দেশের জায় অর্থ উপার্জনের নানান পন্থা আমাদের দেশে অবরুদ্ধ। থাকার মধ্যে আছে কেরানীগিরি, শিল্পবাণিজ্যের একান্ত অভাব, কৃষিকার্য ও মাছাতার আমলের উপায়ে পরিচালিত হইতেছে। অগ্রাগ্র স্বাধীন দেশে সামরিক বিভাগে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হয়। আমাদের সে সুবিধা নাই। আধুনিক যুগের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য এখানে কে করিবে? তার ভাড়া শিক্ষার প্রয়োজন। এ দেশের শিক্ষাবিস্তার সভ্যজগতের তুলনায় নগণ্য। তাহা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কোনো কোনো শিক্ষাভিমানী ও জাত্যভিমানী সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী—কারণ তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ছেলেকে “ছোটলোকেরা” ছেলের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হইবে, এবং “ছোটলোকেরা” লেখাপড়া শিখিয়া “বাবু” বনিয়া যাইবে, ফলে গৃহস্থালির কাজকর্মের জন্ত চাকর পাওয়া যাইবে না।

আমাদের সেন্টিমেন্ট এত প্রবল যে আমরা অনেক সময়ে প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করিয়া বসি। তাই অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও আমাদের মনে পড়ে না যে যদি কেবলমাত্র পুরুষকে অর্থ-উপার্জন করিয়া পরিবার প্রতি পালন করিতে না হইত, যদি নারীও পুরুষের সঙ্গে অর্থ উপার্জন করিতে পারিত, তাহা হইলে জীবন-সমস্যা এমন নিদারুণ হইয়া উঠিত না। কিন্তু তা কেমন করিয়া হয়। মেয়েদের বাহিরে বার হওয়াটাই লজ্জার কথা, তাহা পরিবারস্থ সকলের মাথা হেঁট হয়! কিন্তু প্রয়োজনীয়ত। সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না। নিকট ভবিষ্যতে অবস্থা একদিন এমন অচল হইয়া পড়িবে যে নারীকেও অস্ত্রপুত্রের আবরণ ছিড়িয়া ভিড় ঠেলিয়া জীবিকা উপার্জনে মন দিতে হইবে। বুদ্ধিমান ধারা তাঁরা পূর্বাচ্ছেই মেয়েদের শিক্ষা দিয়া তাঁদের মনে স্বাধীন ভাব জাগাইয়া তুলিয়া সেই অবশ্যস্তাবী দিনের জন্ত তাঁদের প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

আমাদের মেয়েরা পা থাকিতে হাঁটেন না, সস্তা ট্রাম থাকিতে গাড়ী ভিন্ন চড়েন না। সেই জন্ত অভাবের সংসারে অভাব নিত্য বাড়িয়াই চলে। ছয় পয়সাও জায়গায় বারো আনা বা একটাকা খরচ হয়। এ-সম্বন্ধে

কেহ কিছু বলিলে এই-সব লোকেরা বলেন কি করিব, যেয়েদের প্রকাশ্যে চলা দেশের নিয়ম নয়। এটা তাঁদের সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না যে, নিয়ম স্বনাম্নুষে গড়িয়াছে তখন সে-নিয়ম অনিষ্টকর বা অপ্রয়োজনীয় মনে হইলে মাছুষে তা ভাঙিবে। দেবদর্শনের প্রণামী, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদিতেও লৌকিকতা করিতে অনর্থক অনেক খরচ হয়। এইরূপে অনেক রকমে আমরা নিজেরা নিজেদের দারিদ্র্য ডাকিয়া আনি।

শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা উন্নত হইলে দেশে প্রভূত ধনাগম হইয়া থাকে। “২৪-পরগণা বার্তাবহে” প্রকাশিত মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের শিল্প-কমিশনের সাক্ষ্য যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, শিল্পের সার্থকতার জন্য নিম্নলিখিত অল্পকুল অবস্থা-সমূহের সমন্বয়ের প্রয়োজন :—

- ১। প্রকৃত মূলধন এবং ব্যাঙ্কের কারবার। এমন হইবে যে যখন যেখানে টাকা দরকার সেইখানেই টাকা পাওয়া যাইবে।
- ২। টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ।
- ৩। ব্যবসায় বাণিজ্যের আধুনিকতম জ্ঞান।
- ৪। বাহ্য প্রতিযোগিতার সহিত লড়াইয়ে যথেষ্ট সময় টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা।
- ৫। হৃদয়বৃত্তি ও অশিক্ষিত মজুর।
- ৬। জলপথে স্থলপথে স্থলভে মাল চালান দিবার সুব্যবস্থা।
- ৭। স্বদেশে এবং বিদেশে অল্পকুলভাবে মালের কাটতি। এই জন্ত ব্যবসায় বিষয়ক সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা ও এজেন্সী থাকিবে।
- ৮। এমন অল্পকুল স্থানে কারখানা বসাইতে হইবে যে শিল্পজন্মের জন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক পদার্থ অন্যত্রাসেই পাওয়া যায়।
- ৯। আধুনিকতম কলপাতি সরবরাহের সুব্যবস্থা।
- ১০। কাঁচা মাল ও রাসায়নিক পদার্থের পর্যাপ্ত সরবরাহ।
- ১১। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া।
- ১২। লোকবিশেষের মধ্যে সম্মিলিতভাবে কাঁচা করিবার জন্ত ঐক্যবুদ্ধি জাগাইয়া তোলা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাতেই বুঝিতে পারিবেন যে ১, ৪ ও ৬ নম্বর অবস্থা লাভের জন্ত সরকারের সাহায্য চাই-ই চাই। সমস্ত সভ্য দেশের শিল্প-উন্নতির ইতিহাসেও ঐ ঐ দেশের গভর্নমেন্টের ঐ-প্রকার সাহায্যের কথা উল্লিখিত আছে। অথচ দুর্ভাগ্যবশত আমাদেরই একজন নাট-সভার প্রতিনিধি (।) শিল্প-কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান কালে বলিয়াছেন যে শিল্প-শিল্পকে খাড়া করিতে আমাদের দেশে গভর্নমেন্টের অর্থসাহায্যের প্রয়োজন নাই! এই “মাননীয়” ভজ-

লোকটির শিল্প সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা যে নাই তা তাঁর সাক্ষ্য হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাভাবে এ-দেশে কত শিল্পস্থাপনাব চেষ্টা অস্বুয়েই বিনষ্ট হইয়াছে সে-সংবাদ তিনি বাখেন না। “বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী” দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

কি কারণে আমাদের দেশ একদা দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে তাহার আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমেই আমাদের শিল্পের অবনতির কথা মনে আসে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য গভর্নমেন্ট নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিলেও আশামুগ্ধ উন্নতি যে সাধিত হইতেছে ইহা বলিতে পারা যায় না। লোকে প্রচলিত কথা বা জ্ঞান পথের বাহিরে যাইতে চাহে না। কাজেই পরীক্ষা-ক্ষেত্র আদিতে প্রকৃত অর্থব্যয় হইলেও প্রকৃত উপকার যে বিশেষ কিছু হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আর কথা হইতেছে, এক কৃষি-কার্য দ্বারা কোন দেশ অর্থশালী হইতে পারে না। প্রতি বৎসর হাজার হাজার বিঘা পতিত জমলাবৃত্ত জমি শস্তক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে কিন্তু আমাদের অন্নভাব ঘুটিতেছে না, বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আসল কথা, দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত না হইলে কেবলমাত্র কৃষি-কার্যের দ্বারা দেশের অর্থকষ্ট বিদূরিত করা সম্ভবপর নহে। দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার সাধন আবশ্যক ও ইহার জন্য গভর্নমেন্টের কেবল সহায়ত্বই পাইলেই হইবে না, আবশ্যকমত সাহায্যপ্রাপ্তিও আবশ্যক।

দেশে কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে কাবখানার প্রতিষ্ঠাতা লাভবান তো হনই তার উপর এক-একটি বড় কারখানায় কত দরিদ্রের যে অন্নসংস্থান হয় তার সংখ্যা নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাতার লৌহকারখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কোম্পানির মূলধন ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। গত বৎসর লাভ হইয়াছে সত্তর লক্ষ টাকা। এবং কত নিরন্ন ভারতবাসীর সেখানে কুলি মজুর ও কর্মচারীব কাজ করিয়া অন্নসংস্থান হইতেছে।

শিল্প-কমিশনের কাজ ও দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে “দর্শক” লিখিয়াছেন—

০ কমিশন তদন্ত-কার্য শেষ করিতে কিছু সময় অতিবাহিত করিবেন, তাহার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সময় লাগিবে; তাহার পর গভর্নমেন্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত জানিয়া কার্যারম্ভ করিবেন, তাহাও সময়মাপেক। বিশেষতঃ কল কল্যাণ এদেশে আনিয়া তাহা কার্যোপযোগী করিতেও সময় লাগিবে। বর্তমান সময়ে বিদেশ হইতে কল কল্যাণ আনিয়ন করাও সহজসাধ্য নহে। তাহার উপর রাজসরকার ভীষণ মুখে ব্যাপ্ত; তাহার অর্থেরও এখন যথেষ্ট ব্যয় সম্ভবপর নহে। অথচ এদিকে যে-কোন কার্যই করিতে হইবে তাহাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থভাবে কিরূপে পূরণ হইবে? জমজমাট ও কার্য আরম্ভের পূর্বেই অস্তাব ভীষণ অবস্থা ধারণ করিবে। লবণ আনিতে আনিতে পাজা ফুটাইয়া যাইবে। হুতরাং বড় ভাবে কার্যারম্ভের পূর্বে যাহাতে অন্ততঃ ঘোটা কাপড় মোটা ভাতের যোগাড় হইতে পারে,

যাহাতে দিন যাপনোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে, সে বিষয়ে অগ্রে সচেতন হওয়া আবশ্যিক। সকল ভার ব্রাহ্মসরকারের উপর স্তম্ভ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে নিজেদেরই নাগা সাজিতে হইবে; নিজেদের দুর্ভিক্ষ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের ধনী মহাবিল্ল দরিদ্র সকলেবই আত্ম অভাব পূরণ ও আত্মবক্ষার জন্য সচেতন হইতে হইবে। যাহার অর্থ সামর্থ্য আছে তিনি অর্থ সাহায্য করুন, অপরে শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করুন; আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।”

এ-বংসর কনভোকেশনে বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড সমাগত ছাত্রমণ্ডলীকে বলিয়াছেন যে দেশে নূতন নূতন অর্থার্গমের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে গভর্নমেন্ট সচেতন হইবেন। এ আশ্বাস কাজে পরিণত হইলে দেশের দাবিদ্র্য অন্তত কিছু পরিমাণে ঘুচিবে।

সু।

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা *

১৮৮৮ সালে খ্রীষ্টীয় সীতানাথ দত্ত তত্ত্বত্বষণ মহাশয়ের প্রণীত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৯১১ সালে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ইহার এক নূতন সংস্করণ বাহির হয়। ‘পিঠাপুস্তক’এর রাজার অর্থায়কুল্যে এই গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ বাহির হইল।

মূলগ্রন্থে চারিটি অধ্যায় :—(১) আত্মানানুবিবেক, (২) নিত্যানিত্য-বিবেক (৩) ত্রৈত্যবৈত-বিবেক এবং (৪) পূর্ণাপূর্ণ-বিবেক।

পরিষিষ্ট তিনটি অধ্যায়। ‘A’ নামক অধ্যায়টি (পৃঃ ১৯৯—২৩১) গ্রন্থকারের Philosophy of Brahmoism হইতে গৃহীত। অপর দুইটি অধ্যায় Indian Messenger নামক পত্রিকা হইতে গুনমুক্ত হইয়াছে। এই তিনটি অধ্যায় বাঙ্গলা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় নাই।

বাঙ্গলা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ভাষা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। ইহার সহিত তুলনায় ইংরেজী সংস্করণ অত্যন্ত প্রাঞ্জল। উভয় গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, বাঙ্গলা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই যেন ইংরেজী হইতে অনুবৃত।

গ্রন্থের সর্বপ্রথমেই আলোচনা করা হইয়াছে—“আত্মার মূল লক্ষণ কি?”। গ্রন্থকারের মতে “জ্ঞানই আত্মার মূল লক্ষণ”। জ্ঞান ও ইচ্ছার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—“অগ্রে জ্ঞান, তাহার পর ইচ্ছা (Volition)।” বর্তমানযুগেও যে একবার্নার দার্শনিক গ্রন্থে এইপ্রকার মত প্রচারিত হয়, ইহাতে অনেকেই আশ্চর্য্যাবিত হইবেন। Schopenhauer, Beneke, Latze,

* Brahmoijjnasa or An Inquiry into the Philosophical Basis of Theism translated from the original Bengali with supplementary chapters by Babu Sitanath Tattvabhusan, Head Master, Kesab Academy; sometime Lecturer in Philosophy, City College, Calcutta. Printed and published by P. C. Dass, Kuntalin Press 61 Bowbazar Street, Calcutta, pp. iv + ii + 255. Price Re 1-8 or 2 Shillings.

Wundt, Paulsen, Ku'pe, Horwicz, Jodl, Foullee Ribot, Hoffding, Sully, Spencer, Baldwin, Ladd, James, Stout, Ward, Bradley, Royce প্রমুখ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থার ফলে দার্শনিক জগৎ বৃদ্ধিতে পারিয়াছে যে ভাব (feeling) এবং ইচ্ছা (will) কে আর অগ্রাহ্য করা যাইতেছে না। ইহাদিগের মধ্যে কেহ-কেহ ভাবের, এবং কেহ-কেহ ইচ্ছার মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু এখন এই মত প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে আত্মা কেবল জ্ঞান নহে, কেবল ভাব নহে এবং কেবল ইচ্ছা নহে। জ্ঞানকে আর সর্বোদরী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতেছে না। এখন যাহারা কেবল জ্ঞানকেই ভিত্তি করিয়া দর্শনশাস্ত্র রচনা করিবেন, তাহাদিগের পুস্তক ‘প্রাচীনকাহিনী’ ও ‘দার্শনিক-গল্প’ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইউরোপ এবং আমেরিকার জ্ঞানবাদিগণও আব James, Bergson, Dewey, Schiller প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছেন না। Royce পূর্বে আপনাকে জ্ঞানবাদী বলিতেন, লোকে এখনও তাহাকে জ্ঞানবাদী বলিয়া জানে, কিন্তু তিনি কেবল জ্ঞানের উপর নিম্ন দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন নাই, ইচ্ছাকেও জ্ঞানের সহচররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি তিনি বলিতেছেন যে তাহার দর্শনের নাম Absolute Pragmatism। বর্তমান আমেরিকার ফলে Joachim, Taylor, Boyce-Cribbion, Henry Jones, Mellone, Stewart প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নূতন আলোকে দর্শনশাস্ত্র পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এমন কি Bradleyকেও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অজ্ঞানত্বের Pragmatism এবং Jamesএর will to believe প্রভৃতি মতকেও অনেক স্থলে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

(২)

গ্রন্থকার এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন :—“যখন আত্মা কোন বিষয়কে জানে, তখন সেই আত্মা আপনাকে জানে কি না।” তাহার উত্তরে তিনি বলেন ‘হঁ, আত্মা এই সময়ে আপনাকেও জানে, আপনাকেও জানে বিষয়ীভূত করে।’

তাহার যুক্তি এই—

“মনে করুন আপনি কল্যা অন্ধকারকে জানিতেছিলেন। অদ্য স্মৃতিধারা জানিলেন “আমি অন্ধকার জানিতেছিলাম।” “আমি অন্ধকার জানিতেছিলাম” ইহার অর্থ “আমি জানিতেছিলাম। অন্ধকারকে”। সুতরাং ‘আমি জানিতেছিলাম’ ইহা যখন আপনার মনে হইতেছে, তখন ইহা আপনি জানিয়াও থাকিবেন; অর্থাৎ অন্ধ রকে জানিবার সময়ে ‘আমি জানিতেছি’ এই তত্ত্ব আপনার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবে।” (বাং পৃঃ, ইং p. 8)

Ferrier এই-প্রকার একটি যুক্তি দিয়াছেন (Institute of Metaphysics পৃঃ ৮১), তাহার যুক্তি আরও পরিষ্কৃত। সীতানাথ বাবু উক্ত গ্রন্থ হইতে এই যুক্তি লইয়াছেন কি না জানি না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই :—

(ক)

প্রথমতঃ—“আমি অন্ধকারকে জানিতেছিলাম” ইহা একটি গ্রন্থও অবিভাজ্য অবস্থা। গ্রন্থকার ইহা স্বীকার করিয়াও উক্ত অবস্থাকে কাটিয়া দুই ভাগ করিয়াছেন—কারণ “আমি জানিতেছিলাম” এই অংশ তাহার নিত্যস্থ দরকার। দরকার এইজন্য যে ইহা দ্বারা যদি কোন উপায়ে প্রমাণিত হয় যে “কোন বস্তুকে জানিবার সময় আমি আমাকে জ্ঞাতরূপে জানিতে পারি।” আমবা পরে দেখিব যে এই অংশ গ্রহণ করিলেও গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

(৪)

সীতানাথবাবু বলিতেছেন—“আমি জানিতেছিলাম” ইহা যখন আপনায় অরণ্য হইতেছে, তখন ইহা আপনি জানিয়াও থাকিবেন।” শেষ “ইহা” শব্দের অর্থ “আমি জানিতেছিলাম ইহা।” সুতরাং “ইহা জানিয়াও থাকিবেন”=আপনি জানিয়াও থাকিবেন যে “আমি জানিতেছিলাম।”

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই :—“আমি জানিতেছিলাম” ইহা যদি স্মৃতির উক্তি হয়, তবে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ‘সত্যসত্যই আমি (বা আপনি) জানিতেছিলাম (বা জানিতেছিলেন)’; অর্থাৎ মূল ঘটনা=আমি জানিতেছি। কিন্তু সীতানাথবাবু বলেন “স্মৃতির উক্তি হইতে সিদ্ধান্ত এই :—“আমি জানিতেছিলাম যে আমি জানিতেছিলাম।” অর্থাৎ মূল ঘটনা=আমি জানিতেছি যে আমি জানিতেছি। এ-প্রকার সিদ্ধান্ত যে কি-প্রকারে হইতে পারে তাহা বুঝা যাইতেছে না। অঙ্ককার দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনাকে এক ঘটনা বলিয়া ভুলনা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে “আমি জানি” এবং “আমি জানি যে আমি জানি” এই দুইটি একই তত্ত্ব।

Jamesএর Psychology (পৃঃ ২৭৪) এবং Wardএর Psychology (Ency: Brit. ১১শ সংস্করণ। পৃঃ ৫৫০, ৫৫১) পাঠ করিলে পাঠকগণ এই মতের সমালোচনা পাইবেন।

এখন স্মৃতি ঘটনাটিকে একবার বিশ্লেষণ করা যাউক। কলাকার ঘটনা অর্থাৎ মূল ঘটনা=আমি অঙ্ককারকে জানিতেছি (ক)।

স্মৃতিতে ইহা ভ্রান্ত হইলে আমি বলিব “আমি কলা অঙ্ককারকে জানিতেছিলাম।” কোন কথা উক্ত না রাখিয়া বলিলে বাক্যটি এই প্রকার দাঁড়াইবে :—“আমি এখন জানিতেছি যে কলা আমি অঙ্ককারকে জানিতেছিলাম” (খ)। ইহার অর্থ “আমি কলা ‘ক’ ঘটনা জানিতেছিলাম।”

স্মৃতির নাহায্যে যদি আমি ‘খ’-বাক্য উচ্চারণ করি তবে বলিতে হইবে ‘ক’-ঘটনা সত্য অর্থাৎ মূল ঘটনা=আমি অঙ্ককারকে জানিতেছি।

মূল ঘটনা ও স্মৃতির ঘটনা আরও জটিল হইতে পারে। মনে কর কলাকার ঘটনা :—“আমি জানিতেছি যে আমি অঙ্ককারকে জানিতেছি” (গ)। স্মৃতিতে এই ঘটনা ভ্রান্ত হইলে আমি বলিব “আমি এখন জানিতেছি যে “কলা আমি জানিতেছিলাম যে আমি অঙ্ককারকে জানিতেছিলাম” (ঘ)।

স্মৃতি যদি বলে ‘খ’, মূল ঘটনা হইবে ‘ক’; স্মৃতি যদি বলে ‘ঘ’, মূল ঘটনা হইবে ‘গ’। সীতানাথবাবু বলিতেছেন স্মৃতি যখন বলিতেছে ‘খ’, তখন মূল ঘটনা হইবে “গ”। তিনি ‘ক’ ও ‘গ’এর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নাই বলিয়াই ‘খ’ হইতে ‘গ’ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন।

তৃতীয় বক্তব্য এই :—এখানে স্মৃতির প্রকৃতি বিষয়েই ভুল করা হইয়াছে। স্মৃতির ঘটনা ও মূল ঘটনা কখনই সম্পূর্ণরূপে এক হইতে পারে না। James স্মৃতির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন :—

It is the knowledge of an event or fact of which we have not been thinking with the additional consciousness that we have thought or experienced it before.

স্মৃতিতে থাকে দুইটি ঘটনা :—

(১) মূল ঘটনা।

(২) এবং অতিরিক্ত এইটুকু :—“এই মূল ঘটনাকে পূর্বে অমুখ্য কবা হইয়াছিল বা চিন্তা করা হইয়াছিল তাহার বর্তমান জ্ঞান।”

স্মৃতিতে এই দ্বিতীয় অংশ দেখিয়া অনেকে মনে করেন ‘মূল ঘটনাতেও জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বজ্ঞান ছিল। ইহাকেই বলে Psychologist's fallacy (Jamesএর Psychology, vol i পৃঃ ১২৬-১২৮)।

এ বিষয়ে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মূল ঘটনাটি এই :—“আমি অঙ্ককারকে জানিতেছি”। এ বিষয়ে স্মৃতির সাক্ষ্য এই :—আমি (=ক) জানিতেছি যে আমি (=খ) অঙ্ককারকে জানিতেছিলাম। এখানে অনেকেই এইরূপ বলিবেন :—“এখানে স্মৃতিই বস হইতেছে যে আমরা কেবল অঙ্ককারকেই জানিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি যে অঙ্ককারের জ্ঞাতা তাহাও তিনি জানেন। সুতরাং জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞান যাইতেছে।”

আমাদের বক্তব্য এই :—উক্তবাক্য দুইটি ‘আমি’।

১। ‘ক’-আমি অর্থাৎ ‘আমি জানিতেছি’ এই অংশের ‘আমি’। এই ‘ক’-আমি=অঙ্ককার ‘আমি’।

২। ‘খ’-আমি অর্থাৎ ‘আমি অঙ্ককারকে জানিতেছিলাম’ অংশের ‘আমি’। এই ‘খ’-আমি=কলাকার ‘আমি’=স্মৃতিতে জ্ঞাত ‘আমি’।

এই ‘ক’-আমির জ্ঞাতব্য বিষয় :—“আমি অঙ্ককারকে জানিতেছিলাম (ঙ)। এই (ঙ) ঘটনাটার মধ্যে একটি সপক্ষ দেখা যাইতেছে। এই সপক্ষ দুইটি বস্তুর মধ্যে, প্রথম বস্তুটি ‘খ’-আমি অর্থাৎ কলাকার ‘আমি’, দ্বিতীয় বস্তুটি ‘অঙ্ককার’। এ-সপক্ষ দেখিতেছে কে? অবশ্য ‘ক’-আমি অর্থাৎ অঙ্ককার ‘আমি’। সুতরাং অঙ্ককার ‘আমি’ জ্ঞাতা এবং এই ‘ক’-‘আমি’ দেখিতেছে যে ‘খ’-‘আমি’র সঙ্গে অঙ্ককারের একটা সপক্ষ রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে জ্ঞাতা জানিবার সময়েই আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া জানে, এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে ‘খ’-‘আমি’র সঙ্গে অঙ্ককারের জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয় সপক্ষ ছিল এবং ‘ক’-আমি সেই সপক্ষ দেখিতেছে। ‘ক’-আমিও ‘আমি’ এবং ‘খ’-‘আমি’ও ‘আমি’। ‘ক’-‘আমি’ ‘খ’-‘আমি’র জ্ঞাতৃত্ব জানিতেছে এই দেখিয়া লোকে মনে করে ‘খ’-‘আমি’ও বুঝি নিজের জ্ঞাতৃত্ব জানিতেছিল। ‘খ’-‘আমি’ যেমন তখন জানিত না যে সে মূল ঘটনার জ্ঞাতা, তেমনি ‘ক’-আমিও এখন জানে না যে সে স্মৃতির ঘটনার জ্ঞাতা। কোন বিষয় জানিবার সময়ে কেহই নিম্নে কৈ জ্ঞাতা বলিয়া জানিতে পারে না।

(ঘ)

সীতানাথবাবুর বিধান যে অমুখ্যত্ব আত্মজ্ঞান না থাকিলে স্মৃতির সত্য আত্মজ্ঞানের কথা আসিতে পারে না। ইহাই যদি সত্য হয় তবে শিশুকে আত্মজ্ঞান লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু Psychologistগণ ইহার বিপরীত কথাই বলিতেছেন। শিশু কি-প্রকারে অল্পে অল্পে আত্মজ্ঞান লাভ করে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে আত্মজ্ঞানের জন্ম স্মৃতি নিতান্তই আবশ্যক কিন্তু স্মৃতির জন্ম আত্মজ্ঞান না হইলে চলে না এমন নহে। Ward বলেন :—

Whereas it is easy to see that memory is essential to any development of self-consciousness, the converse is not at all clear and would involve us in a needless circle (Psychology, Ency. Brita.)

Edward Cairdও স্বীকার করেন না যে প্রথম হইতেই মানবের আত্মজ্ঞান থাকে। তাঁহার মতে প্রথমে বাস্তবজ্ঞান জ্ঞান। তাহার পর আত্মজ্ঞান।

“The consciousness of objects is prior in time to self-consciousness (Evolution of Religion, Vol i পৃঃ ১৭৭).”

এখানে “in time” ব্যঙ্গিত হইয়াছে। বহুস্থলে ideally এবং logically শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (Critical Philosophy of Kant, Vol ii, p. ৩৭১ ; ৪২৫)।

Bradleyও বলেন জ্ঞান থাকিলেই যে আত্মজ্ঞান থাকিবে তাহা নহে (Truth and Reality, pp. 191-195)।

এখন দেখা বাউক দার্শনিকগণ জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয়ে কি বলেন।

দার্শনিকগণের মত ও যুক্তি।

Kantও বলেন জ্ঞাতৃকপী আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না। ইহারই মত E. Caird এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

If the eye cannot see itself except in so far as it may be said to see itself in all the other things it sees, how can the conscious ego know itself except as the universal principle of knowledge which is present in all things known (Critical Philosophy. Vol ii, page 26. পৃঃ ২৫-২৬ অষ্টব্য)।

Kantএর অনুসরণ করিয়া Schellingও বলেন ‘আমি’-বস্তুকে জ্ঞেয়বস্তু করা যায় না।

“The I is a pure activity that can only be defined as that which is not an object (Watson’s Schelling পৃঃ ১১০)।

“The self is not one of the possible objects of knowledge (পৃঃ ১৫৩)।

Kant এবং Schelling এ বিষয়ে যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা এই :—“যাহার জ্ঞাতৃজ্ঞান বিষয়সমূহকে আয়ত্ত করে, তাহা কি-প্রকারে জ্ঞানের বিষয়রূপে গৃহীত হইবে?” ইহাই স্বভাবতঃ এইরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :—মনে কর Atlas (এটলাস) নামক পুরুষ পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই Atlas, কি পৃথিবীকে ধারণ করিতে পারে? কিংবা মনে কর একজন মানুষ যীর স্বপ্নে ভারবহন করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি কি নিজেকে স্বপ্নে বহন করিয়া লইতে পারে? এই-প্রকার ‘অহম’-রূপ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই যেন জ্ঞান সমুদ্র বিষয় ধারণ করিতেছে, এই জ্ঞান সেই ‘অহম’কে কি-প্রকারে ধারণ করিবে?

Schopenhauer বলেন—

“The knower himself as such, cannot be known ; otherwise he would be the known of another knower (The World as Will and Idea, Vol ii পৃঃ ৪১২) অর্থাৎ জ্ঞাতা জানিবার সময় জানিতে পারে না যে ‘আমি জ্ঞাতা’ ; নতুবা তিনি অজ্ঞ জ্ঞাতার জ্ঞেয় হইবেন।

জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় বলিয়া কল্পনা করিলে কি হয় সেবিষয়ে Herbert এইরূপ বলিতেছেন ;—

As soon as the I is conscious of itself, that of which it is conscious has become objective. The I which is conscious is subjective. It lies outside of that of which it is conscious. To become conscious of this I, we must in some way get behind it. We must be conscious of that which is conscious. But as fast as the I gets behind itself, it is there as an I which demands the renewal of the same process. The search for the I is a process which can never be completed.

(Everett’s Fichte, Grigg’s Phil. c’assics. Page 82-83)।

Lotze (Microcosmus Vol i পৃঃ ২৫০ ; Metaphysics), James (Principles of Psychology Vol i পৃঃ ২৭১-২৭৫ ; ৩০৪) Ward (Psychology : Ency. Brit. ১১শ সংস্করণ : পৃঃ ৫৫০, ৫৯৯) Bradley Bosanquet (The Principle of Individuality and Value. Page 2২১) Ladd (Psy: Descrip, পৃঃ ৩২ ; Theory of Knowledge) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মত পোষণ করেন।

Bradley বলেন—

“জ্ঞাতা আপনাকে অমুভব করে কিন্তু আপনাকে বিষয়রূপে জানিতে পারে না এবং বিষয়-বিষয়ীর পার্থক্যকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না। পরে চিন্তা করিলে এই জ্ঞাতা বিষয়রূপে পরিণত হয় কিন্তু এ ঘটনা এক নূতন ঘটনা, ইহার জ্ঞাতাও এক নূতন জ্ঞাতা। এই নূতন জ্ঞাতাও অমুভবের বিষয়, জ্ঞেয় বিষয় নহে।”

“The subject is always felt and neither itself, nor its actual distinction from the object, can be got out and placed before it as an object.” “It can become an object for reflection ; but in becoming one, it generates a new experience and a fresh-felt subject (Truth and Reality পৃঃ ১১৩)।

অতি প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্যের মুণ্ড হইতেও এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল—বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজ্ঞানীয়াং (বৃঃ ২।৪।১৪) বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে? অজ্ঞাত—“ন বিজ্ঞাতোঃ বিজ্ঞাতারম্ বিজ্ঞানীয়াঃ (বৃঃ ৩।৪।২)—বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিতে পারিবে না।

তবে কি জ্ঞাতাকে জানা যায় না? ইহার উত্তরে ‘হী’ ‘না’ উভয়ই বলা যাইতে পারে। এ প্রশ্নের দীর্ঘাঙ্গ ‘জানা’ শব্দের উপরে নির্ভর করে।

একজন জ্ঞাতা আছেন, একটি জ্ঞেয়বস্তু আছে, এতদ্বয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে, জ্ঞাতা জ্ঞেয়বস্তুকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে ‘সম্বন্ধ-জ্ঞান’কেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে এবং জ্ঞাতা নিজে জ্ঞাতৃত্বকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে—ইহাই যদি জানার অর্থ হয়, তবে বলিব জ্ঞাতা ঠিক জ্ঞানলাভের সময়ে আপনাকে জানে না, এবং আপনি যে বিষয়ের জ্ঞাতা তাহাও জানে না।

তবে যে-নিমেষে জ্ঞাতা কোন জ্ঞান লাভ করে, ঠিক তাহার পর-নিমেষেই ঐ জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়।

কিন্তু এই-প্রকার ‘জানা’ ছাড়াও অল্প একপ্রকার জানা আছে, তাহার নাম অপরোক্ষ অনুভূতি, Bradleyএর ভাষায় Immediate Experience, Bergsonএর ভাষায় Intuition। ইহাকে যদি ‘জানা’ নাম দিতে আগতি না থাকে তবে বলিব জ্ঞাতাকেও জানা যায়। নতুবা যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় বলিব “বিজ্ঞাতাকে কি-প্রকারে জানিবে।”

(৩)

এ জগৎ কি? এবিষয়ে গ্রন্থকার দুইটা উত্তর দিয়াছেন।

(১) এ জগৎ আমার মনোবিকার, আমার অবস্থা, আমার রূপ।

(২) এ জগৎ আমার বিষয়, আমি বিষয়ী।

(ক)

সীতানাথ বাবু নিজে বলেন এবং তাহার বন্ধুবর্গও বলেন যে তিনি একজন Absolute Idealist (“অধ্যাত্মবাদী” আমরা কিন্তু

তাহার কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। তিনি এই গ্রন্থে খাঁটি Subjective Idealism এর মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন “ইহার মনোবিকার, ইন্দ্রিয়বোধ বা বিজ্ঞানমাত্র (বাং পৃ: পৃ ৩৯)। They are states, sensations or ideas (ইং পৃ ৩৮)। যাহা কিছু দেখি বা শুনি বা স্পর্শ করি তাহা আমারই বিজ্ঞান (পৃ: ১২, বাং)। সীতানাথ বাবু মনে করেন বিজ্ঞান * = Sensation। ইহার প্রকৃতি-বিষয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

Sensation being purely mental, a form of consciousness—it bears no impress and furnishes no proof of any extra-mental—any not-self. It implies only the self's spontaneity or activity,—its capacity of assuming various sensuous forms (p 66. বাংলাগ্রন্থে এই অংশ নাই)।

এখানে বলা হইতেছে :—

(১) বেদনা কেবলই মনোব্যাপার।

(২) ইহা আত্মার বা জ্ঞানের একটি রূপ।

(৩) ইহাতে বাহ্যবস্তুর চিহ্ন মাত্র নাই, ইহা কোনো বাহ্যবস্তু বা কোন অনায়াসবস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে না।

(৪) এই বেদনা হইতে প্রমাণিত হয় যে আত্মা আপনা-আপনিই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে এবং আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকার ধারণ করে।

এই অংশ পড়িলেই মনে হইবে যে আত্মার বাহিরে কোন বস্তু নাই। আছে কেবল আত্মা ও আত্মার অবস্থা।

সীতানাথবাবু বর্তমানযুগে এই-মত প্রচার করিতে বাহিতেছেন কিন্তু চিন্তাশীল জ্ঞানবাদিগণ প্রায় সকলেই এই-মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

Edward Caird স্বয়ং এই মতকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন (Évolution of Theology in the Greek Philosophy সপ্তম বক্তৃতা পৃ: ১৭৩-১২৭; Evolution of Religion পঞ্চম বক্তৃতা পৃ: ১১৪-১৪৩; Critical Philosophy of Kant. বহুস্থলে)। ইনি নিজের শেষ মত ব্যক্ত করেন ১৯০৩ সালে, Idealism and the Theory of Knowledge নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি পূর্বোক্ত মত সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া অসম্ভব জ্ঞানবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই মতের বিবন্ধে যে কত পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। পাঠকগণ Adamson's Development of Modern Philosophy (Vol i পৃ ১৮৩—২০০ বিশেষ-ভাবে দ্রঃ) Ladd's Philosophy of Knowledge পড়িলে এবিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

(খ)

জগৎবিষয়ে গ্রন্থকারের দ্বিতীয় মত এই :—জগৎ বিষয় এবং আমি বিষয়ী। এ-মত অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জ্ঞানবাদের বিশেষত্ব নহে। Laurie বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া Natural Realism প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; Wardও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই Edward Caird এর জ্ঞানবাদের ভিত্তি।

* সীতানাথ বাবু বিশ্বাস বৌদ্ধদার্শনিকগণের মতে Sensation = বিজ্ঞান। ইহা সত্য নহে। ইহাদিগের পঞ্চদশের নাম এই :—

(১) রূপ (২) বেদনা = Sensation (৩) সংজ্ঞা = Perception (৪) সংস্কার (৫) বিজ্ঞান = Conceptual Knowledge.

কিন্তু সীতানাথবাবুর মতের বিশেষত্ব এই যে তিনি মনে করেন ‘বিষয়ও আত্মার একটি অবস্থা। ইহাতে ‘বিষয়-বিষয়ী-বাদ’ মনো-বিকার-বাদেই পরিণত হইল।

(৪)

জগৎ ও জ্ঞান।

সীতানাথবাবু বলেন—আমার জ্ঞানের সহিত অসম্পর্কিত করিয়া আমি কোন বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে পারি না। সুতরাং জ্ঞান হইতে স্বাধীনভাবে কোন বস্তুই থাকিতে পারে না। সুতরাং জগৎ “জ্ঞানাত্মক বস্তু; তখন কাহ্নেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে যখন আমরা জগৎকে না জানি তখনও ইহা জ্ঞানকে আশ্রয় কবিয়াই বর্তমান থাকে। তাহা না হইলে ইহার থাকাই ঘটে মা (ইং, পৃ: ২৫; বাং ২৭)।

যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়ায় :—

(ক) আমার জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত না হইলে আমি কোন বস্তুকে জানিতে পারি না।

(খ) সুতরাং কোন বস্তু জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না।

(গ) আমি যখন জগৎকে জানি না তখনও জগৎ বর্তমান থাকে।

(ঘ) জগৎ যখন আছে এবং ইহা যখন জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না তখন বিশ্বাস করিতে হইবে যে জগৎতের আশ্রয়ের জন্ত এক জ্ঞান আছে। তাহা না হইলে জগৎ থাকিতেই পারে না।

(ক)

‘ক’ অংশ বিষয়ে কাহাবও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। রাম = রাম, নদী = নদী, পশু = পশু ইত্যাদি যে শ্রেণীর বাক্য, এই বাক্যটিও সেই শ্রেণীর। ‘জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক হওয়া’র অর্থ ‘জানা’; সুতরাং “আমার জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত না হইলে” = আমি না জানিলে। সুতরাং ‘ক’ অংশের অর্থ “আমি না জানিলে আমি জানিতে পারি না।” এই কথাটাই ভাষার আবরণে নূতন ভাব বলিয়া বোধ হইতেছিল। গ্রন্থের বহুস্থলে এইপ্রকার উক্তি আছে :—যেমন “জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলে জড়কে জানা যায় না” (পৃ: ২১) = জানা না গেলে জড়কে জানা যায় না।

(খ)

‘খ’ অংশ বিষয়ে বক্তব্য এই :—

‘ক’ অংশ হইতে ‘খ’ অংশ প্রমাণিত হইতে পারে না। ‘ক’ অংশের অর্থ কি তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। “আমি না জানিলে আমি জানিতে পারি না。”—ইহাই যদি ঐ অংশের অর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ অংশ হইতে বস্তুর প্রকৃতি, অস্তিত্ব, প্রকৃতি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই করা যায় না। সরল ভাষায় ইহার অর্থ “আমি একটা বস্তুকে জানি।” ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে আমি না জানিলে ঐ বস্তু থাকিতে পারে না। আমি না জানিলে ঐ বস্তু আমার নিকটে প্রকাশিত হয় না—ইহা ভিন্ন অল্প সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

বিষয়ের সহিত বিষয়ীর যে সম্বন্ধ তাহা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নহে। কোন কোন স্থলে ‘কারণ’ বিষয়িক্রমে এবং ‘কার্য’ বিষয়কপে প্রকাশিত হইতে পারে কিন্তু বিষয়-বিষয়ীর যে সম্বন্ধ তাহা কার্য-কারণ বা আশ্রিত-আশ্রয়ের সম্বন্ধ নহে। Ward এই মত পোষণ করেন (Naturalism and Agnosticism পৃ: ১১৭) এবং Edward Caird বলেন

The reality of that which is other than the self-conscious intelligence is seen to rest on the same base with that the self-conscious intelligence itself and the

one cannot be denied without the other. (Idealism and the Theory of Knowledge পৃঃ ৪)।

আত্মা এবং অনাত্মা একই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এক অপরে প্রতিষ্ঠিত নহে।

Green একজন জ্ঞানবাদী—লোকে বলে সীতানাথবাবু Greenএর মত অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই Green কি বলেন শুধুন :—

To assume, because all reality requires thought to conceive it, therefore thought is the condition of its existence, is indeed unwarranted (Works, Vol iii পৃঃ ১৪৫)।

“জ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তু ধারণা করা যায় না সুতরাং জ্ঞানই এই বস্তুর আশ্রয়”—এ-প্রকার কল্পনা করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

আপাততঃ স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল যে বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ = কার্যকারণ-সম্বন্ধ। ইহাতেও প্রমাণিত হয় না যে “কোন বস্তু জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না।” গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে “কোন বস্তু আমার জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না।” যিনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন “কাগজ কলম দোয়াত প্রভৃতি সমুদয়ই আমারই দর্শন, আমারই স্পর্শ,” ইং পৃঃ ১৮-১৯ তিনি এই-প্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন :—“এইরূপে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি, সমুদয়কেই জ্ঞানরূপী আত্মার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সংবদ্ধ বলিয়া জ্ঞানিতেছি।”

গ্রন্থকারের যুক্তির জন্ম এই :—প্রথম সিদ্ধান্ত—আমার জ্ঞানগোচর বস্তু আমার জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত।

এই সিদ্ধান্ত হইতে “আমার জ্ঞানগোচর” এবং “আমার”—এই দুইটি অংশ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত করিলেন—

বস্তু জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত। ইহার পর ‘সম্পর্কিত’ শব্দের অর্থ করিলেন “আশ্রিত”। এই-প্রকার করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন :—বস্তু জ্ঞানের আশ্রিত, বস্তু জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না।

(গ)

আর এ-বিষয়ে যুক্তি দেওয়াও অনাবশ্যক, কারণ গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে আমাদের পূর্বেও জগৎ বর্তমান ছিল (বাঃ পৃঃ ১১; ইং পৃঃ ৭৯) এবং আমরা না-জানিলেও এরূপ বর্তমান থাকিতে পারে (‘গ’ ত্রুটি)।

গ্রন্থকার বলিবেন, যাহাকে আমার জ্ঞান বলি, তাহা কেবল আমার জ্ঞান নহে, তাহা সেই পরমজ্ঞানের ব্যক্তিগত প্রকাশ। কিন্তু আমার জ্ঞান এবং ব্রহ্মের জ্ঞান একই জ্ঞান ইহা কেবল বলিলে চলিবে না, প্রমাণ করা আবশ্যক এতদুভয় একই। Greenও এই আপত্তিই করিয়াছেন (Works, Vol iii পৃঃ ১৪৩)।

(ঘ)

‘ঘ’ অংশ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই :—

গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে ‘জগৎ আমার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত’। ‘জগৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত’ ইহা প্রমাণ করা ত দুয়ের কথা। তবুও কল্পনা করিয়া লওয়া ষাটক তিনি প্রমাণ করিয়াছেন “জগৎ আমার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।” ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি না-জানিলেও জগৎ বর্তমান থাকিবে—ইহা প্রমাণিত হইতে পারে না। ইহাও কল্পনা করিয়া লওয়া ষাটক “আমার জ্ঞান-নিরপেক্ষ ইহাও জগৎ আছে।” তবে আমি জানি বা না জানি

জগৎ আছেই। জগৎ যখন জ্ঞান-নিরপেক্ষ ইহা রহিয়াছেই, তখন ইহার অস্তিত্বের জন্ত একটি লোকাভীত জ্ঞানের কল্পনা কেন?

সীতানাথবাবু যাহা বলেন তাহা হইতে অনেক অদূত সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

আমার জ্ঞানের উপরেই যদি বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহা হইলে বলিতে হইবে—আমার আত্মার যে-টুকু এখন আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে—কেবল সেই-টুকুরই অস্তিত্ব আছে আর যাহা কিছু এখন জ্ঞানের সম্মুখে আসিতেছে না তাহার অস্তিত্বই নাই। অর্থাৎ আত্মার অধিকাংশই অস্তিত্ববিহীন (Moore, The Refutation of Idealism, Mind Oct. 1903)।

“বস্তু জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত” ইহা দ্বারা যদি প্রমাণ হয় যে বস্তু জ্ঞানের অধীন, তাহা হইলে ইহাই বা প্রমাণিত হইবে না কেন যে

আত্মা বস্তুর অধীন—

কারণ গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন যে Self-consciousness is impossible without object-consciousness. অর্থাৎ বিষয়কে না জানিলে আত্মাকে জানা যায় না। এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হইবেই যে আত্মা বা জ্ঞান জগতের উপরে নির্ভর করে, জগৎ ছাড়া আত্মার বা জ্ঞানের স্বাধীন সম্ভাব্য নাই।

জ্ঞানের সহিত অসম্পর্কিত করিয়া কোন বস্তুও বিষয় ভাবা যায় না, —ইহাতে যদি প্রমাণিত হয় যে বস্তু জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না এবং বস্তু জ্ঞানের অধীন, তাহা হইলে যখন বল হইতেছে বস্তু সহিত অসম্পর্কিত করিয়া আত্মার বিষয় জানা যায় না তখন ইহা কেন প্রমাণিত হইবে না যে আত্মা বস্তু ছাড়া থাকিতে পারে না এবং আত্মা বস্তুর অধীন।

John Cairdএর Introduction to the Philosophy of Religion নামক গ্রন্থের কথা অনেকেরই জ্ঞানে। Green এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলিয়াছেন—“Cairdএর মতে এই জগৎ-জ্ঞানই এবং আমাদের জ্ঞানক্রিয়া সেই আসল জ্ঞানেরই প্রতিবিম্ব; সেই জ্ঞানই এই সীমাবিশিষ্ট জীব-প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এ মত সংস্থাপন-বিষয়ে Caird সফলকাম হইয়া নাই। সম্ভবতঃ কেহই সফলকাম হইতে পারে না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইহা সংস্থাপন করা না যাইবে সে পর্য্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—আমরা আমাদের জ্ঞানবাহকে ব্রহ্মবাদ-রূপে প্রমাণ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন, ইহা ব্রহ্মবাদ না হইয়া Subjective Idealism রূপেই থাকিয়া যাইবে। (Our idealism, though we may wish it to be ‘absolute’ remains merely ‘subjective’)। পাঠকগণ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিবে “যে-জ্ঞান সবই করিতে পারে এবং সবই হইতে পারে সে জ্ঞানটা কি বস্তু?” কিন্তু ইহার প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইতেছে না; কেবল বলা হইতেছে ‘বিচার করিয়া দেখ মন কিরূপে কোন বিষয় ধারণা করিতে পারে এবং কোন বিষয় ধারণা করিতে পারে না’ মানব কোন বিষয় ধারণা করিতে পারে বা পারে না এ বিচার করিয়া যে উপরতত্ত্ব এবং জগৎতত্ত্ব অবধারণ করা যায় ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বাস না করাই যুক্তিযুক্ত” (Works, vol iii পৃঃ ১৪৩)।

Green কেয়ার্ডের গ্রন্থবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, সীতানাথ বাবুর গ্রন্থবিষয়েও আমরা তাহাই বলি। এই গ্রন্থের পাঠকগণও পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিবেন—“যে জ্ঞান সবই করিতে পারে এবং সবই হইতে পারে, সে জ্ঞান বস্তুটা কি?” মানবজ্ঞান যে সেই ব্রহ্মের জ্ঞানেরই প্রতিবিম্ব ইহা Cairdও প্রমাণিত করিতে পারেন না, সীতানাথ

বাবুও পারেন নাই। Cairdএর গ্রন্থে Subjective Idealism আছে, কিন্তু সীতানাথ বাবুর গ্রন্থে ইহা অতিরিক্ত নাকায়।

(৩)

দেশকালাদি বিষয়ে সীতানাথ বাবু বাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রাচীন যুগের কথা। এ যুগের মত জানিতে হইলে Non-Euclidean Geometryর তত্ত্ব জানা আবশ্যক। প্রাচীনমত কি-প্রকারে পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, তাহা যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি Poincareএর Science and Method নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন (The Relativity of Space পৃ: ৯৩—১১৩)।

পরিশিষ্টে Bradley এবং Jamesএর মতামত বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অংশে সীতানাথ বাবু সত্য-নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি Bradleyকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যেন তিনি একজন খ্রীষ্টী ব্রহ্মবাদী (Spiritual Monist)। সীতানাথ বাবুর বিশ্বাস ব্র্যাডলির Absoluteকে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলা যাইতে পারে। এই Absoluteকে 'সৎ' বলা যায়, কারণ Bradley ইহাকে Reality বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে 'চিৎ' বলা যায় না। 'চিৎ' বলিলেই Consciousness বুঝায়, কিন্তু ব্র্যাডলির Absolute = Experience। এই Experience শব্দের অর্থ অনুভূতি। ব্র্যাডলি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে Experience এবং Consciousness এক বস্তু নহে। 'চিৎ' মৌলিক বস্তু নহে, অনুভূতিই মৌলিক বস্তু। কেহ কেহ বলিতে পারেন চিৎ = Self-consciousness। ব্র্যাডলি বলেন এই Self-consciousness এবং Consciousness এতদুভয়ও এক নহে। সুতরাং কোন অর্থেই Absoluteকে 'চিৎ' বলা যায় না। ব্র্যাডলির ব্রহ্মকে আনন্দও বলা যায় না। তিনি বলেন জগতে সুখও আছে দুঃখও আছে কিন্তু সুখের পরিমাণই বেশী। সুখ দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি করিলেও কিছু সুখ অবশিষ্ট থাকে। Absolute কোন উপায়ে এই অতি অতিরিক্ত সুখটুকু উপভোগ করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে অপর ভাবও আছে; হইতে পারে একমাত্র Absolute হয়ত সুখ অনুভবও করেন না। (Appearance and Reality পৃ: ৫৩৪)। এইপ্রকার Absoluteকে কখন আনন্দধারণ বলা যায়?

সীতানাথ বাবু ব্র্যাডলির Absoluteকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বাহাতে লোকে বুঝিবে যে ব্র্যাডলির Absolute এবং God একই বস্তু। কিন্তু ইহার মতে এই দুই এক নহে। কেবল যে Truth and Reality নামক গ্রন্থেই এই মত প্রকটিত হইয়াছে তাহা নহে, Appearance and Reality নামক গ্রন্থেরও এই মত। এই God একটি সীমাবিশিষ্ট সত্তা, ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। কেবল ধর্মজগতেই ইহার আবশ্যকতা। তোমার আমার যেমন ব্যক্তিত্ব (Personality) আছে, Godএরও তেমনি ব্যক্তিত্ব আছে। তবে কিনা God এত বড় যে তাঁহার সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

সীতানাথ বাবু Jamesএর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। সোঁকটা যেন নাস্তিক, গড়ানুনাটা বড়ই কম এবং overweening self-confidenceটা বড়ই বেশী। কিন্তু এই-সময় কটাক্তির কোন অর্থ নাই। James নাস্তিক নহেন, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; তবে তাঁহার মতে Absolute এবং ঈশ্বর এক নহে। Absoluteএর মধ্যে পাপ-তাপাদি আছে; এই পাপ-তাপাদি বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই ঈশ্বর। অর্থাৎ Absolute = God + পাপ-তাপাদি। James বলেন ঈশ্বর ও মানব একই উপাদানে গঠিত (Pluralistic U. পৃ ৩৪) এবং মানব ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ (পৃ: ৩১৮)। জেমস নানাবাদী, ভারতীয় ভাষায় বৈতবাদী; কিন্তু এই বৈতবাদ অবৈতমূলক। তাঁহাকে Plura

Pantheist বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে আধ্যাত্মিক ধর্ম (Spiritualism) দুই ভাগে বিভক্ত:—

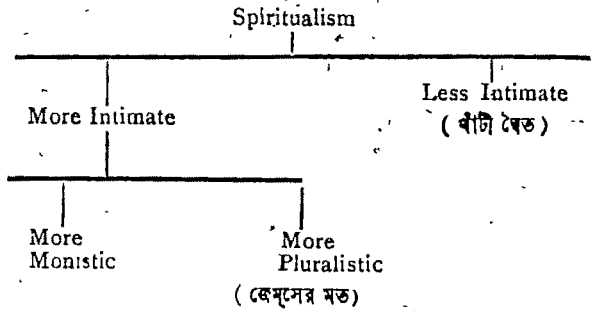
(১) More Intimate species

(২) Less Intimate species (যাহা খৃষ্টানাদি প্রচলিত ধর্ম)।

প্রথমটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত

(ক) More Monistic (খ) More Pluralistic। এই দুইটিকেই James Pantheistic field of vision বলিয়াছেন (P. U. পৃ ৩০৩)।

Jamesএর বিভাগ এই:—



তাঁহার উক্তি করেকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

The philosophy of the absolute agrees with the pluralistic philosophy, in that both identify human substance with the divine substance (ঈশ্বর ও মানব এক উপাদানে গঠিত)। (P. U. পৃ ৩৪)।

We are indeed the internal parts of God and not external creations on any possible reading of the panpsychic system (P. U. পৃ ৩১৮)।

The absolute is only the wider cosmic whole of which our God is but the most ideal portion. The finite God whom I contrast with it may conceivably have almost nothing outside himself; he already have triumphed over and absorbed all but the minutest fraction of the Universe; but that fraction, however small, reduces him to the status of a relative being, and in principle the universe is saved from all the irrationalities incidental to absolutism. (পৃ ১২৫—১২৬)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে James একজন বৈতবৈতবাদী।

Absoluteএর মধ্যে পাপ-তাপাদি আছে, কিন্তু ঈশ্বরে পাপ-তাপাদি নাই। পাপ-তাপাদি ঈশ্বরের বাহিরে। তাঁহার বাহিরে যখন কিছু আছে তখন ঈশ্বকে সীমাবিশিষ্টই বলিতে হইবে। James স্বীকার করেন যে জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; জীব ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ। Bradleyএর মতে ঈশ্বরের পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু Jamesএর ঈশ্বর পারমার্থিক ভাবে সত্য।

Jamesএর মত বিষয়ে সীতানাথ বাবু একটি ভুল করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বিশ্বাস Pragmatism এবং Radical Empiricism একই জিনিস (ইং পৃ: পৃ ২৪৭)। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। James স্বয়ং বলিয়াছেন:—

To avoid mis-understanding at least, let me say that there is no logical connexion between pragmatism,

as I understand it and a doctrine which I have recently set forth as "radical empiricism."

সমালোচনা বীর্ষ হইয়া পড়িল, অধিক মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক—আর সময়ও নাই, স্থানেরও অভাব। এই স্থানেই উপসংহার করা যাউক।

মহেশচন্দ্র বোষ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা

হিমালয়ে আরোহণ করিয়া তাহার শিখরে শিখরে ভ্রমণ অনেকই করে; হিমালয়ের শোভা দেখিয়া আনন্দ পায়; তথাকার নির্মল শীতল বায়ু সেবন করিয়া ক্ষুধা লাভ করে। কিন্তু ভ্রমণের বৃত্তান্ত সকলে লিখিতে পারে না, আনন্দের বর্ণনা সকলে করিতে পারে না, কেন আনন্দ হইল তাহাও বলিতে পারে না। কিন্তু আনন্দ লাভের কথা সকলেই বলিতে পারে; সকলেই বলিতে পারে, হিমালয় ভ্রমণ করিয়া উপকৃত হইয়াছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে জীবনচরিত * শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, আমার অন্তরাঙ্গার পক্ষে তাহা হিমালয়ভ্রমণের মত আনন্দদায়ক ও বলবিধায়ক হইয়াছে; যদিও মহর্ষি-চরিতের শিখরে শিখরে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লেখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, যদিও আমি কেমন আনন্দ পাইয়াছি, কেন আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলা আমার পক্ষে কঠিন। ইহার এক কারণ, অনভ্যাস; আর এক কারণ ধোঁয়াতীর অভাব। তাহার উপর আবার আর এক বিষয়, নানা ছোট বড় ব্যাপাবের চিন্তায় মনের অতিব্যস্ততা ও অনবসব। মহর্ষির জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে মনটাকে যথেষ্ট সময়ের জন্য অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিরূপণ, শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়া যাইতে হয়। ইহা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছে। রবিবার যৌবনে এক সময় "সপ্তাহ" নামে একখানা খবরের কাগজ বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন। তাহা বাহির হয় নাই। সেই উপলক্ষ্যে তিনি ১৮৮৭ সালে এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

"মাইন্ড: মাইন্ডে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসবে, কিন্তু 'সপ্তাহ' আর বের হবে না। অতএব বন্ধুবান্ধবেরা সকলে নিশ্চিন্ত হোন।

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ভেবে দেখুন কি করতে বসেছিলুম! 'সপ্তাহ' বের করবার ছল করে জীবন থেকে সপ্তাহগুলো একেবারে লোপ কর্তে বসেছিলুম। এখন যেমন আমি সপ্তাহে সাড়েটা দিন করে পাই, তখন সপ্তাহে সাড়েটা দিন বাদ পড়ত। মাসের পর মাস আসত—কিন্তু সপ্তাহ নেই; দিনগুলো আমাকে লাগি হাতে তড়া করে বেড়াত। আমি কোথায় গিয়ে লাড়াব ভেবে পেতুম না।"—হিমপত্র, ১১ পৃষ্ঠা।

আমি যদিও 'সপ্তাহ' বাহির করি নাই, কিন্তু দুখানা মাসিক চালাই। অথবা, সত্য কথা বলিতে গেলে, তাহারাই আমাকে চালায়। একখানা আমাকে ১৫ দিন ভাড়া করে, বাকী ১৫ দিন আর-একখানা আমার পশ্চাদ্ধাবন করে। ফলে মনটা স্থির শান্ত হইতে পায় না।

যাদের ইঙ্কুলে বা আফিসে যাইতে হয় না, তারা খাদ্যের রস গ্রহণ করিবার, তাহা সন্তোষ করিবার, অবসর পায়। কিন্তু বাহাদিগকে তাড়াতাড়ি ইঙ্কুলে আফিসে যাইতে হয়, তাহারা নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়া কোন-প্রকারে আহাৰ সারিয়া লয়। অতিব্যস্ত মানুষও তেমন সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে, তাহা সন্তোষ করিতে, এবং অপরকে তাহার অংশ দিতে, পারে না; তাহার পড়া, কোন প্রকারে কাজ চালাইবার মত কিছু তথ্য তত্ত্ব ও ধবর সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা।

মহর্ষির জীবনচরিত আমি আদ্যোপান্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পড়িয়াছি; কোন-কোন স্থান দু-তিনবার পড়িয়াছি। কিন্তু সমগ্র জিনিষটির একটি ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিবার মত অবসর আমি পাই নাই। অজিতবাবু যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাও কোনখানটি উজ্জ্বল হইয়াছে, কোনখানটি অস্পষ্ট হইয়াছে, ছবিখানির সৌন্দর্য কোথায়, দোষত্রুটি কি আছে না আছে, এ-সবও বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু গ্রন্থখানি হইতে নানা বিষয় জানিতে পারিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রধান একটি জিনিষ মহর্ষির স্বাদেশিকতা।

রবিবার "জীবনস্মৃতি"তে লিখিয়াছেন:—

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রধার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান হির দৃষ্টিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক আস্থা তাহার জীবনের সকলপ্রকার বিপদের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা ও দেশের ভাব

উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদার চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখন কিরিয়া আসিয়াছিল।

“আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা স্থাপিত হইয়াছিল। নবগোপাল নিজ মহাশয় এই মেলার কর্তৃকর্ত্ত্বক্ৰূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।”

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজশাসনের যুগের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে, রামমোহন রায় এদেশে সকল বিষয়ে স্বাদেশিকতার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁহাকে শুধু স্বাদেশিকতাব প্রবর্তক বলিলে তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখান হয়। অজিতবাবু সত্যই বলিয়াছেন, “ভাবতবর্ষের ইতিহাসের দারায় পুরাতনের অনেক প্রাণহীন বালুকারাশি বাঁধ বাঁদিয়া তাহার শ্রোত বন্ধ করিয়াছিল। বিশ্বের ছোয়াবড়াটা আর তাহাতে শেলিতেছিল না। এ-যুগে যে সে-সকল বাঁধ ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাহার কারণ।..... পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে আনিবার জন্ত রামমোহন রায়ের মত কেহই লড়ে নাই; আবার হিন্দু সভ্যতার সার ধন যে তাহার ব্রহ্ম জ্ঞান—সর্ব শাস্ত্র মন্বন করিয়া তাহা দেখাইবার জন্তও কেহই অমনতর পরিশ্রম করে নাই।” দেবেন্দ্রনাথের জীবনের চেষ্টা রামমোহনের মত এত বহুবিষয়িণী ছিল না বটে; কিন্তু যে-যে বিষয়ে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, সকলগুলিতেই তাঁহার স্বাদেশিকতা পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইতে আজ পর্য্যন্ত কোথাও বা স্বাদেশিকতার প্রকৃত আদর, কোথাও বা উহার হুজুক চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রকৃত স্বাদেশিকতার প্রয়োজন খুবই রহিয়াছে। এই খাঁটি স্বাদেশিকতাটি কি, এবং কি সূত্রে কেমন করিয়া উহা বাংলাদেশে আসিয়াছে, তাহা জ্ঞানিতে হইলে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত এবং দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত পড়িতে হইবে।

এই খাঁটি-স্বাদেশিকতা জানে, যে, “দেশকালের মধ্যেই দেশকালাতীতের প্রকাশ আছে।” এই স্বাদেশিকতার সঙ্গে সার্বজনীনতার কোনো বিরোধ নাই। রামমোহন মত দেবেন্দ্রনাথ—

“সাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক হইয়াও জাতীয় ভাব ত্যাগ করেন মাই। তাঁহার সমাজকে তিনি হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। তিনি

বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, ‘স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বস্বজাতিকে এবং সর্বস্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যকপে পাওয়া যায়’, ‘আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চ’হিতে বাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।”

নবযুগের প্রবর্তক রামমোহনের ভিতর হইতে যে যুগভাবটি ফুটিয়া উঠে, অজিতবাবু তাহার দুটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়টি এই :—

“জাতীয় ভাবে সার্বজনীন বা সার্বজনীনভাবে জাতীয় হইতে হইবে। ধর্ম যেমন দেশকালের অতীত, তেমনি দেশকালের ভিতর দিয়া ইতিহাসের ভিতর দিয়াই তাহার প্রকাশ। ধর্ম স্বরূপতঃ সার্বভৌমিক, কিন্তু ইতিহাসের মধ্য দিয়া তাহার বিশেষ প্রকাশ বলিয়া ধর্ম ক্রমাগতই নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আপননার সার্বভৌমিক স্বরূপটিকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্মের ভিতরে যেমন এই চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, সমাজের ভিতরেও তেমনি এই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ ধর্মে ও সমাজে অবিস্ফোষ্য যোগ। দেশকালের সঙ্গে সঘর্ষবিচ্ছিন্ন সার্বজনীন ধর্ম বা সমাজ আকাশকুহুম মাত্র; আবার যে ধর্মে বা সমাজে সার্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহাও সংকীর্ণ ও প্রাণহীন।”

ধর্মে দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা বুলিতে হইলে এই কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে।

“তাঁহার জীবনের ইতিহাস, বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে, ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয় ভাবে সার্বজনীন এবং সার্বজনীনভাবে জাতীয় হওয়ার আদর্শকে সমাজে অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার নানা-বিধ কর্মচেষ্টার ইতিহাস।”

দেবেন্দ্রনাথের স্বাভািতিকতার একটি পরিচয় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপনে পাওয়া যায়।

“ডিরোজিওর প্রভাবে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুসমাজকে ভাঙিবার জন্ত যে তুমুল ঝামেলালের সূত্রপাত হইল, যে ভয়ঙ্কর স্বজাতিবিশেষ তাহাদের মনকে অধিকার করিল, তাহার ফলে ধলে ধলে শিক্ষিত যুবকেরা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বালক উমেশ সরকারকে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত মিশনরীর আশ্রয় দেওয়ার, তাহার পিতা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আনিবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করে; কিন্তু ডাক্তার সাহেব তাহাদিগকে কোনো মতে ছাড়িলেন না। এই ঘটনার দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার যুগ্মগণ খৃষ্টান ধর্মের এই বিপ্লবের স্রোতকে বাঁধ দিবার জন্ত উদ্রিত পড়িয়া লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়া কলিকাতার ধনীদেব সাহায্যে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামে এক স্কুল স্থাপন করেন। হিন্দুবালাকর বাহাতে খৃষ্টানদের স্কুলে পড়িয়া তাহাদের শিক্ষার সমাজচ্যে না হয়, সেইজন্ত এই উদ্যোগ।” কেননা, “রামমোহন রায়ের মত তিনি বিশ্বাস করিতেন যে-সমাজের অভিব্যক্তির মধ্যে যে সকল রীতিনীতি, আচার ব্যবহার বহুকাল হইতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে চিহ্নগত রূপ ধরা পড়িয়াছে। যদি কোন সামাজিক রীতিনীতিকে সংস্কার করিতে হয়, তবে জাতীয় সেই চিহ্নটিকে আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া পরে তাহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সংস্কার করিতে হইবে—এক কথায়, জাতীয় ভাবে সংস্কার করিতে হইবে।”

“রামমোহনের মত দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করিতেন যে, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের ধারার মধ্যে একালের প্রয়োজন অনুসারে দেখা দিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজেরই একটি স্বাভাবিক বিপরীতীয় বিকাশ। তিনি বলিতেছেন, ‘আমরা কিছু নূতন ধর্ম প্রচার করিতেছি না।.....চিরকাল হইতে যে ধর্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম।’ অবশ্য এদেশের ইতিহাসের ধারায় যে ধর্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহারি কথা এখানে তিনি বলিতেছেন। হিন্দুসমাজের পরে তাঁহার একটি গভীর আশঙ্কা ছিল বলিয়াই কোন অস্ত্রায় আচার বা কুপ্রথা, কোন ব্রাহ্মধর্মবিশ্বাস যে চিরকাল হিন্দুজাতির নিত্য লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে, একথা তিনি প্রাণপণে সমস্ত অস্ত্রের সহিত অস্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার সমাজসংস্কারের আদর্শ ছিল—‘হিন্দুপ্রথা হিন্দুরীতি ব্রাহ্মধর্ম দ্বাৰা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে,’ এবং ‘হিন্দুসমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দুরীতিনীতি ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে।’”

দেবেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কোন পবিত্রত্বের চেষ্টা করেন নাই; এ-বিষয়ে রামমোহনের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের প্রভেদ ছিল। কিন্তু আর-সমস্ত বিষয়ে তিনি স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-খ্যায়ক বলিতেছেন :—

দেবেন্দ্রনাথ স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্মদাতা, একথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। ভাষা, পোশাকপরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার সকল বিষয়েই তিনি দেশী প্রথার অনুগামী। এই জন্যই দেশীয় সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, অমুঠান, ধর্মোচরণ সমস্তকেই তিনি নবজীবন দান করিয়াছেন। কোন সাহেবের সঙ্গে পারতপক্ষে তিনি দেখাসাক্ষাৎ করিতে চাহিতেন না। রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন, “সিন্ধু সেরী কার্পেন্টার যখন কলিকাতায় আসেন তখন দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে অভিলাষের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার সমিতির নিকটস্থ কুঠিরা উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্রবাবু, স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু ভারতবর্ষ স্বাধীন বিষয়ে তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতামুদান করিয়া চলিলে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজ-বিশ্বের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য আপবে ব্যগ্র নহেন। কৃষ্ণনগর কলেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপাল লব (Lobb) সাহেব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, “The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans.” দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজের তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন তিনি মহারাজা K. C. S. I. হইতেন। তিনি কোন উপাধি চান না।”

স্বজাতির সম্মান মহর্ষি সর্বদা চাহিতেন। অজিত বাবুর পুস্তকে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের লিখিত আখ্যানমালায় ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

“লড” রিপন আমাদের আগসে গিয়া আমার সহিত কথা কহিয়াছেন ও আমার প্রশংসা হইয়াছে শুনিয়া মহর্ষির কত আনন্দ। তিনি বলিলেন, যথিষ্ঠে তোমার মনোবিকৃত সিদ্ধান্ত-সকল তোমার নামে মুদ্রিত হয় নাই, তাহার প্রতিকারের জন্য কেন আন্দোলন করিতেছ না। আমি বিনীতভাবে অবনত মস্তকে উত্তর দিলাম, এক ভগবানেরই

সকল সত্য; সম্মানপ্রার্থী হইলে শাস্তির আশা ছাড়িতে হয় এবং ভবিষ্যতে সত্যানন্দ ছাড়িয়া মন সর্বদা সম্মানের জন্য লাঞ্চারিত হইয়া অযোগ্যতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। (বলিয়াই তখনই বৃষ্টিতে পারিলাম মহর্ষির কাছে এইরূপ কথা কহা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই)। শুনিয়া মহর্ষি কহিলেন, তুমি কালীমোহন মনে করিয়া আমি বলি নাই। আমাদের জাতির সম্মানের প্রতি কেন চাহিবে না।”

কুমারী কলেট তাঁহার লিখিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে বলিয়াছেন,

Rammohun stands in history as the living bridge over which India marches from her unmeasured past to her incalculable future, “ইতিহাসে রামমোহন সেই জীবন্ত সেতুর মত যাহার সাহায্যে ভারতবর্ষ তাঁহার অমিত অতীত হইতে তাঁহার অপরিমেয় ভবিষ্যতের দিকে বাজা করিতেছেন।” “He was the arch which spanned the gulf that yawned between ancient caste and modern humanity,” তিনি সেই খিলান যাহার দ্বারা প্রাচীন জাতিভেদ ও আধুনিক বিশ্বমানবের মধ্যস্থ গভীর বারিরাশি লম্বিত হইয়াছে।”

অজিতবাবু দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই-প্রকারের কথা বলিয়াছেন :—

“দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বের সঙ্গে বেশ বড় রকমেরই কারবার করিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিমের দুই সভ্যতার ভিতর দিবা বিহমানবের সাধনার যে দুই ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তাহার সন্ধিস্থানটি তিনি নিজের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্বসমুদ্র ও পশ্চিমসমুদ্রের মাঝখানে ময়ূরালয় ব্যবধান যেমন দুয়েলখালের উদ্ভাবনিত দূর করিয়া দিয়াছেন এবং যাতায়াতের পথকে সহজ করিয়াছেন, তেমনি এখানে বাংলাদেশে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ভিন্ন (অবশ্য জীবিত মহাত্মাপণ বাদে) বোধ হয় আর কারো নাম করা যায় না, পূর্ব ও পশ্চিমের সাধনা-সমুদ্রের পরস্পরের ব্যবধান বাঁহাদের দ্বারা দূর হইয়াছে। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ শুধু কারবার করিয়াছেন বলিলে তাহাকে ছোট করা হয়। তিনি এ যুগের সন্ধিস্থানটি বাহির করিয়াছেন এবং আমাদের জন্য সেখানে এক নূতন প্রতিষ্ঠাভূমি তৈরি করিয়াছেন।”

তাঁহার স্বাধীনতা ও স্বাদেশিকতা স্পষ্টতর করিবার জন্য অজিতবাবুর গ্রন্থখানি হইতে আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু আমি, তাঁহার “শ্রদ্ধা-বাসরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কবিজগদগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন,” অতঃপর শুধু তাহাই গ্রন্থখানি হইতে তুলিয়া দিয়া নিবৃত্ত হইতেছি।

“এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরাজী শিক্ষার উদ্ভবের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহু বয়ে কৈশোরের উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাঁহার প্রাচীন ঐশ্বর্যভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিশ্বযুদ্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ-গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মম্বাণপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মম্বাণ লাভ করিয়া দিয়া.....আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, ...অন্য আমরা তাহাই অরণ্য করিব।”

যে পুঁথিখানি হইতে ইহা উদ্ধৃত করা হইল, তাহা অতি জীর্ণবয়স্ক। আমার হস্তগত হইয়াছে। পুঁথিখানি হস্তলিখিত এবং বহু পুরাতন। ইহার শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—১৭৬২ সন্থতের ফাল্গুনমাসে ইহা আর-একখানি পুঁথি হইতে নকল করা হইয়াছিল। সে পুঁথিখানি নাকি বয়স নাভাজী বহুস্তে লিখিয়াছিলেন, বয়সের মর্যাদা যদি কিছু থাকে, তবে ইহার কথাও একেবারে উপেক্ষা করিবার নহে; বেস্টটেক্স-প্রেস-বধে হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত ভক্তমালা গ্রন্থে আছে,—

“এবমেকদিনে দিল্লীখরো মেচ্ছঃ বয়ঃ প্রভুঃ।

শ্রদ্ধা মীরাযশো জ্যেষ্ঠু তেন দৈন্তেন সংগতঃ।”

বুন্দাবনে আসিয়া মীরাবাই পৌনঃপুন্যে সঙ্গ সাংসার করিবার বাসনা করিলেন। এ সম্বন্ধে পুরোহিত প্রাচীন পুঁথিতে আছে,—

“বুন্দাবন আই ঐগে সাইজীসে বিলিমিলি।

তিয়া মুখ দেখিবে কো পণ নৈ ছুটায়ো হৈ।”

পৌনঃপুন্যের নাম এখানে স্পষ্ট জানা গেল না। কিন্তু সংস্কৃত ভক্তমালা আছে,—

“একদা সা গতা মীরা বুন্দাবনমমুস্তমম।

জীবগোষামিবৃদ্ধান্তমু শুভ্রাব জনবন্তুঃ।

আবালব্রহ্মচর্যেণ জীমুখং নৈব পশ্চতি।

ইতি স্মৃতিষা বর্ষো মীরা তমু জ্যেষ্ঠু ভক্তসন্তমম।”

ইহা ব্যতীত যাবতীয় হিন্দী ভক্তমালা জীব গোষামীর নামই দেখিতে পাওয়া যায়। রূপগোষামীর কোথাও উল্লেখ নাই।

মীরাবাইএর জন্মস্থান মেরতা গ্রাম বলিয়া ভক্তমালা উল্লেখ আছে। কিন্তু মেরতাকে ঠিক গ্রাম বলা চলে না। উহা বোধপূরের অন্তর্গত একটি পরগণা। ঐ স্থানের নামানুযায়ী এতদঞ্চলের রাঠোরগণকে “মেরতিয়া-রাঠোর” বলা হইয়া থাকে। কুড়কী ঐ মেরতার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রামটি মীরার মাতামহ দুদাজী তাহার আমাতা রতন সিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই কুড়কী গ্রামেই মীরাবাইএর জন্ম।

অধুনা বহুভাব্য প্রচলিত বহুবিধ ভক্তমালের মধ্যে কোনটির কতখানি বিশ্বাসযোগ্য এবং কোনটিই বা নহে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে যে গ্রন্থ যত প্রাচীন, তাহার কথা বোধ হয় তত অধিক বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ভক্তমালের অনুযায়ী সম্রাট আকবরের সহিত মীরার যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং মীরা যে সাধু তুলসীদাসের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ইহাদের পত্র দুইখানির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু, ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব দন্দেহ নাই।

ফলতঃ, ভক্তমালের মুখ্যতা স্বীকার করিতে গেলে পুরোহিত অংশগুলি আমার পক্ষ সমর্থন করিবে; কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গেলে উহা বিপক্ষে দাঁড়াইবে। এ এক বিষম সমস্যা।

শ্রীযাদিনীকান্ত সোম।

পুস্তকপরিচয়

কর্মযোগের টীকা—ঐশ্বরব্রহ্মনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক চেম্বার্স লিমিটেড, ২৫১ বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৯০ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট বাঁধ। মূল্য এক টাকা।

ছোটগল্পের বই। নিম্নলিখিত বারোটি গল্প এই বই-এ সংগৃহীত হইয়াছে—(১) কর্মযোগের টীকা, (২) দীক্ষা, (৩) গোলাপজাম, (৪) পিয়ারী, (৫) আত্মহত্যা, (৬) আনন্দ-পর্যটন, (৭) ডিটেক-

টিভের জীলাভ, (৮) মুক্তিলাভ, (৯) পূজার আসর, (১০) মন্দার স্বয়ম্বর, (১১) দীর্ঘনিদ্রা, (১২) আনন্দলাড়ু।

বাইরা বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা তাহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রাবাবু একজন প্রধান। বাইরা বাংলা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন তাহারা জানেন এই লেখকের গল্পগুলি কেমন উপাদেয়। ইনি লেখেন কম এবং যে কাগজে লিখিতেন তাহার প্রচার অনিয়মিত ও প্রসার অল্প হইয়া পড়তে আজ-কালকার পাঠকেরা এমন একজন গুণ্ডা শিল্পীকে ভুলিতে বসিয়াছিল। সম্রাট ইহার “ছোট-ছোট গল্প” ও “কর্মযোগের টীকা” নামে দুখানি গল্পসংগ্রহের পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে বাঙালী পাঠকপাঠিকারা উপকৃত হইলেন।

সুরেন্দ্রাবাবুর রচনা একেবারে তাহার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ধরণের। চোস্ত ভাষা, কাটা-কাটা প্রায়-ক্রিয়াপদবীন বাক্যপরম্পরা কারণ-কার্যপ্রণালীতে লক্ষ্যকের সিলজিজ-মের মতো সিদ্ধান্ত করিতে-কবিত্তে গল্পকে শেষেব নিকে তেলিয়া লইয়া চলে; প্রতি বাক্য স্নেহে বিদ্ধ, ব্যঙ্গ বিজ্ঞপ হাস্যরস করণরসের মধ্যেও অশ্রুবিদ্ধ হইয়া থাকিয়া করণ-রসকে করণতর করিয়া তোলে। এই গুণ্ডা শিল্পীর রচনার ভঙ্গী যেন সার্কাসের গুণ্ডার মতন; নিজের গুণ্ডারী কৃতিত্ব সে রঙ্গের আবরণে ঢাকিয়া প্রকাশ করে, অনেক সময় মনে হয় শেষ সামলাইতে পাবিল না বোধহয়, কিন্তু অন্যথাবণ দক্ষতা আছে বলিয়াই বিপদ রচনা করিয়া বিপদ হইতে উত্তরণ হইতে পারিবার আনন্দকৌতুক সে দর্শকদ্বিগকে প্রচুরপরিমাণে দিতে পাবে। নমুনাধরূপ আনন্দপর্যটন গল্পটি ধরা বাইতে পারে; আগাগোড়া সেটি একটি পর্যটনের বর্ণনা, পাঠক গল্প না পাইয়া হতাশ হইয়া যখন শেষ লাইন পড়িতে বাইবে অমনি একটি-লাইনে সেটি গল্পের সূত্রী ধরিয়া তাহাকে মুক্ত চমৎকৃত করিয়া দিবে। এমনি কারুকার্য তাহার সমস্ত গল্পেই বিদ্যমান।

ফোঁয়ারা—ঈললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য এণ্ড সন। মূল্য এক টাকা।

রসিক ললিতাবাবুর রঙ্গরসাত্মক কতকগুলি রচনা কোম্পারারূপে বঙ্গসাহিত্যে উৎসাহিত হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে অনেক পরিমাণে রসাল করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী মাঝেই জানেন। সেই সর্গজনসমাদৃত বইখানি বঙ্গসাহিত্যতুল্য দ্বিতীয় সংস্করণ লাভ করিয়া বিজ্ঞ হইয়া অভিনব স্বেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নকল চামড়ায় তলতলে বাঁধা, গোল কোণ, সোনালি নাম, পরিষ্কার ছাপা বইখানিকে মনোহরণ বেশে সাঙাইয়াছে, ভিতরের রঙ্গরচনার আধারটি তাহাব উপযুক্ত মানানসই আনন্দপ্রদ হইয়াছে। এই সংস্করণে অনেক পরিবর্তন পরিবর্তন ও পবিবর্তনও হইয়াছে; কতকগুলি টিপ্সনীও নূতন সংযোগ করা হইয়াছে। যে বইএর দ্বিতীয় সংস্করণ দরকার হইয়াছে তাহা যে পাঠকপাঠিকাব সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

কাব্যসুখা—ঈললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য এণ্ড সন। ১৪২ পৃষ্ঠা; রেশমী কাপড়ে বাঁধা। নাম এক টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রহ্লাবলীতে বর্ণিত গার্হস্থ্য-সম্পর্ক কোন বইএ কিরণ-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহাই দেখানো এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে এই তিনটি সম্পর্ক আলোচিত হইয়াছে—(১) ননদ-ভাঙ্গ (২) বোনে-বোনে (৩) বাসুড়ী-বোঁ। পরিশিষ্টে “একান্নবস্ত্রী পরিবার”-এর দোষগুণ বিচার করা হইয়াছে। ঐ-সমস্ত সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এবং ইংরেজী সাহিত্যে ঐ শ্রেণীর চিত্র থাকিলে তাহার

সহিতও তুলনায় সমালোচনা করিয়া হৃদয় আদর্শ-হইতে বহুমুখের
কল্পনার স্বেচ্ছা ও মৌলিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের
উদ্দেশ্য লেখক ভূমিকায় সবিস্তাবে লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইগুলি
প্রধান—(১) নায়কনায়িকার প্রণয় ছাড়াও পারিপার্শ্বিক অপর সম্পর্কের
মাধ্যমের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ, (২) স্বভাব-বিরোধী দুই সম্পর্কের
মধ্যে ইংরেজী-বিশ লেখকেরা কেমন প্রীতি ও সখ্যের চিত্র অঙ্কিত
করিয়াছেন, এবং (৩) সেইসমস্ত চিত্র বাহাতে আমাদের অন্তঃপুরিকাদের
হৃদয়ে গভীরভাবে সুদ্রিত হইয়া ঐ আদর্শ পারিবারিক জীবন গঠন
করিতে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দাও। এই পুস্তকখানি পড়িলে
বহুমুখের বহুপুস্তকে বর্ণিত যেসব পারিপার্শ্বিক চরিত্রের মাধ্যম
নায়কনায়িকার অর্থ-হৃৎকের আন্দোলনে চোখে পড়ে না তাহা স্পষ্ট
হইয়া উঠে এবং বইগুলিকে ভালো করিয়া বুঝিবার সুবিধা হয়। এই
বইখানি বিশেষ করিয়া 'অন্তঃপুরিকাদের পাঠের যোগ্য হইয়াছে';
বহুমুখের ছাড়া আর কোন কোন লেখক লেখিকার কোন কোন
রচনায় এরূপ আদর্শ সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছে পরিশিষ্টে তাহারও
পরিচয় দেওয়াতে কোন কোন বই পড়িলে পারিবারিক আদর্শ গঠনের
সাধা হইতে পারে তাহা জানিবার সুযোগ তাঁহারা পাইবেন। আশা
করি এই সুলিখিত ও সুদৃশ্য বইখানি গৃহলক্ষ্মীদের নিকট সমাদৃত
হইবে এবং সমালোচনা বিষয়ের একখানি উৎকৃষ্ট বই বলিয়া সাধারণ
সাহিত্যিকদিগেরও সমাদর লাভ করিবে। মুদ্রারাকস।

প্রবাসী-পুরস্কার

এ বৎসর দুটি প্রবন্ধের জন্ত 'নৃত্যগোপাল-
প্রবাসী-পুরস্কার' নামে দুইটি পুরস্কার দিবার
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ ১০০
টাকা পরিমিত। বিষয় দুইটি নীচে দেওয়া হইল।

(১) অল্প মূলধনে আমাদের দেশের বিশেষ
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কোন কোন জিনিসের
কারখানা সহজে স্থাপিত হইতে পারে, কি উপায়ে
উহা পরিচালিত হইতে পারে এবং উহার সাফল্য
সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার প্রমাণ কি। এবং ঐ
কারখানা পরিচালনের উপযোগী লোকের নাম ও
তাহাদের শিক্ষার পরিচয় যদি জানা থাকে তাহাও
নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) প্রীতিশিক্ষার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ
কি, বিশেষ ভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি কি
পরিমাণে প্রীতিশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে; হিন্দু
বালিকাদের উপযোগী শিক্ষা কি এবং কি সহজ ও
অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য সম্ভবপর উপায়ে দেশ-মধ্যে
প্রীতিশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে এবং এজন্ত দেশের
লোকের কর্তব্য কি?

প্রত্যেকটিতে, গভর্ণমেণ্টকে কি করিতে হইবে এবং
দেশবাসীদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিতে
হইবে, এবং অত্যন্ত দেশের গভর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীবর্গ
তত্ত্ববশেষের শিল্প ও শ্রীশিক্ষার উন্নতির জন্ত কি কি
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন আশ্রয়মত তাহার উল্লেখ ও
বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন কোন গ্রন্থাদি হইতে এই-সব
বৃত্তান্ত গৃহীত হইল তাহার নাম ও পত্রাঙ্ক দিতে হইবে।
ইংরেজি কিছু উদ্ধৃত করিলে তাহার বাংলা অমুবাদ দিতে
হইবে।

পুরস্কারের জন্ত আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩২৪)
তারিখের মধ্যে রেজেষ্টারী ডাকে প্রবাসী-সম্পাদকের নামে
প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের উপর "প্রবাসী-পুরস্কারের
জন্ত" লিখিয়া দিতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি এবং
পুরস্কার-প্রতিযোগী প্রবন্ধের মধ্যে যে চারিটি প্রবন্ধ
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহা প্রবাসীতে
প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুস্তিকা-কারে
রা যে-ভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের
থাকিবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ যিনি ফেরৎ চান তিনি
পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী দুই আনা সমেত
ডাকমাশুল পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গেই লেখকের নাম
ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কাগজের এক
পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। একটিও প্রবন্ধ
উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহ পুরস্কার পাইবেন না বা
কোনটিই প্রকাশিত হইবে না।

ইচ্ছা করিলে একজন দুই বিষয়েরই প্রবন্ধ পাঠাইতে
পাবেন। একাদিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুরস্কার
ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমাদের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ, বিচারফল প্রকাশের
পূর্বে অথবা আমাদের নির্বাচনের পর আমাদের নির্বাচিত
ও পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনা লেখক বা অপর কেহ
আমাদের কিনা অহুমতিতে অন্ত্র প্রকাশ করিতে
পারিবেন না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

পুনশ্চ—বর্তমান বৎসরের "নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-
পুরস্কারের" ফল আগামী চৈত্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ
করা যাইবে; ও কোনো রচনা পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত
হইলে আগামী ১৩২৪ সালে প্রবাসীতে ছাপা হইবে।

প্রবাসীর সম্পাদক।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১৬শ ভাগ

২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২৩

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সার্বজনিক কাজে চরিত্রবান লোক চাই।

অনেক লোক আছে যাহারা কথায় সাধু-চরিত্রের প্রয়োজন স্বীকার করে, কিন্তু কাজে তাহা স্বীকার করে না। তাহারা নিজের আচরণেও সাধু নয়, এবং সামাজিক ভাবে বা সার্বজনিক কাজে যাহাদের সঙ্গে মিশে, তাহাদের চরিত্রের বিচার করে না, সাধু অসাধু সকলকেই সাহচর্যের ও সহযোগিতার সমান যোগ্য মনে করে। অনেক লোক এরকমও আছে, যাহারা চরিত্রের আবশ্যকতা কথায় কিংবা কাজে, কোন রকমেই, স্বীকার করে না। আর এক রকমের লোক আছেন, যাহারা নিজে সং, ব্যক্তিগত আচরণে সাধু-চরিত্রকে আবশ্যক ও মূল্যবান মনে করেন, কিন্তু সামাজিক জীবনে ও সার্বজনিক কাজে মুড়ি মিশরির এক দর করেন, সংলোক ও দুর্বৃত্তলোককে তুল্যমূল্য মনে করেন। এরূপ সচরিত্র লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে সামাজিক জীবনে দুঃচরিত্র লোকদের সঙ্গে মিশিতে সন্মত বোধ করেন, কিন্তু সার্বজনিক কাজে অতি ঘৃণিত চরিত্রের লোকদের সঙ্গেও কাজ করিতে ও তাহাদিগকে সভাসমিতিতে উচ্চস্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

বাস্তবিক কিন্তু চরিত্র জিনিষটি যেমন একক সম্যাসীর চাই, তেমনি পরিবারে গৃহীর চাই, সমাজে সামাজিক মাহুষের চাই, এবং সার্বজনিক কাজে সভাসমিতির প্রত্যেক

সভ্যের, কর্মীর ও নেতার চাই। সম্পূর্ণ নিখুঁত মাহুষ পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু যে দেনাপাওনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চক নয়, মিথ্যাবাদী নয়, যাহার কথার উপর নির্ভর করা যায়, যে নিজের স্বার্থেব জ্ঞাত বা ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেশের মঙ্গলকে বলি দিবে না, যে মাতাল নহে বা অস্ত্র প্রকারের নেশাখোর নহে, এবং নারীজাতির প্রতি যাহার ব্যবহার কলুষশূন্য, এমন মাহুষের অভাব নাই। সার্বজনিক কাজের কর্মী ও নেতা এইরূপ হওয়া চাই।

দেশের মঙ্গল কথাটির মানে ভাল করিয়া বুঝিলেই ইহাও বুঝা যাইবে যে সার্বজনিক কাজে চরিত্রের প্রয়োজন। যদি কোন দেশ অস্ত্র দেশেব অধীন না হয়, তাহা হইলেই কি সেই দেশের যতটা সুখ সম্পদ উন্নতি কল্যাণ হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে মনে করিতে হইবে? তাহা নয়। দেশের কাজ করিবার ভার যে রাজা বা দেশনায়ক, মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীদের উপর থাকে, তাহারা যদি চরিত্রহীন ও স্বার্থপর হয়, তাহা হইলে রাজ্যের টাকার অসং ব্যবহার হইবে, অবিচার হইবে, দেশের নারী ও পুরুষদের উপর অত্যাচার হইবে।

উন্নত দেশ বলিলে আমরা এই বুঝি, যে, সে দেশের লোকেরা নিজেই দেশের সব কাজ চালায় ও দেশ রক্ষা করে, সে দেশের সমাজে, পারিবারিক জীবনে, ও ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্র-চরিত্রের প্রতি লোকের খুব দৃষ্টি আছে, এবং তথায় জ্ঞান ও ধর্মের, এবং সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতির

উন্নতি হইতেছে। পরাধীন দেশের উদ্ধার বা উন্নতি-সাধন মানে তাহাকে উন্নত দেশের মত করা। কিন্তু যাহারা দেশকে উন্নত করিবে তাহারা নিজে স্বার্থত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু, সত্যানিষ্ঠ ও ঞ্চয়নিষ্ঠ, এবং পবিত্রচরিত্র না হইলে কেমন কবিয়া তাহা বা দেশকে উন্নত করিবে? যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে কেমন করিয়া অপরকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দিবে? “ইজ্রিয়েল দাস যেবা বারমাস, স্বদেশ উদ্ধার তার কার্য্য নয়।”

কেহ বলিতে পারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন করিব, তাহাতে আবার চরিত্র লইয়া কি হইবে? কিন্তু কঁাকা বক্তৃতায় যে কাছ হয় না, তাহা ত সকলেই বহু বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন। যে-টুকু কাছ হইয়াছে, তাহা কঁাকা বক্তৃতায় হয় নাই; বক্তৃতা ও কাগজে-লেখার পশ্চাতে যতটুকু ভাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহস,—এককথায় চরিত্র, আছে, তাহাতেই কাছ হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে হোমরুল বা স্বরাজ লাভের জন্য প্যার্নেলের দ্বারা অতি স্থূণ্ডল, স্থসংবদ্ধ প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল। টাইমসের মত ধনী ও প্রভাবশালী সংবাদপত্র জাল চিঠির সাহায্যে তাঁহাকে পিষিয়া ফেলিবার চক্রান্ত করিয়াও কিছু করিতে পাবে নাই। কিন্তু যাই প্যার্নেলের চরিত্রহীনতা প্রমাণ হইয়া গেল, অমনি তাঁহার সমুদয় প্রভাব লুপ্ত হইয়া গেল, এবং, তখনকার মত, আইরিশদের স্বরাজলাভ-চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশ্য, জাতীয় অধিকারলাভ-চেষ্টা রক্তবীজের মত, মরিয়াও মরে না। তাই আইরিশদের চেষ্টা আবার প্রবল হইয়াছে এবং সফলও হইবে। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে সার্ চার্লস ডিক্, একজন অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও প্রভাবশালী সভ্য ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্রহীনতা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় সমুদয় প্রভাব লুপ্ত হইয়া যায়। পবে একটু কার্য্যকারিতা আবার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি আর পূর্বপ্রভাব লাভ করিতে পারেন নাই।

ইতিহাস ঘাঁটিয়া অসচ্চরিত্র ক্ষমতাসালী রাজনীতিবেত্তা ও কর্ম্মীর নাম খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে; কিন্তু আমরা রাজনৈতিক অধিকার, ধন, প্রভৃতিকেই ত পরমার্থ মনে করি না; এ-সব কল্যাণের উপায় মাত্র। রাজনৈতিক

অধিকার বা ধনের জন্তই ত আমরা রাজনৈতিক অধিকার ও ধন চাই না। চাই এইজন্য যে আমরা তাহা হইলে নিজেদের ও অপরের পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকশিত করিতে পারিব, দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি করিতে পারিব, এবং সকল বিষয়ে মানুষ্যমানুষের যোগ্য হইতে পারিব। কিন্তু চরিত্রহীন লোকদের দ্বারা দেশের অবস্থার এই আদর্শ অনুধাবী পরিবর্তন হইতে পারে না।

পৃথিবীতে, সকল দেশে না ইউক, অনেক দেশে সমাজে নারীদের যে স্থান ছিল, এখন তাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দেশের মঙ্গল বলিলে এখন কেবল পুরুষদের স্বথ, স্ববিধা, যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার ক্ষমতা, বুঝায় না। নারীদের মঙ্গল, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, যেরূপ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধান হইয়াছে, তাহা প্রার্থনীয় নহে। আগে যে দেশে যে নেতার চরিত্র যেরূপই থাক্ ন কেন, এখন আর এরূপ কেহ ক্ষমতা-লাভের যোগ্য বলিয় বিবেচিত হইতে পারে না, যাহার নারীজাতির প্রতি ব্যবহার নিন্দনীয় ও ঘৃণিত। তাহার অনেক কারণ আছে। তাহার মধ্যে একটা কারণ এই যে, এরূপ লোকদের দ্বারা সমাজের অর্দ্ধ অংশ নারীদের সম্মান রক্ষিত হইতে পারে না, এবং তাঁহাদের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। জননী নারীদের মঙ্গল না হইলে শিশুদের, বালকবালিকাদের, মঙ্গলও হইতে পারে না।

রঘুবংশের আদর্শ রাজা দিলীপ, আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের যেমন বর্ণনা আছে, তেমন শেষের দিকে রঘুকুলকলঙ্ক অগ্নিবর্ণ নৃপতির বর্ণনাও আছে। দেশের কর্ম্মীরা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন না বটে, কিন্তু তাঁহারাও লোকপালক ও লোকসেবক বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র দিলীপ ও রামচন্দ্রের আদর্শে গঠিত হওয়া আবশ্যক, অগ্নিবর্ণের আদর্শে নহে।

ভারতবাসী কাহার প্রজা?

কখন কখন দেখা যায়, যে, কোন জেলার কাগজে লেখা হইতেছে যে অমুক ম্যাজিস্ট্রেট খুব “প্রজাবৎসল”। ইহা পড়িলেই মনে হয়, আমরা কাহার প্রজা? ম্যাজিস্ট্রেটের প্রজা ত নহি। ভাবতবর্ষের একমাত্র আইনসম্বত সম্রাট

আছেন পঞ্চম জর্জ; ভারতবাসীরা আইন অনুসারে তাঁহারই প্রজা। সুতরাং কেহ যদি প্রকারান্তরে কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে রাজা বা রাজস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার রাজপ্রোহিতা অপরাধ হয়। ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, এবং গ্রামের চৌকিদার নিম্নপদস্থ কর্মচারী; কিন্তু উভয়েই কর্মচারী মাত্র। লর্ড মলী যখন ভারতসচিব ছিলেন, তখন তিনি এক বক্তৃতায় ভারতবর্ষের লোকদিগকে “equal subjects of the King”, “ইংরেজদের সমশ্রেণীস্থ প্রজা” বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহাই আইনসম্মত কথা। আমরা ইংরেজমাত্রের বা রাজকর্মচারী-মাত্রের প্রজা নহি। এখন দেশশাসকদের মধ্যে ইংরেজ বেশী বটে, কিন্তু ইহা অস্থায়ী অবস্থা। ভারতবাসীকে ইংরেজের ঠিক সমান করা আমাদেরই চেষ্টা-সাপেক্ষ। কিন্তু এই চেষ্টা করিতে হইলে গোলামী ভাবটা ত্যাগ করা দরকার। আইনে বলিতেছে, ভারতসচিব বলিতেছেন, ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়েই সম্রাটের প্রজা, সমান প্রজা। কিন্তু আমরা যদি তাহা স্বেচ্ছা চিন্তায়, ভাবে, কল্পনায় ও কাঞ্চে ইংরেজ-মাত্রকেই বা ইংরেজ রাজভৃত্য-মাত্রকেই রাজা বলিয়া মানি, তাহা হইলে আমাদের গোলামী ঘুচান কোনও মাহুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। আগে অন্ততঃ কল্পনাতেও খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিলে তবে আচরণে মনুষ্যত্ব আসিবে।

“প্রভু”দিগকে শিক্ষা দেওয়া চাই।

ইংলণ্ডে পালেমেন্ট অনেক শত বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু একশত বৎসর পূর্বেও তথাকার সাধারণ লোকদের পালেমেন্টের সভা নির্বাচন করিবার ক্ষমতা কার্যতঃ ছিল না বলিলেও চলে; ধনী ভূস্বামীরাই অনেক স্থলে সভ্য হইতেন, এবং তাঁহাদের কথা অনুসারেই অল্প সভ্যরাও নির্বাচিত হইতেন। ১৮৩২, ১৮৫২, ১৮৫৪, ১৮৬৬, ১৮৮৪, ১৮৮৫ সালে ভোটদান বিষয়ে পালেমেন্টে যে-সকল আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তাহার ফলে ক্রমশঃ অধিক লোকে নির্বাচন করিবার অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু এখনও শ্রমজীবীরা খুব ক্ষমতামূল্য হইতে পারে নাই, এবং স্ত্রীলোকদের ভোট দিবার বা সভ্য হইবার

ক্ষমতাও নাই। যাহা হউক, ১৮৬৬ সালে নির্বাচন সংঘীয় যে আইন পাস হয়, তাহাতে অনেক নিরক্ষর বা প্রাচীন নিরক্ষর লোক ভোট দিবার অধিকার পায়। তখন রবার্ট লো (Robert Lowe, afterwards Viscount Sherbrooke) পালেমেন্টের একজন বিখ্যাত সভ্য ছিলেন। তাঁহাকে লোকে “ববি” লো ডাকনাম দিয়াছিল। ১৮৬৭ সালে এডিনবরা ফিলসফিক্যাল ইনষ্টিটিউশনে একটি বক্তৃতায় এই “ববি” লো বলেন, যে, “আমাদের ভবিষ্যৎ প্রভুদের মনে অক্ষর চিনিবার প্রবৃত্তি জন্ম দরকার;” (it was necessary “to induce our future masters to learn their letters”)। সচরাচর তাঁহার কথাগুলি, “we must educate our masters,” “আমাদের প্রভুদিগকে আমাদের শিক্ষা দিতে হইবে,” এই আকারে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। পালেমেন্টের সভ্যরা দেশেব আইন করেন, ট্যাক্স বসান, দেশের কাজের ব্যয় নির্ধারণের জন্ত টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করেন ভোটদাতারা। এই জন্ত নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোকদিগকে রবার্ট লো “আমাদের প্রভু” বলিয়াছিলেন।

আইন অনুসারে প্রভু না হইলেও, কার্যতঃ ইংবেত জাতি আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। কোন মাহুষ বা কোন জাতি অপর একজন মাহুষ বা জাতির ভাগ্যবিধাতা হইতে পারে না। বিধাতা আছেন একজন। তাহা হইলেও, তিনি মাহুষের দ্বারাই নিজের কাজ করাইয়া লন। এইজন্য মাহুষকেও ভাগ্যবিধাতা বলা হয়। এই মানবীয় ভাবে ও মানবীয় ভাষায় আমরাই প্রধানতঃ আমাদের ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু অল্প জাতিরা কি করে না করে, তাহা উপরও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এই-সব জাতির মধ্যে ইংরেজদের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক বেশী। এইজন্য তাহাদের জ্ঞানের, চিন্তার, ভাবের ও কাজের সহিত আমাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক বেশী, ববি লো (Bobby Lowe) যখন ইংরেজ নির্বাচকদিগকে অক্ষর চিনিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন, তখনকার মত ইংবেত জাতি এখন নিরক্ষর না হইবে, ভারতবর্ষ সমস্ত ইংরেজেরা ভয়ঙ্কর অজ্ঞ। খুব বড় বড়

রাজনৈতিক, বড় বড় পণ্ডিতেরও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখিলে বাস্তবিক অবাক হইতে হয়। ইংলণ্ডের লোকেরা সব সময়েই যে জানিয়া শুনিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অগ্রায় করে বা অবিচারের প্রশ্রয় দেয়, তাহা নহে। অধিকাংশ লোক হয় কিছু জানে না, নয় মিশনরীদের এবং ভারতক্ষেত্রের রাজকর্মচারী ও বণিকদের নিকট হইতে আমাদের সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত কথা শুনিয়া আমাদের সম্বন্ধে অতি হীন ধারণা মনে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসীর নীতি, ধর্ম, পরিবার ও সমাজের চিত্র জঘন্য না হইলে বিলাতের লোকেরা মিশনরীদের কাছে এদেশে ধর্ম প্রচারার্থ টাকা দেয় না। তজ্জন্য মিশনরীরা ভারতচিত্রে খুব কালী বরাবরই চালিয়া আসিয়াছেন। ভারতক্ষেত্রের ইংরেজদের অন্ন নির্ভর করে, ভারতবাসীদেরকে অবনত রাখার উপর, তাহারা অধিকাংশ নিজেদের কাজ, রোজগার, ও আমোদে ব্যস্ত থাকায় ভারত সম্বন্ধে ঠিক খবর বেশী রাখে না, এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ও আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট লোকদিগের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগও তাহাদের কমই হয়। এই-সব কারণে তাহাদের নিকট হইতেও ইংরেজরা ভারতের ঠিক অবস্থা বুঝিতে পারে না। তা ছাড়া মাছুষ যতদিন স্বপ্নে স্বচ্ছন্দে নির্দ্বিবাদে থাকিতে পায়, ততদিন আত্মস্বপ্নেই নিমগ্ন থাকে; ইচ্ছা করিয়া পরের খবর কয় জন লয়? যে নিজের কথা অপরকে শুনাইতে চায়, তাহার চেষ্টাইয়া অপরের নিজা ভঙ্গ করা ও আরামে ব্যাঘাত জন্মান দরকার।

ইংলণ্ডের অনেক নিবন্ধর এবং অল্পশিক্ষিত লোকও পালেমেন্টের সভ্য নির্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইয়া “প্রভু” হওয়ায় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার যেরূপ প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, আমাদের “প্রভু” ইংরেজ জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার সেইরূপ প্রয়োজন বরাবরই রহিয়াছে। এখন তাহাদিগকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া খুব দরকাব হইয়া পড়িয়াছে। ইহা অত্যন্ত জরুরী কাজ। দেবী করিলে চলিবে না; কেন, তাহা পরে বলিতেছি। পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, মাসিক পত্র ও সংবাদপত্র চালাইয়া, এবং আবশ্যক নানা রকমে শিক্ষা দিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, সভ্যতা, ধর্ম, নীতি, সাহিত্য, শিল্প, আচার ব্যবহার, সামাজিক

ব্যবস্থা, বাষ্ট্রনীতি, শক্তি, সকল বিষয়েই লিখিতে ও বলিতে হইবে, এবং সমস্তই সমঝাইয়া দিতে হইবে। এখানকার ও বিলাতের সবকারী ও বেসরকারী ইংরেজেরা বলিতেছেন, “এখন যুদ্ধের সময়, চেষ্টাইও না; যাহাতে তর্ক-বিতর্ক হয়, এমন কোন কথা তুলিও না।” ইহা কাজের কথা নয়। তাহারা নিজে এ নিয়ম পালন করিতেছেন না; এমন অনেক কথা বলিতেছেন ও কাজ করিতেছেন, যাহার প্রতিবাদ করা, এবং তর্ক করা একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, উপনিবেশগুলিতে এমন কথা কোন ইংরেজ বলিতেছেন না? তাহারা ত এই যুদ্ধের সময় বেশ জোর করিয়া আপনাদের দাবী জানাইতেছে, এবং যুদ্ধের পর সাম্রাজ্য কিপ্রকারে পুনর্গঠিত হওয়া চাই, সে বিষয়ে খুব আলোচনা করিতেছে। তাহাদের একটা প্রভাবশালী দল বলিতেছে, যে, যুদ্ধের পর তাহারাও সাম্রাজ্যের যুদ্ধ ও শান্তি, এবং বাণিজ্য-বিষয়ক বন্দোবস্তে ইংলণ্ডের সহিত সমানভাবে মতামত দিবার ক্ষমতা চায়, এবং ভারতবর্ষ-শাসন-কার্যেও ভাগ চায়। এগুলি কি তর্কবিতর্কের বিষয় নহে? ভারতবর্ষের লোকদিগকে উপনিবেশিকেরা তাহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না; অথচ তাহারা আমাদের মনিব হইতে চায়। বিশেষ করিয়া এইজন্মই বিলাতে আমাদের একখানা দৈনিক পরিচালন প্রয়োজন। ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের চির দাস রাখিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, সাম্রাজ্যের অংশীদার করিতে হইবে। নতুবা আমাদের দুর্গতি আরও বাড়িবে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহি লিখিলে অল্প লোকে পড়িতে পারে। মাসিক পত্র হয় ত সেইরূপ বা তার চেয়ে কিছু বেশী লোক পড়িবে। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী লোক পড়িবে যদি দৈনিক কাগজ চালান যায়। ইহা খুব ব্যয়সাধ্য বটে। কিন্তু স্বরাজ্যলাভ কি তুচ্ছ ব্যাপার যে তাহার জন্ত স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে না, লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে না? দৈনিক কাগজ চালাইবার ব্যবস্থা একান্ত না করিতে পারিলে, অন্ততঃ একখানা সাপ্তাহিক কাগজ চালাইতে হইবে। ইহা লগুন হইতে প্রকাশ করিতে হইবে। লগনে কংগ্রেসের মুখপত্র ইণ্ডিয়া আছে বটে; কিন্তু তাহা ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক

আদর্শ ও মতের কিছু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। উহাকে আরও অগ্রসর করিয়া একজন যোগ্য ভারতবাসীকে উহার সম্পাদক করিতে পারিলে তবে ঠিক হয়। কিন্তু আমাদের মতে, একটি স্বতন্ত্র দৈনিক কাগজ লগুন হইতে বাহির করিয়া ভারতবাসী যোগ্য লোকদিগকে উহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা খুব শীঘ্র করা উচিত। তদ্বিন্ন আমাদের কয়েকজন যোগ্য প্রতিনিধিকে বক্তৃতা করিবার জ্ঞাত এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজদের কাগজে ও বক্তৃতায় প্রচারিত মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করিবার জ্ঞাত আমাদের ব্যয়ে বিলাতে পাঠান ও রাখা একান্ত আবশ্যিক।

বিলাতে প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যার শিক্ষালয়।

বিলাতে একটি প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যার শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা প্রভৃতি শিখান হইবে। যে-সব ইংরেজ এদেশে রাজকার্য ও বাণিজ্য করিতে আসিবেন বা অন্তান্ত প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করিতে যাইবেন, তাঁহারা এখানে শিক্ষা পাইবেন। এজ্ঞ ভারতবর্ষকেও টাকা দিতে হইবে। স্থবিধাটা অপরে ভোগ করিবে; টাকা দিয়া পুণ্যসঞ্চয় আমরা করিতে পাইব; ইহা খুব কপালের ছোর তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শিক্ষালয়ে ভারতবর্ষীয় ভাষা-সকল শিক্ষা দিবেন ইংরেজ অধ্যাপকেরা; বাংলা শিখাইবেন মিঃ জে, ডী, এণ্ডার্সন। ইহারা অযোগ্য লোক ইহা আমরা বলিতেছি না। কেবল ইহাই বলিতেছি যে নিজের বেলায় ইংরেজ যে ব্যবস্থা করেন, অন্তের বেলায় তাহা করেন না। আমাদের দেশে যে মোটা মোটা মাহিনায় ইংরেজ অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তাহার একটা কারণ এই বলা হয় যে কতকগুলি বিষয় আছে যাহা ইংরেজরাই খুব ভাল শিখাইতে পারেন,—যথা, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাঙালীই ভাল শিখাইবে, হিন্দী হিন্দুস্থানী ভাল শিখাইবে, ইত্যাদি। সুতরাং বিলাতেব প্রাচ্য শিক্ষালয়টিতে বাংলা শিখাইবার জ্ঞাত একজন বাঙালীকেই নিযুক্ত করা উচিত।

বর্তমান বাংলা-অধ্যাপক মিঃ জে ডী এণ্ডার্সন মহা বুদ্ধ, বয়স ৮০র কাছাকাছি হইয়াছে। তিনি বেশী দিন কার্যক্ষম থাকিবেন বলিয়া বোধ হয় না। সময় থাকিতে কোন বাঙালী একবার তাঁহার পদটি পাইবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনায় একমাত্র যোগ্য বাংলা-অধ্যাপক রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন চেষ্টা করুন। এণ্ডার্সন সাহেব তাঁহাকে চিনেন, এবং তাহার সহিত রায়সাহেবের গুরু-ব্যবহাবও হয়। এইপ্রকারে রায় সাহেবের আরও অধিক অর্থাগমের পথ হইলে এবং তিনি বিলাতে গেলে, কলিকাতায় ক্রমে ক্রমে হয়ত আনন্দ দু এক জন লোক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার স্বযোগ পাইতে পাবেন। গতবারে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রোতব্য কথা বলিতে সমর্থ কাহারও কাহারও নাম কবিতা ছিলাম। সকল যোগ্য লোককে আমরা জানি না, এবং যাহাদিগকে জানি তাঁহাদের সকলের নামও সব সময়ে মনে আসে না। শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে কিছু জানি না। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের যোগ্যতার কথা আমরা স্বয়ং জানি। বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য এবং তৎপরবর্তী কালের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি পানি জানেন। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার খুব দখল আছে। তদ্বিন্ন তাঁহার আবেষ্টাব ভাষা ও ইংরেজীও জানা আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবকুমার কবিরত্নের নামও আমরা করিতে পারি। তিনি বাংলার নাড়ী নক্ষত্র ত জানেনই, অধিকন্তু ইংবেঙ্গী, ফারসী, ফরাশি, হিন্দী, সংস্কৃত পালি, প্রভৃতি জানেন, এবং তিনি স্বয়ং কবি। কিন্তু এই দুজন পণ্ডিতেরই একটা বড়-রকমের অযোগ্যতা এই আছে যে তাঁহারা কাহারও দরবার করিতে অসমর্থ।

আমাদের লিপি।

সংস্কৃত এবং ভারতবর্ষেব অন্তান্ত আর্থ্যভাষাব বর্ণমালা যে বেশ বিজ্ঞানসম্মত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লিপির একরূপ কোন কোন বিশেষত্ব আছে।

যাহাতে অক্ষরপরিচয় হইতে বিলম্ব হয়, এবং ছাপাখ কাঙ্ছে অধিক ব্যয় হয় ও সময় লাগে। তন্নিম্ন ইংরেজী অক্ষরে টাইপ-রাইটার কল যেমন সহজে হয়, বাংলায় সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। বাংলা লিপিরই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বাংলা স্ববর্ণলিপি নিজের সন্ন্যাসী চেহারা এক রকম; কিন্তু যখনই তাহা বা সামাজিক জীবের মত ব্যঙ্গনের সহিত মিলিত হয়, অমনই বেশ-পবিবর্তন ঘটে। অকারের ব্যবহার আরও বিচিত্র। তিনি একা যখন থাকেন, তখন তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু যাই কোন ব্যঙ্গনেব সহিত যুক্ত হন, অমনি অদৃশ্য হইয়া যান। অল্প বরঙলির আঁইজি পী, এইরূপ দুটি করিয়া রূপ আছে। আবার কেহ ব্যঙ্গনে আগে, কেহ পরে, কেহ বা আগে ও পরে, কেহ বা নীচে, এবং কেহ বা পাশে ও উপরে বিরাস্ত করেন। উকার গ, র, শ প্রভৃতিতে যুক্ত হইলে এবং উকার র এ যুক্ত হইলে আবাব আব-একরকম চেহারা হয়।

তাহার পব ব্যঙ্গনগুলির স্বতন্ত্র চেহারা একরকম, পরস্পরের সহিত যুক্ত চেহারা আব-একরকম। বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক বৃথ সাহের আমাদিগকে এইজন্ম একবার বলিয়াছিলেন, You have got a curious alphabet, one gentleman upon the shoulder of another! "তোমাদের বর্ণমালা বেশ মজার, একজন ভদ্রলোক আর একজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসে।"

এই-সব কারণে বাংলা একটু কিছু চাপিতে হইলে ইংরেজীর চেয়ে অনেক বেশী-রকম হরফ ঢালিতে ও রাখিতে হয়, এবং উপরে নীচে নানা "কাব," রেফ, ফলা প্রভৃতির জায়গা করিতে হয় বলিয়া লেড্ দিয়া পংক্তিগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া সাজাইয়া ছাপিতে হয়। ইংরেজীর মত ঠাসা ছাপা বাংলায় চলে না। ইহাতে প্রয়োজন না থাকিলেও অনেক বেশী কাগজ খরচ হয়।

তা ছাড়া যুক্তাক্ষর সব শেষ করিয়া চিনিতে ও লিখিতে-শিখিতে দেরী লাগে। ইহার কি কোন প্রতিকার হইতে পারে না? আমাদের মনেব মধ্যে অনেক বৎসব হইতে একটা কথা রহিয়াছে। বলিয়া ফেলি।

ব্যঙ্গনে যখন হস্ত চিহ্ন যুক্ত থাকে না, তখন তাহাতে অ যুক্ত আছে, ইহা আমবা লিখিবার, ছাপিবার ও পড়িবার

সময় মানিয়া লই। তাহা মানিয়া না লইয়া, ব্যঙ্গন মাত্রই হস্ত, এবং তাহার পব যে অক্ষর থাকিবে, তাহার সহিত উহা যুক্ত, লিখিবার, ছাপিবার, পড়িবার এই রীতি প্রচলিত করিলে স্বরেব দুই চেহারা এবং ব্যঙ্গনেরও স্বতন্ত্র ও যুক্তরূপ উঠাইয়া দিয়া কেবল বার বার ও ছত্রিশ ব্যঙ্গনের এক-একটি হরফেই বেশ কাজ চলিয়া যায়, এবং তাহাতে ছাপা ও টাইপ-রাইটারের কাজ সুসাধ্য হয়, ও অক্ষর-পরিচয়ও সহজে হয়। নীচে দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রচলিত রীতি অনুসারে লিপি।

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি স্থানের স্থান।"

প্রস্তাবিত রীতি অনুসারে লিপি।

"এই ভূউমণ্ডলদল দএখ অ কই সউখএব সথস্থান।"

প্রস্তাবিত রীতিতে কখন কখন লিখিতে জায়গা ও সময় বেশী লাগিবে, কিন্তু সব দিক্ দিয়া দেখিলে মোটের উপব সুবিধা হইবে বলিয়াই বোধ হয়। ইংরেজী লিখিতে ও ছাপিতে যত জায়গা ও সময় লাগে, প্রস্তাবিত রীতিতে তদপেক্ষা বেশী জায়গা ও সময় লাগিবে না। ইংরেজী অক্ষর বড় (capital) ও ছোট (small) ভেদে দুইরকম। বাংলায় এরূপ কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইলে বাংলা ছাপা ইংরেজী অপেক্ষাও সহজ এবং অল্পব্যয়সাধ্য হইবে। বাংলা টাইপ-রাইটার কলও ইংরেজী অপেক্ষা সস্তায় ও সহজে নির্মিত হইতে পারিবে।

ফিজি দ্বীপে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণ।

লর্ড হার্ডিং অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন যে যত শীঘ্র সম্ভব ফিজি দ্বীপে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণ বন্ধ করা হইবে। সেই প্রতিজ্ঞা পালনের আয়োজন-স্বরূপ তিনি ১৯১৫ সালে ১৫ই অক্টোবর ভারতসচিবকে যে সরকারী পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিত আছে :—

"It is firmly believed in this country and, it would appear, not without grave reason, that the women emigrants are too often living a life of immorality in which their persons are, by reason of pecuniary temptation or official pressure, at the free disposition of their fellow recruits and even of the subordinate managing staff."

এণ্ড্রুজ্ ও পিয়ার্সন সাহেব ফিজি গিয়া স্বচক্ষে সমস্ত

অবস্থা দেখিয়া যে রিপোর্ট লেখেন, তাহা আদ্যোপান্ত মডার্ন রিভিউ কাগজে বাহিষ্য হইয়াছিল। তাহাতে, কুলিরূপে প্রেরিত ভাবতীয় নারীদের দুর্গতির লর্ড হার্ডিং যে অভ্যাস দিয়াছেন, তাহা চিত্রিত হইয়াছে। প্রতি তিন চারি জন পুরুষ কুলিতে একজন নারী কুলি, এই অনুপাতে কুলি পাঠান হইয়া থাকে। এই অবস্থায়, টাকার লোভ এবং কুলিবিভাগের কর্তৃপক্ষের জুলুম, উভয় কারণে মল্ল জীলোকই সতীশ্বর রক্ষা করিতে সমর্থ হন। একরূপ অবস্থাতেও যে কোন কোন নারী অতি কষ্টে সতীশ্বর রক্ষা করিতে পাবেন, ইহা নারী-প্রকৃতির গৌরবের বিষয়।

চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণের প্রথা ও দাসত্ব-প্রথার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। উভয়েই মানুষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়, উভয়েই মানুষ পশুর মত ব্যবহৃত হয়, উভয়েই মানুষের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়। যাহারা চুক্তিবদ্ধ কুলি বা দাস খাটায় তাহারাও পশুবৎ হইয়া যায়। তাহার উপর ঘোব দুর্নীতিপূর্ণ জীবন। এই-সব কারণে ফিজিতে আত্মহত্যার সংখ্যা খুব বেশী। জীলোকের উপর পাশব অত্যাচার খুব বেশী। জীলোকসম্বন্ধীয় ঈর্ষা-বশতঃ খুনের সংখ্যাও খুব বেশী।

এই প্রথা অবিলম্বে রহিত হওয়া উচিত। লর্ড হার্ডিংএর চিঠির ভাবিত হইতে প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহাব মধ্যে নিশ্চয়ই এই নারকীয় প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। তাহা ত হয়ই নাই, অদিকন্তু শুনা যাইতেছে যে আরও পাঁচ বৎসর নাকি এই প্রথা প্রচলিত থাকিবে বলিয়া ফিজি ব ইফুর আবাদের মালিকদিগকে কথা দেওয়া হইয়াছে। অনিতেছি ভারত গভর্ণমেন্ট কথা দেন নাই। সম্ভবতঃ ভারতসচিব দিয়াছেন। এণ্ড্রুজ্ সাহেব বিশ্বস্তত্বের সংবাদ পাইয়াছেন। পাঁচ বৎসর কেন, আব একদিনও এই প্রথা থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। ফিজির চিনির কারখানাওয়ালাদের সুবিধা অসুবিধা দেখিতে, এবং পশুব অধ্যম জীবন যাপন করিবার জন্য সেখানে মানুষ পাঠাইতে আমবা বাধা নহি। ভারতবর্ষের স্বরাজ থাকিলে এই প্রথা কখনই প্রবর্তিত হইতে পারিত না, এবং হইলেও এতদিন কবে উন্মূলিত হইয়া যাইত।

মানুষ সম্রাটই হউন আর মজুবই হউন, শাদা কাল

লাল গীত যে রঙেবই হউন, সকলেরই মানুষ্যবোধ ও স্বাধীনতার মূল্য সমান। সকল নারীরই সতীশ্বের গৌরব এক; গায়ের রং, আর্থিক অবস্থা, পদমর্যাদা, কিছুই কোন প্রভেদ হইতে পারে না। লর্ড হার্ডিংএর চিঠিতে স্বীকৃত হইয়াছে যে ফিজিতে প্রেরিত অধিকাংশ নারী-জীলোক বেস্তাবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়। কোন দেশের মত যেথা জোগান ভাবতগবর্ণমেন্টের কাজ নহে, এবং ভাবত-গবর্ণমেন্ট এই ঘৃণিত কাজ করিতেছেনও না। ফিজি ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ কুলিপ্রেরণ-প্রথা যখন পরোক্ষভাবে বেস্তা জোগানরই সমান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তখন ইহা নিমূল করিতে আব একদিনও দেরি করা উচিত নয়। ইংরেজ নারীর এইরূপ দুর্গতি হইলে, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট কখনও এত বিলম্ব করিতেন না; ইংরেজ জাতিও অসুস্থ ও নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। বাস্তবিক আঘাদের নারীদের এই দুর্গতির জন্য আমরাই প্রধানতঃ দায়ী।

এণ্ড্রুজ্ সাহেব দুর্কল শবীষ লইয়া নানা প্রদেশে বক্তৃতা করিয়া দেশকে জাগাইতেছেন। পোলাক সাহেবও এই কাজ করিতেছেন। তন্নিম্ন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক, সারু রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, প্রভৃতি এ বিষয়ে আন্দোলন করিতেছেন। আগ্রা, অযোধ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, প্রভৃতিতে এই বিষয়ে অনেক সভা হইয়া গিয়াছে, এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশ নীরব। বঙ্গের নেতারা নিশ্চেষ্ট।

বঙ্গের নিশ্চেষ্টতা।

বাংলাদেশ কেবল যে ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণের বিরুদ্ধেই কিছু করিতেছে না, তাহা নয়, আরও যে যে বিষয় লইয়া অগ্রাগ্র কোন কোন প্রদেশে আন্দোলন হইতেছে, সে-সব বিষয়েও বাঙালীরা চুপ করিয়া আছেন। স্ববাহু লাভের জন্য আন্দোলন মাদ্রাজ বোম্বাইয়ের তুলনায় বাংলায় পূর্বেও হয় নাই, এখন ত কিছুই হইতেছে না। পার্লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে কোথাও প্রতিবাদ-সভা হইয়াছে, বন্ধ হয় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধবিষয়ক যে মন্ত্রণাসভা আগামী মার্চ মাসে

হইবে, তাহাতে ভাবতবর্ষের নির্ধারিত কোন প্রতিনিধি সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দিতে পারিবেন না; এই বন্দোবস্তের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করিয়া কোথাও কোথাও সভা হইয়াছে। বন্ধে হয় নাই। উপনিবেশগুলির ভারতশাসক হইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করা কর্তব্য। বড়লাট যুদ্ধের পর ভারতশাসন-প্রণালীর কি কি পরিবর্তন করিবার জ্ঞান বিলাতে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া সর্বসাধারণকে তাহা আলোচনা করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহা দেওয়া হয় নাই। এবিষয়ে আন্দোলন হওয়া উচিত। এইরূপ আরও কত বিষয় আছে। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালী প্রতিনিধিদের প্রাধান্য আর দেখা যায় না। দৈনিক সংবাদপত্র-মহলে বাঙালী প্রথম শ্রেণীতে অনায়াসেই জায়গা পাইতে পারেন, এরূপ বলিবার আর জো নাই। অগ্রজও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী কি পিছনের সাবিত্তে বসিয়া নিজে যাইবার আয়োজন করিতেছেন? শিল্পবাণিজ্যে বাঙালীর জায়গা ত নীচে আছেই। সমাজসংস্কার বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল। এখন বাঙালী হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখনও বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে ও ইতিহাসে বাঙালীর নাম আছে। কিন্তু এবিষয়ে কৃতীদেব আসন শূন্য হইলে তাহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে একাগ্রভাবে হইতেছে কই? ধর্মভাব জাগাইবার জ্ঞান, সকল বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা ও অম্লসঙ্কটসং প্রবল করিবার জ্ঞান, জগতের জ্ঞান চিন্তা ভাব আদর্শের সহিত যোগ রাখিবার জ্ঞান কি চেষ্টা হইতেছে, কি আয়োজন করা হইতেছে?

স্বরাজ্যলাভের প্রযত্ন।

স্বরাজ বা হোমরুল লাভের প্রযত্নের সকলব গোড়াব কাজ, দেশবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মান যে আমরা ইহাব উপযুক্ত। আমরা প্রবাসীতে এই চেষ্টা কিছু করিয়াছি। মর্ডার রিভিউ কাগজেও করিয়াছি। সম্প্রতি Towards Home Rule নামক একটি ছোট বহি প্রকাশ করিয়াছি। উহাতে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অল্পসারে, ভারতবাসীদের স্বরাজ্যলাভের বিরুদ্ধে যত-প্রকার প্রধান প্রধান আপত্তি শুনা যায়, তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পাব্লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্ট।

পাব্লিক সার্বিস কমিশন নিযুক্ত হইবার পব আমরা ১৯১২ সালের জুলাই মাসের মর্ডার রিভিউএ লিখিয়া-ছিলাম—

“We shall be glad if this new Commission does not further narrow the sphere of the higher appointments open to Indians, and saddle the country with higher salaries to be paid to European officials.”

এখন, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর, দেখিতেছি, আমাদের উক্ত দুটি আশঙ্কার কোনটিই অমূলক নহে। আমরা কার্যভঃ উচ্চ রাজপদগুলি খুব কম পাইলেও এপর্যন্ত আমরা কোন সরকারী আইন বা ঘোষণাপত্র অল্পসারে কোন কাজের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হই নাই; কোথাও এরূপ বলা হয় নাই যে ভারতবাসীরা সামান্য অংশ পাইবে, বেশীভ ভাগ কাজ ইংরেজেরা পাইবে। কোম্পানীর আমলে ১৮৩৩ সালে ভারতবর্ষশাসন সম্বন্ধে যে চার্টার অ্যাক্ট (Charter Act) বিধিবদ্ধ হয়, এবং ১৯১৬ সালে যে ভারতশাসন আইন (Government of India Act) পাস হয়, তাহাতে আছে :—

“Be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident therein shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office or employment under the said Company.”

১৮৫৮ সালে মহারাজী ডিক্টোরিয়া ঘোষণা করেন,—

“And it is our further will that, so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartially admitted to offices in our service.”

আইনে ও মহারাজীর ঘোষণায় ইহাই বলা হইয়াছে যে ভারতবাসীরা জাতিধর্মবর্ণনিবিশেষে নিরপেক্ষভাবে সকল কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবে। কোথাও বলা হয় নাই যে তাহারা উচ্চপদগুলির কেবল সিকি অংশ বা অষ্টমাংশ বা অধ্বাংশ পাইবে। কিন্তু মাননীয় বিচারপতি আবদুদ্বারহী ব্যতীত পাব্লিক সার্বিস কমিশনের আর সমুদয় সভ্য বলিতেছেন যে সিভিলসার্বিসে এবং উচ্চ পুলিশ বিভাগে মোটামুটি বার আনা কাজ ইংরেজেরা পাইবে, এবং সিকি কাজ দেশী লোকেরা পাইতে পারিবে। ইহাতে আমাদের খুবই আপত্তি আছে। সব বিভাগের কাজে দেশী লোকদের

দাবীই প্রথম। কেবল ভারতবর্ষে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা, কাজ দেওয়া উচিত, এবং ইংরেজকেও পরীক্ষা দিতে দেওয়া বাইতে পাবে। এই প্রকারে যাহারা যত কাজ পায়, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

আমাদের দ্বিতীয় আশঙ্কা এই ছিল যে কমিশন হয় ত উচ্চপদগুলির বেতন বাড়াইয়া আমাদের খরচ বাড়াইয়া দিবেন। তাহাও ঘটয়াছে। কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে রাজকর্মচারীদের বেতন বাবদে বার্ষিক ৬২,২৫,৭৬০ টাকা খরচ বাড়িবে। বলা বাহুল্য, ইহার অধিকাংশ ইংরেজ কর্মচারীরা পাইবে।

কমিশনের এইরূপ যে-যে প্রস্তাবে ভারতবাসীদের অধিকার ধর্ম হইবে, বা আনানুগত ব্যয় বাড়িবে, সে-সকল প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের নামঞ্জুর করা কর্তব্য।

ছোট-ছোট কোন-কোন বিষয়ে কমিশন ত্রাসস্বত ও ভাল প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু প্রায়ই আবার অল্প একরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে তদ্বারা ভাল প্রস্তাবের স্বফল ফলিবার সম্ভাবনা নষ্ট হইয়াছে।

কমিশন সিভিল সার্ভিসের ক্ষুদ্র ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ পরীক্ষার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন; বিচার ও শাসনবিভাগ পৃথক্ করা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই; সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স ১৭-১৯ বৎসর করিয়াছেন; সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকদের শিক্ষানবিশীর কাল বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসর করিয়াছেন; ৪০টি সেশন-ও-জেলা-জজিয়তী ব্যাবিষ্টার ও উকীলদিগকে দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন; প্রাদেশিক সার্ভিসের লোক-সেব জন্ত ৪১টি উচ্চপদ বাধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; এবং বৎসরে সিভিলসার্ভিসে ৯টি কাজে ভারতবর্ষে লোক নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; তন্মধ্যে ৬টি গবর্ণমেন্ট বাছিয়া ২ জন গ্র্যাজুয়েটকে দিবেন, এবং বাকী ৭টি, মনোনীত (nominated) লোকদের পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতমদিগকে দিবেন।

মাননীয় বিচারপতি আবদুর রহীম স্বতন্ত্র একটি রিপোর্ট লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি সাহসের সহিত অনেক সম্বন্ধিপূর্ণ ভাষা প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রকারে ত্রাস-

পরায়ণতা দ্বারা তিনি ভারতবাসীদের অধিকার হইয়াছেন।

ট্যাক্স বৃদ্ধির গুজব।

এইরূপ গুজব শুনা বাইতেছে যে আগামী মার্চ মাসে রাজস্বসচিব সাব উইলিয়ম মেঘাব ১৯১৭-১৮ সালের আদ-ব্যয়ের যে বজেট বা আত্মমানিক হিসাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবেন, তাহাতে নূতন ট্যাক্স বসাইয়া বা বর্ধমান কোন-কোন ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করিয়া অধিক আদায় ব্যবস্থা থাকিবে। ভারতবর্ষের লোকদের আর বেশী ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ, এখন যুদ্ধের জন্ত বিস্তর লোকের আয় কমিয়া গিয়াছে; অথচ নতুন প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় বা বাড়িয়াছে। ইহাতে লোকের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। এমন ট্যাক্স বাড়াইলে দুর্ভিক্ষ হইবে। গত বৎসর রাজস্বসচিব ট্যাক্স বাড়াইয়া প্রায় ছয় কোটি টাকা আয় বাড়াইয়াছিলেন। ইহা ঠিক বটে যে গবর্ণমেন্টের ব্যয় বাড়িয়াছে ও বাড়িবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহে, ট্যাক্স বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য উপায়ও আছে। ইউরোপে অনেক দেশে আইনে স্তম্ভিতঃ এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, যে, যুদ্ধের জন্ত যে-যে ব্যবসাতে খুব বেশী লাভ হইতেছে, সেই লাভের অধিকাংশ ত্রাসতঃ গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য। ভারতবর্ষেও এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। যুদ্ধ হওয়ায় পাটের কল, কয়লার খনি, চা বাগান, এবং লোহা-ইস্পাতের কারখানার মালিকদের খুব লাভ হইতেছে। তাহাদের অতিরিক্ত লাভের বেশী অংশ যে-কোন আকারে গবর্ণমেন্টের হাতে পৌছা উচিত। কিন্তু এই-সকল লোকেরা ধনী ও ক্ষমতাশালী। তাহারা দিতে হইলে তাহারা খুব চীৎকার করিবে ও আন্দোলন করিবে। গবর্ণমেন্ট যদি তজ্জন তাহাদের উপর ট্যাক্স বাড়াইতে ভয় পান, তাহা হইলে আশা করি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, দরিদ্র ও আন্দোলনে-অসমর্থ লোকদের উপর ট্যাক্স বসাইবেন না। আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে যুদ্ধের জন্ত যাহাদের লাভ বাড়িয়াছে, হয় তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া গবর্ণমেন্ট ব্যয় নির্বাহ করুন, নতুবা যে আয় আছে তাহা দ্বাবাই কোন-প্রকারে ব্যয় নির্বাহ করুন।

সাম্রাজ্যের যুদ্ধমন্ত্রণাসভায় ভারতের “প্রতিনিধি” ।

আগামী মার্চ মাসে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি যুদ্ধমন্ত্রণাসভা হইবে। যুদ্ধ কেমন করিবা চালাইলে শীঘ্র জয়লাভ হইতে পারে, কি-কি সৰ্ত্তে যুদ্ধ শেষ করিয়া সন্ধি কবিতে সম্ভব হওয়া যাইতে পারে, এবং যুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন আদি যে-সকল প্রশ্ন উঠিবে, তাহার সমাধানই বা কিরূপে হইতে পারে,—এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা এই সভায় হইবে। ইহাতে ইংলণ্ড, ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহ ও ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকিবেন। ভারতবর্ষেরও প্রতিনিধি থাকিবেন, ইহা ভাগ কথা; কিন্তু সেই প্রতিনিধি হইবেন ভারতসচিব চেম্বারলেন সাহেব। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত গবর্নমেন্ট আগ্রা-অযোধ্যার ছোটলাট সাব জেমস্ মেইন, সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং বিকানীরের মহারাজাকে মনোনীত করিয়াছেন। ভারতবাসীরা একরূপ বন্দোবস্তে অসন্তোষ প্রকাশ করার বড়লাট বলিয়াছেন, যে, মন্ত্রণা-সভাটি সাম্রাজ্যের ভিন্ন-ভিন্ন অংশের গবর্নমেন্টগুলির সভা, সুতরাং গবর্নমেন্টই প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন; উপ-নিবেশগুলির প্রধান মন্ত্রীরা সভার সভ্য হইবেন, এবং এক-একজনের এক-একটি ভোট থাকিবে; কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা-মত অগ্রান্ত্র মন্ত্রীদিগকেও সঙ্গে আনিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ-বিশেষ কোন-কোন বিষয়ে সভায় বক্তৃতা করিতে বলিতেও পারিবেন; ভারতশাসননীতির জন্ত ভাৰতবর্ষের সচিব পার্লেমেন্টের নিকট দাবী, সুতরাং তিনি ভিন্ন আর কেহ ভাৰতবর্ষের প্রতিনিধি হইতে পারেন না; কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত যে তিন জন মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারাও যথাসম্ভব কোন-কোন বিষয়ে সভায় নিজেদের মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবেন। বড়-লাট সাহেবের এই যে-সব কথা, সমস্তই বুলিলাম। কিন্তু তাঁহার যুক্তি আমাদের আপত্তির ভিত্তি পর্য্যন্ত পৌছিল না। উপনিবেশগুলির প্রধান মন্ত্রীরা তাহাদের স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয়, এবং পরোক্ষভাবে তাহাদেরই দ্বারা নির্বাচিত; অগ্রান্ত্র মন্ত্রীরাও তাই। এইসব প্রধান মন্ত্রী ও অগ্রান্ত্র মন্ত্রী

নিজ-নিজ দেশের অবস্থা, স্বার্থ ও দাবী খুব ভাল করিয়া জানেন ও বুঝেন, এবং তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় স্বয়ং দেশের প্রতি টান রাখিয়া কথা কহিবেন। ভারতবর্ষের জন্ত যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা উপরে-উপরে দেখিতে যেরূপই হউক, উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভারতসচিব ভারতবাসী নহেন, ভারতবর্ষের লোকদের দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে মনোনীত হন নাই, ভারত-বর্ষের বিষয়ে খুব অজ্ঞ। এবং ভারতবর্ষের স্বার্থ ও দাবীর প্রতি তাঁহার টানের কোন পরিচয় কখন পাওয়া যায় নাই। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ত যে তিন জন মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারাও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের দ্বারা মনোনীত হন নাই। তিন জনের মধ্যে একজন ভারতসচিবেরই মত বিদেশী ও রাষ্ট্রকর্মচারী। তিনি মুখে ভাৰতবাসীদের প্রতি টান দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু কাজে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বরং উপনিবেশিকদের যে দল ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অংশীদার হইতে না দিয়া, অধিকন্তু তাহাকে উপনিবেশগুলিরও অধীন করিতে চায়, সেই দলের দূত বা চাঁই লায়নেল কার্টিসের সহিত একমত হইয়া তাহাকে পরামর্শ দিয়াছেন। বাকী থাকেন সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও বিকানীরের মহারাজ। আশা করি তাঁহারা ভারতসচিবকে সুপরামর্শই দিবেন, এবং ভারতসচিবও তাঁহাদিগকে মন্ত্রণাসভায় মত প্রকাশ করিবার সুযোগ দিবেন। কিন্তু ভারতসচিব তাঁহাদের পরামর্শ অস্বাভাবিক কাজ করিতে বাধ্য নহেন; এবং তাঁহাদের মন্ত্রণাসভায় কিছু বলিতে পাওয়া না পাওয়া চেম্বারলেন সাহেবের অসুগ্রহ-সাপেক্ষ। তাঁহাদের ভোট না থাকায় তাঁহাদের সুযুক্তিপূর্ণ জ্ঞায্য কথাও ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের আপত্তি ও অসন্তোষের কারণ সংক্ষেপে বলিলাম। যাহা হউক, আমাদের স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয় হইলেন যদি নিজ নিজ কর্তব্য করিতে পারেন, তাহা হইলে মন্দির ভাল যতটা হইতে পারে, তাহা হয়ত হইবে।

যুদ্ধমন্ত্রণা-সভায় ভারতবর্ষকে অন্ততঃ নামেও যে কিছু বলিতে দেওয়া হইবে, ইহা কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষয় মনে হইতে পারে বটে। কিন্তু যিনি বাস্তবিক প্রতিনিধি নন,

যিনি ভারতবর্ষের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলিবেন না, ভারত সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নিতান্ত কম, যাহার নিজের স্বার্থ ও মঙ্গল ভারতবর্ষের স্বার্থ ও মঙ্গলের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নহে, তাঁহাকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা বরং কোন প্রতিনিধি না থাকিলে এক হিসাবে ভাল হইত। কাবণ, এখন যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে চেয়ারমেন সাহেব যাহা বলিবেন, তাহাতে যদি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অনিষ্ট হয়, এবং আমবা তজ্জন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করি, তাহা হইলে ইংরেজরা বলিবেন, “কেন, ইহা ত তোমাদের প্রতিনিধির মত অহুসারে করা হইয়াছে?” অথচ তিনি আমাদের প্রতিনিধি মোটেই নন। সারু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ কিম্বা বিকানীরের মহারাজা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত কি না, তাহার আলোচনা করা অনাবশ্যক। কারণ, তাঁহারা ত আমাদের প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছেন না, এবং যুদ্ধমঙ্গলা-সভায় তাঁহাদের কোন ভোটও থাকিবে না। তাঁহারা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিরূপে ভারতসচিবকে পরমর্শ দিবার জন্ত প্রেরিত হইতেছেন।

সিংহমহাশয়কে প্রদত্ত বিদায়ভোজ

উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, I feel very proud indeed that I have been chosen as one of the representatives of the Government of India to go to the War Conference, “আমি ভারতগবর্ণমেন্টের অগ্রতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় বাস্তবিক খুব গৌরব বোধ করিতেছি।” তিনি যে আমাদের প্রতিনিধি তাহা তিনিও মনে করেন না, তিনি ভাবত-গবর্ণমেন্টের অগ্রতম প্রতিনিধি। যাহা হউক, তিনি খুব যোগ্য লোক; যদি কোন-প্রকারে ভারতবর্ষের মঙ্গল করিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে স্বর্ষের বিষয় হইবে।

এই ভোজ উপলক্ষে সারু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, বর্দ্ধমানের মহারাজা, এবং সারু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে গুপ্ত মহাশয়ের বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল,

এবং তাহাতে অনেক সত্যকথা স্পষ্টবাদতাব সহিত হইয়াছিল। অগ্রান্ত কথার মধ্যে তিনি বলেন :—

They had sometimes heard complaints of the inadequacy of India's assistance in the war. He could not admit it. If there were any such fault it was due, not to the people, but to the Government, and to the military policy which had caused the martial spirit out of the people. It was to be hoped that the great lesson would not be lost to the Government or the people. If there was to be another war, the man-power of India must come to the front. He had faith in the British Government. He hoped that after the great proof of loyalty that had been afforded they would henceforth be treated with confidence, that everything would be done to start a national army and to open the communication ranks to India.

“কখন কখন এরূপ অভিযোগ শুনা যায় যে যুদ্ধে ভারত সাহায্য করে নাই। আমি তাহা স্বীকার করি না। যদি ভারতের কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, সে দোষ ভারতবাসীর নয়, তাহা বরং গবর্ণমেন্ট দ্বারী এবং দায়ী গবর্ণমেন্টের সেই সামরিক নীতি দ্বারা। যাদের লোকদের সামরিক তৈরীতা নিষ্পেষিত হইয়াছে। যদি আর একটা যুদ্ধ হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের লোকজন সশস্ত্র করিতে হইবে। ভারতবাসীরা যেরূপ রাজভক্তি দেখাইচেন, তাহা হইয়া, আশা করি, গবর্ণমেন্ট অন্তঃপুর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবে, এবং জাতীয় সেনাদলগঠন করিবার জন্ত ও সেনানায়কের পদে দেশের লোকদিগকে দিবার নিমিত্ত বাহা কিছু করা দরকার, তাহা গবর্ণমেন্ট করিবেন।”

ভোজ সম্বন্ধে একটি অবাস্তব কথা ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। বিলাতী রীতি অনুসারে এই ভোজের ভোজনকারীদিগকে দশটাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইত। তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু ভোজের যে দিনে কাগজে বাহিব হইয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল, “বাতীত (‘exclusive of wines’) ১০ টাকা লাগিবে! ভোজে মদ খাওয়া হইয়াছিল কি না তাহা না, সম্ভবতঃ হইয়াছিল। যাহাতে মানুষকে পশুব অপম বোধ, এবং যে সামাজিকবীতি পাশ্চাত্য নানাদেশে ক্রমশঃ বর্জিত হইয়া আসিতেছে, তাহার গোলামী অনুকরণ সেই দেশে। তাহা কি আবশ্যক যে-দেশে স্বরাপান ভ্রষ্টশ্রেণীর মধ্যে পাতঃহাব কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যে-দেশে শাস্ত্রের অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়, এবং যথায উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক বীতি নহে? ভোজের বিজ্ঞাপনে এমন কোন স্বাক্ষরকারীর নাম দেখিয়া বিস্মিত ও হইলাম যাহারা অতি সংযুক্তবিত্ত এবং নিজে দেশের অষ্ট কোন দেশ করেন না। তাহাদিগকে সম্মান

বিজ্ঞাপনটি দেখাইয়া তাঁহাদের নাম ব্যবহার করিবার অমুমতি লওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাঁহাদের নাম একরূপ বিজ্ঞাপনের নীচে থাকায় বড় কুফল হয়। এইজন্য ইহা বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যিক, যে, কোন সাধারণ কাজে তাঁহাদের নাম ব্যবহার করিতে সম্মতি দিবার পূর্বে তাঁহারা সব বৃত্তান্ত জানিয়া তবে অমুমতি দেন। তাঁহারা নিজে নিজে প্রাণনা গ্রাহ্য না করিতে পারেন, কিন্তু সমাজের মঙ্গলার্থ ইহা করা একান্ত আবশ্যিক। বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাদের নাম কেন ব্যবহৃত হইলে তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলে ভাল হয়।

জাতি ভেদে সৈনিক হইবার পৃথক ব্যবস্থা।

পৌষেব প্রবাসীর বিবিধ প্রশ্নে “ভারত-প্রবাসী সমস্ত ইংরেজকে সৈনিক হইতে বাধ্য করিবার প্রস্তাব” সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার শেষ কথা ছিল এই :—

“সমস্ত হওয়া সম্বন্ধে দেশলোক এবং ইংরেজ ও ক্রিস্টিয়ান বর্তমান পাশ্চাত্য আরও বাড়ান গ্রামের স্বাধীনতা মনে করি। যদি এজন্য কিছু করিতেই হয়, তাহা হইলে এর দেশ লোকদিগকে ও ভ্রাতৃপুত্র হইয়া যুদ্ধ শিখিবার অধিকার দেওয়া হউক, এবং সমস্ত বয়সের শারীরিক-যোগ্যতা বিশিষ্ট সমস্ত দেশী লোককে সৈনিক হইতে বাধ্য করা হউক।”

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বড়লাট তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে ভাবতপ্রবাসী সমস্ত বয়সের ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে (European British Subjects) সৈনিক হইতে বাধ্য করিবার জ্ঞাত আইন করা হইবে; এবং তাহারই প্রারম্ভিক আয়োজন স্বরূপ এইরূপ সমস্ত পুরুষের নাম রেজিস্ট্রী করা হইতেছে। ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের যুবকদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইবে, ১৮ হইতে ৪১ বৎসর বয়সের পুরুষদিগকে ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানে সামরিক কার্য করিতে বাধ্য করা হইবে, এবং ৪১ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের লোকদিগকে স্থানীয় (অর্থাৎ তাহাদের বাসস্থানেব নিকটে) সামরিক কর্তব্য করিতে বাধ্য করা হইবে।

ভারতবাসীদেরও স্বতন্ত্র সৈন্যদল গঠিত হইবে, কিন্তু কাহাকেও সিপাহী হইতে বাধ্য করা হইবে না, সিপাহী হওয়া না-হওয়া লোকেব ইচ্ছাবান থাকিবে। তাহা কারণ বড়লাট এই বলিয়াছেন যে সমস্ত ভারতবাসী সমস্ত বয়সের

শারীরিক যোগ্যতা-বিশিষ্ট যত লোক পাওয়া যাইতে পারে, সমুদয়কে যুদ্ধশিক্ষা দিবার জ্ঞাত যুদ্ধশিক্ষক পাওয়া কঠিন, এবং অস্ত্র জোগানও কঠিন। সকলের জ্ঞাত গবর্ণমেন্টের যুদ্ধশিক্ষক ও অস্ত্র যোগাইবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ইহা সত্য কথা। তাহা হই.লও ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে “ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা”দিগকে যোদ্ধা বানান গবর্ণমেন্ট যত দরকারী মনে করিতেছেন, ভারতবাসীদিগকে যোদ্ধা বানান তত দরকারী মনে করিতেছেন না। একরূপ মনে না করিবার কারণ যাহা তাহাতে আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি না।

যাহাই হউক, গবর্ণমেন্ট যে ভারতবাসীদিগকে সিপাহী হইবার জ্ঞাত আহ্বান করিবেন, আমরা বড়লাটের এই সঙ্কল্পের সর্বান্তঃকরণে অন্তিমোদন করি। যাহারা সিপাহী হইবেন, তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানে, বর্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিবে, সামরিক কর্তব্য করিতে হইবে। আমাদের এ বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব আছে। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের সমস্ত যুবককে যেমন যুদ্ধ শিখিতে বাধ্য করা হইবে, ভারতবর্ষের ঐ বয়সের সমুদয় যুবককে গবর্ণমেন্ট সেক্ষপ শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত সহজে শীঘ্র করিতে পারিবেন না বটে; কিন্তু ষোল বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের সমুদয় ছাত্রকে যুদ্ধ শিখিতে বাধ্য করিতে সরকার নিশ্চয়ই পারেন, এবং তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্তও করিতে পারেন। গবর্ণমেন্ট ইহা করুন। ইহাতে ভাবতরক্ষার উপায় ভবিষ্যতে সহজে হইতে পারিবে, এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল হইবে ও নিয়মাত্মকতা বাড়িবে। যে-সকল দেশী লোক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইবে, তাহাদিগকে কমিশনপ্রাপ্ত সেনানায়ক (commissioned officer) হইবার অধিকার দেওয়া হউক। বর্তমানে অতি সাহসী ও রণদক্ষ দেশী সৈনিক ও নিম্নতম কমিশন পায় না। আর একটি বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি থাকা দরকার। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ ও এক শ্রেণীর ক্রিস্টিয়ানদিগকে যোদ্ধা হইতে বাধ্য করিয়া ভারতবাসীদিগকে যুদ্ধে অগ্র ও নিরগ্র বাধিলে কিরূপ অসন্তোষ ও কুফল হইতে পারে, তাহা আমরা পৌষেব কাগজে বিবিধ প্রশ্নে লিখিয়াছিলাম। এমন কথা গবর্ণমেন্ট যে জানেন না বা

বুঝেন না, তাহা নয়। কেবল অসন্তোষ বা সন্দেহ দূর করিবার জন্যই যদি গবর্ণমেন্ট অল্পসংখ্যক দেশী লোককে সিপাহীদলে গ্রহণ করেন, এবং তদপেক্ষা বেশী লোককে শিক্ষা দিতে ও অস্ত্র জোগাইতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে তাহাতে কোন সফল হইবে না; অধিকন্তু অসন্তোষ বাড়িবে। অতএব গবর্ণমেন্টের উচ্চ-পদস্থ সৈনিক কর্মচারীদের প্রতি এইরূপ আদেশ থাকা দরকার যে তাহারা ভারতবর্ষাবস্থা যত বড় সেনাদল প্রয়োজন, তাহার মত লোক যেন গ্রহণ করেন। বর্তমান যুদ্ধ ভারতবর্ষের চেয়ে ছোট-ছোট দেশ রক্ষার জন্য ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ লক্ষ এবং তদপেক্ষা বেশী সৈন্য শিক্ষিত করা হইতেছে। অতএব ভাবতবর্ষে কত লক্ষ সৈন্য চাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার মধ্যে ভারতপ্রবাসী “ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাতি”দের মধ্যে হইতে যত পাওয়া যায়, লওয়া হউক; বাকী সংখ্যা দেশী লোক লইয়া পূর্ণ করা হউক।

আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন আছে, কিম্বা আমাদিগকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন, গবর্ণমেন্ট এরূপ মনে না করিতে পাবেন। কিন্তু ব্যাপারটিকে প্রধানতঃ সন্তোষ অসন্তোষ বিষয়ক মনে করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা অনেক দিন হইতে আগ্রহ করিয়া আসিতেছি এবং পূর্বে-পূর্বে লিখিয়াছিও যে বর্তমান যুদ্ধের পর, এশিয়াতে, আরও মহাযুদ্ধ হইতে পারে, এবং তাহা চীন ও ভারতবর্ষ লইয়া হইবার সম্ভাবনা। এখন যাহারা ইংরেজের বন্ধু তখন তাহারা বন্ধু না থাকিতে পারেন। এবিষয়ে বর্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণরিভিউএ একজন জাপানী অনেক কথা পবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ রক্ষাব জন্য ভারতবর্ষ হইতে ৫০ লক্ষ লোককে দৈনিক করিয়া স্থগিত দেওয়া কর্তব্য। আরও যথেষ্ট উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য, এবং কেন ভারতবর্ষ রক্ষার বন্দোবস্ত এখনই করা উচিত, তাহা ঐ প্রবন্ধে জটব্য।

বর্ণাশ্রম ধর্ম।

কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে কল্পনার আশ্রয় না লইয়া বাস্তব অবস্থা ধরিয়া বিচার করাই কর্তব্য। যাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম বিষয়ব আলোচনা করিতেছেন,

তাহারা বাস্তবিক ভারতবর্ষে সামাজিক অবস্থা আগে কিরূপ ছিল, এবং এখন কি-প্রকার আছে, তাহা বিবেচনা করেন না। তাহারা মনে করেন, আগে ভারতে কেবল চারি জাতি ছিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে নিজের নিজের কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। বাস্তবিক কিন্তু তখনও এখনকার মত বহুসংখ্যক জাতি ছিল, এবং কোন জাতিই লোকই সম্পূর্ণরূপে নিজের কৌলিক কাজে আবদ্ধ থাকিত না। ইহাব প্রমাণ মহাসাহিত্য, মহাকাব্য, পুৰাণ, নাটক প্রভৃতিতে, বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে, ইতিহাসে বিস্তার পাওয়া যায়। আর এখানকার ত কথাই নাই। ১৯০১ সালের ভারতবর্ষের সেন্সস রিপোর্টে ভারতীয় জাতি সকলের একটি তালিকা আছে। তালিকাটি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠা ব্যাপী, এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৭৫ হইতে ৮০টি নাম আছে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে চারি জাতিই উপব্রজ্য জাতির নাম আছে। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু। কৌলিক বৃত্তিব বিষয় বিচার করিলেও দেখা যায়, যে, শুধু বাংলা দেশ ধরিলেও কোন জাতির লোকই নিজের জাত-ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট থাকে না।

ভারতবর্ষে এমন কোন জাতি নাই যাহা বিশুদ্ধ সমুদয় জাতির মধ্যেই খুব রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে। ইং ভারতীয় ও ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত।

তাহার পর, শাস্ত্রে যে চারিটি আশ্রমের কথা আছে, তাহা কার্যতঃ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেদিন সভাবাজার রাজবাটীতে যে বর্ণাশ্রমধর্ম সম্পর্কে সভা হইয়াছিল, তাহার বক্তাদের মধ্যে অনেকেরই বয়স পঞ্চাশের উপর; কিন্তু তাহারা কেহই বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন নাই, করিবেনও না। ব্রাহ্মণ বালকেরা উপবীত পরিয়া আড়াল পা অগ্রসর হন; তাহার পর তাহাদিগকে টানিয়া লওয়া হয়। ইহাই হইল ব্রহ্মচর্য! তাহার পর গার্হস্থ্যটি হয় বটে, কিন্তু বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য কে কে অবলম্বন করিয়াছেন বা করিবেন, তাহা জানি না। সভায় যাহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সভাপতি ত কৌলিক বৃত্তিতে আবদ্ধ নন; অথবা সভা বলিতে গেলে কৌলিক শাস্ত্রটিই তিনি করেন না, আর সব করেন। অগ্রসর

বক্তারা কে কি পরিমাণে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে চলেন, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে খুব কৌতুকজনক হয়। যাহা কখন ছিল না, এবং এখনও নাই, তাহা লইয়া একটা গোলমাল করা পশুশ্রম যাত্র।

চারি আশ্রমের আদর্শটি বেশ সুন্দর। কিন্তু ইহা অক্ষরে অক্ষরে, অন্ততঃ বর্তমান সময়ে, অনুসৃত হইতে পারে না। তবে, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির অনুসরণ আমরা সকলেই করিতে পারি, এবং তাহা করাও কর্তব্য। প্রথমে শিক্ষার অবস্থা। তখন ভোগবিলাস আনন্দপ্রমোদের উপর ঝোঁক না দিয়া দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় ও বর্দ্ধনের চেষ্টা করিবার সময়। জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হইবার সুযোগ তরুণবয়স্ক পুরুষ ও নারী এই সময়ে পায়। ইহাই ব্রহ্মচর্য আশ্রম। তাহার পর গার্হস্থ্য। এই সময়ে প্রধানতঃ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সর্বপ্রথমে ধর্মপথে থাকিয়া করিতে হয়। তাহার পর নির্জনে প্রধানতঃ পারমাধ্বিক বিষয়ের চিন্তায় কালযাপন কবা কর্তব্য, এবং তাহা করিতে সুহৃৎপ্রকৃতির লোকদের স্ভাবতঃ ইচ্ছাও হয়। তাহার পর ধার্মিক লোকের মনের এমন এক অবস্থা আসিতে পারে যখন তিনি বিশ্ববাসী সকলের প্রীতির উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন। অমুক পর, তাহার সাহায্য লইব না, এই অহঙ্কার আর তখন থাকে না। বাস্তবিক কোন মানুষই সম্পূর্ণ নিজের বা নিজের পরিবারের লোকদের সাহায্য ও সেবার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা প্রতিদিন যত জিনিষ ব্যবহার করি, তাহার কতগুলি নিজে প্রস্তুত করি, কতগুলিই বা পরিবারের লোকে করে? স্বদেশবাসীরাও সমস্ত নিত্যব্যবহার্য বস্তু প্রস্তুত করেন না। অস্বাভাবিক পরিমাণে সব দেশেরই অবস্থা এইরূপ। শরীরের জন্য আবশ্যক জিনিষ সম্বন্ধেই যে এই কথা খাটে, তাহা নয়; আত্মার অর যে ভাব চিন্তা আদর্শ আদি, তাহাও কত দেশ, কত যুগ, কত মানুষের নিকট হইতে আসিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং জীবনের শেষ আশ্রমে মানুষের মনে এই ভাব আসা একটুও অস্বাভাবিক নহে, যে, আমরা বিশ্ববাসী সকলের

কৃপার, প্রীতির ভিখারী, সকলেরই প্রেমের উপর আমাদের নির্ভর।

অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়ক সমিতি।

আমাদের ও বাংলা দেশে যে-সকল শ্রেণীর লোক শিক্ষার পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের উন্নতি সাধন করিবার জন্য একটি সমিতি আছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, ইহার সম্পাদক। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ইহার বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তাহা হইতে জানা যায়, যে, এই সমিতি ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়, এবং গত আট বৎসরে ইহা দ্বারা ঢাকা, মৈমনসিং, যশোর, চব্বিশ পরগণা, ত্রিপুরা, রংপুর ও নোয়াখালি জেলায় ৬০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য অর্থান্ধাভাব না হইলে সমিতি আরও অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিতেন। ১৯১৬ সালের গোড়ায় সমিতির ৫০টি বিদ্যালয়ে ১৭৭৫ জন বালক ও ১২৬টি বালিকা পড়িত। তাহার পর দশটি নূতন বিদ্যালয় খোলা হয়; তাহাতে ২৪০টি ছাত্র ও ৪টি ছাত্রী ভর্তি হয়। ১৯১৬র শেষে সমিতির ষাটটি স্কুলে ১৯১৬ জন ছাত্র এবং ২৬৩ জন ছাত্রী ছিল। বৎসরের মধ্যে ১৪১ জন ছাত্র ও ৬৭ জন ছাত্রী বাড়িয়াছে। যশোরের মালিঘাট কেন্দ্রে এবং ঢাকার বেরাশ কেন্দ্রে চাষের অবস্থা ভাল হইলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়িত।

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয় যে কিরূপ সামান্য ব্যয়ে আমাদের দেশে কত বেশী ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহা একাধিক বার বলা হইয়াছে যে মাসিক দুই টাকা সাহায্য দিলে পঞ্চাশটি ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভের আশুকুল্য করা যাইতে পারে। ১৯১৬ সালে যে ১০টি স্কুল খোলা হইয়াছে, তাহার সমিতি হইতে প্রত্যেকে মাসিক দুই টাকা সাহায্য পায়, এবং তাহাতেই তাহাদের কাজ সম্বোধনকরূপে চলিতেছে। সম্পাদক মহাশয় রিপোর্টে জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

"Is it too much to expect that a thousand ladies and gentlemen in Bengal and Assam would come

forward with a monthly subscription of Rs. 2 each to enable us to open a thousand new schools for the diffusion of the blessings of education among the backward classes?"

তিনি ১০০০ ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকের প্রত্যেকেব কাছে মাসে দুটি করিয়া টাকা চাহিতেছেন। তাহা হইলে হাজারটি নূতন স্কুল খুলিতে পারিবেন, এবং তাহাতে অনেক হাজার ছাত্র ও ছাত্রী পড়িবে। ইহা মোটেই দুবাশা নহে। বাংলা দেশে এমন এক হাজার কেন, অনেক হাজার লোক আছেন, যাহারা অনায়াসে মাসে দুটাকা করিয়া দিতে পারেন। তাহারা অগ্রসর হউন। অনেক ছাত্র সিগারেটে মাসে দুটাকার বেশী খরচ করেন। তাহারা এই কুঅভ্যাস ত্যাগ করিয়া দেশের নিবন্ধর দরিদ্র বালকবালিকাদের জন্য অর্থ সাহায্য করুন। সম্পাদক মহাশয় বড়ই আনন্দ ও আশার কথা শুনাইয়াছেন। যাহারা পারেন, তাহারা তাহাকে একবারে এক বৎসরের ২৪ টাকা দিয়া ফেলুন; তাহাকে যেন আদায় করিবার জন্য ব্যয় ও কষ্টস্বীকার করিতে না হয়। গত বৎসর সমিতি সামান্য ৮৩০ টাকা মাত্র চান্দা পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সাবু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ৫০০, বাবু প্রভাসচন্দ্র মিত্র ২২০, বাবু চিত্তরঞ্জন দাশ ২০০, বাবু জে, এন্, রায় ১২৫, বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ ১০০, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদারের পত্নী ৬০, বাবু জুপেন্দ্রনাথ বসু ৫০, বাবু এন্ এন্ সবকার ৫০ এবং বাবু বি এন্ মিত্র ৫০ টাকা দিয়াছিলেন।

প্লেগে মৃত্যু।

খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা, হাঙ্গামায় একজন মানুষ মরিলেও লোকের তাহাতে দৃষ্টি পড়ে। দুটা রেলওয়ে ট্রেনে দাঙ্গা লাগিয়া মানুষ মরিলে তাহার কত বর্ণনা খবরের কাগজে বাহির হয়। জাহাজ ডুবি হইয়া তাহাতে মানুষ মরিলে লোকের প্রাণে আঘাত লাগে। যুদ্ধে যে হাজার হাজার মানুষ মবিতেছে, তাহার ত কথাই নাই। প্রথম প্রথম যুদ্ধে মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য মানুষ স্তম্ভিত হইত; এখন সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক বৎসর ধরিয়া ভাবতবর্ষের সকল প্রদেশে যে লক্ষ লক্ষ শিশু, যুবা বৃদ্ধ মানুষের চোখের আড়ালে প্লেগে মবিতেছে, তাহা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। ভারতবাসীদের ইহা সহিয়া

গিয়াছে, গবর্ণমেন্টেরও ইহা সহিয়া গিয়াছে। প্লেগ নির্মূল করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা গবর্ণমেন্ট করিতেছেন না, দেশের শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার লোকেবাও করিতেছেন না। সপ্তাহে সপ্তাহে মৃত্যুর তালিকা বাহির হইতেছে; এখন আমরা তাহা আব পড়িয়াও দেখি না। বর্তমান যুদ্ধে যত মানুষ মরিয়াছে, পৃথিবীর আর কোন যুদ্ধে তত মানুষ মবে নাই। কিন্তু এ পর্যন্ত প্লেগ ভারতবর্ষে ৫১, অপেক্ষাও বেশী লোক মরিয়াছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ১৪৭৭৬ জনের মৃত্যু হইয়াছিল, এবং ১৮৭২৬ জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহে কমবেশী এইরূপ মৃত্যু হইতেছে। বৎসরের সমুদয় সপ্তাহের অঙ্কগুলি যোগ দিলে বুঝা যায় যে কত লোক বৎসরে প্লেগে মরে। সপ্তাহে গড়ে ২৮০ মন হাজার মরে বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বৎসরে মৃত্যুর সংখ্যা হয় ৫২০০০০। কুড়ি বৎসর হইল ভারতবর্ষে এই ভীষণ মহামারীর আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব ইহাতে যে এক কোটির উপর লোক মরিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার বিষ ইন্দুরের দ্বারা বা অন্য উপায়ে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার উৎপত্তি হেতু যে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও তজ্জনিত অপরিচ্ছন্নতা, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি, দেশের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার, এবং স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন সকলকে অভ্যস্ত করা,—এই তিন উপায় অবলম্বন না করিলে প্লেগ নির্মূল হইবে না। ইহা যে নির্মূল হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ও ইউরোপের আরও অনেক দেশে আগে মধ্য-মধ্যে খুব প্লেগের মড়ক হইত। এখন আব হয় না। এশিয়ায় এখনও চীন, ভারতবর্ষ, এবং আরও ২১১টা দেশে প্লেগের মড়ক হয়। এশিয়ার একটি দেশ হইতে তথাকার গবর্ণমেন্ট ও অধিবাসীদের চেঁচায় প্লেগ দূরীভূত হইয়াছে। তাহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। তথাকার সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৩ ও ১৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরের পর আর সেখানে কাহারও এই রোগ হয় নাই।

শিক্ষকদের বেতন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কনভোকেশন বা উপাধিদান-সভায় বড়লাট বলেন যে শিক্ষাদান কার্য অতি মহৎ; শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং অস্বাস্থ্য উপায়ে শিক্ষকতার গৌরব বৃদ্ধি করা আবশ্যিক। তাহার পর ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেকটরদের দিল্লীতে যে মন্ত্রণাসভা হয়, তাহার প্রারম্ভিক বক্তৃতাতেও বড়লাট শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির প্রয়োজন বুঝাইয়া দেন। তাঁহাদের বেতন, বাস্তবিকই বড় কম। সরকারী কাজের আর যে-কোন বিভাগেই যান, দেখিতে পাইবেন, শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের চেয়ে কম যোগ্যতার লোকেরা বেশী বেতন পাইতেছে।

বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেকটর একটি সাকুলার আফিস করিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট স্কুলে কোন এম্-এ বা এম্-এসসী ৫০ টাকার বেশী বেতনে, কোন বি-এ বা বি-এসসী ৩৫ টাকার বেশী বেতনে, এবং কোন আই-এ বা আই-এসসী পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি ২৫ টাকার বেশী বেতনে কাজে বাহাল হইতে পারিবেন না; যদিও পরে তাঁহাদের বেতন বাড়িতে পারিবে। মাননীয় অধিকাচরণ মজুমদার মহাশয় বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় এই সাকুলারের প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন যে ইহা কি সত্য নয় যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও উন্নতির আশা এরূপ যে তাহাতে যোগ্য লোকেরা শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না? গবর্ণমেন্ট বলেন, না। অর্থাৎ কি না গবর্ণমেন্টের মতে এই বেতনে যোগ্য লোকেরা শিক্ষক হইতে ও থাকিতে পারে এবং সঙ্কষ্ট চিন্তে দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারে। অবাক্ কাণ্ড! অধিকাচরণ মজুমদার মহাশয় এই অস্বপ্ন দেখেন যে ডিরেক্টর সাহেবকে এই সাকুলার পরিবর্তিত করিতে বলা বাঞ্ছনীয় কিনা, তাহা গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করুন। গবর্ণমেন্ট তাহাতেও রাজী হন নাই। তাহা হইলে বড়লাট সাহেব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে দুই দুই বার বক্তৃতা করিলেন, তাহার মানে কি, জানিতে ইচ্ছা হয়।

শাসন ও বিচার বিভাগে দেশের যে-সব শিক্ষিত

লোক কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ও শিক্ষকদের মধ্যে মোটের উপর বিন্যাসবুদ্ধির কোনই পার্থক্য নাই। হাকিমেরাও মর্ত্য লোকের জীব, শিক্ষকেরাও মর্ত্য লোকের জীব। লোকস্বত্বের ও উন্নতির জন্য হাকিমদের চেয়ে শিক্ষকদের কাজের প্রয়োজন কম নয়, বরং বেশী। হাকিমরা মাহুবকে জেলে পাঠাইয়া সমাজকে নিষ্কণ্টক করিতে চেষ্টা করেন, শিক্ষকেরা চেষ্টা করেন যাহাতে মাহুব জেলে যাইবার মত কাজই না করে। ইংরেজীতে যে একটা কথা আছে যে, যে একটা স্কুল খোলে সে একটা জেল বন্ধ করে, তাহা খুব সারগর্ভ। শিক্ষকদের অবস্থা ও পদমর্যাদা দেশের লোকদের ও গবর্ণমেন্টের সভ্যতার একটি মাপকাঠি।

সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ শিক্ষালয়েই অধ্যাপক ও শিক্ষকদের বেতনের ঘেঁরুপ প্রভেদ দেখা যায়, তাহাও অর্থোক্তিক। এম্-এ পরীক্ষায় কিছু নম্বর বেশী বা কম পাইলে তাহাতে বুদ্ধিবিদ্যায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ বুঝায় না। অথচ দেখা যায়, একজন শিক্ষক এম্-এ তাঁহারই সমান যোগ্য ও সমবয়স্ক একজন অধ্যাপক এম্-এর অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, দিকি, বা তদপেক্ষাও কম বেতন পাইতেছেন। আমরা জানি এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে স্কুলের বালকদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া কলেজের যুবকদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা কম দায়িত্ব বা যোগ্যতার কাজ নয়। যে শিশু যত অল্প বয়সের তাহাকে শিক্ষা দেওয়া তত সহজ ও তত কম যোগ্য লোকের কাজ, এরূপ মনে করা যে কিরূপ ভ্রম, এবং এই ভ্রান্ত ধারণায় সমাজের কি যে গুরুতর ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

স্বদেশী প্রচেষ্টা ও বর্তমান চড়া বাজার-দর।

যখন স্বদেশী আন্দোলন খুব প্রবল ছিল, তখন অনেকে এই বলিয়া দেশী জিনিষ কিনিতেন না যে উহার দাম বেশী। কিন্তু এখন তাঁহারাও তখনকার দেশী দ্রব্যের দামের চেয়ে অনেক চড়া দরে জিনিষ কিনিতেছেন। বাধ্য হইয়া লোকে যাহা করে, দেখেছায় দেশোদ্ধার-বশতঃ তাহা করিলে দেশের মঙ্গল হয়।

শিল্প ও ধর্ম

বসন্তের সাড়া পাইবামাত্র বনে-উপবনে গাছে-গাছে লতায়-লতায় নবীন কিসলয়মঞ্জরীর উজ্জ্বল বিকাশে রেখার ভঙ্গিমা ও রঙের রঙ্গিমা যেন হিলোল জাগিয়া উঠে, তাহা যেন বিশ্বশিল্পীর প্রাণের হিলোল। বিশ্বশিল্পীর সেই প্রাণের আনন্দ স্বভূতে-স্বভূতে বিশ্বচিত্রের বিচিত্র রাগে যেমন প্রকাশ পায়, কোন সৌভাগ্যবান দেশে যখন সেই মহাশিল্পীর সাক্ষেদ মানবশিল্পীদের অত্যাশ্রয় হয়, তখন সমস্ত দেশের অন্তরে-বাহিরে, আসবাবপরিচ্ছদে, সৌধকুটারে, সকল ভূচ্ছবুৎ উপকরণে, শিল্পীর আনন্দ-হিলোল তেমনি বহিয়া যায়। তখন সমস্তই জন্মের হইয়া উঠে।

কিছুকাল হইতে যেন বাংলা দেশে শিল্পের আনন্দের সাড়া পাওয়া বাইতেছে। আমাদের পায়ের শিকলি যতই কঠিন হোক এবং পিঠে দাবিজোর বোঝা যতই গুরুত্ব হোক, ধূলিঘলিন অপরিচ্ছন্ন নগরে অথবা জঙ্গলাকীর্ণ পল্লী-গ্রামে জীর্ণ দালান বা কুটারের মধ্যে বাস করিয়াও আমাদের দেশচিত্রের একটি কোণায় কোণায় যেন বসন্তের আমেজ লাগিয়াছে। এই যে আমেজ-টুকু লাগা, ইহাই প্রাণের লক্ষণ। একটি প্রকাণ্ড ভাঙা প্রাসাদ, তাহার কক্ষে-কক্ষে দেয়াল খসিয়া পড়ে, সেখানে বান্ধুদের বাসা, শুভ্রগুলি আর ছাদকে ধরিয়া রাখে না কারণ উন্মুক্ত নীলাকাশ ছাদের আচ্ছাদন ঘুচাইয়া দিয়াছে, সেইখানে একেবারে আঙিনা হইতে শুভ্র জড়াইয়া ছাদ ফুটা করিয়া মহাতেজে এক বিশালকায় বটবৃক্ষ সগর্বে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে ও শিকড়ের পব শিকড় বিস্তার করিয়া সমস্ত প্রাসাদের ভিত্তিকে দীর্ণ করিয়া প্রাণের জয়স্বস্তেব মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এ দৃশ্য যেমন—আমাদের এই অশোভন দারিদ্র্যজীর্ণ দেশের মধ্যে শিল্পপ্রাণের আভাসটুকুও তেমিতর।

শিল্পের এই প্রথম আভাস সর্বত্রই পাঁচমিশল জিনিসের মত দেখিতে অদ্ভুত গোচের হয়। আভাস বলিয়াই যে অমন হয় তা নয়। প্রথম অবস্থায় শিল্পের প্রাণ আপনার উপযোগী প্রচুর উপকরণ চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনে বলিয়াই সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ

করিতে পাবে না। স্থপতির গোড়ায় যেমন বিক্ষিপ্ত অসংহত নীহারিকা, শিল্পস্থপতির আদিতে তেমনি এই নানাস্থানসমাহত উপকরণপুঞ্জ।

পরিহাসরসিক স্বর্গীয় কবি বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়ের একটি গানে আছে :—“আমাদের dress হবে English হি Greek তা এখনো কর্ত্তে পারিনি ঠিক।” সে কথা ঠিক। হিন্দুস্থানী পোষাক, নবাবী আমলের পোষাক, বোম্বাই দেশের পার্শি পোষাক, ইংবেজী পোষাক, সব পোষাবেব খিচুড়ি পাকাইয়া আমবা পবি। কিন্তু ইহারি মধ্যে একটি শোভন শিল্পকচিসঙ্গত পরিচ্ছদ আবিষ্কৃত হই পড়িবেই। মেয়েদের পোষাক কতকটা ঠিক হই আসিয়াছে, তবে তাহাদের পরিচ্ছদের চতুর্দিককে মণ্ডিত করিয়া আছে বিস্তব বিলাতের মায়াজাল, তাহাতে দেখ্য রূপটি ফুটবাব ব্যাঘাত আছে। আমাদের দেশে সন্দেহ কি দ্বী কি পুরুষ সকলেরই সংকোচ আছে—পুরুষ গায়ের জামায় বা উত্তরীয়তে বং চড়াইতে লজ্জা পায়, পাত্রে পথেব লোকে সৌখীন বলে এবং মেয়েরা ফিকে ছোঁতো বংয়ের পক্ষপাতী, কাবণ বিলাতের লোকেরা colour পছন্দ করে না। অথচ আমাদের গ্রাম দেশে সব বংই জোরগলায় আপনাকে ঘোষণা করে, এদেশে তো প্রকৃতিতে রংয়ের আত্মপ্রকাশে কোথাও কোন সঙ্কোচ নাই। এখনো ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বাঙ্গালতানাম, কি দ্বী কি পুরুষ রঙিন পরিচ্ছদ পরিতে ভালবাসে—এং সন্দেহে সে-সকল স্থানে মাহুঘের দিবি বোব আছে, সে-বংশ দেশেব মাহুঘ আমাদের মত বংকাণা নয়। তবু যাইহোক, এই পাঁচমিশলী খিচুড়ি পোষাক পরিতে পরিতেই একদিন ঠিক পোষাকটি আমাদের দেশে বাহিব হইবেই। প্রথম আভাসে ঐ রকমই হয়, ইহা লইয়া গোড়াতেই আত্মপ কবা মিথ্যা।

এই মোটা উদাহরণটি হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অজ্ঞাত শিল্পের সন্দেশও এই একই ব্যাপার ঘটতে পারে। কবিতা আমাদের দেশে চিরকাল ছিল বটে; কিন্তু হা পায়ের ছিল প্রায়ই পরায়ের বেড়ি আর গায়ের পদাবলীর নামাবলী। কবিতার যে স্বচ্ছন্দ উদ্দাম নৃত্য-গতি থাকিলে পর সে সমস্ত জীবনের বিচিত্র গতিটাকে নানা

হৃন্দের নৃপুংস্বক্কারে ঝঙ্কত করিয়া তুলিতে পারে, সে গতি বাংলা কবিতায় প্রথম সঞ্চার করিবার চেষ্টা করেন সেই মহাকবি, যিনি শুধু কবিতার পা হইতে পয়ারের বেড়ি খসাইয়া ফেলেন নাই, তাহার গা হইতে ঐ নামাবলীটা ও ফেলিয়া দিয়া হোমর-মিণ্টেনেব মহাকাব্যের সদৃশ উজ্জ্বলতার পরিচ্ছদে কবিতাদেবীকে ভূষিত করিবার ক্ষমতা আয়োজন করিয়াছিলেন। এদেশে কবিতাব সেই নূতন উদ্বোধনে নকল, পাঁচমিশালী জোড়াতাড়া, খিচুড়ি—বাংলা কবিতাষ ভূরি ভূরি দেখা দিয়াছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যের অমুকরণে কাব্য-সৃষ্টির চেষ্টা তখন ছিল। বাংলা কবিতার ঠিক প্রাতিভাটিকি, যে পর্য্যন্ত তাহা ধরিতে পারা যায় নাই, সে পর্য্যন্ত এই পাঁচমিশালী ব্যাপার ও নকলের খেলা যে চলিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু আজ আর বাংলা কবিতাকে ইউরোপীয় কবিতার নকল বলিবার জো নাই, আজ সে তার স্বাধীন নিজস্ব দীপ্তিতে দীপ্যমান। তাহার মধ্যে ইউরোপীয় কাব্যের ভাবরস প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে ও আসিতেছে, কিন্তু সে সমস্তই আধুনিক বাংলা কবিতা স্বাধীনভাবে লইতেছে, আত্মসাৎ কবিয়া আপনার রূপে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিয়া লইতেছে। এই যে স্বাধীনতার স্ফূর্তি, এই যে নিঃস্বস্ত, ইহাই বাংলা কবিতাকে বিশ্বমানবের সাহিত্যভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার দিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, অচিরে এই কবিতা ইউরোপীয় কবিতাকেও নূতন ভাবের ও নূতন রসের উপকরণ জোগাইবে, নূতন প্রাণে অমুপ্রাণিত এবং নূতন রগনে অমুরগিত করিবে।

যদিচ কবিতা শিল্পের মধ্যে গণ্য হয়, তবু কবিতার স্থান অন্যান্য শিল্পের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। কারণ, চিত্রশিল্প বা ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত বা নৃত্যকলা প্রভৃতি শিল্পের উপকরণের মত কবিতার উপকরণ নয়। কবিতার প্রধান উপকরণই ভাষা এবং ভাষা বলিতে বুঝায় কতগুলি চিহ্ন বা symbols, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যহিসাবে যেগুলির কোন মূল্যই নাই। এই ভাষা একএক জাতির বিশেষ জিনিষ; এক ভাষার রস অন্য ভাষার ভাষী কোন মতেই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেনা। এইজন্য আমরা এতকাল ধরিয়া ইংরেজী শিখিলেও, ইংরেজী ভাষার রসটা যে কি, কোন শব্দের

কি বিশেষ বং ও গন্ধ, কোন বাক্যের কি বিশেষ স্বাদ ও লালিত্য, তাহা ইংরেজী সাহিত্য হইতে ঠিকমত আদায় করিতে পারি নাই। সেই কারণেই ইংরেজী সাহিত্যে আমাদের দেশীয় লোকের কোন রচনাই দীর্ঘকালের মত স্থান পাইতেও পারে নাই। তারপর ভাষায় সঙ্গীত সঞ্চার করিয়া যদিচ কবিতা হয়, তবুও কতটুকু সঙ্গীত তাহাতে সঞ্চারিত হয়? এইজন্য সাহিত্যকে ঠিক Representative artও বলা যায় না বা Presentative Artও বলা যায় না—উপগ্রাণ-নাট্যে ইহা Representative, লিরিক কাব্যে ইহা Presentative। ইহার ভাষা বাধা হইলেও চিন্তার বাহন বলিয়া সাহিত্যে এক হিসাবে সকল শিল্পের সমন্বয় ঘটিতেছে। ইহা যেমন চিন্তাকে প্রকাশ করে, তেমনি মনের বিচিত্র অমুভূতি ও আবেগও (moods & passions) প্রকাশ করে।

যাক সে কথা। বাংলা দেশে সাহিত্য-কবিতার ক্ষেত্র ছাড়াইলেই দেখা যায় যে, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য, নৃত্য-কলা প্রভৃতি অন্যান্য সকল শিল্পের ব্যাপারেও এখনো ঐ আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপাতের সময়ের মত নানা উপকরণপুঞ্জ জমিতেছে মাত্র, কোন একটা বিশিষ্টতা বাহির হইতেছে না। চিত্রশিল্পে বরং বিশিষ্টতার বেশ আভাস দেখা যাইতেছে; কিন্তু সঙ্গীত ত এখনো নীরব। থিয়েটার প্রভৃতির দ্রুত তালের তারস্বরপূর্ণ ইন্দ্রিয়বিলম্বকারী সঙ্গীতে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্রিযমাণ; অন্তরিকে ওস্তাদী সঙ্গীতের কুস্তির আখড়ার কসবতের খেলা দেখিয়া দেবী সরস্বতী দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া বাঁচিয়াছেন। কারণ দেবী সরস্বতী থিয়েটারের নটীও নন, আবার কুস্তির আখড়ার মল্লও নন।

তবু আশা হয় যে, এসকল শিল্পেও পূর্ণস্বরূপে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইবে, কারণ ছবি ও গানের দিকে আমাদের শিক্ষিত মনোব নজর পড়িয়াছে। একথাও সময় সময় শোনা যায় যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিল্প শিক্ষার আয়োজন যে নাই, ইহা আমাদের শিক্ষার একটা মস্ত অসম্পূর্ণতা। শিক্ষিত স্রুতিসম্পন্ন ভদ্রলোক এখন যে-সে পোটে ছবি কিনিয়া ঘর সাজাইতে লজ্জা পান, যে-সে গানেও যে সব সময় তাঁদের মন ভরে তাও নয়। এসমস্তই স্বলক্ষণ।

বাংলাদেশে যেটুকু যেটুকু শিল্পের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, আমি তাহাব একটু প্রতিলিপি মাত্র ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। তবু একথা বলিতেই হইবে যে, শিল্পে যে বড় বড় শ্রোত মাহুষের ইতিহাসে পূর্ব পূর্ব যুগে বহিয়া গিয়াছে, যে শ্রোতে মাহুষের চিত্রক্ষেত্রে ঞ্চামল কবিয়াছে, যাহার তটে তটে কত বড় বড় কীর্তি অমর হইয়া বিভ্রাজমান, সেই-রকম শ্রোত কি এযুগে এদেশে বহিল? যদিবা বহিয়া থাকে, তবে তাহার কাণ কি? এই আলোচনাটাই সবচেয়ে গুরুতর আলোচনা বলিয়া মনে করি। কারণ ইহা হইতেই আজিকার আলোচ্য বিষয়—শিল্পের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ তাহাতে আমরা উপনীত হইব।

ভারতবর্ষে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শিল্পের শ্রোত কোন যুগে বহিয়াছিল মনে করিতে গেলেই বৌদ্ধ যুগের কথাই মনে পড়ে। বৌদ্ধধর্ম যেমন ভারত হইতে গান্ধার, থোটান, তুর্কিস্তান, চীন এবং চীন হইতে জাপান পর্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল, বৌদ্ধশিল্পও তেমনি ঐ-সকল জায়গায় নূতন নূতন রূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছিল। সমস্ত এশিয়া যে এক, ইহা প্রবানতঃ বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সম্ভাবনীয় হইয়াছে। এই ধর্ম নব নব জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নব নব রূপ পাইয়াছে, এবং নব নব শিল্প এই ধর্মের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে।

একদা মহাবীর আলেকজান্দার তাঁহার বিজয়বাহিনী লইয়া যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গ্রীক সভ্যতার জয়ন্ত সৰল-জায়গায় প্রোথিত কবিবেন ইহাই তাঁহার মনের প্রধান ভাব ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি হাব মানিলেন, যুদ্ধে নব, তাঁহার সভ্যতার গর্বে। তাঁহার বিজয়ী চমু, তাঁহার গ্রীক থিয়েটার, গ্রীক আর্ট, কিছুই এদেশের নিত্যসত্যাত্মীয় শান্তিনিষ্ঠ লোকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

ক্রমশঃ গ্রীকদের বসতিব জগৎ যে প্রসিদ্ধ গান্ধার শিল্প ব্যাক্ট্রিয়া প্রদেশে দেখা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বলিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভাবিয়াছেন যে, ভারত-শিল্পের এমন কি এশিয়ার শিল্পের যাহা কিছু লাবণ্য বা স্বপ্না তাহাব মধ্যে ঐ

গ্রীক প্রভাবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আছে। তাহাবা তুলিয়া যান যে গ্রীক আদর্শ ও বৌদ্ধ আদর্শে বহু অনুরাগ —“বৈসে ধরণী আকাশ”—যেমন ধরণী আর আকাশের মধ্যে অনুরাগ। একে চায় বিচিত্র বিচ্ছিন্ন রূপেব মধ্যে সৌন্দর্যমঞ্জর, অন্ত্রে চায় সকল রূপবাসনা নিবৃত্ত বসিয়া নির্মাণেব পরমাশান্তি। তাই গান্ধারশিল্পে গ্রীকবাব বুদ্ধদেবকে বড়জোর আপোলোব একটা অভিনব সংযুগ কবিয়া গড়িয়াছিল। গ্রীকেরাই গান্ধারশিল্পে ভারতের আদর্শকে ধরিতে গিয়াছে, অথচ সে কাজ অসম্পূর্ণ হইয়াছে। তবে গান্ধারশিল্পে ফল হইয়াছে এই যে, ভারতীয় শিল্পকে তাহা কিছুটা পরিমাণে উৎকর্ষ জোগাইয়াছে মাত্র।

ভারত হইতে পেশবার ও গান্ধার দেশের ভিতর দিয়া চীনে যাইবার যে পথ ছিল, সেই পথে সেইকালে বহুত সমৃদ্ধিশালী স্বপ্না বাজ্যেব অস্তিত্ব ছিল; আজ তাহারাব বালি-চাপা পড়িয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। থোটান, তুর্কিস্তান প্রভৃতি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ আজ ডাক্তার ষ্টাইন, ডাক্তার গুনওয়েডেল প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদেরাব মক্কাবালির শতাব্দেব আচ্ছাদন তুলিয়া উন্মোচিত করিয়াছেন। এই-সকল বলুপ্ত প্রদেশে যে শিল্প বাহির হইয়াছে তাহাও পববর্তী গান্ধার শিল্পের সমজাতীয়। কিন্তু চীনে ও জাপানে আদিলেই দেখা যায় শিল্পরচনাব একটা মস্ত পরিবর্তন। এশিয়ার জাতিদিগেব মধ্যে চীন ও জাপানীজাতির মত শিল্পপ্রতিভা বিশিষ্ট জাতি আর নাই।

প্রায় সকল দেশেই সভ্যতার গোড়াব অবস্থায় কি শিল্পে কি সাহিত্যে দৈত্যদানব গড়িবাব একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অন্ধ প্রকৃতিব বিচিত্র ভীষণ শক্তিগুলি আদিম অজ্ঞান মাহুষেব কল্পনায় ঐরূপ আকার পায়। মাগুসের আদিম ধর্মও তাই ভয়েব ধর্ম; বিগময় সে দৈত্যদানবেব বিভীষিকাই দেখিতে থাকে। ব্যাবিলন, ঐজিপ্ট প্রভৃতি দেশে এই অবস্থা। চীনের প্রথম অবস্থাব শিল্পও এই দৈত্যদানবেব মূর্তিতে ভরা। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভবে শিল্পেব কি আশ্চর্য্য রূপান্তরই ঘটিল! তখন হইতে কোন কল্পনায় চীনদেশেব শিল্পীদলকে মাতাইল? নদীর ধারে পাহাড় কাটিয়া শিল্পী সেখানে বোন মূর্তি বহু গড়িল।

ধানী বুদ্ধের মূর্তি, অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। সমস্ত জগৎ যেন ঐ মূর্তির মধ্যে সমাহিত, সংহত, অখণ্ড, পরিপূর্ণ; ঐ মূর্তির পায়ে নীচ দিয়া নদীর স্রোত—কালের স্রোত বহমান কিন্তু সকল অনিত্য চঞ্চলতার মধ্যে ইহা স্থির অচঞ্চল অনির্বাণ। এই “কোয়াংয়িং” বা ধানী বুদ্ধই চীন ও জাপানের চরম সাধনার বস্তু ছিলেন।

তবেইত আমরা দেখিতেছি যে, ধর্মের উৎস হইতে শিল্প যেখানে উৎসারিত, সেখানে শিল্প এক আশ্চর্য্য অভিনব বস্তু হইয়া উঠে। তখন তাহা সভ্যতাকে সভ্যতার সঙ্গে, জাতিকে জাতির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধে। তখন তাহা সমস্ত জাতির মনটাকে উর্দ্ধে তুলিয়া দেয়, মর্ত্য তখন স্বর্গের দিকে মাথা তুলিবার অবকাশ পায়। তখন আদিম অবস্থার শিল্পও এই ধর্ম-অনুপ্রাণিত শিল্পের সঙ্গে সঙ্গত হয়, প্রাচীন ধর্ম নূতন ধর্মে রূপান্তরিত হয়। চীনে যাহা হইয়াছিল, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগের শেষে পৌরাণিক যুগে তাহাই হইয়াছিল। অনার্য্য দেবদেবী, অনার্য্য পূজাপদ্ধতি, অনার্য্য শিল্প সেই সময়ে একটা বড় আদর্শের আগুনে গলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া বড় বড় ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছিল। এই রূপক বা Symbol-সৃষ্টির শক্তি যে কত বড় এবং কত আশ্চর্য্য তাহার প্রমাণ পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষ যেমন দিয়াছে, এমন বোধ হয় আর কোন দেশ দিতে পারে নাই। প্রায় সমস্ত পুরাণগুলিতে চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি নানা শিল্পের আদর্শ, প্রকরণপদ্ধতি ও উপকরণ সম্বন্ধে বিচিত্র উল্লেখ দেখা যায়। বেদের দেবতার শত্রু নিরঞ্জন, বেদান্তের ব্রহ্ম ও অরূপ ও নির্বিকল্প। আর্য্যের এই অধ্যাত্মতত্ত্ব অনার্য্য অবিভেদের নৈসর্গিক শিল্প-প্রতিভার উপর কান্ন করিয়া ভারতবর্ষে যে এক আশ্চর্য্য শিল্পতত্ত্ব ও শিল্প-রসবোধ (art consciousness) সৃষ্টি করিয়াছে এ বিষয়ে এখন সন্দেহ করার আর উপায় নাই। সীমাকে লোপ করিয়া অসীমে যাত্রার দিকটার শিল্পে স্থান নাই। অসীম যে-দিকে সীমাকপ পরিগ্রহ করিতেছেন সেইদিকটাতেই শিল্পের প্রকাশ। পুরাণগুলির মধ্যে এই দিকটাই উজ্জ্বল হইয়াছে। ভারতবর্ষে সকল মরমী (mystic) সাধকদেব মধ্যেও এই দিকেই বাণীর প্রকাশ।

বৌদ্ধধর্ম communal ধর্ম বা সম্মিলিতকারী ধর্ম ছিল বলিয়া তাহাতে শিল্পের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল। ধর্ম communal হইলেই তাহাতে নানা আচার অনুষ্ঠান দেখা দেয়, এবং সেই-সকল আচার অনুষ্ঠান হইতেই শিল্পের উৎপত্তিও হয়। গ্রীক ও শকেরা মূর্তিপূজা করিত; তাহার বৌদ্ধ হইবার পরও চৈত্য তৈরি কবিয়া মূর্তিপূজা করিত। বিষ্ণু, শিব সকল দেবতারই কল্পনার মূলে নানা তত্ত্ব রহিয়াছে। ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, ফ্রিজিয়া প্রভৃতি স্থানে দেবদেবীর পূজায় নানা কুৎসিত অনুষ্ঠান ছিল; এই সূত্রে তাহা ভারতবর্ষে কতদূর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার খোঁজ লওয়া আবশ্যক। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে, ভুবনেশ্বরের শিব-মন্দিরে, কণারকের সূর্য্য-মন্দিরে যে-সকল বীভৎস চিত্র ও মূর্তি দেখা যায়, তাহার কারণ লইয়া অনেকেই নানা আলোচনা করিয়াছেন। সংসারটাকে হেয় ও কদর্য্য বলিয়া দেখানো বৌদ্ধভাব—সুতরাং এ সকল বীভৎস চিত্রের একটা সঙ্গত কারণ সে দিক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই-রকমে নানা জাতির নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গতির জন্ত পৌরাণিক শিল্পের মধ্যে এত বিচিত্রতা দেখা দিয়াছে। মৌর উপাসনা, বৌদ্ধ সাধনা সমস্তই বিচিত্র-ভাবে মিশিয়াছে। বৈদিক অনেক আইডিয়াও রূপান্তর লাভ করিয়াছে। যেমন ব্রহ্মার কথা। বেদে ইহার উৎপত্তি। কামনা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ইহা বেদে আছে; সৃষ্টিকর্তার মন হইতে উৎপন্ন সলিল-রাশিই মানস-স্রোতের।

তবু এই ধানী বুদ্ধের মূর্তিই বলি, বা পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিই বলি, শিল্প যখন ইহাতে একবার আবদ্ধ হইয়া যায়, তখনই শিল্পের শিল্পত্ব নষ্ট হইয়া আসে। কেননা, তখনই পুনরাবৃত্তির পালা। শিল্প তখন স্থিতিশীল (Static) অবস্থায় পৌছে, তাহার মধ্যে বিচিত্র গতি আর খেলে না। শিল্পী একই ধানীবুদ্ধ, একই দেবদেবী গড়িয়া গড়িয়া তাহাব শিল্প-প্রতিভার আর কি নূতন পরিচয় দিবে? সেই মূর্তির মধ্যে তাহাব কি কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিবে? শিল্পের রূপ জীবনের প্রতিরূপ বলিয়াই তাহার বৈচিত্র্যের সীমা নাই। কিন্তু তাহার সেই বৈচিত্র্যকেই বাদ দিয়া একরূপেই তাহাকে বাঁধিলে নদীকে ডোবা বানাইবামত একটা হতভী ব্যাপাব

তৈরী করা হয়। সেই কাণ্ড কি দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে ?

চীনে জাপানে এই কারণে চিত্র ভাস্কর্যের জায়গা দখল করিয়াছিল। কাবণ মূর্তিকাব্যব চেষ্টে চিত্রকরের পক্ষে শিল্পকে গতিমান করা সহজ। অল্পমান করিতে পারি যে, অজ্ঞতা ও হাশিমে চিত্রেব যে বিচিত্র নমুনা পাওয়া যায়, জীবনের লীলা-ছবিব যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, তাহাবও কারণ কতকটা তাই। শিল্প দীর্ঘকাল মূর্তির বন্ধনে থাকিয়া সেই বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থনা করিয়াছে।

তবু এই মুক্তিও পূরা মুক্তি নয়। চীনে, জাপানে এবং ভারতবর্ষে, মূর্তি হইতে চিত্রে যখন শিল্প অভিব্যক্ত হইল, তখনও তাহার ধর্মের বন্ধন ঘুচে নাই। অর্থাৎ তখনও সেই শিল্প ধর্মমূলক শিল্প।

লরেন্স বিন্‌ইয়ন্ তাঁহার "Painting in the Far East" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দশম বা একাদশ শতাব্দীর যে-সকল চীন ও জাপানদেশীয় চিত্রকরের কথা লিখিয়াছেন, তাহাদের চিত্রকে তিনি "Embodied Prayers" মূর্তিমান প্রার্থনা মূর্তিমান উচ্ছ্বাস বলিয়াছেন। এসিন সজ্জ নামক একজন গুপ্তী জাপানী চিত্রকরের একটা কল্পছবির (vision) বর্ণনা তিনি দিয়াছেন এইরূপ :—স্বর্গের অধিপতি আমিদা তাঁহার স্বর্গীয় দলবল সহ "নীতল নীল" অন্ধকারের মধ্যে উচ্ছ্বাসিত একটি মেঘের গুহ্র আলোকচ্ছটার উপর আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহার সেই বিরল আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বর্গীয় বাহিনী বিচিত্র বাদ্যসকল বাজুত করিতেছে এবং শূন্যে শূন্যে স্বগন্ধ পুষ্পদল বিকীর্ণ করিতেছে। ছবিটার এই পরিকল্পনা।

মধ্যযুগের খৃষ্টানশিল্পও ঠিক এই জাতীয় নয় কি ?

তাব মানে, ধর্মকে আশ্রয় করিয়া শিল্প, বিশেষতঃ চিত্রশিল্প, যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন শিল্প এই পৌরাণিক উপকরণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তখন ভারতবর্ষে বুদ্ধের মূর্তিব জায়গার বোধিসত্ত্বগুলি বিচিত্র আকারে দেখা দেয় দেখিয়াছি, তখন স্বর্গমর্ত্যপাতালের দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্বের ছবি শিল্পীরা কল্পনায় সন্ধ্যাতারার মত পুঞ্জ পুঞ্জ ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু ক্রমে এই কল্পনার বন্ধন, পূর্বাণের বন্ধন, ধর্মের

বিচিত্র বিগ্রহের বন্ধনকেও শিল্প একদিন ছাড়াইয়া উঠে। চীনদেশে ও জাপানে একসময়ে শিল্পীরা এই বন্ধনই ছাড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই সে দেশে শিল্প এমন অভ্যাস হইতে পারিয়াছে। কারণ, শিল্প চায় জীবন। শিল্প জীবনেরই একমাত্র প্রকাশক।

অত্যন্ত সহজ এই কথাটা পশ্চিম মহাদেশে যখন ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, তাঁহাবাই শিল্পকে সৌখীন করিয়া জীবনের সকল প্রয়োজন হইতে তুলিয়া লইয়া "শিল্প শিল্পেরই জন্ত" (Art for Art's sake) এই মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ শিল্পের কায়দে যদি হয় প্রকাশ করা, একের অহুভূতিকে সকলের মধ্যে অর্পিত করানো, তবে প্রশ্ন এই যে শিল্প কি প্রকাশ করিবে, কিসের অহুভূতিগুলিকে সে অহুভূত করাইবে? পবিত্র জীবন ভিন্ন আর প্রকাশের দ্বিতীয় বস্তু কি থাকিতে পারে? জীবনের বিচিত্র অহুভূতিই তো শিল্পের প্রকাশের বিষয়। এই জীবন-বস্তুকে আমরা যত বড় করিয়া যত অথচ করিয়া দেখিতে পারি ও ধরিতে পারি, শিল্পও ততই বড় হইতে থাকে। জীবন যেখানে সংকীর্ণ ও খণ্ডিত, শিল্প সেখানে বৃহৎ ও উদার হইতে পারে না।

কিন্তু শিল্পকে অথচ জীবনের প্রকাশই বলি আর ঘাঁট বলি, যে ব্যক্তি প্রকাশ করে তাহার দরুনই শিল্পের আসল শিল্পস্বটুকু কোটে। নহিলে শিল্প তো কেবল অঙ্ক-করণ হইত, রূপের প্রতিকল্প মাত্র হইত। গ্রীক জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্লেটো শিল্পকে এইরূপ কেবল মাত্র অঙ্করণ ভাবিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার "রিপাবলিক্" গ্রন্থে তিনি শিল্পকে নিন্দা করিয়াছেন। প্লেটোর মতে সকল বস্তুই একটা বাস্তবিক ভাবসত্তা, একটা ideal form আছে, সেই রূপের প্রতিকল্পই মানুষ পায়। চিত্রকর আবার সেই প্রতিকল্পের প্রতিকল্প তৈরি করে, হস্তবাং চিত্রকর বাস্তবিক সত্তা হইতে অধিকতর দূরে সরিয়া যায়। হেঁতৌ মনে করিতে পারেন নাই যে শিল্পের মধ্যে শিল্পীই প্রধান। অথচ কেন প্রধান ?

বাহিরের যে জগৎটাকে আমরা দেখি, সেখানে সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ, স্থান্য কুশী, ভাল মন্দ, চঞ্চল এবং সব-রকম কণ্ট গায়ে গায়ে ভিড় করিয়া আছে। এই বিচিত্র

অন্তর্নিহিত যে অখণ্ডরূপ, এই বেষ্ট্রার মর্মগত যে সুর, এই অসমঞ্জস বস্তুগুলার ভিতবকার যে সামঞ্জস্য তাহা কে আবিষ্কার করে এবং কেই বা প্রকাশ করে? শিল্পী। শিল্পীর শিল্পের মধ্যেই আমবা বিচিত্রকে বিশ্বরূপে দেখি, অখণ্ডরূপে দেখি। বাস্তব জীবনের যে-কোন অংশকে শিল্পী যখন রেখা রং বা স্ববের সাহায্যে প্রকাশ করিতে চায়, তখন সেই বাস্তব অংশটুকু মধ্যে কত জিনিসকে সে চাপা দেয়, বদলায়, নূতন করিয়া গড়ে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কারণ অংশকে সে যে সমগ্রেব আলোয় তুলিয়া ধরে; অংশ তাই অংশের রূপ পরিহার করে। বাস্তব সাহিত্যিক এমিল জোলা শিল্পের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও এই কারণে আদৌ বাস্তব বা বস্তুতন্ত্র সংজ্ঞা হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন “Art is a bit of Nature seen through the medium of a temperament.” অর্থাৎ শিল্প মানবপ্রকৃতির ভিতর দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির এক টুকবাকে যেমনটি দেখা যায় তাহাই। এই যে শিল্পীর মানব-প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতির টুকবাটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে ও দেখায়, ইহাই তো শিল্প। এই “temperament”ই তাই শিল্পের মধ্যে প্রধান। শিল্পীই তাই শিল্পের মধ্যে প্রধান। যখন কোন ভাল ছবি দেখি, গান শুনি বা কবিতা পড়ি, তখন সেই ছবি গান ও কবিতার ভিতর দিয়া শিল্পীর মনের মধ্যেই কি আমরা প্রবেশ কবি না এবং সেই মনের দরজা দিয়া আবার দেশ-কালের অনন্তবিস্তার, বিশ্বজীবনের বাধাহীন ব্যাপ্তির চির-রহস্যের মধ্যে ডুব দিয়া আসি না? এই কারণে লরেন্স বিনিয়ন লিখিয়াছেন যে, চীন ও জাপান দেশের ভাবুক শিল্পীরা বলেন যে দর্শকই তো শিল্পীর প্রধানতম শিল্প-সৃষ্টি, কারণ সেই দর্শক যদি উত্তম সমজ্ঞদার হয় তবে তাহারই মধ্যে শিল্পীর শিল্পরচনা পূর্ণ সৌষ্টব পায়। বৈষ্ণবেরা যেমন বলেন ভক্তের মধ্যে ভগবানের সার্থকতা, এই শিল্পাচার্য্যারাও তেমন বলেন যে রসগ্রাহী দর্শকের মধ্যেই শিল্পীর চরম সার্থকতা। কেননা শিল্প মনের সঙ্গে মনের আদানপ্রদানের একটা প্রধান উপাধ; স্তুরাং আমার মন যদি শিল্পীর শিল্পরচনা দেখিয়া শিল্পীর মনের মধ্যে প্রবেশ পাইল, তবেই তো শিল্প রচনার উদ্দেশ্য সফল হইল।

শিল্পের মধ্যে শিল্পীই প্রধান বলিয়াই শিল্পের উপর ধর্ম এতকাল ধরিয়া আপনাব জোর দখল জানাইয়া আসিয়াছে। এইখানেই তো শিল্পের সঙ্গে ধর্মের প্রধান যোগেব জায়গা। কারণ ধর্মও মানুষের জীবনেব কোন একটা আংশিক দিক্ নয়, ধর্ম সমস্ত জীবনের একমাত্র সার। ধর্ম সর্বোবাং ছুতানাং মধু। তাহাবও কাজ জীবনের সব খণ্ডগুলোকে অধ্যাত্মরসেব পরম অমৃত দ্বারা অখণ্ড করিয়া দেওয়া, সব কঁাক ভরাট করিয়া সব দ্বন্দ্বকে মিটমাট করিয়া অনন্তেব হাওয়ার মধ্যে জীবনটাকে মেলিয়া ধরা। ধর্ম তাই মানুষের প্রকৃতিটাকেই বদল করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ইহার জন্ত সকল ধর্মই কত বিধি কত নিষেধ কত নিয়ম কত অমুশাসন কত সাধনার ব্যবস্থা!

তাই পুরাকালে যখন ধর্ম একরাট ছিল, মানুষের জীবনে তার বাড়ি আর কিছুই ছিল না, তখন সমাজ তাহাব অমুশাসনে তৈরি হইয়াছিল, শিল্পও তাহার অমুস্বর্তী হইয়াছিল। সেইজন্ত পুরাকালে এমন কোন ধর্ম দেখি না, যে ধর্ম হইতে শিল্পের উৎসাব হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম নীতিপ্রধান অখচ তাহা হইতে উদ্ভূত বৌদ্ধ শিল্প জগতের মধ্যে আশ্চর্য্য শিল্প হইয়াছে।

ইহার কারণ আর কিছুই নয়—ধর্ম যখন মানুষের প্রকৃতি টাকে অধিকার করে, তখন সেই প্রকৃতি বিশ্বজগৎকে যে ভাবে দেখে শিল্পে তাহাই প্রকাশ পাইবে। অখচ কোন ধর্মই মানুষের প্রকৃতির সবটাকে একই সময়ে দখল করিতে পারে না, মানুষের সমস্ত জীবনটাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তা যদি পারিত, তবে ধর্ম ধর্মও বিরোধ থাকিত না, ধর্ম শিল্পে, ধর্ম বিজ্ঞানে, ধর্ম দর্শনে বিচিত্র দ্বন্দ্বসকলের অস্তিত্বই অর্থহীন হইত। বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভূত বৌদ্ধশিল্প যেমনি আশ্চর্য্য হউক, গ্রীকশিল্প তাহাব চেয়ে কোন অংশেই কম আশ্চর্য্য নয়। গ্রীকেরা সকল বাহ্য রূপে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল; সেই-সকল রূপের মধ্যে একটা সৌসামঞ্জস্য ফুটাইয়া তোলাই গ্রীকশিল্পের আদর্শ। ভারতবর্ষ বা চীনের বৌদ্ধশিল্পের শাস্তি বা ধ্যানের আইডিয়াব মত অবজিহ (abstract) কোন আইডিয়াকে বিগ্রহদান করা গ্রীকশিল্পের আদর্শ মোটেই নয়। কিন্তু রূপ হইতেও

অরূপে যাওয়া যায়, যেমন অরূপ হইতেও রূপে আসা যায়। এই দুই প্রকরণপদ্ধতিই শিল্পজগতে বরাবর আছে। এবং এই দুই প্রণালী যে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন, কোনকালেই মিলিবার নয়, তাহাও নয়। কারণ স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ক্রমশঃ চীনে ও জাপানে শিল্প এই দুই প্রণালীরই সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যোগ সে দেশে পরবর্ত্তীকালে এমনি ভাবে সাধিত হইয়াছে যে কেহই কাহারও অমুদ্বর্ত্তী হয় নাই। ধর্ম শিল্পের বন্ধন হইতে যেমন মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আসার বিগ্রহাদি হইতে যেমন মুক্ত হইয়াছে, শিল্পও ধর্মের বন্ধন হইতে তেমন মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ধর্মের ভাবের দ্বারাই সে পুরাপুরি অধিকৃত হয় নাই।

লরেন্স বিনিয়ন বলেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে “Zen” বা ধ্যানীসম্প্রদায় নামে এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল। তাহারা ধর্মের প্রথাগত ও আচারগত বন্ধন হইতে মুক্তি কামনা করিয়াছিল। তাহারা শাস্ত্র পুরোহিত, বিধি বিধান সমস্তই অস্বীকার করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া সত্যকে অমুদ্বন্দ্বিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। লৌৎসু—যাহা হইতে ‘তাও’ ধর্মের উৎপত্তি—যাহার বচনাবলী উপনিষদের মন্ত্রের মত সরল অথচ গভীর-জ্ঞানপূর্ণ—তিনিই এই সম্প্রদায়েব একজন গুরু ছিলেন। ইহাদের ভাব কতকটা কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের “wise passiveness”এর ভাবের মত; অর্থাৎ নিজেকে সংযত বিবল নিজাম নিজিয় করিলেই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিগূঢ় বাণী আমাদের অন্তরের মধ্যে আপনাই প্রকাশ পাইবে, এই ভাব। একদিকে তাই ইহাদের আদর্শ সেই প্রাচীন বৌদ্ধ অনাসক্তির আদর্শ, অতীতকে ইহা বা বিশ্বের সৌন্দর্যের প্রতি অণুমাত্রও উদাসীন নয়। বিশ্বের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরের যোগ একেবারে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের চিত্তেব সঙ্গে চিত্তেব নিবিড় আনন্দময় যোগ ছিল। এই যোগের সম্পূর্ণতাতেই ছিল ইহাদের মুক্তি।

সুতরাং ইহাদের ছবিতে ধর্মের বিচিত্র পৌরাণিক বিগ্রহাদির কোন স্থান রহিল না। Symbolism থাকিল না। প্রকৃতির চিরস্থল্লর চিররহস্যাবৃত বন-গিরি-নদী-সমুদ্র-আকাশের নানা ছবি। মানুষের নানা প্রবৃত্তির

বিচিত্র দৃশ্যের ছবি। অথচ সে-সকল ছবির ভিতর নিঃশব্দে অধ্যাত্মমুক্তির বাণী প্রচারিত হইয়াছে, কোন নিঃশব্দ-ছবির ভিতর দিয়া তাহা হইবার জো ছিল না।

অগ্রহায়ণের “সবুজপত্র” শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “জাপানের পত্রে” জাপানের শিল্প সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা জাপানের শিল্পের মর্মস্বরূপ আদর্শটিকে যেমন ভাবে খুলিয়া দেখাইয়াছে, এমন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের বড় বড় রচনা দেখাইতে পারে না, ই। তিনি লিখিয়াছেন—

“মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মত শাস্ত্র করেছে। এরা এটুকু জানে, যে, জিনিসের সূচ্য আছে, গৌরব আছে, তার মধ্যে বোধে জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার মধ্যে রিক্ততা সব চেয়ে দরকারী।... জাপান আপনাদের ঘরে বাইরে সর্বত্র সূক্ষ্মতার কাছে আপন অর্থাৎ নিবেদন করে দিচ্ছে।.....মানুষের প্রতি এমন আন্তরিক সম্মতি অল্প কোথাও দেখিনি। এমন সাবধানে যত্নে, এমন গুচিটা রক্ষা করে সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে অল্প কোন জাতি দেখেনি। যা এদের ভাল লাগে, তার সামনে এরা শব্দ কমে না। সংযমই যে প্রচুরতার পরিচয় এবং গুচুটাই যে গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বৃষ্টিতে। এবং এরা বড়ো সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্মের সাধনা থেকে পেয়েছে।”

অথচ বৌদ্ধধর্মের প্রসাদেই যে চীন ও জাপানীজাতি হৃদয়বাক এমন গুচিটা ও সংযমের সঙ্গে পূজা করিতে শিখিয়াছে, তাহা মনে করা বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ, চীন ও জাপানের শিল্পের ক্রমাভিব্যক্তি দেখিলে গনিতিক দেখিতে পাওয়া যায় যে চীন ও জাপানীজাতির নৈসর্গিক শিল্পরসবোধ ধর্মের বন্ধন কাটাইয়া কাটাইয়া ক্রমশ আপন পথে আপন সার্থকতার উত্তীর্ণ হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর ‘Zen’ সম্প্রদায়ের শিল্পই চীনে ও জাপানে শিল্পের একটা নবযুগ আনিয়া দেয়। তারপব হইতে শিল্প শিল্পের রাস্তায় চলিয়াছে কিন্তু ধর্মকে সে বাদ দেয় নাই; ধর্মকে আপন সহচর করিয়া লইয়া চলিয়াছে। ধর্মের এই সাহচর্যই শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন; ধর্মের অধীনতা বা অন্তর্ভুক্তি নয়। তখনই শিল্প ধর্মময় হয়, ধর্মও শিল্পরসপূর্ণ হয়। চীনে জাপানে ধর্মের অভিব্যক্তির ইতিহাসও যদি দেখা সম্ভবপর হইত, তবে বোধ হয় দেখিতাম যে, সেখানে বৌদ্ধ-ধর্মও ক্রমশঃ তাহাব সংযম নিয়ম বিধিবিধানের বন্ধন কাটাইয়া তাহার শীলাদির হিমশিলাকে বিদীর্ণ করিয়া শিল্পরসস্রোতে বিগলিত হইয়া বহিয়াছে। সেইজন্যই কবি

ববীজনাথ জাপানেব জীবনযাত্রার ও লোকব্যবহাবে যেমন একদিকে রিক্ততা বিরলতা ও মিতাচার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন, অন্যদিকে তিনি বলিতেছেন যে “এমনতর সার্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।” রসবোধের সাধনার সঙ্গে বিকৃততা ও মিতাচারের সাধনা সাধারণতঃ মেলেনা; কারণ একটা সৌন্দর্য্যের সাধনা, অন্যটা ধর্ম্মনীতির সাধনা। জাপানে এই দুই বিপরীত সাধনা যখন মিলিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক শিল্পপ্রবৃত্তি (art-instinct) ধর্ম্মনীতিকে আপনাব অংশীভূত অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম সেদেশে আর শুধু নীতি-প্রধান ধর্ম্ম হইয়া থাকিতে পারে নাই।

ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পের এই সম্বন্ধই পাকা সম্বন্ধ; এই উভাহই ঘটানো দরকার। শিল্প-গৌরীকে ধর্ম্ম-মহাদেবের কাছে পরিচর্য্যার জন্ত ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সেই গৌরীও আপন বাহুরূপকে নিন্দা করিয়া অপর্ণা হইয়া মহাদেবের জন্ত তপস্বী করিবেন; মহাদেবও আপন নিবাত-নিকম্প ধ্যানযোগ ভাঙিয়া সেই তপস্বিনীকে পাইবার জন্ত লালসিত হইবেন। ধর্ম্ম শিল্পের অঙ্গবর্ত্তী হইলে ধর্ম্ম হয় পৌত্তলিকতা—আমাদের দেশে পৌরাণিক যুগে যাহা হইয়াছিল। শিল্প ধর্ম্মের অঙ্গবর্ত্তী হইলে শিল্প আর জীবনের প্রকাশক হয় না; তখন শিল্পের ধারা পুনরাবৃত্তির শৈবালজালে আবদ্ধ হইয়া যায়।

এইবার প্রবন্ধের গোড়ায় ফিবিয়া যাই। বাংলা দেশে যে শিল্পের নূতন অত্যাশ্রয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পের এই স্বাভাবিক সাহচর্য্যের সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে কি?

আমার তা মনে হয় না। আমাদের দেশে সম্প্রতি প্রথা ও আচারের বন্ধনমুক্ত যে নূতন ধর্ম্ম দেখা দিয়াছে, তাহা শিল্পসাধনাকে আহ্বান করে নাই। পক্ষান্তরে শিল্প এখনো পর্য্যন্ত প্রথা ও আচারের বন্ধনমুক্ত বিশ্বজনীন ধর্ম্মের উদার হাওয়ায় মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে না।

কেবল রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কাব্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। লরেন্স বিনিয়ন চীনদেশের Zen artএ “complete fusion of the artistic and religious

temper” হইয়াছে বলেন, অর্থাৎ শিল্প এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ মিলন হইয়াছে বলেন। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কাব্যেও তাহাই হইয়াছে। লরেন্স বিনিয়ন Zen art সম্বন্ধে যে কথাগুলি লিখিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের “গীতাঞ্জলি” “গীতিমালা” “খেয়া” সম্বন্ধে সেই কথাই বলা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন :—

“What distinguishes the Zen artists of Sung and Ashikaga is that the religious idea was no longer confined to religion, conceived as something apart from and antithetical to mundane subjects, but that it had gone out to impregnate and fuse itself with life and nature, so that a white narcissus halfhidden among rocks, a bird making a branch quiver with its first song, or crimson maple leaves floating down through the misty air, or reeds trembling in a wind that comes out of boundless space, or the look of remote peaks beyond the clouds, could become, no less than forms of deity or angel, an expression of the divine idea.”

যে ধারায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য এখন বহিয়া চলিয়াছে, সেই ধারায় যখন চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পও চলিতে থাকিবে, তখনই বাংলা দেশেব জীবনেব মধ্যে শিল্পের স্থান আব সামান্য থাকিবে না। তখন সকল শিল্পই বস্তু বা উপকরণের স্থল ভারকে আইভিয়াতে শ্রবীভূত করিয়া দিবে, অনির্কচনীর অদর্শনীয় অশ্রবনীয়কে কলার সুন্দর আভাসে-ইঙ্গিতে বচনীয় দর্শনীয় ও শ্রবণীয় করিবে। শিল্পের সেই বড় আইভিয়াগুলি তখন বীজের মত রসগ্রাহী চিত্তের মধ্যে পড়িয়া মুহূর্ত্তমাত্রে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। আমাদের ভক্তিপ্রবণচিত্ত চিত্র সঙ্গীত স্থাপত্য নৃত্যকলায় তখন অল্পভব কবিবে এক অপূর্ণ বিশ্বরহস্ত—যাহা নানা ভাবভঙ্গিমায অনবরত কথা বলিতেছে অথচ সে কথা বুঝা যায় না। অল্পভব কবিবে সেই-সকল অল্পভাব, সেই-সকল সহজ বোধ (intuitions), যাহা কোথা হইতে মনের মধ্যে আসে তাহা জানি না, যাহাদের উৎপত্তি কোথায় তাহাও জানি না, অথচ যাহারা জীবনেব যেন চরম বস্তু। অল্পভব করিবে ক্ষণকালের জন্ত জীবনের চিরকালের ভরপুর সম্পূর্ণতা,—বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মার শাস্ত অথচ বিলুপ্ত যোগটিকে ক্ষণকালের মত উদ্ধার করিয়া দেখিবে। জ্ঞান তখন হইবে চরিতার্থ, ভক্তি হইবে

সার্থক। এইরূপে ধর্ম ও বাঁধা মতের বন্ধন কাটাওয়া বিশ্ব-মানবধর্ম হইবার উপক্রমে যত বিচিত্র হইবে, সেই-সমস্ত বিচিত্রতা শিল্পকেও বিচিত্র করিবে। সে-সকল ধর্মের কোন নাম থাকিবে না। সংজ্ঞাহীন সে-সকল ধর্ম অথচ সার্বজনীন সে-সকল ধর্ম।

আমার মনে হয় যে অজ্ঞাতসারে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই বড় একটি সৃষ্টির আয়োজনই চলিতেছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিক্ষার যে সামান্য আয়োজন হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পশিক্ষার জুগ্ম একটি কলাভবন যদি রচিত হয়, তবে দেখিতে দেখিতে সেখানেই একটি কলাকেন্দ্র বা school of art পাড়াইয়া যাইবে এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তের সম্পূর্ণ ছাপ তাহার উপর অনায়াসে পড়িতে পারিবে। শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে বিদ্যায় বা জ্ঞানে বিশেষ প্রতিভাবান কোন ছাত্র বাহির না হইলেও অনেকগুলি অর্ধস্মৃট মুকুল-শিল্পী সেখানে দেখা দিয়াছে। এবং একজন তাহাদের মধ্যে স্কুটোম্মুখও হইয়াছেন। কালচারের স্বেয়োজন যদি বরাবর সেখানে থাকে এবং তাহার পাশে যদি রীতিমত একটি কলাভবন গড়িয়া উঠে, তবেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের কাজ ঐ আশ্রমের ভিতর দিয়া সার্থক হইবে এবং এদেগে শিল্পের নব উদ্বোধন হইবে আশা করিতে পারা যায়। তখনই শিল্প ও ধর্ম উভয়ের মিলনে যে কি অপূর্ণ একটি শোভা খুলিয়া যায় তাহা চক্ষে দেখা যাইবে। ধর্মশিক্ষাও যেমন ধর্মবিদ্যালয়ে বা ধর্মমন্দিরে হয়না, শিল্পশিক্ষাও তেমনি শিল্পবিদ্যালয়ে হয় না—যেখানে শিল্পরসিক ও ধর্মপ্রাণ ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের আশ্রম, সেইখানেই শিল্প ও ধর্মের যথার্থ সহজ শিক্ষা হইতে পারে। কারণ, জীবন হইতেই জীবন হয়, কল হইতে জীবন হয় না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিরোধ

(Emile Senartএর করাঙ্গী হইতে)

জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী খুব অল্পই আছে। ঐ-সব কাহিনী যেমন নগণ্য তেমনই বিরল।

উহার রূপকের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত এবং উহাদের মধ্যে কোন গভীরতা নাই। যে কাহিনীটা সর্বাপেক্ষা পরিব্যাপ্ত এবং যাহা আমরা পূর্বেই অবগত হইয়াছি তাহা সেই কাহিনী যাহাতে আছে—ব্রাহ্মণ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাছ হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, ও পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। যেখানে উহা গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে, যেমন মল্লব গ্রন্থে—যেখানে স্পষ্টই দেখা যায়, উহা একটা ঘোড়াতাড়া মাত্র—সেই মনুতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি-সংক্রান্ত মতবাদে উৎপত্তির যে ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, সেই ক্রমটি ঐ কাহিনীর দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। রামায়ণে, বিবাতের সর্বশেষে, কাশ্যপের পত্নী মনু হইতে, জাত-সকল বাহির হইয়াছে এইরূপ প্রতীতিমান হয়। যেমন ইরান দেশের তিন শ্রেণী—হয়, প্রথম রাজা জিমা হইতে—নয়, মহা ধর্ম প্রবর্তক জরথুষ্ট্রা হইতে পদ্যায়-ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল—ইহাও কতকটা সেইরূপ।

কতকগুলি “ব্রাহ্মণ” গ্রন্থে যে পাঠান্তর আছে সে শুধু বাচ্চাতুরীমাত্র অথবা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধীয় শব্দবিশ্বাসমাত্র। উহার মধ্যে কোন গাভীর্ঘ্য নাই, ভাবার্থের ব্যাপকতা নাই। জীবের উৎপত্তিবিষয়ক দার্শনিক আলোচনার মধ্যে জাতকে গণনার মধ্যে আনা হয় নাই। ভবিষ্যতে প্রত্যেক জাতের জুগ্ম এক-একটা বিশেষ স্বর্গলোক নির্ধারিত আছে—এই আত্মসঙ্গিক কথাটি ছাড়া, জাতের আবির্ভাব সম্বন্ধে এমন কোন কার্যকারণমূলক যোগাযোগের উল্লেখ নাই যাহার বিশেষ কোন প্রামাণিকতা বা স্থায়িত্ব আছে।

এই-সকল ব্যাখ্যা “টুলো পণ্ডিতী”, ধরণের ও পঞ্চাং-কালের, উহা চতুর্ধ্ব-পদ্ধতির দ্বারা অল্পপ্রাণিত; কেননা, এই পদ্ধতিটা সমগ্র ঐতিহ্যের মধ্যে অল্পপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে। আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি, পূর্বে অনেক-স্থানেই কাছাকাছি জাতের মধ্যে প্রায়ই প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিত। কোন একটা বিশেষ অধিকার লইয়া এই

বিরোধের আশ্রয় জলিয়া উঠিত। পুরাকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেণীগত প্রাধান্য লইয়া যে বিরোধ হইত তাহার সহিত উক্ত জাত-গত বিরোধের কোন প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না।

বিশেষ অধিকারাদির সীমানির্দেশ, পুরোহিত ও অভি-জাত-শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার সামঞ্জস্য—এই-সমস্ত কার্য্যত গোড়া হইতেই স্থির নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বচনাদির দ্বারা এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অবশ্য একথা আমরা স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে সংশয় করিতে পারি না। আমরা জানি,—ব্যবহারে যাহা শিথিলভাবে ভাসমান, নিয়মের কঠোরতাই সেই ভাসমান জিনিসগুলিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পুরোহিত সম্প্রদায়—যজ্ঞাহুষ্ঠানের অধিকার ও শাস্ত্রাধুশীলনের অধিকার যতই সম্বন্ধে রক্ষা করিবার চেষ্টা করুক না কেন, পুরাকালে বিশেষত আদিমযুগে,—ইহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ধর্মশিক্ষার অধিকারপ্রাপ্ত অধিপতির অনেক স্থলেই নিজেই ব্যবস্থাপক হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক বৈদিক ছন্দের রচনা ক্ষত্রিয়দের প্রতি—এমন-কি বৈশ্বদেবের প্রতিও আরোপিত হইয়া থাকে। বৈদিক স্মৃতিতে, পুরোহিত রাধিবার জন্ত অধিপতিদিগকে যে পুনঃপুনঃ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ বোধহয়, অধিপতির এই কর্তব্য প্রায়ই লঙ্ঘন করিতেন। অনেকস্থলেই ক্ষত্রিয় সম্ভানেরা এই কার্য্য সম্পাদন করিত। কোন কোন রাজার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে পৌরোহিতিক সাহিত্য সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ইহা বোধহয় “ব্রাহ্মণ” গ্রন্থাদিতেও পরিলক্ষিত হয়। যে-সব গ্রন্থে ব্রাহ্মণিক মতবাদ পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, সে-সব গ্রন্থেও, ব্যতিক্রমস্থলে, কোন ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্বকে গুরুরূপে বরণ করা যাইতে পারে এইরূপ উপদেশ আছে।

তা-ছাড়া আমরা এরূপ কতকগুলি ব্রাহ্মণবংশীয় ও রাজবংশীয় রমণী দেখিতে পাই না কি, যাহারা ধর্মতত্ত্ববিদ্যা ও তর্কবিদ্যা দিগ্বিজয়িনী বলিয়া পৌরাণিক কাহিনীতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে?

এরূপ একটা দৃষ্টান্তও আছে,—ব্রাহ্মণেরা বিদেহরাজ্যের জনক রাজার জ্ঞানগরিমার কীর্ত্তন করিয়া, পরিশেষে যেন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, জনক রাজা ব্রাহ্মণ

হইয়াছেন। এইরূপ পদোন্নতির সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বিশ্বামিত্রের কাহিনী হইতে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে যে একটা দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাহা বৈদিক স্মৃতির মধ্যে নির্দেশিত হইয়াছে। রাজা সৌদামের অমুগ্রহে কে তাঁহার পুরোহিত হইবে, বোধ হয় ইহা লইয়াই বিবাদ। স্মৃতির বচনগুলি অস্পষ্ট এবং উহাদের বোগাযোগ সংশয়াস্কর। সে যাহাই হউক, গোড়ার গল্পটি, মহাকাব্যের মধ্যে, বহু পাঠান্তরে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিশ্চিত কথা এইটুকু যে, কে অলৌকিক ধেমু “স্বভি”কে অধিকার করিবে, কে সমস্ত ব্রতনিয়ম পালন করিবে ইহা লইয়াই উক্ত দুই মহর্ষির মধ্যে ভয়ানক যুঝাযুঝি হইয়াছিল। বিশেষত কুশিক রাজবংশের বংশধর বিশ্বামিত্র অতি কঠোর তপশ্চর্যা করিয়া ব্রাহ্মণপদে অধিকৃত হন। এই ধরণের বিবরণ হইতে জ্ঞাতের ইতিহাসসংক্রান্ত দলিল সংগ্রহ করা একটা মহাবিভ্রম সন্দেহ নাই। উহা হইতে এই মাত্র স্মৃতি হয় যে, ব্রাহ্মণশ্রেণীর বিশেষ দাবী সম্বন্ধে, যজ্ঞাহুষ্ঠান প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকার ব্রাহ্মণের কখনই ছিল না; বিশেষত, যে যুগের বিবরণ আমরা পাইয়াছি, সেই যুগে, ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর উচ্চাভিলাষের একটা প্রধান বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণ-পদে অধিকৃত না হইয়া ক্ষত্রিয় কখনই শাস্ত্র স্পর্শ করিতে পারে না, এই কথা স্বীকার করিলেও ব্রাহ্মণের বিশেষ-অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অতীব কঠোর পণে অর্জিত এই অতীব বিরল নিয়মের ব্যতিক্রমটা নিয়মকেই দৃঢ়ীভূত করে। উহা হইতে সপ্রমাণ হয় না যে, জ্ঞাতের পরিবর্তনাদি শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছিল, অথবা উক্ত কাহিনী জ্ঞাতের পদ্ধতি হইতেও প্রাচীন। বরং এই অসম্মানই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় যে, যে নিয়মে ব্রাহ্মণই যজ্ঞাহুষ্ঠানাদির বিশেষ অধিকারী হইয়াছে—(যে নিয়ম আদিম কালে অজ্ঞাত ছিল বলিলেও হয়) অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল অপেক্ষা পুরাকালে সেই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম হইত, কেননা আদিম কালে গার্হস্থ্য পদ্ধতির মধ্যে বাহিরের কেন লোককে পুরোহিত পদে বরণ করা হইত না। পিতাই পৌরোহিত্য করিতেন।

কাহিনীগুলোকে ইতিহাসের মূল্য দেওয়ায় বিপদ আছে। অতি সতর্কতার সহিত ও অতি সন্তর্পণে এই বিষয়ে হস্তার্পণ করা উচিত।

মহাকাব্য হইতে, পুরাণ হইতে কতকগুলি বিবরণ ভ্রমসহকারে সংকলন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণের প্রতি কোন কোন রাজা কিরূপ জবদস্তি করিতেন, কিরূপ তাহাদিগকে শাস্তি দিতেন। যথা :—বেণে রাজা পুরোহিতদিগকে যজ্ঞান্বেষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ;—পুরুষবেরা ব্রাহ্মণদের ধন হরণ করিয়াছিলেন, নহষ সহস্র ব্রাহ্মণ দিয়া তাঁহার রথ টানাইয়াছিলেন—এইরূপ অসংখ্য কাহিনী। প্রাধান্যের জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাহ উহাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকারের স্বতন্ত্র বাস্তবিকই উহাতে প্রতিভাসিত হইয়াছিল কি না, যদি কেহ সন্দেহ করে, তবে সে নিন্দনীয় হইবে কি ?

এই প্রসঙ্গে সব-চেয়ে বেশি ইঙ্গিত পাওয়া যায় পরশুরামের ইতিহাস হইতে সন্দেহ নাই। জমদগ্নি ব্রহ্ম পরশুরাম ভৃগু-বংশীয়। একদিন রাজা অর্জুন জমদগ্নির আশ্রমে সাদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞের বলি একটি গাভীর বংশ হরণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেন। পিতৃসম্মানের প্রতিশোধ লইবার জন্য জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রকুল ধ্বংস করেন। ব্যাপারটা এতদূর গড়াইয়াছিল যে, এই কাহিনীর কোন কোন পাঠান্তর অনুসারে,—সমস্ত বৌদ্ধবর্গ অস্তব্র্হিত হওয়ায়, পৃথিবীতে লৌকিক প্রভু আর রহিল না ; ব্রাহ্মণদিগের সমাজগঠন পদ্ধতিতে, যাহার দ্বারা সমাজের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, সেই সামাজিক সামঞ্জস্যের অপরিহার্য উপাদানটি বিনষ্ট হইল। এবং সামঞ্জস্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্ষত্রিয় বিবাদের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়া নূতন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করা আবশ্যক হইল। আসলে এই বিবরণের মূলকথাটি কি ? ইহা হইতে কি প্রতিভাত হয়, অভিজাত বর্গ ও পুরোহিত বর্গের মধ্যে একটা ব্যাপক সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল ? আমি স্বীকার করিতেছি, সিদ্ধান্তটি অত্র বিচারকেরা যত স্পষ্ট বলিয়া মনে করেন, আমি ততটা মনে করি না। কিন্তু ইহার ভুল দেখাইবার জন্য কষ্ট স্বীকার কবা নিরর্থক। অবশ্য

এই কাহিনীতে আর কিছু না হউক, অন্তত এইটুকু প্রমাণ পায় যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একটা “ধন-কষাকষি” ছিল।

ব্রাহ্মণেরা যে আধিপত্য বিজয়যন্ত্রে অর্জন করিয়াছিল, এবং যাহা শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্যন্ত দৃঢ়ীভূত কবিত হইয়াছিল—সে আধিপত্য কখনই বিনা বিবাদে স্থপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। সকল যুগেই, বৈদিক যুগেই, ব্রাহ্মণের আরম্ভ করিয়া, ব্রাহ্মণদের সকল গ্রন্থেই, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন জোরালো ও অতিরঞ্জিত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, এই সম্বন্ধে সফলতা লাভ করাই তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। একথা ঠিক যে, অথর্ববেদের কতকগুলি স্মৃতি হইতে সেই যুগের আভাস পাওয়া যায় যে-যুগে অন্ততঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধের অনেকগুলি উদাহরণ আছে। তাছাড়া অভিজাত-শ্রেণীর প্রতিনিধিস্বরূপ রাজাদের যে আধিপত্য ও প্রতিপত্তি সর্বকালেই ছিল, পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রতি লোকের অন্ধ ভক্তিও সে আধিপত্য ও প্রতিপত্তিকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, “রাজকীয় (ক্ষত্র) শক্তির উপরে আর কিছুই নাই।” তাহার পরেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, ধর্ম-বীর্ঘ্যের (ব্রহ্ম) স্বজনী শক্তিব দ্বারা ক্ষত্রিয় উৎপাদিত হওয়ায়, স্বকীয় উৎপত্তিস্থানকে ক্ষত্রিয়ে বসমান প্রদর্শন করা উচিত ; এই স্বীকারোক্তিটিতে অস্পষ্ট কিছুই নাই। বৌদ্ধধর্মে বৌদ্ধবর্গের শ্রেষ্ঠতা স্বেচ্ছাপূর্বক স্বীকার কবা হইয়াছে ; এই শ্রেষ্ঠতাব দলনই, শাক্যমুনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম হইতে এই কথাটা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সাক্ষ্য ততটা সংশয় করা যাইতে পারে না। “ধর্মপদ” একটি প্রাচীন ও প্রামাণিক বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহাতে ব্রাহ্মণ মানবিক শ্রেষ্ঠতাব মুর্ত্তমান আদর্শ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের যুগ হইতে বৌদ্ধ যুগ পর্যন্ত জাতের পদ্ধতিটা পূর্ণ প্রত্যাপে বিরাজমান।

কি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ, কি নিয়মের ব্যতিক্রমে এক বর্গ হইতে বর্ণান্তবে সংক্রমণ—ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় না যে, জাতটা তখন অসুস্থাবস্থায় ছিল। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুঝাযুঝি, প্রভাব-বিশেষের মধ্যে যুঝাযুঝি, সকল

যুগেই ছিল। খুব বিভিন্ন সামাজিক গঠনের মধ্যেও এই যুগাযুগের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই-সকল ঘটনা, জাতের অমূরূপ কোন অস্তিত্বকে বর্জনও করে না—আবার উহা হইতে জাত বুঝাইয়া যায়—এরূপ মনে করিতেও দেয় না।

জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যে প্রথম-দলিলের সাফ্য প্রাপ্ত হই তাহা সেই নিয়ম-পদ্ধতি যাহা জাতকে নিয়মের দ্বারা বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছে। পৌর্বোহিতিক সাহিত্যের খুব প্রাচীন যুগ হইতে, এমনকি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদিক স্কন্ধের নিম্ন স্তরের মধ্যেও ইহাব আবির্ভাব দেখা যায়।

যে-সকল তথ্যকে এই পদ্ধতি সংহিতাবদ্ধ করিয়াছে, নূতন করিয়া গুছাইয়াছে, সেই পদ্ধতি স্বভাবতই তথ্য-সমূহের পববর্তী। যখন পদ্ধতিটির আবির্ভাব হয়, তখন জাত জিনিসটার অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া গিয়াছিল বলিতে হইবে। কিন্তু সে কোন কাল হইতে? সে কথা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব। শুধু জাত যে বিদ্যমান ছিল তাহা নহে, সমস্ত হইতেই সূচিত হয় যে, জাতের বর্তমান অবস্থার মতই তখনকার জাতের অবস্থা ছিল। শাস্ত্রের বচনাদি হইতে ইহা অবশ্য সপ্রমাণ হয় না; কিন্তু উহা হইতে জাতের রহস্য অনেকটা বুঝা যায়, তৎসম্বন্ধে অনেকটা আলোক পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদ বাস্তবকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, মিথ্যায় পরিণত করিয়াছে। বাস্পীভূত অতীত ও জীবন্ত তথ্য এই উভয়ের মধ্যে একটা কৃত্রিম রক্ষার দ্বারা এই মতবাদ, জাত-ভেদ ও শ্রেণীভেদের এক করিয়া ফেলিয়াছে, জাতকে প্রাচীন শ্রেণীভেদের স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়াছে। জাতের আকারে পরিণত এই-সকল শ্রেণীর একটা নাম দেওয়া হইয়াছিল যাহা প্রথমে “জাতি-ভেদের” (জাত নহে) ভুল্য অর্থ ছিল। এই সৌসাম্যবিশিষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গঠনবিজ্ঞানের মধ্যে, যেমন একদিকে বাস্তব জাত সংক্রান্ত গোলযোগ ও জটিলতার কতকটা ছায়া আদিয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ দ্বিতীয় নক্সায়, একটা বাঁধাবাধি কৃত্রিম নিয়ম-বিজ্ঞাস দ্বারা উহাকে ঢাকিয়া রাখাও হইয়াছে, যেমন সমস্ত জাতসংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

অতএব সাহিত্য এই সংকট হইতে আমাদেরকে

উদ্ধার কবে না। সাহিত্য আমাদের জ্ঞান না-রাখিয়াছে একটা পাকা-বকমের ঐতিহাসিক শৃঙ্খলা, না-রাখিয়াছে সুস্পষ্ট পূর্বস্বূতিপরম্পরা। যদিও আমার প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, মনোযোগী পাঠক, হিন্দু-ঐতিহাসিক অস্পষ্টতার উদাহরণ এবং আমাদের কৌতূহল-পথে কত বাধা আছে, ও কতটা সতর্কতার সহিত এই পথে চলিতে হইবে তাহাব একটা শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ যদি ইহা হইতে পাইয়া থাকেন তা হইলে অন্ততঃ কতকটা সন্তোষ পাইবেন।

গোড়ার উৎপত্তি-সমস্তাব নিকট সাক্ষাৎভাবে উপনীত হওয়া ভিন্ন আমাদের গতাস্তব নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চরত্ন

(টুর্গেনিভের গদ্য কবিতা)

ভিখারী

পথ দিয়া চলিয়াছিলাম। এক জরাজীর্ণ বুড়ো ভিখারী আসিয়া আমাকে থামাইল।

লাল লাল চোখ জলে টলটল করিতেছে, ঠোঁট দুখানা নীল, গায়ের কাপড় ময়লা মোটা শতছিন্ন ন্যাকড়া, সারা অঙ্গে রক্ত পুঞ্জ আর ঘা। হায়, দারিদ্র্য কি বিকট রাক্ষসী-মুষ্টি ধরিয়া হতভাগাকে গিলিয়া ফেলিতেছে!

সে তাহাব একখানা কর্কশ ময়লা বাতে-ফোলা হাত আমার সামনে পাতিয়া ধরিল। যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করিতেছে; কথা বাহির হয় না। বিভ্রিড় করিয়া অতি কষ্টে বুঝাইতে চাহিল, সে দয়ার ভিখারী।

আমি দুই হাতে পকেট হাতড়াইতে লুপ্ত কবিতাম। নাই, নাই, কিছুই নাই; টাকার খলি নাই, একখানা রুমালও নাই। শূন্য হাতে আজ বাহির হইয়াছিলাম। ভিখারী তখনও আশায় দাঁড়াইয়া, তাহার বাড়ানো হাতখানা বড় দুর্বল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

লজ্জায় দিশাহারা হইয়া আমি আগ্রহভরে তাহার সেই ময়লা কম্পমান হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, “ভাই, আমার যে কিছুই নেই ভাই।”

ভিখারী তাহার রক্তহাথি তুলিয়া আমার দিকে তাকাইল। তাহার নীল ঠোঁট দুখানা হাসিতে ভরিয়া উঠিল। সেও তাহার ঠাণ্ডা কনকনে আঙুলগুলো দিয়া আমার হাতখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল।

সে আবার অফুটস্বরে বলিল “তা’তে কি ভাই?—এর জন্তেও ধন্যবাদ। ভাই এও যে একটা মহৎ দান!”

বুঝিলাম, আমিও আজ আমার ভাইএর কাছ থেকে একটি দান লাভ করিয়াছি।

• • •

কুকুর

আমরা দুটিতে ঘরে বসিয়া—আমি আর আমার কুকুর।

বাহিরে ভীষণ ঝড় গর্জন করিতেছে। কুকুরটি আমার নাম্নে বসিয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া আছে।

আমি তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। সে যেন আমাকে কি বলিতে চায়! সে যে মুক, তাহার যে ভাষা নাই, তাহার মনের কথা সে নিজে বোঝে না—কিন্তু আমি তাহার মনটি দেখিতে পাইতেছি।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, এই মুহূর্ত্তে তাহার ও আমার মনে একটি কথাই জাগিতেছে। বুঝিতেছি, তাহাতে আর আমাতে কোনো প্রভেদ নাই। আমরা এক। দুইজনের অন্তরে সেই একটি কম্পমান শিখাই জলিতেছে।

মৃত্যু তাহার হিম-শীতল বড় বড় পাখার ঝাপটে দিক কাপাইয়া নামিয়া আসিতেছে।

এইবার শেষ।

আমাদের দুইজনেরই মধ্যে যে কিসের অগ্নিকণা জ্বলিতেছিল, তাহা কে বুঝিবে?

না, না; এই যে আমরা দুইটিতে দুই জনের দিকে চাহিয়া আছি, আমরা ত মানুষ ও পশু নয়, আমরা দুজনেই প্রাণী।

এই যে দুই জোড়া চোখ পরস্পরের উপর স্থাপিত, ইহা ত’ সমদর্শীরই চোখ।

এই পশু ও মানুষের ভিতর একই প্রাণ ভয়ে অপরের কাছে ঘেঁসিয়া আসিতেছে।

• • •

বাঁধাকপির ঝোল

এক বিধবা কৃষকবধূর একটিমাত্র ছেলে। ছুড়ি বৎসরের তরুণ যুবক, গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারিগর। একদিন সে মরিয়া গেল।

গ্রামের মালিক এক মহিলা। বিধবার দুঃখের কথা শুনিয়া কবরের দিনেই তাহাকে দেখিতে গেলেন।

দেখিলেন সে বাড়ীতেই আছে।

ছুড়ে-ঘরের মাঝখানে টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া ডান হাতখানা সমান তালে চালাইয়া সে ধীরে ধীরে একটা কালো বাটির তলা হইতে এক এক চামচ করিয়া পাতলা জ্বোলো বাঁধাকপির ঝোল তুলিতেছিল আর খাইতেছিল। বাঁ হাতখানা অলসভাবে পাশে ঝুলিতেছিল।

বিধবার মুখখানি শুষ্ক ম্লান।

কিন্তু সে গির্জাব উপাসিকার মতো আপনাকে ঠিক খাড়া করিয়া রাখিয়াছে।

মহিলা ভাবিলেন, “হা ভগবান, এমন দিনেও এর খাওয়া আসে! বাস্তবিক এই লোকগুলোর কি একজনকেও হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই?”

তখন তাহার মনে পড়িল, কয় বৎসর আগে তাহার ছোট নয় মাসের মেয়েটি যখন মারা যায়, দুঃখে তিন পিটাস বর্গের কাছের অমন সুন্দর বাগান-বাড়ীতেও যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সমস্ত গ্রীষ্মকালটাই শহরে কাটাইয়াছিলেন!

সেই জীলোকটি তখনও ঝোল খাইতেছিল।

মহিলা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া ফেলিলেন, “টাটিআনা, বাস্তবিক! অবাক কাণ্ড! ছেলের জন্ত তোমার কি কোন দুঃখ নেই! একি সম্ভব? তোমার ক্ষুধা তুমি দূর হয়ে যায়নি! একি আশ্চর্য ব্যাপার? কি করে তুমি এখন ঝোলটা খাচ্ছ?”

বিধবা শাস্ত্বরে বলিল, “আমার ভাসিয়া আর এ-জগতে নেই,” বলিতে বলিতে তাহার শুকনো গাল বাহিয়া আর-একবার বেদনার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। “আমারও এইবার শেষ নিশ্চয়; আমার জীবন্ত শরীর থেকে হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু ঝোলটা ত আমি নষ্ট করতে পারি না ওতে যে মন আছে।”

মহিলা অবজ্ঞাভরে ঘাড় দোলাইয়া চলিয়া গেলেন।
হুনের জন্ত ত তাঁহার বেশী কিছু লাগিত না।

চড়াই পাখী

শিকারের শেষে বাগানের পথে বাড়ী ফিরিতেছিলাম।
পথের দুইধারে গাছের সারি। কুকুরটা আমার সামনে
দৌড়াইয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ তাহার গতি মূহু হইয়া আসিল; যেন চুপিচুপি
শিকারের পিছন লইয়াছে।

গাছের সারির দিকে চাহিয়া দেখি, একটা ছোট
চড়াই পাখীর ছানা, ঠোট ছুটি হৃদে, পাখায় নরম নরম
পালক। বাসার উপর থেকে পড়িয়া গিয়াছে (ঝড়ে তখন
পথের ধারের বটগাছগুলি ভয়ানক ঢুলিতেছে); বেচারার
নড়িবার ক্ষমতা নাই, তাই অসহায়ভাবে অপূর্ণ ভানা
দুখানি নাড়িতেছে।

কুকুরটা আস্তে আস্তে তাহার দিকে যাইতেছিল;
হঠাৎ তখনই কাছের একটা গাছ হইতে কালো-ঠোটওয়ালা
একটা বুড়ো চড়াই পাখরের মতন ঠিকরাইয়া ঠিক তাহার
নাকের সামনে আসিয়া পড়িল; তাহার পালকগুলো
এলোমেলো, ভয়ে সে দিশাহারা। নিরাশায় কাতর
হইয়া বেচারী কিচ্‌মিচ্‌ কবিত্তে করিতে ছই ছই বার
কুকুরটার ঠাঁ-করা মুখের ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলোর সামনে
গিয়া আছড়াইয়া পড়িল।

ছানাটাকে বাঁচাইবার জন্ত কি লাফালাফি! তাহাকে
আড়াল করিয়া তাহার সামনে গিয়া পড়িতেছে... কিন্তু
বেচারার ছোট শরীরটুকু ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে;
তাহার গলার স্বর কর্‌কণ, অজুত; ভয়ে অজ্ঞান হইয়া সে
নিজেকেই শত্রুর মুখে ধরিয়া দিল।

কুকুরটাকে তাহার না জানি কি ভীষণ একটা দানবই
মনে হইয়াছিল। কিন্তু তবুও সে বিপদ হইতে দূরে
গাছের সেই উঁচু ডালটিতে বসিয়া থাকিতে পারে
নাই। তাহার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল আর-একটা শক্তি
তাহাকে টানিয়া নীচে আনিয়া ফেলিল। আমার 'ট্রেনার'
একেবারে চূপ, সে আরও হঠিয়া আসিল। সেও সেই
শক্তিকে চিনিয়াছে।

আমি পরাক্রান্ত কুকুরটাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিয়া
শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম। সত্যি তাই, তোমরা
হাসিও না। ওই ছোট বীর পাখীটির ভালবাসার শক্তি
দেখিয়া আমার হৃদয় তাহার কাছে শ্রদ্ধায় নত হইল।
আমাব মনে হইল, মৃত্যুর চেয়ে প্রেম প্রবল, মরণ-ভীতির
চেয়েও প্রবল। ইহারই শক্তিতে, এই প্রেমেরই শক্তিতে
জীবনের স্থিতি ও উন্নতি ও গতি।

আমরা যুবকরা চলিব

কত তুচ্ছ ছোট ঘটনা এক এক সময় মানুষের সমস্ত
জীবনটাকেই বদলাইয়া দেয়।

একদিন বিষন্ন মনে রাজপথ দিয়া চলিয়াছিলাম।

একটা গভীর দুঃখের আশঙ্কায় আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত
হইয়া ছিল। নিরাশায় আমি অবসন্ন। আমি মাথা
তুলিলাম। আমার সামনে ছই সারি উঁচু উঁচু পপুলার গাছের
ভিতর দিয়া পথটি তীরের মতন স্বদূরে চলিয়া গিয়াছে।

পথের ওপারে, আমার পাঁচ হাত দূরে, গ্রীষ্মকালের
ঝলমলে সোনালি রোদের মাঝখানে একদল চড়াই পাখী
একে একে নাচিয়া চলিয়াছে। গর্বভরে, অপরূপ ভঙ্গীতে
আত্মনির্ভরশীলের মতন তাহারা নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে!

তাহাদের মধ্যে একজন আবার নির্ভীক স্বরবে মহা
উৎসাহে তাহার ছোট বুকটি ফুলাইয়া একদিকে হেলিয়া
লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে। উদ্ধতের মতন কিচ্‌মিচ্‌
করিতেছে, যেন বলিতে চায় 'আমি কাহাকেও ভয় করি
না।' বাস্তবিক সে একটী সাহসী যোদ্ধা।

এদিকে মাথার উপর আকাশে একটা বাজ উড়িতে
আরম্ভ করিল; বোধ হয় ওই ক্ষুদ্র যোদ্ধারই যম।

আমি চাহিয়া দেখিলাম, দেখিয়া হাসিলাম। গা-টা
ঝাড়া দিয়া ফেলিতেই যেন যত বিষাদ যত দুঃখিতা উড়িয়া
চলিয়া গেল। আবাব নূতন করিয়া যেন আমার মধ্যে
তেজ বীর্ঘ, ও জীবনের উন্নতির উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

আমাব জীবনের বাজ মাথার উপর উড়িতেছে, উড়িতে
দাও।

আমরা বুঝিয়া চলিব, আর সকল ভয়কে তুড়ি দিয়া
চলিয়া যাইব ।

শ্রীশান্তা দেবী ।

চারের হার

দুঃখজিতা ।

অন্নপূর্ণা, তবে করে ভিক্ষা লভিবারে
সাধ করে হইয়াছি শাস্ত ভিখারী ।
যাচিয়া লয়েছি আমি অনন্ত তৃষ্ণারে
লভিবারে তব করে চির শীত বারি ।
তোমার অঞ্চল-স্নেহ লভিতে নয়ন
হয়ে' আছে যুগে যুগে অশ্রু নিলয়,
ব্যথিরে করেছে আমি এ বেহে গ্রহণ
তব কর-কিসলয়ে হতে নিরাময় ।
স্বধাবাক্য শুনিবারে করি অভিমান,
মমতা লভিতে করি বিরহ স্রবন,
শয়নে নয়নে শুধু করি নিদ্রাভান
জাগিয়া উঠিতে লভি' তোমার চুম্বন ।
ঝরাইতে অশ্রুজল তোমার নয়নে
জনমে জনমে আমি বরি গো মরণে ।

প্রাক্তনী ।

কতবার স্বয়ংবর-সভা তেয়াগিয়া
এ কাঙাল-কণ্ঠে দেছ তব বর-মালা ;
ঘুরিয়াছ বনে বনে আমার লাগিয়া,
কতবার সাজায়েছ মম পর্ণশালা ।
কতবার রাখিয়াছ সতী-তেজোপুণে
শমনের দণ্ড হতে আমার জীবন ;
কতবার সাজায়েছ অসি আর তুণে,
রথরশ্মি কতবার করেছে ধারণ ।
তোমা হেরি আজি মোর মনে হয় তাই
কিছুই তোমার আজি নহেক নুতন,
হে সহ-ধর্মিণী হেথা কিছু শিখ নাই,
সবি চির-পরিচিত প্রবুধ প্রাক্তন ।

কত ভয় হতে তুমি মিলি মোর সনে
বাঁচায়ে রেখেছ মোর মানস-জীবনে !

রূপময়ী ।

তুমি মোর আশি-তারি, তুমি মোর আলো,
তুমি মোর অন্ধ-ক্লান্ত-নেত্র-সজীবন,
এই বিশ্বখানি মোর লাগে বড় ভালো
তোমার স্বচ্ছতা দিয়ে নেহারি যখন ।
বিশ্বেরে দেখালে তুমি ইন্দ্রধনু-সাজে,
লক্ষ কোটি শিখী যেন পাখা মেলে নাচে ;
সব রস ভাব মায়া রূপ হয়ে রাজে,
সব মঙ্গল যেন ঘুরে কাছে কাছে ।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা দীপ খদ্যোতিকা
মাণিক্য ওষধিরশ্মি গড়েছে তোমায়,
শত জনমের মোর স্বপ্ননীরহারিকা
কেন্দ্রীভূত পুঞ্জীভূত তব প্রতিমায় ।
তুমি যাতে নাহি তাহা মায়া আবছায়া,
ঘনীভূত অন্ধকার, নাহি বর্ণ কায়া ।

রসময়ী ।

আনন্দ-মদিরা তুমি নিত্য রসায়ন,
তোমাতে পিইয়া মোর চিত্ত ঢুলুঢুলু,
রসের নির্ঝর, লভি তোমার জীবন
আমার জীবন-নদী বহে কুলুকুলু ।
তুমি কিগো মধুগন্ধা এলে এ ধরায়
বিভূপাদপদ্মযুগে জনম লভিয়া ;
স্বধাসিদ্ধ-বিমণ্ডিত মন্দির-শাখায়
তোমার অঙ্গুলিগুলি ফুটল কি প্রিয়া ?
কটু তিক্ত কষাণের সপ্তবর্ণ-রসে
সঞ্জাত তোমার দুগ্ধস্বয় অমল,
রক্তিম আনন্দে হাস্য অধর বরষে,
দুগ্ধ-সরোবরে যেন কোকনদ-দল !
ইহেরে করেছে প্রিয়ে স্পৃহনীয়তম,
জীবনে করেছে ঘন চুম্বনের সম ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

পাপ স্বীকার

(গল্প)

আমি তখন বাইরের দিকে চেয়ে জানালার কাছটিতে খুব গভীর ভাবে জড়সড় হয়ে বসে ছিলাম। মেঘলা দিনের উল্লাস বাতাস সাবাট। আকাশময় মাতামাতি করে ফিরছিল।

বৃষ্টি,—সে অবিরাম বৃষ্টিতে দুপুরের জাঁকালো ঝাঁঝালো চেহারা সাঁঝের ছায়ায় কালো করে দিয়েছিল।

বৃষ্টি,—সারাদিন বৃষ্টি। গায়ের উপর কাপড়টা ভাল করে টেনে দিয়ে বাইরের দিকে চাইলাম, দূর থেকে কে আসছে, নয়? হাঁ তাইত, কিন্তু যাঃ—ভেবেছিলাম, মিঃ দত্ত কি রায়েরা কেউ যদি আসে, বেশ গল্প করে অবসর সময়টা কাটানো যাবে এখন।

—বুড়ো মাহুঘ, বাতে পধু হয়ে গিয়েছে, হুয়ে হুয়ে পিছল পথ দিয়ে যে কষ্ট করে আসছিল, দেখে ভারী দুঃখ হল। রোজই প্রায় বুড়ী এ পথ দিয়ে যায়। কোন দিনই আলাপ না থাকলেও বেশ চিনি যে তিন কুলে কেউ নেই এক বুড়ী, এক কুড়ানো কাণা মেয়েকে নিয়ে একটা সংসার পাতিয়ে গ্রামের ধারখানিতে বসবাস করে। ঋণাধর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, বারোমাস ত্রিশ দিন গির্জায় আসা যে কখনো দরকার তা তাদের ভুলেও মনে হয় না। এখানে আসার দরকার না হলেও এ রাস্তাটা দিয়ে যাওয়া যে তার রোজই দরকার তা বেশ জানি। কাণা মেয়েটাকে সঙ্গে করে বুড়ী বরাবর ভিক্ষে করত, মেয়েটা বড় হলে পর সে আর ভিক্ষে বেরোয় না। কাজ-টাঙ্গুও কিছু শিখেছে বোধ হয়, মাঝে মাঝে দেখতে পাই বুড়ী নানা রকমের সাজি ভালো চ্যাটাই সব বিক্রীর জগু হাটে নিয়ে যায়, একদিন কাকে বলছিল—মংলী এসব তৈরি করে, আমি বুড়ো দেখতে পাই না কি করে করবো,—হ্যাঁ, মেয়েটাও দেখতে পায় না, মোটেই পায় না, কিন্তু ভারী চমৎকার তৈরী করে, অভ্যেস বাবু, সব অভ্যেস।—এ কি, পথ ভুলল নাকি আজ বুড়ী? এই ঝড়জলে ভিজতে ভিজতে যে আজ গির্জার ফটকে এসে দাঁড়ালো, সত্যিই ত দুয়ার নাড়ছে।—উঠে তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিলাম,

জিজ্ঞেস করলাম,—কি চাই তোমার?

বুড়ী চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে, কি দেখতে পেলে বুঝলাম না, দেখলাম শুধু তার ছোট চোখ ঝোলানো পাতা ঠেলে বড় করবার চেষ্টায় আরো ছোট হয়ে পড়ছে। চার দিক চেয়ে বুড়ী পরম নিশ্চিন্তে সেই খানটায় বসে পড়ল। আমি বললাম—ভিক্ষেই যে, বুড়ো মাহুঘ ভিক্ষে-কাপড়ে অস্থখ করবে, কাপড়-নিংড়ে ফেলো। একখানা কাপড় দিচ্ছি তাই পরো।

অগ্রাহ্যের হাসি হেসে বুড়ী বললে,—কিছুনা বাবু, এতেই যদি অস্থখ বাড়ে কমে ত কবেই মরে যেতাম, তুমিই কি গির্জার বাবু?

আমি বললাম—হ্যাঁ, আমিই এখানকার প্রচারক। কি চাই তোমাব?—

—চাই না কিছু, শুধু দয়া করে বলবেন—যে আমার এমন হল কি পাপে? আমি পাপ স্বীকার করতে এসেছি, সত্যি করে বলুন, কি জন্তে আমার এমন হুঃখু—

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, বুড়ী বললে—আসনখানা টেনে এনে এখানে সোজা হয়ে বসুন, আমি সব কথা বলে যাচ্ছি, শুধু দেখবেন আমার পাপ কি এত বেশী ভারী, যে, তাই জন্তে এই রোগ শোক উপোষের হুঃখু আমি হুদের জায়ে সহিব? হ্যাঁ, কি বলবো—গোড়া থেকেই বলি, সব ঠিক মনে নাই ত, তবু যা হোক শুনুন, যত বুড়ো ভাবছেন আমায় তত বুড়ো আমি নই। আমার বয়সী ঢের লোক খেটে থাকে, আমার এ দশা শুধু রোগে। ব্যায়রামে ভুগে ভুগে চেহারা এই হয়েছে, শক্তি হারিয়েছি; বুড়ো নই তত বাবু, যত ভাবে সকলে। এই সেদিনকার কথা, আমি ছোটবেলা বড় দুঃস্থ ছিলাম, ঝালি পাগলামি আর পাগলামি। কি সময়ই গেছে সে, কি অবোধ সময়, জানতাম না যে আমার বাপ মা কিছুই নেই, পরের দয়ায় খেয়ে বেঁচে আছি।

পরের দয়ামা যে কি রকম, যারা সম্পূর্ণ পরের দয়ায় নির্ভর করে চলে তারা বেশ বুঝতে পারে। যত তোমরা ভাব তত মোলায়েম নয় সে দয়া, আপনার অধিকারে সে রাজার মত হুকুম করে শুধু না, সেই বে-আইনী আইন না মানলে সে দয়ার অধিকার থেকে অতি সহজেই বঞ্চিত হতে হয়। আর সে মাহুঘকে বড় তাড়াতাড়ি জানী ফকর



তোলে, যদিও সে মানুষ কোন দিনই বুদ্ধিমান বলে পরিচিত হতে পারে না। আমার বেশ পরিস্কার জ্ঞান হল যে আমার বাপ মা ভাই তিনকুলে কেউ নেই। কেউ কোনো দিন জন্মের পর থেকে আপন বলে আশ্রয় যত্ন সাহায্য করেনি,—আমি পরের বোঝা হয়েই এতটা বড় হয়ে উঠেছি। আমি তখন বেশ স্পষ্ট করেই সে দয়ার অস্তিত্বটা অনুভব করতে পারছিলাম। তত ছোট বেলায়ই, সেই সাত আট বছর বয়সেই, সে আমাকে বেশ করে জানিয়ে দিয়েছিল, আমার জন্ত সকলকে কত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। রোজ দুবেলা এটা বেশ স্মরণ করিয়ে দিত যে আমার আর কোথাও জায়গা নেই, এখানেই কায়েমী রকমে গিলতে হবে। এই যে বিনা পয়সায় বিনা শ্রমে বসে বসে গিলতে পাওয়া, এ আমার ভারী—ভারী-রকম সৌভাগ্য; আমি সেজন্ত তাদের কাছে যে রীতিমত কৃতজ্ঞ নয় সেটাও আমার স্মরণ করিয়ে দিতে কখনো ভুল হত না।

যাক, তবু সে দয়ায় বেঁচে ছিলাম। আমার পাগলামি, দুরন্তপনা হাসিখেলা সবই সে দয়ার ঠাণ্ডা প্রলেপে বেশ জমে কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

কি বলবো বাবু যদি দেখতে, ছবির মত আমার চেহারা হয়েছিল নিরেট কঠিন। একখানা হাতও যদি কেউ কেটে নিত, তবু মুখে একটা রেখা পড়ত না, চোখ লাল বা সজল হত না; যদি সবাই কোনো কথা বা কাণ্ড নিয়ে হেসে কুটপাট হত, তবু আমার ঠোঁটের কোণ কেঁপে উঠত না, চোখ চঞ্চল হত না। শুধু হুকুমের বেড়ার মধ্যে কলের মত ঘোরা ফেরা করতাম। সে এক অন্তত দিন চলে গিয়েছে।

তারপর,—হাঁ তার পর, সভ্যই ত আমি আর কল নয়। একটা অ্যাস্ত মানুষ, না খেলে খিদে পায়, বেশী খাটলে হাঁপিয়ে পড়ি আর সারা দিনের পরে ঘুমে ঢুলে পড়ি।—সবই যখন ছিল, আমার মন যাবে কোথা? মনও ছিল, আর-সকলের চেয়ে বেশী-রকম ছিল। কারণ আর-সবাই সারাদিনের গোলমালের মধ্যে নিজের মনকে একেবারে ভুলে থাকতো, আমার মন বাইরের আঘাতে আরো সচেতন হয়ে উঠত, ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতো, রীতিমত ক্ষাপা হয়ে উঠত, কি কষ্ট করে যে তাকে সত্যতাম সে আমিই জানি বাবু।

বাইরে দুরন্তপনা যত ধামলো, মন আমার তত দুরন্ত হয়ে উঠল, আমাকে বেশ করে বুঝাতে লাগলো, ওরে কেউই ভাল নয়। এ সারা পৃথিবীতে কেহই ভাল নয়; ভাল বলে একটা জিনিষও এ পৃথিবীতে নেই।

বাইরে থেকে কেউ এসে দুটো ভাল কথা কহিত, আমার মন তখন বেশ বুঝতে পাবতো এ পরের ওপর কিনা তাই, নিজের ঘাড় পড়লে এমুনি এ কথা বদলে যাবে।

যাক, তবু দিন কাটছিল ক্রমে; কিন্তু ঢের উপসর্গ জুটলো, যা ভাঙতো সব আমার নাম; যা হারাত, চুরি যেত সেও আমারি কাজ। সকলকার দাবী দাওয়া মিটিয়ে কারো যদি এমন ঝড়টি সহিতে হয় তো কাঁহাতক টিকতে পারে বাবু?

দোষ?—না, হাঁ দু একখানা ভাঙতাম বৈ কি, সকাইয়েরই যেমন করে যায়। কিন্তু এ যে সব দোষই আমার।

চুরি করতাম না কোন দিনই, হারাত হয়ত দুএকটা। যাক, সেও হয়েছিল, শোনই বাবু,—

একদিন হঠাৎ আড়াল থেকে শুনতে পেলাম, শুনবার মনস্থ করিনি যদিও, তবু শুনলাম, কি তর্ক হচ্ছিল, মোটের ওপর আমার বাবার শচীরেক টাকা ছিল,—এই জিনিস-পত্তর, নগদে, কাগজে এক করে,—সেইটে তারা এতদিনে বেমানুম হজম করে ফেলেছে। হঠাৎ শুনে গা কেঁপে উঠল, কি ভয়ানক! এ আমি কোন দিনই আশা করিনি, যদি জানতামও তবু আমার আশা করা অত্যাশ—এরা আমার খাই-খরচায় সেটা মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই যে দয়ার অনুগ্রহের অত্যাচার, এর দাম কে দেবে? কোনই দাবী নেই জেনে সবই সয়েছিলাম, এবার দাবীর অধিকার পেয়ে মন কেঁপে উঠল, কি দিয়ে, কি রকমে, এ দাবীর দাওয়া মিটাব?

এমুনি, আমি এমুনি চাই!

হঠাৎ বিদ্রোহের সাড়া পেয়ে তারা যত দমন করবার জন্ত লাগল, আমার মনও তত বেশীই অসম্ভব হয়ে উঠল। এক দিন খানিকটা মাল নিয়ে সোজা সরে পড়লাম।

সরে পড়বো আর কোথায়?—যে দিকে দৃষ্টি যায়।

পাড়াখানি ছাড়া কোথাও যে চিনি না। খানিকটা

দূরে গিয়ে মনে হল, এ যে চুরি! বিজোহী মন বন্ধার দিয়ে উঠল, হোক, তবু তাদের চেয়ে ছোট চুরি!

তবু চুরি ত! জ্বিনিসগুলা একটা জ্বলার ভিতর ফেলে দিলাম; ইচ্ছা কবেই এমন ভাবে ফেললাম যে কেউ কখনো না পায়। পরবাব কাপড়খানা ছাড়া আর কিছুই ছিল না আমার। বয়স?—হাঁ, তের চৌদ্দ খুব হবে, বেশীও হয়ত।

যাক, সাবা রাত হেঁটেছিলাম। সে যে কি যাত্রা,—অনির্দেশ যাত্রা, অজ্ঞাত উদ্দেশ্য,—শুধু ভয় আর চিন্তা যে আবার ফিরতে না হয়।

সারা রাতভোর হাঁটলাম, পা ধরে গেল; কোন দিন ত এত হাঁটিনি কখনো।

তবু হাঁটলাম, ভোরে দেখলাম শুধু মাঠ। কাপড় ভিজে ছিল, সঁতারে খাল পার হয়েছিলাম দু তিনটা। রোদ উঠতে মাথা ধবল, দুহাতে মাথা চেপে বসে পড়লাম, সারা গা থর-থর করে কাঁপছে। সেই যে বসলাম, আর পা তুলতে পারিনা, ফুলে এত বড়, আর কি বেদনা বাবু! সেই জীবনে ডাক ছেড়ে কাঁদলাম,—মা, ওমা, কোথায় তুই, আমি যে আর সহিতে পারিনা, আমায় নিয়ে যা। তারপর, আর মনে নাই, যখন চোখ চাইলাম, দেখি একখানি চমৎকার সাজানো ঘরে শুয়ে আছি, এক বাবু কাছে বসে আছেন। চোখ চাইতেই জিজ্ঞেস করলেন কি চাই? থাক, সে অনেক কথা। মোটের ওপর আমি জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, সেখানকার গ্রামের গির্জার বাবু তখন প্রচার করতে রওয়ানা হয়েছিলেন, পথে আমায় পেয়ে তুলে এনে সকলকার হেলাফেলার প্রাণকে অতিরিক্ত যত্নে চিকিৎসায় বাঁচিয়ে তুললেন।

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম; একি মাহুষ না দেবতা!

মনে হল খুষ্টানের জল খেলাম, জ্বাত নষ্ট হল। হোক, আমার আবার জ্বাত কি? আমার জ্বাতে কার কি আসে যায়?

কতদিন সেখানে রইলাম, শান্তিতে ছিলাম। শান্তিতে থাকবারই কথা, কিন্তু কেন জানিনা, মনে শান্তি লাগতো না।

বাবু বললেন তাই বাপ্তাইজ হলাম। ধর্ম কি কোনো দিন জানিওনি শুনিওনি, তিনি অবসর সময়ে খানিক খানিক বলতেন, আমি চেয়ে থাকতাম, কানে কথা পৌঁছত কি না তিনিও জানতেন না আমিও জানতাম না। পড়তে শেখাবার ক্ষমতা যত্ন নিতেন, তাঁর বেশী সময় হত না,—আমি ত তাঁর কাছে পড়বার সময়টুকু ছাড়া বই আর হাতেই নিতাম না। তিনি পড়বার সময় যে কি-রকম পড়া হত, তা দেবতাই জানে। তিনি বলতেন—তোমার মনে নেই হবে কি কবে? আমি বেশী করে ঘরের কাজে মন দিতাম। ঘরের কাজ করে যে এত স্বখ এ আর কোনো দিনই জানিনি। তাঁকে যত্ন করে, একটু আরামে রেখে আমার বুক স্বখে ভরে যেত, তৃপ্তিতে উল্লে পড়তো।

কি স্বর্গের ছবি তাঁর মুখে, কিশান্ত, কিশান্ত, আর কি মিষ্টি! ছ মাসের পর একদিন দেখলাম আর দুখানা ঘর উঠছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হবে এখানে?

তিনি বললেন—তিন বছর স্থায়ী হয়েছি, তাই ওদের আনাব।

প্রথমে অবাক হলাম, কাদের? কথাবার্তায় জ্ঞান হল ঐ ওরা কারা!

কি যে প্রলয় হল মনে, বলতে পারিনা, ভাবতেও পারিনা সেদিনকার কথা। সারারাত কাঁদলাম। কেন কাঁদলাম, কোন আশা করেছিলাম তাই ভেঙেছে বলে? না—না তা ত নয়, এমন অসম্ভব আশা আমার মনে ঠাঁই পায়নি। এখানে থাকতে পাবো না বলে?—চিরজীবন থাকলেও ইনি তাড়াতেন না জানি। তবে কেন, কেন কাঁদলাম? জানিনা কেন। শুধু জানি আমার বুক কেটে যেতে লাগল।

পবদিন কোনো-রকমে জানালাম—আমায় কোনো মিশনে পাঠিয়ে দিন, যেখানে অনেক মেয়ে থাকে। তিনি বললেন—হাঁ আমিও ভাবছিলাম তোমায় নিয়ে কি করি? আমাদের কাছেও থাকতে পারতে, কিন্তু তা হলে ভবিষ্যতের উন্নতির পথ থাকবে না। কোন মিশন জুগ হলেই সুবিধে হয়, বোভিংএ! বেশ থাকবে। তবে তুমি দুচার দিন দেরী করে তোমার বৌদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

আমি স্বীকার পেলাম না, তিনি যেন কিছু দুঃখিত হলেন ; তাঁর মলিন মুখের সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি তখন সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাই, এখানে থাকলে আমার মনের বিপর্যয় কি আরো বেড়ে যাবে না ? আমি কি করে থামাব আমার মনকে ? ছোটবেলা থেকে শাসন করেএল, কিন্তু যেদিন চুরি করে পালালুম, সেদিন ত আর শাসন করবার সাধ্য হল না তাদের। এও যদি তেমন কিছু করি, কি উপায় হবে তখন ? ঈশ্বর রক্ষা কর আমায়, বল দাও আমায় !

যাওয়ার সময় হল, কিন্তু পা যে উঠতে চায়না ;—
তবু যেতেই হবে।

হিন্দু ধরণে পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলাম, শুধু কঁাকা নমস্কারে তৃপ্তি হল না। কিন্তু এ যে আরো অতৃপ্তি কুড়িয়ে নিলাম।

পায়ের উপর মাথা রাখতে পা ভিঙে গেল, তিনিও স্নেহকাতর স্বরে সাস্থনা দিলেন, কত সং উপদেশ দিলেন ; কিছুই কানে গেল না। কি বুঝবেন তিনি আমার ব্যথা !

এলাম সহরে ; সে এক বিচিত্র ব্যাপার, নূতন দৃশ্য ! আমার সবই আশ্চর্য্য ও নিখুঁত মনে হল, কিন্তু কিছুতেই সাস্থনা পেতাম না।

অনেক, অনেক দিন কাটলো। লেখাপড়া কিছু শিখেছিলাম বৈকি, কিছু মনে নেই তার। যাক্ সে কথা, বয়স অনেক হল, সেখানকার জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

বিয়ে করলাম না, করলে এতদিনে মস্ত গৃহস্থালি হত। মন কিছুতেই রাজি হল না।

বিদ্যো ত বর্ণ-পরিচয়, সেও পবিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই ভুলি, ফিরে ফিরে কতবার শিখলাম।

বেশী বয়সে বর্ণপরিচয় করতে লজ্জা হত, তাই, শুধু ঘরের কাজই করতাম।

পঁচিশ উৎরে গেল।

রোজগার করব এমন বিদ্যোবুদ্ধি নেই, ক্ষমতা আছে খেটে খাবার। কর্তৃপক্ষ বেজায় খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, আর চলেনা। চলেনা ত চলই না, আরো ভাল করে লা না যখন আমার টাইফয়েড জ্বর হল। বড়

অনিয়মিত পরিশ্রম করতাম। পরিশ্রমে ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এ বড় অতিরিক্ত। তার পরে শবীরের যত্ন মোটেই নিতাম না। যেন এ পরের মাল, গুদামে পচছে, থাকলেই কি গেলেই কি ?

কি জানি কেমন করে সেরে উঠলাম। হাসপাতাল থেকে ফিরে মন উডু-উডু করতে লাগল। এখানে সবাই বললে তাদের আর আমাকে দিয়ে দরকার নেই, হয় আমি বিয়ে করি নয়তো কোথাও কাজ করি।

কাজ ত ঝি-গিরি ?

হঠাৎ এক কাণ্ড হয়ে গেল, কি-রকম করে এক বুড়ো আরদালীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। তখন কি ভেবে মত দিয়েছিলাম জানি না। আশা ছিল খেতে পরতে পাব। আর এ বুড়োর বাড়ী ঝি-গিরি বউ-গিরি সমানই।

বুড়ো বয়সে স্ত্রী মরে গিয়েছে, এক মেয়ে, আব কোনো সন্তান নেই। সদ্য বিধবা মেয়ে কাছেই থাকে। রোগী মেয়ে, পোয়াতি, দিন চলে না,—তাই কোন রকমে আমার জুটিয়ে নিষে এল। এখানে এসে সেই ছোটবেলাব দৈত্য আমার ঘাড়ে চাপল।

এখানে তেমনি দখার মাহাত্ম্য দেখতে পেলাম, মন বেজায় ক্ষাপা হয়ে দাঁড়াল। বুড়ো বেজায় কঞ্জুষ, খাওয়ার পরেও কষাকষি করে। পয়সা যেন গায়ের রক্ত। কত দিন কাটলো, এক শীতের উষায় বুড়ো মরলো,—আমিও প্রায় বাঁচলাম। হেসো না বাবু, সে স্বামী ছিল না, কখনো না। আর আমিও ত পবিজ কুমারীই ছিলাম, কায় মন প্রাণে।

যাক্ ; সে স্বামী ছিল না ত আমার আছে। কিন্তু বাইরে দশ জনের সাক্ষাতে যখন ছিল, দশ জনের সাক্ষাতে যখন সেটার দাবীও সে করত, তখন সে স্বামীর কাজ করবে না কেন ?

কিন্তু একটি পয়সাও দিয়ে গেল না আমাকে। সবই ওই রোগী মেয়ের,—সে না থাকলে তার ছেলে মেয়ে যা হোক, তাও না থাকলে সে যদি বিয়ে করে তবে স্বামী, তাও যদি না থাকে তা হলে সে যাকে দিতে ইচ্ছা করে দিয়ে যাবে।

এ কি-রকম হল বল দেখি বাবু?—আমি মাহুষই নই? হত যদি সে গরীব, খেতে পায় না, তবে অদৃষ্টের সব কষ্টই হাসিমুখে সযে যেতাম। এ কি স্বার্থপর ধৈর্যলী বুড়ো!

শেষকালে সেবা যত্ন করে আমার হল এই? আরে দাসী রেখেও ত লোকে মাইনে দেয়। মনের ভিতর কি যে হতে লাগল কাকে বলব। সাবাটা জীবন পরের দয়াতেই নির্ভর করে গেলাম, কোথাও এতটুকু কোনো অধিকার নাই?

সেই মেয়েটার একটা মেয়ে হল, বয়েস তখন আমার তিরিশ চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। দেখতে ভারী খারাপ হয়ে গেছি, দুশ্চিন্তায় রোগে কষ্টে যেন পাগলের মত।

সেই ছোট মেয়েটা আমার ঘাড়ে পড়লো, তার মার ভারী অসুখ, বাঁচে কি মরে।

তত ছোট মেয়ে, আরো রোগা মার পেটে জন্মেছে, সম্পূর্ণ মার কাছ ছাড়া হতেই অসুখে পড়ল। কি রকম বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, কি বলবো তোমায বাবু।—মমতার কথা বলছ? সে আর কি হবে? আমার কোনো অধিকার ছিল ওখানে? দয়ার প্রত্যাশাই না শুধু আমি?

ওরা যদি মরেই যায়, আমার কি এমন ব্যথা বাজবে তাতে? সামান্য চাকবাগী বই ত নই কিছু। তোমরা ছায়েব খাতির, কর্তব্যের খাতির কর, আমি প্রাণের খাতিরে দেখলাম, তাদের সঙ্গে আমার একটুও বান্ধন নেই।

ডাক্তার বলে গেল,—সাবধান, ঠাণ্ডা না লাগে, বুক ধরবে। আমার গ্রাহুই হল না, যেমন রোজ থাকে তেমনি রইল। রাত্রে বাতাসে জানালাটা খুলে গেল, চেয়ে দেখবার অবসর আমার হল না, আপনার ভাবনায় ডুবে ছিলাম, চিন্তায় মাথা গরম হয়ে কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে একটু আরামেই ঘুম এলো। পর দিন শুনলাম, সত্যি মেয়েটার বুক ধরেছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গেল, খাওয়ার আর মালিষের।

তত বেশী ভয় হল না, ভাবলাম ও সেরে যাবে। মা-ই তখন যায়-যায়, তার পিছেই খাটতাম, ওর জন্তে ভাবব'র তত সময়ও থাকতো না।

একদিন,—তার দু দিন পরেই এমন এক ভয়ানক সময় এলো যে মনে হলে এখনো আমার বুক কেঁপে ওঠে বাবু। মেয়েটা ও তার মাকে নিয়ে শুয়ে ছিলাম। রাত হুপুর বেজে গেছে, তিন ঘড়ির সময় ওষুধ খাওয়াবার কথা ছিল, চমকে উঠে হাত বাড়িয়ে শিশিটা নিলাম। ঘুমে চোখ আচ্ছন্ন ছিল, কত আর সয় বল, হাড়-মাসের শরীর ত?

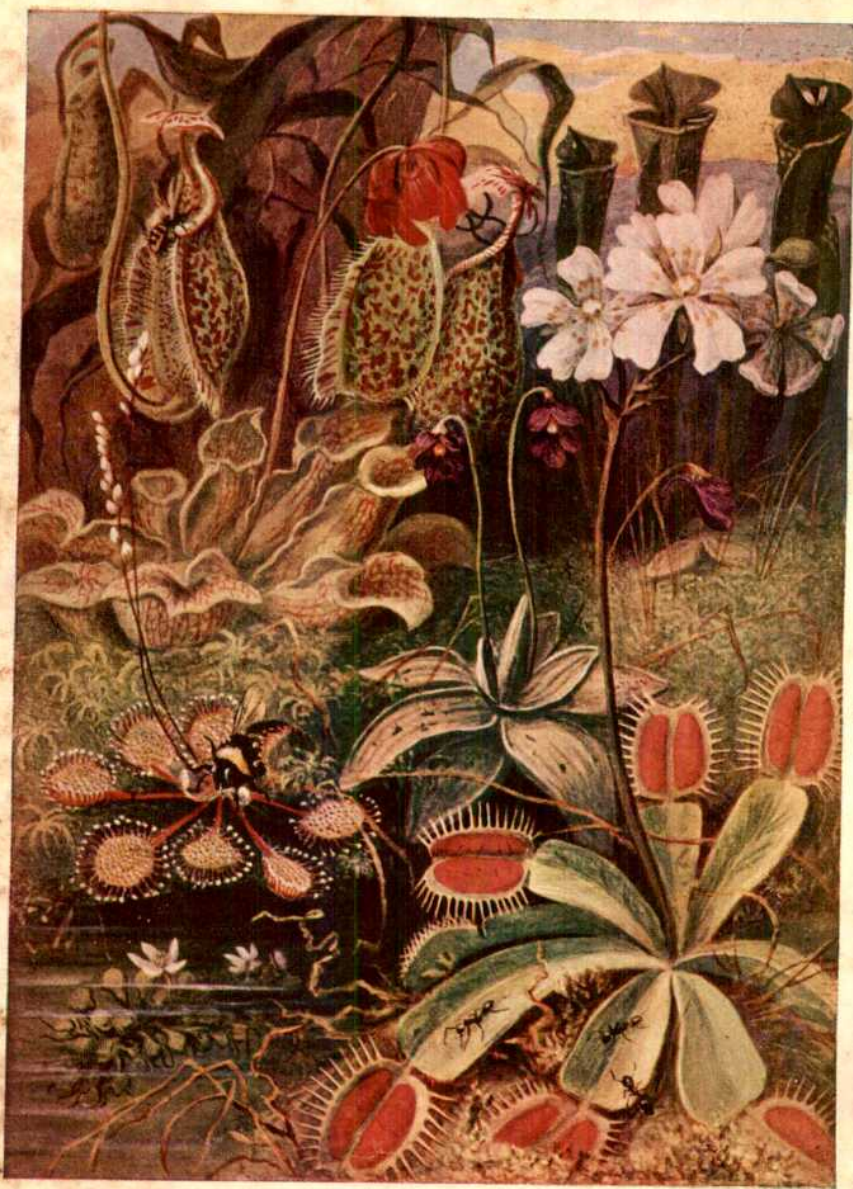
একদাগ ওষুধ ছিল জানতাম, না দেখেই ঝিল্লুকে ঢেলে, মেয়েটার মুখের কাছে নিলাম। ঠিক তেমনি সময়ে মেয়ের মা কি-রকম ঘড়-ঘড় শব্দ করে একটা ঝাঁকানি মেয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ল। হঠাৎ আমার হাত কেঁপে উঠল, ওষুধ মেয়েটার চোখে মুখে পড়ে গেল, মেয়েটা চিক্কে কেঁদে উঠলো। মেয়েকে শুইয়ে রেখে মার কাছে গিয়ে দেখি শেষ হয়ে গেছে।

আমি একা, এমন অবস্থায় কোনো দিন পড়িনি, ভয়ে আমার সারা গা কাঁপছিল, বৃকের ভিতর দপদপ শব্দ হচ্ছিল। মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখি সে বিকট মুখভঙ্গি করছে। একি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে না পেরে চীৎকার করে উঠলাম। মাহুষ এলো, ডাক্তারও হাজির হল। দেখলুম যে অত্যন্ত নির্দয় রকমের একটা খুন, সামান্য অসাবধানের জন্ত হয়নি। ভুলে মালিষের বিষ মেয়েকে খাইয়েছিলাম, কিন্তু চমকে ওঠায় মুখে পড়েনি, চোখে পড়ে চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ও ঈশ্বর, এ তো আমি ভাবিনি, আমার হাত দিয়ে এই ঘটালে! কয়েক মিনিট আগেও এদের ভয়ানক জঞ্জাল মনে করেছিলাম, মরলে আমার কোনই ক্ষতি হয় না মনে করেছিলাম, এমন কি ঠাণ্ডা লাগবার জন্তেও সাবধান হইনি।

না—না, এ তো আমি কখনো ভাবিনি, আমি খুন, আমি চোর।

পরের জিনিস নিয়েছিলাম কিন্তু লোভে নয়, রাগে—ম্যবহারও করিনি, ফেলে দিয়েছি, তবু চোর ত?



জীব-মারী গাছ ।

By courtesy of Messrs. U. Ray & Sons

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

খুন হয়নি যদিও খুনের বাড়ি হয়েছে; একটা কীপছে। কীপ কণ্ঠের স্বর বাতাসে ভেসে আসছে—
জীবকে আজন্মের তরে দৃষ্টিহীন করেছি। আমি খুনে, আইমা!

না বাবু, আমি তেমন কিছুই মনে করিনি, সেরকম কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। মেয়েটা মরলে তার ঠাকুরদাদার পয়সা কটা আমার হাতে পড়বার সম্ভাবনা হলেও আমি তেমন আশা করিনি, সে দৈবর জ্ঞানেন।

ডাক্তারের পায়ে জড়িয়ে পড়লাম, মেয়ের দাদার প্রায় সব টাকা খরচ করে তাকে সারলাম। চোখ ফিরিয়ে দেবার সাধ্য ছিল না, কিন্তু এত যত্নে রাখ-
তাম যে চোখের অভাব বুঝতে না পারে।

তারপর আমিও রোগে পড়লাম, রক্তের জোর পড়ে গিয়েছে, পলু হয়ে গেলাম।

মেয়ে আমার, মংলী আমার, সেই আমায় এখন পালছে।

গরীবের কত কষ্ট আছে বাবু, কত যে সইতে হয়, সব কথা কি কইব? সকলের বড় কথা এই যে আমি মলে মংলী আমার কোথায় দাঁড়াবে? কে তাকে আশ্রয় দেবে?

আহা, দেখতে পায় না বাহা আমার, আমার পাশে তার এই শান্তি হল।

কি বলছিলাম,—পাপ স্বীকার করতে এসেছি,—
হা সবাই বলে যাজকের কাছে পাপ স্বীকার করলে প্রায়শ্চিত্ত হয়, রোগ শোকের উপশমও হতে পারে।

বল না বাবু, বিচার করেই বল না, কি পাপ হয়েছে এতে? কি এমন অপরাধ করেছি আমি যে দিন রাত ভিতরে বাইরে এমন কষ্ট পাই? কেন এমন মন জলে? কেন এমন দুঃখ দুর্দশা সইতে হয়।

আমি সাক্ষনার স্বরে কি বলতে যাচ্ছিলাম—সে হঠাৎ একবার মাথা তুলে কান ফিরিয়ে বলল—চূপ, চূপ!

তারপর আর কোন কথা শোনবার অপেক্ষা না করেই ছুটে বেরিয়ে পড়ল।

দেখলাম, ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে কাণা মেয়েটি

তার। যখন পরস্পর হাত-ধরাধরি করে রাস্তার মোড়ে পৌঁছল, একটা দমকা হাওয়া এসে আমার জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

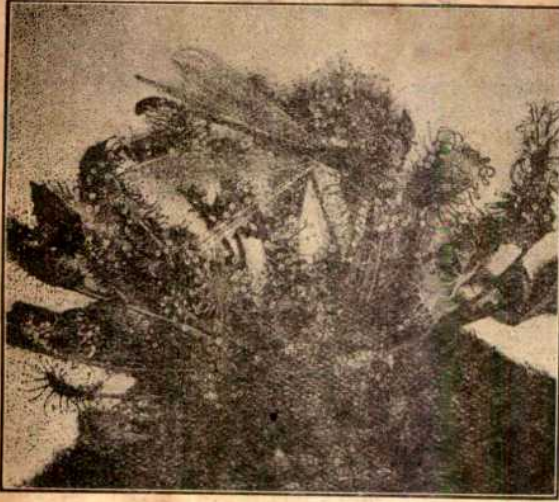
সরযু সেন

মাংসাশী গাছ

গাছেরা তাহাদের পাতা দিয়া আলো এবং বাতাস হইতে কার্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস শোষণ করিতে পারে। প্রত্যেক পাতার কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারিতে সেই বন্দী আলোকের শক্তির দ্বারা তাহার জীবন-পোষক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে; কার্বন বা অক্সিজেন চিনি খেতসার এবং তদ্বিধ অস্ত্রাশ্র পদার্থে পরিবর্তিত হইয়া গাছের পুষ্টির ও বৃদ্ধির সাহায্য করে। এইরূপে গাছ মৃত বা অজৈব পদার্থ হইতে জীবন্ত অথবা শক্তিসঞ্চারক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহা যে কেমন করিয়া ঘটে তাহা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু পাতার মধ্যকার সবুজ রঙের অতি সূক্ষ্ম দানাগুলি (যাহা হইতে পাতাগুলিকে সবুজ দেখায়) ঐ পরিবর্তনের কারণ বলিয়া বোধ হয়।

সুতরাং কোনো গাছ আলো বাতাস ও জল পাইলে তাহা হইতেই শক্তিপ্রদ পদার্থ অর্থাৎ খাদ্যাদ্রব্য নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। এইখানে গাছের সহিত জীবের পার্থক্য। কোন জীব নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে না; তাহার শরীরের প্রত্যেক খণ্ড ও প্রত্যেক নড়াচড়া গাছের পাতা, ডাঁটা, ফুল, ফল প্রভৃতি দ্বারা ফল। অতএব দেখা যাইতেছে যে গাছই জীবের প্রাণ-ধারণের উপযোগী পদার্থের নিখাতা এবং সেই-সকল জিনিষ আশ্রয় করিয়া জীব শরীর পোষণ ও প্রাণ ধারণ করে।

যদিও নিজের খাদ্যসামগ্রী নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইবার শক্তি গাছের আছে, তথাপি কখনো কখনো ইহার অবস্থা এমন হয় যে, আলো বাতাস এবং জল আবশ্যক

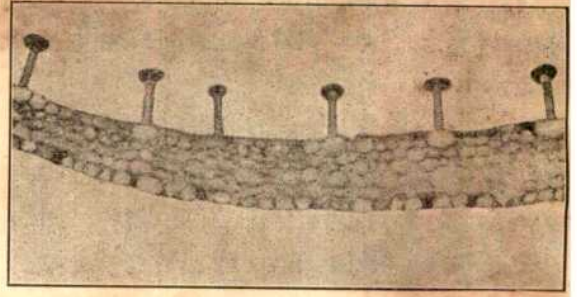


কীটমারী গাছ ফড়িং ধরিয়ে ধাইতেছে। ফড়িঙের স্থায় বড় জীবও যে ইহারা ধরিয়ে ধায় এই ফটোগ্রাফ তাহারই নাকী।

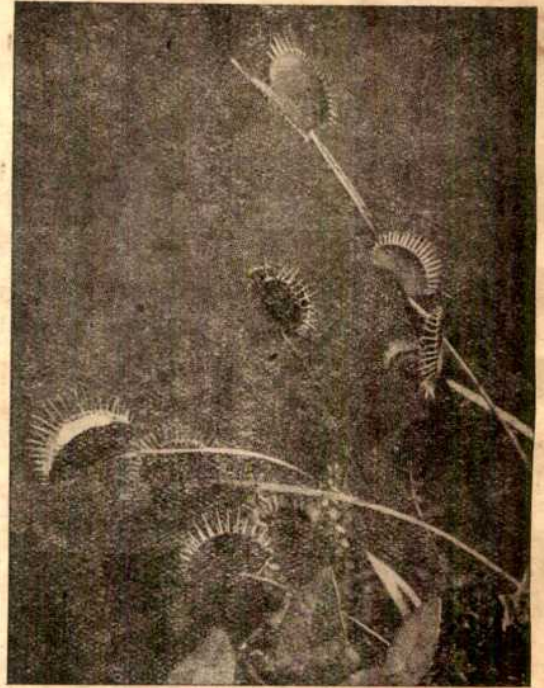


বাটারগাট গাছের পত্রজুড়।

মত পাইলেও সেই জলে আবশ্যক-মত নাইট্রোজেন-ঘটিত ও খনিজ পদার্থ থাকে না; নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ ও খনিজ পদার্থ গাছের শরীর-পুষ্টির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। একজন মানুষ যদি কেবল মাত্র রুটি খাইয়াই বাঁচিতে চায়



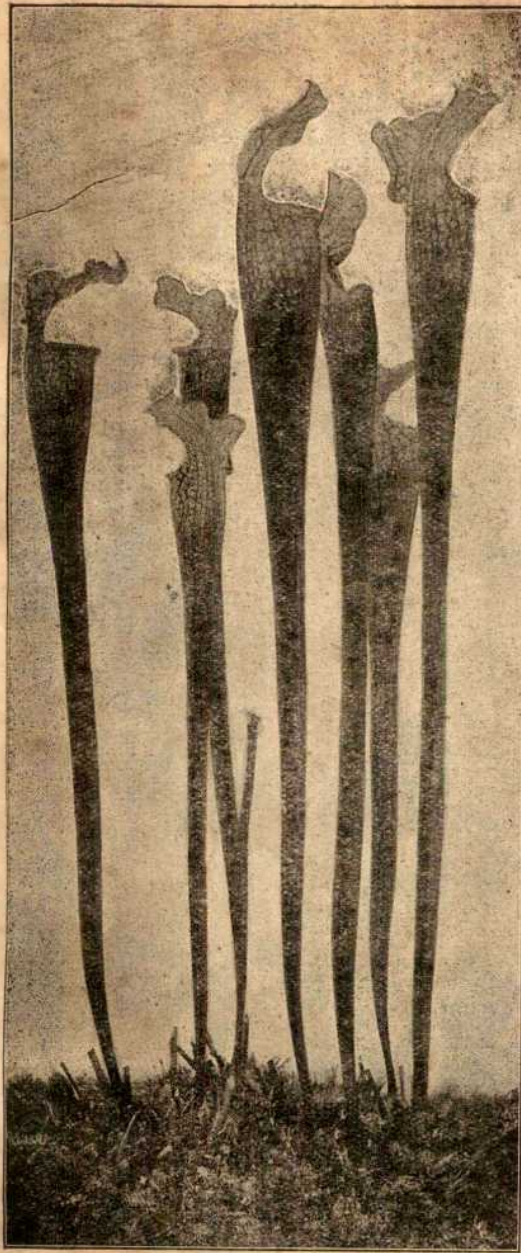
বাটারগাট গাছের পাতার উপরকার ছরকম গ্রন্থি—একরকম খাড় উঁচু শোয়ার মাথার উপর, অপর-রকম পাতার পিঠের গায়ে লাগিয়া থাকে। অণুবীক্ষণে যথেষ্ট বহুতাকার।



জাতিকল গাছের শিকার ধরবার ফাঁদ—মুক্ত-ছিদল পাতার মধ্যে কোনো জীব গেলেই পাতা মুদিয়া পাতার কিনারার দাঁতগুলি চাপিয়া বন্ধ হইয়া পড়ে ও বন্দী জীব তাহার মধ্যে হজম হইয়া যায়।

তবে তাহার যেমন দশা হয়, নাইট্রোজেন ও খনিজ পদার্থের অভাবে গাছেরও পোষণ-ক্রিয়া তেমনি অসম্পূর্ণ হইতে থাকে।

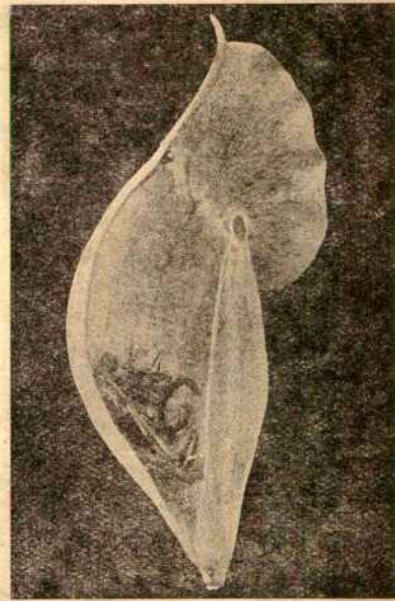
গাছের দেহপুষ্টির এইরূপ অভাব পূরণ হয় গাছের ছোট ছোট কীট পতঙ্গ ধরবার ও খাইয়া হজম করিবার শক্তির দ্বারা। গাছেরা টিঙ সংগঠনের টিঙ



ঘটপত্রী গাছ—এই গাছের পাতা কুলপী-বরফের চোঙার বা ফুল-
দানির মতন, ইহার মধ্যে জায়গায় জমিয়া থাকে; ছোট-খাটো
জীব উহার মধ্যে পড়িলে পাতার মুখের ঢাকনি বন্ধ হইয়া যায় ও
বন্দী শিকারকে গাছ হজম করিয়া খাইয়া ফেলে। এ গাছ
উত্তর-আমেরিকায় দেখা যায়।

যেদূর্য্য মাটি হইতে আহরণ করিতে পারে না তাহার
অভাব দ্বীপ আহার করিয়া পূরণ করিয়া লয়।

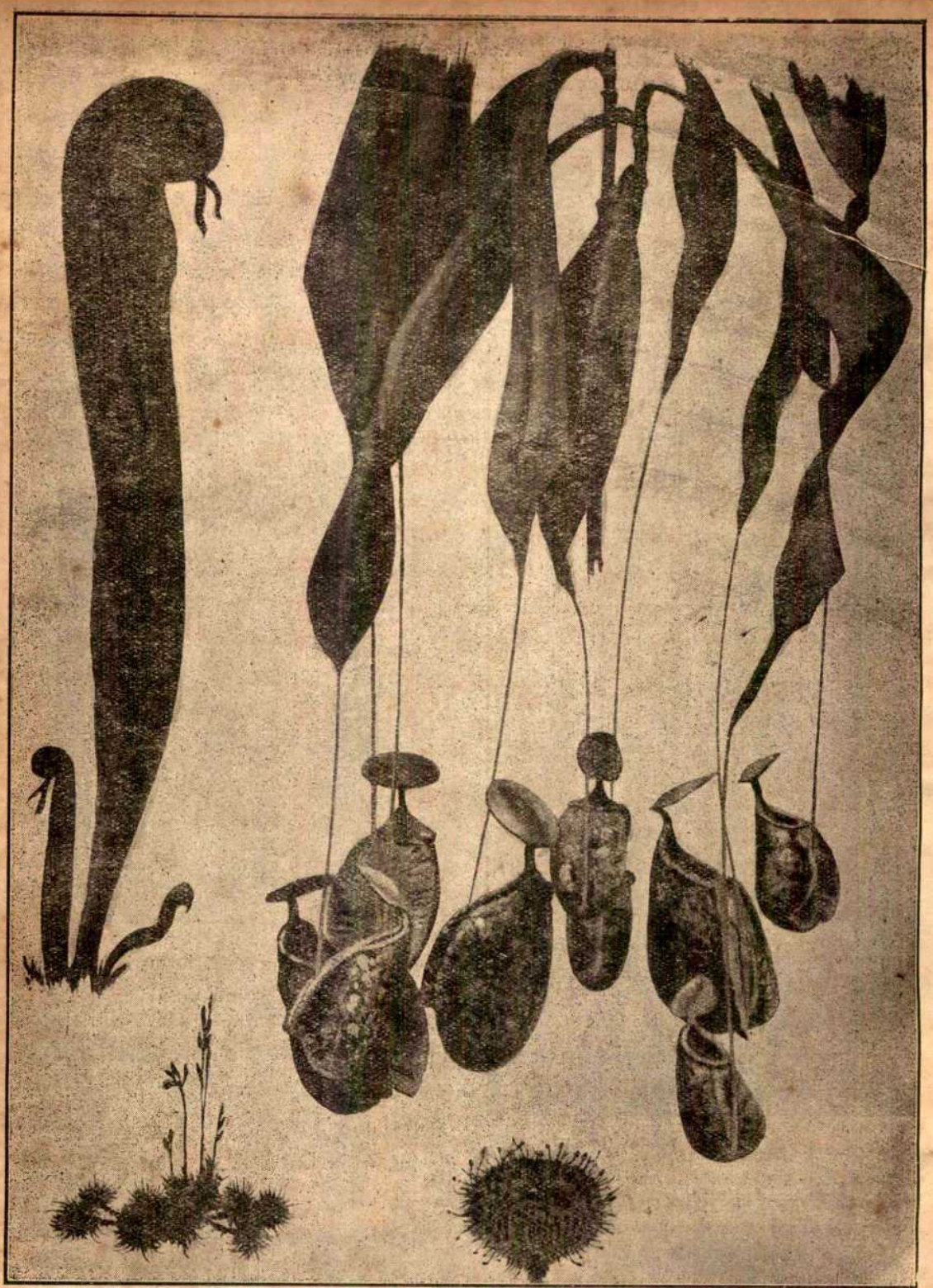
উদ্ভিদের স্বভাব ও প্রকৃতি বাহারা লক্ষ্য করিয়া না
জানিয়াছেন তাঁহারা গাছেরা জীবন্ত প্রাণী ধরিয়া খায়
শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে-কোনো
পেঁকো জলা জায়গায় গিয়া লক্ষ্য করিলে তাঁহারা দেখিতে
পাইবেন হাজারো রকমের গাছ কত রকমের ফাঁদ পাতিয়া
প্রাণী-বধের কাজে লাগিয়া আছে। পেঁকো জলাজায়গায়,
বিশেষ করিয়া যে-জলার পাঁকের মধ্যে গাছপালা পচিয়া
জমিয়া আছে সেখানে, কীটমারী গাছ প্রচুর। গাছপালা-
পচা পাক সর্বদা এমন স্যাঁতা হইয়া থাকে যে তাহার



ঘটপত্রী গাছের পাতার খোলে বন্দী জীব।

মধ্যে অক্সিজেন চুকিবার পথ পায় না এবং তাহার মধ্যে
নানা রকমের বিষাক্ত গ্যাসিড জমিয়া উদ্ভিজ্জাণু ও জীবাণুর
অবস্থানও অসম্ভব করিয়া তুলে; অধিকন্তু সেরকম
জায়গায় নাইট্রোজেন ও আবশ্যিক খনিজ পদার্থের
একান্ত অভাব-বশত সাধারণ গাছও সেখানে টিকিতে
পারে না।

এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও পেঁকো জলা জায়গায় নানা-
বিধ গাছ জন্মিতে দেখা যায়; তাহাদের মধ্যে কীটমারী
নামক একরূপ গাছই প্রধান; সেই গাছকে হিন্দীতে
মুখজালী, ইংরেজীতে Sundew এবং লাতিন ও গ্রীকে



মাংসাশী গাছ—(১) সর্পফণা গাছ, ক্যালিফোর্নিয়া দেশের; ইহার ফুলের মতন পাতার মুখ হইতে সাপের জিভের মতন লাল টকটকে এক জোড়া ফিতা বুলে; তাহাতে মধু স্রবণ হয়; রং ও মধুর লোভে আকৃষ্ট করিয়া ইহা কীট পতঙ্গ ধরিয়া ধায়। (২) ঘটপত্রী গাছের পাতার মুখে ঘটাকৃতি ঢাকনি-ওলা ফাঁদ বুলে, তাহার মধ্যে জীব ঢুকিলেই ঢাকনি চাপা দিয়া গাছ তাহাকে আহার করে। (৩) ও (৪) গান্ধিউ বা কীটমারী গাছের দুই জাত; আঠালো শোঁটার জটা জড়াইয়া ইহা কীট পতঙ্গ ধরিয়া ধায়।



বস্তুতাত্ত্বিক কার্যাবলী
 চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌলতপুরে।



রাগিণী মেঘমল্লার ।

প্রাচীন চিত্র হইতে ।

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত র র দত্তগয় মহাশয়ের সৌজন্যে ।

Drosera বলে। এই গাছের পাতার ধারে সরু সরু শোঁয়া ও শোঁয়াব মাথায গোল গোল চটচটে দানা থাকে, তাহা দেখিতে অনেকটা জালী বা শিশিরবিন্দুর মতন, সেইজন্য তাহার নাম মুখজালী, Sundew, বা Drosera (গ্রীক Drosos = Dew = শিশিরবিন্দু) হইয়াছে। এই গাছের পাতার গায়ে চটচটে শোঁয়াতে ছোট পোকা-মাকড় আদিয়া পড়িলে বন্দী হইয়া যায় এবং সেই-সব প্রাণীই দেহ পচিয়া গাছের টিঙ্গ গঠনের উপযোগী যে-সমস্ত পদার্থ মাটি হইতে পাওয়া যায় না তাহার অভাব পূরণ করে। এইরূপ স্থানে ও অবস্থায় পুরুষাত্মক জন্মিয়া জন্মিয়া প্রকৃতির নির্বাচনের প্রণালীতে ঐক্য কীটমারী গাছদের শোঁয়ার মাথাব গ্রন্থিগুলি স্বল্প-অল্পভবের শক্তি, নড়াচড়া করিবার শক্তি এবং জারক রস স্রবণের শক্তি অর্জন করিয়াছে।

সাধারণ সাতনী কাঁচ দিয়া কীটমারী গাছের একটা পাতা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে কেমন করিয়া সে নিজের পুষ্টির খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে; কীটমারী গাছের সবুজ পাতার উপরে অনাংখ্য সঞ্চরণক্ষম গ্রন্থি লাল রঙেব শোঁয়া আছে, প্রত্যেক শোঁয়ার মাথার ক্ষীত গ্রন্থি বোহু পাইলে চকচক কবিত্তে থাকে যেন শিশির-বিন্দু জমিয়া আছে; সেইজন্য ইংরেজীতে তাহাকে Sundew বা সৌর-শিশির বলে।

ডারউইন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কীটমারী গাছের পাতার ধারের শোঁয়াগুলি স্পর্শ করিলে তাহার ভিতরের দিকে ঝিকিয়া পড়ে। ধারের শোঁয়ার উপরে একটা মাছি বাখিয়া দিলে ধারের শোঁয়াগুলি ঝিকিয়া ঝিকিয়া মাছটিকে পাতার মধ্যভাগে তৈলিয়া দায়। মাছিটি পাতার ঠিক মাঝখানে পড়িলেই সমস্ত পাতার শোঁয়া-গুলিতে সাড়া পড়িয়া যায় এবং সবগুলি ভিতর দিকে ঝিকিয়া খাচার আকারে মাছির চাবিদিকে বেড়া দিয়া তাহাকে বন্দী করে; এবং পাতাটির মধ্যস্থল খোল হইয়া বাটির মতন হয় এবং সেখানকাব গ্রন্থিগুলি হতভাগ্য বন্দীর উপর চটচটে জারক হজ্ম রস ঢালিতে থাকে। বন্দী বলি মুক্তি পাইবার জন্য যতই ছটফট করিতে থাকে ততই মরণ ততই আসন্ন হইতে থাকে, কারণ গ্রন্থিগুলি

নাড়া পাইয়া যতই উত্তেজিত হয় ততই জারক রস ঢালে।

মানুষের পাকস্থলীতে খাবাব জিনিষ পড়িলে পাকায় হইতে যে জাবক রস নির্গত হয় তাহা অম্ল ও উৎপচনশীল অর্থাৎ গাঁজিয়া মাতিয়া উঠে। ডারউইন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কীটমারী গাছের গ্রন্থি হইতে ক্ষবিত জারক রসও অম্ল ও গাঁজিয়া মাতিয়া উঠে; জন্তর পাকায়ের জাবক রস খাদ্যকে যেক্রপ ভাবে পরিবর্তিত করে, কীটমারী গাছের জারক রসও ঠিক সেইরূপ ভাবে ঐ কীটপতকে হজম করে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে যে গাছ জীবন্ত প্রাণী ধরিয়া খাইয়া থাকে।

ইংরেজদেব দেশে বাঙলাদেশের গোলপাতাওয়াল মুখ-জালী কীটমারী গাছ ছাড়া আরও দু'বকমের Sundew গাছ আছে, তাহাদের পাতা নম্বাটে এবং খাড়া হইয়া থাকে। অট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইহাব অন্য জাতও দেখা যায়। উত্তর-আমেরিকায় একবকম কীটমারী গাছ আছে যাহার পাতা সূতোর মতন সরু সরু, এক-ফুট সওয়া-ফুট লম্বা এবং মাটির উপব জট পাকাইয়া ছড়াইয়া থাকে; কীট পতঙ্গ সেই জালে পড়িলেই বন্দী হইয়া হজম হইয়া যায়।

আর একরকম কীটমারী গাছ বঙ্গদেশে ও উদ্ভিমাগ আছে; তাহাও জলজ; বাংলা নাম ঝাজি, ইংরেজী নাম Bladderwort, লাতিন নাম Utricularia। ইহাও কীট পতঙ্গ মারিয়া আহাব করিয়া বাঁচে।

আব-একজাতীয় কীটমারী গাছ আছে তাহার ইংরেজী নাম Butterwort; উহার পাতা দুধে দিলে দু' ছিঁটো যায় বলিয়া উহাব ঐ নাম বা উহার শোঁয়া-হইতে আঠা নির্গত হয় বলিয়া ঐ নাম তাহা বলা যায় না। উহার পাতাগুলি গোলাপের দলের মতন শুবকে সজ্জিত, পাতার উপর-পঠ অতি সরু সরু ভুবকমেব শোঁয়ার ভরিয়া থাকে, সেই শোঁয়াব মাথায় মাথায় এক-একটি আলপিনের নাথার মতন গ্রন্থি থাকে, কিন্তু সেইসব শোঁয়া এমন স্বল্প যে শুধু-চোখে দেখা যায় না; অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দেখা যায় একরকম শোঁয়া আলপিনেব মতন উঁচু ও খাড়া হইয়া আছে ও অপর রকমের শোঁয়াগুলির মাথা পাতার পিঠের

সঙ্গে লাগিয়া আছে যেমন পিন-কুশনে আলপিন পুতিয়া রাখিলে দেখায় ঠিক সেইরূপ। এই উভয়বিধ গ্রন্থি হইতে আঠা-চটচটে রস নির্গত হয় এবং নাইট্রোজেন আছে এমন কোনো বস্তুর সঙ্গে ঠেকিলেই সেই রস অল্প হইয়া গাঁজিয়া মাতিয়া উঠে। বাটারগাটের শোঁয়াগুলি মুণ্ডালী সানডিউ কীটমারীর শোঁয়াব মতন আপনা-আপনি নড়াচড়া করিতে পারে না; পাতার দুই পাশ কোশার মতন মোড়া বলিয়া কীট-পতঙ্গ বসিলেই ভোঁঙার মতন পাতার খেলের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং সেখানে অধিকসংখ্যক শোঁয়াগ্রন্থির সংস্পর্শে আসিয়া হজম হইয়া যায়। ডারউইন পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই গাছ কেবল আমিষাশী নয়, উহার উদ্ভিজ্জাশীও বটে; পাতার কোশের মধ্যে পাতার টুকরা, ফুলের রেণু, ফুলের বীজ দিলেও তাহা খারকরসে গলিয়া উঠে ও সেই রস পতঙ্গবকের সন্ধিস্থলে মুখাকৃতি বাটির মধ্যে গড়াইয়া পড়ে, অর্থাৎ গাছ আহার করে।

নানান দেশের জলা জায়গায় নানাবিধ জীবখোর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে Venus' Fly-trap বা যুপপত্রী বা জাঁতিকল নামে যে কীট-মারী গাছ দেখা যায় তাহার কার্যই জগতের সকল কীটমারী গাছের প্রাণীহত্যা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত। নাম হইতেই বুঝা যাইবে যে উহার পাতা জাঁতিকলের মতন মুদিয়া কীট-পতঙ্গকে পিষিয়া মাঝিয়া খাইয়া ফেলে; এই অদ্ভুত গাছেব পাতা লম্বা লম্বা ডাঁটাব মাথায অল্প-বিস্তার খাড়া হইয়া থাকে এবং পাতার কিনাবায় জাঁতিকলের মতন দাঁতি কাটাকাটা থাকে; পাতা হিঁদল, আধ-খোলা বহিষেব মতন। কোনো কীট পতঙ্গ পাতার ডাঁটায় উঠিলে পাতাতে কোনো সাড়াই টের পাওয়া যায় না; পতঙ্গ ডাঁটার বসিবার সময় বা ডানা গুটাইবার সময় ডাঁটায় যে নাড়া পড়ে তাহাতে কিম্বা ডাঁটার উপর দিয়া পাতার উন্টা-পিঠে বা পাতা ও ডাঁটার সন্ধিস্থলের কাছ পর্য্যন্ত চলা ফিরা করিলেও পাতা কোনো সাড়াই ছায় না; কিন্তু যেই কীট পতঙ্গ পাতার কিনারার দাঁতিগুলি ডিঙাইয়া পাতার ভিতর-পিঠে যায় অমনি পাতার দুই দল মুদিয়া জোড়া লাগিয়া যায় এবং কিনারার দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বসে। পাতার প্রত্যেক দলের ভিতর-পিঠে তিনটি তিনটি করিয়া

শুঁয়া আছে, তাহাদের অল্পভবের ক্ষমতা খুব বেশী; সেই শুঁয়াগুলি যেন জাঁতিকলের কজার স্প্রিং, তাহাতে কিছু ঠেকিলেই জাঁতিকল বন্ধ হইয়া যায়; পাতার ডাঁটায় বা উন্টা-পিঠে হাত দিলেও পাতা মুদ্রিত হয় না কিন্তু পাতাব দলের ভিতর-পিঠের কোনো একটি শুঁয়ার গায়ে একটা চুল ঠেকাইলেও পাতা বন্ধ হইয়া যায়।

এক-রকম কীটমারী গাছ আছে যাহারা জলের উপর ফাঁদ পাতিয়া রাখে এবং শিকার পাইলেই তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিরা খায়। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে Sarracenia বা side saddle গাছ দেখিতে অনেকটা সাপের ফণার মতন, আমরা তাহাকে সর্প-ফণা নাম দিতে পার। তাহাদের ফণাকৃতি পাতার মুখের কাছে টকটকে লাল সাপের জিহবের মতন চেরা একজোড়া ফিতা ঝোলে; সেই ফিতা হইতে মধু স্রবিত হয়। সেই সর্পজিহবার উজ্জ্বল লাল রঙ আর মধুর গন্ধ কীটপতঙ্গকে প্রলোভন দেখাইয়া ডাকিয়া আনে; তাহার পাতাগুলি ফুলদানি বা কুলপি বরফের ভোঁঙার মতন এবং সেই ভোঁঙার মধ্যে অধিকতর মধুস্রাব হয়; নিমজ্জিত কীট পতঙ্গ পাতার মুখের কাছে বসিয়া পাতার ভোঁঙার মধ্যে প্রচুর মধুর সন্ধান পাইয়া নীচের দিকে মরণ-যাত্রা করে। পাতার ভোঁঙার মধ্যে এমন ভাবে শুঁয়া সাজানো থাকে যে কীটপতঙ্গ অনায়াসে ভিতরে বাইতে পারে কিন্তু আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। কোনো কোনো জাতের সর্পফণা গাছের পাতার ভোঁঙার মুখের ছিদ্রের উপরে একটা করিয়া ঢাকনি থাকে এবং ভোঁঙার দেয়ালের গায়ে গোল গোল বহু জ্ঞানালা থাকে; কীট পতঙ্গ পাতার ভোঁঙার মধ্যে ঢুকিলেই মুখের ঢাকনি বন্ধ হইয়া যায়; ইহাতে বন্দী কীট পতঙ্গ মুখের ছিদ্রের সন্ধান না পাইয়া পাতার ভোঁঙার গায়ের স্বচ্ছ জ্ঞানালা দিয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় মাথা কুটিয়া কুটিয়া অবসন্ন হইয়া পত্রগুটের তলায় পড়ে এবং সেখানে যে রস জমিয়া থাকে তাহার মধ্যে ডুবিয়া মরে। তারপর গাছ তাহাকে হজম করিয়া খাইয়া ফেলে।

ক্যালিফোর্নিয়ার Darlingtonia বা প্রিয়ভমিয়া গাছও ঠিক ঐরূপে কীটপতঙ্গ শিকার করিয়া খায়। ঐ গাছ

তাহার বিচিত্র বাহাবে মুগ্ধ কবিতা কীট পতঙ্গকে লুপ্ত করে বলিয়া তাহার ঐ নাম।

আমেরিকার Pitcher plant বা ঘটপত্রী গাছও পাতার বাহাবে মুগ্ধ কবিতা কীটপতঙ্গকে লুপ্ত করে ও নিজের ঘটাকৃতি পাতার মধ্যে তাহাদের ভরিয়া ঢাকনি চাপা দিয়া খাইয়া শেষ করে; খাওয়া হইয়া গেলেই ঘটপত্রের মুখের ঢাকনি খুলিয়া নূতন কীটপতঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিতে থাকে। ঘটপত্রীর মুখের কিনারায় ও ঢাকনির ভলার পিঠে মধু ক্ষরিত হয়; পাতার ঠোঙার মধ্যে এক-রকম অন্ন জাবক রস জমিয়া থাকে, তাহাতে মধুলোভী কীটপতঙ্গ ও এমন কি ছোট ছোট পাখী পর্যন্ত গিয়া পড়িলেই জীর্ণ হইয়া যায়।

চাক

পরগাছা

[পরগাছা উপজাতি; উপজাতি কলনার ফল; কালনিক ব্যাপার হইলেও উপজাতি বর্ণিত স্থান ও পাত্রের নাম কোথাও না কোথাও কাহারো না কাহারো থাকিতে পারে, ঘটনাও কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো বর্ণনার কিয়দংশের অনুকরণ ঘটনা থাকিতে পারে; তাহা মিলাইয়া কেহ যেন ইহাকে ইতিহাস, জীবনচরিত বা ব্যক্তি-বিশেষ ও ঘটনাবিশেষের বর্ণনা বলিয়া ধরিয়া না লন, মিলের সঙ্গে অমিল হিসাব করিয়া দেখিলেই ঐহাদের ভ্রম ধরা পড়িবে যে যাহা সত্যের আভাস বলিয়া মনে হইতেছে তাহা কল্পনারই সৃষ্টি।]

(৫১)

রাজার বিবাহ। সমারোহ আয়োজন নিমন্ত্রিতের আব অন্ত নাই। বাড়ীর ভিতবে রাণী জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সব তদারক করিতেছেন, চন্দনমাণ চৈচাইয়া আপনার গুরুত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, আর মণিমালা নীরব হাসিমুখে সারা দিনরাত সকল কাজ বরিয়া ফিরিতেছে। বাড়ীর বাহিবে বহুবিকারী তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবোলায় নল মুখে চাপিয়া গভীর রাজকায়দায় ছকুম চালাইতেছে, দেওয়ান দীনদয়াল ও কাঙালী কাজের চেয়ে গুণগোল বেশী করিতেছে এবং কাঙালী যে আর কেউ-কেটা নয়, সে রাজারও শত্রুর ইহা সে হুযোগ পাইলেই শোককে খুব বড়া রকমে বুঝাইয়া দিতেছে; আর রাখাল

নিমন্ত্রিত অভ্যাগত লোকদেব বাসায় বাসায় গিয়া কাহাব কি অভাব আছে, কাহাব কি অহবিধা হইতেছে, হাসিমুখে মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া ফিরিতেছে।

বিবাহের সময় প্রস্তুত। কিন্তু কলিকাতার সেকল্যাণ আজ পর্যন্ত গহনা দিল না, বহুবিকারী লোক পাঠাইয়াছে, টেলিগ্রাম করিয়াছে—কিন্তু না! লোক ফিরিতেছে, না কোনো দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে। বহুবিকারী ও চন্দনমাণ অত্যন্ত বিষম ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে,—নূতন বাজবাণী বাড়ীতে আসিবে অথচ তাহাকে কোনো আভরণ দিতে পারা যাইবে না! চন্দনমাণ এক-একবার রাণী জগদ্ধাত্রীকে কাছে আসিয়া হতাশাকাতর স্বরে বলিতেছে—দিদি, কি হবে?—রাণী জগদ্ধাত্রী নিরুপায় ভাবে ফালফাল করিয়া তাহার দিকে শুধু তাকাইয়া থাকেন।

বিবাহের দিন আসিল, কিন্তু গহনা আসিল না। গহনার স্ত্রী বিবাহ আটক থাকিল না, বিবাহ নির্দিষ্ট লগ্নেই হইয়া গেল।

বাড়ীতে নববধূকে বরণ করিয়া লইতে গিয়া মণিমালা দেখিল সোনা রূপা অহরং জড়োয়া গহনার বধুর আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া গিয়াছে—মাথার মুকুট হইতে হাতের রতনচূড় ও পায়ের চব্বাচাঁদ পর্যন্ত কোনো গহনারই অভাব নাই, বধুব গায়ে হাজাব দশ পনের টাকার অলঙ্কার চাপানো আছে। মণিমালার বৃত্তিতে বাকি রহিল না কাঙালী এত গহনা পাইল কোথায়। বরণ কবিতা কুবেরকে চন্দনমাণ, ও কাত্যায়নীকে মণিমালা কোলে করিয়া উপবে তুলিল—নজীব ও নিজীব বোঝা বহিয়া মণিমালার ত শাস্তি একশেষ!

কড়িখেলা ও মঙ্গলভাঙ ঢাকা শেষ হইলে চন্দনমাণ বলিল—দিদি, এইবার বেটা বোকে আশীর্বাদ কর। কিন্তু একখানা গহনাও দেওয়া হবে না—সব অলঙ্কার! গোড়া থেকেই যে টিকটিকি লেগেছে, এতে কি আর শুভ হয়! রাজার রাণী হয়ে এল তা আজকে একখানি গহনা অধে উঠল না!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—ঐ ত অত গহনা দেওয়া হয়েছে মাগীমা, বৌএব যায়ে আর জায়গা কোথায়?

চন্দনমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ও ত ওর বাপ দিয়েছে! ছাঁ-পোষা মানুষ, তবু মেয়েকে রাজরাণী সাজিয়ে ত দিতে হয়েছে! কিন্তু শান্তী ননদের কাছ থেকে ত একটু শোনার আঁচড়ও পেলেন না।.....তা মা মণি, দিদিব গহনাগুলো এখন তুই এনে দে, গহনা গড়িয়ে এলে তুই তখন ফিরিয়ে নিস। আজকের মঙ্গল-আচারটা ত হয়ে থাক।

মণিমালা একবার মায়ের মুখেব দিকে চাহিল। তিনি নীবেব গজীর হইয়া বসিয়া ছিলেন, মণিমালার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিত হইলে তিনি দৃষ্টি নত করিয়া বসিলেন। তখন মণিমালা বৃঙ্খল কলিকাতা হইতে গহনা গড়াইয়া কেন পৌছে নাই, এবং সেসব গহনা কেনই বা কাঙালীর বাড়ী ঘুরিয়া কাত্যায়নীর অঙ্গে চড়িয়া রাজবাড়ীতে বেনামিতে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল এই প্রবঞ্চনার চক্রান্তের মধ্যে তাহার মা স্বক আছেন। তাহাকে গহনা-গুলি দিয়া মায়ের অহুতাপ হইয়াছে! কাহারো মনের ক্ষোভ সে রাখিবে না। সে অমনি ক্রতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। এবং তখনি সেই হাতীর-দাঁতের বাক্সটি আনিয়া বর ও বধুর সামনে কিংবাবের বিছানার উপর রাখিয়া সেই বাক্সের ডানা খুলিয়া ফেলিল। তারপর কাত্যায়নীর সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া তাহার গা হইতে তাহার সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলিল এবং বাক্স হইতে গহনাগুলি তুলিয়া তুলিয়া একে একে সমস্ত তাহাকে পরাইয়া দিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বৌ, এই সমস্ত গহনা আমি তোমাকে যৌতুক দিলাম!

রাণী জগদ্ধাত্রী ও চন্দনমণি, বহুবাহবী ও কাঙালী এই বিজয়িনীসম্মুখে নিতান্ত নিশ্চিন্ত অপ্রতিভ হইয়া গেল। সমস্ত বিবাহ-উৎসবটা অলঙ্কারের স্থচিমুখের বিজ্ঞপে ম্লান হইয়া উঠিল। কেবল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল মণিমালার মুখ—অবের আনন্দে; রাখালের মুখ—পত্নীসৌভাগ্যের গর্ভস্থখে; আর পবিত্রনদের মুখ—বিশ্বয় সন্মমে! চন্দনমণি দাবার চালে মাত করিতে আসিয়া হঠাৎ বোডেব কিস্তিতে এমন ঠকিয়া গেল যে সে তখন ধরণীকে ধ্বিা হইতে বলিতে চাহিতে ছিল।

কিন্তু চন্দনমণির সে ভাব ক্ষণিক মাত্র। সে জোর

কবিয়া সঙ্কচিত মুখেব উপব শুক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—তা দেবে বৈ কি, তা দেবে বৈ কি, তুমি হলে বড় ননদ! আগে তুমি, তবে ত কুবিব! রাজাব মেয়ের এই রকমই নজর হবেই ত!... ওমা বোমা, তোমার বড় ননদকে পেলাম কব...

কিন্তু বিবাহের উৎসব আর কিছুতেই জমিতে পাইল না। চাকরদাসী নিমজ্জিত পবিত্রন স্থবিধা পাইলেই শুধু মণিমালার দানের কথা আলোচনা করে। এই ব্যাপারটা এত বড় অসাধারণ ঠেকিয়াছিল যে সকলের মনে রাজার বিবাহ-উৎসবের উপবেও ইহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

সকলের ধিক্কাব ও কানায়ুয়ার ম্লানি বাড়িয়া ফেলিবার জন্ত বহুবাহবীর গা বেসিয়া দাঁড়াইয়া চন্দনমণি মুখ বাকাইয়া বলিল—মণিটার দেমাক দেখেছ! ভাঙেন ত মচকান না, এমনি হিংসে!

বহুবাহবী বলিল—ইহার মধ্যে নিশ্চয় রাখালের টিপ আছে।

চন্দনমণি পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তা যাই হোক, গহনাগুলো ত ওর খপ্পর থেকে উদ্ধার করা গেছে!

মণিমালার এই অনাধারণ ত্যাগে ফল হইল এই যে সে ও রাখাল কাত্যায়নীর সহিত কুবেরের বিবাহে আপত্তি তুলিয়া সকলের বেক্রপ অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিল তাহা ঘুরিয়া গেল, তাহার এই বাড়ীব আবার সর্বপ্রধান হইয়া পড়িল। যাহার! তাহাদের মাথা নত করিতে চেষ্টা করিতেছিল তাহার ও তাহাদিগের নিকট নত না হইয়া থাকিতে পারিল না, সকলেই তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

যখন এইরূপে সকল উপজব নিরস্ত হইয়া গেল তখন আর রাখাল ও মণিমালার এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার আগ্রহ রহিল না; তাহার প্রাণপণ সেবায়ত্নের পরিবর্তে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন লইতে কিছুমাত্র কুষ্ঠা অনুভব করিতেছিল না। রাণী জগদ্ধাত্রী যদি কখনো কিছু টাকা হাতে তুলিয়া দিতেন তাহাই রাখাল ও মণিমালা লইত; রাখাল যাহা পাইত তাহা তাহার গোসাইদাদাকে পাঠাইয়া দিত, আর মণিমালা যাহা পাইত তাহা দিয়া সে স্বতন্ত্র সংসার

পাতিবার মতন জিনিষপত্র কিনিত—সেদিন দুখ ঢালিয়া লইবার মতন একটা বাটিও তাহার নিজেব ছিল না, ইহা তাহাব মনে বড় বেশীরকম বাজিয়াছিল।

(৫২)

বিবাহের গোলমাল মিটিতে না-মিটিতে কুবের সাবালগ হইবার সময় আসিল। কুবের নিজে জমিদারীভ ভার লইবে, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসেব অধীনতা ঘুচিয়া যাইবে, এই সম্ভাবনাব উল্লাসে সকলেব মন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস তাহাব অধিকা-কালের সমস্ত হিসাবেব নিকাশ আখেরী প্রস্তুত করিতে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। তখন ধরা পড়িল রাজনাথ ও দীনদয়াল অনেক টাকা চুরি করিয়াছে। কাঙালীও যোগ ছিল বোধ হয়, কিন্তু তাহাকে ধরিবার ছুইবার মতন কোনো প্রমাণ সে রাখে নাই; যে একটু ক্ষীণ ঘুব প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় কাঙালী মাত্র হাজার খানেক টাকা নিজের পকেটজাত করিয়াছিল।

ম্যানেজার উহাদের তিনজনকে একসঙ্গে জড়াইয়া নালিশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাঙালী বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়াইতেছে—হঁঃ! আমি রাজার খন্তর! আমার ত সব করবে।

রাখাল ম্যানেজারকে ধরিয়া বলিল—ঐ তিনজনে যদি চুরির টাকা প্রত্যর্পণ করে তবে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভদ্রলোকের ছেলেকে জেল খাটাইয়া উহাদের আখের নষ্ট করিয়া ষ্টেটের লাভ কি?

অনেক বলা কহায় ম্যানেজাব রাজি হইল। এবং রাজনাথ ও দীনদয়াল চুরিব দৌলতে যে বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিল তাহাব সমস্ত বেচিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া জেলে যাওয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিল।

কাঙালী কিন্তু হুইয়া ডুব দিতে চায় না। রাখাল তাহাকে টাকাটা ফিরাইয়া দিতে অস্থবোধ করাতে সে মাথা ঘুরাইয়া বুক ফুলাইয়া বলিল—হঁঃ! নিয়েই যদি থাকি আমি, আমার জামাইএর টাকা নিয়েছি! তাতে কাব বাবার কি! আমি বাজাব খন্তর! আমার অমনি জেল খাটালেই হল?

রাখাল বিরক্ত হইয়া বলিল—ইংবেজের আদালতের

কাছে রাজাদেরই জরিজুরি খাটে না, তা আবার রাজাব খন্তর! তুমি তোমার জামাইএর টাকা ত নাওনি, ও কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের টাকা! তাদের যখন রাজাকে হিন্দাব নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে কড়া জাস্তি মিলিয়ে, তখন তারা তোমাকে রেয়াৎ করবে কেন?

কাঙালী ভয় পাইয়া একটু দমিয়া গিয়া বলিল—অচ্ছা বোসো, রাজ্যামাকে রাজাবাবুকে রাণীমাকে একবার জিজ্ঞাসা করি, পরামর্শ করি.....

রাখাল বিরক্ত হইয়া জোরে বলিয়া উঠিল—জিজ্ঞাসা করি, পরামর্শ করি, হচ্ছে হবে, নয়। টাকা দিতে হবে। তোমাব চাকরী হয়েছিল আমার সুপারিশে। তুমি টাকা নিয়ে আমাকে অবিশ্বাসী কবেছ; তোমার অপমানে আমার অপমান! তুমি হয়ত মনে করতে পার টাকাটা ত মেরে দিয়েছি, আসি না হয় দুদিন জেল খেটে! তা আমি হতে দেবো না—তুমি যদি টাকা না দাও আমাকে দিতে হবে, তোমাকে বাঁচাতে চাই আমার নিজের মান বাঁচাবার জন্তে।

রাখালের এই কথা শুনিয়া কাঙালী নিখাস ফেলিয়া বাঁচিল; সাহস পাইয়া খুব জোব করিয়া বলিল—তা তোমার যা খুদী করগে—আমি কিছুতেই টাকা দিচ্ছি—রাজার খন্তর আমি! কার সাধ্য আমার কিছু করতে পারে।

রাখাল আর কোনো কথা না বলিয়া রাগে গসগস করিতে-করিতে চলিয়া গেল।

মুখে বাজার খন্তর বলিয়া খুব আশ্বালন করিয়া বেড়াইলেও কাঙালী অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল, যদি রাখাল টাকাটা শেষে নাই দায়, যদিই হঠাৎ পুলিশ আসিয়া হাতকড়ি লাগাইয়া এত লোকের সামনে দিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিতে-টানিতে লইয়া যায়!

রাখালের বিষম চিন্তা হইল কাঙালীর চুরির টাকাটা সে কোথা হইতে কেমন করিয়া শোধ করিয়া দিবে। সে বাজার জামাই বটে, কিন্তু তাহাব হাতে ত একটা পরসাদ নাই। রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট হইতে সামান্য অর্থ যখন বাহা পাইয়াছে তাহা গোসাঁইগঞ্জের আত্মীয়দেব যত্নের স্বর্ণের হুদ দিতেই শেষ হইয়া গিয়াছে! মণিমালার

কাছেও ত বেশী কিছু থাকিবাব কথা নয়। বার্গ জগদ্ধাত্রী কাছে চাওয়া যায়, কিন্তু কাঙালীর চুরিব ঋণ তিনি শোধ করিতে যদি অস্বীকার করেন, সে বড় অপমান। তবে কি কুবেরকে বলিবে যে তোমার খণ্ডর চুরি করিয়াছে, হাজার খানেক টাকা দাও? না, তাহা বলাতে কুবেরকে অপমান করা হইবে, লজ্জা দেওয়া হইবে। তবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখাল ম্যানেজারের কাছে গিয়া বলিল—সাহেব, আমি মাস পাঁচ ছয় মাইনব ওড়কে পড়াইয়াছিলাম; তাহার জন্ত আমি ষ্টেট হইতে কিছু পাইতে পারি কি?

সাহেব আনন্দিত হইয়া বলিল—নিশ্চয়! কমিশনার সাহেব ত আড়াইশ টাকা দক্ষিণা আপনার জন্ত মঞ্জুর করিয়া গিয়াছিলেন, আপনিই লন নাই। বিল করুন, আমি আপনার টাকাটা খাজাফিকে দিতে বলিতেছি।

রাখাল কুণ্ঠিতভাবে বলিল—আমি আর বিল করব না; আমার নামে হাজার টাকা খরচ লিখে কাঙালীর কাছে ষ্টেটের পাওনা হাজার টাকা শোধ করে জমা করে নিতে বললে আমি অত্যন্ত উপকৃত হব, আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকব।

ম্যানেজার অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—রাখাল বাবু, আপনি ঐ বদমায়েস কাঙালীটার জন্ত এত করছেন, সে আপনার কে?

—সে আমার সম্বন্ধীর খণ্ডর; সে আমার গ্রামের লোক; আমার সুপারিশে তার চাকরী হয়েছিল; আর তার জন্তে আমার চাকরী জুটেছিল।

কাঙালী বাঁচিয়া গেল, কিন্তু তাহার জন্ত ম্যানেজারের কাছে প্রার্থনা জানাইতে, নিজের প্রত্যাখ্যাত অর্থ পুনর্বাণ ঘাচিয়া গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিতে রাখালকে যে কতখানি খাটো হইয়া অপমান স্বীকার করিয়া ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল তাহা কেহ ঠিক করিয়া অনুভব করিতে পারিল না।

কাঙালী অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—রাখালের এ ভারি অত্যাচার, এ হিংসে কবে আমায় অপমান করা, আমাকে লোকের কাছে চোব বানানো!—আমি টাকা নিইনি বল্লেই ত আমি নির্ভয়ে

ছিলাম! নালিশ করত, আদালতে আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যেত। এ ধরে ভদ্রব ঘটিলে একজন ভদ্র-লোককে চোর করা!

কুবের শুনিয়া বলিল—আচ্ছা! আগে আমি রাজা হই তখন দেখে নেবো!

বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি বলিল—রাখাল মুখে বলেন টাকা নিইনে, টাকা চাইনে; এদিকে কিন্তু ম্যানেজারের কাছ গিয়ে চূপিচূপি বাকী বকেয়া হিসেব করে মাইনে চুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। ধর্মপুত্রের যুধিষ্ঠির আর কি!

নিবস্তুর এই-রকম কথা শুনিয়া রাণী জগদ্ধাত্রী অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

(৫৩)

মহা সমারোহের উৎসব-আনন্দের মধ্যে কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি আসিয়া কুবেরকে জমিদারীর সমস্ত ভার বুঝাইয়া দিয়া রাজপদে অভিষেক করিয়া গেলেন। তাঁহারা রাখালকে বলিয়া গেলেন—আপনিই রাজাকে দেখিবেন, সুপারামর্শ দিবেন, রাজা এখনো বালক।—কুবেরকে বলিয়া বুঝাইয়া গেলেন—তুমি রাখাল-বাবুর পরামর্শ লইয়া চলিও, তোমার মঙ্গল হইবে, রাজ্যের প্রজা সুখী হইবে।

রাখাল তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইল। কুবের গোঁজ হইয়া মাথা ঝাঁকা করিয়া রহিল।

কুবের রাজ্যপরিচালনের অধিকার হাতে পাইয়াই বঙ্কবিহারী ও কাঙালীর পরামর্শে হুকুম দিল—সমস্ত ব্রহ্মদেবতা চাকরান লাখে রাজ্য জমি বাজেয়াপ্ত হোক; কাহারো কোনো অধিকার থাকে সে দলিল দস্তাবেজ দেখাইয়া উদ্ধার করিয়া লইয়া যাক।

দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল। কত বিধবার, কত অনাথ শিশুর, অন্ন-সংস্থানের উপায় গেল; কত দেবতার মন্দিরে পূজা বন্ধ হইয়া গেল; কত দরিদ্র একেবারে নিঃস্ব সম্বলহীন হইয়া পড়িল। এই-সমস্ত জমি পাহাড়পুরের পূর্ব পূর্ব রাজারা দিয়া গিয়াছেন—কাহাকেও মাত্র মুখের কথায়, কাহাকেও মাত্র এক চিলতে ফাঁস কাগজে লিখিয়া—সে কাগজ ছতিন পুরুষ আগেই হমত উইএ থাইয়াছে, কি গৃহ-দাহের সময় আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া

গিয়াছে। তাহাদের একমাত্র দলিল তাহারা এতদিন নির্বিবাদে বিনা ওজরে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে, স্বর্গীয় মহাবাহু ধনেশ্বরের আমলে কখনো কোনো আপত্তি উঠে নাই।

কুবের এমন কাঁকা প্রমাণে ঠকিবার পাত্র নয়—তাহার এককালে বন্ধবিহারী, অল্পকালে কাঙালীর মস্তশ্রুণ হইতেছে; এবং তাহাদিগকে সগর্হন করিবার ক্ষমতা কুবেরের অন্তঃপুরে জননী চন্দনমণি ও জায়া কাত্যায়নী মুখাইয়া আছেন—স্বামীর বা পিতার টিপটি পাইলেই হইল।

রাখাল বলিল—এসমস্ত বড় অগ্রাঘ হচ্ছে কুবের! তোমার পূর্বপুরুষের কীর্তি আর গরিবদেব রুজি লোপ করে অধ্যাতি আর মহা কুড়িও না! এতে স্বপ্ন নেই, মঙ্গল নেই!

কুবের মাথা নীচু করিয়া হনহন করিয়া বাথালের নিকট হইতে চলিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া কাত্যায়নীকে বলিল—হুঃ! সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে ঠুঁর মতন ফকির হই আর কি! গরিবের রুজি মেরেই ত জমিদার! আর, ভারি পূর্ব-পুরুষ দেখাতে এসেছে! এরা আমার কোথাকার কে?—

মামার শাল, পিসের ভাই,

তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

কাত্যায়নী তাহার সুন্দর মুখখানি ঘুরাইয়া বলিল—কখনো ওদের কথা শুনো না, ওরা চিরকাল আমাদের হিংসে করে!

কাঙালী আসিয়া আমতা-আমতা করিয়া রাখালকে বলিল—দ্যাখো রাখাল, রাজাবাবু তোমাকে বলতে পাঠালেন যে আমি রাজা, আমার রাজ্যকার্য্যে কেউ টিকটিক কবে এ আমি পছন্দ করিনে। তা তুমি.....

রাখাল অবাক হইয়া কাঙালীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাঙালী আশ্বে আশ্বে প্রস্থান করিল।

কত লোক আসিয়া সদরে ধরা দিয়া পড়িল, রাখালকে ধরিয়া বসিল তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে। কত বিধবা অপোগণ্ড শিশু লইয়া আসিয়া অন্তরে মণিমালার কাছে কাঁদিয়া পড়িল—এ বিপদে যদি কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে তবে সে মণিমালার পরম ধার্মিক হ্রায়বান স্বামী রাখাল-বাবু!

রাখাল ও মণিমাল। প্রতিকারের অক্ষমতা জানাইল। দরিদ্র ব্যথিতদের চোখের জল পড়িতে দেখিয়া গোপনে শুধু নিজেদের চোখ মুছিল। তাহারা তাহাদিগকে বন্ধবিহারী ও রাণী জগদ্ধাত্রীকে দুঃখ জানাইতে পরামর্শ দিল।

বন্ধবিহারী বলিল—হাঁঃ! স্বাধীন নৃপতি আছে—ত'দ যা খুসী করতে পারে। এতে কাহাবো কিছু বলব'দ নাই!

রাণী জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কুবের আমার কথা রাখবে না। আমাকে মিছে বলা।

সকলে হতাশ হইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ভগবানের উপর বিচারের ভার দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল, ফিরিল না কেবল মহিষবাথানের বেচন চক্রবর্তী। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী ছাড়িয়াছে হয় ব্রহ্মত্ব উদ্ধার করিবে নয় ব্রহ্মহত্যা হইয়া লোভী রাজাকে ধনের সাহিত প্রাণও দিয়া আসিবে। বেচারী নিতা কাছারীতে দরবার কবিত্তে যায়, একদিনও রাজার সাক্ষাৎ পায় না, কর্মচারীরা তাহাকে পাগল বলিয়া হাঁকাইয়া দ্যায়। তবু বেচনের উদ্যমের শৈথিল্য নাই।

একদিন রাখাল ও কুবের ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইয়া ফিরিয়া ঘোড়া হইতে যেই নামিয়াছে, অমনি কোথা হইতে বেচন চক্রবর্তী লাফাইয়া আসিয়া কুবেরের রাইডিং-বুট-পর্য্য হই পা জড়াইয়া ধরিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—দোহাই মহারাজের, ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন। আমার পক্ষে বলবার কি আছে শুধু সেই কথাটি দয়া করে শুনুন।

কুবের বুটস্থ লাধি মারিয়া বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দূরে ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিয়া গটগট করিয়া রংমহলের দিকে চলিয়া গেল। রাখাল গর্জন করিয়া ডাকিয়া উঠিল—কুবের!

কুবের ফিরিয়া না তাকাইয়া টকটক করিয়া সিঁড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া গেল—প্রজা পাইক বরকন্যাজদের সামনে রাজা কুবেরকে রাখাল অপমান করিয়াছে।

চন্দনমণি বলিল—পিপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে! গেলে বল, আর দেবী নেই।

বকবিশারী শাদা-শাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—

‘কে দিল অনলে হাত কে ধবিল ফণী ?

মশল অষ্টমে কার রক্তগত শনি ?’

শাস্ত্রেই আছে—

‘অতি দর্পে হতা লক্ষা, অতি মানে চ কৌরবাঃ !

অতি দানে বলির্বন্ধ, সর্বমত্যস্ত গহিতম্ ॥’

রাণী কাত্যায়নী বলিল—

‘অত বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে ।’

রাণী জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া বলিলেন—রাখাল চিরকালে গোঁয়ার ! মহারাজকে জালিয়েছে, এখন কুবেরকে জ্বালাতে আরম্ভ করেছে ।

বৃন্দাবন গোস্বামী রাখালকে চিঠি লিখিয়াছেন যে তাঁহাদেরই বাড়ীর পাশে উদ্ধব গোঁসাইএর বাড়ী হাজার টাকায় বিক্রী হইয়া যাইতেছে। যদি রাখাল টাকা পাঠাইতে পারে তবে তিনি উহা রাখালের জন্য কিনিয়া রাখিতে পারেন ।

মণিমালা রাখালকে বলিল—এখান থেকে চলে চল, উদ্ধব গোঁসাইএর বাড়ীটা কিনে আমরা থাকব ।

রাখাল বলিল—না মণি, এখান থেকে গেলে চলবে না ; কুবের দিন দিন ধ্বংসকর হয়ে উঠছে, তাকে রক্ষা করবার, পরামর্শ দেবার, উপদেশ দেবার কেউ না থাকলে জমিদারী রসাতলে যাবে ।

—কিন্তু ওরা ত তোমার উপদেশ চায় না, বিরক্ত হয় ।

—ওষুধ খেতে তেতো লাগে, কিন্তু রোগ সেরে গেলে ওষুধের গুণ টের পাওয়া যায় । একটু ব্যয় হলেই কুবের ভালো মন্দ বুঝতে পারবে ।

মণিমালা নিরন্তর হইল । পরের উপকার করার একটা বৃহৎ ও মহৎ আবরণের অন্তরালে, খাওয়া-পরাতে ভাবনা না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইয়া দিবার সুযোগের প্রতি একটু মমতা বোধ হয় রাখালের মনের মধ্যে এক কোণে অতি গোপনে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল । সেইজন্য সে নিজে না বুঝিয়াও বারবার এই বাজবাড়ী ছাড়িয়া যাইতে নানা-রকম ওজর তুলিতেছিল । চিরদিন যে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার এই এতটুকু নিশ্চিন্ত আরাম জোর

করিয়া ভাঙিতে মণিমালাব ক্লেণ হইত, তাই সেও কখনো জোর বা জেদ করিতে পারিত না ।

(৫৪)

বেচন চক্রবর্তীকে জুতা-স্বক লাথি মারিয়া রাখালের নিকট ভৎসিত হওয়ার পর কয়েক দিন কুবের আর রাখালের কাছে দেখাই দ্যাব নাই । কুবের লজ্জিত হইয়াছে ভাবিয়া রাখাল খুসী হইয়া উঠিয়াছিল । কিন্তু মণিমালা দেখিতেছিল সকলেই কেমন ভার-ভার ; সকলেই যেন কিসকিন করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে অথচ তাহা তাহার নিকটে লুকাইতে চাহিতেছে । একদিন প্রভাতে মণিমালা নিজের ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল রাণী জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া বসিয়া-বসিয়া কাঁদিতেছেন, মণিমালাকে দেখিয়া তাঁহার কান্না আরো বেশী হইয়া উঠিল ; চাকরদাসীরা সকলেই স্নানমুখে এক এক জায়গায় জড়ো হইয়া চুপিচুপি কি বলাবলি করিতেছে, মণিমালাকে দেখিয়াই চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিয়া সরিয়া যাইতেছে ; চন্দনমণির মুখে কেমন একটা টেপা হাসি পালিশকরা ইন্দ্রপাতের ছুরির সফ ফলার মতো বড় নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল ; কাত্যায়নী চোখ ঘুঁবাইয়া সারা অঙ্গে টেউ তুলিয়া কৌতুকে হাততালি দিয়া-দিয়া বলিয়া-বলিয়া ফিরিতেছিল—আজকে একটা মজা হবে গো ! আজকে একটা মজা হবে গো !

হানা-বাড়ী মতো সমস্ত বাড়ীটাতে একটা কি অব্যক্ত ভয় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল ; পিশাচীর হাসির জ্বালা কাত্যায়নীর হাসি কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গল ফেরি করিয়া ফিরিতেছিল ; সমস্তানোর হাসির জ্বালা চন্দনমণির হাসি বিবের জ্বালার ঝলক বলিয়া মনে হইতেছিল ।

ভীত শুষ্ক মুখে মণিমালা কাত্যায়নীকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হবে বো ? আজকে কি হবে ?

অট্টহাস্য করিয়া কাত্যায়নী বলিল—হবে হবে, সে একটা মজা হবে !

—মামী, তুমি বল না কি হয়েছে ?

চন্দনমণি ক্রুর হাসি হাসিয়া রহস্য আরো নিগূঢ়তর করিয়া বলিল—কি জানি বাছা, পাগলীর মেয়ে বোমা কি বলছে !

মণিমালা চাকরদাসীদের জিজ্ঞাসা কবিল—ওরে কি হয়েছে তোরা জানিস যদি বল।

সকলে ছলছল চোখে একবার তাহাব দিকে চাহিয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে সরিয়া গেল।

মণিমালা মাকে জিজ্ঞাসা কবিল—মা, মা, তুমি বল কি হয়েছে।

তিনি শুধু বেশী করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মণিমালা বলিল—তবে যাই আমি কুবেরকে জিজ্ঞাসা কবে আসি।

কাত্যায়নী মুচকি হাসিয়া বলিল—সে পথে কাঁটা পড়েছে।

মণিমালা সে কথা কানে না তুলিয়া কুবেরের মহলে যাইতে গেল; আকালু খানসামা বলিল—মহারাজ কাহাকেও যাইতে দিতে মানা কবিয়াছেন।

মণিমালা অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই স্থিতে-না-পারার ব্যাপার হইতে দূরে থাকিবার জন্য মণিমালা তাড়াতাড়ি আপনাব ঘরে গিয়া ঢুকিল; অমনি চন্দনমণি ও কাত্যায়নী হো হো হো করিয়া রান্সসীর মতো নিষ্ঠুর বিজ্ঞপের হাসি হাসিয়া উঠিল।

রাখাল কাছারীতে গিয়া বসিয়াছে, সেখানেও সকলে এমনি উদাস ভাবে একএকবার তাহার দিকে অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে এবং রাখাল অত্যদিকে ফিরিলেই আমলারা আপনাদের মধ্যে কি বলাবলি করিতেছে।

রাখাল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিল—কি হে? কি হয়েছে?

সকলে অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আজ্ঞে কিছু না।

রাখাল সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া কাছারী হইতে নামিয়া অন্তবে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া কাঙালী তোষাখান্য হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বলিল—রাখাল-ভায়া, তুমি একবার ওপরে এস।

রাখাল প্রশ্নমাত্র না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাঙালীকে অনুসরণ করিয়া চলিল—আজকের বাতাসে এমনি একটা অজানা রহস্য ভাসিতেছিল যে তাহার মধ্যে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য যেন কিছু ছিল না, যা-খুসী একটা উদ্ভট বাণের

বীজ যেন অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবার জন্য ফাটিবার উপক্রম করিতেছে!

তোষাখান্য বিস্ময় করিতেছিল বহুবিহারী। রাখাল আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কাঙালী বলিল—বলছি।

রাখাল চুপ করিয়া বসিল। কাঙালীও কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া বসিয়া বহিল। কেহ কোনো কথা কহে না, বেহ কাহারো দিকে চাহে না, কেহ একটু নড়িতে বা নিশ্বাসের শব্দ কবিতো ও যেন ভয় পাইতেছে!

হঠাৎ কাঙালী বলিয়া উঠিল—রাজাবাবু তোমাকে বলতে বললেন.....

রাখাল মূখ তুলিয়া কাঙালীর দিকে চাহিল।

—তোমার ব্যবহার ইতর-নাগাদ তাঁর ওপরে শুশ্রূতা সাধাই হয়েছে।!... ..

রাখাল অবাক আশ্চর্য্য!

—প্রথম দৃষ্টান্ত, তুমি রাজা-মামাকে ওয়ারেন্ট দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিলে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, তুমি বর্তনপুর পবননা কীক দিয়ে নিতে চেয়েছিলে। তৃতীয় দৃষ্টান্ত, কাত্যায়নীর সঙ্গে বিবাহে তোমরা জীপুর্কষে আপত্তি তুলেছিলে। চতুর্থ দৃষ্টান্ত, রাজা-বাহাদুরের মাতা রাণী জগদ্ধাত্রী দেবীর গহনার হক পাওনার কাত্যায়নী-রাণীকে বঞ্চনা করে তোমার জী সেগুলি আত্মনাং করতে চেয়েছিল। পঞ্চম দৃষ্টান্ত, তুমি আমাকে—বাজার শুল্ককে—চোব বানিয়ে ছিলে। ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত, তুমি শিক্ষক থাকে কালীন রাজা-বাহাদুরকে তামাক খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে প্রহার করেছ, উঠতে বসতে লেখাপড়া কবাবার জন্য তিরস্কার করেছ। সপ্তম দৃষ্টান্ত, রাজা-বাহাদুর তাঁর প্রজাদের সঙ্গে যেমন খুসী ব্যবহার করবেন, তুমি তাঁর জন্তে তাদের নামে তাঁকে তিবস্তাব ভৎসনা করে প্রজাদের আশ্রয় বৃদ্ধি করে আশ্রয় দিয়েছ আর তাদের বিবাহী হতে শিক্ষা দিয়েছ। অষ্টম দৃষ্টান্ত, তুমি রাজার স্বাধীনতায় বরাবর বাধা দিয়েছ।

এক নিশ্বাসে এই পর্য্যন্ত বলিয়া কাঙালী একখানা কাগজ রাখালের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল—এই দেখ, রাজা-বাহাদুরের নিজের হাতে লেখা তোমার অপরাধের

কিরিতি। এখন রাজা-বাহাদুরের হুকুম—ভূমি স্বী. পুত্র নিয়ে তিন দিনেব মধ্যে পাহাড়পুর ছেড়ে চলে যাবে। যদি না যাও, আমাদের ওপর হুকুম হয়েছে, দরোয়ান দিয়ে বে-ইজ্জত করে তোমাদের বাড়ী থেকে বা'র করে দিতে হবে।

রাখাল মর্মান্বিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিল—কাঙালী, শেষের কথাটা তোমার মুখ থেকে না বা'র করলেও ভূমি পারতে।

কাঙালী লজ্জিত হইয়া বলিল—আমি কি করব, আমি কি করব, আমার ওপরে রাজা-বাহাদুরের যেমন হুকুম।

রাখাল ঘৃণাভরে বলিল—তোমরা কল্পনেই ত কুবেরের মাথা খেলে। একজন বাবা, একজন মা, একজন শিক্ষক ও শ্রমজ—তোমরা রাতদিন তার কানের কাছে রাজা রাজা করে তাব মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ। এর ফল তোমাদেরও ভোগ করতে হবে।

রাখাল অপমানের লজ্জায় সম্মুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি সকলের কোঁত্‌হলী দৃষ্টি হইতে আপনাকে লুকাইবার জন্য অন্ধরে আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল, আজ তাহার মণিমালা-কেও মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ হইতেছিল।

(৫৫)

রাখাল গিয়া যেই ঘরে ঢুকিল অমনি কাত্যায়নী ও চন্দনমণির উচ্চ হাস্তধ্বনি আবার সমস্ত বাড়ী ভরিয়া তুলিল।

মণিমালা রাখালের লজ্জিত মুখের দিকে ক্লিষ্ট মুখে চাহিয়া বলিল—আজকে ওদের সব কি হয়েছে, আমাদের দেখছে আর টেপাটিপি করে হাসছে? মা কেবল কাঁদছেন?

রাখাল অপরাধীর মতন বলিল—আমাদের কুবের তাড়িয়ে দিচ্ছে, তাইতে ওদের অত আনন্দ। যেমন আমি এর আগে তোমার কথা শুনে যাইনি, তেমনি আজ গলাধাক্কা খেয়ে বেরুতে হচ্ছে। নাও তল্লি বাঁধো। তিন দিনেব মধ্যে পাহাড়পুরের এলাকা ছেড়ে যেতে হবে, নইলে দরোয়ানে বেইজ্জত করে বা'র করে দেবে।

এই দারুণ অবস্থাস্য কথা শুনিয়া আকাট হইয়া মণিমালা দাঁড়াইয়া রহিল।

দাবানলের জ্বালা এই সংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। রাজ্যের মেয়ে পুরুষ যে যতদূর হইতে আসিতে পারিল বাখাল ও মণিমালাকে শেষ বিদায় দিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সকলে কাঁদিয়া আকুল—তাহারা পিতৃমাতৃহীন হইল। রাজ্য দ্বিতীয়বার রাজা ও রাণীকে একসঙ্গে হারাইল! তাহাদের মান ইজ্জতের বক্ষক, সুখদুঃখের অংশীদার, তাহাদের ভয়ভ্রাতা সহায় আজ বিদায় লইতেছে! এই সমস্ত লোকের সহিত রাখাল ও মণিমালারও প্রাণের যোগ হইয়া গিয়াছিল, আজ ইহাদের কাছে বিদায় লইতে ইহাদের চোখের জলের সঙ্গে তাহাদেরও চোখের জল মিশিতে লাগিল। সব-চেয়ে বেশী কাঁদিয়া ভূপাল—তাহার দ্বিদিমাকে আর সে দেখিতে পাইবে না; সে তাহার মামা-মামীকেও যে বড় ভালোবাসে, এখানেই তাহার জন্ম, এখানেই তাহার জ্ঞানের উন্মেষ, এখানকারই স্থান গাছ পালা মানুষ তাহার পরিচিত প্রিয়; সে এই সমস্ত ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানে না। আর কষ্ট হইতেছে তাহার একমাত্র বন্ধু গৌরীপ্রসাদকে ও ম্যানেজার সাহেবের কন্যা নেলীকে ছাড়িয়া যাইতে নেলীকে যে সে বড় ভালোবাসিত; তাহার সমবয়সী; ভূপালের খেলবার জুটি এ বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, রাজ্যাব দৌহিত্র বাহিরের কাহাবও সহিত মিশিতে পাইত না, কাজেই তাহার একমাত্র সঙ্গিনী সখী ছিল নেলী। নেলীও তাহাকে বড় ভালোবাসিত, ভূপাল চলিয়া যাইবে শুনিয়া সেও যে বড় কাঁদিতেছে, তাহার পোষা খরগোশটা মরিয়া গেলেও সে এমন কান্না কাঁদে নাই। সব-চেয়ে ভূপালের কষ্ট বোধ হইতেছিল, আব দুইমান মাত্র পরে তাহার ক্লাশের পরীক্ষা—সে নূতন স্থলে গিয়া এ পরীক্ষায় হয়ত পাশ করিতে পারিবে না, তাহাকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই আর-এক বৎসর হয়ত পড়িয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু জন্মন বৃথা! এ বাড়ীতে একমাত্র তাহারই অধিকার ছিল, কিন্তু তাহার মাতামহের নাম-সই-করা এক ছত্র লেখায় তাহার অদৃষ্ট একেবারে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে, সে এখানকার কেউ নয়!

রাখাল মণিমালা ও ভূপাল রাণী জগদ্ধাত্রীর চরণে

চোখেব জল ফেলিয়া নৌবে বিদায় লইল। রাণী জগদ্ধাত্রীও নীরবে অশ্রুমোচন করিতে-করিতে রাখালের হাতে হাজার টাকার নোট তুলিয়া দিলেন; এই মাত্র তাঁহার শেষ সম্বল।

তাহারা চন্দনমণি ও কাত্যায়নীও কাছেও সকল ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত অপরাধেব জন্ত ক্ষমা চাহিয়া মিনতি করিয়া কাঁদিয়া বিদায় লইল—তাহারা শান্তী-বৌএ পরম্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

বহুবাহারী হাসিতে-হাসিতে বলিল—দুঃখ করিয়ো না বাবাজী, ক্ষান্ত করিয়ো না মা, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট!

মণিমালা শেষকালে আকালু খানসাগার নিষেধ না মানিয়া কুবেরের কাছে গেল। কুবেব গম্ভীর হইয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল—আজ সে দিককে দেখিয়া ভাড়াভাড়ি উঠিয়া পাড়াইল না, বাস্তব হইয়া গড়গড়া লুকাইল না।

কুবেরের সম্মুখে চোখের জল জোঁর করিয়া বন্ধ রাখিয়া অকম্পিত সহজ স্বরে মণিমালা বলিল—শেষ বিদায়ের কণ্ঠে তোমায় জানিয়ে যেতে এসেছি ভাই, ভগবান সাক্ষী, আমরা কখনো তোমাব অহিত চিন্তা করিনি।

কুবেব জুঁক হইয়া কথিয়া বলিয়া উঠিল—করেননি? আগা-গোড়া হিংসে করে শত্রুতা করেছেন।

মণিমালা হাসিয়া বলিল—আমরা তোমার হিংসে কবে শত্রুতা করলে আজকে তোমার এমন করে অপমান কববার সুযোগ পুতে হত না, ভাই!

কুবেব এ কথার জবাব দিতে পাবিল না, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। মণিমালা জয়ী হইয়া গর্ভভরে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

বাখাল বা ভূপাল কুবেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

(৫৬)

১) যাহারা তাহাদিগকে চাহে না, নির্ধন নির্ভর ভাবে যাহারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল, তাহাদের জন্ত অশ্রু বিসর্জন করিতে-করিতে মণিমালা কহা বিভাকে কোলে করিয়া পাকীতে উঠিল, রাখাল ভূপালকে লইয়া হাতীতে চড়িল। হরিহরছত্রের মেল। হইতে বাখাল এই হাতী পাকী ও ভূপালেব চড়িবার জন্ত এফটি ঘোড়া কিনিয়া আনিয়াছিল; —আজ অনেক হাতী-পাকীর মধ্যে সেই পাকী সেই হাতী

বাছিয়া তাহাদিগকে চিববিদায় করিয়া দিতে পাঠানো হইয়াছে। হাতীটি দাঁতাল, পিঠে সওয়ারী চড়িলে সে মাঝে-মাঝে পিঠ ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিত; রাখাল সেই হাতীতে চড়িবার সময় হাসিয়া বলিল—বাহাদুর-গজ, এইবার তোমার পালা!

হাতী ও পাকী দেউড়ি পার হইয়া যাইতেই ছুড়ুম ছুড়ুম করিয়া দুইটা বোম ফুটিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে রাগাব শত্রুরা রাজবাড়ীর হাতা ত্যাগ করিয়া গেল।

বোমেব আওয়াজে সাধারণ লোকের বুক ফাটিয়া অশ্রু পড়িল। চন্দনমণি আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! এত দিনে আপদ বিদায় হল!

বাণী কাত্যায়নী চন্দনমণির দিকে চাহিয়া জুর হাসি ঠোঁটের কোণে চাপিয়া বাধিয়া বলিল—আরো গোটা-কতক আপদ শিগ্গির বিদায় হবে!

চন্দনমণির মুখ শুকাইয়া গেল। উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে বোমা, আবার কে?

কাত্যায়নী হাসিতে-হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে, আছে!

পাহাড়পুর হইতে রেল-স্টেশন কুড়ি ক্রোশ তফাতে। কার্তিক মাস। সেই ছোট বড় অসংখ্য নদীতে দেশের বস্তার জল এখনো শুকায় নাই। নদীতট এখনো কানায়-কানায় পূর্ণ থাকিয়া খরবেগে বহিতেছে—পাহাড়িয়া নদীব স্রোত বিষম; নদীর কুলের দুই ধানেও স্থানে-স্থানে জল জমিয়া আছে, কোথাও-কোথাও জন নামিয়া গিয়া কাদা হইয়াছে। এখনকার অবস্থা এমন যে স্টেশন পর্যন্ত বরাবর নৌকাতেও যাওয়া যায় না; হাতী-পাকীরও পথ বেশ পড়ে নাই। কোনো-মতে ছোট-ছোট সোঁতাগুলি পার হইয়া ভীমশ্রী নদীর ধারে গিয়া পড়িতে পারিলে নৌকায় যাওয়া যাইতে পারে।

রাজি গভাব হইয়াছে। হাতীর উপর ভূপাল ঘুমাউদা গিয়া বাখালেব কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। রাখাল এক হাতে ভূপালকে ও একহাতে হাতীর গমির কাছি ধরিয়া শুক হইয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে একটা সোঁতা। পার হইতে হইবে। বেহারা বা পাকী কাঁধে করিয়া ফলে

নামিল। সোঁতায জল বেশী ছিল, জল পাকীর তলায় পৌঁছিল। বেহারারা পাকী মাথায় কবিতা চলিল। পাকী টলমল করিতেছে—যদি বেহারাদের হাত ফস্কাইয়া পড়িয়া যায় তাহা হইলে মণিমালা ও বিভার জীবনলীলা এইখানেই শেষ। ক্ষুদ্র বিভা ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া মায়ের গলা ধরিয়া বলিতে লাগিল—ছুগ্গা ছুগ্গা মাকে বেঁচে থেকো, বাবাকে বেঁচে থেকো, দাদাকে বেঁচে থেকো!

পাকী সোঁতা পাব হইয়া গেল। বাহাদুর-গঙ্গ কুলে দাঁড়াইয়া পিঠ ঝাড়া দিয়া আপত্তি জানাইতে লাগিল সে জলে নামিবে না। মাহত যত গঙ্গ-বাগ দিয়া তাহার মাথায় মারে, যেট যত ফাশা দিয়া তাহার পশ্চাতে খোঁচা মারে সে তত জ্বরে পিঠ ঝাড়িতে থাকে। রাখালের প্রতিমুহুর্তে ভয় হইতে লাগিল এখনি হবত সে ভূপালকে লইয়া ছিটকাইয়া গিয়া জলে পড়িবে। তারপর ক্রুদ্ধ হাতী শুঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জলেই চাপিয়া রাখুক বা পায়েই চাপিয়া ধরুক বা আছাড়ই মারুক ফল তাহার একই-প্রকার। রাখাল মাহতকে বলিল—মম্মু মম্মু, আর মেরো না। ওকে ঠাণ্ডা করে আমাদের নামিয়ে দাও, আমরা হেঁটে সোঁতা পার হচ্ছি।—মাহত বলিল—কুছ জর নেই বাবু, আপনি চূপ করে বসে থাকেন।—আর চূপ করিয়া বসিয়া থাকুন, বসিয়া থাকিতে দিলে ত! অনেক ধন্যধন্তির পর হাতী জলে নামিল বটে, কিন্তু সম্মুখে ছিল গর্ভ, হাতী ছন করিয়া গিয়া তাহাতে নামিয়া পড়িল, হাতীর পিঠ পর্যন্ত জল! রাখাল তাড়াতাড়ি পা গুটাইয়া লইল। বাহাদুর-গঙ্গ দেখানে আবার বাহাদুরী দেখাইতে আরম্ভ করিল। রাখাল একএকবার মনে করিতে লাগিল ভূপালকে পিঠে করিয়া সাতার দিয়া পলাইবে। কিন্তু হাতী শুঁড় ফিরাইয়া যদি ধরিয়া ফেলে! রাখাল হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিল—মনি, কুবেরের মনস্কামনা এবার পূর্ণ হল।

হঠাৎ এই উচ্চ কণা শুনিয়া হাতী জল হইতে উঠিয়া উজ্জ্বল পৌড় দিল। এও ভয়ানক! তবু জলে দাঁড়াইয়া পিঠ ঝাড়া দেওয়ার চেয়ে ঢের ভালো।

এমনি করিয়া কোনো মতে নোনাধড়কে নদীর তীরে কাদনটোল ডিহর কাছারীতে আসিয়া পৌঁছিল। মাহত

ও বেহাবারা হাত জোড় করিয়া বলিল—হজুর, আমাদের কল্প মাফ হয়, মহাবাজের হুকুম আমাদের এখন থেকেই ফিরতে হবে। না ফিবলে আমাদের রুজি যাবে, জ্ঞান যাবে।

বাজার মেয়ে-জামাই-দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে একটা কাছারীর সামনে অসহায় নামাইয়া দিয়া যান বাহন সমস্ত ফিরিয়া চলিয়া গেল একটা কোথাকার কে বেদখলকার ছোকরার হুকুমে। অদৃষ্ট!

মণিমালা হতাশভাবে বলিল—এ যে স্বীপান্তরে দেওয়া! উপায় কি হবে?

বাখাল শুক মুখে বলিল—দেখি ভিহির নায়েবের যদি দয়া হয়, সে যদি যাওয়ার কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

এমন সময়, সেই যে তুফানি বাখালকে খুব দিতে গিয়া রাখালের কাছে চাবুক খাইয়াছিল, সে আসিয়া রাখাল ও মণিমালাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। সে হাত জোড় করিয়া বিনীতভাবে রাখালকে বলিল—হজুর, রাজকন্যাকে আমার গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে বলুন। আমি আপনাদের ছেলে, এখানকার নায়েব-তহশীলদার।

তুফানির জীকন্ডা ঘোমটা দিয়া আসিয়া মণিমালাকে “ভক্তি” করিল। মণিমালা তাহাদিগের সহিত তুফানির অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। তুফানি রাখাল ও ভূপালকে আনিয়া নিজের হাতে মোড়া পাতিয়া বসাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—হজুর, এ রাজ্য আপনার, আমি আপনার গোলাম, আপনি অসঙ্কেচে এখানে থাকুন, আমি নৌকার জোগাড় দেখছি।

—তুফানি, শিগগির নৌকা দেখ। তোমাদের রাজ্য-বাহাদুরের হুকুম তিন দিনের মধ্যে তাঁর রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে, নইলে তাঁর দরওয়ান অপমান করে তাড়িয়ে দেবে।

তুফানি গর্ভভরে বলিল—কার সাধ্য আমার সামনে আপনার অপমান করবে? আমার তাবে একশো লাঠিঘাল পাইক আছে, তারা মরবে, আমি মরব, আমার জীপুজ-কন্যা মরবে, তারপর আপনাদের দেখা পাবে। আমি মহারাজের চাকর; কিন্তু আপনি আমার কাছা-বাচ্চার মুখের ভাত রক্ষা করে দিয়েছিলেন।—আমাদের জ্ঞান ও মালের ওপর আপনার অধিকার।

রাখাল লঙ্ঘিত হইয়া বলিল—তুফানি, আমি আবো
কত লোকের একটু আধটু উপকাব করতে চেষ্টা কবেছি;
তাদের কাছ থেকে উণ্টে অপকারই পেয়েছি। আর
তোমাকে আমি বেত মেরেছিলাম তুফানি!

তুফানি শা হাত জোড করিয়া বলিল—সে কথা আমি
ভুলিনি হুজুব। আমি আপনাব মহম্মদ মাহাত্মা মর্যাদা
বুঝতে না পেরে নীচ কাজ করতে গিয়েছিলাম। আপনি
গুরুমশায়ের মতন বেত মেরে আমাকে শিক্ষা দিয়ে-
ছিলেন। আমি সেইদিন থেকে আপনার গোলাম হয়ে
আছি।

রাখাল উঠিয়া তুফানিকে আলিঙ্গন করিয়া সম্মল নয়নে
বলিল—তুমি আমার বিপদের বন্ধু, তুমি আমার অপবাদ
ক্ষমা কর তুফানি।

তুফানি রাখালের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—আমি
আপনার দাস।

(৫৭)

পাটের সময়। সমস্ত নৌকা বোঝাই। নৌকা আর
পাওয়া যায় না। তিন চার দিন এই কাদনটোলা ডিহিতে
রাখাল ও মণিমালা পড়িয়া আছে। তুফানি শা সপরিবারে
গুরুর মতো তাহাদের সেবা করিতেছে।

অনেক কষ্টে একখানা নৌকা মিলিল। রাখালেরা
আজ যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। সদব হইতে ডিহির
নায়েব-তহশীলদারের উপর পরোয়ানা লইয়া পাইক
আসিল—মহারাজের বাবা ও শ্বশুর সপরিবারে বাড়ী
যাইবেন, একখানা নৌকা যেন হাজির থাকে।

পাইক রাখাল ও মণিমালার জন্ত নিযুক্ত নৌকা আটক
করিল।

রাখাল ও মণিমালা আশ্চর্য হইয়া ভাবিল—হঠাৎ বাবা
ও শ্বশুর-মহাশয়দের সপরিবারে বাড়ী বাওয়াটা কি-বকম
কিরকম ঠেকিতেছে! তাহাদেরও কি আমাদের দশা হইল
না কি!

তুফানি রাখালকে বলিল—আপনারা এই নৌকা নিয়ে
চলে যান; এই নৌকা ফিরে এলে গুরা যাবেন, ততদিন
আমার এখানেই একটু বিশ্রাম করবেন না হয়।

রাখাল বলিল—এতদিন রইলাম, আর একদিনের কথা

বৈত নয়। বড় নৌকা, একসঙ্গেই সবলে যাওয়া দায়ে।
পবদিন বহুবিহারী ও কাঙালী ডিহিতে নামিয়া
রাখালকে দেখিয়াই ঝাঁকহিয়া উঠিল—আ্যা! তুমি এখানে
যাওনি?

রাখাল হাসিয়া বলিল—না, একসঙ্গে এক নৌকায়
যাত্রী হব বলে অপেক্ষা করছি।

বহুবিহারী ও কাঙালী বলিল—না, ও নৌকায় ত
তোমাদের জায়গা হবে না।

রাখাল তেমনি হাসিমুখেই বলিল—জায়গা বেশ হবে।
কাল ঐ নৌকা নিয়ে আমরা চলে গেলে আজকে এই
ডিহিতে গড়াগড়ি দিতে হত। দয়া করে নৌকা নিয়ে
যাইনি। আমরা আগে এসছি, এ নৌকায় আগে
আমরা চড়ব। জায়গা না হয়, তোমরা পরে যেও।

রাখাল আর কাহারও দিকে না চাহিয়া স্ত্রীপুত্রবৎসা
লইয়া গিয়া নৌকায় উঠিল এবং মাঝিকে হুকুম করিয়া—
নৌকা খুলে দাও।

গণপত মাঝি নৌকা খুলিতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া
রাখাল নৌকার গলুইএর উপর দাঁড়াইয়া হুকুমের স্ববে
বলিল—গণপত, নৌকা খোলো।

এতদিন বাহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয় করিয়া আসিয়াছে
তাহার আদেশ রাজ্যের ভয়েও অবহেলা করিতে গণপতের
সাহস হইল না; সে নৌকা খুলিবার উপক্রম করিতে লাগিল।

বহুবিহারী ও কাঙালী তাহা দেখিয়া বলিল—বড়
নৌকা আছে, বড় নৌকা আছে, সকলেরই বেশ ভাঙ্গা
হবে; সকলেরই কুলিয়ে যাবে, কতক্ষণেই বা মানল। ..

কাত্যায়নী তাহাদের বিষদাত ভাঙিয়া বিদায় কান্দে-
ছিল। কাঙালীর ইচ্ছা ছিল বহুবিহারীকে বিদায় করিয়া
সদরে সেই রাজ্যের শ্বশুররূপে প্রধান হইয়া থাকিবে,
এবং অন্দর হইতে চন্দনমণিকে বিদায় করিয়া কাত্যায়নীর
মাকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কাঙালীর অস্থ
হইয়াছিল কস্তা কাত্যায়নী। সে যখন-তখন বহুবিহারী ও
চন্দনমণির আচরণ লক্ষ্য করিয়া ক্রুরেরকে বলিত—ভালো
আপদ হয়েছে বুড়োবুড়িগুলো! রাতদিন কেবল ঘুরছে।
আমরা ছুটিতে যে একটু নিরিবিলি আমোদ আহ্লাদ করব
তার জো নেই।

হঠাৎ কথাটা কাত্যায়নীর রূপমুগ্ধ ধৌবনমত্ত কুবেরের মনে লাগিল।—ঠিক ত! বুড়াবুড়ি গুলা বড় জ্বালাইয়াছে! দাঁও ওদের খেদাইয়া!

কাত্যায়নীর হিসাবে একটু ভুল হইয়াছিল। সে নিজে বাক্যে বুড়ার দলে না ফেলিলেও কুবের ফেলিল। হুকুম দিল, বন্ধবিহাবী ও কাঙালীকে সপরিবারে বাড়ী চলিয়া যাইতে হইবে—বাড়ীতে থাকিয়া তাহারা কিছু কিছু মাসহারা পাইবে। রাণী জগদ্ধাত্রীও বুড়ি হইয়াছিলেন; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারের ভয় থাকাতে তিনি রেহাই পাইয়া গেলেন। কাত্যায়নী নিজে কঁাদে নিজে জড়াইয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বন্ধবিহারী ও কাঙালী রাজাগিরির খোলস পিছনে খুলিয়া-রাখিয়া আপনাদের কুঠিরে লুকাইতে যাইতেছে; তাহাদের দস্ত আফালন সমস্ত সমাপ্ত; চন্দন-মণি ত একেবারে চূপ।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা এখন হঠাৎ চলে যেন?

কাঙালী বলিল—এখন রাজাবাহাদুর স্বয়ং লায়ক হয়েছেন, আর তাঁকে আগলাবার ত দরকার নেই। আমরা অনেক দিন বাড়ীঘর ছাড়া, তাই দেশে যাচ্ছি একবার।

বন্ধবিহাবী ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিল—যথার্থ, যথার্থ!

টেশনের ঘাটে পিয়া নৌকা লাগিল। বন্ধবিহারীদের সঙ্গে আহারের আয়োজন ছিল; আহার করিতে বসিয়া গেল। ভূপাল ও বিভা যে ছটি বালক বালিকা আছে, তাহাদেরও খাইতে ডাকিল না। এই বুনো জায়গায় প্রস্তুত খাদ্য কিনিতে পাওয়া যায় না; তুফানি-শার উপহার-দেওয়া সিধা রন্ধন করিবারও সময় নাই, ট্রেন অলক্ষণ পবেই আসিবে। তুফানি-শার দেওয়া দুধ চিড়ে মুড়কি কলা দিয়া ফলারের জোগাড় করিবার অন্ত রাখাল ভাঙায় নামিল।

উপরে উঠিতেই কে তাহাকে ডাকিল—রাখাল-বাবু মশায়, রাখাল-বাবু মশায়।

রাখাল ফিরিয়া দেখিল এক জায়গায় নৌকার পাল দিয়া থিথিয়া পাহাড়পুর-কলেজের শিক্ষকেরা বসিয়া আছেন,

তাহারা পূজার ছুটিব পর বাড়ী হইতে স্কুল-কলেজের কাজে সপরিবারে ফিরিয়া যাইতেছেন।

রাখাল নিকটে গেলে তাহারা বলিলেন—আপনি এখানে?

রাখাল লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—পাহাড়পুরের বাস উঠিয়ে দেশে চলেছি। কুবের ভায়া রাজা হয়েছেন, আর আমাকে দরকার নেই।

—কী অশ্রাব! পাহাড়পুরের ঘিনি প্রাণ ছিলেন তাঁকে বিদায় করে দেওয়া!

রাখাল সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল—আমাকে তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, মাপ করবেন। আমার ছেলেমেয়েদের জন্তে খাবার তৈরি করতে যাচ্ছি, ট্রেনের আব বিলম্ব নেই।

শিক্ষকেরা বলিয়া উঠিলেন—আমাদের পরিবারেরা রয়েছেন, রান্না প্রস্তুত। অনেক দিন রাজবাড়ীতে আপনারা জীপুরুষে যত্ন সমাদর করে আমাদের নিয়ন্ত্রণ খাইয়েছেন। আজ আমরা জীপুরুষে এই মাঠের মাঝখানে আপনাদের নিয়ন্ত্রণ করছি।.....ওগো তোমরা যাও, রাখাল-বাবুর জী আর ছেলে মেয়ে নৌকোতে আছেন, নামিয়ে নিয়ে এস।

অন্যজীয়েদের সহৃদয় যত্নে রাখাল ও মণিমালা মুগ্ধ হইয়া দেশে রওনা হইল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুলনা

‘নিকট’ কপট ভারি; ক্ষুদ্র ব্যবধান
মনে হয় সুবিশাল প্রাচীর-সমান।
‘দূরে’তে দূরত্ব কোথা? সে যে সন্নিকট;
মনের মিলন-দ্বারে সে যে পূর্ণ-ঘট!

যেখানে প্রদীপ, সেখা আছে ছায়া আলো।
কর্ণমাত্রা আছে ফল,—মন্দ আর ভালো।

যে মেঘেতে জল দেয় বজ্র আছে তা’য়।
সর্ব বস্তু বিধে ভরা আশা-নিরাশায়।

শ্রীমত্তমধন সরকার।

ভারত-ভারতীর চরণ-প্রান্তে আর দুই-এক ডালি নৈবেদ্য

আমার হাতের এই সারস্বত নৈবেদ্য-যোগানো কার্যটি আমি কিছু দিনেব মতো স্থগিত রাখিয়া ভ্রাতৃসৌহার্দের শান্তিসমীরণে শরীর-মনের ক্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্বাস্থ্য উপার্জন করিবার মানসে বোলপুরের শান্তিনিকেতন হইতে রাত্রির শান্তিবামে উপনীত হইলাম। দুইচারিদিন যাইতে না যাইতে—আশ্রয় বিধাতার করুণা—এবারকার পূজার সামগ্রী ঘেন আকাশ হইতে আমার করতলে নিপতিত হইল। শ্রীমান্ ভ্রাতৃবিভ্রনাথ ভায়া আমার বিগত মাসেব প্রবন্ধে বল সঞ্চার কবিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ফরাসীস্ দপ্তর হইতে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র আমাকে অনুবাদ করিয়া দিলেন :—

“ভারতের অগণ্য পুণী দৃষ্টে অল্পমান হয়—সমস্ত দর্শনের তব ও ধর্মতব ভাবতীয় মনীষিগণ কর্তৃক অগ্রত্ব সঞ্চালিত হইয়াছিল। এ কথা কেবল-একটা ফাঁকা অল্পমান নহে—ইহার প্রমাণও আছে যথেষ্ট :—গ্রীস দেশের মাথালো-শ্রেণীর দুই তরুজানী—পিথাগোরাস্ এবং প্লেটো—ঐ মূল উৎস হইতেই তরুখান লইয়া কলস ভরিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রাচী অনাবৃত হইয়াছে ;—বাস্তবিকই প্রাচী হইতে আমরা আলোক পাইয়াছি :—স্যাটিন ভাষায় এই যে একটি কথা আছে ‘প্রাচী হইতেই আলোকের উৎসান’ এটা সত্যকথা।” Introduction Le Buddhisme par G. Delafont —Page 9। এই গ্রন্থকার আর একস্থানে বলিতেছেন :—

“খ্রীষ্টীয় মতবাদ হইতে যদি খ্রীষ্টীয় কর্মকাণ্ডেব বাহ্যোপকরণের অবতারণা করা যায় তবে দেখিবে—তাহাব মধ্যেও ইহুদীধর্মের অপেক্ষা আধ্যাত্মিক প্রভাব বেশী সুপরিষ্কৃত। দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে :—অগ্নি প্রজালন (burning candles) কোণাকুশী (chalice) প্রভৃতি কাথলিক উপাসনামণ্ডপের সাজসজ্জা যত কিছু, সমস্তই বৈদিক ধর্মের যজ্ঞীয় উপকরণ ; আচার্য্য-বরণ এবং মস্তক-মুণ্ডন (tonsure) ব্রাহ্মণধর্ম হইতে আসিয়াছে ; বিবাহ-সংস্কারত সমস্ত আধ্যাত্মিক মতোই সমান আকারে

বর্তমান ; তা ছাড়া পুরোহিতদিগের ব্রহ্মচর্য্য (celebracy), পাপস্বীকৃতি (confession), প্রাদেশিক, এসমস্তের মূল উৎস বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম হইতে আসিয়া পাইয়াছি—সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনীর মঠ, সংঘসভা, ধর্মপ্রচাৰ। Gerson da Cunha বলেন—‘মহাযান সম্প্রদায়ের সাহস অনেক বিষয়ে কাথলিক খ্রীষ্টধর্মের সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধধর্ম এবং কাথলিক খ্রীষ্টধর্ম উভয়েরই মধ্যে—সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনীর মঠ তো আছেই—তা ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তিকে ধর্মের উচ্চতম সমাক্রম করা হইয়াছে ; মস্তকমুণ্ডন, সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, পাপস্বীকার, উভয়ের মধ্যেই সমান ; বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আমাদের মতো সবই আছে—পরোক্ষসব আছে—মন্ত্রালাপ আছে—বটাবাদন আছে—মালাদপ আছে—সবই আছে, এমন কি—(মহাযান-পন্থী) বৌদ্ধেরা মহাপুরুষদিগের মধ্যবর্তিতাতেও বিশ্বাস করে।’ এইরূপ স্পষ্ট দেখা বাইতেছে যে, ইহুদী ধর্মের অপেক্ষা আধ্যাত্মিকের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম অনেক বেশী পরিমাণে স্তম্ভী।” ঐ ২৫ পৃষ্ঠা।

ফরাসীসেরা এ-দেশীয়দিগের হায খোলা-প্রাণের নোংরা, তাই উপরি-উক্ত গ্রন্থকারটি পেটে কিছু না রাখিয়া সব কথা পঠাপঠি খুলিয়া বলিয়াছেন। দুই একজন উচ্চদরের গ্রন্থকার বাদে ইংরাজ পুরাবৃত্ত-লেখকদিগের মধ্যে ষাঁহার ফরাসীস এবং জার্মান-দিগের দেখা দেখি ভারতীয় শাস্ত্রাদি হাঁটকাইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে যথা-সম্ভব কতক পবিনাণ ব্যুৎপত্তিলাভও করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের মনোমত অভিপ্রায় অতটা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে সাহসী হ’ন নাই। কিন্তু সত্যের প্রভাব এমনি অনতিক্রমণীয় যে, শেখোক্ত গ্রন্থকারদিগের লেখনী হইতেও সময়ে সময়ে নয়-নৈপুণ্যের (diplomacy) বাধ ভাঙিয়া প্রকৃত বস্তু কথাটা স্পষ্টাকাবে বাহির হইয়া পড়ে। Rhys David এর প্রণীত “Buddhism” নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লেখা আছে দেখিলাম এইরূপ :—

[‘ফরাসীস্’] Professor Garbe in his book which I quoted in the first lecture, the just published *Sancti et Philosophie*, repeats his opinion expressed in the *Monist* of January 1894, that the Greeks did actually borrow, in other respects, from the Indian philosophers. And Professor von Shroeder, in his treatise *Pythagoras und die Inder*, seems to me to have quite

clearly made out his case in favour of a borrowing by Pythagoras. It is at least certain that the students of ancient philosophy will do well to study more carefully than hitherto the Indian parallels.

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেব ১লা ডিসেম্বর তারিখের "Literary Guide" নামক ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্মনীতিব মৌলিকতা এবং পৃথিবীব্যাপী প্রভাব সম্বন্ধে একজন সম্ভ্রুত-সম্পন্ন সুবিদ্বান্ স্পষ্টবক্তা বলিতেছেন—

Coming to his (Sir E. Ray Lancasterএর) recent essay; two remarks on page 16 of the *Annual*, appears to me to call for comment. In the first, he says that *the moral precepts of Christianity are to be found, scattered here and there, in the writings of Greek and oriental sages* (the italics are mine), conveying an impression that in such writings the Higher Ethic is, as it were, hit upon in merely passing or casual remarks, without ever being insisted upon, emphasized, or amplified. This impression may possibly be due to the unfortunate fact that of some of the best Greek ethical writers, only scattered fragments have survived. There is, however, at any rate, one pre-Christian ethical literature that has come down to us *in extenso*. This is the Pitaka literature of Buddhism. As far as mere space goes, it is much more voluminous than the New Testament, and that space is not expanded upon biography or theology. Its ethic is wellknown to be as lofty as, many consider it to be loftier than, that of the New Testament. What, now, is the position of the Buddhist ethic in this literature? Well, certainly, "scattered here and there" would be about the very last epithet that any student of the Pitakas would think of applying. Not merely is it to be found throughout insisted on, emphasized, and amplified in all kinds of ways, but it is interwoven with the very structure of the system. "As a man washes foot with hand, and hand with foot, so is understanding purified by conduct and conduct by understanding." It is incorporated into the famous compendium of the system known as "the Arian Eightfold path that leads to Sorrow's Ceasing"; and unless it be practised "in the highest" (Samma=Latin Summa), there is no attainment of the goal. It will thus be seen that the suggestion implied in "scattered here and there" cannot be sustained.

The second remark is that "it is directly through the spread and impulse of the Christian religion that this moral teaching has been carried over the earth."

It is evident that the history of the Buddhist propaganda, carried over the whole of Asia (and apparently further still) without the shedding of one drop of blood, is as yet unknown to most English people. I would suggest, however, a conversation on the point with, say, a Burmese or Sinhalese, brought up, not in our tradition but in his own. His tolerant and kindly, if perhaps faintly ironic, smile is a wonderful solvent of the stiffness of our European assumption that no tradition but our own is worth considering.

Edward Greenly.

অধুনাতন কালের আর-একজন সুবিদ্বান্ ইংরাজ লেখক বলিতেছেন—

"The deeper one penetrates towards the spiritual centres of ancient civilizations, the higher seem the heights to which pre-Christian saints and sages reached. Every now and then one is startled to come upon a feature which was supposed to be a landmark erected by Christianity. Just as the dogmas and rites of Christianity find their fore-runners in heathen religions, so the ethical ideals associated more or less closely with these dogmas and rites are legacies from earlier ages. Even the Beatitudes—those brightest blossoms on Christian soil—can be traced to former growths, from which, indeed, they show a certain degeneracy. Each 'Blessed' [অর্থাৎ "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth," এইসব খ্রীষ্টোক্ত-পরম্পরার সুকৃত্রিমীয় Blessed শব্দগুলির প্রত্যেকে] is accompanied by its reward—a partnership which the Stoic [আমাদের দেশে Stoic না, পরন্তু গীতা-শাস্ত্রের মতানুযায়িত কর্মযোগের অনুরূপতা] would have looked upon as immoral."

Adam Gowans Whyte.

অধ্বানদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবব Paul Deussen তাঁহার প্রণীত "System of Vedanta" নামক সারবান্ গ্রন্থের গোড়া'র একস্থানে আপনাব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপ :—

"The thought that the empirical view of nature is not able to lead us to a final solution of the being of things, meets us not only among the Indians but also in many forms in the philosophy of the west. More closely examined this thought is even the root of all metaphysics, so far as without it no metaphysics can come into being or exist. For if empirical or physical investigation were able to throw open to us the true

চীনের তৃতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব

(১৯১৫-১৬)

(১) “আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন!”

বিগত ৫ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যাকালে “ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের” বক্তৃতা-গৃহে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে পরিচালক রীড্ সাহেব বলিলেন—“মহাশয়, আজ এ পাড়ায় এক বাড়িতে বিবাহের ধুম। বাহিরের আওয়াজ ঘরের ভিতর বড় বেশী প্রবেশ করিতেছে। কিছু জোরে চোঁচাইয়া কথাবার্তা বলিতে হইবে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“এই যে বাজি পোড়াইবার শব্দ শুনিতেছি উহা কি এই বিবাহ উপলক্ষ্যে না কি?” ইনি বলিলেন—“হা, আপনাদের দেশেও বিবাহোৎসবে এইরূপ বাজি-বাজনার ব্যবস্থা আছে বুঝি!” বক্তৃতা হইয়া গেল। ডাক্তার উ-টিংফাঙ সভাপতি ছিলেন। রাত্রি হইয়া আসিল।

ধানিক ক্ষণ পরে রীড্-পত্নী আসিয়া বলিতে লাগিলেন—“ডাক্তার উ, মহা বিপদ। আবার বুঝি ১৯১৩ সালের হাপামা উপস্থিত!” রীড্ জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেন, কি হইয়াছে?” পত্নী বলিলেন—“শুনিতে পাইতেছেন না—কামান দাগার আওয়াজ?” উহা মিয়া বলিলেন—“মেয়েমানুষ মাঝেই ভীক। ভুঁই-পট্কা, হাওয়াই, আতসবাজির আওয়াজ শুনিয়াই আপনি কামান-দাগার ঘটা দেখিতেছেন! পাশের বাড়ীতে যে বিয়ের সমারোহ?” রীড্-পত্নী বলিলেন—“ভুঁইপট্কার আওয়াজ, বোমাব আওয়াজ আর কামানের আওয়াজ তফাৎ করিবার মত কাণজ্ঞান আমার আছে। ওই শুধুন ‘বুম্’! ওই শুধুন ‘বুম্’! ইহা কি ছেলেদের হাতের ভুঁইপট্কা?” রীড্ এবং উ আলোচনা করিতে লাগিলেন—“তাই ত, এখন শাংহাইয়ে কামান দাগাদাগি কি জন্ম? কাহার উপর আক্রমণ? কোথা হইতে আক্রমণ?” রীড্-পত্নী বলিতে লাগিলেন—“আমি যখন এই গৃহে আসিতেছিলাম—তখন মনে হইল যেন আমার মাথার উপর দিয়া হুস্ করিয়া একটা কি চলিয়া গেল?” রীড্ এবং উ বলাবলি করিতে লাগিলেন—“বিদেশী মহাল্লার উপর আক্রমণ হইবে কেন? বোধ হয় নদী হইতে কেজার দিক তোপ ছাড়া হইতেছে—কিন্তু কেজাই বা

আক্রমণ করিবে কে? শুনিতেছি কয়েক দিন হইল একখানা সশস্ত্র চীনা রণতরী শাংহাইয়ের ঘাটে আশ্রিত। তাহার কাণ্ডে ও লক্ষ্যেরা ত সকলেই যুয়ান্ পক্ষীয়। তাহারা কি হঠাৎ বিজ্রোহী হইয়া উঠিল?” রীড্-পত্নী বলিলেন—“বোধ হয় তাই। জাহাজের লোকেরা যুয়ানের দল ছাড়িয়া বোধ হয় বিপ্লব সূত্র করিল। এই জন্ম কেজাটাকে আগে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত। এই কেজায় আজকাল যুয়ানের অনেক সৈন্য আছে। তাহা ছাড়া গোলা বারুদ রসদ ইত্যাদি অনেক সংগ্রহ হইয়াছে।” রীড্ বলিলেন—“অসম্ভব নয়। শাংহাইয়ে বিপ্লবপন্থীরা খুব সম্ভব জাহাজের কাণ্ডে হাত করিয়াছে। শাংহাইয়ে আজকাল নাকি হাজার হাজার বিপ্লবপন্থী আসিয়া জুটিয়াছে।” কোন কোন কাগজে প্রকাশ দে, বিদেশী মহাল্লার প্রত্যেক বাড়ীতেই নাকি যুয়ানের বিপ্লবপন্থী সান্-পন্থী একজন করিয়া চীনা আশ্রয় লইয়াছে।”

নানা-প্রকার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। ভূত্যা আসিয়া জানাইল উ মহাশয়ের ভবন হইতে মটরকারে সংবাদ আসিয়াছে। তাহার পত্নী তাঁহাকে শীঘ্রই ঘরে ফিরিবার জন্ত গাড়ী পাঠাইয়াছেন। বৃদ্ধ বিশেষ চিন্তিতভাবে গিয়া মোটরে বসিলেন। বৃদ্ধা রীড্-পত্নী ততোধিক বৃদ্ধা উ পত্নীর কথা পাড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—“আহা, বুড়ীর বৃদ্ধ বয়সে বড় কষ্ট। একদিনও মনে শান্তি নাহি। সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কেন?” রীড্ বলিতে লাগিলেন—“ডাক্তার উ উভয় দিকটে পড়িয়াছেন। যুয়ান্ উকে বহুবার সরকারী বন্দ গ্রহণ করিতে অহুরোধ করিয়াছেন। উ কোনমতেই যুয়ানের আধিপত্যে পদগ্রহণ করিবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই সেদিন পিকিঙে শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইল। যুয়ান এত সাধাসাধি করিলেন তথাপি উ প্রদর্শনী পরীক্ষকগণের হইতে রাক্ষি হইলেন না। এদিকে সাতো চরমপন্থিতাও উ পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ বন্দ বাড়িয়াছে—গুণগোলের ভিতর না যাওয়াই ইচ্ছা। কিন্তু যুয়ানের দল উকে সহজে ছাড়িবে না। মাথাগরন ছোক্রারা উকে কয়েকবার ভয়ও দেখাইয়াছে। তাহারা বলে—“খোশখুলি আমাদের দলে থাকিতে ইচ্ছা না করেন

যুগ্মানের দলে যাইতে পারিবেন না। একবার যখন আমাদের দলে ছিলেন তখন শেষ পর্যন্ত আমাদের দিকেই সহায়ভূতি দেখাইতে হইবে।” অধিকন্তু উ পয়সাওয়ালা লোক, কাজেই সান্‌পছীরা উর তহবিল হইতে বিপ্লবের লক্ষ্য অর্থ-সাহায্য আশা করে।”

রীড-পত্নী আবার বলিলেন—“চীনে নামজাদা বড়লোকদের বড় বিপদ। কোন এক দলের পক্ষগ্রহণ করিলেই অপর দলেব হাতে মৃত্যু একপ্রকার সুনিশ্চিত। বৃদ্ধ উ মহাশয়ের যখন-তখন প্রাণসংশয় উপস্থিত হইতে পারে। এ যাত্রায় বিপ্লব যদি সত্যসত্যই স্বরূপ হয় তাহা হইলে হয় যুগ্মানের দল, না হয় সানের দল উকে সর্বদা প্রাণভয়ে উদ্ভিগ্ন করিয়া রাখিবে। বুড়া উ সেদিন আমার নিকট অনেক দুঃখের কথা বলিতেছিলেন। আজকাল আবার সহরের ভিতরে চীনাাদের বড় বড় দোকান লুটপাট ও ডাকাইতি স্বরূপ হইয়াছে। উর ঘরে কখন ডাকাইতি হয় বলা যায় না। কাজেই ধনে প্রাণে সারা হইবার ভয়ে উপরিবার বিশেষ বিব্রত।”

হোটলে আসিয়া শুইয়া পড়া গেল। ভাবিলাম—মজা মন্দ নয়। বিলাত হইতে যেদিন বেলজিয়াম রওনা হইবার কথা সেই দিন ইয়োরোপে রণভেরী প্রথম বাজিয়াছিল। আর একদিন দেরি হইলেই হয় ত বেলজিয়ামে কামান দাগা গুলিতাম। ঘটনাচক্রে তাহা হয় নাই। শেষ পর্যন্ত চীনে আসিয়া কামানগর্জ্জন শুনিতে হইল। কলিকাতায় রাজারাজড়ারা পদার্পণ করিলে কেজা হইতে তোপ পড়ে। তাহা ছাড়া কামানের আওয়াজ জীবনে আর ত কখনও শুনি নাই। লড়াইয়েব সত্যিকার কামান দাগা শাংহাইয়ে প্রথম শুনিলাম। ভেতো বাঙ্গালীর কানেও শুনাইতেছে মন্দ নয়। ববুম্, ববুম্, ববুম্—এইরূপ আওয়াজ দশবিশ মিনিট পর পর হইতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িলাম—রাত্রিকালে বোধ হয় দুএকটা আওয়াজে ঘুম ভাঙিয়াছিল—ভোরেও ঘুম ভাঙিবার সময়ে কামান-গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া গেল। সকাল বেলা আর কোন আওয়াজ নাই। বাহির হইয়া দেখি—সমস্ত রাজি কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, এখনও চারিদিক ঝাপসা। কলিকাতায়ও শীতকালে অনেক দিন এইরূপ দেখা যায়।

কাগজ আসিল—বুঝিলাম বিপ্লবই বটে। সত্যিকার কামান, সত্যিকার আক্রমণ। কিন্তু চূড়ান্ত বেকুবি—নিষ্ফল প্রয়াস—অনেকটা ঠিক যেন “ঢাল নাই, তরওয়ালা নাই, শাস্তিরাম সিং”এর অভিনয়!

জাহাঙ্গের অধিকাংশ কর্মচারিগণ সহরে এক ভোজে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে কাপ্তেন লস্করের সংখ্যা বেশী ছিল না। একথানা ছোট ঈমলাকে চড়িয়া ত্রিশজন পাশ্চাত্যবেশী চীনা যুবক রণভেরীতে উপস্থিত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি নৌ-বিদ্যালয়ের ছাত্র। কয়েক জনের সঙ্গে জাহাঙ্গের কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আলাপ ছিল। তাঁহারা যুবকগণকে জাহাঙ্গের বিভিন্ন বিভাগ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রিভলভার বাহির করিয়া যুবকেরা গোলন্দাজদিগকে বলিল—“বারুদখানার চাবি কোথায়? কামান দাগিতে হইবে ...শীঘ্র চাবি দাও। নচেৎ হস্তবোহসি ময়া ইত্যাদি।” বেগতিক বুঝিয়া গোলন্দাজ ছোট ছোট কামানে ব্যবহারোপযোগী বারুদ ও তোপ বাহির করিয়া দিল। কয়েক জন চতুর লস্কর বড় বড় কামানের তোপগুলি জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল। যুবকগণ কেহই কখন কামান দেখে নাই, কামান দাগা কাহাকে বলে তাহাও জানে না। বারুদ তোপ তাহাদের সম্মুখে আনা হইল। আবার গর্জ্জন করিয়া ছোকরারা হুকুম করিল—“দাগো কামান।” গোলন্দাজেরাজিজ্ঞাসা করিল—“কোথায়? কাহার উপর?” শাস্তিরামেরা বলিল “আবার কিসের উপর? ঐ কেজা ও বারুদ-ফ্যাক্টরির উপর।” প্রাণের ভয়ে গোলন্দাজেরা হুকুম মানিতে বাধ্য হইল। রাত্রির মধ্যে সর্বসমেত পঁচাশিটা তিন ইঞ্চি তোপ ছাড়া হইয়াছিল। একটাও কেজায় অথবা বারুদখানায় অথবা কোন অট্টালিকার উপর পড়ে নাই। গোলন্দাজেরা চতুর—তাহারা সতর্ক ভাবে নিশানা ঠিক করিয়াছিল। শাংহাইয়ের স্বদেশী বিদেশী কোন মহাজারই অনিষ্ট হইতে পারিল না। ছোকরারা মহা খুসী—কেজা ত আক্রমণ করা হইতেছে আর কি চাই? কেজার উপর গুলি গোলা পড়িতেছে কি না অতটা বুঝিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের কাহারও ছিল না।

ভোর হইতে না-হইতে কুয়াশা ভেদ করিয়া যুয়ানপক্ষীয় নিকটবর্তী এক জাহাজের লোকেরা এই জাহাজের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। জাহাজটা কিছু জখম হইতেছে দেখিয়া যুবকগণ যে যেদিকে পারিল নৌকা করিয়া পলায়ন করিল। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন—তাহা-দিগকে পাকড়াও করিবার চেষ্টায় কোন ফল হইল না।

সেই রাত্রেই স্থলপথে কেবল আক্রমণ করিবার আয়োজনও নাকি কবা হইয়াছিল। শাংহাইয়ের স্বদেশী মহাশয় স্থানে স্থানে বিপ্লববাদী সান্-পম্বীবা রিভলভার ও বোমা হাতে স্বেযোগ ধুঁজিতেছিল। দু'একটা থানাও আক্রমণের কথা ছিল। মোটের উপর সবই ফাঁসিয়া গেল। দুই তিন দিন ধরিয়া এখানে ওখানে দু'একটা মারপিট, ধব পাকড়াওয়ের হাঙ্গামা চলিল। বিদেশীয়েরা কানাখুসা হাসাহাসি করিতে থাকিল। কেবল প্রেসিডেন্ট য়ুয়ান হুচিঙায় পড়িলেন। য়ুয়ানপক্ষীয়েরা ভাবিতে লাগিল—“তবে কি নির্বিবাদে য়ুয়ানকে রাজতত্ত্ব প্রদান করা সম্ভবপর হইবে না? ছেলে-ছোকরা ত এ বাজায় বেকুবী করিল। কিন্তু এই বেকুবির পশ্চাতে কতখানি বুদ্ধি কৰ্ম পাণ্ডিত্য ও টাকার জোর আছে তাহা ত আশ্চর্য করিতে পারিতেছি না।”

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে শাংহাইয়ের সামরিক শাস্তি-বক্ষক দুই যুবকের হাতে মারা পড়েন। ইনি চীনের একজন পাকা নাব্যক্ষ ছিলেন। লোকের অন্তর্গমন, ইনি য়ুয়ানপক্ষীয়দিগের প্রধান পাণ্ডা বলিয়া নিহত হইয়াছেন।

ইতিমধ্যে কয়েকজন সান্-পক্ষীয় লোক ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের সঙ্গে রিভলভার বন্দুকও পাওয়া গিয়াছে। সকলগুলিই জাপানী-মার্ক। জাপানী ব্যবসাদারেরা পয়সা পাইলে ছুনিয়ার যে-কোন বিপ্লবপন্থীকে নাকি গোলাগুলি বন্দুক বারুদ ইত্যাদি বেচিয়া থাকেন। ইংরেজ পত্রিকা-সম্পাদকগণ এইরূপ বে-আইনি ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। জাপানীরা বড় অর্থ-পিশাচ এবং নীতি-বিরুদ্ধ কর্মে লিপ্ত থাকে বলিয়া অখ্যাতি রটিতেছে।

(২) প্রেসিডেন্ট য়ুয়ান ও বিশ্বশক্তি

হু-রাজা য়ুয়ান-শী কাইয়ের তর সহিল না। ১২ ডিসেম্বরের য়ুয়ান-পক্ষীয় পিকিঙের সংবাদপত্রগুলি দাল কাগজে ছাপা হইল। পিকিঙ সহবটা নব্য রাজ্য সীম পতাকায় স্বশোভিত হইল। ঢাক ঢোল সহকারে প্রচার “অযোধ্যায় রাম রাজা হবেন। অযোধ্যায় রাম রাজা হবেন।” য়ুয়ানকে দেশের লোকেরা জ্বরদস্তি করিয়া রাজসিংহাসন দিতেছে। মাণ্ডু, তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, চীনা, মুগলমান, কনফিউশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ব্যবসায়ী, সকল শ্রেণীর লোকেরই নাকি ইহাই হৃদয়ের ইচ্ছা। যথারীতি ভোটও গণনা করা হইয়াছিল—একটা ভোটও য়ুয়ানের বিরুদ্ধে ছিল না। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকাজী জননায়কগণ সমগ্র দেশব পক্ষ হইতে য়ুয়ানকে দরবারে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা ভক্তিগদগদ কর্তে য়ুয়ানের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—“চীনের চল্লিশ কোটি নরনারী সমবেত হইয়া আপনার ভগবচ্ছিত্র শ্রীমন্তকে রাজমুকুট দেখিতে অভিলষী। এই কদমাস ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত আপনার সম্ভানস্বরূপ চীনের আবালবৃদ্ধবনিতা হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছে।” য়ুয়ান কিছু কল্পভাবে জবাব দিলেন—“আমাকে আপনারা বিরক্ত করিয়া মারিলেন। আমাকে শাস্তিতে ভিষ্টিতে দিবেন না দেখিতেছি। যদি দেশের লোক রাজাই চাহেন তাহা হইলে অপর কোন ব্যতিক্রম রাজমুকুট প্রদান করুন। আমি সম্মতি হইতে অসমর্থ।” সেই দিনই চীনা ধুরন্ধরেরা আবার এক সভা আহ্বান করিলেন। আবার স্থির হইল য়ুয়ানকেই সম্রাট করিতে হইবে। আবার তাঁহারা করঘোড়ে য়ুয়ানকে দেশবাসীর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সেইদিনই য়ুয়ান মহা বিস্তম্বতাবে উত্তর দিলেন—“নেহাংই আপনারা আমাকে তবে রাজা করিবেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া দেশের লোককে খুসী করিলাম।” শ্রীমুখ হইতে এই বচন বাহির হইবামাত্র পিকিঙ, উজাসে মত্ত হইল। তাহার পর ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই তারিখ চীনের সর্বত্র উৎসব অলুপ্তিত হইতে থাকিল। য়ুয়ানের দল পিকিঙেই বেশী, কাজেই পিকিঙে উৎসবের মাত্রা বেশী। অন্তান্ত সহরে অতি সামান্যমাত্র আয়োজন। সরকারী আপিস, আদালত ছাড়া আর কোন বাড়িঘরে

আমোদপ্রমোদ পতাকার ধুম দেখা গেল না। শাংহাইয়েব স্বদেশী মহল্লায়ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দিন বিশেষ কিছু বুঝা গেল না। লাল কাগজে কোন সংবাদপত্র পিকিও ছাড়া বোধ হয় আর কোথাও ছাপা হয় নাই। সর্বত্রই একমাত্র সবকারী কণ্ঠচাবীবা “হবির লুট” নিজে ছিটাইয়া নিজেই খাইলেন। পাড়ার লোক সে হবির লুটে বোগ দিল না। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে য়ুয়ান্ কাগজে কলমে রাজা হইলেন—চীনা স্বরাজ্যকে কাগজে কলমে কবর দেওয়া হইল। নবীন সাম্রাজ্যের প্রথম বর্ষের প্রথম দিন ১৫ই ডিসেম্বর—কিন্তু রাজ্যাভিষেক-যজ্ঞ পাজি-পুঁথিবি তিথি নক্ষত্র অনুসারে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই দিনই জাপান-সরকার য়ুয়ান্কে এক উপদেশ-পত্র পাঠাইলেন। এই উপদেশে ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও ইতালীয় গবর্নেন্ট ও জাপানের পশ্চাতে ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—“য়ুয়ান্, কাজটা তাড়াহুড়া করিয়া সারিও না। আরও কিছু অপেক্ষা কর। দেশেব লোকের মতিগতি কোন্ দিকে সতর্কতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা কর। আমাদের বিশ্বাস তুমি রাজসিংহাসন গ্রহণ করিলে চীনের ভিতর বড় রকমের একটা গুণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে বুঝিতেছ—চীনের বাণিজ্য-সম্পদ নষ্ট হইতে থাকিবে—আর ঘটনা-চক্রে হয়ত আমরা ও আমাদের লোকজন টাকা পয়সা শিল্প ব্যবসায় বক্ষা করিবার জন্য লাঠিসোঁটা লইয়া চীনের ভিতর হাজির হইব। বুঝিলে, কাঁচা কাজ করিও না। আমাদের বিশ্বাস তুমি তোমার বিপক্ষীয়গণের ওজন বুঝিতে পাব নাই।” ঠিক এই ধরনেরই উপদেশ এই পাঁচ রাষ্ট্র প্রায় দেড় মাস পূর্বেও একবার দিয়াছিলেন। এই উপদেশপ্রদান-কাণ্ডে কর্তা ছিলেন জাপান—অস্ত্রাস্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ জাপানী চীন-মন্ত্রী পশ্চাতে পশ্চাতে য়ুয়ান্-দরবারে উপস্থিত ছিলেন মাত্র। জাপানের আশ্পর্ক দৈখিয়া ইংরেজ পত্রিকা-সম্পাদকগণ বিরক্ত—আর ইংরেজ মন্ত্রী জাপানী মন্ত্রীর এক-প্রকার ছকুম অনুসারে কর্ম করিতেছেন দৈখিয়া চীনের ইংরেজ-সমাজ নতশির। কি করা যায়?—ইয়োয়োপে এখন মহা কুরুক্ষেত্র। জাপানকে হাতে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে এখনই এসিয়ায় একটা

ছলস্থল বাধিতে পাবে। যাহা হউক, য়ুয়ান্, রাষ্ট্র-দূতগণকে সংক্ষেপে বলিলেন—“দেশের মধ্যে কোনপ্রকার অশান্তির কারণ নাই। বিপ্লববাদীরা গুণ্ডগোল সুরু করিলেও আমরা নিজশক্তিতেই তাহা দমন কবিতে পারিব। বিদেশীয় ধন-জনের কোন অনিষ্ট হইবে না। আপনাবা নিশ্চিত থাকুন। বিদেশী রাষ্ট্রের চীনে হস্তক্ষেপ আদৌ আবশ্যক হইবে না। এই-সঙ্গে আশ্বাসও দিতেছি যে, সকল-প্রকার বাধা দুর্যোগ্য বুলিবার পূর্বে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হইবে না।” য়ুয়ান্ বিদেশীর চোখ-রাঙানিতে কাবু হইলেন না। য়ুয়ান্‌র দৃঢ়তা দেখিয়া বিধাতা-পুরুষ অলক্ষ্যে হাসিলেন।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার লড়াইয়ের দৃশ্য আমরা সেক্সপীয়ারের নাটকে অনেক দেখিয়াছি। একটা দৃশ্য য়ুয়ান্-উপলক্ষ্যে মনে পড়িতেছে। রসিকপ্রবর তাঁহার “জুলিয়াস সীজার” নাটকে বিশ্বশক্তি ও মানবের ঘন্দ অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। সীজার যখন শত্রুহস্তে নিহত হব-হব হইয়াছেন ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মুখে চূড়ান্ত দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য ও শক্তির কথা বাহির হইতেছে। পর মুহূর্ত্তেই যিনি মারা পড়িবেন তিনি বুক ঠুকিয়া বলিতেছেন—“আমার কার্যপ্রণালী অটল, আমি শীঘ্র নড়ি না—আমাকে তোমরা কি fixed as the polar star বলিয়া জাননা?” ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে য়ুয়ান্ ও সেক্সপীয়ারীয় সীজারের মত “আকাশের ঐক্যতারার জায় স্থিৎপ্রতিষ্ঠ।” হুনিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বোধ হয় য়ুয়ান্ নড়িবেন না।

চারি মাস মাত্র গত হইয়াছে। আজ ২১ এপ্রিল গুড্‌ফ্রাইডে। কাল কাগজে পড়িতেছিলাম য়ুয়ান্ বিপ্লব-পন্থীদিগকে জানাইয়াছেন—“আমি চীনা-স্বরাজ্যের সভা-পতিত্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, (১) আমার ও আমার পরিবারের জীবন ও ধনসম্পত্তি তোমরা নষ্ট বা বিপন্ন করিবে না; এবং (২) এতদিন যাহারা আমার স্বপক্ষে রাষ্ট্রকর্ম করিতে ছিলেন এবং আন্দোলন চালাইতেছিলেন তাঁহাদিগের জীবনের উপর কোনরূপ আক্রমণ হইবে না। তোমরা এই দুই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেই আমি তোমাদিগের নির্বাচিত সভাপতির হস্তে রাষ্ট্রের ভার সমর্পণ করিব।” আজ

যুয়ান্ সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। মাস খানেক পূর্বেই—২২ মার্চ তারিখে—তিনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেক্সপীয়াব কল্পনায় নীজারের যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন জগতের প্রকৃত কণ্ঠক্ষেত্রে তাহা ঘটিল স্বচক্ষে দেখিলাম। ইতিমধ্যে ইয়াংপি ও হোয়াংহো নদী দিয়া অনেক জল বহিয়া গিয়াছে! বিপ্লবজি বহুবিধ ও বিপুল, তাহার পরিমাণ ওজন করা কোন এক ব্যক্তির বা দলের গাধ্য নয়।

(৩) চীনের সি কিয়াঙ-মাতৃক জনপদ।

আলঙ্কারিক ভাষায় বলিলাম হোয়াংহো এবং ইয়াংপির জল বহিয়া গিয়াছে। বস্তুত এই দুই নদীর কোন পরিবর্তন হয় নাই। খাঁটি ভৌগোলিক হিসাবে বলা উচিত যে জন বহিয়া গিয়াছে সি-কিয়াঙের।

বিদেশী রাষ্ট্রের কোন প্রদেশের নাম সাধারণতঃ কোন উচ্চশিক্ষিত লোকও মনে রাখে না। ইংলণ্ডের কাউন্টিগুলির নাম কয়জন ইয়াঙ্কি জানেন? জার্মানির প্রদেশসমূহই বা কয়জন ইংরেজের জানা আছে? এমন কি নিতান্ত ক্ষুদ্র বা নগণ্য স্বাধীন রাষ্ট্রেরও সংবাদ বেশী লোক রাখে না। বর্তমান ইয়েরোপীয় লড়াই সুরু হইবার পূর্বে তেজস্বী সার্ভিয়ার নাম পৃথিবীর কয়জনে জানিত? ঘটনাচক্রে সার্ভিয়ার নাম ছনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চীন ভাবতবর্ষ পারশু ইত্যাদি দেশের প্রদেশ বা জেলা-সমূহের নামও লোকসমাজে প্রচারিত না হইবারই কথা। ভাবতবর্ষের কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগর ছাড়া বোধ হয় অল্প কোনো নাম ভাবতের বাহিরে পবিচিত নয়। প্রদেশ হিসাবে একমাত্র বাঙ্গালার নাম স্থানে স্থানে শুনা যায়। বার্পার্ডি তাঁহাব বিখ্যাত গ্রন্থে বঙ্গের নামটা জাহির করিয়া দিয়াছেন।

ঘটনাক্রমে চীনেরও একটা প্রদেশ এখন হইতে ছনিয়ায় প্রসিদ্ধ থাকিবে। তাহার নাম য়ুনান্। সভাপতি য়ুয়ান্ ১৫ ডিসেম্বর (১৯১৫) তারিখে সভাপতি পদ গ্রহণ করিতে রাজি হন। তাহার দশ দিন পরে য়ুনান্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা য়ুয়ান্কে তারে জানাইলেন—

“য়ুয়ান্, আজ হইতে আমার প্রদেশ তোমার এলাকা বাহিরে জানিয়া বাধ্য। তোমার সাম্রাজ্যের একত্রিত্য আমাদেব এই য়ুনান্ স্বরাজ্যে খাটিকে না। য়ুনান্কে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র চীনের স্বরাজ্য-সেবকগণকে দৃষ্টবদ্ধ করিতে আজ হইতে আমরা লাগিয়া গেলাম।” স্বপ্ন-সংরক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত য়ুনান্ প্রদেশ এক নিমেষের মধ্যে সার্ভিয়ার মত জগদ্বাসীষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নিদ্রাক্ষে লোকেরা ভাবিল—চীনেও তবে প্রাণ আছে? চীনাগা নিতান্তই নড়নচড়নহীন জাতি নয়। ইহাদেব মরণোত্তর প্রবল শক্তিব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবাব লোক জন্ম গ্রহণ করে। বাহবা য়ুনান্!

১৯১৫ সালের বড়দিন করটা (২৫/২৬ ডিসেম্বর) জগতের লোকেরা চীনেব মানচিত্র হাতড়াইতে লাগা হইয়াছেন। য়ুনান্ কোথায়? নামটা ত স্বয়ং হু-নান্ হই য়ুনেরই লাগালাগি! কেহ কোরিয়া অঞ্চলে আঙ্গল চালাইলেন—কেহ আসিয়া পিকিঙের নিকট ঠেকিলেন। কেহ কেহ শাংহাইয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তোমরা ইয়াংপি নদীর মোহানায় য়ুনান্-নানের সন্ধান খাবিলেন। অনেকে হয়ত জানেন বিপ্লবপ্রবর্তক সান্ ক্যান্টনের লোক। তাঁহাবা ক্যান্টনেব নিকট য়ুনান্ খুঁজিতে লাগিলেন। যাহাকে গরু খোঁজা বলে সেই ধবণের খোঁজ নিশ্চয়ই হইয়াছিল—তথাপি য়ুনান্ দৃষ্টিগোচর হনু নাই।

না হইবারই কথা। শিক্ষিত চীনাগাও বোধ হয় মানচিত্রে য়ুনান্ বড় শীঘ্র বাহিব করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ ইহাদের মনে কখনও বোধ হয় য়ুনান্-নানের নাম স্মরণে আবশ্যক হয় না। বাঙ্গালদেশকে প্রাচীনকালে অযোধ্যা বৈদবজ্জিত দেশ বলিয়া জানিতেন। কোন সন্দেশে আমবা ব্রাহ্মণবর্জিত সমাজরূপে ভারতে প্রচারিত ছিলাম। ভারতবাসী বাঙ্গালীকে সংক্ষেপে “প্রাচ্য” নাম দিয়া বর্ণনা করিতেন। অনার্যের দেশ, দ্রাবিড়ের দেশ, অসভ্যের দেশ ইত্যাদি সংজ্ঞা বঙ্গদেশের ছিল। বাঙ্গালায় পদার্পণ করিলে নাকি আখোরা “পতিত” হইতেন। বাঙ্গালাদেশেব “বাঙ্গালার ইতিহাসে” দেখিতেছি যে, “ঐতিহ্যের ব্রাহ্মণে” বাঙ্গালীবা নাকি “পক্ষী”-জাতীয় মন্তব্য বিবেচিত হইত। সে-সব যাকাতার আয়লের কথা। কিন্তু য়ুনান্

সভ্য-সভ্যই চীনাঙ্গের চিন্তায় এইরূপ “পক্ষী-জাতীয়” গল্পবোঝ দেশ—বেদ-বিবর্জিত দেশ—বুনো অসভ্যদের দেশ। সভ্যত্বের চীনাঙ্গের সংখ্যা এখানে অতি অল্প বস্তুতঃ দুইশত বৎসর পূর্বেও য়ুন-নান্ চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিলনা—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাঞ্চুসম্রাটেরা এই জনপদকে চীনের দখলে আনিয়াছেন। কাজেই চীনাঙ্গও য়ুন-নানের সংবাদ বেশী রাখে না।

বলিয়াছি বিগত চারিমাসে সিকিমাণ্ডের জল অনেকখানি বহিয়া গিয়াছে। য়ুন-নান্ প্রদেশের অবস্থান এই সি-নদীর মাথায়। য়ুন-নানের একমাস পর কুই-চাও প্রদেশ য়ুয়ানের বিক্ষিপ্ত স্বরাজ-পক্ষ অবলম্বন করিল। তখনও য়ুয়ান্ নরম হইলেন না। তাহার তিন সপ্তাহ পর কোয়াংসি প্রদেশ স্বরাজের দল পুরু করিল। এইবার য়ুয়ান্ রাজ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কবিলেন। এবং সন্ধিব জন্ত স্বরাজ-সংরক্ষকগণের নিকট তার করিলেন। তাহাবও প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে কোয়াং-টুঙ প্রদেশ য়ুয়ানের বিপক্ষে দাঁড়াইল। ফলতঃ দেখিতেছি সেদিন য়ুয়ান্ “ছেড়ে দে মা কঁদে বাঁচি” ভাবিয়া সভাপতিত্ব পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বড়দিন হইতে শুভ-ক্রাইডে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চীনেব সি-কিয়াঙ-প্রক্ষালিত জনপদ জগতে এক অভূত দৃশ্য দেখাইল।

য়ুন-নান্, কুই-চাও, কোয়াংসি এবং কোয়াং-টুঙ এই চারি প্রদেশকে চীনেব সি-ধৌত বা সি-মাতৃক অঞ্চল বলা যাইতে পারে। এই জনপদের আয়তন আমাদের চারিখানা বাঙ্গালাদেশের সমান—তাহা অপেক্ষাও বেশী।

চীনাভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেক নামের অর্থ আছে। প্রদেশগুলির নামও অর্থযুক্ত। কোনটার অর্থ অমুক পাহাড়ের পূর্ব, কোনটার অর্থ অমুক হ্রদের দক্ষিণ ইত্যাদি। কতকগুলির নাম কবিত্বপূর্ণ। কাজেই প্রদেশের নাম করিবামাত্র চীনরা অতি সহজেই তাহার অবস্থান বুঝিয়া লইতে পারে। কিন্তু বিদেশীদের পক্ষে বুঝা সহজ নয়।

চীনের আলোচনায় তিব্বত, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া—এই পাঁচ জনপদের নাম ভুলিয়া যাওয়া আবশ্যক। এইগুলি ছাড়িয়া দিলে চীন সাম্রাজ্যের ষতখানি অবশিষ্ট থাকে তাহারই নাম চীন। এই চীন

আঠারটা প্রদেশে বিভক্ত—চীন বৃটিশশাসিত ভারত অপেক্ষা আয়তনে কিছু বড়—কিন্তু সমগ্র ভাবতবর্ষের ৬ অংশ মাত্র।

বাস্পপোত আবিষ্কারের যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল লোকই কৃষিকার্যকে জীবনধারণের প্রধান উপায় বিবেচনা করিত। জগতেব প্রায় সকল দেশকেই কৃষি-প্রধান বলা চলিত। তখনকাল দিনে নদ-নদীর গতি, আকৃতি ইত্যাদি অল্পসরে জনগণের স্বাস্থ্য ও সম্পদ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইত। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সকল দেশকেই মোটের উপর “নদী-মাতৃক” বলিলে দোষ হইত না।

বর্তমান কালে কৃষিকার্যের মূল্য নূতনভাবে নির্ধারিত হইয়া থাকে—কারণ ব্যবসায় ও শিল্পের প্রভাবেই এক-শতাব্দী পরিয়া মানবসমাজ পরিচালিত হইতেছে। এই প্রভাব প্রবর্তন করিয়াছেন পাশ্চাত্যেরা, কিন্তু এশিয়ায় এখনও কৃষিপ্রধান নদীমাতৃক দেশের যুগই চলিতেছে বলা চলিতে পারে।

অধিকন্তু সকল যুগেই পাহাড় পর্বত উপত্যকার অবস্থান এবং নদনদীর গতি প্রবাহ হইতে প্রত্যেক দেশের প্রদেশবিভাগ সাধিত হইয়াছে। বর্তমান কালের বাস্প-নিয়ন্ত্রিত-এঞ্জিন-চালিত শিল্পের প্রভাবেও ছনিয়ার কুত্রাপি এই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বিভাগ বিশেষ পবিবর্তিত হয় নাই। কাজেই এখনও কোন দেশের জেলা বা কাউন্টি বা প্রভিন্স বুঝিতে হইলে নদনদীর গতি অল্পসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত। আজকাল ইংলণ্ড, জার্মানি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশকে সভ্যতাহিসাবে আর নদীমাতৃক বলা চলে না। কিন্তু প্রাকৃতিক হিসাবে এগুলিও চিরকালই নদীমাতৃকই থাকিবে। আব চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য ও মিশর প্রাচীন কালের মত বর্তমান কালেও সভ্যতাহিসাবে নদীমাতৃকই রহিয়াছে, এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের বিচারে ত আছেই।

চীনে তিনটি নদীমাতৃক জনপদে বিভক্ত কবিতোঁছি। চীনে নদনদীকে “হো” “কিয়াঙ” “চুয়ান্” ইত্যাদি বলে। উত্তরের অঞ্চল হোয়াং প্রক্ষালিত, মধ্যের অঞ্চল ইয়াংসি (বা ইয়াংছি) প্রক্ষালিত, আব দক্ষিণের অঞ্চল সি-প্রক্ষালিত

হোয়াংহো চীনের শতদ্রু বিপাশা, ইয়াংসিকিয়াঙ্ নদী
গোদাধরী এবং সি-কিয়াঙ্ কাবেরী।

ভারতে আৰ্য্য-সভ্যতা পঞ্চদশ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও
দক্ষিণপূর্বে প্রসারিত হইয়াছে। সুদূর দক্ষিণকে আৰ্য্যময়
করিবার জন্ত অগস্ত্য-যাত্রার আবশ্যক হইয়াছিল।
রামায়ণের কবি দক্ষিণাঞ্চলটাকে বানরের দেশরূপে প্রচার
করিয়াছেন। তাহারও দক্ষিণে ত রাক্ষসের মুহূক! চীনা-
সভ্যতার ধারাও অনেকটা এই ধরণেব। প্রাচীনতম চীনা-
সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে।
উহা হোয়াং-মাতৃক দেশ। সেই অঞ্চলকেই চীনরা দুনিয়ার
কেন্দ্রস্থল বা গৌরব বলিয়া জানিত। সেই অঞ্চলের চারি-
দিকে যে-সকল জনপদ ছিল সেগুলির একটা সাধারণ নাম
প্রদান করিয়া তাহা বা সমুদ্র থাকিত। সেই নাম “Land
of the Barbarians” অর্থাৎ অপরিচিত স্বেচ্ছ বা অসভ্য
বর্করদিগের দেশ। এই পারিভাষিক শব্দ আমাদের
“পক্ষীজাতীয় মানুষের দেশ” অথবা “বানরের দেশ” অথবা
“বেদবর্জিত দেশ” অথবা “রাক্ষসের দেশ” ইত্যাদি বিবরণের
অনুরূপ।

প্রাচীন চীনের সভ্যতাকেই সেই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে
অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে হোয়াংহোর প্রবাহ
অনুসারে চীনা সমাজের প্রসার পূর্বদিকে সাধিত হইতে
থাকে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম চীনে প্রবর্তিত
হয়। তখনও চীনের রাষ্ট্রকেই বেশী পূর্বদিকে অগ্রসর
হয় নাই। হোনান নগর সেই যুগে রাজধানী ছিল—মোগল
সম্রাট কুবলা খা পিকিঙ্ নগরে রাজধানী প্রথম স্থাপন
কবেন। সে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। পিকিঙ্বে
বহু পশ্চিমে হোনান নগর।

এইরূপে পূর্বাঞ্চলের বর্কর বা পক্ষীজাতীয় মানুষ চীনা
সভ্যতার অন্তর্গত হইয়াছে। সেই সঙ্গে দক্ষিণেও সভ্যতার
অভিধান আসিত। ইয়াংছি পর্য্যন্ত সভ্যতার বিস্তার সাধিত
হইতে অনেক শতাব্দী কাটিয়াছিল। কাজেই ইয়াংছির
দক্ষিণ অঞ্চল শেনদিনমাত্র চীন-মণ্ডলের অন্তর্গত হইয়াছে।
সি-মাতৃক সমগ্র জনপদই খাটি সভ্য চীনাদের আবহাওয়া
বেশী দিন ভোগ কবে নাই। খৃষ্টপূর্ব যুগের চীন-সম্রাটেরা
এই দক্ষিণতম অঞ্চল সম্বন্ধে এক পকার অজ্ঞ ছিলেন বলা

যাইতে পারে। পুর্বাতন পুঁথিতে এই-সকল প্রদেশ-বিষয়ক
অল্পত কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পুর্ব-বর্ণিত
বহু ভৌগোলিক কল্পনার পাশে চীনা মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত
কল্পনাগুলি বেশ খাপ খাইবে।

কোন সময়ে হয়ত সম্রাটগণের খেয়ালে এই দক্ষিণ
বর্করগণের খোঁজখবর লওয়া হইত। মাঝে মাঝে অভি-
যানও পাঠান হইত। কিন্তু লক্ষ্য যিনিই আসিতেন তিনিই
রাজা হইয়া বসিতেন। সম্রাটের নিকট বশ্ততা স্বীকার
বা স্বাধীনতা দাখিল করার কথা তাহারা ভুলিয়া যাইতেন।
বহুকাল পরে হয়ত আবার এক নরপতি সেনাপতিক
আদেশ করিতেন—“দক্ষিণ অঞ্চলের বানরেরা কি
করিতেছে দেখিয়া আসিবার জন্ত ফৌজ পাঠাও। অনেক
দিন কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।” কয়েক বৎসর পর
সেনাপতি আসিয়া জানাইতেন—“হুঁজু ওখানকার বুনা
ডাকাইতেরা (দস্যুগণ) বিদ্রোহী হইয়াছে—চীন সম্রাটের
শাসন মানিতে চাহে না।” সম্রাট বিদ্রোহদমনের জন্ত নৌক
জন পাঠাইতেন। দুই তিন সম্রাটের রাজ্যকাল গত হইলে
হয়ত এক দিন সংবাদ আসিত—“দক্ষিণ অঞ্চল সাম্রাজ্যে
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।” সনতারিখ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক
নাই। চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে চীনের সি-প্রক্ষালিত দক্ষিণ
জনপদের সম্বন্ধ অনেকটা এইরূপই ছিল। যুন-নান্ এবং
কুই-চাও তাঙ-সুঙ মিডান-মিঙ্ আমলেও (৬০০—১৬১০
খৃঃ অঃ) চীন-সম্রাটগণের পূরাপূরি বশে আসে নাই।
দুইটা বঙ্গদেশের সমান এই জনপদ মাত্র দুই শত বৎসর
হইল চীনের দখলে আসিয়াছে। তবে কোয়াংটুং ও
কোয়াংসিই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সুঙ্ সম্রাটগণের অধীনে
ছিল। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুই প্রদেশ চীনের
অঙ্গীভূতই আছে।

সি-ধৌত জনপদের মধ্যে একমাত্র কোয়াংটুং প্রদেশ
সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। ক্যান্টন নগর এই প্রদেশের
বন্দর। মধ্যযুগের চীনা সভ্যতায় ক্যান্টনের কৃতিত্ব ও
গৌরব আছে। বৌদ্ধ প্রভাবের প্রথম অবস্থা হইতে
১৯১১ সালে সানের উত্তর পর্য্যন্ত চীনের ইতিহাসে ক্যান্টন
প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞাত তিন প্রদেশ চীনকাজই
নগণ্য। এই অঞ্চল এতই দুর্গম যে এখানকার লোক

চীনকে কিছু দেয়ও নাই—চীন হইতে কিছু গ্রহণ করেও নাই বলা যাইতে পারে। অথচ আজ চীনের এই পনব আনা “অচীনা” অঞ্চল দুনিয়ায় চিরপ্রসিদ্ধ হইতে চলিল।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার।

চরৈবেতি, চরৈবেতি

“আগে চল, আগে চল, ভাই!”

হুঃখের নামে যে স্বপ্ন ভীত, যে স্বপ্ন বাহিরের উদার মুক্তিকে দেখিয়া ভয় পায়, যে স্বপ্ন বিশ্বের রাজ্যপথে নিরুদ্দেশ যাত্রার নামে অন্তরে অন্তবে কাঁপিয়া উঠে, সে স্বপ্ন অতি ক্ষুদ্র স্বপ্ন। তাহাকে আরাম বল, স্বপ্ন বল, কিন্তু আনন্দ বলিতে পার না। তাহা আমাদিগকে নিরন্তর আরামের গৃহকোণের দিকে টানে, উন্মুক্ত বিশ্বের অনন্ত পথে বাহির হইতে দিতে চাহে না, তাহা ভীক, তাহা ক্ষুদ্র ও রূপণ; সে স্বপ্নের ভোগে প্রতিদিন আমাদের আত্মা ক্ষুদ্র ও রূপণ হইয়া আসে।

আর যে আনন্দ হুঃখের মধ্য দিয়া প্রাপ্য, যাহা তপস্তার ধন, যে আনন্দ বিশ্বের অনন্ত পথকে দেখিয়া এক চুল কম্পিত হয় না, যাহাকে হুঃখের নিকটতম যিহ্ন বলা চলে, সেই বিরাট আনন্দ আমাদিগকে প্রতিদিনকার আরামের গৃহকোণ হইতে টানিয়া জগতেব মুক্ত পথে বাহির কবিয়া দেয়। সত্যের বিরাট স্বরূপকে দেখিয়া সে আনন্দ সহর্ষে মাথা নত কবিয়া দেয় এবং সে একতিলও ভীত হয় না। বিশ্বভুবনের অনন্ত অপার পথে সে আনন্দ মহান নৃত্যছন্দে অগ্রসর হইয়া চলিয়া যায়।

এই আনন্দই যোগীর আরাধ্য আব ইহাই সাধকের সাধনার ধন। যুগে যুগে মহাকবিগণ এই আনন্দেরই জয়গান করিয়াছেন। সাধু ভক্তেরা এই আনন্দ লাভ করিয়া যুগযুগান্তের বন্দনা গান করিয়া গিয়াছেন। এই আনন্দেরই অন্বেষণে জগতের লক্ষ লক্ষ লোক সাধু মহাত্মাদের চরণের পিছে পিছে যাত্রা করিয়া লাভক্ষতিকে

ত্বণের ত্রায় তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। জীবন ও মৃত্যু তাঁহাদের পক্ষে সমান বরণীয় হইয়াছে। ক্ষুদ্র স্বপ্ন ও আরামের দিকে ইহারা ফিবিয়াও চাহেন নাই। যে মানুষ স্বপ্ন ও আরাম চাহিয়াছে সে নিজেব ধন মান পদগৌরবে ফীত হইয়া আপনাকে অসম্ভব উঁচুদরের বিজ্ঞ লোক মনে কবিয়াছে। জগতেব সমস্ত বৃহৎ অল্পষ্ঠান ও মহৎ প্রয়াস এবং মহৎ পুরুষগণের স্মৃতিত্র সমালোচনার দ্বারা সে নিজের রূপণতম বিজ্ঞতাই প্রকটিত করিয়া সমস্ত জগতেব ধূলায় ধূলাব সঙ্গে কোথায় মিশিয়া গিয়াছে! আর যে-সব মহা-পুরুষ জগতের মুক্ত পথে সত্যেব আলোকে সকলকে ডাক দিয়া জীর্ণবস্ত্রে ধূলিলিপ্ত দেহে যাত্রা করিয়াছেন—তাঁহাদের প্রতি-পদক্ষেপ যুগযুগান্তেব মানব আপন হৃদয়েব মধ্যে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে।

ভাবতের মনীষীরা বলিয়াছেন—মানব যে জগতে আসিয়াছে তাহা ক্ষুদ্র স্বপ্নের অন্বেষণে নহে, আরামের জ্ঞত নহে; ধন, মান, পদগৌরবের জ্ঞতও নহে। সে তীর্থ-যাত্রী। পরম দেবতাব স্বরূপেব অন্ত নাই। অনন্ত লোকে তাঁর অনন্ত স্বরূপ। এই ভুবন-লোকে তিনি ভুবনেশ্বর হইয়া আছেন; সেই ভুবনেশ্বরকে দর্শন কবিয়া তাঁব প্রশাদ গ্রহণ করিয়া, কেবল কণ্ঠে নহে—জীবন দিয়া তাঁর জয়গান করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে মানবের যাত্রা করিতে হইবে। এই জগতে আসিয়া সামন্ত বা মন্ত্রী, রাজা বা উজীর হইয়াও যে সেই জগন্নাথের চরণে সমস্ত জীবন দিয়া ভুলুষ্ঠিত প্রণাম না করিয়া যাইতে পারিল—সে অধম, সে রূপাব পাত্র। দীনেব দীন হইয়াও যে সেই প্রণামটি করিয়া গেল সে ধম্ম, সে ব্রাহ্মণ, যুগযুগান্তের সকল রাজচক্রবর্তীর মুকুট তাঁর চরণ-ধূলায় কাছে নগণ্য।

এই তীর্থযাত্রী হইয়া যিনি আসিয়াছেন তিনি তো ক্ষুদ্র স্বপ্ন ও আরাম লইয়া আপন সর্পিণ গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। তাঁহাকে জগতেব মুক্তপথে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। নিখিল মানবেব সহিত মিলিত হইয়া সকলকে ডাক দিয়া সকলেব কণ্ঠে কণ্ঠ গিলাইয়া বিবাত যাত্রা-সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তাঁহাব অগ্রসব হইতে হয়। তিনি আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞানেন না—বিজ্ঞ বলিয়া ঘোষণা করেন না। তিনি আপনাকে সকলের সাধী

(Comrade) বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন।

সঙ্গীর্ণ মৃত লোকাচার গ্রামধর্ম জনপদধর্ম বা প্রদেশ-ধর্ম, জীর্ণশাস্ত্র ও সংস্কার এই-সব মহাপুরুষদের প্রবল গতির সম্মুখে লুপ্তাত্তর হ্রাস কেমন করিয়া যে পলে পলে ছিন্ন হইয়া যায় তাহা তাঁহারা জানিতেই পাবেন না। তাঁহাদের জনস্ব সাধনা, তাঁহাদের তীর্থযাত্রা, মৃতপ্রায় মানবকে আবার নূতন করিয়া জীবন্ত অগাধ, উদারধর্ম ও জীবন্ত শাস্ত্র দান করিয়া যায়।

তাঁহাদের আবাম নাই, গৃহ নাই—গৃহস্থ নাই। বিধাতা তাঁহাদিগকে ভুবনের মাঝে আনিয়া বিশ্বভুবনের পথে অগ্নিময় সচল মস্ত্রে পথিকের দীক্ষা দিয়াছেন। ইহাদের ঘর নাই—ইহাদের পথই আছে। নীড়হীন সদা-উড়ন্তী হোমা পক্ষী-ব্রাহ্ম আলোকই ইহাদের প্রাণ, অগ্নিময় ইহাদের আহাব।

পাশ্চাত্য মনসী ও কবি গাল্ট্‌ হুইটম্যান্ এই মুক্ত পথের (Open Road) জয়গান গাইয়া ধ্বজ হইয়া গিয়াছেন। মুক্তপথের এই জয়গান কোনো দেশ বা যুগবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা যে সর্বদেশের সর্বকালের প্রাণ-সম্পত্তি।

আজিকার তিথিটি মহাতিথি হইয়া উঠিল কেন? কেন আজিকার দিনে এই পবিত্র আশ্রম নিখিল মানবকে অকুণ্ঠিত উৎসবের আহ্বান প্রেবণ করিল? কেন সহস্র সহস্র নরনারী না জানিয়াও এই উৎসবভূমিকে কোলাহলে মুগ্ধিত করিয়া তুলিল! এই তিথি কিসের তিথি? এই উৎসব কিসের উৎসব?

এই আশ্রম যিনি স্থাপনা করিলেন—কঠিন সাধনা ও পরিপূর্ণ সিদ্ধি দ্বাৰা এই ভূমিকে যিনি কাল ও স্থানের সীমা অতিক্রম করাইয়া বিশ্বের নিত্যধন করিলেন—আজিকার তিথি তাহার দীক্ষা-তিথি। সে দীক্ষা কিসের দীক্ষা? কোন্‌ মস্ত্রে তাঁর দীক্ষা হইল? সে এই মুক্ত পথের দীক্ষা! ধনী গৃহস্থের সন্তান আজিকার এই মহনীয় দিনে কি এক

অগ্নিময় লাভ কবিলেন—যাহার পর গৃহের কোনো অংশ কোনো স্থখ, কোনো ধনমান পদমর্যাদা তাঁহাকে বাধিয়া রাখিতে পারিল না, তিনি নিখিল মানবকে মুক্ত হইয়া আহ্বান করিয়া বিশ্বের পথে যাত্রা করিয়া চলিলেন। তাহার উপর দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল—বজ্র ভাঙিতে লাগিল—উপরে নীচে সর্বত্র অন্ধকার—দেই বাহির আলোককে সঞ্চল করিয়া তিনি আলোকের অন্বেষণে বহু যাত্রা করিলেন। পরম আলোককে পাইয়া ধ্বজ হইলেন—তাহার যাত্রা সফল হইল। এই ভুবনের ভুবনেশ্বরকে সমস্ত ভুবন দিয়া প্রণাম করিয়া জীবন পবিত্র করিলেন। আজিকার আর তো এই তিথি তাহার বা তাহার পরিবারের তিথি রহিল না। ইহা যে এখন বিশ্বের ধন। এই ভূমি ও ভূমিও এখন হইতে সকল জগদ্বাসীর সম্পত্তি হইয়াছে।

আজিকার উৎসবের মতো যদি মুক্ত পথের পূর্ণ ও উদার যাত্রার অগ্নিদীক্ষা না থাকিত তবে কী সাধ্য এই তিথিকে উৎসব করিয়া তোলে? হইলে এই ভূমিতে যেলা সমারোহ বা রাত-অ-রাত সম্ভব হইত—উৎসব কখনও সম্ভব হইত না।

কিন্তু একটা কথা। যাহারা সাধক তাঁহারা তো অনেক মতোই শাস্ত্র শিবমন্দিরতমকে দেখেন—বিশ্বভুবনের পথে যাত্রা করিবার তাঁহাদের কি প্রয়োজন?

এই বিশ্বের পথে সেই অন্তবস্তিত ব্রহ্মকেই কে পূর্ণ করিয়া তাঁহা পান। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে কে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যক্ষ না দেখিলাম—তবে কে দেখিলাম কি! তাঁহাকে কেবল বাহিরে দেখিলেও পূর্ণ হইল না—কেবল অন্তরে দেখিলেও পূর্ণ দেখা হইল না। “বাহর ভীতব সোই”—তাঁহাকে বাহিরে ভিতরে দেখা চাই। এই বিধে তো তিনি আপনাকেই ছড়াইয়া দিয়াছেন। দুঃখের পর দুঃখ সহিয়া এই দুর্গম পথে যাত্রা করিয়া কোন্‌ আনন্দে দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেন! কোন্‌ তাঁহাকে দেখারই আনন্দ! তিনি যে জগৎকে দেখিয়া আছেন—

“অবোচ্চ ব্রহ্মেতি

পরিবিধানি কাব্য নেমিচক্রবিবাহুবৎ।”

সামবেদ, ছন্দ ব্যাক্তিক, ১, ২, ৩।

এই বিশ্বখানি! তাহার কাব্য। নেমি যেমন চক্রকে

* এই পৌষ-মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষার দিন, শাস্ত্রনিকেষ্টনের উৎসবের দিন। সেই উপলক্ষে এই প্রবন্ধ পাঠিত হইয়াছিল।

বেড়িয়া আছে তেমনি যে তিনি বিশ্বকে বেড়িয়া আছেন—
তিনিই তো ব্রহ্ম। এই বিশ্ব-কাব্যে যে তিনি আপনাকে
ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই তো এই কাব্যের রসের অন্ত নাই
এবং সে রস জীবন্ত রস। এই বিশ্বের অপরূপ রূপ যে
দেখিল, এই রস যে আশ্বাদ করিল, আর সে কি স্থির
ধাকিতে পারে? বিশ্বভুবনকে মহোৎসবে না ডাক দিলে
তাঁহার আর চলে না। তখন তিনি আর যত্নের ভাবনা
করেন না। জীবনে যত্নাতে শোকে বিচ্ছেদেই তো এই
কাব্য করুণ স্বন্দর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তখন ডাক দিয়া
বলেন—

“দেবস্ত পশু কাব্যম্ মহিষায়া মমার সহঃ সমানঃ।”

সামবেদ ছ, আ, ৪, ১, ৪, ৩। ঋ, ১০, ৫৫, ৫।

দেখ দেখ দেবতার কাব্য—আজিকার যত্ন কালিকার
জীবন! কি তাঁহার মহিমা! কি অপূর্ণ সঙ্গীত জীবন-
যত্নাব তান-লয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!

এই সঙ্গীত যে না শুনিল, বিধাতার এই পরিপূর্ণ সঙ্গীত
প্রাণ ভরিয়া আশ্বাদ না করিল, সে এই জগতে আসিল
কেন? এই সঙ্গীত শোনাই তো সাধনা। এই মুক্ত
পথে যাত্রা কি কয় সাধনা?

এই মুক্ত পথে নিমন্ত্রণ যাত্রা কয় সঙ্গীত নহে।
বিধাতা সেই অহুচ্চারিত সঙ্গীত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন।
দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত সহিয়া মানব
যে চলিয়াছে তাহাতে যে নিঃশব্দ সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে
তাহা অতি মধুর, অতি গভীর—

“উৎকর্ণন শত্রুমান্নাগ্নোরগ্নিরিচ্ছিক্তে।

ন গায়ত্রীমামহম্।” সাম, ছ, আ, ৩, ১, ৪, ৩। ঋ, ৮, ২, ১৪।

তিনি যে কেবল উৎকর্ণ (শ্রব) বা গীতমান গায়ত্রী
প্রভৃতিই প্রবিধানপূর্বক শোনেন তাহা নহে, প্রভূত
অহুচ্চারিত স্ততিও সেইরূপ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করেন।

এই যে মুক্ত পথে যাত্রা—প্রথমে সেবায় কর্ণে সকলের
সঙ্গে এই মহাযাত্রাই তো পূর্ণ স্তব। এমন কোন্ স্তব
আমরা বাক্যে উচ্চারণ করিতে পারি? সমুদ্রে যেমন
সকল নদীর অবসান—তেমনি এই সমস্ত সঙ্গীত, এই
সমস্ত যাত্রাও লীন হইতেছে সেই পরম দেবতাব গধ্যে।
যে যেখানে যেমন করিয়াই যাত্রা করুক, যাত্রার অবসান
হইবে তাঁহাতেই।

“সমস্ত যন্তবে বিশো বিশ্বা নমস্ত কৃতয়ঃ।

সমুদ্রায়েব সিদ্ধবঃ।”

সাম, ছ, আ, ২, ১, ৫, ৩। ঋ, ৮, ৬, ৪।

গতিমৎ নদীসকল যেমন স্বভাবতই সমুদ্রে আনত,
সমস্ত মানব তেমনি তাঁহাতে আনত। সকল মানব-
যোত সেই সমুদ্রেব দিকেই যে যাত্রা কবিয়াছে। নদী
জানে না তবু অজ্ঞাতসাবে সমুদ্রেব দিকেই অগ্রসর
হইয়াছে। এই বাণী কত বড় প্রবোধবাণী। যাত্রা যদি
কর—জানিয়াই হউক, না জানিয়াই হউক, দেখিবে ক্রমে
তাঁহাতেই উপনীত হইতেছে!

অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর। বসিয়া বসিয়া যদি
তাঁহাকে পাইতে চাও—তবে অন্তরের নানা ভ্রান্তিজাল
তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে—সে বাণা, সে ভ্রান্তিজাল কাটিবে
কিমে? যাত্রা কর, যাত্রা কর—যাত্রাব গতিতেই, প্রাণেব
বেগেই সকল ভ্রম-জঞ্জাল দূর হইয়া যাইবে। যাত্রা কর,
যাত্রা কর—বসিলেই পচিয়া য়িবে। ভয় কি? তিনি
ছাড়া আর যে গম্য নাই—নির্ভয়ে যাত্রা কর। যে যাত্রা
করিল সেই মুক্তির পথে চলিল।

কোন্ পথে যাইবে? পথ জান না? বাহির হইয়া-
পড়—পথই আমাদের পথ দেখাইবে। পথই শুধু।
পথ যে ব্রহ্মেই লইয়া যাইবে। আমরা পন্থাপ্তরূকে প্রণাম
করি। প্রত্যয় প্রণত হইয়া পথকে আশ্রয় কর।

“যে তে পন্থা অথো দিবে। যে তি বৈ বৈমরঃ।

উত শ্রোষন্ত নো ভুংঃ।” —সাম, ছ, আ, ২, ২, ৩, ৮।

হে দেবতা, স্বর্গের নীচ দিয়া তোমার বহু প্রশস্ত পথ
চলিয়া গিয়াছে, সে পথ নিখিল-জনকে চালিত করিচ্ছে,
সেই পথ আমাদের স্ততি শ্রবণ করুন। “হে পথ,
তোমাকে প্রণাম করি—আমাদিগকে জড়ত্ব হইতে
উদ্ধার কর। অলস গৃহ হইতে বাহির কব। আমা-
দিগের বধির কর্ণে গতিব যন্ত্র শোনাও। আমাদের
গতি দাও।”

যদি গতি পাই, মুক্তি তবে লাভ হইবেই। কত কত
কাল হইতে যত জড়ত্বের মধ্যে ডুবিয়া আছি, আলোক
নাই, প্রাণ নাই, গতি নাই, কবে দেবতা কৃপা করিয়া
আলোক দিবেন—নয়ন সফল হইবে—উন্মুক্ত পথে যাত্রা

করিব—সকল পাপ ছিন্ন করিয়া মুক্তির আনন্দ সন্তোষ
করিব?

অপমায়স্তুর্হি পুংকি চক্ষু মূখ্যাস্তান্ নিবসেব বন্ধান্ ।

সামবেদ, ছ, আ ৪, ১, ৩, ৭। ঋ ১০, ৭৩, ১১।

হে দেবতা, ক্ষান্ত (অন্ধকার) দূর কর, চক্ষু পূর্ণ করিয়া
দাও; পাশবন্ধ পক্ষীর গ্রাস আমরা আছি, মুক্ত কর। অন্ধ
কোনো প্রার্থনা নাই—কেবল আলোকের প্রার্থনা,
আলোক পাইলেই নয়ন সফল হইবে, সকল পাশ ছিন্ন হইবে,
বিশ্ব-শোভা দেখিয়া ধন্ত হইব, আমরা যাত্রা করিব।

জড়তার অন্ধকারই মানবকে মৃতের গ্রাস পতিত
রাখিয়াছে, এই জড়তাই সর্ব পাপের মূল। এই জড়তা
যদি যায়, মানব নব জীবন পাইবে—মানব পবিত্র হইবে—
উজ্জল হইবে—দীপ্ত হইবে। সেই যে মানবের জীবন্ত দীপ্ত
যাত্রা তাহাই দেবতার চরণে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তুতি। উৎসবের
দিনে মানব চিরদিন সেই জীবন সেই আশ্লাদ সেই নব-
প্রভাত প্রার্থনা করিয়াছে। চারিদিক উজ্জল করিয়া মুক্ত
পথে যে দীপ্ত যাত্রা তাহাই পরিপূর্ণ সঙ্গীত। তাহাই বৃহৎ
সঙ্গীত—তাহাই তো সেই অগীর্ষমান গায়ত্রী বাহ্য পরম
দেবতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করেন। হে মানব, যাত্রা কর,
যাত্রার বৃহৎ গান দিয়াই জগৎসবিতার স্তব করা চাই।

“বোধো আগাম্ বৃহদগায়ত্রীমদগায়নং আধর্ষণ ।

স্তুতি দেবঃ সবিতারম্ । সাম, ছ, আ ২, ২, ৪, ৩।

দোষ (রাত্রি) বিগত হইল, হে বৃহদগায়ক দীপ্তগমন
অধব-পুত্র—দেব সবিতাকে স্তব কর। হে অধব-পুত্র
তোমার দীপ্ত যাত্রাই বৃহৎ গান—তে যাত্রায় কি
বৃহদগান বিশ্বাকাশতলে জলিয়া জলিয়া উঠিতেছে!
কোথায় এখন রাত্রি?—রাত্রি বস্ত হইয়া গেল! এখন
তোমার যাত্রার জলন্ত সঙ্গীত, পরম দেবতার অগ্নিময়
স্তবগান চলিতে থাকুক।

যে ভীক এই মুক্ত উদার পথে দীপ্ত যাত্রায় সাহস
পাইতেছে না, যে অন্ধকার গৃহকোণে ক্ষুদ্র অপ তপ লইয়া
রহিল, সে কতক্ষণ আগিয়া থাকিতে পারিবে? নিদ্রা
আসিয়া তাহাকে ধরিবে—মোহ আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন
করিবে। সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিবে—এবং
তাহাকেই একমাত্র জীবন মনে করিয়া আগরণের

আঘাতকেও ক্রমাগত ভয় করিতে থাকিবে, কি জানি
এই স্বপ্নের শেষ হয় তবে কি জীবন আর কোথাও মিলিবে?
এই জীবন্ত বিশ্বজগতে যেন জীবনের এমনি দৈন্ত যে স্বপ্নটুকু
হারাইলেই সর্বস্ব যাইবে! এমন তন্দ্রালু জড়কে দেহ
জাগ্রত দেবতা তো চাহেন না। তিনি চান জীবন্তকে,
মুক্ত পথের যাত্রীকে।

“ইচ্ছন্তি দেবাঃ স্ববস্ত্রং স্বদ্বারং স্পৃহয়ন্তি । যন্তি প্রমাদমতন্নাঃ ।
সাম, উ, আ, ২, ৩।

দেবগণ, জাগ্রত প্রাণবানকে চাহেন—শ্রমে অকাতব
জাগ্রতকে চাহেন। যাহারা তন্দ্রাহীন তাঁহারাই পবমানন্দকে
লাভ করেন। ব্রহ্মের সাহচর্যই পরমানন্দ; যে তাঁহার
সাহচর্য-বঞ্চিত তার আর আনন্দ কোথায়?

এই জগৎ দিগে দিকে বিধাতার গভীর শব্দ ঘোষণা
করিতেছে “ক্ষুদ্র অপ তপ লইয়া জড়ের মত দিন কাটাইও
না। শুষ্ক মৃত নিয়ম আচার কিছুই নহে—যাত্রা কর,
যাত্রা কর—জীবন্ত হও।”

“মৌ ব্রহ্মেব তদ্রমুভূবো ।” সাম, উ, আ, ২, ১, ১০

ব্রাহ্মণের গ্রাস তন্দ্রালু অলস হইও না। ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া
জড়ের গ্রাস নিয়ম পালনে ব্রাহ্মণ হয় না। যে তাঁহার
অগ্নিময় লইয়া বিশ্বের মুক্ত পথে দুঃখ শোক সহিতে সহিতে
মহা যাত্রা করিয়াছে—সেই যথার্থ ব্রাহ্মণ। বিধাতা তাহাকেই
চান। নিবীহ শাস্ত্র তন্দ্রালুকে তিনি তাঁহার অগ্নিময়
কখনও দান করেন না।

জগতের মুক্ত পন্থাতে যে যাত্রা করিল তাহার কি
আর স্থখ আছে? আর তো তাহার নয়নে নিদ্রা নাই,
মনে শান্তি নাই, জগতের সর্বমানব যে তাহার আপন—
সকলের সেবাই যে তাব আপন কর্ম। তাহার শ্রম
বিপুল, উদ্যম বিরাট। আপন ক্ষুদ্র গৃহের স্বজন পরিচর্য
সঙ্গীর্ণ কল্যাণ-চেষ্টা মাত্রতেই তো তাহার কর্মের পরি-
সমাপ্তি নহে—নিখিল মানবের সকল কল্যাণই তাহার
পুণ্যব্রত। সকল সংসারের কল্যাণ-সাধনায় এই ব্রতের
উদ্যাপন। যে দুর্বল বাহার অন্তরে কোথাও ক্ষীণতা
সঙ্গীর্ণতা বা ক্লেশ আছে সে কয় দিন এই প্রচণ্ড দুঃখ-
আঘাত সহিতে পারে? তাহার মন ক্রমাগত নিম্ন গৃহের
অন্ধকারময় আরামের কোণটুকুতে ফিরিয়া আসিতে

চার। নিখিলেব শুভ চেষ্টাকে সে তখন অসাধ্য বলিয়া অবিশ্বাস করে, আপনাব সঙ্গীর্ণ কৃত্যটুকুই আপনার পরিপূর্ণ ব্রত মনে করে। মুক্তির উদার আনন্দ ফেলিয়া আরামটুকুব জগৎ লুক্ক হইয়া উঠে। কিন্তু যে সত্য-সাধক সে মনে করে আমার একমাত্র সাধনা বিধাতার মুক্ত পথে অগ্রসর হওয়া ও তাঁহার কাজ করিয়া যাওয়া। সকল অভাব, সকল দুঃখ তিনিই দূর্ব করিবেন। তাঁহারই উপর সব ভাব দিয়া আমি কেবল অগ্নিমন্ত্র লইয়া তাঁহার পথে অগ্রসর হইব।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এক অপূর্ব উপাখ্যান আছে। রোহিত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পথে বাহির হইয়াছিলেন। রোহিত শ্রান্ত হইয়া ও গৃহে তাঁহার কর্তব্য আছে ইহা মনে করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। সকল অভাবের পূরণকর্তার কথা তাঁহাব মনে ছিল না। যাহা হউক, রোহিত যখন গৃহে ফিরিতেছেন তখন দেবতা আসিয়া পথে ব্রাহ্মণরূপে তাঁহাকে দেখা দিলেন। দেখা দিয়াই বলিলেন “বাহির হও, পথে বাহির হও।” বার বার রোহিত গৃহে ফিরিতে চাহিলেন, বার বার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণেব সেই কয়টি মন্ত্র একেবারে অগ্নিমন্ত্র। সেই যে মহা মন্ত্র সে মন্ত্র সেই ঘটনা ছাড়াইয়া সেই যুগ ছাড়াইয়া ভাবতবর্ষকে ছাড়াইয়া অনন্ত বিশ্বের আকাশে নিত্যকাল ধ্বনিত হইতেছে।

কোথাকার বোহিত, কোথাকার ক্ষুদ্র ঘটনা, কি তাঁর মুক্তি, কি তাঁর বন্ধন, কি তাঁর শ্রান্তি, কি তাঁর প্রয়োজন, আজ সে-সকলের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই। আজ বিশ্ববাসী সকল রোহিতকে সন্মোহন করিয়া আকাশ পূর্ণ করিয়া ঐ অগ্নিমন্ত্র মহামন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। আজ সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঐ মন্ত্রই বার বার সকল শ্রান্ত ও অবসন্ন মানবের কর্ণে ঘোষণা করিতেছে। কোনো বিশেষ তপঃকানন হইতে নহে, কেবল ভারত হইতে নহে, বিশ্বভূবনের তাবৎ আকাশকে বিকম্পিত করিয়া সর্বমানবকে সন্মোহন করিয়া অদ্য সেই মহামন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে।—

“নানা শ্রান্ত্যঃ শ্রীরতীতি রোহিত শুক্রম।

পাপোন্মূষ্যবোজনঃ ইন্দ্ৰ ইচ্ছরতঃ সখা।—চর্যবেত্তি।”

হে রোহিত, চিরকালই শ্রুতিয়াছি চলিতে চলি হইয়াছে তাহাব আব শ্রীর ইয়ত্তা থাকে না। যদি শুইয়া পড়িয়া থাকে তবে সে তুচ্ছ হইয়া চলিতেছে স্বয়ং দেবতা তাহার সখা হইয়া সঙ্গে থাকেন—অতএব হে রোহিত, বাহির হও চলিতে থাক।

“পুশ্পিণো চরতো ব্রজ ভূকু রান্না ফলগ্রহিঃ।

শেরেন্ত নর্কো পাপ্যানঃ শ্রমেণ প্রপথে ইত্যঃ।—

হে রোহিত, যে বিচরণ করে শ্রমবশতঃ ও কান্তি বিকশিত পুষ্পের ভ্রায় স্বয়মাময়ী হ তাহার আত্মা নিত্য বৃহৎ হইতে থাকে এবং বৃহত্ত্বের ফলভোগ করে। যে পথ সম্মুখে তাহাতে যে বিচরণ করে শ্রমের দ্বারা হতবীৰ্য্য সকল পাপ মরিয়া শুইয়া পড়ে। অতএব বিচরণ কর।

“আন্তে ভগ্ন আসীনস্তোদ্ধিত্তি তিষ্ঠতঃ।

শেতে নিপদ্যমান্য চরাতি চরতো ভগঃ।—চ

কে বলে দেবতা ভাগ্যদান করেন? মুক্ত বাহির হয় সে আপন ভাগ্য আপন হস্তে সৃষ্টি ব দুঃখ কষ্ট সকলই সে নৌভাগ্য করিয়া লয়। স্পর্শ কবে কাহার সাধ্য?

যে বসিয়া থাকে তাহার ভাগ্যও বসিয়া উঠিয়া বসে তাহার ভাগ্যও উঠিয়া বসে। যে থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া পড়িয়া থাকে। আরম্ভ করে তাহাব ভাগ্যও চলিতে থাকে। রোহিত, যাত্রা কর যাত্রা কর।

যে মুচ তাহারই নিত্য কলি যুগ। ও বাহির হইতে আসে। যে মুক্ত পথে যাত্রা তাহার কিসের ত্রোতা কিসের দ্বাপর কিসের আপন সত্য যুগ আপনি গড়িয়া লইতে থাকে।

“কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানন্ত দ্বাপরঃ।

উজ্জিষ্টং ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্।—চ

শুইয়া পড়িয়া থাকিলেই তাহাব কলিযুগ লাগি যে আগিয়া উঠিয়া বদিল তাহার দ্বাপর। উঠিল তাহার ত্রেতা উপস্থিত হইল। যে মু

করিল—তাহার সত্যযুগ সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর।

আচ্ছা, এই যে চলা, ইহাতে সত্য যুগ না হয় হইল—
কিন্তু ইহাতে সত্য ফললাভ কি হইল ?

এই চলাই যে পরমানন্দ ! এই চলাই এমন অমৃতময়, এই চলাই এমন সফলতা, যে, ইহার অতিরিক্ত কোনো সফলতার প্রয়োজন নাই। বিধাতাব বাঞ্ছ্যে তাহাব নির্দেশ বহন করিয়া যে চলিয়াছে, সেই পরম পবিত্রতা পরম সৌন্দর্য্য পরম অমৃত লাভ করিয়াছে। তাহাব নির্দেশে ব্যোমের মুক্ত পথে স্বর্ঘ্য চলিয়াছে—গ্রহ চন্দ্র তার। চলিয়াছে—সব জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে। পৃথ্বী চলিয়াছে—পৃথ্বী সৌন্দর্য্যের অবধি কোথায় ? নদনদীর ধারা চলিয়াছে—বারিশ্রোত কি স্নিগ্ধ ও পবিত্র ! বায়ু চলিয়াছে—বায়ু পবিত্র স্ববভিত প্রাণপ্রদ। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে পল্লব মুকুল লতা চলিয়াছে—সব স্বন্দর। ঋতু চলিয়াছে—তাই তাহাব অর্ধাশ্রিত্য নিতাই বিচিত্র স্বন্দর ও পরিপূর্ণ। বিধাতার মুক্ত পথে যে চলিয়াছে কল লাভেব জ্ঞাত অজ্ঞাত কোথাও তাহাকে যাইতে হয় না। সে নিজের মধ্যেই নিজের কল প্রাপ্ত হয়।

"চরন্ বৈ মধু বিন্ধতি চরন্ স্বাদ্ধমুদ্রণঃ।

স্বর্ঘ্য পথ প্রমাণঃ যো ন তদ্রূপে চরন্ ॥—চট্টোবেতি।"

যে চলিতেছে সেই মধু লাভ করিতেছে, যে চলিতেছে সেই অমৃতময় ফল লাভ করিতেছে, ঐ দেখ স্বর্ঘ্যের কি দীপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব—সে যে চলিতে চলিতে কখনও তদ্রূপকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর।

এই যাত্রা নিজেই অমৃত-মধুব, নিজেই অমৃত-ফল। যাত্রাতেই স্বর্ঘ্য চন্দ্র তাবার জ্যোতি। যাত্রাই তৃপ্তি যাত্রাই দীপ্তি।

"প্রাণস্ত পথঃ অমৃতঃ।"—ব, স, মাধ্য, ১০, ২০।

প্রাণের পথ অমৃত। প্রাণ যে গতি, সে অগ্রসর হইতে চায়, চলিলেই প্রাণ কৃতার্থ হয়, এই আনন্দই পরমানন্দ।

অপর কোন আনন্দ এই আনন্দের সমতুল্য ? ইহাই অমৃত।

আজিকার এই পবিত্র দীক্ষা-তিথিতে আমবাও দীক্ষা চাহি। নহিলে কেমন করিয়া পূর্ণরূপে এই উৎসবে যোগদান

কবিব ? প্রাণহীন আমরা পড়িয়া আছি—আমরা আজ প্রাণ চাই। প্রাণ দীক্ষা আমাদের চাই। দীর্ঘকাল, হে দেবতা, অতি দীর্ঘকাল আমরা যে প্রাণহীন হইয়া ৫-৬ বছর অক্ষকালে মরিয়া পড়িয়া আছি। চলিবার নামে ভীক অস্তর কাঁপিতে থাকে। তুচ্ছ স্বর্থ তুচ্ছ মান তুচ্ছ লাভই আঁকড়িয়া এই মৃতজীবন পড়িয়া আছে। তোমার দীক্ষা-শব্দে নিনাদ শ্রবণের ভয়ে শ্রবণ বন্ধ করিয়া আছি। চিন্তেব কোনো দ্বাবে বেন দীক্ষার ভৈবব মন্ত্র না ধনিত হইতে পারে এইজন্ত সকল দ্বাব সর্বপ্রকারে ক্রমগত বন্ধ করিতেছি। এই রোধের প্রয়াসকে, তোমার বিরাট মন্ত্র হইতে রক্ষা পাইবাব জন্ত দীন আত্মার এই সদাভীত প্রয়াসকেই, জীবন মনে করিবাব চেষ্টা করিতেছি। তদ্রূপে চিত্ত এই মোহতেই আচ্ছন্ন হইয়া থিমাইতেছে। হে দেবতা, এই দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর। আজিকার শুভ তিথিতে প্রাণের দীক্ষাই চাই—

"প্রাণঃ দীক্ষান্ উষ্টপমি।"—শা, শ্রৌ, ২, ৫, ৪, ৬।

প্রাণের নিকট দীক্ষার নিকট উপনীত হইতেছি। আজ প্রাণের দীক্ষাই দাও। হে প্রাণ-স্বরূপ, অজ্ঞ মস্ত্রে নহে—মুক্ত পথের পথিক করাব প্রাণমস্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষা দিতে হইবে।

"প্রাণো যে প্রাণেন দীক্ষতান্।"—কৌশী, ব্রা, ৭, ৪।

হে প্রাণ, প্রাণ দিয়াই আমাকে দীক্ষা দাও। অত কিছু দিয়া দীক্ষা দিলে এই মৃত্যুর ভাব যে তৈলিয়া উঠিত পারিব না। এই দীক্ষা যদি পাই তবে কি আব জীবনের সীমা থাকিবে ? তবে কি আর শ্রান্তি অবসাদ দৈন্ত্য থাকিবে ? এই দীক্ষা যে সীমাহীন দীক্ষা ! এই দীক্ষায় যে প্রাণ যে আনন্দ তাহার সীমা কোথায় ?

"অপরিসীমতা দীক্ষা।"—শা, শ্রৌ, ২, ৫, ৪, ৭।

এই দীক্ষা অপরিসীম। এই দীক্ষা না পাইলে আর জীবনের আশা নাই। হে পরম-দেবতা, অদ্যকার শুভ দীক্ষা-তিথিব মহোৎসবেব অবসান-দণ্ডে, দীপ্ত গ্রহতানক-মণ্ডিত অনন্ত আকাশতলে জীবনতৃষ্ণায় মুহমান শুক অচল চিত্ত পাতিয়া দিলাম, বজ্রনির্ঘোবে তোমাব দীক্ষামন্ত্র উচ্চারণ কর। তোমার দীক্ষাই আজ আমাদের একমাত্র

গতি। অসত্য হইতে সত্যে লইয়া চল, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে অমৃত্যু লইয়া চল। হে রুদ্র, এই উৎসব-লগ্নে আবির্ভূত হও, দক্ষিণ মুখে আশ্বাস দিয়া বল—

“প্রাণেন জীব মা যুগাঃ।”—অথর্ব ৩, ১৩, ১৮।

“প্রাণের দ্বারা জীবনলাভ কর—মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইও না।” আমাদের কাছে বল “দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তোমরা ধন্য হও, তোমরা ধন্য হও—মৃত্যু তোমাদিগকে কখনও পরাজিত করিতে পারিবে না, যাত্রা কর—জীবন প্রাপ্ত হইয়া যাত্রা কর—আমাদেরই তোমাদের বিশ্রাম হইবে।”

হে দেবতা, আশ্রমের স্তম্ভতিথিকে এই অগ্নিদীক্ষা দ্বারা সার্থক করিয়া দাও, আশ্রমবাসী ও আশ্রমে আগত সকলকে তোমার মন্ত্র দিয়া ব্রহ্মজীবন দান কর।—আমাদের উৎসব সফল হউক।

“এশান্ত পরমাগতি এশান্ত পরমা সম্পৎ এযোহন্ত পরম আনন্দঃ—
এতমৈবানন্দস্তান্মানি তুতানি সাত্বামুপজীবন্তি ॥”

তুমিই আমাদের পরমাগতি, তুমিই আমাদের পরমা-
সম্পৎ, তুমিই আমাদের পরম ধন, তোমার আনন্দের কণা-
মাত্র পাইয়াই সকল জীব জীবন লাভ করে। ও শান্তিঃ।

“ও ব একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমার্মো স দেবঃ
সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংব্রুজু ॥”

শ্রীক্ষতিমোহন সেন।

মরুসম্ভব পুষ্পমালা

সারা জীবনের যে-কটি নিমেষ তোমার সঙ্গ পেয়েছে প্রিয়া,
ফুল হয়ে তারা উঠেছে ফুটিয়া পুলকিত করি এ মরু হিয়া।
সেই ফুলে হবে দেবতার পূজা। যত্নে যুগল নয়ন-ঝারি
পাছে সে শুকাই সেই ভরে সদা সেচন করিছে অশ্রুঝারি।
দেবতা আমার, হে প্রিয় আমার, চরণে এনেছি অর্ঘ্যধালা,
সার্থক কর তুলি এই মরুসম্ভব পুষ্পমালা!

বিপ্রী।

আলোচনা

“ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”

মাঘ মাসের “প্রবাসীতে” বাবু মহেশচন্দ্র বোষ আমার ইংরেজি “ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসা”র যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য-
যিত হইলাম। তাঁহার দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি যে একখানা বইকে এত
ভুল বুঝিতে পারেন ও ভুল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহা
আমার ধারণা ছিল না। তাহাতে আমাদের মতভেদ হওয়া কিছুই
বিচিত্র নহে, কিন্তু আমাকে তাঁহার এতদূর ভুল বোঝা কিরূপে সম্ভব
হইল? তিনি আমার ইংরেজি প্রাঞ্জলতার প্রশংসা করিয়াছেন।
হুতরাং আমার ভাষা ভুলের কারণ নহে। আমি যতদূর বুঝিতে
পারিতেছি তাহাতে বোধ হয় তাঁহার ভুলের কারণ এই যে তিনি
আমার বইখানা ভাল করিয়া পড়েন নাই। তাঁহার সমালোচনা
পড়িয়া বোধ হইল তিনি আমার পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টি ও শেষ
দুটি পরিশিষ্ট মাত্র পড়িয়াছেন। সমালোচনা ঐ অংশেই আবদ্ধ।
আমার বোধ হয় যে তিনি বইখানার সমস্ত ভাল করিয়া পড়িলে
এমন তীব্র সমালোচনা করিতে পারিতেন না। অগ্নাংশ পড়িতে
তাঁহার যে-সকল ভ্রম হইয়াছে, সমগ্র পড়িলে সেই-সকল ভ্রম সংশো-
ধিত হইয়া যাইত। এই বিষয়ে একটি ছোট বস্তুর সঙ্গে একটি বড়
বস্তুর তুলনা দিই। কোন কোন দার্শনিক লেখক বলিয়াছেন যে
ক্যান্টের “Critique of Pure Reason”এর কেবল Aesthetic
অংশ পড়িলে মনে হয় যেন ক্যান্টের মতে ইঞ্জির বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র,
কিন্তু “Analytic” পড়িলে সেই ভ্রম চলিয়া যায়। আবার কেবল
“Analytic” পড়িলে বোধ হয় যেন বুদ্ধি প্রজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু
“Dialectic” অংশ পড়িলে সেই ভ্রম চলিয়া যায়। এক স্থানে কিছু
সকল কথা বলা যায় না,—সকল দিক বজ্রায় রাখিয়া কথাও বলা
যায় না। আমার ক্ষুদ্র পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপে বলা যায়, যে, যদি
প্রথম অধ্যায় পড়িয়া মনে হয় (দেয়গ মনে হইবার কারণ যদিও আমি
দেখি না) যে আমি ইহাতে Subjective Idealism সমর্থন
করিয়াছি, তবে দ্বিতীয় অধ্যায় পড়িলেই সেই ভ্রম চলিয়া যাইবে,
কারণ তাহার প্রথম পরিচ্ছেদই Sensationalism ও Subjective
Idealism-এর গুণন। মহেশবাবু বলিয়াছেন যে মানবজ্ঞান যে ব্রহ্ম-
জ্ঞানের প্রতিবিম্ব তাহা আমি প্রমাণ করিতে পারি নাই। কিন্তু
প্রমাণ করিতে পারি নাই বলিলেই ত হইল না। তাঁহার উক্তি ছিল
আমার “Unity and Difference” নামক তৃতীয় অধ্যায়ের বৃত্তির
উল্লেখ করিয়া তাহার গুণন করা। তিনি আমার পুস্তকের একটি ক্ষুদ্র
অংশের সমালোচনায় বারো তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে বলিতেছেন,
“সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অধিক মন্তব্য প্রকাশ করা অনা-
বশ্যক—আর সময়ও নাই, স্থানেরও অভাব। এই স্থানেই উপসংহার
করা যাউক।” ইহা কি রকম বিচার?

মহেশবাবু এই বারো তত্ত্বের মধ্যেই আমার পুস্তকের অত্যন্ত
অংশের সমালোচনার কতক স্থান পাইতেন যদি তিনি নানা পণ্ডিতের
উক্তি উদ্ধারে এত স্থান না দিতেন। তাঁহার সমালোচনার এই লক্ষণটাকে
আমি বিশেষরূপে আশ্চর্যযায়িত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমি ত
কোন দার্শনিকের দোহাই দিয়া পুস্তক লিখি নাই, কাহারো মত উদ্ধার
করিয়া আমার মত সমর্থনও করি নাই। কেবল মুখবন্ধ বুদ্ধিপ্রণালী
সম্বন্ধে হেগেলের ইংরেজি ব্যাখ্যাকারদিগের সঙ্গে আমার সাধারণ
একতার কথা বলিয়াছি আর ফুটনোটগুলিতে কোন কোন দার্শনিক

লেখক ও গ্রন্থের নির্দেশ (reference) দিয়াছি। এই-সকল নির্দেশের অর্থ কিছু এই নহে যে ইহাদের সঙ্গে আমার একা আছে। কাহারো কাহারো সঙ্গে সাধারণ একা আছে, কাহারো কাহারো সঙ্গে সম্পূর্ণ অনৈক্য। প্রয়োজনমত উভয় শ্রেণীর লেখকেরই উল্লেখ করিয়াছি। স্মরণ্য আমাদের সমালোচনা করিতে বাইরা এত পণ্ডিতের নামোন্মেষণ ও এত বচনোদ্ধারের যে কি প্রয়োজন ছিল তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ইহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতে না যদি ইহার সঙ্গে সঙ্গে মহেশবাবু আমাকে ধমক না দিতেন। তিনি বার বারই কতিপয় লেখকের উল্লেখ করিয়া আমাকে এইভাবে শাসন করিয়াছেন—“কি? এত পণ্ডিতের মতের বিপক্ষে, আর এই যুগে, একগু মত প্রচার করিতে সাহস!” একগু ধমক দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষে অত্যন্ত অশুভযুক্ত। মহেশবাবুর শ্রিয় লেখকগুলি কি চিন্তাজগতে এমনই বিপ্লব আনিয়াছেন যে তাঁহাদের মতের বিপক্ষে আর কাহারো কিছু বলিবার অধিকার নাই? আমি এই বিধি সম্পূর্ণরূপেই অগ্রাহ্য করি। নামের ছটায় কোনো দিন ভুলি নাই, কোনো দিন ভুলিবও না। যে-দিন ভুলিব সেদিন কেবল দার্শনিক আলোচনা নয়, নিম্নের অবলম্বিত ধর্মমতও পরিচাণ করিব। সেই ধর্মমতের বিপক্ষে ত হাজার হাজার পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান লোকই দাঁড়াইয়াছেন, তবুও কেন নিতীকভাবে নিজমত প্রচার করিতেছি? মহেশবাবুর এই পণ্ডিত ও পণ্ডিতবচন বোহাইয়ে আমার বিশেষরূপে ব্যথিত হইবার কারণ এই যে যে-সকল দার্শনিকের সহিত আমার মৌলিক একা আছে বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের কাছে দর্শনশিক্ষা বিষয়ে আমি বিশেষরূপে ধীর, মহেশবাবু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে তাঁহারাও আমার বিপক্ষ। আমি তাঁহাদের সঙ্গে আমার একাগ্রদর্শনের জন্ত কিছুই বাস্তব নই। এই যুক্তিপ্রাণী আমি আসতেই পসন্দ করি না। কিন্তু মহেশবাবু যখন তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে তিনি এই বিষয়ে খুব ভুল বুঝিয়াছেন,—হয় তাঁহাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন।

মহেশবাবু তাঁহার সমালোচনায় Logic ও Psychologyতে খুব গোল করিয়াছেন, আর এই গোল করতে আমার অনেক কথাই ভুল বুঝিয়াছেন। Logic (ইদানিন্তন অর্থে) আত্মার মৌলিক প্রকৃতির বিষয় বলে, Psychology জীবের জীবনে আত্মার ক্রমবিকাশের বিষয় বলে। যে-সকল উপকরণের মধ্যে মৌলিক, logical, অগ্রপশ্চাৎ নাই, সেই-সকল উপকরণই কালে, psychologically, অগ্রপশ্চাৎ হইয়া প্রকাশিত হয়। আমি যে-সকল ব্যাপারকে logical implicationএর অর্থে সত্য বলিয়াছি, মহেশবাবু বুঝিয়াছেন যেন আমি সেইগুলিকেই psychological manifestationএর অর্থে সত্য বলিতেছি। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা মূলে সংযুক্ত, কোনোটাই কোনোটার অগ্রপশ্চাৎ নহে। কিন্তু জীবের মানসিক জীবনে আগে জ্ঞান, তারপর ইচ্ছার প্রকাশ। আমি আমার পুস্তকের ১০৮এর পৃষ্ঠায় বলিয়াছি “Our individual volitions are dependent on sensation, memory and understanding in a word, on knowledge. First knowledge, then volition. It is impossible for the will, i. e., the mind conceived as capable of acting, to put forth a volition unless it knows, unless it understands.” (বাক্সালা পুস্তকের ১০৯ ও ১১০এর পৃষ্ঠায় ইহার অনুবাদ আছে)। মহেশবাবু এই অংশটি উদ্ধৃত করেন নাই, এবং কোন সংগ্রহে ও কি প্রয়োজনে এই-সকল কথা বলা হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি কেবল জ্ঞানবাদী, আর কেবল জ্ঞানবাদ যে ভুল তাহা দেখাইবার জন্ত

ছাঞ্চিক জন লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, “জ্ঞানকে আর সর্বোদরকা বলিয়া গ্রহণ করা বাইতেছে না।” “যে কোথায় বলিবার যে জ্ঞানই সর্বোদরকা? মহেশবাবু... লোচনার সর্বত্রই এইরূপে বাক্যদগুলির অপব্যয়,—বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া।

মহেশবাবুর সমালোচনার দ্বিতীয় অংশ, বাহাতে তিনি জ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়ে আমার মতের অতি দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে Logic ও Psychologyর গোলমাল খুব বেশি। আমার মত এই যে বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে আত্মজ্ঞান মিলিত (logically implied), কিন্তু জীবের স্পষ্ট আত্মজ্ঞান ক্রমশঃ হয়। এই কথাটিকে বুঝিয়া মহেশবাবু আমার মতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ চারিত্র্য সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইংরেজ জ্ঞানবাদী ও দেশীয় বহিঃপ্রাণীরাও, যাহাদিগের সঙ্গে আমার মৌলিক একতা আছে, তাঁহাদিগকেও আমার বিপক্ষে সাক্ষ্যরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। আমি কোনো প্রকারে বলি নাই যে বিষয়কে যেভাবে জানা যায় বিষয়কেও সেইভাবেই জানা যায়। কেবল ইহাই বলিয়াছি যে বিষয়ী যে বিষয়কে জানে সেই জ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞান নিহিত আছে। বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান ভিন্ন না হইলে ভিন্ন দুটা কথাই বা কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু এই ভেদের মধ্যে অভেদও আছে, বিষয়ী বিষয়কে আপনা হইতেই জ্ঞানিতে বাইয়া উঠাকে নিজ জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়াই ভেদভেদজ্ঞানের মধ্যে এই অভেদজ্ঞানই প্রকৃত আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান জীবের মানসিক জীবনে যে ক্রমে ও যেভাবে বিকশিত হয়, সেই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানবিদেরা যাহা বলেন, তাহা সঙ্গে দর্শনের কোনো বিরোধ নাই। কিন্তু যে মনোবিজ্ঞানবিদ বলেন যে মানবজীবনে প্রকাশের আগে আত্মজ্ঞান বর্তমান হইয়া না, তাহার সঙ্গেই দর্শনের বিরোধ। যাহা হউক, মহেশবাবু তাঁহার সমালোচনার এই অংশের উপসংহারে বলিয়াছেন—“এই প্রকার (অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানে, স্মৃতির আকারে) ‘জ্ঞান’ ছাড়া আর এক প্রকার জ্ঞান আছে, তাহার নাম অপরিচক্ষণীয় (Immediate Experience, Bradleyর ভাষায় Immediate Experience, Bergsonের ভাষায় Intuition. ইহাকে যদি ‘জ্ঞান’ নাম দিতে আপত্তি না থাকে তবে বলিব জ্ঞাতাকেও জ্ঞান। বাবা।” সব গোল তৈরি গেল। একগু জ্ঞানকে “জ্ঞান” বলিতে আপত্তি থাকা দুর্বোধ্য। আমি এই জ্ঞানের কথাই বলিয়াছি। আমার স্মৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা আবদ্ধকতা এই যে স্মৃতিতে এই জ্ঞান স্পষ্টীকৃত হয়, তাহাও প্রথম উৎপন্ন হয় তাহা নহে। এই বিষয়ে আমি ফুটনোটে ইংরেজ ও লঙ্করের উল্লেখ করিয়াছি। মূলও বলিয়াছি—“To know something and to think that we know it,—are two very different things. Knowing is often a matter of direct perception, insight or introspection, while understanding is always the result of reflection, or observation. We have shown that no knowledge is possible without the knowledge of the self as the knower,—without the knowledge of the process of knowledge as one's own. This self-consciousness, which lies at the root of all consciousness of objects, is direct knowledge.” (p. 9. ব', পৃ. ৯ পৃ.) মহেশবাবু এই ও Bradley হইতে আমার মতের আপাতবিরুদ্ধ যে-সকল উক্তি উদ্ধার ও নির্দেশ করিয়াছেন, পাঠক এখন যে-সকলের প্রত্যক্ষ

বুঝিতে পারিবেন। বিষয়জ্ঞান বিকাশক্রমেই আত্মজ্ঞানের অগ্রে, মূলে অগ্রে নয়।

মহেশবাবুর সমালোচনার তৃতীয় অংশের প্রথমদেই একটি ভয়ানক ভুল পাইলাম। তিনি বলিয়াছেন, ‘এ জগৎ কি? এ বিষয়ে প্রশ্নকার দুইটি উত্তর দিয়াছেন। (১) “এ জগৎ আমার মনোবিকার, আমার অবস্থা, আমার রূপ। (২) এ জগৎ আমার বিষয়, আমি বিষয়ী।” ‘এ জগৎ আমার মনোবিকার,’ এই কথা আমি কোথায় বলিলাম? মহেশবাবু আমার পুস্তকের যে স্থান নির্দেশ করিয়াছেন ও যে স্থান হইতে কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন সে স্থানে ত আমি বলি নাই যে জগৎ আমার মনোবিকার। বাহা আমি বলিয়াছি তাহা এই যে বর্ণ-রূপাদি ইন্দ্রিয়বাপার, যাহাদিগকে লোকে মনোনিরপেক্ষ বস্তু বস্তু মনে করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে মনোবিকার, ইন্দ্রিয়-বোধ বা বিজ্ঞান-মাত্র। ব্যাধার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি যে বাক্য যেমন আত্ম-নিরপেক্ষ ব্যাপার নহে, তেমনি রূপ-রসাদিও নহে। মহেশবাবু কি বলিতে চান যে এইগুলির কোন আত্ম-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে? যদি তিনি তাহা বলেন তবে তাহার সঙ্গে দার্শনিক তর্ক করা বুঝা। Sensation বা feeling যে sentient বা feeling mind ছাড়া থাকিতে পারে, এই মত কোনো দার্শনিকের আছে বলিয়া ত আমি জানি না। Sensation ও sensationএর কারণে প্রভেদ আছে। Sensationএর কারণ সম্বন্ধে উল্লিখিত স্থলে আমি কিছু বলি নাই, তাহা বলিয়াছি “Refutation of Naturalism” নামক পরিচ্ছেদে। বাহা হটক, বর্ণ-রূপাদি ব্যাপার যদি যগৎ হইত, তবে মহেশবাবু আমার মতের যে ব্যাখ্যা ও খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ঠিকই হইত। কিন্তু এই-গুলি ত জগৎ নহে আর আমি এইগুলিকে জগৎ কোথাও বলি নাই। এইগুলি প্রকৃত অর্থে বিষয়ও নহে, বিষয়ের উপকরণমাত্র। এইগুলিকে phenomenal বিষয়মাত্র বলা যায়, noumenal বা transcendental বিষয় বলা যায় না। শেষ অর্থে, পূর্ণ অর্থে, বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ, দেশ কাল, এবং বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, (conceptions) অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এই তিন-প্রকার উপকরণ আবশ্যক। এক্ষণে বিষয়ই প্রকৃত পক্ষে জগৎ আর এই জগৎ আত্ম-নাপেক্ষ, অশূচ ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়ার অধীন নহে। যারা বলেন যে বিষয়জন্য ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, তাঁরাই Subjective Idealists. আমি এই মত পোষণ করা দূরে থাক, আমি ইহার খণ্ডনের জন্য একটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছি। সুতরাং মহেশবাবু Caird, Green প্রভৃতির মত নির্দেশ ও উদ্ধার করিয়া এই বিষয়ে বাহা বাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই আমার উপর প্রযুক্ত্য নহে। এই-সকল লেখকের সহিত আমার মৌলিক প্রভেদ কিছুই নাই। মহেশবাবু আমার পুস্তকের যে যে স্থান নির্দেশ ও আংশিকভাবে উদ্ধার করিয়াছেন সে-সকল স্থানের কিছু কিছু আমি উদ্ধৃত করি, তাহাতেই পাঠক মহেশবাবুর ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। মহেশবাবুর নির্দিষ্ট ৩৮এর পৃষ্ঠায় আমি বলিয়াছি—“We have thus shown that space, the form in which matter is perceived, depends on consciousness. We shall now show that the matter of perception—colour, hardness, smell, &c., which are supposed to be things or qualities of things independent of mind, are not so, but are also dependent on consciousness. We shall show that they are

mental states, sensations or ideas.” আমি স্বীকার করি যে “mental states” নামটি একান্ত সন্দেহজনক নহে। ইহা কতকটা আনুমানিক। চলিত অর্থে বস্তু আর বস্তুর অবস্থার মধ্যে জাত-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু আত্মা ও ইন্দ্রিয়বোধের মধ্যে জাত-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ আছে। আমি এই সম্বন্ধের স্পষ্ট উল্লেখই করিয়াছি। ইন্দ্রিয়বোধ কেবল এই অর্থেই মানসিক অবস্থা যে অনুভবকারী আত্মাকে ছাড়িয়া ইহার অস্তিত্ব অনস্ব্য। বাহা হটক, ইন্দ্রিয়বোধ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় এক জিনিস নহে, তাহা পূর্বেই দেখান গিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে মহেশবাবু আমার কথা ভুল করিয়া ভুলিয়াছেন। তাহা যদিও তাহার সমালোচনার চতুর্থ অংশে, তথাপি প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানেই তাহার ভ্রম সংশোধন করি। তিনি আমার ইংরেজি পুস্তকের ১৮-১৯ পৃষ্ঠা নির্দেশপূর্বক কোটেশন চিহ্ন দিয়া লিখিয়াছেন, “কালজ কলম দোয়াত প্রভৃতি সমুদয়ই আমারই দর্শন, আমারই স্পর্শ”। আমি বস্তুতঃ বাহা বলিয়াছি তাহা এইঃ—“What I have before me,—paper, ink, inkpot, pen, table, &c.,—are all objects of my sight, related to that form of knowledge which is called visual perception. The pen, paper and inkpot touched by me are related to my tactual sense,—are objects of my sense of touch.” (বাস্তবতা অনুবাদ বাঙ্গালা পুস্তকের ১৯এর পৃষ্ঠায় আছে)। মহেশবাবুর ব্যাখ্যা আর আমার মতে অনেক প্রভেদ। “আমারই দর্শন, আমারই স্পর্শ” বলিলে অস্থায়ী ক্রিয়ামাত্র বুঝায়, ‘দর্শনের বিষয়’, ‘স্পর্শের বিষয়’ বলিলে এমন বিষয় বুঝায় যে বিষয় ইন্দ্রিয়ক্রিয়া শেষ হইলেও বর্তমান থাকে। আমার উপর একটা কল্পিত মত আরোপ করিয়া তাহা খণ্ডন করা সহজ। সেই কাল্পনিক মত মহেশবাবুর মত পণ্ডিত লোকের প্রয়োজন নাই, মুখ লোকেও তাহা করিতে পারে।

মহেশবাবু তাহার সমালোচনার চতুর্থ অংশে গোলবোগের একশেষ করিয়াছেন। তিনি আমার ব্রহ্মবাদের যুক্তিপ্রণালী কিছু-তেই ধরিতে পারেন নাই। কেমন করিয়াই বা গবিবেন? যে যে স্থানে সেই যুক্তি আছে সেই সেই স্থানেই কোন উক্তিই তোলে নাই। সুতরাং তিনি যে খণ্ডন দিয়াছেন তাহা আমার যুক্তির খণ্ডন নহে। আমার যুক্তির আভাসমাত্র এই যে, যে জ্ঞানকে আমরা দেশকালে প্রকাশিত দেখিয়া কেবল “আমাদের জ্ঞান” বলি তাহা বস্তুতঃ দেশের অতীত, কালের অতীত, অনন্ত; সন্দেহ বস্তু অসীমকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দেশকালের সহিত আত্মার সম্বন্ধ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ নিজা জাগরণ ও স্মৃতি-বিস্মৃতির পরীক্ষাবারা দেখান হইয়াছে যে চিরজাগ্রত সর্বজ্ঞ আত্মার আশ্রয় ব্যতীত এই সমুদয় অসম্ভব। এই যুক্তি আমার পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে—“The Temporal and the Eternal” ও “Unity and Difference”—এই দুই অধ্যায়ে—বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহেশবাবু যখন এই-সকল স্থল স্পর্শও করেন নাই, তখন আমিও আর এই-সকল স্থল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিলাম না। কেবল Green ও Caird সম্বন্ধে তিনি এই অংশে বাহা বলিয়াছেন তার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। তিনি Greenএর পুস্তকাবলীর তৃতীয় খণ্ড হইতে একটি স্থান উদ্ধার করিয়া ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—“জ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তু ধারণা করা যায় না, সুতরাং জ্ঞানই ঐ বস্তুর আশ্রয়—এ-প্রকার কল্পনা করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।” Green বলিয়াছেন “thought,” মহেশবাবু ইহার অনুবাদ করিয়াছেন “জ্ঞান”।

কেন? "Thought"-এর অনুবাদ "চিন্তা," "জ্ঞান" হইবে কেন? Thought ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক ক্রিয়া, ইহার উপর যে বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না তাহাতে আব সন্দেহ কি? বাহা ইউক, Greenএর গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড এখন আমার কাছে নাই। Green কোন সংগ্রহে ও কোন অর্থে উল্লিখিত কথা বলিয়াছেন তাহা আমি জানি না, এই জানি যে তাঁহার মত বোঝার ক্ষমতা ঐ খণ্ড তেমন প্রয়োজনীয় নয়। তাঁহার প্রধান প্রধান লেখা "Polegomena to Ethics" এবং পুস্তকাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডই আছে, আর ঐ সকল স্থলে তিনি অসংখ্য বার বলিয়াছেন যে জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া বিষয় থাকিতে পারে না। আর ব্যক্তিগত জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানেরই অমুপ্রকাশ। প্রয়োজন হইলে ও স্থান পাইলে আমি এই ভাবের অনেক কথা উদ্ধৃত করিতাম। বাহা ইউক, সমালোচনার এই অংশ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আত্মজ্ঞান ছাড়া যেমন বিষয়জ্ঞান অসম্ভব, বিষয়জ্ঞান ছাড়াও তেমনি আত্মজ্ঞান যখন অসম্ভব, তখন আমি কেন বিষয়কে আত্মার অধীন বলিলাম, আত্মাকেও কেন বিষয়ের অধীন বলিলাম না,—মহেশবাবুর এই এক আপত্তি। এই আপত্তির উত্তর অধ্যাত্মবাদের প্রত্যেক পুস্তকে আছে বলিলেই হয়, আর আমিও আমার পুস্তকে এই উত্তর দিয়াছি। আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানে ভেদ আছে বটে, এবং এই ভেদ অনুসারে বিষয় আত্মা হইতে ভিন্ন বটে, কিন্তু এই ভেদের উপরে একটি অভেদ আছে। বিষয়-বিষয়ীর ভেদ করে কে? আত্মাই করে। ভেদট' জ্ঞানের ভিতরকার ভেদ, হুতরাং ভেদকারী আত্মা এই ভেদের অতীত ও ভেদের আশ্রয়। বিষয়ে সেই আশ্রয় নাই। এই তথ্যট না বোঝা পর্যন্ত বিষয় ও বিষয়ীকে পরস্পর স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়, বোধ হয় কেহই কাহারো আশ্রয় নয়, কিন্তু তথ্যট বুঝিলে দেখা যায় প্রকৃত পক্ষে বস্তু একটিনাহী আর সেই বস্তু অনন্ত আত্মা; অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য বিষয়ী তাঁহার অন্তর্গত ভেদমাত্র, স্বতন্ত্র বস্তু কিছুই নহে। আমার সমগ্র পুস্তকে এই "জ্ঞানবাদ"ই ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং Green, Caird, Royce প্রভৃতি জ্ঞানবাদীর মতও ইহাই। মূল প্রণালীও তাঁহাদের সঙ্গে আমার এক চিন্তার নিয়তম সোপান বিষয়বাদের অভেদ হইতে দ্বিতীয় সোপান বিষয়-বিষয়ীভেদে উঠা, আবার তাহা হইতে তৃতীয় ও উচ্চতম সোপান ভেদাভেদবাদের উঠা। ইহারই নাম Dialectical Method. বাহা ইউক, আর একটি কথা বলিলেই সমালোচনার এই অংশের কথা বলা শেষ হইবে। Green সাহেব John Cairdএর Introduction to the Philosophy of Religionএর ঐশ্বর-প্রমাণে সন্তুষ্ট হন নাই, এই কথা সবিস্তার বলিয়া মহেশবাবু বলিতেছেন, "মানবজ্ঞান যে ব্রহ্মের জ্ঞানেরই প্রতিবিম্ব ইহা Cairdও প্রমাণ করিতে পারেন নাই, সীতানাথবাবুও পারেন নাই।" Cairdএর সঙ্গে আমার নাম করায় বড়ই লজা অনুভব করিলাম, কিন্তু তুলনাট্যে সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না। আমি John Cairdএর প্রমাণ ও Greenএর সমালোচনা উভয়ই পড়িয়াছি আর ঐ সমালোচনা সম্বন্ধে রাখিয়াই John Cairdএর অতিসঙ্কীর্ণতা-দোষ পরিহার করিয়া Absolute Idealismএর প্রমাণ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। John Caird বাহা করিতে পারেন নাই সীতানাথবাবু তাহা পারিবেনই না, এই ভাবিয়া যদি মহেশবাবু আমার প্রমাণ না পড়িয়া থাকেন তবে তাহা আমারই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তাঁহার উপরি-উক্ত সত্যটির বিচারটাকে কিছুতেই হুবিচার বলিতে পারিতেছি না।

মহেশবাবুর সমালোচনার পক্ষমাংশের সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। Bradleyএর মত যে ব্রহ্মবাদ, তাহা আমি তাঁহার

উক্তি তুলিয়াই প্রমাণ করিয়াছি, হুতরাং মহেশবাবুর সমালোচনায় ঐ বিষয়ে আমার মত পরিবর্তিত হয় নাই। বাহা ইউক, আমি Bradleyও ব্রহ্মবাদে সন্তুষ্ট নই। আমার ব্রহ্ম প্রেমময়, প্রেমবাস্ত পুণ্য—যা'নি ইহা আমার পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মহেশবাবু সেই অধ্যায়ের কোন খবরই লন নাই। Jamesএর মত সম্বন্ধে মহেশবাবু যে দেড় স্তম্ভ বিধিয়াছেন সে বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তিনি James সম্বন্ধে কেন আমার মত ভুল বুঝাইলেন ও আমায় কখন ভুল করিয়া উদ্ধার করিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি আমার বইয়ে কোথাও Jamesকে নাস্তিক বলি নাই, অথচ মহেশবাবু বলিতেছেন, "সীতানাথ বাবু Jamesএর প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস করিয়াছেন। লোকটা যেন নাস্তিক, পড়াশুনাটা বড়ই কম এবং overweening self-confidenceটা বড়ই বেশী।" Overweening self-confidenceএর কথা আমিও Jamesএর সম্বন্ধে বলি নাই। সাধারণভাবে Pluralism সম্বন্ধে বলিয়াছি। "পড়াশুনাটা বড়ই কম" এই কথাও আমি বলি নাই, ঐ মতাবলম্বীরা বিরুদ্ধমতের সাহিত্য ভাল জ্ঞানেন না, ইহাই বলিয়াছি। এই বিষয় Bradleyও উল্লেখ করিয়াছেন। বাহা ইউক, আমাকে বাধ্য হইয়া আমার লেখা হইতে কিংবা তুলিতে হইতেছে; ইহা হইতেই পার্থক্য বুঝিবেন মহেশবাবু তাহা বই কত অল্প মনোযোগের সহিত পাঠ্য্যাছেন। আমি ২৪এব পৃষ্ঠায় Pluralism সম্বন্ধে বলিয়াছি—

"In still another characteristic it resembles the elder sister (The elder Empiricism), and that is impatience in studying the literature of the opposite school. The result is an overweening confidence in itself and an exaggerated idea of its own victory over its enemies mostly the creatures of its own imagination. In going through James's *Pluralistic Universe*, one is struck with the author's superficial knowledge of the Absolutist writers he mentions and criticises. There is nowhere any attempt to systematically state or summarise the arguments of these writers, to enter into the analysis of experience given by them, and then to show its insufficiency or to expose any unwarrantable assumptions that may be involved therein. The whole criticism resolves into the suggestion of a number of difficulties which the theistic or monistic theory of the world cannot fully meet."

মহেশবাবু Jamesএর উপরি-উক্ত পুস্তকের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া Jamesএর ঐশ্বরবিষয়ক মত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার উক্ত পুস্তক প্রথমে পড়িবার সময়ও বোধ হইয়াছিল আর এখনও মহেশবাবুর অংশের অগ্রপণ্ডিত মিলাইয়া ঐ পুস্তকের ঐ স্থানটা আবার পড়িয়া বোধ হইল James ইহাতে ঐশ্বর সম্বন্ধে কোন স্থির বিশ্বাস প্রকাশ করেন নাই, কেবল Absolutistএর ব্রহ্মবিষয়ক ও লৌকিক বিশ্বাসের ঐশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা এই দ্বিচার উপযোগিতা সম্বন্ধে তুলনা করিয়াছেন। বাহা ইউক James যদি ঐশ্বরবাদীই হন, তাহা হইলেও তাঁহার ঐশ্বর যখন সীমাম, তখন সেই ঐশ্বর আমার কাছে Bradleyর Absoluteএর চেয়েও অধিক অতৃপ্তিকর। তাঁহার সেই ঐশ্বর সম্বন্ধে আমি কিছুই বলি নাই। আমি উক্ত প্রবন্ধে সবিস্তার বলিয়াছি Wardএর ঐশ্বরবাদ সম্বন্ধে। সেই বিষয় যখন মহেশবাবু স্পর্শ করেন নাই তখন আমারও আর কিছু

বক্তব্য নাই। আমার শেষ কথা এই যে সাময়িক পত্রিকার তর্কবিতর্ক চালাইবার অবকাশ আনার নাই। আমার নির্দিষ্ট কাণ্ড অল্পরূপ। আমার সমস্ত দার্শনিক গ্রন্থের ভিত্তিবস্তুরূপ “ত্রস্তা জিজ্ঞাসার” অতি ভ্রমপূর্ণ ও ভ্রমজনক সমালোচনা বাহির হইয়াছে দেখিয়া কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম। কেহ যদি বইখানা সমগ্ররূপে পড়িয়া ইহার অপস্রপাতী সমালোচনা করেন, আর সেই সমালোচনা আমার মতের প্রতিফলন হয়, তথাপি তার সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার থাকিবে না।

শ্রী নীতানাম গন্ত।

চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি বেদের কথা।

অষ্ট শতাব্দী পূর্বে আমাদের দেশের ভ্রমসমাজে চিত্রশিল্পের মর্যাদা ঘৃণিতে পারিয়াছিল কম লোকে। এক্ষণে চিত্র-শিল্পের চর্চা প্রলয়ের অঙ্ককার হইতে এই যে গারভা দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহা সহস্র ব্যক্তি যাদেরই অভিনন্দনের বিষয়। সব ভাল—কেবল একটি বিষয় বক্তব্য আমার চক্ষে বাজে; সে বিষয়টি প্রকাশ করিয়া বলিতে আমার বাধা বাধা ঠেকিতেছে,—তাহা আর কিছু না—স্বন্দরী স্ত্রীর নাকে নথ বা নলক। একে তো এক্ষণকার কালের সাজিত রুচিতে নগ্নের সম্ভাপারিপাট্য নিতান্তই একটা হাস্যকর সামগ্রী, তাহাতে আমার পুরাতন কালের কাব্যসাহিত্যটির একটি স্থানও নাকের গরনার উল্লেখ নাই। সত্য কথা যদি বলিতে হয়, তবে নাকের নথ আর দাঁতের মিসি এই দুইটি অনাব্যোচিত অলঙ্কার তাহা বর্জনের পরিচরক।

চিত্রশিল্প সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ভাবপ্রধান (idealistic) এবং (২) রূপপ্রধান (realistic)। ভাবপ্রধান চিত্রের তো কথাই নাই—রূপপ্রধান চিত্রেও নথ বা নলকের দ্বারা বস্তাব-শোভন অকৃত্রিম মুখমাধুর্যের রসহস্তা এমন আর কিছুই নাই, আর, সেইজন্য অমুনাতন কালের ভ্রমসমাজে নথ এবং নলকের ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এবিষয়ে বাহ্যিক বাক্যব্যয় অনাবশ্যক-বোঝে আমার মনের খেচরটি ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রী বি—।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা সমালোচনার একটু জের

খাঁটি সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে উ ভ চ র শব্দ হয় না, তথাপি ইহা যে চলিতে পারে, এ সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছি; কিন্তু সে সময়ে তাহার একটা তেমন প্রয়োগ দেখাইতে পারি নাই, আজ তাহা দেখাইতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩.২৫.৩৩) উ ভ যা য়ী (=উভয়গামী) শব্দ আছে। সম্পূর্ণ শব্দটি এই—

“ইহং লোকং তথৈবামুদ্রায়ান মু ভ যা য়ি ন ন।

আত্মানমমু ভে চেহ বে রাসঃ পনথো গৃহঃ।”

লক্ষণীয় উ ভ চ র ও উ ভ যা য়ী শব্দের ব্যুৎপত্তিভা অর্থ একই। অব্যেতাতে কেবল উ ব (=উভ) শব্দ আছে, উ ভ র শব্দের প্রয়োগ তাহাতে একবারে লুপ্ত হইয়াছে।

পুস্তক শব্দ লইয়াও আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু মনে হইতেছে কোনো সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রয়োগ দেখাইতে পারি নাই। আজ দুইটি প্রয়োগ দেখাইব। গারভী-তন্ত্রে (শিবচন্দ্র বিদ্যার্য্যভূত তন্ত্রতত্ত্ব, ১১৮ পৃ.) হু শ পুস্তকী আছে—

“কুশপত্রগতেঃ সাত্বিনী বর্ষ ক শ পুস্তকী ন।

যেবোক্তবিবিনা তত্ত্ব অগ্নিগাহং সমাচরেৎ।”

আর দেবীভাগবতে (ঐ, ৩.১৭ পৃ.) কা ঠ পুস্তকী কা আছে—

“মুদ্রানহং নর্তক্যনি কা ঠ পুস্তকী কো প মা ন।”

শব্দের পুনরুক্তি-প্রসঙ্গে কোথাও যেন পড়িয়াছি মনে হইতেছে, ললিত বাবু বা অপর কোনো লেখক কোনো বাঙলা লেখা হইতে কা লা ষ্ট ক ব ম শব্দ তুলিয়াছেন। ইহা ভাগবতেরই একটি স্রোতের মধ্যে আছে—

এবং নির্ভংসিতোহ্যষ্টঃ কুপিতো কোপিতঃ গম্ভঃ।

চৌদরানাস কুকায কা লা ষ্ট ক ব মো প ম ন। ১০. ৪৩.৪

শ্রীধরবাসী অর্থ করিয়াছেন—“গম্ভকো মৃত্যুঃ, কালব্রহ্মিগম্ভঃ, বম-ভ্রমিগম্ভা, তৈকপমা যন্ত।” অর্থাৎ গম্ভক=মৃত্যু, কাল=মৃত্যুর কারণ, বম=মৃত্যুর নিয়ন্তা, ইহাদের সহিত উপমা যাহার। চীকাকার এখানে এই তিনটি শব্দেরই পৃথক-পৃথক অর্থ দেখাইয়াছেন।

শ্রীধরশেখর ভট্টাচার্য।

শব্দপ্রসঙ্গ

১। বাঙলায় ধা ম, ধা মা ইত্যাদি কোথা হইতে আসিল? অব্যেতা ইহার খাঁটি উত্তর দিতে পারে। সংস্কৃত শ ম্ (=শাঙ্ক হওয়া) ধাতুর স্থানে অব্যেতায় √ধ ম্ হয়।

২। বাঙলায় বলা হয়, মাগা ফিট, ফি ট-কাট, ইত্যাদি। এই ফি ট, কা ট, শব্দের মূল কি? সংস্কৃত √ফি ত (=মাগা হওয়া) ধাতুর প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর রহিয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে কেবল তদ্বংসরূপে ত শব্দই দেখা যায়। ফি ত্র (=বেত কুঠ) শব্দও এই ধাতু হইতে হইয়াছে। সংস্কৃত √ফি ত=অব্যেতা √ফি ত। প্রাকৃততঃ স্প=ফ, এবং ত=ট। অতএব ফি ত্র =ফিট। আবার এই ফি ত হইতেই হিন্দী ফারসী (?) সফে দ। অপর দিকে বৈদিক √ফি ত ধাতু হইতেই Anglo-Saxon √hwit ধাতু, শ=হ, এবং ইহা হইতেই ইংরেজী √white (to make white)।

৩। বাঙলায় শব্দবিশেষ অর্থে বন-বন প্রযুক্ত হয়। ইহা অনুকরণ শব্দ হইতে পারে। অন্তরূপেও ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। সংস্কৃত √ব ন্=অব্যেতা √ব ন্।

৪। দর্শন অর্থে বেদে ও অব্যেতায় √স্প শ্ আছে, এবং ক্রিয়াপদ রূপে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। লৌকিক সংস্কৃতে ইহার একটি মাত্র কুশল পদ রহিয়াছে স্প শ (=চর) আর একটি শব্দ রহিয়াছে প স্প শা (পতঙ্গলিকৃত ব্যাকরণ মহাভাবের প্রথম আঙ্কিকের নাম)। লৌকিক সংস্কৃতে √স্প শ্ নিজের সকারকে হারািয়া √প শ্ (অর্থাৎ পশু—√দৃশ-স্থানে আদিষ্ট) আকার ধারণ করিয়াছে। চর-অর্থে পুরোক্ত স্প শ=Eng. Spy, অব্যেতা, স্প শ ন=Ger. Spion.

৫। মদ্য-অর্থে হা লা শব্দ সংস্কৃতেও চলিত আছে। কিন্তু ইহা মোটেই সংস্কৃত নহে, পালিপ্রকাশের ভূমিকার এ সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছি। কেহ (বামন) ইহাকে দেশী বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার মূল কি পাওয়া যায় না? সংস্কৃত হু রা=অব্যেতা হ রা। র=ল, অতএব হরা=হলা, তাহার পর উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে হলা হইতে হা লা হইয়াছে মনে হয়।

৬। সংস্কৃতের উ ব রা (ভূমি) শব্দটির বক্তৃত মূল কি? সংস্কৃত ত র অর্থে অব্যেতায় উ ব রা (স্ত্রী) শব্দ প্রযুক্ত হয়। ত র ব রা =অ র ব রা (তালো)। তাহার পর উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া এই অ র ব রা শব্দই উ ব রা হইয়াছে কি? তাহা হইলে

উর্বা শব্দের আসল অর্থ দাতার—যে ভূমিতে তরু বর অর্থাৎ প্রধান বা প্রচুরভাবে হয়। তাহা ও চ (সংস্কৃত ও অবস্থা) একই।
Gr. *Drus*

৭। জাগরণ-অর্থে বৈদিক সংস্কৃত √গৃ (= অবস্থ) √গৃ।
লৌকিক সংস্কৃতে অভ্যস্ত হইয়া √জাগৃ মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। এইরূপ
চতুল্যকারে স্বাধাতুর স্থানে তিষ্ঠ আদেশ বস্তুত স্বাধাতুর অভ্যস্ত
আকার।

৮। বৈদিক √হ্র (আস্থান, ভূগঃ-√হ্র) হইতে হ্রবন = অবস্থা
হ্রবন। ইহাতে বারমী ভবান (৭)।

৯। সংস্কৃত যব্ (=জ্যোতিঃ, ইহা হইতে স্বর, যর, যুর্ধা)
অবস্থা স্বর (সূর্য) Gr. *helios* (সূর্য); আবার ইহা ইহতে পুনর্বার
সংস্কৃত হেলি (সূর্য)।

১০। তামাক খাইবার হাঁকা শব্দটী কোথা হইতে আসিল?
সংস্কৃতে শুক = অবস্থা শুক, শুক = শু। এইরূপে শুক হইয়া দাঁড়াইল
হঁক, হঁকা। নারিকেলের শুক অস্থিটাই ত হঁকা হয়। খুব সম্ভব
এই ক্ষুদ্র ইত্যাহার ঐ নাম।

১১। সংস্কৃত যুবন = *L. juvenis* = (cf. Eng. *young*)
অবস্থা যুবন, যবন। সংস্কৃতে প্রচলিত যবন (*roman*) শব্দ
অবস্থার যবন হইতে আসিয়াছে কি?

১২। সংস্কৃত কৃমি = অবস্থা কেরে মা। ককার লোপে ইহা
এরে মা হইতে পারে। Ger. *worm* ও Eng. *worm* এই
কেরে মা—এরে মার সহিত সম্বন্ধ।

১৩। বাঙলায় গরুর ছা ব কাটা প্রসিদ্ধ আছে। ও ব কিরূপে
হইল? বৈদিক √জজ্জ (চর্ষণ করা, তুলঃ—√জজ্জ) = অবস্থা
জজব। √জজ্জ + জ = জজ = জবজ = জাব।

১৪। ভূমি-অর্থে বৈদিক সংস্কৃত জ্ঞা = অবস্থ জ্ঞেন = বারমী
জ্ঞেনী ন = বাঙলা জ্ঞেন।

১৫। সংস্কৃত বর (বেঠন, তুলনীয়—বৃতি) = অবস্থা বর
(আবেঠন, বেড়া)। বর = বল। Lat. *vallum*, a rampart,
Ger. Eng. *wall*.

১৬। সংস্কৃত গদ্ = অবস্থা জদ্ (যশস্বয় করা, প্রার্থনা করা)।
ইহাতেই বাঙলায় জেদ করা আসিয়াছে।

১৭। অবস্থ বরে মি (টেউ) = সংস্কৃত উ মি। অবস্থার
বরে মি = সংস্কৃত ভ মি। উ মি শব্দ স্বাধাতু হইতে নিম্পন্ন বলিয়া
ধরা হয় (উগাদি যু, ৪, ৪৪), কিন্তু বস্তুত তাহা ভ মি হইতেই
পূর্বোক্ত লগ্নে পরিবর্তন আগু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

১৮। অবস্থা √বদ্ (ভিধান) = সংস্কৃত উদ্। √উদ্ + জ =
উজ = wet।

ঐতিহাসিক তত্ত্বাচার্য।

বাঙলার বানান-সমস্যা

১। শ্রদ্ধাশ্রমী ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বঙ্গ ভাষায়
অতি চার প্রমত্তে আমার কতিপয় আলোচনা করিবার অঙ্কে, নিম্নে
তাহা লিখিতে চেষ্টা করিব।

২। তিনি “বাংলা দাওয়া” বঙ্গী করিয়া এই-সকল শব্দের ওয়া
কিরূপে বাঙলায় প্রবেশ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়াছেন।
ওয়ার আকারটা কোথা হইতে আসিল, আমি প্রথমে তাহাই
দেখাইব। সংস্কৃতের অন্তি প্রত্যয় শব্দগুলি বাঙলায় আকার

দেখ দাও। বাকরণ-বিভাগে বঙ্গী বানান-সমস্যা
বলিয়াছি। সংস্কৃত বানান-সমস্যা, এইরূপ বঙ্গী বানান-সমস্যা
তাড়া, তুলন- (তুলন-) বানান, ইত্যাদি বানান-সমস্যা
হইল? সংস্কৃত অন্ত-প্রত্যয় শব্দগুলির পুণিঃ প্রবেশ
অন্ত-এর নকারের লোপ ও অকার-স্থানে আকার বঙ্গী। যথা
ব্রাহ্ম, ব্রহ্মন—ব্রহ্ম, অধ্বন—অধ্বা, যুবন—যুব, বর—
ইত্যাদি। চলন, মরণ ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ-সকল বঙ্গী
বাঙলার স্বার্থে একাকার-রূপে উচ্চারিত হইয়াছে।
ভাবে উচ্চারিত হয়, চলনকে আমরা চলন উচ্চারিত
বাঁকি। এইজন্য ঐ-গকল শব্দ বস্তুত একাকার হইতে ও
অন্ত-প্রত্যয় শব্দের দ্বারা হইয়া পড়িয়াছে, এবং
শব্দের সাদৃশ্যে তাহাদের নকারের লোপ ও পূর্ব-প্রত্যয়
আকার হইয়া যায়, এবং চলন বাঙলায় চল মূর্ত্তি বোধ
নিম্নেই সংস্কৃতের অন্তি প্রত্যয় শব্দগুলির প্রাচীন
আকারগুলির সমাধান করিতে পারা যায়।

৩। কিন্তু বাওয়া হইল কিরূপে? বাওয়া
বা অন হয়। ইহা হইতে বাঙলায় প্রথমে বা আকার
প্রাকৃতে শঅন (অথবা সঅন, ময়ন পদও হইয়া
তাহা হইতে বাঙলার স্বার্থে শব্দ-রচিত নকারের ওক,
পূর্বের নিম্নে গো আ। নয়ন = ন + য + ন = ন
পালি-প্রাকৃতে অয় = এ হইয়া গেল। অতএব ন
অন = (পূর্বোক্ত নিম্নে) যা। এখানে সংস্কৃত ময়ন
প্রথমে নে আ হইয়াছে। সংস্কৃত বান = যা + যন।
হইতে পূর্ব নিম্নে যা আ। দান = দা + যন।
হইতে উচ্চারণের বৈকল্যে সে অন হয়, যেমন
ময়নশব্দের একবচনে দাহিত্বনে দাহি হইয়া গেল।
হইতে দে আ। অতএব যোগেশবাবু যদি বাওয়াকে
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যথার্থি বচনকে আ আ,
নে আ, শো আ বলে, দাহে ওকার আনে ন (৩২ পৃঃ)
সেগুত কাহারো আচ্ছা হইব ব বেনে কাবল দেখি
প্রকৃতি এই যথার্থেই সমর্থন করিতেছে। আমি বৈশেষ
কবিগণকে বা যু স্থানে বা উচ্চারণ করিতে
তাহার পর প্রাকৃতির সঠিত পরিচয় পাও হইবে।
বুঝিয়া এবং একবার হস্তিগাহিত্য।

৪। সংস্কৃত √জজ্জ হইতে প্রাকৃতে বাঙলায়
জবতি প্রাকৃতে হবতি, হোতি, হোই ম = জ =
বহুবে অব = ও (হেমচন্দ্র, ৮, ১, ১৭২)। এইরূপে
= হো। এখন ম = ভবন = প্রা = হবন। হবন
বৈকল্যে হও, এবং অন = প্রা। এইরূপে
হো আ বা হও মা হইয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন
প্রাকৃতে পাবন (পা + যাব + যন)।
পাওয়া। এইরূপে বা বন হইতে পাওয়া।

৫। অথবা সংস্কৃত ভবন প্রাকৃতে হবন।
বলোপে (হেমচন্দ্র, ৮, ১, ১৭৭) হবন। প্রাপণ
(প = ব, প্রাকৃ-প্রকাশ, ৩, ১২) = পাবন।
এখন যুগাব বাঙলায় এককের ওকার-উচ্চারণ
ভাগ্য শব্দের ন-বোলে পূর্ব-প্রত্যয় দ-হইতে

• এই ওকার হইবে।

চ অ ন, পা অ ন, ধা ব ন যথাক্রমে হ ও আ, পা ও আ, ধা ও আ
স্থান প্রাপ্ত করে।

৩। পূর্ণবর্ণ ও আরো অক্ষর স্থলে থা অ ন, দা অ ন বলা
এখনো বুন চলিত আছে। এখানেও বাহারি অকারকে ওকার
উচ্চারণ কবিষা থাকেন, তাহারি থা অ ন হইতে থা ও আ করিলেন,
দা অ ন হইতে দা ও আ করিলেন। আর বাহারি অকারকে ওকার
উচ্চারণ করেন না, তাহারের নিকট থা অ ন—দা অ ন যথাক্রমে
থা অ—দে আ (দা—দে, যেমন দা হি—দেহি) মুক্তি ধারণ
করিল।

৪। অপর হ রা, বা রা, দা রা হইতেই (ঋত্বাঃ) উচ্চারণের
বৈবক্ষণ্য হ ও রা, থা ও রা, দা ও রা হইতে পারে। শেষের
য়াকার-উচ্চারণই এই বৈবক্ষণ্যের কারণ।

৫। থা ও রা-দা ও রা ব অর্থাৎ ওকারের সমাধান এইরূপেই
করিতে পারা যায়। আকারের কথাত পূর্বে বলিয়াছি। এখন
যকার কোথা হইতে আসিল দেখিতে হইবে—পূর্ব-প্রদর্শিত আ-স্থানে
য হউল কিনল ?

৬। অর্ধ প্রাকৃত একটি নিয়ম আছে (“অবর্ণো য শ্রুতিঃ”,
চেমচন্দ্র, ৮. ১. ১৮০. শুভচন্দ্র, ১. ৩. ৫, সিংহরাজ, ১২. ৫. ৫, চণ্ড,
৩. ৩৫, ক্রমদীপক, ৮. ২. ২), ইহাতে অকার-আকার-স্থানে য-বা হইয়া
যায়। প্রাকৃতের সাধারণ নিয়মে কা ক=কা অ, র জ.ত
=র য অ, ন গ র=ন অ র, গ ভা=গ আ হইয়া থাকে, কিন্তু উল্লিখিত
বিশেষ নিয়মে ঐ-সকল শব্দ যথাক্রমে কা য, র য র, ন য র,
গ য হইবে। এইরূপ মা তা সাধারণ প্রাকৃতে না আ, কিন্তু অর্ধ
প্রাকৃতে ল য়া হইবে। এই নিয়ম অনুসরণ করিলে থা ও আ-
দা ও আ হইতে থা ও রা—দা ও রা সহজেই আসিয়া উপস্থিত
হয়। ঐক্যকীর্তন খুলিয়া দেখিলে জানা যাইবে, শু নি য়া,
ক নি য়া প্রভৃতি স্থলে সেখানে সর্বত্রই শু নি আঁ (২৫ পৃ.), ক রি আঁ
(১৪ পৃ.), শি আঁ (৩০ পৃ.), পু ছি আঁ (১৫ পৃ.) দি আঁ (১৮ পৃ.)
ইত্যাদি প্রযুক্ত হইয়াছে, কখনই য়া দেওয়া হয় নাই। এইরূপ
এখানেও আ (১৫, ২৪ পৃ.), যো রাল সেখানে গো আ ল।
এতাদৃশ অনেক প্রয়োগ রহিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে
(সাহিত্য-পরিব্রাজক) গো আ লি (৪৮ পৃ.), গো রা লী (১৮ পৃ.), উভয়ই
দেখা যায়। পা রি র (পারিয়া), দে খি অ (দেখিয়া, ২১৮) উভয়ই
প্রযুক্ত চইয়াছে। কাশীরাম, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস-প্রভৃতির
প্রচলিত সম্প্রদায়-সমূহে য়াই দেখা যায়। এই জন্মই আমরগও
বলাই নির্দিষ্টা আসিতেছি। বসন্ত-মহা-মহা লইয়া বিশেষ খোল-
মানের কিছুই নাই। উচ্চারণের পার্থক্যই প্রাকৃতেও অকার ও
যকারের পার্থক্য স্থান পরিবর্তন হইয়াছে।

৭। বলিয়াছি ল য়া সাধারণ প্রাকৃতে ল আ, কিন্তু অর্ধ প্রাকৃতে
ল য়। এতাদৃশ স্থলে যকারের উচ্চারণ ল য় ন-প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের
অপ্রত্যাশিত্যকারের মত সম্পূর্ণরূপে নহে, তাহা অপেক্ষা লঘুতর প্রযুক্ত
এ যকার উচ্চারিত হইয়া থাকে (“লঘু প্রযুক্ততর যকার শ্রুতিভাবতি”;
—হেমচন্দ্র, ৮. ১. ১০০)। এখন ল য়া ও ল য়ার মধ্যে কতটুকু

এই যকার-সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা করা হইবে।

৮। ঐক্যকীর্তনের ভাষা বহু বৈচিত্র্য আছে, এবং তাহা বিশেষ
প্রাধান্যযোগ্য। এখানে আক্ষরিক-কার করিয়া প্রভৃতি ক রি আঁ
প্রভৃতি হইয়াছে, কিন্তু আমাদের যথানে ইকার, ইহাতে সেখানে প্রায়ই
যি দেখা যায় :—পা যি ব (২৫৬), পা যি যোঁ (২৫৬), লা না যি ল

ভেন আঁছে, পাঠকগণ অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপে
থা ও আ আর থা ও রা রূপেরও মীমাংসা হইয়া যাইবে।

৯। যোগেশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন “করা জানা শোনা থাওরা
লওয়া প্রভৃতি শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বোধ হয়।” আমি
একটু খুঁজিয়াও দেখিলাম। ঐক্যকীর্তনে একটি প্রয়োগ পাইয়াছি
(দেখাঃ ২৯)। কেহ যদি এদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন সাহিত্যগুলি
পড়েন, তাহা হইলে সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারা যায় কখন হইতে
এইরূপ পদের প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে।

১০। ওয়ার সমাধানে যোগেশ-বাবুর সহিত আমি একমত
হইতে না পারিয়া আমার বক্তব্য পূর্বে বলিয়াছি, তাহার মত কেন গ্রহণ
করিতে পারি নাই, তাহা বলিতে হইবে। তিনি দুইটি কারণ নির্দেশ
করিয়াছেন। (১) প্রথম—“থা পরে; আ মিশিয়া থা হইয়া পড়িতে
পারে। এই আশঙ্কায় মাঝে ও বসিয়া থাকুর আ হইতে প্রত্যয়ের
আ পূৰ্ণ রাখিয়াছে।” ইহা কেবল কল্পনা, কোনো নিয়ম বা প্রমাণ
অনর্শিত হয় নাই। ভাষা নির্দেশ করণে নিজেই নিশ্চয় ভাবে গড়িয়া ও
ভাঙিয়া থাকে, তাহাতে তাহার যেরূপই দাঁড়াইক, বে বাক্তি ভাষা
প্রয়োগ করিবেন, তাহাকে তাহাকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। প্রশ্ন
হইতেছে ওকারটা বসিল বটে, কিন্তু কিরূপে বসিল? কোথা হইতে
আসিল? একার-ইকার-প্রভৃতি না আসিয়া ওকারই বা আসিল কেন?
ইহার কোনো উত্তর দেওয়া হয় নাই।

১০। (২) তিনি দ্বিতীয় কারণ অনুমান করিয়া, ক রি বা কু—
ক রি বা ক—ক রি বা—করবা—প্রভৃতির ক্রম-পরিবর্তন অবর্ণনে
ও যা দেখাইয়াছেন। সাধন-প্রণালী যেরূপ অদর্শিত হইয়াছে, তাহা
ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলেও অর্থের মিল হয় না। যোগেশ বাবু নিজেই
বলিয়াছেন।—“বহু পূর্বে ছিল, করিবাকু পরে করিবাক—করিবার
নিমিত্ত।” ধরি, বা ক (ঐক্যকীর্তন, ১২) = ধরিতে, ক রি বা ক
(১৪) = করিতে, দি বা ক (১৪) = দিতে, ... মারিবা = মারিতে।
এতাদৃশ প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে-আছে, আর তাহারই অপর। আকার
ক রি বা—করবা, ধরিবা—ধরবা, মারিবা—মার্বা, যা বা, থা বা, দি বা
ইত্যাদি এখনো আমাদের অঞ্চলে (মালদহের পশ্চিম অংশ) খুবই
প্রচলিত আছে। থাওয়া-দাওয়া যদি থাইবাক দিবাক অথবা থাবা—
দিবা প্রভৃতি হইতেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই
হইবে থাওয়া—দাওয়ার অর্থ থাইতে—দিতে বা থাইবার লজ্জা—
দিবার লজ্জা। কিন্তু বস্তুত এই অর্থে ঐ-সকল শব্দ প্রযুক্ত হয় না।

১১। এ স্থানে একটি প্রশ্ন করা বাউক।—এই ক রি বা ক—
ক রি বা প্রভৃতি পদগুলি কোথা হইতে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছে?
ক বার্ষে, প্রাকৃতে ত অনেক স্থলেই হয়, সংস্কৃতেও তম নহে (ঋত্বা—
সিংহরাজ—প্রাকৃতনর্কণ, ১৩৫)। থাকিল ক রি বা। আমার মনে
হয় ভূম্ব অর্থে বৈদিক ত বৈ বা ত বেঙ্ (পাণিনি, ৩. ৪. ২), পালি
ত বে (পালিপ্রকাশ, ৫১২২), বা প্রাকৃত এ বি প্রত্যয় যোগে
ঐ-সকল পদ হইয়া থাকিবে। পালিবার লজ্জা এই অর্থে প্রাকৃতে

(২৩০), মা না যি বোঁ (১৩), থা যি ব (২৩৭); ল যি আঁ (১৩৬),
বি না যি আঁ (২৩৩), কি লা যি আঁ, ভ রা যি আঁ (২৪২);
ইত্যাদি। আবার কা টা ই ল (১৩১), হা রা ই বে (১), পা ঠা-
ই বোঁ (২২), পা ঠা ই য়াঁ (২৩), পে লা ই ল (২৫, ২৭), পা ই ল
(৬৪), থা ই ল (৩৮), ইত্যাদি।

১২। শুভচন্দ্র (১. ৩. ৫) লিখিয়াছেন—“লঘু প্রযুক্ততর যকার
শ্রুতিঃ।”

পা লে বি পদ হয়। সংস্কৃত কৃ বাঙালার কর্। ইহার পব তব-প্রত্যয় করিলে ইকার-আগমে ক রিত বে, তাহার পর সাধারণ নিয়ম-অনুসারে ত-লোপে (বিতান=বিদান) ক রি অব, তাহার পর প্রাকৃত সন্ধির প্রত্যবে ক রি বে। অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মে শেষের একার অনারসেই আকার হইতে পারে। এইরূপে ক রি বে ক রি বা হইয়া দাঁড়ায়। এখন এই-সকল পদের অপর কোনো সমাধান আছে কি না পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

১৫। এইবার প্রজ্ঞাপদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবুর উদ্ভাবিত ও-অক্ষর বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১৬। হ ও আ, খা ও আ'র আদি ও শেষ স্বরের উচ্চারণে কোনো গোলমাল নাই, বা কিছু গোল মধ্যবর্তী ওকারকে লইয়া। এখানে ওকার প্রায়ই ঠিক ওকারের যেরূপ উচ্চারণ হওয়া উচিত, সেরূপ উচ্চারিত হয় না, তাহা অপেক্ষা অনেকটা লঘুভাবে ইহার উচ্চারণ হইয়া থাকে। এখানকার ওকার যদি ঠিক ওকারেরই মত উচ্চারিত হয়, তবে তাহার ধ্বনি হইবে হ-ও-আ, খা-ও-মা। রামানন্দ বাবু ইহাই ইংরেজী হরপে দেখাইয়াছেন ha-o-ā, khā-o-ā। হকার ও ওকারের মধ্যে অকারের সেরূপ ব্যবধান রক্ষা না করিয়া উভয়কে দ্রুতভাবে উচ্চারণ করিলে হও-আ, বা ইংরেজী হরপে hao-ā হয়। কেহ কেহ আত্মকাল একুপ উচ্চারণ করেন। কিন্তু এখানে ও ওকারের সম্পূর্ণ উচ্চারণ হয় না। বলিয়াছি এতাদৃশ স্থলে ওকারটি অনেক লঘু ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। অবশ্যই দুইটি ওকার আছে, একটি ত্রুণ (short), অপরটি দীর্ঘ (long)। প্রথমটির উচ্চারণ for-এ o'র মত, আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ fore-এর o'র মত। অর্থাৎ ঠিক সংস্কৃত ওকারের মত। হ ও আ, খা ও আ'র ওকারটা ত্রুণ। বোধহয় রামানন্দ বাবু ইহাই প্রকাশ করিবার জন্য ইংরেজী হরপে hawā, khāwā লিখিয়াছেন। তাহা হইলে কথটি এই দাঁড়াইল যে, হ ও আ, খা ও আ'র মধ্যবর্তী বর্ণটি খাটি (অর্থাৎ সংস্কৃত) ওকার নহে, ওকারের সদৃশ আর-একটি ধ্বনির (অর্থাৎ ত্রুণ ওকারের) স্যোতক পৃথক বর্ণ। কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় ওকারই প্রযুক্ত হইয়াছে;—যেমন (১২) আর্ষ প্রাকৃতে লয়া (=লতা) প্রভৃতির যকার খাটি সংস্কৃত রকার হইতে ভিন্ন হইলেও নিজের স্বতন্ত্র আকার না থাকায় তাহার স্থানে সংস্কৃত রকারই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।

১৭। সংস্কৃত অ লি অবশ্যই অ ই পি, এইরূপ অভি=অ ই বি, প্র তি=প ই তি। প রী (=অঙ্গুরা cf. fairy) শব্দ বাঙালিতেও অনেক স্থানে প ই রী উচ্চারিত হইয়া থাকে (অবশ্যই প ই-রি কা)। এতাদৃশ স্থানে ইকারটা epenthetic। প্রাকৃত ব্যাকরণে অবর্ণ স্থানে যে, ব-প্রতির কথা লিখিত হইয়াছে তাহাতে epenthesis-এর* কার্য হইতে পারে। প্রকৃত স্থলেও কি ওকারটা Epenthetic? অবশ্যই পাক্যাত্য পণ্ডিতেরা Epenthesis ও Prothesis-এর anticipatory বা অপেক্ষিত স্বরকে অপেক্ষাকৃত ছোট হরপে ছাপাইয়া সাধারণ অক্ষর সমূহ হইতে ইহাকে পৃথক রাখিয়া থাকেন। তাহার প ই তি শব্দ লিখিবেন পইতি (paity)। তদনুসারে বাঙালিতেও ছোট-বড় হরপে ছাপিতে পারা যায়। হ ও আ এইরূপে হওআ লিখিলে চল। অথবা অবশ্য

পড়িবার সময় শুভ্রাটীরা যেমন ত্রুণ ও দীর্ঘ ওকারের পৃথক সাধনের জন্য ত্রুণ ওকারের মাঝার উপর একটু বিশেষ-চিহ্ন (diacritical mark) দিয়াছেন, বাঙালিতেও সেলপ করা যাইতে পারে। ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরে লিখিবার জন্য মাঝারি ভাষাতেও এইরূপ চিহ্নের প্রয়োগ দেখিয়াছি। অক্ষরের সংখ্যা অসংখ্য বাড়িবে আশঙ্কা আছে। তবে বিচার করিয়া চিহ্নের প্রয়োগ করিলে ইহারও সমাধান বোধ হয় সহজে হইতে পারে।

১৮। যেরূপে বিশেষ চিহ্ন না দিলে অনেক স্থলেই গোলমাল পড়িতে হইবে। hand, hat প্রভৃতির a-র ধ্বনি প্রকাশ করিবার জন্য উপায় নাই। শ্রীযুক্ত নবকুমার কবিরাজ মহাশয়ের স্বপ্নদর্শনে সে দিন এ প্রসঙ্গও পুনর্বার উদিত হইয়াছে। সংস্কৃত গতি, মতি প্রভৃতির অকারকে আমরা ঠিক অকার ত উচ্চারণ করিই না, (গতি বা gati বলা হয় না), ঠিক ওকারও উচ্চারণ করি না,—একবারে গতি বা goti বলি না। এখানেও ত্রুণ ওকার উচ্চারিত হইয়া থাকে। এইরূপ কা লো কা লো চুল, ভা লো ভা লো বই বস্ত্র বলা হইবে, আবার স্থানে স্থানে ঠিক কাল কাল, ভাল ভাল (Kāla, bāla) উচ্চারণও না, ইহাদেব উভয়েরই মধ্যবর্তী ত্রুণ ওকারের উচ্চারণ হইয়া থাকে। ওকার লিখিলেই সংস্কৃত ওকারের ধ্বনিটাই মনে আসে কেননা এইরূপ অভ্যাস আছে। গতি প্রভৃতির অকারটা কি ও ওকার-ঘ্যান বা ত্রুণ ওকার ভাবেই মনে আসে। ইহারও প্রমাণ অভ্যাস। হরত কা লো প্রভৃতির ওকারও কালে ত্রুণ ওকার বা কা লো অভ্যাস হইয়া যাইবে, কিন্তু এখন তাহা হয় নাই, তাই গোলমালও অনিবার্য। এতাদৃশ স্থানে অকার বা ওকারের উপর একটা বিশেষ চিহ্ন দিলেই ধ্বনি বা বর্ণ কাহারো সম্বন্ধে কোনো গোলমাল না। পাঠকগণ ইহা অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিবেন। অনেক ভাষাতে এই উপায়েই ভিন্ন-ভিন্ন ধ্বনির প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯। বিশেষ চিহ্নের ব্যবস্থা করিলে সর্বত্রই তাহা প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হইবে না। ইংরেজী hate, happy ও harm শব্দের a-র ধ্বনিগত পার্থক্য আছে, এই পার্থক্য হ্রস্বত করিবার জন্য hate ও harm-এর aকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া যথাক্রমে ā ও ā লিখিবার পদ্ধতি আছে। কিন্তু সাধারণত তাহার প্রয়োজন হয় না। আমাদের অভ্যাস বা পরিচয় থাকিতে চিহ্ন দিয়া না লিখিলেও hate ও harm শব্দে a-র ধ্বনি আমরা ঠিকই করিয়া থাকি। বাঙালিতেও আবশ্যক স্থলের জন্য এইরূপ কয়েকটি চিহ্ন ঠিক করিয়া লইতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে অগ্রণী করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ইহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

২০। কয়েকটি অবাস্তব কথা বলিয়া ফেলিলাম। আবার এটি কথা বলি। রামানন্দ বাবু বলেন বাঙালার হ ও আ (অন্তরূপ হ ও মা) খা ও আ (অন্তরূপ খা ও মা) বলিয়া বস্তুত যে ধ্বনিটি প্রকাশ করার ইচ্ছা করা হয়, তাহা ইংরেজীতে লিখিলে hawā, khāwā। তিনি ও লিখিয়া এই wa'র ধ্বনিই প্রকাশ করিতে চাহেন। কখনো হইতে পারে তাহার একটা লেখায় railway কথটি রে ল ও লিখিত হইয়াছে। তবেই দাঁড়াইতেছে, তাহার মতে w=ও। কিন্তু এই ওকারে সংস্কৃত বর্ণমালার ওকার নহে। তিনি শ্রাবণের প্রবাদীতে ইহা লিখিয়াছেন—“আমি বলি ‘দেও’ কথটির ‘ও’ ‘u’-এর মত। একটি স্বর-বাক্সের যোগ-জাত মিশ্রবর্ণ।” তাহাই যদি হয়, তবে ও ওকারে অর্থাৎ w-সদৃশ একটী স্বরবাক্সনামক যকারাদি দ্বারা বর্ণে আকার-ওকারাদি স্বরের সংযোগ কোনোরূপে হইতে পারে না; তাই ও ও, ও ও প্রভৃতি লিখিতেও কোনো বাধা নাই।

* উচ্চারণের সৌকর্য্য বা সৌকুমার্যের জন্য শব্দের মধ্যে কোনো বর্ণের আগমকে Epenthesis বলে।

গোল উঠিয়াছে পূর্ব বায়ানন্দ বাবু ও-হিচ ওকারের যত্ন-পরিচয় না পাওয়ায়।

২১। এান কথা হইতেছে *W*কে বাঙলায় ও-হিচ প্রকাশ করা নত কি না? *V* ও সংস্কৃত *v* (স্বত্ব) * সমান। ভাষান্তরে বেথিতে পাঠ *w*-এর ধ্বনিও নত্বা প্রকাশ করা হয়। হিন্দীতে, *v* এল বে নিমিত্ত হয়। ইংরেজীনির্ণয়ের নিকট স্তবিত্তে পাই, *V* ও *w* পরস্পর এতদূর যত্নপূর্ণ যে, অনতিবর্তপূর্বে ঐ উভয় বর্ণ নির্বিশেষে অক্ষর হইত, পরে যত্নধান ও যত্নাচ্ছ পুস্তকে ঐ-দুই-স্বর্ণ-যুক্ত পদ-সমূহকে পৃথক-পৃথক করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে, বিশেষত লণ্ডনে, অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে নাকি বহু স্থানে ঐ উভয় বর্ণের ভেদ দেখা যায় না। তাহার *weal* স্থানে *veal*, বা *veal* স্থানে *weal*। এবং *wine* স্থানে *vine*, বা *vine* স্থানে *wine* বলিয়া থাকে। *v* ও *w*-এর মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকিলেও তাহার মধ্যে যেটুকু ভেদ আছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলে যে, বুঝি ভাল হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এ যত্ন বাঙলায় ঐ দুই ধ্বনির ভ্রম দুইটি বর্ণেরই প্রয়োজন। কিন্তু *Railway*-এর ধ্বনি রেলবে শব্দে কি প্রকাশ হয় না? *Walk*কে বাকু এবং *wine*কে বাই ন লিখিলে কি চলে না? আবার মনে হয় ঠিক চলে, (তবে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা প্রশংসা)। অতএব দেখা যায় *v* ও *w* উভয়েরই দ্যোতকরূপে বধিলে সাধারণত বাধে না। কিন্তু স্থানবিশেষে বাধা আসে। যেমন *wine*=বাই ন, *vine*=বাইন। এতদূর স্ত্রে বাঙলায় কোনো ভেদ থাকে না, অবশ্য থাকা উচিত। এই ভেদ রক্ষার জন্য *v*-এ কোনোনা একটু বিশেষ চিহ্ন দিলেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যাইতে পারে।

২২। *v*-এর বহির্ভূত *w*-র ব-কে একটু বিশেষ চিহ্ন দিয়া যখন আর একটা বর্ণ করিতে হইতেছে, তখন তাহা না কথি *w*-র ভ্রম ও-বর্ণকেই ধরা হইত কি না কেন? উত্তরে বলিতে পারা যায়, ও পূর্বে হইতেই সংস্কৃতের ওকারের ধ্বনির দ্যোতকরূপে এককাল প্রসিদ্ধ আছে, ইহাকে আর-একটি ধ্বনির দ্যোতক বলিলে, উভয়ের গোলমাল অবশ্যস্তম্ভী। যদি বলা হয়, ওকার-ধ্বনির ব্যঙ্গক ও-বর্ণে আকার-ইকাবদি স্বর-সংযোগ হয়, আর *v*-এর ওকারে ঐ স্বর সংযোগ হয়, ইহাতেই ভেদ বুঝা যাইবে। তাহা হইলেও হব না। যে স্থানে *w*-র ও-এ আকারদি স্বর যোগ কথিবার প্রয়োজন হইবে না, সেখানে ও-ধ্বনির ও এবং *w*-র ও, এই উভয়ের পার্থক্য জানিবার উপায় নাই। অতএব যে-কোনো একটু চিহ্ন দিয়া উভয়কে পৃথক করিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে *w*কে ব বলিয়া ধরা অপেক্ষা ও ধরায় বিশেষ কোন লাভ হইল না।

২৩। ত্রিতীয়ত, আর সব বর্ণ ছাড়িয়া *w*কে ও-আকারের ধরিতে যাই কেন? হয় ত ইহার সহজ উত্তর, *w* আর ও, এই দুইটি বর্ণের খুব সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য অবশ্যই আছে, সাদৃশ্য অনেক রূপের হয়, কিন্তু *w*-এর প্রতিনির্ণিরূপে বা তাহার স্থলে ওকে বসিতে পারা যায়, অপর কথা *w*-র ধ্বনিক ও প্রকাশ করিতে পারে, একগ কোনো সাদৃশ্য আছে কি?—*w* আর ও এই উভয় বর্ণের ধ্বনি কি একরূপ? যে-কোনো ব্যক্তি উত্তর করিবেন “না।” অতএব *w*-র ব্যঙ্গকরূপে ও ধরা ঠিক নহে। সংস্কৃত বর্ণমালায় মধ্যে যদি কোন বর্ণকে এইরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা ব-ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

২৪। তৃতীয়ত, *w*-র ধ্বনির ব্যঙ্গক বর্ণটি স্বর-ব্যঙ্গন এই উভয়রূপ হইবে, যেমন সংস্কৃতে *v*, *v*। তাহা হইলেই তাহাতে প্রয়োজনানুসারে সমস্ত স্বরই বোজনা করিতে পারা যাইবে। রামানন্দ বাবু নিজেও তাহা বলিয়াছেন (‘‘দেও’’ কথাটির ‘‘ও’’ *w*-এর মত একটি স্বরব্যঙ্গনের যোগদ্বারা বিশ্রবর্ণ)। অতএব সংস্কৃত বর্ণমালায় মধ্যে সেই ধ্বনি সূচনা করিতে পারে একগ যদি স্বর-ব্যঙ্গনাত্মক কোনো বর্ণ থাকে তবে তাহাই গ্রহণ করা উচিত। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণটি ব-ভিন্ন অক্ষর হইতে পারে না। কারণ, *w*-র ধ্বনিকে ব-বতনুর প্রকাশ করিতে পারে, অপর কোনো বর্ণই ততদূর পারে না। বলা বাহুল্য ও স্বর-ব্যঙ্গনাত্মক বর্ণ নহে। ইহাকে সেইরূপ ভাবিয়া লইতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে তেমন যুক্তি নাই।

২৫। অধিক যোগেশ বাবু প্রশ্ন জিজ্ঞাসাছেন—‘‘মা-র’’ না ‘‘মায়ের’’? তাহার বহু উত্তর দাঁড়াইয়াছে—‘‘মায়ের’’। ইহা কতকটা ঠিক, সম্পূর্ণ ঠিক হইতেছে মা এ র। প্রাচীন বাঙলায় ঠিক এই প্রয়োগ দেখিয়াছি—

‘‘মা এ র গর্তপাত ছল করিখা।’’

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৪ পৃ.

মাতা=মা আ=মা, মা+এ র (কের)=মা এ র। এইরূপ পাদ =পা অ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ১৩২ পৃ.)=পা, পা+এর=পা এ র (ঐ, ১৩৪ পৃ.) (পূত্র=পূত্র=) পোত্র=পো অ (ঐ, ৪৪ পৃ.) পো, পো+এর=পো এ র (ঐ, ৫০ পৃ. ৬১)। এইরূপ গা এ র লেখাই সমস্ত-তর। ইহাও (গাত্র=গত=) গাত্র=গাঅ=গা, এবং তাহার পর গা+এর=গাএর, গাঅ+এব হইতে নহে। যোগেশ বাবু বলিয়াছেন প্রাচীন প্রয়োগ না মের আছে, থাকিতে পারে, কিন্তু ইদৃশ স্থলে য-প্রতি আছে বলিয়া মনে হয় না, তাই যের অপেক্ষা এর লেখাতেই আবার পক্ষপাত বেশী।

২৬। যোগেশবাবু বাঙলায় মে মে, মা ইয়া প্রভৃতি শব্দের অর্থ করিতে চান মাতৃ-সদৃশ। ইহা ঠিক। অনেক স্থলে ইহা আশ্রিত বলিয়াছি। পালির মাতৃ-গা ম, বৌদ্ধ সংস্কৃতের মাতৃ-গা ম, এবং মালবের পশ্চিম ভাগে প্রচলিত তি রি মাতৃ (—স্ত্রী-মাতা) শব্দ ইহাই সম্বন্ধে বলিতেছে।

২৭। যোগেশবাবু বলিয়াছেন, ‘‘পূর্বকালে ইয়া-প্রত্যয়ান্ত শব্দ (যথা, ‘‘করিয়া’’ ইত্যাদি) ই-প্রত্যয়ান্ত ছিল, তখন ছিল ‘‘হই,’’ ‘‘করি’’ ইত্যাদি অন্তরাধে ই।’’ আবার মনে হয় ইহা বিপরীত, পূর্বে ই ই ছিল, পরে ই হইয়াছে। প্রাকৃত ও গাথা আলোচনা করিলে ইহাই বলিতে হয়। শিফা-সমুচ্চয়ের (২৮৭ পৃ.) আধা-বালোকন সূত্র হইতে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐষ্টব্য পালিপ্রকাশ :—প্রবেশক, ৫৫ পৃ.)

‘‘ভত্তেহ পুজাং করিম।’’

এখানে আনন্তর্য্য বোধক স্বা অথবা য প্রত্যয় স্থলে প্রাকৃতে ই য করিয়া ক রি য পদ হয়, তাহার পর য-লোপে অ হইয়া ক রি অ হইয়াছে। কালক্রমে আবার অকারেরও লোপে বাঙলায়, এবং, যোগেশ বাবু যোগ বলিয়াছেন, আসামী, মৈথিলী ও ওড়িয়াতে ই প্রত্যয় হইয়াছে।

২৮। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন ‘‘যদি প্রাচীন বাঙলা হইতে সেন মহাশয় হইলে ও দেখাইতে পাবেন, সেটা নতুন আবিষ্কার হইবে।’’ বীরেশ্বর বাবু এখনো নীরব আছেন দেখিয়া আমার নজরে বাহা পড়িয়াছে দেখাইতেছি, আমি বাঙলা লিখিয়া থাকি :—

(১) পিঙ্গল=পিঙল

‘‘অবগে চকল,

মকর কুণ্ডল

পিঙ্গল পিঙল বাস।’’

গোবিন্দদাস (বৈষ্ণবপদাবলী—বহুমতী, ২৫২ পৃ.)

* প্রচলিত দেবনাগর-অক্ষরসারে যত্নপূর্ণ বকে আমি ব (ব), এবং বগীর বকে ব (ব) লেখাই স্ববিধা মনে করিয়া তাহাই করিয়া থাকি। এই প্রবন্ধের অবশেষে হানে এই স্মৃতি রাখিতে হইবে।

(২) ভাস্কর্য=ভাঙায়

“সুবর্ণ চম্পকমালা দোলে উড়ে যায়।

মধুর চলনি মত্ত করিবর ভাঙায়।”

জ্ঞানদাস, ঐ ১৬৮ পৃ.।

(৩) ভাস্কর (ভঙ্গ)=ভাঙ

“যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।

তাঁহা তাঁহা উছলই কালিনী-হিমোল।”

গোবিন্দদাস ঐ ২১০ পৃ.

(৪) ভাস্কর=ভাঙল

“নাহ-দরশ-স্থ বিহি কৈল বাদ।

আঁকুরে ভাঙল বিনি অপরাধ।”

বিদ্যাপতি ৪০৫ পৃ. (সাহিত্য-পরিষৎ),

মুদ্রিত পুস্তকের বানান বিকৃত কি না বিচার্য।

২৯। যোগেশ বাবু বলিয়াছেন ষা মী শব্দকে “ভূভারতে কেহ সামী

বলে না।” কিন্তু প্রাকৃতিক বরাবরই এইরূপ হইয়া আসিতেছে, এবং এইরূপ হওয়াই নিয়ম। ষা মী, ষা দু, ষা গ ত, ষা ম, ষা না প্রভৃতি শব্দ প্রাকৃতিক যথাক্রমে সা মী, সা উ, সা গ ত, সা ম, সা না প্রভৃতি হয়। বাঙলাতেও সেই উচ্চারণ আসিয়াছে এবং প্রাচীন বাঙলায় এরূপ ভাবে লিখিতও হইত দেখা যায়। সা মী শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একাধিকবার (পৃ. ১২, ২৪, ২৫, ৪১) প্রযুক্ত হইয়াছে। জা ল (বৈদিক সাহিত্যে জা ল) অথবা জা ল ক এইরূপেই বঙ্গোপে শা লা হইয়াছে। কোনো-কোনো স্থলে ষা মী আবার দো আ মী উচ্চারিত হয়। এবং সাহিত্যেও ইহা ধরা পড়িয়াছে—“সো আ মী ঘরেত নাহি চিত্ত বে আ কুল।”—দৈর্ঘ্য মর্ন্ত্যার পদাবলী, গৃহ স্তব, আবরণ, ১৩২৩, ১১২ পৃ.।

হরিশ্চন্দ্রপুর,

৪ আশ্বিন, ১৩২৩।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য।

“ঘবন” হরিদাস

গত মাসের প্রবাসীর কষ্টিপাথরে “ঘবন হরিদাস” নামে একটি প্রবন্ধের সার উদ্ধৃত হইয়াছিল। প্রবাসীতে “ঘবন” শব্দ ব্যবহারে ক্ষুদ্র হইয়া শ্রীযুক্ত আহমদ-আলী দেওয়ান প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

আমরা কোনো জাতি বা ধর্মকে অবজ্ঞা করা অজ্ঞায় মনে করি। ঘবন শব্দ গ্রীক Ionian শব্দজ; ঐ শব্দে ভারতের পশ্চিম দেশ হইতে আগত অনেক জাতিকে বুঝাইত—প্রধান গ্রীক ও পারসিক মুসলমান জাতি। অধিকন্তু হরিদাস “ঘবন হরিদাস” নামেই প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও বৈষ্ণব-বঙ্গ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সূতরাং তাঁহার নামের সঙ্গে ঘবন শব্দ ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। হরিদাস ঘবন বণিয়া নিজেই নীচ স্বীকার করিতেন, ইহাও প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে আছে। তখনকার কালের ধারণা এরূপ থাকতে ও বিনয়-বশতঃ হরিদাস এরূপ করিয়া থাকিবেন। সেই প্রদক্ষেই নীচ ঘবন বলা হইয়াছে—অজ্ঞভাবে নিন্দা বা অবজ্ঞা করিয়া নহে।

বিশেষতঃ, ঐ প্রবন্ধ অপর স্থান হইতে উদ্ধৃত, প্রবাসীর নিজস্ব নহে।

প্রবাসীর সম্পাদক।

ভারতের স্থাপত্য

যে ভারতবর্ষের অন্তঃস্থলে বিকশিত অম্লান কমণ্ডিত মত তাজমহল বিরাজ কবছে, তাকে স্থাপত্য-শিল্পের পীঠ-স্থান বলেও অত্যাক্তি কবা হয় না।—কিন্তু, বলতে বটে বোধ হয় যে এখনকার সভ্যতার ভ্রান্তদান প্রসিদ্ধ কলিকতা নগরীর দিকে যখন আমরা তাকাই তখন প্রাচীন কীর্তিগুলির বিষয় স্মরণ কবে যেমন উল্লাসে গৌরবে বুক ভরে ওঠে তেমনি এই আধুনিক সহরের অত্যন্ত দৃষ্ট দ্বাবাভীশুলা দেখে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাপত্যের জন্তে কোন আশাই মনে স্থান পায় না। প্রাচীন ভারতের সংখ্যাভীত রমণীয় স্থাপত্য-রচনা—আর এখনকার বৈষ্ণব সহরের ইটকাঠের কতকগুলি পায়বার খোপ—যেন কতকগুলি প্যাক-বাল্ল বা দেশলাইএর বাস্ম উপবাস্তুর সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে! আমরা কলকাতা সহরে ইষ্টক-হস্ত্যের মধ্যে বৈদ্যুতিক পাথার তলায় বরফজল খেতে খেতে ভাবি P. W.D.’র তৈয়ারী সরকারী বিল্ডিং-গুলি বা বেসরকারী রেলওয়ে-ষ্টেশন-ভবনগুলিই স্থাপত্যকলার একমাত্র চরম ও পরম! আমরা গুড়ের মাঠের মল্লমেণ্টের দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে বসে থাকি। কলকাতায় দেশী কতশত ধনী ব্যক্তি বিলাতী স্থাপত্যের বস্তাপচা গুঁড়া নমুনায় বাড়ী ঘর তৈরী করাতে ঝুড়ি ঝুড়ি অর্থ ও সামর্থ্যের অপব্যবহার করচেন—আর দেশের সকল প্রাচীন আদর্শ স্থাপত্যগুলি ক্রমশই অযত্নে ও অজ্ঞাতে ধরাশায়ী হবার উপক্রম হচ্ছে—এমনি আমাদের অবস্থা! আমাদের স্বদেশ-সেবক হতে হলে এটা জ্ঞানতেই হবে যে, সকল শিল্পের মধ্যে স্থাপত্যই জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে প্রধান। সকল দেশে সকল কালে প্রত্যেক জাতি এই স্থাপত্যের পাথরের ভিতের উপবেই তাদের সভ্যতাবিষয়-নিশান উড়িয়ে গেছে। তাই আজ আমরা ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যগুলির মত ইউরোপীয় প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট সহরগুলি থেকে রোম ও গ্রীসের এবং পিরামিড প্রভৃতি থেকে প্রাচীন ইজিপ্টের স্বপ্নের কত না নিগূঢ় পরিচয় পাচ্ছি।

সুন্দর ও স্বগঠিত স্থাপত্যে যেমন মনকে প্রসংবিত

করে দেয় তেমনি আবার কদম্ব স্থাপত্যে হৃদয়েব স্মৃতি ও দীনতাই আনে। যে দৌভাগ্যবান স্বন্দর গৃহে বাস করেন তিনিই যে শুধু স্থখী হন তা নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যকলা যারা যারা দেখবার সুযোগ পান তাঁরাও ধন্ত হন! সত্রাট সাজাহানের ভাগ্যে তাজমহল নির্মাণের যারা যে আনন্দ, তাঁর সেই অনরকীর্তি যুগে যুগে তার চেয়ে কত বেশী আনন্দ কত দেশের নরনারীকে দিয়ে আসচে তার কি ইয়ত্তা আছে!

আজকাল আমাদের দেশে যেমন দেশী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সৌভাগ্যক্রমে কিছু কিছু আদব হচ্ছে; এমন যদি কিছুমাত্র স্বন্দর স্থাপত্যের প্রতি না দিতে পারি তা হ'লে আমরা কিছুতেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবো না—এবং ফলে সবই বৃথা হবে। চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য—এদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। দেশের চারু-শিল্পে সমগ্রতা আনতে হ'লে এই তিনেবই সমাবেশ চাই। স্কন্ধির মধ্যে যেমন মুক্তা থাকে, তেমন স্থাপত্যই চিত্র ও ভাস্কর্যের আবার, আবার চিত্র ও ভাস্কর্যই স্থাপত্যের বসন ও ভূষণ; এগুলি না থাকলে আভরণ-ও-অলঙ্কারহীনা স্বন্দরীর ত্রায় স্থাপত্য নগ্ন ও ত্রীহীন হয়ে পড়ে, সে স্থাপত্যের কোনো মানে থাকে না। আমাদের ইলোরা অজন্তা বাঘগুহা প্রভৃতি প্রাচীন মঠ ও মন্দির-গুলিতে তাই স্থাপত্যকলার সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্র ও ভাস্কর্যের সমাবেশ দেখা যায়।—ইউরোপেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দেখা যায়, যে-কোন ধরনের চিত্র বা ভাস্কর্য যে-কোন স্থাপত্যের সঙ্গে জোড়া লাগাতে গেলে কখনই মিশ খায় না—জোড়ের মুখে দাগটা বিকট আকারে প্রকাশ পায় মাত্র। তাই আমরা দেখি যে দেশী চিত্র বা ভাস্কর্য যদি তরুণশ্রুত দেশী রীতিতে তৈরী গৃহে স্থান না পায় তাহলে ধুতিচামরের সঙ্গে ছাট-কোটের মত চোখ ও মনকে শুধু পীড়াই দেয়।

স্থাপত্যকলার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের দেশের গৃহের আসবাবপত্রেরও ঘোরতর পবিতর্কন ঘটেচে। আজকাল আব সে সাধাসিধে সুরুচির পবিচায়ক তাকিয়া-খাসগেলাসে সজ্জিত গৃহ আমাদের তেমন করে সহজভাবে আস্থান করে না—এখন ভিজিটিং কার্ড দাখিল করে অতি সঙ্কোচে

ও সম্বর্ণে বিলাতি ফার্ণিচার ও ক্রোটন-গাছের টবে সজ্জিত অগণিত আসবাবপত্রের নোকানঘরের ত্রায় ড্রয়িংরুমে প্রবেশাদিকার লাভ কবা যায়। অবশ্য বৈচিত্র্যই যুগের ধর্ম, কিন্তু রসবোধ সকলকালে সকল সময়েই একরূপ হওয়া উচিত—কোনটা স্বন্দর কোনটা অস্বন্দর এ বোধটা আমাদের তাই বলে লোপ পেলে তো চলবে না? একবার মনে পড়ে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে গোলদিঘিতে সন্ধ্যাজয়ণে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল দিঘির পূর্বপাশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের দেশী স্থাপত্যের রীতিতে নির্মিত পদ্মানীত একটি তেতলা বাড়ী; আবার তারই পশ্চিমে বিপরীতদিকে পাশ্চাত্যের অতি স্থল বিরাট সিনেটহলের মোটা-মোটা গথিক ধরনের খাম দিয়ে সাজান হলটি। আমরা দেখলুম দেশী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমপাশে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের গুরুধ্বজা বহন করে দাঁড়িয়ে আছে, আর দেশী স্থাপত্যকলাকে বিদেশী পাশ্চাত্য মিশনারীরা সাদরে গ্রহণ করেছেন—বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! আমাদের দেশী স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য বিদেশী মিশনারীর হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, কিন্তু আমরা 'চোখে দেখেও প্রাণে কাণা' হয়ে বসে আছি। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথটি পদে-পদে স্মরণ হয় যে আমরা—'বাঙালীরা আত্মবিস্মৃত জাতি।' সমগ্র ভারতের মধ্যে আধুনিক স্থাপত্যকলা সর্বদে পর্য্যালোচনা কবলে দেখা যায় যে আমাদের বাঙলা-দেশই সবচেয়ে নিজেদের বেশী ভুলে বসে আছে। ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমে এখনও দেশী স্থপতির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় এবং বিশেষ নতুন কিছু না করলেও তারা বংশানুক্রমে তাদের প্রাচীন প্রথাহুযায়ী সমস্তই বজায় রেখে এসেচে, কিন্তু আমাদের দেশে স্থপতির নামগন্ধও শুনতে পাওয়া যায় না। যদি কখনও আমাদের দেশে কচিং কারও দেশীধরনের দেবালয় বা এমন একটা কিছু তৈরী করাবার আবশ্যক হয়, তা হলে উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতের চারিদিকে স্থপতিসংগ্রহের জন্তে প্রদক্ষিণ করে বেড়াতে হয়, হাতের কাছে পাওয়া যায় না—এ বড়ই দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। মাত্র শতবৎসর পূর্বেও আমাদের দেশী ভদ্রাসন যারা তৈরী করত তাদের আর চিহ্নও পাওয়া যায় না। পূর্বে যে-সব প্রাচীন পল্লীতে ধনী

গৃহস্থদের নাচঘর, ঠাকুরদালান, নাটমন্দির ইত্যাদিতে নানারকম খিলান ও নক্সার কাজ প্রভৃতি হতো তা একেবারেই লোপ পেয়ে গেল!

এইপ্রসঙ্গে আজ বলতে বড়ই আনন্দ হচ্ছে যে আমাদের দেশের মহাত্মা বিজ্ঞানার্চাধ্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর স্বোপাধিকৃত সমস্ত অর্থ দিয়ে যে বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দিরটি তৈরী করান তা সেটি যথাসম্ভব দেশী ধরনের ও স্বদেশী কারিগর দ্বারা করানো হচ্ছে। আশা করা যায়, তাঁর এই শুভ অমুষ্ঠানের দৃষ্টান্তের দ্বারা অমুপ্রাণিত হ'য়ে ভবিষ্যতে আরো অনেক দেশী স্থাপত্যের সৃষ্টি হবে।

সম্প্রতি কোন বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রে রাধানগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের যে স্মৃতিমন্দিরটি হবে তার একটি নক্সা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সেটি কোনমতেই অনুমোদন করতে পারি না। বিশেষতঃ আমরা যখন কোন স্বদেশী মহাত্মার স্মৃতি রক্ষা করতে চাই তখন এরূপ খাপছাড়া একটা তৃতীয় শ্রেণীর বিলাতি হলের মত মন্দির প্রতিষ্ঠা কখনই আমাদের কলনায় ও উদয় হওয়া উচিত নয়। দেশী মহাত্মার কীর্তি আমাদের দেশের সকলের মনের মধ্যে যে মন্দিরটি স্বতই প্রতিষ্ঠা করচে—আমরা তারই ছাপ স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে দেখাতে চাই। অর্দ্ধশতাব্দি পূর্বে ভারতবর্ষ তরুণ ইউরোপীয় সভ্যতার মাদকতায় যখন গস্ত, সেই সময়ে স্বদূর ইংলণ্ডে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় নিজ ব্যয়ে বৃষ্টলে মহাত্মা রামমোহনের সমাধিটি স্বদেশী স্থাপতির চারুশিল্পে শোভিত করে রেখে গেছেন—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজ এই ভারতশিল্পের নবজাগরণের যুগে রামমোহনের জন্মভূমির স্থপত্যনৈরা এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তাও করছেন না।

এখন আমাদের দেশে স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কার অনেক করা হচ্ছে সত্য, কিন্তু সেগুলিকে আবিষ্কারকের পুঁথির মধ্যে বদ্ধ করে বা যাদুঘরের গুদামে পচিয়ে রেখে লাভ কি? আমাদের মনে হয় যে এই-সকল সুন্দর সুন্দর প্রাচীন কীর্তিগুলি যদি আমাদের কিছুমাত্র অমুপ্রাণিত না করলে তাহলে এই-সকল আবিষ্কার ও মাটি খোঁড়ার প্রয়োজন কি? আমাদের জিনিসকে আমাদের মাটি থেকে ধুলো বেড়ে

তুলতেও হবে এবং গ্রাহ্যও করতে হবে। আমরা জোর করে একথা বলতে পারি যে আমাদের এই-সকল প্রাচীন স্থাপত্যকলার মধ্যে যাকিছু সত্য ও সুন্দর তাই তা একদিন জগতের মধ্যে নিজের স্থানটি অধিকার করে নেবেই এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে দেশকেও ধন্য করবে। সৌন্দর্যের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেবার কাহারও প্রয়োজন হবে না। অবশ্য এখনকার যুগের যাকিছু অবশ্যসি পরিবর্তন তা আপনা থেকেই ঘটবে—কেউ সে কার্য পরিবর্তিত আবর্ত-চক্রকে উল্টা দিকে ফেরাতে পারবে না। তাই আমাদের এখন সে বিষয়ে চিন্তা না করে এতখানি বিবেচনা করেই নিজেদের স্থাপত্যকলাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে, তাতে যদি স্থপতিদের পাশ্চাত্য এঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপনও করতে হয় তাহলে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। এককালে যেমন মোগল ও পারসিকেরা এসে আমাদের স্থাপত্য-শিল্পে একটা বিশেষ রং ধরিয়ে গিয়েছিল—অর্থাৎ আবার এই বৈজ্ঞানিক যুগে ইউরোপীয় আবহাওয়ায় আবার তেমনি অবিকৃত ভাবে দেশী স্থাপত্যের মধ্যে বিশেষ একটা ছাপ যা পড়বে তা আমাদের শিরোধার্য বলে নিতেই হবে—কিন্তু তাই বলে এরূপ সমূলে বিনাশ হতে দেওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। এখন আমাদের ইউরোপীয় স্থাপতির শেখানো রোমক করিষিয়ান প্রভৃতি যথাসম্ভব ভুলে যেতে হবে—এখন আমাদের সবদিকে সামঞ্জস্য ও স্বদেশী ভাবে নবজাগরণের পালা।

স্থাপত্যের মধ্যে প্রত্যেক যুগের বৈচিত্র্যের ছাপ থাকবে বটে, কিন্তু তার মধ্যে রস-সৌন্দর্যটি অনন্তকাল ধরে সকল নরনারীকে সমানভাবে মুগ্ধ করবে—সে-সময় তার কালকাল পাত্রাপাত্রের বিচার থাকবে না। স্থাপত্যের ভিতর যদি এতটুকু কৃত্রিমতার চিহ্ন থাকে তা হলে তা জগতে কখনই স্থায়ী হ'তে পারে না। এখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে শুধু প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে স্থাপত্যের বিচার করলে চলবে না—কেননা স্থাপত্য শুধু একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণারই জিনিস নয়, ওটি জাতীয়-সুন্দর এবং ওর বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুধু বসবাসের স্ব-সুবিধার অমুপ্রাণিত গৃহনির্মাণ করা নয়, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে গঠন-সৌন্দর্য ও শিল্প-স্বভার ব্যঞ্জন্যও প্রয়োজন আছে।

দেখা যায়, এদেশে প্রাচীনকালে স্থাপত্যকেও অগ্রাঙ্ক চাকশিল্পের ন্যায় ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল। বেদ-পুরাণাদিতে এবং স্থাপত্য সম্বন্ধে ‘বিশ্বকর্মাপ্রকাশ,’ ‘শিল্পশাস্ত্র,’ ‘জ্ঞানরত্নকোষ’ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে স্থপতিদের জ্ঞাতব্য মাপ-প্রমাণাদি নানান তথ্য দেওয়া আছে। এমন কি কিরূপ জমির উপর কোন্ সময়ে কোন্ দিনে গৃহনির্মাণ আরম্ভ করা হবে এ-সকলেরও উল্লেখ আছে। কথিত আছে, বাড়ীর জমি পূর্বেদিকে ঢালু হলে গৃহস্থের সৌভাগ্য, কিন্তু পশ্চিমে ঢালু হলে গৃহস্থেরই হানি। এখনকার দিনে এ-সকল খুঁটিনাটি যুক্তিতর্কে যদি না টেকে ত না মানলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু পশ্চিমের দিকে গড়িয়ে পড়া সম্বন্ধে শাস্ত্রের নিষেধ মেনে চলাই আমাদের কর্তব্য বোধ হয়। ধর্মের বর্ষ পবিত্রান করে আমাদের শিল্পকলা মোগল প্রভৃতির আমল থেকে বহুকাল আত্মবক্ষা করে এসেছিল। দেশের অন্তরের পরিচয় যেমন ধর্মে তেমনি শিল্পেও পাওয়া যায়। তাই জাতীয়তা বজায় রাখতে হলে শুধু ধর্মের দ্বারায় নয়, শিল্পকলারও সহায়তার দরকার। আমরা জাত বাঁচাতে ব্যস্ত, কিন্তু জাতীয়তাকে রক্ষা করতে পারি না। ভয় হয় কোন্দিন আমরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মল্লমেট তৈরী ক’বে না বসি।

ভারতের পশ্চিম প্রদেশে রাজপুত রাজাদের আধুনিক দেশী ধরণের সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, উড়িষ্যার ও বৃন্দাবন প্রভৃতির আধুনিক দেশী স্থাপত্যগুলি দেখলে যেমন আশার উদয় হয়, তেমনি বাঙলায়ও যদি দেশী স্থাপত্যশিল্পের আদর কিছুমাত্র দেখতে পাই তা হ’লে বোঝা যাবে যে আমরা স্বদেশ-প্রেম যে কি বস্তু তা কিছু হৃদয়ঙ্গম ক’বেচি।

সকলেই জানেন যে ভারতশিল্পের প্রবর্তক মিঃ হ্যাভেল ও বিলাতের ন্যূনাধিক দেড়শত গণ্যমান্ত পদস্থ ব্যক্তি ও শিল্পী মিলে যাতে দিল্লীর নতুন সহবটি ভাবতীয় স্থাপত্য-রীতিতে দেশী কারিগরদের দ্বারা তৈরী করানো হয় সেই ক্ষণে সম্রাটের ভাবত-বিভাগের প্রধান সচিবের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন, কিন্তু সেই আবেদন দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রাহ্য হয়নি। মিঃ হ্যাভেল প্রভৃতি মহোদয়গণের আশা ছিল যে মোগল-দরবার থেকে ভারতের স্থপতিরা যে সহায়তা লাভ করে এককালে তাজমহল প্রভৃতি রমণীয় প্রাসাদ-

সকল তৈরী করেছিল তেমনি ভারত-সম্রাটের সাহায্যে ও উৎসাহে আবার বুঝি নতুন দিল্লীতে এই-সব স্থপতিদের বংশধরেরা কিছু কিছু কাজ দেখাতে পাবে। কিন্তু ভারতভাগ্যবিধাতারা ভারতের চেয়ে নিজেদের জাতি-বন্ধুদের যে বেশী আত্মীয় সেটা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। যদিও দেশী স্থাপত্যকলা রাজকীয় সহায়তায় সহজেই ও শীঘ্রই পুনরুদ্ধার হতে পাবতো, কিন্তু তা যখন হ’ল না তখন আমরা নিজেবাই ধৈর্য্য ও সংশ্লেষ দ্বারা আমাদের দেশী শিল্পকে জাগিয়ে তুলবো—তাতে যত সময় যত চেষ্টাই লাগুক। মিঃ হ্যাভেল তাঁর ভারতের স্থাপত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থে একস্থলে লিখেছেন যে উড়িষ্যায় রাজপুত্রের কোন একজন সাধু সম্রাসী তাঁর সমস্ত জীবনের ভিক্ষালব্ধ ধনে দ্বারা একটি বিরোহাব পাথরের মন্দির মেরামত ক’বিয়ে দিবেছিলেন।* পশ্চিমে সন্তরাস-কা মসজিদ ও পিষহরী কা মন্দির প্রসিদ্ধ। ফতেপুর-সিক্রিতে মিস্ত্রীরা প্রাসাদ নির্মাণের পর প্রত্যহ এক ঘণ্টা বেশী কাজ করে সেই প্রথম সুন্দর মন্দিরটি গড়ে তুলেছিল, আর একজন জীলোক জাঁতা পিষে অর্থ সংগ্রহ করে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরূপ শুভ-সঙ্কল্প যদি ভারতে মজ্জাগত থাকে তা হ’লে এদেশের শিল্পকলা কখনই লোপ পাবে না, বরং উত্তরোত্তর অজ্ঞাতে বাড়তে থাকবে। আমরা আশা করি এইসকল সাধুদুষ্টান্ত আমাদের মনে সর্বদা অনুপ্রেরণা জাগিয়ে রাখবে এবং আমরা সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ভুলে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেব এই শুভমিলন-মন্দিরটি দেশী স্থাপত্যে পুনরায় গড়ে তুলব। অবশ্য একান্তে অনেক যুগ, অনেক অর্থ ও অনেকের মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন—একদিনেই কিছু বোমনগরী তৈরী হয়নি।

এখন প্রাচীন কীর্তিসকল নিয়ে বড়াই করে বেড়িয়ে কোনই ফল নেই, এখন আমাদের কার্য্যেব দ্বারা সেই-সকল পূর্বগৌরব বক্ষা করবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীঅসিতকুমাৰ হালদার।

পঞ্চশস্য

প্রাচীন রোমীয় চিকিৎসাতন্ত্র—

মিनि, লিভি, ট্যালিসাস প্রভৃতির লিখিত বিবরণে প্রাচীন রোমে প্রচলিত ঔষধপত্রের কথাও পাওয়া যায়। এই-সব ঔষধের মধ্যে মুষ্টিযোগ, তন্ত্রমন্ত্র, তুর্কতাক, বোইসু আছে, আবার কোথাও ব' 'সমঃ সমঃ শময়তি' নীতির প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহাদের বিবাস ছিল যে ছাগবিষ্ঠা এবং ছাগলোষের ভাষে অশ্রারী আরোগ্য হয়। ছাগমাংস ঝলসাইয়া খাইলে মৃগীরোগ সারে। ছাগ-যকুং দৃষ্টিক্ষীণতার উপকারী। ছাগের যকুং মধুর সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে উগরী, ও ভূবির সঙ্গে খাইলে আমাশয়, ভালো হয়। মাঠে-মারা একটা ইঁদুরের দাঁত সদ্য-হত সিংহের চামড়ায় ফুটাইয়া, চামড়াখানি বঁ পায়ে জড়াইলে বঁ হাতের গঁটেবাত সারে। সলোমনের নামে মন্ত্র পড়িলেই ত্রাহিক অর আরোগ্য হয়। সম্ভারক যকুং পোড়াইয়া ভক্ষণ ও উহার বস চক্ষে প্রয়োগ করিলে রাতকাণা রোগ সারে। কাঁকড়ার চক্ষু বুলাইলে চোককুলা সারে। উত্তমরূপে 'লাঠৌষধি' প্রয়োগ করিতেই নাকি অগাঠাস নীজারের কোমরের বাত আরোগ্য হয়। গিয়াছিল। বধিরতার পিঁয়াল ও রাজহাঁসের চর্কি ব্যবস্থা ছিল। লোহা না ছোঁয়াইয়া মেহেনী কাঠে আঙী তৈরি করিয়া পরিলে কুঁচকী কোলা সারে। সূর্যমুখী ফুলের তিনটি দানা খাইলে তৃতীয়ক ও চারিটি খাইলে চারদিন অন্তর পালান্নর আরোগ্য হয়। রাঁধুনী গাছ গলায় বাঁধিলে আলুজিবেব বাধা সারে। চতুর্ধক জ্বরের আর একটা ঔষধ—গাছ হইতে তিনটি ধনে বঁ হাত দিয়া তুলিয়া স্পীড়িত ব্যক্তির নাম অরণ্য করিবে,—আর ফিরিয়া তাকাইবে না।

গাড়ীর চাকার তৈল কুজুরদংশনের ঔষধ। বিছুটি গাছে গুকের বস মাখিয়া তাহা দিয়া চাবকাইলে বাত সারে। বঁ হাতে নয়টি বয়ের দানা লইয়া কোড়ার চারিদিকে তিন বার ঘুরাইয়া আঙনে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ কোড়ার বেদনা কমে। দাড়িম ফুলের খোসা অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার সাহায্যে তুলিয়া চোকে ঘষিলে ও দাঁতে না ছোঁয়াইয়া গিলিলে এক বৎসরের মধ্যে চক্ষুরোগ হইতে পারে না। গণ্ডমালা রোগে ব্যবস্থা এই—কেহ দেখিতে না পায় এমন ভাবে ডুমুর গাছের একটা গাঁট দাঁতে কামড়াইয়া ভাঙ্গিয়া গাঁটটা একটা চামড়ার বলিতে পুরিয়া গলায় বুলোও। মেহেনী গাছের পল্লব মাটিতে বা লোহায় না ছোঁয়াইয়া শরীরে ধারণ করিলে গ্রন্থিহীন আরোগ্য হয়। মঞ্জিষ্ঠা শরীরে কবচরূপে ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে সেদিকে তাকাইলে কামলা রোগ ভালো হয়। বাউ গাছের পল্লব মাটিতে বা লোহায় না ছোঁয়াইয়া ব্যবহার করিলে আন্থিক-বেদনার উপশম হয়। বন-মঞ্জিষ্ঠা জলাতন্ত্রের মহৌষধ। নরহত্যা করা হইয়াছে এমন কোনও অস্ত্র দিয়া একটা বুনা পশু মারিয়া তাহার মাংস খাইলে অপম্মার রোগ আরোগ্য হয়।

শামুকের কামড়ের বিষ শামুকের কর্ণমলে ভালো হয়। সর্পবংশনে মমুয়াস্তুর্চুর্ ব্যবস্থা। শিশুর মাথার প্রথম-কাটা চুল লইয়া বাতের ঘরগার বাঁধিলে বাত সারে। ক্ষতের চারিদিকে শামুকের হাড় দিয়া গভী দিলে বা আর বড় হইতে পারে না। ক্ষয় রোগে হাতীর রক্ত ও মৃগীরোগে হাতীর যকুং ব্যবস্থা। কুমীরের ছৎপিও কালো পশমে জড়াইয়া ধারণ করিলে চতুর্ধক অর সারে। চোর-পশমে জড়ানো ছটি ছাত্র-পোকা রাজিকালীন জ্বরে ব্যবহৃত হইত, ও লাগ রংএর হুতী কাগড়ে জড়াইয়া দিবারে প্রয়োগ করা হইত। উলরামরে দধি ব্যবস্থা ছিল।

এই বিষয়ে আয়ুর্বেদের সহিত ঠোহার মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ১. ৩ মেচনিকফ্, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাদায় তৈল কুষ্টি চর্ম মৃশণ করে ও গায়ের রং ফরসা করে। ২. ৩ প্রস্তবণের কাদা দিয়া প্রলেপ দিলে বঁধা বেদনা সারে। ৩. ৩ পড়াইবার অস্ত্র রাইসরিষা ও কোড়া পাকাইবার অস্ত্র তিনি ব্যাধিত হইত। ৪. ৩ মন্ডা রোগীদিগকে দেবদারু ও হেমলকের হাওয়ায় রাখা হইত। ৫. ৩ আলকাতরা ও মেটে তৈল পাঁচডার ঔষধ বলিয়া বিবাস ছিল।

আমাদের দেশের প্রাচীন গৃহিণীদের মত প্রাচীন রোমক গৃহিণীরাও মুষ্টিযোগ-প্রযোগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমন কি পরিবারের কোনে পুরুষ যুদ্ধে আহত হইবা বাড়ী আসিলে তাঁহার দেবাত্ত্রশ্রমা চিকিৎসা নিমন্তই তাঁহারা করিতেন, সহজে চিকিৎসক ডাকিতেন না।

ঐ প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

*
*

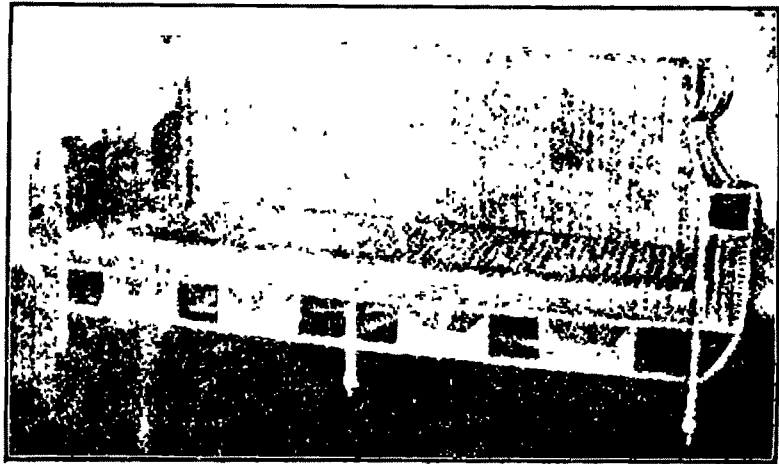
কাগজের কাজ—

কাগজ যে শুধু লেখবার কাজেই লাগে তা নয়; কাগজ আরো অনেক কাজে লাগে। কাগজ দিয়ে জিনিস মোড়ক করা আজকাল সর্বত্র প্রচলিত হয়েছে; ছাকড়ার বাঁধা পৌটলা বা দাণ-পাতার ঠোঙায় খাবার হাতে করে' রাস্তার চলতে লজ্জা বোধ হয়, বাধো-বাধো তাকে, কিন্তু তার ওপর কাগজের আবরণ চড়ায়ে নেট; ভজ হয়ে যায়। কাগজ দেবী-সরস্বতীর চরণ-শতদলের পাপড়ি, তারই ওপর সরস্বতীর চরণচিহ্ন পড়ে বলে কাগজ কি এই সম্মান দাঁত করেছে? জাপানী ও চীনারা কাগজ দিয়ে হুল্লর লঠন গড়ে; জাপানীরা কাগজের রমাল ব্যবহার করে; তারা কাগজ দিয়ে বাড়ী আর নৌকাও যে গড়ছে তার খবর ও ছবি কিছুদিন আগে প্রবাসীর পত্র-পত্র সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়েছিল। সম্প্রতি ফ্রান্সে যুদ্ধ ব্যাপ্ত মৈত্রীরে জন্ত কাগজের অন্তর্ভাব পোষাক তৈরি কববার আয়োজন চলছে। কাগজ খুব গরম আটকার; হুতরা শীতের সময় গায়ের উপরে জামার তলে কাগজের জামা থাকলে শরীরের তাপ বেরিয়ে যেতে পারবে না, বাইরের ঠাণ্ডাও গারে পৌঁছবে না। ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষৎ একটি বড় কাগজের কলে বহু পরীক্ষার পর এমন একরকম কাগজ তৈরি করতে পেরেছেন যা কাপড়ের মতন নরম ও নমনীয়, অথচ শক্ত মজবুত তেল-অবরোধক এবং স্বাস্থ্যকর (antiseptic)। এই কাগজ শণের পুরাণো দড়িগড়া কুটে তৈরি হচ্ছে। পরীক্ষার ফির হয়েছে বাঁশের মতো এই কাগজ খুব উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু ফ্রান্সে বাঁশ জন্মে না। ভারতবর্ষে বাঁশ প্রচুর, চাষ করলে আরো বেশী জন্মানো যায়, কিন্তু ভারতের লোকের নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা অব্যবহারে ম্লান হয়ে রয়েছে, দেশে বড় অধিকার না থাকতে দেশী লোকের উদ্যম চেষ্ঠা হযোগের অভাবে ক্ষুষ্টি পাচ্ছে না। যাই হোক ফ্রান্সের নবনির্মিত কাগজ দিয়ে জামার কাগজের নীচে অন্তর দেওয়া হচ্ছে, তাতে জামা দ্বিগুণ গরম হচ্ছে এবং কাপড়ের সঙ্গে থাকতে কাগজ ভাজে ভাজে ছিঁড়ে বা কেটে যাবার অথবা ঘুড়ে-হুড়ে জড়োজড়ে হয়ে থাকবার সম্ভাবনা খুব কম হয়ে যাচ্ছে। ঐ কাগজের ওপর জেলাটিন ও চর্কির সঙ্গে প্রচুর উবা-তেল মিশ্রিত বার্ণিশ করে তাকে বেশীরকম নরম নমনীয় ও জল-বাতাস-অবরোধক করা হয়। এই কাগজের তৈরি ভেট কুর্টার ওজন হয় আড়াই আউন্স মাত্র, আর ভাজ করে খুব ছোট করা যায়। এই জামার ওপর পণ্ডেরে বুপি লাগিয়ে তাকে আরো গরম করা চলে। এই কাগজে ছাত্রপোকা উকুন শিশু প্রভৃতি কোনো পোকা তিষ্ঠতে পারে না—স্বাধীন

ইউক্যালিপ্টাস তেল আর ফার্মালিড-হাইড্র মিশিয়ে তা এন্টিসেপ্টিক করা থাকে। আমেরিকাতোও কাগজের জন্য পরী প্রচলন হয়েছে—তবে সে কাগজ এমন ভালো নয়।

আমেরিকায় ও জাপানে কাগজের নথ্য লিখা ফালি পাকিয়ে দড়ি করা হয়। সেই দড়ি দিয়ে দোকানীরা জিনিসের মোড়ক বাঁধে। আমেরিকায় কাগজের তা থেকে ফালি কেটে তার পর দড়ি না পাকিয়ে কল থেকে একেবারে ফালি কাগজ তৈরি করে সেই-দেই তার এক খেঁচ পাকবার কল দিয়ে দেওয়া হয় এবং কল থেকে কাগজের দড়ি পাকিয়ে বেরিয়ে আসে। কোনো কোনো দড়িতে তুলোর পাঁচ খাটয়ে থাকিয়ে কাগজের ফালি পাকানো হয়—তাতে করে দড়ি সুদৃঢ় আঁশগুঠা ও শক্ত হয়।

কাগজের দড়ি দিয়ে কখন (lugs) বোনা আমেরিকায় খুব চলতি হয়েছে, যে-কোনো বোকারে কিনতে পাওয়া যায়। মার্কিন দেশে ৭ রাগ চৈনিব ২৫ ট কাঁচখান হয়েছে, তবু একটাতে রোড ২৫ টন



কাগজের দড়িতে বোনা আসন।

আমেরিকায় কাঠের বা বেতের কাঠানো ফ্রেমের ওপর কাগজের দড়ি বুনে বিবিধ প্রকারের হুন্ডর অথচ সম্ভা আসন তৈরি করবারও অনেক কারখানা হয়েছে। লোকে যত ঐসমস্ত আসনবাবের পরিচয় পাচ্ছে, ততই তার প্রচলন বেড়ে চলছে।

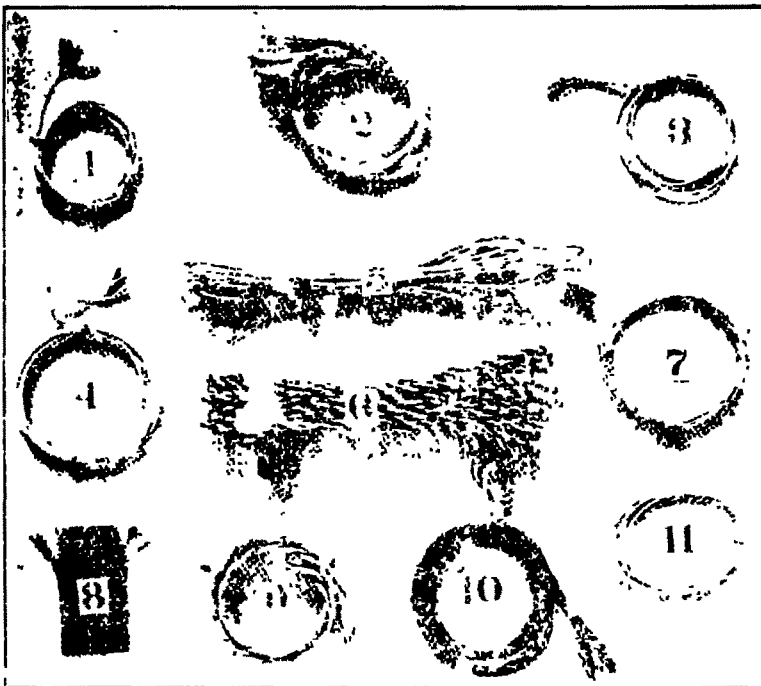
কাগজের দড়ি দিয়ে থলি থলে খোঁবা বোনা হচ্ছে। সেইসব বোরায় পোঁয়াজ কড়ি তামাক মগদা বস্তাবন্দী কবে দেশবিদেশে চালান হচ্ছে।

কাগজের দড়ি বুনে ম্যাটিং মাস্তুর করা হচ্ছে। নৌকা-টানি গুণ ও কাঁচি পয়ান্ত কাগজের দড়িতে হচ্ছে। কাগজের সূতোতে সেলাই করা চলছে, রঙিন কাগজের দড়িতে ঘর সাজাবান বালর করা হচ্ছে। কাগজের দড়ি বুনে নকল চামড়া তৈরি হয়েছে। আবার কতকি তৈরি করবার গোপন চেষ্টা ও পরীক্ষা যে চলছে তার ইয়ত্তা নেই, অল্প দিনেই দেখতে পাব কাগজেই যা-কিছু দরকারী সব তৈরি হয়েছে।

* *

সিঁড়ির মতন বাড়ী —

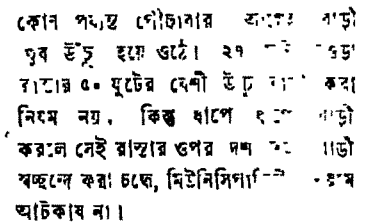
ফ্রান্সে এক মিজি স্থপতি ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতন অনেক তলার বাড়ী নির্মাণের প্রথা প্রবর্তন করেছে, সে বলে যত তলা বাড়ী, তত ধাপে সরে সরে হলে সকল তলার সকল



কাগজের নানান প্রকর সূতা দড়ি টোমাইন কাছি গুণ।

ওজনের রাগ কখন তৈরি হয়। কোনো কোনো রাগ কেবল কাগজের, কোনো-কোনোটোতে হলে বা পশম বা উভয়ই মিশ্রিত দেওয়া হয়। বিভিন্ন রঙের সূতের বুননে থেকে বা ষ্টেনসিল করে বা লাগিবে কখনের ওপর বিবিধ নগা তোলা হয়।

যে সমান হাওয়া বাতান পাওয়া যায়, প্রত্যেক তলার সামনে খোলা বারান্দা ও ছাদ পাওয়ারও সুবিধা হয়। শহরে এই ধরণে বাড়ী করলে সড় গলিতেও আলো বাতাসের অভাব ঘটে না। প্রথম তলা বাড়ী গেঁথে তার ওপর-তলা কয়েক ফুট ছোট করে



খাদ্য 'ও' ঔষধ রূপে গাটের

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ দেশ
প্রস্তুত হয় ইন্ডিয় ও বনিক্স ড্রব হ-হ,
অতি প্রাচীন কালে বিবিধ-প্রকার
মাটি ঔষধকপে ব্যবহৃত হত। ন,
ষ্ট্রোবা, ও অপরাপর গ্রীক ও রোমান
লেখকদের লেখা হতে জানা যায়,
ইটালী ও গ্রীস ও তৎসম্বন্ধিত দেশ-সমূহ
লেবনন, সামস, কিষন—হতে ঔষধ-
বিশেষ মাটি সংগ্রহ করা হত, যেগুলি
লৌহ বেনী থাকত সেই মাটিই বিশেষভাবে
সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হত। প্রাচীন লেবনন
নামজাদা চিকিৎসক ডায়োদোরসিস
হিপপোক্রেটিস ও গ্যালেন প্রভৃতি
ইতিবিদ্যা হতে পোড়া মাটি অর্থাৎ
করতেন।

শ্রোতব বড়বরের নেমেদ ১৫৬
খুব তারিফ করে উপাদেয় ১৫৬
থেকে আসদানি কান ১৫৬
র উত্তরাংশে, আসিডোনিয়া ১৫৬
লাহেম মাটি নয়দায় শিশিয়ে ১৫৬
মস্ত্রে দেই মাটি হাটে বড়ায় ১৫৬
স্তর ইটালীর ট্রেভিডো প্রদেশে, ১৫৬
কোনো কোনো প্রদেশে নিচে ১৫৬
রকন কদা মাথিয়ে পায় ও ১৫৬
গাধন-মাটি ।

পারস্তের নিম্নাপূর্ব অংশের অসিদ্ধ মাটি কাটা বা ছাড়া ও স্বগদ শিথিয়ে, খুব ভারিফ করে খাওয়া হয়। দক্ষিণ দায়ে এক জায়গায় একরকম মাটি পাওয়া যায় তাতে ম্যাগনেসিয়াম-সাল্ট ও চুনের ভাগ বেশী থাকে, তাকে সেদেশে গিল ই-গিরাহ বলে, দিখে পাউকটির খাদির করে, আর কাটাও যায়।

একিমোরা নানান-রকম মাটি প্রচুর ধায়। চীনের নানা
একরকম খিচুচ্চ মোলায়েম মাটি মুখে মেখে মুখচন্দ্রের বিবর্তিত
করে। এ রীতি বহু প্রাচীন।

ভারতবর্ষে গভীর্ণদের নানি বাণ্যের অত্যাশ খুব প্রাচীন
 রঘুবংশ কাব্যে গর্ভবতী স্থপতিগণের মুগ্ধরূতি আননের বর্ণনা
 রেখে গেছেন। কলিকাতায় বাণ্যের দ্রষ্টা পাত্ৰবোম্বাই
 বৃন্দাবনের মাধব-নাট্য প্রসিদ্ধ যোগ্য পাণ্ডিত্যে একরকম ঘৃণা
 মধ্যে ভাঙের তরকারী করে লোকের বায়।

করতে হয়, এই রবনে থাকে থাকে বাড়ী উঁচু দিকে উঠে যাবে। ফতেপুর সিক্রিতে সম্রাট আকবরের তৈরি পঞ্চমহল এই প্রণালীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ফ্রান্সের নবনির্গিত বাড়ীর প্রত্যেক তলার বারান্দা এমন কোশলে গঠিত যে উপর হতে রাস্তা দেখা যায় কিন্তু নীচের বারান্দার কিছু দেখা যায় না, এতে করে নীচের তলাব বাসিন্দাদের আশ্রয় নষ্ট হয় না। বারান্দার কিনারে লোহার রেলিং, তার মাঝে গাছের সারি, রাস্তা থেকে দেখলে লাহোরের শালিমার বাগের মতন ধাপে ধাপে বাগান উঠেছে বলে মনে হয়, এবং বড় ফুলের দেখায়। এই প্রণালীতে গঠিত বাড়ীর প্রত্যেক তলায় অপর সাধারণ বাড়ীর চেয়ে এক ঘণ্টা বেশী দিনের আলো থাকে। এই প্রণালীতে বাড়ী গড়লে প্রত্যেক তলায় খানিক খানিক জায়গা ছেড়ে ছেড়ে যাওয়াতে যেমন ঘর কম হবাব সম্ভাবনা, তেমনি নিরাপদে বাড়ীটিকে অনেক তলা উঁচু করা চলে বলে সেই ক্ষতি সহজেই পূরণ হয়ে যেতে পারে। মিউনিসিপালিটি সব গলিতে বেশী উঁচু বাড়ী কবতে দায় না। সব গলিতে যদি সাধনাসামনি দুটো উঁচু বাড়ী ওঠে তা হলে গলি অস্বাচ্ছন্দ্য ও নীচের তলার ঘরগুলো অন্ধকার সঁাতা হয়ে ওঠে—যেমন অবস্থা হয়ে আছে কাশীর গলির। সেইজন্মে মিউনিসিপাল নিষন এই যে বাড়ীর মাথা থেকে রাস্তার ওপারের সীমা পর্যন্ত একটা রেখা টানলে সেই রেখা ও বাড়ীর খাড়াই রেবার ঘরের কোণ ৪০ ডিগ্রির কম যেন না হয়। ধাপে ধাপে সরিয়ে সরিয়ে বাড়ীর তলা তুললে তাব শিখর থেকে রাস্তার ওপারের সীমা পর্যন্ত রেখা পূর টান হয় এবং ৪০ ডিগ্রি

জামশেদের স্ট্রোলোক ও শিশুরা ষড়্‌মাটির মতন একরকম মাটি (steatite) খুব আদর করে খেয়ে থাকে। যাবারপের সমুদ্রকিনারের লোকেরা এম্পো মাটি তত্ত্বি বা পুলির আকারে গড়ে বিক্রয় করে ও কিনে যায়, ঐ মাটি খেলে দেহ নাকি ছিপছিপে একহাবা থাকে, কখনো মোটা হয়ে পড়তে পারে না। মালয় ইপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত টিমর দ্বীপে পোড়া মাটি খাওয়ার পর্ব আছে; রীতিমত পূজা অর্চনা করে তবে মাটি খাওয়া হয়।

আফ্রিকার নিউবিয়া প্রদেশে ও পশ্চিম উপকূলের কতকাংশে মাটি খাওয়ার খুব প্রচলন। গিনি প্রদেশের কাক্সিরা গণ্ডেপিও কুয়াক মাটি খায়। সেনেগামিয়ার লোকেরা শাদা সাবানের মতন মোলায়েম খিচুন্ত মাখন-মাটি দিয়ে খাবার প্রস্তুত করে। নিউ-গিনির ও মেলা-নেসিয়া দ্বীপের বাসিন্দারা সবজি রঙের সাবান-মাটি খায়; নিউ-ক্যালিডোনিয়ার লোকেরা লোহার মচের রঙের লোহাসংযুক্ত মাটি কাঁচা বা পিষ্টকাকারে শুকিয়ে খায়।

দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র মাটি খাওয়ার খুব প্রচলন আছে। মেন্ডোকোর কতকাংশে ছেলে বড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই সমান আগ্রহে মাটি খায়। পোড়া মাটির চাকতি বাজারে হাটে বিক্রয় হয়। গোয়াটি-মালার লোকেরা চিনিব বদলে আয়েম-গিবিয়া ছাইএর উপর উপাত্ত একরকম ভুরা মাটি খায়। আমেরিকার কলম্বিয়া হতে বলিভিয়া পর্যন্ত সকল দেশেই মাটিখোব লোকের বাস দেখা যায়। আমেরিকার আদিম লাল মানুষের মেয়েরা কাজ করতে করতে কাদার ডেলা গিলে গিলে খায়; সিদ্ধ আলুতেও মাখিয়ে খায়। এই মাটি পরিষ্কার করে সুগন্ধ মিশিয়ে নানা প্রকারের বাটী কুঁজো ও পুতুল গড়ে বিক্রয় করে; যেতাল মহিলারা খাওয়ার জন্তে সেইসব কেনে। বর্ষা কালের জন্তে ঐ মাটি সংগ্রহ করে গুলি পাকিয়ে শুকিয়ে রাখে।

মাটির দোঁলা গন্ধ ও আমিষ্ট নোনতা স্বাদ লোককে মাটি খেতে প্রবৃত্তি দায়। রক্তহীনতা ও হিষ্টরিয়া রোগে মেয়েদের রুচির বিকারও মাটি খাওয়ার একটা কারণ। অল্প অল্প মাটি খেলে অসুস্থ করে না; বরং অনেক সময় ওষুধের কাজ করে। কিন্তু এক একজন লোকের—বিশেষত শিশু ও অল্প বয়সের মেয়েদের—এমন মাটি খাওয়া বাতিক থাকে যে তাদের মুখে লোহার মতো পলি দিয়ে রাখতে বা হাত বেঁধে রাখতে হয়।

*
**

দীর্ঘজীবী প্রথম সন্তান—

আমরা পূর্বে প্রবাসীতে বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও পরীক্ষালব্ধ ফল আহরণ করে দেখিয়েছিলাম যে প্রথম সন্তান তেমন বুদ্ধি-ও-শক্তি-সম্পন্ন এবং দীর্ঘজীবী হয় না, যেমন পঞ্চম সন্তান হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেপে আমেরিকার জার্গাল অফ হেরেডিটি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে প্রথম সন্তানই অপর সন্তান অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়ে থাকে। আমেরিকার Genealogical Record Office কয়েক বৎসর ধরে দীর্ঘজীবী লোকদের তালিকা সংগ্রহ করছেন। সেই তালিকা থেকে জানা যায় যে যে-সব লোক নব্বই বৎসরেরও বেশী বেঁচেছে তারা বহুপ্রজ পিতানাতা ও খুব বৃহৎ পরিবারের প্রথম সন্তান। ১০০কে নিম্নলীমা ধরে সেই তালিকা থেকে ক্রমিক আঁত সন্তানদের দীর্ঘজীবীর সংখ্যা এইরূপ পাওয়া গেছে—

১ম জাত	...	১৫২
২য়	...	২০
৩য়	...	৮৬
৪র্থ	...	২৪
৫ম	...	১০০
৬ষ্ঠ	...	৬১
৭ম	...	১০৬
৮ম	...	৭৯
৯ম	...	৮৫
১০ম	...	১২৫
১১শ ও তদুর্দ্ধ	...	১১৭

এই তালিকা থেকে প্রথম জাত সন্তানেরাই সব চেয়ে বেশী দীর্ঘজীবী হয় দেখা যাচ্ছে, তারপর ১০ম, ১১শ, ৭ম ও ৫ম, অপররা তেমন দীর্ঘ-জীবন লাভ করে না।

ডাক্তার আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল নিম্নলিখিত সংখ্যাতালিকা সংগ্রহ করেও দেখেছেন যে প্রথম সন্তানই সব চেয়ে বেশী বাঁচে।

জন্মের ক্রম সন্তানের মোট তার মধ্যে কতজন দীর্ঘজীবীর শতকরা

সংখ্যা	দীর্ঘজীবী	হার
১ম	৮০২	২১৭
২য়	৭৮৬	১১৮
৩য়	৭৬৫	১০৪
৪র্থ	৭০৫	২৫
৫ম	৬৩০	৮২
৬ষ্ঠ	৫৪২	৪০
৭ম	৪৫০	৫৩
৮ম	৩৬৯	৩০
৯ম	২৭১	২২
১০ম	১৮১	২০
১১, ১২, ১৩,		
১৪, ১৫	১৮৮	২১

মোট	৫৬৮৭	৮০২	১৪.০২
-----	------	-----	-------

কার্ল গারসন দেখিয়েছেন যে প্রথম গর্ভের সন্তান অনেক মৃত অবস্থায় জন্মিষ্ট হয়; তারা শৈশবে বেশী মারা পড়ে, তাদের শৈশবে স্বাস্থ্য দুর্বল ও রুগ্ন থাকে। এই আপাতবিরোধী তথ্যের সমস্ত-সমাধান প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রণালী আলোচনা করলেই সহজেই হয়ে যায়। প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মাতৃদেহ সেই কপের তেমন উপযুক্ত থাকে না; পরে অভ্যাসের রূপে উপযুক্ত হয়ে ওঠে; এই কারণে প্রথম সন্তানকে অনেক ফাঁড়া কাটিয়ে বেঁচে উঠতে হয় এবং সেইপ্রজ প্রকৃতি তাকে অল্প সন্তানের চেয়ে শক্ত সমর্থ করে গড়ে; নানা ফাঁড়া কাটিয়ে যারা বেঁচে যায় তারা খুব বেশী দিনই বাঁচে।

চাক।

দেশের কথা

জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে দেশবাসীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি দূর হওয়া প্রয়োজন। দেশের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তুকেই তার সমাদর করিলে দেশপ্ৰীতিব পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সে-সব অবহেলা করিয়া আমরা যদি কেবল দেশের মধ্যে জাত্যভিমান জাগাইয়া তুলিয়া দেশবাসীর মধ্যে হিংসাবিদ্বেষের বীজ বপন করি তাহাতে দেশকে অপমান করা হয়, জাতীয়তাও ক্ষুণ্ণ হয়।

সম্প্রতি ভাবতে বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত কেহ-কেহ সভাসমিতি করিতেছেন। মজার কথা এই যে লটিসভায় যে-ভারতীয় সদস্য হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলনের জন্ত বিল উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তিনিও এই বর্ণাশ্রমধর্ম-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দিতে ইতস্তত করেন নাই। একজন নামজাদা বিলাতফেরত ব্যাপারিটারও যোগ দিয়াছিলেন। এইপ্রসঙ্গে “রংপুর-দিক্‌প্রকাশ” বেশ যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তাহা এই:—

আমার বিষয় যে, এই অনৈসর্গিক জাতিভেদের প্রতি লোকের আস্থা দিন দিন শিথিল হইয়া যাইতেছে। বর্তমান সময়ে বংশাশ্রয়ত ভেদভেদের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই না। গুণমণাদা চিরদিন থাকিবে ও থাক সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনকই। কিন্তু কাকনের আণেফিক গুণত্ব যে স্বরূপান্তরদেখে অনুভূত হয় এবং আমাদের বেশে হয় নাই বা হয় না একপ বলা যায় না। কাকনকোলিষ্ঠ এবং বংশ-কোলিষ্ঠ দুই-ই আমাদের দেশে ওতপ্রোত ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। কাকনকোলিষ্ঠ দেশে ও বিদেশে উদ্যোগী পুরুষের দ্বারা লভ্য হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞাত এ দেশে নিম্নবংশীয়ের দ্বারা লভ্য নহে। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-বিভাগ লুপ্ত হইয়া সমগ্র প্রাপ্ত হয়। ইয়ুরোপের অধিকাংশ রাজ্যসমূহে ক্ষত্রিয় বলিয়া এখন আর বিশিষ্ট জাতি নাই। সকলকেই ক্ষত্রিয়বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণগায়ণ হইতে হয়। সমাজের অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্মে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া জীবিকা উপার্জন করিতেছে। আজকাল গৃহকর্মের জন্ত ভৃত্য পাওয়া দুস্কর হইয়াছে। বহু মার্কিন ভ্রম্যপরিবার দারোচিত কর্ম্ম বহুস্তই সম্পাদন করেন। ভারতেও ইয়ুরোপের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। ইয়ুরোপে ধনবল এবং শ্রমবলের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। Cooperative Principle অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমবায়-নীতির অবলম্বনে এই শ্রেণীগত বিবাদের মীমাংসা সম্ভবপর হইতেছে। ভারত হইতে ডাতিভেদ তিরোহিত হইলে, অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই। জাতিভেদগুণ বৈদ্য যুগে ভারতীয় সাধনা, বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ ক্ষয় হইয়া পরিপুষ্টীভূত করিয়াছিল। আগ্রার বিকাশে বাজির মঙ্গল, জাতিব মঙ্গল—আম্রার ভেদ-

ভেদ নাই। হীন ব্যক্তিকেও আদ্রদানীয় বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত অমঙ্গল হইবে।

দেশেব কোথাও যদি অজ্ঞায় থাকে তাহা হইবে দেশ পরিহার করিব, তেমনি বিদেশের অজ্ঞায়কেও পরিহার করিব। এবং দেশের যা-ভালো তা যেমন হইবে, তেমনি বিদেশের ভালো গ্রহণিসটিকেও অজ্ঞায় পরিহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিব। মনকে সংকীর্ণ করিব দেশ জাতের লোক বলিয়াই কাহাকেও অবজ্ঞা করিব না। অজ্ঞায় করিব না। যিনি অজ্ঞায় তাঁকে অজ্ঞায় করিব। তিনি স্বদেশেরই ইউন আ-র বিদেশেরই ইউন। যদি কোথাও অজ্ঞায় থাকে তাহা হইবে তাহাকে ত্যাগ করিব। দেশের ভাষা, দেশের পোশাক, দেশের শিল্পকলা, দেশের সঙ্গীত, দেশের যা' কিছু নিজস্ব মহামূল্য সম্পদ ত্যাগ করিলে চলিবে না। তাই যখন দেশে যুবকবো বিদেশী ভাষায় চিঠি লেখেন, 'বাবা' 'মা' তাঁদের বাবা-বাবা চৈকে, বলেন father, mother, জিতে কথা বলেন এবং দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য, সঙ্গীত চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয় রাখেন না; দেশী কল্পগামিত্রিত অজ্ঞায় চোখে দেখেন; যখন দেশে প্রয়োজনে তাঁরা বিদেশী সাঙ্গে সজ্জিত, তখন জাতীয়তা বিস্তার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়ি। লজ্জার একথা অস্বীকার করিবাব যো নাই যে বিদেশী সজ্জিত হইয়া আমরা দেশীয় লোকের কাছে স্থলে বিশেষ সম্মান লাভ করি, যে-সম্মান দেশের সজ্জিত থাকিলে পাওয়া অসম্ভব। তবুও আমরা রাখি যে যে-সম্মান যুরোপীয় পোশাকে প্রদর্শিত তার জন্ত নিজেকে সম্মানিত বা কৃতার্থ বোধ অপৌকষেয়। কোনো-কোনো বাঙালীর মধ্যে ভাবও দেখা যায় যে ধুতি পরিয়া কোনো বড় কাজ চিন্তা সম্ভবপর নহে। মক্কেলের কাগজে প্রকাশ মাঠার নাকি মনে করেন যে ধুতি চাদর পরিয়া শিক্ষা দিলে শিক্ষাকার্য্য অসম্পন্ন হইতে পারে না ত

মুগ্ধবেড্যা গঙ্গাধর হাই স্কুলের অধ্যক্ষগণ হেতু মাত্রের মধ্যে বন্ধের পূর্বে এক ইস্তাহাব জারী করিয়াছেন যে সমস্ত শিক্ষককে vernacular teacher (বঙ্গীয় শিক্ষককেও) কোর্সে অবগতির কাল করিতে হইবে।

সম্মান। ২য় ভ্রাম্যমাণী বিদ্যালয় খুলিলে সকলকে উক্ত প্রকার
ঘড়ীচড়া পরিধান করিতে হইবে।

—“নীহার”

আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা পবাধীনতাবশত
আমাদের দেশের মাটির উপরই সর্বত্র নিজেবপোশাক
পরিয়া ফিবিতে পারি না। এই কলিকাতা শহরেব শ্রেষ্ঠ
উদ্যান “ইডেনগার্ডেন” দেশবাসী সকলেব নিকট কর গ্রহণ
কবিয়া স্থাপিত ও সংরক্ষিত। কিন্তু সেই উদ্যানের
কোনো-কোনো অংশে আমরা বহুমূল্য দেশী ধূতি পাঞ্জাবি
শাল আলোয়ান পবিয়াও যাইতে পারি না। চাঁদনির
রোথে ছোটকোট পরিয়া কিন্তু যাইবার বাধা নাই।

এ মর্মে কোনো লিখিত নিয়ম না থাকিলেও উদ্যান-
রক্ষক বিদেশী পুলিশ প্রহরীকে এ-বিষয়ে খুব কড়া হুকুম
দেওয়া আছে। আগবা কিন্তু এমন মেসেব ছায়া নিবীহ
যে এই জুলুম অবনতমস্তকে বহু বৎসর ধবিয়া মানিয়া
চলিতেছি।

ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতবাসী প্রবেশাধিকার পায় না
এবং নানাপ্রকারে লাক্ষিত অপমানিত হয় বলিয়া আমবা
তুমুল আন্দোলন করি, দক্ষিণ আফ্রিকায় হলদুল বাধাইয়া
দিই, কিন্তু বাংলাব শ্রেষ্ঠ শহর কলিকাতাব শ্রেষ্ঠ সাধারণী
উদ্যানের মধ্যে যে বাঙালীব এবং অন্যান্য ভারতবাসীর
অপমানকর নিয়ম চলিতেছে সে-সমক্ষে কোনো “মাননীয়”
দাট-সভাব সদস্যকে কখনো একটি প্রশ্নও কর্তৃপক্ষের কাছে
উত্থাপন করিতে শুনি নাই।

রেল ষ্টামাব প্রভৃতিতে ভ্রমণের সময়ও যুরোপীয়
পোশাক পবা থাকিলে বিনা খবচে অনেক স্থবিধা ভোগ
কবা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে।
একবার একটি ক্ষীণজীবী বাঙালীর ছেলে মধ্যম শ্রেণীব
Reserved for Europeans কামবায় ধূতি পরিয়া ভ্রমণ
কনিতোছিল। গাড়ীতে যখন ওঠে তখন কামবা খালি
ছিল। পথে এক ষ্টেশনে এক যুরোপীয়-পোশাক-পরিহিত
ফিরিঙ্গি আসিয়া ছেলেটিকে বলিল—“তুমি নেটিভ, তুমি
কোন সাহসে ইউরোপীয়ানদের কামবায় উঠিয়াছ!
নাগিয়া যাও।” ছেলেটি সেই কৃষ্ণবর্ণ ‘যুরোপিয়ান’টিকে
বলিল—“তুমি আর আমি কেহই যুরোপিয়ান নই।
অতএব আমাদের একত্রে যাইতে ক্ষতি কি?” তখন
ফিরিঙ্গি রাগে গশ্গশ্ করিতে-করিতে ষ্টেশন-মাষ্টারকে

ডাকিতে ছুটিল। সে চলিয়া যাইবার পর ছেলেটি হঠাৎ
একটা তোরঙ্গ খুলিয়া তলদেশ হইতে একটা অতি জীর্ণ
দোমড়ানো-মোচডানো বিবর্ণ প্যাণ্টলুন বাব করিয়া
কাপড় মালকোঁচা মারিয়া তাহার উপর উহা পরিতে আবস্ত
করিল। সবেমাত্র একটা পা প্রবেশ কবাইয়াছে, এমন সময়
ফিরিঙ্গি ও ষ্টেশন-মাষ্টারটি আসিয়া উপস্থিত। ষ্টেশন
মাষ্টার প্রকৃত সাহেব। ছেলেটিকে তদবস্থ দেখিয়া এবং
প্রাণপণে তাহাকে প্যাণ্টলুনে আর একটি পা প্রবিষ্ট
কবাইবার অক্ষম চেষ্টা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া
জিজ্ঞাসা কবিল—“Hallo! what are you doing?”
ছেলেটি তখন সাহেবের মুখেব দিকে এবং ফিরিঙ্গির মুখের
পানে চাহিয়া বলিল—“I am becoming an Euro-
pean, Sir!”

এবাবকাব কংগ্রেস ও মোসলেম লীগে জাতীয়
ঐক্যবোধেব প্রকাশ ও হিন্দুমুসলমানে মিলিয়া দেশেব
কাজ কবিবাব ইচ্ছাব পরিচয় পাইয়া মনে কতকটা আশার
সঞ্চাব হয়। “চারুমিহিব” এই প্রসঙ্গে বলেন—

ভারতে যাহাতে স্বাযন্তশাসনমূলক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়,
তজ্জন্ত জাতীয় মহাসমিতি ও মুসলমান সমিতি একত্র ও একযোগে
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন; এই প্রস্তাব উপলক্ষে দেশের লোক
প্রকার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া এলো-
ইণ্ডিয়ান সমাজের প্রত্যেকেই মনে করিতেছেন, বর্তমান সময়ে এ দেশে
ঠাহারা যেক্ষপ রাজোচিত স্বত্ব সন্তোগ করিতেছেন, দেশের লোকের জন্ত
নীর মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ঠাহারাই এখন যেক্ষপ ক্ষীর ভক্ষণে অধিকারী
হইয়া রহিয়াছেন, দেশে স্বাযন্তশাসনমূলক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে
ঠাহাদের সেই স্বত্ব ও সুবিবাব বিস্ত্র উপস্থিত হইবে। ঠাহারা সেই
জন্ত বলিতেছেন, বর্তমান যুদ্ধের সময়ে এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়া
এ দেশের লোক গবর্নমেন্টকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা
গবর্নমেন্ট পরিচালনা কার্যে বাধা উপস্থিত করিবে, এবং সেই জন্তই
ঠাহারা গবর্নমেন্টকে অতি আগ্রহের সহিত পরামর্শ দিতেছেন যে,
ভারতবর্ষে ঐক্সপ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তাহা প্রকাশ্যরূপে
সকলকে গবর্নমেন্টের জানাইয়া দেওয়া উচিত।

অপর দিকে উপনিবেশের অধিবাসীগণ বৃটীশ সাম্রাজ্যময় সর্বত্র
ঠাহাদের প্রভুত্ব বিস্তারের জন্ত কেবল দাবী উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হুঁ
নাই। ঠাহাদের শুভাকাজক্ষীগণ তজ্জন্ত পৃথিবীর পরিভ্রমণ করিয়া
নানাস্থানে নানা ভঙ্গিতে তদুদ্দেশে জনমত সঞ্চারে আয়োজন
করিতেছেন। সম্প্রতি এ দেশে লায়নেল কার্টিস নামক এক বৈদ্য
এই উদ্দেশে উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঠাহার
উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।

এই লায়নেল কার্টিস, কাহাওয়ার, কি উদ্দেশে এ দেশে প্রেরিত
হইয়াছেন, তাহা জানিবার জন্ত পাঠকগণের কৌতুহল হইতে পারে।
সম্প্রতি বিলাতে “রাউন্ড টেবিল” (Round Table) সম্মেলন নামে

একটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। সেমিল রোড্‌স্ ইত্যাদি যে-সকল লোক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বর্ণখনির লোভে দক্ষিণ আফ্রিকায় যুগাব জাতিয় বাধীনতা লোপে উদ্ধত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ-সকল উপনিবেশে অবস্থান করিয়াই স্বর্ণ ও হীরকাদি আহরণ করিয়া প্রচুর ধনী হইয়াছেন। এইক্ষণ তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, যে সকল ইংরেজকে উপনিবেশগুলিতে অবস্থান করিতে হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষ ইত্যাদি স্থানের স্বর্থ সুবিধার ভাগী হইতে পারিতেছেন না। তজ্জন্ত তাঁহাদের ইচ্ছা যে, উপনিবেশের অবিকারীগণও খাস ইংরেজের স্থায় এ দেশে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।

খৃষ্ট উপনিবেশবাদীগণ যাচাতে আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন না করিতে পারে তৎপক্ষে আমাদের পক্ষে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে; অপর দিকে আমরা যাচাতে বুদ্ধাঙ্কে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে পারি তজ্জন্তও সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের শত্রুগণ আমাদেরই দেশের কোনও কোনও লোককে হস্তগত করিয়া দেশমধ্যে ভিন্ন মতের অশিষ্ট প্রমাণ কবিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমাদের আন্দোলন যাচাতে মন্দীভূত না হয় তজ্জন্তও আমাদের সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে।

“মোহাম্মাদী” লিখিয়াছেন—

আজ হইতে কএকবৎসর পূর্বে মুসলমানের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান করা একটা মহা পাপজনক কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যে ২৪ জন মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান করিতেন তাঁহারা সাধারণ মুসলমানের নিকট হিন্দুভাবাপন্ন, হিন্দুমত্রে দীক্ষিত বলিয়া নিন্দিত হইতেন, কিন্তু মোসলেম লিগে নবজীবন সঞ্চারিত হওয়ার পর হইতে ক্রমে চিন্তাশীল মুসলমানগণ কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে-ছেন। এবৎসর লক্ষৌ সহস্রে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। কংগ্রেস ও লিগের উদ্দেশ্য অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাহারা কংগ্রেসে যোগদান করেন না অথবা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সহিত সহায়ত্ব পোষণ করেন না তাঁহারা এখন সমাজে স্বার্থপর ও ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ২৩ বৎসর পূর্বে যে কয়েকজন মুসলমান নেতৃস্থানীয় লোক মোসলেম লিগে অবিবেশনে স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন কবিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সমাজচক্ষে কষ্টকররূপে বিবেচিত হইতেছেন, তাঁহারা এখন সাধারণ সমাজকর্তৃক বর্জিতাবস্থায় সময় কাটাইতেছেন।

গত মাসে “দেশের কথা”য় দেশের দারিদ্র্য নিবারণের একটি প্রধান উপায় বলিয়াছিলাম পুরুষ ও নারীর একত্রে অর্থ উপার্জন কবা। “বরিশাল-হিতৈষী”তে প্রকাশিত নিম্নোক্ত আশা প্রদ সংবাদে আমরা সুখী হইয়াছি—

বাবু অক্ষয়কুমার বোধ বামনার সর্বস্বজিষ্ঠার। তাঁহার আক্ষিপে একজন একষ্ট্রা মোহরারের পদ শূন্য হইলে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার-সমীপে ঐ পদটী তাঁহার ভ্রাতাকে প্রদান করিতে অস্বরোধ করেন। মেজিষ্ট্রেট সাহেব প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সু।

চন্দ্রের উৎপত্তি

ধরিতরীর পৃষ্ঠদেশ যদি খনন করিয়া পরীক্ষা করা যায় তাহা দেখা যায় যে এই পৃষ্ঠদেশটা স্তরে স্তরে পর্দায় পর্দায় নিশ্চিত। উপরের এইরকম মাটি ভিতরে নাহ। উপবেব মাটিটা চাঁচিয়া ফেলিলে আর-একটা জিনিষের স্তর বাহির হইয়া পড়ে, সেটা চাঁচিলে আব একটা, কতকটা বাধাকপির পাতার মত। এই স্তরগুলার কোনটা বালি, কোনটা পাথর, কোনটা কয়লা, ইত্যাদি। এগুলি যে সমতল, তাহাও নহে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের ফলে কোনও স্থলে উঁচু হইয়া পাহাড় হইয়াছে, কোনও স্থলে নীচু হইয়া উপত্যকা ও সাগর হইয়াছে। কিন্তু যেখানেই খোঁড়, সর্বত্রই এই স্তরের বিস্তার দেখিতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর স্তর যেখানেই পরীক্ষা কবা যায় সেইখানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই স্তর জলপ্রাবন দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছিল। তাহা সে উচ্চ পর্বতের স্তরই হউক আর সমুদ্রের ভিতরকারই হউক। হিমালয়ের স্তরের মধ্যে এমন এমন প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে বাহা জল ভিন্ন অল্প কোথাও বাস করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে হিমালয়ের স্তর-গুলি এককালে জলের মধ্যে ছিল। হিমালয়ের স্তরও নীচ তৈয়ার হইয়াছে জলের পলির কার্যের দ্বারা। অবশ্য তৈয়ার হইবার সময় হিমালয়টা অত উচ্চ ছিল না, পরে কোনও প্রাকৃতিক উৎপাতের ফলে হিমালয় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠের এই স্তরনির্মাণকার্য এখনই শেষ হয় নাই। এখনও গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি ইত্যাদি বড় বড় নদীগুলি বর্ষার সময় বালু ও মৃত্তিকা বহন করিয়া আশ্রিত নদীর মুখের নিকট জড় করে। বর্ষার পর জল সরিয়া গেলে দেখা যায় যে সে জায়গাটা একটু উঁচু হইয়াছে। পরবর্তী বর্ষার প্রাবনে স্তর পড়িয়া আর-একটু উঁচু হয়, এইরূপ বৎসরের পর বৎসর পলি পড়িয়া একটা প্রকাণ্ড দেশ তৈয়ার হয়। আমাদের এই শস্যশ্রামলা সোনার বাংলা এইরূপেই তৈয়ার হইয়াছিল। পৃথিবীর এই ভাঙা গড়া স্তরক্ষয় ও স্তরনির্মাণকার্য অতি দীর্ঘে দীর্ঘে সম্পাদিত

হয়। সমস্ত প্রাকৃতিক ক্ষমকাবীশক্তিগুলি,—জল, ঝড়, মেঘস্ফার, জোয়ার ভাঁটা, সবগুলি একসঙ্গে কাজ করিলে, হিনাবে দেখা যায় যে আমেরিকা মহাদেশটাকে এক ফুট ক্ষয় করিতে ৬০০০ বৎসর লাগিবে। ৫০০০ ফুট একটা স্তরকে ক্ষয় করিতে ৩০ কোটি বৎসর লাগিবে। আমেরিকার এক একটা পাহাড়ের স্তর ৫১৭ মাইল পুরু। এই পুরু স্তর কতবার ভাঙিয়া গড়িয়া তৈয়ার হইয়াছে, তাহা ঠিক নাই। এবং ইহার ক্ষয় কত সময় লাগিয়াছিল তাহা ত্রৈরাশিকজ্ঞেরা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। মনে রাখিবেন এই ৫ মাইল পুরু স্তর একটা নহে—একুপ উপরি উপরি বিস্তার আছে। উপবোক্ত হিসাবে ভূপঙ্করের এই সমুদায় স্তর নির্মাণ করিতে কত কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে। ভূতত্ত্ববিদেরা এতদিন এবিষয়ে নির্ভীক ছিলেন। একটা স্তর নির্মাণ করিতে ৩০ কোটি বৎসর লাগিয়াছে ত কি হইয়াছে? পৃথিবী কি আজিকার? এ পৃথিবী কতদিনকার পুর্বাতন! এসব কাজ একদিনে হয় না—ইত্যাদি ইত্যাদি। পদার্থবিদেরা এ উত্তরে নিরস্ত হইতে পারেন নাই। পৃথিবী যে আজিকার নয় এবং এই স্তর নির্মাণ যে একদিনে হয় না তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু তবুও পৃথিবীর বয়সের ত একটা সীমা আছে, পৃথিবী কিছু অনন্ত কাল এখানে ছিল না। পৃথিবীর বয়স কত তাহা ঠিক জানা নাই, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে ১০০ কোটি বৎসরের মধ্যে হওয়াই সম্ভব। তাহার পূর্বে পৃথিবী তরল ছিল। ভূতত্ত্ববিদেরা যে পৃথিবীর দেহেব একখানা সূক্ষ্ম স্তর গাণ্ডিবার জন্ত বিশ ত্রিশ কোটি বৎসর চাহিয়া বসেন, তাহার কোনও মূল্য নাই।

ভূতত্ত্ববিদেরা ইহাতে হঠিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলেন আমাদের গণনায় ভুল দেখাও। ভূপঙ্কর যে স্তরে স্তরে নিশ্চিত, তাহা ঠিক। এবং এই স্তরনির্মাণব্যাপার যে আজকাল অত্যন্ত দীর্ঘে দীর্ঘে হইতেছে তাহাও ঠিক, স্মরণ্য এই হিসাবে মোটা স্তরগুলো তৈয়ার করিতে বিশ ত্রিশ কোটি বৎসর লাগিবেই ত। হাঁ, তোমরা যদি বল যে পূর্বেকার পাহাড়ের নীচেকার মোটা মোটা স্তরগুলো যখন তৈয়ার হইয়াছিল তখন এই স্তরনির্মাণব্যাপারটা খুব শীঘ্র শীঘ্র হইত, তা হইলে কোনও কথাই নাই। কিন্তু

তোমাদের এমন একটা প্রাকৃতিক শক্তি দেখাইতে হইবে যাহার সাহায্যে ঐরূপ ৫১০ মাইল পুরু স্তর শীঘ্রই তৈয়ার হয়। যতদিন তোমরা সেরূপ শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছ না, ততদিন আমরা তোমাদের বথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। পদার্থবিদগণ ইহাব সম্ভাব্যজনক উত্তর খুঁজিয়া পান না অথচ নিজেদের গণনায় অবিশ্বাসও করিতে পারেন না। ফল পদার্থবিদ ও ভূতত্ত্ববিদের মধ্যে পৃথিবীর বয়স লইয়া একটা মতভেদ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ভূতত্ত্ববিদ বলেন পৃথিবীর একটা স্তর নির্মাণ করিতে ১৫০১২০০ কোটি বৎসর লাগিয়াছে, আর পদার্থবিদ বলেন—তাহা কিরূপে হইবে? আমাদের হিসাবে পৃথিবীর বয়সই ১০০ কোটির উর্দ্ধে নহে। সম্প্রতি এই দুই বিরোধী দলের মধ্যে একটু মিলনের আশা দেখা গিয়াছে। মেটা বুরিবার পূর্বে আমাদেরকে সৌরজগৎ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জানিতে হইবে।

আমাদের সৌরজগতের ৭টা গ্রহ স্বর্ঘ্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া তাহাব চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ঘুরিবার পথ বা কক্ষটা স্থির নহে। গ্রহগুলো নিজেদের মধ্যে টানাটানি করিয়া স্বর্ঘ্যানির্দিষ্ট পথ হইতে একটু বিচ্যুত হয়। মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, এই কক্ষচ্যুতি কি কালে এত বেশী হইতে পারে যে তাহার ফলে দুইটা গ্রহেতে ঠোকাঠুকি করিয়া, দুইটা গ্রহই বিনষ্ট হইয়া যাইবে? প্রশ্নটা বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃসহ। অনেক বড় বড় গণিতবিদগণ হাব মানিয়া গিয়াছেন, কারণ সাতটা গ্রহের টানাটানি ফলে কোনটা কোন সময়ে কোথায় আসিবে তাহা বলা প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি দুঃসাধ্যকে দুঃসাধ্য বলিয়া মানিতে চায় না। ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত লাপ্লাস অনেক গণনার পর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন গ্রহগুলো নিজের স্থান হইতে সরিয়াছে বটে, কিন্তু খানিক দূর সরিয়া আবার কিরিয়া আসিতেছে। কতকটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। সৌরজগতের গ্রহগুলার স্থানচ্যুতি যদি একমুখী হইত তা হইলেই ভয়েব কারণ ছিল। কালক্রমে বিপরীতমুখী হয় বলিয়া সংঘর্ষের কোনও সম্ভাবনা নাই।

লাপ্লাসের এই অকাট্য গণনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া অনেকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে সৌরজগতের কোনও

কালে ধ্বংস নাই। অনেকে ইহাতে চমৎকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিধাতার এই অপূর্ব কৌশলে কয়েকজন ছিত্রাশেষী খুঁত বাহির করিলেন। লাপ্লাসের গণনার মূল সূত্র হইতেছে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম। যদি বিশেষ গতি-বিশিষ্ট দুইটা সম্পূর্ণ কঠিন বা Perfectly Rigid বস্তু আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তা' হইলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে, একটা আর-একটার চারিদিকে বৃত্তাভাসের পথে ঘুরিতে থাকিবে। বস্তু দুইটা কিন্তু Perfectly Rigid হওয়া চাই। লাপ্লাস তাঁহার গণনায় স্বর্ষ্যসমেত সমস্ত গ্রহগুলিকে সম্পূর্ণ কঠিন ধরিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। লাপ্লাসেব অকাটা গণিতের উপর এতদিন কেহ দস্তখুট করিতে সাহসী হন নাই। সম্প্রতি লাপ্লাসেব অজ্ঞানের ষাথার্থ্য সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। বাস্তবিকই জগতের সমস্ত বস্তু কি কঠিন? লাপ্লাসের এ অজ্ঞানটুকু একেবারেই ঠিক নহে। পাতথ, লোহা, ষ্টীল, এমনকি হীরকও সম্পূর্ণ কঠিন নহে। পৃথিবী নিজে ত নহেই। ইহার অভ্যন্তর অনেকের মতে তবল। স্বর্ষ্য কঠিন হওয়া দূরে থাকুক তরলও নহে, বাষ্পায়। বৃহস্পতি ও শনি এখনও প্রায় তবল। স্তরাং দেখা যাইতেছে যে লাপ্লাসের গণনার মধ্যে গোড়ায় গলন বহিয়াছে। গোড়ায় যখন ভুল, তখন আগাতেও ভুল থাকিবে। অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহগণ যে-পথে স্বর্ষ্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহা স্থির নহে। সে পথ হইতে তাহারা অগ্নে অগ্নে বিচলিত হইতেছে। এ অগ্নি বিচলন ছইমুখী নহে। ছইমুখী হইলে কোনও গোলই ছিল না, বহুকাল পবে তাহাবা পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত; ইহা একমুখী। এই বিচলনের শেষ পৰিণামে যে সৌরজগতে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে?

বিচলন বা স্থানচ্যুতি যে হইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আমাদেব চন্দ্রে। চন্দ্রমহাশয় পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাব ঘূর্ণণেব সময় ক্রমশঃ বাড়িতেছে, গড়ে প্রতি শত বৎসরে প্রায় ৬ সেকেন্ড। সকলেই জানেন যে চন্দ্র বা স্বর্ষ্যগ্রহণের সময় জ্যোতিষিক হিসাবে নিরূপণ করা অত্যন্তই সোজা। নিত্যন্ত অর্কাটীনেরাও, তিন চারশত বৎসর পূর্বে বা পরে কোন

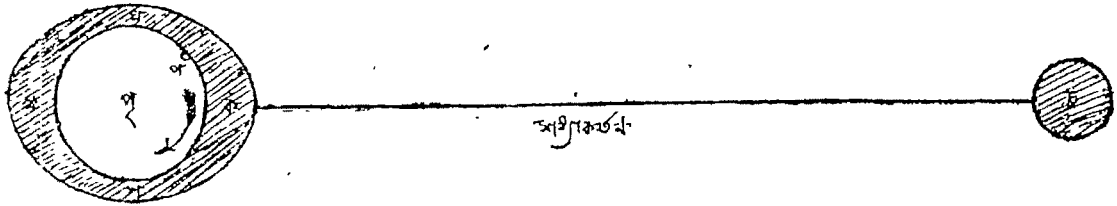
সময় গ্রহণ হইয়াছিল বা হইবে চোখ বুজিয়া বলিতে পারেন। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার একটা গ্রহণের বহুদূর ও সময় পূর্বাতন পুঁথি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল। এমন পণ্ডিতেরা গণনা আরম্ভ করিলেন। উদ্দেশ্য—পৃথিবী টুকু সময়ের সঙ্গে গণনার সময় মিলে কি না। গণনা মিলিল বটে, কিন্তু ঠিক মিলিল না, একটু খুঁত রহিয়া গেল। প্রায় দুই ঘণ্টার পার্থক্য। গণনার হিসাবে গ্রহণটা যে সময়ে হওয়া উচিত ছিল তাহার প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্বে হইয়াছে। নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে একঘণ্টার হিসাব পাওয়া গেল, বাকি একঘণ্টা পার্থক্যের কোনও রকম কারণ পাওয়া গেল না। অনেকদিন জ্যোতিষী-সমাজে ইহার কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি দুইজন মনীষীর কৃপায় ইহার সহজর পাওয়া গিয়াছে। একজন অভিব্যক্তিবাদেব গুরু চার্লস ডাবউইনের উপযুক্ত পুত্র জর্জ ডাবউইন ও ২১ঃ একজন স্বনামধন্য লর্ড কেলভিন।

সমস্ত ব্যাপাবটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। এতদূর বিষয় গণিতের সাহায্য ব্যতীত বুঝিয়া উঠা কঠিন, কিন্তু তাহা সবেও যেটুকু পারা যায় সেখা যাউক। এই ২৩ঃ বৈজ্ঞানিক তথ্যের মূলে একটা অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা রহিয়াছে। যাহারা কখনও সমুদ্রতীরে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে সমুদ্রের জল প্রতি বার ঘণ্টায় একবার করিয়া ক্ষীত হয় ও একবার নিয়গামী হয়। সহজ ভাষায় ইহাকে জোয়ার-ভাটা বলে। জলের এই উত্থানপতন শুধু যে সমুদ্রে হয় তাহা নহে, উচ্চ নদী বহিয়া অনেকদূর পর্যন্ত নদীর ভিতর প্রবেশ করে।

এই জোয়ারভাটার কারণ হইতেছে চন্দ্র ও স্বর্ষ্যের আকর্ষণ। তবে চন্দ্র নিকটে বলিয়া তাহার আকর্ষণ ইহা বেশী উপলব্ধি হয়। পৃথিবী ও তাহাব মলরাণিকে মাধ্যাকর্ষণেব জন্ত চন্দ্র নিজের দিকে টানিতেছে। পৃথিবী কঠিন বলিয়া তাহার কিছুই হইতেছে না, কিন্তু আকর্ষণেব জন্ত পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ জলটা চন্দ্রেব নীচে জড় হইতেছে। চন্দ্র ঠিক চন্দ্রেব নীচেকাব জলটা ক্ষীত হইতেছে ও সেই-সেই ঠিক বিপরীত দিককাব জলটা ক্ষীত হইতেছে। বিপরীত দিকের জলটা কেন হইতেছে? পৃথিবী ও চন্দ্র

উভয়কেই চন্দ্র টানিতেছে, কিন্তু পৃথিবীর গুরুত্ব (Density) বেশী বলিয়া তাহাকে একটু বেশী জোরে টানিতেছে। ফলে পৃথিবীটা চন্দ্রের দিকে একটু আগাইয়া আসিয়া চন্দ্রের বিপরীত দিককার জলটাকে উঁচু করিতেছে।

বৃদ্ধি বৃদ্ধিতে পারা যাইবে না, কিন্তু দশবিশ হাজার বৎসরে অনেকখানি বাড়িবে। আবার আজ পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতেছে, গতকাল ২৪ ঘণ্টার একটু কমে ঘুরিত। দশ হাজার বৎসর পূর্বে হয়ত ২৩ ঘণ্টায় একবার



। 'ক' ও 'খ' পৃথিবীর উপরিভাগের জল। চন্দ্র 'ক' জলরাশিকে টানিয়া তাহার নীচে উঁচু করিয়াছে। পৃথিবীর গুরুত্ব জল অপেক্ষা বেশী বলিয়া পৃথিবীকে বেশী জোরে টানিতেছে ও তাহার ফলে পৃথিবী জলরাশির মধ্য হইতে চন্দ্রের দিকে একটু আগাইয়া আসিয়াছে, সেইজন্য 'খ' জলরাশি উঁচু হইয়াছে। 'ক' ও 'খ' জল উঁচু হওয়াতে 'গ' জলরাশি নীচে হইয়াছে। 'ক' ও 'খ' জোয়ার, 'গ' ও 'ঘ' ভাটা। পৃথিবীর উপরিভাগে 'প' চিহ্নিত স্থানটি ২৪ ঘণ্টায় একপাক ঘুরিয়া আসে। 'প' বখন 'ক'র নীচে আসিল তখন 'প'তে জোয়ার। ৬ ঘণ্টা পরে 'গ'তে আসিলে ভাটা। আবার ৬ ঘণ্টা পরে 'খ'তে পৌঁছিলে জোয়ার হইল। আবার ৬ ঘণ্টা পরে 'ঘ'তে ভাটা। এইরূপে ৬ ঘণ্টা অন্তর জোয়ার ভাটা হয়।

তা' হইলে দেখা গেল যে চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে ঠিক চন্দ্রের নীচেকার পৃথিবীর দুই পৃষ্ঠস্থ জল উঁচু হয় ও দুই পার্শ্বস্থিত জলরাশি নীচে হইয়া যায়।

চন্দ্রের টানে আবদ্ধ হইয়া জলটা স্থির হইয়া রহিয়াছে—অর্থাৎ পৃথিবীটা ঘুরিতেছে। পৃথিবীর সঙ্গে তাহার উপরি ভাগেব জলরাশির অনবরত ঘর্ষণ হইতেছে। ঠিক যেন চাকায় বেক কসা হইতেছে। রেলগাড়ীকে থামাইবার জন্য যেমন তাহাৰ ঘূর্ণায়মান চাকার দুই দিক হইতে দুই লৌহখণ্ড চাপিয়া ধরে এবং সেইজন্য তাহার ঘুরণটা বন্ধ হইয়া যায়, এখানে ঠিক সেইরূপ ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে চন্দ্র জলবলী ত্রেক করিতেছে। কাজে কাজেই উপবোক্ত রেলগাড়ীর চাকার মত পৃথিবীর ঘূর্ণণ ক্রমেই কমিবে, প্রভেদের মধ্যে রেলগাড়ীর চাকাটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই থামিয়া যাইবে কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণণ থামিতে কয়েক কোটি বৎসর লাগিবে। কয় কোটি বৎসর লাগিবে তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে এককালে যে থামিবে তাহা নিশ্চয়। আজ পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতেছে, কাল তাহার একবার ঘুরিতে একটু বেশী লাগিবে। পরন্তু আর-একটু বেশী দুই একদিন বা দুই এক বৎসবে এই আবর্তনের সময়-

ঘুরিত। পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্বে বিশ ঘণ্টায় ঘুরিত। তাহার পূর্বে ১৫, ১০, ৫ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর সম্পূর্ণ অর্জন হইত। সে সময়ে, সেই বহুপূর্বের অভীত যুগে, ২৪০ ঘণ্টার মধ্যে সূর্যের উদয় ও অস্ত হইয়া যাইত। ইহার পূর্বে পৃথিবী আবও বেগে ঘুরিত—তাহার পূর্বে আরও। কিন্তু এই বেগে ঘুরণের একটা সীমা আছে। সেই যুগে যে-সময়ে ৩৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর দিবারাত্র হইত সেই সময়ে পৃথিবীর আকার নিশ্চয়ই কঠিন ছিল না। কারণ পৃথিবী যে পূর্বে গরম ও তরল ছিল এবং ক্রমশঃ শীতল ও কঠিন হইতেছে তাহার প্রচুর প্রমাণ ভূতত্ত্ববিদের নিকট পাওয়া যায়। সে সময়ে পৃথিবী বাষ্পময় না হউক তরল নিশ্চয়ই ছিল। সুতরাং বেশী জোরে ঘুরিলে পৃথিবী বেচারীর বিপদের আশঙ্কা আছে। গাড়ীর চাকা বখন জোরে ঘুরিতে থাকে তখন তাহার গায়ে যদি কাঁচা লাগিয়া থাকে ত সেটা ছিটকাইয়া বাহির হইয়া যায়—অবশ্য চাকা আস্তে ঘুরিলে কাঁচাটা না ছিটকাইতেও পারে। সেইরূপ তরল পৃথিবীটাও যদি বেশী জোরে ঘুরে তাহার কতক অংশ তাহার শরীর হইতে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব। পৃথিবী তাহার উপরিভাগের তরল পদার্থগুলিকে

কিরূপ জোরে টানিতেছে তাহা যদি জানা থাকে তা হইলে সহজেই বলিতে পারা যায় যে কিরূপ বেগে ঘুরিলে তাহার শরীরের অংশ বিচ্যুত হইবে। এইরূপ মোটামুটি হিসাবে জানা গিয়াছে যে পৃথিবী তরল অবস্থায় যদি ৩ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে তা হইলে তাহার আকৃতির একটা পরিবর্তন সম্ভব। তা হইলে দাঁড়াইল এই।—পৃথিবীর ঘুরণের বেগ ক্রমশঃ কমিতেছে। আজকাল পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে, পূর্বে আরও অল্পসময়ের মধ্যে ঘুরিত। এমন একসময় ছিল যেসময় ৩ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর একটা সম্পূর্ণ আবর্তন হইত। সেই সময়ে পৃথিবীর শরীরের কোনও একটা অংশ বিচ্যুত হইয়াছিল।

আচ্ছা! ইতিমধ্যে চন্দ্রের কি হইতেছিল দেখা যাউক। চন্দ্র পৃথিবীর জলরাশিকে টানিয়া তাহার নীচে উন্নীত করিয়াছে। চন্দ্র যেমন এই জলরাশিকে টানিতেছে, এই জলরাশিও ঠিক সেইরূপ চন্দ্রকে টানিতেছে। গতিতত্ত্বে Action and Reaction কার্য ও প্রতিকার্য বা পাণ্টা কার্য বলিয়া একটা কথা আছে। আপনি ঐ দেয়ালটাকে যদি হাত দিয়া চাপেন ত দেয়ালটা আপনাকে যদি হাতকে সমান জোরে চাপিবে। ভাহিন করতল দিয়া বাম করতলকে চাপ দিলে দেখিবেন যে, বাম করতল ভাহিনকে সমান চাপ প্রয়োগ করিতেছে। কোন ব্যক্তিকে যদি “অর্দ্ধচন্দ্রং দস্তা” বহিষ্কৃত করিতে চান ত দেখিবেন সে-ব্যক্তি নিতান্ত নিরীহ হইলেও তাহার গ্রীবাদেশ দ্বারা আপনার হাতকে সমান জোরে ধাক্কা দিবে। সুতরাং চন্দ্রমহাশয় পৃথিবীর জলকে টানিয়া উঁচু করিয়াই নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহাকেও ঐ জলরাশি কর্তৃক টান সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু সহ্য করিবেন কিরূপে? যেখানে ছিলেন সেইখানে থাকিয়া সহ্য করা যায় না। টানের জন্ত পৃথিবীর ঘাড়ে আসিয়া পড়া খুবই সম্ভব। এই টানের বেগ সামলাইবার জন্ত ইনি ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া পিছু হঠিতেছেন অর্থাৎ পৃথিবী হইতে দূরে যাইতেছেন।

একটা রবারের সূতায় যদি টিল বারিয়া তাহাকে ঘোরান ত দেখিবেন যে একবার বেশ ঘুরিতে আরম্ভ করিবার পর আপনার হাতটা প্রায় স্থির থাকে আর

টিলটা ইনার্শিয়ার দরুন সমান বেগে ঘুরিতে থাকে। কিন্তু এখন যদি হাত দিয়া টিলটাব প্রতি একটু টান দেন ত দেখিবেন রবারের সূতটো লম্বা হইবে। টিলটা আরও দূরে সরিয়া যাইবে। চন্দ্রের বেলাও এইরূপ হয়। পৃথিবীর জলটা স্ফীত হইয়া চন্দ্রকে দূরে দিকে একটু বেশী জোরে টানিতেছে বলিয়া চন্দ্র দূরে সরিয়া যাইতেছে। তবে উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আপনি যখন সূতা বাঁধা ঘূর্ণায়মান টিলটাব জোরে দিতেছেন তখন টিলটা দূরে সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই-সঙ্গে বেশী জোরেও ঘুরিতেছে। চন্দ্রের বেলা অতরূপ হয়—সেই চন্দ্রটা পৃথিবীস্থ স্ফীত জল টানের জন্ত দূরে সরিয়া যায় বটে কিন্তু যত দূরে যান তত আরও ঘোর। এই তফাৎটুকুর একটু কারণ রবারের সূতা বাঁধা টিলটা হাত হইতে যত দূরে যান তত সূতার টান তত বেশী হইবে। অর্থাৎ হাত ও টিল মধ্যে দূরত্ব বাড়িলে টান বাড়ে। চন্দ্র ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অতরূপ, এখানে দূরত্ব বাড়িলে আকর্ষণ কমিবে। গণিতের ভাষায় Inversely as the Square of the Distance. আকর্ষণের নিয়মের এই প্রভেদ জন্ত উপরোক্ত ঐ প্রভেদটুকু হয়। তা হইলে দাঁড়াইল এই।—পৃথিবীর উপরিভাগের স্ফীত জলরাশির আকর্ষণ ফলে চন্দ্র পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাহার পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণের সময় ক্রমশঃ পাইতেছে।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব এখন ২৪০০০০ মাইল পূর্বে কোনও সময় ২০০ হাজার মাইল দূরে ছিল। যখন আরও নিকটে ছিল তখন পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা খুব ভীষণ ভাবে হইত। পূর্বেই বলিয়াছি জোয়ার-ভাটা কারণ প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণ। চন্দ্র যখন নিকটে তখন আকর্ষণটা বেশী বেশী হইত। এখন জোয়ার-ভাটা সময় জল ৩০৪০ ফুটের বেশী উঠে উঠে না। যে চন্দ্রের দূরত্ব এখনকার অর্ধেক ছিল সে সময়ে জোয়ার-ভাটা জল অন্ততঃ ১৫০ ফুট উঠে উঠিত। দূরত্ব দ্বিতীয়াংশ ছিল তখন জল উঠিত ৬০০ ফুট উঠে। তৃতীয়াংশ ছিল তখন জল উঠিত ৩০০ ফুট উঠে। জোয়ার-ভাটার সময় বাপারটা কিরূপ হইত ভাবিয়া দেখুন।

আমাদের এখানকার উচ্চতা মাত্র ১৫০ ফুট। জোয়ারের সময়, বঙ্গদেশের মাথার উপর ৪০০ ফুট নীল জল ক্রীড়া করিত। আবার সে সময়ে দিনগুলিও ছিল ছোট ছোট। এখন জোয়ারের পব ভাঁটার জল ৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়, সে সময়ে হয়ত তিন কি চার ঘণ্টার মধ্যেই ভাঁটা আসিত। সমগ্র বাঙলা দেশের উপর হইতে ঐ চার শত ফুট উচ্চ জল ৩ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়া যাইত ও তাহার স্থলে বিস্তীর্ণ বালুকাময় বেলাভূমি চারিদিকে ধু ধু করিত। আবার ৩ ঘণ্টার মধ্যে এই উদ্ভাস জলরাশি ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিত। এই সময়ে পৃথিবীর উপরিভাগের ভাঙ্গা-গড়াব্যাপার খুব সমারোহের সঙ্গেই সম্পন্ন হইত। জোয়ারের সময় জল অনেক দূর পর্যন্ত উঠিয়া পাহাড় পর্বত ভাঙ্গিয়া মুক্তিকা আনিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিত। সেসময়ে পলি পড়িয়া খুব বিস্তীর্ণ ভূমি খুব শীঘ্র শীঘ্রই তৈয়ারি হইত। ভূতত্ত্ববিদেরা ভূপঞ্জরের স্তর নির্মাণ কার্যে যে একটা বেশ জোয়ার প্রাকৃতিক শক্তি খুঁজেন তাহা ইহাই। অতীতকালের এই ভীষণ জোয়ার-ভাঁটা পৃথিবীর স্তর-নির্মাণ-কার্যে বিস্তর সাহায্য করিত। পৃথিবীর বয়স লইয়া ভূতত্ত্ববিদ ও পদার্থবিদের মধ্যে একটা সালিসী নিম্নস্তি এইখানেই সম্ভব।

ঘাউক ভূতত্ত্বের কথা। পূর্বে চন্দ্র পৃথিবীর আরও নিকটে ছিল। কত নিকটে? ১০০০ মাইল, ৫০০ মাইল, ১০০ মাইল, ১ মাইল—তাহাই বা কেন? এমন এক সময়ে ছিল যে-সময়ে চন্দ্র একেবারে পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া ছিল। চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণের কাল ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এখন চন্দ্র ২৭ দিনে একবার করিয়া পৃথিবী চারিদিকে ঘোরে, পূর্বে ২০ দিনে একবার ঘুরিত। তাহার পূর্বে দশ দিনে। গণিতের হিসাবে দেখা যায় যে সময়ে চন্দ্র ও পৃথিবী একেবারে গায়ে গায়ে লাগাও ছিল তখন চন্দ্রের পরিভ্রমণকাল ছিল ৩ ঘণ্টা। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের পৃথিবীর দিবারাত্র ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহা সত্ত্বে যে পৃথিবীর কোনও সময়ে ৩ ঘণ্টায় এক অহোরাত্র হইত ও সে-সময়ে পৃথিবীর কতকটা অংশ বিচ্যুত হওয়া সম্ভব। চন্দ্রও সে-সময়ে পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া ৩ ঘণ্টায় একবার ঘুরিত। পৃথিবীর আবর্তন ও চন্দ্রের পরিভ্রমণ

দুইয়েরই এক সময়—৩ ঘণ্টা। তা হইলে এই দুইটা প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনওরূপ যোগ আছে। বিজ্ঞান এইখানে একটা দৃঢ় সূত্র খুঁজিয়া পাইল।

বিজ্ঞান তাহার অশেষ উজ্জ্বল চক্ষু অতীতের দিকে ফিরাইয়া স্পষ্টই দেখিতেছে যে এক সময়ে, বহু পূর্বে প্রায় ৫০ কোটি বৎসর পূর্বে চন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল না। কেবল একটা প্রকাণ্ড বায়ুবাশি ছিল। এই বায়ুরাশি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে ও তাহার ভারকেন্দ্রের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচনের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার আবর্তনের বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তবল অবস্থায় আসিবার পর কোনও সময় তাহার আবর্তনকাল হইল ৩ ঘণ্টা। এই তিন ঘণ্টা আবর্তনের ফলে যে কেন্দ্রোপসারিণী শক্তি বা Centrifugal force সঞ্চিত হইত তাহার ফলে তরল পিণ্ডটা বিধা হইয়া গেল এবং সমস্তটা ৩ ঘণ্টায় একবার করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিল। তরল পিণ্ডের এই অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না—গণিতের ভাষায় ইহাকে Unstable Equilibrium কহে। দুইটা অংশ হয় পুনর্বার মিলিত হইবে, নয় একটা আর-একটা হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। এই দুইটা ক্ষুদ্রপিণ্ড,—একটা আর-একটার ৮০ গুণ—কোনও কারণে (ঠিক কি কারণে বলিতে পারি না) শেযোক্ত পথ অবলম্বন করিল। ঐ ক্ষুদ্রপিণ্ড দুইটার মধ্যে বড়টা আমাদের পৃথিবী ও ছোটটি চন্দ্র। দুইটা যেমন বিচ্ছিন্ন হইল অমনি তাহাদের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা আরম্ভ হইল। এ জোয়ার-ভাঁটা জলের উপর বিশ বাইশ ফুট নহে—জলস্ত গলিত ধাতু ও অঙ্গার শত শত মাইল উচ্চে উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। জোয়ার-ভাঁটার ফলে পৃথিবীর ঘূর্ণনের বেগ হ্রাস পাইতে লাগিল, চন্দ্র দূরে সরিতে আরম্ভ করিল ও তাহার পরিভ্রমণকাল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—জোয়ার-ভাঁটার কোপটা চন্দ্রের ক্ষুদ্র কলেবরে খুব বেশা পরিমাণেই সহ্য করিতে হইত, ফলে তাহার আঙ্গিক গতি অতি দ্রুত ভাবেই কমিতে লাগিল। ক্রমে তাহার আবর্তন ও পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণের কাল এক হইয়া গেল। চন্দ্র তাহার একদিককার মুখ পৃথিবীর দিকে ফিরাইয়া তাহার চতুর্দিকে ২৭১০ দিনে ঘুরিতে লাগিল। স্বতরাং চন্দ্র জোয়ার-ভাঁটা শেষ হইয়া গেল। পৃথিবীর আবর্তনকাল

ইতিমধ্যে বাড়িতে বাড়িতে ২৪ ঘণ্টায় দাঁড়াইল। ইহাই চন্দ্র ও পৃথিবীর বর্তমান কালের অবস্থা।

বিজ্ঞান তাহার উজ্জ্বল দীপবর্তিকা হস্তে লইয়া ধীর-পাদবিক্ষেপে ভবিষ্যতের অন্ধকার আলোকিত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। কি দেখিতেছে? চন্দ্র-পৃথিবীর এই যে অবস্থা যাহাকে আমরা বর্তমান বলিতেছি তাহা চিরকাল এইরূপ থাকিবে না। পৃথিবীর দিন ও মাস ক্রমে-ক্রমে এক হইয়া যাইবে। সে সময়ে অহোরাত্রের পরিমাণ হইবে ৩৪০০ ঘণ্টা—চন্দ্র ঠিক ঐ সময়ে তাহাকে একবার প্রদক্ষিণ করিবে। অর্থাৎ চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর পরস্পরের মুখবর্তী হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। ঠিক যেন উভয়ে একটা অদৃশ্য দণ্ড দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে। এই অবস্থা প্রায় ১৫০ কোটি বৎসর পরে আসিবে। কিন্তু এই অবস্থাও ইহাদের শেষ পরিণাম নহে। সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা ইহাদিগকে বিচলিত করিবে। ফলে চন্দ্রের পরিভ্রমণ-কাল ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে, চন্দ্র পুনরায় পৃথিবীর নিকটে আসিবে, এবং বহু কোটি কোটি বৎসর পরে যে-স্থল হইতে চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেই ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইবে। চন্দ্রের পৃষ্ঠ হইতে প্রাকৃতিক শক্তির বাতপ্রতিঘাতের ফলে দিন-কতক উচ্চে উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া চন্দ্র পুনরায় জননীর কোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে, ইহাই চন্দ্রের পরিণাম। সম্ভবতঃ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহেবও ইহাই পরিণাম।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধধর্মের মহাসাঙ্গিক মত।

বুদ্ধদেব কখন পরিণিবৃত্ত হন, তাহার দিন তারিখ ঠিক নাই। লঙ্কাবাসীরা বলেন, তিনি খৃঃ পূঃ ৫৪৩ সালে নির্বাণ লাভ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বরাবর বলিয়া আনিতেছিলেন যে, এই গণনার ৬৬ বৎসরের ভুল আছে। তাহার পরে কাণ্টন নগরে চীনদেশে একখানি কাঠের পাটা পাওয়া যায়, উহাতে কতকগুলি ফোঁটা দেখা যায়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দিন হইতে বছর বছর ঐ পাটা সিন্দূকের ভিতর হইতে মহাসন্ন্যাসীরা বাহির করিয়া মঠের ভিক্ষুরা উহাতে একটি করিয়া ফোঁটা দিতেন। ফোঁটা গুণিয়া বৎসর ঠিক করিয়া লইতেন। তাহাতে ২৭৫টি ফোঁটা ছিল এবং ৪৩৮ খৃঃ সালে শেষ ফোঁটা দেওয়া হয়। স্তম্ভসংখ্যা ২৭৫—৩৮৮=৪৩৮ খৃঃ পূঃ সালে বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

অনেক বাতানুবাদের পর ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ৪৮৩ খৃঃ পূঃ সালেই তাহার নির্বাণ হয়।

ইহার পর একশত বৎসর বৌদ্ধদের মধ্যে কোনকণ সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে বড় আন্দোলন ছিলেন, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল ছিল। যে দিন বুদ্ধদেব মরেন, সেই দিন হস্তদ্বন্দ্ব নামে এক ভিক্ষু বলিয়া বলেন, “অঃ ঐতিহাসিক, কঠোর পানন হইতে আমাদের উদ্ধার হইল। এখন আমরা যা খুশী করিতে পারি।” যাহা হউক, স্থবিরেরা একত্র হইয়া রাজগৃহের নিকট সমুদ্রপাশে সন্মুখে এক সঙ্গীতি করিয়া সব গোলযোগ মিটাইয়া দেন ও বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপকে সংঘের করিয়া ধর্মশাসনের বচনপ্রদ করেন। তদবধি একজন করিয়া সংঘের থাকিতেন। তিনিই বৌদ্ধদের আঙ্গিল-কোট ছিলেন। কোনও গোলযোগ হইলে সকলে তাহার নিকটে গিয়া পড়িতেন। তিনি তাহা বলিতেন কাজ সেইকণ হইত।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টের ৩৪৩ বৎসর পূর্বে, সর্বকামী সংঘের ছিলেন। তাহার সময়ে ‘দশবন্ত’ নামক বৈশালীর বজ্রপুত্রদের সঙ্গে দলবলি হয়; তৎপশিলা হইতে পোষত আসিয়া “উদাহিক” করিয়া দল দলি মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈশালীওয়ালারা নাম লইল “বহাসাঙ্গিক”। বয়স, বিজ্ঞতা, বৈদ্য, বুদ্ধি, পদার-প্রতিপত্তিতে মহাসাঙ্গিকের বিরুদ্ধ দল ধেরাবাদীরা বড় ছিল। ধেরাবাদীদের ইতিহাস পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু মহাসাঙ্গিকদের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা কপিফের সময় হইতেই বিধাসংঘাৎ; কারণ, তাহার সময়ই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রবেশ হয়। খৃঃ পূঃ ৩৮০ হইতে খৃঃ পূঃ ৭৫ মহাসাঙ্গিকদের ইতিহাস অন্ধকার।

অশোকের অনুগ্রহে পাইয়া ধেরাবাদীরা প্রবল হইয়া উঠে। ইহার পরই ৪০৫০ বৎসরের মধ্যে ঘোরান্নাদের বিশাল সৈন্যতা আক্রমণ পেল। যিনি ভাবিলেন, তিনি শুদ্ধ গোত্রের একজন সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ। তাহার নাম পুষ্যমিত্র। তিনি বৌদ্ধদের উপর যোঁসড়ের অভ্যুত্থার করিতে আরম্ভ করেন। এ অভ্যুত্থার হইতে মহাসাঙ্গিক দল অনেকটা রক্ষা পাইয়াছিলেন। ধেরাবাদীদের নিখ্যাতনে মহাসাঙ্গিকেরা কতকটা হিন্দুদের দিকে চলিয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার বুদ্ধদেবকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। তাহাই প্রথমে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়া বিহারে স্থাপিত করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুঁথি-পাঁজা সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় লেখা হইত। তাহারা বুদ্ধদেবকে “মহাবন্ত” বলিয়া মনে করিতেন। ধেরাবাদীরা বিনয়ের কঠোর শাসনে বদ্ধ ছিলেন। ইহার ত গোড়া হইতেই সে শাসনের কঠোরতা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার দলনশাসনের নিকট অধিক চলিয়া পড়িলেন।

ধেরাবাদীরা মনে করিতেন, বিনয়ের নিয়ম রক্ষা করিতে করিতে তাহাদিগের চরিত্র বিকৃত হইবে এবং চরিত্র বিকৃত হইলে তাহার অনেক জন্মের পর এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, মুক্তি পথ হইতে তাহাদিগকে আর ফিরিতে হইবে না। এইরূপ অসংকে তাহারা শ্রোতাপত্তি বলিতেন অর্থাৎ শ্রোত পড়িলে যেমন মানুষ যত ফিরে না, ক্রমেই একনিকে আসিয়া যায়, সেইরূপ তাহারাও নিবৃত্তির নিকে আসিয়া যাইবেন। আরও কিছু দিন পরে তাহার এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, তাহাদিগকে আর একবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকে তাহারা সন্ধনানামী অবস্থা বলিতেন। আরও অগ্রসর হইলে তাহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, ইহার নাম অনাগামী অবস্থা। ইহাও পর তাহারা অর্জন হইবেন। কিন্তু তাহারা মুক্তি পাইবেন না, অর্থাৎ ইহা

বসিয়া থাকিবেন। আবার নূতন বুদ্ধ আসিলে তাঁহারা সেই বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া নির্বাণ আশ্রয় হইবেন অর্থাৎ নিব্বাণ ঘাইবেন। তাঁহারা আর জন্মগ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা জন্ম-জরা-মরণের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহারা কর্ণের দ্বারা ই মুক্তি হয় ভাবিতেন।

মহাসাভিকেরা মনে করিতেন, বিনয় প্রথম প্রথম কতকটা দরকার হয় বটে, চরিত্রবলে কর্তব্যে কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এমন স্থানে উপস্থিত হন যে, কর্তব্য চরিত্র বিনয়ে তাঁহাদের কোনই সাহায্য হয় না, তখন জ্ঞান চাই, সে জ্ঞানলাভের উপায় স্বতন্ত্র— উপকরণ স্বতন্ত্র।

গেড়ার কথা উঠিয়াছিল, বুদ্ধদেব লৌকিক অপর মানুষের মত, না অলৌকিক, যেমন সেবতা? খেরাবাদীরা বলিতেন, তিনি মানুষ, মহাসাভিকেরা বলিল, না, তিনি লোকোত্তর; তাই মহাসাভিকদের আর-এক নাম হইল লোকোত্তরবাদী। তাঁহারা বলিতেন, বুদ্ধদেবের কোনও আশ্রয় ছিল না অর্থাৎ কোনও দোষ ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার অহংবুদ্ধি ছিল না, অজ্ঞান ছিল না, এবং জন্মমৃত্যুর তিনি অতীত ছিলেন। খেরাবাদীরা বলিত, প্রথম দুইটি কথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু শেষটি ঠিক হইল কেনন করিয়া? তিনি মানুষ ছিলেন, তাঁহার আশ্রয়ও ছিল। মহাসাভিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব কখনও একটি কথা কহেন নাই, তিনি বাহাই বলিতেন, তাহাতেই উপদেশ পাওয়া যাইত। শোওয়া, বসা, দাঁড়ান ও পাইচারা করা এই চারিটিকে ঈর্ষাপাণ্ড বলে। বুদ্ধদেব যে-কোন ঈর্ষাপাণ্ডেই থাকুন, তাঁহার দ্বারা কেবল লোকের উপকারই হইত। খেরাবাদী বলিতেন, এ আদৌ সত্য নহে, তিনি মানুষ ছিলেন, মানুষের মত তাঁহাকে খাওয়া-দাওয়া করিতে হইত, পাইচারা করিতে হইত, দাঁতন করিতে হইত, স্থান করিতে হইত। এই-সকলের জন্য লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে হইত, লজ্জা করিতে হইত। এই-সকলের দ্বারা লোক উদ্ধার হইবে কিরূপে? তিনি অথবা কথ্য কহিতেন না, বাজে কথ্য কহিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার সকল কথায়ই যে লোক উদ্ধার হইত, এটা বড় বেশী কথা। মহাসাভিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেবের ঘুম ছিল না, স্তব্ধতাও স্বপ্নও ছিল না। খেরাবাদীরা বলিতেন, স্বপ্ন ছিল কি না জানি না, কিন্তু তিনি ত মানুষ, ঘুম ছিল না, সে কি কথা? মহাসাভিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব নিরন্তরই সমাধিস্থ থাকিতেন; স্তব্ধতাও কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিলে তাঁহাকে ভাবিতে হইত না। তিনি একেবারেই তাহার জ্ঞান দিতে পারিতেন ও দিতেন। খেরাবাদীরা বলিতেন, তাঁহাকেও ভাবিয়া জবাব দিতে হইত। খেরাবাদীরা বলিত, কৈ, বুদ্ধদেব ত নিজে কখন বলেন নাই, যে, তিনি লোকোত্তর, ভবে তোমরা তাঁহাকে “লোকোত্তর” “লোকোত্তর” বলিয়া গোল কর কেন? তাঁহার মতে বাহা পরমার্থ, তাহাই তিনি শিখাইতেন, তিনি ত কখন বলেন নাই যে, তিনি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া এই-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতির ফলে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, শিবাদিগকেও তাহাই উপদেশ দিতেন। মহাসাভিকেরা বলিতেন, সত্য, কিন্তু পড় দেখি বুদ্ধের উপদেশ, পড় দেখি তাঁহার সূত্রান্ত, দেখ দেখি, তাহাতে কত গভীর ভাব, কত গভীর উপদেশ, কত গুঢ় তথ্যকথা আছে। সাধারণ মানুষের সাধ্য কি সে-সব কথা কয়, সে ভাব মনে ধারণা করে, সে-সব গুঢ়তর আবিষ্কার করে।

এই-সকল কথা হইতেই মহাসাভিক ধর্মের উৎপত্তি হয়।

(নারায়ণ, মাঘ)

ঐহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শেষরাত্রি

(গল্প)

সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। খুব জ্বর হইছিল, মাথায় অসহ্য বেদনা। টেবিলের বাতিটা খুব কমানো ছিল, এমন সময় সুনলুম চুড়ির টুংটাং। প্রথমে ভেবেছিলুম আমার ভাই ননী বুঝি জিনিসপত্র নাড়চে, তারপরে দেখলুম তা নয়, সে আর-একজন। আমার মাথার ঠিক ছিল না; বললুম, কে ওখানে?

কোন জবাব এল না; মাথাব কাছে আঙুলে আঙুলে কে এসে বসল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, কে ও? এবার আমার অত্যন্ত কাছে নত হয়ে চুপিচুপি সে বললে, আমি—বৌ।

বুলুম সে আমার স্ত্রী হেমলতা। আমি আঙুলে আঙুলে তার হাত দুটি টেনে এনে আমার কপালের উপর রাখলুম, গভীর বিশ্বাসে, অসহায় শিশুর মত, অল্পভব করতে লাগলুম তার কোমল আঙুলগুলি, স্বদীর্ঘ, সক্রমণ, তার বড় বড় কালো চোখ দুটির মত, আমার চুলের মধ্যে। তার মনের সমস্ত কথা এই আঙুল কটির মধ্যে দিয়ে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল, জ্যোৎস্না যেমন অন্ধকারের মধ্যে খিতিয়ে পড়ে, সেই-রকম।

অনেকক্ষণ পরে আবার চোখ মেললুম, মাথার ওপরে সেই কাজল-চোখের সজল দৃষ্টি, প্রত্যাহারের গুহ্যতারটির মত গভীর, করুণ, দীপ্তিময়;—সেই তার নীরব ভাষা যা তার শুভ্র আঙুলগুলি থেকে এতক্ষণ নিষ্পন্নিত হচ্ছিল, আমার প্রত্যেক শিবা উপনিবার মধ্যে দিয়ে;—সেই তার সীমন্তের স্বদীর্ঘ সিঁদুরের রেখাটি, যেখানে তার প্রেমের চিব অরুণরূপ স্নিগ্ধজ্যোতি বিকিরণ করচে, বাইরের ঐ জ্যোতির্ময় নক্ষত্রলোকের মত। তার লালপেড়ে শাড়ির ঐ বন্ধি রেখাটি, তার নিটোল চিবুকের মাঝখানের কৃষ্ণ তিলটি, তার মুহূ বসন-গঙ্গটি, তার সমস্তটি—সে যে আমার অত্যন্ত কাছে আছে, এই অহুত্বিতুকু পর্যন্ত সেদিন আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগছিল। কিন্তু সব চেয়ে ভালো লাগছিল, তার ঐ সিঁদুরের উজ্জ্বল রেখাটি, যা সে কেবল আমারই ক্ষেত্রে পরেচে, যা কেবল আমারই অন্তরের রঙ, আমারই একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি।

তার ঐ সিঁড়রের হৃদয় রেখাটি আমি জীবনে ভুলব না—আর ভুলব না তার চরণপল্লব দুটি, আমার হৃদয়ের রঙে রক্তিম স্বকোমল। কি অসীম সঙ্কোচে সে দিন সে তার পা দুটি ঢেকে রেখেছিল। আজ মনে পড়ে, পাশ ফিরতে গিয়ে আমার ডান হাতখানা তার পায়ের ওপর পড়ল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। আশ্চর্য্যে তার টুকটুকে রাঙা ঠোঁট-দুটি স্পর্শ করলে, আমার দুই পায়ের ওপর,—সূর্য্যাস্তের শেষবিদায়ের অন্তিমরেখাটি ধেমন করে পাহাড়ের মাথাটি ছুঁয়ে মিলিয়ে যায়।

আমার পায়ের ওপর সে সেদিন মূখ ঢেকেছিল, নভবস্ত পদ্মফুলটির মত—আমি আজ আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তার সেই নিঃশব্দ চরণদুটি ঢেকে রেখেছি। তার ঘনকুন্তল ধেমন করে তার পিঠটিকে ছেয়ে রাখত, তেমনি।

অনেকক্ষণ পরে সে আবার উঠে এসে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। আমি তার হাতখানি বুকের মধ্যে নিয়ে, তার সেই স্তম্ভ কচি আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। তার চুড়ি নিয়ে টুংটাং করতে লাগলুম। তার আরক্ত নখপ্রান্তের ওপর হাত বুলোতে লাগলুম। সে যেন আমার খেলার সামগ্রী এমনি ভাবে। সেও ত সোদন কিছু বলেনি। সেও সেদিন আপনাকে বিছিয়ে দিয়েছিল, একখানি ছবির মত, আমার চোখের সমুখে, গভীর বিশ্বাসে, অনন্ত নির্ভরতায়।.....

তার হাতখানি বুকে ধরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে যখন উঠলুম, আগেকার চেয়ে ঢের ভালো আছি—কিন্তু শিরেরে সে নেই, আছে একখানা খোলা টেলিগ্রাম।—

‘হেমমতা পরন্তু রাত্রে মার। গেছে।’*

* এই গল্পটি নাম টিকানা বিনাই আমাদের কাছে এসেছে, লেখক বা লেখিকা অমুগ্রহ করে। তাঁর নাম জানালে চৈত্র মাসে বাৎসরিক স্মৃতিতে তাঁর নাম দেওয়া যাবে।

—প্রবাসীর সম্পাদক।

প্রবাসীর-পুরস্কার

আগামী বৎসর দুটি প্রবন্ধের জন্য নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কার নামে দুইটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ ১০০ টাকা পরিমিত। বিষয় দুইটি নীচে দেওয়া হইল।

(১) অল্প মূলধনে আমাদের দেশের বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিসের কারখানা সহজে স্থাপিত হইতে পারে, কি উপায়ে উহা পরিচালিত হইতে পারে এবং উহার সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার প্রমাণ কি। এবং ঐ কারখানা পরিচালনের উপযোগী লোকের নাম ও তাহাদের শিক্ষার পরিচয় যদি জানা থাকে তাহাও নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) জাতীয় শিক্ষার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ কি, বিশেষ ভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি কি পরিমাণে জাতীয় শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে; হিন্দু বালিকাদের উপযোগী শিক্ষা কি এবং কি সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য সম্ভবপর উপায়ে দেশ-মধ্যে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে এবং এজন্য দেশের লোকের কর্তব্য কি?

প্রত্যেকটিতে, গভর্ণমেণ্টকে কি করিতে হইবে এবং দেশবাসীদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিতে হইবে, এবং অত্যাচ্ছ দেশের গভর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীবর্গ তত্ত্বদেশের শিল্প ও জাতীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন কবিয়াছেন হাবশ্বকমত তাহার উল্লেখ ও বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থাদি হইতে এই-সব বৃত্তান্ত গৃহীত হইল তাহার নাম ও পত্রাক্ষ দিতে হইবে। ইংরেজি কিছু উদ্ধৃত কবিলে তাহার বাংলা অম্বুবাদ দিতে হইবে।

পুরস্কারের জন্য আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৪) তারিখের মধ্যে রেজেষ্টারী ভাঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদকের নামে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের উপর “প্রবাসী-পুরস্কারের

জন্ম" লিখিয়া দিতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি এবং পুরস্কার-প্রতিযোগী প্রবন্ধের মধ্যে যে চারটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুস্তিকাকারে বা যে-ভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের থাকিবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ যিনি ফেরৎ চান তিনি পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী দুই আনা সমেৎ ডাকমাণ্ডল পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গেই লেখকের নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। একটিও প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহ পুস্কার পাইবেন না বা কোনটিই প্রকাশিত হইবে না।

ইচ্ছা করিলে একজন দুই বিষয়ে রই প্রবন্ধ পাঠাইতে পাবেন। একাধিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুস্কার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমাদের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ, বিচারফল প্রকাশের পূর্বে, অথবা আমাদের নির্বাচনের পর আমাদের নির্বাচিত ও পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনা, লেখক বা অপরা কেহ আমাদের বিনা অমুমতিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ করিতে পাবিবেন না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

গুনস্—বর্তমান বৎসরের “নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কারের” ফল আগামী চৈত্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ করা যাইবে; ও কোনো রচনা পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইলে আগামী ১৩২৪ সালে প্রবাসীতে ছাপা হইবে।

প্রবাসীর সম্পাদক।

পুস্তক-পরিচয়

বীরভূম-বিবরণ—মহারাজকুমার শ্রীমহিমারঞ্জন চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, হেতমপুর রাজবাটী হইতে প্রকাশিত। রয়াল ৮ অং ২৫০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, ৫১ খানি চিত্রে শোভিত। মূল্য দুই টাকা। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বহু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ভূমিকা লিখিয়াছেন।

বীরভূম-মমুসকান-সমিতি স্থাপন করিয়া মহারাজকুমার বীরভূমের ইতিহাস সংগ্রহের জন্ত বীরভূমের পত্নী ও তীর্থক্ষেত্রের কাহিনী, প্রবাদ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বীরভূম-বিবরণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রধানত হেতমপুরের কাহিনী ও রাজবংশের লোকদের ও কীর্তিকলাপের ছবি সংগৃহীত হইয়াছে। হেতমপুর ছাড়া—(১) ভদ্রপুর, (২) হুপুর (৩) ভাণ্ডারবন (৪) বজ্রেশ্বর (৫) মঙ্গলভিহি (৬) জোফলাই (৭) কেন্দুবিহি ও (৮) জামারপার গড় বা ত্রিষটিগড় বা চেকুর নামক স্থানগুলির বিবরণ আছে।

নগেন্দ্রবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“ভদ্রপুর-কাহিনীতে মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি বাহা পূর্বে কোন ইতিহাসে প্রকাশিত হয় নাই।” নগেন্দ্র বাবুর ভূমিকায় বহু জাতব্য পুরাতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। বীরভূম বহু কীর্ত্তমান লোকের জন্মভূমি। জয়দেব, চণ্ডীদাস, লাউসেন, ইছাই ঘোষ, নন্দকুমার বীরভূমের লোক। এই বিবরণ হইতে ইহাদের বহু কীর্ত্তির পরিচয় প্রকাশিত হইবে। এবং এই সমস্ত বিবরণ হইতে ক্রমে বঙ্গের ইতিহাস মালমসলা সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ হইবার পথ পাইবে।

এইজন্ত মহারাজকুমার বঙ্গবাসী মাত্রেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন।

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার—দ্বিতীয় খণ্ড, হুঙ্গ রাজবংশ, কুমার শ্রীশৌরীজ্ঞকিশোর রায়গৌরী প্রবীত, রামগোপালপুর রাজবাটী। মূল্যের উল্লেখ নাই। কাপড়ে বাঁধা, হৃদয়।

প্রথম খণ্ডে পরগণা ময়মনসিংহের প্রাচীন জমিদারবংশের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। এইখণ্ডে হুঙ্গ রাজবংশের ধারাবাহিক বিবরণ আছে। কান্তকুজবাসী সোমেশ্বর পাঠক প্রথম হুঙ্গের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজবংশে বহু বীর, সাহিত্যরসিক ও কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই-সব কারণে এই প্রাচীন রাজবংশের বিবরণ পাঠের যোগ্য। এইরূপে খণ্ড খণ্ড বংশ ও স্থানের বিবরণ সংগ্রহ হইতে হইতেই বঙ্গের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গঠিত হইবার সুযোগ ঘটবে। কুমারের এই উত্তম প্রশংসনীয়। আমরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এই বইখানি পাঠ করিয়াছি; অত্যন্ত ইতিহাসজিহ্বা পাঠক ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন।

মহারাজসম।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

১৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২৩

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতরক্ষক সেনা ।

স্বাধীনজাতির একটা লক্ষণ এই যে তাহারা নিজের দেশ নিজেই রক্ষা করে, এবং আত্মরক্ষা ও স্বদেশরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে পারে। জন্মভূমির রক্ষার ভার নিজের হাতে না থাকা বড় অপমানের কথা। জন্মভূমির রক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকা কেবল যে অপমান তাহা নয়; ইহা হইতে কাণ্ডরূপতা আসে, এবং মহুষ্যত্ব রক্ষার সব উপায় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়। বিদেশী প্রবল জাতি দেশ আক্রমণ করিলে আমরা আমাদের বর্তমান যুদ্ধশিক্ষাবিহীন নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতে পারিব না, ইহা ত সুনিশ্চিত; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও লজ্জার বিষয় এই যে, যদি দিনে দুপুরে দু চার জন চোর বদমায়েস আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আসে ও মাতা ভগিনী বধু কন্যাদিগেব অপমান করিতে চেষ্টা করে, সে অবস্থাতেও, নিরস্ত্র বলিয়া এবং আত্মরক্ষা করিতে, যুদ্ধ করিতে, অনভ্যস্ত বলিষা, যথেষ্ট বাধা দিতে ও সমুচিত প্রতিকার কবিতো আমরা সমর্থ হই না।

এইরূপ কথা আমরা অনেকবার লিখিয়াছি। এখন গবর্ণমেন্ট ভারতরক্ষক-সেনা-আইন অনুসারে ১৮ হইতে ৪১ বৎসর বয়সের স্বস্থদেহ ভারতবর্ষীয় পুরুষদিগকে সৈনিক হইবার সুযোগ দিয়াছেন। এই আইন

অনুসারে যাহারা সিপাহী হইবেন, তাহারা বর্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিবে, এবং যুদ্ধাবসানের ছয়মাস পর পর্যন্ত, ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে-কোন স্থানে আবশ্যক, যুদ্ধ বা সেনাদলসম্পৃক্ত কাজ কবিতো বাধ্য থাকিবেন। ভারত-সাম্রাজ্যের বাহিরে তাহাদিগকে যাইতে হইবে না। আপাততঃ তাহাদিগকে যুদ্ধশিক্ষা করিতে হইবে। সিপাহীদের মত বেতনাদি তাহারা পাইবেন।

যুদ্ধশিক্ষা করিবার, দেশরক্ষা, আত্মরক্ষা, নিজ-নিজ মাতা কন্যা বধু ছুহিতার মান ইজ্জৎ রক্ষা করিবার সামর্থ্য লাভের এই যে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, সমর্থ বয়সের কোন স্বস্থদেহ পুরুষের ইহা হেলায় হারান উচিত নয়। প্রত্যেকের সিপাহী হওয়া উচিত।

স্বরাজ ও আত্মরক্ষা, এই দুটি একই জিনিষের দুই পিঠ। যে স্বরাজ চায়, তাহাকে স্বদেশ রক্ষার ভারও লইতে হইবে। তুমি আমি স্বরাজ পাইয়া রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব করিব, কিন্তু দেশরক্ষা ও তোমার আমাব পরিবার পরিজন রক্ষা অপরে করিবে, ইহার মত হাস্যকর কথা আর কি হইতে পারে? ইহা কল্পনা করিতেও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়।

ভারতরক্ষক-সেনা-আইনে যে-সব দোষ ত্রুটি আছে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু সে-সব পরের কথা। এখন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারাই যথাসম্ভব দেশরক্ষার শক্তি অর্জন করিতে হইবে।

আমার বাড়ী যদি কেহ আক্রমণ করে, আমার মা

ভগিনী বধু কষ্টাদিগকে কেহ যদি অপমান করিতে আসে, তখন কি আমি বলিব, “ইংরেজের যেমন অস্ত্র আছে, আমরা তাহা নাই; ইংরেজের যেমন বেতন পাই, তাহা আমি পাই না; ইংরেজের যেমন উচ্চ সেনানায়ক হয়, আমরা তাহা হইবার অধিকার নাই;—অতএব আমি আমার মা ভগিনীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিব না।” এমন নির্বোধ কাপুরুষের কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। মা ভগিনী বধু কষ্টার সম্মান বক্ষাব জন্য, পুরুষ যে, সে ইটপাথর লাঠি বাঁটা না তলোয়ার বন্দুক বর্ষা, যা হাতের কাছে পায় তাই লইয়াই লড়ে। কোন অস্ত্রই যদি না থাকে, তাহা হইলেও সে লাঠি ঘুষি কীল চড় মারে। তাহাও যদি না পারে, তাহা হইলে নিজের দেহটা আততায়ী ও মা ভগিনীদের মাঝখানে ফেলিয়া তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে।

আমরা বলি, জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরীয়সী; আমরা গান করি, বন্দে মাতরম্; গান করি, বঙ্গ আমার জননী আমার। এ সব কি কল্পনা, না ভাবুকতা? কল্পনাও নহে, ভাবুকতাও নহে। জন্মভূমির স্বর্ণ মাতৃ-স্বপ্নেরই মত অপরিশোধ্য। জন্মভূমি আমাদের জন্য বাহা করেন, তাহা আমরা অনেক সময়, ভাবিয়া না দেখায়, বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক কিন্তু জননীর মত জন্মভূমিরও দান অতুলনীয়। জননীকে ও জন্মভূমিকে সর্বপ্রকার অমঙ্গল ও লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করা, দেশরক্ষা বলিতে উভয়ই বুঝায়।

অতএব, জননীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেমন আমরা অস্ত্রের ভাল মন্দ বিচার কবি না, অপরের কি স্বধ্ব স্ববিধা পদমর্যাদা আছে তাহা ভাবিয়া দেখি না, যে উপায়ে পারি মাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করি; তেমনি দেশরক্ষার সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য আমরা যতটুকু সুযোগ পাই, যেরূপ অস্ত্র ও পদ পাই, তাহাই আগ্রহেব সহিত গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ শিখিতে লাগিয়া যাই। ইহাতে কোন দ্বিধা করিবার কারণ নাই।

বিপদ কোথায় ?

প্রশ্ন হইতে পারে, বিপদ কোথায় যে যুদ্ধসজ্জা করিতে বলিতেছেন? যে কোন মুহূর্ত্তে ঝড়ের মত বিপদ আসিয়া

পড়িতে পারে। কিরূপে কৌনন্দিক হইতে বিপদ আসিতে পারে, তাহার আলোচনা মধ্যে-মধ্যে গত আড়াই বৎসর ধরিয়া করিয়াছি। গত ফেব্রুয়ারী মাসের মজার-রিভিউএ তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আর যদি সদ্য-সদ্য এখন কোন বিপদ না-ই ঘটে, তাহা হইলেই কি প্রস্তুত হইবার আবশ্যক নাই? বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে তাহার পর কি গৃহস্থ তলোয়ার গড়াইবার জন্য কামারের বাড়ী যায়, না লড়াই শিখিবার জন্য ওস্তাদেব আখড়ায় যায়? ওস্তাদের কাছে লড়াই আগেই শিখিয়া রাখিতে হয়, তলোয়ার আগেই গড়াইয়া শাণ দিয়া তাহা চালাইবার কৌশল অভ্যাস করিয়া রাখিতে হয়। আর, শত্রু যে বিদেশ হইতেই আসে বা আসিবে, তাহাও ত নয়। দেশেই ছুর্বৃত্ত লোক রহিয়াছে। তাহারা কি ডাকাতি করিয়া লুণ্ঠন করিতেছে না, তাহাদের হাতে মধ্যে-মধ্যে কি মানুষ খুন জখম হইতেছে না, তাহাদের দ্বারা নারীর লাঞ্ছনা ও সর্বনাশ কি হইতেছে না? যুদ্ধ শিখিলে, অস্ত্র চালাইতে জানিলে, এইসব অত্যাচারের প্রতিকার হইবে।

ছাত্রদের জন্য যুদ্ধশিক্ষার ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বিদ্যালয় হইতে ছাত্র-সেনাদল গড়িবার চেষ্টা করা হউক। কলেজের ছাত্রেরা যে যে শহরে থাকে, সেখানেই তাহাদের যুদ্ধশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে ডিলের সময় ছাড়া অন্য সময়ে তাহারা কলেজে উপস্থিত হইতে পারিবে। তত্ত্বিন্ন এইরূপ ব্যবস্থাও করা উচিত যে তাহারা যুদ্ধশিক্ষা করিবার জন্য অধ্যাপকের কোন উপদেশের সময় অনুপস্থিত থাকিলে, তাহাদিগকে উপস্থিত বলিয়া গণনা করা হইবে। সাধারণ সেনাদলের জন্য পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ নিয়ম ত করিয়াছেনই; অধিকন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কোন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সিপাহী হইয়া সৈনিককাজে ব্যাপৃত থাকার জন্য যদি যথাসময়ে বি-এ পরীক্ষা দিতে না পারে, এবং যদি তাহার অধ্যাপকেরা তাহাকে এরূপ সার্টিফিকেট দেন যে সে কলেজে চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীতে পড়িয়া পরীক্ষা দিলে তাহার পাস হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হইলে সে

পরীক্ষা না দিয়াই বি-এ, উপাধি পাইবে। জ্ঞানবত্তার সম্যক প্রমাণ ব্যতিরেকে জ্ঞানপরিচায়ক কোন উপাধি দেওয়া আমরা ভাল মনে করি না। ভাবতরক্ষক সেনাদলের জন্য একরূপ নিয়ম করিবার প্রয়োজনও নাই; কিন্তু যুদ্ধশিক্ষার জন্য কলেজে অল্পপস্থিতিকে হাজরী বলিয়া গণনা করিতে কোন দোষ নাই। এ-নিয়ম করা উচিত ও আবশ্যিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজসমূহের কর্তৃপক্ষেরা ছাত্রসেনাদল গঠনে উদ্যোগী হইলে বড় ভাল হয়।

চরিত্র, প্রতিভা ও সামর্থ্যের মাপকাঠি।

এক-এক জন মানুষের চরিত্র, প্রতিভা ও সামর্থ্যের আমরা যখন বিচার করি, তখন আমরা একরূপ মনে করি না, যে, যাহার জমীজমা টাকাকড়ি যত বেশী, তাহার চরিত্র তত ভাল এবং তাহার প্রতিভা ও সামর্থ্য তত বেশী। কিন্তু এক একটি জাতির উৎকর্ষ অপকর্ষের আলোচনার সময় লোকে এইরূপ ভুল করিয়া থাকে। যে-সব জাতির সাম্রাজ্য রাজ্য ধনসম্পদ বেশী, তাহারাই বেশী পরিমাণে এই ভ্রমের অধীন হয়। এইরূপ মনে কবা হয় যে সাম্রাজ্যের বা রাজ্যের বিস্তৃতি এবং ঐশ্বর্য, চরিত্র প্রতিভা ও সামর্থ্যের মাপকাঠি; যে জাতি যত পররাষ্ট্র দখল করিয়া ধনশালী হইয়াছে, তাহার তত চরিত্রবান্, প্রতিভাশালী ও সমর্থ। বাস্তবিক কিন্তু সম্প্রতি যেমন ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রবত্তা, প্রতিভাশালিতা ও সমর্থ্যের পরিচায়ক না হইতে পারে, উহা তেমনি জাতিবিশেষেরও সচরিত্রতা, প্রতিভাশালিতা ও সামর্থ্যের পরিচায়ক না হইতে পারে। অনেক মানুষের সম্বন্ধে যেমন শুনা যায় যে তাহার নানাবিধ অসাধু উপায়ে ধনী হইয়াছিল, জাতির পক্ষেও তেমনি এ কথা খাটিতে পারে।

মানুষ মোটা, ওজনে ভারী, বা লম্বা হইলেই যেমন সম্মানার্থ হয় না, গুণেবই আদর কবিতে হয়; তদ্রূপ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, জাতির লোকসংখ্যা, বা জাতির ধন দেখিয়াই সম্মান কবা যায় না, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ, প্রতিভা, পৌরুষ, মানবহিতৈষণা, প্রভৃতি অল্পসারে জাতির সম্মান করিতে হয়।

যুদ্ধস্বর্ণ।

যুদ্ধব্যয়ে সাহায্যার্থ ইংলণ্ডকে দান করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেন্ট দেড়শত কোটি টাকা ঋণ করিতেছেন। ভারত-গবর্ণমেন্টে এই ঋণের সুদ বৎসরে মোটামুটি ৮ কোটির উপর টাকা দিতে হইবে। সুদটা ট্যাক্স বশতই ভারতবর্ষ হইতেই উঠান হইবে। যাহা বা গবর্ণমেন্টকে ঋণ দিবে, তাহারাই এই সুদ পাইবে। ভারতবাসীরা ১৭০ কোটি টাকা গবর্ণমেন্টকে ঋণ দিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। বিদেশের লোকে যত বেশী পরিমাণে ঋণ দিবে, সুদের আকারে তত বেশী টাকা তাহারাই পাইবে, সুতরাং আমাদের দেওয়া ট্যাক্স সেই পরিমাণে বিদেশে চলে যাইবে। এইজন্য যতটা সম্ভব, দেশের টাকা দেশে রাখিবার জন্য এবং নিজ নিজ আয় বাড়াইবার জন্য, দেশের লোকে গবর্ণমেন্টকে ঋণ দিলে ভাল হয়। সুদ শতকরা বার্ষিক ৫ ও ৫½ টাকা; সাধারণ কোম্পানীর কার্যের সুদের চেয়ে বেশী। যাহা বা ধনী নহে, তাহারও অল্প পরিমাণে গবর্ণমেন্টকে ঋণ দিতে পারে। ডাবলিং ৭৫০, ১৫০০, ৩৮৫০ এবং ৭৭০০ দিলে যথাক্রমে ১০, ২০, ৫০ ও ১০০ টাকার সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে। এই ১০, ২০, ৫০, বা ১০০ টাকা পাঁচ বৎসর পবে পাওয়া যাইবে। তাহার পূর্বেই যদি কেহ টাকা ফিরাইয়া লইতে চান, তাহা হইলে ৭৫০র সার্টিফিকেট দেখাইয়া এক বৎসর পবে ৮৮৫, দুবৎসর পবে ৮৮০ তিনবৎসর পবে ৮৭৫ এবং চার বৎসর পবে ৮৭০ পাইবেন। ৭৫০র বেশী টাকার সার্টিফিকেটগুলি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম আছে।

যুদ্ধের জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের দান।

এখন যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রত্যাহ সাড় সাড় সাত কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। এই ব্যয়ের বিধান নির্বাহ করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে দেড়শত কোটি টাকা দান করিতেছেন। ভারত-গবর্ণমেন্টের তহবিলে এত টাকা নাই, সুতরাং ঋণ করিয়া এই টাকা দিতে হইতেছে। এই দেড়শত কোটি টাকার যুদ্ধের কেবল মাত্র কুড়িদিনের ব্যয় নির্বাহ হইবে। সুতরাং ইহাতে যে ইংলণ্ডের বিশেষ সাহায্য হইবে, এমন বোধ হয়

না। অজ্ঞদিকে, ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ। এই ঋণ শোধ দিতে এবং ইহার সুদ দিতে ভারতবর্ষকে অতিবিক্র ট্যাঙ্কের গুরুভার বহন করিতে হইবে। অন্যান্য ত্রিশবৎসব আমাদিগকে বেশী করিয়া ট্যাঙ্ক দিতে হইবে। তাহার পরও অতিরিক্ত ট্যাঙ্ক যে উঠিয়া যাইবে, এমন বোধ হয় না। কারণ ট্যাঙ্ক একবার বসিলে তাহা কচিং উঠে; একেবারেই উঠে না, এমন অবশ্য বলা যায় না। অতিরিক্ত ট্যাঙ্ক দিয়াই যে আমরা নিরুত্তি পাইব, তাহা নহে। যুদ্ধের পূর্বেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতির জন্ত দেশের লোক গবর্ণমেন্টকে অর্থব্যয় করিতে বলিলে গবর্ণমেন্ট বরাবর টাকা নাই বলিয়া ওজর করিয়া আসিতেছেন। অতঃপর ঋণশোধ ও ঋণের সুদ দেওয়া এই দুই কারণে আরও বেশী করিয়া গবর্ণমেন্ট এই ওজর করিবেন বলিয়া মনে হয়। সেই জন্ত দেশে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে হইবে না। দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিও যথেষ্ট পরিমাণে হইবে না।

এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যুদ্ধের জন্ত যে কিছু করেন নাই, তাহা নহে। অবশ্য ভারতের শত্রু কতবগুলি বিলাতী কাগজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ, এবং তাহাদের মস্ত্র দীক্ষিত কতকগুলি লোক বরাবর চীৎকার কবিয়া আসিতেছে যে ভারতবর্ষ কিছু করিতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী, বড়লাট, সেক্রেটারী অব ট্রেট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী এবং রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষ যাহা করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। এইজন্ত আমরা ভারতবর্ষের নিম্নকদের কথার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে কবি।

আমাদের বিবেচনায় ঋণ করিয়া দেড়শত কোটি টাকা দান করা ঠিক হইতেছে না।

এই দানকে গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের স্বেচ্ছাকৃত দান বলিতেছেন, এবং আমাদের দেশেরও কোন কোন লোক ইহাকে আমাদের দান বলিয়া বড়াই কবিতেছেন। উভয় পক্ষই অপ্রকৃত কথা বলিতেছেন। ভারতবর্ষের শাসন-কার্য প্রজাদের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা নির্বাহিত হয় না। সুতরাং গবর্ণমেন্টের কোন কাজই দেশবাসীদিগের মতের দ্বারা নিয়মিত হয় না। এই দান সম্বন্ধে আমাদের হাঁ বা

না কিছু বলিবাব অধিকার নাই, স্বযোগও নাই। ইহা ভারতবর্ষের দান বটে বলিবারও জো নাই, নয় বলিবারও জো নাই; ইহা গবর্ণমেন্টের দান। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকজন নির্বাচিত দেশী সভা আছেন। তাঁহাদের নির্বাচন প্রবালী একরূপ যে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দেশের প্রতিনিধি বলা যায় না। তথাপি তাঁহারা যে কতকটা আমাদের প্রতিনিধি তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং তাঁহারা ব্যতীত সমস্ত দেশের আব কোন প্রতিনিধি নাই। ভারতগবর্ণমেন্ট যে ১৫০ কোটি টাকা দান করিবেন, এই প্রতিনিধিরাও আগে তাহা জানিতে পারেন নাই; আগে হইতে তাঁহাদের পরামর্শ বা সম্মতিও লওয়া হয় নাই, তাঁহাদিগকে আগে হইতে জানানও হয় নাই। বিলাত হইতে ভারত-গবর্ণমেন্টের নিকট কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক টেলিগ্রাম আসিবার পর জানা গেল যে এদেশ হইতে দেড়শত কোটি টাকা বিলাতে পাঠান হইবে। তাহার পর বড়লাটের সভায় আমাদের কোন কোন প্রতিনিধি সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহা অবশ্য নামঞ্জুর হইয়াছে। এ-অবস্থায় কেহ যদি এই দানকে ভারতবর্ষের স্বেচ্ছাকৃত দান বলিতে চান, বলুন; কিন্তু তাহা ঠিক বলা হইবে না।

ভারতবর্ষের কর্তব্য।

যাহাদিগকে একত্র ঘর করিতে হয়, তাহাদিগকে সুখ-দুঃখের, লাভ-লোকসানের ভাগী হইতে হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা একটা বড় গৃহস্থালির মত। সুতরাং ইহার কোন বিপদ ঘটিলে ইহার সমুদয় অংশীদারকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত যে সমবেত চেষ্টা কবিতে হইবে, ইহা গ্রাসমন্ত্র কথ্য। যদি ব্যয় হয়, তাহাও সকলকেই বহন করিতে হইবে, ইহাও গ্রাসমন্ত্র কথ্য। ইহা গেল মোটামুটি কথা। এখন একটু স্বল্প কবিয়া ব্যাপারটি বুঝিতে হইবে।

একত্র যাহারা ঘর করে, তাহারা দুঃখ এবং সুখ উভয়েরই ভাগী হয়। ভারতবর্ষকে বিপদের বোঝা বহিতে ডাকা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যের সম্পদের অংশী ত পূরা সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ নহে। শিক্ষার স্বযোগ, বাণিজ্যের

সুযোগ, ইচ্ছা-মত সাম্রাজ্যের সর্বত্র রোজদারের সুযোগ, সামর্থ্য অনুসারে সাম্রাজ্যের সর্ববিধ উচ্চ ও নিম্ন পদ লাভের সুযোগ, রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহের অধিকার,—এই-সব যে স্বাধীন ও স্ববিধা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আছে, ভারতবর্ষ তাহার অতি অল্প অংশই পাইয়া থাকে। সুতরাং যে সূত্রে সম্পদের সমান ভাগী নয়, তাহাকে দুঃখের বিপদের সমান বোঝা বহিতে বলা গ্রাহ্যসঙ্গত নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তিশালী বলিয়া ইহার অগ্রাংশের মত ভারতবর্ষও শাস্তিস্থ ভোগ করে। সুতরাং এই স্ববিধার প্রতিদান তাহার করা কর্তব্য। তাহা ভারতবর্ষ বরাবর করিয়া আসিতেছে।

একটা গৃহস্থালিতে অংশীদার ছাড়া অমুতর সেবক পরিচারক পরিচারিকাও থাকে। বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে শেখোক লোকেরাও অবশ্য সাহায্য করে; কিন্তু অংশীদারেরা ঘর বাড়ী জমিদারী রক্ষা করিতে যে পরিমাণ দায়ী, অগ্রেরা সে পরিমাণে দায়ী নহে। তাহাদিগকে ব্যয়ভার বহন করিতে বলা হয় না। আমাদের বলিতে ক্লেশ হয়, লজ্জা ও অপমান বোধ হয়, যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম অংশ হইলেও, ভারতবাসীদিগকে সাম্রাজ্য-গৃহস্থালির অংশীদার মনে করা হয় না, অমুগত পরিচারকের মত মনে করা হয়। যাহারা অংশীদার, বিপদে তাহাদের কাছে যে-পরিমাণ সাহায্য আশা করা হয়, যাহারা অংশীদার নহে, অংশীদারের অধিকার স্ববিধা আদি যাহাদের নাই, তাহাদের নিকট হইতে সে পরিমাণ সাহায্য আশা করা কি সম্ভব ?

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধিকার ও দায়িত্ব, এই দুটি একটি জিনিষের দুই পিঠ। যাহার অধিকার আছে, তাহার দায়িত্ব আছে; যাহাকে সমান দায়ী কবিতো চাও, তাহাকে সমান অধিকার দাও; যাহাকে যতটুকু দায়ী করিতে চাও, তাহাকে ততটুকু অধিকার দাও।

বোঝা বহিতে হইলে, যাহার যেমন শক্তি সে সেই অনুপাতে বোঝা বহিবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর গড় বার্ষিক আয় সবকাবী হিসাবেই ত্রিশ টাকার বেশী নহে। কানাতা উপনিবেশের মত পিছু গড় বার্ষিক আয় ১২০০ দায়ে ১৭২ টাকার উপর ছিল, এখন সম্ভবতঃ আবে

বাড়িয়াছে। অগ্রাংশ ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিরও বেশী। ইংলণ্ডের লোকদেরও তাই। তাহাদের পরিমাণে ও যে অনুপাতে সূত্রে ব্যয় নির্বাহিত হইতে পারে, আমাদের মত দরিদ্র জাতির নিকট তাহা করা যাইতে পারে না।

সূত্রে অগ্রাংশ যে-সব জিনিষ আবশ্যক হইতেছে, ইংরেজরা ও ব্রিটিশ উপনিবেশিকরা নিজেদের ব্যবহার প্রস্তুত করিতেছেন। তাহাতে কোন কোন শান্তির সময় অপেক্ষা খুব বেশী লাভ হইতেছে। ও মজুবদের বেতনও খুব বাড়িয়াছে। এইরূপে ও ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি সূত্রে অগ্রাংশ যাহা দিতেছেন, তাহা কতক অংশ দেশের লোকদের নিকট হইতে আসিতেছে। ভারতবাসীদের নিজস্ব কাঁচা আছে, যাহাতে সূত্রে সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক, পরিচালক, কারিগর, কত জন কি হারে বেতন পাইতেছে? উক্তকাল অনাবশ্যক।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। তাহাকে বিপদের বোঝা অবশ্যই বহিতে হইবে। যোঝার পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময় পূর্বোক্ত সমস্ত কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহারা ভারতবর্ষের নিন্দা আসিতেছে, তাহাদেরও এসব কথা ভুলিলে চলিবে।

নিন্দুকদের সন্তোষ।

ভারতবর্ষের নিন্দা যাহারা করিয়া আসিতেছেন তাহারাও বলিতেছে, ভারতবর্ষ এত দিনে নিন্দুকদের সন্তোষ করিল। ভাল কথা। এখন এই সন্তোষটা হইতে কি বাচি।

দুঃখভাগী সূত্রে ভাগী হইবে কি না

যাহাকে সম্পদের সময় সম্পদের অংশ দেওয়া হয়, বিপদের সময় দুঃখের ও ব্যয়ের বোঝা বহিতে তাহাকেই ডাকা উচিত। ভারতবর্ষের লোকেরা ব্যবহার পায় নাই। অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে, আর অধিক আলোচনা না করিয়া ভবিষ্যতের কথা বলিতেছি, "বিপদের সময় আমবাও সামান্য লাভ নড়িয়াছি, অর্থ ব্যয় করিয়াছি। এখন আমরা সম্পদ

ফিরিয়া আসিবে, তখন এই কথাটা যেন মনে থাকে। সাম্রাজ্যেব অংশীরা তখন যেন আমাদের দাবীটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করে।”

ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের অর্থদান আইন সম্বন্ধে কি বলে।

ভারত-শাসন আইনের (Government of India Act এর) ২০ ও ২২ ধারায় লিখিত আছে :—

“20 (1) The Revenues of India shall be received for and in the name of His Majesty, and shall, subject to the provisions of this Act, be applied for the purposes of the Government of India alone.” “(22) Except for preventing or repelling actual invasion of His Majesty's Indian possessions or under other sudden and urgent necessity, the revenues of India shall not, without the consent of both the Houses of Parliament, be applicable to defraying the expenses or any military operations carried on beyond the external frontiers of those possessions, by His Majesty's forces charged upon those revenues.”

ইহাব তাৎপর্য এই যে, ভারতবর্ষেব রাজস্ব কেবল ভারতবর্ষের শাসনকার্যের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে; এবং ভারতবর্ষ আক্রমণ নিবারণ বা আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্ত কিম্বা অপর কোন আকস্মিক ও জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত, ভারতের রাজস্ব ভারতেব বহিঃ-সীমার বাহিরে কোন যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ, পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতিরেকে, প্রযুক্ত হইতে পারিবে না।

ইংলণ্ডকে যে ১৫০ কোটি টাকা দান করা হইবে, তাহা পূর্বেকৃত কোনরূপ ব্যয়ের জন্ত নহে, এবং ভারতের রাজস্ব হইতে এই টাকা দিবার জন্ত পার্লামেন্টের অমুমতিও লওয়া হয় নাই।

টাকাটা ঋহারা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই ইংরেজ; ঋহারা পাইবেন, তাঁহারাই ইংরেজ। পার্লামেন্টও ইংরেজদের। আইনও ইংরেজরাই প্রণয়ন করিয়াছেন। স্বতরাং প্রয়োজন বোধ হইলে পার্লামেন্টেব সম্মতি পাওয়া বটিন হইবে না। পার্লামেন্টেব সম্মতি সত্ত্বেও ১৪ই মার্চ লওয়া হইবে।

ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী।

কয়েক দিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট

হাউসে লর্ড কারমাইকেল পর:লাকগত ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের তৈলচিত্র আবরণযুক্ত করেন। তদুপলক্ষে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন :—

Dr. Surja Kumar was probably the only Bengali who has served as an officer in the Navy. He was Surgeon in charge of the gunboat Fire Queen in 1856-57, when she cruised about the Burma coast and when she brought Sir Henry Havelock to Bengal from Madras. He was also I fancy the only Bengali who has served as an officer in a Highland Regiment. He became Surgeon to the 72nd (the Seaforth's) when the European Surgeon fell at Ghazipur, and was Surgeon to Havelock's Brigade on its march to the relief of Lucknow.”

“বঙ্গালীদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র ডাক্তার সূর্যকুমার রণতরী বিভাগে অফিসারের কাজ করিয়াছেন। যখন কামান-নৌকা ‘ফায়ার কুইন’ ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের উপকূলে ইতস্ততঃ পাহারা দিয়া বেড়াইত এবং যখন তাহাতে করিয়া সারু হেনরী হেডলকে মালদ্বীপ হইতে বাংলায় আনা হয়, তখন সূর্যকুমার উহার সার্জেন ছিলেন। আমার বোধ হয় হাইল্যাও রেজিমেন্টে অফিসারের কাজও বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই করিয়াছেন। ৭২ সংখ্যক সীফোর্থস্ রেজিমেন্টের ইউরোপীয় সার্জেন যখন গাজিপুর্বে যুদ্ধে মারা যান, তখন সূর্যকুমার উহার সার্জেন হন, এবং হেডলকেব সৈন্যদল যখন লাক্কৌ উদ্ধারের জন্ত যাত্রা কবে, তিনি তখন তাহারও সার্জেন ছিলেন।”

ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী সিপাহী যুদ্ধের সময় ক্রীকপ সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলেন, তাহা ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসেব প্রবাসীতে ৭৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত আছে।

বিতর্কভীত না আর কিছু ?

এইরূপ কথা হয় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস, নেপালে বন্দনারী, প্রভৃতির লেখিকা, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্পা শ্রীমতী হেমলতা সরকার মহাশয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমূহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িবে। কিন্তু ইনষ্টিটিউটেব কর্তৃপক্ষ প্রবন্ধ পাঠ করিবার অমুমতি দেন নাই; কারণ শুনিতেছি নাকি এই যে রবিবাবু কাব্যসমূহ একটা

তর্কবিতর্কের বিষয় (controversial topic)। ইহা সত্য কি না, তাহারা সর্বসাধারণকে জানাইলে ভাল হয়। যে কারণে যুদ্ধের সময় আমাদের গবর্ণমেন্ট আমাদের কোন-প্রকার তর্কবিতর্ক উত্থাপন করিতে বার বার নিষেধ করিতেছেন, ইন্সটিটিউটের কর্তারা কি সেই কারণে তর্কভীত হইয়াছেন? তাহা ত বোধ হয় না। বিলাতের গবর্ণমেন্ট খুব বেশী পরিমাণে, এবং আমাদের এখানকার গবর্ণমেন্ট কতক পরিমাণে যুদ্ধ লইয়া ব্যতিব্যস্ত আছেন। কিন্তু ইন্সটিটিউটের কর্তারা ত কোন যুদ্ধ করিতেছেন না।

আমরা শুনলাম ইন্সটিটিউটের কার্যনির্বাহক সভার যে অধিবেশনে এই বিষয়টির মীমাংসা হয়, তাহাতে অগ্গাণ্ড সভ্যের মধ্যে সার্ ওল্ডফ্রাস বন্ডোপাধ্যায়, সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মিঃ লায়ন, এবং মিঃ হর্নেল উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ লায়ন কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। বাঙালী নাইট দুজন ও মিঃ হর্নেল প্রবন্ধ পাঠের বিরুদ্ধে মত দেন। বিরোধী দলেরই জয় হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ কোন কোন সভ্য ভয়ে বিরুদ্ধ পক্ষে ভোট দিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। আশুবাবু কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া আপত্তি করেন, এবং হর্নেল তাহার সমর্থন করেন। আশুবাবু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন, তখন রবিবাবুকে সাহিত্যাচার্য্য উপাধি দেওয়া হয়। এখন তাঁহার আপত্তিটার কাবণ জানিতে ইচ্ছা হয়।

ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ইন্সটিটিউটে সাধারণতঃ যে-সকল বক্তৃতা হয়, তাহা কি সর্ববাদিসম্মত? দুই আর দুয়ে চার, বক্তৃতাগুলিতে কেবল এই-প্রকারের তর্কাতীত সত্যই কি থাকে? ইন্সটিটিউটে আর কোন বাঙালী কবি সম্মুখে বক্তৃতা কি কখন হয় নাই? আমাদের মনে পড়িতেছে যে হইয়াছে। তাঁহাদের সম্মুখে, তাঁহাদের কোন গ্রন্থ সম্মুখে কি দ্রিমত নাই? ইন্সটিটিউটের কোন কোন বক্তৃতায় রবিবাবুর রচনার প্রতিকূল সমালোচনা কি হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই-সকল সমালোচনা কি তর্কাতীত ছিল? তৎসমুদয় কি বিতর্কের বিষয় নহে? শ্রীমতী হেমলতা সরকারের প্রবন্ধ পঠিত হইবে কি না, তাহা বিচার করিবার সময় তাহা কি ইন্সটিটিউটের

কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ছিল? আমবা যতটা জানি, ততটা কিস্ত প্রবন্ধটিতে হয় (১) প্রতিকূল সমালোচনা, (২) অল্পকূল ব্যাখ্যা পরিচয় ও প্রশংসা, (৩) প্রবন্ধ ও অল্পকূল মন্তব্য উভয়ই ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতে পারে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, (১) এক জন রবিবাবুর বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তাহা বিতর্কের বিষয় বিবেচিত হয় না, অথবা আর একজন তদ্রূপ মন্তব্য তাহা কেন তর্কের কারণ বিবেচিত হইবে? (২) অন্য মন্তব্য কেন তর্কের কারণ হইবে? রবিবাবুর নিন্দার কথা তবে তর্কাতীত ও সর্ববাদিসম্মত। (৩) প্রতিবন্ধ অল্পকূল মন্তব্যের সমাবেশ হইলেই বা কোন প্রবন্ধ বিশেষ করিয়া তর্কের কারণ বিবেচিত হইবে?

জগতের সমুদয় সভ্যদেশে এবং ভারতবর্ষের প্রায় প্রদেশে শিক্ষিত সমাজে রবিবাবুর কাব্যের খুব পঠাবে শ্রীযুক্ত লাল লাক্ষণ্য রায় একজন লোক। তিনি আধ্যাত্ম-সমাজী। তিনি বাঙালী সমাজের, বা রবিবাবুর গোড়া ইহা কেহ পারিবেন না। তিনি এখন আমেরিকায় আছেন তাঁহার একখানি নবপ্রকাশিত পুস্তকে লিখিয়াছেন:-

"Tagorism is becoming a cult and he is at the present moment perhaps the most popular and most widely read and most widely admired literary man in the world."

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত-ও-ভাবে অল্পবর্তিত ধর্মমতের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি বর্তমান সময়ে বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পে সর্বাপেক্ষা বেশী, সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের দ্বারা অধীত, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের দ্বারা প্রশংসিত সাহিত্যিক।"

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের গৌরব, ভারতের গৌরব। দেশের কতকগুলি লোক বহুকাল হইতে তাহার শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটেও এই-সব লোকেব প্রভুত্ব থাকা দেশের লোক অকল্যাণের কারণ। এই সমিতি ও প্রতিষ্ঠানটি স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। তখন ইহার নাম ছিল, Institution for the Higher Training of Young Men. ইহার

উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।" গুণের আদর করিতে না শিখিলে, যিনি শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে না শিখিলে, উচ্চতর কেন, কোন শিক্ষাই হয় না, সব তথাকথিত শিক্ষা ব্যর্থ হয়। ইন্সটিটিউটেব কর্তৃপক্ষের এই ক্ষেত্রে কি আপনাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা যুবকদিগকে বর্তমান সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিকে সম্মান করিতে শিখাইলেন? রবীন্দ্রনাথের নিন্দায় তাঁহার নিজের কিছু আসে যায় না। ক্ষতি দেশের।

তাঁহার নিন্দা ও শত্রুতা কতকগুলি লোকে কেন করে, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। সমবক্ষ লোকদের মধ্যে কখন কখন একটা ঈর্ষ্যা দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমবক্ষ সাহিত্যিক তাঁহার নিম্নকদের মধ্যে কেহ নাই। কেহ তাঁহার কাছাকাছিও যান না। তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, এবং তজ্জগৎ প্রতিকূল সমালোচনাও হইতে পারে। এইরূপ সাহিত্যিক সমালোচনায় বিষ থাকিবার কথা নয়। কিন্তু বঙ্গে তাঁহার বিরোধীরা সাহিত্যিক সমালোচনায় আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখেন না, তাহাতে অশ্রুবিঃ বিষ ঢালেন। এই বিষ উদ্‌গারের কারণ কি? কারণ আর যাহাই হউক, পরশ্রীকাতরতা বা ক্ষুদ্রাশয়তা অশ্রুতম কারণ না হইলেই স্বথের বিষয় হইবে। কারণ, পরশ্রীকাতরতা ও নীচাশয়তা জাতিকে অত্যন্ত ছোট, নীচ ও দুর্বল কবে। দেশমধ্যে এইসকল দোষের বিস্তৃতি হইলে তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হইবে।

অতিরিক্ত ট্যাক্স।

ইংলণ্ডকে ১৫০ কোটি টাকা দিতে হইবে বলিয়া বৎসবে ভারতের নব্বোটি টাকা ব্যয় বাড়িল। ইহার জন্য কয়েক প্রকার অতিরিক্ত ট্যাক্স বসান হইতেছে। যাহাদের আয় বার্ষিক ৫০,০০০ টাকার উপর তাহাদিগকে অতিরিক্ত ইনকাম ট্যাক্স দিতে হইবে। বিদেশ হইতে আমদানী সূতী কাপড়ের উপর মূল্যের শতকরা ৭৫০ টাকা করিয়া শুল্ক বসিবে। রপ্তানী পাট ও পাটের জিনিসের উপর ট্যাক্স বসিবে। এই-সব করে গরীবের বিশেষ কষ্ট হইবে না। দেশী হাতের তাঁত ও কাপড়ের কলে দেশেব লোকের দরকারী সব কাপড় জোগাইতে পারে না। এই কারণে যাহাদিগকে বিদেশী কাপড় কিনিতে হইবে, তাহাদের কষ্ট

হইতে পারে। যাহা হউক, যদি এই কব স্থাপন হেতু দেশী কাপড়ের ব্যবসার স্ববিধা হয়, তাহা হইলে এ কষ্ট সহ্য করা সার্থক হইবে। রেল যে-সব জিনিস চালান হয়, তাহার মধ্যে কয়েকটির জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক রেলভাড়া দিতে হইবে। রাঁধিবার কোক কয়লা ও জালানী কাঠ তাহাদুই অন্তর্গত। ইহাতে গরীব লোকদের কষ্ট হইবে। এই জিনিষ দুটি আগেকাব মত ভাড়া মালগাড়ীতে চালান করিবার বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হইত।

রাজস্বসচিব, যুদ্ধের জন্য যে-সব ব্যবসাতে বেশী লাভ হইতেছে, সেই অতিরিক্ত লাভের উপর কর স্থাপন কেন করেন নাই, তাহা বলিয়াছেন। তিনি যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা সম্ভোষজনক নহে। এই কর বসান উচিত ছিল। তিনি বলেন, কোন কারবারে সাধারণ লাভ কিরূপ এবং যুদ্ধের জন্য বেশী লাভই বা কিরূপ হইয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন। এই জন্য তিনি কর স্থাপন করেন নাই। এই কারণে মানুষকে কর হইতে নিষ্কৃতি দিতে হইলে প্রথমেই নিষ্কৃতি দিতে হয় গরীব চাষীদিগকে। জমী হইতে তাহাদের মজুরী আদি বাদ দিলে বাস্তবিক কত যে তাহাদের আয় থাকে, বলা বড় কঠিন। অনেকস্থলে কিছুই থাকে না, অনেক স্থলে উর্দ্ধীয়া ঋণ হয়। তাহার পর ইনকাম ট্যাক্স বসাইবার জন্য লোকের যে আয় ধরা হয়, তাহাও অনেকস্থলে আনুমানিক। যতটা সম্ভব চেষ্টা করিয়া দেখিলে যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত লাভের উপর কর বসাইয়া নিশ্চয়ই অনেক টাকা পাওয়া যাইত। রাজস্বসচিব আরও বলেন যে, ইহা অস্থায়ী আয়, যুদ্ধ শেষ হইলেই এই কর তুলিয়া দিতে হইত। কিন্তু অস্থায়ী হইলেও টাকা পাওয়া যাইত। এক বৎসরও যদি বেশী টাকা পাওয়া যাইত তাহাতে ক্ষতি কি ছিল? এদেশের বড় বড় কারখানা ও কাববার ইংরেজদের হাতে। তাহাখা খুব ধনী লোক। তাহারা ই যুদ্ধের দরুন অতিরিক্ত লাভবান হইতেছে। তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া গরীবের রান্না করিবার কয়লা ও জালানী কাঠকে রেহাই দিলে ভাল হইত। বিশেষতঃ যখন রাজস্বমন্ত্রী ভয় দেখাইয়াছেন যে তিনি দরকার হইলে পরে লবণের শুল্ক আরও বাড়াইবেন এবং কৃষিকর আয়ের উপরও কর বসাইবেন। গরীবের ম্লন এবং গরীবের

সামের আগের উপরও এখন উচ্চ দৃষ্টি বহিয়াছে, তখন মোটামোটা টাকা, এক বৎসরের জন্ম হইলেও, তাহার চাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। অবস্থা ৫০০০০এব উচ্চ সামের উপর যে অতিরিক্ত ট্যাক্স বসিল, তাহার দ্বারা দুর্ভিক্ষের অতিরিক্ত লাভের উপরও কোন কোন স্থলে ট্যাক্স বসিলে, কিন্তু সকল স্থলে নহে।

জুরীর বিচার।

দ্বিহুদিন পূর্বে বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় অখিলচন্দ্র দত্তের এই প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মতে গৃহীত হয় যে বাংলার সব জেলায় জুরীর সাহায্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার প্রচলিত হউক। গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে সকল জেলার জজদের মত চাহিয়াছেন। তাহা-দিক্কে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিবার সুযোগ দিলেই ভাল হইত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট জজদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যেন গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মত চান তাহার একটু ইঙ্গিত করা হইয়াছে :—

১) রাজনৈতিক মোকদ্দমায় জুরিদিগকে আসামী পক্ষের লোকেরা প্রাণনাশের বা অথ কোন অনিষ্টসাধনের ক্ষমতা দেখাইতে পারে। তাহাতে বিচার-বিলাট হইবার সম্ভাবনা আছে।

২) জাতিগত বিদ্বেষের জন্ম বিচারবিলাট হইতে পারে।

(৩) সকল জেলায় জুরি হইবার যোগ্য লোক না মিলিতে পারে।

“পঞ্জাব ও দিল্লীতে আসিও না।”

শ্রীযুক্ত পান পঞ্জাবের টিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের প্রতি পঞ্জাবের ও দিল্লীর শাসনকর্তাদের হুকুম হইয়াছে যে তাহারা যেন এই প্রদেশে না যান। গেলে তাহাদিগের কারাদণ্ড হইবে, ইত্যাদি। তাহাদিগকে তথায় যাইবার জন্ম কেহ অল্পবোধ করেন নাই, তাহাদেরও সেখানে যাইবার কোন সঙ্কল্প বা কল্পনা ছিল না। ইতিপূর্বে ভীমতা এনি বেসাণ্টের উপর বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও মধ্যপ্রদেশে না যাইবার এই-রূপ হুকুম হইয়া আছে। এই-সকল হুকুমের প্রকাশিত কারণ এই যে তাহারা এই-সব প্রদেশে গিয়া সর্বস্ব ধারণের পক্ষে

বিপজ্জনক কিছু করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন, তাহা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, তাহাদের বাসের উদ্দেশ্য ছিল না। এ বিষয়ে প্রদেশের শাসনকর্তারা ভ্রম হইয়াছে। তাহাদের কার্যক্ষেত্র যে যে প্রদেশে এবং তাহার বাহিবেও কোন কোন স্থানে তাহারা বজুতাদি বরিগাছেন। কোথাও তন্ময়তা, অশাস্তি, বাটুদিগের, বা অবাধ্যকর্তা ইত্যাদি।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উদ্দেশ্য হইত তাহাদের কাজের উপর আমাদের কোন প্রভাব আমাদের এমন সাধ্যও নাই যে যুক্তি দ্বারা তাহাদের এই ধারণা অম্মাইয়া দি যে তাহারা বাঙ্গালীদিগকে দিয়া ভ্রম করিতেছেন। তাহা হইলেও কোন ভ্রম করিবেন, দেশের মঙ্গলের জন্য তখনই তাহা দেওয়া আমাদের কর্তব্য হইবে। কিন্তু না-অল্পমান করিতেছি যে ভবিষ্যতে এইরূপ অনেক প্রদেশ হইতে আরও যত্নে বলা উপর জারী হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

সকল প্রদেশের এবং সকল দেশের মধ্যে তাহাদের আদান প্রদান মানুষের স্বত্ব-স্বাধীনতার জন্য আবশ্যক, ভাব, চিন্তা, আদর্শের অভাব উন্নতির জন্ম তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন। বিধি সংকীর্ণ গভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে তাহা ঘটে; তা ছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়া তা হইবে। আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বাড়িলে ইহাও প্রতিকার হইবে। কিন্তু আপাততঃ নিজের নিজের প্রদেশে থাকিয়াই চিন্তা ও আদর্শের অভাব মোচন করিতে হইবে, অল্পপ্রাণনা বাহির হইতে আমাদের কনিষ্ঠ হউক না। সমুদয় শক্তি, সমুদয় উৎসাহের উৎস আত্মাতেই রহিয়াছে। আমাদের আশ্রয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে।

পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়-বিল প্রসঙ্গে বিচার ছোটলাট এই বিসেস প্রতিকূল সমাপোষণ হইতে আমাদের বলিয়া বক্তব্য করিয়াছেন

বিহার-ওড়িশা বাংলার সতিত মন্ত্র ছিল। নানাকারণে বিহার-ওড়িশার সার্বজনিক নত এপ্যাস্ত অন্য কোন কোন প্রদেশের মত পবিস্ফুট ও আত্মপ্রকাশ-সমর্থ হয় নাই। এক্ষেত্রে যদি আন্দোলনের বাদ্ধটা বাঙালীবাওকবিষা থাকে, তাহা মোটেই দোষের নয়। বিশেষতঃ যখন বিহার-ওড়িশাতে বহুলক বাঙালী বাস। কিন্তু, তাহা হইলেও সকল প্রদেশের প্রাদেশিক সব কাজ, সব প্রচেষ্টা, সব আন্দোলন, ন্যাহাতে প্রদেশবাসীরাই ছোরেব সহিত চালাইতে পারে, সেক্ষেপ উদ্যোগ আয়োজন করা কর্তব্য। বিহারের লোকেরা বলেন, “বিহার বিহারী বজ্র, বাঙালীর এখানে ঢাকরী ও ওকালতীতে ভাগ বসাইতে আসিও না।” কিন্তু সেই-সঙ্গে তাহাবা এই কথাটাও কেন বলেন না যে “আমরা আমাদের পদেণের সব অভাব অভিযোগ জুলুমের কথা আমাদের প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে বলিব?” বিহারের ছটি দৈনিক কাগজ ছজন ধনী জমীদারের টাকায় চলে। বিহারের স্বাধীন মত তাহাতে ব্যক্ত হয় না।

এ বিষয়ের উল্লেখ কেবল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কবিরাম। প্রাদেশিক সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যে আমাদের কর্তব্য, তাহা বুঝানই আমাদের উদ্দেশ্য। কোন প্রদেশের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমাদের অভিপ্রায় নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি হওয়ায় ছাত্রেরা দুই দিন পরীক্ষা দেওয়ার পর উহা স্থগিত হইয়াছে; ৩০শে মার্চ আবার আরম্ভ হইবে। প্রশ্ন চুরি যাওয়ায় নানা-প্রকার অনিষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপব এবং উহাব পরীক্ষার উপব লোকের আস্থা কমিয়া যায়, এবং লোকের ধারণা জন্মে যে, যে-সকল বৎসর প্রশ্ন চুরি কোন কথা শুনা যায় না, বুঝি বা সে-সব বৎসরও প্রশ্ন জানা পড়িয়া থাকে। এই-প্রকারে, পরীক্ষায় পাশ হওয়া যে কোন মূল্য আছে, এ-বিশ্বাস কমিয়া যায়। তজ্জন্য চাকরীর বাজারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের দব পরোক্ষভাবে কমিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। অনেক ছাত্র সব বৎসরই জ্ঞান অর্জনে ততটা মন দেয় না, নতটা, কি প্রশ্ন পড়িতে পারে, তাহা অনুমান কবিতে চেষ্টিত হয়, বা কি প্রশ্ন পড়িয়াছে তাহা জানিবান জগ্ন ব্যগ্র

থাকে। ইহাতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বিদ্যালয়ে যাওয়া ও পরীক্ষা দেওয়া ব্যর্থ হয়। সকলের চেয়ে অনিষ্ট এই হয় যে মনেব মধ্যে প্রশ্ন জানিবার এবং জানলাত না করিয়াও কাকি দিয়া পাশ করিবার একটা অসাধু আকাজক্ষা জাগিয়া থাকে। চবিত্রগঠনের ইহা এক মহা অন্তবান। বাঙালীয় ক্রতিজ্ঞ মানুষের যাহা কিছু হইতে পারে, সিদ্ধিলাভ মানুষের দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে, পরিশ্রম, সংযম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সাধনাব মূল্যে সেই ক্রতিজ্ঞ ও সিদ্ধি ক্রয় করিব,—মল্লম্ব্যাহার আছে, সে এইরূপ ইচ্ছাই করে। বিপরীত প্রকারের ইচ্ছা যাহারা কবে, তাহাদের চরিত্র অন্তঃসারশূন্য হয়। কাকি দিয়া খাটা কিছু এ জগতে পাইবার জো নাই। যে-যে কারণে মানুষের মন অসাধু উপায় অবলম্বন, চাতুরী, প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়, ও মানুষ কাকি দিয়া কিছু একটা করিতে ও হইতে উৎসুক হয়, সেই-সব কারণ মানুষের মহা অনিষ্টের হেতু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন চুরি যাওয়ার বাঙালীর কি পবিমাণ দায়ী এবং খেতকায়েরাই বা কি পবিমাণে দায়ী তাহা নিশীত হইবে কি না, জানি না; কিন্তু ব্যাপারটা যে গবর্ণমেণ্টের কাছে ও সভ্যজগতের কাছে বাঙালীর অকর্মণ্যতা ও বিশ্বাসের অযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞপ করিয়া বলা হইবে, ইহারাই আবার স্বরাজ চান! আমরা কোন বাঙালী বা বাঙালীদের দোষ চাকিতে প্রয়াসী নহি। দোষ যত জানা পড়ে, এবং সংশোধিত হয়, ততই মঙ্গল। আমাদের কেবল ইহাই স্বপ্ন রাখিতে হইবে, যে, প্রশ্ন চুরি প্রভৃতি ব্যাপার কেবল মাত্র বাংলা দেশেরই একচেটিয়া দোষ নহে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। পঞ্জাবে হইয়া গিয়াছে। দেখানকার একজন ইংবেজ বেজিষ্টার ঘুষ লইয়া প্রশ্নের কাগজ বিক্রী করিত। তাহা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় সে দণ্ডিত ও পদচ্যুত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক টাকা নষ্ট হইল। উত্তর লিপিবা বখাতা ৬৩০০ নষ্ট হইল। পুনরীক সমুদয় প্রশ্ন প্রস্তুত করাইবার ও ছাপাইবার জগ্ন বিস্তব ব্যব হইবে। দুই দিন যাহাব পরীক্ষাগৃহে পাতাব দিয়াছেন, তাহাদিগকে

যে টাকা দিতে হইবে, তাহা বুঝা খরচ হইল। নমুদয় পরীক্ষা-কেন্দ্রে প্রথম পাঠাইবার ব্যয় আবার হইবে। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের ও তাহাদের অভিভাবকদের বিনা দোষে অর্থনাশ ও কষ্টভোগ হইল। অবিকার্য ছাত্র বাড়ী বসিয়া পরীক্ষা দিতে পারেন না। বাড়ী হইতে দূরে পরীক্ষা-কেন্দ্রে গিয়া বাসাখরচ করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয়। খাতায়াতের খরচও আছে। এই-সব খরচ দুই বাব করিয়া হইবে। অনেক বিবরণী মা গমনা বন্ধক দিয়া ছেলের পরীক্ষার খরচ দিয়াছিলেন। তাদের মত গরীব লোকদের কি কষ্ট! অনেক ছাত্র ও ছাত্রী পরীক্ষার অসুস্থ-দেহে উপস্থিত হইয়াছিল; কোন বিভ্রাট না ঘটিলে তাহারা পরীক্ষা দিয়া পাস হইতে পারিত। কিন্তু পুনর্কাল যখন পরীক্ষা হইবে, তখন তাহারা পীড়িত হইয়া পড়িতে পারে। বিনা দোষে তাহাদের এই যে শাস্তি হইবে, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়।

তাহাদের অসাবধানতা, অকম্পনাতা বা ছুরীতায় প্রশ্ন চুরি হইয়াছে, তাহারা অতি দুষ্ট লোক। তাহাদের সমুচিত শাস্তি হওয়া উচিত।

এই বিভ্রাটের মধ্যে সন্তোষের বিষয় কেবল একটি আছে যদি প্রশ্নচুরি ব্যাপারটা চাপা থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক অযোগ্য ছাত্রও পাস হইয়া যাইত, এবং তাহারা সম্ভবতঃ অনেক যোগ্য ছাত্র অপেক্ষাও পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিত। তাহারা প্রশ্ন জানিতে পারিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে অনেককে সং ছেলে, তাহার প্রমাণ এই যে তাহারা চুরিটা গোপন না রাখিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। যদি বাঙালীরা ও বাঙালী ছেলেরা সকলে তাহাদের নিম্নকদের আঁকা বিরূত ছবি অঙ্কন করিয়া অসং হইত, তাহা হইলে, সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া ব্যাপারটা লুকাইয়া রাখিত। কিন্তু কাহাবও কাহারও পক্ষবুদ্ধি ইহা অসম্ভব বিষয় ফেলিয়াছে। অবশ্য বেহ কেহ অন্য কাবণেও কথাটা প্রকাশ করিয়া থাকিবে।

প্রশ্ন চুরির তদন্ত।

অপরাধী ও তাহাদের দলভুক্ত লোক ছাড়া সকলেরই আত্মবিক ইচ্ছা এই যে ব্যাপারটার খবর প্রকাশিত না হয়। সঙ্গীত ও তদন্ত ইত্যাদি বিষয়বস্তু, এতদ্বারা

চারারাজ্যে মথ্য হেট করিয়া আছেন। তাহা নিশ্চয় চান যে খুব তলাইয়া অনুসন্ধান করা। সীণ্ডিকেট অনুসন্ধান কবিবার জন্য একটি কমিটি করিয়াছেন। সীণ্ডিকেটের কয়েকজন মেম্বর এবং কয়েকজন ক্রলসাহেব কমিটিতে সভ্য। ক্রলসাহেবকে এই কমিটিতে রাখা উচিত হয় না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কায্যনির্বাহক কর্মচারী এবং আফিসের প্রধান সাক্ষ্য ভাবে হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, তিনি ভুল চুক চুরির জন্য দায়ী। কমিটির কাছে, প্রশ্নের হউক, অংশতঃ তাহার বিচার হইবে, অংশতঃ উচিত। স্তবরাং তিনি বিচারকের বা অধ্যক্ষের পক্ষে বসিতে পারেন না। সীণ্ডিকেটের সভ্য বাহিরের যোগ্য লোককেও কমিটিতে গণ্য উচিত। নতুবা সাধারণের ধারণা এই যে ব্যাপারটা চাপা হইবে। আগে আগেও, এত বেশী প্রশ্নচুরি কমিটিতে পরিমাণে কাহাবও কাহারও কাছে নিশ্চয় কোন প্রশ্ন জানা পড়িয়াছিল। তাহাও প্রশ্নের আফিসের কোন কর্মচারী পদচ্যুত বা অংশতঃ প্রশ্ন হয় নাই। তাহাব দু একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯১৬ মৈত্র ও মণিকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯১৬ সালের পরীক্ষা দেয়। ইহা প্রমাণ হয় যে তাহারা বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরের শাখা খাতায় উত্তর দিয়া তাহা পরীক্ষার ফলে লিখিত উত্তর বলিয়া চালান ছিল। এই অপরাধে তাহারা পুনর্কাল বিবেচিত হইল। কোন পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ১৯১৬ সালের এই জুলাই সীণ্ডিকেট তাহাদের অনুযায়ী পুনর্বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে ১৯১৭ আবার এম্-এ পরীক্ষা দিবার অধিকার দিয়াছেন। ঘটনায় প্রমাণ হয় যে এই দুজন ছাত্র পরীক্ষার পরে পারিতাছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরের শাখায় উপাধি সংগ্রহ করিয়াছিল। নতুবা তাহারা বাহ্যিক সেই খাতায় প্রশ্নের উত্তর কেমন করিয়া লিখিয়া

গত বৎসর তিনজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র লন্ডনের সর্বোচ্চ পরীক্ষক প্রাভা প্রিন্সের এক প্রশ্নের সীণ্ডিকেটের হস্তে উত্তর লিখিয়া

খাতা গ্রানসাহেবের পরীক্ষণীয় উত্তরের খাতাব মধ্যে স্থাপিত কবাইয়া তাহাদেব হলে-লিখিত খাতা তিনখানা বাহিব করাইয়া লয়। এই উভয় বিভাগে সংস্থষ্ট ছাত্রদের কোন কোন আশ্রয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে কাজ করে কি? এই দুটা ব্যাপারের ফল-স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কক্ষচারী তিরস্কৃত, দণ্ডিত বা পদচ্যুত হইয়াছিল কি? যদি বিশ্ববিদ্যালয় কোন চোর ধরিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যাপার দুটা পুলিশের হাতে কেন দেওয়া হয় নাই? দুইটাতেই চুরি ও ঘুবেব পবিষ্কার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। এইজন্য পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। তাহা ন দেওয়ায় অসং আচরণের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। আগে আগে এইরূপ ২১১ টা কাণ্ড আপোমে চাপা দেওয়া-তেই হত এই বড় বিভাগটাই ঘটিয়াছে। এবারও যাহাতে চাপা না পড়ে, সেইজন্য আমরা বলি, এবারকার ব্যাপারটির তদন্ত পুলিশের দ্বারা হউক। বাবণ, ঈদাব মধ্যে ঘৃণ ও চুবি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কমিটি হইতে ক্রল-সহেবকে বাদ দিয়া এবং তাহাতে সাফ্য গ্রহণে ও সাফ্যপৰীক্ষায় অভ্যস্ত যোগ্য বাহিবেব লোকই বেশীর ভাগ লইয়া তদন্ত না করাইলে সীণ্ডিকেটের নিযুক্ত কমিটির তদন্তের ফল ত কোন ক্রমেই সৰ্বসাধারণের নিকট সহোয়জনক বলিয়া প্রতীত হইবে না।

কয়েক বৎসর আগে এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন জানা পড়ে। জানা পড়িবারাত্র, প্রশ্ন নানা কেন্দ্রে প্রবেশের কাজ যে-সব কর্মচারী করিয়াছিল, তৎক্ষণাত তাহাদিগকে সম্প্রদত্ত কবাইয়া এবং পবে তাহাদের দণ্ড হয়। তথাকাব ইংবেজ রেজিষ্ট্রারকে ছুটি দিখা বা অগ্রত চাকরী লইয়া (কি উপায়ে, এখন মনে পড়িতেছে না) চলিয়া যাইবার স্বযোগ দিখা অব্যাহতি লাভ করিতে দেওয়া হয়। এখানে চূড়ান্ত নীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ক্রলসাহেবকে কোথাও যাইতে দেওয়া উচিত নয়। অনিতেছি তিনি নাকি ছুটি লইবেন। তাহার জ্ঞান উচিত যে তাহাতে লোকে তাহাকে অধিকতর সন্দেহ করিবে। এখানেও প্রশ্ন-প্রবেশ-কাযে নিযুক্ত কর্মচারীদিগকে সম্প্রদত্ত কবাইয়া উচিত ছিল, অস্ততঃ এখন করা উচিত। কেন একরূপ করা হয় নাই? শুধু তাই নয়, যাহারা আগে এই কাজে

নিযুক্ত ছিল, এবং বাহাদিগকে সহজেই সন্দেহ হইবার কথা, তাহাদিগকে আবাব নূতন প্রশ্নসমূহ নানা কেন্দ্রে প্রবেশের কাজে নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। ইহা কিরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা? অবশ্য, কে দোষী কে নির্দোষ, তাহা আমরা জানি না, এবং কে কে প্রশ্ন বিতরণ করেন, তাহাও জানি না। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে যেক্ষণ সাবধানতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় মনে হয়, আমরা তাহাই বলিতেছি।

প্রশ্ন নানা জায়গা হইতে বা নানা সময়ে চুরি হইতে পারে, প্রশ্নকর্তাদের বাড়ী হইতে, ছাপাখানায় যাইবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস হইতে, ছাপাখানা হইতে, ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত হইয়া সেনেটহাউসে আসিবার পথে, সেনেটহাউসের লোহার সিঁদুক হইতে, তথা হইতে নানা কেন্দ্রে যাইবার সময় ভাকে, ইত্যাদি। তন্মধ্যে, ছাপাখানা হইতে, ছাপাখানা হইতে সেনেটহাউসে আসিবার পথে, বা সেনেটহাউসে, এই তিন জায়গা হইতে চুরি যাওয়াব সম্ভাবনা বেশী।

যেক্ষণ শুনা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ছাপাখানা হইতে চুরি যায় নাই। তাহার একটা পরোক্ষ প্রমাণ বলিতেছি। অবশ্য যেক্ষণ শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। প্রবেশিকা, আই-এ, এবং বি-এ, এই তিন পরীক্ষার প্রশ্ন জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে কেবল প্রবেশিকার প্রশ্নই কলিকাতাব একটি ইংরেজপরিচালিত প্রেসে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া শুনিতেছি। কলিকাতার প্রেস হইতে প্রশ্ন জানা গেলে শুধু প্রবেশিকারই জানা যাইত। বিলাতে ছাপা আই-এ বি-এর প্রশ্ন জানা যাইত না। অবশ্য ইহাও হইতে পারে যে ছাপাখানা হইতে প্রবেশিকার এবং সেনেটহাউস হইতে আই-এ বি-এর জানা গিয়াছে। কিন্তু উৎকোচগ্রাহী ও চোরের ত ভয় আছে। তাহারা যদি এক যায়গাতেই সব নাল পায়, তাহা হইলে দু জায়গায় চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বাড়াইবে কেন? এইজন্য আমাদের মনে হয়, যে, সম্ভবতঃ কলিকাতাব প্রেসটিব দোষ নাই, সেনেটহাউসের বন্দোবস্তেরই দোষ; তজ্জন্য ক্রল-সাহেব দায়ী। যাহা হউক, ইহা কেবল আমাদের অনুমানমাত্র; কে দায়ী ও দোষী এবং কি পরিমাণে তাহা অনুসন্ধান দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অবস্থায় প্রস্তুতকৃত বস্তা করিবার ভার সম্পূর্ণরূপে রেজিষ্ট্রারের উপর থাকে। যদি তাহার অসাধনতা বা কর্তব্যে অবহেলা প্রযুক্ত প্রস্তুত বাহির না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাহার দোষে হইল? রেজিষ্ট্রার কাগজগুলি প্রেস হইতে আনিবার জন্ত স্বয়ং প্রেসে গিয়াছিলেন কি না? না, আর কেহ গিয়াছিল? তৎসমুদয় তাঁহাকে গণিয়া প্যাক করিয়া মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কি না? তাহার পর যে গাড়ীতে করিয়া কাগজগুলি আনা হইল, তাহাতে স্বয়ং রেজিষ্ট্রার ছিলেন, না কোন কোন কেরানী ছিলেন? যদি বেজিষ্ট্রার ছিলেন না, তাহা হইলে কেন ছিলেন না? যদি কোন কোন কেরানী ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা কে? আগে যে যে বিভাগের কথা বলিয়াছি, তৎসংস্থষ্ট ছাত্রদের তাহারা কেহ আত্মীয় কি না? যখন কাগজগুলি সেনেট হাউসে পৌঁছিল, তখন তাহার মোড়কসমূহের উপর মোহর ঠিক ছিল কি না, অথবা আদৌ মোহর ছিল কি না? তাহা দেখিয়া লইয়া কাগজ রাখিবার কামরায় লোহার সিন্দুকে বেজিষ্ট্রার স্বয়ং তাহা রাখিয়া সিন্দুক ও কামরায় তালা বন্ধ করিয়া নিজের নিকট চাবী রাখিয়াছিলেন কি না? যদি আর কাহারও কাহারও কাছে চাবী ছিল বা থাকে বা বেজিষ্ট্রারের অসাক্ষাতে কখন দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহারা কে? এইরূপ গুজব শুনিয়াছি যে শিক্ষাবিভাগের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাগজের কামরা দেখিতে গিয়া একটি সিন্দুকের ডালা তোলা দেখিয়াছিলেন। ইহা সত্য কি না? শুনিয়াছি গোঁহাটী বেঞ্চে প্রেরিত প্রশ্নপত্রের মোড়কের উপর কোন মোহর বা মোহরের চিহ্ন ছিল না। ইহা কি সত্য? প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্ন বিলাতে ছাপা হইয়া থাকে। তন্মতে পাই, এবারেও অত্যাশ্চর্য পরীক্ষার মত প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন বিলাতে ছাপিবার জন্ত বিলাতে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু উহা বিলম্বে প্রেরিত হওয়ায়, পাছে ঠিক সময়ে মুদ্রিত হইয়া আসিয়া না পৌঁছে, এই ভয়ে তৎসমুদয় আবার কলিকাতার একটি প্রেসেও ছাপিতে দেওয়া হয়। কিছু বিলম্বে বিলাতে মুদ্রিত কাগজগুলিও আসিয়া পৌঁছিযাছে। সাধারণতঃ আগষ্ট মাসে প্রশ্ন ছাপিবার জন্ত বিলাতে পাঠান হইত। এবার

অক্টোবর মাসে পাঠান হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। বিলম্বের কারণ কি এবং কে ইহার জন্ত দায়ী? গুজব রটিয়াছে যে কোন কোন প্রশ্নবর্ত্ত প্রবেশিকা বিলম্বে দেওয়ায় বিলাতে পাঠাইতে দেরী হয়। সত্য কি সত্য? সত্য হইলে এই প্রশ্নকর্তারা কে কে? ইংরেজ না দেশী লোক?

এরূপ গুজবও রটিয়াছে যে এই ব্যাপারের মধ্যে বিদ্যালয়ের একটা বৃহৎ দলাদলি আছে। তাহা কি?

বঙ্গের রাজস্ব ও ব্যয়।

১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের রাজস্বকোষে ৩,১০,০০০ টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই রাজস্ব বিভাগে কি কাজে কি পরিমাণে খরচ হইবে, তাহা পারিলে বুঝা যাইবে। গবর্ণমেন্টের বোর্ড বিদেশী, দেশের লোক সর্বাপেক্ষা দরকারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প। তাহারা দেশে শান্তি, মাছুষের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্ত, অপরাধ নিবারণ, চোর বদমায়েস ধরিবার জন্ত, পুলিশের আশ্রয় স্বীকার করে। কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি প্রভৃতি অপেক্ষা পুলিশকে উচ্চ স্থান দেয় না। বৎসর মনে দেশের লোক যদি সুস্থ ও শিক্ষিত হইয়া শিল্প দ্বারা উপার্জন করিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পারিত ও সতৃপদেশ লাভ দ্বারা তাহাদের মন উন্নত হইত, তাহা হইলে পুলিশের প্রয়োজন কম হইবে। গবর্ণমেন্ট বিদেশী জন্ত যেরূপ ব্যয় করেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্পের জন্ত করেন না; এবং পুলিশের জন্ত ব্যয় যেরূপ দ্রুত বাড়াইতেছে, অল্প ক্রমেই বিভাগের ব্যয় সেরূপ বাড়িতেছে না।

১৯১৭-১৮ সালে পুলিশের আনুমানিক ব্যয় ১,৮০,০০০ টাকা বা বরাদ্দ করা হইয়াছে ১,৮৪,৩০,০০০ টাকা। ১৯১৬-১৭ সালের বরাদ্দ ৮৮,৬০,০০০ টাকা। ১৯১৬-১৭ সালের বরাদ্দ ৮৮,৬০,০০০ টাকা হইয়াছিল। এখন তাহা সংশোধিত অনুমানে ৮২,১০,০০০ টাকা অর্থাৎ বাস্তবিক ব্যয় ধার্য টাকা অপেক্ষা ছয় লক্ষ কম করা হইয়াছে বা হইবে। পুলিশের আনুমানিক যত ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যয় হইবে।

অর্থাৎ ১৯১৬-১৭তে পুলিশের জন্ম বরাদ্দ হয় ১,১১,- ১২,০০০ ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা বাড়িয়া ১,১২,২৭,০০০ দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শিক্ষাব জন্ম ১৯১৬-১৭তে প্রথমে যাহা বরাদ্দ হয়, খরচ তাহা অপেক্ষা ছয় লক্ষ টাকা কম হইয়াছে ও হইবে, কিন্তু ঐ বৎসর পুলিশের জন্ম যাহা বরাদ্দ হয়, খরচ তাহা অপেক্ষা ১,১৫,০০০ বেশী হইয়াছে ও হইবে। ১৯১৭-১৮ সালের আনুমানিক বরাদ্দ ও বাস্তবিক খরচে, পুলিশের খরচ বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী এবং শিক্ষার খরচ বরাদ্দ অপেক্ষা যে কম হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? হওয়াই সম্ভব।

পাঠক ইহাও দেখিবেন যে পুলিশের বরাদ্দ ১৯১৬-১৭ অপেক্ষা ১৯১৭-১৮ সালে ২৩,২৬,০০০ বেশী হইয়াছে। শিক্ষার বরাদ্দ ১৯১৬-১৭ অপেক্ষা ১৯১৭-১৮ সালে বেশী হইয়াছে ২,৮৩,০০০। পুলিশের বরাদ্দ বাড়িয়াছে সওয়া তেইশ লক্ষ টাকা, শিক্ষার বরাদ্দ বাড়িয়াছে প্রায় দশ লক্ষ টাকা। তা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে, যে, পুলিশের জন্ম বরাদ্দ অপেক্ষা খরচ বেশী হয়, শিক্ষার জন্ম বরাদ্দ অপেক্ষা খরচ কম হয়।

পুলিশের ব্যয় ক্রমগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালে পুলিশের বাস্তবিক খরচ হইয়াছিল ১,০২,- ০৩,৭৮৩, ১৯১৬-১৭ সালের সংশোধিত আনুমানিক ব্যয় ১,১২,২৭,০০০ এবং ১৯১৭-১৮ সালের বরাদ্দ হইয়াছে ১,৩২,৩৮,০০০। ভারত-রক্ষা আইন পুলিশ-বিভাগের ব্যয়ের একটা বড় কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯১৭-১৮ সালে এই আইন প্রয়োগের জন্ম বরাদ্দ ৭৫০০০ টাকা, এবং এই আইন অনুসারে অবরুদ্ধ লোকদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের ভাতা দুইলক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। বঙ্গ অশান্তির মূল কারণ লর্ড কার্জনের শাসননীতি। এই-সব ব্যয় তাহার নিকট হইতে আদায় হইলে তবে ত্রায়সমস্ত কাজ হয়।

কোন গবর্ণমেন্ট কি পরিমাণে উন্নতিশীল, শিক্ষাব জন্ম ব্যয় তাহার একটা মাপকাঠি। ১৯১৪ সালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সরকারী সমুদয় বিভাগের মোট ব্যয়ের শতভাগেব ৩৩ ভাগ শিক্ষাব জন্ম খরচ করা হইয়াছিল। বঙ্গের

১৯১৭-১৮ সালের আনুমানিক আয় হইবে ৬,৭৭,২০,০০০, তন্মধ্যে শিক্ষার বরাদ্দ ২৮,১৩,০০০ টাকা। ইহা শতকরা ১৩ টাকার কিছু বেশী; কিন্তু বাস্তবিক খরচ এত করা হইবে কি না সন্দেহ। হইলেও তাহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের শিক্ষার ব্যয়ের হার অপেক্ষা অনেক কম হইবে।

বোগপ্রতিকার বিভাগ দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত, চিকিৎসা (medical) ও স্বাস্থ্যরক্ষা (sanitation)। চিকিৎসা শাখার জন্ম যাহা বরাদ্দ হয়, তাহা সরকারী ডাক্তারদের বেতন ও আফিস-খরচ, হাসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয়, মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ইত্যাদি জন্ম ব্যয় হয়। চিকিৎসা শাখার জন্ম ১৯১৭-১৮ সালের বরাদ্দ ২৬,১৪,০০০ টাকা, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা শাখার জন্ম বরাদ্দ ৫,৯৮,০০০; মোট ৩২,১২,০০০। মনে রাখিতে হইবে পুলিশের জন্ম ঐ সালের বরাদ্দ ১,৩৪,৩৭,০০০, অর্থাৎ বোগপ্রতিকার বিভাগেব চারিগুণেরও বেশী। স্বাস্থ্যরক্ষা শাখার প্রায় সমস্ত টাকা কতকগুলি মিউনিসিপালিটির জন্ম ব্যয়িত হইবে; তদ্বারা গ্রামবাসী লোকদের, যাহাদের সংখ্যাই বঙ্গে বেশী, বিশেষ কোন উপকার হইবে না।

আমরা গত বৎসরের চৈত্রমাসের প্রবাসীতে শিক্ষকের কাজ, পুলিশের কাজ ও বোগপ্রতিকার বিভাগের কাজের গুরুত্বের ভুলনা করিয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, পাঠকদিগকে তাহা পুনরুবা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ঐ মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে “সরকারী গৃহস্থালি” শীর্ষক প্রসঙ্গে এই-সব কথা আছে।

বঙ্গের শতকরা ৭৮ জন মানুষের নির্ভর করির উপর। ১৯১৭-১৮ সালে রুবিবিভাগেব জন্ম বরাদ্দ হইয়াছে ১২,২৬,০০০ টাকা মাত্র। ইহা পুলিশের বরাদ্দের দশমাংশেবও কম।

স্কুলকলেজের ছুটি।

প্রবেশিকা পরীক্ষা এক মাস পিছাইয়া বাওয়ায় পরীক্ষার ফলও সম্ভবতঃ অস্তান্ত বৎসব অপেক্ষা একমাস পরে বাহির হইবে। তাহা হইলে কিন্তু কলেজগুলির কাজ জুলাইয়ে আবস্ত না হইয়া আগষ্টে হইবে। তাহাতে ছাত্রদের ক্ষতি হইবে। এই ক্ষতি নিবারণের জন্ম বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি পরীক্ষাবগণকে বিশেষ তাগিদ দিয়া অন্ত্য

বৎসরের মত সমগ্রই পরীক্ষার ফল বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বাহির হউক বা বিলম্বেই বাহির হউক, কলেজগুলি প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকিবে। স্কুল-গুলিও মাসাধিক কাল বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে ছাত্রেরা কি করিবেন তাহা তাঁহারা এবং তাঁহাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও অনা গুরুজনরা ভাবিয়া দেখুন।

ছাত্রদের কর্তব্যের কথা ভাবিতে ও বলিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, আমরা কোন একটা দেশের কাজ পড়িলে তাহাদিগকেই আগে ডাকি কেন? তাহাদিগকে ডাকিয়া যে কিছু অত্যাশ কবি, তাহা নয়। কিন্তু তাহাদিগকে ডাকিবার অধিকার কেবল তাঁহাদেরই আছে যাহারা স্বয়ং দেশের কাজ করেন, করিতে প্রস্তুত আছেন, ও তজ্জনিত বিপদের দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। নতুবা আমরা বেশ আরামে থাকিব, এবং নানা-প্রকার কাজ যুবকদিগকে বাংলাইয়া দিয়া আরামে নিদ্রা যাইব, ইহা ত হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাহাদের বিষয়কর্ম কবিয়াও অনেক অবসর থাকে; এমন অনেক লোক আছেন, যাহাদের বলিতে গেলে সমস্ত দিনটাই অবসর। তাহারা দেশের কাজ কেন করেন না? ছাত্রদের প্রধান কাজ মাহুস হইয়া উঠা। তাহার জন্ত তাহাদিগকে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, এবং চরিত্রের সদগুণ-সকলকে দৃঢ় করিতে হয়। চরিত্রের বিকাশ ও দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্ত তাহাদের মাহুসের সংস্পর্শে আসা এবং নানা বাধা অতিক্রম করিয়া মাহুসের সেবা করা আবশ্যক। কিন্তু কেহ যে এই-প্রকার স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সেবা করে, তাহা নয়,—যদিও ইহা উচ্চ অঙ্গবৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক মাহুসের জন্মে অপরের প্রতি যে প্রেম আছে, তাহাই তাহাকে সেবায় প্রবৃত্ত করে।

সাধারণতঃ অল্প অনেক লোকদের চেয়ে ছাত্রদের অবসর কম। তথাপি তাহারা যে নানা সংকাজ করেন, ইহা তাহাদের প্রশংসার বিষয়, এবং তাঁহাদের নিজেব মঙ্গলেরও কারণ। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা দেশের সব বিপদ আপদের মুখে শুধু ছাত্রদিগকে ফেলিয়া দেওয়াব পক্ষপাতী নহি। ছাত্রকে তাহাদিগকে মাতান সোজা,

কিন্তু তাহাদের প্রধান কর্তব্য সাধনে বাধা পড়িলেহি কি না, তাহা আগে দেখা উচিত।

ছুটির সময় ছাত্রদের বেশী অবসর থাকে। এই সময়ে তাহারা দেশ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ কবিতে পারেন। দেশের স্বাস্থ্য কেন খারাপ ও কিরূপ খারাপ, দেশের গরীবেরা কেমন ঘরে থাকে, কতটুকু ঘরে কতজন থাকে কি ধায়; কি পরে, দেশের লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত কি আছে; কোন গ্রামের কতগুলি বালকবালিকার শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, কতগুলি নাই, ও কেন নাই, অনেক বালকবালিকা কেন লেখাপড়া শিখিতে পাবে না; গ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা কিরূপ; কি প্রকারে তাহার উন্নতি হইতে পারে, বোগীর চিকিৎসার কি উপায় আছে; নিঃস্ব রোগীর বিনাবায় চিকিৎসার কি উপায় আছে, গোচারণের কি ব্যবস্থা আছে, গ্রামের বালকবালিকাদের ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের খেলা ও আমোদের কি উপায় আছে, গ্রামে পাঠাগার আছে কি না, রামায়ণাদি কথকতা হয় কি না, প্রাপ্তবয়স্ক অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত আছে কি না; প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর পুরুষদিগকে লেখাপড়া শিখাই-বার জন্য নৈশবিদ্যালয়াদি আছে কি না, চাষের উন্নতির জন্য ভাল ভাল বীজ জোগাইবার ব্যবস্থা আছে কি না, বোথ ঋণদান-সমিতি গ্রামে আছে কি না,—ছাত্ররা এইরূপ নানা বিষয়ের ঠিক খবর নিজে দেখিয়া শুনিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন। এবং নিজদের সাধ্যমত গ্রামের কোন কোন অভাব মোচনের চেষ্টাও কবিতে পারেন।

কিন্তু দেশের বয়োবৃদ্ধ প্রধান লোকদিগকে ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করিতে হইবে। শুধু “আমরা পেছনে আছি” বলিলে চলিবে না। ক’বণ, দেখা যাইতেছে, যানের সচ্চবিজ্ঞ ও সদাশয় ছেলে সংকাজ করিতে গিয়াই ভারত-রক্ষা আইনের কবলে পড়িয়াছে। পুলিশের এবং শাসন-কর্তাদের একটা খিওরী এই, যে, বিপ্লববাদী ও বিদ্রোহ-কাজীরা নৈশবিদ্যালয়ে সর্কসাধাবণকে শিক্ষা দিবার এবং দুর্ভিক্ষ জলপ্রাচীন মড়ক আদিতে জনসেবা কবিবার অছিলায়, তাহাদের মত প্রচাৰ করিবার সুযোগ করিয়া লয়। ইহা কি পরিমাণে সত্য বা অসত্য বলিতে পারি না। কিন্তু যদি কোন কোন বিপ্লবপ্রয়াসী একরূপ কবিয়াই থাকে,

তাহা হইলেও ইহা প্রমাণ হয় না, যে, যে-কেহ জনসেবা কবিত্তে যায় তাহারই কোন বাহ্যনৈতিক বে-আইনী মতলব আছে। অথচ ছাত্রদের মধ্যে যাহাবা জনসেবায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাবা প্রায় সকলেই পুলিশের সন্দেহভাজন হইয়া থাকে। ইহাব ক্ষম পুলিশের লোকদিগকে দোষ দিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের কাজ যেকপ, তাহাতে তাহারা মানব-চরিত্রের মন্দ দিকটাই বেশী দেখে, এইজন্য মানুষ যে কাজ কবে, তাহাতে তাহার স্বার্থ আছে ও কুঅভিসন্ধি আছে এইরূপ মনে কবা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। অপরাধী ধরা পুলিশের প্রধান কাজ। তজ্জন্য মানুষকে সন্দেহ না করিলে তাহাদের চলে না। এই নিমিত্ত পুলিশ কর্মচারীদের একটু বেশী সন্দেহ-পরায়ণ হইবারই কথা। ইহা সন্দেহও কোন কোন পুলিশ কর্মচারী মানুষের সদাশয়তায় ও মহত্বে বিশ্বাসী থাকেন। কিন্তু মোটের উপর পুলিশের লোকে বোধ হয় সাধারণতঃ মানুষের স্বার্থপরতা ও কুঅভিসন্ধিকেই বেশী প্রবল মনে কবে ও লোককে তজ্জন্য কিছু বেশী সন্দেহ করে। এই নিমিত্ত যুবকদিগকে মড়কে রোগীৰ সেবা এবং ছুঁতিল্পে ও জলপ্রাবনে গবীবের সাহায্য কবিত্তে দেখিলে পুলিশের সন্দেহের উত্থেক হয়। অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা শিক্ষকতা করিলেও সন্দেহ হয়। দেশের মাতব্বর লোকেরা এই-সকল কাজে ছাত্রদের সহযোগী ও সহকর্মী হইলে পুলিশের সন্দেহ কিছু কমিবে কি না, জানি না। কিন্তু যদি বিপদে পড়িতে হয়, তাহা হইলে শুধু যুবকেরাই কেন বিপদে পড়িবে, সকলেরই বিপদে পড়া উচিত। সকলে একসঙ্গে কাজ কবিলে ছোট বড় সকলেরই সাহস বাড়ে, এবং একপ্রাণতা জন্মিয়া দেশের মধ্যে একটা জমাট ভাব আসে। তা ছাড়া, আরও একটি সফল ফলিতে পারে। আমরা জানি, ভারতরক্ষা আইন অনুসারে আবদ্ধ অধিকাংশ লোক যুবক বলিয়া দেশের লোকদেরই কাহারও কাহারও এইরূপ সন্দেহ আছে যে ঐ যুবকেরা অধিকাংশস্থলে হয়ত বা কিছু কবিবা থাকিবে; কিন্তু যদি দেশের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি এইরূপে ছেলোদের সঙ্গে আবদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে এইরূপ ধারণা জন্মিতে পারিত কি না সন্দেহহীন।

যাহাই হউক, “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল বে।” কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া মানুষের কল্যাণের জন্য বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক আশ্রয় সকলে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন কবিয়া যাই। মানুষ কে সঙ্গে আছেন, কে নাই, ভাবিবার দরকার নাই। ভগবান্ সঙ্গে আছেন।

রাধানগরে রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির।

রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির স্থাপনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার উদ্যোগী ও পরম উৎসাহী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় “রাধানগরে স্মৃতিমন্দির” নাম দিয়া একটি সুন্দর পুস্তিকা প্রকাশ কবিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে স্মৃতিমন্দির-স্থাপন-চেষ্টাব ইতিহাস জানিতে পাওয়া যায়। গত বৈশাখ মাসে রাধানগরে, রামমোহন-স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষে, যে মহতী সভা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এই পুস্তিকায় আছে।

স্মৃতিমন্দির নির্মাণ ও তাহার নিকট অতিথিশালা স্থাপন, অতি শুভ ও মহৎ অমুষ্ঠান। ইহা সুসম্পন্ন না হইলে আমাদের দারুণ লজ্জার বিষয় হইবে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ধর্মাবলম্বীর ইহাতে যোগ দেওয়া এবং অর্থ সাহায্য করা কর্তব্য। দ্বিজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, “এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে গঠিত ও ইহার কার্যনির্বাহক সভা সেইরূপেই কাজ কবিবেন।” এই অমুষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ৭১ নং আমহাষ্ট্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টাকাকড়ি সেই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পালের নামে পাঠাইতে হইবে, এবং সমুদয় সংবাদও তাহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনাদল গঠন

সারু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাজ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে লইয়া সেনাদল-গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আগে কিছু লিখিয়াছি। এই কাজটি সারু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত কাজ। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার ক্ষমতা প্রভূত। তাহার মত শক্তিশালী লোক এই কাজটি হাতে লইলে ইহা শীঘ্রই সুসম্পন্ন হইবে। এইজন্য, কে এই কাজটি করিবেন, ভাবিতে গেলে, তাহাব নামই আগে মনে আসে।

দেশের সেবা

মানুষ যে বাঁচিয়া আছে সে হিংসাব জ্বাবে নহে প্রেমের জ্বারে। মানুষ বাঁচিয়া থাকে, বাড়িয়া উঠে, বড় বড় কাজ কবে—সে সবই প্রীতির বলে। Struggle for existence বা জীবনসংগ্রাম নহে, mutual aid বা পরস্পরের সাহায্যই সমাজের ভিত্তি ও সমাজের উন্নতির মূল ও নিয়ামক। এই mutual aid বা পরস্পরবৎ সাহায্যের কথাটাই টলষ্টয় তাহার এক উপন্যাসে মর্ত্যপ্রবাসী এক স্বর্গীয় দূতের মুখে বলাইয়াছেন,—

"All men live, not by the care they take of themselves, but by the love that there is in men I have learned that it only seems to men that they live by the care they take of themselves; but in truth they live only by love."

অর্থাৎ মানুষ আপনার প্রতি যত্ন কবে বলিয়া বাঁচে এমন নয়, মানুষের মধ্যে যে প্রেম আছে তাহারই জন্ত মানুষ বাঁচে। আমি দেখিয়া শুনিয়া জানিয়াছি যে মানুষ মনে কবে সে আপনাকে আপনি যে যত্ন করে তাহারই জন্ত সে বাঁচে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা বাঁচে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমের জন্ত।

এই সত্যই বর্তমানযুগের সমাজতত্ত্বের প্রধান আবিষ্কার। এই প্রীতি, বাহা মানুষকে মানুষের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উন্নতির পথে লইতেছে ইহা, মানবসমাজের আদিযুগে কেবল অন্তবদ্ধ আত্মীয়ের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার পর যুগে যুগে ইহা প্রবৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃহত্তর সমাজে প্রসারিত হইয়াছে। দেশ-প্রীতি এই বিশ্বব্যাপী প্রীতির একটি পরিণতি ও পরিচয় মাত্র। আদিযুগে বাহা অপবিসর ছিল, আজ তাহা সর্বব্যাপী; আদিযুগে বাহা পবিবাব বা আত্মীয় আবদ্ধ ছিল, আজ তাহা দেশব্যাপী; আব সেই দেশ বাহা এককালে ছিল একটি অপেক্ষাকৃত ছোট স্থান, আজ তাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়া একএক বিরাট ভূখণ্ডে পর্যাবসিত হইয়াছে। শতবর্ষ পূর্বে বাহাবা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী, আজ তাহারা এক লক্ষ্য লইয়া একসাথে চলিয়াছে, শতবর্ষ পূর্বে বাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হিংসা করিয়া লোকক্ষয় করিয়াছে, আজ তাহাদের মধ্যে পরমপ্রীতি, আজ তাহারা পরম বন্ধু।

পূর্বে বাহা ছিল বিদেশ, আজ তাহা স্বদেশ; পূর্বে বাহাবা ছিল দেশের শত্রু, আজ তাহারা স্বদেশবাসী।

মানবের প্রেমের যে পরিসর দেশই কি চিত্রিত তাহার সীমা থাকিবে? দেশ যতই বাড়িয়া যাক না কেন সে সীমাবদ্ধ, মানুষের ভালবাসিবার শক্তি কিন্তু অসীম। এখনি দেখিতে পাইতেছি যে দেশ ভালবাসা ভগ্নোৎসর্গ সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া মানুষকে বাঁধিতেছে, দেশের গভী ছাড়াইয়া গিয়া মানুষের প্রীতি বৃহত্তর সমাজে প্রকাশিত হইতেছে। এই অঘেঘণেব পরিণতি কোথায় তাহার কি কোনও সন্দেহ আছে? সমুদয় মানবসমাজে যে এই প্রীতি ছড়াইয়া পড়িবে, দেশ জাতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র সমাজ যে সেই প্রকাণ্ড প্রীতির বস্ত্রায় ভাসিয়া বাইবে, সমুদয় মানবজাতি যে এক মহাদেশ ও এক মহাসমাজ হইয়া গড়িয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেমন আগে ছিল নিজেব পরিবাব, নিজের কুল-গণ-জাতি, তেমনি আজ দেশ আমাদের প্রীতির পরিণতির পথে দাঁড়াইবার একটি সাময়িক স্থান মাত্র। এ স্থান ছাড়িতে হইবে, আবও আগে চলিতে হইবে, অনেক পথ এখনো সম্মুখে আছে—এখনি ডাক উঠিয়াছে, উত্তীর্ণত, জাগ্রত, প্রাণবন্তবোধিত—এ পথের সেই সীমা, সেই শ্রেষ্ঠ পরিণতি সনগ্রহ মানবে প্রীতি; ভূগোল অবহেলা করিয়া, নদী পর্বত সাগর মহাসাগরের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যে সমাজ তাহাতে আপনাকে পাইতে হইবে, দেশাত্মবোধ অতিক্রম করিয়া ভগবানের অপূর্ববিধানে আমাদের সেই মহাদেশে সেই মহাসমাজে আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।

সেদিন এখনো আসে নাই, সে পরিণতি এখনো স্বদূরে। এখনো আমবা দেশাত্মবোধকেই সম্পূর্ণরূপে আদৃত করিয়া উঠিতে পারি নাই, এত বড় সমাজকে এখনও আপনার সহিত সম্পূর্ণ এক করিয়া দেখিতে পারি না। তাহা না করিতে পারিলে জগতের সহিত আপনাকে এক করিয়া দেখিতে এবং সেই জ্ঞান লইয়া জীবনকে নিয়মিত করিতে তেমন করিয়া পারিব? মুখে কথাটা বলা সহজ যে, সকল মানুষ আমবা ভাই, সমস্ত জগৎ আমার সমাজ; কিন্তু সেই বুদ্ধি মনের ভিতর কার্যকরীরূপে জাগ্রত করা ঠিক তেমনি

কঠিন। মুখের বড় কথা অনেক সময় ছোটখাট কৰ্তব্য করিতে আলগ্ন্যেব উপব গিলট চড়ান মাত্র। আমি আমার পরিবারের প্রতি কর্তব্য করিতে পারি না, হয়তো তাহার কারণ আলস্ৰ বা প্রকৃত প্রীতির অভাব বা তেমনি আব কিছু। কিন্তু আমি যদি খুব বুদ্ধিমান হই তবে লোকেব কাছে দেখাইতে হইবে যে আমার অপকার্যের হেতু অতি মহৎ। যদি আমার মনে বিবেক কিছু উপদ্রব করে তবে তাহার চোখেও ধূলা দিতে হইবে। ইহা কবিত্তে হইলে বড় কথা দিয়া আমার নীচ কাঙ্ক্ষকে ঢাকা দেওয়াই প্রকৃষ্ট এবং সহজ উপায়। ভাইয়ের অল্পে সেবা করিব না, ভয়ে কিম্বা অল্পবাগের অভাবে, কিন্তু লোকের কাছে নন্দলাল্যেব মত বলিতে হইবে

“ভাইয়ের জন্ত প্রাণটি যদি বা দি

তা না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশেব হইবে কি?” দেশের সেবার নাম করিয়া অনেকে এমন ছোটখাট কৰ্তব্যের হাত হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন—কেবল পরকে বুঝাইবার জন্ত নয়, হয়তো নিজেকেও সেইরূপ বুঝাইয়া থাকেন। তেমনি দেশের কাজ করিতে যাহারা নারাজ, দেশেব প্রতি সে প্রীতি যাহাদেব নাই, তাহারাও অনেক সময় দেশকে কঁাকি দিবার জন্ত মানব-সমাজের একত্বের দোহাই দিয়া থাকেন। জীবনে অমবা নিজের মনকে নানা স্তোত্রবাক্যে ভুলাইয়া অনেক সংকার্য হইতে বিরত হইয়া থাকি—দেশের সেবায় বিরত থাকিয়া অনেক সময় অনেকেব মনকে প্রবোধ দিবার উপািস্বরূপ হয় মানব-সমাজের একত্ব।

ইহা যে কেবল অন্মায় তাহা নহে, ইহা অসত্য। দেশের সেবার সঙ্গে মানব-সমাজের একত্ববোধের প্রকৃত কোনও বিরোধ নাই। তোমার প্রীতির পরিসব যতই হউক না কেন, তোমার কার্যের ক্ষেত্র সৰ্ব্বদাই সীমাবদ্ধ। তোমার সেবার ক্ষেত্র তোমার সমাজ, তোমার চারিপাশে যে-সকল লোক আছে ; যাহাদের সঙ্গে তোমার নিত্য ব্যবহার তাহাদের প্রতি কর্তব্য তোমাব যত বড় আদর্শই হউক না তাহার একটা অত্যাক্রম্য অঙ্গ। তোমার আদর্শ যত বড় হইবে সে কর্তব্য তত মহৎ হইবে, তাহার অর্থ তত গভীর হইবে, তাহা পালনের গৌব তত বৃদ্ধি পাইবে।

দেশ এমন একটা সমাজ যাহার ভিতর তোমার কৰ্তব্যের খুব বেশী ভাগ আবদ্ধ থাকিবেই। মানব-সমাজের হিত যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে সে হিতসাধন সম্বন্ধে তোমার আদর্শ যাহাই হউক, সে আদর্শ কার্যতঃ আয়ত্ত করিতে হইবে প্রধানতঃ তোমার দেশবাসীকে দিয়া। স্বতরাং তুমি দেশপ্রেমিকের আদর্শ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলেও দেশেব সেবা ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। দেশেব সেবার সাধারণ যে আদর্শ তাহার সহিত তোমার বিরোধ থাকিতে পারবে, দশ জনে যে কাজ দেশের মঙ্গলের জন্ত কর্তব্য বিবেচনা করে তুমি তোমার উন্নত আদর্শ লইয়া হয়তো তাহাকে অকরণীয় বিবেচনা কবিত্তে পার, কিন্তু যদি তোমার আদর্শ কেবল মুখের কথা না হয় তবে তোমাকে তোমার আদর্শ ও বিবেচনার সম্মুখারে দেশবাসীর সেবা করিতেই হইবে।

বাংলার যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে দেশসেবার একটা প্রকৃত প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সাধু আকাঙ্ক্ষা যেরূপ বিস্তৃত ও যেরূপ গভীর ভাবে ছাত্র ও যুবকসমাজে দেখা যায় তাহাতে ইহা যদি স্পষ্ট ও সন্ধিবেচনার সহিত পরিচালিত হয় তবে ইহা হইতে পরম সফল লাভ হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দেশের সেবা করিতে হইবে, কিন্তু কোন পথে যাইব, কোন কাঙ্ক্ষ করিব, কি সাধনা কবিব, এ কথা সকলে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, আর যাহারা কাজ করিতে আসিয়াছে তাহাদেব অনেক সময় এসব কথা খুব ভাবিয়া দেখিয়া কৰ্তব্য নিশ্চয় করিয়া লওয়াব সময়ও হয় না। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কৰ্তব্যের একটা সুনির্দিষ্ট নকসা করিয়া লইলে কাজের অনেকটা সুবিধা হয়, শক্তির অপচয় অনেকটা কমিয়া যায়।

এমন একদিন ছিল যখন দেশের সেবা বলিতে প্রধানতঃ লোকে বুঝিত দেশেব জন্ত যুদ্ধ করা। দেশের জন্ত যুদ্ধে প্রাণদান করার যে গৌরব ছিল তাহার প্রধান কারণ এই যে যখন এ আদর্শ গঠিত হয় তখন যুদ্ধ করাটাই দেশের সর্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল। যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ হইত তখন দেশের আত্মরক্ষাই প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল এবং দেশের রক্ষার জন্ত প্রাণ দিতে যে অগ্রসর হইত সেই ধন্ত বিবেচিত হইত। আজ সেদিন নাই।

যদিও এখন ইউরোপে দারুণ লোকক্ষয়কর মহাসমব চলিতেছে তথাপি এ কথা অসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে আজকালকার সমাজে যুদ্ধটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নহে এবং দেশের হিতকামীরা যুদ্ধ বিগ্রহ অপেক্ষা অপরাপর হিতকর বিষয়েই অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন। কাজেই যুদ্ধের গৌরব এখনো যথেষ্ট থাকিলেও অনেকটা সত্বের হইরা আসিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ এখনো জগৎ হইতে লোপ পায় নাই, এখনো সকল দেশেরই আবশ্যকার জন্ত যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। যতদিন এ প্রয়োজন আছে ততদিন আমাদেরও দেশের জন্ত যুদ্ধ করা গৌরবের বস্তু থাকিবে, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকা দেশসেবা বলিয়া পরিগণিত হইতে বাধ্য। কিন্তু ইহা দেশের সেবার একটি উপায় মাত্র, তাহার কেবলমাত্র উপায় নহে। পরিণতির সহিত মানব-সমাজ ক্রমশঃই অধিক জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সমাজের ক্রিয়া বহুমুখী হইয়াছে, সেবার ক্ষেত্রও বহু পরিমাণে বিস্তৃত ও বহুদ্রাব্যক হইয়াছে। দেশসেবার সেই নানা পন্থার মধ্যে দেশের জন্ত যুদ্ধ করা একটি মাত্র পথ।

এই কথাটি সকল সময় আমাদের মনে থাকে না। যে দেশের সেবার নানা পন্থা আছে। সমাজের যত-প্রকারের প্রয়োজন আছে ঠিক তত-প্রকার সেবার উপায় আছে। সে প্রয়োজন বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক, সেই প্রয়োজন পূরণ করা দেশের সেবা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এমন কি, এক হিসাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে মানুষ মাত্রেই দেশের সেবক। সমাজের সেবা দেশের সেবাই জীবন। প্রত্যেক মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেকেই জীবনের বেশী ভাগ সমাজের সেবায় ব্যয় করে। মানুষ ঠিক নিজের জন্ত খুব সামান্য কাজই করে, বেশীর ভাগ কাজ করে অপরের জন্ত। অতি দীন-হীন যে মজুর সে রোজগারের জন্ত কাজ করে, সে-কাজে পরের কোনও একটি অভাব মোচন হয়—রোজগারের টাকা সে খরচ করে বেশীর ভাগ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্ত—ইহাদের প্রতিপালন করিয়া সে প্রকৃত-প্রস্তাবে সমাজেরই কাজ ও কর্তব্য পালন করে। বাস্তবিক মানবজীবন ও মানবচরিত্র এমন ভাবে গঠিত যে সমাজেব সেবা ছাড়া

মানুষ বাঁচিতেই পারে না, নিজের স্বথের জন্ত ত দেশের সেবা করিতেই হইবে।

তবে না-জানিয়া সেবা ও জ্ঞানকৃত সেবায় ত কোন আকাশপাতাল। আমরা চাই সেবার ইচ্ছায় সেবা অন্তানে সেবা সবাই করে; গৌরব শুধু তাহারই না জানিয়া শুনিয়া সেবা করে; সেবার জন্ত আত্মত্যাগ করে।

যাহারা সজ্ঞানে দেশের সেবা করে তাহাদের নিত্যই একটি প্রকাণ্ড জাঁকাল রকমের কাজ করিতে হইবে তাহা নহে। সেবার গৌরব সেবার আবাসিক, সেবার সৌকর্য্যে; সেবা-কর্ষের পরিসর বা চাবুক নয়। বরং গৌরব তাহারই বেশী যাহার কাজ চাকচিক্য নাই জাঁকজমক নাই, যে এই সংকীর্ণ নাট্যাঙ্গণার পর্দার আড়ালে বাজ করে, ফুট-লাইটের সম্মুখে আসিয়া করতালি অর্জন করিতে চাহে না। সে-কাজের উপর লোকের খুব নজর থাকে, যাহাতে খ্যাতি লাভ করা যায়, দেশের লোকের সম্মান অর্জন করা যায়, সে-কাজের জন্ত বরং লোকের অভাব হয় না, কিন্তু সে-কাজ খুব নীচে, লোকচক্ষুর অগোচরে করিতে হয়, যাহাতে কর্তব্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা হয়। অল্প কোনও পুণস্কার নাই, সে-কাজের কর্মী বড় আনন্দ মিলে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার প্রয়োজন কম নহে, বরং অনেক সময় অধিক। মন্দিরের চূড়ার স্বর্ণকলসের চোখে ঝকমক করে, কিন্তু লোকচক্ষুর অগোচরে মাটির তলে ভিত্তি মূলে যে ইটখানি আছে তাহার সৌভাগ্য কম হইলেও মন্দিরটি রক্ষার জন্ত ভারী প্রয়োজন কাহারও অপেক্ষা কম নহে। অথচ সে যদি মন্দির-কলসের সহিত সমান গৌরব লাভ করিবার জন্ত চেষ্টা হইয়া উঠে, তবে স্বর্ণকলসকে সে ভূতলশায়ী করিয়া দে নিজেও ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এই কথা দেশেব সেবাকাজী যুবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দেশের কাজ যদি করিতে চাও তবে সৌধীন কাজের দিকে বেশী ঝুঁকিও না। ভোলাব হাতের কাছে যে ছোট কাজট আছে তাহা হইতে তোমার সেবা আবশ্যক কবিত্তে হইবে, সে-কাজ ছোট হইতে পারে কিন্তু তাগাব ফলে তুমি সে উপকার কবিবে তাহ

হয়তো কোনও উপকাব অপেক্ষা হীন নহে মনে রাখিও দেব বলিয়া কোনও একটা abstract বা বস্তুনিরপেক্ষ জিনিষ নাই, দেশের মানুষ লইয়াই দেশ। সে মানুষ যেখানে আছে সেইখানেই তোমার সেবার ক্ষেত্র আছে। তুমি দেশের মানুষের যে উপকারটুকু করিবে সেটা যে অতি সামান্য বা সাধারণ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না। সামান্য হউক, সাধারণ হউক, সমাজের পক্ষে তাহার ষোল আনা প্রয়োজন আছে। তুমি যদি একজন পথভ্রান্ত পথিককে পথ বলিয়া দেও বা সাধারণের চলবার পথ হইতে কাটাটি সরাইয়া ফেলিয়া দেও, তাহা হইলেও তুমি দেশের উপকার করিতেছ একরূপ মনে করিতে পার। চারিদিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে তোমার আশে-পাশে জীবনের প্রতিমুহুর্তে একরূপ অসংখ্য সেবার অবসর রহিয়াছে। সেইসব কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। তাহা অপেক্ষা বড় কাজ করিতে পার করিও, কিন্তু ছোট বলিয়া কোনও সেবার কাজকে অবহেলা করিও না। সকলে যদি এই-সব ছোট কাজ ফেলিয়া বড় কাজের নিষ্ফল সন্ধানে ফিরে, তবে বড় কাজ কোনও কাজের হইবে না, ছোট কাজটিও মাট হইবে।

অতি সামান্য অতি নগণ্য কাজ, এমন কি যে কাজকে লোকে নিতান্ত স্বার্থপরের কাজ বলিয়া মনে করে তাহাও, দেশের কাজে লাগিতে পারে। নিজের কাজ কঁবা এবং তাহার জন্ত পরের কাজ করিতে না যাওয়া স্বার্থপরতা হইতে পারে, কিন্তু নিজেকে একেবারে অবহেলা করিলেই যে দেশের কাজ করা হয় তাহাও নহে। দেশের জন্ত মরিলে গোবব আছে যদি মরার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু যেখানে বাঁচাটাই বেশী দবকার সেখানে মরার কোনও গৌরব নাই। সময়ে সময়ে দেশের জন্ত বাঁচারই বেশী আবশ্যক হয়। শুধু বাঁচা নয়, নিজের উন্নতি করাটীও অনেক সময়ে নিজের মঙ্গলামঙ্গল-বিষয়ে উদাসীন হওয়ার চেয়ে দেশের পক্ষে বেশী হিতকারী হইতে পারে। নেলসন বা ওয়েলিংটন কিম্বা পিট বা গ্যাডস্টোন ইংলণ্ডের যে পরিমাণ হিত করিয়াছেন, সেক্সপীয়ার বা মিলটন, নিউটন বা ডারউইন তাহা অপেক্ষা অল্প হিত করিয়াছেন একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কিন্তু

সেক্সপীয়ার যদি থিয়েটার ছাড়িয়া পার্লামেন্টের সদস্য হইয়া দিন রাত “দেশেব কাজ” কবিতেন, মিলটন যদি নোসেনাথ নাম লেখাইতেন, ডারউইন যদি চার্টারের দলে আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেন বা নিউটন যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিতেন তবে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের জন্ত বেশী করিতেন কি? তোমার ভিতর যদি এমন কিছু থাকে যাহাতে পরিণত অবস্থায় তুমি দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তবে সেই শক্তিকে বর্ধিত পূর্ণ পরিণত করাই তোমাব পক্ষে প্রধান কর্তব্য হইবে এবং সেই আত্মোন্নতির চেষ্টা যদি তুমি দেশের আর দুই-দশটা কাজ না করিয়াও থাক তবে তাহাতে তোমার সেবার গৌরবে কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে এমন কথা বলা চলিবে না। শুধু অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষগণেরই যে আত্মোন্নতির দ্বারা দেশের সেবা করা হয় তাহা নহে, এক হিসাবে প্রত্যেকের পক্ষেই আত্মোন্নতির চেষ্টা দেশসেবার একটি অত্যাবশ্যক। দেশের হিতের জন্ত প্রত্যেকেরই সাধ্যের সীমা পর্যন্ত কার্য করা উচিত। তুমি অপরিণত বুদ্ধি বা অপরিণত শক্তি লইয়া যে কার্য করিতে পারিবে, সেই শক্তি ও বুদ্ধির সাধনা দ্বারা উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে তুমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান দেশকে দিতে পারিবে, তোমার সেবার মূল্য অনেকটা বাড়িয়া যাইবে। প্রত্যেকে নিজ-নিজ শক্তিসাধ্যের চরমোৎকর্ষ সম্পাদন কবিয়া দেশকে সেই শক্তি ব্যবহার করিতে দিতে বাধ্য। সুতরাং একথা সত্য যে self-culture বা আত্মোন্নতিও দেশের সেবার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

যেখানে নানা পথ সম্মুখে মুক্ত রহিয়াছে সেখানে বিরোধ ও সংশয় অবশ্যস্বাবী। নিজের উন্নতি যেমন দেশের জন্ত কর্তব্য, আন্তের সেবাও তেমনি কর্তব্য। যখন এই উভয় কর্তব্যে বিরোধ হয় তখন কোন পথ শ্রেয় বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবে? ইহার সহজ উত্তর এই যে সংশয়ের স্থলে ত্যাগের পথই শ্রেষ্ঠ। সাধারণ ভাবে একথা অত্যন্ত সত্য। যেখানে আত্মহুষ্টি ও আত্মত্যাগে বিরোধ, সেখানে ত্যাগের পথই কর্তব্যবিশিষ্ট নিরাপদ, নহিলে হয়তো বা আমরা দেখিতে পাইব যে আমরা নন্দলালের মত একটা পণ করিয়া বসিয়াছি যে

“দেশের তরে বা’ ক’রেই হোক রাখিবই এ জীবন।”

কিন্তু সব সময় একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।

এমন অবস্থা অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে যেখানে আত্মরক্ষার পথই দেশেব পক্ষে শ্রেয়। রবার্টসন পসাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া দেশের সেবার তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন একথা কেহ বলিবে না।

আসল কথা এই যে দেশের কাজ বলিয়া কাজের কোনও মান-মারা বিশেষ শ্রেণী নাই। প্রায় সব কাজই দেশের কাজ। কাপড়-বোনা জুতা-সেলাই মোট-বওয়া হইতে আবস্ত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় দেশের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নে সহায়তা করা পর্যন্ত নিজেব জন্ত বা পরের জন্ত যে কোনও কাজ করা যায় সকল কল্পই দেশের কাজ হইতে পারে। প্রভেদটা কাজের মধ্যে নাই, প্রভেদ সেই কাজের অন্তরালে কর্মকর্তার মনের ভিতর। যে কাজ করিতেছি তাহা যদি দেশের সেবা করিবার ইচ্ছায় এবং সেবা করিতেছি এই বুদ্ধিতে করি তবেই তাহা দেশ-সেবা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবদগীতায শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন যে নিষ্কামভাবে ধর্মবুদ্ধিতে যে কার্য করিবে সে কার্য যাহাই হউক না কেন তাহাই ধর্ম। আত্মীয়-বধ সামাজিক-অমঙ্গল সাধন প্রভৃতি যত প্রকার অনিষ্ট তাহা হইতে হউক না কেন তুমি যদি সে কার্য ধর্ম করিতেছি জানিয়া কর তবে তাহাই ধর্ম। সেইরূপ দেশেব সেবা করিতেছি জানিয়া তুমি যে-কাজই কর না কেন, সে কাজ যত কেন স্বার্থপরের মত দেখা যাক না, তাহার দ্বারা তুমি দেশসেবার গৌরব লাভ করিবে।

এ কথা যদি সত্য হয় তবে দেশ-সেবকের কাছে আমরা চাই কি? চাই—ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপ। আব চাই—ধীরবুদ্ধি, শাস্তিচিত্ত, রাগ-দ্বেষ্টার একান্ত অভাব। চাই—সেই নিষ্ঠা যাহা ইবসেনের Brandএব মত All or None এই নিয়মে সমস্ত জীবনকে নিষমিত করিতে পারে, যাহা দেশের প্রয়োজনে সর্বস্ব পবিত্যাগ করিতে পারে। চাই—সেই আত্মত্যাগ যাহা অহংকার একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, যাহা কোনও কার্যে দেশের মঙ্গল হইতে ভিন্ন করিয়া আপনাব মঙ্গল কল্পনা করিতে পারে না, দেশের জন্ত আশা ছাড়া নিজের জন্ত

কোনও ইচ্ছা করিতে পারে না। চাই—সেই আত্মবিলোপ যাহাতে নিজের স্বার্থভঞ্জন রাগদ্বেষ্টা তৃপ্তি-অতৃপ্তি অভ্যাস-অভিমান সব দেশেব পায় নিবেদন করিয়া দিয়া। কিন্তু শুধু ইহাতে চলিবে না—তোমাব প্রবৃত্তিব উৎকর্ষ দেশসেবায় তোমাব উৎকর্ষ লাভ হইবে না—বলিবে উৎকর্ষও সম্পাদন করিতে হইবে। নিরন্তর চেষ্টার দ্বারা, অধ্যয়ন বিবেচনা ও গবেষণা দ্বারা দেশের মঙ্গলানন্দন প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সম্বন্ধে তোমাব জ্ঞান বুদ্ধি বর্ধিতে হইবে, অগ্রমত্ত চিত্তে সমুদয় আবশ্যক অবস্থা বিচার করিয়া দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যেটা তোমাব ভাল লাগে সেইটাই যে দেশের পক্ষে সত্যসত্যি ভাল একথা মনে করিও না। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ সেটা ভাল কিনা, খুব ভাল করিয়া দেখ যে যে-সিদ্ধান্ত তুমি করিয়াছ তাহা কেবল বুদ্ধির ফল, তোমাব রাগদ্বেষ্টা-প্রসূত নহে। যাহা এইরূপ বিবেচনায় দেশের মঙ্গলজনকরূপে চিহ্নিত সেই কার্য তোমাব কর্তব্য হইবে, তাহাতে তুমি মনপ্রাণ একান্তভাবে নিযুক্ত কর।

বুদ্ধি ভগবান সকলকে সমান দেন নাই। দেশের হিতাহিত অমুসন্ধানে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যার প্রয়োজন, সে বিদ্যা যত্নের সহিত অমুশীলন করিতে হয়। Politics, Economics, Jurisprudence, Sociology প্রভৃতি বিদ্যা যে-কেহ অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে না। অথচ এসমুদয় বিদ্যা দেশের হিতাহিত বিবেচনার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। যদি তোমাব সে অধিকার না থাকে তবেই যে তুমি দেশের সেবার কার্য হইতে বঞ্চিত হইবে এরূপ মনে করিও না। যে-সমুদয় বড় বড় প্রশ্ন এই বিদ্যাব সাহায্য ছাড়া সমাধান করা যায় না, তুমি কেবল সেই-সমুদয় কার্যে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইবে—তাহাতে তোমাব অগ্রসর হওয়া অববিবেচনার কার্য হইবে; কিন্তু এমন শত শত ছোটখাট কাজ আছে যাহার জন্ত এত বেশী বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই—সেই কাজ একান্ত নিষ্ঠার সহিত করিয়া তুমি দেশসেবার সম্পূর্ণ গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

হিন্দুশাস্ত্রে সকল বিদ্যামুশীলনে সকল কার্যের প্রারম্ভে

অধিকারী বিচার করা হয়। সকলেই সকল কাজ কবিত্তে পাবে না। যাহা যাহাব শক্তির সাধ্য সেই অনুসারে তাহা সম্পন্ন করিয়াই সে ধর্ম করিতে পাবে। যেভাবে এই অধিকারী-বিচারভঙ্গ এখন সমাজে প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত দুষণীয় কিন্তু ইহাব গোড়ার কথাটা অত্যন্ত ঠাট। দেশের সেবা সম্বন্ধেও এই অধিকারী-ভেদ মানিতে হইবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তির অনুযায়ী কার্য কবিত্তে হইবে—অধিকার অতিক্রম কবিয়া কার্য করিতে গেলে কাজ ভাল হইবে না।

আর একটা প্রয়োজনীয় কথা এই যে সব কাজের মত দেশ সেবারও একটা সাধনা চাই। সখের খেলোয়াড়ের মত দেশ-সেবা লইয়া খেলা কবিলে কোনও কাজই হইবে না—দেশ-সেবায় লাগিয়া পড়িয়া-থাকিলে তবেই তুমি একটা কিছু সত্যসত্য ভাল কাজ করিতে পারিবে। তোমার কায়েব ক্ষেত্র নির্ণয় করিয়া তোমাকে আগে আপনাকে সেই কায়েব জগৎ উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে, যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা লাভ করিতে হইবে, যে শক্তিব প্রয়োজন তাহার সাধনা করিতে হইবে; নিজেকে আগে তৈয়ার না করিয়া কাজে হাত দিলে শুধু কাজ পণ্ড হইবে। তাই বলিতেছিলাম, দেশসেবার জগৎ একটা সাধনা চাই। অভ্যাস দ্বারা শক্তি ও কর্মপটুতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, অধ্যয়ন ও অল্পশীলন দ্বারা তোমার বুদ্ধিকে শাণিত করিতে হইবে, ঐকান্তিক ধ্যান দ্বারা তোমার চিত্তে সর্বদা সেবার প্রবৃত্তি প্রবল করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা না করিতে পারিলে তোমার সেবা নিষ্ফল হইবে।

এই কথাটা আমাদের দেশে সকলে স্বরণ রাখেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের দেশে বর্তমান কালে এইরূপ ঐকান্তিক সাধক ও সেবক স্থলভ নহে। আমাদের দেশে যে খুব তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অল্পরাগ সত্ত্বেও দেশের সেবাকার্য্য বিশেষ ফলপ্রসূ হইতেছে না এই ঐকান্তিক সাধনার অভাবই তাহার কারণ। আমরা বেশীর ভাগ উত্তেজনার দাস, আমাদের সাধনার অভাব আমরা উত্তেজনা দিয়া পূরণ করিতে চাই। কিন্তু একটা হাউইয়ের আগুন যতই তীব্র বা প্রবল হউক না তাহার দ্বাবা ভাঙ বাঁধা চলে না। দেশের কোনও দায়ী মঙ্গল করিতে হইলে

সাময়িক উত্তেজনার উপর নিভর করা বাতুলতা; কোনও একটা ভাল কাজ কবিত্তে গেলে দীর্ঘকাল তাহাতে তা দিতে হয়, অধীবতায় তাহা পণ্ড হয় মাত্র।

এই নিষ্ঠা, এই ঐকান্তিকতা, এই যে একটা কাজে লাগিয়া পড়িয়া-থাকিবার ক্ষমতা, ইহা আমবা পাইব কোথা হইতে? স্বদেশপ্রেম যতই প্রবল হউক না কেন আমাদের মনের ভিতর এই আগুন চিরদিন সমানভাবে জ্বলাইয়া রাখিবার সাধ্য শুধু তাহার হয় না যদি তাহার পশ্চাতে ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আস্থা ও তাঁহার ধর্মনিয়মে স্থির বিশ্বাস না থাকে; যদি আমরা সত্যসত্য বিশ্বাস করি যে এই জগতের ভিতর ভগবানেব ধর্মরাজ্য অনুস্থ্যত আছে, যদি এই জ্ঞান অন্তরে অন্তবে অনুভব করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক চেষ্টার ভিতর সর্বদা ইহা জাগ্রত রাখিতে পারি, তবেই আমরা পাইতে পারি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এই অটুট চেষ্টা, সুখদুঃখে সমান এই শাস্তি; তবেই আমরা তাঁহার আশীর্বাদ বলিয়া সকল শাস্তি সকল দুঃখ মাথায় তুলিয়া লইতে পারি, তবেই পারি আমরা নিষ্ফলতায় না ভাবিয়া পড়িয়া সফলতায় শাস্ত থাকিয়া অচল অটল সংকল্প লইয়া তাঁহার কেতন বহন করিতে, ফলাফল তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহার মঙ্গল-অঙ্গুলি-নির্দেশে জীবনকে নিয়মিত করিতে; তবেই আমরা করিতে পারি প্রকৃত স্বদেশসেবা। ভগবানে এই বিশ্বাস, তাঁহার ধর্মরাজ্যে এই আস্থা, যদি না থাকে তবে দেশের প্রকৃত সেবা ফলাফল অবহেলা করিয়া স্থির নিষ্ঠার সহিত কেহ চিরদিন করিতে পারে না। দেশের কাজ অনেক সময় অনেকে অল্প ভাব অল্প লক্ষ্য লইয়া কবিয়া থাকেন, কিন্তু সে সেবার এ ঐকান্তিকতা এ নিষ্ঠা কখনও থাকিতে পারে না।

মনে রাখিও যে ভগবান মাথার উপর আছেন, মনে রাখিও যে দেশেব সেবায় লোকের সেবায় তুমি তাঁহার কাজ করিতেছ, মনে রাখিও তাঁহার ধর্মবাজ্যের তুমি এক ক্ষুদ্র মৈনিক। অধ্যর্থ করিয়া, তাঁহার মঙ্গলনিয়ম অবহেলা করিয়া ক্ষণিক সুবিধা লাভ করিতে পার, তোমার চিত্তে ক্ষণিক তৃপ্তি পাইতে পার, কিন্তু ভগবানের ধর্মবাজ্যে অধ্যর্থের দ্বারা কোনও স্থায়ী ফলাভ হইতে পারে না। স্মরণ্য যদি প্রকৃত স্বদেশ-সেবক হইতে চাও তবে ধর্ম

ছাড়িয়া কখনও অবশ্য কবিও না, সেবা ছাড়িয়া কখনও হিংসা কবিত্তে যাইও না, ভালবাসা ছাড়িয়া কখনও ঘৃণা কবিত্তে যাইও না। যদি তুমি মধ্যপথে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া থাক, যদি তোমার স্বদেশ-প্রীতি ও স্বদেশ-সেবাব ভিত্তি অবশ্যের ভেজাল না থাকে, যদি নির্মল পবিত্র চিত্ত দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া থাক, তবে কিছুতেই তোমার ভয় নাই, কোনও ত্যাগে তুমি সম্বলিত হইবে না, কোনও নিফলতায় বিপ্লবিত হইবে না, কঠিনতম দুঃখভোগে ভীত হইবে না, ভগবানের ধর্মনিষেমে তুমি শেষে চরম সফলতা লাভ করিবার স্থির বিশ্বাসে শান্তচিত্তে তাহার আশীর্বাদের প্রতীক্ষা করিতে পারিবে।

ইহাই স্বদেশপ্রেমিক ও স্বদেশসেবকের আদর্শ। যদি আমরা দেশের প্রকৃত হিতনাথন করিতে চাই তবে এই আদর্শ আমাদের আয়ত্ত কবিত্তে হইবে, চিন্তেব এই অবস্থা আমাদের লাভ কবিত্তে হইবে। যদি আমাদের হৃদয় এই-রূপ ভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে পারি তবে আমাদের কাজের ক্ষেত্রের জগৎ খুঁজিয়া ফিরিতে হইবে না।

কাজ তো চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের এ দরিদ্র অবনত দেশ, পরাভূত হৃত পরমুখাপেক্ষী এ দেশ, বোগ-শোকের লীলাভূমি এ দেশ, ইহার সেবাব শত পন্থা খোলা রহিয়াছে। গ্রামে গ্রামে নগবে নগরে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র আছে যাহারা দুবেলা দুমুঠা অন্ন খাইতে পায় না, দেশেব সেবা যদি করিতে চাও তবে ইহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দাও; ভিক্ষার অন্ন নয়, পরিশ্রমের পুরস্কার যে অন্ন তাহা দিয়া ইহাদের অভাব দূর করিয়া মনুষ্যত্ব স্মরিত কর। গ্রামে গ্রামে পীড়িতের আর্তনাদ। প্রত্যেকে নিজ গ্রামে পীড়িতের শুশ্রূষার আয়োজন কর, এমন ব্যবস্থা কর যাহাতে দরিদ্র বোগী চিকিৎসা পায়। এমন আয়োজন কর যাহাতে সকলে গৃহস্থাব পরিষ্কার রাখে, জঙ্গল বাড়িতে দিয়া বাসগৃহকে ভয় ও পীড়ার আশ্রয় না কবে, যাহাতে লোকে সুপবিত্র পানীয় পাইতে পারে, যাহাতে পচা ভোরা দূর হয়। অন্ধ অজ্ঞতায লোক আচ্ছন্ন—যাও তাহাদের শিক্ষা দেও, লেখাপড়া শিখাও, আর শিখাও তাহাদিগকে স্বাস্থ্যনীতি, শিখাও তাহাদিগকে বাঁচিবার ও সমৃদ্ধ হইবার উপায়। সর্বত্র দেখিতে পাইতেছ দরিদ্রকে নিপীড়িত করিয়া ধনী, ছোটলোককে পীড়িত

বিক্ত করিয়া ভুল্ললোক, সমৃদ্ধ হইতেছে; দরিদ্রের নন্দ হইয়া তাহাদের সহায়তা কর। ইহার জগৎ যে দশা করিতে হইবে তাহা যে সহজসাধ্য একথা যদি কেহ চাহি না, কিন্তু যদি আমরা সবাই সম্মিলিত করি যে প্রত্যেক যতটুকু সাধ্য করিব, তবে কার্য যে খুব বেশী কঠিন—ইহা একরূপ মনে করি না।

আর একদিক হইতে দেখ, দেখিতে পাইবে যে দেশ এ দেশ বড় দরিদ্র; ইহাকে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইবে মুখ্য ব্যক্তিদিগেব ন্যায় দেশকে ধনগৌরবে পৌনঃপত্য কর। দেশেব ধন নানা লোকেব হাত হইতে বহিয়া নিষ্কর হাতে সংগ্রহ করিয়া তুমি ধনী হইলে দেশের কোনও উপকার করা হইবে না, দেশের কয়েকটি লোক ধনী হইলে কিছু আসিয়া যায় না। আমাদের চাই দেশেব ধনবৃদ্ধি—দেশেব আপামরসাধারণের সমৃদ্ধি! দেশের উপায় শিল্প ও বাণিজ্য। তোমরা কি জ্ঞান না ধনের কি শাস্তি, কি সম্মান, জান না কি ধনীর কি আধিপত্য? দেশেব জগৎ কি কবিবে ভাবিয়া অস্থির না হইয়া, নানা অসম্ভব কল্পনা নানা মরীচিকার সন্ধানে বৃথা সময়ের দ্রব্য শক্তিব অপব্যয় না করিয়া যদি দলে দলে তোমরা শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কর, তবে দেশেব দেশের যে উপকার কবিবে তাহা অন্য কোনও প্রকার সেবা অপেক্ষা কোনও-ক্রমে ন্যূন হইবে না। শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইবার পথে নানা বাধাবিঘ্ন আছে। বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্যে অধিক সফলতা লাভ করিতে পাবে নাই—এ কথা সত্য। কিন্তু যদি সত্যসত্যই এ বিষয়ে তোমাব অমুযোগ থাকে, যদি শিল্পবাণিজ্যে শিন নবিসী কবিতে, নিম্নতম স্তরে অতি তুচ্ছ কাজ হইতে আরম্ভ করিতে তোমার আপত্তি না থাকে, তবে দেখিতে পাইবে যে শিল্প-বাণিজ্যে অভ্যাস অতিশয় সহজসাধ্য।

আমাদের এ দেশ শুধু ধনে দরিদ্র নহে, জ্ঞানেও দরিদ্র। আমরা সময়ে অসময়ে সর্বদাই বলিয়া থাকি যে ভারত-বর্ষ জ্ঞানে গরীবান্। এ কথা যে বলে সে হয় মূর্খ, না হয় অন্ধ। অতীত কালে আমাদের দেশ জ্ঞানভণ্ডে শীঘ্র স্থান অধিকার কবিয়াছিল সত্য; সাহিত্যে দর্শনে গণিতে বিজ্ঞানে শিল্পে ভারত অতি উচ্চ স্থান অধিকার কবিয়া-

ছিল। সেই অতীতের গৌরব লইয়া আশ্চর্য কবিবার অবসব আমাদের তখনই হইবে যখন আমরা আমাদের বর্তমানকে সে অতীত অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত করিতে পারিব। কিন্তু আমাদের বর্তমান কি সে অতীতের যোগ্য? সম্রাটের জ্ঞানের জগতে আমাদের স্থান আজ কোথায়? বাণীর মন্দিরের নিম্নতম সোপানেও যে আমাদের জাতিব এখনও অধিকার হয় নাই। যে-কোনও বিদ্যাব উচ্চতর স্তরে উঠিলেই তোমরা দেখিতে পাইবে যে জ্ঞানের সাম্রাজ্য আজ কত হ্রাসিত, কত শতসহস্র পণ্ডিত তাহার নানা ক্ষেত্রে আজ কাজ করিতেছে, নানা খনি খনন করিয়া জ্ঞানের অপূর্ণ মণিমাণিক্যসকল সংগ্রহ করিতেছে। এই সাম্রাজ্যে আমাদের অধিকার বিস্তার করিবার জন্য আমরা কি করিয়াছি? এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শত লক্ষ কর্মীর মধ্যে আমরা একটি কি দুইটি ক্ষুদ্র কর্মী পাঠাইয়া কি তুষ্ট থাকিব? তাহাতে কি আমাদের দেশ জগতের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারিবে? এখানে তোমাদের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে, জ্ঞানের যে-কোনও শাখা অক্ষুণ্ণ করিয়া যদি তোমরা জগতকে সেই বিদ্যার কোনও নূতন সন্ধান দিতে পার তবে তোমরা তোমাদের মাতৃভূমির গৌরব একতাই বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং প্রকৃত স্বদেশ-সেবক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। কে আছে মাতৃভূমির কৃতীসন্তান, কে আছে মায়ের অন্তরঙ্গ সেবক, এস এই ক্ষেত্রে, তোমরা দেশকে জ্ঞানে মণ্ডিত করিয়া সমস্ত জগৎকে অবনত মস্তকে তামার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করাইবার জন্ত চেষ্টিত হও, তোমাদের চেষ্টার ফলে দেশের সমূহ উন্নতি হইবে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে কি ধনের ক্ষেত্রে যে-কেই প্রকৃত দেশ-প্রেমিক সেবক হইবে তাহা একটি কথা স্বরণ রাখিতে হইবে—সেটি এই যে, আদর্শকে কোনও মতে ক্ষুণ্ণ করিও না, ছোটখাট কোনও কাজ করিয়া পবিত্র হইও না, সামান্য কথ্য করিয়া মহৎ কার্যের সম্মান লাভ করিবার জন্ত লোলুপ হইও না। আমরা মনে হয়, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় অমঙ্গলের কারণ আমাদের আদর্শের ধর্মহীনতা। আমাদের কল্পনার দোড় খুব বেশী দূর যায় না। যে-কোনও দিকেই যাই না কেন আমরা খুব উচ্চ

আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া অগ্রসব হই না, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভেব চেষ্টা করি না। দুটো চলনই বক্তৃতা করিয়া আমরা ডিমসেথেনিসেব চালে চলিতে চাই। ব্যবস্থাপক সভায় একটা সামান্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পিট গ্যাভস্টোনের সম্মান লাভ করিতে চাই। বিজ্ঞানের একটা ক্ষুদ্র মৌলিক গবেষণা করিয়া মনে করি অস্তিত্ব: একটা ডাবউইন কি কেলভিনেব কাজ করিয়া বসিয়াছি। আমাদের দেশের পণ্ডিতসমাজেও খুব উচ্চশিক্ষার অভাব-বশত: আমরা অল্প কাজে বড় পুঙ্খাবলাভ করিয়াও থাকি। একটা বিলাতী কাগজে আমার প্রবন্ধের প্রশংসা বাহিব হইলে আহ্লাদে দেশের লোক অস্থির হইয়া যাইবে, আমিও তাই লইয়া খুব খানিকটা হৈ চৈ করিব—যদিও সে প্রশংসা হয় তো বিলাতেব একটা পঞ্চমশ্রেণীর লেখকের প্রশংসার চেয়ে কিছুই উচ্চ নহে। আমাদের আদর্শ ক্ষুদ্র বলিয়াই আমরা দেশবাসীবা প্রশংসার অপেক্ষা বিলাতী যেমন-তেমন প্রশংসাব জন্ত লোলুপ হইয়া থাকি।

যদি আমাদের প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তবে আমরা এরূপ অল্পে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। যে পর্যন্ত না এমন একটা কিছু করিতে পারি যাহাতে জগতেব পণ্ডিতসমাজেব মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিতে পারি সে পর্যন্ত নিজে আত্মপ্রসাদ বা পরের প্রশংসায় সন্তোষ লাভ করিতে পারিব না, অল্প সমালোচকের অল্প চাটুকারিতায় মুগ্ধ হইব না, কেবল আমাদের দেশেব দশজনের চেয়ে বড় হইয়াই খুশী হইব না। মনে রাখিও জ্ঞানের জগৎ আজ একটা বিশ্বব্যাপী সমাজ। এখানে কুপমণ্ডুক হইয়া থাকিলে চলিবে না, জ্ঞানের মহাসমুদ্র অবলীলাক্রমে সত্তরণ করিতে হইবে। আমার দেশের মানদণ্ড যদি ক্ষুদ্র হয় তাই বলিয়া আমার বাণীর মন্দির আমি খাটো করিতে পারি না; আমার বিদ্যার বহর ব্যাঙের হাতের পাঁচ হাত হইল বলিয়া গর্বে বুক ফুলাইতে পারি না। জ্ঞানেব মন্দিরে যে ব্যক্তি ভাবতের জন্ত গৌরব লাভ করিতে চাহিবে তাহার সাধনা ও সিদ্ধির একমাত্র মানদণ্ড জগতেব পণ্ডিতসমাজের সাধারণ মানদণ্ড; যদি আমি যাহা কবিয়াছি তাহা সমস্ত জগতে সমাদৃত ও সমস্ত জগতের চক্ষে শ্রেষ্ঠ হয় তবেই আমার কাজকে বড়

কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারিব, তবেই আমি আমার মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারিবাছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিব—তবেই আমি দেশের একটা সেবার মত সেবা করিবাছি বলিতে পারিব।

শুধু জ্ঞানের রাহ্যে নয়, দেশসেবার সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই আদর্শের উচ্চতা রক্ষা করিয়া তাহাব তুলনায় আমাদের কার্যের পরিমাণ করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কোনও ক্ষেত্রেই এই আদর্শের উচ্চতা পরিলক্ষিত হয় না। বলিতে গেলে এ পর্য্যন্ত আমরা দেশের কাজের কেবল এক ক্ষেত্রেই নিযুক্ত আছি—সে রাজনীতিক্ষেত্র। আমাদের বাঙ্গালৈতিক নেতাদিগের মুখে আমরা সর্বদাই শুনিতে পাই যে বাঙ্গালী এক্ষেত্রে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এক্ষেত্রে আমাদের করিবার যত আছে তাহাব কিছুই আমরা করি নাই। রাজনীতির নানাবিভাগের মধ্যে সকলটিই আমরা কেবল স্পর্শ করিয়া গিয়াছি; তেমন নিষ্ঠার সহিত, একাগ্রতার সহিত কোনও একটি বিভাগে এমন কোনও কাজ কবি নাই যাহাতে বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি। অল্প দেশের কথা ছাডিয়া দিলেও বোম্বাই বা মাদ্রাজে বাঙ্গালৈতিক কর্মীরা প্রকৃত কার্যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন আমরা বাঙ্গালীরা ততদূরও যাই নাই।

আসল কথা এই যে আমাদের প্রধান দোষ যে আমরা কোনও কাজের ভিতর ডুবিয়া পড়িতে পারি না, কেবল ভাসিয়া বেড়াইতে চাই। আমাদের সে একাগ্রতা সে অমপটুতা নাই যাহা ছাড়া কোনও কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। গায়ে হুঁ দিয়া সৌখীন ভাবে কাজ করিলে কাজ সুসম্পন্ন হয় না। নেতা হইবার জন্ত সপথের যাত্রার দলে রাজা সাজিবার ইচ্ছায় দেশের সেবার সখ করিলে চলিবে না। কিন্তু যাহার ভিতর থাকে সেই হোম-বল্লি—যাহাতে দেশের পূজাব জন্ত নিজের যথাসর্বস্বকে আহুতি দিতে প্রস্তুত কবে, যাহার থাকে সেই পণ যাহাতে যে যে-পথে আসিতেছে তাহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না, যদি এ সংকল্প থাকে যে পর্বতের চূড়ায় না যাইয়া ফিরিবে না, তবেই তাহার এই ব্রত ধারণের জন্ত অগ্রসর

হওয়া উচিত। সম্মুখে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র, আমাদের কান্দাল দেশ প্রভূতভাবে ত্যাগী কর্মপটু নিষ্ঠাবান বীর স্বেচ্ছের জন্ত সজ্জন নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন, পণ করিতে হইবে মায়ের সে অশ্রু আমরাই মুছাইব; আমাদের দেশবাসী দুঃখে কষ্টে জর্জরিত—প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে তাহাদের দুঃখ আমি দূব করিব; আমাদের দেশ জগতের সভ্যনয়াজে ধনে মানে জ্ঞানে অস্ত্যজ-তুল্য হইয়া রহিয়াছে; প্র উন্নত হইতে হইবে যে গৌরবের শীর্ষস্থানে তাহাকে আমরাই উঠাইব। পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আমাদের দেশের দুঃখ অপরে দূর করিতে পারিবে না, এত ভগবানকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম সঞ্চল করিয়া, নিজেদের সাধোক সীমা পর্য্যন্ত দেশের সেবা করিব এই সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; আমাদের দেশমাতৃকা আমাদিগকে নিরন্তর আহ্বান কবিতেছেন—উন্মত্ত জাগ্রত প্রাণ্য বরাঙ্গিবোধত।

(চাকার ছাত্রসমাজে পঠিত।)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

পরগাছা

[পরগাছা উপস্থান; উপস্থান কল্পনার কল। কালনিয় ব্যাপার হইলেও উপস্থানে বর্ণিত স্থান ও পাত্রের নাম কোথাও না কোথাও কাহারো না কাহারো থাকিতে পারে, ঘটনাও কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো বর্ণনার কিয়দংশের অনুরূপ ঘটনা থাকিতে পারে; তাহা নিলাইয়া কেহ যেন ইহাকে ইতিহাস, জীবনচরিত বা ব্যক্তি-বিশেষ ও ঘটনাবিশেষের বর্ণনা বলিয়া ধরিয়া না লন; বিবরণ সম্বন্ধে অমিল হিসাব করিয়া দেখিলেই তাহাদের ভ্রম ধরা পড়িবে যে যাহা সত্যের আশ্রয় বলিয়া মনে হইতেছে তাহা কল্পনারই স্বষ্টি।

(৫৮)

রাখাল ও মণিমালা আবার গোসাঁইগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া। সুখী হইল প্রসাদী ও বিন্দি।

বিন্দি মণিমালার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া কান্দিয়া গাহিল—

“শুন লো রাজার স্বী,
তোরে কহিতে আসিবাছি—

কান্ত হেন ধন পরাণে বধিঙ্গি এ কাজ করিসি কি!”

মণিমালা হাসিয়া বলিল—মরণ আর কি! বড়ো হয়ে মরতে চললেন তবু রত্নরস কমল না!

বিন্দু হাসিতে-হাসিতে গাহিল—

“স্বপ্ন মিটা হে কি কহব পে সব রঙ্গ ।

সে যে মুগধিনী, হেরিয়া মুখানি বাচল রস-তরঙ্গ !”

নারায়ণদাসী রাখাল ও মণিমালাকে দেখিয়া নথ নাড়িয়া বলিল—‘তুমি যাও বন্ধে, কপাল যায় সঙ্গে।’ এমন হাড়-হাঝাতে যে রাজার ইশ্বাভেও দৈন্ত্যতা ঘুসল না। বংশব-ভী জ্বলিয়ে এখন এলেন আমাদের গণ্ডে পা দিতে। ই হ কাঠালীও এল বাজবাড়ী থেকে—কেমন গুছিয়ে এসেছে, বৌয়ের গায়ে বাড়িটি-সুট গহনা হয়েছে, মেয়েকে বাজরাগী করে দিলে, নিজের বেশ ছপস হাতে করে বাড়ী এসে বসল। আর এঁরা এলেন শুধু-চাতে নাচতে-নাচতে। ঝাঁটা মারো এমন ধান্নিকপনায়, মুক্কে আশুন এমন পনের উপকারের। আপনি বাঁচলে তবে ত বাপের নাম।

গৌর বলিল—এল উৎপাত, এখন কেবল করবে পড় পড়। বাপ-ঠাকুদার আচ্ছা এক হুলীনের ডেকাল বাড়ীতে পুবেছিল!

নারায়ণদাসী নথ নাড়িয়া বৃন্দাবনকে বলিল—ফুলের সোহাগে ছোট্টার আদর! বুঝতাম ছপস পাখ-খোব নাড়ব-চাড়ব, পরের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতাম! ওদের ভিন্ন হয়ে নিজের সংসার পাততে বলা।

স্বত্বাং বৃন্দাবন রাখালকে বলিল—দেখ রাখাল, আমি বুড়ো হয়েছি, আর বেশীদিন বাঁচব না। আথেরে গৌরের সঙ্গে ছপালের বনিবনাও নাও হতে পারে। আমরা থাকতে-থাকতেই তোমাব ভিন্ন হওয়া ভালো। তোমায় আমি জায়গা দিচ্ছি—ফণে বাগদার পড়াটায় তুমি বাড়ী কর। তখন যদি উদ্ধব-গোসাঁইএর বাড়ীটা কিনে বাসতে তাহলে আব কোনো গণ্ড-গাল হত না।

রাখালকে তাহার দাদামশায় যখন ভিন্ন করিয়া দিতেছেন তখন সে ক্ষুব্ধ মনে পৃথক ঘরের পত্তন করিল। মাটির দেগালেব উপর খড়ের চাল দেওয়া দুখানি শোবার ঘর ও ছোট্ট বেড়াব তালপাতায় তায় ও এখানি রান্নাঘর। এই কুণ্ডলব স্বতন্ত্র নিজের হইতেছে দেখিয়া মণিমালার আনন্দ আব ধ্বস্তেছিল না।

যা খেব হইবার পূর্বেই বৃন্দাবন চঠাং মাগ পেলেন।

নারায়ণদাসী যথাবীতি চীৎকার করিয়া কান্নাকাটির পর পাড়ায়-পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—রাখাল অল্পেয়ে এমন ধান্নিক যে রাজাবা তাড়িয়ে দিয়ে তবে হাঁপ ছাড়লে, আব এতকাল যাদের খেয়ে মাছ তাদের নাবালক ছেলেকে কঁাকি দিয়ে জায়গা বেদখল করে বাড়ী হচ্ছে!

রাখাল নারায়ণদাসীকে বলিল—রাঙা-দিদিমা, গোসাঁই-দাদা আমাকে যে জায়গা দিয়ে গেছেন সেটা আমি চাইনে, তুমি আমায় বিক্রী কর।

কাঠালী এতকাল রাজসংসারে ছিল, রাজার খণ্ডর, ওয়ও রাজবুদ্ধি থাকা সম্ভব মনে করিয়া নারায়ণদাসী তাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

কাঠালী বলিল—এখন বেচে দাও, তারপর গৌর সাবালগ হলে নাবালকের বিষয় কান্নর দানবিক্রীর অধিকার নেই বলে হয় জায়গা নয় ক্ষতিপূরণের আরো কিছু টাকা আদায় করে নেওয়া যাবে।

নারায়ণদাসী খুসী হইয়া টিপসই দিয়া জমী বিক্রয় করিল।

নারায়ণদাসী হাতে টাকা পাইয়া স্বামীশোক কিছু ভুলিতে পারিল। তখন সে বিষয়কর্মে মন দিল। গৌরকে বলিল—তোমার আর ইচ্ছা যেতে হবে না! সেবক-শিখা দেখে বেড়ালে তোমার কড়ি খায় কে? তোমার ত আর চাকরী করতে হবে না, তোমার ত চরণে কড়ি!

গৌর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার সমবয়সী নিতাই শ্রাম কৃষ্ণ হৃদয় জগাই- তাহারা কেই পড়ে না, গলায় তিনকণ্ঠী মালা আঁটিয়া তিলকসেবা করিয়া গয়লাবাড়ী কলুবাড়ী জ্বলেবাড়ী ঘুবিয়া বেড়ায়, কত দেশ দেখে, কত কি খাইয়া মজা করিয়া বেড়ায়—গয়লাবাড়ী ক্ষীর ছানা দই, কলুবাড়ী ছাঁকা তেলে ভাজা তালের বড়া, জ্বলেবাড়ী বাড়ের ভালো ভালো মাছ গুজর ভোগে লাগে। তা ছাড়া যদি কোথাও অষ্টগ্রহর কি ধূলোট হয়, যদি কোথাও মচ্ছব লাগে, তবে মালসাভোগ পানোড়া ও মালপো খাইয়া জীবনেব পরমায়ু অনেকখানি বাড়াইয়া লইতে পারা যায়। তাহারা গোসাঁইগোবিন্দ লোক, তাহারা প্রতুপাদ, তাহারা গুরুবংশ—তাহাদের শুধু পা

থাকিলেই হইল, বিদ্যা সাধা জ্ঞান বুদ্ধি আর কিছুবই দরকার নাই।

রাখাল বলিল—রাঙা-দিদি, ওকে এর মধ্যে স্থল ছাড়িও না।

নারায়ণদাসী বলিয়া উঠিল—তুমি তবে ওকে মাসে-মাসে মাসহারা দিও, বসে থাকলে ত পেট চলবে না।

—কেন, ছুটির সময়ে শিষ্যসেবক দেখতে ত পারবে।

সকল ঘোঁষা হতে দাও আগে, তাবপর ত গুরুগিরি কববে?

নারায়ণদাসী ফরকিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল

—গোসাঁইগোবিন্দের ছেলে গুরু হয়েই জন্মায়!

নারায়ণদাসী ও গৌর বলিল—এ কেবল শক্রতা সাধা।

তাহাতে কাঙালীও প্রাণ খুলিয়া খুব জ্বোরে সায় দিল।

(৫২)

জমির দাম দিতে ও ঘর করিতে রাখালের পুঁজি হাজার টাকার তোড়ার পেট অনেকখানি সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

তাহার উপর বাড়ীতে কিছু খাবার হইলেই রাখাল মণিমালাকে বলে—আমার ভাগটা ভাগ করে গৌরকে আর প্রসাদীদের দিয়ে এস, আমি ওদেরই খেয়ে-মাহুষ!

—ইহাতে মণিমালাকে প্রত্যেক জিনিসই বেশী বেশী করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

কাঙালী গ্রামের মজলিসে খুব লম্বা চণ্ডা গল্প করে—রাজার বাড়ীতে কি-রকম নিখুঁতি-নাড়ু হইত, কি-রকম ঘিওর হইত, কি-রকম পোলাও হইত, কি-রকম কোপ্তা কোপ্তা কালিয়া হইত! তাহা একদিন থাইলে দশ দিন হাতে গন্ধ থাকিত—সে স্বাদ জন্ম ভুলিবার নহে।

গ্রামের লোকে অনেকে এসবের নামও শুনে নাই; অনেকে নাম জানে, খায় নাই। কাঙালী সকলকে চুপিচুপি টিপিয়া দ্যায় রাখালের বৌ এগব খাসা তৈয়ার করিতে পারে, তোমরা রাখালকে ধর।

রাখালকে বলিবামাত্র সে আহলাদিত হইয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে—সে মনে করে লোককে খাওয়াইতে পারা সে ত ভাগ্যের কথা; সে কত লোকের খাইয়া আছে, একটুও যদি সে শোধ করিতে পারে। মণিমালা ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হয়, কিন্তু স্বামীকে মুখ ফুটিয়া

কিছু বলিতে পারে না। এমনি করিয়া তাহার হাজার টাকার শেষ টাকাটিও শীঘ্রই খরচ হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে ভূপাল এণ্টাল পাশ করিল। পাহাড়পুর্বের স্থলেব শিক্ষকেরা মনে করিত ভূপাল এণ্টালসে কম্পিট করিয়া প্রথম দশজনের মধ্যে হইবে; কিন্তু খারাপ স্থলে আসিয়া ও নানাবিধ বিক্ষেপে সে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইল। এখন কেমন করিয়া তাহার কলেজে পড়া চলিবে, তাহাদের সেই ভাবনা উপস্থিত।

মণিমালার পিসেমহাশয় শ্রীকৃষ্ণ মাঝা গিয়াছেন। কুবের এই সুযোগে তাঁহার তালুকটি দখল করিয়া লইয়াছে—রাজা ধনেশ্বর ভগ্নীপতি ও ভগ্নীকে ঐ তালুক যৌথিক কথায় দান করিয়াছিলেন, কোনো লেখাপড়া ছিল না! তথাপি মণিমালার পিসি হরহৃন্দরী অনেক দিনের ভোগ-দখলের স্বস্ত দেখাইয়া নালিশ করিবে বলিয়া যখন চোখ রাঙাইল, তখন কুবের তাঁহাকে মাসে পাঁচশত টাকা মাসহারা দিবে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। হরহৃন্দরী তালুক খোয়াইয়া সেখানে থাকিতে লজ্জা খোঁ কবিলেন, তিনি পুত্রকন্ডা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া আছেন।

মণিমালা বলিল—ভূপাল কলিকাতায় পিসিমার বাড়ীতে গিয়ে থাকুক; সেখানে পিসিমা ছুটি করে খেতে আর কলেজের মাইনেটা দিতে অস্বীকার করতে পাববে না।

এই খবরটা কাঙালী সাত-তাড়াতাড়ি মেয়েকে লিখিয়া পাঠাইল। কুবের হরহৃন্দরীকে চিঠি লিখিল ভূপালকে ঘরে জায়গা দিলে তাঁহার মাসহারা বন্ধ হইবে।

বালক ভূপালকে একাকী কলিকাতায় পাঠাইতে গিয়া রাখাল ও মণিমালার অনেক চোখের জল পড়িল। রাণী-কান্তর চরণতুলসী তাহার পায়ে দিয়া তাহাদের ভবন-যন্তিকে তাঁহারা বিদায় দিলেন।

ভূপাল অনেক খুঁজিয়া যখন হরহৃন্দরীর বাসায় গিয়া গাড়ী হইতে নামিল তখন বেলা বারোটা; বালক ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সাড়া পাইয়াই বিবুদসী উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—মামাবাবু, মা বললেন, এ বাড়ীতে ত জায়গা নেই, এখানে তোমার থাকার সুবিধে হবে না, তুমি অল্প জায়গা দেখ।

ভূপাল কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—
আচ্ছা। শুধু আগার তোরঙ্গটা থাক, আমি কোথাও বাসা
ঠিক করে এসে নিয়ে যাব।

বিধু উপর হইতে জানিয়া আসিয়া বলিল—হাঁ, তোরঙ্গটা
দু-এক দিন থাকতে পারে।

শুক্লান মুখে ভূপাল বাহির হইয়া যাইতেছে, বিধু
তাহার মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মামাবাবু, তোমার
এখনো খাওয়া হয়নি? দাঁড়াও কিছু খেয়ে যাও।

ভূপাল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদিমা
বললেন, না তুমি বলছ?

বিধু লজ্জিত হইয়া বলিল—মা কিছু বলেননি, আমিই
বলছি।

—তবে থাক।—বলিয়া ভূপাল পথে বাহির হইয়া
পড়িল।

কলিকাতায় কখনো সে আসে নাই; কখনো সে
একাকী কোথাও যায় নাই; কলিকাতার এই অট্টালিকার
অরণ্যের মধ্যে মাহুতের আগাছা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া
তুলিল; গাড়ী ঘোড়া ট্রাম হিংস্র-জন্তুর মতো তাহাকে ভীত
করিয়া তুলিল। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সে হেদোর
পুষ্করিণীতে শ্রান্ত বিপন্ন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল তখন
বেলা চারটে। সে অঞ্জলি ভবিয়া এক-পেট হেদোর জল
খাইয়া ইট-বাধানো বেদীর উপর শুইয়া পড়িল, শুইবামাত্র
ঘুম আসিয়া তাহার সকল দুঃখ ঢাকিয়া বসিল।

যখন ঘুম ভাঙিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাড়ী
ফিরিবার জন্ত তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তাহাদের
বাড়ীতে যাইবার একমাত্র উপায় ষ্ট্রিমার; ষ্ট্রিমার প্রত্যহ
একবার সকালে ছাড়ে, আজ বাড়ী যাইবার আর কোনো
উপায় নাই। তবে আজ রাতটা সে কোথায় থাকিবে? সে
একবার মনে করিল পথে-পথে হাঁটিয়া রাত কাটাইয়া দিবে।
কিন্তু ক্ষুধায় পা আব চলিতেছিল না। ভূপাল হেদো হইতে
বাহির হইল কোনো দোকান হইতে কিছু কিনিয়া
খাইবে।

খানিকদূর যাইতেই একটা বাড়ীর সম্মুখে দেখিল
পাহাড়পুরের ইনাম সিং জমাদার বসিয়া আছে। একজন
চেনা লোককে দেখিয়া ভূপাল সমুদ্রে যেন কুল পাইল।

অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—জমাদার,
তুমি এখানে?

—হাঁ বাবু। ইয়ে মোকান বাণীয়া মোল লিয়েসে
কি না, সেই হামি আসিয়েসে।

—এ বাড়ী দিদিমাব? আমি তবে এখানে থাকব।
ইনাম-সিংএর মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—উ'ত
হোবে না বাবু, মহাবাজের মানা আসে।

ভূপাল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া মাটিতে বসিয়া পাকিয়া
বলিল—শুধু আজকের রাতটা থাকব জমাদার; কাল
সূর্য্য ঝঠবাব আগেই চলে যাব। এই আমি বসলাম।
ইচ্ছে হয় আগায় জোর করে বার করে দাও।

জমাদারের বোধ হয় একটু দয়া হইল, অথবা রাখাল-
বাবুব ছেলেকে গলাধাক্কা দিবার সাহস তাহাব হইল না, সে
আর কিছু বলিল না।

ভূপাল পড়িবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরদিন ভোবে
আবার বাড়ী ফিরিয়া গেল।

(৬০)

এই সময় এক কণ্ঠাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক গোসাইগঞ্জে
রাখালের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল—ভূপালের
সঙ্গে তাহার কণ্ঠাটির বিবাহ দিবাব ইচ্ছা। তাহার নাম
যোগেশ, বাড়ী বহুবাহারীব দেশে, বহুবাহারীব কাছে
খবর পাইয়া আসিয়াছে।

রাখাল তাহাকে নিজের নিঃস্ব অবস্থার কথা বলিয়া
হাঁকাইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু যোগেশ নড়িল না। রাজার
মেয়ে, রাজাব জামাই, রাজার নাতি—তাহাবা কখনো
নিঃস্ব হইতে পাবে? যোগেশ হাসিয়া বলিল—আমাব কাছে
গোপন করবার দরকার নেই মুখুন্ডো মশায়; আমি আপনা-
দের সমস্ত ইতিহাসই জানি। বহু বলেছে যে আপনার
স্ত্রীর কাছে অনেক দামী অলঙ্কার আছে, আর পঞ্চাশ
হাজার টাকার কোম্পানিব কাগজ আছে। আপনার আত্মীয়
কাঞ্চালী-বাবুও সেই কথাই আমাকে বলেছেন।

তাহাব কথা অবিশ্বাস করিতেছে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া
রাখাল বলিল—অত টাকা আছে তাই আমার মেয়েব বিয়ে
দিতে পাবছি না, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পাবছি না।

যোগেশ মনে করিল রাখাল প্রকারান্তরে ছেলের বিবাহ

দিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে পারে এবং ছেলেকে লেখাপড়া করাঁইবার ভারটা ছেলের শ্বশুরই লয় এইরূপ একটা মাছের তেলে মাছ ভাজিবার মতন দাঁও খুঁজিতেছে।

যোগেশ বলিল—আমি মেয়ের গা-সাজানো গহনা, বরাভরণ, রূপোর দান আর হাজার টাকা নগদ দেবো; জামাইকে পড়ার খবচ বলে মাসে মাসে দশ টাকা করে দেবো। আপনি রাজি হোন।

ভূপালের বয়স অল্প ইত্যাদি অনেক রকম ওজর তুলিয়া রাখাল অসম্মতি জানাইল।

বিবাহের পর যতদিন না ভূপালের পড়া শেষ হয় ততদিন তাহার মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকিবে ইত্যাদি বলিয়া যোগেশ রাখালের সমস্ত ওজর খণ্ডন করিল।

বিভার বয়স বারো বৎসর হইয়াছিল। তখনো তাহার বিবাহ হয় নাই বলিয়া গ্রামের লোকে অত্যন্ত বাস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অতবড় সোমখ মেয়েকে ঘরে রাখিয়া বাপ-মার মুখে ভাতের গ্রাস কেমন কবিয়া উঠে এবং রাত্রে কেমন করিয়া তাহাদের নিদ্রা হয় এই ভাবিতে-ভাবিতে গ্রামের লোকের আশাব ও নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রাখালের চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয় দেখিয়া ব্যথিত কাঙালী অত্যন্ত আত্মীয়তা দেখাইয়া গ্রামের সকলকে বলিয়া বেড়াইতেছিল—আমাদেরই চাঁদা করে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে! গরীব দুঃখী প্রতিবেশীকে আমাদের সকলেরই ত দেখা দরকার।

যোগেশের অত্যন্ত আগ্রহে ও গ্রামের লোকের নিতান্ত নিগ্রহে বাধ্য হইয়া মণিমালা রাখালকে ভূপালের বিবাহ দিতে রাজি হইতে বলিল; ভূপালের বিবাহে যে টাকাটা পাওয়া যাইবে তাহা দিয়া কোনোমতে বিভার আইবড় নামটা খুচাইয়া গাঁয়ের লোকদের নিশ্চিন্ত করিতে পারা যাইবে।

ভূপালের সহিত যোগেশের মেয়ে সোহাগীর বিবাহ হইয়া গেল। বরষাত্রী হইয়া গিয়া আবার বন্ধবিহারীর সহিত কাঙালীর শুভমিলন হইল।

কাঙালী বন্ধবিহারীদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে বিভার বিবাহের সন্ধ করিল। ছেলেটির কেউ কোথাও

নাই; স্থলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে; খুব কুলীন; নাম বিরিকি।

রাখাল ছেলেটিকে দেখিয়া ও বন্ধবিহারী ও কাঙালীর মুখে তাহার গুণব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বিবাহ দিতে সম্মত হইল। ভূপাল অত্যন্ত আপত্তি তুলিল, কিন্তু বন্ধবিহারী ও কাঙালী রাখালকে ভূপালের আপত্তি ছেলে-মাছুষী বলিয়া মানিতে দিল না।

বিভার সহিত বিরিকির বিবাহ হইয়া গেল ভূপালের বিবাহে যে টাকাগুলি রাখালের ঘরে আসিয়াছিল তাহা বিরিকির ম বন্ধতে বন্ধবিহারী ও কাঙালী ভাগ করিয়া লইল। বিভার আইবড় নাম ঘুচিল; কিন্তু সে স্বামীর ঘর চক্ষে দেখিল না। বিরিকিও শ্বশুরবাড়ী-মুখো হইল না; শোনা গেল তাহার জীপুত্রকন্ডা লইয়া জাজল্যমান সংসার বর্তমান আছে।

(৬১)

ভূপাল শ্বশুরের-দেওয়া দশটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া আবার কলিকাতায় পড়িতে গেল; ভরসা, আর দশ টাকার একটা শিক্ষকতা জুটাইয়া লইয়া সে কলিকাতার খরচ কোনোমতে চালাইয়া লইবে।

যাইবার সময় ভূপাল সোহাগীকে বিনয় করিয়া বলিয়া গেল—সোহাগ, আমার মা বাবা রইলেন; আমি বিদেশে চললাম; তুমি ওঁদের যত্ন সেবা করো।

তাই সোহাগী সকলের আগে ওঠে, সকলকে শোয়াইয়া তারপর শোয়। মণিমালার হাত হইতে কাড়িয়া কাজ করে; রাখাল ও মণিমালা যেন তাহার শিশু সন্তান, এমনি ভাবে তাহাদের সেবা যত্ন করে।

একদিন মণিমালার পা চাপিয়া দিতে-দিতে সোহাগী জিজ্ঞাসা করিল—মা, বাবা বলেন আপনার নাকি হীবের বালা আর মোতির মালা আছে?

মণিমালা হাসিয়া বলিল—না, মা! তোমার শাস্ত্রী বড় পরীষ। আর যদি থাকে ত সে তোমারই আছে!

সেদিন সেকথা তাহার তেমন বিশ্বাস হইল না, কিন্তু শীঘ্রই সোহাগীর বিশ্বাস হইল যে তাহার শ্বশুর শাস্ত্রী বাস্তবিকই বড় পরীষ। সকল দিন বাড়ীতে হাড়ি চড়ে না, যেদিন চড়ে সেদিনও তরা-পেট খাইতে যিলে না।

যেদিন কাহারো বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয় সেইদিন মাত্র পেট ভরিয়া থাওয়া জোটে।

রাখাল চাকরী খুঁজিতেছিল। তাহার যে বিছা তাহা কোনো বিহীনসভা দ্বারা বাচাই হইয়া চিহ্নিত হয় নাই; যাহারা বিদ্বান চাকর চায় তাহার বিদ্বৎদ্যালয় টোল চতুষ্পাঠী বা নর্ম্যাল স্কুলের কোনো একটা উপাধি দেখিয়া বিচার করে। যে-সব জায়গায় উপাধির দরকার নাই, সে-সব জায়গায় পূর্ক-অভিজ্ঞতা, অপর স্থানে কক্ষের প্রশংসাপত্র ইত্যাদি দেখাইবার আবশ্যক হয়। রাখালের এসব কিছুই নাই। সে এত বয়স পর্যন্ত কোথাও এমন কোনো কাজ করে নাই, কোনো বিশেষ কক্ষের এমন কোনো অভিজ্ঞতা ও তাহার জন্য প্রশংসা অর্জন করে নাই, যাহার জোরে সে কাহারও গুরুগ্রহ আদায় করিতে পারে। সুপারিশ করিবার মতন বন্ধু আত্মীয় মুকুন্দেরও নিতান্ত অভাব। সে মনে করিল একবার কাঙালীর শরণাপন্ন হইয়া দেখিবে।

কাঙালী গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া রাজা জামাইএর নিকট হইতে পুনরাহ্বান অথবা মাসহারা পাইবার প্রত্যাশায় অনেক দিন রহিল। ক্রমে ক্রমে চিঠি লিখিয়া স্বরণ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কুবেরের কোনো-রকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সে সত্য মিথ্যে নানা-রকম প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া ও চুরি-চামারির টাকা কিছু গচ্ছিত রাখিয়া নন্দনপুরের নটবর সামন্তের জমিদারী-সেরেস্তায় একটি মোটা মাইনের চাকরী জোগাড় করিয়াছিল।

রাখাল কাঙালীর কাছে নন্দনপুরে গেল। কাঙালী একেবারে তাড়াইয়া না দিয়া দণ্ড করিয়া রাখালকে তাহার অধীনে একটি মোহরেবের পদে বাহাল করিতে চাহিল—মাহিনা মাসিক পনের টাকা, তহরির মিলিবে পাঁচ টাকা আন্সাজ, এবং লইতে জানিলে উপরি পাওনা হইবে আরো টাকা কুড়ি। যে লোক এতকাল সিংহের কাছে শশকের জ্বায় ভয়ে সন্ত্রমে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত, সে স্বযোগ পাইয়া তাহার কাছে খুব একচোট মুকুন্দের আনা করিয়া লইল; এবং রাখালকে উপরি-পাওনার প্রলোভন দেখাইতেও কুণ্ঠা বোধ করিল না। রাখালের অত্যন্ত স্বপ্ন হইল—ও সে

এই কুড়ি টাকার চাকরিই স্বীকার করিত, কিন্তু সে দেখিল তাহার ভাবী প্রভু তাহাকে প্রথম সাক্ষাতেই তুমি বলিয়া কথা কহিল—সে ব্যক্তি এমনই দাস্তিক যে কোনো কর্ম-চারীকে সে আপনি বলে না, কর্মচারী বলিয়া তাহার ঘেন্না কোনো মধ্যদা নাই, সে ঘেন্না ভ্রলোকের সম্মান পাই-বার অনধিকারী। তাহার উপর সে দেখিল নটবর অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী, হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে কর্ম-চারীদের অকথ্য গালাগালি দ্যায়, কাঙালীও তাহা সহ্যেতে বাদ পড়ে না। রাখাল অনাহারে মরিবে তবু এমন নীচতা স্বীকার করিবে না সঙ্কল্প করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

কুবের ও কাত্যায়নীর কাছে রাণী জগদ্ধাত্রী নিতান্ত ফাল্গুতো ও ভার হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাহারা কথায় কথায় বগড়া বাধাইয়া তাঁহাকে অপমান করে; তাই তিনি স্বস্তর-স্বামীর ভিটা পরকে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন—সেই বাড়ী কেনার পরই ভূপাল জোর করিয়া এক রাত্রির জন্য তাহাতে আশ্রয় লইয়াছেন। বঙ্গবিহারী সংবাদ পাইয়া মাত্র ছুটাছুটি আসিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর অভিব্যবক হইয়া বসিয়াছে, আর তাহার সঙ্গে আসিয়াছে তাহার সহস্রমণি চন্দনমণি। রাণী জগদ্ধাত্রীর মাসহারাটি আসিলেই বঙ্গবিহারী তাহার বারো আনা অংশ রাণী জগদ্ধাত্রীরই সংসার-খরচ চালাইবার স্ববন্দোবস্ত করিতে হইবে বলিয়া হস্তগত করে এবং বাকি চার অংশ—যাহা রাণী জগদ্ধাত্রী মনে করেন তাঁহার রহিল তাহা চন্দন-মণিও খেঁজাজতে থাকে। কুবেরের আদেশে ও বঙ্গবিহারীর হুকুমে এ বাড়ীতে রাখালের সম্পর্কীয় কাহারও প্রবেশ নিষেধ। তাহার দিদিমার জন্য ভূপালের মন-কেমন করিত; রাণী জগদ্ধাত্রীও তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন; কিন্তু তিনি রাণী হইয়াও বন্দিনী; চাকর দাসী দারোগানেরা তাঁহার চেয়ে কুবের বঙ্গবিহারী ও চন্দন-মণিকে বেশী ভয় করিত, কারণ তাহারাই বেতন দিবার না-দিবার মালিক, বাহাল বরতরফের কর্তা, কাজে-কাজেই তাহারা তাহাদেরই হুকুম পালন করিত। ভূপাল মাঝে-মাঝে মলিন মুখে মলিন বেশে এই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাতা-য়াত করে; যদি একবার তাহার দিদিমাকে সে দেখিতে পায়, যদি তাহার দিদিমা তাহাকে দেখিতে পাইয়া একবার

নিকটে ডাকেন, যদি দিদিমার দয়ার দান কিছু-কিঞ্চি মিলিয়া যায়। কোনো কোনো দিন বাণী জগদ্ধাত্রীর সহিত তাহার দেখা হইয়া যাইত, জগদ্ধাত্রী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন; কিন্তু ভূপালকে বাড়ীতে ডাকিতে তাহার সাহসে কুলাইত না। কোনো দিন চন্দনমণির স্কেনদৃষ্টি এড়াইয়া দশ বিশ টাকা গোপনে ঝুন্কিয়া দাসী কি ঘিহু খানসামার হাত দিয়া ভূপালকে দিতেন, কখনো বা নিজেই জ্ঞানলা গলাইয়া দুএকখানা নোট রাস্তায় ফেলিয়া দিতেন, আব ভূপাল চোরের মতন তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিত।

ভূপালের এই উদ্ধৃষ্টি স্বীকার করিতে কষ্ট ও অপমান বোধ হইত খুবই। কিন্তু যখন সে মনে করিত যে বাড়ীতে তাহার পিতামাতা ভগিনী পত্নী অনাহারে রহিয়াছে—তাহার সূর্যের সমান তেজস্বী দুপ পিতা অল্প-চিন্তায় মুগ্ধিয়া পড়িতেছেন, তাহার রাজকন্যা মাতা অশ্রুভাবে শীর্ণ হইতেছেন, তাহার বড় আদরের বোনটি সকল স্থখ সাধে বঞ্চিত হইয়া প্রাণেও মরিতে বসিয়াছে, তাহার সোহাগের সোহাগী বাপের বাড়ী যাঁতে অস্বীকার করিয়া তাহাদের সঙ্গে সকল দুঃখ হাসিমুখে সহিতেছে—তখন ভূপালের কাছে কোনো কর্মই অকবণীয় থাকিত না।

জগদ্ধাত্রীর নিকট হইতে সামান্য বাহা পাইত হই বাবাকে পাঠাইয়া দিত। টাকা পাঠাইলে দিন পনব কুড়ি একরকমে তাহার বাকী দশ পনব দিন কষ্টের অন্ত থাকিত না। এই অতিকষ্টে সংগৃহীত অর্থ হইতে মণিমালা তাহার করিয়া মাত্র প্রাণধারণের উপযোগী যে স্বত করিত তাহাই তাহার রন্ধনপটুতায় বিচিত্র ও সুখাদ্য হইত। স্বপ্নাদ্য একলা লর কোণীতে লেখে নাই, গৌরকে তাহার মুখে হইতে ভাগ দিয়া আসিতে মণিমালাকে রাখাল অহুরোণ করিত—কারণ গৌরের বাবার খাইয়াই রাখালের দিদিমা, মা ও সে নিজে মাহুষ! যদি রাখাল পূর্বে টের পাইত যে আজ একটা স্বপ্নাদ্য কিছু প্রস্তুত হইবে, তবে বেড়াইতে বাহির হইয়া একজন দুজন লোককে ডাকিয়া

লইয়া সে বাড়ী ফিরিত—হয় তাহাবা এককালে ভালো অবস্থায় থাকিয়া ভালো খাইত, এখন খাইতে পায় না; অথবা তাহাদের উর্দ্ধতন কোনো পুরুষে কেহ রাখালের দিদিমাকে কি মাকে কি রাখালকে একটি স্নেহের কথা বলিয়া আহা করিয়াছিল! এমনি করিয়া টানাটানির সংসারে অভাব বেশী করিয়া শীঘ্র ডাকিয়া আনা হইত—মণিমালা মনে মনে বিবস্ত্র হইলেও স্বামীকে কিছু বলিতে পারিত না। লোকে ভাবিত—উঃ! রাজার জামাই কিনা, রাখাল বেশ দু পয়সা হাতে করিয়া গুছাইয়া আসিয়া বসিয়াছে!

যেদিন আহা জুটিবার আর কোনো সম্ভাবনা থাকিত না সেদিন মণিমালা নারায়দাসীকে গিয়া বলিত—রাঙা-দিদি, আজকে বিভাকে দুটি খেতে দিও, আমাদের রাজা হতে দেবী হবে।

সে দেবী যে কত দেবী তাহা ভগবান ছাড়া আর কেহ বলিতে পারিত না।

মণিমালা বধুব জ্ঞাত ও কাতর হইতেন, কিন্তু সোহাগী কিছুতেই পরের বাড়ী খাইতে যাইতে স্বীকার করিত না। সে হাসিমুখে খুব গিন্নির ধরণে বলিত—ঠাকুরকি ছেনেমাহুষ, ওকেই খাইয়ে আহুন মা। আমার উপোষ করা খুব অভ্যাস আছে—আমি বাবার ওপর রাগ করে কতদিন উপোষ কবুতাম।

মণিমালা ছলছল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত—এই হাসির প্রতিমা মেহের পুতুল এ কি কখনো রাগ করিতে জানে?

মণিমালা চোখ মুছিয়া স্নেহ-বিগলিত কর্ণে বলিত—মা, তুমি ছুপের মেয়ে, তুমি আমাদের সঙ্গে কেন কষ্ট পাচ্ছ? তোমার বাপকে চিঠি লিখি, তুমি বাপের বাড়ী চলে যাও।

একথায় সোহাগী চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। তাহার স্বামী যে তাহাকে বলিয়াছে,—সে কলেজে বসিয়া থাকে, কিন্তু শিক্ষকের পড়ানো সে শুনিতে পায় না, সে ভাবে শুধু তাহাকেই; ভূপাল যে তাহাকে বলিয়াছে যে সে যদি পুতুল হইত তবে তাহাকে বুক-পকেটে লুকাইয়া লইয়া সে কলেজে যাইত, তাহাকে যদি পুরুষের ছদ্মবেশে কলেজে ভর্তি করিতে পারিত তবে এক দণ্ড বিচ্ছেদের

দুঃখ সহিতে হইত না; তাহার স্বামী তাহাকে দেখিবার জন্ত মাঝে মাঝে কলেজ পালাইয়া বাড়ীতে ছুটিয়া আসে, এবং এখন কিসেব ছুটি জিজ্ঞাসা করিলে বাবাকে বা হোক একটা সামান্য কোনো পরবের নাম করিয়া প্রবন্ধনা করে, সে যে তাহারই জন্ত; এমন ছুটকো ছুটি একদিনেই ফুরাইয়া যায়, পরদিন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার স্বামীর মন চাহে না, সে অস্থির ভান কবিয়া বাড়ীতে থাকে, আব কাজেই সমস্তদিন উপবাস কবিয়া কাটাইতে হয়, সেও যে শুধু তাহারই জন্ত; সে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া তাহার স্বামী যে তাহার খাবারের অধিকাংশ পাতে প্রসাদ রাখিয়া উঠিয়া যায়; এসব কি সোহাগী বুঝে না? এমন স্বামীকে ছাড়িয়া সে কোঁথায় যাইবে? শনিবারের ষ্টিমারের বাঁশী যে তাহাকে বৃন্দাবনের জ্বামের বাঁশীর মতন উতলা করিয়া তোলে—খাইতে বসিয়া বাঁশী শুনিলে আনন্দে তাহার আর খাওয়া হয় না, রন্ধন চড়াইয়া বাঁশী শুনিলে সে আর রাঁধিতে পারে না। যা ত এসব জানেন, তবে তাহাকে বাপের বাড়ী যাইতে বলিতেছেন কেমন করিয়া? সে সজল চোখে মিনতি করিয়া বলে—মা, বাবা আমাকে ত আপনাদেরই দিয়ে দিয়েছেন; আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না!

মণিমালা তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলে—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমাকে কি আমি তাড়াতে পারি মা!

যেদিন সামান্য দুটিখানি চালেব জোঁগাড় হয়, সেদিন সোহাগী হাসিমুখে বলে—মা, আজকে ফেন ফেলে দেবেন মা; হুন দিয়ে ফেন খেতে বেশ লাগে মা! আমি বাপের বাড়ীতে খেতাম!

সেদিনকার ফেন মণিমালার অশ্রুতেই লবণাক্ত হইত।

সোহাগীর পরিবার কাপড় নাই। সে বাপের দেওয়া তেলা ভালো কাপড়গুলি আটপোরে করিয়াছে। প্রসাদী বলিল—মা সোহাগী, এমন ভালো কাপড়গুলো পরে পুরোণো করছ কেন মা?

সোহাগী হাসিয়া বলিল—পরে' নি বড়মা, কোনদিন আবার মরে যাব।

এমনি করিয়া নিজেদের দারুণ দারিদ্র্যকে ঐশ্বর্য্যে আবরণে ঢাকিয়া রাখালের সংসার চলিতেছিল।

(৬২)

একদিন দুপ্রহবে ঠাকুরবাড়ীর তিনকড়ি-পূজারী দুই খালা রাধাকান্তব প্রসাদ আনিয়া মণিমালার ঘরের পিঁড়ায় ছুম কবিয়া নামাইল। মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—এ কার প্রসাদ তিনকড়ি?

—পেসাদী-মাসীব আর বিন্দি-বষ্টমীর। ঠাকুরবাড়ীতে পেসাদী-মাসী বোধুনা আর বিন্দি পাটকরনী হয়েছে যে।

—তা তাদের প্রসাদ আমার বাড়ীতে কেন?

—তারা এখানেই দিতে বলেছে।—বলিয়া তিনকড়ি চলিয়া গেল।

একটু পরেই প্রসাদী ও বিন্দি আসিল।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—তোদের আজ পেসাদ এল যে?

বিন্দি হাসিয়া বলিল—আমবা যে ঠাকুরের সঙ্গে স্বয়ম্ববা হয়েছি বৌ! আমি বৃন্দে, আমার সঙ্গে রাধাকান্তর ত অনেক কালের ডাঈ—সবাই সেটা নিয়ে কম কানায়ুযো কবে কি? আর উনি প্রসাদী, উনিও রাধাকান্তরই!

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে

পরানে পরানে লেহা।

না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল

ভিন ভিন করি দেহা।

“মণিমালা আজ আর হাসিতে পারিল না। বলিল তোমাদের পেসাদ আমার বাড়ীতে দিয়ে গেল।

বিন্দি বলিল—আমাবও মা মরে গেছে, মা মাপ গেল; আমরা দুটোতে এক একটা ভিটে পড়ে থাকি, লোকের প্রাণে তা সয় না, কত কি তাই আমবা ঠিক করেছি আজ থেকে আমরা তোমাদের এই বাড়ীই আমাদের বাড়ী। আমরা অনাথ, আমাদের একটু আশ্রয় দিতে হবে বৌ।

কোন বিধি সিরঞ্জিল শ্রোতের শেষলি।

এমন বেথিত নাই ডাকে রাধা বলি।

তুমি মোবে যদি প্রভু নিদারুণ হও।

মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।

মণিমালার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। সে বুঝিল যে, যাহা সে এত যত্নে গ্রামের লোকের নিকট লুকাইয়া চলিতেছিল, এই দুটি ব্যথার

ব্যথীর কাছে সে তাহা গোপন রাখিতে পারে নাই। ইহারা দুজনে পবামর্শ করিয়া ঠাকুরের সেবার কাজ স্বীকার করিয়াছে শুধু তাহাদের অন্নকষ্ট মোচন করিবার জন্য। প্রত্যহ ইহাদের দুজনের যে “বাড়া” আসিবে তাহাতে তিন চার জনেব খাওয়া অনায়াসে চলিয়া যাইবে।

বিলি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌ, তোর কি চোখের জল ফুরায় না? তুই কতই কাদিতে পারিস!—

ওবে, চোখের জল কি সস্তা?

খাটি সোনা বিলিয়ে দিল যেন বাং কি দস্তা!

মণিমালাকে আজ আর কিছুতেই হাসাইতে না পারিয়া বিলিও কাদিতে বসিয়া গেল। প্রসাদী ত আগে হইতেই চোখ মুছিতেছিল।

(৬৩)

নারায়ণদাসীকে আসিতে দেখিয়া মুক্তামালা তাড়াতাড়ি ঘরে উঠিয়া গিয়া চোখ মুছিল।

নারায়ণদাসী আসিয়া মণিমালাকে ডাকিয়া বলিল—ওগো ও নাতবৌ, শুনেছ? তোমার নামাশ্বত্থের বয়স বিয়ে!

মণিমালা মুখে হাসি টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্যগ্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল—কোথায় রাজা-দিদি, কবে ঠিক কবলে?

—রাইপুকের অজুর-গোসাঁই বড় ধরে বসেছে; এই মাসেই বিয়ে হবে। বিয়েটি কিন্তু তোমাদের দিঘে দিতে হবে বাছা! ওর বাপ নেই, আমি কোথেকে খরচ-পত্তর করব? তোমাদেরই ত এ কর্তব্য!

—আর কিছুদিন অপেক্ষা কর রাজা-দিদি। ভূপাল আমার মাহুশ হোক, রোজগার করুক, আমাদের তখন কিছু বলতে হবে না।

—ভূপাল গৌরের মেসের বিয়ে দিয়ে দেবে। তোমরা গৌরের বিয়ে দিয়ে দাও।

কথাটা রাখালের কানে গেল। রাখাল সেখানে আসিয়া বলিল—গৌরকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলাম তাতে তুমি বাধা দিলে; স্থল ছাড়াতে বারণ করলাম, শুনলে না; বিয়ের সব নিজে ঠিক করলে—আমরা জানলাম না কার মেয়ে, কেমন মেয়ে। কিন্তু তার বিয়ে

দিঘে দিতে হবে আমাদের। কেন? আমাদের মতর?

শুকন। থড়ে আগুন লাগার মতন নারায়ণদাসী উঠিল—গরজ নয়ই বা কেন? সাতগুটিতে খেয়ে বান্নে বাড়িয়েছেন, বুকের ওপর চেপে বাস করছেন, এত-এত গরজ হয় না? আচ্ছা, দেখে নেবো গরজ হয় কি না!

নারায়ণদাসী ফরফর কবিয়া রাখালের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়া আপনাব বাড়ীর বকে তারস্বরে কাদিতে লাগিল।

কালী শনিয়া গৌর ছুটাছুটি বাড়ী আসিয়া যখন ঘরে কাছে গুলিল যে তাহারই বিবাহেব নিমন্ত্রণ করিতে দিয়াছিল এই অপবাদে রাখাল তাহার মাকে তাহাদেরই জমিদারী জায়গা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, প্রজা হইয়া জমিদারকে অপমান করিয়াছে, এবং হয় রাখালের নিকট হইতেই জমিব মূল্য লওয়া নয়ত চালা কাটিয়া তাহাকে উদ্ধার করা গৌরের মাহুভক্তি থাকিলে একান্ত কর্তব্য, তখন গৌর সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া রাখালকে অধাৰ্মিক চোর হিসেবে শত্রু বলিয়া গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল।

বাখাল ব্যথিত হইয়া বলিল—গৌর, তোমার যে মনে মুখেব গ্রাস খাইয়ে এত বড় করেছে! তুমি আমার গালাগালি দিয়ে না!

গৌর রাখালের প্রদত্ত খাবাবকে এমন একটা মতন সপ্তে ভুলনা কবিল, এবং বাখালের খাবারে সে এমন প্রবল কথার আরোপ করিল যে রাখাল স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তাহার পব গৌর তর্জ্জন করিয়া বলিল—হয় জমিদার দেওয়া হোক, নয়ত সে জুতা মাঝিয়া তাহাব জমি হইতে চালা কাটিয়া উঠাইয়া দিবে।

রাখাল ব্যথিত হবে বলিল—জুতো মারতে হইবে যখন, তখন মাঝাই হল। কিন্তু গৌর, পানের দিঘে দেবে দেখ, ও জুতো আমাবই দেওয়া! জমির দাম এত? তোমার বাবা আমাকে জমি বাস করতে দিয়েছিলেন, কারণ, তোমাব বাবা আমার মায়ের মামা, তাপন, তোমাব মা আপত্তি করাতে তাকে আমি দাম দিঘে, তাব টিপসই-করা দলিল আছে। তোমার মাকে চিত্রাঙ্গী করলেই জানতে পারতে। আব তুমিই কি দেসব জানে না?—তুমি ত আর কচি খোবাটি নও।

—ওসব কাকির কথা আমি শুনি। মাকে টাকা দিয়েছ, মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া বা করতে হয় কোরো। আমি তখন নাবালক ছিলাম; আমার বিষয় বিক্রীর অবিকাব মায়ের ছিল না। আমি এখন সাবালক হয়েছি, আমার জমির দাম আমি চাই!

রাখাল ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়া বলিল—দাম দেবার সম্ভতি আমার এখন নেই। ভূপাল তোমার ঋণ শোধ করবে। আর যদি ততদিনে ঋণ না হয়, তোমার যা খুসী করতে পার।

মণিমালা গহনা সব পেটের দায়ে কতক বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, কতক বন্ধক পড়িয়াছিল। কেবল পুঞ্জি ছিল সোহাগীর আর বিভার গহনা। প্রাণ থাকিতে তাহাদের নিরাভরণ করিতে তাহারা পরিবে না বলিয়াই রাখাল ও মণিমালা সেগুলি এতদিন ছোঁয় নাই। আজ সোহাগী আপনাতঃ গা হইতে গহনাগুলি খুলিয়া স্বস্তরের সামনে রাখিয়া বলিল—বাবা, এই দিয়ে ওদের ধার শোধ করে ফেলুন।

রাখাল ও মণিমালা সজল চক্ষে সোহাগীকে চাহিয়া শুক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা কিছু বলিবার আগেই গৌর তাড়াতাড়ি গহনাগুলি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল—মায়ের দস্তখতি দলিলটা দিও, কাল আমিও তাতে সই করে দেবো।

গৌর জমির স্বিগ্ণ দামের গহনা লইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়াও রাখাল বা মণিমালা গৌরকে কিছু বলিতে পারিল না। তাহারা সোহাগীর চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহাকে চুষন করিয়া নীরবে চোখের জল মুছিল।

প্রসাদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বাড়ী হইতে একটা বাস হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সোহাগীকে ডাকিয়া বলিল—বোমা শোনো।

সোহাগী কোঁতুলী হইয়া তাহার কাছে গিয়া বসিয়া বলিল—কি বড়মা?

প্রসাদী বাস খুলিয়া আপনাতঃ সমস্ত অলঙ্কার দিয়া সোহাগীকে সাজাইয়া মুখচুষন করিল। সোহাগী লজ্জিত হইয়া প্রসাদীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—এ কি করছ বড়মা?

প্রসাদী কৃতার্থতার সন্তোষ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া হাসিমুখে বলিল—আমার বোমাকে আমি যত্ন দিলাম। বাসের মধ্যে পড়ে পচছিল, আজ সোনার সঙ্গে উঠে সোনা সার্থক হল।

বিন্দি বলিল—এস বোমা, বাকীটুকু আমি সাজিয়ে দি।

বিন্দি সোহাগীর দি'খিতে দি'ছর ও পায়ে আলতার হাসি উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল—এইটুকু নিয়ে তুমি স্নেহে খেঁকো!

দুঃখে স্নেহে আনন্দে রাখাল ও মণিমালা কাঁদিল হাসিল।

(৬৪)

ছেলে যখন কুখিয়া রাখালের সহিত ঋণগড়া করিতে গেল তখন ব্যাপার কতদূর গড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য নারায়ণদাসী পাঁচিলে মই লাগাইয়া মইয়ের উপরে দাঁড়াইয়া পাঁচিলের উপর শুধু চোখ দুটি তুলিয়া রাখালের বাড়ীতে আড়ি পাতিয়া দেখিতেছিল। সে যখন দেখিল তাহার পুত্র সোহাগীকে একেবারে নিরাভরণ করিয়া বিজয়ীর যোগ্য লুণ্ঠন লইয়া বাড়ী ফিরিল, তখন আনন্দের আতিশয্যে তাহাব পা এমন কাঁপিতেছিল যে মইয়ের উপরে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে দুস্কর হইয়া উঠিল। নারায়ণদাসী নামিতে যাইতেছে এমন সময় দেখিল প্রসাদী একটা বাক্স লইয়া আসিল। আর তাহার নামা হইয়া না। কোঁতুলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যখন দেখিল সর্বানামাশী প্রসাদী নিজের হাতে এক-একখানি করিয়া সমস্ত গহনা সোহাগীকে পরাইয়া দিল, তখন এক-একখানি গহনার স্বর্ণকাস্তি তন্তু আঙারের গ্রায় নারায়ণদাসীর অন্তর পুড়াইয়া তুলিতে লাগিল, এক-একখানি গহনার রক্ত-আভা প্রসঙ্গস্বর্ঘ্যের গ্রায় তাহার দৃষ্টি ঝলসাইয়া দিতে লাগিল। সে রাখালের লাভের কপাল দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া তাহাদের উপর ত রাগ করিলই, প্রসাদী ও বিন্দির উপরও তাহার চিরকালের রাগ মর্ম্মাস্তিক হইয়া উঠিল। সে মনে করিল—প্রসাদী আর বিন্দির রাখালের উপর এত যে টান, তাহারা সর্বস্বই যে ইহাদের চালিয়া দিতেছে, তাহার নিশ্চয় একটা মন্ত-রকম হেতু আছে। পাড়ায় সেই হেতুটা প্রচার করিবার প্রচুর আনন্দে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া নারায়ণদাসী মই হইতে নামিয়া পড়িল।

গৌর বাড়ী আসিয়া গম্ভীরভাবে ঘবে ঢুকিল।

নারাণদাসী বলিল—গৌর, কি আনলি দেখি।

গৌর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—কি আবার আনব ?

—আ মর অগ্নেসে, আমি কি দেখিনি ? সোহাগীর গায়ের গরনা যে নিয়ে এলি।

গৌর দেখিল তাহার মা জ্যোতিষ জানে, নতুবা অমন চুপে চুপে অত সহজে যে ব্যাপারটা হইয়া গেল তাহার সন্ধান মা জানিল কিরূপে ? গৌর বলিল—নিয়ে এলাম ত নিয়ে এলাম, তাতে তোমার কি ? ও আমি তোমায় দেবো না।

—আরে মোলো, আমার বুদ্ধিতেই ত পেলি !

—ও আমার জমির দাম, আমি নেবো। তুমি ত একবার নিয়েছ।

এমনি করিয়া গহনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে গিয়া মায়ে পোয়ে এককথা ছুঁকাইয়া মহা কলহ বাধিয়া গেল। অবশেষে গৌর এক বাঁশ লইয়া মাকে তাড়া করিয়া বলিল—বেরোও আমার বাড়ী থেকে। এ সব আমার !

“সেরা প্রমাণ লাটির গুঁতো !” নারাণদাসী বাড়ী ছাড়িয়া উর্দ্ধ্বাসে নৌড় দিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

নারাণদাসী সমস্ত দিন পাড়ায় পাড়ায় রাখালের উপর প্রসাদী ও বিন্দির টানের হেতু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মনটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া যখন রাত্রি একপ্রহরের সময় বাড়ী ফিরিল তখন দেখিল সদর দরজায় চাবি। সন্ধান লইয়া জানিল অজুর গোসাঁই আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে গৌর গহনা বিক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছে, কলিকাতা হইতে রাইপুরে বিবাহ করিতে যাইবে।

তখন নারাণদাসী কাদিয়া আসিয়া রাখালের বাড়ীতে পড়িল—পেটের ছেলে আমার এমন খোয়ার করলে। আমায় একবার বললে-না কইলে-না, অমনি একলা বিয়ে করতে চলে গেল ! আমি এখন আধাস্তরে পড়েছি, আমি কোথায় দাঁড়াই রাখাল ?

রাখাল বলিল—রাঙা-দিদি, এ বাড়ী তোমারই। তুমি এখানেই থাক।

মণিমালা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া গম্ভীর হইয়া শুধু বলিল—এস রাঙা-দিদি।

নারাণদাসী বলিল—সম্মীশ্বর হয়ে বাপ-বেটায় বেচে থাকো। তোমরা শান্তুড়ী-বৌএ পাকা-চুলে সিঁছর পর, হাতেব লোহা ক্ষয় থাক ! তোমাদের ভরসাই ত আমি বেশী করি।

ঘরের মধ্যে সোহাগী হাসিয়া চুপিচুপি বিতাকে বলিল—বিমা গালও দিতে যেমন, আশীর্বাদ করতেও তেমন—একেবারে কল্লতরু !

প্রসাদী বলিল—মুখের কথা বৈ ত নয়, পয়সা ত লাগে না !

বিভা বলিল—বাবার দয়াতেই ত খেয়েছে। আঘরা হলে ঝাঁটা মেয়ে দিতাম খেদিয়ে—যেমন কণ্ঠ তেমনি ফল হত !

বিন্দি গুনগুন করিয়া গাহিল—

পায়েও পড়ি কামড় মারি আমি যে ডালফুতা।

নাই দিওনা বাড়বে বড়াই, পত্তি আমার জুতা !

(৬৫)

রাখালের পরিবার বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং তাহাতে খরচ বাড়িতেছে আয় কমিতেছে। ভূপাল এখন এম-এ ও ল পড়ে ; তাহার খরচ সংগ্রহ করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর সোহাগীর সন্তান-সন্তানবা হইয়াছে। সোহাগীর বাবা মারা গিয়াছে ; তাহার কাছে যে সামান্য কিছু পাওয়া যাইত তাহা বন্ধ হইয়াছে। গৌর বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে এক মাস-শান্তুড়ীকে সঙ্গে বরিয়া আনিয়াছে, সেই গৌরের ঘরকন্নায় কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছে, নারাণদাসী সে-বাড়ীতে আর প্রবেশের অধিকার পায় নাই। গৌরকে নারাণদাসী যখন জিজ্ঞাসা করিল তাহার দিন চলিবে কেমন করিয়া, তখন গৌর মাকে বৃন্দাবনবাসের সংপ্ৰদর্শন দিল। কাজেই নারাণদাসী এখন রাখালেরই পোষ্যের মধ্যে।

কাঙালী জমিদারী-সেবস্তার চাকরী করিতে-বরিতে অনেক টাকা চুরি করিয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছে। সে একদিন রাখালকে বলিল—রাখাল, তুমি বই লেখ, আমি নিজের খরচে ছেপে প্রকাশ করব ; তার পর যা লাভ হবে তোমার আমার অন্ধা-অন্ধি।

রাখাল যেন অকূল সমুদ্রে অবলম্বন পাইল। কান্দো

যে তাহাকে দুঃখের সময় সাহায্য করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহার জন্ম রাখালের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। রাখালের অনেকগুলি বই লেখা ছিল; কাঙালীকে সেইগুলি দিল।

কাঙালী সেগুলি ছাপাইয়া টাইটেল-পেজের প্রকৃ দেখাইয়া রাখালকে বলিল—দেখ ভাই রাখাল, আমার ইচ্ছে যে আমারও নামটা লেখকের স্থানে দিয়ে দি—তা হলে আর পৃথক লেখাপড়া কিছু করতে হবে না, যা লাভ হবে তা আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্ক-অঙ্কি করে পাব, আমাদের ছেলেপিলেদেরও কোনো গুণগোল হবে না।

রাখাল লজ্জায় পড়িয়া অস্বীকার করিতে পারিল না; কাঙালী বইএর প্রকৃ পর্য্যন্ত না দেখিয়াও লেখকের নাম লইতে চাহিতেছে দেখিয়া তাহার যেমন একটু বিরক্তি হইতেছিল, তেমনি কাঙালী নিজে উপযাচক হইয়া তাহার লেখা সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া তাহার খ্যাতি-বিস্তারের ও আয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে এই কৃতজ্ঞতাও তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং বাখাল ও কাঙালী দুজনের নামেই বই বাহির হইল।

বই প্রকাশ করিয়া কাঙালী বিজ্ঞাপনে লেখকের নামের স্থানে শুধু নিজের নামই প্রচার করিতে লাগিল, রাখালের নাম চাপা পড়িয়া গেল।

রাখাল মনে করিল, যাক, নাম লইয়া কি করিব, আমার বই ত দপ্তরে বাঁধা বন্ধই ছিল, কাঙালীই উদ্যোগ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আমার কিছু টাকা পাইলেই হইল।

দু-তিনখানা বইএর প্রথম সংস্করণ চট করিয়া বিক্রয়ও হইয়া গেল। রাখাল কাঙালীকে বলিল—কাঙালী-দা, হিসেবটা একবার দেখলে হত না?

কাঙালী আশ্চর্য হইয়া বলিল—তোমায় কি আমি টাকা দিইনি?

রাখাল তুচ্ছ টাকা লইয়া হিনাব-নিকাশ করিতে চাহিতেছে এই চিন্তাতে লজ্জিত হইয়া বলিল—কৈ, বোধ হয় দাঁওনি।

—তুমি ভালো করে মনে করে দেখো ত?

—না, আমার ভালো-রকমই মনে আছে।

—তা হবে তবে। নানান ঝগড়াটে কাকে কি দিচ্ছি

না-দিচ্ছি মনে থাকে না। আচ্ছা, একটু ফুরসৎ পেলেই আমার খাতা-পত্রে দেখবো।

রাখাল সেই স্বপ্নময় আসিবার প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে।

এইসময় হঠাৎ রাণী জগদ্ধাত্রীর মৃত্যু হইল। অস্বাভাবিক সম্পত্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া বঙ্কবিহারী তাড়াতাড়ি দেশে প্রস্থান করিল। কুবের আসিয়া গজভুক্ত কপিথের জায় কলিকাতার বাড়ীটি দখল করিয়া বসিল। ভূপাল কালেভদ্রে যে দশ বিশ টাকা দিদিমার নিকট হইতে পাইত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

দুঃখ বিপদ একলা আসে না। অনাহারে পরিশ্রমে ম্যালেরিয়ায় সোহাগীর শরীর জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; মাতৃস্বের গুরু বেদনা সে সঙ্গ করিতে পারিল না, স্মৃতিকাগৃহে সে সজল চক্ষে “মা, একটুবার শুকে দেখতে পেলাম না” বলিয়া মণিমালায় কোলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

বিভা বিধবার মতনই ছিল, এবার সে সত্যসত্যই বিধবা হইল।

ভূপালের আব পড়া চলিল না। তাহার চাকরী না করিলেই নয়।

সে বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরীর জন্ম দরখাস্ত পাঠাইবে, সেই চিঠির মাশুল দিবার পর্য্যন্ত সঙ্গতি নাই। তাহার পঞ্জরের জায় বুকের নিত্য নিকটের প্রসাদীর-দেওয়া সোহাগীর গহনা একএকখানি করিয়া হস্তান্তর হইয়া যাইতে লাগিল।

রাখাল বারবার তাগাদা করিয়া কাঙালীকে জেদ করিতে লাগিল তাহার বইএর হিসাব মিটাইয়া দিতে হইবে।

কাঙালী বলিল—এই যে ভাই, হিসেব ঠিক করে রেখেছি। প্রত্যেক বই হাজার কপি করে ছাপা হয়েছিল। তা থেকে আমাদের গল্পের বইখানার তুমি নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের দিয়েছ পঞ্চাশ, আমি দিয়েছি সাতষাট; দুশো তেরোখানা বই দপ্তরীর বাড়ীতে উইএ খেয়েছে, দপ্তরী গরিব-মাঝামাঝি কাঁদা-কাটা করছে, ওটা আমাদেরই লোকসান গেল; বিক্রী হয়েছে বাকি ৬৭০, একটাকা হিসেবে ৬৭০

টাকা। তা থেকে বুকসেলার কমিশন শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে ১৬৭৥০ আর প্রকাশকের প্রাপ্য অর্ধেক ৩৩৫ টাকা বাদ দিয়ে থাকে ১৬৭৥০ টাকা; আমবা দুজন গ্রন্থকার সেই টাকাটা অঙ্ক-অঙ্কি পাব—তা হলে তোমাব পাওনা হল ৮৩৮০। আর আমাদের উপস্থানস্থানাবও ঐ-রকমই তোমার পাওনা হবে। ফুলের বইখানার ৪০০ কপি বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা আব-একবার দেখে যদি নাই পাওয়া যায় ঐ ৬০০ বই বিক্রী ধরেই হিসেব করতে হবে। শিগগিরই কবে দেবো। তোমাব যদি টাকার বিশেষ দরকার থাকে আগাম কিছু নিতে পার।

এই কথাতেই রাখালের মনের সমস্ত বিবক্ষিত হইয়া গেল। কাঙালী যে কাঁথের করাতের মতন যাইতে আসিতে তাহার পাওনা কাটিয়া কমাইয়া দিল, নষ্ট বইএব জন্ম যে প্রকাশকই দায়ী এবং কাঙালী যে প্রকাশক ও গ্রন্থকার দুই রূপে দুবার নিজে লইল, এসব বাখাল আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। একজন ভদ্র-লোককে মুখের উপর চোর প্রবঞ্চক বা জুয়াচোর কি কখনো সে বলিতে পারে? তাহার উপর এই দারুণ অভাবের সময় কাঙালী তাহাকে যাহা হাতে তুলিয়া দিল তাহাই পরম উপকার করিল মনে করিয়া রাখালের মন কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই কটি টাকায আর কদিন চলে? আবার অভাবের বিভীষিকায় রাখাল মুড়িয়া পড়িল।

বার বার আঘাতে রাখালের বুক ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে পরের ভালো করিতে গিয়া নিজে যে কি-রকম বঞ্চিত হইয়াছে ও ঠকিয়াছে, তাহা সে এখন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল। সে নিছকের অক্ষমতায় ও নিষ্ফলতায় স্ত্রীপুত্র-কণ্ঠার নিকট কুণ্ঠিত লজ্জিত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তাহার উপর পরের মেয়ে সোহাগীকে যখন হাসিমুখে সকল দুঃখ সম্বন্ধ করিতে দেখিত তখন রাখালের অন্তর শতধা বিদীর্ণ হইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিত। মণিমালা রাজার মেয়ে, তাহাব হাতে পড়িয়া উহাব কি দুর্দশা! প্রসাদীর জীবনটাকেও ব্যর্থ করিল তা সে-ই। দুঃখের মেয়ে বিভা, তাকে চিবহুঃখিনী কবিল সে-ই। ইহাব উপর লোকের অকৃতজ্ঞতা, নাবাণদাসী ও গৌরব কুব্যবহার, গ্রামেব

লোকের কাছে হেয় হইবার আশঙ্কা, সর্বোপরি দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়ন বাখালের হৃদয় একেবারে জ্বলিত কবিতা ফেলিয়াছিল। তারপর যখন সোহাগী তাহার বৃকে শেল হানিয়া একবুক অতৃপ্তি লইয়া মরিয়া গেল, বিভা বিধবা হইল, শেষ আশ্রয় ও নিরাশার সম্বল বাগ জগদ্ধাত্রীও মবিয়া গেলেন, তখন সে-দুঃখ রাখালের মতন অতিবলিষ্ঠ তেজস্বী লোকের পক্ষেও অতিবিক্ত হইয়া উঠিল। বালক ভূপালের লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গেল, সে কোথায় কেমন করিয়া একটু আশ্রয় একটু অবলম্বন পাইবে তাহা ভাবিয়াও নির্ণয় কবিবার কোনো উপায় দেখা যাইতেছিল না। রাখাল আর হাসে না, বাখাল কাঁতে ন, বাখাল কাহারও সহিত কথা বলে না,—ভোর হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা হইতে একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সে ঘরের কোণে বসিয়া কেবল পূজা পাঠ ধ্যান জপ করে, পাঞ্জি আর জ্যোতিষের বই লইয়া অদৃষ্টের সন্ধান করে, আর দুই হাতেব মধ্যে মাথা রাখিয়া শুধু ভাবে আর ভাবে।

আহার পাইবার সম্ভাবনা যত কম হইয়া উঠিতেছিল, রাখালের পূজা আরাধনা ভগবানে নির্ভর ও আশ্রয়দর্শন তত বাড়িয়া চলিয়াছিল।

সেদিন বাখাল পূজা পাঠ শেষ করিয়া আসনের উপর তখনো চুপ করিয়া কালকা-মুখে হইয়া বসিয়া ছিল। জপের মালা তখনো হাতে রহিয়াছে।

মণিমালা আসিয়া ডাকিল—অত ভাবছ কেন? বাবে এস।

রাখাল শূন্য দৃষ্টিতে মণিমালার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া উদাস ভাবে বলিল—খাব? কি খাব? আমি ত খাবার কিছু জোগাড় করিনি কখনো!

—তুমি অত ভাবছ কেন? ভূপাল বেঁচে থাক, আমাদের দুঃখ কি?

—ভূপাল? আমাব সব গেছে, ভূপালই কি বেঁচে আছে?

মণিমালার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে বুঝিল তাহার অমন জ্ঞানবান স্বামী জ্ঞান হারাইতে বসিয়াছে, তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠিতেছে।

মণিমালা চীৎকার কবিতা ভূপালকে ডাকিল।

ভূপাল তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—বাবা, এই যে আমি, আমি আপনার ভূপাল !

রাখাল হতাশ ভাবে অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল—তুমি আমার ভূপাল নও ! তুমি কাঙালী, ভূপালের মুখোস মুখে দিয়ে আমার ঠকাতে এসেছ ! আর আমি ঠকছিলাম !

মণিমালা কাতর হইয়া বলিল—আমাকে ত চিনতে পারছ ? আমি ত তোমার মণি !

রাখাল তেমনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—তুমি চন্দনমণি !

বিভা আসিয়া কাদিতে-কাদিতে বলিল—বাবা বাবা, আমি ত তোমার বিভা !

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ তুই বিভা, আমি তোমার সর্বনাশ করেছি, তোকে আর চিনতে পারব না ?

—বাবা, আমার অদেষ্টি ছিল, তুমি কি করবে। উঠে ধেতে এস।

—তুই যে আমাকে বিষ খাওয়াবি, তোমার হাতে আমি খব না।

দুঃখের উপর এ এক দুর্দৈব, রাখালকে খাওয়ানো দুষ্টর হইয়া উঠিল। কাহাকেও সে আর বিশ্বাস করিতে পারে না, কাহাকেও সে আর চিনিতে পারে না। সে সর্বদা ঘরের এক কোণে অন্ধকারে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকে, অন্ন হয় পূজা করে, নয় পাঁজি দেখে। বাহিরের কোনো লোকের সাড়া পাইলে বলে—আমাকে লুকোও লুকোও, ও আমাকে মারতে এসেছে—আমি বোধহয় ওর কিছু উপকার করেছিলাম।

এ দৃশ্য আর চোখে দেখা যায় না। একদিন যাহাকে দেবতার গ্রায় ভক্তি করিয়াছে, রাজার গ্রায় ভয় করিয়াছে, গুরুর গ্রায় যাহার নিকট হইতে সর্বদা জ্ঞান-উপদেশ পাইয়াছে, যাহাকে পরম দৃষ্ট তেজস্বী বলিষ্ঠ দেখিয়াছে, তাহাকে আজ এমন নির্জীব জ্ঞানশূন্য হীন অবস্থায় দেখিতে বুক যেন ফাটিয়া যায়। ভূপাল সোহাগীর শোকে জর্জরিত হইতেছিল, তাহার উপর পিতাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আর সে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না।

মণিমালা বলিল—ভূপাল, কুবেরকে একখানা চিঠি লেখ। সে যদি কিছু এখন দ্যায় তা হলে ওর চিকিৎসা করাতে পারি।

ভূপাল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—না মা, অন্তর কাছে ভিক্ষে চাইব, কিন্তু ওর কাছে নয়।

মণিমালা তখন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পরে লুকাইয়া বিভাকে দিয়া কুবেরের নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করিয়া চিঠি লেখাইল।

কিন্তু কুবের কোনো জবাবই দিল না।

আজকাল খাওয়া একরকম বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মণিমালা আবার নিজের জবানী চিঠি লেখাইল। সেও অনেক দিন হইয়া গেল, জবাব আসে নাই।

আজ কাহারো কিছু খাওয়া জুটে নাই। বেলা তিন-প্রহরের সময় ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদী ও বিন্দির প্রসাদ আসিবে, তখন তাহাই সকলে ভাগ করিয়া খাইবে। ভূপাল দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। অধর পিয়ন আসিয়া ভূপালের সামনে দুখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া গেল।

ভূপাল চিঠি দুখানি পরম আগ্রহে তুলিয়া লইয়া দেখিল একখানি তাহার মাকে কুবের লিখিয়াছে, অপরখানি অপরিচিত হাতের লেখা, তাহার নামে।

কুবেরের চিঠি খুলিয়া ভূপাল মাকে পড়িয়া শুনাইল, কুবের লিখিয়াছে—“শ্রীচরণকমলে প্রণাম পূর্বক নিবেদন, আপনার চিঠি পাইয়াছি। আমি জানি আপনারা ষ্টেট হইতে চল্লিশ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছেন; অতএব আমার নিকট আর কিছু আশা করিবেন না। ইতি সেবক শ্রীকুবেরচন্দ্র রায়।”

এই দারুণ দুঃখের উপর এই অপমান দেখিয়া মণিমালার হাসি আসিল।

ভূপাল বলিল—কেমন মা ? আর ভিক্ষে চাইবে ? আমরা সমস্ত দিন উপোষ করে একবেলা পরের দেওয়া প্রসাদ দুটি ধেতে পাই, আর ওটা লিখেছে কিনা যে আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা আছে ! আমার মা-বাবা কি ওদের মতন চোর ! থাকত সামনে ও.....

মণিমালা চোখ রাঙাইয়া বাধা দিয়া বলিল—চুপ কর ভূপাল, ও তোমার মামা !

ভূপাল নিরন্তর হইয়া দ্বিতীয় চিঠির খাম খুলিয়া দেখিল
ষাট টাকা মাহিনায় নয়সরাই স্থলের হেডমাষ্টারের পদে
নিয়োগের পত্র আসিয়াছে। ভূপাল যেন সাম্রাজ্য লাভ
করিল। একদিন বিস্তৃত জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইবে
বলিয়া রাজা ধনেশ্বর বাহার নাম ভূপাল রাখিয়াছিলেন, সে
আজ ষাট টাকা বেতনের স্থল-মাষ্টারী পাইয়া আপনাকে
কৃতার্থ বোধ করিল।

সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মা, আমার
চাকরী হয়েছে!

তারপর হাসিমুখে ছুটিয়া রাখালের কাছে গিয়া বলিল—
বাবা বাবা, আর আমাদের দুঃখ থাকবে না! আমার ষাট
টাকা মাহিনের চাকরী হয়েছে!

মণিমালা, বিভা, প্রসাদী, নারায়ণদাসী, বিন্দি সকলে
হাসিতে-হাসিতে সেখানে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল তখন পূজার আসনে বসিয়া ফুল-তুলসীতে
চন্দন মাখাইয়া নারায়ণের চরণে দিতে বাইতেছিল।
ভূপালের কথায় রাখালের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অনেক
দিন পরে একটু হাসির রেখা তাহারও মুখে ফুটিয়া উঠিল।
তাহা দেখিয়া ভূপাল চাকরী পাওয়ার চেয়েও আনন্দিত
হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি
মাখায় লইল। রাখাল নারায়ণের নির্মালায় লইয়া পুত্রের
মস্তকে স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিবার জন্ত হাত
বাড়াইল,—কিন্তু হাত কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপালের মাথা
হইতে স্থলিত হইয়া পড়িল, আর সঙ্গে-সঙ্গে রাখালের
প্রাণহীন দেহ নারায়ণের টাটের সম্মুখে পুষ্পপাত্রের উপর
ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

(সমাপ্ত)

চাকর বন্দোপাধ্যায়।

জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা-পদ্ধতি

(Emile Senart-এর করাদী হইতে)

জাতের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় সমস্তাটি অনেকবার আলোচিত
হইয়াছে এবং বিভিন্ন দিক্ দিয়া। এই সম্বন্ধে আলোচনা
অনেকগুলি পদ্ধতি উপস্থাপিত হইয়াছে। আমি বোধ হয়
এক্ষণে অসংকোচে ঐ-সকল পদ্ধতির ফর্দটাকে সংক্ষিপ্ত
করিতে পারি।

যে-ভূমির উপর এই সমস্তাটি প্রতিষ্ঠিত সেই ভূমি
সম্বন্ধে মনোযোগসহকারে যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত
আলোচনা না হওয়ায় জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-সকল
অতীব সাধারণ ও ক্রত ধরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে,
সেই-সকল ব্যাখ্যা প্রথমেই আমি দূরে সরাইয়া
রাখিয়াছি।

খুব সম্প্রতি, জাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানগভীর যথেষ্ট
সকল চেষ্টা হইয়াছে, সেই-সকল চেষ্টাকে কতকগুলি ভাগে
বিভক্ত করা যাইতে পারে; দৃষ্টান্তের দ্বারা, সেই-সকল
চেষ্টার গতি কোন্ দিকে, তাহা দেখাইতে পারিলেই আমি
যথেষ্ট মনে করি। ইহা একটা সাদাসিধা কৌতূহলমাত্র
নহে। এইরূপ সরাসরিভাবে আলোচনা করিবার সময়,
আলোচনা-ভূমি হইতে অনাবশ্যক জঞ্জাল কাঁটাইয়া ফেলিবার
অবসর হইবে এবং পথে চলিতে চলিতে একটার পর
একটা বাদ দিয়া সম্ভবপর সিদ্ধান্তের দিকে আমরা ক্রমশঃ
অগ্রসর হইব।

হিন্দুরা দুই জিনিসকে—শ্রেণী ও জাত, এই দুই সংজ্ঞাকে
মিলাইয়া মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়াছে, আমরাও
তাহাদের কথা সহজে মানিয়া লইয়া ভুল পথের অনুসরণ
করিয়াছি। আমি বিশেষরূপে “ইণ্ডিয়ানিস্ট”দের লক্ষ্য করিয়া
এই কথা বলিতেছি। শাস্ত্রাঙ্গিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি
যাহারা তাঁহারা অল্প দিক্ ছাড়িয়া কেবল চিরাগত প্রথার
দিক্ দিয়াই এই সমস্তার সম্মুখীন হওয়ায় একটা বিশেষ দিকে
অনিবার্যরূপে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। ত্রাস্ত্রাঙ্গিক মতবাদই

ঐহাদের নিজস্ব আব-হাওয়া। সাহিত্যিক কাল-তত্ত্ব হইতেই প্রায় তাঁহারা যাত্রা আরম্ভ করিয়া থাকেন।

একটা মূলসূত্র অম্লসরণ করিয়া (মনে হয় যেন স্বতঃসিদ্ধ) ঐহাদের মধ্যে অধিকাংশই একটা নিশ্চিত তথ্য বলিয়া এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, সাহিত্যিক লিপি-নিদর্শনাদিব পরিণাম-কল, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ঠিক অম্লরূপ, এবং সাহিত্যিক অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশেরও অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণাংশ বাহা কাল-পর্যায়ের হিসাবে, বৈদিক সূক্তদিগের সহিত অধিকতর নৈকট্যসূত্রে আবদ্ধ, সেই ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে এমন কিছু থাকিতে পারে না যাহা সূক্তাশ্রিত বিষয়ের স্বাভাবিক অম্লবদ্ধ বা পরিপুষ্ট নহে। ইহা হইতেই এই উভয়-সংকট। হয়—জ্ঞাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেদ সাক্ষী, নহ জ্ঞাতট। সেই যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে যুগে সূক্তের রচনার পর ব্রাহ্মণাংশের রচনা হয়। সূক্তের রচনার মধ্যে জ্ঞাতের কোন কথা নাই,—ব্রাহ্মণাংশেই জ্ঞাতের কথা আছে এইরূপ অম্লমান করা হইয়া থাকে। উহা অম্লবদ্ধ-স্বরূপ প্রায়ই মৌনভাবে আব-একটি সিদ্ধান্ত এইরূপ জুড়িয়া দেওয়া হয় যে, সূক্তাদি হইতে যে-সকল মূল উপাদান স্পষ্ট-রূপে পাওয়া যায়, সেই-সকল উপাদানই জ্ঞাতের উৎপত্তি সমর্থন করে।

আমি যতদূর জানি, কেহই এই আধুনিক সিদ্ধান্তটিকে লঙ্ঘন করেন নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বেদেব ভিতর যে শ্রেণী বিভাগের কথা আছে, তাহা হইতেই যাত্রা শুরু করা উচিত;—কাহারও কাহারও মতে বেদেব মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ ও প্রমাণসিদ্ধ জ্ঞাতের কথা পাওয়া যায়, কাহারও কাহারও মতে, কেবল কতকগুলি সামাজিক শ্রেণীর কথা পাওয়া যায়। বৈদিক সূক্তাদির ভিতর জ্ঞাতের প্রমাণ থাকা সম্বন্ধ প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের একপ জলন্ত অম্লবাগ ও বিশ্বাস যে, সচরাচর প্রণালী অম্লসারে, জ্ঞাতের উৎপত্তি যে খুব আধুনিক বলিয়া নির্ধারণ করা হয়,—এ কথা উপলব্ধি করা ঐহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিগণ সূক্তাদির মৌনতা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে সেই পুরাকালে জ্ঞাতের কথাটা একেবারেই অজ্ঞাত ছিল; অতএব জ্ঞাতটা পরবর্তীকালে স্পষ্ট আকার ধারণ

করিয়াছে। এই উভয় সম্ভাদায়েব লোকের এক বিষয়ে মতের ঐক্য আছে—তাঁহারা উভয়েই বলেন যে, চতুর্কর্ণের সহিত বর্ণভেদপ্রথার উৎপত্তি যে-বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ তাহা আদিম ও অচ্ছেদ্য।

এই ধারণাব বণবর্তী হইয়া, কতকগুলি কাছাকাছি সাদৃশ্যমূলক যুক্তি অম্লসারে, একটা ব্যাখ্যা টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। পুরোহিত-সম্প্রদায়েব দাবী ও স্বার্থ, বুদ্ধি-পূর্বক ও অধ্যবসায় সহকায়ে যে খণ্ডাংশ বিভাগ উদ্ভাবিত করিয়াছে এবং যাহা কঠোর নিয়মের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা "বর্ণশাস্ত্র"রূপ বেলাউরী-কাচের মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই-সকল রচনার মধ্যে, রেখাগুলি সাধারণত একটু ক্ষীণ ধরণের। উহাদের সৌসাম্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে, কতকগুলি সাধারণ ধারণার দোহাই দিয়া আমাদিগকে আতুষ্ট করিতে পারে। কিন্তু উহাতে এমন কিছুই স্পষ্ট নাই যে আমাদিগকে ভ্রম হইতে উদ্ধার করিতে পারে।

যাহারা হিন্দু যুরোপীয় সমস্ত শব্দকোষ কতকগুলি মূল-ধাতু হইতে বাহিব করিয়াছেন, সেই বিশ্লেষণের ওস্তাদেবা এবং ভাবাত্মম্বাসনায়ী কতকগুলি পণ্ডিত—ইহাদেব বিশ্বাস, যে-সকল ভাষার শব্দব্যুৎপত্তিতে স্বচ্ছতা আছে, সেই-সকল ভাষার ভিতরেই মানব-ভাষার প্রথম আধো-আধো কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের বিবেচনায়, সেখানকার সীমা লঙ্ঘন করিয়া মূল-উৎসে উঠিতে যে পদক্ষেপ করিতে হয় তাহা নগণ্য অথবা স্বল্পগণ্য। জ্ঞাত সম্বন্ধে যে-সকল ব্যাখ্যা সমুখিত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি এইরূপ সহজ আশাকে প্রশ্রয় দেয়। যাহারা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত আছেন বলিয়া মনে হয়, এই মুগ্ধ আশার আক্রমণে তাঁহারাও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।

তাহার দৃষ্টান্ত,—M. Sherring সাক্ষাৎভাবে সমসাময়িক বর্ণভেদ-প্রথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রভূত ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন (Tribes and Castes in Benares)। বধন একদিন তিনি মনে করিলেন, তাঁহার মতামতগুলি একত্র আনিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করিবেন, "বর্ণভেদের স্বাভাবিক ইতিহাসেব" ("Natural history of Caste", Cal. Review) সম্বন্ধে তাঁহাব যে মনোভাব, তাহা

সংক্ষেপে বিবৃত কবিবেন; তখন এই সমস্তটির অবয়বগুলি তিনি একরূপ দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থেব নামের ভিত্তি যে অস্বীকারগুলি ব্যক্ত হইয়াছে তাহার এক-বর্ণও মিথ্যা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, পূর্বে হইতেই একটা পদ্ধতি মনোমধ্যে ধারণা করিয়া রাখায়, তাঁহার সমস্ত মন্তব্য, তাঁহার সমস্ত উপলব্ধি জ্ঞান নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে। প্রভুত্বাকাজ্ঞী পুরোহিতগণলী যে-ধর্মনীতির বশবর্তী হইয়া জাতের সমস্ত খণ্ডাংশগুলি নিজ হাতে তৈয়ারী করিয়াছিলেন, হিন্দু-ভ্রগংটাকে নিজ স্বার্থের অঙ্গুল করিয়া গড়িয়াছিলেন, শেরিং সেই নীতির ফলটাই জাতের মধ্যে দেখাইয়াছেন মাত্র।

জেন্সইটিদিগের তুলনা ও জেন্সইটিদিগের পৌরোহিতিক অভিসন্ধি সাধারণত এই-সকল ব্যাখ্যায় একটু অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। আবার খুব আধুনিক শব্দতাত্ত্বিক সম্প্রদায়েব এক প্রতিনিধি M. Schroederএব লেখাতেও এইরূপ দেখিতে পাই। M. Schroeder প্রথমেই ব্রাহ্মণিক পদ্ধতিটাকে বাড়াইয়া তুলিবাব দিকে ঝুঁকিয়াছেন একরূপ মনে হয় না। তিনি মনে করেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি যে চতুর্বিধ বিভাগ, তাহা কেবল শ্রেণীগত পার্থক্যের অঙ্গরূপ। ঐ-সকল বিভাগ হইতে, এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ গঠনপ্রণালী হইতে জাত উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে মরণোন্মুখ বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিজয়ী প্রতিজ্ঞাবাব সহিত এই পদ্ধতিটি যোগস্বরে আবদ্ধ। তাহা হইলে, জাতের আবির্ভাব-কালটা আরও কাছাকাছি আসিয়া পড়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সনাতনপন্থী তত্ত্বজ্ঞানী গন্থরের কাল পর্যন্ত নামিয়া আইসে।

আমি এই-সকল আলোচনা-পদ্ধতিকে চিবাগত প্রখাপিত পদ্ধতি বলিব। ইহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে, বিনা আয়াসে পুনঃ পুনঃ সংক্রামিত হইতেছে। তাহাদিগেব কতকগুলি প্রণালীব মধ্যে নিপুণতাব পরিচয় থাকিলেও, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, বিশেষ ফলদায়ী বলিয়া মনে হয় না। একটা দৃষ্টান্ত। Ross এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—ব্রাহ্ম-পুর্বোহিতেরা অল্প অল্প করিয়া ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করায় তাহা হইতেই গোড়ায় পৌরোহিতিক

জাতের অভ্যুদয় হইল। এবং আর্থালোকোবা সমস্ত ভাষা-ভূমিতে প্রসারিত হইয়া, বহু খণ্ডাংশে পরিণত হইল,—এই চূর্ণীকৃত হইল; স্বকীয় শক্তি ও আধিপত্য সমস্ত রাষ্ট্রবংশীয়েবা তাহার মধ্যে বিলীন হইল; শুধু তাহা-নৈব আভিজাত্যের পদটিমাত্র বহিয়া গেল, “ক্ষত্রিয়গণ” প্রচলিত ব্রাহ্মদেব স্থলাভিষিক্ত হইল। তাহাদেব দুর্বলতা হইতেই ব্রাহ্মণ-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। জ্ঞানেব দ্বারা স্বসজ্জীভূত এইরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধি হইতে যে মতামত নিঃসৃত হইয়াছে, সেই-সকল মতামতেব অবশ্য মূল্য আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীর ইতিহাসেব প্রতিই রস সাহেবের অমুরাগ ও ঐশ্বর্য লক্ষিত হয়, জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নহে।

শ্রেণীব সহিত জাতকে মিথাইয়া একাকার করাতেই, আমার মতে, সমস্তই কুয়াসাজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাব কতকগুলি ছেঁচ আমি ইতিপূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু বিস্তাবে, কি প্রকৃতিগত লক্ষণে, কি স্বাভাবিক প্রবণতাগ, জাতটা শ্রেণীব অঙ্গরূপ নহে। এমন-কি যে-সকল জাত কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর সহিত যুক্ত, সেই-সকল জাতের প্রত্যেকেই স্বকীয় শাখা-জাতগুলি হইতে ভিন্ন। প্রত্যেকেই কঠোর ভাবে স্বকীয় পার্থক্য বক্ষা করে, উচ্চতর একতা সম্বন্ধে কাহাবও কোন চিন্তাই নাই। শ্রেণী বাহু-নৈতিক উচ্চাভিলাষ পোষণ কবিয়া থাকে; জাত অঙ্গনরূপ বনে,—একপ কতকগুলি সংকীর্ণ সংকোচ-সূচক আচরণ, কতকগুলি চিবাগত প্রথা, কতকগুলি স্থানীয় প্রভাব,—যাহার সহিত সচরাচর শ্রেণীগত স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই। সর্বাংগে, জাত এমন-একটি অগণিত রক্ষণেব প্রতি আসক্ত, যাহা খুব নীচেব লোকেবাও ভয়ে ভয়ে বক্ষা কবিবাব জন্য সতত সচেষ্ট। শ্রেণীগত সংগ্রামেব স্বদূর্ব প্রতিধ্বনিই চিবাগত প্রথার মধ্যে ধ্বনিত হইয়া থাকে। তথোব উপর পদ্ধতির প্রতিজ্ঞাবাবশত এষ্ট দুই প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকেই এ-টা সম-স্বার্থিক স্বাতন্ত্র্য লাভ কবিয়াছে। আসলে উহাদেব বিশিষ্টতা কোন অংশেই কম নহে।

পুর্বোহিত-তন্ত্রেব বিভাগ-অঙ্গসায়ে লোকেবা যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, তাহা প্রায় সার্বভৌম, জাতের পদ্ধতিটা একটা অনগ্রসাধারণ ব্যাপার। ব্রাহ্মণেব প্রভূত স্বপ্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষ ব্রাহ্মণ এই জাতকে

নিজের কাছে যে লাগাইয়াছেন, তাহা সম্ভব। কিন্তু জাতের পদ্ধতিকে পুরোহিততন্ত্র মাত্রেরই ভিত্তি কবিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যদি ব্রাহ্মণিক মতবাদ, শ্রেণী ও জাত সংক্রান্ত দুই বিভিন্ন ধাবণাকে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়া থাকে—সেটা গৌণকল্পেব ব্যাপার। ঐতিহ্যের বিচার আলোচনা করিয়া আমরা এই কথা জানিয়াছি। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বুঝিতে গেলে, উক্ত দুই-প্রকারের ধাবণাকে যত্নপূর্বক পৃথক্ কবা উচিত; তাহার পর অল্পসন্ধান কবিতে হইবে, কিরূপে ঐ দুই ধারণা মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত তথ্য ও আমাদের দৃষ্টি এই দুয়ের মধ্যে, পৌর্বোহিতিক আলোচনা একটা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন করিয়াছে। যে যবনিকা নাট্যদৃশ্যকে আবৃত কবিয়া রাখে, সেই যবনিকাকে নাট্যদৃশ্য বলিয়া ভ্রম না করি সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মণিক ধরণে, কতকগুলি বড় বড় আদিম পর্যায় হইতে, পর-পর খণ্ডাংশে পরিণত অসংখ্য জাতগুলিকে বাহির করা,—মনে হইতে পারে খুব সোজা। কিন্তু এটা কেন দেখা হয় না যে, এই খণ্ডাংশ-বিভাগ যে-সকল স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত, শ্রেণীব মর্মান্বাভা তাহার বিরোধী। তৃণগুচ্ছের মত শ্রেণীকে ক্রমাগত একত্র আঁটয়া কসিয়া বাধা—ইহাই শ্রেণীর মর্মান্বাভ।

ভৌগোলিক, ব্যবসায়িক, ধর্মসাম্প্রদায়িক ইত্যাদি একীকরণের বিবিধ মূলস্রোতের বশবর্তী হইয়া জাত একটা সর্বসাধারণ একতা স্থাপনের প্রতি প্রায়ই হতচেতন। শ্রেণীর মর্মান্বাভা এই যে, শ্রেণী কোন খুঁটিনাটিকে আমল দেয় না, কোন-প্রকার সংকোচকে আমলে আনে না। পক্ষান্তরে জাতের বিশেষত্ব এই যে সাধারণ এক জাত হইতে নিঃসৃত শাখা জাতগুলির মধ্যেও উহা উচ্চ বেড়ান ব্যবধান স্থাপন করে।

এই আলোচনা-পদ্ধতিগুলি সমস্তাটিকে ঠিক স্থানে স্থাপন করে নাই, এই পদ্ধতিগুলি এমন একটি যথেষ্টপ্রণোদিত মূলস্রোত অবলম্বন করিয়াছে যাহাব দ্বারা কিছুই সমপ্রাণ হয় না। স্পষ্টই দেখা যায় উহা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সাহিত্যিক সাক্ষ্যের প্রতি অথবা ভক্তিগ্রন্থের ঐ-সকল

পদ্ধতি, জাতের প্রথম উৎপত্তিকে এমন এক নিম্ন যুগে আনিয়া ফেলিয়াছে যে-যুগে ভারতের জীবন-প্রবাহ একটা নির্দিষ্ট পথে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন-এক প্রতিষ্ঠান, যাহা হিন্দুসমাঙ্গে সর্বত্র প্রচলিত, যাহার জীবনীশক্তি অবিনশ্বর বলিয়া মনে হয়, তাহা জাতীয় ক্রমবিকাশের মূলেব সহিত আবদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। যাহার এতটা আধিপত্য সেই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গজাইয়া উঠিলেও, অন্ততঃ গোড়া হইতেই কতকগুলি নির্দিষ্ট পদাঙ্ক-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

এই-সকল আলোচনা-পদ্ধতিব মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; এই-সকল পদ্ধতি বর্তমান তথ্যের দিকে লক্ষ্যই কবে না; মূল হিন্দুধর্মের মধ্যে যে-সকল লোক-সম্মুখ প্রবেশ কবিয়া সম্প্রতি হিন্দুধর্মকে অসম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে, এই-সকল পদ্ধতি সেই-সকল লোকের জীবন-গতি ও ধারণাদি পর্যালোচনা করে নাই।

পক্ষান্তরে কি সমাজ-তত্ত্ব, কি নৃতত্ত্বটিত আলোচনা—এই-সমস্ত আলোচনার পূর্বে উক্ত আলোচনাব আবশ্যকতা সর্বাপেক্ষা অধিক—উহাই সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

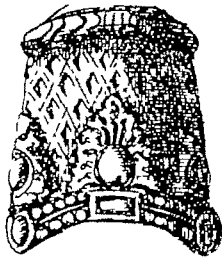
প্রাচীন ভারতের রাজা, মুকুট ও সিংহাসনের লক্ষণ

রাজ-লক্ষণ।

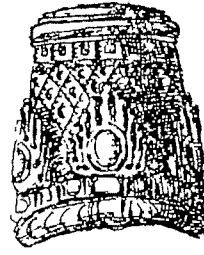
প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রে সকল বিষয়েরই খুব খুঁটিনাটি বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের শরীরের অবয়বের পরিমাণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী কিরূপ হইলে সুন্দর ও সুদৃশ্য হয় তাহা নির্ণয় করিয়া যেমন শিল্পশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, তেমনি রাজশক্তির তারতম্য অনুসারে রাজাদের শ্রেণীবিভাগ, মুকুটবিভাগ ও সিংহাসনবিভাগ কত রকমের হইতে পারে তাহারও বহু শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই-সকল শাস্ত্রের মধ্যে “মানসার” নামক শাস্ত্র প্রধান।

মানসার শাস্ত্রের মতে রাজাদিগকে নয় শ্রেণীতে ভাগ

১ম পট

গুপ্ত, চালুক্য ও পল্লব-বংশের
মুকুট

সিংহলের মুকুট

প্রাচীন চোল-রাজবংশের
মুকুটপ্রাচীন চোল-বংশের
মুকুট

বিবিধ কিরীট-মুকুট।

করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীবিভাগ রাজাদের
সৈন্যবল অনুসারে এইরূপ—

রাজসংজ্ঞা	হস্তী	অশ্ব	পদাতি	মহিষী	স্ত্রী
শ্রোত্রগ্রাহী	৫	৫০০	৫০,০০০	১	৭০০

(অশ্বগ্রাহী ?)

প্রাধারক	৬	৬০০	১ লক্ষ	২	৭০০
পট্টভাক্	৭	৮০০	দেড়লক্ষ	৩	১৩০০
মণ্ডলেশ	১০	১০০০	দুইলক্ষ	৪	১৫০০
পট্টধ্বক্	১২	১৫০০	২ বা ৩ লক্ষ	৫	২০০০
পাঞ্চিক	১৫	২০০০	৪ লক্ষ	৬	৩০০০
নরেন্দ্র	১০	১০০০০	১ কোটি	১০	৫০০০০

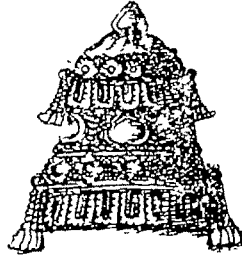
অধিরাজ ১০ হাজার ১ কোটি ১০ কোটি ১০০ বা হাজার

১০ লক্ষ

সার্কভৌম ১০ কোটি ১০০ কোটি ১০ কোটি ঐ ঐ
(চক্রবর্তী)যে রাজা তাঁহার বাল্যকালে চতুর্দশ-মেখলা পৃথিবীকে
নিজের স্বায়ত্তাধীন করিতে পারেন তিনি সার্কভৌম
চক্রবর্তী।যে রাজার ত্রি-শক্তি (অর্থাৎ প্রভুশক্তি বা প্রভু
শক্তির অল্পগ্রহ হইতে যে শক্তিলভ হয়, উৎসাহ-শক্তি
বা উৎসাহজনিত শক্তি এবং মন্ত্রশক্তি বা স্তম্ভনা হইতে
লব্ধ শক্তি) আছে এবং সেই ত্রি-শক্তির সাহায্যে যিনি
ছয়টি প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়া-
ছেন; যাহার ষড়্-গুণ—সন্ধি (সন্ধি করিবার কৌশল),
বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (অভিযান বা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা),আসন (কাহারও সহিত শত্রুতা না করিয়া স্থির হইয়া
থাকা, Neutrality), সংশ্রয় (আশ্রয় গ্রহণ), বৈবিত্য
(কূটনীতি),—আছে এবং আত্মরক্ষার উপযোগী ষড়্-বল
অর্থাৎ অল্পগত প্রজা, পরিপূর্ণ রাজকোষ, বুদ্ধিমান মহী,
পরাক্রান্ত সৈন্য, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী এবং অজ্ঞেয় দুর্গ
প্রস্তুত আছে; যিনি নীতিশাস্ত্র সুপণ্ডিত, যিনি জ্ঞানবান্
ও ধার্মিক এবং যিনি স্বর্ঘ্য বা চন্দ্রবংশে জাত, তিনি
অধিরাজ শ্রেণীর।যিনি দুর্বল প্রতিবেশীর অধীনস্থ তিনটি প্রদেশ জয়
করিয়া নিজের অধীন করিয়াছেন এবং সেই জিত রাজ্য
জায় ও ধর্ম অনুসারে শাসন ও পালন করেন, সেই রাজ্য
নাম নরেন্দ্র। তাঁহার অধীনে যে-সকল রাজা থাকেন
তাঁহাদিগকে পাঞ্চিক পট্টধ্বক্ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা
হয়।যে রাজার মাত্র একটি প্রদেশের উপর অধিকার এবং
একটি মাত্র দুর্গ-রক্ষিত নগর ষড়্-বলের দ্বারা স্বরক্ষিত
হয়, সেই রাজাকে পাঞ্চিক বলে। যাহার চারিটি গুণ
থাকে এবং যিনি অর্দ্ধ প্রদেশের অধীশ্বর ও সেই অর্দ্ধ
প্রদেশ একটি মাত্র দুর্গের দ্বারা রক্ষিত হয়, তিনি পট্টধ্বক্।
পট্টধ্বকের অধীনে যে-সব ছোট ছোট রাজা থাকেন
তাঁহাদের নাম মণ্ডলেশ্বর—ইহারা একএকটি উপপ্রদেশ
বা জেলার অধীশ্বর। তাঁহাদেরও অধীনে যাহারা,
তাঁহাদের নাম পট্টভাক্; তাঁহাদের কর্তব্য সামাজিক
নীতি নীতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করা
এবং দেশের ধনবল বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করা; এজন্য



মণ্ডার মুকুট



হয়সল-রাজবংশের মুকুট



রাজপুতানার মুকুট



যব-দ্বীপের মুকুট

বিবিধ কিরীট-মুকুট।

ইহাদের আর-এক নাম ধর্মার্থসাধিপতিঃ; যিনি অর্দ্ধ জেলা বা একটি মাত্র মহকুমা বা সবডিভিজননের কর্তা ও ঠাহার অধীনে একটি মাত্র দুর্গ থাকে, তিনি মণ্ডলেশ্বরের স্হকারী, তাঁহাবও পদবী পটভাক্—আধুনিক এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট। যে ব্যক্তি কতকগুলি জনপদ বা জেলার কর্তা ও একটি মাত্র দুর্গের অধিকারী এবং চারিবর্ষের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র বর্ণের) অন্তর্গত, তাঁহার নাম প্রাহারক। যে ব্যক্তি কয়েকটি জেলার ও একটি মাত্র দুর্গ-সংরক্ষিত নগরীর প্রভু, তাঁহার পদবী শ্রোত্রগ্রাহী বা অঙ্গগ্রাহী। এই রাজপদবীর বিভাগ তাঁহাদের রাজ্যের আবতনের অল্পপাতে নির্দিষ্ট হয়।

এই সকল রাজাদের প্রত্যেকেরই বাজচিহ্ন ও পদবী-চিহ্ন-স্বরূপ পৃথক পৃথক রকমের মুকুট, দণ্ড, ছত্র, চামর, সিংহাসন ইত্যাদি থাকিত। চক্রবর্তী বা অধিরাজ-উপাধি-চিহ্নিত রাজাদের শিরোভূষণ মুকুটের নাম মৌলি বা কিরীট। পার্শ্বিক রাজার মুকুটের নাম শিবজ। পটধ্বক্ ও মণ্ডলেশ্বর নামক রাজার মুকুটের নাম পটবন্ধ। পটভাক্ নামক রাজার মুকুটের নাম পট। প্রাহারক ও শ্রোত্র-গ্রাহী বা অঙ্গগ্রাহী নামক রাজকর্মচারীদের মস্তকে কেবলমাত্র পুষ্পমালা ধারণের অধিকার ছিল, অল্প কোনো-রকম মুকুট নহে।

সিংহাসনের কারুকার্য, অলঙ্কার ও অঙ্গ-সংযোগের ভেদে তাহা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ও তাহার শ্রেণী-তারতম্য স্থির করা হইত। যে সিংহাসনের পশ্চাতে একটি তোবণ ও সূর্য্য-

ছটা ও কল্পবৃক্ষ সংযুক্ত থাকিত তাহাতে বসিবার অধিকারী চক্রবর্তী, অধিরাজ বা মহারাজ এবং নরেন্দ্র। পার্শ্বিক, পটধ্বর ও পটভাক্ সূর্য্যছটা-ও-তোবণ-সংযুক্ত সিংহাসনে বসিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সিংহাসনে কল্পবৃক্ষ থাকিতে পারে না। প্রাহারকের সিংহাসনে তোবণ এবং সূর্য্যছটাও থাকিবে না। শ্রোত্রগ্রাহী বা অঙ্গগ্রাহী সাধারণ চৌকিতে বসিবেন, সেই চৌকির নাম “কেবল-আসন”।

ইহার পরে মানসার শাস্ত্রে প্রত্যেক রাজার রাষ্ট্রীয় কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। চক্রবর্তী তাঁহার প্রজাদিগকে দুই লোক ও শত্রুর অত্যাচাব ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া ছায়-ধর্ম্মমতে সদয়ভাবে শাসন ও পালন করিবেন; ইহার জন্য তিনি প্রজার আয়ের সপ্তাংশ কর পাইবেন। এরূপ কর্তব্যপালনের জন্য অধিরাজ বা মহারাজ কর লইবেন ষষ্ঠাংশ, এবং নরেন্দ্র লইবেন পঞ্চমাংশ; কিন্তু ইহাদিগকে দরিদ্র ও আত্মবদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষার জন্য মুক্তহস্ত থাকিতে হইবে এবং গৃহে সমাগত অভ্যাগত-অতিথিদিগের সমাদর ও সন্মুখনা করিতে হইবে। পার্শ্বিক শ্রেণীর রাজা প্রজাদের উৎপন্ন ধনেব অর্দ্ধেক পাইবার অধিকারী এবং কোনো প্রজার অপরাধের জন্য তিনি তাঁহার অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর শক্তিশালী রাজাদের নির্দিষ্ট দণ্ড করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা তিনগুণ বেশী অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই সংগৃহীত অর্থ হইতে তাঁহাকে দরিদ্র ও অক্ষমদিগের ভরণপোষণেব্যয় নির্বাহ করা ছাড়া শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে হইবে, ইহাই মানসার শাস্ত্রের অল্পশাসন।



মাড়গাড়ের কিরাট-মুকুট



চোল-কেশবধ



পশ্চিম চাণক্য-কেশবধ



দক্ষিণ-ভারতের ধনির

বিবিধ কেশ-বন্ধ।

শুক্লনীতি শাস্ত্রে রাজপদবীর শ্রেণীবিভাগ ভিন্ন-রকম।
 ত্রায় ও ধর্ম অল্পসারে সংগৃহীত কর হইতে যে রাজার আয়
 এক হইতে তিন লক্ষ কার্ষ (এক-রকম স্বর্ণমুদ্রা) হয়,
 তাঁহাকে সামন্ত বলে। যাহার আয় দশ লক্ষ কার্ষ পর্যন্ত,
 তিনি মণ্ডলিক। কুড়ি লক্ষ কার্ষ আয় থাকিলে, তিনি
 রাজা। পঞ্চাশ লক্ষ কার্ষ আয় হইলে, তিনি মহারাজা।
 যাহার এক কোটি কার্ষ আয়, তাঁহাকে বলে স্বর্বাট। যাহার
 দশ কোটি কার্ষ আয়, তিনি সম্রাট। এবং যাহার পঞ্চাশ
 কোটি কার্ষ আয়, তাঁহার পদবী বিরাট। যে
 সম্রাট সপ্তদ্বীপের বা মহাদেশের অধিপতি তিনি
 সার্বভৌম।

এই-সকল রাজা পুরুষাভুক্রমে জ্যেষ্ঠাধিকারে রাজ্যের
 অধিকার লাভ করিলেও তাঁহাদের সিংহাসনে অভিষিক্ত ও
 প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রজা-সাধারণের অভিমত ও অল্পমোদনের
 উপর নির্ভর করিত। প্রজাদের নির্বাচিত রাজা ত্রায়বান ও
 প্রজাহিতে-রত না হইলে প্রজারা সেই দুষ্ট বাজাকে শাস্ত্র-
 সম্মতিতে সিংহাসনচ্যুত, রাজ্য হইতে বিতাড়িত এবং এমন
 কি হত্যা পর্যন্ত করিতে পারিত। কারণ প্রজাদের নিকট
 কর গ্রহণ করিয়া রাজা তাহাদের বেতনগ্রাহী ভৃত্যস্থানীয়
 হইয়া থাকেন এবং সেইজন্য রাজার কর্তব্য যেজন্য তিনি
 বেতন গ্রহণ করিতেছেন সেই কার্য সুসম্পন্ন করা। যে
 রাজা সেই কর্তব্য অবহেলা করে সেই রাজাকে দশ দিব্য
 অধিকার প্রজারা প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট হইতে পাইয়াছে
 বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যে-সমস্ত সামন্ত তাহাদের
 কর্তব্য অবহেলার জন্য, অথবা বার্কক্য ইত্যাদি কারণে,

কর্তব্য পালনে অক্ষম হওয়াতে প্রজাদের দ্বারা সিংহাসন
 হইতে অপসৃত হন, তাঁহাদিগকে হীন-সামন্ত বলে।

সামন্ত নামক ভূস্বামীরা নিম্নলিখিত উপবিভাগে শ্রেণী-
 বদ্ধ—যিনি একশত গ্রামেব অধিকারী তিনি নৃ-সামন্ত,
 যিনি দশ গ্রামের কর্তা তিনি নায়ক। যিনি দশ হাজার
 গ্রামের অধীশ্বর তাঁহাকে স্বর্বাট বলে।

শুক্লনীতি নামক শাস্ত্রে রাজাদের সৈন্তবলের অল্পপাতে
 তাঁহাদের অপর একপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে।
 ঐ শাস্ত্রের মতে যে রাজার পদাতিক সৈন্ত যত তাহার অধ-
 সাদী হইবে তাহার চতুর্থাংশ; রসদ ইত্যাদি ভায়বহনের
 উপযুক্ত বলদের সংখ্যা হইবে পদাতিকের পঞ্চমাংশ;
 অশ্বের সংখ্যাব অষ্টমাংশ থাকিবে উষ্ট্র; উষ্ট্র-সংখ্যার
 চতুর্থাংশ থাকিবে হস্তী; হস্তী-সংখ্যার অর্ধেক থাকিবে রথ।
 দৃষ্টান্তস্বরূপ নরেন্দ্রশ্রেণীর রাজার সৈন্ত-সংখ্যা এইরূপ
 নির্দিষ্ট হইয়াছে;—মানসার শাস্ত্রের মতে তাঁহার ১০ হাজার
 অশ্বসাদী থাকা আবশ্যক; তদনুসারে শুক্লনীতিসারের মতে
 তাঁহার সৈন্ত-বিভাগ হইবে এইরূপ—

অশ্ব	১০০০০
বলদ	২০০০
উষ্ট্র	১২৫০
হস্তী	৩১২
বথ	১৫৬
কামান	৩১২

মোটের উপর শাস্ত্রনির্দেশের এই উদ্দেশ্য যে পদাতিকের
 সংখ্যা হইবে বেশী, অশ্বসাদীর মাঝাবি, এবং হস্তীর সংখ্যা



ধর্মিল



পঙ্কব-মুকুট

চালুক্য ও হরসল-রাজবংশের
মুকুট

পঙ্কব মুকুট

বিবিধ জটা-মুকুট।

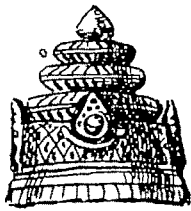
সবচেয়ে কম। এই-সকল সৈন্যবল ছাড়া যে রাজার আশ্রয় এক লক্ষ কার্ঘ্য তাঁহার সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ পার্শ্ব থাকিবে— একশত বাছা বাছা বলিষ্ঠ জোয়ান অঙ্গরক্ষী, তিন শত বন্দুকধারী পদাতিক, আশিজন ঘোড়সওয়ার, দশটি উষ্ট্র, দুটি হস্তী, একখানি রথ, দুখানি শকট, ঘোলাটি বলদ, দুটি বড় কামান, তিনজন মন্ত্রী এবং ছয়জন কর্মচারী।

প্রজাদের উৎপন্ন আয়ের ষষ্ঠাংশ করূপে গ্রহণ করিয়া রাজা রাষ্ট্রহিতের জন্ত নিম্নলিখিত অল্পপাতে ব্যয় করিবেন— সৈন্যসংরক্ষণের জন্ত তিন, দান আধ, মন্ত্রীদের বেতন আধ, অপরাপর কর্মচারীর বেতন আধ, রাজ্যব্যক্তিগত ব্যয় আধ, ভাণ্ডারে সঞ্চয় এক, মোট ছয়।

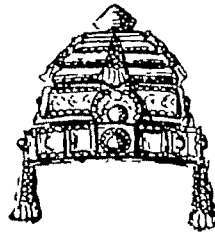
শাস্ত্রের নির্দিষ্ট এই-সমস্ত ব্যবস্থা কর্মক্ষেত্রে বাস্তবিক পালিত হইত কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; লোকে মনে করিতে পারে যে আমাদের নীতি-বা ধর্মশাস্ত্রে যে-সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা যাহা হওয়া বা করা উচিত তাহারই উপদেশ মাত্র, বাস্তবিক ঐরূপ নিয়ম সেকালে পালিত হইত তাহার সাক্ষ্য নহে। কিন্তু প্রাচীন কাব্য, পুরাণ ও ইতিহাসে বর্ণনীয় সেকালের সমাজের যে-সমস্ত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিক বলিয়া মানিয়া লইলে ও স্পষ্ট অতীতগুলি বাদ দিয়া লইলে নীতি ও ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশের সহিত সামাজিক ও রাষ্ট্র জীবনের বিরোধ দেখা যায় না।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় প্রজা-সাধারণের অল্পমোদন আহ্বান করিয়াছিলেন; রামচন্দ্রকে বনবাস দিলে প্রজারা রাজা দশরথের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অত্যাচারী বেন রাজাকে তাঁহার প্রজারা রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

রাজাদের পদবীও যে তাঁহাদের রাজ্যের বিস্তার ও শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করিত, যে যাহা ইচ্ছা তাহাই ব্যবহার করিতে পারিত না, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেব দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায়। পরাস্তক, বাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতি চোল সম্রাটগণ বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও নিজেদের চক্রবর্তী বা ত্রিভুবন-চক্রবর্তী বলিতেন না। এই গর্বিত উপাধি চোল রাজাদের মধ্যে প্রথম ব্যবহার করেন কুলোত্তম। তাঁহার সাম্রাজ্য সমস্ত মালদ্বীপ প্রেসিডেন্সি, কলিঙ্গ, উড়িষ্যা ও সিংহলের উত্তরাংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। এবং তাহা তিন দিকে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এইরূপ, হরসল-বংশের প্রথম-দিক্কার রাজারা নিজেদের চক্রবর্তী বলিতেন না, বিষুবর্দ্ধন ও তাঁহার পুত্র নরসিংহের জ্যেষ্ঠ ক্ষমতাশালী রাজারাও নিজেদের মহামণ্ডলেশ্বর মাত্র বলিয়া অভিহিত করিতেন। নরসিংহের পুত্র বল্লাল নিজেকে ভূজবল-চক্রবর্তী বা প্রতাপ-চক্রবর্তী বলিয়া প্রচার করেন।



চোল-মুকুট



হয়সল-মুকুট



পল্লব-মুকুট

পাঞ্চারীপুরের
আধুনিক টুপি

বিবিধ করণ্ড-মুকুট।

বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর পল্লব-বংশের রাজারাও নিজেদের মহারাজাধিরাজ মাত্র বলিতেন। রাষ্ট্রকূট-বংশীয়েরা সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের অধিপতি ছিলেন এবং সেইজন্য নিজেদের মহারাজাধিরাজ বলিতেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তও মহারাজ এবং মহারাজাধিরাজ অপেক্ষা মহত্তর উপাধি গ্রহণ করেন নাই। ছোট ছোট প্রদেশের অধিপতির নিজেদের মহারাজ বা মহারাজাধিরাজ বলিতেন না।

মহারাজাধিরাজ এবং সার্বভৌম নৃপতিদের যে সৈন্য-সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই কল্পনা নহে। চোলরাজ কুলোত্তম এক যুদ্ধে এক হাজার হস্তী বধ করিয়া তামিল ভাষায় পরনি নামক প্রশস্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রশস্তি হাজার হাতী বধ না করিলে কোনো রাজা পাইতে পারেন না। পরবর্ত্তীকালে যুদ্ধে বোধ হয় রথ ব্যবহৃত হইত না, কারণ রাজাদের লেখমালায় রথের উল্লেখ দেখা যায় না। দাক্ষিণাত্যে উষ্ট্রেরও ব্যবহার ছিল না বোধ হয়।

একজন রাজা খুব বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও, তাঁহার বিপুল সৈন্য, ধনসম্পত্তি ও অধীনস্থ রাজা থাকিলেও, মানসাবের মতে তিনি আপনাকে মহারাজা বা চক্রবর্ত্তী বলিবার অধিকারী হইতেন না; এই সম্মানিত পদবী লাভ করিতে হইলে ঐ সমস্ত ছাড়া তাঁহাকে সূর্য বা চন্দ্রবংশীয় হইতে হইত। এইজন্য যে-কোনো রাজা প্রবল হইয়া উঠিলেই পিতৃমাতৃকুলের যে-কোনো দিক দিয়া আপনাকে সূর্য বা চন্দ্রের বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত। অনেক অখ্যাত বংশের লোক হঠাৎ পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিয়া সূর্য বা চন্দ্র হইতে নিজের উদ্ভব

দেখাইবার জন্য খুব বিস্তারিত কুলজী তৈয়ার করাইয়াছেন দেখা যায়। একজন গোয়াল রাজা হইয়া উঠিলেই নিজেকে যদুবংশীয় বলিয়া প্রচার করে; কারণ যদুবংশী কৃষ্ণ এককালে গোয়ালার কাজ করিয়াছিলেন এবং যাবৎ চন্দ্রবংশীয়। বিজয়নগরের রাজারা ইহার দৃষ্টান্ত।

শাস্ত্রের নির্দেশমত রাজারা প্রজাব বিস্তারিত বর্ষাংশের বেশী কর গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই শাস্ত্র-নিয়ম কোনো বাজা অমান্য করিয়া বেশী কর আদায় করিয়াছেন এমন কোনো প্রমাণ কোনো লিপি বা লেখে পাওয়া যায় না। কিন্তু রাজাদের জীসংখ্যার অঙ্ক দেখিলেই তাহা যে নিতান্তই কল্পনা ও অতুলিত তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

মুকুট-লক্ষণ।

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের তিলক-চিহ্ন যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি বিভিন্ন জাতি ও সামাজিক অবস্থার তারতম্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের শিরোভূষণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইতে দেখা যায়। বোধহয় মিউজিয়ামে বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন প্রদেশের এইরূপ নানান রকমের পাগড়ি সংগৃহীত আছে। হায়দরাবাদ রাজ্যে বহুবিধ পাগড়ি প্রচলন দেখা যায়। বচ্চী ও পাণীদেব মধ্যে সামাজিক অবস্থা ও ব্যবসায়-ভেদে একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের টুপি-পরা প্রচলন আছে। সিন্ধু-প্রদেশে যাহারা রাজমন্ত্রীদের বংশধর তাহাদের টুপি দেশের সকল-প্রকার টুপি বা পাগড়ী হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। এইজন্য ভারতবর্ষের সকল হিন্দু-সম্প্রদায়েরই কোনো-না-কোনো-রকমের শিরোভূষণ আছে। কেবল বাঙালীর



আসিরীয়

পারসিক

পারসিক

আসিরীয়

বিবিধ-উষ্ণীয়।

কোনো-রকম উষ্ণীয় সাধারণতঃ নাই; কিন্তু তাহার জীবনের সকল মাজলিক অল্পঠানে, যেমন অন্নপ্রাশন, উপ-নয়ন, বিবাহ প্রভৃতিতে, তাহাকে টোপর ব্যবহার করিতে হয়। টোপর—সোলার মুকুট।

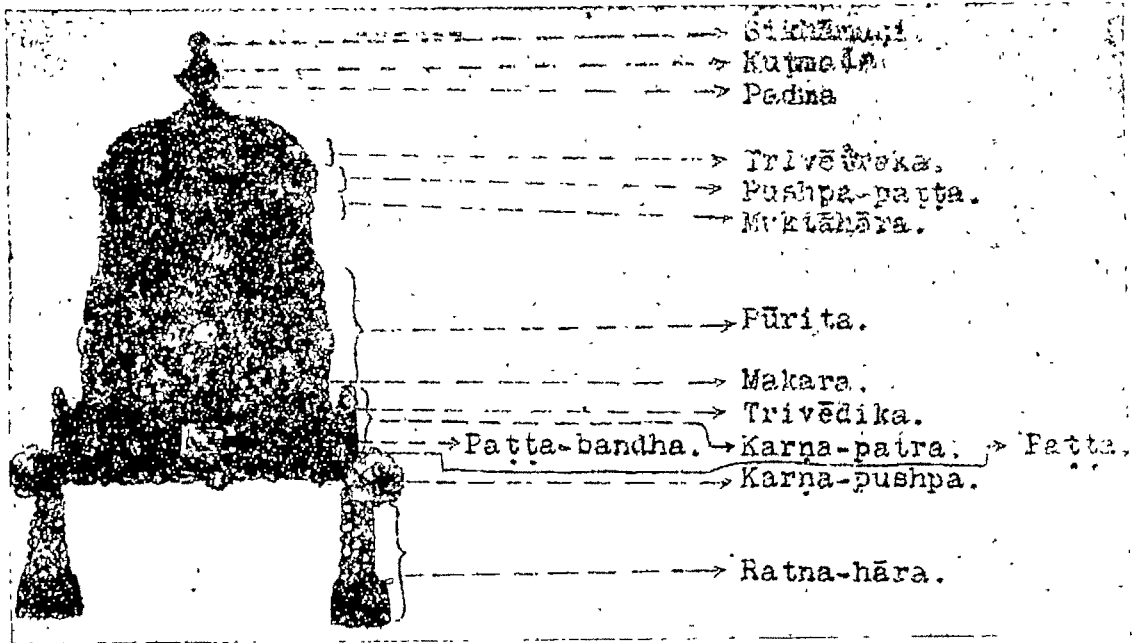
সকল দেবদেবীর প্রতিমাকেই মুকুট পরাইবার বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়। রাজাদের রাজ্য ও শক্তির তারতম্য অল্পসারে তাহাদের মুকুটের গঠন ও মুকুট নির্মাণের স্বর্ণের ওজন শাস্ত্রে নির্দেশ করা আছে। আগমশাস্ত্রে দেবতা ও বাজাদের মৌলি বা মুকুটের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসার ও শিল্পরত্ন নামক শাস্ত্রেও মৌলি বা মুকুটের বিশদ বিবরণ আছে। এই-সকল শাস্ত্রে মুকুটের নিম্নলিখিত নাম দেখিতে পাওয়া যায়—কিরীট-মুকুট, করণ্ড-মুকুট, জটা-মুকুট, শিরস্কক, কেশবন্ধ, ধমিল, অলক-চূড়ক, পুষ্পপট্ট, মস্তকপট্ট, পদ্মপট্ট ইত্যাদি। এইসকল মুকুটের মধ্যে কিরীট-মুকুট, করণ্ড-মুকুট, জটা-মুকুট এবং অলক-চূড়ক বেশী প্রচলন ছিল। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুকে কিরীট-মুকুট, ব্রহ্মাকে করণ্ড-মুকুট এবং রুদ্র বা মহাদেবকে জটা-মুকুট পরাইবার বিধি আছে; দেবীদের মধ্যে দুর্গার জটা-মুকুট, লক্ষ্মীর কুস্তল-মুকুট ও সরস্বতীর কেশবন্ধ এবং অন্যান্য দেবীদের সকলেরই করণ্ড-মুকুট ধারণ করা ব্যবস্থা।

রাজাদের মধ্যে যাহাদের পদবী সার্ক্‌ভৌম-চক্রবর্তী বা অধিরাজ, তাহারাই কিরীট-মুকুট পরিবার অধিকারী;

নরেন্দ্র-উপাধিধারী রাজার মুকুটের নাম করণ্ড-মুকুট এবং পার্শ্বিক উপাধিধারী রাজার মুকুটের নাম শিরস্কক। করণ্ড-মুকুট সকল শ্রেণীর রাজাই ধারণ করিতে পারেন। সার্ক্‌ভৌম এবং অধিরাজ নামক সম্রাটদের মহিষীরা কেশ-বন্ধ নামক মুকুট ধারণ করিবেন। অধিরাজ এবং নরেন্দ্র উপাধিধারী রাজাদের মহিষীরা যে মুকুট ধারণ করিবার অধিকারিণী তাহার নাম কুস্তল। মণ্ডলিক-পত্নীদের শিরো-ভূষণের নাম ধমিল। এবং রাজা ও রাণীদের দাসদাসী বা দাসপত্নীদের যে শিরোভূষণ তাহার নাম অলক-চূড়ক। খুব সম্ভবত মাথার চুল বিভিন্ন প্রকারে বাঁধিবার বিভিন্ন রীতিকে ধমিল, কেশবন্ধ এবং অলক-চূড়ক বলিত। এই-সকল খোঁপা পুষ্পপট্ট বা ফুলের মালা ও পত্রপট্ট বা নাবিকেল প্রভৃতি পত্রের গ্রথিত বা বিনানো মালা ও রত্নপট্ট বা রত্নখচিত সোনাব পাত দিয়া জড়ানো থাকিত। এইরূপে বিভিন্ন পদবীব লোকের বিভিন্ন প্রকারের শিরো-ভূষণ হওয়াতে লোকে দেখিবারামাত্রই তাহাদের কাহার কিরূপ পদমর্যাদা বুঝিয়া লইবার সুবিধা পাইত। যুরোপেও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন প্রকারের শিরোভূষণ হয়; ইংলণ্ডের রাজা, যুবরাজ, ডিউক, আল, মারকুইস, ব্যারন প্রভৃতির শিরোভূষণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট আছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মুকুটের পরিমাণ এইরূপ—

সাধারণত, যাহার মুকুট তাহার মুখের দৈর্ঘ্যের দুই বা তিন গুণ মুকুটের খাড়াই হওয়া নিয়ম। কিন্তু ব্রহ্মা ও



কিরীটের অবয়ব ও অঙ্গসংস্থানের নির্দেশ ও নাম।

কিংবদন্তীর মুকুট তাঁহাদের প্রতিমার মুখের পোনে-দুই গুণ এবং শক্তিদেব মুকুট তাঁহাদের প্রতিমার মুখের দুই গুণ লম্বা হওয়া বিধি। মুকুটের নীচের-মুখের প্রস্থ মুকুটধারীর মুখের লম্বের সমান হওয়া নিয়ম; মুকুট নীচে হইতে উপর দিকে ক্রমশ সঙ্ক হইয়া যায়, যেমন বাংলা দেশের টোপর। কিরীট-মুকুটের নীচের দিকের চওড়া যতখানি, চূড়া তাহার অপেক্ষা অষ্টমাংশ বা ষোড়শাংশ কম হইবে; করণ-মুকুটের চূড়া তলার চওড়া অপেক্ষা অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ সঙ্ক হওয়া নিয়ম।

চক্রবর্তী রাজার মুকুট তাঁহার মাথার বেড়ের সমান খাড়া হইবে। চক্রবর্তী রাজার মুকুটের অপেক্ষা অধিরাজের মুকুট ষোড়শাংশ ছোট, নরেন্দ্রের মুকুট বিংশাংশ ছোট এবং পার্শ্বিকের মুকুট অর্ধেক ছোট। চক্রবর্তীর মহিষীর মুকুটের খাড়াই হইবে তাঁহার মাথার বেড়ের সমান, অধিরাজের মহিষীর মুকুট তাঁহার মাথার বেড়ের তৃতীয়াংশ কম, এবং নরেন্দ্র প্রভৃতি রাজাদের মহিষীদের মুকুটের উচ্চতা তাঁহাদের মুখের দৈর্ঘ্যের সমান হওয়া বিধি। কেশবদ্র প্রভৃতি শিরোভূষণের উচ্চতা মুখের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক বা ত্রি-চতুর্থাংশ এবং পট্টের উচ্চতা মাথার বেড়ের

তৃতীয়াংশ হইবে। পট্টধারিগের বিশেষ শিরোভূষণের নাম পট্ট। মণ্ডলেশ্বর বা মণ্ডলিকদিগের যে পট্ট তাহা মাথার বেড়ের সিকি এবং পট্টভাঙ্গদিগের পট্ট ষষ্ঠাংশ উচ্চ হইবে।

বিবিধ পদবীর রাজা ও তাঁহাদের রাণীদিগের মুকুট কাহার কতখানি স্বর্ণে প্রস্তুত হইবে তাহারও বিবরণ শাস্ত্রে নির্দেশ করা আছে। মুকুটের তিন শ্রেণী—উত্তম, মধ্যম, ও অধম। যে মুকুটের ওজন ১৫০০ নিফ তাহা অধম মুকুট, যাহার ওজন ২০০০ নিফ তাহা মধ্যম, এবং যাহার ওজন ২৫০০ নিফ তাহাই উত্তম শ্রেণীর। রাজারা নূতন মুকুট ধারণ করিবার অবিকারী হইতেন চারিবার। যখন প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করিতেন তখন; এই মুকুট ধারণের অমুষ্ঠানের নাম প্রথমভিষেক। রাজার বিবাহের পর তাঁহার মঙ্গলাভিষেক হইত। তখন তিনি এবং তাঁহার বাণী উভয়েই নূতন মুকুট ধারণ করিতে পারিতেন। যখন রাজা কোনো দেশ বা শত্রুকে জয় করিতেন তখন তাঁহার বিজয়াভিষেক হইত এবং তখনও তিনি নূতন মুকুট ধারণ করিতেন। যখন তিনি কোনও বীরকে প্রকাশ করিতে পারিতেন, তখন তাঁহার বীর্যভিষেক হইত এবং তখনও

তাহার নূতন মুকুট ধারণ কবিবার অধিকার জন্মিত। যে সমস্ত রাজার এই চতুর্বিধ অভিষেক হইয়াছে তাহাদের মুকুটের ওজন ১৫০০ হইতে ২৫০০ স্বর্ণ নিষ্ক পর্য্যন্ত সকল প্রকারেরই হইতে পারে। এই সকল চক্রবর্তী বা অধিরাজ-দিগেব মহীষাদিগেব মুকুট তাহাদিগেব স্বামীর মুকুটের ওজনের অর্ধেক হওয়া নিয়ম।



যশমাঙ্গল্য সংযুক্ত পুরিত।

অধিরাজের মুকুট ১৫০০ হইতে ২০০০ নিষ্ক ওজনের পর্য্যন্ত, অধম মধ্যম বা উত্তম শ্রেণীর তিন প্রকারেই হইতে পারিত। পার্শ্বিকের শিরশ্বক নামক মুকুটের, অধম মধ্যম ও উত্তম ভেদে, ওজন নির্দিষ্ট ছিল ৫০০ বা ৮০০ বা ১২০০ নিষ্ক। উত্তম মধ্যম অধম ভেদে ত্রিবিধ মুকুটের ওজন পটু-পূর্ণক ৩০০ বা ৬০০ বা ৯০০ নিষ্ক, মণ্ডলিকের ২০০ বা ৫০০ বা ৬০০ নিব এবং পটুভাকের ১০০ বা ২০০ বা ৩০০ নিষ্ক নির্দিষ্ট ছিল।

উপরে বিভিন্ন মুকুটের উচ্চতাব যে-সকল মাপ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মুকুটের ছাদেব উপরে যে অনঙ্গার ও শিখামণি নামক চূড়া থাকে তাহার উচ্চতা বাদে ধরিতে হইবে।

কিরীট-মুকুটের আকার বেণুর্কণ অর্থাৎ বাশের পাতার কঁড়ি মতন, কেশবক্ষ মুকুটের আকার ত্রণুষ অর্থাৎ শশাব মতন; শিরশ্বক, জলবুধুদেব মতন; ধাম্বল, লতার মতন; এবং অনঙ্গ-চূড়ক, মাথার ব্রহ্মতালুর উপরে চূড়ার আকারে রাখা যোপা।



সিংহলের ক্রীট-মুকুট

কিরীট-মুকুটের গায়ে যে সমস্ত নকশা ও বাদবায়্য কবিত্তে হইবে তাহারও নাম এইরূপ নির্দিষ্ট আছে—পুথিত, ভুঙ্গ-তার, অগ্র-পট, ত্রি-বেদিক ত্রি-বেত্রক, পদ্ম, কুটিল এবং শিখামণি, পুথিত ওতহ ক্রে মবদেব মৃতি এবং মধ্যে ৮ উচ্চ রত্নবন্ধ অর্থাৎ মণিধতি ৮ বিবে। মকরের মুগ হইতে পত্রপুষ্পাশোভিত মুকুতলতা বাহির হইবে। কপালের

যতনানি মুকুটের মন্যে ঢুকিয়া থাকিবে সেই-পরিমাণ স্থান চওড়া ফিতার মতন হয় বলিয়া তাহার নাম পটুবন্ধ; পটুবন্ধও রত্নগঠিত হইবে। কিরীট-মুকুটের অপরাপর অংশ মোলবন্ধ, বল্লী এবং মুস্তাহার ওড়তি অলঙ্কার দ্বারা শোভিত করিতে হইবে। কপালের উপর চন্দ্রবলা এবং দুই বানের দুই পার্শ্বে পাতার মতন দুটি বর্ণপত্র সংযুক্ত কবিত্তে হইবে। মুকুটের মুখের নীচের বিন্যাসে রত্নস্বাক ওড়তি বারিতে হইবে। বর্ণপত্রের নাচে ও মাথার সহিত কানে জোড়ের ঠিক উপরে বর্ণপুষ্প থাকিবে এবং তাহা হইতে রত্ন-মণি-মুক্তা-গ্রন্থিত থু বানিবে। কিরীট মুকুট নাচে হইতে উ পর্য্যন্ত গোলাকার হইবে।

উত্তরকামিকা-আগমে ক্রীটামুকুট গঠনের প্রণালী ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কেশজটা পাঁচটি একত্র বিনাইয়া তিন অঙ্গুলী উচ্চে এক বা তিনটি ফাঁস দিয়া ক্রীটাব অগ্রভাগ চারিদিকে বুলাইয়া দিলে যেকপ দেবিত্তে হয় এই মুকুটের আকার সেইরূপ হইবে। এই মুকুটের গায়ে বতকগুলি নকশাকাটা রত্নগঠিত চন্দ্রক সংযুক্ত রাখিতে হইবে; সেই-সকল চন্দ্রকেব অবস্থান ও আকার ভেদে বিভিন্ন নাম আছে—মুকুটের সম্মুখের চন্দ্রকের নাম মকরকুট, তাহার গায়ে দশটি ছিদ্র থাকিবে; দুইপাশে যে চন্দ্রক থাকে তাহার নাম পত্রকুট; পিছনের চন্দ্রকে বলে রত্নকুট এবং তাহাদের মাঝে-মাঝে যে-সকল আলংকারিক চন্দ্রক থাকে তাহাদিগের নাম পূর্ণী বা পূরিত অর্থাৎ যাহারা ফাঁক পূরণ করে। এই মুকুটের বেড নীচের দিকে মাথার বেড়ের সমান অবস্থা হইবেই এবং উপরের দিকে হইবে দশ অঙ্গুলী।

জন্ম বা উপনাম	...	১ অংশ
তদুর্দ্ধে, অর্দ্ধকম্প	...	১/৪ অংশ
" মহাপদ্ম	...	১/৪ "
" কর্ণবৃত্ত ও পদ্মক	...	১/২ "
" কঙ্কর বা গল	...	১/২ "
" উপরি	...	১/২ "
" কম্প-বৃত্ত-দল	...	অনুল্লভ
" কম্প-পদ্ম	...	"
" কুস্ত-বৃত্ত	...	১ অংশ
" পদ্ম	...	১/২ "
" নিম্ন-বৃত্ত	...	১/২ "
" কম্প	...	১/২ "
" গল	...	২ "
" কম্প-বৃত্তক	...	১ "
" নিম্নকম্প	...	অনুল্লভ
" কপোত	...	"
" আলিঙ্গ	...	"
" অন্তরিত ও প্রতিবাদন	...	১ অংশ

মোট ২২ অংশ

বৃত্তকম্পগুলি এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যেন পরস্পরে সামঞ্জস্য ও মিল থাকে। প্রত্যেক অবয়বকে পত্র, পুষ্প এবং পশুপক্ষী ও ব্যালমূর্তির দ্বারা সুসজ্জিত করিতে হইবে। দুই প্রান্তে বিপবীত মুখে দুইটি মকর-মুখ সংযুক্ত থাকিবে। কপোত নামক অবয়বে অনেকগুলি নাসিকা সংযুক্ত থাকিবে এবং নাসিকাগুলিতে কর্ণবৃত্তক অর্থাৎ মল্লয়া প্রভৃতির মুখ অঙ্কিত থাকিবে। সিংহাসনের চারকোণে পল্লব পত্র অঙ্কিত হইবে। কপোত, মহাপদ্ম প্রভৃতি অঙ্গে কেশরদলযুক্ত পদ্ম অঙ্কিত হইবে; বৃত্তকুস্ত বা কুমুদ নামক অঙ্কে কটক এবং পট্ট প্রভৃতি অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত করিতে হইবে। গল নামক অঙ্গ সিংহাসন-নিখাতার ইচ্ছা অনুসারে দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অনামঞ্জস্য হইয়া দেখিতে

অস্বন্দর না হয়, গলপ্রদেশকে প্রকৃত জীবনের ঘটনা-বলীর দ্বারা এবং যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও বিদ্যাধর প্রভৃতির মূর্তির দ্বারা ও বিবিধ-প্রকারের পট্ট দ্বারা পরিভূষিত করিতে হইবে। এইরূপ অলঙ্কার-ভূষিত সিংহাসনের নাম পদ্মাসন।

যদি পদ্মাসনের নীচে আর-একটি উপপীঠ থাকে তবে সেই সিংহাসনকে পদ্মকেশর বলে। উপপীঠের গঠনে ক্ষুদ্রকম্প, বৃত্তকম্প, অস্ত্র-কম্প প্রভৃতি অঙ্গ সংযুক্ত করিতে হইবে। উপপীঠের গলদেশ নৃত্যপর মল্লয়া ও পক্ষীর প্রতিকৃতি এবং ক্ষুদ্র-শলা নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকাণ্ডের দ্বারা ভূষিত করিতে হইবে এবং পল্লব নামক অঙ্গের নিম্নে তোরণ সংযুক্ত থাকিবে। এই সিংহাসন সকল দেবতা এবং চক্রবর্তী রাজাদিগের বসিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে।

পদ্ম-ভদ্র নামক সিংহাসনের অঙ্গসংস্থান এইরূপ—

জন্ম বা উপনাম	...	১ অংশ
তদুর্দ্ধে, ক্ষেপণ	...	১/৪ "
" অম্বুজ	...	১/৪ "
" নিম্ন বৃত্ত নিম্ন জ্ঞান-কম্প	...	১ "
" বপ্রভুজ	...	৫ "
" হর্ম্যাবৃত্ত পদ্ম বৃত্তক	...	১ "
" পদ্ম কুমুদ বৃত্ত	...	অনুল্লভ
" হর্ম্যাবৃত্ত পদ্ম কম্প	...	১ অংশ
" কর্ণ কম্প পদ্ম বৃত্ত	...	৩ "
" কপোত	...	২

"	আলিঙ্গ	}	...	১	অংশ
"	অন্তরিত				
"	প্রতি (বাজ বা শরপক্ষ)				
"	কম্প		...		
মোট অংশ					২১

অধিরাজ-উপাধিধারী রাজারা এই পদ্ম-ভদ্র সিংহাসনে
বসিবার অধিকারী।

শ্রীভদ্র নামক সিংহাসনে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি থাকা
উচিত—

জয় বা উপনায়	...	১	অংশ
তদুর্দ্ধে বাজন বা শরপক্ষ	...	২	"
" ক্ষুদ্র-বেত্রক	...	১	"
" মহাশুভ্র	...	২	"
" নিম্ন	...	২	"
" পদ্ম	...	২	"
" কুমুদ	...	২	"
" অশুভ্র	...	২	"
" উর্দ্ধকম্প	...	২	"
" গল	...	৩	"
" কম্প-পদ্ম	...	১	"
" কপোতক	...	২	"
আলিঙ্গনান্তরিত	}	...	১
প্রতিবাজন			

এই আসন অধিরাজ এবং নরেন্দ্রদিগের বসিবার জন্ত।
রাসনেরও প্রত্যেক অঙ্গ বিবিধ কারুকার্যের দ্বারা
যিত করিতে হইবে।

বিশাল নামক সিংহাসনের অঙ্গসম্মিলন এইরূপে
হইবে—

জয়	...	২	অংশ
পদ্ম	...	১	"
বৃন্ত বেত্রক	...	২	"
অগ্রকম্প	...	২	"

" বৃন্তক	...	২	অংশ
" গল	...	৩	"
" বৃদ্ধি	...	২	"
" উপরিপক্ষ	...	২	"
" বৃদ্ধি	...	২	"
" দল	...	২	"
" মধ্যবৃন্ত	...	১	"
" পদ্ম	...	২	"
" আবৃত বেত্রক	...	২	"
" অগ্রপট্ট	...	অনুলেখ	
" গল	...	৩	অংশ
" অগ্রপট্ট	...	অনুলেখ	
" বৃন্ত-বেত্রক	...	"	
" উর্দ্ধপদ্ম	...	"	
" বাজন	...	১	অংশ
" অগ্রবৃন্ত	...	অনুলেখ	

মোট অংশ ২২

এই আসন পার্শ্বিক-উপাধিধারীদিগের বসিবার জন্ত।
ইহার উর্দ্ধগলপ্রদেশ পত্র পুষ্প বক্ষ ইত্যাদির প্রতিকৃতি
দ্বারা এবং নিম্নগলপ্রদেশ সিংহ প্রভৃতি জন্তর প্রতিকৃতি ও
পত্রবল্লীর দ্বারা ভূষিত থাকিবে।

উপরে বর্ণিত শ্রীবিশাল নামক সিংহাসনের মধ্যে বৃন্ত-
নির্গম বগ্ন-মধ্য প্রভৃতি অঙ্গ সন্নিবিষ্ট করিয়া কারুকার্যের
অল্প স্বল্প পরিবর্তন করিলেই শ্রীসংজ্ঞ বা শ্রীবজ্ঞ নামক
সিংহাসন প্রস্তুত হয়। তাহা পট্টবরদিগের ব্যবহার্য।

এ সিংহাসনে এক অংশ চওড়া একটি অগ্রপট্টিকা
মধ্যবৃন্ত নামক অবয়বের অঙ্গে সংযুক্ত করিলেই তাহার নাম
হইবে শ্রীমুখ। সেই আসনে মণ্ডলেশ-শ্রেণীর ভূষামীর
বসিতে পারেন।

এ সিংহাসনে যদি মূলভাগ ও অগ্রবৃন্ত এবং অশুভ্র সংযুক্ত
করা না হয় তাহা হইলে তাহার নাম হয় ভদ্রাসন।
পট্টভাকেরা এই আসনে বসিবার অধিকারী।

এ আসনে জনোপরি অঙ্গের উপরে দুই অংশ চওড়া

অমুজ সংযুক্ত করিলে তাহাকে পদ্ম-বন্ধ বলে এবং তাহাতে প্রাহারকেরা বসিতে পারেন।

পদবন্ধ নামক সিংহাসনের অঙ্গসংস্থান এইরূপ—

জন্ম	...	২ অংশ
তদুর্দ্ধে পদ	...	৩ "
" কম্প	...	১ "
" বপ্র	...	৮ "
" পদ	...	১ "
" কর্ণ বা কণ্ঠ বা বন্ধাংশ	...	৩ "
" কম্প	...	১ "
" কপোত	...	৮ "
" আলিঙ্গ	...	২ "
" বৃন্ত-বেত্রক	...	১ "

মোট অংশ ৩০

এই সিংহাসনের কর্ণ বা কণ্ঠদেশ সিংহ ব্যাল প্রভৃতির প্রতিকৃতি এবং পুষ্প-পত্রের দ্বারা ভূষিত করিতে হয়। এই সিংহাসনে অস্ত্রগ্রাহী রাজারা বসিতে পারেন।

সিংহাসনের পশ্চাতে থিলানের মতন আকারের ঠৈসান—
দিবার যে অংশ থাকে তাহার পারিভাষিক নাম তোরণ। এই তোরণ বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার, ত্রিভুজাকার, ধনুকাকার, বৃত্তাভাসেব আকার অথবা অন্য যে-কোনো আকারের হইতে পারে। আলঙ্কারিক ভূষণের তারতম্য অনুসারে তোরণ চতুর্বিধ। যে তোরণ লতা-পত্রের দ্বারা বিভূষিত হয় তাহাব নাম পত্রতোরণ; যাহাতে পুষ্প খচিত থাকে তাহার নাম পুষ্পতোরণ; যাহাতে রত্নমণি খচিত করা হয় তাহাব নাম রত্নতোরণ; এবং যাহাতে উপরোক্ত সর্ব-প্রকারের অলঙ্কার এবং যক্ষ বিদ্যাধর প্রভৃতির মূর্তি সংযুক্ত থাকে তাহাকে চিত্রতোরণ বলে। প্রত্যেক তোরণের মধ্যস্থলে গন্ধর্বগায়ক তুণ্ডক ও স্বর্গগায়ক নারদ ঋষির মূর্তি খোদিত করিতে হয়। তোরণের দুই পার্শ্বে নীচের দিকে দুইটি মকরমুখ সন্নিবেশিত থাকিবে এবং তাহাদের মুখ হইতেই যেন তোষণ নির্গত হইয়াছে এইরূপ ভাবে তোরণ নির্মাণ করিতে হইবে। মকরকিম্বর প্রভৃতির মূর্তির অঙ্গে মণিরত্ন খচিত করিতে হইবে। তোরণেব শীর্ষদেশের

মধ্যস্থলে দুই পার্শ্বে দুই হস্তীর দ্বারা সংরক্ষিত লক্ষ্মীমূর্তি সংলগ্ন করা যাইতে পারে। লক্ষ্মীর মূর্তিকে সর্বপ্রকার রত্ন ও অলঙ্কারে পরিভূষিত করিতে হইবে।

তোরণের পরিমাণ এইরূপ—

পদ বা স্তম্ভের উচ্চতা ৫ বা ৬ বা ৭ অংশ

তোরণেব উচ্চতা ৩ অংশ

সিংহাসন ও তোরণের সকল অঙ্গের নাম ও পরিমাণ

যে সম্পূর্ণ বা সহজবোধ্য এমন কথা বলা যায় না। পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থও কোনো শাস্ত্রে কোথাও ব্যাখ্যা করা নাই। যে-সকল শিল্পী সিংহাসন গঠন করে তাহাবা পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত ও ধারাগত আদর্শ অনুসারে গঠন করিয়া থাকে, তাহারাও কোন অঙ্গের কি নাম তাহা ঠিক কথিয়া বলিতে পারে না। প্রচলিত সিংহাসনের বহুনার সহিত শাস্ত্র-নির্দিষ্ট অঙ্গসংস্থান ও পরিমাণ মিলাইয়া পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ এইরূপ বলিয়া মনে হয়—

জন্ম—সিংহাসনের ভিত্তিভূমি বা যেখান হইতে সিংহাসনের জন্ম বা উদ্ভব হইয়াছে।

উপনাম—আগমন অর্থাৎ দেখান হইতে সিংহাসন উপরেব দিকে উঠিতে আরম্ভ করে।

পদ }
মহাপদ } —পদের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও বিকশিত অবস্থার
অমুজ } বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য পৃথক পৃথক পারিভাষিক
মহামুজ } শব্দ।

কুমুদ—কুমুদপুষ্পের আকৃতি।

কর্ণবৃত্ত—কর্ণ বোধ হয় তাহাই, বাংলায় যাহাকে কড়া বলে বাংলার প্রতিমার কানের কাছেই মুকুটের সঙ্গে কড়া চৌদানি (বৃত্তাকার মাকড়ী) সংলগ্ন করা প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। অতএব কর্ণবৃত্ত সেইরূপ কোনো অলঙ্কার হওয়া সম্ভব।

কম্প—কম্পিত রেখা-বিন্যাস।

বৃন্ত, বৃন্তক প্রভৃতি—গোলাকার রেখাবিন্যাস। যে একটু উচু করিয়া তোলা থা (Relief), তাহাকে উপরি-বৃন্ত, যাহা গোল কোটার যত থা থাকে তাহাকেই নিম্নবৃন্ত বলে বর্ধা অনুমান হয়।

আলিঙ্গ—এক নম্রার সহিত অপর নম্রার সংযোগ। এক
বৃত্তের কেন্দ্র দিয়া অপর বৃত্তের পরিধি টানিয়া
বৃত্ত-শৃঙ্খল।

অন্তরিত—ছাড়া-ছাড়া।

আলিঙ্গান্তরিত—কোথাও সংযুক্ত কোথাও বিচ্ছিন্ন।

প্রতিবাদন—বিপরীত বা বিরুদ্ধ ভাবে সংস্থিত।

বাঁহ—শরপক্ষ বা শরের গায়ে সংযুক্ত পক্ষের পুচ্ছ সদৃশ
রেখা অর্থাৎ গায়ে গায়ে খুব ঘোঁষাঘোঁষি কোণাকৃতি
রেখা-বিশ্রাস।

নিম্ন—গর্ভ করিয়া খোদা রেখা বা বৃত্ত প্রভৃতি।

উপরি বা উর্দ্ধ—রেখা বৃত্ত বা আসল নম্রাটি উচু কবিয়া
রাখিয়া তাহার পাশ খুদিয়া ফেলা (relief)।

উর্দ্ধকম্প—উচ্চ করিয়া খোদিত কম্পিত রেখা।

নিম্নকম্প—গর্ভ বা খাল করিয়া খোদিত কম্পিত রেখা। *

চাক্র বন্ধ্যোপাধ্যায়।

অবোধ

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

ভাল কাপড় ফেলে কেন

শাদা কাপড় পরলে হেন,

হাতের শাখা মাথার সীঁদুর কোথায় গেল চ'লে,

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

আদর ক'রে কোলে তুলে

বাবার কথা কওনা তুলে,

ভরা তোমার চক্ষু ছুটি সব সময়ে জ্বলে,

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

বলছি তোমায় এত ক'রে .

কথার জবাব দাওনা মোরে,

এক দৃষ্টে চাইছি শুধু চক্ষু ছলছলে,

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

লুকিয়ে বাবার ছবিখানি

কেন দেখ নাহি জানি,

আর কেন মা কেঁদে কেঁদে ডেজাও তাহা জ্বলে,

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

রাতের বেলা ঘুমোও নাকো

আপন মনে কাঁদতে থাকো,

আমারে আর পাড়াও না ঘুম “ঘুম-পাড়ানি” ব'লে,

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

বকেছে কি বাবা তোমায়

রাগ করেছ, কাঁদছ কি তাই?

চুপ্ কর মা, ক্ষমা চাইবে এসে নয়ন জ্বলে,

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

বাবার দেখা অনেক দিনই

পাইনি; কোথায় গেছেন তিনি,

রাগ করে' কি? আনব খুঁজে যেথায় যান না চলে,

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

মালদহ

শ্রীনন্দলাল দত্ত।

* মডার্ন-রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাওএর
খিত Kings Crowns and Thrones in Ancient and
edieval India, with Pen and Ink Sketches নামক
ক অবলম্বনে রচিত।

কষ্টিপাথর

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্তক কে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্তন স্যার আন্তোণিয়ারাই হইয়াছে, এই কথা কতদূর বিচার সহ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে ১৮৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা বি-এ পরীক্ষায় পাঠ্য ছিল—বি-এতে পুস্তকপত্রিকা, প্রবোধচলিতকা, বত্রিশ-সিংহাসন, কান্দীদাসী মহাভারত, কুন্তিবাসী রানায়ণ ইত্যাদি গদ্য-পদ্য, নাটিকা এবং ব্যাকরণও ছিল। তৎপরে ১৮৬১ হইতে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত পুস্তক-পরীক্ষার্থীর জন্য এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ব্যতীত অস্ত্রান্ত পরীক্ষায় বাঙ্গালা উঠিয়া গেল। এণ্ট্রান্স সংস্কৃতের সঙ্গে ও একটা ইংরেজীতে বাঙ্গালা অনুবাদের পরীক্ষা গৃহীত হইত।

১৮৮৫ হইতে পরীক্ষা-প্রণালীর অনেক পরিবর্তন ঘটে—কিন্তু বাঙ্গালা তেমনই থাকিয়া গেল। কেবল ১৮৮৬ অব্দ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অনুবাদের সঙ্গে বাঙ্গালা রচনা লিখিবার প্রথা প্রবর্তিত হইল।

১৮৯১ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার ঐযুক্ত ওরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"I also deem it not merely desirable but necessary that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worth study. * * * In laying stress upon the vernaculars, I am not led by any mere patriotic sentiment excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation unless knowledge is disseminated through our own vernaculars."

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবেশ অথবা পুনঃপ্রবেশ-ব্যাপারের শুভ স্বস্তিবাচন করিয়াই স্যার ওরুদাস ক্ষান্ত হইলেন না। অল্পদিন পরে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সংস্থাপিত হইল, পরিষদের ১৩০১ সালের ১১ই ভাদ্র (১৮৯৪ অব্দের ২৬শে আগষ্ট) তারিখের অধিবেশনে ঐযুক্ত হোরেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহোদয়দের পত্রানুসারে পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপিত হইল যে, প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীগণের পণিত ভূগোল ও ইতিহাসের পরীক্ষা তাহাদের মাতৃভাষায় গৃহীত হউক; এক-এ, বি-এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা অত্রুতি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক। এই প্রস্তাব উপলক্ষে তর্কবিতর্ক হইয়া "অবশেষে স্থির হইল যে, নাননীয় ঐযুক্ত ওরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐযুক্ত হোরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, ঐযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও ঐযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়দিগকে অনুরোধ করা হউক যে তাঁহারা এ বিষয়ের অল্পকাল অতিকূল পক্ষ প্রদর্শনপূর্বক একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত করুন। করিলে পরিষদ তৎসময়ে যাহা কর্তব্য বোধ করেন, তাহা করিবেন।" (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, প্রথম ভাগ—২য় সংখ্যা, ১২২ পৃষ্ঠা।)

এই কমিটি একটি সাহিত্য-পত্র শিক্ষানুরাগী প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেখিয়া প্রায় ২০ জনের নিকটে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের উত্তর

পাইয়া একটি রিপোর্ট পরিষদের সাধারণতঃ নিকটে দাখিল করেন। (পরিষদ-পত্রিকা দ্বিতীয় ভাগ, ২য় সংখ্যার পরিশিষ্ট।) উক্ত রিপোর্টে ১৩০২ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হইয়া স্থির হইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট-সমীপে পত্র লেখা হইবে—এবং সেই পত্রের মোদাফিরা করিবার ভার স্যার ওরুদাস গ্রহণ করিবেন।

১৮৯৫ অব্দের ৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সেই চিঠি (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ—৩য় সংখ্যা ৩৯৯ পৃষ্ঠা) বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃত্তার নিকটে প্রেরিত হইল।

পরবর্তী বর্ষের মার্চ মাসে ফেব্রুয়ারি অব্দের আটনব্বইর অধিবেশনে স্যার ওরুদাস ঐ অধিবেশন-পত্র পেশ করেন, এবং বহু আলোচনার পরে এতদ্বিষয়ে কর্তব্য-নির্দ্ধারণ-কালে একটি কমিটি গঠিত হয়, তাহাতেও স্যার ওরুদাস বলেন। স্যার আন্তোণিয়ারাই কমিটিতে ছিলেন। তখন তিনি যে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন এমনকি পাওয়া যায় নাই। উপরিউক্ত ফেব্রুয়ারি ১২ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন—তাহাতে স্যার ওরুদাসের নাম সন্ধান দৃষ্ট হয়। আবার স্যার ওরুদাসেরই প্রস্তাবে এবং স্বর্গীয় নীলমণি বসু-পাধ্যায় মহোদয়ের সমর্থনে উহা পরিগৃহীত হয়। অবশেষে ১৮৯৭ সালের ফ্রান্সিস মাসে সেনেট সভাতে রায় ঐযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং স্যার ওরুদাসের সমর্থনে এই নিকারিত হয় যে, এক-এ, ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার রচনা-পরীক্ষা গৃহীত হইবে, কিন্তু উহাতে উত্তীর্ণ না হইলেও কাহারও এক-এ, বি-এ, পাশের ব্যাধাত হইবে না—উত্তীর্ণ হইলে সার্টিফিকেটে তাহা উল্লেখিত হইবে।

লড কর্জনের আনলে যে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশন গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে স্যার ওরুদাস সভ্য ছিলেন। এই কমিশন যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে আছে:—

"The vernacular languages should be introduced (as at Bombay) in combination with English as a subject for M. A. Examination. The M. A. Examination in the vernacular should be of such a character as to ensure a thorough and scholarly study of the subject. The encouragement of such study by graduates who have completed their general course should be of great advantage for the promotion and development of vernacular languages. We hope that the inclusion of vernacular languages in the M. A. course will give an impetus to their scholarly study * * *. We also think that vernacular composition should be made compulsory in every subject of the B. A. course although there need be no teaching of the subject."

ইহাতে স্যার ওরুদাসের হাত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। স্যার আন্তোণিয়ারাই কমিশনের যে-সকল অধিবেশন বাঙ্গালা প্রদেশে হ তাহাতে "লোকল ঘেষর" স্বরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু রিপোর্টে ইহা হাত ছিল না।

এই কমিশনের রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট অব্দের ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে পাঠ্য হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি সার্ভিসেও ইহা পাঠ্য হইয়াছিল। এই অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "নিউ রেজেন্সনস্" ক অন্তঃসার আন্তোণিয়ারাই রেজেন্সনস্‌গণের ভূমিত্ব হইতে হইতে কিন্তু নুতন বিবানে বাঙ্গালা ভাষা যে-ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তাহা

শ্রাব খণ্ডেই যে উদ্ভাবিত নতুন কিং আছে বলিয়া তে' দেখা যাই-
তেছে না। তিনি ভাটস্‌চ্যানসেনাবাণে স্থলীকাল বিখ্যাতলাবে
সর্বদয় কতৃৎ কবিযাচেন, এবং এখনও অশ্রুতঃ বাঙ্গাল-পাঠাদিবিষয়ে
উহার যথেষ্ট কতৃৎ আছে। যদি তিনি বঙ্গভাষায় পূর্বের মত গদ্য-
পদ্য সাহিত্য ও ব্যাকরণ পাঠ্য করিতে পারিতেন, যদি বেশিভান,
প্রত্যেক কলেজে ইংরেজী এবং সত্ত্বের আর বঙ্গভাষারও সাহিত্যাদির
অধ্যাপনা হইতহে, তবে সব স্বনামভরিত কটাকার প্রশংসা-বাক্যের
অনুমোদন করিতাম। স্ব' রীতাব নিম্নোণে এবং বচন-রীতির অদর্শ
বলিয়া বাঙ্গালী পুস্তক নিলাসনে তিনি গণ্যোচিত বিতরণতা ও
নিবপেকতা দেখাইতে না পারিয়া অশ্রুতঃপাবই ভাজন হইয়াছেন।
(নব্যভারত, মাঘ) শ্রীশ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য, বিনাখিনোদ, এম-এ।

* * *

কাঁটাল।

আপনার অনেক রকম ফুল দেখিয়াছেন,—কিন্তু কাঁটালের ফুল
দেখিয়াছেন কি ?

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন কোনও ফুল
অকুটপ্ত অবস্থায় থাকে তখন সবুজ রংয়ের একটা 'বাগ' দিয়া যেন
ফুলটার আগাগোড়া মোড়া থাকে। ঐ বাগটাকে ইংরেজীতে কেলিয়া
(Calyx) বলে; বাঙ্গালীয় উচ্চার অর্থ বহিদল। ফুল ফুটবার সময়
ঐ 'বাগটি' ফাটিয়া যায়, আর তাহাব মধ্যে হইতে নানা বর্ণের চাকচিক্য-
ময় ফুল বাহির হইয়া আসে। ইহাই ফুল ফোটানোর মোটামুটি
ইতিহাস।

ফুলের ছবকম ছাতি আছে—'গ্রীভাতী' ফুল' আর 'পুরুষজাতীয়
ফুল'। গ্রীভাতী ফুলকে আমরা 'গ্রীপুষ্প' এবং পুরুষ ফুলকে 'পুংপুষ্প'
বলিব। বাঙ্গালী ভাষায় যাহাকে আমরা পরাগ বা পুংপুষ্প বলি
তাঁহা পুংপুষ্পই ব্রাহ্মণ। ইংরেজীতে এই পরাগকে পোলেন
(Pollen) বলে। গ্রীপুষ্পের বিশেষত্ব এই যে, ইহার বীজাধার বা
ওভারি (Ovary) আর পরাগগ্রন্থি স্থান (Stigma) আছে, কিন্তু পরাগ-
কোষ (Anther) নাই, হুতরাং পরাগও (Pollen) নাই। ওভারি
শব্দেব প্রকৃত অর্থ যদিও ব্রাহ্মণ নয়, তথাপি উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞগণ
তরাগু শব্দ ওভারি (ovary) অর্থেই ব্যবহার করেন। যাহার মধ্যে সন্ধান
অগ্রগ্রন্থি করে তাহাই ব্রাহ্মণ। ফুলের জরাগুর আকৃতি অধিকাংশ-
ফুলেই ঠিক খাবার স্নান রাখিবার "কঁজোরা" মত, তবে অস্ত্র ছোট,
ঐ যা প্রভেদ। কঁজোরা অগ্রভাগটা যেরকম লম্বা আর ফাঁপা,
ফুলের জরাগুর অগ্রভাগটাও সেই-রকম লম্বা আর প্রায় ফাঁপা এবং ঐ
লম্বা প্রায়-ফাঁপা অগ্রভাগের উর্দ্ধপ্রান্তকেই ষ্টিগ্মা (Stigma) বলে।

ফুলের যৌবনকাল আগত হইলে ষ্টিগ্মার অগ্রভাগটি সরস
হইয়া উঠে। মধুলক রূপময় মধুমক্ষিকা বা অস্ত্রাক্ত কীট পতঙ্গ যখন
পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমনাগমন করে তখন তাহাদের অস্ত্রাক্ত
পুংপুষ্পের পরাগ, পরিপুষ্পে পুংপুষ্পব সরস ষ্টিগ্মার উপর লিপ্ত হইয়া
যায়। পরে ঐ পরাগ নিজ দেহ বৃত্তি করিয়া বর্জিত দেহভাগ সেখান
হইতে ষ্টিগ্মার হ্রদপথে ওভারি বা জরাগুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়
এবং তথায় (জরাগুর-মধ্যে) পুষ্পপরাগ ও বীজকোষ পরস্পর মিলিত
হইয়া সন্তানকণ্ঠে পরিবর্তিত হয়। ইহাই ফুলের সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত
যৌবনকথা। এ ছাড়া বায়ু-চালিত পরাগসহবন্দে গর্ভধারণও ফুলের
মধ্যে বিরল নয়।

'ফুল ফল' Inflorescence অর্থাৎ পুষ্পগ্রন্থি। কাঁটালও
সমাবস্থায় একটা Inflorescence অর্থাৎ "পুষ্পগ্রন্থি"।

প্রায় সকল ফুলই সবুজরংয়ের কেলিন্দু নামক পুষ্পাবরণটাকে ছিন্ন
করিয়া আপনাপন দৌলধর্ম্য মণ্ডিত দেহ লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু
কাঁটালের ভাগো আর সে মুক্তিচুত্ব ঘটে না। কেলিন্দু এখনো কাঁটালের
অগ্রিমদণ্ডা পর্যন্ত ছিন্ন হয় না। কাঁটালের বহির্ভাগে কণ্টকাকৃত
বর্ধসদৃশ যে অংশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা "কাঁটাল" নামক শুষ্ক-
পুষ্পের কেলিন্দু। অস্ত্রাক্ত-ভাগে ভীমের গদার ক্ষুদ্র সংকরণের জায়
যেদও দেখিতে পাওয়া যায় সেটা আমাদের পূর্বপরিচিত শুষ্কপুষ্পের
কাণ্ডগু (Richis) (বাংলা নাম ভুত)। কাঁটালের ভিতর পাতার
মত মে-সব জিনিস (বাংলা নাম চ'পা) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা
যুনের পাপড়ি, আর কাঁটালের যে-সমস্ত কোষ (কোষ)—যেগুলিকে
আমরা পরম পরিতোষ-সহকারে ভোজন করি—তাহা কাঁটাল নামক
শুষ্ক পুষ্পের জরাগু। এই জরাগুর মধ্যে আমবা কাঁটালের ভবিষ্যৎ-
বংশবরকে বীজরূপে দেখতে পাই। কাঁটালের গর্ভাধান মক্ষিকা দ্বারা হয়
না—কাঁটালের সহজাত পরাগ সহবাসে গর্ভাধান হয়।

(বিজ্ঞান, ডিসেম্বর)

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ সাহা।

পঞ্চশস্য

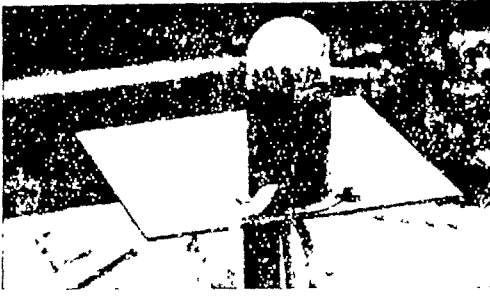
সূর্যের শক্তিপরীক্ষা—

পৃথিবীতে আমরা নিত্য যত শক্তিশীলা দেখিতে পাই, সে
সমস্তই সূর্য হইতে আইসে। কিন্তু তাহার অতি অল্প অংশই
আমরা কাজে লাগাইতে পারি। বৃক্ষলতা এই শক্তির কিয়দংশ
নিজ নিজ শরীরে সঞ্চিত করিয় রাখে এবং অবশিষ্টাংশ মহাগুণে
বিকীর্ণ হইয়া যায়। আজ আমরা যে পাতৃরিখা করলা জ্বালিয়া
কল, কারনান, মাড়ী প্রভৃতি চালান তাহা শত শত বৎসর পূর্বে
সঞ্চিত সূর্যশক্তির নগণ্য অংশমাত্র। এখন আমরা পুঁজি ভাঙ্গিয়া
খাইতেছি, কারণ বর্তমানে পাতৃরে করলার স্রষ্ট হইতেছে না বলিলেই
হয়। ফলে একদিন নিশ্চয়ই আমরা দেউলিয়া হইয়া পড়িব, অথচ
বর্তমানে আমাদের চারিদিকে স্বাভাব্যে অচূব শক্তি অথবা নষ্ট
হইতেছে।

এই বিরাট শক্তিকে কাজে লাগানো যায় কিনা তাহাই স্থির
করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আবহ-সমিতি রোজের উদ্ভাপ
ও শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকট কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছেন।
আবহের সঙ্গে সূর্যতাপের সন্ধি স্থির করাও ইহার অন্ততম উদ্দেশ্য।

এই যন্ত্রগুলির মধ্যে রৌদ্রমাত্র (Pyrehuometer) অন্যতম।
এই রৌদ্রমাত্র যন্ত্রটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম রৌদ্রমাত্রিক, এই
অংশটি ছাদের উপর রোজে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইম্পাতের বাক
খাঁটা একটি ছোট কাঁচগোলাকর মধ্যে সমান-মোট গাটিনাম-তারের
জড়ানো চারিটি বর্ণাকৃতি অস্ত্রও থাকে। চারিটি বস্তুর মধ্যে দুটি
বস্তুর গায়ে কালো এনামেল মাখাইয়া একটি শালা একটি কালো এমনি
করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হয়। অস্ত্রও-বরা গাটিনাম-তারগুলি বিদ্যুৎ-
বাহী তার দিয়া নীচে অপর একটি যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে।

শালা জিনিসের চেয়ে কালো জিনিসের তাপশোষণ-ক্ষমতা বেশী।
হুতরাং রোজে রাখিলে রৌদ্রমাত্রিক যন্ত্রের কালো অস্ত্রগুলি শালা
বস্ত্রগুলির চেয়ে বেশী উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের



রৌদ্রমানের এক অংশ, যাহা রৌদ্রে থাকিয়া
রৌদ্রশক্তি শোষণ করে।

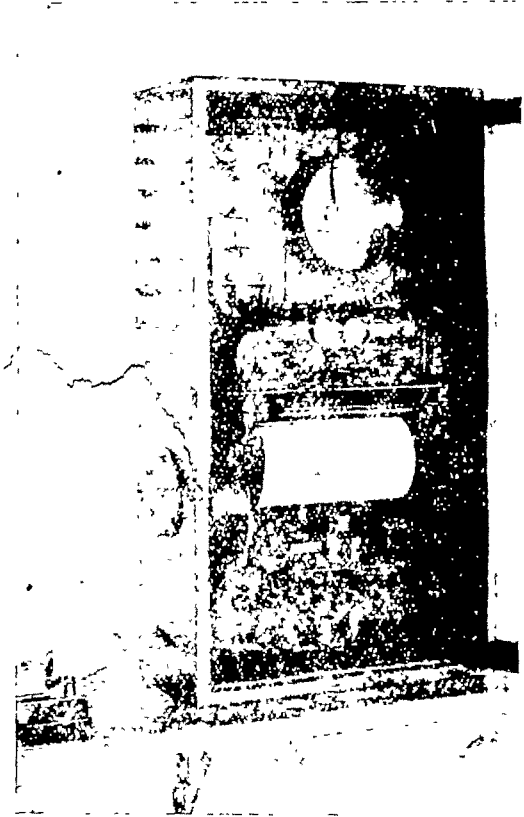
পরিবেষ্টক কালো প্লাটিনাম-তারও শাদা তাবের চেয়ে বেশী উষ্ণ হয়। আবার শীতল বস্তুর চেয়ে উষ্ণ বস্তু বৈদ্যুতিক প্রবাহকে বেশী বাধা দেয়, ফলে শাদা তারগুলির ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ যত সহজে যাইতে পারে, কালো তারগুলির ভিতর দিয়া তত সহজে যাইতে পারে না। একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এই বৈষম্য একটা মোটা চোদ্দের গায়ে জড়ানো কাগজের উপর চোটতোলা রেখা দ্বারা লিখিত হয়। এই রেখা দেখিয়াই যন্ত্রচালক বলিয়া দিতে পারেন সেই দিবসে সূর্য্যদেব কতটুকু স্থানে কতটুকু তাপ দিলেন।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে এক বর্গগজ পরিমিত স্থানে প্রত্যহ গড়ে এক অশ্বশক্তির সমান সূর্য্যকিরণ পড়ে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে একটা শহরের একটা পাড়ার পরিমাণকল ১০,০০০ বর্গগজ, তাহা হইলে প্রত্যেক পাড়ায় প্রত্যহ ১০,০০০ অশ্বশক্তি অনর্থক নষ্ট হইতেছে। যদি এই শক্তি কাজে লাগানো যাইত, তবে প্রত্যেক পাড়ায় ১০০ ঘর গৃহস্থ থাকিলেও তাহাদের আলো, জল, পাখা, রীবাবাড়া ইহাতেই চলিতে পারিত।

এই যন্ত্রটি প্রায় ২ বৎসর পূর্বে যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেন্ট ব্যবহারে লাগান। তখন একবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পর সকলে বলিতে থাকে যে সূর্য্যের তাপ কমিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের পরিবর্তনে পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীতে কোনো পরিবর্তনের ফলে সূর্য্যের পরিবর্তন ঘটবে একথা বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তখন বৌদ্রমান বস্তুর লোকের কথার নাক্ষ্য দিল। অনুমানে ও পরীক্ষায় দেখা গেল যে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমস্ত আকাশ একপ্রকার অতীন্দ্রিয় হৃদয় ধূলিকণায় পূর্ণ হওয়ায় সূর্য্যের তাপ কম বোধ হইতেছিল।

এই যন্ত্রটি কৃষি-বিশাগেও কাজে লাগিতেছে। গাছ কত জল শোষণ করিতে পারে, এবং শস্য কতটা উন্মত্তে পুষ্ট হইয়া থাকিয়া ওঠে, এই সমস্ত স্থির করিবার জন্য রৌদ্রমানের সাহায্য আবশ্যক হইতেছে।

আতঙ্গী কাছে সূর্য্যতাপ কেন্দ্রীভূত করিয়া আফ্রিকার একবার ছোট একটা এঞ্জিন চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এলাহাবাদ প্রদর্শনীতেও রৌদ্রে ভাত রান্না করা দেখানো হইয়াছিল। কিন্তু এ সমস্ত শুধু বৈজ্ঞানিকের পুতুল খেলা মাত্র—ব্যবসাদারী হিসাবে (on a commercial scale) ইহা এখনো সফলতা লাভ করে নাই। ফ্রান্সলিন প্রথমে আকাশের তড়িৎ দিবা ঘটা বাজাইয়া দেখান যে তাহাকে দিয়া কাজ করানো যাইতে পারে। পরে ব্যার'ডের আবিষ্কারে এখন বিদ্যুৎ-সাহায্যে অনেক কাজই হইতেছে। তেমনি অশা করা যায় যে বিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সলিন-ব্যার'ডের চেষ্টায় ভবিষ্যতে সূর্য্য-

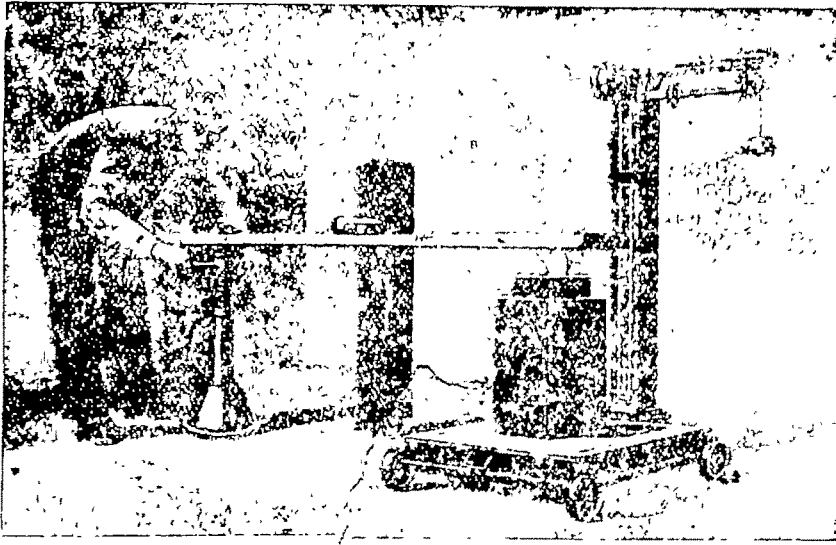


রৌদ্রমানের অপর অংশ যাহা দূরে থাকিয়া বৌদ্রশক্তি
লিপিয়া নির্ণয় করে।

তাপেই সব কল কারখানা, রেল স্ট্রিমার প্রভৃতি চালানো সম্ভব হইবে।

ডিম্বের দৃঢ়তা—

একটি টাটকা ডিম হাতের মধ্যে লম্বালম্বি ভাবে রাখিয়া ৭.৬ ডিগ্রি চাপিয়া ভাজিতে পারেন এমন কেহই নাই—তা' তিনি ৭.৩ ডিগ্রি জোয়ানই হউন। এই দৃঢ়তা সম্প্রতি আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হইয়াছে। রেল-স্টেশনে যেমন মাণিকার দাঁড়ি থাকে তেমনি একটা দাঁড়ীর বায়ের উপর এক খণ্ড কাঠের গায়ে একটা গর্ত কাটা হয়। তাহাতে ফেট আঁটিয়া একটা ডিম ঝাড়া করিয়া বসানো হয়। একটা দণ্ডের (lever) গায়েও ফেট আঁটিয়া তাহা দিয়া ডিমটিতে চাপ দেওয়া হয়। কত চাপ পড়িল তাহা মানদণ্ডে বুঝিতে পূর্ণ যাম পরীক্ষক দেখিয়াছেন যে শাদা ডিম্বের চেয়ে বাদামী রংএব ডিম্ব বেশ শক্ত। বাদামী ডিম্বগুলি গড়ে ১৫১ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দুই মণ চাপে ভাঙ্গিয়াছে। আর শাদা ডিম্বগুলি ১২২ পাউণ্ড অর্থাৎ এক মণ খে সের চাপে ভাঙ্গিয়াছে। ডিম্বের খোলাগুলি ১০১৩ হইতে ১০১৪ ই পর্যন্ত পূর্ণ। এত পাতলা গ্রিনিসের এত চাপসহতা আশ্চর্য্যজনক।



জিহ্বের দৃঢ়তা মাপিবার যন্ত্র।

অসম্ভব, কিন্তু অবস্থাবিশেষত্বের জন্তই এরূপ হয়। আমরা সকলেই দেখিতে পাই যে ছোট ছোট খিলানের উপর প্রকাণ্ড ইমারত খাড়া করা হয়। প্রকৃতি-দেবীও ভবিষ্যৎ জীবের আবাসস্থলরূপ জিহ্বের দুই দিকে দুইটি খিলান প্রস্তুত করিয়া উহাকে হৃদয় করেন।

শ্রীপ্রদুর্ভাষ্য সেনগুপ্ত।

সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া অ-সাধারণ মানুষে পরিণত হয়—

প্রতিভাবান ব্যক্তি সাধারণ নিয়ম ছাড়া একটা বাপছাড়া ব্যাপার নয়। সকল সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেই যে শক্তি নিহিত আছে তাহার ব্যবহার করিয়া তাহারা অতি সহজে কর্মদক্ষ হইয়া উঠিতে পারে। একজন পণ্ডিতের মত প্রতিভা অনেকাংশে চেষ্টার দ্বারা অর্জন করা যাইতে পারে।

আমাদের মনের মধ্যে দুই কুঠি আছে, একটির মধ্যে আমরা সম্মানে যে-সব চিন্তা করি সেইগুলি নিহিত থাকে। অপরটির সম্মুখে আমরা সচেতন নই, এবং তার মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে আপন-আপনি অনেক চিন্তা জন্মগ্রহণ করিতেছে। বাহ্যিক এই কুঠির সঞ্চিত সম্পদ বেশী করিয়া গ্রহণ করিতে পারে তাহারাই কর্মক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দাখিল করে।

প্রতিভা এমন কোনো বিস্তৃত জিনিস জন্মগ্রহণ কবে না বা সাধারণের দ্বারা প্রদত্ত হয়। কিন্তু সে উন্নতি করে এইজন্য যে তাহার মনের অজ্ঞাত কুঠির মধ্যে নিহিত শক্তি সর্বদা অতি সহজে তাহার নিকট আসিয়া পৌঁছায়।

শিশুদের শিক্ষা আত্মকাল যে-বয়সে আরম্ভ করা হয় তার চেয়েও বয়সে যদি আবৃত্ত হয়; তাহাদের সামনে যদি যথার্থ উন্নত আদর্শ পিত হয়; এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামগ্রী যদি সুনির্বাচিত হয়, তাহা হইলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেবল যে নীতির সিক দিয়া হইবে তা নয়, বুদ্ধিগতি ও মানসিকশক্তিও তাহারা প্রতিভা-

বানদের পাশে দাঁড়াইতে পারিবে। জগতে যে শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার কাব্য এ নয় যে জনসাধারণ তাহাদের দিকে বিস্ময়বিহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে—জনসাধারণ কি হইতে পারে তাহারা তাই নির্দেশ করেন।

মনেব যে একটা অজানা গোপন কুঠি আছে যেখানে আমাদের অজ্ঞাতে চিন্তার ষাট প্রত্যাহাত চলিতেছে, মন-জগৎবিশেষ তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যেখানে যে জাগ্রত অবস্থায় যে-সকল ব্যাপারের মীমাংসা হয় নাই কখনো কখনো স্বপ্নে সেগুলির মীমাংসা হইয়া গেছে। অজ্ঞানতার অনেক কঠিনতম মীমাংসা হইল না বলিয়া

ছাড়িয়া দেওয়ার পর স্বপ্নে মীমাংসিত হইয়াছে। এবং ব্যবসায় হিসাবের গরমিল বাজারি শত চেষ্টাতেও ধরিতে না পারিয়া স্বপ্নে ভুলের নির্দেশ পাইয়াছে এমনও শোনা যায়।

ঔপন্যাসিক সঙ্গীতকার ও চিত্রকরদের জীবনেও এরূপ ঘটনা অনেক ঘটয়াছে। কোলরিঞ্জের কবিতা “কুবলা বার্না” স্বপ্নের মধ্যে রচিত হয়। সঙ্গীতকার টাটিনার বিখ্যাত গৎ “The Devil's Sonata” স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনও স্বপ্নের মধ্যে কিছু-কিছু লাভ করিয়াছিলেন। রবার্ট লুই স্টীভেনসন প্রণীত *Doctor Jekyll and Mr. Hyde* এবং অস্কাট অনেকগুলি উপন্যাস ও গল্পের আদর তিনি স্বপ্নের মধ্যে পান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর কয়েকটি গল্পের ঘট স্বপ্নের মধ্যে লাভ করিয়াছেন।

কথাটা এই দাঁড়াইতেছে যে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় তাহাদের মনের অজ্ঞাত কুঠির হইতে সেই-সব প্রেরণা (inspiration) লাভ করেন যাহা হইতে সাধারণে প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে।

প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যে-সময়ে কোনো একটা বিশেষ চিন্তা করিতেছেন বা মনকে বিশ্রাম দিতেছেন, অর্থাৎ কোনো চিন্তাই করিতেছেন না, এমন সময় তাহাদের মনের উপর কোনো বিরাট চিন্তা আসিয়া পড়িয়া যুগের চিন্তাধারা পরিবর্তিত করিয়া দিল, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

অনেক শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—রচনার সময় মনে হইয়াছে যেন প্রধান ভাবগুলি এবং কখনো কখনো ভাষাও মনের মধ্যে আপনি উদ্ভূত হইয়াছে। মোজার্ট পিয়ানো বজায়েছিলেন যে তাঁর রচনাগুলি অন্যায়সে স্বপ্নের মত আসিয়া উপস্থিত হইত। রবীন্দ্রনাথ তাহার সেই অজ্ঞাত শক্তিকে জীবন-দেবতা বলিয়াছেন।

মনের গোপন কুঠিরিট যেন একটা কারখানা। সেখানে প্রত্যেকের “আমি” পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতিস্বপ্নকণ্ঠলি নাড়াচাড়া করিতেছে। এবং তাহার কলে নব-নব চিন্তাধারা উদ্ভূত হইয়া অতি সহজেই আমাদের কাছে একটা দ্বি-সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়া দিতেছে।

মৌমাছি পালন—

বহু বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মৌমাছি পালন করিয় এক লেখক পুস্টা হইতে প্রকাশিত "ভারতীয় কৃষি পত্রিকা"য় স্বীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন মৌমাছি, বিশেষ করিয়া মৌমাছির কল্লরী মৌমাছি এবং গুণে ঘণেট বিভিন্ন। তাহাদের মধ্যে কেহবা ভালো, কেহবা দরিদ্র, কেহবা কর্মক্ষম এবং যথেষ্ট উৎপাদনক্ষম, আবার কেহবা সংগ্রহ কবে কম এবং বাড়িও কম। ভালো মজুর মৌমাছি ভালো মৌচাক রচনা করে। লেখকের বাগানে একটি মৌচাক ছয় বৎসর ধরিয়া আছে, এখনো তাহাতে স্রোতের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই এবং তাহা হইতে সকল চাকের চেয়ে বেশী পারমাণে মধু পাওয়া যায়। এই-প্রকার মৌচাক হইতেই নূতন মৌমাছির উপনিবেশের স্রষ্টা রাণী সংগ্রহ করা উচিত। মৌচাকে মৌমাছি বসা বা না বসা আমাদের আয়ত্তাধীন। মৌচাক হইতে মৌমাছি কমিয়া গিয়া বাহাতে চাকের মোমে পোকা না ধরে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মৌমাছি যদি চাকের সমস্ত অংশ ঢাকিয়া না বসে, তবে যে-অংশ অনাবৃত থাকে, সেইখানে মোমে পোকা ধরে। এই পোকা বা গুটিপোকা একপ্রকার ছোট পতঙ্গের প্রথম সন্তান। ইহা ডিম হইতে বাহির হইয় মৌমাছির গুচ্ছ কক্ষগুলির মধ্যে দিয়া মোম খাইতে খাইতে অগ্রসর হয় এবং অচিরে তন্তু দ্বারা সমস্ত গুচ্ছ অংশটি ছাইয়া ফালে। একবার উহা ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে মৌমাছির আর বাধা দিতে পারে না—সমস্ত চাকটি তন্তু গুটিপোকা এবং ময়লায় ভরিয়া যায়। তখন মৌমাছির বাধা হইয়া সে চাক পরিত্যাগ করে। কোনো কারণে মৌমাছির সংখ্যা কমিয়া গেলে যখন সমস্ত কক্ষ আর ভরা থাকে না সেই অবসরে এই মোম-পতঙ্গ চাকের মধ্যে ঢুকিয়া ডিম পাড়িয়া আসে। মৌমাছির যখন কাক বাহিয়া উড়িয়া ব্যাড়াই, কিংবা শীতের প্রারম্ভে যখন অনেক মৌমাছি মরিয়া যায় সেই সময়েই একপ ঘণ্টে। এই সময় মৌমাছিপালককে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়; মৌমাছির সংখ্যা কমিতেছে বুঝিতে পারিলেই সেই অনুসারে চাক ভাঙিয়া ছোট করিয়া দিতে হয়।

মৌমাছির নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, কোনো কাপ-গাছের মধ্যে মৌমাছির দল বসিয়াছে দেখিতে পাইলে গাছের সেই অংশটি কঁরা দিয়া কাটিয়া মৌমাছি ও চাক সমেত উঠাইয়া আনা হয়। কয়েকদিন পরে মৌমাছির নূতন স্থানে অভ্যস্ত হইয়া আসিলে চাকটি কাটিয়া কাঠের ত্রিমের মধ্যে রাখা হয়। এবং তাহার মধ্যে মৌমাছিগুলোকে তাড়াইয়া আনা হয়। তার পরে যে-সব গাছে মধুর লোভে মৌমাছি আসা নতুন সেইরকম গাছের ডালে ঐ কাটা গাছের টুকরাটা আবার টাঙাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণত শীত্রই মৌমাছির একপ তৈরি বাসস্থান দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে বসবাস আরম্ভ করে। এই কাজের জন্য শুকনো নারিকেল বা তাল মাছই উৎকৃষ্ট। এই গাছগুলি পনের ইঞ্চি আঙ্গাঙ্গ লম্বা করিয়া কঁরা দিয়া কাটা হয়। ব্যাসের মাপ নয় হইতে বার ইঞ্চি থাকে। বাসস্থানটা কুঁদিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং মোটা তক্তা দিয়া দুইদিক বদ্ধ করা হয়। একদিকে কতকগুলি ছোট-ছোট ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্র দিয়া মৌমাছির ভিতরে বায়ু। তারপর উপযুক্ত স্থানে গাছের এই টুকরাগুলি সাজাইয়া রাখা হয়। একেবারে নূতন ঘরের মধ্যে মৌমাছির আসিতে একটু বিলম্ব ঘটে। কিন্তু যেগুলির মধ্যে একবার মৌমাছি বাসা করিয়াছে এবং বাহ্যিক মধ্যে চাকের অংশ এবং মধু ও মোমের সানাত পক্ষ বর্তমান, সেখানে মৌমাছির শীত্রই আসিয়া ছুটে। নাদে নাদে বাসাগুলি পরীক্ষা করিয়া দাখা দরকার, কারণ

ঠাণ্ডালী ও ইঁদুর বাসাগুলি তাদের জন্য রাখা হইয়াছে তাহা অনেক সময় তাহার মধ্যে আসিয়া সংসার পাতে।

মৌমাছির যুদ্ধ—

চৌবজ্রগৎ একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে জোর যার মূহুর্তে তাহার দুর্বলের এখানে স্থান নাই, তবে দুর্বল যে কোথাও কোথাও আছে তাহা তার কারণ প্রবলত তাদের প্রজনন-শক্তির প্রায়। পোকা মাকড় ধরিয়া অহরহ খাইতেছে, কিন্তু পোকা মাকড় তাহা হাবার বংশ বৃদ্ধি করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে এখনও বিরূপ চক্ষু নিক্ষেপ করে। অনেক সময় সমজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে নিদারুণ যুদ্ধ চলিতে থাকে। মধুখর তার মধ্যে প্রধান, এবং কীট-পতঙ্গের মধ্যে মৌমাছি প্রধান।

লৌকসংখ্যার আধিক্য, অল্পসংখ্যার লুটতরাজের ইচ্ছা মানুষের মতোই ফুটাইয়ের প্রবল কারণ। মৌমাছির মধ্যে লড়াইয়ের কারণও এতগুলি। বৎসরের যে-সময়ে হুল আর মধু থাকে না তখনই সাধারণত শক্তিশালী মৌমাছিদের দুর্বল দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহার নিজেদের মধুচক্র মধুপূর্ণ থাকিবে ও পরাজিত দলের মধু লুটিয়া লইবে। কল্লর করে না। ঘটরাত্রি শেষ হইলেও যুদ্ধ অনেক সময় চলিতে থাকে। মধ্যাহ্ন তখন ভয়ঙ্কর নেশা চাপিয়াছে, বিজ্ঞেতাৎন একটা এম্পার-ওম্পার না করিয়া ছাড়ে না।

কবিতার সহিত মধুচক্র ও মৌমাছির আতি নিকট সম্বন্ধ বর্ণনা করা সকলে জানে। কিন্তু মৌমাছির ব্যবহারে কবিতা নাইই; বরং বার্থপরতা ও বর্জরজনোচিত নিষ্ঠুরতার পরিচয় আছে। তাহাদের আতি নিষ্ঠুরভাবে ইহারা হত্যা করে এবং মাতবরের অস্তিত্ব বক্ষ্য হইয়া পড়িলে তাহাদের যমালয়ে পাঠাইয়া নিদারুণ কষ্টের পর পরিচয় দায়। পরস্পরকে ইহারা সাহায্য করে না, যদি না কোন ভাতির মনোর জন্ত একত্র করা প্রয়োজন হয়। ইহাদের ভাতি পান বা দয়ার নাম মাত্র নাই—আছে কেবল অশুশ্রল কষ্ট এবং একাগ্রতা।

মৌমাছির যারা রাণী তারা সাধারণ লোকের লড়াইয়ে যেমন করেন না। লড়াই হয় রাণীতে রাণীতে। জেতাই ও পরাজিত অবস্থা প্রায় সমানই হয়। কারণ আক্রান্ত মৌমাছি আক্রমণকারীকে ছোট টানিয়া ছিড়িয়া লয় এবং জেতাই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিধাবিশুদ্ধ দেহে ছুটিয়া পালায়।

অবশ্য আক্রমণকারিণীরা যদি সকলেই নিহত হইত তাহা হইত মৌমাছির বংশ রক্ষা হওয়া সম্ভব হইত না। শক্তিশালী মৌমাছি দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর অনেক সময় প্রায় স্রাস্ত শতকে মাত্র উপর চাপিয়া ধরে এবং মুহূর্ত মধ্যে হুল বাহির করিয়া তাহার ফোমল অংশে ফুটাইয়া দায়। অনেক সময় মৌমাছির মানুষের মত কেল্লার মধ্যে অর্থাৎ মৌচাকের মধ্যে থাকিয়া লড়াই করে। এত লড়াইয়ে অল্পসংখ্যক মৌমাছি মধুচক্রের মধ্যে থাকিয়া অনেক কষ্টে কল্লরকে টেকাইয়া রাখিতে পারে।

লড়াইয়ের সময় মৌমাছির পাখা ও চিবুকের সাহায্যে পরস্পরকে মরণাঙ্ক আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরে, তারপর হুল ফোটানো চলিতে থাকে। মৌমাছির দল যখন উড়িয়া পক্ষদলকে আক্রমণ করিতে চলে তখন তাহাদের দেখিতে এয়েলেনের দলের মত। কিন্তু গুচ্ছ তাহাদের অবিকল্প লড়াই চলে না। কিছুক্ষণের পরই লড়াইটা মাটিতে উপর চলিতে থাকে। কখনো কখনো পূর্ব একঘণ্টা কাল যুদ্ধ চলে। মোম চাক দল যখন মাঝে উভয়দলের সৈন্যসংখ্যা প্রায় সমান, তখন দুইদল দুইদল উড়িয়া পালায়। মৌমাছির কতক সৈন্য হাতে রাখিয়া দায়। কখনো কখনো আক্রান্ত হইয়াছে তখন এই সৈন্যদল সহসা আক্রমণকারিণী

সাধারণ উপর দিয়া পড়িয়া কেল্লার মধ্যেকার মোমাছিদেব কাছ সহজ করিয়া দায়। মধুচক্র যেখানেই নির্মিত হউক—পাহাড়ের কাটলের মধ্যে বা কাঠের বাগের মধ্যে বা চুবড়ির মধ্যে—তাহার দেওয়ালগুলি দুর্বল করিবার জন্য একদল মোমাছি গাছ হইতে আঠা সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত থাকে। মোমাছিদেব গাধের মাগে মোচাকের বাহিরে-আসা ভিতবে-যাওয়ার পথ নির্দিষ্ট হয়।

এত সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও আক্রমণকারীর দল যদি কোনোগতিকে কটক ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করে তাহা হইলে ভিতরের মোমাছিয়া ট্রেক বা খাতের লড়াই শুরু করিয়া দায়। সমান্তরাল মোমের সারিগুলি খাতের কাজ করে। কখাটা সহজে বিখান করা যায় না বটে, কিন্তু ইহা যথার্থ যে স্থানে স্থানে মোমাছির শাখী দাঁড়াইয়া থাকে; এবং কোনো মোমাছি বাদ্যজ্যব আহরণ করিয়া উপস্থিত হইলে শাখী তাহার নিকট আগাইয়া যায় ও মনে হয় যেন নন্দেত-বাঁকি জিজ্ঞাসা করে। বাজে মোমাছি বা অন্য দলের গুপ্তচর ধরা পড়িলে শাখীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়া করে বা মারিয়া ফেলে। গুপ্তচর যদি কোনমতে মোচাকের মধ্যে ঢুকিয়া মধু-চুটিয়া লইতে পারিল তাহা হইলে সে অচিরে সমীপলকে লইয় গিয়া আসে। একপ দুএকবার যাতায়াত করিলেই মোচাকের-মোমাছিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারে, এবং সমলবলে গিয়া সহসা শত্রুরের আগুনা আক্রমণ করে। যে-মোচাকের রাণী নিহত হয় সেই দল রাণীর অবর্তমানে বিশৃঙ্খলা অবস্থাপ্রাপ্তি বুঝিতে পারিয়া রণে ভঙ্গ দায়।

লড়াই চলিতে চলিতে রাত্রি আসিয়া পড়িলে যুদ্ধ স্থগিত থাকে। পরদিন আবার আরম্ভ হয়। কখনো কখনো কয়েক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়া থাকে। একপক্ষ সম্পূর্ণ জয়ী হইলে অপর পক্ষের সর্বনাশ, কারণ তখন ছোট বড় নির্বিচারে হত্যা চলিবে, কাহারো নিস্তার নাই, এমন কি ডিমগুলি পর্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। যে-মোমাছি শত্রুর রাণীকে মারিয়া ফেলিতে পারে সে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

হ।

দেশের কথা

দেশের প্রধান কথা আজকাল এই যে দেশে জাগবণের সাদা পড়িয়াছে। দেশের সকল দিক হইতেই একই স্বর শোনা যাইতেছে—আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, মানুষের অধিকার চাই—সমাজে বা রাষ্ট্রে কোথাও আর হীন হইয়া দাস হইয়া গোলাম হইয়া থাকিব না—এজন্য চাই আমাদের সংস্কার, চাই আমাদের স্বরাজ। বড় লোকের বাড়ীতে আশ্রিত হইয়া থাকিয়া নিত্য পোলাও কালিয়া খাওয়ার চেয়ে নিজের কুটীরে শাক অন্ন আহাৰও যে উপাদেয় সেই আত্মমর্যাদার জ্ঞানেব উন্মেষ সমস্ত দেশে দেখা দিয়াছে। ছলে বলে কৌশলে পরকে অবনত করিয়া রাখিলে শুধু যে অধীন জনের অকল্যাণ হয় তাহা নহে, যে প্রভুত্বের মোহে পরকে অবনত করে তাহাব নিজেরও অবনতি

ঘটে—নিজে অবনত না হইয়া পরকে অবনত করা যে যায় না, ইহাও আমরা বুঝিয়াছি। সেইজন্য সমাজের অবনত জাতিদের উন্নতিব জন্য তাহারা নিজেবাও যেমন চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে পাইতেছি, তেমনি যাহারা উন্নত তাহারাও চেষ্টা করিতেছেন; রাষ্ট্রে যেমন অধিকার লাভের জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছেন, তেমনি যাহাদের হাতে বাজশক্তি তাহারাও ক্রমশ সেই শক্তি সাধারণের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন। দেশব্যাপী এই যে মুক্তি পাইবার আগ্রহ তাহাকে “বরিশাল-হিতৈষী” উচ্ছৃঙ্খিত যৌবন-তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—

পুৰাতন ভারতের জন-সাধারণের প্রাণে আজ পূর্ব যৌবনোচ্ছ্বাস আবির্ভূত—আজ কানে কানে সে উচ্ছ্বাস তীরভূমিপ্রাণিত করিয়া বাধ ভঙ্গ করিতে চাহিতেছে।

আজ সমগ্র ভারত হোমরুল পাইবার আশায় উচ্ছৃঙ্খিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ জগৎ-জোড়া স্বাধীনতার সঙ্গীত—স্বাধীন-ধ্বনি—মানুষ হইবার প্রচেষ্টা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ ভারত অন্ধ নহে, মধ্যযুগের সে ভারত আজ নাই, আজ সমুদ্র-মেঘলা হিমালয়-মণ্ডিত ভারতবর্ষ আর নাই—আজ চারিদিক হইতে তাহার অন্ধ নয়ন উন্মীলিত করিতে, কন্ধ কর্ণপটহ ভিন্ন করিতে প্রবল আঘাত আসিয়াছে। আজ দীনহীন কাদ্মাল ভারতবাসীর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতেছে:—

উঠব নোরা উঠব নোরা

বিধির আদেশ-বাণী।

দেশব্যাপী এই যে যৌবনের জোয়ার ছুটিয়া চলিয়াছে

তাহা আর প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারো নাই। তাই বঙ্গদেশের দুই স্বধি বঙ্কিম ও রবীন্দ্র দিব্যচক্ষে ভারতের ভবিষ্যৎ দেখিয়া এই যৌবনের পুরোহিত হইয়া যৌবনের মন্ত্র বঙ্গদেশ ছাপাইয়া সমগ্র ভারতে ধ্বনিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহাদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া “বরিশাল-হিতৈষী” তেজস্বী স্বরে উচ্ছৃঙ্খিত আনন্দে প্রচার করিয়াছেন—

এই জ্ঞানসম্পন্ন মানবের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করা আর প্রকৃতি হতাশনকে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবার প্রয়াস একই রকম। সদয়ভাবে হোমরুল প্রদত্ত হইলে দেশের সমস্ত অশান্তি অত্যাধিকার দূরীভূত হইবে—সেই বিশ্বাসে পঞ্চদশ হইতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত একই হুরে একই প্রার্থনা উদ্ভিত হইতেছে। তাহা অমোঘ, সে প্রার্থনা উপেক্ষা করা আর শাস্তির যৌবনোচ্ছ্বাস ও ঐরামতের গঙ্গা-প্রবাহে বাধা প্রদান একই শ্রেণীর অলীক প্রয়াস। তাই রহিয়া রহিয়া মনে হইতেছে:—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ

রোধিবে কে?

হরে মুরারে

হরে মুরারে।

নিজে নবে নিজে কর্তা হইতে চাওয়া স্বাভাবিক অধিকার। সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে কেহ চাহে না। তাই আমরাও হোমরুল বা স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। কিন্তু প্রত্যেক কাজের জন্যই যোগ্যতা দরকার। আমাদের সেই যোগ্যতা আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে দ্বিমত দেখা যায়—এক, যাহাদের স্বার্থ আছে আমাদের ধীন প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের স্বাধিনাবে বঞ্চিত রাখিয়া আমাদের প্রভু হইয়া আধিপত্য করতে ও দেশের ধনশোষণে, তাহারা বলে যে আমাদের যোগ্যতা এখনো হয় নাই, যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিলে আমরা স্বাধীন পাইবার উপযুক্ত হইব, আর, আমরা বলি যে আমাদের যথেষ্ট যোগ্যতান্নত হইয়াছে, যেখানে যেখানে আমরা যতটুকু স্বাধিকার ফিরিয়া পাইসাহি তাহার সুসম্পাদনে আমরা কৃতিত্ব ও কুশলতা দেখাইয়াছি, বাকী যে-সব কাজ আমরা করিতে পাই নাই বা আমাদেরকে কবিত্তে দেওয়া হয় নাই তাহাতে আমরা কোনো কৃতিত্ব বা কুশলতা দেখাইবার অবসর পাই নাই, জলে না নামিয়া যেমন সাঁতার দেখা যায় না, তেমনি কাজ কবিত্তে না পাইলে তাহাতে যোগ্যতা কৃতিত্ব কুশলতাও অর্জন বা প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু স্বাধীন পরিচালনার উপযুক্ত হইতে হইলে কয়েকটি জিনিসের দরকার—(১) স্ত্রীপুরুষের সমানভাবে শিক্ষা (২) সামাজিক অবস্থায় অবনত ও হীনদিগের উন্নতি (৩) সামাজিক কুসংস্কার ও কুবীতি পরিবর্তন ও সুসংস্কার (৪) শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ও পরিপুষ্টব ছাড়া দেশের ধনরক্ষি (৫) ধনবৃদ্ধির দ্বারা অন্নবস্ত্র-সমস্যার সমাধান (৬) অন্নপট দূব করিয়া স্বাস্থ্য ও বদার্কি (৭) বলবৃদ্ধির ফলে সাহসবৃদ্ধি ও অগ্নায় প্রতি-কারের ক্ষমতান্নত (৮) সমবায় ও শ্রমসাধন দ্বারা দুর্বল অল্প অসমর্থ প্রভৃতির রক্ষা। এক্ষণে ক্রমশ দেখা যাক এই কয়টি বিষয়ে আমাদের দেশের গতি অগ্রসর কি না।

(১) শিক্ষা।

স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষার প্রসার তাহাতে হয় তাহান আগ্রহ ও প্রবল দেশের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। — দেশের ন্যায় কবিত্তে পারিয়াছে শিক্ষাদ উন্নত হইতে

পারিলে মনুষ্যের স্বর্গীয় ভাভ বনে, এ... মঃ হুগ, রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রবলত্ব প্রত্যাপন... হইতে আনন্দ... ববিষা তাহার প্রতিদান... ব্যাপি কুসংস্কার ভূর্তোগ ও অপব্যয় হইতে পরি... ঘটে। গত একদশাব্দে মধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন... নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার বা পুরাতন... উন্নতির নিম্নলিখিত সংবাদগুলি পাঠিয়া... ও আশাবিত্ত হইয়াছি—

কাজলাকাঠি মধ্য ইংরেজী স্কুল।—বরিশাল জেলার কাজলাকাঠি গ্রামে মধ্য ইংরেজী স্কুল, গত ১১... হইতে ৩ জন মাটির ২ জন পণ্ডিত শিক্ষক দ্বারা... স্কুলের কার্য সুচলিত হইতেছে। বিদেশী... ছাত্রের খোরাক ও বাসস্থানের স্ববন্দোবস্ত আছে। গ্রাম... কয়েক প্রভৃতি লোকের, স্কুল ভাড়াতে বন্দোবস্ত... চেষ্টা করিতেছে।—কাশীপুর নিবাসী।

ডেপুটি ইনিং বিদ্যালয়।—বরিশাল সহরের পশ্চিম প্রান্তে... শিক্ষাব্যবস্থা-বিদ্যালয়ী মনোভিত্তিক সম্পাদক প্রচুরিত... নামক একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।... পণ্ডিত এখানে পড়ান হইবে।—কাশীপুর নিবাসী।

করীয়ায় নূতন স্কুল।—গত ২৬শে জানুয়ারী... স্কুলের অন্তিম লোপ হইয়াছে। সকলে... আলী খান মহে দরকে তথায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়... অনুরোধ করেন। তিনি তাহার পিতৃসেবক নামে একটি... স্থাপন করিয়াছেন।—চাঁক-গোবিন্দ।

বিদ্যালয়।—যশোর জেলা আদালতের উকীল... চরণ দত্ত বাহাদুর যশোরের টাউনের উপরে একটি... স্থাপিত করিবেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি নিজের... রাখিবেন ও অত্যন্ত বানকদিগকেও নানা প্রকারে... আমর ভগ্যানের নিকট প্রার্থনা করি যে উক্ত... ভগবান পূর্ণ করুন ও এই সনাতন ব্যক্তির প্রতি... —চাঁক-গোবিন্দ।

নূতন বিদ্যালয়।—কাধি মহম্মদের বিভিন্ন... মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে।... যাইতেছে যে এই মহম্মদাবাদীর ইংরেজী শিক্ষার... যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। এই বেশী দিন হয় নাই... উপরে একটি এবং মধ্যম মধ্যমের, বসতিয়া ও... একটি নূতন উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়... হইতেছে। সেদিন হেঁড়া মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়... বিদ্যালয়ে পরিণত কর হইয়াছে। এখন আবার... ইংরেজী বিদ্যালয়কে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত... এ ছাড়া মধ্যমাত্তা উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়কে... বিদ্যালয়ে উন্নীত কর হইয়াছে। এবং সারনা ও... হইটিকে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার... দেশের... মধ্যম অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়,—দেশের... মধ্যম অধিক শিক্ষা বিস্তার হয়, ততই বঙ্গদেশ... মহম্মদ চাঁক-গোবিন্দ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে... —চাঁক-গোবিন্দ।

বাড়িতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে এই কাঁপি সহরের উপর কলঙ্ক স্থাপনের যে একটি প্রধান অশ্রাব্য তীর্থভাবে অনুভূত হইতেছে, সেই অশ্রাব্য পূরণ হইতে অধিক কালবিলম্ব হইবে না। দেশের লোকের উচ্চ শিক্ষা প্রতি যেকোন স্থানের টান পড়িয়াছে, তাহাতে এই মহদমুর্তানে হস্তক্ষেপ করিলে অর্থের অভাব হইবে না, কেবল চাই, অধ্যবসায় ও উৎসাহ উদ্যম।—নীহার।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ অপরাহ্নে নলহাটী হরিপ্রসাদ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বাৰ উদ্বাটন কার্য মহানমোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।—বীরভূমবাসী।

শিল্প ও কৃষি স্কুল।—চট্টগ্রাম জেলায়গঞ্জের সবরেজিটার শ্রীযুক্ত ফজলুল কাদের তথায় এক শিল্প ও কৃষি স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। মিরেদরী ও ধুম টেননের মধ্যবর্তী রেলওয়ের অদূরবর্তী স্থানে সাহি ৪০ কানি জমি তাহার কৃষিক্ষেত্রের জন্ত হস্তগত করিয়াছেন। আপাততঃ তাহার ৩০০০ টাকা চাঁদা তুলিয়া কার্যারম্ভ করিবেন।—এডুকেশন-গেজেট।

নিলকামারী মহকুমা শিক্ষাবিশয়ে বড়ই পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এত বড় মহকুমার মধ্যে মাত্র দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে ডিমলার রাণী শ্রীযুক্তা বন্দারানী চৌধুরাণী মহোদয়া তাহার জমিদারী ডিমলা তালুকের নব-প্রতিষ্ঠিত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টি দীর্ঘই উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন। এ-বিশয়ে তাঁহার প্রজ্ঞার পুৰ উৎসাহ আছে, তাহার এখন হইতেই বাজনার সহিত শিক্ষার দিতেছেন। প্রত্যেক জমিদার যদি এইরূপ ভাবে শিক্ষার আদায় করিয়া প্রজাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে দেশে শিক্ষার অনেক অভাব মোচন হয়।

—রঙ্গপুৰ-দর্পণ।

দান।—বীরভূম জেলার হেতঙ্গপুরের জমিদার মহারাজকুমার শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয় সিউড়ি রিসভান' টমসন বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণে জন্ত এককালীন তিন সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।—এডুকেশন-গেজেট।

দারুল উলুম মাদ্রাসা।—সরকারী মাদ্রাসা-সমূহে ইংরাজীমিশ্রিত শিক্ষায় আরবী ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছে মনে করিয়া শিক্ষার পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা যেন আদর্শ মাদ্রাসায় পরিণত ও স্থায়ী হয় এই ভাবের আয়োজন হইতেছে। মোট ১৩ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মাদ্রাসা-গৃহ ও ছাত্রাবাস ইত্যাদি নির্মাণে জন্ত ২৫০০০ টাকার প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত হাজি চানমিঞা সদাপুর নগর ৩০০০ তিন হাজার টাকা দিয়া জমি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন ও ৮০ জন গরীব ছাত্রের মাসিক বেতন দিতেছেন। রেজুনের প্রসিদ্ধ ধনী এ কে জামাল সি আই ই সাহেব মাসিক ৫০ টাকা ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটি ২০ টাকা সাহায্য দিতেছেন।—জ্যোতিঃ।

মেজিয়া থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহের মধ্যে শিক্ষার অভাব বহুদিন হইতে পরিগণিত লইয়া আসিতেছে। এ সকলের গ্রামের মধ্যে একমাত্র মেজিয়া ভিন্ন আর কোন গ্রামে একটিও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় নাই। যদিও পুণ্ডিয়া গ্রামে অদ্য কয়েক মাস হইতে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন হইতেছিল তথাপি তাহা এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই। রামচন্দ্রপুৰ গ্রামে একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামবাসীগণ সেই বিদ্যালয়টিকে উচ্চ-প্রাথমিক শ্রেণীতে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রামচন্দ্রপুৰ গ্রামের স্বনামধন্য পুণ্ড্য ভাগলপুর জেলার লোকেল ও ডিঃ বোর্ডের মেম্বর এবং অনারারি মাজিষ্ট্রেট

শ্রীযুক্ত রামানন্দ পট্টনায়ক মহাশয় স্কুলের জন্ত ১২টি বেঞ্চ দান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।—বাকুড়া-দর্পণ।

বরাহনগর নিয়োগীপাড়া "শশিপদ ইনস্টিটিউট" স্থিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্থাপক ও সংস্কারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মনাথ মুখোপাধ্যায় তাহার নিজ জম্ভুতি বাকুড়া জেলার অন্তর্গত কুচিয়াকোল গ্রামে একটি "মডেল প্রাইমারী" বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইং ১৯১৩ সালে কুচিয়াকোল গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেখিয়াছেন যে এই বিস্তৃত গ্রামে একটি আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয় উত্তমরূপে পরিচালিত হইতে পারিবে, তজ্জন্ত গ্রামের মধ্যস্থলে ১০ কাঁচা জমি খরিদ করিয়া তাহার মধ্যে একটি ১২ x ১০ ফুট এক তলা পাকা-ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আপাততঃ একটি কাঁচা-দেওয়ালী ঘরে স্কুল বসিবে; তাহারও সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবল, টানা-পাখা ইত্যাদি কতক পৰিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে, আরও কতকগুলি শীঘ্র প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ বাহাতে অন্ততঃ ৫০/৬০ জন বালিকা বসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা যত্ন বাবুর এই সল্পক্ষ্য সফল হউক।—বাকুড়া-দর্পণ।

বহুস্থানেই বিদ্যালয়ের একান্ত অভাব আছে; স্থানীয় লোকেরা সেই অভাব তীর্থভাবেই অনুভব করিতেছেন। রঙ্গপুৰে যতগুলি বিদ্যালয় আছে ভাষা শিক্ষার্থীর তুলনায় অল্প। দলে দলে শিক্ষার্থী ছাত্র প্রত্যাখ্যাত ও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া "রঙ্গপুর-দর্পণ" বলিতেছেন—

শিক্ষক মহাশয়গণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, সম্ভব হইলেও শিক্ষা-বিভাগের নাগপাশের ফলে আমাদের পক্ষে আর ছাত্রগ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। এখন ইহার যায কোথায়? সুতরাং রঙ্গপুরে আর-একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই, আমরা ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

এ সম্বন্ধে ময়মনসিংহের অবস্থাও এইরূপ—

এই নগরে যে তিনটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় আছে তাহার ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। প্রতি-বৎসর প্রায় তিন চারি শত ছাত্র স্থানান্তর-বশতঃ এই-সকল স্কুলে ভর্তি হইতে আসিয়া ফিরিয়া যায়। তাহাদের অনেকের ভাগ্যেই ইহার পর আব শিক্ষালাভ ঘটয়া উঠে না। এই-সকল কারণে এই নগরে আরও দুই-একটি উচ্চশ্রেণীর স্কুল স্থাপিত হওয়ার আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ এই নগরে অল্প একটি স্কুল স্থাপনের ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ স্কুলের কর্তৃত্ব ও বাস্তব ইত্যাদি সম্পর্কে বহু অনাবশ্যক কথা উত্থাপন করিয়া উহা কার্যে পরিণত হইতে দেন নাই। কেহ কেহ এহিঞ্চক তাহাদের ঐ-সকল আবশ্যক রক্ষা করিয়াই স্কুল স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু এখন শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ এক অতি অল্পত আপত্তি উত্থাপন করিয়া স্কুল স্থাপনে অমত প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ বলিতেছেন যে, তাহার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন এই নগরের অল্পসংখ্যক ছাত্র মাত্র তাহাদের পিতা মাতা বা স্বাভাবিক অভিভাবকের অধীনে বাস করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের মতে অপর অর্ধ ছাত্র স্বচ্ছন্দে অন্ততঃ বাইরা পড়িতে পারে। কাজেই

উদ্যোগ ও সাহায্যের ফল। আমবা সামাজিক হিসাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জাতি হইলেও কর্মক্ষেত্র বড় স্বপ্রাণ ও বিচ্ছিন্ন ছিলাম, কিন্তু এক্ষেত্রেও সমবায়ের উপকারিতা আমবা উপলব্ধি কবিতৈছি। আমবা সংবাদ পাইয়াছি—

শিক্ষার উন্নতি। শিগর বিরেটার হলে মণিপুরী জাতির শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতিকল্পে একটি সভা হইয়াছিল।

সভায় গৃহীত প্রধান প্রস্তাবগুলি এই—

- (৩) তাঁরা সংগ্রহ করিয়া “মৈতৈ মাকপ পুগৈ” (মণিপুরী সম্প্রদায় ভাণ্ডার) নামে একটি ভাণ্ডার স্থাপন করা।
- (৪) মণিপুরী ছাত্রদের জন্য একটি হোষ্টেল নির্মাণ করা।
- (৫) মণিপুরী ছাত্রদের পড়াশুনার তহাবধান লওয়ার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা।
- (৬) ভাণ্ডারের কার্য নির্বাহের জন্য সভা নিযুক্ত করা।
- (৭) কার্যনির্বাহক সভাগণকে প্রথমতঃ কেবল মণিপুরীদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় উন্নতিমূলক কার্যে রতী হইতে অনুরোধ করা।—ইত্যাদি।

—হরম।

খুলনা নমঃশূদ্র শিক্ষাসমিতির ১ম অধিবেশন—

১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নমঃশূদ্র-কুলটিলক বাবু সুন্দরবিহারী মল্লিক এম, এ, বি, এল মহোদয়ের সভাপতিত্বে সমিতির ১ম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় খুলনা জিলার প্রত্যেক মহাকুমা ও থানা হইতে নমঃশূদ্র-সমাজের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি যথারীতি পরিগৃহীত হইয়াছে।

১। খুলনা জিলার নমঃশূদ্রের শিক্ষানুষ্ঠান বিধানে নানাবিধ পরামর্শ অবলম্বিত হউক।

২। নমঃশূদ্র-বহুল খুলনা জিলার জন্য জনৈক আভ্যন্তরীণ-গ্রাডুয়েট নমঃশূদ্রকে জুল-সব-ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত করার জন্য সরকার বাহাদুরের কৃপাপ্রার্থী হওয়া।

৩। খুলনা জিলার নমঃশূদ্রের শিক্ষানুষ্ঠান বিধানার্থে গবর্ণমেন্ট ও ডিবেোর্ড হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হউক।

৪। বামেরহাটে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক একটি নমঃশূদ্র-ছাত্রাবাস নির্মিত হউক।

৫। চুড়কা-কলমিয়া বিদ্যালয়ের চতুর্থ কতিপয় গাছ দিতে চাহিয়াছেন বলিয়া বনক-বিভাগকে প্রস্তাব দেওয়া।

৬। চুড়কা-কলমিয়া বিদ্যালয়টিকে শীঘ্রই মধ্য-ইংরাজীতে মজুর করা ও এককালীন প্রচুর অর্থ সাহায্য করার জন্য গবর্ণমেন্টের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করা।

৭। নমঃশূদ্র-সমাজের হিতার্থে অনেক সংকর্ষ করিয়াছেন বলিয়া গবর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ দেওয়া।—খুলনাবাসী।

বৈজ্ঞ কৰ্ম্মকার সভা।—শ্রুত ২০শে মার্চ শনিবার বানরীপাড়া-দাওরাট গ্রামে এই সভার বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। নবদ্বীপ ঢাকা ফরিদপুর ত্রিপুরা বাধরগঞ্জ প্রভৃতি জেলার আর ৫০০ শত সভ্য উপস্থিত ছিল। কর্মকার-জাতীয় বালক-বালিকাদিগের উন্নতি বিধান কবাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

—বরিশালহিতমী।

মুসলমান শিক্ষা সমিতি।

মালদহ জিলার মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সাধু উগ্রা চেয়া গ্রন্থই মুসলমান-সম্প্রদায়ের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। সভাপতি মিঃ এ কে কল্লল হক ডিঃ বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটিকে আরও কিছু ট্যাক্স ভুলিয়া শিক্ষা বিভাগের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ‘মশবাসী জনসাধারণও কতকটা টাকা চাঁদা ভুলিয়া একটা ‘বু’ ‘স্ট’ কখন। পরে সেই টাকা হইতে অংশ অনুপাতে ডিঃ বোর্ডকে সাহায্য কবিয়া স্থানে স্থানে মকতব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হউন। আমরা এইজন সভা সমিতির একান্ত পক্ষপাতী। দেশের আপামর সাধারণ শিক্ষিত হওয়া রাজ-শক্তি এবং প্রজা-শক্তি উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল-জনক।—গৌড় দূত।

সমগ্র বঙ্গবাসী শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কারের জন্য বঙ্গদেশের গণ্যমাণ্য কয়েকজন এক শিক্ষাসম্মিলন ও কমিশন বসাইবাব চেটা কবিতৈছেন, এ সংবাদ পাইয়া আমরা অতীব আনন্দিত ও আশাবিত্ত হইয়াছি। আমাদের বর্তমান সম্রাট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে “আমি দেখিতে চাই আমার ভারতবাসী প্রত্যেক প্রজা জীপুরুষ-নির্কিংশেবে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে।” এই আশার বাণী সার্বক কবির তোলা যেমন গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্তব্য, দেশবাসীরও তেমনি কর্তব্য। প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে শিক্ষার সুবিধা পৌছাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষালাভের উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। অতএব কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের এই সাধু উদ্যম সকলকারই সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই শিক্ষা-সম্মিলন ও কমিশনের পূর্বে “হিন্দু” বিশেষণ যোগ করিয়া সম্মিলনটিকে সংকীর্ণ ও পঙ্কু করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। হিন্দু মুসলমান জাতিগণ বৌদ্ধ এই চার প্রধান সম্প্রদায় বঙ্গদেশবাসী বিভক্ত। “যুক্তবঙ্গ” বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেখানে অ-হিন্দুদিগকে বিযুক্ত করিয়া কেবল হিন্দুকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হয় নাই; খৃষ্টানদিগের জন্য গভর্ণমেন্ট ও মিশনারীরা শিক্ষার ব্যবস্থায় ব্যয় ও বন্দোবস্ত অধিক করেন, মুসল-মানরাও নিজেদের ততক্ষ শিক্ষা-সম্মিলন গঠন করিয়াছেন, বৌদ্ধের সংখ্যা বড়ে মুষ্টিমেয় ও তাহার হিন্দুপরিচায়ভুক্ত হইতেও পারেন—কারণ বুদ্ধদেব হিন্দুদেরও অবতার,—এই-সকল কারণেই বোধ হয় কেবল হিন্দুদেরই শিক্ষাসম্মিলন প্রতিষ্ঠা উদ্যোগ হইতেছে। নেই-মানের চেয়ে কাণ-

দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান আবশ্যিক দেশবাসী
জীপুরুষের মনে শিক্ষালাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা;
তাহাব পরই আবশ্যিক শিক্ষক—বিদ্যায় প্রগাঢ়, চরিত্রে
দৃঢ়, ত্যাগে স্বেচ্ছান্বিত, সহস্রদুঃখ উদার। বিদ্যাব আলস্য
ও আসবাব সুরঞ্জনে গৌণ সাধন, মৃথ্য নহে। জীবন্তবর্ষের

গৌরবেদ দিনে জীবন্ত দশায় এই আদর্শ অনুসাবেই কাটাইত। শিক্ষাদান জীবনের ব্রত করিয়া ও তাগ স্বীকার করিয়া প্রগাঢ় পণ্ডিতগণ তপস্বী ন্যাস সমাগত ছাত্রছাত্রী-দিগকে জ্ঞান দান করিতেন, ড্রাবিড কোলন মহারাষ্ট্র ওর দেশ হইতে ছাত্রছাত্রী তাতাদেব জ্ঞান ও চরিত্রেব যশে আকৃষ্ট হইয়া বাবাণসী মিথিলা ও বঙ্গদেশের গুরুকুলে শিক্ষার্থী হইয়া সমাগত হইত; বঙ্গবাসীবাও বাবাণসী ও মিথিলার জ্ঞানোদিগেব শিষ্যত্ব স্বীকার করিত; প্রাদেশিক সঙ্গীততা, পথের দুর্গমতা, স্থানের দূরত্ব এই সুস্থিতির বাধা হইতে পাবিত না। শিক্ষাদানেব স্থান ছিল স্নিগ্ধ-চ্ছায়াতকমূল, অথবা অধ্যাপকের কুটীৰ-প্রাঙ্গণ, সেইজন্য নিয়ম ছিল বৃষ্টি হইলে অনধ্যায়, মেঘগর্জন হইলে পাঠ বন্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ লইয়া বিদেশী লোকেরা আমাদের বর্তমান শিক্ষাদানের ব্যবস্থাপক ও কর্তা হইয়া আমাদের দেশেব সেই স্থলত অথচ প্রগাঢ় শিক্ষালাভেব পক্ষে ব্যয়বহুল ও বাধাসঙ্কল করিয়া তুলিতেছে, পাকা নৌা অট্টালিকায বাজাসনেব ব্যবস্থা না করিতে পাবিলে তাহাদের মনঃপূত বিদ্যালয় হয় না। শিক্ষাকে একদিকে এইরূপ ব্যয়বহুল করিয়া অন্যদিকে শিক্ষকদেব দক্ষিণাব বেলা যৎকিঞ্চিং বাঞ্ছনমূল্যেব ব্যবস্থা করিয়া স্বার্থপব বিদেশী শিক্ষাধুবন্ধবেরা আমাদেরগকে অজ্ঞানেব অন্ধকাবে বন্মুট করিয়া রাখিবাব বথাসম্ভব যত্ন করিতেছে, কাবণ শিক্ষাব বিস্তার হইলে আমবা আত্মনির্ভবক্ষম সচেতন হইয়া জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিব ও তখন আমাদের দেশে বিদেশী কত্নর আমবা সহ্য করিব না। ত্যাগী শিক্ষাদানব্রত শিক্ষক আধুনিক যুগে ছলভ, শিক্ষাবিভাগে অর্থ উপার্জনের স্বেযোগ না থাকাতে দেশেব সকল শিক্ষিত চিন্তাশীল বুদ্ধিমান লোক ওকালতি ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে ভিত্তি করিতেছে; যাহাদের অপব দিকে স্থবিধা হইল না তাহাবাই শিক্ষকেব মহৎ ব্রত অগত্যা গ্রহণ করিতেছে। ত্রয়ত দশ বিশজন ত্যাগ ও কর্তব্যেব প্রেবণায় শিক্ষাদানেব ব্রত অবলম্বন কবেন, কিন্তু মাতুব ত্যাগ করিতে পাবে বিলাসিতা, জীবনযাত্রাব বাচনা, নিজের ও স্ত্রীপুত্রেব মোটা ভাতকাপড় ও যদি তাহাব না জুটে তবে তাহাকে চিন্তাকল করিয়া তুলে, বস্ত্রবে নাহাব ক্রটি খটে।

এ সম্বন্ধে আমবা নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি জানিতে পাবিমাডি,—

শিক্ষকগণের দরিদ্রতা। দেশে শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতবৈধ নাই। শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলেই যে, উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, একথাও ব্রব সত্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে গবর্নমেন্ট এবং প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে গবর্নমেন্ট ও ডিস্ট্রিক্টবোর্ড যে বেতন প্রদান কবেন, তাহাতে তাহাদের পরিবার প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, আপনাদের উন্নয়নের সংস্থান হয় না। বর্তমান সময়ে যাবতীয় দ্রব্যের দ্রুত লাভা জ্ঞাত লোকের সংসারযাত্রা নির্বাহ করা ছবর হইয়া পড়িয়াছে। এখন মাসিক ৫০, ৭০ বা ১০০ টাকা বেতনে কেহই দুই বেলা আহ্বারের সংস্থান করিতে পারে না। অত্র প্রোভার বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের যাবতীয় অর্থ-কষ্টের সংবাদ আমবা ক্রমাগত প্রাপ্ত হইতেছি।—খুলনাবাসী।

নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ বিলম্বে বেতন পাইয়া থাকেন। ইহা ভ্রমের বিষয়। শিক্ষকগণের বেতন যে ওনা সম্বন্ধে স্থাব্যতা হওয়া উচিত।—সুরমা।

শিক্ষা বিভাগের সাকুলার—সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগেব ডিরেক্টার মহোদয় এই মর্মে এক সাকুলার জারী করিয়াছেন যে এন্স এ কিম্বা এম এন্স সি, বি এ, কিম্বা বি, এস, সি, এবং আই এ কিম্বা আই, এন্স, সি-গণের সর্বাচ্চ প্রথম বেতন ৫০, ৩৫ এবং ২৫ টাকা হইবে। বডলাট বাহাদুর শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে আভাস দিয়াছিলেন, এই সাকুলার দ্বারা সেই উন্নতির কোনও আভাস পাওয়া যাব না। গবর্নমেন্টের অজ্ঞাত বিভাগে অগণাকৃত অল্প শিক্ষিত অবিকাংশ কর্মচারীদিগের তুলনায় শিক্ষকদিগের এই বেতন অল্প। গবর্নমেন্ট স্কুলে শিক্ষকদিগের বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে এবং পেনশনেরও ব্যবস্থা আছে। প্রাইভেট স্কুলে সেকপ কোন কিছু নাই। তগাপি প্রাইভেট স্কুলগুলিও যদি ডিরেক্টার মহোদয়ের এই সাকুলারের অনুসরণ করেন তবে শিক্ষকদিগের উন্নতির আশা করা বৃথা হইবে। যাহা হউক আমরা আপা করি ডিরেক্টার মহোদয় এবিষয় আবার পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।—ত্রিপুরা-হিষ্টরী।

শিক্ষকের বেতন।—যত্নাট বাহাদুরের বক্তৃতায় আমরা জানিতে পারি যে, তিনি শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির সভ্য করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের উন্নতি সাধন করিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষকের দরকার, উপযুক্ত শিক্ষক পাইতে হইলে উপযুক্ত বেতন দিবাব ব্যবস্থা করিতে হইবে, দর্শন-শাস্ত্রের অটল যুক্তিগুলির সাগবা না লইয়াও এ কথাটা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গলার ডাইরেক্টার মহোদয় সম্প্রতি একগানা সাকুলার জারী করিয়া আদেশ করিয়াছেন যে, গবর্নমেন্ট স্কুলে যে-সব এম, এ, ও এন্স এন্স সি পাশ করা শিক্ষক ভর্তি হইবেন, তাহাদের প্রাথমিক বেতন ৫০ টাকার অধিক হইতে পারিবে না। আর বি, এ, ও বি, এন্স-সিদিগের বেতন ৩৫ টাকার অধিক হইবে না। আই, এ, ও আই, এন্স সি ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। মাস্তবর বাবু অবিকারিত মজুদার মহাশয় ইহা লইয়া ব্যবস্থাপক সভার আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন, এ আদেশের আর সংশোধন হইবে না। গবর্নমেন্টেব এই আদেশে শিক্ষাবিভাগে উপযুক্ত লোকের প্রবেশ লাভ করা কষ্টকর হইয়া দাড়াইবে।

আমাদের বিশেষ আশঙ্কা, মূলমান শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে। গবর্নমেন্ট স্কুল ব্যতীত তাহাদের পক্ষে অল্পত্ব প্রবেশ করা কার্যতঃ অসম্ভব। তাহাদের মধ্যে একে ত পূব কম, তাহার উপর এই কথা আইনের পদ

শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিতে করগ্রন বীকৃত হইবে? অথচ মুসলমান-শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, মুসলমান শিক্ষকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করাও যুব আবশ্যক।—মোহাম্মদী।

শিক্ষকের বেতন যথোচিত না হইলে শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না, তখন শিক্ষাব্যবস্থার পড়িবে অশিক্ষিত মূঢ় লোকদের উপর। তাহাব ফল যে কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। নিম্নপ্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রভৃতি পাঠশালার শিক্ষকগণকে অতি সামান্য বেতন দেওয়া হয়, এবং ছাত্রদত্ত বেতন যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে শিক্ষকদের উপবি-লাভ। এ সম্বন্ধে নিম্ন-উদ্ধৃত আবেদনপত্র আমাদেব সাক্ষী—

✓ To

The Deputy Inspector of Schools, Khulna.

Sir,

অনুগ্রহ প্রদান পূর্বস্ব কৃতান্ত্রিলিপুট প্রার্থনা এই যে, অধীনের সাক্ষী বেতন ১০০ টাকা মাত্র। বিশেষতঃ এই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় ছাত্র অবৈতনিক, স্তত্রাং ছাত্রদত্ত প্রাপ্য মাদো নাই। এই ভীষণ ভুক্তির সময় এবং বেতনে অধীনের সংসার যাত্রা নির্বাহ হওয়া অতীব শ্রুতিন। ইত্যাদি

আজ্ঞাধীন ভূত্য—

সেগ আদাস্ মানাদ,

সেক্রেটারি কলারোয়া ওলট্রিনিং স্কুল।

—খুলনাবাসী।

বেতন ভিন্ন উপবি-পাওনা লোভ থাকিলে শিক্ষক যে শীঘ্র কসাই হইয়া উঠিবাব সম্ভাবনা তাহা আমবা নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদটি হইতে বুঝিতে পারিব।—

নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষকের অত্যাচার। অদ্য সামসারিক কাব্য উপন্যাসে বড়লিখিতে গিয়াছিলাম, রাস্তায় অল্পমির বালক-বিদ্যালয়। উক্ত বিদ্যালয়ে একটি ছেলের কণ্ঠ ক্রন্দন শুনিয়া বারান্দায় বাইয়া দেখিতে পাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্দয় ভাবে একটি ছেলেকে বেত্রাঘাত করিতেছেন। বেত্রাঘাতের কারণ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। কারণ ছাত্রটি প্রমোশন-দিন না আনাতে শিক্ষক এই-প্রকার ব্যবহার করিতেছেন, আরও অন্ত্য ছাত্রগণকে এই অপরাধে স্কুলের প্রধানের স্তত্রেরদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিতে আদেশ দিয়াছেন, স্কুলের অন্ত্য কায়ে দৃষ্ট নাই কেবল প্রমোশন-দিন নিয়া সকলেই বস্ত। স্বাস্থ্য বাহিব হইয়া তথাকার দুইজন অধিবাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহাব বনে উক্ত শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে বেতন পর্যন্ত এই-প্রকারে আদায় করেন। তাহাব লেখাপড়া কিছুই জানে না, শিক্ষক যাহা বলেন তাহা গালন করে। (প্রেরিত পত্র)—হুমদা।

পূর্বে আমাদের দেশে এইরূপ শিক্ষকদের মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিবাব ব্যবস্থা ছিল। অল্পপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমাবেহ অন্ত্রাণে বিভিন্ন আনের বহু

অধ্যাপককে নিয়ন্ত্রণ কবিয়া আনিবা তাহাদিগকে অল্প-প্র তৈজস অর্থ ভূমি দান কবার বীতি প্রচলিত ছিল; এংনো অধ্যাপক বিদ্যাব অন্ত্রবল হইয়া থাকে। ধনীদেব উক্ত ঐক্য সমাবেহ অন্ত্রাণে বাইনাচ বা থিয়েটার প্রভৃতিব বদলে জাতিধর্মনির্নির্দেশে সকল-প্রকার শিক্ষক অধ্যাপক ও গুরুদেব আয়জ্ঞ কবিয়া মধ্যে মধ্যে সাহায্য ও পবিত্র কবা। এ সম্বন্ধে সম্প্রতিকার একটি দৃষ্টান্ত ধনী মাত্রেবই অন্ত্রকবণীয় বনিয়া আনিবা মনে কবি—

বিশেষতঃ বৃদ্ধি।—গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার মাক্তবর মৌক্ ত্রৈলোক্যকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় স্থানীয় 'প্রসন্নচন্দ্র মাদ্যত চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপকদ্বয়কে এক বৎসরের অন্ত্র বিশেষতঃ বৃদ্ধি নামক ৫০ টাকার একটি বাবিত বৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন।

—একুশেশন-মহোত।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে স্বর্গীয় মনসী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোপাঙ্কিত এক লক্ষ টাকা অধ্যাপকদের সাহায্যেব অন্ত্র নিযুক্ত কবিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহাবাই বাঙালীর গৌ বব ও মুখপাত্র।

শিক্ষাবিস্তারের উপযোগিতা ও উপায় সম্বন্ধে নিম্নেব প্রবন্ধটি হইতে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে।—

পাঠশালার অবৈতনিক শিক্ষা।

বঙ্গ দেশের যে জিলায় বা যে বিভাগে বাঙ্গলা শিক্ষার অধিক প্রচার হইয়াছে, সেই জিলায় বা বিভাগে ইংরেজী শিক্ষারও বিস্তার অধিক হইয়াছে। এইজন্য আমি ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী হইয়াও পাঠশালা বৃদ্ধির পক্ষপাতী। সামান্য চাষ বা মূদার কোন মন্ত্রানকে ভগবান বত শক্তি দিয়াছেন, পাঠশালায় প্রবেশ করিলেই তাহা প্রকাশ হইবার সম্ভব। ইহাদের মধ্যে যাহারা মেধাবী ও বুদ্ধিমান, পিতা মাতা বা আত্মীয়বর্গ তাহাদিগকে অধিকতর উন্নতির জন্য ইংরেজী স্কুলে পাঠাইতে পারেন।

বাঙ্গলা দেশে শতকরা ৯২ জন নিরেট মুর্থ। যদি ত্রাঙ্কন কংস বৈদ্য ও হুর্গণিকদিগকে বাদ দেওয়া হয়, তবে দেশের অবদিশ লোকের মধ্যে মুর্থের সংখ্যা শতকরা ৯৬.৯৭ হইয়া পড়ে। ইহারাই দেশের মূঢ়, চাষী, শিল্পী। ইহাবাই লোকসংখ্যায় শতকরা ৯০ জন। স্তত্রাং কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্ট যে-সকল স্তত্র চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ইহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না।

কো-অপারেটিভ সমিতি যে আমবাণী মূলী, তাঁতি, চাষী, কামাব, কুমার প্রভৃতির মহোপকরণ সাধন করিতে পারে, তাহা এংন শিষিত বাস্তবমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের অধিকাংশেব নিরক্ষরতা সমবাগ-সমিতি-সমূহের অতীক্ষিত পরিমাণে প্রদান-পক্ষে কটক-খরপ হইয়াচে।

বাঙ্গলাদেশের সকল জিলায়ই প্রজাসহ আইনের দশম অধ্যায় অনুসারে প্রজাদের কোন, জোতের সামিল কোন জমি, এংন কোন জোতের খাজনা কত, জোতের উপবিষিত বুদ্ধাদিতে প্রাপ্য কোন স্বত্ব

আছে কিনা, প্রজা জ্যোত হস্তান্তর করিতে পারে কি না ইত্যাদি খসড়া ও খতিয়ান প্রস্তুত হইয়া কালেক্টরীতে দাখিল হইতেছে, এবং তদনুসারে জমিদারী সম্বন্ধীয় সমস্ত বিরোধ মীমাংসা হইতেছে। প্রজাদের শতকরা ৯৬ জন মূর্থ। স্বতরাং তাহাদের জ্যোত সম্বন্ধে কি লেখা হইল, তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না।

প্রজাপক্ষ আইনে খাজনা আদায় করিয়া প্রত্যেকবার প্রজাকে স্বতন্ত্র দাখিল করিবার নিয়ম রহিয়াছে। জমিদারের গোমস্তার তাহা প্রারম্ভে প্রদান করেন না। দাখিল দিলেও তাহাতে জ্যোতের বার্ষিক খাজনা এবং যে দিন যত টাকা দেওয়া হইল তাহার পরিমাণ ঠিক লেখা হইল কিনা, তাহা শতকরা ৯৬ জন প্রজাই পড়িতে ও বুঝিতে পারে না।

কৃষিবিভাগের কৃষিতত্ত্ব-সকল স্বতন্ত্র পুস্তকেই প্রচারিত হউক, আব বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকায়ই প্রকাশিত হউক, নিরক্ষর পঠনাক্রম ব্যক্তিদের পক্ষে উভয়ই সমান। যে-প্রজাব জ্ঞাত গবর্ণমেন্ট এত অর্থ ব্যয় করেন, তাহাদের বিশেষ কোন উপকার হয় না।

বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৯২ জন মূর্থ। ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে শতকরা ৯২ জন পঠনক্ষম।

বাঙ্গালদেশে ৪১০ সাড়ে চার কোটি লোকের বাস। ইহাদের বর্ষাংশে অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ পাঠশালার ছাত্র হইবার উপযুক্ত। যদি প্রত্যেকের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৬ টাকা ব্যয় আবশ্যক, তবে শুধু বাঙ্গালদেশে ৪১০ সাড়ে চার কোটি টাকার প্রয়োজন।

নবাব সার সলিমুল্লাহ বাহাদুর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, মুসলমান বালকবালিকাদিগকে পাঠশালা-সমূহে বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য মুসলমান জমিদার ও প্রজাদের নিকট হইতে রোডসেদের দ্বায় নির্দ্ধারিত খাজনার উপর টাকার এক পরমাণু কি আধ পরমাণু আদায় করা হউক, এবং এই প্রকারে যে যে গ্রামের জমি জমা হইতে যত টাকা আদায় হইবে, তাহা ঐ ঐ গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালার জন্য ব্যয় করা হউক।

বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোস্বলে মহোদয়ের উত্থাপিত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার প্রস্তাবে গবর্ণমেন্ট বাধা দেন এবং প্রজাদের শিক্ষার বিস্তারে ইংরেজ-সম্পাদিত কাগজ-সমূহ নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। যে পর্যন্ত মৃত্যু, চাঁদী, তাঁতি, জেলে প্রভৃতি দেশের চৌদ্দ আনা লোক অশিক্ষিত থাকিবে, সে পর্যন্ত এই দেশের কল্যাণ নাই।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত। (সম্মোদন)

সম্প্রতি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক কবিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; তাহাও আবার নামঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

শিক্ষাবিস্তারের আর এক উপায়—দেশে নির্ভীক তেজস্বী সংবাদপত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম—

নূতন সংবাদপত্র।—কুমিল্লা হইতে 'জিপুরা গেজেট' নামে একখানি ইংরেজী-বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কুমিল্লার উকীল শ্রীযুক্ত বৃদ্ধবিহারী ঘটক ঐ কাগজের সম্পাদক হইবেন।—২৪ পরগণা বার্তাবহ। এবং ঢাকা-প্রকাশ।

(২) সামাজিক অবস্থায় অবনত ও হীনদিগের উন্নতি।

এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টার সংবাদ প্রদানের

উপলক্ষে আমবা কয়েকটি দৃষ্টান্তের পরিচয় পাইবাছি।

অপব একটি এই—

"চামার" এসোসিয়েশন—মেদিনীপুরের পাঞ্জাবী জুতা ব্যবসায়ী-বৃন্দ মেদিনীপুরের চামারগণকে টাকা ধণ দিয়া একপ্রকার কৃতদাসের দ্বায় কার্য করাইত। তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মাহিনা তাহারা পাইত না। ইহা দেখিয়া কয়েকজন ভদ্র মহোদয় আমাদের সহায়তায় মাজিষ্ট্রেটের সহায়তা গ্রহণ করিয়া চামারগণকে জইয়া তাহাদিগেরই স্বাধীনতা বিধান জন্য উক্ত এসোসিয়েশন গঠন করিয়াছেন। উক্ত এসোসিয়েশন কর্তৃক যে-সমুদয় জুতা প্রস্তুত হইতেছে তাহা নাম মাত্র লাভে সাধারণকে বিক্রয় করা হয়। চামারগণকে উপযুক্ত মজুরি দিয়া বাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও তাহাদিগের স্ব-স্বাধীনতার ব্যয়িত হয়। চামারগণের বালকগণে শিক্ষাদান জন্য কয়েকজন ভদ্রলোক পর্যায়ক্রমে তাহাদের শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

কিন্তু সংস্কারেই যে মনের ছাঁচ শীঘ্র পরিবর্তিত হইয়া

যায় তাহা নহে; তাহাব জন্য সাধনা দরকার। বড় হইয়াছি বলিয়া খোলস বদলাইলেই বড় হওয়া যায় না, মনটাকেও বড় করিতে হয়, নতুবা সিংহচর্ম্মীভূত গর্দভের দ্বায় শীঘ্রই লোকের নিকট উপহাস্যস্পদ হইতে হয়।

তাহার দৃষ্টান্ত এই—

এখানকার সমস্ত রাজবংশী কিছুদিন হইতে পৈতা গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছে। মক্কেল জজব রটয়াছে যে শীঘ্রই ক্ষত্রিয়দের যুক্ত হইতে হইবে; সেই ভয়ে অনেকেই পৈতা ছিড়িয়া ফেলিতেছে।—রঙ্গপুরবর্ধণ।

নারায়ণগড় সলোপ সভা।

১৫ই মাঘ নারায়ণগড় পরগণার অন্তর্গত মুড়াকারী গ্রামে তৎপ্রদেশ-বাসী বহুসংখ্যক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত সলোপ সম্মিলিত হইয়া স্বজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মীয়মারী সমাজ-সংস্কার উদ্দেশ্যে এক মহতী সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। সলোপ বৈষ্ণব।

নারায়ণগড় সলোপ সভার প্রধান উদ্দেশ্য চাষি।—

(১) সমাজ সংস্কার দ্বারা সলোপ জাতির সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থার উন্নতি সাধন।

(২) সলোপ বালকবালিকাগণের বিশেষতঃ অসমর্থ বালকগণের শিক্ষাবিধানকল্পে সাহায্যদানের ব্যবস্থা।

(৩) অসহায় সলোপ বিধবদিগের জীবিকানির্ব্বাহ-সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ।

(৪) পরস্পর সহায়তায় কো-অপারেটিভ সমিতির বিস্তার করণ।

সকল শাখা-সভার সহিত কয়েকটি স্থল সংযুক্ত থাকিবে। সম্প্রতি যে-সকল স্থল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বর্তমান আছে সেগুলিও যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে। শিক্ষা, শিল্প ও কৃষি বাণিজ্য এবং স্বাস্থ্য বক্ষার উন্নতি বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করা ও তদ্বিষয়ে কার্যানুবর্তী হওয়া সভা কর্তৃক অবধারিত হইয়াছে। এক বৎসরের আবশ্যকীয় ব্যয়সংকুলান জন্য সভাগুলিই প্রায় দুই হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি এবং তদ্ব্যতীত তিনশত টাকা নগদ দান পাওয়া গিয়াছে

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—

- ১। নারায়ণগড়-সংশোধন-সভা এবং তদন্তগত কেন্দ্র সভা ও শাখা-সভা কর্তৃক স্বজাতির কলাগণ কামনায়া নির্ধারিত ও প্রবর্তিত নিয়মাবলী অনুসারে কার্যামুস্বত্তী হইতে পরাধীন হইব না।
- ২। সার্বজনীন প্রেম প্রচারে দৃঢ়ত্ব হইব।
- ৩। স্বজাতির সর্ববিধ উন্নতি ও হিতসাধনকল্পে সাধ্যামুস্বারী চেষ্টা করিব।
- ৪। সমাজ-মধ্যে কোন কুসংস্কার বা কুরীতি থাকিলে তাহা সংশোধন বা দূরীকরণ-বিষয়ে প্রয়াসী হইব।
- ৫। স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, সহানুভূতি ও সন্তাব সংস্থাপন জন্ত প্রচেষ্টা হইব।
- ৬। আপন আপন পুত্রকন্ডার ও আত্মীয়স্বজনের বালকবালিকার হৃদয়-বিষয়ে সাধ্যামুস্বারে যত্নবান হইব।
- ৭। স্বজাতীয় অসমর্থ বালকবালিকার বিদ্যালয়-শিক্ষা সম্বন্ধে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।
- ৮। সমাজ মধ্যে উচ্চ-শিক্ষা ও জ্ঞান-শিক্ষা বিস্তার এবং জীৱন-প্রতিপালন-বিষয়ে সর্বিদেষ যত্নবান হইব।
- ৯। শাস্ত্র বিহিত সদাচার প্রতিপালনে সাধ্যামুস্বারী উৎসাহী হইব।
- ১০। আপন আপন বা আত্মীয়-স্বজনের পুত্রকন্ডার বিবাহ উপলক্ষে পণ গ্রহণ করিব না।
- ১১। স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা প্রতিপালনে কদাচ উদাসীন হইব না।
- ১২। আপন আপন পারিবারিক অবস্থার সর্বপ্রকার উন্নতি ও সামঞ্জস্য বিধানে সতত প্রযত্ন করিব।
- ১৩। জাতীয় মর্যাদা, আত্মসম্মান ও আত্মগৌরব সংরক্ষণ ও সংবর্ধন জন্ত সর্বতোভাবে প্রয়াসী হইব। —মেদিনীপুর-হিতৈষী।

(৩) সামাজিক কুসংস্কার ও কুরীতি পরিবর্তন ও
সুসংস্কার।

এই ক্ষেত্রে আমরা একটুও অগ্রসর হইতেছি বলিয়া বোধ হয় না; বরং আমাদের অধোগতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহা বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। এসম্বন্ধে আমাদের লজ্জার কথা এইগুলি প্রচার হইয়াছে—

বুড়ার বিয়ে।—গত ২৭এ মায় শুক্রবার মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর সভ্যভিন্দনের অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া নামক গ্রামে এক অপূর্ণ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়স অনুমান ৫০ বৎসর এবং কস্তার বয়স ২ বৎসর মাত্র।

কুমারখালির ত্রিযুত পূর্ণচন্দ্র কুন্ড ৫৬ বৎসর বয়স্ক কালে বিগত অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। পত্নীশোক তিনি এতদূর মূহমান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার উপযুক্ত চারিটি পুত্র, পুত্রবধূ ও ২টী কস্তার আশান-বাক্যে সাদৃশ্য লাভ করিতে না পারিয়া গত ২৫এ মায় তারিখে তিনি পুনরায় তাঁহার নাতিনার বয়সী একটি একাদশ বয়সী বাগিকার পাণিগাড়ন করিয়াছেন।—রত্নপুর-দর্পণ।

ইহারাই আবার বালবিধবার ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা করিবার জন্ত বড় বড় শাস্ত্রবচন আওড়াইয়া থাকেন! কিমার্চ্যমতঃ পরম!

অম্য রামপুরহাট হাইস্কুলের খেলিবার মাঠ খোলা হইল। জেনেব! অনেক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে পান, তামাক, সোডা, গিননেড ও মিষ্টার প্রভৃতি দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিল।—বীরভূমবাসী।

সম্প্রতি নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের কতিপয় ছাত্র তাহাদের “একগ্রাসের” কোন “ইয়ারের” বিবাহে এক উপহার জারি করিয়াছে। নড়াইল কলেজ-হোষ্টেলে কি “ইয়ারগণ” বোতল গেলার পার কবিত্তে আরম্ভ করিয়াছে? উপহারের নীচে লেখাঃ—

“এক গ্রাসের ইয়ারগণ,
কলেজ হোষ্টেল নড়াইল।”

এইবার উপহারের ভাষা ও ভাব দেখুনঃ—

“কাগজ, কলম জুটলেই যদি
উপহার একটা দেওয়া যায়,
তখন একটা উপহার দেয়া
সেট আর কি বিষম তার?
“উপ” শব্দের যোগে বেধছি
থরচটা বেশ কমছে গো।
অম্ম দিকে সংখ্যাতে খুব
বৃদ্ধিটাও বেশ কমছে গো!
অনেক সীতা সাবিত্রী, এ
রত্নগ্রন্থ বন্ধেতে,
“উপ” শব্দ যোগ করিয়ে
নেছেন পতির সঙ্গেতে।
তবেই দেব, “উপ” শব্দ
বাড়াচ্ছে বেশ সংখ্যাটা,
হারের সঙ্গে শিশে আবার
বাঁচিয়ে দিচ্ছে তাক্কাটা।”

হিন্দুর বিবাহ একটা দারিদ্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দুইটি আত্মা প্রেমবদ্ধ হইয়া সংসারের ভিতর দিয়া ভগবচ্ছিন্নিধানে যাত্রা করে, এই শুভ মুহূর্ত্তে একি পৈশাচিক কাণ্ড!

হে নড়াইল কলেজ-হোষ্টেলের এক গ্রাসের ইয়ারগণ, বাপ দাদা অনাহারে থাকিয়া—হাড়েব মজ্জা, বুকের রক্ত জল করিয়া তোমাদের শিক্ষার ব্যয় সংকুলান করিতে অক্ষম, আর তোমরা সেই অর্থ দ্বাৰা ইয়ারকিবাজ সাজিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারে কুঠ' বোধ করিতেছ ন', সেই অর্থ দ্বাৰা বাবু সাজিয়া তোমরা বন্ধের সীতা-সাবিত্রীদের উপপতির তালিকা সংগ্রহ-পূর্বক একটি নিরপরাধা বালিকার সংসারে প্রথম প্রবেশের দ্বার, ছাপার অক্ষরে বিন্যস্ত করিয়াছ! থিক্ তোমাদের উচ্চ শিক্ষায়, থিক্ তোমাদের মনুষ্যত্বে?

নড়াইল কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল বাবু একজন জবরদস্ত প্রিন্সিপাল। তাঁহার হোষ্টেলে এমন ছাত্র গণ্যায়! আমরা আশা করি তিনি একপ বীদরায়ীর বিবন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।—বশোহর।

আমাদের দেশে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হয়; শুচিতা শুদ্ধাচার সংঘম তাহাদের তপস্যার অঙ্গ; সেই ছাত্রগণ যদি মাদকদ্রব্য পরকে বিতরণ করে বা নিষেধা

সেবন করে বলিয়া গর্ব করে তবে আমাদের চরম অধঃপতনের পথ মুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। ছাত্রবা অপরিশ্রুতবুদ্ধি, তাহাদের চেয়ে বয়স্ক ষাহারা অভিভাবক-স্থানীয় তাঁহারা ছাত্রদের নিকট হইতে তামাক কেমন করিয়াই বা লইতে পারিলেন ও কেমন কবিয়াই বা তাহাদের নিলক্ষ্য কুৎসিত বসিকতা সহ্য করিতে পারিলেন! এই সব ভূনীত ছাত্রদের সাবধান হওয়া উচিত। দেশের একটি লোক কুক্রিয় হইলে দেশ সেই পরিমাণে অধঃপতিত হয়; ষাহারা দেশের মেরুদণ্ড, ভবিষ্যতের আশা ও অবলম্বন তাহাদের মতিগতি এরূপ দেখিলে শঙ্কিত হইয়া উঠিতে হয়, দেশের উন্নতির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

এই স্বসংস্কারের ক্ষেত্রেও একটি ক্ষীণ আশার সংবাদ আছে—

পণ-গ্রহণ প্রথা।—সম্রাট বেলন, “সম্প্রতি মেদিনীপুর হাড্ডি কুলে পণগ্রহণেব প্রতিবাদ করিবার জন্য এক জনবহুল সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় অনেকই এই প্রথার নিষেধা ঘোষণা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই প্রথার দোষ-কীর্তন করিয়াছেন।

আমাদের মুখে এই যে, সকলেই এই প্রথার নিষেধা করেন বটে, কিন্তু পুত্রের বিবাহকালে আবার তাঁহারা হই কছার পিতার বাড়ি ভাঙ্গিয়া টাকা আদায় করিতে ছাড়েন না। অস্তিত্ব: এক দল লোকও যদি কথায় ও কাজে এক হইতে পারিত, তাহা হইলে এই প্রথা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পরিণামে বিলুপ্ত হইত।

বিদ্যালয়ের উপাধ্যায়ী যুবকদিগকে কি আমরা এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারি না? বিবাহের বাজারে এই-সকল শিক্ষিত যুবকগণকে লইয়া দর কষাকষি আর কতদিন চলিবে?—কাশীপুর্নবাসী।

(৪) শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ও পরিপুষ্টি। (৫) ধনবৃদ্ধি।

এই ক্ষেত্রে দুই চারিটি ক্ষীণ চেষ্টা অঙ্কুরিত হইবার চেষ্টা করিতেছে।—

তমসুক কৃষি-সমিতি—তমসুক মহকুমার আসমান-নিবাসী জমিদার ঐযুক্ত কপীন্দ্রকৃষ্ণ দাস বাগেদর চাঁদবালীর নিকট আট হাজার বিঘা জমি লইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য তিনি এই জমি সেয়ায়ে বিলি করিতে ইচ্ছুক হইয়া কো-অপারেটিভ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করিয়াছেন। সেয়ায়ের টাকা হইতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি ক্রয় কবিয়া আপাততঃ ধান চাষ করা হইবে ও অশ্বাদারদিগকে উৎপন্ন ধানের পরিমাণানুযায়ী লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। বাম্পীয় লাঙ্গলের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করা হইবে ও বীজ বপন, শস্ত কর্তন এবং ফসল ঝাড়ান প্রভৃতি কার্য্য কলের সাহায্যে করা হইবে। বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যের এরূপ অনুষ্ঠান

এই প্রথম। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হয় বলিয়া তথ্য বিধা-প্রতি পূর্বে-বে পবিমাণ ফসল হইত, এখন তদপেক্ষা ৫৬ গুণ অধিক ফসল জন্মিতেছে। আমাদের দেশে সেইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে অবশ্যই শস্তের পবিমাণ বৃদ্ধি হইবে। তমসুকের বৈজ্ঞানিক কৃষি-সমবায়-সমিতি কৃষির উন্নতি-বিধানের জন্য মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রবর হইয়াছেন। এই সমিতির মূলধন দুই লক্ষ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। সমিতির সাফল্যের উপর এ দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।—নীহার।

চিক্রনির কাবখানা।—চিক্রনি নির্মাণের উপকরণ প্রস্তুতের নিমিত্ত যশোহবে এক কারখানা বসিতেছে। গভর্ণমেন্ট কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি আসিয়াছে।—কাশীপুর্ন-নিবাসী।

স্বদেশপ্রাণ মাননীষ মহারাজ স্রার শ্রীমন্তচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই মহাশয় তাঁহার মণিকতলাহ বাগান-বাটিতে একটি সেলুলয়েড ফ্যাক্টরী স্থাপিত করিয়াছেন। যশোহর চিক্রনি-কাবখানার প্রতিষ্ঠাতা কণ্ঠবীর ঐযুক্ত মদননাথ ঘোষ মহাশয় ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।—ঢাকা-গেজেট।

আবিষ্কার।—ত্রিপুরা জেলার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ঐযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মন্ডী মহাশয় একটি দেশলাইয়ের কল আবিষ্কার করিয়াছেন। কলটির কার্য্যপ্রণালী সহজ এবং প্রত্যহ ১০ গ্রোস দেশলাই প্রস্তুত হয়।—এডুকেশন-গেজেট।

ময়দার কল।—প্রকাশ, বগুড়াতে শীত্ৰই একটা ময়দার কল প্রতিষ্ঠিত হইবে।—রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ।

চট্টগ্রামের “জ্যোতি” পত্রে প্রকাশ—চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী আবদুল রহমান দোস্তাযী প্রতি বৎসর এক-একখান জাহাজ নির্মাণ করিতে আবল্ল করিয়াছেন। গত পূর্ব বৎসর আমিনা-খাতুন নামক এক জাহাজ এবং গত বৎসর জামিনা-খাতুন নামক এক জাহাজ ইনি নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমিনা-খাতুন ৮২ টনের আর জামিনা খাতুন ১০৫ টনের ছিল। প্রথম জাহাজে দেড় হাজার এবং দ্বিতীয় জাহাজে দুই হাজার বস্তা চাউলের অধিক ধরিত না। এই দুই জাহাজ মাল্যাজের চোট্টিদিগের নিকট ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। এ বৎসর আবদুল রহমান রবিয়া-খাতুন নামক ৫০০ টনের এক জাহাজ তৈয়ার করাইয়াছেন; ইহাতে বার হাজার বস্তা চাউল ধরিবে। নির্মাণে নব্বই হাজার টাকা ব্যয় পড়িগছে। গত ১০ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ঐযুক্ত ক্রিষ্ণচন্দ্র দে মহাশয় রবিয়া-খাতুনের ভাসান-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। যে-সব নকল “বদেশী” বাবুয়া টাকার ধলে সিন্দুক পুরিয়া রাখিয়া মুখে কেবল “বদেশী” “কাতরানি” দেখাইয়া থাকেন, তাহাদের সহিত এই আবদুল রহমানের আসমান জমিন তফাৎ। কে জানে, কতদিনে অচেতনদের চৈতন্যস্ফার হইবে?—বাঁকুড়া-দর্পণ।

আমাদের দেশের নৌবিদ্যা ব্রিটিশ-শাসনে লুপ্ত হইয়াছে। যিনি তাহার পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা একাকী কবিত্তেছেন তিনি দেশের সুসন্তান, দেশবাসীর প্রশংসিত কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমিনা-খাতুন জাহাজের সচিত্র বিবরণ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতের অপব-একটি নষ্টশিল্প বস্ত্র-বিদ্যা। জামানী
বৈজ্ঞানিক রঙের প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের বংশে
সকলেই কৃষি প্রভৃতি অপব ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য
হইয়াছে। তাহার ফলে হইতেছে—

রংএর অভাবে হিন্দু ধর্ম নষ্ট :—খানে নেবেদেবীগণের বেশপ বর্ণ
ও আকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে প্রতিমা নির্মাণ ও চিত্রিত
করাই হিন্দু ধর্মের বিধান। কিন্তু বর্তমান যুগের ফলে চার্মাগীর রং-
এর আমদানী এককালীন রহিত হওয়াতে দেশে রংএর একান্ত অভাব
উপস্থিত হইয়াছে। হুতরাং শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রতিমা চিত্রিত
করা এক্ষণে বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি
অনেক সময়ে কালী-মূর্তিকে সবুজ রং দিয়া চিত্রিত করিতে হইতেছে।
উপায় কি?—স্বাভাবিক।

উপায় নিজেব ঘরের নষ্ট শিল্প উদ্ধারের চেষ্টা করা।
বাহাদিগকে স্বেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি তাহাদেবই উপব দেব-
প্রতিমার সাজ এবং বংশস্ত্রের ববাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা
কৌতুককর বটে। ধর্ম মাহুষের অন্তরের জ্বিনিস, আত্মাব
অবস্থা; তাহাকে এতখানি পরনির্ভর কবিয়া তুলিলে দুর্গতি
অনিবার্য। প্রথমত প্রতিমাই ত বাহিরের জ্বিনিস,
তাহাব উপর তাহাব সজ্জা ও যদি বিদেশী হয় তবে আর ধর্ম
বলিয়া ও আমার বলিয়া বহিল কি?

(৬) স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধি।

একত্রে কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাব সংবাদ পাওয়া
গিয়াছে মাত্র।

যশোহর বাকু-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল দত্ত মহাশয় যশো-
হরের স্বযোগ্য সদর মহকুমা মাজিস্ট্রেট মহোদয়ের নিকট দাতব্য
চিকিৎসালয় স্থাপন উদ্দেশ্যে ৩০০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান
করিয়াছেন।

বাকু ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীবৃন্দ ২০০০ টাকা টাঙ্গা
করিয়া বা ব্যক্তিগত ভাবে কেহ দিতে যাকৃত হইলে কেশব বাবু সর্ব-
সাধারণের স্বাধীনক স্থানে একটি মহাংরাজ্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-
কল্পে ১০০০ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আমরা আশা করি গ্রামবাসীগণ এ স্বযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ
করবেন না। শিক্ষার আবশ্যকতা এখন সর্বত্র তীব্রভাবে উপলব্ধি
হইতেছে এবং জনসুলভ চেষ্টাও চলিতেছে। এখন দ্বারার হেলার
স্বযোগ হারাইবেন, জীবনঃগ্রামে তাহাদিগকে ভীষণ হইতে ভীষণতর
প্রহার সহ্য করিতে হইবে।

কেশব বাবুর এবিধ আদর্শ সদিকার জ্ঞাত আমরা তাহাকে আন্ত-
রিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।—যশোহর।

সম্মুখীন।—বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীন কোয়ালপাড়া একটি গওগ্রাম।
উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র কোলে মহাশয় কেবল ব্যবসায়ের দ্বারা
নিজের সামান্য ধনবৃদ্ধি হইতে উন্নতি লাভ করিয়া আজ প্রভুল ঐর্থ্যের
অধিকারী হইয়াছেন। সোদন তিনি নিজের গ্রামে দাতব্য চিকিৎসা-

দায় স্থাপনকল্পে ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন।—

প্রকাশ।
সংবাদ। কলিকাতা মণিকতলা-নিবাসী বাবু গো-
বিন্দ্যাস্ত্র মেহো হাসপাতালের সাহায্যার্থ এক হাজার
করিয়াছেন।—চুঁচুড়া-বার্ভাবহ।

স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধির জ্ঞাত আবশ্যকমত লবণ।
পাওয়া দবকার; কিন্তু লবণ-ব্যবসায় গভমেণ্ট এ.
করিয়া দেশে লবণ তৈয়াবী একরকম বন্ধ কবিয়া দিয়া
কেহ করিলে দণ্ডনীয় হয়, এবং তাহাব ফলে বিদেশী
ব্যবসায়ীবা লাভবান হইতেছে ও দবিদ্র ভারতবাসী
বলিয়া যথোচিত লবণ খাইতে পাব না। এসময়ে
লিখিত মন্তব্যগুলি সমীচীন।

যে সকল খাদ্যসামগ্রী না হইলে সাধারণতঃ মানুষের
নির্ভর হয় না, লবণ সে-সকলের মধ্যে অন্ততম। এ দেশের
এত গরীব যে,—বহু লোক শুধু “সুন ভাত” খাইয়াই দিন
এমতাবস্থায় লবণ হুলাত ও সহজপ্রাপ্য না হইলে দরিদ্র লোকের
সীমা থাকে না। কয়েক বৎসর হইতে লবণের মূল্য পূর্বাগে
হওয়া লোকের খুবই কষ্ট হইয়াছে।—২৩৭৭গন-বার্ভাবহ।

লবণের মূল্য। লবণাদুবেষ্টিত ভারতবর্ষের লোকে বিদেশী
ক্রয় করে, ইহা যতই বিচিত্র কথা হউক না কেন, এখন লবণের
সম্বন্ধে বাঙ্গালার জনসাধারণ বিশেষ কিছু আলোচনা ক
তাহারা জানিয়াছে যে লবণ সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা, স
গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই উহার মূল্য বাড়াইতে বা কম
পারেন। রাষ্ট্রপুত্রনার সময় হুদে প্রচুর পরিমাণে লবণ
হয়, গবর্ণমেণ্ট ই লবণ এক টাকায় ২৭ পের হিসাবে
করেন, কিন্তু দোকানদারগণ জনসাধারণকে টাকায় ১
করিয়া দিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট দুই শত সাড়ে বাতান
পরিমাণ লবণ কাহাকেও বিক্রয় করেন না। কাচেকাচের
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লবণ ক্রয় করিতে পারে ন, তা
লবণের প্রত্য দোকানদারদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। গবর্ণ
কুইনি বা ডাক-টিকিটের ছায় পুচরা লবণ বিক্রয়ের ব্য
তাহা হইলে দরিদ্র গৃহস্থগণের সুবিধা হয়। অসাম
জ্ঞাত মতবলেব অধিবাসীদিগকে অনেক বিষয়েই এইক
হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট কোন প্রতিকার না করিলে, ল
প্রতিকার করা প্রজাদের ক্ষমতার অতীত। গবর্ণমেণ্ট
কোনকণ সুব্যবস্থা করিবেন না কি?—হিতবাদী।

একট ছুত্র অধিকার চাই।—ভারতবাসীকে সৈনিক
প্রবেশের, সার্বভৌম বড় বড় কাউন্সিলে যোগ দেওয়ার এবং
স্বাধীন্যসনের অধিকার দেওয়ার কত কথাই উঠিতেছে।
একটি অতি ক্ষুদ্র অধিকার বাচু করা করিতেছি। আমাদের
সমুদ্র রহিয়াছে, সমুদ্রতর। লবণ রহিয়াছে, সেই লবণ
লইবার অধিকার আমাদের দেওয়া হৌক। লিবারপুল
আনয়ন এইকণ অতি কষ্টকর হইয়াছে। আমাদের অ
হার ক্রমশঃ বাড়িতেছে এই অভাবে সহস্র দূর হইবে
পবস্ত্র যুদেব দশন ইংলেণ্ডে প্রমত্তবীর সংখ্যা অনেক
আমাদের দেশে কাপের অভাবে গরীব লোকেরা কত

হইয়াছে,—তদুপরি দিন দিন সমস্ত জবাজ্ঞাত দুর্মূল্য হইতেছে। এসেশের সমুদ্রোপকূলে লবণ ঠৈয়ারীর কারখানাগুলিবার অধিকার দিলে অনেক গরীব লোকের জীবনোপাধের একটা পথ হইবে।

— যোতিঃ।

কোনো অধিকার সহজে না পাইলেই যে হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহার কোনো কারণ নাই, লাগিয়া না থাকিলে অধিকৃত স্বত্ব পবের হাত হইতে ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। কোনো অধিকার শীঘ্র না পাইলেই যে বৃষ্টিতে হইবে তাহার যোগ্যতা প্রার্থীর নাই এমনও কোনো মানে যুক্তিগত্রে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্যের উত্তর দেওয়া সহজ হইবে বলিয়া অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উত্থাপন করা যাইতেছে।—

ঐমতী রেঘিনা ওহ এম-এ-বি-এল, ওকালতী করিবার অধিকার চাহিয়া হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মাস্তান্ন মহিলা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐহার হিন্দু দ্রো-পুরুষের অধিকার আলোচনায় প্রচলিত হিন্দু আচারের গোড়ামীর নিন্দা করেন, তাহার এই বিদূষী মহিলার নৈরাশ্র সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন?—যশোহর।

আমরা বলিতে চাহি যে ইংবেজের হাতে ক্ষমতা গিয়া পড়াতে যেমন ভারতবাসী যোগ্যতা সত্ত্বেও হীন হইয়া আছে, আমরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছি; তেমনি পুরুষের প্রণীত ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকের জায়গা অধিকার খর্ব হইয়া বহিয়াছে, নারীদের কর্তব্য হইতেছে স্বার্থপর পুরুষদিগের হাত হইতে তুল্য অধিকার আদায় করিয়া লওয়া এবং সফল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত না হওয়া।

(৭) সাহন ও অজ্ঞাত প্রতিকারের ক্ষমতা লাভ।

বলচর্চার উপায় আমাদের নাই। আমাদের শাসক-সম্প্রদায়ের এমনই ভয় যে কাহাকেও ছুবেলা ডন-বৈঠক করিতে দেখিলেই তাহাদেব আতঙ্ক হয় যে বৃষ্টি বা স্ত্রামসনের দ্বারা তাল ঠুকিয়াই সে ব্রিটিশ-শাসনের বিরূপ অট্টালিকা উঠাইয়া ফেলিবে! অথবা লাঠিসোঁটা লইয়া ম্যাকসিম-গান হাউটজার প্রভৃতির বিরুদ্ধতা করিবে! সেই ভয়ে তাহার বলচর্চায় বাধা দ্যায়, উৎপীড়ন করে। তাহার ফলে দেশবাসী দুর্বল ও ভীত হইতেছে। অগাধ ঐশ্বর্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ভৃত্য-অনুচর থাকা সত্ত্বেও আমাদের কে-কোনো প্রধান লোককে একজন সাহসী

ইংরেজ অপমান কবিত্তে সাহন পায় সেই জন্তই। এই সেদিন প্রসিদ্ধ ব্যাবিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে ও যান্ত্রব নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরী মহাশয়কে রেল-গাড়ীতে দুজন ইংবেজ অপমান করিয়াছিল। তাহারা স্বহস্তে সেই স্পর্ধাব দণ্ড না দিয়া অপবের কাছে নালিশ করিয়া নিজেদেব ও দেশের দুর্বলতা প্রমাণ কবিয়াছেন। এ সম্বন্ধে “মোহাম্মদী” উক্ত অতি সমীচীন ও আমরা সর্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন কবি।—

চরম অভ্যুত্থান।—সংবাদপত্রে প্রকাশ, যান্ত্রব নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবের পরিবারস্থ কর্তৃক ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ রেল-স্টেশনে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় নারায়ণগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রস তথায় আসিয়া ঐ আরোহীদিগকে গাড়ী হইতে নামিয়া বাহিতে বলেন, তাহারাই হাতে সম্মত না হওয়ায় রস সাহেব তাহাদিগকে বলপূর্বক নামাইয়া দিয়াছেন। স্টেশন মাষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি উপরওয়ালাকে জানাইয়া চূপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। একপ বেআইনী বল প্রয়োগের পরিবর্তে আরোহীগণ যদি মিঃ রসকে দুই খাতা দিয়া গাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতেন, তাহা হইলে রাজদণ্ড আইনের অধিকার ও আত্মসম্মান বজায় রাখা হইত। এই শ্রেণীর ইংরাজগণই যত অনিষ্টের মূল। —মোহাম্মদী।

দেশের লোককে গভর্নমেন্ট যখন স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্ত অজ্ঞধারণ কবিত্তে আহ্বান করিতেছেন, তখন অস্ত্র-আইন তুলিয়া দেওয়া গভর্নমেন্টের কর্তব্য এক দেশবাসী তাহাই বহদিনেব আকাজিক অস্ত্ররোধ। যদি না হয় তবে গভর্নমেন্টেব কথায় কাছে সামঞ্জস্য থাকিবে না। এই অবস্থায় আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি পড়িয়া দুঃখিত ও আশ্চর্য হইয়াছি।—

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ। বগড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদেশ দিয়াছেন যে জেলার সমুদয় বন্দুক পুলিশ সাহেবের আফিসে দাখিল করিতে হইবে। এই আদেশ কেন প্রবৃত্ত হইল, তাহার কারণ সাধারণে প্রকাশ নাই।—পাবনা-বগড়া-হিঃস্বী।

(৮) সমবায় ও শৃঙ্খলা দ্বারা কর্ম সম্পাদন।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিঃ—দেশে ক্রেডিট সোসাইটির সংখ্যা দিন-দিনই বাড়িতেছে। অজ্ঞাত স্থানের খবর আমরা বিশেষ জানি না—তবে চাটমোহর অঞ্চলে যে-সমস্ত সোসাইটি আছে, তাহা সমস্তে আমরা খুব প্রশংসাই গুণিতে পাইতেছি। প্রকাশ যে, এতদঞ্চলের মহাজনগণ এক্ষণে স্বদের হার অনেকটা কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে স্বদের বিষয় সন্দেহ নাই। এতদঞ্চলের অনেক কৃষক এবার কিছু কিছু আদুর আবাদ করিয়াছে। পাবনার কৃষি-পরিদর্শক কর্মচারী মহাশয় নাকি সম্প্রতি এই সমস্ত আদুর পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আদুর আবাদের প্রচলন হইলে কৃষকদের অনেক সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি এ বৎসরে, বিলাতি ঘাস,

চিনা বাদাম প্রভৃতির আবাদের প্রবর্তনের চেয়ে চলিতেছে। শুধু কয়লা কারবার না কবিরা নতুন নতুন শতপ্রবর্তনের চেয়ে করিলে ক্রেডিট সোসাইটির দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

—স্বরাজ।

এইরূপে দেশের লোক সকলে সমবেত হইয়া স্বশৃঙ্খলায় স্বরাজনৈতিক কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেশের দৈন্য ও অভাব অচিরে দূর হইয়া যাইবে। দেশের সকল লোকেই এই মহাযজ্ঞে যোগ দিবার জ্ঞান ডাক পড়িয়াছে। সহব ও যক্ষ্মসলেব অনেক সংবাদপত্রেব অপেক্ষা “বরিণাল-হিতৈষী” স্থিতিস্থিত স্থিতিস্থিত ও তেজোগর্ভ মন্তব্য লিখিয়া দেশকে উদ্বোধিত ও দেশের হিতসাধন করিবার চেষ্টা করেন দেখিয়া আমরা সমধিক প্রীত হইয়াছি। তাঁহার কথ্যেই “দেশের কথা” আরম্ভ করিয়াছি ও তাঁহার কথা দিয়াই উপসংহার করি—

“জয় জয় রবে চল চল সবে,
এসেছে মধুর আবাহন,
কে রবে পড়িয়ে অচেতন!”

চাকর বন্দোপাধ্যায়।

শিল্প ও সাহিত্য

“শিল্প ও বন্ধ” প্রবন্ধে আসসা শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে এ কথা মানিলেও শিল্প ও সাহিত্যকে এক-পর্যায়ভুক্ত করিয়াই দেখিয়াছি। কিন্তু সে ভাবে দেখিতে গেলে শিল্প ও সাহিত্যের সম্বন্ধ ধবা পড়ে না। অথচ, এই সম্বন্ধ-বিচারেব উপর সাহিত্যের প্রকৃতি বোঝা না-বোঝার সম্পূর্ণ নির্ভর আছে।

আমি সেই প্রবন্ধে বলিয়াছি যে শিল্প জীবনের প্রকাশক, সেইজন্য শিল্পের মধ্যে শিল্পীই প্রধান। এ কথাটাকে আমার সাধ্যমত সেখানে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং পুনরাবৃত্তি বরকার নাই।

কিন্তু তাহা মনে কবেন শিল্পের কাজ কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা, তাহারা ‘শিল্প জীবনের প্রকাশক’ এই কথাটিতে আপত্তি কবিত্তে পারেন। তাহারা বলিবেন, তবে শিল্পের সঙ্গে সৌন্দর্য্যেব কি সম্বন্ধ থাকে? এই সৌন্দর্য্যের দোহাই মানিয়া তাহারা শিল্প ও সাহিত্যের সম্বন্ধ বিচার কবিয়া থাকেন, এবং সাহিত্যের যে অংশ কলাসৌষ্টব-

পূর্ণ সেই অংশকেই ‘শিল্প’ আখ্যা দিয়া বাকী অংশে শিল্পের গভীর বাহিবে নিষ্ক্ষেপ কবেন। তাহারা বলিবেন—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং বা হাইটম্যানের ‘Life’ থাকিতে পারে, কিন্তু ‘Art’ যথেষ্ট নাই। স্থলব পদার্থ দেখিয়া মনে যেকম রসোজেক হয়, তাহাদের বচনায় ‘আর্ট’ আর তাহাদের রচনা পড়িলে মনে ঠিক সেই-রকম রসভাব জাগে। কীটস্, হাইন, বদলেয়ার, গোতিয়ে প্রভৃতি রচনায় সেই ‘আর্ট’ বস্তুটা আছে। হাইটম্যানের লেখা Life থাকিলেও, তাহাবই দেশীয় কবি পো’র কাব্যে ঢেব বেশি আর্ট আছে। অস্কার ওয়াইল্ড্, সিমন্স, প্রভৃতি এই দিক্ হইতে সাহিত্য ও শিল্পের সম্বন্ধ বিচার করিয়া থাকেন বলিয়া, শিল্প শিল্পেরই জ্ঞান (art for art) এ মতকে তাহাবা পোষণ ও প্রচার করিয়াছেন।

‘আর্ট’ এবং ‘লাইফ’, শিল্প এবং জীবনের মধ্যে এ একটা বড় বিচ্ছেদ-বেধা টানিবার কোন সম্ভব কারণ আদি পাই না। কেন পাই না, তাহা গোড়ায় আলোচনা করি। লইলে বোধ হয় শিল্প ও সাহিত্যের সম্বন্ধটা আমরা বিবেচনায় কি, তাহা প্রকাশ করিতে পারিব।

জীবন-বস্তুটাকে যতই আমরা তলাইয়া দেখিতে যাই ততই দেখি যে, জীবনের গতিতে নানা পরিবর্তন, নানা বিচিত্রতা ও জটিলতা যেমন দেখা দেয় তেমনি সেগুলিকে সংযত ও বিধৃত কবিয়া শৃঙ্খলা ও ছন্দও দেখা দেয়। জীবনের গতির মধ্যে কেবলই পরিবর্তন-পরম্পরা, কেবলই বিচিত্রতা ও জটিলতা যদি দেখা যাইত, তবে জীবনের ব্যাপারে সমস্তই বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল হইত, ইহা সহজেই বুঝিতে পারি।

অতএব, জীবনের প্রকাশ যেখানেই দেখিব, সেখানে যেমন দেখিব পরিবর্তন ও বিচিত্রতা, তেমনি দেখিব শৃঙ্খলা ও ছন্দ। কিন্তু সকল প্রকাশ এবং সব-রকমের প্রকাশেই একপ দেখিবার উপায় নাই। কারণ, প্রকাশের মধ্যে তারতম্য থাকিবেই। কোন প্রকাশে হ্রত ব্যাপ্তিব (extensity) দিক্টা বেশি, কোন প্রকাশে হ্রত সংহতির (intensity) দিক্টা বেশি। মোটামুটি এই পার্থক্যের জন্য জীবন-বস্তুর প্রকাশের বিশেষ তারতম্য ঘটে। যেখানে ব্যাপ্তিব দিকে কোঁক বেশি,

সংহতির দিকে নয়, সেখানে বিচিত্রতা ও জটিলতার সন্ধান আছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে ছন্দিত ও সরল করিবার প্রণালী নাও দেখা যাইতে পারে। অথচ এই দুইয়ের মিলনাই জীবনের এবং জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণতা—প্রসারও চাই গভীরতাও চাই; বৈচিত্র্যও চাই, ছন্দও চাই। এখন প্রশ্ন এই যে, তবে সৌন্দর্য কোথা হইতে আসে? জীবনের সব প্রকাশেই কি সৌন্দর্য দেখা যায়? প্রকাশের মধ্যে যদি তাবতম্য থাকে তবে সৌন্দর্যের মধ্যেও কি তাবতম্য থাকিবে না? জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণতা হইলেই সৌন্দর্য অবশ্যস্তাবীরূপে দেখা দেয়।

একটা স্থূল উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। মানুষের শরীর জিনিসটাব মধ্যে অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের, প্রত্যঙ্গের সঙ্গে প্রত্যঙ্গের নানা বৈপর্বিত্য আছে, ইহার প্রত্যেকেই বিচিত্রতা আছে; কাবণ প্রত্যেকটির আকারের ও আয়তনের বিশিষ্টতা আছে। এই শরীরে যখন জীবনবেগ দেখা দেয়, তখন এই শরীরেব অবলীলা আন্দোলনের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈপর্বিত্যগুলি যেমন ফোটে, ছন্দও তেমনি ফোটে। আমরা তাই বলি, নৃত্যকলায় শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য কেবলমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কি? এই শরীর-জীবনের সম্পূর্ণতার নয় কি? এক কথায় জীবনের নয় কি? শরীরের সঙ্গে অঙ্গ জীবনবেগ সঞ্চারিত হইয়া যখন অঙ্গের প্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য ও বৈপর্বিত্যগুলিকে ছন্দিত করে, তখনইনা সৌন্দর্য ফোটে? কুস্তিগিবার শরীর সঞ্চালনের মধ্যেও এই সৌন্দর্য আছে। কুস্তিও একটা মস্ত আর্ট। জীবনের প্রকাশ যেখানেই পূর্ণমাত্রায় ভাগে, সেইখানেই সৌন্দর্য অচ্ছূভ হয়। আর্টের লক্ষ্য দুখাতঃ তাই জীবন, সৌন্দর্য নয়। অথচ সে লক্ষ্য আর্ট যে পৌছিল, তাহার নিদর্শন কিন্তু সৌন্দর্যে।

অতএব একটা উদাহরণ লওয়া যাক। আমরা দেখিতে পাই যে, সকল দেশেই নির্মলতা সৌন্দর্য বলিয়া কীৰ্তিত হইয়াছে। নির্মলস্বভাব পুরুষ বা নারী মানুষের কাছে সুন্দর। তাহা যদি না হইত, তবে বুদ্ধ বা খুষ্ট বা saintsগণ চিত্রকলার বিষয় হইতেন না। বর্মণীমূর্তির মধ্যে মাছুর্মূর্তি সকল দেশেই আদর্শীয় ও বর্ষণীয় হইত। ইহাও কাবণ কি এই যে, ভালোবাসার মধ্যে মানুষের

একটা সামাজিক সংস্কার মনেব মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে; তাই মন্দকে বা অপবিত্রকে মানুষ কোন মতেই সুন্দর বলিতে পারে না। এই কি? অবশ্য দেশের মধ্যে এ সংস্কার থাকিলেও, শিল্পীর মনে থাকিবাব হেতু নাই। কারণ শিল্পীকে সংস্কারের উপরে উঠিতে হয়, স্বাধীন মন ও দৃষ্টি লইয়া জগৎটাকে দেখিতে হয়। তবুত আজ পর্যন্ত অপবিত্রকে সুন্দর বলিতে কোন শিল্পী পারে নাই। অবশ্য অনেক সময় সামাজিক সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আমরা যাহাকে অপবিত্র বলি তাহাকে শিল্পী অপবিত্র বলেন না। তিনি ভিতরের দিক হইতে শুচিতা অশুচিতার বিচার করেন। তবু নিববচ্ছিন্ন অপবিত্রতাকে তিনি কোনমতেই সৌন্দর্যের সঙ্গে একাসন দিতে পারেন না, এ কথা তো সত্য। কেন পারেন না? কুৎসিত কাজ বা আচরণের দ্বারা আমরা যে জীবনকেই মারি; সে-সব কাজের দ্বারা জীবন প্রসারও পায় না, গভীরতাও পায় না। অপবিত্রতা বা কলুষের দ্বারা আমরা বৃহৎ ও সমগ্র জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হই; আমাদের মন্দ ইচ্ছা বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত হইয়া সকলের যোগে কাজ করিবার অবসর পায় না। এই জন্য মানুষ প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে বরণীয় জানিয়াছে, কারণ শ্রেয়ের পথেই জীবনের পূর্ণমাত্রায় বিকাশ। এবং পূর্ণমাত্রায় বিকাশেই সৌন্দর্য। জীবন যেখানেই অবাধিত ও ক্ষুণ্ণ, সেখানেই সৌন্দর্য ফুটিবেই।

গুহাবাসী আদিম অসভ্য মানব তাহাব নির্মিত যন্ত্রাদিতে ছবি আঁকিয়াছে; সুসভ্য গ্রীক শিল্পের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কোথায়? গ্রীকের মধ্যে অসভ্য মানবের জীবন সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, রূপ পর্যবেক্ষণে যে আনন্দ এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তজ্জনিত যে চাঞ্চল্য তাহা তো আছেই; আরও কিছু আছে। তাহার জীবন ঐটুকুতেই পর্যাবসিত হয় নাই। অসভ্য মানব রূপ দেখিয়াছে, রূপবৈচিত্র্য দেখে নাই। আবার রূপবৈচিত্র্য দেখিলেও সুসমা ও সুসঙ্গতি (harmony) দেখে নাই। গ্রীক তাহা দেখিয়াছিল। গ্রীকের শিল্পে তাই সৌন্দর্য বেশি, কারণ জীবন বেশি। আরও বৈচিত্র্য ও জটিলতা; এবং আরও শৃঙ্খলা ও ছন্দ যদি গ্রীক শিল্পে থাকিত, তবে সে শিল্প আরও বড় শিল্প হইত। শুধু

রূপবদগ্ৰাহ্য জীবন গ্রাককে মুগ্ধ করিয়াছে, অব্যাহত
অতীন্দ্রিয় জীবনের খবর সে পায় নাই। সেই দিক হইতে
হিন্দুশিল্প, চীনশিল্প আবও দূবে গিয়াছে। যে দিকেরই
জীবন হোক, তাহার সরলতা ও সুষমা বৈচিত্র্য-ও
জটিলতাবিহীন হইলে চলিবে না। অল্প পক্ষে বৈচিত্র্য ও
জটিলতা যথেষ্ট আছে, অথচ সুষমা ও সূক্ষ্মহৃতি নাই,
ইহাতেও জীবনের পূর্ণতার অভাব, সুতরাং সৌন্দর্যেরও
অভাব ঘটে।

জীবনের যেখানেই সম্পূর্ণতা, সেখানেই সৌন্দর্য্য অবশ্য-
স্বাভাবিকরূপে দেখা দেয়, একথা যদি মানি, তবে “শিল্প শিল্পের
জ্ঞান” এ মত মানিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু
এই কথাটা বলি এই চুকা যায় না, কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে
আরও কতগুলি সন্দেহ প্রশ্নের আকারে জাগিয়া উঠে।
প্রথম প্রশ্ন—জীবন তো স্বতন্ত্র, তবে তাহার আবার
শিল্পরূপ পরিগ্রহ করিবার সার্থকতা কি? জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্লেটো
শিল্পকে জীবনের অঙ্কুরণ মাত্র মনে করিয়া তাহাকে নিন্দা
করিয়াছেন। বাস্তবিক, অঙ্কুরণের সার্থকতা দেখা
যায় না।

ঐ যে জীবনের সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতার কথাটা বলা
গিয়াছে, উহা কি আপাতদৃষ্টিতে সকলেরই অসুভবগম্য?
জগতের দিকে তাকাইয়া আমরা কি দেখি? জীবনের রূপ
বিচিত্র বটে, কিন্তু অংশে অংশে প্রতিভাত, সম্পূর্ণতা
কোথাও নাই। কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা; কোনটা
তাজা কোনটা ধসা, কোনটা সচল কোনটা অচল ও ধ্বংস-
মুখে পতিত। এই আংশিক জৈব টুকুবাগুলির সমগ্রতা
কোথায়? এই ক্ষণিক জীবনের কণাগুলির সমষ্টি কোথায়?
এই অসমগ্রস বিক্ষিপ্ত রূপগুলি সম্পূর্ণ অণু রূপ কোথায়?
বাহিরের প্রকৃতিতে তাহা যদি পাওয়া যায়, তবে আব
শিল্পের প্রয়োজন ছিল না। বাহিরের প্রকৃতিতে তাহা
পাওয়া যায় না। কবি কল্পলোকে, শিল্পী মনোরাঞ্জে
তাহা পাওয়া যায়। সেইখানে সমগ্রতা, সমষ্টি, সম্পূর্ণতা।
সেইখানে জীবন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। সুতরাং সেখানেই
যথার্থ সৌন্দর্য্য ফোটে। সেই সমগ্রতাব আলোয় বাহিরের
বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে আয়ত্তা দেখি, আব মুগ্ধ হই।
সেই আলো—

That light which never was on land or sea
The consecration and the poet's dream

যে আলো জলে কিম্বা স্থলে কখনো ছিল না,
যে কেবল পুত হইয়া আছে কবির স্বপ্নের মধ্যে।

তार्কিক এ স্থলে অল্প প্রশ্ন তুলিবেন—তবে তাহা কি
‘বস্তুতন্ত্র’ হইল না? এ তো ‘আইডিয়াল’ কল্পিত বস্তু হইল,
মায়িক বস্তু হইল। কিন্তু শিল্পীমাত্রেই বলিবেন যে ইহাই
যথার্থ বাস্তব পদার্থ, যাহাকে reality বলি তাহা হইল।
কারণ আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বহির্জগৎটাকে সচেতন
করি, সে অল্পভূতিগুলি তখনই বাস্তব অল্পভূতি হয়, যখন
জগৎটা বা জীবনটা আমাদের কাছে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত
বিচ্ছিন্ন প্রাতিভাসিক টুকুবা টুকুবা না হইয়া সমগ্রতা সমষ্টি
হয়, যথার্থই বিশ্ব হয়। শিল্পী এই বাস্তব অল্পভূতি
দেয়। শিল্পের মধ্যে সকল শিল্পী এই কাজ করে, যখন
অল্পভূতি বহন করে, এমন কথা বলি না। তাহা হইলে
অবাস্তব, মায়িক কল্পলোকাশ্রয়ী বহু জিনিস আছে।
তাহাদেরও সার্থকতা আছে। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় শিল্প
জীবনের সমগ্ররূপ উদ্ভাসিত করিয়া দেখায়, ইহাতে আ-
কোন সন্দেহ নাই।

একটা প্রশ্ন ও সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করা যাক।
আরও প্রশ্ন আসে। তবে কি শিল্পবস্তু উদ্দেশ্যমূলক?
শিল্পের কি উদ্দেশ্য থাকিতেই হইবে? শিল্পের কাজ কি
আমাদিগকে কেবলমাত্র আনন্দ দান করা নয়?

শিল্প একেব অল্পভূতি অস্ত্রের মধ্যে বসে নিত
কবিবার একটা প্রধান উপায়। আমার মনে যে অল্পভূতি
জাগিতেছে, অস্ত্রের মনে তাহা জাগাইতে গেলে তাহা
বাধ্য হইয়া (অথবা স্বভাবতই বলা ভাল) শিল্পের মধ্যে
লইতে হয়। এইজন্ত রংচং চাই, শব্দবাহার চাই আভাস
ইঙ্গিত চাই, ছলাকলা চাই। এটা একেবারে আদিম শিল্প
প্রবৃত্তির (art-instinct) কথা। পক্ষী-পক্ষিণী মননকে
পরস্পরকে আকৃষ্ট করিবার জন্ত গান গায়, পশুভূতদিগ-
বলেন যে তাহাদের গানের অর্থই তাই। এই যে প্রথম
অল্পভূতি অস্ত্রের মনে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা, তাহা
হইতেই যত ছলাকলার উৎপত্তি। কাউন্ট ট-ম-
ইহাকে ‘infection’ ছোঁষাচ বলিয়াছেন। শিল্প

ছোঁয়াচে জিনিস। এ ছোঁয়াচ সকলকেই ধরিলে ধরিতে পাবে।

কিন্তু শিল্পের এই আদিগ উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার তার চেয়ে বড় এবং সর্বপ্রধান আর-একটি উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে। তাহা, জীবনের অমুভূতিকে বহন করা বা সঞ্চারিত করা। এই জায়গাটিতে উদ্দেশ্য আছেও বটে নাইও বটে। কারণ উদ্দেশ্য বলিলেই যে-রকম একটা পূর্ব-হইতে-চিন্তিত স্থানির্দিষ্ট ব্যাপার মনে হয়, শিল্প তাহা আদর্শেই নয়। ইহা একেবারেই স্বতচ্ছূর্ত, স্বতোচ্ছূসিত। যেমন আমরা হাসি কান্দা, তেমনি আমরা জীবনের অমুভূতিকে শিল্পে প্রকাশ করি। জীবনে আমাদের যেমন আনন্দ, শিল্পে তেমনি আনন্দ।

অতএব, জীবনের অমুভূতি যদি শিল্পের অন্তর হয়, তবে সেই অমুভূতিকে যে ছলাকলার সাহায্যে অন্যেব মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়, তাহা শিল্পের কল্পনা। বস্তুটাই আসল না রূপটাই আসল, ইহা লইয়া তর্ক আছে। দুইই পরস্পরাপেক্ষী।

জীবনে ও শিল্পে বিচ্ছেদ যদি না ভাবি, তবেই শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা সহজেই নির্ণয় করিতে পারিব। ম্যাথু আর্নল্ড কবিতার সংজ্ঞাদিতে গিয়া লিখিয়াছেন “Poetry is, at bottom, a criticism of life.” অর্থাৎ কাব্য জিনিসটা তলাইয়া দেখিতে গেলে জীবনের সমালোচনা। ম্যাথু আর্নল্ড সমালোচক ছিলেন; তরাং সমালোচনার কথাটাই তাঁর সকলের আগে মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্য সমালোচনা নয়; কাব্যই। অবশ্য সমালোচনাও যে সৃষ্টি হয় না তা বলি না। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা সমালোচনা বলিতে যে বিশ্লেষণ বা তাহা পাছে কাব্যের সংজ্ঞা-নিরূপণের সময়ে মনে আসে, তাই সমালোচনা কথাটা কাব্যেব সংজ্ঞার্থে ব্যবহার বিতে. আপত্তি কবি। জীবনকে কেবলি আবিষ্কার, জীবনের উপকরণ-বিচিত্রতাকে কেবলি প্রত্যক্ষীকরণ, ও তাহা হইতে নব নব রসসৃষ্টি—ইহাই সাহিত্য। সকল দল মোটের উপর এই উদ্দেশ্য সাধন করিলেও, সাহিত্যে বা যত বিকাশ এবং পবিপূর্ণ মাত্রায় বিকাশ এমন অন্ত্যায়ক নয়। ইহাই আজ আমি প্রতিপন্ন করিতে চাই।

সাহিত্য সকল শিল্পের সমন্বয়ীকৃত শিল্প। কেন এ কথা বলি তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করা যাক।

কতকগুলি শিল্প আছে যাহা বাহিরেব বিষয়াপেক্ষী। বাহিরের বিষয়কে শিল্পী আপনার কল্পনার ছাঁচে ফেলিয়া রূপান্তরিত করিয়া সৃষ্টি করেন। অবশ্য ইহা অমুকরণ নয়, কারণ শিল্পের কাজ সৃষ্টি, অমুকরণ কখনই নয়। আবার কোন কোন শিল্প আছে যাহার বিষয়, রূপ, সমস্তই শিল্পী কর্তৃক উদ্ভাবিত, শিল্পী কর্তৃক সৃষ্টি।

সঙ্গীত শেফোক্ত শ্রেণীর শিল্প। সঙ্গীতের বিষয়, রূপ, সমস্তই সঙ্গীতশিল্পী কর্তৃক উদ্ভাবিত। চিত্রকলা, নৃত্যকলা, প্রভৃতি কলা পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, জীবনের ব্যাপারে এইরূপ শ্রেণীভেদ করা শক্ত। ভেদ রেখা দেখিতে দেখিতে কখন যে বিলোপ পায় তাহা আগে ভাগে হিসাব করিয়া বলা যায় না। মোটের উপর বলা যায় এই যে, সঙ্গীতের কালের (time) সঙ্গে সম্বন্ধ; চিত্রকলার আকাশের (space) সঙ্গে সম্বন্ধ। সঙ্গীতের মধ্যে গতির দিক; চিত্রে স্থিতির দিক। কিন্তু এ কথাও ঠিক খাটে না, কারণ গতি ভিন্ন চিত্রেও সম্পূর্ণ হয় না। জাপান ও চীনে বোধ হয় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। জীমং ওকাকুরা তাঁহার ‘প্রাচ্যের আদর্শ’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন “শাকাবু পঞ্চম শতাব্দীতে চিত্রশিল্পের যত্ন বা ছয়টি সূত্র নির্ধারিত করিয়াছিলেন; বাহিরের প্রকৃতিকে চিত্রিত করাকে তিনি খুব নিয়ন্ত্রণ দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম সূত্র এই, ‘বস্তুর ছন্দের ভিতর দিয়া আত্মার প্রাণ-গতি’ (‘The life-movement of the spirit through the rhythm of things’)—ইহাই চিত্র-শিল্পের প্রধান অঙ্গ। কারণ শাকাবুর মতে শিল্পমাত্রেরই বিশ্বের একটা বিশাল মনোভাব বই আর কিছুই নয়; এবং বস্তুরাজ্যের মধ্যে যে-সকল ছন্দোময় নিয়ম আছে তাহাদের ভিতর দিয়া তাহা চলিতে চায়।” ইহার চেয়ে বড় শিল্প-সূত্র কোন দেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। একদিকে বস্তুরাজ্য, অন্যদিকে মনোবাস্য—বস্তুরাজ্যে ছন্দ, এবং মনোবাস্যে প্রাণ-গতি, এই দুয়ের যোগে শিল্প। সেই মনও সংকীর্ণ মন নয়; সে বিশ্ব-মন। বস্তুরাজ্যও অসংহত বিক্ষিপ্ত বস্তুরাজ্য নয়, ছন্দিত নিয়মিত বস্তুরাজ্য। সুতরাং চিত্র ও সঙ্গীতের মধ্যে স্থান ও কালের হিসাবে

ভেদ থাকিলেও গতিতত্ত্ব উভয়েই আছে। যে চিত্রে life-movement নাই, তাহা চিত্রই নয়।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রেণীভেদ কড়াকড় রকম দাঁড় করানো চলে না; তবু ভেদ আছে, ইহা স্বীকার্য। গানে যে 'life-movement' প্রকাশ পায়, যে জীবনগতি প্রকাশ পায়, ছবিতে ঠিক সেই পরিমাণে জীবন-গতি প্রকাশ পায় না। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এক জাগরণ গান এবং ছবির মধ্যে এই ভেদ দেখাইয়াছেন যে, গান সীমা হইতে অসীমে যাওয়া এবং ছবি অসীম হইতে সীমায় আসা। দুয়ের গতি দুই ভিন্ন রকমের গতি। এই জগতের মধ্যেও বোধহয় স্থান এবং কালের (space and time) সম্বন্ধটা ছবি ও গানের সম্বন্ধেরই মত।

সাহিত্যে এই গানও আছে, ছবিও আছে। সাহিত্য "ছবি ও গান" একাধারে। গীতিকাব্যে ও অত্যাচ্ছ কাব্যে গানের ভাগ বেশি; গল্প-উপন্যাসে ছবির অংশ বেশি; নাট্যে ছবি ও গান পূর্ণসম্মিলিত।

অত্যাচ্ছ সকল শিল্পের চেয়ে বোধহয় গানের শক্তি সকলের চেয়ে বেশি। গানে কথা নাই, কথার দরকারও নাই। "মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন" গান যে-লোকে উড়িয়া যায়, সে-লোকে আমরা ইন্দ্রিয়গম্য ধরিবার-ছুইবার-মত কিছুই পাই না; কোন স্পষ্ট হৃদয়াবেগও বুঝি না; অথচ আমাদের ভিতরকার গভীর, গভীরতম স্বপ্ন, সূক্ষ্মতম চিন্তাবগুলি, moodগুলি, কেমন করিয়া যেন নাড়া পায়। আর কিছুতেই যেন তাহাদের সেই গোপন দরজাঘ ঘা দিতে পারিত না, এই মনে হয়। কেন যে এমন হয় তাহা গানের মোহিনী মায়া ষাহারা জীবনে বারংবার উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারাও বলিতে পারিবেন না। একটা কারণ বোধহয় "rhythm of things" বস্তুব্রাজ্যের তরঙ্গিত ছন্দের দোলের ভিতর দিয়া "life-movement" জীবনগতি গানে যত ব্যক্ত হয় এমন আর কিছুতে নয়। স্বরের একদিকে আবেগের কম্পনমালা; অত্রদিকে তাল এবং লয়ের যথার্থ পরিমাণ। আর কানে এবং মনে সেই দুয়ের আন্দোলে কখনো অতৃপ্তি, কখনো বিবহ, কখনো অনির্বচনীয় মাধুর্য, কখনো স্বগভীর অবসাদ—নানা মনো-

ভাব ও অসুভাব—এমনি আপনি উঠিয়া আসে, এমন হয় যে সত্যসত্যই বাহিরের জগৎ এবং মনোজগৎ এক সুরে বাঁধা বীণার তারের মত—একের আধাও অগুটি বাজিয়া উঠে। এটা যে একটা কল্পনা মাত্র নয়, এটা সত্য, তাহা জীবনের গতি দেখিলেই আমরা বুঝি। গতি মাত্রেরই ছন্দিত গতি। দিন এবং রাত্রি, দক্ষিণায়ান উত্তরায়ান, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নিশ্বাস প্রশ্বাস, স্বপ্নপিণ্ডের দ্বিধাভ্রমণ, কৈশোরাবস্থা ও বৈদ্যুতিক শক্তি—সর্বত্রই ছন্দ এবং বাবে সু-মি-দ্বিষ্ট। এই বিশ্বছন্দকে বিজ্ঞান আবিষ্কার বদেবাব বহুপূর্বে মানুষ আপনার ভিতর হইতে এই ছন্দকে বাহির করিয়াছে। ছন্দে কথা বলিলে কি ফল হয় তাহা সে পূর্বে করিয়া লইয়াছে। মানুষের কাব্যে এই ছন্দ সবচেয়ে বড় অঙ্গ হইয়াছে। কাব্য মানেই গান—শুধু অর্থযুক্ত গান এই কথা তফাৎ।

সেই অত্যাচ্ছ কাব্যে এমন সকল হৃদয়াবেগ (mood and emotions) জাগ্রৎ হয়, যাহা গানেও সব সময়ে পান না। লিরিক জিনিসটা বিশেষভাবে গাহিবার জিনিস; তাহা লিরিক কবিতা গান করিয়াই পড়া উচিত। প্রাচীন গ্রীসে লিরিক কবিতা গীত হইত। কবি ইয়েটস্ দেখাইয়াছেন যে এখনো কবিতা এবং ছন্দোময় গদ্যও সুর বহন পড়া চলে। গল্পও সুর করিয়া পড়া চলে। গান বহন পড়িলেই তবে আমরা তাহাদের যথার্থ রসগ্রহণে সক্ষম হই। আমার মনে হয় প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্যন্ত সর্বত্র গীতিকবিতা (যাহাদের মধ্যে গানই প্রাণ) গানের গুরু হওয়া উচিত। তাহার ঠিক সুরটি পাইলেই তবেই তাহা যে-সকল হৃদয়াবেগ যে-সকল চিন্তাব জাগাইতে চান তাহা জাগাইতে পাবে। ইংরেজি সাহিত্যে শেলি, মুর, রসেট, টেনিসন, সুইনবার্ণ প্রভৃতির অনেক কবিতা, এবং অসুভাব পড়িয়া বুঝা যায় যে, জার্মান সাহিত্যে হাইনে, ফরাসী সাহিত্যে ভিক্তর হুগো, গোতিয়ে, বাল্জাক প্রভৃতির কবিতাও গানের জিনিস। আমাদের দেশে যুগীয় সকল কাব্য-সাহিত্যই দৌহা-জাতীয় ছিল। আমাদের সবই গান, কবীরেরও তাই। বৈষ্ণব কবিতাও গান। এখনও বাংলার শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা

কবিতাই গান। আর তাঁহার যে-সব কবিতা ঠিক গান নয়, তাহাও গীতের যোগ্য। স্বকীয় সাহিত্যেও সবই প্রায় গান। এই সমস্ত লিরিক কাব্যে স্বরটাই লক্ষ্য, কথা উপলক্ষ্য। কথা স্বরকে আচ্ছন্ন করে না, স্বরকে অচ্ছন্ন করিয়া স্বরের সাহায্যে কতগুলি হৃদয়াবেগকে জাগায়।

শেলি যখন Ode To The West Wind লিখিয়াছিলেন তখন তাঁর মর্মগত কথাটি ছিল এই :—

“Make me thy lyre, even as the forest is”

অর্থ যেমন তোমার বীণা, তেমনি হে দুর্দগ পবন, আমাকে তোমার বীণা কর।

শেলিও অধিকাংশ কবিতাই গেম। বার্নস্ যখন গাহিয়াছেন :—

Oh my love's like the melodie
That's sweetly played in tune.

আমার প্রেম সেই গান যাহা স্বরে বড় মধুর বাজে।—তখন তিনি জানিতেন যে তাঁর কবিতাগুলি গানেরই জিনিস।

টেনিসনের কবিতার প্রাণও যে সঙ্গীত, তার প্রমাণ তাঁর idyllগুলিকেও তিনি গান দিয়া গাঁথিয়াছেন। “The Brook” খুব স্পষ্ট একটা উদাহরণ। The Princess, Maud প্রভৃতি কাব্যও গানে-গল্পে গাঁথা। অল্প-মসী ভাই-বোনের মত তাহাদের পরস্পরের চেহারার পার্থক্য বুঝা যায় না।

সুইনবর্গের কবিতা সম্বন্ধে নিম্না এই যে ছন্দের ঝঙ্কারে তাহার বলিবার কথা যদি কিছু থাকে তাহা আচ্ছন্নপ্রায় হইয়া যায়। অমন ছন্দের বৈচিত্র্য ত আর কাহারও দেখা যায় না।

ব্রাউনিংএর কবিতায় গানেও অভাব, ব্রাউনিং সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই। সাধারণতঃ তাই বটে, যদিচ গান না থাকিলেই যে কোন কবিতা কবিতা-হিসাবে হীন হইবে তাহার কোন মানে নাই। ইহার পরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, যে কবির কবিতায় শুধু গান বা শুধু ছবির সন্ধান না ফুটিয়া উয়ের সম্মিলনে নাট্যরস ফোটে, তিনি কলের চেয়ে বড় কবি। ব্রাউনিংএর কবিতায় এই নাট্য-

রস প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। তবু বিস্তৃত গানের কবিতা ব্রাউনিংএ যে নাই তাহা বলিতে পারি না। Abt Vogler একটা মস্ত উদাহরণ।

“Would that the structure brave, the manifold
music I build,
Bidding my organ obey, calling its keys to
their work—”

ইত্যাদি যখন পড়া যায়, তখন মনে হয় আব্বট ভোগ্লাব যেন অরগেনে বসিয়া গিয়া বাজাইতে শুরু করিয়াছেন এবং সেই অশ্রুত বাজনা কবিতাটির ভিতর হইতে স্বগন্তীর ছন্দে ধ্বনিত হইয়া বাহির হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে—

সমুদ্রমল্লের ছন্দ—

“হে আ | দি | জননি | সিদ্ধু | বজ্র | রা | সন্তা | ন
তোমার | একমাত্র | কন্যা | তব | কোলে | তাই | তজ্জা |
নাহি আর | চক্ষে | তব তাই | বন্ধ | জুড়ি | সদা | শঙ্কা | সদা
আশা | সদা | আন্দো | লন তাই | উঠে বে | দ মস্ত | সম
ভাষা | নিরন্ত | র প্রশান্ত | অম | রে মহেশ্বর | মন্দির
পানে | অন্ত | রেব অনন্ত | প্রার্থনা | ।” ইত্যাদি।

ঐ কবিতায় ভাল করিয়া যুক্তাক্ষরগুলির উপর ঝাঁক দিয়া দিয়া পড়িলে সমুদ্রতরঙ্গের ধ্বনির অম্লকার পরিস্কার টেব পাওয়া যায়। যেমন মাইকেলের :—

বাদঃ। পতি রোধঃ। যথা চলো। শ্মি-আঘাতে।

এই একটি পংক্তিতে বিসর্গের সাহায্যে এবং ‘চলোদ্বিগ্ন’র ‘ও’কারে ঝাঁক পড়ার জন্য সমুদ্রতরঙ্গের তটে আঘাত করিবার অম্লকৃতি-স্বর বাজিতেছে। মাইকেলের ছন্দেরও বিচিত্র দোল আছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর বাংলার কোন কবিরই অত ছন্দবৈচিত্র্য নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঝড়ের রোল :—

বীণাতন্ত্রে | হান হান | ধরতর | ঝঙ্কা | র ঝঙ্কা | না...
তোল | উচ্ছ্বস |—

সেই বর্ষশেষের কবিতাটি পড়িলে পূবাপুরি ঝড়ের সঙ্গীতরস আদায় করা যায়।

আবার বর্ষের স্বর :—

ঐ। আসে ঐ। স্রতি ভৈ। রব হরষে.....
জলসি। ক্ষিত। ক্ষিতি সৌ। রত রভসে....।

ঘন গোঁ। রবে। নব ঘোঁ। বনা বরষা.....।

শ্রাম গম্। ভীর সরসা.....।

এ কবিতা মেঘগর্জনের গুমগুম আওয়াজের এবং ঝুমঝুম বাবিপাতের সঙ্গে স্বর মিলাইয়া পড়িলে তবে ইহার ছন্দের দোল ঠিকমত গলায় আদায় করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দেব বিচিত্র দোল। “Life-movement” বা জীবনগতির অনেক ছন্দই তাঁহার জীবনকাব্যে আন্দোলিত দেখিতে পাই। বাস্তবিক গীতিকাব্যে গানটাই আসল প্রাণ। কারণ গানই যে জীবনের নাড়ী; জীবনের সমস্ত স্পন্দন ঐ গানে যত প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই নয়। সুতরাং ঠিকমত ছন্দ পড়া একটা অত্যন্ত দুঃসহ কাজ, ইহা আমরা অনেক সময় মনে রাখি না। কারণ কবিতা-পাঠের কালে শুধু ভাল ও লয় পাইলেই হইল না, ভাবের ওঠানাবার সঙ্গে-সঙ্গে স্বরের ওঠানাবা—কোথাও বেশি জোর, কোথাও মৃদু জোর, কোথাও স্পর্শমাত্রায় কেবল ছুঁইয়া যাওয়া, কোথাও স্বল্পঘটি কোথাও দীর্ঘ বিরতি—এ সমস্ত আয়ত্ত করিলে তবে কবিতা ঠিক পড়া যায়। কবিতা ঠিকমত পড়া হয় না বলিয়া কবিতার রসমাধুর্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়, ইহা আমার বিশ্বাস।

শুধু কবিতার ছন্দেই যে “Life immense in passion, pulse and power” আবেগ শক্তি এবং চঞ্চল নর্ত্তনপূর্ণ জীবনের সমস্ত আন্দোলন ধরা পড়ে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। পয়ার ত্রিপদীতে যখন কুলায় না তখন অমিত্রাক্ষর ছন্দের দরকার হয়। গাইকেলের তাহাই দরকার হইয়াছিল। সেও একটা ‘structure brave’ এবং ‘manifold music’। একটা সাহসপূর্ণ গীতের গড়ন, বিচিত্র সঙ্গীত বটে। তাহার ছন্দের দোল বিচিত্র, বিরামঘতির সংস্থান বিচিত্র বলিয়া নানা মনোভাব(moods)

তাহা জাগ্রত করিতে তিলমাত্র ক্রেশ পায় না। কখনো কল্পনা, কখনো ব্যাকুলতা, কখনো বেদনা, কখনো রুদ্ধতা। এপিক মাত্রের গানই এই বড় গান। মিল্টনের এই বড় ছন্দ, সম্ভবতঃ হোমারের ছন্দেও এই বিচিত্র বৃহৎ দোল আছে। ইহাব যে হার্মনি তাহা সমুদ্রতবঙ্গরাজির নানা ধ্বনির হার্মনি বা স্বরসঙ্গতিব মত। কখনো তরল, কখনো

গম্ভীর; কখনো মৃদুপুনিকণের মত, কখনো বজ্রাঘাতের মত।

অবশ্য মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে, শোন বাস। পৌরাণিক কাহিনীগত এপিকের যুগ গেলেও অদল এপিকের যুগ কখনই যায় নাই এবং কখনই যাইতে পারে না বলিয়া আমরা বিশ্বাস। গীতিকাব্য একলার গান, মহাকাব্য বা এপিক অনেকের গান, সমাজের গান, জাতির গান। সে এপিক সব সময়েই লিখিত হইবে। ইংলণ্ডে পিউরিট্যান্ যুগে মহাকবি মিল্টন যেমন লিখিয়াছেন, ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে দান্তে যেমন লিখিয়াছিলেন, তেমনি এযুগেও কাব্যে না হোক্ গদ্যে বা উপন্যাসে মনো-মধ্যে সে-রকম এপিক লেখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। হুইটম্যানের Leaves of Grass এক হিসাবে নব্য আমেরিকার এপিক বলিতে পারি। ডব্লিউডব্লিউ ‘The Idiot’ বা ‘The Possessed’ এক হিসাবে রুশদেশের এপিক, ইহাও বোধ হয় বলিতে পারা যায়। এখনও এপিক হয় নাই, এপিকের সম্ভাবনা আছে।

গান গেল, এবার ছবিব দিকটা সাহিত্যে কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখা উচিত। গানের সঙ্গে ছবির এই একটি বড় তফাৎ যে, গানে কোন symbol বা বিগ্রহের সাহায্যে জীবন-গতিকে বুঝাইতে হয় ন। ঠিক বীণার তারে বা দিলে যেমন সঙ্গীত বাজে, তেমনি আমাদের দ্বায়ুতন্ত্রে বা দিয়া গান জীবনের স্পন্দন জাগায়। ছবিকে বিগ্রহের সাহায্য লইতেই হয়; কারণ ছবি নিজেই বিগ্রহ। তাই তাহার রস আবার ভিন্ন। কিন্তু বিগ্রহ বলিলেই হইল না—ছবিকে আলো ছায়ার সম্প্রাণে শুধু রেখা টানিয়া শুধু রং দিয়া ঐ ‘life-movement’ জীবনগতিকেই প্রকাশ করিতে হয়।

ওখানে গানের বেলায় যেমন স্বর মনোভাবকে প্রকাশ করে, এখানে ছবির বেলায় তেমনি রং করে, রেখা রবে ক্রমাগতই চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর তাই নব নব বিগ্রহ গড়িতেছে। আধুনিককালে Impressionism, Futurism প্রভৃতি যে-সবল কলারীতি দেখা দিয়াছে, তাহাবা কলাব নূতন নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছে ও বাঁধা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। ফরাসী এক শ্রেণী

Impressionismএ বলে যে কোন একটা ঘটনা, যেমন ধরা যাউক, কাহারও জন্ম বা মৃত্যু চিত্রিত কবিত্তে হইলে অঙ্কিত দৃশ্যের ভিতরকার শুধু একটা বিশেষ রংয়ের উপর দর্শকের সমস্ত দৃষ্টি ও মনোযোগকে শিল্পী নিবদ্ধ করাইতে চেষ্টা করিবে। সেই বংয়েই সমস্ত ঘটনার রূপটি ফুটিবে। পূর্বতন কোন শিল্পী হয়ত সেই ঘটনার নানা খুঁটিনাটির কথা ভাবিত, সেই ঘটনাব অন্তর্গত চরিত্রগুলিকে সমুদয়ান করিত। এই-সকল নূতন চিত্ররীতি সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়াছে। গল্পে উপন্যাসে বিশেষ ভাবে আসিয়াছে বলিতে পারি। একটা ঘটনা বা চরিত্রকে ফুটাইতে গেলেই ছবি আঁকার বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। এ বিষয়ে চিত্রকলার রীতিরও যেমন বদল হইতেছে, সাহিত্য-চিত্রের রীতিরও তেমনি বদল হইতেছে। স্ফুট যে ভাবে উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র আঁকিয়াছিলেন এখনকার ঔপন্যাসিক সে ভাবে আর আঁকে না। সে ঠিক ঐ আলোটি ফেলার কায়দা নানা-রকম করিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে কতক ব্যক্ত করে; কতক আভাসে (Suggestion) রাখে। টুরগেনিভ কি বাল্জাক, কি ফ্লোবেরের চিত্রশিল্পের সঙ্গে আর স্ফুট-ভিক্সের এই রকমের বিস্তর প্রভেদ। Pere Goriotতে বাল্জাক শুধু গোরিষোর পিতৃশ্রের উপর এমনি আলো ফেলিয়াছেন যে সমস্ত উপন্যাসের সব বিচিত্রতার settingএ গোরিষো একান্ত নিবিড়ভাবে দেখা দিয়াছে। হথর্ণের Scarlet Letterএ ঐ লাল 'A' অক্ষরটির উপর যত আলো নিক্ষেপ। উষ্টয়ভ্‌স্কির উপন্যাসের ছবি জটিল; সন্ধানে অনেক চিত্রের জটলা। তবু কালিমাময় অপরিচ্ছন্ন রংয়ের উপর স্নিগ্ধ মেঘালোক পড়িলে অতিতুচ্ছ জিনিসও যেমন মহিমাম্বিত হয়, উষ্টয়ভ্‌স্কির উপন্যাসে তাহাই হইয়াছে। "The Idiot"এ প্রিন্স মুস্কিনের বিশাল আত্মবিস্মৃত উদাভতার আলোয় তাহার সঙ্গী যত আসামী, তত জালিয়াত, যত বদমায়েস—সকলেই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যেন। ছবিতে যেমন Portrait আঁকা আছে, আবার ঘটনার ছবি আঁকাও আছে, তেমনি কোন কোন উপন্যাসে Portrait বা একটিমাত্র ছবির রস পাওয়া যায়। যেমন আনাটোল ফ্রান্সের The Crime Of Sylvestre

Bonnardএ শুধু একটি বৃদ্ধা প্রোফেসরের ছবি। Gogolএর The Dead Souls উপন্যাসে Chichikovএর একটিমাত্র ছবি। Turgenevএর On the Eveএ শুধু একটি জ্বীলোক Elena'ব ছবি—আর সবাই কতকটা ছায়ায় মত। আবার কোন কোন উপন্যাসে বিচিত্র ছবির মিশ্রণ উপভোগ করা যায়। উষ্টয়ভ্‌স্কির উপন্যাসাবলীতে সেই বৈচিত্র্যের রস যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অথচ সে বৈচিত্র্যের ছবি পূর্বেকার উপন্যাসের বৈচিত্র্য নয়।

নাটকে শুধু ছবি নয়, গানও আসে। কারণ নাটকে নানাবিধেব ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাত উপন্যাসের চেয়ে বেশি করিয়া দেখান হয়। উপন্যাসে যে এ জিনিস একেবারে নাই তাহা বলি না। তবে নাটকে এই ঘাত-প্রতিঘাত থাকিতেই হইবে, নহিলে নাটকই হয় না—বিচিত্র চরিত্রের, বিচিত্র স্বার্থের, বিচিত্র ঘটনার ভিতরকার শক্তিগুলার, পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাত। নাটকে তাই চিত্র যেমন চাই, ছন্দও তেমনি চাই। শুনা যায়, বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা Wagner বলিয়াছেন যে, সবচেয়ে বড় শিল্প গান এবং নাট্যের মিশ্রণে উৎপন্ন হইবে। আমার মনে হয় সে কথার মধ্যে কতকটা সত্য আছে। নাটকে আরম্ভে, বিচিত্রতা, বৈপরীত্য ও জটিলতা; এবং পরিণামে বা climaxএ শান্তি ও ছন্দ। নাটক তাই জীবনের গতির শ্রেষ্ঠ রূপ। সুতরাং নাটকেই আমরা সব শিল্পের একত্র সমাবেশ দেখি। নাটকের মধ্যে গানও নাট্যবেশে ও নাট্যরূপে দেখা দেয়; অর্থাৎ নানা রূপরবের সংঘাত-সঙ্গীত বাজে। বিখ্যাত ওয়গনারের গানই তাহার উদাহরণ। সে গানের মধ্যে নাট্যবস যথেষ্ট। যেমন গানের স্থান তেমনি চিত্রের স্থান নাটকে দেখিতে পাই। গানের সঙ্গে নৃত্যকলাব যোগও নাটকে ঘটিয়াছে। এবং স্থাপত্য শিল্পে (architecture) স্তম্ভের সঙ্গে স্তম্ভের, খিলানের সঙ্গে প্রাচীরের, এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংঘাতে যে বিচিত্র শব্দনি বা পূর্ণসৌষ্ঠব দেখা দেয়, নাটকের গঠনেও ঠিক সেইরূপ দেখা যায়। তাহার একটা গঠনগত পূর্ণাঙ্গ ঐক্য (Structural organic unity) আছে। বোধ হয় এই কারণেই সকল সাহিত্যই আজকাল প্রধানতঃ নাটকেব ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশে এত ব্যস্ত। লিরিকও

কোনো সাড়া নেই।

“মিগেল্‌স্! মিগ্‌ল্‌স্ গো!” গাভোয়ানের মেজাজ ক্রমেই চড়ে উঠতে লাগল। সহিসটাও তাব সঙ্গে যোগ দিয়ে একটু মন-ভুলানো স্বরে ডাক দিল “ও মিগ্‌ল্‌স্; মিগি, মিগ্‌!” কিন্তু মিগ্‌ল্‌সের কোনো সাড়া শব্দই মেলে না। জঙ্গ-বাহাদুর এতক্ষণ পবে ঘানলাব খড়খড়িটা নামিয়ে গলাটা বের করে গাভোয়ানকে পবে পবে অনেক-গুলো প্রশ্ন করলেন। সেগুলোর ঠিক ঠিক জবাব যদি পাওয়া যেত, তা হলে সব বহস্য মীমাংসাহুয়ে যেত; কিন্তু গাভোয়ানের সে-বকম কোনো মতলব দেখা গেল না, সে প্রশ্নের উত্তর দেবার বদলে টেচিয়ে বলল “মশায়রা যদি সাবা বাত ডাকগাড়ীতেই না বসে থাকতে চান, তা হলে সবাই মিলে উঠে একবাব মিগ্‌ল্‌সকে ডাক দিলেই ভাল হয়।”

তাব কথা-মত আমবা সবাই মিলে প্রথমে একতানে মিগ্‌ল্‌সকে ডাক দিলাম, তারপর এক-একজন আলাদাও ডাকলাম। আমাদের পালা শেষ হবানাত্র, গাড়ীর উপর-তলার যাত্রী এক আইরিশম্যান “মেইগেল্‌স্” বলে এক হাত দিল। তার উচ্চারণে বিশেষ আয়োদ অল্পভব করে আমবা হাসতে শুরু করেছি, এমন সময় গাভোয়ান হাত তুলে বলল “চুপ্‌!”

আমরা চুপ কবলাম। দেয়ালের ওপাশ থেকে আমবা মিগ্‌ল্‌সকে যে কবকমে ডেকেছিলাম, সব কটাই খুব জোরে আবার শোনা গেল, এমন কি শেষে “মেইগেল্‌স্” বলতেও বাদ পড়ল না।

জঙ্গ-বাহাদুর বললেন “এমন আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি আমি আর কখনও শুনি নি।”

গাভোয়ান উচু গলায় দিবিয়া গেলে বলে উঠল “আচ্ছা পাক্সি যাহোক। ও হে মিগ্‌ল্‌স্, একবাব বেবিয়ে নিজের মুখখানা দেখাওইনা! পুরুষ বেটাছেলে, তোমার এ কি কাণ্ড! আমি হলে তোমার মত আঁধারে লুকাতে যেতাম না!” গাভোয়ান যুবা বিল এইভাবে রেগে নাচতে আরম্ভ কবল।

দেয়ালের আড়াল থেকে আবার সেই ডাক শোনা গেল “মিগ্‌ল্‌স্, ও মিগ্‌ল্‌স্!”

এইবাব জঙ্গ-বাহাদুর আসরে নামলেন। নামটাকে যতদূর সম্ভব মোল-য়েম কবে নিয়ে তিনি স্বরূপ করলেন “ও মশায়, মিষ্টাব মাইঘেল, এমন বাড় জ্বলেব সময়টা বিপন্ন মাহুঘবে যে জ্বায়গা দিতে চাচ্ছেন না, এটা কি ভাল হচ্ছে মশায়, বলি ও—” জঙ্গ-বাহাদুরের মুখেব কথা মুখেই থেকে গেল, দেবালেব ওপাশ থেকে আবাব “মিগ্‌ল্‌স্” ডাক আর হাসিব গরবা ছুটে এসে তাঁব গলার স্বব একেবাবে ডুবিয়ে ফেললে।

যুবা বিলেব আর সুইল না। রাত্তা থেকে একখানা মন্ত পাখর তুলে, তার একঘায়ে গেটের হুড়কার দফা নিকেষ কবে, সে আর ডাকপিওনটা ভিতরে ঢুকে পড়ল। আমবাও পেছন পেছন চললাম। জনমানবেব চিহ্ন নেই। ঘুটুঘুটে আঁধারে আনরা এইটুকু বুঝলাম যে আমবা একটা বাগানে ঢুকেছি, গোলাপগাছগুলোর ভিজে পাতা থেকে আনাদের গানে একটা ছোটখাট বৃষ্টিরারা ঝবে পড়ল। একটা লম্বা খবণের কাঠেব বাড়ীও দেখা গেল।

জঙ্গ-বাহাদুর যুবা বিলকে জিজ্ঞাসেব করলেন “এই মিগ্‌ল্‌সকে চেন নাকি?”

“চিনি না, চিনবাব কোনো ইচ্ছেও নেই!” মিগ্‌ল্‌সেব ব্যবহারটা যে পাওনিয়ার ডাকগাড়ী কোম্পানীব প্রতি অত্যন্ত অপমানজনক, এই ভেবে যুবা বিল বড়ই খাপ্পা। সে বাড়ীতে ঢুকে পড়বার জোগাড় করছে দেখে জঙ্গ-বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে বল্লেন “আবে বাপু অচেনা লোকের বাড়ীতে—”

যুবা বিল খোঁচা দিয়ে বলে উঠল “দেখুন মশায়, আপনাবা এক কাজ ককন, যতক্ষণ না কেউ বাড়ীর কর্তার সঙ্গে আপনাদের আলাপ পবিচয় কবে দ্যায, ততক্ষণ ডাক-গাড়ীতে গিয়ে বসে থাকুন। অত ভদ্রতা আগার পোষায় না, আমি চল্লু ভেতরে!” সে খাঙ্কা দিয়ে ঘরের দরজা খুলে ফেলল।

একখানি লম্বা ঘর, তার চিমনির নিবু-নিবু আগুনের অস্পষ্ট আলোয় ঘরের দেয়ালের বিচিত্র-ছবি-আঁকা কাগজ দেখা যাচ্ছে, একজন কে সেই আগুনের খারে একখানা বড় আবামকুর্সীতে বসে। ঘবে ঢুকেই সবটা একখানা ছবির মত আমাদের চোখে পড়ল।

যুবা বিল সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল “ওহে, তুমিই মিগ্ল্‌স্‌ নাকি?” মানুষটি কথার উত্তর ত দিলই না, একবার নডলও না। যুবা বিল তার সামনে এগিয়ে গিয়ে ডাকগাড়ী ব লঠনটা তুলে ধরল। একটি মানুষেব মুখ দেখা গেল, সে যেন অল্প বয়সেই বুড়ে হয়ে পড়েছে, মুখেব চামড়া কুকড়ে গিয়েছে, চোখের চাউনি তাব পেঁচাব মত অকারণ-গস্তীব। আলো লাগাতে সে তার বড়-বড় চোখ দিয়ে একবার লঠনটাব আর যুবা বিলের মুখের দিকে চাইল, তারপর একদৃষ্টে সেই লঠনেব দিকেই চেয়ে রইল, আব কিছুই যেন সে চিন্তে পারল না।

যুবা বিল অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলল “ওহে মিগ্ল্‌স্‌, তুমি কালো নাকি? বোবা যেনও তাব পরিচয় ত আগেই পেয়েছি।” এতেও কিছু সাড়াশব্দ না পেয়ে যুবা বিলেব আর বৈধ্য রইল না, সে ঐ লোকটিকে ধবে এক ঝাঁকানি দিল।

ওমা! সেই লোকটি তফুনি কাপড়ের পুঁটলির মত চেয়ারেব মধ্যে গড়িয়ে পড়ল, লম্বাতেও যেন হঠাৎ আধখানা হয়ে গেল। আমরা ত ভড়কে গেলাম।

“কি আপদ, এমন কাণ্ডও ত কোথাও দেখিনি,” বলে যুবা বিল একটু অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়াল।

জঙ্গ বাহাহু ব এগিয়ে এলেন, আমরা সবাই ধরাধরি কবে জড়পুঁটলি লোকটিকে আবার সোজা কবে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। বিলকে লঠন হাতে করে বাইরে খোঁজ কবতে পাঠান গেল, কাবণ লোকটিব অবস্থা দেখেই বুঝলাম যে কাছাকাছি নিশ্চই আরও লোকজন আছে। আমরা আগুনের চারধাবে ঘিবে বসলাম। জঙ্গ-বাহাহুর এতক্ষণে বেশ সামলে উঠেছিলেন, তিনি আগুনের দিকে পিছন ফিরে ঠিক ছুবীর সামনে বক্তৃতা কবাব ধরণে আবস্ত কবলেন, “এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এই ব্যক্তি হয় বার্কিক্যাব আক্রমণে এমন দশাষিত হয়েছেন, নযত কোনো কারণে তার বুদ্ধিবৃত্তি হঠাৎ লোপ পেয়েছে। ইনি সত্যিই মিগ্ল্‌স্‌ কিনা—”

কথা শেষ করা বোধহয় জঙ্গ-বাহাহুবেব কপালে লেখা ছিল না। “মিগ্ল্‌স্‌! ও মিগি! মিগি!” বলে আগেকার স্বরেই ঠিক সেই চীৎকার শোনা গেল।

আমরা এইবার কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গিয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। জঙ্গ-বাহাহুর খুব চট্ট-কমেই সরে দাঁড়ালেন, কারণ শব্দটা ঠিক তাঁর মাথার উপর থেকেই আসছিল। যাক, শব্দটা যে কোথা থেকে আসছে তা শিগ্গিবই বোঝা গেল, দেখালে লটুকানো একটা কাঠের তাকে মস্ত বড় একটা ময়নাকে দেখা গেল। তার দিকে চাইবানাত্র সে এমনই চূপ মেরে গেল যেন তার সাত-পুরুষের কেউ কখনও ডাকতে জানে না। এরই গম্ভীর আওয়াজ-আমরা রাস্তায় থাকতে শুনতে পেয়েছিলাম, চেয়ারেব লোকটিব এই অভ্যস্ততা কবাব মধ্যে কোনো হাত ছিল না।

যুবা বিল লঠন হাতে কবে এই সময় ফিরে এল, সে কাউকে খুঁজে বেব করতে পারেনি। চাঁদর গুলোর উৎপত্তি স্থল তাকে বলা গেল, তার বোধহয় ঠিক বিশ্বাস হল না, চেয়ারটার দিকে তখনও সে এতদূর সন্দেহভাবে তাকাতে লাগল। একটা টিনের ছাউনি থেকে ঘোড়াগুলোকে সেইখানে সে রেখে এসেছে, কিন্তু অচিরে একচোট ভেজাতে তার মেজাজ আরও তেরিয়া উঠেছে। ঘরে ঢুকেই বলল “দশ মাইলের ভেতর ফান একটা মানুষ নেই, আর এই বুড়ে বেটা তা ছেনেও কিছু বলছে না।”

কিন্তু দেখা গেল যে আমরাই ঠিক আন্দাজ কব ছিলাম। যুবা বিলের গজ্‌গজানি থামতে না থামতে বাইরে লঘু পাঘের শব্দ শোনা গেল আব তাব পশেব মিনিটেই একটি তরুণী দম্কা হাওয়াব মত ঘরে দবজাটা বন্ধ কবে তাতে ঠেপ দিয়ে দাড়াল। তার বড়-বড় কালো চোখ তাবার মত ঝকঝকে, কাপড় ভিজে হাওয়া গায়ে জড়িয়ে গিয়েছে, চলা-ফেরার মধ্যে বাধাব লেশমাত্র নেই। দরজায় পিঠ দিবে আমাদের দিকে ফিরে সে বলে উঠল “আমিই মিগ্ল্‌স্‌।”

এই নাকি মিগ্ল্‌স্‌! এই তরুণী যার মাথাব কোবড়া চেউ-খেলানো চুল থেকে কাঠেব-জুতো-পবা শোনা পা ছুখানি অববি সবই লাবণ্য-মাথা! তার মাথায় একটি ছেলেদের টুপী, তার ভেতর থেকে তাব কৌকড়া হোদ গোছা বেরিয়ে পড়ে মুখেব চাবধারে ছলছে। আমরা

মুখেব দিকে চেয়ে সে বেশ সপ্রতিভভাবে হাসতে লাগল।

আমরা স্বাই এতই ভাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম যে কারুর মুখ দিয়ে আব কথা বেরছিল না। মিগ্লস্ যেন তা দেখতেই পেল না, এমন কি যুবা বিলের ছুপাটি দাঁত যে কেন অকারণে বেবিয়ে পড়ল তাব কাবণ অল্পসন্ধান করবারও তাব কোনই ইচ্ছে দেখা গেল না। সে হাঁপুতে হাঁপাতে বলতে লাগল, “তোমাদের গাড়ী যখন রাস্তা পাব হয়ে আসছিল, আমি তখন বাড়ীর থেকে ছুগাইল দূবে। তোমরা হয়ত এখানে এসে উঠবে, আর বাড়ীতে ‘কিম্’ ছাড়া কেউ নেই, এই ভেবে আমি সারা পথটা ছুটে আসছি। বাবা! একেবারে বেদম হয়ে পড়েছি।”

মিগ্লস্ চট করে মাথা থেকে টুপিটা খুলে কেলল, টুপির যত জল সব পড়ল আমাদের গায়ে এসে। টুপি খুলতেই তাব স্বাব্য চুলের গোছা মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল, চুল ঠিক করতে গিয়ে গোটা দু তিন চুলের কাঁটা মাটিতে ফেলে দিয়ে গোলা চুলেই হাসতে হাসতে সে যুবা বিলের পথে বসে পড়ল।

জঙ্গ-বাহাদুর এবাবও সবার আগে সামলে উঠেছিলেন, তিনি এখন খুব গম্ভীরভাবে তরুণটিকে সম্ভাষণ করতে এগোলেন। তাঁব কায়াদা-দুরন্ত বচন-বিন্যাসে বাধা দিয়ে মিগ্লস্ বলল “আমার চুলের কাঁটাটা একটু কষ্ট করে তুলে দিন।”

প্রায় আধ জঙ্গন হাত একসঙ্গে সেই কাঁটাটার উপবে গিয়ে পড়ল, তার স্বন্দবী অধিকারিণী সেটা এক সেকেন্ডেই ফিরে পেলেন। চুলের গোছা কাঁটা দিয়ে ভাল করে আটকে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি সেই আবান-কুসীর কাছে ছুটে গিয়ে সেই লোকটির মুখেব দিকে তাকাল। দেখতে-দেখতে পীড়িতের চোখের ভাব বদলে গেল। তার ভাবহীন মুখে যেন প্রাণের ঢেউ খেলে গেল, চাউনিতে একটা বুদ্ধির আভাস দেখা দিল। মিগ্লস্ জোরে হেসে উঠে আবার আমাদের দিকে ফিরে এল, ঐ হাসিতে তার মনের কথা অনেকপানি ধরা পড়ে গেল।

“এই পীড়িত ব্যক্তিটি কি—” এই পর্যন্ত বলে জঙ্গ-বাহাদুর একটু ইতস্তত কবতে লাগলেন।

মিগ্লস্ চট করে বলল “ও জিম্।”

“তোমার বাবা?”

“না।”

“ভাই নাকি?”

“না।”

“স্বামী?”

মিগ্লস্ একবার আমাদের দুটি সহযাত্রীব দিকে তাকাল—তাঁরা হুজ্জন মোটেই প্রশংসমান পুরুষদের দলে যোগ দেননি—তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল “না ও জিম্।”

খানিকক্ষণ সব চুপ, কেউ কথা কয় না। মহিলা যাত্রী দুটি ঘোঁষাঘোঁষি কবে সরে দাঁড়ালেন, “ওয়াশোব” যে ভদ্র-লোক সঙ্গে গৃহিণীকে নিয়ে চলেছিলেন তিনি একদৃষ্টে আগ্রনব দিকে চেয়ে রইলেন, লম্বা লোকটি এ হেন অবস্থায় কি কবা উচিত, নিশ্চয় হয়ে বোধ হয় তাই ভাবতে লেগে গেল, কিন্তু মিগ্লস্ হেসে উঠে শিগ্গিবই আমাদের গুমোট ভাবটা দূর কবে দিল। “তোমাদের নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে, চা করে দিচ্ছি, কেউ একটু আমাকে সাহায্য করবে?” বলে সে এগিয়ে এল।

সেচ্ছাসেবকের অভাব মোটেই হল না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল যুবা বিল “ক্যালিবানের” মত একালের এই বিরান্দাটিব জন্ত কাঠ বইছে, ডাকপিওন কফি গুঁড়োতে ব্যস্ত, আমার উপর মাংস কুটবার ভার পড়েছে, আব জঙ্গবাহাদুর খোস মেজাজে সবাইকে প্রচুর পরিমাণে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। অল্পক্ষণ পরেই মিগ্লস্, আইবিশম্যানটি আর জঙ্গবাহাদুর মিলে টেবিল সাজিয়ে ফেললে। বাইবে তখন বাড় গর্জাচ্ছে, হুহ করে চিম্নি দিয়ে হাওয়া চুকেছে, জানলাব উপব রুটির জল ঝাপটা দিচ্ছে, আব মহিলা যাত্রী দুটি এককোণে ঠেসে বসে ফিস্ফিস্ করে কি বলাবলি কবছেন, কিন্তু এততেও আমাদের ফ্রি খুবই জমে উঠল। আগুনটা কাঠকুটো দিয়ে বেশ কবে উক্কে দেওয়াতে ঘবখানা পবিস্কারই দেখা যাচ্ছিল, কাঠের দেয়াল মাসিক-কাগজের ছবি দিয়ে স্ননিপুন মেয়েলী হাতে সাজানো। আন্বাবপত্র যা-কিছু সবই কেবসিন কঠেব বান্ন ভেঙ্গে গড়া, আব পশুব চামড়া কি বৃষব বংএব মোটা কাপড় দিয়ে পরিপাটি কবে মোড়া।

ত জিমের আবার কুলাপানা একটা ময়দার পিপের নব রূপান্তর। ঘরে দু চাবটা যা জিনিষপত্র রয়েছে তাতেই বেশ সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

চমৎকার হয়েছিল, খাওয়াটা তেজা হল। বাজমল, সে আরও তেজা, তাব জন্ত বেশীভ ভাগ্য। নিশ্চয়ই মিগল্‌সের প্রাপ্য। সে গল্প জমাবাব দাটা জানত, যা কিছু প্রগ কবাব সব সে একলাই, কিন্তু তাও এমন সবলভাবে যে সে যে নিজেব না কথা লুকতে চায় তা মোটেই মনে হল না। তাদের নিজেদেব ঘবেব কথা, আমরা কোথায় যাচ্ছি, কবতে, রাত্তাটা কেমন, ঝড় বৃষ্টিবই বা কি অবস্থা—বিষয়েই কথা হল, কেবল আমাদের আশ্রয়দাত্রী আবাব কথা ছাড়া। মিগল্‌সের কথার ধরণ যে বিশেষ মরণ শব্দ কিম্বা কাষদা-হুরগু হচ্ছিল তা মোটেই নয়, কিন্তু সে মাঝে মাঝে এমন দু চাবটা অলঙ্কার ব্যবহার হল যা চিরদিনই পুরুষ-জাতটার সম্পত্তি বলে গণ্য। সেগুলোর সঙ্গে তার প্রাণখোলা হাসি আর কান্ডলনা চোখের চাউনিব মিলন হচ্ছিল বলে তাতে আমাদের কোনো পটকাই লাগছিল না।

ঘরে বাইরেব দিকেব দেয়ালে কে যেন জিমের ভাবি রাখানা ঘবছে, খেতে খেতে এমনি একটা শব্দ শোনা। তাবপরেই এগিয়ে এসে দবজাব রূপাট আঁচড়াতে ল, তার ফোঁস ফোঁস করে নিখাস ফেলার শব্দ ঘর ক শুনতে পাচ্ছিলাম। মিগল্‌সের দিকে একটু মাস্ত দৃষ্টিতে তাকাবামাত্র সে বলল, “ও জোয়াকিন্। বে ও দে?” আমরা কিছু উত্তর দেবার আগেই সে পাটা খুলে দিল, আব একটা মস্ত বড় “গ্রজলী” কব বাচ্। ঘরে ঢুকে সোজা হয়ে ভিকিরীব মত হাত বাড়াল। মিগল্‌সের দিকে তাব তাকানব কণ আমাব চট্ ববে মনে পড়ে গেল যুবা বিলের মহিলা যাত্রী দুটি ভয় পেয়ে কোণে সবে দাঁড়াচ্ছেন। মিগল্‌স বলল “ও কাউকে কানডান না, তুমি কাউকে ডাঙনা, না টপি?” কিছু খাবাব দিগে ভালুকটাকে থেকে বের কবে দিগে সে টেবিলে ফিবে এসে বসে ন “তোমাদেব ভাগিা ভাল যে তোমরা যখন এলে তখন

জোয়াবিন্ বাড়ী ছিল না।” জজ-বাহাদুর জিগ্‌গেস করলেন “এ ছিল কোথায়?” “আমাব সঙ্গে, আর কোথায়? ও সারাক্ষণই আমাদের চৌকি দিগে বেড়ায়, ঠিক যেন মাস্তম।”

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে আমরা ঝড়ের গর্জন শুনতে লাগলাম। বোধ হয় সবাব চোখের সামনেই এক ছবি ভেসে উঠেছিল—বনের ভিতর দিয়ে মিগল্‌স চলেছে, মাথায় তাব বাদলেব জল ঝবে পড়ছে, পাশে পাশে চলেছে তার ডয়াবহ ঋক্ষ বক্ষকটি। জজ-বাহাদুর “যুনা আর তার সিংহেন” সঙ্গে তুলনা কবে কি একটা স্ততিবাক্যও যেন ঝাডলেন, সে সেটা বেশ গম্ভীর মুখেই শুনল। তাব ভাব দেখে মনে হয় যেন সবাইকে যে সে কতখানি চমকে দিগেছে, তা নিজে মোটেই জানে না, যুবা বিলের পুজাটা না দেখা কিন্তু এ একটু শক্ত ব্যাপাব।

মিগল্‌সের স্বজাতীয়া যে দুটি আমাদের দলে উপস্থিত ছিলেন, ঐ ভালুকটাব আবির্ভাবে, গৃহস্থামিনীর উপর তাঁদের মন মোটেই বেশি প্রসন্ন হল না। তাঁরা দুজনে যে, তুষাব-শীতলগান্তীর্ঘ্যেব গম্ভী সৃষ্টি করলেন তাতে আমাদেরও ফুটি জল হয়ে আসতে লাগল। মিগল্‌সও বোধ হয় সেটা বুঝতে পেরেছিল, হঠাৎ মহিলা দুটির দিকে ফিরে বলল “বাত হয়েছে, চলুন আপনাদের শোবাব ঘর দেখিয়ে দি, আর তোমাদেব বাপু এই ঘরেই কোনো রকমে রাত কাটাতে হবে, এই দুটো বই ত আর ঘর নেই।”

পরের হাঁড়ির খবর জানতে বিশেষ ব্যস্ত বলে বদনাম পুরুষ-জাতটার সম্বন্ধে ভেমন নেই। কিন্তু সত্যের খাতিরে আমরা একটা কথা স্বীকার কবতেই হবে। আমাদের রূপসী আশ্রয়দাত্রীটি মহিলা যাত্রী দুইটির সঙ্গে ঘরের বার হবা মাত্র আমবা সবাই গিলে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে, মুচকে হেসে তার অভুত সঙ্গীটির আর তার জল্পনা স্বরু কবে দিলাম। গল্পে যেতে গিয়ে সেই বুদ্ধিহীন জীবন্ত জিমেরও গাণে যে দু চাব বাব ঠোক্তব লাগাইনি তা নয়। সে অর্থহীন দৃষ্টিতে আমাদের সাংসারিক গল্পে মত্ত দলটির দিকে চেয়ে ছিল, অন্যাদি অতীতের ঐদাসীত্রে যেন তার চাউনিতে আমাদের গল্প খুবই জমে উঠেছে এমন সময় দবজা খুলে মিগল্‌স ঘরে ঢুকল।

কিন্তু একি সেই, যে এই ক-ঘণ্টা আগে আমাদেব চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল? তাব চোখের দৃষ্টিতে সঙ্কেচ আর হাতে একখানা কদল নিয়ে সে দবজাব গোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল, আগেব সেই মন-ভোলান নিভীক সরলতা তার আব নেই। তাবপব কি যেন একটা বাধা কাটিয়ে সে চট করে ঘবে ঢুকে, একখানা নীচু টুল টেনে নিয়ে সেই অচল লোকটির পাশে এসে বসল। কদলখানা নিজের গায়ে বেশ করে জড়াতে জড়াতে বল্ল “তোমাদের যদি কিছু অসুবিধে না হয় ত রাতটা আমি এইখানেই কাটাই, আর জায়গাও ত নেই কোথাও।” আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করে সে জিমের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে পিছন ফিরে বসল, চোখ রইল তার সেই আগুনের শিখার দিকে চেয়ে। আমরা একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলাম। বাইবে তখনও ঝড় বইছে, এক-একটা দম্কা গাওয়া মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে পড়ে কয়লাগুলোকে উল্টে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সব ঘেন একটু চুপ হল, গিগলসও তখুনি মাথা তুলল। হাত দিয়ে চুলের গোছা পিছনে সরাতে সরাতে সে বল্ল “তোমাদের ভেতর কেউ কি আমায় চেন?”

কেউ উত্তর দিল না।

“একটু ভেবে দেখ। বছব কয়েক আগে আমি মেরিসভিলে ছিলাম। সেখানের সকাই আমাকে চিন্ত, চিনবাব অধিকাবও সবাব ছিল। জিমের কাছে আসবাব আগে সেইখানেই আমাব দোকান ছিল। সে প্রায় দু বছব হল, এতদিনে আমি একটু বদলে গেছি হয়ত।”

আমরা কেউই কোনো উচ্চবাচ্য না করাতে সে বোধ হয় একটু অপ্রস্তুত হল। কানিকক্ষণ চুপ কবে আবাব বসে বইল আগুনের দিকে চেয়ে, তারপব তাড়াতাড়ি করে বলে যেতে লাগল “যাক্, আমি ভেবেছিলাম তোমরা কেউ আমাকে চিনলেও চিন্তে পার। তা তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। আমি বলছিলাম কি যে এই জিম—জিমের হাত-খানা সে দুহাতে চেপে ধবল—আমাকে খুব ভাল কবেই চিন্ত, টাকাও ঢেলেছিল ঢের আমাব পেছনে। বোধ হয় যা কিছু ছিল সবই খুইয়েছিল। শেষে একদিন—সে

আজ দু বছর হল—জিম আমার ঘরে এসে চেম্বাবে পড়ল, তাবপর থেকে তার এই অবস্থা। তাব আর পা নাড়ার ক্ষমতাও বইল না, কি যে তাব হল তা নিজে বুঝল না। ডাক্তার দেখে বলল, বদ জন্মোই তার এমন দশা হল, জিম বড় গোয়ার ছিল। নেশাও করত। ভাল হবার আশা ডাক্তার কিছু দিল বলল টিক্বেও না আব বেশি দিন। ওরা ওকে সং হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিতে বলল, কাক ত আর কিছু লাগবে না, কেবল কচি ছেলের মত চিবকাল বোঝা থাকবে। কিন্তু আমি বললাম “না, তা আমি দেব। কেন বলেছিলাম জানিনা, বোধ হয় ওর চোখের চ দেখেই কিছা চিরকালই আমাব কচিছেলের সাধ ছিল জন্মোও হতে পাবে। আমাব তখন টাকাকড়িও পণারও সবাইকাব কাছে খুব। তোমাদের মত লোকেবাও আগায় দেখতে আসত। আমি সেখান দোকান পাট বেচে ফেলে এইখানে আমার থোকা নিয়ে চলে এলাম। জায়গাটা বেশ নিরাবিল কিনা।”

কথা বলতে বলতে সে একটু পিছনে সরে বসল, আব আমাদেব মধ্যে রইল সেই মহুম্যব্দের ধবংসাবশেষ সে নিজে আঁধাবে লুকিয়ে ওকেই আমাদের চোখের সা ধবল, সেই মুক্ ভাবহীন মুখই বেন তার হয়ে কথা বা লাগল, পরমেশ্বরের দণ্ডে দণ্ডিত চলৎশক্তিহীন হ সে তার সঙ্গিনীটিকে অদৃশ্য বাহতে আগলে রইল।

আমাব কোণ থেকে গিগলস আবাব বলতে লা তখনও সে জিমের হাত শক্ত করে ধবে আছে।

“এখানে প্রথমে আমাব বড় অসুবিধে হত, কিছু মন টিক্ত না, আমোদ আহ্লাদে লোকজনের সঙ্গেই কাল কাটিয়েছি। আমার কাজকর্ম করবাব জগ্ মেয়েমানুষ খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কেউ আসতে না, পুরুষ চাকর রাখতে সাহস হল না। যাক্, শে বকম কবে সব গুছিয়ে নিলাম, এই বুনো জায়গায় ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা আমার কাইফরমাসগুলো দিত আর দরকারি জিনিসপত্র সব দোকানদাররা পাঠি দিত নর্থফোর্ক থেকে। ডাক্তারও মাঝে মাঝে স্তা মোটোর থেকে এসে ওকে দেখে যেতেন। এসেই বলে

ক মিগ্লসের খোটাটিকে দেখি," মাঝে মাঝে বলতেন "মি খান! মানুষ মিগ্লস, ঈশ্বর তোমায় স্বপ্নে রাখুন।" "আর আমার মনে হত না যে আমি একলা। শেষবার মিগ্লসে বেরতে বেরতে তিনি বলেন "মিগ্লস্ জান, গমার খোকা একদিন মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠবে, তার মায়ের গোরবের জিনিস হবে; কিন্তু সে এখানে নয়, এখানে নয়—"মুখ গভীর করে তিনি বেরিয়ে গেলেন, "আর যেন মনে হল যে—" মিগ্লসের গলার স্বর মিলিয়ে গেল, মুখখানা ও আঁধারে ঢাকা পড়ে গেল।

খানিক পরে তার মুখ দেখা গেল, সে এগিয়ে বসে বাব বলতে লাগল, "এখানকার লোকজনরা বেশ ভাল বহারই করে। ছোকবারা দিনকত বাড়ীর চারিধারে বই ঘোরাঘুরি কবত, কিন্তু দিন কয়েক পবেই কোনো বিধে না দেখে তাবা সরে পড়ল; মেয়েরাও দয়া কবে—কউ আমাকে দেখতে আসে না। প্রথম প্রথম বড়ই কঁলা লাগত, একদিন বনের মধ্যে জোয়াকিনকে কুড়িয়ে পলাম, সে তখন ছোট্ট বাচ্চা, তাকে ভিক্ষে চাইতে থালাম, তার খাইখরচ আমার কিছু লাগেনা আর। তারপর পোনী আছে—ঐ যে গো ঐ ময়নাটা—ওটা এত বড়, কথাও বলে একেবারে অফুবান্, কাজেই এখন তার আমার একলা ঠেকেনা, ওবাই বিকেল বেলাটা বেশ মিয়ে তোলে। আর জিম্,"—মিগ্লসের সেই পুৰণো হাসি আবার ঝলকে উঠল, সে উঠে দাঁড়াল—"জিম্ও এত জানে! তাব বুদ্ধি দেখে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। যখন ফুল নিয়ে আসি তখন এমন করেই তাকায় যেন বেশ বুঝতে পারছে; একলা বসে বিকেলবেলা ওকে কতদিন ঐ দয়ালেব গায়েব ছবিব নীচেব লেখাগুলো পড়ে শুনিয়েছি। শীতকালে আমি তাকে গোটা দেয়ালটাই শুনিবেছি। তার মত পড়াশোনায় মজবুত লোক কমই দেখা যায়।" সে চুপ করল। জঙ্গ-বাহাদুর জিগ্গেস করলেন "যার মত তুমি তোমাব তরুণ জীবনটি উন্মর্গ করলে তাকে তুমি বিয়ে করনা কেন?"

সে বলল "তা হলে জিমের উপর একটু অজায় কবা হবে। তার এখন কোনো ক্ষমতা নেই বলেই কি আমি তাব উপর এমন কলঙ্ক দেব? ভাল থাকলে সে ত আমাকে

বিদে কবত না। তা ছাড়া আমি এখন যা নিজেব ইচ্ছে করছি, বিয়ে হয়ে গেলেই মনে হবে আমি যেন তা কবত বাধ্য, সে আমার ভাল লাগবে না।"

"কিন্তু দেখ তোমার এখনও অল্প বয়স, চেহারাটাও ভাল--"

মিগ্লস্ তাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "রাত হল, এখন শুয়ে পড়াই ভাল। শুভ্-নাইট!" গায়ে কদলখানা বেশ করে জড়িয়ে, জিমের পায়েব তলার ছোট্ট নীচ টুলটাতে মাথা বেখে তাব চেহাৰেব পাশে সে শুয়ে পড়ল, আর একটিও কথা কইল না। আগুনটা আস্তে আস্তে নিবে আসতে লাগল, আমরাও সবাই চুপচাপ শুয়ে পড়লাম যে যাব কদল মুড়ি দিয়ে। চাবদিকের সব শব্দ থেমে গেলে কালে বইল শুধু ঘরে এতগুলি লোকের নিশ্বাসের শব্দ আর বাইরে টিনের চালের উপর বৃষ্টির জলের ঝমঝমানি।

ভোরের দিকে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম বড় জল তখন কেটে গেছে, আকাশে দু-একটি তাবা বদল ঝক্ করছে, আব খোলা জানালার ভিতর দিয়ে কালো কাঁচ-গাছের সাঁবের মাথাব উপর দিয়ে ঘরের মধ্যে উকি মাঝে পুণিয়ার চাঁদ। তার আলো সেই হতভাগ্যের চারিদিকে দয়াময়ের কঙ্কণার মত ঝরে পড়ছে, আর তাবই পায়েব উপর যার কালো চুলের ঢেউ ছড়িয়ে গিয়ে চুল দিয়ে মুছিয়ে দেবাব পুরাতন মধুর কাহিনী স্বরণ করিয়ে দিচ্ছিল, সেই তরুণীব মুখেও সেই আলোই পুণ্যধারার মত এসে পড়ে তাকে যেন পবিত্রতায় অভিষেক করছিল, সব বিল মাঝখানে আগশোয়া ভাবে পড়ে পড়ে রুম্ম তব দৃষ্টিতে সবাইকে চৌকী দিচ্ছিল, তার করুণ মুখখানায় যেন একটু কবিত্ব-মণ্ডিত দেখাচ্ছিল ঐ আলোতে। তারপর কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, সেদিন দেখি চারদিক বোদে ভবে গিয়েছে, যুবা বিল আমার পাশে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলছে "ওঠ না হে বাপু।"

টেবিলে সবাইকাব জন্তে কফি সাজানো, 'বু' মিগ্লসের দেখা নাই। গাড়ীতে ঘোড়া জোতা হয়ে গেল, তখনও আমরা বাড়ীর আশেপাশে ঘুরছি, কিন্তু সে আব ফিরল না। বুঝতেই পারলাম, সে আমাদের বাবা মামুলি ধরণের বিদায় নিতে চায় না, তাই সরে পড়ে

মহিলা ছটিকে গাড়ীতে তুলে দিবে আমরা আবার এসে কাঠেব ঘরখানাঘ ঢুকলাম, প্রত্যেকে খুব গম্ভীর ভাবে জিমের সঙ্গে হাওশেক করলাম, এবং হাওশেকের পরে তেমনি গম্ভীর ভাবেই আবার তাকে সোজা করে বসিয়ে দিলাম। শেষবার একবার ঘরখানার চারদিকে চোপ বুলিয়ে নিলাম, তারপর আশ্বে আশ্বে উঠলাম গিয়ে গাড়ীতে। যুবা বিলেব চাবুক শপশপ শব্দ করল, গাড়ীও ছাড়ল।

বড়রাস্তায় যখন পৌছেছি, হঠাৎ বিল রাস্তা ঘরে এক ইঁচকা টান দিলে, ডাকগাড়ী থেমে গেল। দেখি পথের ধারে এক টিপির উপর মিগ্লস্ দাঁড়িয়ে, চুল এলিয়ে পড়ে বাতাসে চেউ খেলছে, কালো চোখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে; হাতেব সাদা কামালখানি নেড়ে নেড়ে সে আমাদের বিদায় দিচ্ছিল। আমরাও আমাদের টুপী নাড়তে লাগলাম। তারপর যুবা বিল আর মায়া বাড়াবার ভয়েই যেন ঘোড়াগুলোকে জোরে চাবকে দিল, ঝাঁকরানি দিয়ে ডাকগাড়ী আবার এগোল, আমরাও বসে পড়লাম। নর্থফোর্ক পৌছবার আগে কেউ একটাও কথা বললাম না। আমাদের গাড়ী গিয়ে হাজির হল পুরানো হোটেলে। আমরা সবাই খাবার ঘরে ঢুকে পড়লাম, জঙ্ক-বাহাদুর সবার আগে আগে।

তিনি গম্ভীরভাবে নিজেব সাদা টুপীটা মাথা থেকে নামিয়ে হাতে করে আমাদের দিকে ফিরে বল্লেন—
“আপনাদের সবাইকার গেলার ভরা হয়েছে ত?”

গেলার ভরাই ছিল।

“আচ্ছা তবে সবাই এবার পান করুন মিগ্লসের স্বাস্থ্য, পরমেশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন।”

হয়ত তিনি আশীর্বাদ করেছেন। কে বলতে পারে?

শ্রীমতী দেবী।

আলোচনা

বাক্সালা-বানান-সমস্যা।

পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় বানান সমস্যা।
সমাধান সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

১। প্রথম প্রশ্ন—করা, চল, প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক শব্দের আকারের উৎপত্তি কি?

শাস্ত্রীমহাশয় বলেন, (১) স. করণ বা উচ্চারণে করন্, (২) স. রাজন্ প্রথমার এক বচনে স.তে রাজা হয়। অত সাদৃশ্যে করণ-করন্—করা। এইরূপ, স. ভবন্—প্রা. হবন্ হোজন্—হোজন্—হোজ বা হওয়া, স. প্রাপণ—প্রা. পাবণ পাওন্—পাওয়া।

২। এই বৃত্তিতে দোষ পড়িতেছে। স. করণ বা উচ্চারণ করন্ এই অংশ অবশ্য ঠিক। স.তে রাজন্ শব্দে রাজা, ইহাও ঠিক কিন্তু বা. ভাষা, রাজন্—বাজা, বিচার কিংবা অরণ করিয়া রাজা গ্রহণ করিয়াছে কি? বোধ হয়, এত বিচার করে নাই। কারণ হই। সেকালের লোকের সংস্কৃতভাষা-জ্ঞান সমধিক ছিল, স্বীকার করি হয়; সংস্কৃত ও বাঙ্গালার ঐক্যসাধনের প্রয়াসও স্বীকার করিতে হত। ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ব্যতীত ভাষায় রাজন্ শব্দ ছিল বিহতরাং সাদৃশ্যে ‘করন্’ হইতে ‘করা’ করিবাব বৃত্তি ছিল না।

৩। এই প্রশ্নে বা. ভাষার একটা তত্ত্ব উল্লেখ করিতেছি। স. ভাষা হইতে বা. ভাষা বহু শব্দ লইয়াছে, লইতেছে। স. প্রথমার এক বচনে যেরূপ, বা. ভাষা সেইরূপ লইয়াছে। স. অশ্বখার বিসর্গ থাকিলে তাহা ত্যাগ করিয়া লইয়াছে। যথা, বা. ‘সখি’ নহে ‘সখা’, ‘মাতৃ’ নহে ‘মাতা’, ‘মনস্’ নহে ‘মন’ (মনঃ বিসর্গ ত্যাগে), ‘দিশ্’ নহে ‘দিক্’, ‘চক্ষমস্’ নহে ‘চক্ষমা’, ‘ধনিম্’ ন ‘ধনী’, ‘জীমং’ নহে ‘জীমান্’, ‘আজন্’ নহে ‘আজা’, ‘রাজন্’ ন ‘রাজা’, ইত্যাদি। ‘রাজন্’কে ‘রাজনের’ নহে, ‘রাজা’কে ‘রাজা’ বা ‘ভাষা’ ‘রাজা’ শব্দের উৎপত্তি বিচার করে নাই, ‘রাজা’ পাইয়াছে লইয়াছে। এই বৃত্তিতে ‘শাস্ত্রী-মহাশয়’, ‘পিতা-ঠাকু’ ‘মন-মোহন’, ইত্যাদি বানান নির্দোষ। সম্বোধনে, ‘হে হরে’, ‘হে সো’ ‘হে গুরো’, ‘হে পিতা’, ‘হে বধু’, ‘হে রাজন্’, ‘হে বিঘ্ন’, ইত্যাদি চলিত হইতেছে। কিন্তু ‘হে হরি’, ‘হে সখা’, ‘হে রাজা’ লিখিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। কয়েকটি শব্দ পৌরবে স.তেব বচনের রূপে চলিত আছে। যথা, মহাস্ত, জীমস্ত, বিদ্যাবস্ত, ইত্যাদি বস্ত, মস্ত প্রত্যয়-স্বরূপও হইয়াছে। আমার বাক্সালা ব্যাকরণে তা দেখাইয়াছি। এইরূপ, গৌরবে, ‘পাপিষ্ঠ’, ‘বলিষ্ঠ’, ‘জ্যেষ্ঠ’, ‘কনিষ্ঠ’ ইত্যাদি। গ্রাম্যজনও ‘গরিষ্ঠ ভোজন’ বলে।

৪। এই অনুমান ঠিক হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিচার বৃত্তিহী

পড়ে। প্রথম প্রহর উত্তর ঘামার নিম্নে অস্তরূপ বোধ
দেখিতেছি 'বঙ্গভাষায় অতিভাব' প্রসঙ্গে ঘামার উত্তর পড়ে
নাই। প্রামাণ্য বাকরণে স্পষ্ট আছে। প্রবাসীতে পুনরুজ্জী-
কৃত হয় নাই। এখানে আবান জানাইতেছি। বা-তে
কৃৎ, প্রত, প্রাতি, সেখানে এই সকল বিশেষণ বসে। এত
বাক্য করা হইবে,—'কর' বিশেষণ। এই 'কবা'ও কি প্রাচীন
'করিবা' হইতে? বোধ হয় না। এখানে কব্ বৃত্ত+বা।
কৃত=হিন্দী কিত, বা. করা, ও. কল। এই রূপ, প্র-
গত=হিং গয়, বা. গেল (প্রাচীন, গেল), ও. গল। অতএব
বতমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক 'কব', এবং কৃতক্রিয়াবাচক 'কবা', এক
মূল হইতে আসে নাই।

৮। যদি 'করিবা' হইতে 'কর' বাক্য করি, তাহ হইবে—
হইতে বাবা—বাওয়া, 'শুইবা' হইতে শোবা—শোওয়া অর্থ বাওয়া
ওয়া। এই বা. বা না হইয় যায় না। বাইবার বেলা, বাবা
বেলা, বাওয়ার বেলা, তিনই বলিতে পারি যায়, অর্থতঃ হয়
এইরূপ, নি-ইব—দিবা দিওয়া—দেওয়া।

৯। যদি ইহাই ঠিক, তাহ হইলে বা মা, বাঅ, বাঅ, বাঅ
শোঅ, হাঅ, ল-অ, কোথা হইতে আসিল? আমার অনুমানে
বা (বা) হইতে আসিয়াছে। কোথাও বলাপে আসা আছে, কেবা
বা হানে ওয়া হইয়াছে। আমি বলি, এই যে ওয়া, ইংলিশে
হানী নোকের সহিত সংসদে হইয়াছে। আমার মনে হয়, যতদূর
কান পাতিয়া শুনিলে ওয়া শোবা, যাঁইবে না, যাঁইবে আ।
ক প্রমাণ নাই। গ্রামে কেহ কোথাও 'বাওয়া' শুনিলে, গা-
আমি রূপমত, বলিতে পারি না। কিন্তু যদি ভাষাভাষানয়ন
তাহা হইলে 'বাওয়া' শুনিলে পাওয়া, যাঁইবে না, যাঁইবে
কোথাও বা 'বাঅ'। স. 'বাঅ' হইতে 'বাঅ' মনে হইবে
কিন্তু সেটা অসঙ্গত। কারণ, অন্য, অন্য প্রত্যয়
শব্দ আছে যাঁহার সহিত স. মূল্যেব একা নাই। মন,
কামড়ান, আঁকড়ান, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, স. অন প্রত্যয়
কিন্তু এই মূল ধরিয় বা. ভাষা নিজের স্বাতন্ত্র্যে প্রত্যয়
দিয়াছে। এই রূপ, নেমান, নেমান, শোআনা, ধোআনা
হলে, নেওয়ান, নেওয়ান, শোওয়ান, ধোওয়ান, যে
নিদর্শকে বলিতে পারা যায়। 'নি' বাহু শাণ্ড (স. নি) 'ক'
'নেঅ' বাহু হয়। 'নেঅ' বাহুর ওস্তর অন কি ব অন
অথচ কেহ কেহ 'শোওয়ান', 'ধোওয়ান' দেখেন। আমার মনে
মূল দেখেন। ওয়া, ওয়ানী (ব্যস্তিক) 'বা' 'বা'
বলিতে পারি না। বাঙ্গালার হয়, বা. না হয় আ, হ-বা ক
উ-বা কবিলে অতিক্রিয় 'হওয়া', 'বাওয়া' 'ক' 'ক'
প্রতি ব-বালা শব্দে ওয়া অনাবশ্যক হইবে।
এস করিতে পারা যায় কি না, তাহাই আর বিবেচনা

পড়ে। প্রথম প্রহর উত্তর ঘামার নিম্নে অস্তরূপ বোধ
দেখিতেছি 'বঙ্গভাষায় অতিভাব' প্রসঙ্গে ঘামার উত্তর পড়ে
নাই। প্রামাণ্য বাকরণে স্পষ্ট আছে। প্রবাসীতে পুনরুজ্জী-
কৃত হয় নাই। এখানে আবান জানাইতেছি। বা-তে
কৃৎ, প্রত, প্রাতি, সেখানে এই সকল বিশেষণ বসে। এত
বাক্য করা হইবে,—'কর' বিশেষণ। এই 'কবা'ও কি প্রাচীন
'করিবা' হইতে? বোধ হয় না। এখানে কব্ বৃত্ত+বা।
কৃত=হিন্দী কিত, বা. করা, ও. কল। এই রূপ, প্র-
গত=হিং গয়, বা. গেল (প্রাচীন, গেল), ও. গল। অতএব
বতমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক 'কব', এবং কৃতক্রিয়াবাচক 'কবা', এক
মূল হইতে আসে নাই।

৮। যদি 'করিবা' হইতে 'কর' বাক্য করি, তাহ হইবে—
হইতে বাবা—বাওয়া, 'শুইবা' হইতে শোবা—শোওয়া অর্থ বাওয়া
ওয়া। এই বা. বা না হইয় যায় না। বাইবার বেলা, বাবা
বেলা, বাওয়ার বেলা, তিনই বলিতে পারি যায়, অর্থতঃ হয়
এইরূপ, নি-ইব—দিবা দিওয়া—দেওয়া।

৯। যদি ইহাই ঠিক, তাহ হইলে বা মা, বাঅ, বাঅ, বাঅ
শোঅ, হাঅ, ল-অ, কোথা হইতে আসিল? আমার অনুমানে
বা (বা) হইতে আসিয়াছে। কোথাও বলাপে আসা আছে, কেবা
বা হানে ওয়া হইয়াছে। আমি বলি, এই যে ওয়া, ইংলিশে
হানী নোকের সহিত সংসদে হইয়াছে। আমার মনে হয়, যতদূর
কান পাতিয়া শুনিলে ওয়া শোবা, যাঁইবে না, যাঁইবে আ।
ক প্রমাণ নাই। গ্রামে কেহ কোথাও 'বাওয়া' শুনিলে, গা-
আমি রূপমত, বলিতে পারি না। কিন্তু যদি ভাষাভাষানয়ন
তাহা হইলে 'বাওয়া' শুনিলে পাওয়া, যাঁইবে না, যাঁইবে
কোথাও বা 'বাঅ'। স. 'বাঅ' হইতে 'বাঅ' মনে হইবে
কিন্তু সেটা অসঙ্গত। কারণ, অন্য, অন্য প্রত্যয়
শব্দ আছে যাঁহার সহিত স. মূল্যেব একা নাই। মন,
কামড়ান, আঁকড়ান, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, স. অন প্রত্যয়
কিন্তু এই মূল ধরিয় বা. ভাষা নিজের স্বাতন্ত্র্যে প্রত্যয়
দিয়াছে। এই রূপ, নেমান, নেমান, শোআনা, ধোআনা
হলে, নেওয়ান, নেওয়ান, শোওয়ান, ধোওয়ান, যে
নিদর্শকে বলিতে পারা যায়। 'নি' বাহু শাণ্ড (স. নি) 'ক'
'নেঅ' বাহু হয়। 'নেঅ' বাহুর ওস্তর অন কি ব অন
অথচ কেহ কেহ 'শোওয়ান', 'ধোওয়ান' দেখেন। আমার মনে
মূল দেখেন। ওয়া, ওয়ানী (ব্যস্তিক) 'বা' 'বা'
বলিতে পারি না। বাঙ্গালার হয়, বা. না হয় আ, হ-বা ক
উ-বা কবিলে অতিক্রিয় 'হওয়া', 'বাওয়া' 'ক' 'ক'
প্রতি ব-বালা শব্দে ওয়া অনাবশ্যক হইবে।
এস করিতে পারা যায় কি না, তাহাই আর বিবেচনা

১০। কত কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় দুই ব এক হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। মনে হইয়াছে, এবং কিছু প্রমাণও পাইয়াছি, আট শত বৎসর পূর্বে দুই ব এর উচ্চারণ পৃথক ছিল। অথচ মহাশোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় 'বৌদ্ধগানে ও দোহা' শোধান করিয়াছেন, তাহাতে দুই ব পাই না। সব গানের ভাষা কিংবা বানানও এক নহে। কোন গানে যে শব্দে ণ, অল্প গানে সে শব্দে ন। এমন কি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ণ-এর বাহুল্য দেখিয়া প্রথমে আশ্চর্য হইয়াছিলাম। ইহার যে শব্দে ণ আছে, 'বৌদ্ধগানে'-হয়ত সে শব্দে নাই। চণ্ডীদাসের অল্প পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বানান দূরে থাক, ভাষাই পাই না। হাজার বছরের (৭) বাঙ্গালা গৃহ-পুরাণে ব দূরে থাক, ণ পাই না। এই সব দেখিয়া শূনিয়া বোধ হইয়াছে সেকালের বাঙ্গালা ভাষার বহু ভেদ ছিল। এই ছাপা-খানা ও ছাপা বহির দিনেও যোজনান্তে ভাষা লুপ্ত হয় নাই। দেখা, দেওয়া, হসা, হওয়া; প্রভৃতি বিিন্ন প শব্দের মধ্যে কোনটা ভাষা আর কোনটা ভাষা, তাহা বলিবার জো নাই। তবে বাঙ্গালার গতিক দেখিলে দেখা, হসা, লসা, প্রভৃতি ঠিক মনে হয়।

১১। অস্ত্র ব-কারের উচ্চারণ পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে যে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইবে, তাহা আমি বিশ্বাস করি। ভাষায় ধনিটা আছে, ধনির দ্যোতক হারাইয়া গিয়াছে। কেবল বাঙ্গালা ও ওড়িয়া ভাষার দুই ব-এর উচ্চারণ এক হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয় আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। ওড়িয়াতেও সব শব্দে এক হয় নাই, ব ফলার ব সংস্কৃতের তুল্য উচ্চারিত হয়। হিন্দী মরগী ও দাক্ষিণাত্য ভাষায়, উদূতে, এমন কি মৈথিলী ও আসানীতেও দুই ব নইলে চলে না। ইদানী ইংরাজী শব্দের প্রচলন-হেতু অস্ত্র ব আবশ্যক হইতেছে। এখন কথা হইতেছে, সে ব-এর কি মুক্তি হইলে ভাল হয়। শাস্ত্রী-মহাশয় পেট-কাটা ব (ব)-কে বগীয় ব বসিতে বলিয়াছেন। তাহা হইলে সামান্য ব অস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহা বোর পরিবর্তন হইবে। কারণ আমরা ব-এর উচ্চারণ বগীয় করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। যে শব্দ যে অর্থে বলিয়া আসিতেছি, যে অক্ষর দ্বারা যে বর্ণ ধা ধনি বুঝিয়া আসিতেছি, তাহার অত্যা হইলে ভাষা ও লিখন ওলট-পালট হইয়া পড়ে। সেটা ভাষার উন্নতি নহে, অবনতি। নাগরী ব বাঙ্গালা কোথায় অক্ষরের সহিত মানায় না! এই কারণে আমি আসানী ব অক্ষর লইয়াছি। এই অক্ষর যে ভাল, তাহা নহে। ইহার প্রধান দোষ, ইহা দ্বারা ব-ফলা প্রকাশ করিতে হইলে ব টা ব-এর মতন দেখায়। অসংযুক্ত আকায়েও ব ব

ঘটিতে পারে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে অস্ত্র ব এর আকৃতি কিংবা ও অক্ষরের সহিত সাদৃশ্য রাখা কতখানি হইবে। এ বর্তমান ব-অক্ষরের প্রতি মায়া কাটাইয়া উহার রূপান্তর কত কিছু কে এ সব করে? ইচ্ছা করিলে বগীয় সাহিত্য-পরিষদ পারেন।

১২। এক এক অক্ষর দ্বারা এক এক ধনি বুঝি বলিয়াই 'লেখকদিগের "কালো ভালো মতো করানো জানানো" প্রভৃতি বান অ-কার স্থানে ও-কার যোগ দ্বারা বিবাদ সৃষ্টি হইতেছে। অ তাহার ভাষার উন্নতিপ্রয়াসী। কিন্তু তাহািগের উন্নতি শে অর্থ বুঝিতে পারি নাই। 'মোরবে বুক ভরে ওঠে', 'জাতীয় জী গড়ে তুলতে প্রধান', ইত্যাদির 'ভরে' 'গড়ে' বানানে উন্নতি বুঝি পারিতেছি না। বানান ও লিখনটা ভাষার কি বিষয়, নত দানযোগ্য অর্থে 'দেখ' শব্দ আছে বলিয়া 'দ্যাখ' পদ সৃষ্টি করিতে হইবে— শাস্ত্রী মহাশয়ও 'ঘা'বা' বানান করিয়াছেন। বাঙ্গালার বাঙ্গালীর স্থানে ও লেখায় ভাষার অবনতি মনে করি। শাস্ত্রী মহাশয় 'বাঙা' বানান করিয়া থাকেন। কেন করেন, যদি অস্ত্রত: তিনি আদ্যবিগে বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে আমরা মশজ্ঞন গতানুগতিক ভায়ে তা অমুসরণ করিতে পারি। জানিতে চাই, কেবল 'বাঙ্গালা' কি 'বাঙ্গলা' শব্দ বুঝাইবার সময় ক্ষ স্থানে ও দিতে হইবে, কি যেথা ভাষায় ও পাইব সেখানেই ও লিখিব? বোরের বীধ বলিয়া ছিলেন, আমরা ক্ষ উচ্চারণ না করিয়া ও করি। এ ক্ষ মা না। যদি বা মানি, তাহা হইলে বাবতীয় শব্দের বানান ধনি-সংবাদ করা উচিত হইবে না কি? শুধু ক্ষ উপরে, আক্রোশ, এবং ও প্রতি আদর কেন? প্রাচীন বৈক্যবপাবলী হইতে শাস্ত্রী মহাশয় যে কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহাতে আমার আগতি দৃঢ় হইয়াছে। 'পিঙ্গল' স্থানে 'পিঙল,' কিংবা 'ভাঙ্গ' স্থানে 'ভাঙ' দ্বারা বুঝিতেছি ও ষাক এই অক্ষর যে ধনির দ্যোতক সেই ধনি করা হইত। বৈক্য পদাবলীতে 'শাঙল' (প্রাণ) শব্দ পাইয়াছি। 'সঙরণ' শব্দ অদ্যপি প্রচলিত আছে। 'পিঙল' ও 'ভাঙ' শব্দের ও অবিকল সেই ও। অক্ষরের নাম উঅ', এও, অক্ষরের নাম ইঅ'। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে মোঞি, কাহাঞি, প্রভৃতি শব্দে এও না লিখিত আছে। চন্দ্রবিন্দু-যোগ লিপিকবের কিংবা গায়কের বোধ হয়।

কথানির্জা বাঙ্গা এড়ি মিছাঞ' দোষনি বুটা
হৃদযত ভয় না মানসী।

এখানে 'মিছাঞ' বানানে এও অক্ষরের প্রকৃত ধনি পাইতেছি। অক্ষরেরও এই রূপ বিশেষ ধনি আছে। কয়েকমান পূর্বে প্রবাসী, অনেক প্রমাণ তুলিয়াছি।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

(প্রভুত্তর ও সমালোচনা)

(১)

নাথবাবু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া আলোচনাকে তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ত হইবাছি। আমি কি এমন ভাষা ব্যবহার করিয়াছি যার মনে আঘাত লাগিতে পারে? তিনি আমার বিষয়ে বুঝিয়াছেন এবং এই ভুল-বিশ্বাস জইয়া বাহা লিখিয়াছেন কেও আমাকে ভুল বুঝিতে পারে, এইজন্য ২১১ কথা বলান হইতেছে।

(ক)

‘মার বিষয়ে বলিয়াছেন “তিনি (=সমালোচক) বার-বার লেখকের উল্লেখ করিয়া আমাকে এই ভাবে শাসন—“কি? এত পণ্ডিতের মতের বিরুদ্ধে, আর এই যুগে একুপ করিতে সাহস?” একুপ ধমক দার্শনিক পণ্ডিতেব পক্ষে

হুলা কোটোনানের অভ্যন্তরস্থ কথাগুলি আমার নহে। আমি ই ইহা বলি নাই। কেবল এই কথাগুলিই যে বলি নাই কোন কথাতেও উক্ত ভাব প্রকাশ করি নাই। উক্ত অংশের গব উভয়ই সীতানাথবাবুর।

ধবাবুকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তিনি সর্ব-ঠ এবং আমি কনিষ্ঠ। তাঁহার প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করা ধমক দেওয়া আমি অপরাধ মনে করি। দার্শনিকদিগের যে উক্ত করিয়াছি তাহা সীতানাথবাবুকে ধমক দিবার আমার যুক্তি আমি যদি Kantএর মত লোকের গ্রন্থে পাই, ত্ত তাঁহার নামে প্রচার করাই কি ভাল নয়? আর আলোচ্যে যে অতি গুরুতর হয়, তাহা হইলে চিত্তাশীল লোকদিগের যুক্তির দ্বারা যুক্তি মিলাইয়া সেবা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সীতানাথবাবু ভাবিতে পারিতেন যে তাঁহার দুর্গ এতই দৃঢ় যে ইহা ভগ্ন হইয়া অনেক গোলাগুলি ধার করিয়া আনিতে হইয়াছে।

(খ)

বলিয়াছিলাম সীতানাথবাবু Jamesএর প্রতি কটুক্তি করিয়াছেন। সীতানাথবাবু বলেন তিনি Jamesকে ওসব ন নাই; তিনি সাধারণ ভাবে Pluralism সম্বন্ধে উহা। আমার অশুভ্রকার বুঝিয়াছি। তিনি “Radical empiricism”এর নাম করিয়া সেই-সঙ্গে Jamesএর উল্লেখ করেন। Empiricism-বিষয়েই তিনি overweening self-confidence কথটা ব্যবহার করেন। Jamesএর Pragmatismএর নক, শিষ্যও কম নহে কিন্তু তাঁহার Radical Empiricism-ব্যাখ্যা এবং সমর্থক এখনও দেখা বাইতেছে না। র Empiricism বলিলে Jamesকেই বুঝায়। হুত্তরাং overweening self-confidence কথটা Jamesএর মন্তকেই ল। আমরা এই-প্রকারই বুঝিয়াছি।

নাথবাবু Jamesকে লক্ষ্য করিয়া “author’s superficial view of the Absolutist writers” এবং “James’s view of Absolutism” (পৃ ২৫০) এই দুইটি কথা প্রয়োগ

করিয়াছেন। ইহাতেও সন্দেহ না হইয়া নিজ মত সমর্থনের জন্য Bradleyএর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহাতে “limits of his knowledge” (পৃ ২৫৪) এই কথাগুলি আছে। এই-সময় দেখি কি সমালোচক বলিতে পারে না যে “পড়াশুনাটা বড়ই কম”?

তৃতীয় কথাটা James “যেন নাস্তিক।” প্রতিবাদে সীতানাথবাবু বলিয়াছেন—“আমি ত আমার বইয়ে কোথাও Jamesকে নাস্তিক বলি নাই।” আমিও কখন বলি নাই সীতানাথ বাবু Jamesকে নাস্তিক বলিয়াছেন। আমার ভাষা “যেন নাস্তিক।” Jamesএর মত দ্বিগুণে সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন “If there is a god at all” ইত্যাদি (পৃ ২৫১)।

সীতানাথবাবু লোককে ইলিতেছেন Jamesএর মত এই—ঈশ্বর যদি একান্তই থাকে ইত্যাদি। ইহার অর্থ কি ইহা নহে “James যেন নাস্তিক”? প্রতিবাদেও তাহিনি বলিয়াছেন “James ঈশ্বর সম্বন্ধে হির মত প্রকাশ করেন নাই”; আরও বলিয়াছেন “James যদি ঈশ্বরবাদী হন” ইত্যাদি। হুত্তরাং আমার অভিযোগ অমূলক নহে।

(২)

ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়িয়া এখন মূল বিষয়ে আলোচনা কর বাটিক।

(ক)

সীতানাথবাবু বলিয়াছেন আমি Logic এবং Psychology-বিষয়ে অনেক গোলমাল করিয়াছি। এ বিষয়ে আমার ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। “জীবের মানসিক জীবনে অগ্রে জ্ঞান, পরে ইচ্ছা-প্রকাশ”—এই কথা সীতানাথবাবু প্রতিবাদেও বলিয়াছেন। কিন্তু সমালোচনায় এ মতও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়টি সমালোচনার অবাস্তব বিষয়। মুখ্য বিষয় এই—“জ্ঞান কায়ার মূল লক্ষণ কি না।”

(খ)

আমি সীতানাথবাবু মত খণ্ডন করিবার জন্য Greenএর একটি যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সীতানাথবাবু ইহার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন “Green বলিয়াছেন “thought”, মহেশ বাবু ইহা অনুবাদ করিয়াছেন ‘জ্ঞান’। কেন? Thoughtএর অনুবাদ ‘চিন্তা’, জ্ঞান হইবে কেন? Thought ব্যক্তিবিশেষের ‘সাময়িক জিয়া’, তিনি আরও লিখিয়াছেন—“Greenএর গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড এখন আমার কাছে নাই। Green কোন সংশ্লেষ এবং কোন অর্থে উল্লিখিত কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি জানি না, এই জানি তাঁহার মত বোঝার জন্য ঐ খণ্ড তেমন প্রয়োজনীয় নয়।”

পুস্তকখানা না দেখিয়া প্রতিবাদ করাটা ঠিক হয় নাই। দুঃ একদিন অপেক্ষাও করিতে পারিতেন, মধ্যস্থলেও হয়ত এমন ব্যক্তি আছেন, যাহাকে লিপিলে তিনি পুস্তকখানা পাঠাইয়াও দিতে পারিতেন। গ্রন্থখানা পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন যে সমালোচনা অনুবাদে ভুল হয় নাই। আরও পুস্তকখানা না পড়িয়াও সীতানাথবাবুর মত একজন দার্শনিক পণ্ডিত বলিতে পারিতেন যে ও-অংশে Thought অর্থ জ্ঞানই। এইপ্রকার Hegelian ভাষার অর্থ হয় না।

বাহা হউক সকলের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। সমালোচনার যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে এ অংশ ঠিক তাহার পূর্বেই।

“What Hegel had to teach was, not that thought is the *prius* of things, but that thought is things and things are thought. The only effectual answer

to such criticism as we have supposed to be called forth by Dr. Caird's way of putting his case lies in an appeal not to those processes of the discursive understanding which are what the reader inevitably takes to constitute thought but to things." ইহার পরেই আমার উক্ত অংশ :—

To assume, because all reality requires thought to conceive it, that therefore the thought is the condition of its existence, is, indeed unwarrantable. (Works, vol iii, p. 145).

ইহাতেই বুঝা যাইবে যে এখানে ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক ক্রিয়ায় অর্থে Thought শব্দটা ব্যবহৃত হয় নাই।

Greenএর মত বিশ্ববাব পক্ষে তাঁহার গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডে তেমন প্রয়োজনীয় নয় এই কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যাবিত হইয়াছি। আমরা কি বলিব New Testamentএর Apocryphaয় আর এ খণ্ডও গ্রীকমণ্ডনের Apocrypha? একজন দার্শনিকের মতামত জানিব অথচ তাঁহার সমুদয় দার্শনিক প্রবন্ধ পড়িব না ইহা কি একটা কামের কথা? Lotzeএর গ্রন্থ পড়িবার পূর্বে Green হেগেলের মত হইতে কতটুকু সরিয়া পড়িয়াছিলেন, Dr. Cairdএর মতের সহিত তাঁহার মতের কোথাও ও কতটুকু পার্থক্য—ইত্যাদি বিষয় জানা কি আবশ্যক নহে? এ-সব জানিতে হইলে তৃতীয় খণ্ড পড়া নিতান্তই দরকার।

(গ)

“আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান” নামক অংশের বিস্তারিত সমালোচনা করা হইয়াছিল, ইহা সীতানাথবাবু পছন্দ করেন নাই। বিস্তারিত সমালোচনার কারণ এই যে গ্রন্থকার মনে করেন এই অংশে যাহা প্রমাণ করা হইয়াছে সেই সত্যই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিমূল (the basis of our knowledge of God ইং, বাং পৃ ৭)।

সীতানাথবাবু ব্রহ্মজ্ঞানসার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে কোন বস্তুকে জানিবার জন্য আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া জানে। আমরা যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি যে ‘কোন বস্তু জানিবার সময় জ্ঞাতা আপনাকে জ্ঞাতরূপে জানে না।’ আপনাকে অনুভব করা এবং আপনাকে জ্ঞাতরূপে জানা এই দুইটি এক কথা নহে, ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। আত্মা যখন কোন বিষয়কে জানে, সেই সময়ে সে আপনাকে জ্ঞাতরূপে জানে না, ইহাই আমাদের সিকান্ত। উপসংহারে বলিয়াছিলাম—

“তবে কি জ্ঞাতাকে জানা যায় না? ইহার উত্তরে ‘হা’ ‘না’ উত্তরই বলা যাইতে পারে। এ প্রশ্নের মীমাংসা ‘জানা’ শব্দের উপর নির্ভর করে।

“একজন জ্ঞাতা আছেন, একটি ক্ষেত্র বস্তু আছে, এতদ্ব্যতীত মতো একটি সম্বন্ধ, জ্ঞাতা জ্ঞেয়বস্তুকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে, এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে ‘সম্বন্ধজ্ঞান’কেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে এবং জ্ঞাতা নিজ জ্ঞাতৃত্বকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে—ইহাই যদি জ্ঞানের অর্থ হয়, তবে বলিব জ্ঞাতা ঠিক জ্ঞানলাভের সময় আপনাকে জানে না এবং আপনি যে বিষয়ের জ্ঞাতা তাহাও জানে না। (ক)

তবে যে-নিম্নে জ্ঞাতা কোন জ্ঞান লাভ করে, ঠিক তাহার পর নিম্নেই ঐ জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়।

কিন্তু এইপ্রকার ‘জানা’ ছাড়াও অল্প একপ্রকার জানা আছে, তাহার নাম অপারোক অনুভূতি, Bradleyএর ভাষায় Immediate

Experience, Bergsonএর ভাষায় Intuition। ‘জানা’ নাম দিতে আপত্তি না থাকে তবে বলিব জ্ঞাতাকে নতুবা যজ্ঞবল্লভের ভাষায় বলিব ‘বিজ্ঞাতাকে জানিবে?’ (খ)

সীতানাথবাবু (খ)-চিহ্নিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া ২ গোলমাল চুকিয়া গেল। একজন জ্ঞানকে ‘জানা’ বলিতে ও দূরে থাক, আমি এই জ্ঞানের কথাই বলিয়াছি। অদৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যকতা এই যে স্মৃতিতে এই জ্ঞান। স্মৃতিতে যে প্রথম উৎপন্ন হয় তাহা নহে। এই বিষয়ে আমি Ferrier ও শঙ্করের উল্লেখ করিয়াছি।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই :—

গোলমাল চুকিয়া যাওয়া দূরে থাক, বাড়িয়াই গেল। অংশে ‘জানার’ যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, সেই অর্থ এ সীতানাথবাবু ব্রহ্মজ্ঞানসার বাদানুবাদ করিয়াছেন। (২) পড়িয়া মনে হইতেছে সীতানাথবাবু সমালোচনাটা সহিত পড়েন নাই। সমালোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে ঘটনার জ্ঞান এবং স্মৃতির জ্ঞান এক নহে। স্মৃতিতে এ থাকে। সেই বেশী অংশ এই—‘আমি ইহা জানি। প্রতিবাদেও সীতানাথবাবু বলিয়াছেন মৌলিক জ্ঞান ও জ্ঞান একই জাতীয় জ্ঞান ;—পার্থক্য এই—প্রথমটি অস্পষ্ট, দ্বিতীয়টি স্পষ্ট। (৩) অপারোক অনুভূতি ও Immediate Experience আমি যাহা বলিয়াছি, সীতানাথবাবু মনে করেন, তিনি বলিয়াছেন। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ করিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশের একস্থল এই—knowing is matter of direct perception, insight or intuition (জানাটা অনেক স্থলেই সাক্ষাৎ-দৃষ্টি-ঘটিত, সাক্ষাৎ অনুভব জ্ঞানের ফল)।”

কিন্তু ইহার পরেই ভাবের বিপর্যয় ঘটয়াছে। আত্মা সাক্ষাৎ ভাবে জানে (—অনুভব করে) সীতানাথবাবু যদি কে বলিয়াই নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে গোলমাল কমিয় কিন্তু ইহার পরেই বলিতেছেন—

No knowledge is possible without the knowledge of the self as the knower,—without the knowledge of the piece of knowledge as one's own, অর্থাৎ জ্ঞাতা বলিয়া না জানিলে, প্রত্যেক জ্ঞানকে ‘আমার জ্ঞান’ জানিলে কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না’ পৃ ২।

গ্রন্থের বহুস্থলে এইপ্রকার ভাব রহিয়াছে—

We could not know anything without knowing ‘I know’ ‘the knowledge is mine’ অর্থাৎ ‘আমি জ্ঞান’ ‘এ জ্ঞান আমার’ ইহা না জানিয়া আমি কোন বস্তুই জানিতে পারি। (পৃ ১১; ইং ১০।

অপর একস্থলে বলিয়াছেন “আত্মা যে আপনাকে জানে, জ্ঞানে? জ্ঞাতারূপে। আত্মা যে-কোন বিষয়ই আত্মক, বিষয়ের সঙ্গে আপনাকে সেই বিষয়ের জ্ঞাতারূপে জ্ঞাত, আত্মজ্ঞান যে-কোন বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে প্রকাশিত হউক, জ্ঞানের আকার ‘আমি জ্ঞাতা’। আত্মা আপনাকে জ্ঞাতারূপে জানে। (পৃ ১৪, বাং)।

অতঃপর দেখা যাইতেছে যে সীতানাথবাবু প্রতিবাদে বলিলেন আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে জানা যায়, কিন্তু তাহা

কহ-কেহ বলিতে পারেন “এই মনোবিকার আমারও তোমারও মনোবিকার এবং প্রত্যেকেই মনোবিকার”— হইতে পারে না? ইহার উত্তর দিবার পূর্বে সীতানাথ-বাবু ২১১টা অংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

“এই পদ্ধতি-বিষয়ে ব্রহ্মভিক্ষাসা এই প্রকার আছে :—

“এই বিজ্ঞানোপপত্তির ঘণ্টা কারণ নয় কি? আস্তা-ভিত্তির বিজ্ঞানসমম্বিত হইতেছে। ভিত্তি-ভিত্তি বিজ্ঞান অনুভব ব্যাপারটা; তা এই; ইহার জন্ম একটা অজ্ঞেয় অভাবনীয় অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কি আবশ্যক?..... আস্তা নিজের বিজ্ঞান-সমম্বিত হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করিলেই ত হয়, এটি অতিরিক্ত কর্তা ভাবিবার প্রয়োজন কি?” বাঃ পুঃ

কথা করিবার জন্ম ইংরাজী সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশ হইয়াছে, বাঙ্গলা গ্রন্থে এ অংশ নাই।

“The idea that in sensation the self is purely mental—which makes people imagine a not-self as sensation in it. (পৃঃ ৬৫)। অর্থাৎ লোকে ভাবে আস্তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কিয়,—এই জন্ম তাহার কল্পনা যে একটা অনাস্তবস্ত এই বেদনা উৎপাদন করিতেছে।

পরেই বেদনার প্রকৃতি-বিষয়ে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া

“sensation being purely mental—a form of consciousness—it bears no impress and furnishes no proof, nothing extramental—any not-self. It implies the self's spontaneity or activity—its capability of assuming various sensuous forms” ইং পৃঃ ৬৬। (বাঙ্গলা অংশও নাই)। এই অংশে বলা হইতেছে :—

বেদনা কেবলই মনোব্যাপার।

ইহা আস্তার বা জ্ঞানের একটি রূপ।

ইহাতে বাহ্যবস্তুর চিহ্নমাত্র নাই, ইহা কোন বাহ্যবস্তু বা বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে না।

এই বেদনা হইতে প্রমাণিত হয় যে আস্তা আপনা-আপনিই কল্পনা করিতে পারে এবং আস্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকার

বস্তুজ বলিয়াছেন :—

“জ্ঞানবস্তুর দুই দিক্, একদিক্ জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতাব্যপেক্ষ একদিক্ কেবলই জ্ঞান। প্রথম দিক্কে বিদ্যী, দ্বিতীয় দিক্কে জ্ঞেয় বলা যায়।।...এই যে জ্ঞানের দুই দিক্, কেহ ইচ্ছা করিলে একদিক্কে আস্তা, অপর দিক্কে অনাস্তা বলিতে পারেন। সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আস্তা ও অনাস্তা একই দুইটা অচ্ছেদ্য দিক্ মাত্র, আদিত খাঁটি বস্তু—জ্ঞান, আমরা অনেক স্থলে কেবল আস্তাই বলিয়াছি। ইহাকে আস্তা বলা যাইতে পারে, কেননা আস্তা বলিলেই বিষয় ও বিষয়ত্ব উভয়ই পৃ ৭৭, ইং ৭৪—৭৫।

অন্যসমূহ হইতে আমরা বুঝিতেছি যে Not-self অর্থটি বলিয়া কিছু নাই। ‘অনাস্তা’ কথাটা যদি ব্যবহারই করিতে হইলে বলিতে হইবে ইহা আস্তারই একটি দিক্।

যে মত ব্যাখ্যা করা হইল ইহাকেই আমরা Subjective বলিয়াছি। সীতানাথবাবু বলেন “যারা বলেন বিষয়-বস্তুজ ভ্রান্তি-বিষয় উপস্থাপিত করে, তাঁহাই Subjective

Idealist, আমি এই মত পোষণ করা দুবে ধাব্, আমি ইহাও-একটা পরিচ্ছেদ লিখিয়াছি।” ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই :—গ্রন্থে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে আমরা ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়া ছাড়া বেশী কিছু পাই নাই। বেদনা-ব্যাপারে আস্তা ক্রিয়াশীল, আস্তাই নিজের বেদনা-নিজের উৎপাদন করে। সুতরাং সীতানাথবাবুর ব্যাখ্যা যথাসমাবেশে তাহার মত Subjective Idealism. আর সীতানাথবাবু যে বলিয়াছেন তিনি Subjective Idealism খণ্ডন করিবার জন্য এক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন—তাঁহার উত্তরে বক্তব্য এই যে তিনি যাহার নাম দিয়াছেন Subjective Idealism, তাহা আমাদের Subjective Idealism নহে। তবে এসময় অবাস্তব কথা। মূল কথা এই—সীতানাথবাবু জড়জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া মনোবিকার বা বেদনা ছাড়া কিছুই পান নাই এবং তাঁহার মতে এই বেদনা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার, ইহাতে বাহ্য বস্তুর চিহ্ন মাত্র নাই।

এখানে বলা যাইতে পারে যে ইহার সমুদয় বস্তুকেই মনোবিকারে পরিণত করেন, তাহাদের মতও Subjective Idealism, তবে নামে কিছু এসে যায় না। রহস্যকে রহস্যই বল, কিংবা চামেলী বা গোলাই বল, রহস্যের রহস্যত্ব ঘুচিবার নয়।

এখন পূর্বের প্রশ্ন ধরা বাড়ুক। ইহা কি হইতে পারে না যে এ জগৎ আমারও মনোবিকার, তোমারও মনোবিকার এবং প্রত্যেকেই মনোবিকার?

আমাদের প্রথম বক্তব্য এই :—

জ্ঞান-ব্যাপারটা কেবল মনোবিকার নহে। বেদনা, মনো-বিজ্ঞানাদি হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। তবে যথাযথ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে ইহার অসুবিধার নিবৃত্তি করিয়া বলিয়া দিতেছে ‘ঐ দেখ তোমার আস্তার অতিরিক্ত বস্তু ইহাকেই বলে Transubjective Reference. সীতানাথবাবু ভিক্ষাসা করিয়াছিলেন sensation বা feeling কোন feeling in a ছাড়া থাকিতে পারে কি না। এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবার পূর্বে তিনি যদি ভিক্ষাসা করিতেন—“এ জগৎটা কি কেবলই মনোবিকার নহে তাহা হইলে ঐ প্রশ্ন করা আর আবশ্যক হইত না।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই :—

জ্ঞান-ব্যাপারটি যদি কেবলই মনোবিকার হইত তাহা হইতে মনোবিকারকে মনোবিকার বলিয়াই বুঝা যাইত না। জন্ম বা সহিত সম্পর্কিত হয় বলিয়াই আস্তা জ্ঞান লাভ করে,—বিষয়জ্ঞান লাভ করে এবং অজ্ঞান লাভ করে। Edward Caud পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে আমরা বস্তুকে মনোবিকারে পরিণত করিতে পারি। “we must repel the Berkeleyan tendency to dissolve objects into mere ideas” (Evo. Theo. vol 1, p. 190).

আমরা কেবল নিজের মনের অবস্থাকেই জানি এই মতকে যে paradox of subjective idealism বলিয়াছেন (p. 19) :—

“It is... irrational to take thoughts as mere states of the subject without reference to reality; for it is such objective reference that all their meaning lies in. Indeed apart from such reference, we could not comprehend them even as states of the subject” (p. 1 vol 1).

মানুষ যদি কেবল নিজের মনের বিকাবেই আশ্রয় খাতিয়ে হইলে তাহার সঙ্গে amūba (এমিবা) প্রভৃতি জীবের পার্থক্য কি? amūba (এমিবা) জানে না যে আমি আমি

নার অবস্থা। বিকাবাগদ মানুষকে এত 'এনিগমেটিক' পরিণত করে।

E Card এর ভাষায় বলা যাইতে পারে—

If the object be reduced to a state of the subject, the subject ceases *ipso facto* to be an ego; and a self which knows nothing but its own states is an absurdity, a cross between a sensitive subject which does not know but merely feels and a self-conscious subject which can be conscious of itself only as it is conscious of objects (Critical Phil. Vol I, p. 420; and Evolution of Theology, Vol. I. See p. 189).

Dr. Card এর মতবাদ খাটি জ্ঞানবাদী, তাহারও মত এই:—

If we start with mere sensation, it is as much a problem how we get *into* ourselves, as how we get *out* of ourselves (words N and A vol II, p. 289)

Dr. Card এ বিষয়ে কি যুক্তি বিদ্যাছেন তাহা পাঠকগণ উক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ২৮৯ পাইবেন।

তৃতীয় বক্তব্য এই:—

কল্পন করিয়া লওয়া যাউক বিকারবাদীর পক্ষে নিজের অবস্থা না সম্ভব। সে কেবল নিজের অবস্থার বিষয়েই জানিতে পারে। ছাড়া অন্য বস্তু আছে, ইহা তাহার পক্ষে জানা সম্ভব নহে। জানিবেই বা কি করিয়া? নিজের অবস্থা ছাড়া আর ত কিছু নাই। এমন প্রশ্ন এই, তাহার নিকটে জগতের নরনারী আছে না? বলিতেই ইহা যে জগতের নরনারী বলিয়া কিছু নাই। তাহার মনে জড়জগতের যে গতি, জগতের নরনারীরও সেই গতি। জগতের সমুদয় আত্মা শারীরিক। সুতরাং বাহ্য জগতের অন্তর্গতই বা আত্মাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। ব'হ্য জগৎ যখন আমার নাবিকার তখন জগতের নরনারীও আমার মনোবিকারে পরিণত হয়।

জানিতে পাই অপর লোকেও চিন্তা করে এবং জ্ঞানসারেই চিন্তা করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইহার আশ্রয়ই মনোবিকার এবং সেই জ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ আমি এসব চিন্তার বিষয় কিছুই জানি কেহ কি করিয়া সম্ভব হইল যে, যে মনোবিকার (নরনারীগণ) এই জ্ঞানের বিষয়, সেই মনোবিকারের মধ্যে কি ঘটতেছে, ওহা কি জ্ঞানের অতীত? এ মনোবিকার ত অজুত মনোবিকার! বলেন—If the brain of my fellow man is only a part in my mind, how then is it possible that some of my ideas in another's head is diseased and coming my fellow man to all sorts of insane statements? A relativism, with its constantly vibrating correlation of subject and object cannot avoid the conclusion at least the last subject to which he relates the object as object, must be a brainless subject (Science Metaphysics, p. 50).

স্থলে বলা আবশ্যক Edward Card এর জ্ঞানবাদ-বিষয়ে এ গণনা প্রযোজ্য নহে। তিনি জগৎকে মনোবিকারে পরিণত করেন; তিনি দার্শনিকভাবেই স্বীকার করেন যে প্রত্যেক উদ্ভাস আছে। A thorough-going idealism will not admit the reality of that which is other than

mind and even, in a sense, diametrically opposite (Evolution of Theology, vol II, p. 27)। উদ্ভবশ্রুতি কেবল মনোব্যাপার নহে। ইহারও প্রকৃত তিনি ইহাও বলেন যে জড়জগতের যদি প্রকৃত কর, তাহা হইলে সমুদয় জগতের অস্তিত্বই অর্থহীন হইবে। The denial of the reality of the material world will inevitably lead to the denial of any world (Idealism, p. 4).

চতুর্থ বক্তব্য এই:—

বিকারবাদিগণের মধ্যে দুইটি কথা গুলিতেছি—(১) 'আমার বিকার।

আমি ছাড়া যখন দ্বিতীয় আত্মাই নাই, তখন এ আমার ছাড়া আর কাহার?

অর্থাৎ এই প্রশ্নাও আছে কেবল দুইটি জিনিষ:—

(১) একটি তত্ত্বকোষ

(২) ইহার অভ্যন্তরস্থ একটি ক্রমিকীট।

পঞ্চম বক্তব্য এই:—

অতি জড় জড়বাদ এবং এই বিকারবাদ একই জিনিষ। বলে জড়বস্তুর দ্রব্য বা দীর্ঘ, বিকারবাদী বলেন, তোমরা যাহা বলিতেছ, তাহা আমারই আত্মার অবস্থা। সুতরাং আমার অবস্থাই দ্রব্য বা দীর্ঘ। লোকে বলে জড় বস্তু লাল, কাল বা বিকারবাদী বলেন আমার একটা অবস্থাই লাল, কাল বা লোকে বলে জড়বস্তুর কতিন তরল বা বয়বীয়, এই বিকারবাদী আমার আত্মার একটা অবস্থাই কতিন, তরল বা বয়বীয়। বলে জড়বস্তুর কটু, তিক্ত, কষায়, বিকারবাদী বলেন আমার অবস্থাই কটু, তিক্ত, বা কষায়। যাহা পূর্বে জড়ের দ্বারা পরিচিত হইত, এখন তাহা আমার অবস্থার-রূপে পরিণত যাহার অবস্থা দ্রব্য বা দীর্ঘ, লাল, কাল বা সাদা; মিষ্ট কটু কষায়—সে বস্তু জড়বস্তুর ছাড়া আর কি? পূর্বে জড় বস্তু ছিল এখন আসিল ভিতরে। ইহাতে জড় বস্তুর জড়ত্ব বিনষ্ট হই আত্মাই সেই জড়ত্ব গ্রহণ করিল। (Adamson's Fichte, p. 10)

সীতানামাধার যে Subjective Idealism কে অতিক্রম চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে। তাহার চেষ্টার প্রণালী এই:— তিনি প্রথমে জড়জগৎ বিশ্লেষণ করিলেন। তাহার পর করিতে চেষ্টা করিলেন এ-সমুদয় বস্তু আমারই দর্শন, আমার এবং সমুদয় আমারই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত (এই সমালোচনার, ৭ ১ ও ২-চিহ্নিত অংশ দেখ)।

ইহার পর কোন-প্রকার যুক্তি না দিয়া বলিলেন—জড় জগৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত (৩-চিহ্নিত অংশ দেখ)।

'আমার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত' ইহা এক কথা, এবং 'জ্ঞানে ও ইহা সম্পূর্ণ পূর্ণত্ব কথা। প্রথম সিদ্ধান্ত হইতে দ্বিতীয় পৌছান যায় না।

অর্থাৎ Subjective Idealism এর তরগীতে আরোহণ Absolute Idealism এর দেশে পৌছান যায় না। নৌকায় কেবল ওপ টানাই যায়।

(৬)

আমরা বসিয়াছিলাম "আমার জ্ঞান ও ব্রহ্মের জ্ঞান একই প্রকার ইহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রতিবাদে, বসিয়াছেন "প্রমাণ করিতে পারি নাই বলিলেই তাই নাই।